

বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫—আষাঢ়

সম্পাদক

শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতা,

৬৮, পটলভাঙ্গা ষ্ট্রাট

বার্ষিক মূল্য

130220

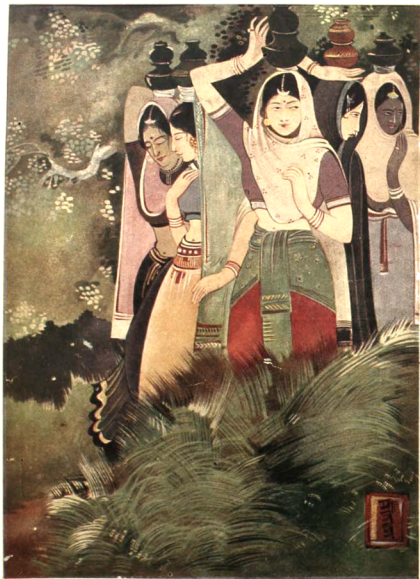
756.3
005/6

বিষয়-সূচী[illegible]

निर्दिष्ट

ସାମ୍ବାଦିକ ୨୪୮

[illegible][illegible]



भारतीय

मित्री—शिवमोरी ७

मौस, १०००

বিচিত্রা

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড

১৯৩৩

প্রথম সংখ্যা

বীজ-ধর্ম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল যখন যখন কানোলা পূলে বাইরের নিকে ডেয়ে
কিছুম তখন আমার মনে হ'ল, নিজের অকারণের মধ্যে
নিহিত প্রকৃতির স্পন্দনটিকে উপলব্ধি করবার জন্যে তলসিনা
জা'র দ্বায়ে বসেচে। নিজেকে যখন বিলুপ্ত করে দেবে,
সকলকার আবরণ যখন ঘ'লে যাবে, তখন সে আপনাব
স্বভাবের স্পন্দনটিকে প্রকাশ করতে পারবে।

মাগুয়েনও যেমন একটি পথম নজি
হয়েচে। কত বড় যে সেট ~~কিছু~~ দেখাই পাঠে না
তার প্রভাত তার রাতির আবরণে ঢাকা আছে। এমন
সম্পদ তার অগোচরে রয়েছে বলে সে নিজেকে চমকিত
বলেই জানে, সেই ভয়েই সামান্যের কাছে তার ভিক্ষার
অন্ত নেচে এবং তার ভিক্ষার কূপ থেকে একটি কথা
দশলেই অকারণের সীমা থাকে না।

বীজ যতক্ষণ বীজ ততক্ষণ সে রূপে। তখন তার সকল
দ্রব্যতা ঘ'টে। কিন্তু তারই ভিতরে একটি চিরসংবাহিত
প্রকারের ধাবা অস্তর হ'র রয়েছে। ঐ অতি ক্ষুদ্রের
ভিতরে অতি বহু যে যেমন ক'রে দল, তা তবের পাওয়া
যায় না। কিন্তু এট বীজ যতক্ষণ দ্রব্যতা মধ্যে রহিল ততক্ষণ
সেই বিরাট চাপা বটল, ততক্ষণ ছোটোবট কর। এমন

ক'রে হাজির বটল কেউ যেতে পারে কিন্তু উপলব্ধি,
মাটির ভিতর যখন সে প্রবেশ করলে, যখন এক নিকে রস
আর এক নিকে তাপ তার অকারণ নজিকে ঢেকে ক'রে
তুলে—তখন সেই নজি নিজের, আবরণ বিদীর্ণ ক'রে
বীজের সত্যকে প্রকাশ করতে লাগল।

মাগুয়েনও আবার সত্য তার অকারণের মধ্যে
অবাক ক'রেই থাকে যতক্ষণ না তার প্রকাশনটিকে কাগজ
হয়। মাগুয়েনও সকল দ্রব্যতারই একটি প্রকাশনটিকে
বাধ্যমুক্ত করবার উপদেশ আছে প্রতিদিন একান্ত প্রবণতায়
হাজি সত্য বাধ্য। কোন বাধ্য, সেটা হেবে বেশী
থাক।

মাগুয়েনও একটি দ্রব্য হাজি সত্যময় থাকে যেতে চলে
হবে, নাহি তাঁহা বর্ষাব আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাবে,
মহানকে কদম দিতে এবং শাসন করতে চাবে। এটী কদম
পালনের কাজ আমাদের প্রতিভাগুলি দ্রব্য। অর্থাৎ
আমাদের প্রতিভা না থাকলে দৈনিক জীবনরক্ষণ ও বাণ্য
রক্ষার কাজে আমাদের চোঁটাক লাগত না।

এই সত্যময় বীজ মাগুয়েনও পক্ষে একমাত্র এবং চমক
হ'ত তা'র প্রতিক্রিয়া সত্য করবার কথা কেউ থাকে



...ର ମହାବଳ

না। কাজিকে যদি যদি পথই পথের লক্ষ্য, পথ ভেঙে পৌঁছে দেয় না, তাহলে সে লোক পথ চলা বন্ধ করলে তাকে ঘোষ দেওয়া যায় না। নীতি-উপদেষ্টা সেই ভাবেই কথা বলেন বলে নীতি-উপদেষ্টা শুদ্ধতার চরমে গিয়ে পৌঁছায়; এবং মানুষ যদি বলে স্বার্থভোগের কাজিকে এবং প্রবৃত্তিমানের শুদ্ধতাকে এতদূর করব কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় না।

কিন্তু বীজকে এই জন্মই বলা যেতে পারে, “কুসি
নিষেকের বিদীর্ণ কর বিলুপ্ত কর” যেহেতু সেই বিলোপ
তার ক্ষর নয়, তাহেই তার আধোপলক্ষি। মানুষ আশনার
কৃত্ত জীবনের নক্ষিকের অতিক্রম করবে আশনারই বড়
জীবনের নক্ষি লাভ করবার জন্তে। সেই অতিক্রম করার
পথই হচ্ছে নীতির পথ, বুদ্ধির পথ। নীল গলেনে সেউ
নীলের পথ। বীজের ভিতরকার গাছের মত মানুষকে
এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যেতে হবে বলেই মাতৃবাদে
এত তার ধ্বংস, এত তার দুঃখ। কিন্তু বড় জীবনকে যে
মানুষ সৃষ্টিশক্তি সত্তা বলে ভেবেছে এই দুঃখের মূল্য দিতে
সে চিত্তা রাখতে পারে না। এই জন্মেই মানুষকে এত ক’লে
বলতে হয় আমাদের জান। আমাদের সত্তা বলে জানুল
সেই আমাদের প্রকাশ কথবার পরম নক্ষি নিজের সত্তা
সঙ্গেই আবিস্কার করি। কিন্তু আমাদের সত্তা বলে
জানতে গেলেও তার আবরণ দূর করতে হবে। সেই
আবরণের দূর করবার জন্মেই প্রতীতিক মনন জন্ম,
বুদ্ধির তাগ। বোধের ভিতর দিয়েও আমাদের
সত্তা সত্তা বলে নিশ্চিত জানব সত্তা সত্তা এই ক’ল বড়
কঠিন, এখন সত্তা বলে জানব এখন এই ক’ল আনন্দময়।

বলতই না। কারণ সেই একই বলা। মূলধনের চেয়ে
খণ্ড করত বলা অসঙ্গী না থাকে, তা' হ'লে সেটাকে
স্বল্প ধন - কতি। কিন্তু লাভের দন মূলধনের চেয়েও
একটু বেশীকৈ লব্ধকৈ বলা বাহ্য লোকের দৃষ্টিতে
একটু বেশীকৈ লব্ধকৈ বলা বাহ্য লোকের দৃষ্টিতে
একটু বেশীকৈ লব্ধকৈ বলা বাহ্য লোকের দৃষ্টিতে

পড়াশের উপরে একটা মানবধর্ম আছে। অর্থাৎ
দৈনিক জীবনের চেয়েও বড় জীবন হচ্ছে মানুষের। দৈনিক
জীবনের প্রসঙ্গ দৈনিক জীবনের পক্ষি এই জন্তে যে পক্ষি
একটা হ'লে বড় জীবনকে বশবাস্তি দেয় তখন আমাদের
মানবধর্ম বলে, "আধ্যাত্মিক পক্ষি বায় ঐ পক্ষিকে
কাজের ওঠ।" মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে তার
আত্মার জীবনটাই তার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় পুত্র—
অতএব সেই জীবনটাকেই যদি সাপাই, না বাঁচাই, তা হ'লে
কোনটাই হবে মানুষের পক্ষে অসমর্থ, মহতী বিনষ্ট।
এই জন্তেই মানুষ আপন পড়াশের মধ্যে মানুষ হ'লে
ধাক্কাচ্ছে বসন বলে।* এরই থেকে আমাদের জীবন মুক্তি
—শুধার জন্তে প্রত্যেকের নীতিবদ্ধন সে দ্বিধা করতে চায়। তাই
আধ্যাত্মিক জীবনের সোড়ার উপদেশ—প্রত্যেকের শাসন
কর, অনেক নির্দেশ কর।

এইজনি হ'ল নীতি-কথা, এবং নীতি-কথা শুধু।
কিন্তু নীতি ত নিজেই যথো নিজে সঙ্গাপ নহ—নীতির
মানের লক্ষ্যে যাতে ক'রে আমাদের নিজে যায়। নীতি যদি
বলে আমাদেরই দেখে, আমাদের উর্ধ্বে যায় কিছু নেই, তা'
হ'লে আমাদের বলবার অধিকার আছে যদি নীতি মানব





—উপস্থান—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেখার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে বসল। কপাঃ
কইতে কইতে অন্ধকার হয়ে এল, বেচারী! আলো
আপত্তে, কুমু নিষেধ করে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনে; চুপ করে বইল।

মোতির মা বললে, “যাক্কে কুতে শেরেচে বোরাণি।
ওখানে টিকে থাক; মায়, তুমি কি বাবে না?”

“আমার কি ডাক পড়েছে?”

“না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি
না গেলে তো চলবেই না।”

“আমার কি করবার আছে? আমি তো তাঁকে চুপ
করতে পাবই না। তেবে দেখতে গেলে আমার চক্রেই
সমস্ত কিছু রয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি
যা গিতে পারতুম সে তিনি নিয়ে পারলেন না। আজ
আমি শুনু হাতে গিয়ে কি করব?”

“কলো কি বোরাণি, সপার যে তোমারই,

তোমার চাকচাকি হ’লে চলেবে না।”

“দেখাব বলতে কি বোকো ভাই? ঘর ভেঙে, জিনিষ
পাশে পাশে? মজা করে এ কথা বলতে যে, তাতে
আমি অধিকার আছে। মজলে অধিকার থুইয়েছি, এখন
কি বলাব বাইরের জিনিষ নিয়ে লোভ করা চলে?”

“বলত ভাই, বোরাণি? আর কি তুমি একেবারেই
কিরাবে?”

“সব কথা ভালো করে বুঝতে পারচিনে। আর কিছু
দিন আগে হ’লে ঠাকুরের কাছে লেখত চাইতুম, সেইজনের
কাছে শুধাতে যেতুম। কিন্তু আমার সে সব ভাবনা ঘুরে
বুকে গেছে। আরন্তে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে
তোনোটাই তো একটুও বাটল না। আজ কতবাব ব’লে
ব’লে ডেবেছি দেবতার চোখ সামার বিচারের উপর ভর
করলে এত বিশদ ঘটনা। তবুও মনের মধ্যে যে দেব-
তাকে নিয়ে কথা উঠেছে, দমকের মধ্যে তাঁকে এভাবে
পাঠিনে। কিরে কিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।”

“তোমার কথা শুনে যে ভর লাগে। আর কি বাবেই
না?”

“কোনো কালেই যাব না সে কথা। পক্ষ, খাবণী
সে কথাও লজক নয়।”

“মজা, তোমার সামার কাছে একবার কথা ব’লে
দেখব। ঘেঁষি তিনি কি বলেন। তাঁর মশন শক্তি
যাবে তো?”

“চলনা, এখন নিয়ে যাকি।”

বিগমাসের ঘরে ঢুকেই তার চোখা দেখে মোতির মা
থমকে দাঁড়ালে, মনে তোশো যেন তুমিকম্পের পরেকার
আলো-নেবা চুড়ু; ভাঙা মশির। চিত্রের একটা, মজুকার
আর নিম্নহতা। প্রণাম করে শাখের ধুলো নিয়ে মেডেট
উপর বসল।

বিগমাস খাত হ’য়ে বললে, “এই যে চোকি আছে



আঁচি।”

গোমটার ভিতর থেকে তার চেহে চপচপ করতে গিলিল। একতে পারলে দানার এই মৎগার কুম্ভকে বাগাই বাতচৌ।

কুম্ভ প্রসঙ্গটা সত্য ক’রে দেবার গুণে বললে, “দাদা, বিশেষ ক’রে এসেচেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।”

মোতির মা বললে, “না, না, মত জিজ্ঞাসা গতের কথা, আমি এলিচি চরণ দশন করতে।”

‘কুম্ভ বললে, “উনি জানতে চান, ওঁদের ব্যক্তিতে আমাদের যেতে হবে কিনা।”

বিপ্রদাস উঠে বললে, বললে, “সে তো পরের ব্যক্তি, সেখানে কুম্ভ গিয়ে থাকবে কি করে?” যদি জোখের মূখে বলত তা’ হলে কথাটার ভিতরকার আস্তান এমন ক’রে জ’লে উঠত না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা কিন্তু কিস ক’রে কি বললে। তার অভি-
প্রায় ছিল পাশে বসে কুম্ভ তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুম্ভ সম্মত হোলো না, বললে, “তুমিই গলা’ ছেড়ে বলো।”

মোতির মা তার আর একটু স্পষ্ট ক’রে বললে, “গা
ওঁর আপনার, কেউ তাকে গতের ক’রে দিতে পারে না,
তা সে খেই হোক না।”

“সে কথা ঠিক নয়। উনি অপ্রিত মাত্র। ওঁর
নিজের অধিকাংশের জোর নেই। ওঁকে ধরছাড়া কখনো
হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। গত ব্যক্তি সমগ্রই
কেবল ওঁর জন্তে। তবু অহুঃস্বরে আশ্রয়ও লব্ধ কথা বের
যদি তা মহাবাহুর সোত।”

এরনি কথার কি জবাব দেবে মোতির মা তেবে পেলো
না। স্বামীর আশ্রয়ে বসে বসে মেয়ের শব্দে লোকেরাই
তো’ পারবে স্বাধীন করে, এ যে উন্মোক্ত ব্যক্তি।

কিন্তু কুম্ভ ক’রে থেকে বললে, “কিন্তু আপন সংসার
না থাকলে মেয়েটা যে বাঁচে না, পুষ্করো তেলে বেড়াতে
পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাইতো।”

“স্থিতি কোথায়? অদম্যনের মধ্যে? আমি তোমাকে
ব’লে দিচ্ছি কুম্ভকে যিনি গড়েছেন তিনি আপাগোড়া পরম
প্রজ্ঞা ক’রে গড়েছেন। কুম্ভকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা
কারো নেই, চরুবর্তী সম্রাটেরও না।”

কুম্ভকে মোতির মা পুই ভালো বাসে, ভক্তি করে,
কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত বৃদ্ধা থাকতে পারে যে তার
গোবর স্বামীরকে ছাপিয়ে যাবে এ কথা মোতির মার কানে
ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে কগড়া কাটি চেলুক,
দ্বার ভাগো অদম্যর অপমানিত না হয় খেতে ঘটল, এমন
কি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার গুণে স্বামী দামিস্থ খেতে
গলার দড়ি দিয়ে মরে সেও বোকা যায়, কিন্তু তাই ব’লে
স্বামীরকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে
এটাকে মোতির মা সন্দেহ ব’লেই মনে করে। মেয়ে জাতির
এত ক্রমের কেন! মনুষ্যের গত অযোগ্য হোক, গত অসুখ
করুক, তবু সে তো পুষ্কর মাথুই; এক জাহাঙ্গীর সে গুণ
দ্বার চেয়ে আপনাই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার থাকে
না। বিধাতার লগ্নে মাথো ক’রে জিতবে কে?

মোতির মা বললে, “একদিন ওখানে
চলেই, আর তো সান্তা নেই।”

“যেতে হবেই এ কথা জ্ঞাতবান ছাড়া শোন যায়
গকে খাটে না।”

“মত পড়ে স্ত্রী যে কেনা হ’য়েই গেছে। সাত সাত
যেদিন খোরা হ’ল সেদিন সে যে বেহে মরে বাঁধা পড়ল,
তার তো আর পাশোবার ছো বইল না। এ গাধন যে
মরণের বাড়ী। মেয়ে হ’য়ে যখন জঘোক্ত তখন এ জন্মের
মতো মেয়ের জাগা তো আর কিছুতে উঠিয়ে ফেরানো
যায় না।”

বিপ্রদাস বৃদ্ধে পায়ূলে মেয়ের লক্ষণ মেয়েদের কাছেই
লব্ধ চেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এই জন্তে মেয়েদের
ভাগো ধরে ধরে অপমানিত হওয়া এত দুঃখ। তারা
আপনার মাগো আপনি নিখির ব’লে আছে। তার গরে
কেবলি মরতে ভরে, কেবলি মরতে ভাবনাও, যোগ্যতা
লোকের হাতে কেবলি পড়ে মার, আর মরতে করচে
সেইটে নীরবে লব্ধ করচেই স্ত্রী-মুখের লক্ষ্যে চিত্তার্থতা।

না,—মাথুয়ের এত লাজনাকে প্রসন্ন দেখা চলবে না। সমাজ থাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিলে।

বিশ্রমালের ঘাটের পানেই মেজের উপর কুসুম নীচু ক'রে ব'সে ছিল। বিশ্রমাদ মোতির মাথক কিছু না ব'লে কুসুম মাথার হাত দিয়ে বললে, “একটা কথা তোকে বলি, কুসুম, বোকবার চোরা করিস। কমতা জিনিসটা দেখানে প'ড়ে পাওয়া জিনিস, আর কোন পাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার ক্ষেত্রে থাকে যোগাযোগ কোন প্রমাণ দিতে হয় না, দেখানে সংসারে সে কেবল হীনতার সূচী করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেছি, তোর লজ্জার তুই কটাতে পারিস নি, কই শেরেহিস। তুই এখন বিশেষ ক'রে প্রাক্কলভোজন করাতিস কোন দিন বাধা দিও নি, কেবল আর আর বোকাতে চোরা করেচি, অধিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'রে নেওয়ার দ্বারা তুমি যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে ত'রে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এ রকম অন্ধ প্রচার দ্বারা নিজেরই মন্থনকে মন্থন করে এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সারিতা কিছু কিছু পড়েচিস, বুঝতে পারচিল নে, এই রকম যত বল-পড়া পাত্রপড়া নির্বিকার কমতার বিকড়ে সমস্ত জগতে আর লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। বত সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাম্যসকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল শোষণ করেছে, তারি বাল্যে ভাঙবার দিন এলো।”

কুসুম মাথা নীচু ক'রেই বললে, “দাদা, তুমি কি বলে ত্রী বার্ষিক অভিক্রম করবে?”

“অত্যন্ত অভিক্রম করা ছাড়া কেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও ত্রীক অভিক্রম করবে না—এই আমার মত।”

“বলি করে, ত্রী কি তাই ব'লে—”

কুসুম কথা শেষ না হ'তেই বিশ্রমাদ বললে, “ত্রী যদি সেই তার মেনে সেহ ভবে সকল স্থানোক্তের প্রতিই তাতেই যে অধ্যয়ন করা হবে। এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই বলের ঠাণ্ডা ক'রে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হ'ল।”

মোতির মা একটু অবৈধের পরেই বললে, “আমাদের বউমাণী সতীলক্ষী, অসম্মান করলে সে অসম্মান প্রত্যেক লক্ষ্য কর্তৃকও পারে না।”

বিশ্রমালের কণ্ঠ এইবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠল, “তোমরা সতীলক্ষীর কথাই ভাবচ। আর যে কাপুরুষ তাকে অবৈধে অসম্মান করবার অধিকার দেবে সেটাকে প্রতিদিন খাটোতে তার গুণতির কথা ভাবচ না কেন?”

কুসুম তখন উঠে বাড়িরে বিশ্রমালের চুপের মধ্যে অটুট বুলোতে বুলোতে বললে, “দাদা, তুমি আর কথা কোরোনা। তুমি থাকে মুক্তি কল্যাণ, যা জানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাস। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার গতি ছাড়তে পারিনে। গতই যা খাই খুরে কিংবা মাটকা পড়ি। তোমরা অনেক জানো তাতেই আমাদের মন ছাড়া শাখ, আমরা অনেক জানি তাতেই আমাদের জীবনের গতি ভরে। তুমি এখন বুঝি দাঁড় তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? দাঁড় অ'কড়ির মতো আমাদের মন সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভাবই চোক আর মনই চোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারিনে।”

বিশ্রমাদ বললে, “সেই জগ্রেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পুজারিণীর অভাব হয় না। তারা কানখার বেণ অপরিতকে অপরিত ব'লেই জানে, কিন্তু মানবীর বেলায় তাকে পবিত্রের মতো ক'রেই জানে।”

কুসুম বললে, “কি করবে দাদা, সংসারকে তই গড়ে জড়িয়ে নিতে হবে ব'লেই আমাদের সূচী। তাই আমরা গাছকেও অ'কড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। শুককেও মানুষেরে আমাদের বতলন লাগে—তাকে মানুষের ততলন লাগে যে আমাদের নিজের ভিতরেই। গবে থেকে আমরা দেহকে বাচাবে কে? সেই জগ্রেই তাবি গবে যদি পেতেই হয়, তাকে যেনে নিতেও তাকে জড়িয়ে ওঠবার উপায় ক'রে হবে। তাইতো মেয়েরা এতো ক'রে যখনই আশ্রয় ক'রে থাকে।”



বিজ্ঞানসিদ্ধিই বললে না, চুপ করে ব'লে রইল।

সেই ওর চুপ করে ব'লে কাটাটাই কুয়েক কই মিলে।

কুয় ভানে কথা বলার চেয়েও এর তার অনেক বেশি।

যর থেকে বেহিরে এসে মোতির মা কুয়েক কিজাসা করলে, "কি টিক করলে যোরাই?"

কুয় বললে, "যেতে পারব না। তা আমাকে তো কিরে বাবার অহুমতি ঘেন্নি।"

মোতির মা মনে মনে কিছু বিরক্ত হোলো। বস্তুর বাড়ীর প্রতি ওর স্রষ্টা বেবী তা নয়, তবু বস্তুর বাড়ী সবচেয়ে দার্বিকালের সমক-বোধ ওই জগৎকে অধিকার করে আছে। দেখানকার কোনো বউ যে তাকে লজ্জন করবে এটা তার কিছুতেই ভালো লাগলো না। কুয়েক বা বললে তার তাবতী এই, পুরুষ মানুষের প্রতিভাতে দরদ কম আর তার অসংখ্য বেশি, সেজো থেকেই এটা তো বরা কথা। সুই তো আমারেও ভাতে নেই, বা পেরেচি তাকে নিজেই ব্যবহার করতে হবে। "এরা ঐ রকমই" ব'লে মনটাকে তৈরি করে নিয়ে যেমন করে হোক সাধারণ-টাকে চালানোই চাই। কেন না—সামান্যটাই মেয়েদের। বাস্তা ভালোই হোক মনট হোক সামান্যটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হলে মরণ ছাড়া আর পতিই নেই।

কুয় হেসে বললে, "না হয় তাই হোলো। মরণের অপরাধ কি?"

মোতির মা উদ্বিগ্ন হয়ে ব'লে উঠল, "অমন কথা বলো না।"

কুয় ভানে না, অরুদিন ভালো ওকেই পাঠাতে একটি সন্তোষ বহুরের বউ কারাগিক এনিড খেয়ে আশ্বস্ততা করেছিল। তার এম এ পাণ্ডা করা মান্না—পদ্য-মন্ডি আপিলে বড় চাকরী করে। জী বোণার সৌভাগ্যর একটি রশোর চিকিৎসা চারিয়ে ফেলতে, আর কাছ থেকে এই নাগিল শুনে লোকটা তাকে লাগি মেয়েছিল। মোতির মা সেই কথা মনে পড়ে গারে কাঁটা মিলে।

"এমন সময় নবাবের প্রবেশ। কুয় খুঁসি হয়ে উঠল। বললে, "জানকুম ঐ কুয়গের আসতে বেশি বেশি ক ব না।"

নবাব হেসে বললে, "জার পায়ে যোরাটির দখল আছে। আগে দেখেছেন ইমতী বোতকে, তার থেকে ইমান আড়নের আবির্ভাব হিসেব করতে শুরু হোতেনি।"

মোতির মা বললে, "যোরাই, কুমই ওকে নাই দিয়ে বাড়িরে তুলেচ। ও বুঝে নিজেচে ওকে দেখলে কুম খুঁসি হও, সেই সমস্যা—"

"আমাকে দেখলেও খুঁসি হ'তে পারেন যিনি, তার কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে খুঁসি করেছেন তিনিও নিজেই হাতের কাচ দেখে অহুতাপ করেন, আর যিনি আমার স্থানিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেখা না জানি কতো মন্থাঃ।"

"চাছুরগো, তোমরা দুজনে মিলে কথা কাটাকাটি করো, কুতারা ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চলুম।"

মোতির মা বললে, "দে কি কথা ভাই! একবার কুতারা ব্যক্তিটা কে? কুমই না আমি? পাঁচি তাঃ করে ও কি আমাকে দেখতে এসেচে ভেবেচ?"

"না, ওঁর কাজে খাবার ব'লে গিই গে।" ব'লে কুয় চ'লে গেল।

মোতির মা কিজাসা করলে, "কিছু বহর আছে কুমি?"

"আছে। বেশি কজতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। কুমি তো চ'লে এল, তার পরে দাফা হুতাব আমার ঘরে এসে উপস্থিত। যেজাতিটা পুই খাওয়া। সামান্য নামের একটি গাউন করা চোরাইের জাইদান টেকিল থেকে অদৃষ্ট হয়েছে। সমস্ত বার আবির্ভাবে সেটা এসেচে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে তোমার খ'লেট টাইয়েরে নইলে পরকাল হোজরতে যাবেন কোন্ দারে। জাঃ তো তুমি একটা তিনিব ন'ড়ে গেলে দাফার 'বলুল ল' এর ভিখটাতে ঘেন্না নাফা গাণে, সে তিনি সহীতে পার্কে না। আর দকালে আপিলে খাবার সময় আমাকে ব'লে বলেন আমাকে বেশি পাঠাতে। আমি বুও উৎসাহে সহী সেই পাকি কাজে সেগেতিসুম। টিক করেগিঁ তিনি আপিল থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেচে রাই। এমন

সময়ে বেলা বেড়ায় সময় চটায় পাশা একত্রে আমার পরে
ওল ঢুক পড়লেন। বললেন, এখনকার মতো থাক।
যেই পর থেকে বেহতে থাকেন, আমার ভেতর উপর
বোরাণির সেই ছবিটি চোখে পড়ল। বন্ধুকে দেখেন।
বুড়ুমুয় আঁক চাকনিটাকে গিছে ক'রে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে
দায়ার লক্ষ্যে বোধ হচ্ছে। বলুমুয় দাবা একটু বাসে,
একটা চাকনি কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির
মাঝে ছোট ভাজের সাথ, তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু
গণেশবাবু নামে আমাকে ঠিকাতেন বলে বোধ হচ্ছে।
তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই।
আমার দটটা মাঝার ভাজে মনে হয় না ভোভেরা
টাকা তার নাম হ'তে পারে। খুব বেশি চর ভোভো
টাকা লাগে ন টাকার মধ্যেই চর উচিত।"

মোতির মা অরাক হ'য়ে বললে, "ও আবার তোমার
মাঝার কোথা থেকে এল? আমার ছোট ভাজের সাথ
চরার কোন্‌ উপায়ই নেই। তার ফেলের ফেলের
বল তো সব ফেঁদ মলে। বানিয়ে বলতে তোমার
আমকাল দেখি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন
বিত্তে গেলে কোথায়?"

"যেখান থেকে কালিদাস তার কবিতা লেখেন, বাণী
বীণাশিরি কাল থেকে।"

"বীণাশিরি তোমাকে বতকন না ভাজেন বতকন
তোমাকে নিয়ে বর করা যে দার হবে।"

"গণ করেছি, বর্গায়োহনকালে বরকর্ষণ ক'রে গাব,
বোরাণির চর এই আমার দান।"

"কিন্তু লাগে ন টাকা মামের ঢাকাই কাপড় তখন
তখন তোমার ছুটল কোথায়?"

"কোথাও না। কুচি যিনিট পরে ফিরে এসে বলুম,
দিল্লীতে সে কাপড় আমাকে না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে
গেল। দায়ার মুখ বেবে বুড়ুমুয়, ইতিমধ্যে ছবিটা তার
মগে মগে ঢুক যত্নের রূপ ধরেছে। কি জানি কেন,
পৃথিবী আম'রি কাছে দায়ার একটু মাতে চম্পুজা,
আর তো হ'লে ছবিটা খা ক'রে তুলে নিতে তার বাধত
না।"

"তুমিও তো লোভী কম নও। দাবাকে না-কর সেটা
দিতে।"

"তা দিয়েছি, কিন্তু সব মনে দিইনি। বসেম, দাবা,
এই ছবিটা থেকে একটা অরণ শেখি কবিরে নিয়ে
তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে চর না? দাবা যেন
উদাসীন ভাবে বললে, 'আজ্ঞা দেখা যাবে।' ব'লেই ছবিটা
নিয়ে উপরের ঘরে চ'লে গেল। তার পরে কি তোমো টিক
জানিলে। বোধ করি আপিলে দাবার হুঁসি,
আজ ঐ ছবিটাও কিরে শোবার আশা রাখিলে।"

"তোমার বোরাণির কল স্বপ্নটাই খোজাতে যখন রাত
আজ, তখন না হয় একদাম ছাবই বা খোজাও।"

"স্বপ্নটা সব্বদা স্মরণ আছে, ছবিটা সব্বদা একটু
স্মরণ ছিল না। এমন ছবি বৈবাহ চর। যে গণেশ
পরে গ'র সুপীঠে লক্ষ্যের প্রদান সম্পূর্ণ নেই, টিক
সেই ব্রত যোগটি ঐ ছবিতে পরা প'ড়ে গেছে। এক
একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো আগিয়ে ঐ ছবিটি
দেখিছি। প্রদীপের আলোয় এর ভিতরকার রূপটি যেন
আরো বেশি ক'রে দেখা যায়।"

"দেখ, আমার কাছে অত ব্যক্তিগত অরতে তোমার
একটুও ভর নেই?"

"ভর যদি থাকত তা হ'লেই তোমার ভাবনা ক'থাও
থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য কিছুতে ভাঙে না।
মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা লক্ষ্য হ'ল কি ক'রে?
আমি যে ওঁকে বোরাণি বলতে পারছি এতকাল পরে
কীটা দেখ। আর উনি যে আমাক নবীনের মতো
মাঝবকও হালি মুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন,
বিত্তস্বভাও এও এত লক্ষ্য তোমো কি ক'রে? আমাদের
পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগা আমার দাবা। থাকে
সঙ্গে গেলেন তাকে কবির ক'রে রাখতে গিরেই
হারাগেল।"

"বাস্তবে, বোরাণির কথা তোমার মুখ এখন খুলে
যায় তখন থামতে চায় না।"

"যেহ বো, জানি তোমার মনে একটুখানি
বাধে।"



“না, কখনো না।”

“হ্যাঁ আর একটু” কিছু এই উৎসাহে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। দুঃসময়ে হৈমেন পথের ঘোড়ারি দালাকে দেখে যে সব কথা বলেছিলে চলতি ভাষার ভাষেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।”

“আজ্ঞা, আজ্ঞা, ওসব উকীল থাক, এখন কি বলতে চাচ্ছিলে বোনো।”

“আমার বিশ্বাস আজকালের মধ্যেই দাদা ঘোড়ারিকে ডেকে পাঠাবেন। ঘোড়ারি যে এত আগরে বাপের বাড়ি চলে এসেছে, আর তার পর থেকে এতদিন কেবলই নাম নেই, এতে দাদাবাব গরুও মতিমান হয়েছে জা জানি। দাদা কিছুতেই বৃকতে পারেন না সোনার পাঁচাতে পাবীর ফের-লোভ নেই। নিঃসোধ শাবী, মজতজ শাবী।”

“তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান না। দেউতাকে তো ভিল।”

“আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই ঘোড়ারি বলি যান ভালো হয়, দাদাবাব ঠিকই অভিমানের না হয় কিংবা হইল। ও হাড়া বিলম্বই বাঁধ তো জান ঘোড়ারি তাঁর সংসারে দিতে যান, আমিই নিষেধ করেছিলাম।”

বিশ্রমাসের সঙ্গে এই নিয়ে আল কি কথা হয়েছে মোতির মা তার কোনো আভাস দিলে না। বললে, “বিশ্রমাস বাবুর কাছে গিয়ে বলই না।”

“তাই বাই, তিনি তুলে পুদি করেন।”

এমন সময় কুন্স দরবার বাইরে থেকে বললে, “বয়ে চুকুন কি?”

মোতির মা বললে, “তোমার ঠাকুপো পথ চেয়ে আছেন।”

“কুন্স কখন পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার বর্ণন পেলুম।”

“জাঃ ঠাকুপো, এত কথা তুমি বানিয়ে বলতে পারো কি ক’রে?”

“নিজের আশঙ্কা হয়ে বাই, বৃকতে পারিনে।”

“আজ্ঞা, চল এখন যেতে হবে।”

“দাদাবাব আগে একবার তোমার দাদাবাব সঙ্গে কিছু কথাবার্তা ক’রে আসিলে।”

“না, সে হবে না।”

“কেন?”

“মাজ দাদা অনেক কথা বলেছেন, মাজ আর নয়।”

“ভালো পথের আছে।”

“তা” চোক, কাল এসে বকক। মাজ কোনো কথা নয়।”

“কাল চরতো ছুটি পাব না, চরতো বাবা খটবে।

বোচাই তোমার, মাজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের ছাড়ে। তোমার দাদা পুদি করেন, কোনো ক্ষতি হবে না উঠে।”

“আজ্ঞা আগে তুমি গেরে নাও, তার পরে হবে।”

খাওয়া হয়ে গেলে পর কুন্স নবীনকে বিশ্রমাসের ঘরে নিয়ে এল। সেখানে দাদা তখনো ঘুমোচ্ছিলেন। ঘর গ্রাধ, অন্ধকার, আলোর শিখা রান। খোলা জানালা দিয়ে তত্না দেখা যায়; থেকে থেকে ছহ ক’রে বইতে দাঁকনের হাওয়া; বয়ের শব্দা, বিছানার কাশর, আলনার কোলাহো বিশ্রমাসের কাপড় নানারকম ছাড়া বিস্তার ক’রে কেঁপে কেঁপে উঠে, মেজের উপর দবরের কাগজের একটা পাতা বখন তখন এলোমেলো উড়ে বেড়াকে। আধ-শোওয়া অবস্থায় বিশ্রমাস স্থির চ’রে ব’সে। এগোতে নবীনের পা সরে না। গ্রাধাঘের ছাড়া আর রোগের শীর্ণতা বিশ্রমাসকে একটা আশ্রয় দিচ্ছে, মনে হচ্ছে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অজ লোকে। মনে হোলো ওর মত এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই!

নবীন এলে বিশ্রমাসের পায়ে দুলো নিয়ে বললে, “বিশ্রমাসে ব্যাখ্যাত করতে চাইনে। একটা কথা বলে দাও। সময় হয়েছে, এইবার ঘোড়ারি বয়ে দিগে আসবেন ব’লে আদরা চেয়ে আছি।”

বিশ্রমাস কোনো উত্তর করলে না, স্থির চ’রে পুদি হইল।

খানিক পরে নবীন বললে, “আপনার অসুস্থতাই পড়েই শুঁকে নিয়ে দাখ্যাত ব’লোবত্ত করি।”

ইতিমধ্যে কুন্স ঘরে ঘরে দাদাবাব পায়ে দুলে এসে দলে। বিশ্রমাস তার সুখের উপর দৃষ্টি ফেলে বললে,

“মনে যদি করিল তোর বাসার সময় ভগ্নে তা হ’লে দা’
কুমু।”

কুমু বললে, “না, বাবা, যাব না।” ব’লে বিসম্বাদের
ঠাট্টার উপর উপরু হ’য়ে পড়ল।

দশ স্তম্ভ, কেবল থেকে থেকে নমস্কা বাতাসে একটা
শিখিল জানিলা পড় পড় করতে, আর সাইরে বাসানে পাড়ের
পাতাগুলো মঞ্চরিয়ে উঠেচে।

কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে বললে,
“চলো আর ঘেরি নয়। বাবা, তুমি ঘুমোও।”

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে বললে, “এতটা কিছ
ভালো না।”

“অর্থাৎ চোখ খোঁচা দেওয়াটা যেমনি লোক না,
ফোঁসটা হাঁটু হ’লে ওটা একেবারেই ভালো নয়।”

“না গো, না, ওটা ওদের দেমাক। সংসারে ওদের
যোগা কিছুই মেলে না, ওঁরা দগার উপরে।”

“মেক বৌ, এতবড়ো দেমাক সবারক সাজে না, কিছ
ওদের কথা আগোনা।”

“তা’ই ব’লে কি আত্মীয়ত্বের সঙ্গে ভাড়াভাড়া
করতে হবে?”

“আত্মীয়ত্বজন বললে আত্মীয়ত্বজন হয় না ওঁরা:
আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পূর্ণ
দ’রে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার লজ্জা হয়।”

“যিনি দত বড়ো লোকটি চোন্না কেন, তবু সম্পূর্ণের
জোব আছে ওঁটা মনে যোগো।”

নবীন বুকতে পারলে এটা খালোচনের মধ্যে কুমুও পাত
মোতির মায় একটুখানি ঈর্ষার স্বাক্ষর আছে। “তা ছাড়া
এটাও সত্য, পারিবারিক ঐখনিটার রাম দেহেরের কাছে
খুবই বেশ।” তাই নবীন এ নিয়ে সত্য তর্ক না ক’রে বললে,
“আর কিছুদিন বেখাই থাক না। বাসায় আগ্রহটাও একটু
বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।”





—ঐক্যদানশঙ্কর রায়

১৫

মতগুলো রাক্ষসাদেব দেখলুম তাদের কোনোটাই মনে ধরল না, কেননা কোনোটাই যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোলাকে—প্রাণকে—যায়ে—বাজনে—কোষে—গোলামে আমাদের রাক্ষসজাতের চিনিগার দেয়া। আশ্রা দিগি বেড়া বেনাবনের সঙ্গে ভাসেগল ভিষেবা মিউনিক পুডাশেষের এইখানেই তার যে বাক্যে প্রকৃতি ভারতবর্ষে এমন আসমান কর্মী করুক, সমস্ত এক রাশিগা ভাড় গুইয়েগের আর ভোখাও তেমন ছিল না। আমরা যাতে এস্টেটমিউ। আমরা রাজ্য বাগলা ও ভিখারী কর্তার ভাড়াককে সম্মান করি। তাই আমাদের বেলে ভোগের নামে লোক দুর্জা বার, তাই না জানি কোন রাজা রাক্ষসের মতো ভোগ করতে গিয়ে তিখারীতে সম্মান ভরিবে দেবে! আর ভোগের নাম করলে ধড়ে শ্রাণ আসে,—হী, সমাজের শীতলের উপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখছো না, আমাদের চক্রে উনি কোপীন ধরলেন! "মহম্মদাশপ শততপাকন তার আমাদের—ইত্যাদি।

ভোগের আড়ম্বর ও ভোগের আড়ম্বর বোধের কেবল ভাবতবর্ষের নয়, প্রথম দর্শনলোকিত লেখকদিগের চর্চা। ঐজিন্ট ও হীসে সমাজের একটা ভাগ বাস করছে, অপর ভাগ সেই দারিদ্র উপরে শিগামিড, বাড়ি করেছো। মতটা এক্সট্রিমিজম প্রকৃতির সঙ্কর না—ঐজিন্ট ও

গীস্ ট'লে পড়েছে। দারিদ্র মরছে, দারিদ্র রাক্ষস। ভারতবর্ষে কোনো একটা রাক্ষসে ভুঁটার পুঙ্কর বেলা টেকনি, বত বিজ্ঞতা এসেছে সবাই ভুঁটার পুঙ্কর পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেলা এর বাস্তবিক চ'লো, কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জল-ভাওয়া কিবা দারিদ্র কোনোটাকেই দোকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে পালন করে এবং দরদ প্রভাববশত মনে গায়ে নাটনাটকি থাকে। ইংরেজের temper পরমম নয়, নরম নয়; অসহিষ্ণু নয়, সহিষ্ণু নয়। ইংরেজ আন্দর্বা রকম মধ্যমশী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেলা মাকারি। এই মাকারিরকে লোক গালাগোল দিয়ে বলে conservatism; বাংলায় কিন্তু ইংরেজের conservatism হাওয়া নয়, বীর হুচে চলা, slow but sure—কঙ্কল-গতি। কংগের আলোর মনে মাতাল করসীজা কতকটা আমাদের মতো এক্সট্রিমিউ, তাই তারা প্রদীর্ঘ কাল মধ্যমের মতো বাই মধ্যমে তাই নয়, অবশেষে একদিন এটনা আরোগতির মতো অধিতরী ক'রে আবার চূর্ণচাপ ব'লে মনে চুচুক দেয়। তার ফলে পরগোপকে ছাড়িয়ে কঙ্কল এগিয়ে যায়।

তবে দরাসী বেলা আন্দান বেলা ইংরেজ বেলা—কেউ আমাদের মতো ছোটতে বকতে আসমান ময়দান বাবদান বটতে দেয় না, দরদ থাকতে প্রতিকার করে। এই যে

সোভালিট্, সুভ্যেট্, এটার মতো সুভ্যেট্, প্রতি
শতাঙ্কিতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিচ্ছে। আজ
যদি এ সুভ্যেট্, অতি রুদ্ধ হ'য়ে থাকে তবে তার বিপক্ষে
এ সুভ্যেট্, সেও আজ 'অতি রুদ্ধ হ'য়ে উঠছে। সমাজের
একটা পা আজ বিপর্যয় লক্ষ দিয়ে এগিয়ে গেছে ব'লেট
অপর পাটা বিপর্যয় লক্ষ দিয়ে লুপ্ত রাখতে বাঞ্ছা।
ইউরোপের দনীরাজ আজকের এই উদ্ভূত পৃথিবী থেকে
যে প্রচুর ধন আহরণ ক'রে যাবে আনুচ্ছে, ইউরোপের
অমিত্য সেট প্রচুর ধনেরই একটা সমানোপাত বটন
চাই।

ইংরেজ নিজে পাউকিটো মাছটা শেষে আমাদের
ছিবড়োটা কাটাটা কেলে বেশ ব'লে আমাদের একটা মস্ত
অভিমান আছে। এ অভিমানটা যে এক হাফত বছর
আগেও ছিল এর প্রমাণ তখনকার দিনেও আমাদের বেশে
বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা
যে তাগ রুদ্ধ বাগধান দাঁতে না পেয়ে হুতো-হুতো ঘুড়ির
মতো আকাশে নিকচেন হ'য়ে যায়। এরা ধনীলোকের
দনভার-লাগব ক'রে বরিসের বরিসভার লাগব করনি,
কেননা 'সেভেলে অনেক চঃ- ভূগুৎ কর এবং কোমোনি
সে ভোপের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাভূত এই যে সাধনা
এই তার সাম্যের সাধনার প্রকৃতির সঙ্গে সমানী বোগ দে
না, সে চিরকালের মতো দিচ্চি চাই। যে ভগতে প্রতিদিন
বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র ভাঙছে, মহাপুত্রের গর্ভে বড় বড়
নৌকাফুবি ঘটছে, প্রতিদিন ছোট ছোট মনুষ্যমাণু থেকে
নব নব গ্রহ নক্ষত্র গ'ড়ে উঠছে, ছোট ছোট প্রাণলীট
মিলে মিশে প্রাণলীট গেলো কুচ্ছে—এই প্রতিদিনের
খেলাশের সমানীকে কেউ পারে না। সে তার কাঁধ-
কবল ছাল-ফুল আঁকড়ে ধ'রে বিরানী হয়ে গেছে।
এমিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রাণী মলিকার সংখ্যা বাড়ছে
এবং দাদামলিকারের ক্রন্দনওকনে সংসারচক্র ঘুর
হ'লো। প্রাসাদে আর কুটীয়ে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত্তা
নয়, একবারে স্বর্ণ—পাতাল। আরস পল্লত ও
ভূমধ্য সাগর লক্ষ হস্ত, কেননা উঁচু নীচু
হ'লেও তাদের ব্যবধান ওরতিক্রম নয়, কিন্তু বিমানের পল্লত

ও ভারতদাগর লক্ষ হস্ত না। উপরে গ্রিন হাটার কিটু ও
নীচে বিন চাষার কিটু—পকাশ চাষার কিটুর ব্যবধান
ওরতিক্রম। ভারতবর্ষের রাজা মহারাজার বা চালে থাকেন
ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষা
মহুরা যে চালে থাকে ইউরোপের ভিগারদের পক্ষেও
তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার পূব লুপ্ত হাজার হাজার
বছর থেকে চ'লে আসছে। কেননা আমরা চিরকাল
In-temperate Zone-এর লোক। আর আমাদের
দেশটার চিরকালে এত বেশি উঁচু নীচু যে আমাদের চোখে
চোখের বিস্তীর্ণক উঁচু নীচুও একটা লক্ষ উপমায়ে মতো
ব্যভাবিক ঠেকে।

রাজ প্রাসাদগুলি পরিদর্শন করার সময় লক্ষ্য কবেছি
সেগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলি প্রত্যেকটি একটি
পুখ ও একটি নাগর ভূগুৎ হ'নের নাক—এক একট
"home"। ইংরেজী "home" কথাটির ভারতীয় প্রতিপদ
নেই, কেননা "home" কেবল গ্রাম, একটি নারী ও
একটি পুখের কাঠ-লাগের তপালবিত প্রেম। ইংরেজ
পুখ যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন
একটি গুহা প্রতাপা করে যেখানে সে দিটার মুক্তা স্বাধীন,
যেখানে তার স্বামী পর্দার তার অতিথি, স্বাক্ষরী স্বত্ব তা
সেবার তার পক্ষে ততখানি দূর, স্বাক্ষরী স্বত্বের ভালিক
তার স্বামীর পক্ষে ততখানি। গুহার বাইরে তার স্বামীর
এলাকা, গুহার ভিতরে তার নিজের; কেউ কান্নার এলাকার
অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। বাড়ীতে একটা
চাকর বাহাল করার অধিকারও স্বামীর নেই, কিবা চাকরকে
জবাব দেবার। বাজার কাটাও স্বীর এলাকা, কেবল
দাম দেবার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক আঁকলে
এবং ক্রাবে ভাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আসুবারে
দোকানে গহনার দোকানে গোবাকের দোকানে খোশার
বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের ইচ্ছা বাকী ওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে
আমন্ত্রণে পাতিতে নাচে লক্ষ স্বীর বৈষম্যতা। এ সমস্ত
"home"-এর এলাকার পড়ে। অতএব "home"-কে
আপনাতা কেউ চাবখানা দেয়াল ও এককানা সঁদি-
ঠা ওয়ালেন না। ছেলের খোলা থেকে ছেলের বাসে



খাবার টেবিল পর্যন্ত ঘর রাগী হ'লিনি সুগৃহিণী নন, সমাজে তাঁর নিকা, তিনি কুণো। গিফার্ড, চাবিটি Liszard, সমাজসেবার দূর আয়োজনে গার চাউ (বা ইন্ডাকশন) তিনিই সুগৃহিণী!

এত যদি স্বাধীন অধিকার তাহা feminism এর কড় উঠলো কেন? কারণ industrial revolution এর ফলে সমাজে একটা কৃত্রিমকল্প ঘটে গেছে, ছেলেরা মাথা-কীবন দেশ-দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা "home" কববে কাকে নিরে? "Home" এর মতো একটা তারিখের তাহ আছে, বার্মিক তারিখ না হ'ল, সাময়িক তারিখ। শ্রেয় প্রায় না হ'লে "home" হয় না। বার্মী প্রী টাই-টাই হ'লেও তাহনা ছিল না, চকনের সময়ও যে টাই-টাই হ'তে আসতে করত। আমবা হ'লে বহুদূর, ডক-ডকো চকুক না? অথবা সময় মক-মক? দু'কল এই যে, এতটা পতিততা হ'তে এসেবের মেয়েরা এখনো শিবলো না। সুতরাং কোথায় যেন বলে আসনার করে নেবে ও বার্মীর পনার পরিচয় দেবার পাট'য়ে করবে—তা নয়, আরে ছি ছি, নাম বার, বার্মীমেবতাকে বিগামীর অপরূপে পুণিলে দেব। আর মক-মকের ধর পেলে, একবারে ডাইভেস' : কুর্ট—দিক্! এরি নাম নাকি পততা!

ইংরেজ—ভার্মান—স্বাভিনেভগান মেয়েরা নিজের পাওনা পত্তাটি চিরকাল বুকে নিয়েছে। অতীতকালে একা বার্মীকে বগছে, তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা-বাবাকে না। তাই এদের বার্মা গিফ-পিতামহের দনাতন টাইব্ থেকে গা পুত্রকে নিয়ে কামিনী স্কট করেছ—কামিনী ও পরিবার এক কথা নয়, সেম "home" ও গুহ এক কথা নয়। এই মঙ্গাপত পাওনা-পত্তা বুকে বেবার স্বতাব থেকেই বর্তমানকালে feminism এর উৎপত্তি। এর মূল স্রষ্টা এই যে, "home" এর দারি বধন তোমরা বাকর করছো না তখন আমরাও বাকর করছো না, তোমরা দুক হও তো আমরাও দুক হই!" আপনারা করবেন, পরিচ্ছটাই নারীর বধ, বা বহুমতী কত লইছেন! কিন্তু প্রেচ্ মেয়েরা এত বড় তথ্যকটা বোকে না, তাই তাদের বার্মীমেব পদভারে বা বহুমতী টলমল, এবং তাদের পদভারে তাদের বার্মা শিখের মতো চীৎপাত।

ভিয়েনার রাজ প্রাণালয়গুলিতে মেরিয়া খেরেদার ব্যক্তিদের ছাপ হুশুটে। অপরূপের রাজ প্রাণালে বহিঃ ব্যক্তিদের চেয়ে বাড়ীর ভগ্নিই লক্ষ্য করবার বিষয়। তাই বলতে অপরূপ স্বাধীন বুদ্ধিতে হবে—এক জা-বা-ভু-হীন। এবং সামাজিক প্রাণি। গিন্নি—আজা—কলতপুর দিল্লীতে বেগমের ব্যক্তির চিল-বিশেষ বান বা দেখা দার হু-ও সব রাজ প্রাণালে "home" মনে করতে পারিনি। এবং সামাজিক প্রাণি চিনাবে বেগমের আত্ম হু ছিল না। সমাজের পাচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আত্ম বা পাননি; প্রাক্তনপ্রাণের পাচজন পুরুষ তাঁদের লক্ষ্য হ'ল না, আলো কহু-ত পায়নি, হু'ল না, দার আশ্রয় হুগেন নি। বার্মী ও বার্মার তরা বিপল বেগমমহলে বার্মা মলে একবার পুর্নপ্রাণের মতো উদয় হু, পুত্রকরার মা-বাবার লক্ষ্য হ'ল না, আবার করবার দোতাগা না পেতে দার দার প্রভাবে বাড়েন। এমন গুহকে গুহিয়ার স্কট বলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য প্রাক-প্রাণালয় আত্মদের অপরূপের মতো হ'লেও হুগে হুগে নীড়ের মতো নয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, লুই-প্রাণালয় বা নেপোলিয়নেরও মক-মক ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পাননি। বহুত প্রাচ্য ও প্রাচ্যের রাজার লক্ষ্য সমাজের লক্ষ্য এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইন-কানুনের উপরে, তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মাহু, কিন্তুনির আগে লক্ষ্য পোপের নির্দেশ অনুসারে রাজা ও একা উভয়েই চালিত হোতো। ইংলন্ডের রাজা চার্লস অফ ইংলন্ড ও পার্লামেন্টের কাছে এতটা দার্মী যে যে তাঁর বিবাহ বা বিবাহচ্ছেন লক্ষ্য সমাজের এই স্কট হাতে। রাশিয়ার অত বড় বেকজারী দার ও প্রী বিজ্ঞানের পুনর্কার বিবাহ করতে পারতেন না কিবা সুযোগপ্রিয় ছেলেকে রাজাবিকার দিয়ে খেতে পারতেন না। সে-কেন্দ্রে তিনি গ্রীক চার্চের নির্দেশলাপেক। তবে এও অস্বীকার করছি যে শোণ বা প্যাট্রিস্টার্ক মাঝে মাঝে হুগে ছাপ্রজ নিয়ে দিতেন না। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিজ্ঞে সমাজের বিবেক চিরদিন বিরোধ করছে। প্রোটেষ্ট্যান্টিক হু তো এই সাজীর একটা বিশেষ:

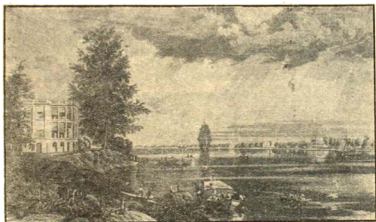
ওটাও আধুনিক মোটোগিটে সুইস্মেন্ট বা এর অঙ্গের
পশ্চাত্তাত্ত্বিক আন্দোলনেরই মতো। মজুদে মজুদে ঐক্যবাদের
বাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আস্বাব-পিরের জন্যে ভিরেনার খ্যাতি আছে। এই দুইয়ের
টউরোপের সমগ্র আস্বাব-পিরের বিরুদ্ধে। কোলোনে
মিউনিকে ও ভিরেনার নতুন ধরনের ধর ও নতুন ধরনের
আস্বাবের কত রকম নতুন দেখা গেল। গত মহাসম্মেলনের
পর টউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন নতুন ও অস্বাভাবিক
মারখান থেকে আর্থিক বাবধান শুরু গেছে। চাষা-
মজুরদের অবস্থার খতটা উন্নতি করতে মধ্যবিত্তদের অবস্থার
ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই এই প্রবন্ধের জন্যে অল্প সময়ের
মধ্যে মজুদ অথচ বৈশিষ্ট্যবদ্ধ বাড়ী ও আস্বাবের ব্যবহার
হচ্ছে লাগে লাগে। গার যে নতুন পদ্ধতি চলে অবিলম্বে
জিনিফটি পায়। Large scale production এর নীতি
অনুসারে খরচ বেশী পড়ে না, হাজারো নেই, পদ্ধতি
পক্ষে নতুনও হচ্ছে। হাজার বেড় হাজার টাকার ছোট
একটি বাড়ির বাড়ী, তিন চারটে ঘর, ব্যবসায়িক লোক।
মনে রাখতে হবে যে ঘরের সাইজ ও রঙ, ইত্যাদি
অনুসারে আস্বাবের সাইজ, রঙ, রেখা ও পড়ন। এর

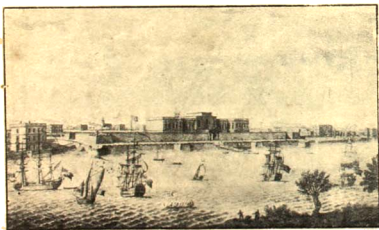
দিকেই বিপরীত পড়েছে—বাড়ী ও আস্বাব দুই দিকের দুই
বিপরীত পরাম্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বেগেছে। দুই-ই
পরল, লম্বাঘর, নীতিবদ্ধ, বাস্তবিকপূর্ণ, বিরল-
বলতি, নিয়মকায়। মজুদের কতি এমন সন্তোষের দাঁড়-
বৃত্তিক ছেড়ে প্রকৃতির উদার উজ্জ্বল বলাকায়িক সন্তোষের
ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই ভেত্রে নতুন ধরনের চেয়ার, টেবিল,
ঘটি বা দেয়ালের উপরে লাল-লালী ছাপ ঘনি বা দেয়ালে
লাগা ঘর চালাকার মারখান বা বড়মজুরের চেপে-
আঙুল-পেঁচা তাব এক রকম অলঙ্কার। এর একটা কারণ
আগে যে-সেই-লুম এ থাকতো তাদের চাচিদা অলঙ্কার
এ সংবেদ কোথান। এবং তাদের কতি অতি স্থান বা মা
পূর্ববর্তে নব ব'লে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উন্নতির
মধ্যবিত্ত প্রবীণের কতি মেলতে চলে। Mass produc-
tion এর মতো এই যে চাষা মজুরের দিকটা চরানিটান
করে যে সিনেমার কি—তার কটির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের
কতি না মেলো তো কলেজের ছাত্র নাচাবে। দিক
চরানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষা মজুর ও-পক্ষের
লম্বাক, অসত্য কটির দিক থেকেই ও-পক্ষের সাম্যবাদী
হতে চাবে।



বিচিত্রা-



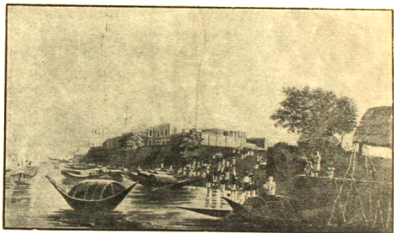
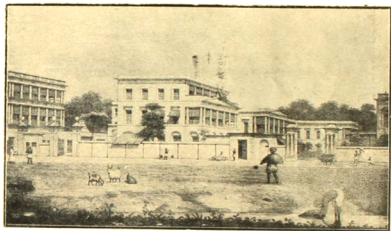
বেটানিক্যাল গার্ডেনের দৃশ্য



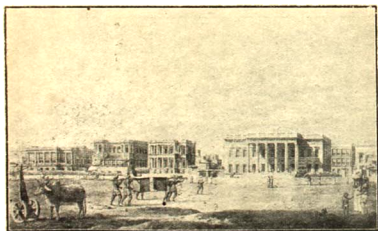
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট উইলিংডন

চিত্রশালা

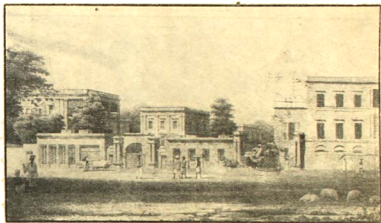
পুরাতন কলিকাতা



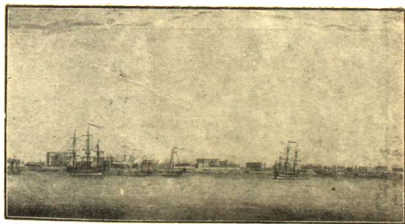
চাঁদমালা ঘাটের একটি দৃশ্য

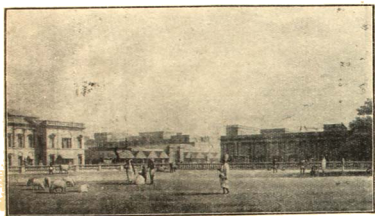


টাইম বক—এন্ড্রাসেনড, (১০)



ডেপুটি





কান্টোনা রোড. এল্‌ফিংটন রো, বর্কটলা রোড.
ভেলিয়ার—চৌরঙ্গি



আনবারকান টাউ

বর্ণিকাভঙ্গম্

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ চাকুর

বসন্ত আর রং অঙ্কিত লক্ষ্য। রূপ দেখানে রঙ দেখানে, রঙ দেখানে রূপ দেখানে, এই হ'ল সভ্যতার নিয়ম।

এক রঙা রূপ, পাঁচ রঙা রূপ এ রয়েছে, বদ-রঙ রূপ গ্রাণ আছে; কিন্তু রঙ ছাড়া রূপ তা কোথায়? রূপ ছাড়া রঙ গ্রাণ নেই! কচি পান্ন পাঁকা পান্ন শুকনো পান্ন তিন অবস্থাতেই রূপ গ্রহণ নিয়ে বেঁটে আছে। নতুন পাতার অক্লিম্মা সবুজ থেকে ক্রমে শুকনো পাতার বেঁকুয়েতে দিয়ে পৌছয়। পাতার রূপেরও অদল বদল ক'রে চলেছে কালে কালে। রূপ রঙের কোথাও বিচ্ছেদ নেই।

বিষয়গত রচনার কাজ এট নিরমেষেই চলেছে দেশ, যাত্রার পিঠ রচনাতেও এই নিয়ম বলবৎ। যাত্রার মাঝে পাড়া সেটা ধানিক সাধা রঙ মাত্র নয়, চতুঃপাশ একটা রূপও আছে তার। কাগজের উপরে কালো পেনসিলে ছবি বাগলেম—সাধা রঙ কালো রঙ, তাই বড়ের মিলনে তবে রূপটি ফুটলো। এমনি কালো সেলেটে সাধা রূপ, নানা বর্ণের কাগজে নানা বর্ণ দিয়ে সাগা রূপ, এত হল ছবিও পড়ন। গালে নাগে কালোর সাধারণ হুণ্ডে মিলনে নিভক রঙের কাজ করলেম রূপ না ফুটিয়ে, এমনটি করার জো নেই একবারেই। পাঁচ রঙের হিম্মিবিচি সেও পাঁচ রঙা একটা রূপ। আকাশ আর সবুজের নীল রঙ কতকটা রূপ ছাড়া রঙের আভাস বিশেষ তাবত্ব দিয়ে পুরোপুরি ভরি, মকতুমি—সেখানে রূপ রঙ ছাড়াছাড়ি তাবে নেই। আকাশের নীল রূপের তাবনা দিয়ে চরা, সবুজের জলে ও গুণ বাগুনের এই রূপও ভরি রঙ। একটা চিত্র অরি যদি মক-তুমির, তবে মকতুমির রূপ এবং রঙ দুটোকেই টানতে হয়। মকতুমির পারে আকাশের নীল এইটুকু ধই বর্ণের বিভিন্নতা দিয়ে ছবিতে বেধাতে চলেম,—আকাশ থাকে উপরে ঘাটি থাকে নীচে, অতএব কাগজের উপরটা রঙলেম নীল আর নীচেটা করলেম বেগু রঙ। শুধু এইটুকু কাজ ক'রে দিয়ে

ছবিটাকে মকশারের নীলময়্যাটাকারে পরিণত করা চলেনা, রঙের সঙ্গে রূপকে এনে মেলতে চল তবে দরলো কাগজের একটা অংশ মকতুমি রঙ ভাগ আকাশরূপ, এবং তাই মিলে দৃষ্টি পরিণতী রূপে বর্ণিত হ'ল।

সুতরাং ছবির কোন্‌খানে কি রঙ দেবো সেটা যেমন তাববার কথা, কোন রঙ কি কি তাবে কলাবো তাও জানা দরকার। আকাশে সবুজ তাব রূপ দিয়ে কলানো রঙ, তাব রূপ চেয়ে দেখা যায় না কিন্তু রঙের রূপক দিয়ে বরা থাকে জলে ফলে আকাশে; চিত্র করার কোনলই হচ্ছে এই তাব রূপে গোলা রঙ সমস্তকে আঁরত করা। নীল লাগ টতাদি রঙ এমনি লাগালেই হ'ল না—জলের লোয়, পানলে-নীল, আকাশের বেলায় হাওরাই-নীল, বাণির আলায় বেলে রঙ, লক্ষ্যের আকাশে আকাশি-পাটেল না মিলে রঙের কাজে তুল ব'লে যায়, কাজেই চিত্র বড়লের খোড়া যেমন আরম্ভ হ'ল তপের ভেদ ও তাবত্ব নিয়ে, তেমন বড়লের শেষ রইলো শুধু বর্ণ মিশ্র বর্ণ সমস্ত নানা ভেদ ও শুজ নিয়ে।

লক্ষ্যটির আমরা আকাশটি নীল ব'লে থাকি, কিন্তু এইটুকু জান নিয়ে বর্ণিকের কাজ চলে না। আকাশ পলক পলকে রঙ কিরিয়েচলেছে, গোলায় লুপ্ত সাধা সবুজ লুপ্ত কালো কত কা। রঙের আকাশ বিনের আকাশ একটাও যে অবিমিশ্র নীল নয় তা ছবি আঁকতে বেসেই বরা পড়ে। ইউনিয়ান জেক্‌ পতাকা কি ব্রদেশ-পতাকা তার রঙ অবিমিশ্র নীল সবুজ সাধা লাগ ইত্যাদি দিয়ে বঁধা; রঙের বাস্তব রঙও কতকটা অবিমিশ্র তাবে সাজানো থাকে, কিন্তু ছবির পটে এসে মেলমেল। জুক হয়—রঙে রঙে রূপে-রঙে, বিষ রচনাতে এই নিয়ম, মাতুরের রচনাতেও এই নিরমেষ বাধাধাবি—অমিশ্র রঙ অচিৎ, মিশ্র রঙই প্রচুর প্রয়োগ হচ্ছে।

রূপের বিভিন্নতাও কথা পূর্বে ব'লে চুকোছি, এখন রঙের বিভিন্নতায় একটু পরিষ্কার ক'রে থরার চোটা

বানরে বহুতে কল্যা, দিদি গো দেখতে মতা'—তুণ এখানে
রূপের কথা বল। দ্বিতীয় বল এর জবাব দিলে—‘তৌনের হলুদ
মাথা গা, তোরো তব দেখতে যা, আমিগা হলুদ কোথায় পাগো
উঠো তথৈ বাবো’। তুণ দেখার বল আর রঙ-বোথার বল—
একদল রক্তিনী উঠো নথের পগথারী, আর একদল রূপশা
গোজা যথের বাবো !

যখন দূরে থেকে রিমগিরি দেখি তখন
রূপরঙ সমস্তাবে মনের উপরে কাজ করে। রঙের
দিকে মিলিয়ে না দেখলে রূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না এবং
সে দেখার রঙও পাওয়া যায় না—নিরর্থক চুপ্তি বরণ হয় মাত্র
বস্তুর মধ্যে। যেমন,—‘তাকমহলটি গিয়ে দেখলেম না কিন্তু
চাঁক ইঞ্জিনিয়ারের নজর দাড়ায়ে দেখলেম না কিন্তু
‘আর একটু বিস্তার ক’রে আলো ছায়া ফেলে দেখালে, কিন্তু
তাতেও দেখা সম্পূর্ণ হলো, ই আই রেলওয়ের টাইমটেবলের
মলাট খানা তাকমহলটি বদরঙ দিয়ে দেখলে তাতে ক’রে
তুল খাওয়া জ্ঞানলো বহুটির, পাকা শিলী রূপ রঙ মিলিয়ে
শিখলে তাকমহলের ছবি কি কবিতা, সত্য তাকমহলের
দেখা শেষে গোলম তখনই !

রূপের চেয়ে রঙ দেখানে ভোর করছে মনে, তার
চকচকী উদাহরণ দেখা থাক্।

যেমন—‘নিষ্কপম হের যোগাতি মিনি বরণ,

স্বীতে চম্ভিত রসিত চরণ,

নাচত সৌরভর গুণদলিয়া—”

এখানে কেবলি রঙ আর রঙ চোখে পড়ছে !

“নাথবান কনক কবিত কণেবর

মোহন স্নেহক মিনিয়া ভূঠাম—”

এখানে রঙের ছাঁদ রূপের ছাঁদ পথে পথে মালা
বাওয়া করলে।

কিন্তু—‘নমো নিরঞ্জন নিরাকার অবিশত পূরব অলপ
জিন সন্তক হিত কয়ো পূণ পূণ নানা তেথ’ !

এখানে রঙছাড়া রূপ ছাড়া থানটাই পাচ্ছি পরমপূরবের।

গ্রিক এই কথাই উপনিষদে—‘ব একো অর্থং বহুধাপকি
যোগ্যে বর্নং অনেকান্ বিহিতার্থো বহৌতি’ ! বল এবং
আকাশ অর্থের কাছাকাছি, কিন্তু বল আকাশ চরায়ই

রঙের অন্ত নাই। বস্তুত্তরের রূপও নেই রঙও নেই, কিন্তু রঙ
বর্ণনায় শক্তি প্রভ আছে। বাতাসে ভোবা দূরের গাড় পর্যন্ত
দর বাড়ি রঙ ফেরায়, এটা জানতে সাধারণ পড়তে হয় না,
চোখ থাকলেই দেখা যায়। প্রকৃতির নিয়মে কোনো
অজুত রঙ অবিস্মিত ভাবে বর্তে থাকতে পার না, বিকাশ
য’তে যায়, আলো পড়ে ছায়া পড়ে,—কৃষ্ণভূমি, সে গাছের
তলাটার নীলাভ রঙ, গাছেরছায়া দেখানে পড়লে না দেখানে
নীলাভ সবুজ রঙ ধরলে ! সুবর্ণে বর্তে আছে এমন কোনো কিছু
নেই যেনওচলে ; জগতে এ ওয় রঙে রঙিতই উঠছে বিনরাত !

এট যে রঙের মিশ্রণ ও আশান-প্রদান এ
যেমন বেগুনি বিষভবিত, তেমনি আবার পাশাপাশি দুই
বস্তুর রঙে রঙে কপ্তিন বাবধান তাও দেখছি। কালোর পাশে
আলো, একট রঙের দুই পাছ একটির পাশে আর একট
রূপ ও রঙের তারতম্য নিয়ে অন্ধর দুটলো, সবুজের কোলে
রঙীন ফুল, অন্ধকারের বুকে তারাচূপের দাড়াই, ঘন মেঘের
পায়ে সাধা বকের সারি, আলোর গারে কালো কাকের
বল,—রঙের এসব হিসাব শিখতে, আঁতুলে যেতে হয় না।
কত বার দেখেছি রঙে রঙ মিলিয়ে পাণির ছানা জুকু বোয়াল
বাগ মাছের দিকি পা ঢাকা দিলে, তেলোজুতো ফল বর্ণচোরা
আম রঙ দিয়ে রংয়ের অপবার্থতা সূঁকিয়ে চলে।

ফুলের রঙটাইশেঁছে দেব মধুও সংবাদ মোমাছিকে, এট
জানা কথা। উৎসবের রঙ শোকের রঙ এবাই বার ক’রে
নিকেছে মাহুদ প্রকৃতির কাছে কোন আনিকালে তার গ্রিক
টিকানা নেই।

সবল রূপ বীকাকল এমনি নানা রূপ রেখা যেমন ভাগ্যে
প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, তেমনি রঙও প্রতীক হিসেবে
ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রকার বলেন—“প্রামোদবিত
পূনারঃ, সিংহাভ্য প্রকীর্ণিত, কণোভো ককলশ্চৈব,
বক্তোত্রোঃ প্রকীর্ণিত, দোত্রোবায়গ বিজ্ঞায়, ককলশ্চৈব
তদানকঃ নীলকর্ণে বীতংল পীঠশ্চৈবায়ুঃ সত্যঃ স”

গ্রিক এই ভাবে আমেরিকার রোড ঠাঁওখানদের মধ্যে
রঙের নানা প্রতীক ও হিসেব দেখতে পাই, যেমন—

কালো রঙ চল—শোকের নিবারণ, যেটে এবং দূরব,
রঙ বোঝায়—ওফতা সুতা ইত্যাদি, পীত নীল বস—



‘পরিপূতি’ বলি ঐখনি ইত্যাদি, লব্ধ রক্ত তাড়না মাথা
ইত্যাদি, শুদ্ধবর্ণ বোঝায়—শান্ত হৃদয় ভাবটুকু, উদার
‘নৈখলতা’ উচিত ইত্যাদি। আদিম যুগের মানুষ হলেও এই
সব চাতি তপ ও রক্তের অঙ্কেও মিলন বিষয়ে অজ্ঞ হইলেন।

বাল্যের দিনে চ্যাব ঘৃণ্যলোক তাদেরও মনে বস
কাগিরে দিলে, এম’ আদিম আটটি কালো রক্তের উপরে
যাণ রক্তে জোর দিয়ে লোকলের বয়ামকলের উল্লেখমণ্ডপ
সাক্ষ্যাব নিরম ক’রে গেল। বাল্যের সন্ধ্যার তাদের মেঘের
পেঁতেজোয় কালো কলি আভাষা বিরে বহুখায়া রক্ত ক’রে
গেল। কাছের দেখা যাচ্ছে, কি আদিম যুগে, কি আজকের
যুগে, রক্ত মার রূপ অঙ্কেও বড়নে বাঁধাই হইলো—এ থেকে
থাক স্বতঃ কলার সামর্থ্য নেই কোনো আটটিই।

বয়সের বেলায় রূপ রক্ত ভাব ইত্যাদিকে পৃথক ক’রে
দেখি, কিন্তু ছবিদর্শনার বেলায় তাদের আর আলাদা ক’রে
রাখা চলে না, এ রকম লগ্নে মিলে ঘের পরিপূর্ণ-রূপটির ছন্দ।
এই যে বিভিন্ন সব ভাবে রক্তে মিলিয়ে মায়ামালা বিপুল হয়ে
গিছে, তারি রহস্যভেদ হ’ল বর্ণিকভেদের শিক্ষার লক্ষ্য।

রূপ আর রক্ত এক ক’রে দেখেছেন পণ্ডিতেরা,—নানা
রক্তের অনুরাগ তারি লক্ষ্য বিচ্ছেদ, যেমন—নীলিরাগ অর্থাৎ
নীল অনুরাগ, যে ভালবাসার রক্ত বদলায় না তাকেই বলা
হব নীলিরাগ; এমনি বাইরে বাইরে কণ্ট ভালবাসা একটুতে
উপে যায় রক্ত, এমন ভালবাসার নাম দিলেন কবির
কুসুমরাগ; মজ্জিরাগ চল পাকা রক্তের ভালবাসা বা
ভূতরক্তি গতি হল। লবল, চূর্ণল, কীটো, পাকা নানা রক্তে
নানা চিহ্নে নামে দেখি এবং চারিদিকে চোখেও পড়ে।

বর্ত্তান রূপ নিয়ে বসী মানুষের রূপ কারবাখ, বর্ত্তান ছবি
বিরেট পাঠশালার বর্ণ পরিচয় শ্রু ক’রে বিরুদ্ধে অন্তের
পূজা মানুষ, অথচ আন্তরিক বিবর এই যে আমাদের টেক্ট-
বুক কমিটি রক্তট বর্ণপরিচয় দিয়ে আমাদের ছেলেদের
শিক্ষা শ্রু করতে বলছে! খানা কঙ্ককের বর্ণপরিচয়
বিচ্ছেদগতের আমলেও যে-রক্তটা আঙ্কের আমলেও তাই।
কাক লিখে তার পালে কালো ছবি, বক লিখে কালো
ছবি, আর লিখে কালো ছবি, আম লিখে কালো ছবি, কিন্তু

সবকটাই বেয়ত্তা কালো। এই পর্যায় এগিয়েছে আমাদের
নতুন বাংলায় বর্ণপরিচয়। কিন্তু এটাকে অগ্রসর হওয়া বলা
চল কেননা দেখতেই পাচ্ছি, রূপ রক্ত ওখানে মিলেই না,
রূপও পালে না ছেলেগুলো; কিন্তু অর্থ পেলেই দেখে একালে
সেকালে অনেকের। ঐ লাল কাগিতে ছাপা টুকটুক বইয়ের
যা কিছু রক্ত ঐ খানেই শেষ। বিলাতি বর্ণপরিচয় দিক
আমাদের উক্টো রাস্তা এবং বাস্তবিক শিক্ষার পথ ধরলে
তপে রক্ত মিলিয়ে বর্ণপরিচয় আরম্ভ চল দেখানো। কাজেই ওয়া
এগিয়েগেল, আর আমাদের বেয়ত্তা বর্ণপরিচয় প’ড়ে প’ড়ে চরখায়
চ’তে থাকলেন। কলেজ কোঠানে ছেলে ভোগাশার বাংলা
বই ভালরকম একখানা আঙ্কে ব’লে তো মনে হয় না।
বইয়ের লোকান দেখেই, নামও বেশ চড়া, কিন্তু পড় রক্ত
মলাটেই, অনেকটা মাকাল কলের অহুতপ। বইগুলো চৌপু
ভোগাশ কিছু ছেলের কাত আসে না। মিলিতি লোকানে বাট,
শিক্ষা-শিক্ষাকে দেখি তারা রক্তের চক্কো পাঠা খেলার মতো
মানসম্ব্যাক ক’রে কুলেছে।

রক্তের উল্লেখ ছেলে মেয়েদের ডাক দেওয়া যে দরকার,
না হ’লে জীবনটাই যে তাদের বিজ্ঞী হ’য়ে যায় এটা জানতে
কাক বাকি নেই, কিন্তু তবু আজও বাতারে বেয়ত্তা ছাড়া
দুরত বাংলা হিমি বর্ণপরিচয় পাওয়াই যায় না। এর কারণ
এখনো রূপ ছয়মি বর্ণপরিচয় নিবিচ্ছেদের মনে, কাজেই
রক্তও বরছে না বর্ণমালায় আমাদের।

মহামেঘবদন পার্শ্বটাকে বর্ণমালায় পাঠি বিরোধিলেন তখন
রূপের লগ্নে রক্তও আমদানি করেছিলেন তিনি। লক্ষ্য, অ
হ’ল—শরচ্চর প্রৌকাশ: অ্য হ’ল—লগ্নে: প্রতিমধরুদ, হ’ল
—পরমানন্দলগ্নককুসুমজিহ্বা উ হল—পীতলগ্নকলগ্নাণ,
অ হল—রক্তবিজ্ঞানহাকার্য, হ’ল—চকলাপাকী কুণ্ডলী
পীতকিরমতা। এমনি পটিকাচার মূল বিভাৎ কুণ্ডল এট লগ্ন
দিয়ে পার্শ্বটীর বর্ণপরিচয় মাঝে মধ্যে মিলেছিলেন লিখ,
লগ্নে রক্তে মিলিয়ে শিক্ষা।

রূপ ও রক্ত বাক্য এবং অর্থের মতো মিলে-জ্বাছে
এটা পুরোনো কথা, কিন্তু নতুন যুগেও আটটিঘের একপাঠা
বুকে না চ’য়ে যে বিশদ আছে সেটা বলাই বাহুল্য।

অতসী মামী

—গল্প—

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—

—এক—

যে পোনে সেই বলে, হাঁ, শোনবার মত বটে!

বিশেষ ক'রে আমার দ্বন্দ্ব মামা। তাঁর মূখে কোন জিনিসের এমন উজ্জ্বলিত প্রশংসা পূর্ব কয় কখনোই।

তবে তবু তারি কৌতুহল হ'ল। কি এমন বানী বাজার লোকটা যে দ্বাই এমন ভাবে প্রশংসা করে! একদিন তখনে গেলাম। মামার কাছে থেকে একটা পরিচয় পত্র লেখে নিলাম।

মামি থাকি বাসিন্দা, আর বীর বানী বাজারের ওস্তাদার কথা বললাম তিনি থাকেন ভবানীপুর অঞ্চলে। মামার কাছে নাম শুনেছিলাম, ঘটন। উপাধিটা শোনা শুনি। আজ পরিচয় পত্রের উপরে গুরো নাম দেখলাম, ঘটনানাম রাহু।

বাড়ীটা দু'কে বার ক'রে আমার তো চক্ৰবর্তি! মামার কাছে ঘটন বাবুর এবং তাঁর বানী বাজারের যে রকম উজ্জ্বলিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হ'য়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেইবাটু গোছের কেউ হবেন। আর কেইবাটু গোছের একজন লোক যে বৈজ্ঞানিক বা মনুষ্যের হাল-প্রাণাদ না হোক, অল্পত বেশ বড় আর্থ ডিপেন্ডেন্ট, লুফি একটা বাড়ীতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়ীটা যে গলিতে দেটার কথা না হয় ছেড়েই বিদায়, এখা ইউ বার করা তিনকালের বুড়োর মত নড়বড়ে একটা ইউরোপীয়া! সামনেটার চেহারাটাই যদি এরকম, ভেতরটা না জানি আবার কি রকম!

উইয়ে বরা বরাবার কথা নাড়লাম।

একটু পরেই দরজা খুলে যে লোকটি গামনে এসে গিজালেন তাঁকে বেধে মনে হ'ল ছাইগাসা নাড়তেই যেন একটা টকটকে মাখন বার হ'বে পঙ্কল।

পূর্ব ভোগা আর গায়ের রঙও অনেকটা তাকালে হ'বে গেছে। একদিন চেহারাখানা কি রকম ছিল অনুমান করা শক্ত নয়। এখনও যা আছে, অপূর্ণ!

বহুর ত্রিবেক বহু, কি কিছু কম। মগিন হ'য়ে আল' গায়ের রঙ অপূর্ণ, পরীরেব গড়ন অপূর্ণ, বুকের চোলাটা অপূর্ণ! আর সব মিলিয়ে যে রূপ তাও অপূর্ণ! সব চেয়ে অপূর্ণ চোখ দুটি। চোখে চোখে চাইলে যেন বেশ লেগে যায়।

শুকধেরও তা' হ'লে সৌন্দর্য থাকে! ইউ বার কথা নোনা বরা বেগুলাল আর উটেরে বরা দরজা, তার মাঝখানে লোকটিকে দেখে আমার মনে হ'ল তারি হৃদয় একটা ছবিকে কে যেন অতি বিটী একটা ক্রমে গাধা বকে!

এমন, আমি ছাড়া ত বাড়ীতে কেউ নেই, ততবার, আমাকেই চান। কিন্তু কি চান?

আমার মুখ চিত্তে কে যেন একটা থা মিল। কি বিজ্ঞি গলাব বহু! করুণ! কথাগুলি মোদায়েম কিন্তু মোকটির গলাব বহু তবু মনে হ'ল যেন আমার গালাগালি দিচ্ছেন। ভাবলাম, নির্দেশ সৃষ্টি বিদ্যাতার সূত্রিতে লেখে না। এমন চেহারাও ত্রি গলা! সূত্রিকর্তা বহু বড় কাগির হোক কোথায় কি মানার পে জানটা তাঁর একমম নেই।

বরাম, আপনার নাম তো ঘটনানামে রাব? হরেন বাবুর ভায়ে।

পরিচয় পত্রখানা বাড়ীয়ে বিদায়।

এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে বসেন, ইলু! আবার পরিচয় পত্র কেন হে? হরেন যদি তোমার মামা, আমিও তোমার মামা। হরেন আমার দাদা ব'লে জাকে কিনা! এসো, ভেতরে এস।

আমি ভেতরে ঢুক্।



সব্ব মরজা থেকে তখারের দেহাশে পা ঠেকিয়ে হাত পাচেক এসে একটা হাত তিনেক চওড়া ব্যাককার প'ড়ে ডান দিকে ঝাকতে চল। বা দিকে ঝাকবার ঘো নেই, কাহন দেখা গেল সেমিকটা প্রাচীর দিগে বন্ধ করা।

ছোট্ট একটু উঠান, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক উঠানের চানটে ক'রে পাশ থাকে। এটাও তাই আছে দেখলাম। উপরে চান্দা ঘর, এ বাড়ীরই অঙ্গ। একটা পাশ প্রাচীর দিগে বন্ধ করা, অঙ্গ পাশটার অঙ্গ এক বাড়ীর একটা। ঘরের পেছন দিক, কামালা মরজার চিক্ মায় নেই, প্রাচীরেরই সামিল।

আমার নবলক্ মামা ডাকলেন, মতলী, আমার এক ভাগে এসেছে, একরে একটা মাতর বিছিরে দিগে যাও। ও ঘরটা বড় অঙ্গকার।

এব্ব মানে আমরা যে ঘরের সামনে ধাঁড়িয়েছিলাম। ওঘর মানে ওসিককার ঘরটা। সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন এক ডকলী, মস্ত ঘোমটার মুখ ঢেকে।

বতীন মামা বলেন, এক! ঘোমটা কেন? আছে, এ যে ভাগে!

মামার ঘোমটা পুজাবার লক্ষণ নেই দেখে আমার মনে, ছি ছি, মামা হ'রে ভাগের কাছে ঘোমটা টেনে কলা বোঁ দাড়াবে?

এবার মামার ঘোমটা উঠল। দেখলাম, আমার নতুন পাগড়ী মামাটি মামারই উপস্থিত হ'লে বটে! মনে মনে বললাম, মামার পলায় বিছিরে ঘরটা দিগে যে তুলটা করেছ ভগবান, মামা'কে দিগে পেটু'র ওপরে নিয়েছ বটে! ভামার কল্পর আশ করা গেল।

মামা একরের সেকেন্ডে মাতুর বিছিরে দিলেন। ঘরে তক্তপেলে, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির বালাই নেই। এক পাশে একটা রঙ-চটা ট্রাক আর একটা কাঠের বাস। দেওয়ালে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত একটা ধড়ি টাঙানো, তাতে একটা বাস মুক্তি কুলছে। একটা গেরেকে একটা আর মফলা বন্ধের পাঞ্জাবী লটকান, বতীন মামার লম্পতি। গোটা চাই চার-পাঁচ বছর আগে-কার কালেঞ্জারের ছবি। একটাতে এবমও চৈমমাসের

তারিখ লেখা কাপড়টা লাগান রয়েছে, ভি'ড়ে ধর কাছো খেয়াল করনি।

বতীন মামা বলেন, একটু হুজুটুজি থাকে তো ভাগেকে ক'রে দাও। না থাকে এক কাপ চাই খাবে'ন।

কলগাম, কিছু দরকার নেই বতীন মামা। আপনাত বাশী ভনতে এসছি, বাশীর সুরেই বিবে মিটেবে এখন। গবিও বিবে শারমি মোটেই, বাড়ী থেকে খেয়ে এসছি।

বতীন মামা বলেন, বাশা? বাশী তো এখন আমি বাকাই না।

বললাম, সে হবে না, আপনাকে শোনাতেই হবে।

কলেন, তা' হ'লে বোল, বাজি তোক। লজ্জার পর ছাড়া আমি বাশী ছুঁই না।

বাম, কেন?

বতীন মামা মশা নেড়ে বলেন, কেন জানি না ভাগে, দিনের বেলা বাশী বাজাতে পারি না। আজ পর্যন্ত কোন দিন বাজাইনি। হ'ী গা মতলী, বাজিয়েছি?

মতলী মামা মুখ হেসে বলে, না।

বেন প্রাকট একটা লম্ভার লম্ভাধান ক'রে গেল এমনি ভাবে বতীন মামা কলেন, তবে?

বললাম, মোটে পাঁচটা বেজেরে, লজ্জা হবে লাভটার। এতক্ষণ হ'লে থেকে কেন আপনাদের অস্থিবিধা করব, হুজুটুজের লজ্জার পর আসব এখন।

বতীন মামা ইংরাজীতে বলেন, Tut! Tut! জায়গার বালায় যোগ দিলেন; কি বে বল ভাগে! অস্থিবিধা কি বে, এ'ী? পাড়ার লোক তো বরফট করেছে। বলে, অন্তলী আমার স্ত্রী নয়! তুমি থাকলে তবু কলা ক'রে বাঁচবে।

এ আবার কি কথা! মতলী আমার স্ত্রী নয়, একপার মানে?

বতীন মামা আবার বলেন, লম্ভাবাটীর তার বন্ধবে পাচলো, তাই দিগে আমি একটা স্ত্রীলোক পুছি! কি বুদ্ধি লোকের! তিন আইনে রেখাটী করা দিগে, স্ত্রীলোক দলিল আছে, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? বডো মধ—

অন্তভাবে মতলী মামা বলে, কি যা-তা বলছো?

বতীন মামা বললেন, ঠিক ঠিক, তাহে নতুন লোক, তাকে এদখ বলা ঠিক হচ্ছে না বটে। তাহি রাগ চর্য কিনা! ব'লে হাসলেন। হঠাৎ বায়েন, তোমরা যে কেউ কাক লোক কথা বলছ না গো!

মামী মুহু হেগে বললেন, কি কথা বলব?

বতীন মামা বললেন, এই নাও! কি কথা বলবে তাও কি আমার ব'লে দিতে হবে নাকি? বা হোক কিছু ব'লে হুক কর, গড় গড় ক'রে কথা আপনি এসে যাবে।

মামী বললে, তোমার নামটি কি কারণে?

বতীন মামা লমকে হেসে উঠলেন। হাসি খামিরে বললেন, এইবার তাহে, পাশ্চাৎ গ্রন্থ কর, আজ কি হাঁদখে মামী? বাস্! খাস আলোপ জ'মে যাবে। তোমার আত্মকটি কিছু বেশ অকস্মী!

মামীর মুখ লাল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, অমন বিকী গ্রন্থ আমি কখনো করব না মামী, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমার নাম হুতের!

বতীন মামা বললেন, হুতের কিনা হুতের দাখা, তাই হুত শুনতে এত আগ্রহ। নয় তাহে?

হঠাৎ উঠে পাড়িয়ে বলেন, ইন্! তুবন বাবু যে টাকা: জুটা ফেরত দেবে বলেছিল আজ! নিয়ে আসি, হুতিন বাজার হয়নি। বসো তাহে, মামীর লোক গল্প কর, বেশ মিনিটের ভেতর আসি।

হুতের বাইরে গিয়ে বলেন, পোরটা দিয়ে যাও অতল। তাহে ছেলে মাহু, কেউ তোমার গোতে ধরে ঢুকলে ঠেকাতে পারবে না।

মামীর মুখ আয়ক হ'য়ে উঠল এবং সেইটা গোপন করতে চট ক'রে উঠে গেল। বাইরে তার চাপা গলা শুনলাম, কি যে বলিকতা কর, ছি! মামা কি জবাব দিলেন দেখা গেল না।

মামী ধরে ঢুকে বলে, ঐ রকম স্বভাব গুণ। বায়েন ঠট খোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজার গেলেন। বলাম, একটা খাস্! জবাব দিলেন কেন? রাগের তুবন বাবু চাইতে টাকা ঠট তাহে দিয়ে খানি হাতে ধরে ঢুকলেন।

আমি বলাম, বেশ লোক তো বতীন মামা! মামী বলে, ঐ রকমই। আর জাণো ভাট— বললাম, তাই নয়, তাহে।

মামী বলে, তাও তো বটে! মাগে থাকতেই যে লবছটা পাড়িয়ে ব'লে মাহ! গ'র তাহে না ক'রে আমার তাই হলেই বেশ হ'ত কিন্তু। লম্পকটা নতুন করে শাভ না? এখনো এক খন্টাও হয়নি, জমাট বাসেনি।

আমি বললাম, কেন? মামী তাহে বেশ তো লম্পক! মামী বলে, আচ্ছা তবে তাই। কিন্তু আমার একটা কথা তোমার লম্বতে হবে তাহে। তুমি গুণ বাণী শুনতে চেয়ে না।

বললাম, তার মানে? বাণী শুনতেই তো এলাম!

মামীর মুখ গর্ভীর চল, বলে, কেন এলে? আমি ভেবেছিলাম? তোমাদের আলার আমি কি গলায় বড়ি দেবো?

আমি অবাক হ'য়ে মামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কথা বেগার না।

মামী বলে, তোমাদের একটু লম্ব মেটাবার জন্য উনি মাঝহত্যা করছেন দেখতে শাভনা? রোজ তোমরাই একজন না একজন এসে বাণী শুনতে চাটবে। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়লে মাহু কদিন বাটে?

রক্ত! রক্ত নয়? দেখবে? ব'লে মামী চ'লে গেল।

ফিরে এল একটা গামলা হাতে ক'রে। গামলার ভেতরে জমাট বাধা খানিকটা রক্ত।

মামী বলে, কাল উঠেছিল, ফেলতে মাথা হাঙ্কিল তাই রেখে দিয়েছি। রেখে কোন লাভ নেই জানি, তবু—

আমি অসুতন্ত হয়ে বললাম, জানতাম না মামা। জানলে কখনো শুনতে চাইতাম না। ইন্, এত জন্তেই মৃত্যুর পরী এর খাবাপ?

মামী বলে, কিছু মনে কোরো না তাহে। অস্ত কাকেরী, লম্ব তো কথা কইনা তাই তোমাকেই পায়ের খাল মিটিয়ে ব'লে নিলাম। তোমার আর কি ঘোষ, আমায়, অস্ত!

আমি বললাম, এত রক্ত পড়ে তবু মামা বাণী বাজান?



মামী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বুলে, ইগা, পৃথিবীর কোন বাধাই তাঁর বাঁশী বাজান বন্ধ করতে পারবে না। কত বলেছি, কত কৈদেছি, শোনেন না। আমি চুপ করে রইলাম।

মামী ব'লে চল, কতদিন ভেবেছি বাঁশী ভেঙ্গে ফেলি, কিন্তু লাভ হল চরনি। তখন বাঁশীর বদলে মদ পেয়েই নিজেকে শেষ করে ফেলবেন, নহত যেখানে বা আছে সব বিক্রি করে বাঁশী কিনে না গেলে মরবেন।

মামার শেষ কথাগুলি বেন গুমরে গুমরে কৈদে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কি বলতে পেলাম, কি কথার সূতল না।

মামী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, অগচ্চ ঐ একটা ছাড়া আমার কোন কথাই কেমনে না। আগে ছাড়া মদ খেতেন, বিয়ের পর বেগিন নির্মতি করে মদ ছাড়তে বরাদ্দ সেটলিন থেকে গ্রিনিথ ছোঁয়াই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাঁশীর বিষয়ে কোন কথাই শোনেন না।

আমি বলতে গেলাম, মামী—

মামী বোধ হয় তখনকেট পেলে না, বলে চল, একবার বাঁশী সূক্তির বেখেছিলাম, সেকি ছুটু কটু করতে লাগলেন। সেন তাঁর সঙ্গী চারিগে দেছে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ চল। মামী দরজা খুলতে উঠে গেল।

বতীন মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, দিলে না টাকা। অতটা বরদ পত্রও বেতে।

পিছন থেকে মামী বলে, দে আমি আগেই জানি।

বতীন মামা বলেন, দোকানদারটাই বা কি পাড়ী, একপো হুজি চাইলাম দিল না। মামার বাড়ী এসে ভাঙরকে বেখাছি হালি শেটে কিরতে হবে।

মামী জান বুঝে বলে, তখি ঘেরন-ভালই করেছে। শুধু ভাল দিয়ে তো আর হুজি হল না।

বি নেই?

কবে আবার বি আনলে তুমি?

ভাঙতে বটে। ব'লে বতীন মামা আবার দিকে চেয়ে চান্সলেন। বিয়া সপ্রতিভ হালি।

আমি বললাম, কেন বাত বলেন মামা, বাবাভের কিছু দরকার নেই। ভাঙের সঙ্গে অত তন্ত্রতা করতে নেই।

মামী বলে, বোল তোমরা, আমি আসছি। ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মামা বলেন, কোথায় গো?

বাবাঝা থেকে জবাব এল, আসছি।

খিন্টি পনের পরে মামী ফিরল। হাতে হাথানা রেফাকিত গোটী চারেক করে বসগোয়া আর গোটী দুই লম্বা।

বতীন মামা বলেন কোথেকে বোগাড় করলে গো? ব'লে, একটা বেকাবি টেনে নিয়ে একটা বসগোয়া বুঝে তুলেন।

অন্য বেকাবিটা আমার সামনে রাখতে রাখতে মামী বলে, তা দিয়ে তোমার দরকার কি?

বতীন মামা বিয়া নিশ্চিন্তভাবে বলেন, কিছু না! যা খিন্টি পেয়েছে, ডাকাতি করেও যদি এনে পাক কিছু দোষ হল নি। মামীর প্রাণ বাঁচাতে সাধী অনেক কিছুই করে।

আমি স্তব্ধ হয়ে বলতে পেলাম, কেন মিনো—

বাবা বিয়ে মামী বলে, আবার যদি ঐ সব জুক কর ভাবে, আমি কৈদে ফেলব।

আমি মিনেপে খেতে আরম্ভ করলাম।

মামী ওঘর থেকে ছোটো এনায়েনের রাশে জল এনে দিলেন।

প্রথম বসগোয়াটা দিলেই মামা বলেন, ওহাঙ্ক! কি বিক্টি বসগোয়া! রইলো পড়ে খেতো তুমি, নহত ফেলে দিও। দেখি লেখপটা কেমন!

সংশয় বুঝে দিয়ে বলেন, হ্যাঁ এ বিনিবটা ভাল, এটা ব্যব। ব'লে, লম্বা ছোটো তুলে নিয়ে বেকাবিটা ঠেলে দিয়ে করেন, যাও তোমার জামিহি চাঁপি ফেলে বিগ'পন নদামার।

অতমী মামীর চোখ ছল ছল করে এল। মামার ছল-চুহু আমায়ের কারুর কাছেই গোপন রইল না। কেন সে এমন বাঁশী বসগোয়াও-মামার কাছে হুজির চিলি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে ঐরা জল আসবার উপক্রম হল।

মামা নাচু করে রেকাবিটা শের করলেন। মামাথানে একবার চোখ তুলতেই নতুন পড়ল মামা মামার 'রেকাবিটা' কপালে ছুঁইয়ে দরজার ওপরের ডাকে তুলে রাখছে।

সন্ধ্যার সন্ধ্যার ঘনিরে এলে মামী ঘরে করে প্রদীপ সেখান, 'দুনা' দিল। 'আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জালিয়ে দিয়ে মামা চুপ করে থাকিয়ে কি বেন ভাবতে লাগল।

বতীন মামা হেসে বলেন, 'মামা লজ্জা কিসের! নিত-কার অত্যাচার, বাপ পড়লে খাতে ঘুম করেন। ভাতের কাছে লজ্জা করতে নেই।

আমি বললাম, আমি না হই—

মামা বলে, 'বোপ, উঠতে ধেনা অত লজ্জা নেই আমার। ব'লে, পলার খাটলে দিয়ে আমার পাথের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

লজ্জার মুখে কৃষ্ণিতে আরক্ত মুখখানি নিয়ে অতীম মামী ঘরন উঠে গাড়ান, আমি বললাম গাড়িও মামা, একটা প্রণাম করেন।

মামা বলে, না না ছি ছি—

বললাম, 'ছি ছি নয় মামা। আমার নিত-কার অত্যাচার না হ'তে পারে, কিন্তু তোমার প্রণাম না করে যদি আর বাকী কিরি রাতে আমার ঘুম হবে না ঠিক। ব'লে মামা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

বতীন মামা হো হো করে হেসে উঠল।

মামা বলে, 'জাখোতা ভাতের ভাত!'

বতীন মামা বলেন, 'ভক্তি হচ্ছে গো! কলিঙ্গের সীতাদেবীকে দেখে।

যেহেটির মত ললকে 'খোং' বলে মামা পলারন করল।

বাহ্যিক থেকে ব'লে গেল, আমি বাবা করতে গেলাম।

বতীন মামা বলেন, 'এইবার বাই পোন।

আমি বললাম, 'খাকপে, কাপ নেট মামা। শেরকালে রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে আমার।

বতীন মামা বলেন, 'তুমিও বেগে ঘান ঘান পান পান আরম্ভ করলে ভাতের রক্ত পড়বে তো। হয়েছে কি? তুমি শুনেও আমি বাজাব, না শুনেও বাজাব। পূর্ণা হই রাজা করে মামার কাছে ব'লে কানে আগুল দিয়ে থাকবে।

- কাতের বাসন্তী পূলে বাধার কাতের কেনটা বার করলেন। বলেন 'বাহ্যিক চর্চা, ঘরে বড় শব্দ হয়।

নিম্নেই বাহ্যিক মামাটী তুলে এনে বিস্তারিত দিলেন। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'লে বাধাটা বুঝে তুললেন।

হঠাৎ আমার মনে হল আমার ভেতরে যেন একটা উদ্ভাব একটা কপাটা উদ্ভাবন বুনিয়াদ ছিল আর বাধার সুরের নড়া শেরে জেগে উঠল। বাধার সুর এসে লাগে কানে কিন্তু আমার মনে হল বুকের ভেতরে যেন লাগে পৌছোতে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আনন্দপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌছানি, বাধার এই ঘর কোরকও যেন বর্ণ দিয়ে ভীষণ করে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে সূচ জাবে ল্পন করতে করতে যেন ঘুরে ঘুরে গেলো যেনো কয়েক তারা দুটে উঠেছে বেগুনে শাকি, দেহপানে বস্ত্রের মাত্রার মাঝে লগ পড়েছে। অস্তুর বাধা বোধ করে মানব পাবার বতর্কলি অতৃপ্তি আছে বাধার সুর যেন জাদের সঙ্গে কোলাহলি আরম্ভ করেছে।

বাধা শুনেছি ভেবে। বিশ্বাস হ'লে এই বাধা বাধার একজন একদিন এক কিশোরী কুল মান লজ্জা প্রসব বুনিয়াদ নিয়েছিল, ঘনুনাতে উদ্ভাব ব'লেছিল। আর মনে হল, আমার বতীন মামার বাধার 'সমগ্র' প্রাপ যদি আসন্নকালে উঠে নিঃস্বর্ণ এমন বাতুল হয়ে ৩৩ ৩৩৩ সেই বিশ্ব বাধার বাধকের পক্ষে ৩ ৩টি কাজ আর এমন কি কঠিন!

বেগ, মামী কখন এসে নিঃশব্দ গানকের বাহ্যিক ব'লে পড়েছে। বুঝ লজ্জা ব'লে ঘটাই রাজা খব, কিবা রাজা ঘরে বাধার পথ ৩ ঘরের ভেতরে গিয়ে।

বতীন মামার দিকে চেয়ে দেখলাম, বুঝ লজ্জা সত্য নেই। এ যেন সুরের আনন্দ ভোল: লাগক সমাপ্তি পেয়ে গেছে।

কতকণ বাধা চলেছিল ঠিক মনে নেই, বোধ হয় খন্ডা দেড়েক হবে। হঠাৎ এক সময়ে বাধা খামিয়ে বতীন মামা তখনক কানেতে আরম্ভ করলেন। বাহ্যিক কণা মাগোতেও বুকেতে পাঠলাম, মামার বুঝ চোখ অত্যন্তক রক্ত মনে হয়ে উঠেছে।



অতলা মামী বোধ কর্ত্ত প্রসন্ন ছিল, চল আর পাখা নিয়ে চুটে এল। বানিকতা রক্ত তুলে মামীর শুভ্রবর্ণি বতীন মামা অনেকটা হুহু চলেল। বাহুরের ওপর একটা বালিশ পেতে মামী তাকে গুইয়ে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আমি বতীন মামা।

মামা কিছু বলবার আগেই মামী বলে, তুমি এখন কথা করো না। ভাতের বাড়ীতে ভাতের, আজ থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবে এখন। চল আমি দরজা দিয়ে আসছি।

দরজা খুলে বাইরে যাব, মামী আমার একটা ছাত চেপে ধরে বলে, একটু দাঁড়াও ভাতের, খামলে নি।

এদীপের আলোতে খেবলাম, মামীর সমস্ত শরীর বয় ক'রে কাঁপছে। একটু হুহু করে বলে, ওঁর রক্ত পড়া দেখলেই আমার এরকম হয়। বাঁশী শুনেও ধ'তে পারে। আজ্ঞা এবার এসো ভাতের, ঈশান্দির দ্বার একদিন আসবে কিন্তু।

বললাম, মামার বাঁশী ছাড়তে পারি কিনা একবার চেষ্টা ক'রে দেখব মামী?

মামী ব্যস্ত কণ্ঠে বলে, পারবে? পারবে তুমি? যদি পার ভাতের, শুধু তোমার বতীন মামাকে নয়, আমাকেও খাণ দেবে।

অতলী মামী তব বয় ক'রে কেঁপে ফেললে।

হাস্ত্যর লেমে বললাম, খিলটা লাগিয়ে লাও মামী।

—হুই—

কেবলই মনে কর, নেপাকে হাছব এত বড় ব্যম ঘের কেন। লাভ কি? এই যে বতীন মামা পলে পলে জীবন উল্লস ক'রে হুহুর আল ধনবার নেপার যেতে যান, যানি তাতে ক্লানন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তারও, যেপোনে তারও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিয়ে কি সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে বয় সৃষ্টি এ তো অর্নিবের! বতকণ সৃষ্টি করা যায় জন্ম ভতকণ এর স্থিতি। তারপর ব্যতবের কঠোরতার মাঝে এ. বহুরে চিহ্নও তো বুঁজে পাওয়া যায় না। এ নির্বাক মামা সৃষ্টি ক'রে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কি বিচ্ছিন্ন! আমারও ইচ্ছে করে বতীন মামার

মত হুহুর আলোর ভুবন ছেয়ে ফেল, হুহুর আন্তর পপনে বেধে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! শান্ত নেই? নাই বা দইল।

এতদিন জানতাম, আমিও বাঁশী বাজাতে জানি। বহুরা শুনে প্রাণদাও করে এসেছে। বাঁশী বাজিয়ে আনন্দও খে না পাই তা নয়। কিন্তু বতীন মামার বাঁশী শুনে এসে মনে হল, বাঁশী বাজান আমারি মতো নয়। এক একটা কাক করতে এক একজন লোক লম্বা, আমি বাঁশী বাজাতে লম্বাইনি। বতীন মামা ছাড়া বাঁশী বাজাবার অধিকার কারো নেই।

থাকতে পারে কারো, অধিকার। কারো কারো বাঁশী মত বতীন মামার বাঁশীর চেয়েও মনকে উতলা ক'রে তোলে, আমি তাবের চিনি না।

একদিন বললাম, বাঁশী শিখিয়ে দেবে মামা?

বতীন মামা হেসে বলে, বাঁশী কি শেখাবার জিনিষ তাহলে? ও শিখতে হয়।

তা ঠিক। আর শিখতেও হয় মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, লম্বা লম্বা দিয়ে। নইলে আমার বাঁশী শেখার মতই সে শিখা বার্থ হয়ে যাবে।

অতলী মামীকে সেদিন বিচার নেবার সময় যে কথা বলেছিলাম সে কথা জুগি নি। কিন্তু কি ক'রে যে বতীন মামার বাঁশী ছাড়ারো ভেবে গেলুম না। অথচ দিনের পর দিন বতীন মামা যে এই সর্গালাশা নেপার পলে পলে ময়পের দিকে এগিয়ে যাবে একথা ভাবতেও কষ্ট হল। কিন্তু করা যায় কি? মামীর প্রতি বতীন মামার যে ভালোলা তার বোধ হয় ভাল নেই, মামার কান্নাই এখন ঠেসেছেন তখন আমার পাখা কি তাকে ঠেকিয়ে রাখি!

একদিন বললাম, মামা আর বাঁশী বাজাতেন না।

বতীন মামা গোপ বড় বড় করে বলেন, বাঁশী বাজাব না? বল কি তাহলে? তাহলে বাঁধো কি ক'রে?

বললাম, দল দিয়ে রক্ত উঠছে, মামী মত কানে।

তা আমি কি করব? একটু আটু কাঁদা ভাল। ধ'লে হাকলেন, অতলী! অতলী!

মামী এল।

মামা বলেন, কান্না কি করে তনি ? বাশি ছেড়ে দিয়ে
আমার হরতে কল। নাহি ? তাতে কান্না বাজবে, ক'মবেনা ।
মামী জানবুঝে চুপ ক'রে থাকিবে বটল ।

মামা বলেন, জান ভায়ে, এই অতলীর আলাদা আমার
বেঁচে থাকা তার হয়ে উঠেছে । কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে
বসলেন, নড়বার নাহ নেই । ওর তার থাকে না গাফলে
বাশী বগলে মনের আনন্দে যেন বিবেকে ঘুরে বেড়াতাম ।
বেড়ানো টোরাহো সব মাগার উঠেছে ।

মামী বলে, বাওনা বেড়াক্তে, আসি ব'রে বেবেছি ?

রাণোনি ? ব'লে মামা এমন ভাবে চাইলেন যেন নিজের
চোখে তিনি অতলী মামীকে খুন করতে দেখেছেন আর মামী
এখন তাঁর লম্বুখেই সে কথা অবীকার করছে ।

মামার চোখে জল এল । অল্প অভিভূত কণ্ঠে বলে, অমন
করতো আমি একদিন—

মামা একেবারে জল ধ'রে গেলেন । আমার সামনেই
মামীর হাত ধ'রে কৌজার কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে
বলেন, ঠাট্টা করছিলাম, সত্যি বলছি অতলী,—

চুট ক'রে হাত ছাড়িয়ে মামী চ'লে গেল ।

আমি বললাম, কেন মিথ্যা চটালেন মামা কে ?

বতীন মামা বলেন, চুটিনি । লজ্জার পালাগো ।

কিন্তু একদিন বতীন মামাকে বাশী ছাড়তে হল ।
মামীই ছাড়াল ।

মামার একদিন হটাৎ টাইফয়েড মর হল ।

দেখনি বুঝি আরের সত্তর দিন । লকাল নটা বাজে । মামী
দুঃখে, আমি তার মাথার আইল ব্যাগটা চেপে ধ'রে আছি ।
বতীন মামা একটা টুলে বসে জানবুঝে চেয়ে আছেন । তারি
মুখে তার বতীর আরও দীর্ঘ হয়ে গেছে, চোখ চুটি লাল
হয়ে উঠেছে । মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চুল উজ্জ্বল মুখো ।

হটাৎ টুল ছেড়ে উঠে মামা টাকটা পুগে বাশীটা বার
করলেন । আজ সত্তর দিন এটা বাকেই বন্ধ ছিল ।

সবিস্ময়ে কান্নাম, বাশী কি ধ'বে মামা ?

ছেঁড়া পাশ্পহুতে পা ঢুকতে ঢুকতে মামা বলেন,
বেঁচে দিয়ে আসব ।

তার মানে ?

বতীন মামা জান হাসি হেসে বলেন, তার মানে ডাক্তার
বাহক আর একটা কল দিতে হবে ।

বললাম, বাশি লাক, আমার কাছে টাকা আছে ।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হেসে বতীন মামা পেরেক টানলেন
জামাটা টেনে নিলেন ।

যদি বরকার পড়ে তবে পকেটে কিছু টাকা এনেছিলাম ।

মিথ্যা চটো । আমার মেল মামা কতবার কত বিপদে
বতীন মামাকে টাকা নিয়ে লাগবা করত চেয়েছেন,
বতীন মামা একটা পরমা নেননি । বললাম, কোথাও যেতে
হবেনা মামা, আমি কিনবো বাশী ।

মামা সিরে দাড়ালেন । বলেন, তুমি কিনবে ভাত ?
বেগতো !

বললাম, কতদাম ?

বলেন, এখন পরামিতি কিনেছি, একশো টাকার বেগো ।
বাশি ঠিক আছে, কেবল সেকেন্ড হ্যান্ড এট বা ।

বললাম, আপনি না সেদিন বলছিলেন মামা, এরকম
বাশি বুঝে পাওয়া যায়, অনেক বেছে আপনি কিনেছেন ?
আমি একশো পরামিতি নিয়েই ওটা কিনবো ।

বতীন মামা বলেন, তাকি হু ! পুরোনো মিনিব—

বললাম, আজকে কি মোড়োর পেলেন মামা ?
আপনাকে ঠিকরে কম্বোমে বাশী কিনবো ?

পকেটে বশটাকার তিনটে নোট ছিল বার ক'রে মামার
হাতে দিয়ে বললাম, মিশ টাকা আগাম নিব, বাকি
টাকটা বিকেলে নিয়ে আসবো ।

বতীন মামা কিছুক্ষণ তত্বভাবে নোটকটার বিকে
ডাকিয়ে বইলেন, তারপর বললেন, আজ্ঞা !

আমি সত্বে নিকে মুখ ক্রিহিয়ে নিলাম ।

মুগের ভাবটা খেববার লাগা হল না ।

বতীন মামা ডাকলেন, ভায়ে—

কিবে ডাকালুম ।

বতীন মামা হালবার চটো ক'রে বলেন, পূব বেগী কই
হচ্ছে ভেঝোনা, যুগলে ভায়ে ?

আমার চোখে জল এল । ভাড়াভাড়ি যুগ ফিনিবে
মামোত পিরের গিরে বললাম ।



মামীর ঘুম ভাঙেনি, জানতেও পারল না যে রক্তাংশপাত্ত
বাঁশীটা বলকে বলকে মামার হাঁক শান করছে, আমি
আজ সেই বাঁশীটা কিনে নিলাম।

মনে মনে বললাম কিংবা মাথা। এবে বাড়ির বাঁশ।
একটা বাঁশ। পেল, আর একটা কিনতে কতক্ষণ?
লাঙের মধ্যে বসেই মামা একান্ত প্রিয়বৎ হাতছাড়া হয়ে
দাবার খবরটাই পেলেন।

বিকালে হাকি। টাকা। এনে দিতেই পতীন মামা বলেন,
বাড়ী বাবার সময় বাঁশীটা নিয়ে দেও।

আমি ছয় চুকতে চুকতে বললাম, থাকনা এখন কদিন,
এত ভাড়াটাকি কিসের?

পতীন মামা বলেন, না। শরের মিনিষ আমি বাড়ীতে
রাখি না। বৃন্দাম, পনের হাতে চলে বাজা বাঁশীটা
চোখের ওপরে থাকা তাঁর সহ হবে না।

বললাম বেশ মামা, তাই নিয়ে যাব এখন।

মামা গাভ নেড়ে বলেন, বাঁশ, নিয়েই বেও। তোমার
মিনিষ এখানে কেন ফেলে রাখবে। বুঝে না?

উনিশ দিনের দিন মামীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে
উঠল।

পতীন মামা টুলটা বিছানার কাছে টেনে এনে মামীর
একটা হাত বুটো করে ধরে নীরবে তার হোশবার্ণ করা
কানের মত স্নান বুকের বিকেলেরে বইলেন।

ঠাং মতন। মামা বল, ওগো আমি যোগ্য হয় আর
বাঁচবে না।

পতীন মামা বলেন, তাকি এর অতী, তোমার বাঁচতে
হবেই। তুমি না বাঁচলে আমিও যে বাঁচবে না।

মামা বলে, বালাই, বাঁচবে বৈকি। জাখো, আমি
যদি নাই বাঁচি, আমার একটা কথা রাখবে?

পতীন মামা নত হয়ে বলেন, রাখা। বল।

বাঁশী বাজান ছেড়ে দিও। তিন তিন করে তোমার
শরীরের সঙ্গে দেখে ওপরে দিয়েও আমার শাস্তি থাকবে
রাখবে আমার কথা?

মামা বলেন, তাই হবে মতলী। তুমি ভাল হয়ে ওঠো,
আমি আর বাঁশী ছোঁব না।

মামার শীর্ণ ঠোঁটে সুখের হাসি ফুটে উঠল। মামার
একটা হাত বুকের ওপর টেনে প্রান্তভাবে মামী
চোখ বুজল।

আমি বৃন্দাম পতীন মামা আর তাঁর হোশবার্ণপাত্ত
অতীতির ভক্ত কতক একটা ভাগ করলেন। অতি মুচরবে
উজ্জ্বলিত। ঐ কটি কথা। তুমি ভাল হয়ে ওঠো, আমি আর
বাঁশা ছোঁব না, অর্ন্তে না বৃন্দাম আমিও পতীন মামাকে
চিনি, আমি জানি, মতলী মামাও জানে, ঐ কথাটির
পেছনে কতবারি জোর আছে। বাঁশী বাজাবার-ওঠ মন
উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও পতীন মামা আর বাঁশী ছোঁবেন না।

শেষ পর্যন্ত মামা ভাল হয়ে উঠল। পতীন মামার
মুখে হাসি ফুটল। মামা সেদিন পথ পেল সেদিন হেসে
মামা করেন, কি গো, বাঁচবে না বটে? অমনি মুখের
কথা কি না! চাঁড়াল পুরের কাছ থেকেই তোমার
চিনিয়ে এনেছি, ঘম বাটা তো ভাল মাহুত।

আমি বললাম, চাঁড়াল বুড়ো আবার কি মামা?

মামা বলেন, তুমি জান না বুঝি? দে এক দ্বিতীয়
মহাভারত।

মামা বলে, গুরুনিলা কোর না।

মামা বলেন, গুরুনিলা কি? গুরুতব নিলা করব।
ভায়েকে দেখাওনা অতী, তোমার পিতের দাপট।

মামীর বাবা দেওয়া সন্তো মামা ইতিহাসটা শুনি
দিলেন। নিজের বুড়ো নয়, বাপের শিশুতো ভাই।
না বাবাকে হারিয়ে সন্তর বছর বয়স পর্যন্ত ঐ বুড়োর কাছেই
মতলী মামা ছিল। অত বড় বয়ে তাকে কিস চুড়
লাগাতে বুড়োটির বাহত না, অগ্রবিক অত দুর তো
ছিলই। বুড়োর মেজাজের একটা অঙ্গ ছিল আর পথ
মামীর পিত্রে আছে। পানের বাড়ীতেই পতীন মামা বাঁশী
বাজাতেন আর কাছের ঘর খেলে। গ্রামই বুড়োর গর্ভন
আর অনেক স্নাতে মামীর চাপ। কাহার নবক তাঁর বেশা
ফুটে যেত। বিহাট চটে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন
করলেন এবং কীর করে কেলেন।

মামার ইতিহাস শেষ হয়ে মতলী মামা শীর্ণ হাসি হেসে
বলে, এখন কি জানি মদখার! তাহলে কখনো আসতুম না।

মামা বলেন, এখন কি জানি তুমি মাঝার রতন হয়ে
মাটির মত শেঁটে পড়েবে! তাহলে কখনো উদ্ধার
করতাম না। আর সব না গেলে কি এক
তরগোব্বের বাড়ী থেকে মেয়ে চুরি করার মত দিকি কাজটা
করতে পারতাম গো! আমি স্তেবেছিলাম,
বছর বানেক—

মামী বলে, গাও, চুপ কর। তারের সামনে যা তা
ব'কে না।

মামা হেসে চুপ করলেন।

মাস চুই পরের কথা।

কলেজ থেকে সটান ঘটানমামার প্রবাসে চাকির
হলাম। দেবি, জিনিব পত্র বা ছিল বীধা ছীলা চ'রে
প'ড়ে আছে।

অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, এলব কি মামা?

ঘটান মামা সংক্ষেপে বলেন, বেশে গাছি।

দেশে? দেশ আবার আপনায় কোথায়?

ঘটানমামা বলেন, আমার কি একটা দেশও নেই
ভায়ে? পাঁচশো টাকা আমার জমিদারী আছে দেশে,
খবর তাহো?

অন্তরীমামা বলে, হুত জখের মতই তোমাদের ডেডে
জাম ভায়ে। আমার অস্থবের বসুই এটা হল।

বললাম, তোমার অস্থবের কত? তার মানে?

মামা বলেন, তার মানে বাড়ীটা বিক্রি ক'রে দিয়েছি।
বিনি কিনেছেন পাশের বাড়ীতেই থাকেন, মাংসখানের
প্রাচীরটা তেড়ে গুটো-বাড়া এক ক'রে নিতে বাস্ত
হ'য়ে পড়েছেন।

আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, এত কাণ্ড করলে মামা,
আমাকে একবার জানালে না পর্যন্ত! কবে বাগতা
ঠিক হ'ল?

বাধা বিছানার আর তাগাবৎ বাস্তের দিকে আঙুল
বাড়িয়ে মামা বলেন, আজ। রাতে ঢাকা বেলে রওনা
হব। আমরা বাস্তাল হে তাপনে, জান না বুঝি? ব'লে
মামা চলেলেন। অবাক মালুম! এমন অবস্থায়
হাসিও আসে!

পত্নীর ভাবে উঠে পাড়িয়ে বললাম, আজ্ঞা,
ঘটানমামা, মাদি মামা। ব'লে পরজার
মজলর হ'লাম।

অন্তরীমামা উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধ'রে
বলে, লজ্জা ভাপনে, রাগ কোর না। আগে থাকতে
তোমার খবর দিয়ে লাভ তো কিছু ছিল না, কেবল মনে
বাধা পেতে। যে ভায়ে তুমি, ওও কি হারামা
তুলতে ঠিক আছে কিছু?

আমি দিগে দিগে বাধা বিছানার উপর ব'লে বললাম,
আজ যদি না আপতাম, একটা খবর ও তো পেতাম না।
কাল এসে দেশতাম, বাড়ী ধর না খী করছে।

ঘটান মামা বলেন, আমার রামা! তোমার না ব'লে কি
যেতে পারি? ওপরে বেলা দেশের জাকারখানা থেকে
কোন ক'রে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ীতে। কলেজ থেকে
বাড়ী ফিরলেই খবর পেতে।

বাড়ী আর দেখলাম না। শিখারদ'র টেনে মামামানীকে
উঠিয়ে বিতে পেলাম। পাড়ী ছাড়ার আগে কতকণ সময়
যে কি ক'রেই কটিল! কাতো বুধেই কথা নেই। ঘটান
মামা কেবল মাঝে মাঝে ও একটা হাসির কথা বলছিলেন
এবং হাসাচ্ছিলেনও। কিন্তু তার বুকের ভেতর য'ক
কতছিল সে খবর আমার অজ্ঞাত থাকলি।

পাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজলে ঘটান মামা আর অন্তরী
মামীকে প্রণাম ক'রে পাড়ী থেকে নামলাম। এতবার
ঘটান মামা অন্তরীকে বুপ কিরিয়ে নিলেন। আর বোধে
জর বুধে চালি ছুটতে প্রাধা তাঁর শব্দে স্তব্ব হ'ল না।

জানিলা দিয়ে সুববার ক'রে মামী ডাকল, শোনো।
কাছে পেলাম। মামী বলে, তোমাকে ভায়ে বলি আর বার
বলি, মনে মনে জানি তুমি আমার ছোট ভাই। পারিও
একবার বেড়াতে দিয়ে দেখা দিয়ে এলো! আমাদের ভরত আর
কলকাতা জালা হবেনা, জমির ভারি কর্তি কর গেছে।
যেও, কেমন ভায়ে?

মামীও প্রাধ দিয়ে উপ উপ ক'রে বল করে পড়ল।
যদি নেড়ে জানিলাম, যাব।



বন্দী বাড়িরে গাড়ী ছাড়ল। যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল
অশ্লক দৃষ্টিতে তেরে দাঁটায়। দুইর লাল সবুজ অশোক
বিদ্যুৎ ওপরে খেন একটি লেগল লাল বিদ্যুৎ অস্ত্র হয়ে গেল
তখন কিলনাম। চোখের ভেগে দৃষ্টি তখন কাপল। হয়ে

—তিন—

নাহুকের হুতাবই এট এখন যে চোখটা পাথ তখন সেই
চোখটাকেই লম্বা বড় ক'রে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল,
যে বড়ান মায়া আর অতলী মায়ীর বিচ্ছেদে একুশ বছর
বংশে আমার চোখের ভেগে তেরে গিরেছিল সেই বড়ান মায়া
মার অতলী মায়া একদিন আমার মনের এক কোণে
সাদারের সন্তান আবক্ষনার তলে ঢাপা প'ড়ে যাবেন।

ভাবনে অনেকগুলি ওলোট পালাট হ'য়ে গেল। বি,
পাল ক'রে বার হ'তে না হ'তে ভাগা আমার বাড়ি হ'য়ে
যৌবনের কলনের প্রথমধর্ম থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে
নামিয়ে দিল। ধবলা তেল পড়ল। বার মনের ভেগে টালোক
ভাগ করলেন। বর্গগণকের বাড়ীটা পর্দায় বিক্রি ক'রে
শিক্তকণ শোধ দিয়ে মাশি টাকা মাইনের একটি চাকরি
নিরে প্রায় বাজার অকলে ছোট একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে
উঠে গেলাম। মার, কীদা কাটার গ'লে একটি বিয়লু ক'রে
কোমার

প্রথমটা সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তেজটা লাগতে লাগল,
জানন্টা বিপদ হ'য়ে গেল, আশা আনন্দের এতটুকু
আগোড়নও ভেতরে বুঁকে গেলাম না।

তারপর ঘরে ঘরে সব টিকি হ'য়ে গেল। নতুন জীবনে
তলের খোঁজ পেলাম। ভাবনের জুগেযোয়ার হারিয়েভের
কথা কবিন আর মাহুৎ বুক পুরে রাখতে পারে?

জীবনে এখন এই সব বড় বড় ঘটনা কীভাবে তখন
নিজেকে নিয়ে আমি এমনি ব্যাপৃত হ'য়ে পড়লাম যে কবে
এক বড়ান মায়া আর অতলী মায়ীর যৌব পরম সম্পদ
ব'লে গ্রহণ করেছিলাম সে কথা মনে কীপ হ'তে কীপতর
হ'য়ে গেল। সাত বছর পরে আর কচিন কখনো চরত
এতটা অশ্লষ্ট বৃত্তির মত তাদের কথা মনে পড়ে।

মধ্যে একবার মনে পড়েছিল, বড়ান মায়াদের দেশে
চলে আসবার বছর তিনেক পরে। দেউবার ঢাকা মেলে
কলিলন হয়। দুজনের নামের মাঝে বড়ান্ননাথ আর
নামটা দেখে যে পূব একটা যা লেগেছিল সে কথা
আজও মনে আছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেশে
আসব, কিন্তু হয়নি। দেউবিন মাশিল থেকে কিংবা বোশ
আমার দ্বার করিন অস্থখ। মনে পড়ে বড়ান মায়ার দেশের
টিকানোর একটা পত্র লিখে দিয়ে এই ভেবে মনকে সাহসনা
দিয়েছিলাম, ও নিকর আমার বড়ান মামা নয়। পৃথিবীতে
বড়ান্ননাথ আরের অতাব নেই তো। সে চিত্রের কোন
কথাই আসেনি। দ্বার অস্থখের হিড়িকে কথাটাও
মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর গড়িরে গড়িরে আরও জরটে বছর কেটে
গেছে।

আমার ছোট বোন বাগার বিয়ে হয়েছিল ঢাকার।
বাগার বামা তারক দেখানে কলেজের প্রফেসর।

পুছোর সময় বীণাকে তামা লাগল না। অগ্রহায়ণ
মাগে বীণাকে আনতে ঢাকা গেলাম। কিন্তু মামা হ'ল
না। গিছেই বেশি বাগার বাস্তভীর পূব অস্থখ। আমি
বাগার আগের দিন হু হু ক'রে অগ্র এগেছে। ডাকার
মাশল্য করছেন নিউমোনিয়া।

ছুটি ছিল না, জুজ হ'য়ে একাই কিরণাম। তারক
খরে, মা ভাল হ'লেট আমি নিজে গিয়ে রেখে আসব,
হুতের বাব।

গোয়ালামে প্রিমার থেকে নেমে ট্রেনের একটা ইন্টারে
ভিড় কম বেখে উঠে পড়লাম। দুটি মার তরলোক, এক-
কোণে ব্যাপার বৃদ্ধি নেওয়া একটি স্ট্রীলোক, খুব সন্তান
এঁদের একমনের স্ত্রী, লিখিল পজের একাত অভাব। দুটী
হ'য়ে একটা বেঁকিতে কলনের ওপর চাদর বিছিয়ে বিদ্যনা
করণাম। বাশিল সোান দিয়ে আরাধ ক'রে ব'লে, পা দ্রুটো
রাগ দিয়ে ঢেঁকে একটা ইংরাজী মানিক পত্র বার ক'রে
গুণনহেমের ডিটেকটিভ পরে মনঃসংযোগ করলাম।
বাসামলগে গাড়ী ছাড়ল এবং পরের ট্রেনে বাইল।
আবার লেল। ওটা ঢাকা মেলে বটে, কিন্তু পোড়ান পর্দায়

প্রত্যেক ট্রেনে পেরে খেয়ে পাসেজার ছিলেবই চলে।
শোড়ান'র পর ছোটখাটো ট্রেনগুলি বাস দেয় এবং
গতিও কিছু বাড়ায়।

গোলাপবনের পর বোটা তিনেক ট্রেন পরে একটা
ট্রেনে গাড়ী বাঁড়তে উত্তরলোক গুটি তিনিবপত নিতে নেমে
গেলেন। প্রাণ্যকটি কিন্তু তেমনই ভাবে ব'লে রইলেন।

বগলার কি? এক ফেলেই দেখছি সব নেমে গেলেন।
এমন অস্ত্রমনকও তো কখন দেখিনি! ছোটখাটো তিনিবই
মাল্লের তুল হই, একটা আঁঠু মাংস, তাও আবার এক-
ভনের অর্ধাৎ, তাকে আবার কেউ তুল ক'রে ফেলে
দায়!

তানিলা দিবে তাকিরে দেখলুম পিচনে লুকপাত মাত্র
নাঃক'রে তাঁরা ট্রেনের পেট পার চক্ছেন।

হয়ত জেবেছেন, চিরদিনের মত থাকও খ্রীটি তার পিছু
শেঁকু চলেছে।

চৌচির ডাকলুম, ও মল্লার—মল্লার শুনছেন?
গেটের ওপারে জললোক গুটি অলুত ক'রে গেলেন।
বাঁশী বাজিরে গাড়ীও বাড়ল।

মগত্যা নিজের ডাকগায় ব'লে শ'ড়ে ভাবলাম, জেবে কি
টনি একাই এসেছেন নাকি? বাঙালীর ঘেরে নিচ্ছই, হাঙ্গার
দিবে নিজেকে ঢাকবার কাথরা বেখেই পেটা বোকা দায়।
বাঙালীর ঘেরে, এই রাত্রি বেলা নিঃসঙ্গ থাকে, তাও আবার
পুরুষদের গাড়ীতে—

আরে! এটা পুরুষদেরগাড়ী ঠিক ক?

গুট ক'রে গুদিকের মানিলা দিবে দুখ লাড়িবে ট্রেনের
'আলোতে ভাল ক'রে বাইরেটা দেখে নিলাম। মেয়ে-গাড়ীর
কোন চিহ্নই তো লটকান নেই!

একটু জেবে বলাম, বেশুন, শুনছেন?

নাঃ। নেই।

বলাম, আপনার সঙ্গীতা সব নেমে গেছে, শুনছেন?

কথাগুলি বে আলোয়ান জেদ করে তেততরে গেল তার
কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

কি মৃগিল! অপরিস্ফুট: মেয়েদের সন্ধান করবার
কোন পথই তো বাঙালী ভাবায়'নেই! না বলা দায়, কিন্তু

দেটা কেমন কেমন ত্রেকে শেষকালে
পরিভাক নাতীর কুঁকি লাড়ে পড়বে নাকি?

বেকের কাছে দ'রে গিয়ে বলাম, বেশুন, আপনার বামা
আগের ট্রেনে নেমে গেছেন।

এইবার আলোয়ানের শেটলা নড়ল, এবং আলোয়ান
ও বোমটা দ'রে দিবে সে দুখানা বাত চ'ল বেগেই আমি
চমকে উঠলাম।

কিছু নেই, সে সুখের কিছুই এতে নেই। আমার অতীত
মামার সুখের লগে এ সুখের অনেক তফাৎ। কিন্তু আমার
মনে হ'ল, এ আমার অতীত মামীই!

মুঠ হেলে বয়ে, থলা ত্রনেই মনে হয়েছিল এ আমার
ভাইয়ের থলা। কিন্তু অতীত আশা করতে পারিনি। দুখ
বার করতে ভয় হ'ছিল, পাছে আশা ভেঙে যায়।

আমি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম, অতীত মামী!

মামী বলে, খুব বদলে গেছি, না?

মামার দিখিতে সিঁড়র নেই, কাপড় পাড়ের ডিকও
পুঁতে শোলাম না।

চার বছর আগে ঢাকামেল করণনে মৃতদের নামের
প্রাণিকার একটা অতি পরিচিত নামের কথা মনে পড়ল
বর্ত্তান মামা তবে সত্যিই নেই!

অন্তে আন্তে বললাম, খবরের কাগজে আমার নাম
দেখেছিলাম মামী, বিশ্বাস হ'লি সে আমার বর্ত্তান মামা।
একটা চট্টা লিখেছিলাম, পাওনি?

মামী বলে, না। তারপরই আমি ওখান থেকে ওতিন
মাদের মজ চ'লে ঘাই।

বলাম, কোথায়?

আমার এক দিবার কাছে, দুখ সম্পর্কের অবস্ত্র।

আমার কেন একটা খবর কিলনা মামী?

মামী চুপ ক'রে রইল।

তাৎপের কথা বুকে মনে ছিল না?

মামী বলে, তা নয়, কিন্তু খবর বিবে মনে কি হোত!

বা হবার তা তো হয়েই গেল। দানীকে চৌকিরে রাখলাম,
কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না! তোমার
মেজ আমার কাছে তোমার কথাও সব শুনলাম, আমার



ভীষণ নিরে তোমার আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা হ'ল না।
জানিত, একটা ধবর মিলাই তুমি ভুটে আসবে।

চুপ ক'রে বইলাম। বলবার কি আছে? কি নিয়েই
বা অন্তিমান করব? ধবরের কাগজে হতীন আমার নাম
শ'ড়ে একটা চিঠি গিবেই তো আমার কর্তব্য শেষ করে-
ছিলাম।

মামী বলে, কি করছ এখন ভায়ে?

চাকরী। এখন তুমি থাক কোথায়?

মামী বলে, একটু পরেই বুসবে। ছেলে পিলে কটি?

আন্দাজ। জগতে এত প্রশ্ন থাকতে এই প্রশ্নটাই
দুশ্বরের আগে মামীর মনে জেগে উঠল।

বললাম, একটা ছেলে।

ভারি টাঙ্কে কব্জে আমার ভাইয়ের খোকাকে দেখে
আসতে। দেখাবে একবার? তার মত হয়েছে?
তোমার মত, না তার মার মত? কত বড় হয়েছে?

বললাম, তিন বছর চলেছে। চলল আমারে বড়।
মামী, বাকী প্রশ্নগুলির জবাব নিজের চোখেই দেখে
আসবে?

মামী হেসে বলে, গিরে যদি আর না নড়ি?

বললাম, তেমন ভাগ্য কি হবে! কিন্তু সত্যি কোথায়
চলেছ মামী? এখন থাক কোথায়?

মামী বলে, থাকি কোথায়। কোথায় থাকি, একটু পরে
বুসবে। ভাল কথা, সেই বাঁশীটা কি হ'ল ভায়ে?

এইখানে আছে।

এইখানে? এই গাড়িতে?

বললাম, হ্যাঁ। আমার ছোট বোন বাঁশীতে আসতে
গিয়েছিল। সে লিপেছিল বাঁশীটা নিয়ে যেতে। লম্বাই
নাকি গুনতে চেরেছিল।

মামী বলে, তুমি বাজাতে জান নাকি? বার করনা
লম্বাই বাঁশীটা—

ওপর থেকে বাঁশীর কেনটা পড়লাম। বাঁশীটা
বার কয়েকই মামী ব্যগ্র হতে টেনে নিয়ে এক গুটিতে
গোটান দিকে চেয়ে উঠল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে
হলে, বিয়ের পর এটাকে বন্ধ ব'লে এখন করেছিলাম,

হাফথানে এর চেয়ে বড় শত্রু আমার ছিল না, আর আমার
এটাকে পরম বন্ধ ব'লে মনে চলেছে। কি ভালই বাগতেন
এটাকে! শেষ তিনটা বছর বাঁশীটার কত ছটকট ক'রে
কাটিয়েছিলেন। আজ মনে চলেছে বাঁশী বাজান ছাড়তে
না বলিয়েই হুত ভাল হ'ত। বাঁশীর তেরের নিয়ে মনকে বরণ
করলে তবু শান্তিতে যেতে পারতেন। শেষ কটা বছর
এত মনকে ভোগ করতে হ'ত না।

বাঁশীর অংশগুলি দাগিয়ে মামী মুখে তুলল। পরক্ষণে
টোপের কমকমানি ছাপিয়ে চমৎকার বাঁশী বেতে উঠল।
পাক্সা গুটির হাতের স্পর্শ শেষে বাঁশী যেন প্রাণ পেয়ে
অপূর্ণ বেনামের সুতের ভাল বুন চলে।

আবার বিয়ের দীঘা উঠল না। এতো অল্প সাধনার
কাজ নয়। বার তার হাতে বাঁশীতো এমন অপূর্ণ কাড়া
কীদে না। মামীর চকু ধীরে ধীরে নিম্নীলিত হয়ে গেল।
তার দিকে চেয়ে ভাবানীপুরের একটা অতি ক্ষুদ্র বাড়ীর
প্রাঙ্গণের বজালোকে আলোকিত বারান্দার দেয়ালে ঠেস
দেয়া এক সুর-সাহকের সমাধিময় মূর্তির ছবি আমার মনে
জেগে উঠল।

মাকে লাভটা বছর কেটে গেছে। হতীন আমার যে
অপূর্ণ বাঁশীর সুর একদিন শুনেছিল। সে সুর মনের
তলে কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ অসহী মামীর বাঁশী
শুনে মনে হ'তে লাগল সেই হারিয়ে যাওয়া সুরগুলি যেন
ফিরে এসে আমার প্রাণে মৃদুগুঞ্জন শুরু ক'রে দিচ্ছে।

এক সময়ে বাঁশী থেমে গেল। মামীর একটা দীর্ঘ-
নিঃশ্বাস ক'রে গড়ল। আমারও।

কতক্ষণ শুধু হ'য়ে থেকে বললাম, মামী, এ কথাটাও তো
পোশন রেখেছিলে!

মামী বলে, বিয়ের পর লিপিয়েছিলেন। বাঁশী শিখবার
কি আগ্রহই তখন আমার ছিল! তারপর যেদিন
বুললাম বাঁশী আমার পর সেদিন থেকে আর ছুটিনি। আজ
কতকাল পরে বাজালাম। মনে করেছিল, বুঝি তুলে বেছি!

টোপ এসে একটা টেকনে পড়ল। মামী জানালা দিয়ে মুখ
বার ক'রে আলোর গায়ে দেখা টেকনের নামটা শ'ড়ে তেরের
বুণ চুকিয়ে ফেল, শেষে টোপের আঁচি মেয়ে ধাব তাগে।

পরের টেননে! কেন?

মামী বলে, আজ কত তারিখ, জান?

বহান, সত্তরই অষ্টাব।

মামী বলে, চার বছর আগে আজকের দিনে—বৃকতে শরত না তুমি?

মুহুর্তে সব বিনয়ের আলোর মত বৃক চ'রে গেল। ঠিক! চার বছর আগে এই সত্তরই অষ্টাব ঢাকা মেলে কলিনন চরেছিল। সেদিনও এমনি সময়ে এই ঢাকা মেলেটির মত সেই গাড়ীটা পত পত নির্ভিক্স অরোহীকে শলে শলে মুহুর্ত বিকে টেনে নিয়ে থাক্ছিল!

ব'লে উঠলাম, মামী!

মামী ছির দৃষ্টিতে আমায় বুকের বিকে চেয়ে থেকে বলে, সামনেই টেননের অগ্নি গুলিকে লাইনের দাগে কটিন মারির ওপর তিনি মুহুর্তখণ্ড ছটকট করেছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ঐ তাঁর বর্ণন করছে ঘাই। আমার কাছে আর কোন তাঁপের এন্ট্রিক্স মূল্য নেই!

ঠাং জানাবার কাছে ম'রে গিয়ে বাইরের বিকে অঙ্কণ বাড়িয়ে মামী ব'লে উঠল, ঐ ঐ ঐখানে! দেখতে পাচ্ছ না? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি দরবার ছটকট করতে করতে একটু বেগুনীতল স্পর্শের চক্কর বাগে চ'রে রয়েছেন। একটু মল, একটু কলের অন্তেই চরত!—উঃ মাগো, আমি তখন কোথায়!

চরতে বৃক টেকে মামী ভেতরে এসে ব'লে পড়ল।

ধীরে ধীরে গাড়ীখানা টেননের ভেতর ঢুকল।

বিছানানী! শুটবে আমি বহান, চল মামী, আমি

তোমার সঙ্গে যাব।

মামী বলে, না।

বললাম, এই রাতে তোমাকে একলা ঘেতে নিতে পানব না মামী।

মামীর চোখ জ'লে উঠল, চিঃ! তোমার তো বৃক্স অডার নেই চায়ে? আমি কি মজা নিয়ে দেখানে যেতে পারি? সেই নির্জন মাঠে সমস্ত রাত আমি উঁর সঙ্গে অতুতব করি, সেখানে কি তাউকে নিয়ে যাওয়া যায়! ঐখানেই বাতাসে যে তার শেষ নিশ্বাস রয়েছে! অনুভব চয়ে না—

গাড়ী গাড়ল।

বাণীটা তুলে নিয়ে মামী বল, এটা নিয়ে সেলাম চায়ে! এটার ওপর তোমার চেয়ে আমার দাবী বেশী।

দরজা খুলে অতীত মামী নে: আমি নিকাক চ'রে চেরে প্রচলাম।

আবার বাণী বাড়িয়ে গাড়ী ছাড়ল। খোলা দরজাটা একটা ককণ শব্দ ক'রে আড়কে বন্ধ চ'রে গেল।



কবি-প্রিয়া -

শ্রী প্রভাতকিরণ বসু

কবিরূপ	প্রিয়তমা কেমন হারা,	তারা	কি হেঁচ মনে এখনি ধারাই ?
বেশেনি	দারা তবু, শুধায় তারা—	কবিরূপ	নেপা কি সে ভাগ্য্য তব ?
আকাশের	আলোর মতন, রবির মতন ?		
বাতাসের	গতির মতন লক্ষ্যেরা ?	কবিরা	গানে যে গো বজ্রা আনে !
		গেমে হু	উজ্জ্বলিত মনে-প্রাণে !
তারা কি	সুন্দর মতন চাওরাব দোণে ?	হৃৎনে	বেশে সব প্রিয়া-ভরা !—
তারা কি	কণপ্রভা—মেঘের কোলে ?	তবে কি	প্রিয়া তাদের গাও জানে ?
কোতিলের	মাতাল গলার 'হৃৎ'র মতন		
কান্তনের	আন্তরিক্যে দার কি ব'লে ?	কবিরা	মাতাল হ'ল প্রেমে দারি,
		কি জানি	কেমন দারা সেই সে নারী !
	দারা তারা করকর ?	যেখানে	যত কণের আভা আছে,
	কিপ্রভের মরমর ?	গেল কি	একটি সুখের প্রভা হারি ?
	আধা, আলো অন্ধকারে		
	কপন কি গো পরপর ?	হবে কি	কবি-প্রিয়া যেমন তেমন ?
বে নারী	বেশি সলা চোখের পরে,	ভালো সে ?	ভালো ? তবু কেমন-কেমন ?
বিরাজে	এ সংসারের সকল দ্বারে,	লবারে	বাঁধতে পারে মাঝারি জোরে,
বে নারী	হাসে-কীদে হুখে-হুখে,	তারি দেই	চলার কলর আছেই এমন ?
নিজের	স্বার্থ নিয়ে বাঁচে মরে :—		
		তবু তার	রূপের আলো, গুণের আলো,
		তবু এক	কবির চোখেই লাগুক ভালো !
কবিরূপ	প্রিয়রা কি তেমন হবে ?	প্রিয়া যুব	স্বপ্নাবাসে ছায়ে-গানে
চল লব	গজলিকার প্রলয়-তবে ?	কবিরা,	দিকে দিকে লাগি ঢালো !

কথা-পুরাতনী

ঐচ্ছিক তনাপ ভট্টাচার্য্য

মরণের দ্বারা নিমজ্জিত অতিমি এই খাঁন লোকের অন্তর
আত্ম বৈশ্বক-স্বস্তির যে পবিত্র পুণকল্পেরে সুধাময় চট্টভেদে,
সঙ্গমর পাঠক-মহোৎসবদিকেরে তাহার বসনামাজ আভাস-
প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের দ্বারা উদ্দেশ্য।

এমোদিত সনাতন বর্ষ ভারতীয় চিত্র নর-নারীগণের
অস্তি-মজ্জাগত। “স্বঃ ব্রহ্মাণি” “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি
মতাবলম্বকঃ সত্যঃ সিদ্ধ সত্য।

অতি প্রাচীন সময় চইতে সপঞ্চমের চিত্র-সাধারণ ঐ
দর্শক অন্ত্যস্ত অখ্যাত তবু কতক আত্মবান্ হইয়া রহিয়াছে,
নিয়মিত বাণ্যারটি তাহার প্রতিরূপ-প্রদর্শক।

অন্য অর্ধশতাব্দী পূর্বে আমরা যখন অল্পবয়স্ক বালক
ছিলাম, তখন আমাদের গ্রামে এক শ্রেণীর ব্যক্তির দল মধ্যে
মধ্যে আসিত ও বিবিধ ঐচ্ছিক কৌতুক দেখাটাই
অধোপাখ্যান করিত। ক্রীড়াগোষ্ঠের পক্ষে তাহারা
“আত্মগায়ক সুরকারের ভাবের বো” এই কথাগুলি বাহ্যিক
উদ্দেশ্যেরে আশ্রিত করিত। উত্তরকালে আমার জনৈক
বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, কথাগুলি নিরর্থক শব্দসমষ্টি মাত্র
নহে, ঐগুলি একটি মন্তব্য; ঐ মন্তব্যের উচ্চারণ দ্বারা ব্যক্তকর
“আত্মগায়ক” অর্থাৎ পক্ষিগণকর করিয়া থাকে।

এখন এই অস্তিত্ব বহলে উক্ত “আত্মগায়ক” পক্ষের যে অর্থ
উপলব্ধি করিয়াছি, পাঠকগণকে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।
আত্মগায়ক সুরকার স্বঃ ভাবাচ্ছাঃ আর ভাষার ভাববৎ
(ভাবের বো) সেরেস্তার-লংঘ্য। সেরেস্তার-লংঘ্যে অস্ব-
প্রভাভ, মায়া; এই মায়া নিরাকৃত হইলে আত্মচৈতন্যের
অবস্থায় কল্পে। আত্মা বা স্রষ্টব্যঃ স্রোতব্যো মন্তব্যঃ
নিদিষ্টাণিভবাঃ সৈমন্তব্যোমন্তব্যঃ স্বঃ স্রষ্টে স্রষ্টে মতে বিজ্ঞাতে
ইহাঃ সক্ষঃ বিদিতঃ।

যোগী বাজবজা।

আত্মাই স্রষ্টব্যঃ, স্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, স্বঃ স্রষ্টব্যঃ, স্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ।
আত্মা স্রষ্টে, স্রষ্ট, স্রোত হইলে নিদিষ্ট-স্রষ্ট অঙ্গতঃ স্রষ্টব্যঃ গায়।

দেশের স্রষ্ট আত্মার স্রষ্টক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিব
কথা-কুশল কৌতুক-প্রদর্শক যেন স্রষ্টব্যঃ বিজ্ঞানিত
করেন এবং বিজ্ঞানবিজ্ঞান দর্শকগণকে স্রষ্টব্যঃ করেন।
এই অবস্থার নিপুণ ব্যক্তকর স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টে যে স্রষ্টক কৌতুক
প্রদর্শন করেন, স্রষ্টব্যঃ জনগণ সে সমস্ত স্রষ্টব্যঃ বিজ্ঞান
করিতে বাধ্য হয়।

যদি স্রষ্টব্যঃ পুণক ক্রীড়া চিহ্ন বিজ্ঞানঃ স্রষ্টব্যঃ।

অত্মনৈব স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

যোগী-বাগিষ্ঠা—১-৩

আপনাকে সেরেস্তারের অস্তিত্ব সত্য অল্পভব করিবঃ
চিত্রবৎ স্রষ্টব্যঃ করিয়া স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।
স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

ঐচ্ছিক উপলব্ধি স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।
স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।
স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

ঐচ্ছিক—১-৩-৩২

বাগীকরেরা সাধারণতঃ ইতর স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।
নিয়মেরে স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।
স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।
স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ স্রষ্টব্যঃ।

ঐচ্ছিক ১৫-১১



ঘোষণা পূৰ্ণক পৰৱৰ্তী আত্মকে দৰ্শন কৰিঃ
থাকেন, কলুৰি চ-চিত্ত মূঢ়োঃ চেষ্টা কৰিগাওঁ উদ্ধাৰক বোম্বাঃ
পায় না।

কৌৰৱ হুধ-ওংব ভেজুইই সংলাপিত। মানব আশনাঃ
হুধ-ওংব অতঃ অ'নন্দময় সত্তা উপলব্ধি কৰিতে পাবলৈ
সংলাপেৰে অৰ্গাং বিশ্বমাধ্যম হস্ত চইতে চিত্ততঃ পৰিতাপ
গাভ কৰে।

কবঃ প্ৰদ্যোময় চাক্তঃ চৰঃ।

কবিত্বানিবাসিত দেব একঃ চ।

তত্ত্বাভিধানানং যোজন্যং তত্ভাৱং।

• ভূতচাত্ত্ব বিশ্বমাধ্যমিত্তিঃ

বৈভাৱতত্ত্বোপনিষৎ ১-১*

ভোক্তব্যাকী চইতে অামনা এই এক পৰম উপায়েৰ পিকা
লাভ কৰি নে, বৈদ্যমিত্তে মমত্ব-বুদ্ধি পৰিহাৰপূৰ্ণক অামনা
ভুক্তিলাভ কৰিতে ও অমৰয়েৰ অধিকাৰী চইতে পাব।

তমেব বিদিত্বা অতি মূঢ়া মেতি।

মাতঃ পৰা বিজ্ঞতে অধনাঃ।

বৈভাৱতত্ত্বোপনিষৎ ৩-৮।

কাজেৰ লোক

শ্ৰীনিবৃত্তমোহন সামন্ত

পানী খান গেৰে বলে, "তন মোৰ বহ।"

কাজেৰ মাতৃব বলে, "নেই অকল।"

কল বলে, "চেৰে বেৰ ছুটেছি কেন।"

কাজেৰ মাতৃব বলে, "গাং প্ৰাণে তন।"

মনী বলে, "ভীৰে ব'লে শোন গাই।"

কাজেৰ মাতৃব বলে, "অকল নাই।"

পুনিমাত্ৰ টাব বলে, "প্ৰলীপ নিভাও।"

কাজেৰ মাতৃব বলে, "কাজ আছে, বাঙ।"

প্ৰেম বলে, "এদো দৌৰে বসি পানাপানি।"

কাজেৰ মাতৃব বলে, "দুঃ সৰ্জনাই।"

মুত্ৰা এদো অবশেষে খাৰ তাব হৈলে,

চলিল কাজেৰ লোক কাজৰ্ণ কেনে।

"এ বিব অকলে এলি কলা!" কবি কৰ,

"চাৰ, চাৰ, কিনা কাজে কাটালি সময়।"

শ্রীমদীপকুমার রায়

বন্দী পাহাড়,

বন্দীশূন্য

২৭-১-২৮

তাই স্মৃতি,

হঠাৎ আমার কাছ থেকে বহুদিন ধরে একটা বড় চিঠি পেয়ে চমক ভূমি আশ্চর্য্য হব। কিন্তু যেহেতু আজ বড়-চিঠি-লিখব বড়-চিঠি-লিখব গোছের মনটা করছে, সেহেতু আমি লিখবই, তা তোমার বড় চিঠি পড়ার সময় থাক বা না থাক। বড় চিঠি লেখার এ প্রক্রিয়াকে ইচ্ছে কেন যে আমার মনের মধ্যে ঠিক আজই দেখা দিল জানি না। হয়ত অনেকদিন ধরে একাবিক্রমে উড়ু-উড়ু বা ভ্রাম্যমাণ হ'লে মনটা চিঠির নিগড়ে থাকা দিতে একটু ব্যস্ত হ'য়েই ওঠে, কিন্তু যে কারণ নিয়ে লেখণ্য এখন থাকুক। আমি ভেবেছিলাম যে আবহায্যে ও একেবারে অভ্যাগাতিতে আমার মরতে ধ'বে গেছে, তোমার যেমন গেছে। কিন্তু আজ এ শৈলশিখরে স্থানীয় হ'য়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে স্বভাব না দায় ম'লে। তুমি হয়ত ভিজালা করবে যে বড় চিঠি লেখার স্বভাবটা। তোমার তা হ'লে বেঁচে থাকতে থাকতেই বা গেল কি ক'রে? তার উত্তর—তোমাকে যে বেশোড়ার করতে হচ্ছে—আমার মতন উড়ো ভ্রমণের মধ্যে থেকে সমগ্রক কোনো মতে বঁচ করতে ত হচ্ছে না। কিন্তু তবু জেল থেকে তুমি বড় চিঠি লেখার অভ্যাগাতি সন্তের অশ্রুধাক্তে আবার একটু একটু মল্ল ক'রে নিচ্ছিলে—এমন সময়ে কর্তৃপক্ষগণ ঠিক করলেন যে এ একেবারে কাছটিতে তোমাকে বাপুত না রেখে আবার বেশোড়ার-তপ অস্তর থেকে-কনক-মোষ-তাড়ানো কাজে জুড়ে দেওয়াই ঠিক। তুমিও চিঠি পত্র লেখা ছেড়ে দিয়ে বেশোড়ারের বেশোড়ারে লেগে লেগে—সকলব্যবস্থা ক'লা জুলে “সুগাথ, বেশোড়ার করতে থেয়ো না, কেন অনর্থক জেলে যাবে?”

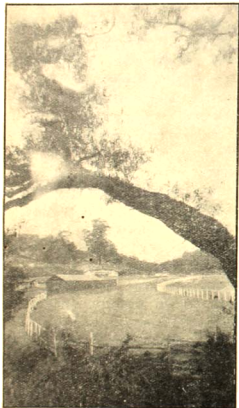
—কিশোর বধন দেশ উড়ার হ'তে চাই না, ও দেশের মধ্যে বিভিন্ন বল কাজের চেয়ে কমলচেতাই বেশি রস পায়। তুমি একা কি করবে বল?—তবু ধোঁষ ওর সব চেয়ে বড় গরজ এই রকম আবহুটাকট কিছু একটারই পথক! আমার লে গরজ নেই। তাই তুমি প্রাণপণে খাঁটি ও বক্তৃতা ও নানা গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত, আর আমি ভ্রমণ-সুখালতে গিমিভ্রমণের হ'য়ে দীর্ঘ চিঠি লেখা-তপ একেবারে কাজে রত। কেবল আমার আমার “ঐক্য”—বন্ধুর মধ্যে একা আমিই একেবারে ত'রে-গলমে, তুমি ও ফিটলি মিলে কর্ণে গা ভেলে।

কিন্তু এই স্থখনিলা হরিৎ-সমুদ্র শৈলশিখরের পাখাবাসে ব'লে মনের মধ্যে আজ নানা রকম ভাবাবেশ মালম্ভের আলোড়নে মনের তলানি ভেদ ক'রে উঠে লেখণীর মুখে ধরা দিতে চাচ্ছে—জানাবীর চরপাখাতে পুত'রদীর কল'ল-প-উজিত বৃষ্টিধের মতনই। তাই মনে করলাম কলম ধ'রে একবার দেখাই থাক না—কিশোর বধন বাইরে যেখের যেহুজ্জ্বাল মনটার সব্বাও ঘোঁরালা হ'য়ে এসেছে ও গাছের পাতার মধ্যে বিরে বাতাসের মর্দবধনি মনটাকে আরো সজীব গোছের নেপার মনো ফেলে দিচ্ছে। তাই বিজ্ঞ মনটি বলছে যে এ সময়ের চিঠি লেখার মাধ্যমকর্মে উচ্চমনোস্থ প্রাণটাকে একটু বরাবামের দিকে দাবিয়ে বরাবর ছোঁর মধ্যে আনব আছে; যেহেতু এ-প্রাণের মধ্যে আছে ছোট্ট প্রবণতার টাপ-জ্বক-ওয়ার—একটা মস্তরপতিতে পা এলিয়ে দিয়ে হেসে চলা; আর একটা এ-ভেদে-চলার মধ্যে থেকে থেকে মাঝা জুলে মালম্ভাশের তাঁর-একটু থবর নেওয়ার বাসনা; এবং সব প্রাণের মধ্যেই একটা-না একটা সার্থকতা আছে।

তুমি হয়ত বলবে—যদি তুমি না-ও বল জটরলাল নেচক নিকটই বলবেন—এরকম দিব্যাস্থ দেখলে চলবে না, ওগা,



তাপ নবে ভারত সন্তান, নটলে—ইতগদি। সামান্য
চণ্ডাটা একটা মন্থ বিলাস সংকীর্ণ নেই—কাভেই শুভা
চক্ষে সমস্তের নিভৃত অঙ্গবাদ, একবারে “পূজারী” প্রবণতা।
এ লব্ধে চুড়ান্তে তথা ক’দিন হ’রে মনের মধ্যে ভারি গচ্ছ



উটকামণ্ডের রেঙ্গুণ

গচ্ছ ক’রে বেড়াচ্ছে। সেগুলো গুলে না কল্লে
বোধ হয় তাদের অপর্যায় প্রত্যাশার অন্তর্যয়ন হবে
না। তাই প্রেমের দময়ের ওপর একটু অত্যাচার করা
যাচ্ছে।

তুমি জান যে সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ভারি একটা
গোণকাল চলছে ও ত ভিনটে ট্রেন বর্ষখটীয়া লগ্ন করছে।
লিলুয়ার মতনই ট্রাইক্ করছে এদের রেলের প্রমিকণ ;
এবং কতদিন যে বর্ষখট চলবে বলা যাচ্ছে না। ফলে
উটকামণ্ড থেকে ট্রেনে আসা হ’ল না—মোটরবাগে ক’রে
মহাপুর হ’রে বাঙ্গালোর আসতে হোল। বাগতে না আসতে
৫ ভিনটে গাড়ী লগ্নম—বেগভক্ত। কতলোক যে যারা
গেছে কেউ জানে না এখনো। মনটা তাই একটু উবিয়
যাচ্ছে।

লগ্নম প্রমিকণের ঢাকলা। উটকামণ্ডে একটা
বাঙালি মহিলার সঙ্গে আলপ হ’ল। তিনি একজন
মাত্রাজী জমিদারকে বিবাহ করেছেন। তিনি বলছিলেন
বর্ষখটকারীদের চেষ্টার একবার একটা ট্রেন উপটে যায় ও
হবি ত’ হ’ সেই ট্রেনেই তিনি ও তাঁর স্বামী ছিলেন।
তারপর থেকে তিনি ট্রাইক-ব্রপ লিলু র মেঘের ছায়াপাতি
হ’লেও ডিরিও ওঠেন।

বেলুড়ের দুর্ধটনার কথাও কাগজে পড়লাম।
তারপরই এখানে একটা নর, দুটো নর, তিন তিনটে
দুর্ধটনা। এতে সামান্যগেরও ভাবনা আগে।

আমি এখানে, অর্থাৎ বাঙ্গালোরে, আমার একটা
ইংরাজ বন্ধুর অতিথি। তিনি সেদিন কবায় কবায়
বলছিলেন যে শুধু এভাবে লোকজনের প্রাণহরণ করে যে
সমাজের কোনো স্বার্থী হিত সাধিত হবে একবার আস্থা
স্থাপন করা কর্তন; ইংলেণ্ডে অনেকেরই আজকাল তাই
বলেন যে তাঁরা প্রমিকণের আদর্শ গছন করেন, কিন্তু
প্রমিকমণকে করেন না।

সেদিন পড়ছিলেন একজন চিন্তাবীল লেখকের লেখা।
তিনি বলছেন যে যেহেতু বর্তমান সমাজে মাদ্রবী শক্তির
বিশূণ অশরৎ হচ্ছে সেহেতু সকলেই স্বীকার করছেন
আজকাল যে সমাজব্যবস্থার একটা গভীর পরিবর্তন সাধিত
হওয়া অগতঃ হ’রে পড়েছে। কিন্তু একটা কথা ট্রিক্,

যে শুধু বেশরোয়া, নিরপেক্ষ ভাষায় যথো দিবেই একটা কিছু গ'ড়ে উঠবে না। সমাজে কোনো স্তম্ভ পরিবর্তন ঘটিত করতে হ'লে সব আগে চাই সত্যের পরীক্ষা, আন্তরিক চেষ্টা ও অঙ্গসংখ্যক বুদ্ধিমান লোককেই প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব। তিনি dictatorship of the proletariat এর বিধাণ করতে পারছেন না। বলছেন কখনো সর্বোচ্চ প্রলেটারিয়েটকেই কর্তব্য শুধু বাজে ফোঁপ ফোঁপ—সেখানে সত্য বা কিছু হচ্ছে সে হচ্ছে চিরকালকার মতনই—ঐ জনকল্লের মাত্র বুদ্ধিমান গঠন-মনীষীর প্রচেষ্টায়। তিনি বলছেন, একটা কথা বুঝবার আশ্রয় সময় এসেছে ও সেটা এই যে একত্বধর্মের ও চিন্তাশৈলীর আবেগ দিয়ে বড় কিছু গ'ড়ে তোলা যায় না, ও অল্প প্রলেটারিয়েটরা শুধু পালি দেওয়া ও খাল করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। জগতে সৃষ্টি বা কিছু হয়েছে তা সবই অঙ্গসংখ্যক মানুষের বুদ্ধি ও আগ্রহের পরিপ্রসবে হয়েছে। অস্তিত্ব অত অবাধ ইতিহাস এই কথাই বলে।

কথাটার মধ্যে সবটুকু সত্য না হোক অনেকটা সত্য আছে মনে হয়।

ব্যক্তিগত দিক দিয়ার করেকটা কথা কাল সত্যাবোধে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুর্জোয়া ব'লে আজকাল যে একটা কথা উঠেছে, সে কথাটা বড় বিপজ্জনক। কেননা কথা তিনিবটা এখন একটা লেবেল হ'য়ে ঝাঁড়ার তখন তার মোর বড় প্রবল হ'য়ে ওঠে ও সে মোহের ফলে মানুষ বড় বোণ সহজে সব-কিছুই লম্বা একটা রাস দিয়ে বাগা হ'য়ে ওঠে, ভাবতে চায় না। কেন না ভাবা শক্ত, রাস বেওয়া সহজ।

আজকালকার প্রমিততমীয়া তাই অত্যন্ত অমানববদনে থাকিছু বুর্জোয়া তাকেই হেঁচ ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। কখনো আজকাল প্রলেটারিয়েট কবিতা বলছেন শেক্সপীর, গেটে, দাঁকে, রবীন্দ্রনাথ—সব হচ্ছেন তৃতীয় শ্রেণীর কবি—যেহেতু তাদের সৃষ্টির ওপর মাকি বুর্জোয়া ছাপটি অত্যন্ত শক্ত। আজকাল সেখানকার কবিতা পড়িই কারো লিখছেন, "বুর্জোয়াদের মাথার পুলি ভাঙে, তাদের মস্তিষ্কে জেলের ডালে পরিণত হয়, "সবাইকে গুলি কর—"

ইত্যাদি *। শুধু তাই নয় তাদের আটকিয়া এই যে এট রক্তমাংসের হাড়ে আলগলি বড় কাবা; তবে আমরা যে মাজ ও শেক্সপীর প্রত্যয়কে শব্দক কবি সে কেবল আমাদের চমকোত্তর বুর্জোয়া বনোত্তরের মকল। কাল এই নিয়ে নানা কথাই মনে হোলোপাড় করছিল। মনে হচ্ছিল, হঠাত আমরা নিজেরা বুর্জোয়া ব'লেই নিজেদের সৃষ্টি প্রতিভাকে একটু বেশি বড় ক'রে দেখে থাকি। হঠাত প্রলেটারিয়েট সৃষ্টির মধ্যে এমন সত্যিকার বড় কিছু দেখা দিতে পারে বা নতুন ও ভাবের প্রেরণা উদ্ভূত। এ সব সম্ভাবনার সার দিয়ে আপত্তি নেই,—কিন্তু তাই ব'লে শুধু বুর্জোয়া হওয়ার মকলই শেক্সপীর প্রত্যয় যে অবজ্ঞার একবার সার দেওয়া কঠিন—শুধু এইটুকুই আমায় বললো।

মনে প্রায় ভাগছিল বুর্জোয়া সত্যতা কি মানুষের কাছে একটা মত সত্যের অভাব বহন ক'রে এমন দেয়নি—যেটা গুটী হ'লে না উঠলে প্রতিক্রিয়া কখনো জাগতে পারত না?

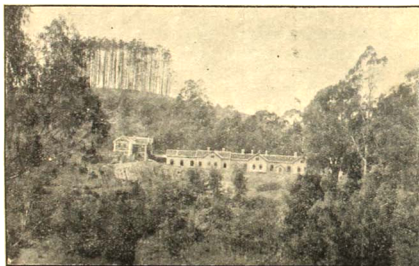
নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি সে সত্য? উত্তর এল—সে সত্যটা হচ্ছে এই যে মানুষের গোঁব ও গুচ্ছতা শুধু বাটার নয়—সৃষ্টিতে, ও সে সৃষ্টি বিকশিত হ'তে পারে কেবল অবজ্ঞার স্নিহোযোগে। এখন, একথা মনে মনে নেওয়া যায় তাহ'লে মানতেই হবে যে ও অবজ্ঞার অধিকাংশ মানুষকে না হোক অনেক মানুষকে দিয়েছে—এই বুর্জোয়া সত্যতা। সত্যতা আজ যে সকলেই এই অবজ্ঞার পেতে চাচ্ছে ও পেয়ে সত্য মস্তজবে গরীমান হ'বার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেছে সেটার মূল কারণ বলা যেতে পারে—বুর্জোয়াদের এই অবজ্ঞাত সৃষ্টিরই দৃষ্টান্ত। মেটারলিচ কোথায় বলেছেন যে আমাদের—অর্থাৎ বুর্জোয়াদের—একটা মত দাঁড়ি হচ্ছে এই যে আমাদেরই সত্য সত্যতা ও বৈষম্যের পত্যাকাবাধী হ'তে হবে, কাজেই যদি আমরা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে টগঠের মতন প্রমিততমের দাঁড়িত্রাক্ষক বরণ করি তাহ'লে মানুষ কখনো উঠবে না।

* Rene Fülöp Miller প্রণীত 'The mind and Face of Bolshevism' ব'লে বইখানিতে এসব কবিতার কাব্যের মূল্য হ্রাস।
উপস্থাপিত গ্রন্থে Eucken, Wells, Thomas Mann, Russell, Holland প্রভৃতি লোকের দ্বারাও প্রমাণিত হ'বে



কণার মধ্যে গার আছে মনে হয়। প্রমিক্তাও মাহুৎ এ সত্যও যেমন আমাদের স্বীকার করবার সময় এসেছে তেমনি এ সত্যমুখেও তাদের সচেতন হবার সময় এসেছে যে বুর্জোয়া সমাজের “বিষধর সাপ” (Viper) মত নয়। তাদের বৈতরার সময় এসেছে যে বুর্জোয়া দুর্ভাগ্য প্রতাপ করেছিল বলেই তারা আজ অবসর ও স্বাধিকার লাভী করতে পারছে, এবং বুর্জোয়াদের উত্তর না চ'লে এত বেশি সংখ্যক লোক কখনোই এক

সেদিন লিখেছেন যে আমেরিকায় (যেখানে প্রমিক্তা সব চেয়ে ভাল থাকে, দেখানে) তারা অবসরের নিয়োগ করে শুধু নেচে ও বাজি সিনেমা দেখে। কিন্তু তাই বলে কি গভাই বলতে হবে, “ওদের অবসর দিয়ে কি হবে— যখন অবসরের লম্বাবহার তারা জানে না?” হাজলি মহোদয়ের মনে এ প্রশ্নটি তেগেছে বলেই এ কণার উল্লেখ করলাম। মাহুৎয়ের মধ্যে সর্বদশে ও সর্বকালেই তক্তির চাইতে কীটন বেশি হয়ে এসেছে তার আর



উটনাকের দৃশ্য

শীত এ সত্যটি বিখ্যাত না যে man does not live by bread alone.

মানি যে বুর্জোয়াদের মধ্যেও অধিকাংশই তাদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয় নি। কিন্তু তার মধ্যে দায়ী শুধু কি তাদের বুর্জোয়া? তাহ'লে, তা' বলতে হয় যে বুর্জোয়ে আজকাল প্রমিক্তাদের মধ্যে যে ঈর্ষা ঘে, কুটিলতা ও নীচতা দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে দায়ী তাদের “প্রমিক্তা”? আলস কথা মাহুৎয়ের মধ্যে অধিকাংশই সুখপ্রিয়, অলস ও দায়িত্বজানহীন। কি করা যাবে? আলসুল হাজলি

কি করা যাবে! সে যোয তক্তিরও নয় কীটনেরও নয়— সে যোয মাহুৎয়ের মধ্যে অধিকাংশের অসারতার।

কাল মাহুৎয়ের অসারতার এ নিদান মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল অনেক কথা। মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশের প্রমিক্তা বুর্জোয়ের দেখাবোধ দতই কেননা বাইবীফোট কক্ক, সুযোগ পেলেই যে তাদের মধ্যে আঁকে থাকে হত্যাকাণ্ড, মহরগাল, শঙ্কটের সম্মুখীন এ আশা চরান। বুর্জোয়াদের মধ্যেও যখন মাহুৎ সংখ্যক মাহুৎ আজ তাদের সত্য দায়িত্বের প্রতি সচেতন,

প্রমিষ্টদের মধ্যেও তবিলতে হিচ্ তাই হবে। কাজেই কেবল এইটুকুর বেশি ভোর ক'রে বণা চলে, না যে তাদের মধ্যে সুযোগ পেলে ধরা সত্যিকার মানুষ হ'তে পারত, শুধু তাদের খাতিরেই সকলকে মাহুয হবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এ সুযোগ দেবার সময় যদি আমরা এ আশা পোষণ করি যে তা'পেলেই তারা জীবনের নিগুঢ় উপলব্ধির স্বভেদে দলে দলে বাগা চ'রে উঠবে তা হ'লে সে আশা প্রকৃতির পরিত্রাসে ঢুকিয়ে খুণোয় লুটোবেই লুটোবে। অতঃ "অদূর ভবিষ্যতে" অধিকাংশ মাহুয যে সত্যিকার সত্যতা লব্ধকে সত্য হ'য়ে উঠবে না এটা ঠিক—"অদূর ভবিষ্যতে" খাতি হোক না কেন।

তোমার এত বড় চিঠি লিখব ভাবিনি। ভেবেছিলাম আমার ভ্রমণ লব্ধকে এ চিঠিতে চুটোরটে কথা জানাব। কিন্তু মাহুয ভাবে এক হর আর।

কেন এত কথা লিখলাম জানে? আমার ব্যাখ্যাটা শোন তা হ'লে। কদিন থেকে নানা স্বল্প প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের মধ্যে ছাড়া গেরে ঘনটা বেশ বিকশিত হয়ে উঠেছে ও মনে হচ্ছে যে আমাদের সমাজ অনেকেরই আমার মতন একটু আটুটু ভ্রাম্যমাণ হওয়ার সুযোগ দিলে কাকটা নেহাৎ মদ্য করত না। অতঃ এ ভাব-বিস্তারিতের স্বভেদে কোতও গাণে এবং মাহুয শুধু কোত নিয়ে ঘর করতে পারে না, খানিকটা আটপোরে আশ্ব-সম্মানও তার লব্ধ একান্ত আবশ্যক। তাই নিজের raison d'être অশিষ্ট আশ্বদমর্ষন বৃদ্ধিতে বাগা হ'লাম। মাহুয এমনি ক'রেই লাকাই গায় ও নানা স্বল্প জীবনের বিশালিক গ'ড়ে তোলে বোধহয়।

কিন্তু এ বিশালিকের মধ্যে আশ্বপ্রবন্ধনার উপাধান খানিকটা থাকলেও খানিকটা সত্যও যে আছে একথা আশা করি তুমি স্বীকার করবে না। সেদিন একজন বড় লেখকের লেখার একমাত্রাণ্য পড়ছিলাম:—Success, power, wealth—those aims of profiteers and premiers, pedagogues and palemoniacs, of all, in fact who could not see

God in a dew-drop, hear him in distant goat-bells, and scent* him in a pepper tree—had always appeared to me as akin to dry-rot. (গলন্দগার্দি)

কাল লঙ্কার দূর স্বর্গান্তের রঞ্জিত মেঘানোকে মনে চঞ্চল যে প্রতি সত্যতাও এ স্বল্প স্বল্প উপলব্ধি যদি এক মাধবনের মধ্যে ছুটে গুটে তব তাত্ত্বিক ক'রে তার অনেক অসঙ্গততারও মস্ত কতিপয় লে। মানবজন্মের নানান অসুখের অসুখ, নানান ললিতরাগের স্বল্পরাগ, নানান অগছারা অগছাণো আবেগের সমগ্র, নানান ধরা-ছোঁয়া-গার-না-এমন আশাবিস্তারের ইচ্ছাশ্রবণ, জীবনের তদু অতিথিতে নানান ব্রহ্মতত্ত্ব—এসবের মধ্যেই কোথায় একটা স্পষ্ট সার্থকতার রেশ নিহিত। যে-সুহৃৎ মাহুয এমন একটা অসুখের পরল লায় সে "নাভিনন্দিত মরণ নাভিনন্দেও জীবিতম্। কালমেঘ প্রত্যেকের নির্দেশম্ ভ্রাতাকো বণা।" (মহৎকণ্ডে অতিনন্দন করবে না, জীবনকেও না; শুধু অগল্গা ক'রে থাকবে ভাস্কর কণ্ডে—যেমন ভ্রাতা থাকে) যে-সুহৃৎ সে তার আশ্ব-পাণের মাহুযকে একটা অশ্লীল সুখানীপ্ত ভাবরুদ্ধতার লসান বহন ক'রে এনে ঘের ও মাহুয তার জীবন ছেড়ে খানিক পরিমাণে দেবত্বের কোঠায় গুটে। পরন্তুত্বকে মাত্র যে স্বল্প বাগলাদেশে অতিনন্দন দিচ্ছে তার ভিতরকার কথাটাও ত এই যে আমরা বলতে চাচ্ছি—"হে শিল্পী, তুমি যে আমাদের জীবনের শত রানির সানিমার খানিকের মারেও লুকনের অসুখ, সমবেদনার তৃপ্তি, স্বল্প কাককাপোরে লাবণ্য বহন ক'বে এনে দিচ্ছে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে তার লগ্নে আমাদের অসুখবলগত সন্মুখের হচ্ছে।"

নর কি? কাজেই (এখন নিজের লাকাইয়ে কিংবা জাতি আমি যদি স্বীকৃত ও ভাববিস্তারিতের চোঁরা একটা গুচ্ছ-বলে চাড়া দিয়ে আশ্বার আলস্তের সমর্থন একটু পুঁজিতেই যাই তাতে তোমরা একটু ককণার হাসি হাসো ত হোলে কিংবা দোহাই, মুখ ফিরিও না, বা আমি যে এ বাড়া মাকাজ, ভাঙের, ভিড়িনপটী, মাহুয, পণ্ডপণ্ড, লেখক, উটাকার্মও যাকালোর, নন্দীপাহাড়, মহীপুত্র, বাঘছাণ্ড, মলিনপুত্র



প্রতি বৃন্দ চরকীর মতন ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে বেড়াছি তার কত
আক্ষেপ কোর না। অশ্লিষ্ট—তোমরা যেখানেই নিরত
আছ তেবে সময়ে সময়ে আমারও যে বিবেক সংশয় হয়
একথা অবিশ্যাক্ষর না।

কিন্তু এবার যতটুকু বলা যাবে একটু ভ্রমবৃত্তান্ত নিয়ে
উঠে পড়ি নাগি।

প্রাকৃতিক দূরের দিক দিয়ে সব চেয়ে ভাল লাগল
উটাকাহাও। এমন সবুজের আগুন সেখানে এখন সেগেই
আছে যে আমার কেবল মনে হ'ত তোমার ছোর ক'রে
হ'লে নিয়ে আসতে পারলে কাজটা হ'ত চমৎকার। কিন্তু
বিলেতে তোমাকে তোমার বেশোছার-স্বপ্ন-মহৎমনটাকে যদি
বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে-শোভা-গের নিখরী আলতপরাধতার
দিকে সময়ে সময়ে ফেরাতে পারতাম—এখানে তা হ'লে
উঠেছে—কেন অসম্ভব, যদিও আমি চেষ্টার কুটি করিনি।
কিছুপাশে গেলি ঠিকই বনছিল যে তোমার পক্ষে কোনো
কিছু উপভোগ করা সুবিধা—তোমার কেবল মনকাণ হ'তে
থাকবে—এমনটা যে পরিমাণে মীটি: করা যেত বেশোছারের
বিনটা সেই পরিমাণেই এগিয়ে আসত তবু বিলেতে
তোমাকে ডাকিগায়ার, লুতাগায়ার প্রকৃতি স্থানে টেনে নিয়ে
বাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখানে?—হায়, তুমি হেলে বলতে
চাও "তে হি নো বিদ্যা পত্যা।"

কিন্তু আমার "তে বিদ্যা" এখনো "পত্যা" নয়,
বিদ্যাতাকে পরোয়ায়। "পত্যা" হ'তে হয়ত সে চাইত।
কিন্তু বিবেক-প্রভুটিকে একটু আঘাত আসল যেওয়া চললেও
বেশি আমল সেওয়াটা যে কিছু নয় এ বিদ্যা আমার
আজকের নয় তুমি জানো।—এমন কি বেশোছারের
খাতিয়েও নয়—তা তুমি হতই রাগ কর না কেন একথা
জনে। তাই শোনো একটু উটাকাহাওর ও নখীশেগের
কথা। প্রথম লিখলে ত পড়বে না—কিন্তু
চিঠিটা অন্তত পড়তেই হবে—স্বযোগ পাওয়া গেছে
মুখ নয়।

তুমি যদি কখনো বেশোছার ফাঙ্কর মধ্যে একটু
ফুসল পাও ত বোঝে উটাকাহাও একবার।

সেখানে আমার সবুজের শোভা যেনে প্রায়ই মনে
হ'ত শ্রেষ্ঠ সেই দৃষ্টান্তটি:—"The emerald green of
leaf-enchanter beams।"

কী ক্ষতিকর মতন বকবক সবুজ! বোধ হয় বর্ষার
সময় হ'লেই এত সবুজ হয়েছিল! এমন সবুজের মেলা দেখতে
শাওয়াটা একটা সোভাগ্য সৃষ্টি। নিছক সবুজ রঙের বাহার
যে আমাদের মনকে কুড়টা উত্তলা করতে পারে তার
পরিচয় পেতে হ'লে একবার উটাকাহাও বাওয়া ভাল।
সাধ কি "কিরণমালা পত্রিকা" হ'ল?

তার ওপর কী দীর্ঘাকৃতি গাছের শোভা! কী সুগারি,
সেবদারু পাইন প্রভৃতির ঘন নিছকের মনোহারিণি! আর
কী সে স্বচ্ছতা তৃপ্তি।

বহুত উটির বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় এইখানে। এত
অপর্ণাপূর্ণ গছ ও লতা গাছ বোধ হয় আর কোথাও দেখিনি।
আর সে সব গাছের মধ্যে কত শাখাই যে "স্বকবানরা"
সে কি বলব! বিলেতের weeping willow গাছ মনে
পড়ে? এখানে সে রকম সবুজ অক্ষত-লম্বিত গাছ
অজ্ঞ।

কেবল এ সময়ে উটির আকাশ খুব সদর নু—এই
বা উৎখ। সারাদিনই মেঘে ঢাকা। কালিঘাসের "বগ্নভাড়া-
পরিণত পঙ্কজ" বাহার সমতলভূমিতে লাগে ভাল—কিন্তু
শৈলশিখর এই নন্দীপাহাড়ের মতন মেঘদূক হ'লেই বেশ
মনোমগ্ন হয়। হয়ত তুমি বলবে তা হ'লে শাপেনাস্ত্রাগমিত
মহিমা যকের কাছে রানসিহির মেঘমালা কেমন ক'রে এত
গ্রন্থ হ'লে উঠেছিল? উত্তর—ভাব যে, সে "কামরূপ
মহাবানের" কাছে নিজের "খাঙ্কা" জাপন করার ব্যর্থ
ছিল। তবু আমার মনে উটাকাহাও নিরন্তর গাণের
আগত যে বিদ্যন নীকরসম্পৃক্ত শৈত্যের মাঝখানে সে-যকের
মনে দহিতার কথাই বেশি আগত না দেহের জ্বলিতার
মিকেই বেশি স্মৃতি পড়ত। সে বাই হোক—যেহেতু আমি
যক নই সেহেতু আমি যে উটাকাহাওর মেঘের বিরতিহীন
আলিঙ্গনের মধ্যে খুব আনন্দ পেতাম না এটা কব।

কিন্তু তবু সেখানকার নিদর্শনোভার প্রতি অনন্যোদ্যোত
হওয়া ছিল—অসম্ভব।

ঐতিহাসিক স্থান রায়

বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছিল দেবানন্দের বটানিকাল গার্ডেনট। আঘটাকা ঘোমটার বাগানটি মাঝে মাঝে এমন একটা অপরূপ শোভার দাঁত হ'য়ে উঠত যে সে "মেথালোক" একটু "অন্তর্গতচিত্তে" না হ'য়েই আমার উপায় ছিল না। এমন সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। সার্বিকের কথা কেবল মনে হ'ত যে রতনচূড়ি মোগ নিত্যই পঙ্ক-প্রকৃতি রচকের ঘোমটা পরেন কেবল তখন—যখন মাটি উজনাচতার ঢেউ-খেলানোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে এলিয়ে বিতে চায়।

চর্মা-পূর্ণ সহর গ'ড়ে তোলে—রাস্তাঘাট ও রাস্তা ম'র—যেন স্বীকৃত-স্বাভাবিক স্নেহে রাখে—ও লসোল্লসি আমায়ের দিকে খাটের নিরেই ওরা বাজার চালে শোভমান থাকবার গুহু তরুটি, সম্বন্ধে স্বঃ বিধবস্তার কাছ থেকে তালিম নিতে জানে।

বাক্য এবার উটকামাত্র ছেড়ে মনোমুগ্ধ-ভ্রমণের কথা প'লে প্রবন্ধটি শেষ করি; কি বলুন হইলে উদ্বাস্ত হ'য়ে উঠবে যে!

কদিন থেকে বাঙ্গালোরে আমি অতিথি হ'য়ে আছি আমায় একটা ইংরেজ বন্ধুর। আরও দুই যুরোপীয় মহিলা; তাঁর অতিথি।



উটকামাত্রের দৃষ্ট

আর প্রশংসা করতে হ'ত ওদের রাস্তাঘাট রাবার ক্ষমতাকে। তুমি চীক এলিকিউটিভ অফিসার হ'লেও সম্ভবত দেবানন্দের রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য আর বেশি বাড়াতে পারতে না। কাঁপানকমতা ও কর্ণনিষ্ঠতা ওদের! এমন একটা সহর শুধু করা নয়—রেখেছে কি স্থলর ক'রে! সাত দশককের নবী পার হ'য়ে এসে মাকড়সার জালের মতন ওরা যেনগণ বিতায় করার দক্তি ধরে—ঠৈল দেবালেই ওরা শুধু চ'ড়ে ক্ষান্ত হয় না—ওদিনে দেবানে হুসমা

এদের সঙ্গে মিলেমিলে থাকতে হতই ভাল লাগছিল ততই মনে চকিল যে আমরা ক্রমশ যুরোপীয় মনের কি রকম কাছে গিয়ে পড়ছি! শুধু তাই নয়—আমার মনে হচ্ছিল যে রাষ্ট্র ও নাগরিক জগতের অনেকগুলিই আমরা এদের কাছ থেকে নিতা নিহত কি ক্ষত রেটে শিখছি ও শেখবার সঙ্গে সঙ্গে দেশদাসীদের মন থেকে কী ক্ষতবেগে ধুয়ে প'রে যাচ্ছি! কথটা পরিচার ক'র বলি।



আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে ঘারা তাঁদের আচরণের ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটি বহার রেখেছেন তাঁরা ক্রমেই আমাদের মনের রাজ্যে কি রকম অজ্ঞাতসারে অনাযাচিত হ'য়ে পড়ছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমরা অজ্ঞাতে চরিত্রগত মনেকল্পে নতুন গুণ কি রকম স্থায়ীভাবে ওদের কাছে থেকে গ্রহণ ক'রে হজম করছি! দুষ্টায় চাপ? তোমার নিজেরই নেও না কেন। তোমার মিথ্যা, তোমার কর্ণপীণতা, তোমার ভাণ্ড, তোমার নিঃসামান্যতা—ভেবে দেখ দেখি এসব কী পরিমাণে ঘুরোপের দ্বারা প্রচাষিত। এসবের মধ্যে ভারতীয়ের কতটুকু? অবশ্য

আমার এই যে ৪৪ত পুরাকালে আমাদের মধ্যেও এ ধারণাটা ছিল—(তার কোনো পূজ্যপুণ্যক ইতিহাস ত নেই)—কিন্তু পশ্চিতি আমরা যে আমাদের পরেই জীবনে ক্রমেই বেশি আত্মকেন্দ্র হ'য়ে পড়ছিলাম এটা অস্বীকার করা যায় না। Civic life যাকে বলে সে জীবনের যে-সব দাবী-মাগা আছে সে-সব দাবী-মাগার মর্গায়া রাখাটা যে আচারের দাবী-মাগার মর্গায়া রাখার জের বেশি দরকার এ পদ্ধতির প্রতি আমরা উদাসীন হ'য়ে পড়ছিলাম। ঘুরোপের একটা বড় উপলক্ষি মাথুকে জানা ও মাথুয়ের নিকটে আনা। আমরা ক্রমেই হ'য়ে পড়েছিলাম গৃহবধ,



উটকান্দা থেকে মহীশূর 'বাসো' ক'রে আসতে পথের দৃশ্য

ভাঙতে ভাঙা হিন্দী একথা বলতে চাই মনে কোরো না যেন।। কারণ কে না জানে যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার জন্তে বিলাসবর্জনের আইডিয়া ছিল, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রজাস্বতন্ত্রের জন্তে নিজের বিশ্বাসভাগের আইডিয়া ছিল—ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্তে যে প্রতি নাগরিকের সৈন্যমিন জীবনের অনেকখানি স্বার্থ ছাড়তে হবে এ সত্যটি আমরা ঘুরোপের কাছেই নতুন ক'রে শিখেছি এই আমার বলবার কথা। নতুন ক'রে শিখেছি কথাটা বলার সমর্থ

আচারবদ্ধ, চুঁমুর্গাপরী। দক্ষিণ ভারতের সত্যকার ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে এটা আরও উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কী বিবর্ত টিকি এদের! কী দগদগে তিলক! আর—সর্বোপরি কী অবজ্ঞা নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি!—যেন ব্রাহ্মণের সব জাতিই বিধাতার অভিশপ্ত সম্ভ্রান। একথা এখানে আমার একটি ঘুরোপীয় বাকবী কাল ব'লে আক্ষেপ করছিলেন। তাই ভেবে যেখ দেখি, তুমি-আমি যে আজ ঘুরোপীয়দের সঙ্গে এত সহজে

মিশ্রিত পারি তার কারণ কি এই নয় যে আমরা আর খাটি ভারতীয় নই? বসন্ত তুমি-আমি যে-পরিমাণে মনের মতো বেদনা বোধ করি ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা যুরোপীয় ভাষাপর নয় কি? তাই এক কথায় বলা চলে যে বেশাধিবোধ জিনিষটা যুরোপীয়—ভারতীয় নয়, অস্বস্ত পত করক পতাকাঁর মধ্যে যে এটা বেশের লোকের মন থেকে মৃত্যু হ'লে গিরেছিল এটা পুঁই বেশি সম্ভব মনে হয়।

এটা কথার কথা নয়। আমার সত্যিই মনে হয় তুমি-আমি আর খাটি ভারতীয়ের মনের কাছে অন্যায়। আমার একটি উদারজন্যর ভারতীয় বন্ধু তার দেশে নিমন্ত্রণ পান না—তিনি নিষিদ্ধ মাংস তক্ষ করছিলেন বলে। এটা আমাদের কাছে আর যে অসঙ্গত মনে হয় তাইতেই প্রমাণ হয় যে আমরা যে খাটি ভারতীয় নই; যদি ভারতীয় হ'তাম তাহ'লে বলতাম বেশ হয়েছে—নিষিদ্ধ মাংসতক্ষণ! উঃ, কী মহাপানী! ওর সঙ্গে একত্রে থাটতে আছে!

পত করবিন আমার যুরোপীয় বন্ধু বাফী ক'জনের সঙ্গে একত্রে হাঙ্গি গয়, বেশাগুলো প্রভৃতি করার সঙ্গে সঙ্গে একথা আমার বড় বেশি ক'রেই মনে চড়ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে গর উঠছিল—মাত্রাজে কয়টি সভাকার ভারতীয়ের ঘরে আমি এত সহজে প্রবেশাধিকার পেতে পারতাম বা পেলেও এত সহজ দস্ততার সঙ্গে মিশতে পারতাম? একথাটা এখানকার একটা ছোট অভিজ্ঞতা দিয়ে আর একটু ফুট ক'রে তুলে।

যুরোপ আমাদের যে কতটা অ-ভারতীয় ক'রে তুলছে ও তার প্রভাব যে ধীরে ধীরে কী ব্যাপক হ'য়ে উঠছে সেটার খেঁদ নতুন ক'রে পরিচয় পেলাম সেদিন এখানে একটি দাক্ষিণ্য তরুণীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে করতে। ঘেরেরি বয়স হবে বছর বাইশ তেইশ; তার মাতৃভাষা কথিত ভাষামাত্র—কাকানী—তার কালচার বিশেষ ক'রে মারাত্মি ও সে এম্ এ পাশ করেছে হায়দ্রাবাদ থেকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে তার মনের ক'রে ভারতীয় হবারই কথা ছিল। কিন্তু সে হতে পড়েছে ঠিক উলটে। একটি জীব, অর্থাৎ একটি পূর্ণবিকশিত যুরোপীয় মেয়ে; বেশভূষার নয়, কিন্তু মনে। বুদ্ধিমান যুথ; আমার সঙ্গে এক

বন্দীর মধ্যে সব ক'রে মিল ঠিক যুরোপীয় মেয়েরই মতন। ভাল চলন সতি ডক্টর, হাঙ্গি গয় সবেই যুরোপীয় ভাষা। এমন কি পুরুষ যে তাকে দেখলেই একটু আকৃষ্ট বোধ করে সে সত্যটির প্রতিও সে যেমন লম্বায়েই লড়েছেন, এতটুকু তেমনি কৃষ্ণদেপনীয়। তার ব্যক্তিবৈবরণে যেটা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ সেটা হচ্ছে তার অকুতোভয় ভাব। সে আদর্শ চিন্তামণীর মতন লক্ষ্যবস্তু, সফটবিজ্ঞিতা কথার কথার বেশবুঝা ও আনো-হাওয়ার-বিচারসিনী নয়। শুধু তাই নয়—তার জীবনের ফিলসফি সম্বন্ধেও সে লগরচর এমন অসংলোভে কথা বলে যে, ভালও যেমন লাগে আশ্চর্যও তেমনি বোধ হয়।

কিন্তু মনে কর কি যে, এরকম মেয়ে এখানকার গড়পড়তা ব্রাহ্মণের হাতে পড়লে প্রবী হ'বে? অথচ যদি সে যুরোপীয় সভ্যতা ও আইডিয়ায় সম্পর্কিতা আস্ত ত হ'লে যে সে অতি অবলীলাক্রমেই যে-কোন অর্ধবৃত্ত, কক্ষাকার তিলকখাতকে বিখার করত এটা ত অবগারিত? কি বল্লেই আমরা যাঁহি ভিতরে ভিতরে—ঘদিও বাইরে একথা স্বীকার করতে কৃষ্ণা বোধ করি!

না—সত্যি ভারতের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য যদি কিছু হ'তো হয় তবে সেটা হয়ত হ'তে পারে দর্শনের রাজ্যে; কিংবা লিঙ্গকলগর রাজ্যেও হয়ত হ'তে পারে। কিন্তু বৈদ্যমিন জীবনে, আনো হাওয়ার এলাকার, নৈতিক আচরণ ও ন্যায়িক কর্তব্যজগতে আমরা আর ভারতীয় থাক্ছি না—এবং মোটের ওপর আমাদের মানসিক বাহ্যার পক্ষে এটা অতি উভ চিহ্ন। মাহুৎ একবার এঘিরে এলে কিরে দেতে আর পারে না—বহুই কেননা তার কানে কানে বলা ছোঁক্ যে মুক্তি আছে কেবল পক্ষপাশমনে।

অথচ তবু মনোবাজো, ভাবজগতেও জীবনটাকে বেখার ডকীতে কোথায় খেন আমরা একটা মস্ত সম্পদেব উত্তরাধিকারী—একথাও আমার মনে হয়। হয়ত তুমি বলবে আমার এ ছটি উক্তি, পরস্পরবিরোধী; ও সেই সঙ্গে হয়ত একথাও বলবে যে "নৈতিক আচরণ, বাহ্যারিক জীবন প্রভৃতিতেও আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বহাৰ রাখা পরকায়—নইলে এসব বিধের যুরোপীয় প্রভাব শেখটার আমাদের জীবনের ফিলসফির ওপরও ছাপ ফেল্বে।"



‘এটা অসম্ভবও নয়। কিন্তু তবু মনে হ’বে আমাদের ভাষার দুর্যোগীয় প্রচণ্ড রূপক বড়ই হ’বে উঠবে; ছোট হয়ে হবে না। সে প্রত্যেককে আমরা আশ্বাস্য ক’রে একটা নতুন ধারণা—প্রত্যয় অবদান রূপকে দিতে পারব কিনা জানি না। রূপ পারলেও পারতে পারি। তবে এ বিষয়ে আমার নিজের কাছে নিজের ধারণা বড় অশ্পট, তাই এখানেই ছাড় তুলিত হ’বে গেলাম।

না—স্বাক্ষিত হ’লে চলবে না। মনোহর থেকে উটাকামণ্ডের পাকড়া রাস্তা লম্বকে কিছু লিখতেই হবে যে।—কিন্তু না—বেশি লেখা বুঝা। এটা দেখাই ভাল। তাই বসি কখনো উটাকামণ্ড অফলে যাও ত সেখান থেকে মনোহর অবধি ৭৫ মাইল বাত বাত তাতে একবার চ’ড়ো—কুণো না। এমন চমৎকার পাকড়া রাস্তা ও দুস্তরবেচিত্রো এরকম পথ এক নরওয়ে ছাড়া কোথাও দেখছি ব’লে ত মনে হয় না। জায়গার জায়গার প্রকৃত ঠিক বেন বুড়োপের মতন, জায়গার জায়গার উচ্চপ্রবেশগুণ, আবার জায়গার জায়গার স্রোতধিনী, বজ্রা প্রভৃতিতে সন্নিহিত। এক কথার সমস্ত পথটি অত্যন্ত উপভোগ্য। মেঘ ও স্রোত, বন গাছ ও রূপক বিরলতা, ডেউয়ের পর ডেউ পাহাড় আবার সমস্ত ভূমির গোতা—যা চাও সবই পাবে। দাঁড়া এ পথটুকু অপূর্ণ—নিছক বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে।

তরুণ দিন বাঙ্গালোরে এসেছি উটাকামণ্ড থেকে। পরশ দিন বাঙ্গালোরে রুটি মেয়ের গান শুনলাম। এদের নাম তথমা ও নজমা। বড়ি বেল বিপা বাখায়। ছোটটি বেশ গায়। বাঙালী মেয়েদের মতন কণা এসের নই—কিন্তু মৈলুণো এরা কাকর চেয়ে সীন নয়। তেঁকল এসের দক্ষিণ দলীতের মতো হিন্দুস্থানী দলীতের প্রানের পরশটি মেলে না। সেই কোচ্চনী মেয়েটি সৌন্দর্য তার সহজ সাবলীল তরীতে ছোবের সঙ্গেই বসল আমাদের, “মাত্রাধীরা দক্ষিণী গায়কদের মতো কে প্রথম শ্রেণীর, কে দ্বিতীয় শ্রেণীর, কে তৃতীয় শ্রেণীর এ নিয়ে নানা তর্কশ আলোচনা করে—কিন্তু আমার কাছে মনে হয় দক্ষিণী গায়ক বা বাবক সবই তৃতীয় শ্রেণীর।” আমি হেসে বিভ্রান্ত করলাম হারজাখানে তিনি খুব ভাল হিন্দুস্থানী গান শুনে একথা বলছেন কিনা।

মেয়েটি নির্ভর উত্তর দিল—“হারজাখানে বাজার যাতে গাফোলানে যে-গান বাজ এসের প্রের গাফকের গানও তার কাছে ঠাঁড়তে পারে না।”

কিন্তু গান বাজনা লম্বকে বোনো আলোচনা করব না—ভূমি মফা বিস্তর হ’বে লড়বে বোধ্যয়। তোমার উপর আবার বেশি উপদ্রব করায় কিছু নয়।

পরশ বাঙ্গালোর থেকে বাসে চ’ড়ে আলা গেল এট নন্দী পাহাড়ের পায়লু—মাইল পরাম্ব। তারপর সেখান থেকে এখানে—অর্থাৎ নন্দীপাহাড়ের পিণবহিত পাহাৰাঙ্গে—হেঁটে এলাম আমরা চার জন। আমি, আমার এক মাত্রাধী দলীতাহারগী বন্ধু, আমার এক চিত্রকরী বান্ধবা—সুইল—ও একটি আমেরিকার মহিলা—দার্মিক।

বাঙ্গালোরের উচ্চতা হাজার তিনেক ফিট; এ পাহাড়ের উচ্চতা হাজার চই। কাছেই বৃক্ক নন্দী পাহাড়ের উচ্চতা কানিরাঙের চেয়ে কম নয়।

কল—পৈতা—কিন্তু মনোরম পৈতা—চন্দ্র পৈতা নয়। তবু তাই নয়, এখানে স্থানান্তর নির্দিষ্ট নন। বঙ্গদেশের সব নন। কাছেই কাল সমস্ত দিন তপালি তপন-কিরণে পুৰ মট হওয়া সিগেছিল ও রাতে অর্ধ চন্দ্রের আলোকে চারিবিকের পোতা উপভোগ করা হয়েছিল।

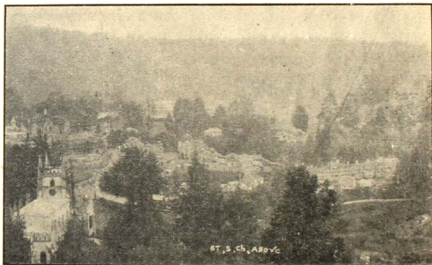
অতি চমৎকার স্থান এ। অর্ধচন্দ্র হেঁটে হু হাজার ফিট উঠতে আমাদের একটুকু পথে হ’লেও, ওঠার পর প্রম দার্ক হয়েছিল পূর্বোপরি। বিশেষত বখন এখানে টিপুহুলতান প্রায়ই আসতেন। ঐতিহাসিক নরপুত্রবাদের পীঠস্থানে আসতে তোমাক হবে না এমন টুট্টি কে আছে? পূর্বোপরি বান্ধবীরও মধ্যস্থতা। এরা দতাই নিদ্রা পোতা ভালবাসেন, নইলে মত কই ক’রে উঠতে পারতেন না এ পাহাড়ে। তবে এদের পরীরও ভাল—আমাদের আধুনিক-শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ের মতন কুণের বাবে নুর্জা দান না। জীবনী পক্ষিতে এরা এমন তরুণ বো—এখানে এসে হুগনে মিলে নেচেই অধির। আমাদের স্থলেন নাচতে হবে। অনেক কষ্টে এঁদের বুকিয়ে নিজস্ব করা

আমায়ানের উড়ো চিঠি

ঐন্দ্রিলীপকুমার রায়

যেন যে ভারতীয় শিল্পীর আদর্শ—গতি নয় স্থিতি—যেতেই
ভারতে শিল্পী হচ্ছে দার্শনিকেরই ভারত। তাই। 'ভাগ্যে
ভারতীয় দার্শনিকের ওপর এঁদের প্রগাঢ় প্রভা! নইলে
আমাকেও এ-বয়সে পূর্ণমান হ'তে হ'ত চরিত! যুরোপের
প্রভাবে দড়ি মোর আমায়ান চওড়া গেছে—কিন্তু তাই ব'লে
নৃত্যমান হ'তে বললে চলবে কেন? পরংবাবু সেই প্রশ্ন মনে
পড়ে; "আরে, মদ বেতে প্রেক্ষুডিল থাকবে না ব'লে কি
মাতাল হ'তেও প্রেক্ষুডিল থাকবে না?"

দেখা যায়। 'আর দেখা যায় অজস্র ডোবা। বেশ লাগে।
অনেকটা চেরাপুঞ্জী খেঁক লিলেটের স্তম্ভের মতন। 'আমায়
মাস্তাকী বহু এখানে পল রিশারের সঙ্গে এসে অনেক দিন
ছিলেন। কাল বলছিলেন যে এক দিন চম্পালোকে অজস্র
ডোবার চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে পল রিশার বলেছিলেন;
"প্রতি ডোবাই চম্পালোকে প্রতিবিম্ব বুকে খঁচে মনে কবে
শব্দী মুক্তি ভারতই ভক্ত কিরণ দিচ্ছেন। মাহুদ ষ্ট্রিক্‌ তেমনি
তার নিজের বর্ষ সযত্নে মনে করে যে তগবান্ কেবল তার



উটকামায়ানের পুত্র

কানগ্রাতি এই গাছাবাসেই কাটল। কী চম্পালোক! ধর্মেই প্রকাশ।"
কী পুত্র! আর কী মধুর বাতাস! তার ওপর প্রচণ্ড
উর্জালপণও হ'ল ও শেষটায় গানের ঢেঁও হোল।
এঁরা দতলেই সঙ্গীতপ্রিয় কাজেই কালকে কাটল ভাল।
শব্দী গাছাডাটা উঠেছে একবারে ঝাড়া। কাজেই ওপর
থেকে চারদিকেই সমতলভূমি ক্ষেত্র, বর্ষা, উকগাজি প্রকৃতি

জ্বালো গত বহুর পল রিশার এরকম প্রকার প্রকার কণা
প্রাচীর আমাকে বলতেন তাই এ উপমাটি তোমায় না। ব'লে
থাকতে পারলাম না। একদিনের ভক্ত এখানে জালা
দিয়েছিল, কিন্তু এল এত ভাল লাগছে যে আজও থেকে
খাওয়া গেল। কাল বালালোরে ফিরব।

আলো

ত্রিমৈত্রেয়ী দেবী

ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি,
 চির রাতি চির দিন যদি তোরে যিঁতে
 ত'রে থাকে মোর চিত্ত অলুপ অমৃত,
 প্রভাতে ছুঁতে হ'তে এসে তোরে যদি
 নুহন পাঠার লগ্নে করে কানাকানি,
 রাতের শিশির-মালা নব শশ্যদল
 তোমার চরণ লগ্নে চটুত বিছল—
 দেখে তাই পূর্ণ হ'ত, সৈন্ত মোর
 না রহিত থাকি ;
 ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি ।

শায়র এন্ডাভে সেই শুভ বন্ধ মেঘে
 তোমার চমক যবে উঠিত গো জেগে,
 লজ্জা-দুট করবীর মজার তলে
 তোমার চমক যেত নেচে গলে গলে,
 হৃদি তার কেড়ে নিয়ে তারে প্রাণ দিত
 মেরে প্রাণে তার শাফা জাপানে তুলিত,
 তজ্জা যেত বুড়ে জীবনের হ'ত তোমার
 সে আলোর ঢাকি'
 ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি

তবে হবে বিধানেধে রাতের ছায়ায়
 আমারে লুকায়ে এসে বিপুল মায়ায়,
 বুকে কড়া সেবা যাবে, পুষ্প যাবে ক'রে,
 বায়ু কেঁদে কেঁদে যাবে নব শত্রু পরে,
 গভীর আঁধার এসে আগুন চারারে
 আমারে কাড়িয়ে চাবে হু'হাত বাড়ারে,
 বিহীন বিধম লাজে লুকায়ে ছানিয়ে
 মেঘ যাবে ঢাকি'
 ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি !

তবে আত্ম ব'লে যা রে কোন বায়ী,
 দিগে যা রে কোন দান তারে লব মানি' ।
 সে-বাণীর গুণবলে দানের মতিমা
 মুখ প্রাণে ছড়িয়ে মাঝি তবে সীমা,
 দেখ মনে একটি সে সীমা হবে স্নক
 তোমার কাছে লীলা মাগি, তোরে বলি শুক,
 সে তোমার একটি কথা তার মরনি বরি'
 কেটে যাবে বজ্রামরী মন্ত বিভাবরী,
 সে-আঁধারে তোমার বায়ী টেনে নেবে মোরে
 তোমার কাছে ঢাকি'
 ওরে আলো, তোরে যদি শুক ব'লে থাকি ।



বিনায়ক

—গল্প—

১

প্রৌঢ়কাল। বেলা প্রায় দুইটা। ক'দিন হইতে অশুভ
পরম পড়িয়াছে। মাথার উপর বন্ বন্ করিয়া বৈজ্ঞাতিক
পাখা ঘুরিতেছে। খাড় গুঁড়িয়া কাজ করিয়া বাইতেছি।
ফাইলের পর ফাইল আশিত্তেছে, চিঠির পর চিঠি দাখ
হইতেছে। এমন সময় টেলিগ্রাফিক টেলিফোনটা রিং কিম্ব
করিয়া বাজিয়া উঠিল—রিডিভারটা তুলিয়া লইলে নিরুপস্থিত
কথোপকথন চলিল—

“হ্যালো।”

“আপনি মিঃ জ্যোতিষের বাস?”

“হ্যাঁ, আপনি কে?”

“আমাকে চিন্তে পারবেন কিনা জানি না; অনেক
দিনের কথা কি না।”

“তবু, কে বলুন না, দেখি যদি চিনতে পারি।”

“কি ক'রেই বা পারবেন, আপনি এখন মত্ত লোক,
আমার সঙ্গে প্রায় আশ্রয় তখন ত কে কি হবে তা কল্পনার
বড়ই ছিল। বা হ'ক, হুঁফুস জি চার্ক ফুলের কথা মনে
পড়ে।”

“পড়ে।”

“সেখানে কিরকম বোধ হ'লে চাককে চিন্তেন?”

“আছে।”

“বিনায়ক বোধ?”

“হ্যাঁ, জায় মস্ত পড়তেন, এক পাড়ার থাকতেন, এমন

বিন্ বোঝা যে-কিছু মনে না দেখা করতেন।”

“কি ক'রেই বা পারবেন, আপনি এখন মত্ত লোক,
আমার সঙ্গে প্রায় আশ্রয় তখন ত কে কি হবে তা কল্পনার
বড়ই ছিল। বা হ'ক, হুঁফুস জি চার্ক ফুলের কথা মনে
পড়ে।”

“পড়ে।”

“সেখানে কিরকম বোধ হ'লে চাককে চিন্তেন?”

“আছে।”

“বিনায়ক বোধ?”

“হ্যাঁ, জায় মস্ত পড়তেন, এক পাড়ার থাকতেন, এমন

—শ্রীমদারব্র মুখোপাধ্যায়

নিরে কলকাতায় এগেছ। আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে
দেখা করতে ভয় করে।”

“ভয় কি? এক দিন বাড়িতে দেখা করো।”

“কি ভয় করে। তুমি মত্ত লোকের। আজ্ঞা জ্যোতিষ,
পড়তে থাকে আমারের সেই পলপ মনে পড়ে?”

“কি পলপ?”

“মনে পড়ছে না?”

“ও, হ্যাঁ পড়েছে বটে।”

“কিন্তু দেখ, তুমি সে কথা ভুলেছ, আমি কিন্তু ভুলিনি।
আর ভুলবই বা কি ক'রে। খুঁধা কত লোকের দিকে চেয়ে
দেখে, কিন্তু খুঁধাখুঁধী এক খুঁধার দিকেই চেয়ে থাকে।”

“ও তুমি ত দেখছি মত্ত কবি হ'রে পড়েচো, বা হ'ক
এক দিন নিশ্চয় এগো। আজ্ঞা! তুচ্ছ।”

“গুডবাই।”

টেলিফোনটা রাখিয়া বিলাস।

বজমিনের কথা, পৈশব ছাড়াইয়া কৈশোরের প্রথম
মাগে মবে পা দিয়াছি। হুঁচুকার ইংরাজী গুলে ভিত্তি
হইলাম। তখন বোম্বের দাত আট বৎসর বয়স। আজ
২৮শের কোয়ার পা দিয়া গ্রীক মনে করিতে পারি না তাহার
সহিত প্রথম আলপন কি করিয়া হইল। তবে সেদিনের
কথাটা বেশ মনে পড়ে—অতুল মাটির একটা। কতদিন বকম
অজ বোটে লিখিয়া দিয়া বাহিরে গেলেন। অতুলবাবু বড়ই
প্রহর-প্রহর ছিলেন এবং অজ-পাটটার প্রতি আমার প্রহর
বড়ই কম ছিল। কাজেই কোমল পিঠের উপর কত বা
বেত পড়িবে ইহারই একটা পরিচয়। প্রায় দুজন-মহনে
করিতে বলিয়াছিলাম এমন সময় কোথা হইতে বিনায়ক
আদিয়া আমার পাশে বেসিয়া বসিয়া অজটা জলের মত
বুকাইয়া দিয়া কদাইয়া দিল। অতুল বাবুর ক্রোধে বাচিয়া
বেলায়। কিন্তু ইতিহাসটাও ভাল মুখ্য ছিল না। ইতিহাসের



খাতা আসিলে বিনায়ক বলিল, “শেঙ্কনের গ্যানারীতে চল।” তার পর সেখানে শব্দ হইতে এমন যেমলুম prompt করিয়া দিল যে, মাতার মনোব পড়ার স্তিমিত্ত তারিক করিলেন। শুধু তাই নয় ইহার পর কত বিবেচনাই যে ঐটুকু ছোট্ট আমায় লাগায়া করিত তা ভাবিয়া শেব করিয়া উঠিতে পারি না। আমার এটুকু লাগায়া করিতে পারিলে সে বেশ দগ্ধ হইত। আমার বেশ মনে আছে হেডমাস্টার মণ্ডলের ক্রাশে ভাড়াভাড়ি প্রবেশ করিবার সময় আমার খাতা লাগিয়া হেডমাস্টার মহানবের টেবিলের উপর মোড়াত উঠাইয়া চাষিয়া-খাতার উপর কাণি পড়িয়া যায়। তৎক্ষণ হেডমাস্টার যেত উঠাইয়া আসিয়া লিখাঙ্গা করিলেন, “কে কাণি ফেলেছে?”—কেও তথা বলিবার আগেই বিনায়ক গাড়াইয়া কহিল “সাব, আমি।” অমনি শটাপটু করিয়া পাচো বা বেত তাহার হাতের উপর পড়িল। সে অজান বদনে লজ্জা করিয়া নিজের চাষাঙ্গা বসিল। সেদিন স্থল ছুটী হইলে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলুম, “কেন তুই অমন মিছে নিজের হাতে সাব নিয়ে আমার হ’য়ে মার খেলি?” সেদিন সে মাথামে আমার অঙ্গুলঙ্গল চোখ গুটি মুছাইয়া দিয়া, কি পড়ার দরদের সহিত উত্তর দিয়াছিল, “জ্যোতি, আমার গরীব, আমারে কত মার দগ্ধ খাওয়া অভাগা আছে; তোরা বড়লোক, স্বামী, ওই শুভার মার খেলে হুত ম’রে যাবি, ছি তাই, কাঁদিলে না।” ইহার পর জীবনবিধাতার হাতে কতবারই না বেত খাইয়াছি, কতই না কাঁদিয়াছি—কিন্তু সেই যে সূটনোদ্রুপ কৈশোরের প্রাকালে এক বছর লাক্কা পাইয়াছিলুম সেই এক আমার হইয়া বুক পাতিয়া মার খাইয়াছিল আর ত কার্যকেও পাই নাই।

সে ছিল গরীব। ব্যাবসিকই বড় গরীব। কিন্তু কি অসাধারণ মেধাবী, ও বুদ্ধিমান। তাহার যে কত অভাব কত দিক দিয়া ছুটিয়া উঠিত তাহা প্রাণে-প্রাণে বুঝিতাম কিন্তু কোন দিন তা সাধল করিয়া দূর করিতে চেষ্টা করি নাই। সেই অটুটুকু বসলেও বেশ বুঝিয়াছিলুম যে যদি একবার সাহায্য করিবার বা সমাহৃত্তি দেখাইবার এটুকু চেষ্টা করি তাহা হইলে এই আশ্চর্যমণ্ডল বাগকটি হুত এক

নিমেষে তাহার সমস্ত বন্ধুর একবারে বুইয়া মুছিয়া ফেলিবে। সে ছিল আমার অতি প্রিয়, অতি আশ্রয়কর বন্ধু। আমার সে কৈশোরে বয়স্কর দিনে সে যেন আমার চারিদিকে এক অদৃশ্য মায়াবলম্বল করিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার লিখিত চার কংসর একত্র পড়িবার পর বাবা হুঁচুড়া হইতে বসিল হঠাৎ, আমার স্থল ছাড়িতে হইল। সে দিনের কথাটা আজও ভুলিব না। সে দিন সমস্ত বিকাশটা হুতনে কি কাছাকাছি না কাঁদিয়াছি। অতি ক্ষুদ্র বালক তখন আমরা, জগতটা কি চিনিতাম? তবে নিজেদের যে জগতটা নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছিলুম সে জগতটার ছিল জ্যোতি আর বিনায়ক, বিনায়ক আর জ্যোতির সে প্রেমের মূল্য কি আজও বুঝি নাই। আজও তাহার কোনও লাক্কাও আছে কিনা সে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারি নাই, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, সেই কৈশোরে বন্ধুত্ববন্ধনটা হুত প্রগাঢ় ভাবে দৃঢ় বন্ধা অতীব করিয়াছিলুম তাহা বুঝি আর কখনও করি নাই। তখন বুঝি নাই যে পরশুরক ছাড়িতে হইবে, তাহা হইলে হুত অত নিবিড় ভাবে পরশুরক জল বাগিতাম না।

অনেককাল তাহার পর বিনায়ক লিখিয়া গিয়াছিল—
“জ্যোতি, তুই কি আমার চিরকাল মনে রাখবি?”

—“নিশ্চয়; তুই কি অত দৃঢ় ভাবে পারিলি বিনায়ক?”

তখন বিনায়ক আমার হাত ধরিয়া গলার ভিতর এক হাঁটু মলে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল—“এখানে গাড়ায়ে আর আর হুতনে শপথ করি—জীবনে কেউ কাউকে ভুলব না। এবং যদি একজন বড়লোক হুত, আর একজন বিশেষ লড়লে—সে তাকে প্রাণ দিয়েও সাহায্য করবে।” তারপর ১৯১৫ বৎসর তাহার কোন খবর পাই নাই। প্রথম হুঁএক মাস পর চলিয়াছিল তাহার পর ধীরে ধীরে সব বৃত্তি মুছিয়া গেল। তাহার পর কত বন্ধু পাইলাম, কত হারাইলাম। আমার পাইলাম। কিন্তু জীবনব্যয়াম আরম্ভগমনে বিনায়ক বলিয়া এক বৃহৎসের নিকট যে কত বড় শপথ করিয়াছিলুম তাহা ত ভুলিয়াই ছিলাম—এমন

কি বিনায়ক বলিয়া যে কাচাকেও চিনিতাম তাহাও এই টেলিফোনে কথা বলিবার আগে হুহুত লহহুতের চোটা করিয়া মনে আনিতে হইত। সে শব্দের হুহুত কোন মূল্য নাই, হুহুত সে বাগ্‌চোড়িত খেলা—কিন্তু মনে চর, মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ, অসংখ্য তারা, পরিপূর্ণ চন্দ্র, পদতলে ভরদুকলা নীলামরা ভাগীরথী, আর আশেপাশে বহু জলরাশি, যেন সে শব্দের চিরন্তন সাক্ষী স্বরূপ আজও বর্তমান বসিয়াছে।

সে দিনও দুইটার সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

“হ্যালো।”

“আপনি কি জ্যোতির্বিদ বোন্স ?”

“হ্যাঁ, কে, বিনায়ক ?”

“হ্যাঁ, গজাজীরে সেই শব্দের কথাটা মনে আছে ত জ্যোতি ?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, আচ্ছা—এ কি পাগলামি হচ্ছে বলতো, টেলিফোন ক’রে। একদিন এলে দেখা কর না কেন ?”

“বড় ভয় করে তাই, বড় ভয় করে। আচ্ছা ঘাব এক দিন, ঘাব। ‘জি চাই।’”

“আচ্ছা।”

আশ্চর্য্য লোকটি ত।

তাছাড়া পর দিন কি ব্যর ছিল জানি না। কিন্তু হালিসে প্রচণ্ড কাক পড়িয়াছিল। ঠিক দুইটার সময় মাথার টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল—এবার বিরক হইয়া উঠিয়াছিল। টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম—“কে, বিনায়ক ?”

“হ্যাঁ।”

“গজাস্তে শব্দের কথাটা বেশ মনে আছে তোমার। তোমার রোজ মনে করাতো হবে না বুঝলে।” সোজটা রাগিয়া বিগল। একটু রাগিয়াছিল। এ শব্দ বার বার শ্রবণ করানোর উদ্দেশ্য কি !

এই ঘটনার প্রায় আট দিনের পরের কথা বলিতেছি। বেগা ঐশ্রু বারটা। পুরাতন আকিল চলিতেছে এমন সময় চাপকোনি আদিয়া থবর-বিল, যে একজন পুলিশের

মারোগা ও ভজন কনষ্টেবল একটি চোরকে ধরিয়া লইয়া আদিয়াছে—আমার “সাক্ষ্য চার। আকিলের মধ্যে একি কাতু; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। সেইলাম চলের ভিতর একজন সাক্ষর ও দুইটি পুলিশ একটি নৃপকের গায়ে লাঠকড়ি লাগাইয়া, কোমের দড়ি বাঁধিয়া, দড়িটা ধরিয়া গড়াইয়া আছে। নৃপকটি হিম্মত্বে লম্বা থবরের, অচিন্ত্য রূপ। চোখে মুখে অভাচারের একটা নিরুৎ ছাপ লাগিয়া আছে। চুলগুলা উর পুর, চোখের কোটি অস্বাভাবিক বকমের উচ্চল। আমাকে দেখিয়াই সম্মত মুখে কহিল—“জ্যোতি, আমি বিনায়ক।”

তাকান কথার উত্তর না দিয়া ইংরাজিতে মারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার কি চান ?”

মারোগা দালা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই—এই ব্যক্তি বিনায়ক বোন্স, পটুনি নাহা কোন কুচরিত্র। স্ট্রীলোকের গহনা চুরির অপরাধে দৃঢ় হইয়াছে এবং তিনি এইবার ভক্ত আমার নাম বলিতেছে, পুলিশ জানিতে চার আমি উহাকে চিনি কি না এবং উহার জামিন হইতে ইচ্ছুক কি না। বিষয় কুড় হইলাম। আশেপাশে অধীনস্থ কন্সটারেবলের কোকুলী দূরী, চাপরাশিদের ব্যবস্থা সমস্ত ব্যাপারটাকে ত্রুণ বহুভাষ্যের অভিনয়ের আকার দিয়া দিল। “জ্যাক্সন্ কোম্পানীর কলিকাতা আকিলের মানেকার মিঃ জে নাসকে জামিন হইতে বলিতেছে একটা চোর, যে বৈজ্ঞানিক গহনা চুরি করিয়াছে। মাথার উপর যেন অধিষ্টি হইয়া গেল। কুড় পুষ্টিতে একবার লোকটার দিকে চাহিলাম। সে লক্ষ্যিত্ত তাহা মাটির দিকে চাহিয়া গড়াইয়া আছে। তাহার পর মারোগাকে কহিলাম—“আপনি কি মনে করেন যে এই লম্পট চোরটার সঙ্গে আমার বন্ধুর বা আশাশ থাকি সম্ভব ? আমি অসুরোধ করি এতদূর তাহা আমার সম্মত নষ্ট করার আগে আমার টেলিফোন করে, বানোবান।” ক্ষতবেগে থবরের ভিতর প্রস্থান কবিলাম। শুধু যেন মুহূর্তের জন্য একটা ফাঁপ আগরাক কানে আদিলা—“জ্যোতি !”

আজও তাহা বিতে পারি না কেন তাহাকে অত নিষ্ঠুর ভাবে কুহুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার যে নৃপ



বেশিখাম তাক। যেন বেশিবার জন্ত প্রস্তুত ছিলাম না। মনে হইল এ যেন কোন নরকস্থান বিনাধকের নাম লইয়া বিপদগ্রস্ত হুঁরিয়া বেড়াইতেছে। ওরূপে শীঘ্র হর চলিয়া যাওয়া উচিত। বহুদিন চলিয়া গিয়াছে তবুও বেশ মনে করিতে পারি বিনায়ক বড় হইলে কেমন দেখিতে হইত। তাহার মত অশ্রম স্তম্ভ, উন্নত নাসিকা, আঁধার চকু আরও ত চক্ষে পড়িল না। তবে ও কাহাকে বেশিখাম, লম্পট, খেচ্ছাচাখী কল্যাণদার! এই কি বিনায়ক! তাহাতেও কষ্ট হয়।

তবু মনে হইল ইহাকেই একদিন প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবার কথা হইয়াছিল। সময়ের ঘূর্ণিঝড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে এত দিন কে কোথায় ছিল জানি না, যখন প্রথম স্রোতের টানে পরস্পরে এক স্থানে আসিয়া মিলিল, তখন একজন শতশ্রমিল চন্দ্রকরোচ্ছল বাশাবলিখ মথো আগ্রহ পড়িয়া তুলিয়াছে আর একজন সেই বাশের এক কোণে এতটুকু আগ্রহ পাতিবার জন্ত বাতাকুচ্ছ সাগর হইতে চাঁৎকার করিতেছে।

উহাকে আগ্রহ দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। নিকটে যে জানের ঐশ্বর্য উদ্বেগ-বিনের এক মহা-সত্য হইতেছে—হইতে হয়। তবুও কি করিব টিক করিতে পারিলাম না। জামিন-হইতে প্ররুতি হইল না, বহু বলিয়া পড়ির দিতে লক্ষ্য হইল। এ যে কত বড় মিথ্যার মধ্যে কত বড় নির্মম সত্যকে প্রত্যাপন করিয়াছিলাম আর তাহাই বলিয়া বলিয়া ভাবি। যেদিন বহুপ্রোতা সম্মার জলে গাড়াইয়া উঠি বালক পরস্পরেও বহুরের অটু বহুনে দাঁদিতে প্রাণ পাইয়াছিল সেদিন কি তাহারা একবারও ভাবিয়াছিল—যে সায় যোগ বহুরের পরে, বিখ্যাত নিকট সেই সত্য পালনের কঠোর পক্ষী দিতে হইবে। সেদিন তারা দুইনে চাইত তাহারা অত বড় প্রতিজ্ঞা করিত না। আর করিলেই বা কি, তখনও কেহ ভাবে নাই সম্মার প্রতিজ্ঞা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বা কিছু অর্ধপ্রব, অ-সমতক তাহাদের চলা করিবার মত মনের গতি হইয়া যায়। মিথ্যার জন্ত সত্যকে পলা টপিয়া মারিয়া ফেলে।

আমার ছোট-বোনের গুণের সত্যতাবাবু পুণিণ কোটেও বেশ বড় উকিল। তাহাকে গিয়া বলিলাম, ঐ পোকটিকে

বাচাইতে হইবে। পরে শুনিয়াছিলাম সত্যতাবাবু বিনায়কর জন্ত অনেক বাস্তবিক কঠিনাঙ্কিলেন কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই, শুধু অনেক ছোটের পর তাহার শক্তির পরিমাণ কমিয়া গিয়া ছুরমাণ সঙ্গম কারাবাসের আবেশ হইল। সেই দিনের পর হইতে তাহার গতি আর সাক্ষ্য করি নাই, কেমন যেন একটা অপরিণীম লক্ষ্যের মনটা স্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পর আটমাস পরের কথা বলিতেছি। আকস্মিক হইতে কিহিয়া লক্ষ্যের সমর বালিগঞ্জে আমার বাসের পড়ির দিকের বাগানার আশ্রম-বেদ্যার উপর পড়িয়া আছি। লক্ষ্যের গান আবছায়া অন্ধকারে সন্ধ্যের সমস্ত মাটিতে তরিয়া গেছে। এমন সময় একটি পোক ধীরে ধীরে সামনে আসিয়া গাড়াইল। লক্ষ্যের অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল রকম দেখা দাঁতেছিল না, ভাবিলাম বোধ হয় আকস্মিকের কর্ণজারী, তাই বিভ্রান্ত করিলাম—“কে আশনি, কি চান?”

পোকটি সংক্ষেপে উত্তর করিল—“ছোটো, আমি বিনায়ক।”

আবার সেই কথা। তাকাতাড়ি উঠিয়া আলো জালিলাম। তাঁর বিভ্রান্তপোকে বেশিখাম সেই দৃষ্টি, আরও ক্রম, চোখ চুটি আরও অস্বাভাবিক রকমের উজ্জল, মাথা বুদ্ধিত। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটি চর্ণাবৃত কলস। ইচ্ছা করিলে আজও তাকাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু পারিলাম না, কেমন যেন একটা বাগার মনটা টু টু করিয়া উঠিল। বলিলাম—“বিনায়ক, বোদ।” বিনায়ক বলিলে বলিলাম—“বিনায়ক, আমরা সেদিনের বাশাবের জন্ত তুমি আমায় কমা কর।”

বিনায়ক সে কথা উত্তর দিল না। কহিল—“হুরি আমি কোনদিন করিনি ছোটো, আর বোধকর কল্পকুমার না; কিন্তু কত বড় ছায়ে যে ও কাজ করেছে সেই কথাটাই তোমার বলে যেতে চাই। ‘এ তাপই হয়েছে স্বীকৃত্যবাহার

আবদুসসমের ভোমার প্রাণ নিয়ে ভালবেসেছিলুম আর
যাবার দিনে তুমি একদুখ পুণ্য নিয়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু
যাবার আগে সব কথা তোমার পরিকার করে বলে বেতে
চাই।”

বিনায়কের তিরস্কারটা মাথা পাতিয়া গইলাম। আর
সাব্যবিক-আমার সমস্ত যোচ, বিলাত-কোরণের সমস্ত গর্ল
ছাপাইয়া মনটা গ্রিক আট বছরের বালকের মনের মত
দুর্জল, অদ্বায় হইয়া পড়িয়াছিল। আর তোর করিগণও
রাগিতে পারিলাম না। মনে হইল এই কল, মরণপত্র,
মাজাটাই একদিন আমার জীবনে কি পূজনীয়ই না ছিল,
সেদিন ওর প্রতিভা, ক্রাণে সমস্ত বিষয়ে ওর প্রথম হওয়া
দেখিয়া কি অধিক বিস্ময়ই না ওর চরণে নীরব প্রজ্ঞাগুলি
দিরাছি। তাই তাহার হাতছাড়া চাওয়া ধরিয়া বলিলাম—
“ভাগ করিস না বিনায়ক, কি বলি সমস্ত পূণ্য বসু।”

—“কি বলব সেইটেই ত চেয়ে পাই না ছোটি, কোন
অন থেকে বলব। গত জীবনটার দিকে চোখ ফেরালেই
বেগতে পাই সেখানে সংঘাতের পর সংঘাত। কিন্তু আমার
সর্বনাশ কে করলে জান? ঐ পটলী। কি কখনোই না
ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল! মাইনে যা শেতুম সমস্ত
ওর পায়ে জেলে পিছুম। আরে বউ, ছর বছরের মধ্যে তাদের
দিকে কিরকম বেগতুম না। মেবেটা কিসে মল্ল, জান?
এত রকম যোগও মগতে মাছে!” বলিয়া বিনায়ক হাসিল;
সে হাসিল কি অর্থ বৃথিলায় না।

—“ভাকারে বললে, মেবেটা ছর বছর ধরে আধ-পেটা,
শিক-পেটা খেয়ে, মেকরঙ বেঁকে ম’রে সেম।”

শিরিয়া উঠিলাম। মনে হইল যেন চোখের লক্ষ্যে
বিষের গারিরা এক ছর বঙ্গবীরের মেকরঙটোম শিকর আকৃতি
লইয়া কোকোইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

—“এততেও আমার লক্ষ্যের পাতি হ’ল না। এক দিন
বললে—মত যে ভালবাস, ভালবাস বল, কই কাও শিকিদি
বউয়ের গহনা জগো এনে।” তখন মনের বেগায় ছর
হ’রে আছি—বসায়, “পারিবা?” সে বললে—“কখনো না,
তোমার সব বুঝে।” বলে পটলী হাসলে—পটলীকে তুমি
বেগনি, তাই সে যে কত বড় ভাইনী তা আমি তোমার আঘ

বলে বোঝাতে পারি না। তার সে জানি আমার পাপলু ক’রে
বিলে, ছুটে বাড়ী গেলুম। আমার বউ অনেক লজ করত।
মাতালের বউরা লামারত যা লজ করে তাব চেয়ে একটু
বেগাই; কেন না, তুমি ত জান, আমার হার-
হাটটা ছেলে বেলা থেকেই একটু বেগা। কিন্তু
গমন তার বাল্লের দেওয়া গচায়ান। তারী গমন; তার
বাক্সায় হাত বিলুপ তখন সে বাখিনার মত আমার উপর
কাঁপিয়ে লকলে—এক বাক্সকে আর গুই লাগিতে তাকে
অজান ক’রে কেলে তাব বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেলুম। যখন
কিরে এল তখন তোর চাওটে, এসে—এসে—তার গলায়
আর যেন লগলা বন্ধ হইয়া গেল, সে যেন নাকদ আতকে
একেবারে কার হইয়া বসিয়া বসিল—আমি ভীত ভীত;
বলিলাম, “বিনায়ক, চল যাবে?”

সে বলিল—“কই দাড়া?” তাহার পর জল বাইরা
কতকটা প্রকৃতিহ হইয়া করিল—“এল সেখলুম আমার
চির-অনাতা বউ গলায় বড়ি নিয়ে কাঠে হ’রে মুলছে।”

তখন হইয়া বলিলাম। মনে হইল যেন লগলা লগলা
বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়া আমার লম বন্ধ করিয়া নিতেছে।

—“সমস্ত দিন রাত্তার রাত্তার খুবলুম। লগলায় সমস্ত দিক
করলুম—যে গহনার মতে একটা নারীহতা ক’রে কেললুম সে
গহনার বাক্স পটলীর হাত থেকে উদ্ধার ক’রে গলায় জলে
বিলক্কন দেখ; সেইদিন রাতে পটলীরা বাড়ী থেকে গহনার
বাক্স চুরি ক’রে পালাই। যখন ধরা পড়তে আর দেবী নেই
তখন তোমার কথা তখন্তে গেলে তোমাকে টেলিফোন
করি। কিন্তু আর পারি না। এখন মনে হয় এ আগার হাত
থেকে বত শিখ নিরুতি পাই ততই ভাল।”

সমস্ত গুনিয়া করিলাম—“বাক্স, সমস্তই ত হ’ল, এখন
কি করবে দিক করত?”

—“কি আর করব, একরকম তিকে ক’রেই কটা দিন
চালাছি আর ধীরে ধীরে ওপরের দিকে এগিয়ে চলেছি।
এই রকম ক’রেই কাটায।”

—“তার মানে?”

—“মানে আর কি। অনবরত মদ খেয়ে লরীয়ে আর কিছু
মাছে যে তাই।”



হরের ভিতর উঠিয়া গিয়া একখানা পাঁচপত টাকার চেক লিখিয়া বিনাধকের হাতে দিয়া কহিলাম—
“আমার এ অঙ্কুরোষটা রাখতেই হবে বিপ্লু, চিকিৎসা করা, বাঁচু। এখন আমার দশ দেবা কংবোয় তখন এমন বেবোরে তোকে মারা বেতে দেব না।”

বিনাধক চেকটা হাতে লইয়া দৌরে দৌরে কহিল—
“আমি জানিই যে—আমার বায়না তুল হু না—
তোর ভিতর যে কত বড় মহৎ গ্রাণ লুকিয়ে আছে তা জানিই নেই। সেদিন টেলিফোন করতে সাফল্য করেছিলাম। ওর খোঁজ, আমার জীবনের যে কত কী নষ্ট হ’য়ে গেছে সে সব তুলে গিয়ে আজ কি নিজে বাঁচব রে।”
“আজ কি মনে হয় জানিস, মনে হয় যদি নীচ না মরি তা হ’লে কোনদিন হরত ঐ পট্টনীকে খুন করে ক’লি যেতে হবে।”

অর্ধকণ্ঠে কহিলাম—“না না তোকে বাঁচতেই হবে বিপ্লু, এমন করে নিজের মূল্যবান গ্রাণটাকে নষ্ট করিস না। যা গেছে তা গেছে, এখন আমার নতুন ক’রে জীবনী গড়ু।”

বিনাধক হাসিয়া আমার শিরের উপর হাতটা রাখিয়া কহিল—“বেল ত ব’লে গেছি যা গেছে তা গেছে, কিন্তু তত যে গেছে তা ত তোকে আজ বোঝাতে পারি না। তবে এখন বলছি তখন চেষ্টা করব। তবে কি জানিস, চিরদিন বার্থ হ’রে হ’রে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি—এখন মনে হয় বুকি বার্থতাই জীবন, আর সেইটাই তার চরম সার্থকতা।” বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তাহার বাহার পর পত্নী সুরমা আসিয়া বলিল—“একটা মাতালের সঙ্গে কি এককথ করছিলে বল ত, আর আবধকী চল ডিনারের বেল বিয়েছে।” কোন কথা বলিলাম না। কিন্তু ইচ্ছা হইয়াছিল বলি যে, যেদিন তোমার প্রবেশ করিবার পক্ষি হয় নাই, সেদিন সেই জীবনের প্রথম প্রত্যতে জন্মের সমস্ত সঙ্কিত স্ত্রীভিগ্নতার নিঃশেষ করিয়া ঐ মাতালটির হাতেই পণিগ দিয়াছিলাম।

৪

ইহার পর অনেক দিন তাহার আর কোন খবর পাই নাই। আমার জীবনাকালে সে খুনকতুর মত মহা উদিত

হইয়া আমার পারিণাম না।

একদিন বিকালে শোলোক টীটে কয়েকজন পাটের দালালের সহিত দেখা করিয়া ক্রামবাজারের দিকে বাইতেছি এমন সময় ট্রেডিংবাজারের মোড়ের মোটরের গতি ধামিয়া গেল; বাণেশ কি মানিবার মত সুখ বাড়ীতে দেখিলাম ছুটপাখের খায়ে বেশ একটু জনতা হইয়াছে। মোটরচালক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল একটি মাতাল চলিতে চলিতে ছুটপাখের উপর পড়িয়া গিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া আছে, এবং তাহারই আশে-পাশে এই জনতার সৃষ্টি।

অল্প সময় হইলে হরত মোটর চালককে গাড়ী ঘুরাইয়া অল্প রাস্তা দিয়া চলিতে বলিলাম; কিন্তু বিনাধকের কাহিনী শোনার পর হইতে সমস্ত দরিদ্র অদ্বার জাতির উপর নিজের অধিকৃত কখন যে একটা আকর্ষণ দৌরে দৌরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। মনে হইত তারতের প্রত্যেক দরিদ্রটির ভিতর একটা কলম ইতিহাস লুকাইয়া আছে; একটু চেষ্টা করিলেই তাহা জানা যাইবে, আর তাহাদের সমবেত ইতিহাস হরত একদিন সেপের অস্তরকে নাক্তা দিয়া যাইবে।

গাড়ী হইতে নামিয়া মাতালের নিকট গিয়া দেখিলাম সে বিনাধক। বিস্মিত হইলাম না। মোটর চালকের সাহায্যে তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলাম। একবারে বোর্ড মাতাল। নরপথ, গায়ে জামা নাই। পরনের কাপড় অসংযত। সমস্ত মাথার লম্বা লম্বা তুল—তাহাতে কাবা ও ধূলা। সমস্ত গায়ে কাঁদা। মাঝে মাঝে তুল বকিতেছে। যবের উত্তর গড়ে আমার প্রাণ যেন অর্ধিত হইয়া উঠিতেছিল।

ভাক্তার আসিয়া বলিল ডিগিরায় ফি ইয়েম; জান নাও হইতে পারে। বড় আশা করিয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রে বসিয়া রহিলাম, যদি একবার জ্ঞান হয় তাহা হইলে এইবার পাঠের বাড়ীর নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাহিয়া লইব। যেদিন বড় আশার বুক ধামিয়া আমার আশ্রয়ে আশিয়াছিল, সেদিন কেন বিদ্রোহে সাহায্য করিয়া তাহাকে এই জ্বালের হাত হইতে রক্ষা করি নাই!

কিছু জ্ঞান । ত্রি চরিত্র ।

কাহ্নার কাছে আসে যেহে কিছুকিছু বৃত্তিও পাইব না

বহুসংখ্যক লগাটে চুলিছা সাগরবিধি বুল বাক্যে
লাগিল । কিংবা বসিল অনেক কথারি মনে নীরে, তবে এতদুঃ

মনে আছে, একবার বলিয়াছিল — “তুমি আমাছপাট্রে বগছ
জোড়ি, কিংবা কি ক’র ব’ড়ি বগ ছ ।” মনে না খোলেও জগি

বউ খলোৎস’ডি’সি’য়ে কুলছে, মেয়েটা অন্যভাবে জিকি

একটা ডাহলী, অন্যববও ঢাকা আর গ’লনা গাছ’ছে,

মনে না খোলে কি ক’রে থাকি ।” আবার নিঃস্বত

লড়িল । কত ডাকিলাম, কত উষষ সিলাম ।

সাত্তে তিনটে’র সময় তাহাব যেন লবিহার জ্ঞান চটল । আম’দ

সি’কে চাইছা হা’গিয়া ব’লিল—“বড় হা’বেই ম’বডি, তোর

হোল কা’ছে ব’ড় ছা’ড়া’ ছ’ব’বে আম’দ কেউ

ব’লিছা ল’লসা গা’উ গা’উ ক’লিছা উঠিল ।



ইসলামি প্রেম কাব্য

ত্রিবিমল সেন

পর্লোয়ামে বাগা 'গাছির গান' ইত্যাদি লোকগ্রন্থ অঁড়নধের ছড়া বাধেন, তাঁদের অধিকাংশই সুন্দরমান। সুন্দরমানপ্রধান পর্লীর অধিবাসী বলিয়া বালা হইতেই হমোর এই ছড়াপানের দিকে বিশেষ কৌত ছিল। গান গুদিত ভিতর মোর একটু-আধটু থাকিলেও কুদিমতা মোটেই ছিল না। অশিক্ষিত পর্লী-কবিদের প্রাণে যে সফল কবিত্বের স্রোত প্রবাহিত, এবেন তার লীলাধিত উজ্জ্বল। বখারীতি হুহতো তা বহুধা চলিতে চানে না। কিন্তু শৈলগারোঅধিকপ্তা নিক'রিগি থেমম অঁক্তিয়া-বাকিয়া উজ্জ্বল আনন্দে, উজ্জ্বল হুশে নাতিয়া চলে, এ গানগুলিও তেজ্জ্বল রীতিকে লজ্জন করিয়াও হুশর ভাবে নাতিয়া চলিয়াছে।

এ সুন্দর স্ববিরের ডালি আনও পর্লোয়ামের দিক্তত্বহরে আবৃত। চটরখানি মাত মাক-মাক সাহিত্য-বদিশি-পাম্রপের বুল্লিগতে সমর্থ হব। আমাদের হেলীর ভাপ লোকই এদের কান সংবোধ রাধেন না। অবস্ত তার অনেক কারণও আছে।

এরমত, পর্লী-কবিতা অশিক্ষিত বলিয়া তাদের কবিত্বজ্ঞান প্রায়ই হুত্ব। সর্গদা প্রোঁগিত অনেক শব্দের বানানও এমন তাবে করা হব যে বোকে কার লাগে! 'কপোতীয়া' শব্দটা পড়িয়া এখমেই একটু ধাঁধা লাগে— কিন্তু পরে বোকা যায় ইহা আমাদের চির-পরিচিত 'কপোতীয়া' শব্দ। বর্ণিতকিবোধ প্রায় প্রত্যেক শব্দেই আছে—এর উপর আবার উর্দু কাসী শব্দের অকারণ প্রোঁগ।

বিতীত—পর্লী-কবিত্বের শোচনীয় দারিত্র্য। প্রায়ই তহিদের বই ছাপবার মত অর্থ-সামর্থ্য থাকেনা। যে ক-একজন বা বই ছাপান, তাহারও কিছু মোটে কাগজে সাধারণ হরকে বই ছাপেন। সকল কবিত্বের হুশ গড়ে ছাঁচে ঢালা—কাজেই তত্ব করিয়া পড়িয়া যাওয়ার পক্ষে

বিশেষ অসুবিধা। আধুনিক সাহিত্যসংকলনের দৃষ্টি আকৃষ্টে কবিত্বের মত গৌরব বা চাক্চিকোর ইয়াতে একতিই অডাব। ইসলামি পুস্তকবিক্রেতাদের ঘোকানে ইহা অনাবহে পড়িয়া থাকে।

এই প্রেমকাব্যের কবিত্ব প্রায়ই মৈমনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানের অধিবাসী। ইহাদের শত করা একজনও হুত বই ছাপান না। উৎসর্বাদি উপলক্ষে নিজেদের মন হুইতে ছড়া-গান বিবৃত করিয়া পর্লী-স্রোতবন্ধে কুঠ করিয়া থাকেন। সধর পর্য্যন্ত তাঁদের কঠ আসিয়া শৌছার না। পর্লী-কবিতা ভীত, সহজ। পর্লোয়ামের সীমার বাহিরে যে তাঁদের রচনা সমাদর গাত করিবার যোগ্য, একথা তাঁহারা স্বপ্নেও বোধহর করেনা করেন না।

কিন্তু একটা ভালো কথা দেখিলে যেমন পিপাসুহৃৎকে ডাকিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে, আমারও তেজ্জ্বল ইচ্ছা করে এই পর্লী-কবিত্ব সুবীজ্যের অপোচরে পর্লীর দিক্তত্বকে যে মধুচক্রের রচনা করিয়াছেন, তাহার স্বরিত মধুপাত্র সাহিত্য-রসিকদের মধুপে তুলিয়া বরি। তাই আমার এই কুত্র উত্তর। কয়েক শত ইসলামি কাব্য পড়িয়া আমার যে করখানি সব চেও ভালো লাগিয়াছে তারই কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব

এই প্রেমকাব্যগুলি পড়িয়া প্রথম লক্ষ্য হব, তাঁহাদের কবিত্বের উপর হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব। প্রেমকাব্যের হুজে হুজে হিন্দু ভাব, গুণ, উপমা, এবং ধর্ম ইসলামি ভাবে ঢালাই ইহা এক অপূর্ণ ঐ গায়ন করিয়াছে। ইহা চত্রে বায়ু বঙ্গল অপর কিল্লর—সবসেই আছে; অথন্ত সকলের উপরে আছেন আল্লা-হ-তায়া। হিন্দু দেব-

দেবীপণ মুলমানী বর্ণের বিরোধ, কিন্তু মুলমানদের সঙ্গে তাহাদের নানারকম সম্পর্ক হইতে পারিত। ইজের সত্য প্রেমকাব্যের অনেক নাতিকাই নাচদান করিতেন। প্রেমকাব্যে পাই—

গদা হুগা শিব মাথা, তাহাকে করিত লড়া,

মদো তাহা দাখির হইত :

(গদা কাণ্ড ও চম্পাঘাতি)

নাগোপরি আরোহিতা, বেল পদা দাখির করেত :

হাসিয়া সেলাব করে,

চুপী তরী বলি করে

বসি বসি ললি কোলেতে।

(গদা কাণ্ড ও চম্পাঘাতি)

গদা, চুপী, কালী, মনসা, ইজ, চিত্র প্রভৃতি কোন দেবতাই কবিদের কাছে মিথ্যা নহে। কিন্তু মদা এই, কিন্তু সেকদেবীতে সম্পূর্ণ আত্মবান্ এই কবিগণ হিন্দুদের মুলগদানী বর্ণে দাক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে কল্প করিতেন না। কি যে তাঁহাদের দৃষ্টি, তাহা স্পষ্ট কথিয়া কোথাও বলিল নাই। তবে—হিন্দুধর্ম লড়া নহে, মুলমানী ধর্ম একমাত্র লড়া, অতএব গ্রহণ কর—এমন দৃষ্টি তাঁহারা কোথাও প্রয়োগ করেন নাই। মুলমানদের দল তারি কজাই বোধ হয় ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই জনৈক কবি তাঁর নাগকে ধুব দিয়া বাহির করিতেছেন—

করাটেতে পারি বলি গদার বর্নব,

হেবা কিনা মুলমান করে বীকাব।

গদার বিধাসী গাধারা, তাহারা গদাধর্ষণ করিয়াই আপনাদের পিঙ্গ মনে করেন। তারপর তাহারা কেন মুলমান হইবেন, একথা কবি তাহারা বলেন নাই। আসল কথা, পরীবাণী মুলমান কবিদের ধর্ম খাটি ইসলাম ধর্ম নহে—উহা হিন্দু ও মুলমান ধর্মের মিশ্রজন।

পরীবাণিসণ এ কথার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আশিকাল একটু অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলেও সেদিনও দেবিধাষি মুলমানগণ হিন্দু পুণ্য রীতিমত উদ্ভব করিয়া থাকেন। হুগা আতিবা নবীতে ভূষাতিত মুলমান,—বিজ্ঞা বশবীর এগাম জানাইরা মুলমান মণেশ আদার করিত। হিন্দুদের জার তাহারাও কালী শীতলা প্রভৃতি উদ্ভব

দেবতার খোলায় কলেয় বসন্তের প্রকাশপাতির মত মানব করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের উপর হিন্দু ধর্মের কত-খানি প্রভাব, তাহা সহজেই অন্বেষণ।

তুধু ধর্ম মণকে নহে, সাহিত্য সঙ্কে কবিতাও হিন্দুদের প্রভাবে প্রভাবাধিত। গ্রামে রামায়ণ গান, চণ্ডীকৌতন, রহানি (মনসামঙ্গল গান), বাজা, কলকতা প্রভৃতি হিন্দু মন্ত্রদান আবহমান কাল ধরিয়া এত বেশী প্রচলিত যে, মুলমান হ'ক্, খ্রীষ্টান হ'ক্, কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই তাহার প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। এই মুলমানে কবিগণও জানিয়া এবং না-জানিয়া হিন্দু পুরাণাদি অবলম্বনে কবি রচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বলা বাইতে পারে।

ভেলোয়া হুমরো সনাম শীতা-সময়তা-চিত্তা

আমির সাধু বর্ণিতা ভেলোয়া হুমরো আদব লতা।
একবার তিনি নবীতে গল নিতে বান্। ভেলো সাধু তখন ভিত্তি সামাইয়া সেইখান দিয়া বাইতেছিলেন। ভেলোয়ার অসামাজ ভগলাবা দেবিয়া মৃত ভেলো ভেলোয়াকে বলপূর্বক নৌকার জুলায় বধেণ লইয়া—মোক্ষো। তারপর তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হুচুয়া ভেলোয়া বহিলেন, এ ছ'মাস আমার একটা ভ্রত আছে, এ ছ'মাস না গেলে পুনবিবাহ করিতে পারিব না।

আমির সাধু নিমন্ত হইলেন, কিন্তু ভেলোয়া হুমরো নিমন্ত হইলেন না। তিনি নিজেই কাছিনী বিগত করিয়া একটি গান রচনা করিলেন, এবং যেনে যেনে লড়া পাত্রাইয়া সেই গান গাওয়াইলেন। কেউ সে গানের জবাব দিতে পারিল না—পারিলেন তুধু ভেলোয়ার হামো আমির সাধু। আমির সাধু তখন ভেলোয়ার সজান শাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিয়া গেলেন। কিন্তু যেনে গিয়া এক বিব্রাতি উপলব্ধি হইল। এতদিন ভেলোয়া হুমরো পরবাসে বসিনী ছিলেন, তাঁর চরিত্র যে 'ছটুটি' আছে, তার প্রমাণ কি? প্রবাণিনী ভেলোয়ার আশ্বপদীকা হইল। (ভেলোয়া হুমরো) — অর্থাৎ নব হইলেন না বটে, তবে অভিমানে এ মর্ত্য ভাড়া।



অন্তলোকে চলিয়া গেলেন। এই কাহিনীরচয়িতার উপর যে চিন্তা, সমস্যা এবং সত্যের কাহিনীর প্রভাব আছে, তা পৃথিব্যানি পড়িলেই অনায়াসে বোঝা যায়।

বদিউজ্জামাল বনাম বিজ্ঞানসন্মত

বদিউজ্জামাল বদিয়া যে একবারি বই আছে, তাহা তথ্য বিজ্ঞানসন্মতের মতল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ভিন্ন দেশকাল পাতের অবসারণা করিয়া কবি সেই পুরাতন বিজ্ঞানসন্মতের কাহিনীই আমাদের পুনাইতেছেন। ইহার প্রস্তাব, বর্ণনা, এবং প্রত্যঙ্গপ্রণালী সবই বিজ্ঞানসন্মতের স্তার, তবে যে অসামান্য কবিত্বপ্রভাব প্রায়শ্চলিত বিজ্ঞানসন্মতের তাহা বসাল করিয়াছে, বদিউজ্জামালের কবির তাহা অসম্ভব নাই। তাই তাঁহার তাহা রচিতা বরিয়া অসংগত এবং অশাস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

গল্পটা হইল—বাল্মীকিরা ছয়জনমুসক পতমাস্ত্রমুসকী কস্তা লালমতিত চিত্র দেখিয়া উদ্ভাস হইলেন, এবং নারিকলাভের আশায় বিদেশ যাত্রা করিলেন। যত পথটানের পর তিনি সেই দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন, যেখানে লালমতি থাকেন। কিন্তু লালমতি রাজকস্তা অস্ত্রপুত্রচারিণী। তাহাকে কি করিয়া পাওয়া যায়? তখন কৌশলী ছয়জনমুসক রাজবাটীর মালিনীর নগ্নপাশ হইলেন এবং এক দিন মালিনীর পুত্রবৎ সাক্ষিয়া রাজকস্তার রক্তে প্রবেশলাভ করিলেন। তাত্রপর বিজ্ঞানসন্মতের মত প্রেমের অভিনয় চলিল। সেই মুহূর্ত্ত, সেই প্রেমোদ্বিগ্ন, সেই বর্ণনা, সেই বিচারের পালা। পড়িতে পড়িতে মনে হয় এ যেন দ্বিতীয় বিজ্ঞানসন্মত পড়িতেছি।

কাব্যরচনার প্রণালী

এট মব কাহিনী বাতীত কাব্যরচনার সাধারণ প্রণালীও হিন্দু কবিসংগেই অসুস্থ। ইহাতে ব্যক্তমানী বর্ণনা আছে, বিরহিনীর কোকিল বা ব্রহ্মের উপর কুহক-কল্প কটাক আছে, মদনের মূলপত্র, পদপত্র ধরিয়া মানভক্তনের পালা আছে। সূত্রাদির বর্ণনা নায়ক নায়িকাদের মধ্যে সজোপ-চিহ্নের বর্ণনা, নায়ক-নায়িকাদের রূপবর্ণনা প্রভৃতি

মবই হিন্দু কবিরের স্তাব। এই কবিতা বর্ণনা করিতে কবিত্ত সমস্ত সমস্ত কুসিদ্ধা বহির্ভূত, স্তাভাতা মূলমতান। প্রায় কবির মূলমতানো নায়িকার মধ্যে সজোপ-চিহ্নের বর্ণনা করিতে গিয়া বসিয়াছেন, নায়িকার এতাত্তি-চিহ্ন কপালের শিরুর বিশদীকৃত হইয়াছে। মূলমতান রমণীয়া যে শিহুত পছেন না, বর্ণনাকালে একথা বোধ হয় কবিরের মনে ছিল না। হিন্দুপ্রভাবের ইহা একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

কাব্যের পরিকল্পনা

এই প্রেমকাব্যকে নিছক কাব্য বলা চলে না। লোক-মতনিরপেক্ষ হইয়া আত্মনির্দেশে বিভার কবি যে কাব্যরচনা করেন, ইহা তাহা নয়। এই প্রেমকাব্য সাধারণত পলীতে পলীতে গীত অথবা অভিনীত হয়। অতএব ইহার নাম দেওয়া যায় লোকসাহিত্য। লোকপ্রিয় করার জন্য কবির ইহাকে ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল করিতে হয়। কবি বিশেষ বিশেষ অবস্থার অবতারণা করিয়া পলীপ্রোতুৎককে প্রেমিকত, আগ্রহাব্যাহিত, এবং উৎফুল্ল করিয়া তোলে। এক কথায় বলিতে গেলে—কবি কাব্যে ঘটনাবৈচিত্র্য পরিমুদ্রিত করিতে গিয়া এক-একটা সংঘর্ষের অবতারণা করিয়াছেন।

বস্তুত, সংঘর্ষ না থাকিলে পলীসাহিত্য অর্থহীন। পলী-প্রোতাতা সাধারণ জীবনধারার দার্শনিক ব্যাখ্যা: তিনিতে উৎস্রুত নয়। কবিত্ত মূলমতান এক মূলমতান রমণীকে বিবাহ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে দিনের পর দিন সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—এতে পলীসংগীর তৃপ্তি হইবে না। কবিত্ত কাব্য হইয়া সংঘর্ষমূলক কাব্যের পরিবেশন করিতে হয়। ইহাই লোকসাহিত্যের সঙ্গকথা। ইহার উপর এই প্রেমকাব্যের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত।

এই কাব্যের বিবাহ হইতেছে নায়ক-নায়িকার মিলন। মিলন ঘাটতে আকাঙ্ক্ষার আগ্রহে মূগুর হইয়া উঠে, তন্মত এই মিলনের পথে কবি কবিত্ত অসুস্থতার উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইসলিমি প্রেমকাব্যে নায়কপদ মূলক কেহেই মূলমতান। এখন নায়িকার নায়কদের সম্ভলতা হইবেন না, হইলে আসব তমিবে না, কাহেই নায়িকাপদ প্রায়ই হিন্দু কস্তা বা হিন্দু বৎ। যে ক্ষেত্রে নায়িকা

মুসলমানী, সেখানে হয় নারিক। নারকের শত্রুত্ব, অথবা পরত্রী, অথবা নারকের গুরুত্বন এ মিলনে বাদী। নারকের শিতার দিক হইতে যদি বা বাধা না আসিল, নারিকার বিক হইতে এই বাধা আসিবে। এই বাধা অভিক্রম করিয়া নারক-নারিক। মিলিত হইবেন।

কিন্তু তৃতীয়াঙ্কমে যে নারক-নারিকারা প্রেমের প্রস্তাব প্রুতিয়ার আগেই বাণাবিগাঙ্কে বন্ধ হইয়াছেন, তাহাদের মত শত্রু বাবস্থার অযোগ্যন। তাহাদের মিলনে বিচ্ছেদ ঘটনো চাই। এর মত শাত্তী-নন্দী আছেন অথবা অত্যাধিত আকস্মিক কোন বিশদ আছে। মোট কথা নারকনারিক। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। নারক শতশত্রু বিশদ বাধা অভিক্রম করিয়া নারিকার সহিত মিলিত হইবেন। এই পুনর্মিলনের বর্ণনাবলে প্রেমকাব্য বেশ জমিা উঠে।

অনেক সময় নারিক। যথঃ এ বাধা জ্ঞান। বুদ্ধিমতী হইলে এমন চুত্রে প্রেমের উপাণন করেন যে নারক। তাহার জবাব দিতে সঙ্গত্বর্ষ হইয়া উঠেন। শাপিপ্রাণী নারিকার সমস্তাপুরণে অসমর্থ হইয়া প্রাথই রাজকস্তার বকী অথবা ক্রোড়ন হইয়া থাকেন। নারক শুধু সে সমস্তাপুরণে সঙ্গত্ব হ'ন। অনেক সময় সমস্তাপুরণের পরিবর্তে গাথাখেলার অবতারণা করা হয়। নারকে নানানু কিকর-কমি করিয়া এই পাণ্ডার জ্ঞানাত করিতে হয়।

কিন্তু পূর্বকথিত কোনো দিক হইতেই যদি বাধা না আসে তো, নারিকাকে পরোয়াখোর কত। বলিয়া তুলতা করিয়া তোলা হইবে। মোট কথা, নারিকাকে অসঙ্কলভা। করা চাই। কবির ধারণা,

‘বিনাঙ্গনে গেলে হয়, কে করে তাহার ধর ?’

নারকে দিয়া তাই তিনি অনেক নাহুধের অসাধা কাজ করাইয়াছেন। মত বন্ধ বিখ্যাত বাণ্যার একমাত্র ছেলে হইয়া নারক কবির সাক্ষিলেন, তারপর রাজকস্তার সন্ধানে একাধী নিকচ্ছেদ-বাক্ত। করিলেন। পথে কত রাজস বর করিলেন, কত শত বুদ্ধ জর করিলেন ইত্যাদি সন্ত বঙ্গলব অনেক বর্ণিা। কাম। পরিপূর্ণ। যেখানে কোন কাণী নাহুধের পক্ষে একান্তই অসম্ভব, সেখানে সৈবশক্তি বা সৈব নাহুধের অবতারণ। করা হইয়াছে। বাব, কুমীর

নাহু সকলে নারকের পক্ষ হইয়া গড়িয়াছেন। নারকে: কোষপূর্ণ দৃষ্ট পড়িল আর শস-পুরী বাউ-খাউ করিয়া জলিয়া উঠিল।

এই ধরণের কল্পনার চাতুর্য। সকল সাহিত্যেই আছে। দ্বিপুত্র প্রামাণ্য অমাত্যত পুরাণাদিতে এ কল্পনা অতিরিক্ত পরিমাণেই আছে। কাব্য জনপ্রিয় করিতে হইলে সে সংবর্ধের প্রয়োজন, তাহার মত প্রাথই ইহা অপরিহার্য।

রূপবর্ণনা

কাব্যের দুই প্রধান শাখা—রূপবর্ণনা এবং প্রেমবর্ণনা। রূপ এবং প্রেমের মধ্যে কোন অসঙ্গীতমত্ব আছে কিনা জানি না, তবে সকল দেশের ক্লাসিক সাহিত্যেই কবিরের প্রেমসুতীর প্রধান ভোক্ত হইয়াছে মপ। নারক-নারিকার রূপবর্ণনা: জলে সকল কবিই তার মানদী মুক্তির সৌন্দর্য: বর্ণনা করিয়া: ছেন। নারক-নারিকার চরিত্র নিখুঁত রূপও নিখুঁত। প্রত্যেক কবিই সৌন্দর্য: বর্ণনা: জলে তার কবিরের জাতের উচ্চ। করিয়াছেন। এক বিবরে সকল কবিরের মধ্যে একটা আঙ্গণা মিল আছে। নারক-নারিকা সাধারণত এমন সুকী হইবেন যে বেৎকেউ তাহাদের চোখ তুলিয়া দেখিবেন, তিনিই মুক্তি হইয়া পড়িবেন। নত নারী পরম্পরার সৌন্দর্যে: বন্ধ হইয়া মুক্তি। যার, এ বর: কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু আমাদের আঙ্গণা: জাগে তখনই বন্ধ দেখি নতের রূপবর্ণনে এর মুক্তি হন, নারীর সৌন্দর্যে: নারী মুক্তি। হন। স্বাধী। কতংব সত্য, মনস্তত্ত্ববিদ্রাই তাহা বলিতে পারেন।

এই সন্দর্ভ-মাছের বর্ণনা: জলে জটিল কবি বলিতেছেন—

বেলের আগেতে তাব আত্ম যবে যায়,

সুকারি করিতে যাবে, কবে হার হার।

চুরতের কানে যোবে কৈল প্রেগ্রাব,

কেমনে বাঁচিব আর বিধানে তাহাব।

(বড় নিম্নাংশাধলার কেকা)

‘প্রাণের মাঝে যে চকু, তাহাতে আমার মত বঁচিয়া বাইতেছে। সুকারি। কামিতে পারি না, শুধু হার হার করিতেছি। রূপের কানে আমার প্রেগ্রাব করিয়াছে। তাহাকে বাঁচী। আমি কেমনে বাঁচিব ?’



এর পরেই মুক্তি।

এই জাগরণেই কাবির খামেন নাই। সুন্দর নারকপণের দর্শনে মননবাণীভূত কৃত চকল নারকপণের খেখোক্তিও ছুরি ছুরি প্রয়োগ করিয়াছেন।

‘মান জন করে বুঝা পাই যদি তবে।

বাঁধিয়া পলাতে আমি হাং হাং করে।

কেউ বলে তোরা বুঝাছোঁর কথা পোনে।

যেমন ম’লিডা করে জুড়াই জোনে।

আর জন বলে যদি যেন তপ পাই

সদা লয়ে বুকে আমি রজনী পোহাই।

যেহ বলে যদি আমি পাই এ মাথরে।

তোপাগরে যদি তরবার চোরা করে।

(পোয়েনু ও মূলহাসেন)

এখানে একথা বলা দরকার যে কাবির শুধু জন বলিতে বাঙ্ সৌন্দর্যই বোঝেন নাই। কবির সুন্দর কল্পনা-মাধুর্যমাত্রিত হইর তপের আর এক ছাতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—তাঁরা পবিত্র এবং প্রকৃত ভালোবাসা! জনকে প্রশংসা করিয়াই মাত্র তৃপ্ত হই না,—তাহাকে পূজা করিবার একটা বৃত্ত। মস্তুরে মস্তুরে বাঁধিয়া উঠে। কবির ভাবের অসীম প্রেম। এই প্রেমে বিহ্বল আমছারা নারক বলেন,—

‘আমি বলে বাট-বাই, মন কিন্তু মানে বাট,

যদি বা বুঝাই মনে, না বোঝে মনে,

যদি বাট করে ছোহ, গ্রাণ নাহি যাবে মোর,

পালি বড় দিতে মোর কিবা প্রয়োজন।’

(ভল মকাজী)

এ প্রেম যেন চুরকের মত নিরস্তর আকর্ষণ করে। সুসীতির বোহাই দিয়া মনকে যদি বা কতকটা সামাল করিতে পারি, চক্ষু কোন মানা মানে না,—কোন মজ্জাত মুহুর্তে যেন ব্যাক্তির রূপমালা ভেদ করিয়া গ্রাণও নারিকার গ্রাণের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাই কবির আক্ষেপ—

‘পালি বড় দিতে মোর কিবা প্রয়োজন।’

নয়ন-মন-গ্রাণের এই বন্দী বিশ্বের চিরন্তন প্রেমলীলার— উপাখ্যান। কবে গ্রাণ জয়ী হয়। সুন্দরী নারী যেন

জামলা পুষ্পোত্তিতা একখানি উতান। তার সৌন্দর্যে যে আকৃষ্ট হয়, সে শুধু বাহিরেই পঁড়াইয়া থাকে না। কলিত সাহসে দৃঢ়পদে সে তার অন্তরে আনিয়া আসন গ্রহণ করে।

এ প্রেমকাব্যাবলিতেও ভ্রমের সেই অর্থটিই ছুটানে: হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির তত্ত্ব আমি তাহ সামাল করেকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যেন জন না পাইয়ে যেনতা কিয়

সুখের লাগে: জিনি কোটী পন্থহ।

আর যে যদিও কীতে যিনি মাথাইয়ে।

মলকোটি তাহা যেন উল্লস করিহ।

জনা কুল জিনি মিছা, তাতে ব্যর্থ পন।

না বাটে উপমা কিবা করিব বাপন।

সুখের মন বুঝা পোতিত গোচন।

জিনিয়া চক্রে হটা তাহার কিপন।।

চক্ষু বেশি সেই বনো যাহ পানে চাহ।

গ্রাণহাঃ হইগা সেই কবে হার হাঃ।

অন্যের বর্ষ জিনি লাখা বেশ মাগে।

পঁড়াইলে পড়ে কেন পায়ের তলাঃ।

কেলেবার কটীতুলা কটী তাহ নক।

তাম্র পিত্ত আর পেট-পিট-উঃ।

সুপমন হরণম, কি করিব যদি।

তাহার উপমা নাহি রিতুন মুক্তি।

আকাশের বিকে যদি তপ্পাবতী চাহ।

গ্রাণহাঃ হইগা সেই কবে হার হাঃ।

(বাহি কাণ্ড ও তপ্পাবতী)

‘আকাশও গ্রাণহাঃ হইয়া হার-হার করে যাকে দেখিয়া, না জানি সে কত সুন্দরী!’

২

কজার দুহাতের পুঁথি কি কব হাঃ।

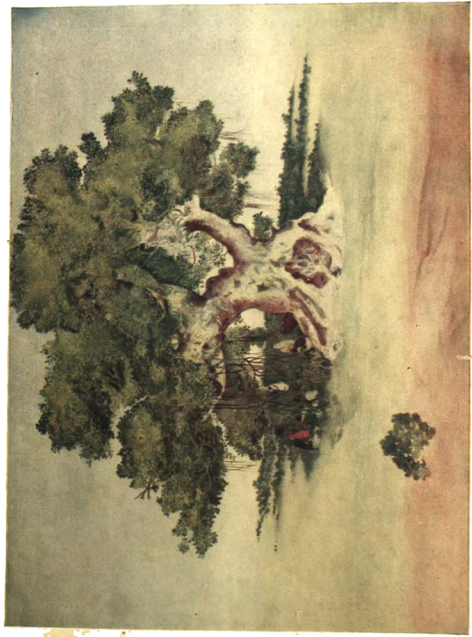
কজরেতে তাহ যেন উঠেবে আ’নানে।

বুকেতে মৃতন কহ, কি কব হাঃ।

হুগে যানাইয়ে যেন তেপুধা সোনার।

অ’খির কোড়া কুল যেন হুট কামানি।

হুগের মন বেহা কোকিলার বাই।



জীবনল সেন

বিষম বাণের কোণ যেন বেঁধেছিলি ।

হাসিতে ঢককে বেরত। যেসেব বিমল:

মুখের ছুরত বড় জিনি মধ্য মূল

মুখ বেধে ঢেঁকে-ঢেঁকে করিব মূল-মূল ॥

১ কলকলমূলক

৩

‘কল্লার ছুরতের পুঁথি’ এখনই খেব হই নাই। কবি
তাহার বিশদ বর্ণনা করিতেছেন—

মুখ চেহারা আশ্রয় বেত্ !

এই আশ্রয়ের দান

যেহা বেসোঁয়াই আরম্ভ।

হাসি মুখের ফিকলী টুক ॥

টোটে ছুই জিনি রূপাকুল :

নাসিকার উল্ল যেন বাঁধি :

তাহাতে বোলাকে খোলে ।

হঠিঃ কানের কোলে

সিকুকের সত দুই কান :

তাহাতে সোণার কুঁড়ক,

জান বাঁধি বতি মটিকান্ ॥

বাঁধি ছুই করে টলু টলু :

বলা কাগা বিত পুতি,

টলু টলু তাবার জোতি ॥

খিটখিট চক্কলেকা ।

‘ভালো কাজলের বেলা ॥

কপালে বর্ণসীকার মূল ।

কাকট করিহা মাখার টুল,

বাঁধিরে সোটাঁ মৌশা :

প্রবর্ণ-মতিঃ ভাশা,

কত হে বাণিকের মূল ॥

খিটখিট আবার বাঁধিছে হতন ।

হাতি বোন ডালিখ আকার ।

যেন নয় লম্বুফলি,

যেমন চালের হুসি ॥

তিতবহাঙ্গা, পাতি-মিঃ কোরবা :

হাতে পাতে খিলে আচুল,

যেন কুম্ভকারি মূল ।

চক্ক হৈতে নাপুল্ কলম ॥

১ খিটখিটখিট

৪

কিবা দুই কলকলি, যেন পাতিফাৎ ক’ল

মসিকের মনপানী করিতে কলম

টলু নোনা ম’বকলী, ঢকে কাঞ্চল পাতে ফিলি,

কতকল যেন বৈদ্য নাহি করে চান

৩ সেন দত্তাওলী

এই জগদ্বর্ণনার অল্পশম সৌন্দর্য্য ও সংঘম পরিপূর্ণ।
অন্য কথার ইচ্ছা হেঁচা মুখেরস্তর বর্ণনা খুব বেশী
মেলে না।

কল্লার জামান লাল যেনন মাকাল কল,

বাণ তার কোর আছে হাই ॥

বেশব লমান হুইত, তেবে লাগে বজ্রাখাত,

ললমাজা হমর লমান ॥

কমল বহন খলী, কোর কাপ জোলে মুরি,

কপ খেঁপি হবত জামান ॥

মুখে কপ মুক্কা-মতি, কবচেরা সে হুইত

হুই টোটে পুশেত লমান ॥

তাহনি মরনী বাণ, খেঁপেলে হাণাণ লান,

কুক হুইত যেনন কামান ॥

খোল বরন, তিকন সিডা, তেতা মুখে কই কবা,

খুবে কাগে বাপুখারি জাণ :

কামলার যেন কোর, হবলী হুইত এণ,

মুখলোকা টাকের লমান ॥

আঁখি খেঁপে হরিণ ভাণে, মইম অবনে জাণে,

চলন তেবে বাহুরে পালাব ॥

কন যেন ক’টা সোনা, হবর করে আনাখোনা,

যেন দিগে বাপুখ ১১১ ॥

(বাপুখী ও বসনেচা ককা)

মাখালের চক্ক বেব : কোচা জুলাই :

মুখে খাচি লাগে যেন উল্লকুলের দলী ॥

কাতে খেলে কাহ রে খেদা সোনার প্রতিমা :

আর ভালো লাগেত তেতোয়ার তকের তলিমা ॥

বাঁধির উপর কল্লার আঁত খলোবন :

পত কুলের মাখার যেনন মসিক হমর ॥



ভাল শুল্ক পাঠ্য। এ এমন মধু করে পান
 এভাবে সুন্দর লাবণ্য বীজ্য ভূমপান ।
 প্রভবো ছিনিয়ে। হোমোজার উজ্জ্বল রক্ত
 কুশের কলিক। ছিন্নি হরুপশের পদ ।
 মালিন্যের দখলি দৃষ্টি বারো
 হালিতে বিকলী ছটকের অতি চমৎকার ।
 পদ্যের উপরে ছুটি কনককোঠা
 মধু লোহের মত হইয়া স্তব্ধের সমতা ।
 (হোমোজার কলিক)

৭

এক বস্তু ভাগে যেন আঁগারের বিড়
 মৃত্যু যৌন ভাগে বাহার লিখারে ।
 কি কব নাগের কেশ, কাল নাগ যেন ।
 দুহরি চুলেতে গোদু মাড়ব যেন ।
 মালিন্য পড়িতে কল নীততে ভাঙু ।
 বেশামি উপরে যেন চমকিত মূর ।
 কি কটকি টুট মালি বহান করিয়া ।
 যেন চুতকেতে পানি চলেতে বহিয়া ।
 মায়া কি কেকের পদে দুকটু কোড়া ।
 সেকথিতে কামানেতে মিঠাতে চড়া ।
 মালিকার কথা আর কি কব মাথানি ।
 মালিন্যের মনোহর ঐক্যের বাঁধি
 বি লি চলা। আরি সে ছুটি টোটে
 যেন আলু চা বোলা মাড়ে উপরে যুগে ।
 সে বহিন হাত কি করিব মাথ ।
 মালিন্যের লাবণ্য যেন মাড়ো চমৎকার ।
 কি কব পদ্যের কথা নাহি যাব লোনা ।
 পান খেলো মালি তার মত যাব কেশ
 আর তার ছুটি হাত বেদন লবন ।
 কলকাতা যুগে কাট মালিন্য যেন ।
 আর কোরব তার এমন মালিক ।
 মালিন্য পাঠ্যক তাই খা যায় ঠিক ।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে কবিত্বের সুখীতর আদর্শের
 একটা আচ পাওয়া যায়। এই কবিত্বের মতে সুখীতর
 হইলেন তিনি—এই রূপ দেখা পাই কিয়ত। বিজ্ঞানী লকেশ

তাকে পরাজিত করিয়াছে—যেন প্রভাতকাশে নব্যোদিত
 সূর্য: অথবা অন্ধ নিশিধীনী বৃকে বীণোজ্জ্বল চক্রমা ।

—মুনিজনমনোহর তুলুতা পদ্যের, মালিক মল্লের
 জায় লাল, অথবা কাটা সোনার মত কেশন ।

—যার কেশপাশ দীর্ঘ, মাথাহু বা অগ্ন্যগ্নিগত,
 ব্রহ্মর মেঘ অথবা কালনাগের মত কৃষ্ণবর্ণ। সুন্দর চিত্রণ
 দিখি—কেশের স্বভাবিক গন্ধ আভরের জায় ।

—যার দুকটু কামান তুলা অথবা রক্তের মনশাশী
 বন্ধন করিবার ফাঁদস্বরূপ ।

—যার নয়ন মুখোপম, বহুতটাকসমূহ অক্ষপটে
 কালো কালনের রেখা। অক্ষিতারকা যেন পত্রের
 পাশ্চাতে আসীন ব্রহ্মর। দুই হইতে তরল মোহপ্রা
 করিয়া পড়িতেছে। চাহিতে মনবানাহত হইয়া লকলে
 নিঃশেষ হইয়া পড়ে, এমন কি আকাশ পর্যন্ত ভাঙাকার
 করিয়া উঠে। মালি দেখিয়া বিকলী চমকের কথা মনে
 হয় ।

—যার মালিকা উর্দ্ধ-হৃদয়, রাগিকার মনোভোভা
 ঐক্যের শিশির মত ।

—যার কান ব্রহ্মকের মত ।

—যার বদন কোটি পদ্যব লাবণ্যে মণ্ডিত,
 গোল, অথবা মূল তুলা রক্তিম। পুস্তকমে ব্রহ্মর উড়িয়া
 মালিকা পড়িতেছে ।

—যার গীত মানবের দান। দুক্ত, অথবা আদ্যনার
 মত স্তম্ভ বন্ধ, অথবা মিশিরজিত ।

—যার লবণ্য যুগের মত লাল বিহা পানের ছোপে
 আরো সুন্দর হইয়াছে ।

—যার বদন কোকিল কুহরনের জায় অলপিত, ভোক্তার
 বুলির জায় আধ-আধ, আদ্যমানো ।

—যার টোটে কণা যুগের অথবা আলতার মত
 লাল ।

—যার পদ্য এত বন্ধ ও পাতলা যে পান বাইলে তার
 লালিমা দেখা যায় ।

—যার কুচের বেধিলে মনে হয় যেন এককোণা
 ভাগিন, অথবা নগা পরমণি—তার চাহিপাশে মনব্রহ্ম

গুরুত্ব করিতেছে, অথবা কোন কৃষকতার যেন সোনার
ছবিয়া বানাইয়াছে।

—যাহ কঠিনেত্র ভ্রমরসমান চিত্ত ও লক্ষ, অথবা এত
পাতলা যে সুঠোর করিয়া বহা যায়।

—যাহ উচ্চ রামরজা কৃষ্ণময়।

—যাহ হস্ত-পদ বেগুনের মত গোলা, কৃষ্ণকলিকার মত
শেলব। কবিগণ কোন কারণে তাঁদের সৌন্দর্যের আদর্শ
জান হইতে যেন নাই।

প্রেমোত্তর

সকল দেশের সকল যুগে প্রেমোত্তরের একটা বিশিষ্ট
ধারা আছে। মাহুকের চিত্ত শুধু পারিপার্শ্বিক অথবা লইয়া
চুই নহ, মাহুকের গেমও এমনি পারিপার্শ্বিক অর্থের
অনুরক্ত। যাহা হাতের বাহিরে, শক্তির বাহিরে, দৃষ্টির
বাহিরে তাহাকে আয়ত্ত করিবার একটা চরম শোভ
প্রাপ্তই মাহুকের আছে। এই ইসলামি প্রেম কাণ্ডের
নাগর-নারিকারাও এই হৃৎকণ্ড আয়ত্ত করিবার সাধনা
করিয়াছেন। কাহারও মুখে শুনিয়া হউক বা কোন
পুস্তক পাঠি অথবা চিত্র দর্শন করিয়া হউক, নাগর যখন
জানিলেন এক দেশে এক সুন্দরী কস্তা আছে, অমনি নাগর
সেই অন্বেষণে ও অস্ত্রপুর্ণা কস্তার গোমে 'বেগুয়ান'
অর্থাৎ উদারান হইলেন। বহু-দলার ছাড়িয়া দেই কস্তার
উত্থেপে নিকশেপ যাত্রা করিলেন। এই যাত্রা সকল ঘাইবে
কি না, নাগর তা ভাবিলেন না—নিকশিণী যেন পল্লভ-
পাতা বাছিয়া বাছিয়া নিজের কক্ষ, নিজের পথ সুজিয়া লয়,
নাগরও তেমনি এই ভরসায় যাত্রা করিলেন যে এই যাত্রায়
শেষে তাঁর ঈশ্বিজা প্রিয়তার সঙ্গে মিলন হইবে। প্রেম
চিত্রকাণই অন্ধ বটে, কিন্তু চিত্রকাণই সে দাহনীর। বাহিরের
রূপকে সে দেখিবে না বলিয়া সে অন্ধ। বাহিরের বাগা
মানিবে না বলিয়াই সে দাহনীর। ইসলামি কাণ্ডেও প্রেমের
এই ঐক্য রূপ।

বাগ্‌শায় হোলে ছয়ফলদুগ্ধ পিতৃমত একখানি কাপেটে
নিখশিত একখানি চিত্র দেখিলেন।

বাগ্‌শায়দারের হৃদয়ে পড়া নমুনা

চান্দায়া সাহায্য হইল কেওয়ান।

দরদর কণে অঙ্গ, বহি নারি ত্রি

কলিতার বিলোড়ান, সোলাতের তার

কলে চরিত্র খলে বার, কণে হার পাট

কণে মুখে চুপে, কণে কণে হার হায়ে।

চাই, ন যারে চাই কণে, কণন আশ মনে

আহাড়ে-পাহাড়ে কণন গোটার জমিনে।

হাত মারে কপালেতে মুখে হায়ে, চার

গোটন পাচহাণ মত চরিত্র মোটাই।

(ছয়ফলদুগ্ধ)

ছয়ফলের চিত্র এইরূপে একখানি চিত্রের সঙ্গে গেম
পড়িল। কে সে চিত্রিতা নারী, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা,
হিন্দু কি মুসলমান, লু কি শত্রু, বৃদ্ধা কি তরুণী, মুহ-
কি জীবিতা—এ সব কোন মর্মান লগ্‌তার অপেক্ষা না
রাখিয়া ছয়ফল প্রেম পড়িলেন। এই গেমচিত্রিত অর্থের
উপরই কাব্যখানি জমিয়া উঠিয়াছে। বাগ্‌শায়ের চেলে,
কস্তার পরমাহুকরী নারী তার পাশে-পাশে দৃষ্টিতে, কিন্তু
তাহাদের দিকে তিনি চোখ তুলিয়াও চাঁচেন না। তাহাদের
শত প্রলোভনে তাঁর জয় টলে না। চারক দেখুন চিত্রের
নাগনির্ঘণ্ড কল উপেক্ষা করিয়া কটক কলের তুফার উচ্চ
ছুটিয়া যাহ, ছয়ফলও তেমনি সেই অজ্ঞাত অর্থের চিত্র-
নাগিকার আশায় হৃৎকের পথে যাত্রা করিলেন। তাঁর চিত্র
নারিকার চরণে লম্বিত। তাঁর জয় অস্তব, ঢকল।
গতিয়া রহিয়া শুধু মনে চর,—

বিশ্ব কি কঠিন, জ্ঞান

হেন 'ছয়ফল', হৈল মন উডাটন,

আর কি পান সে বহন,

কে জানিয়া বিধে যোবে।

এ যেন নয় কবল, শেষে মন টেল্টল,

তুলির কমনে বন,

বৈধে নারি মানেব।

যেবে চিত্র প্রভল, দগমল কণে অঙ্গ,

উখালি প্রেম তরঙ্গ,

হালিহে তার।

(বহু নিখামপদার কেওয়ান)



শ্রেয়ের এই আবেশে নাথকেব অবস্থা ধাঁড়ান অনেকটা
বোম্বের মত—নাথিকার সঙ্গে মিলনে এই প্রেমেরোগের
একমাত্র মনোবিশ্ব। কিন্তু কান হকমেই এ রোগ গ্রন্থিত
হয় না।

ওমা! নথি, প্রেমবোশ, নিবেশ কি গায়।

যিকি যিকি ক'লে ওঠে, হত মল ওঠে।

হোসের ইশবি পোকে, তবে বোশ যায় চলে।

অমিলনে মল জলে, তবে জাব হতে।

(গোপালদাস)

ইন্দ্রশ্যামি কামের প্রাণ এই প্রথম মর্শনে প্রেমস্ফোর।
শে মর্শন চিরে হউক, দূতাব মুখে চউক অথবা বস্ত্রে চউক,
শে মর্শন অল্পস্থ আশ্রয়ের মতই নারকেকে গড় করিবে।

অভিনায়

শ্রেয়ের এই দাও চইতেই অভিনয়ের কথ। নথী যেমন
শিল্পমিলন বাসনার ওপর পাকতায় পথ অগ্রাভ করিয়া
ধূম্রমলীর বেগে ছুটিয়া চলে, নারকেও তেমনি সংসারের
পত্নী সহস্র বাধা উৎসেকা করিয়া নাথিকা-মিলনে ছুটিয়া
চলেন। নাথিকার উদ্দেশ্য বেশে-বিদেশে পরিভ্রমণ করেন।
মল-মলী, পাঠাচপ্পত, বন-জঙ্গল তাহাকে বাধা দিতে পারে
না। আত্মপ্রেম ও চরিত্র ত্যাগের গতি অপ্রতিহত। সৈবশক্তি-
সম্পন্ন কোন কার্পট বা আসনে চড়িয়া সায় সফল হইল
পুণ্য অতিক্রম করিয়া নারকে আসিয়া নাথিকার নগরে
উপস্থিত হ'ন। কিন্তু নাথিকাপ্রভের অন্তরায় হইয়া ধাঁড়ার
অনুরমধনের চুড় পাখাপগ্রাচীর—পুরুষের সে মরণ প্রবেশ
নিবেশ। অতঃ মন মানে না। যে নারকের লাহল খুব
বেশী মল, তিনি স্বতঃ নাথিকা যে ঘাটে মান করিতে আসেন
সেই ঘাটের কাছটতে বসিয়া নাথিকা-পিকারের চক্র
প্রস্রোত কাঁদ পাঠেন। এ কাজ পুর সহজসাধ্য নয়, এবং
সহজসাধ্য নয় বলিয়াই এর বর্ণনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।
কোন নারকে স্বতঃ নিজামপাশার মত আপনাকে চুত।
—বলিয়া পরিচয় দিয়া নাথিকার গুণে কৃতান্তাবে প্রবেশ

করিলেন, এবং নাথিকার মন চরণ করিয়া বাহির হইয়া
আসিলেন।

কিন্তু যে নারকে সাহসী, তিনি স্বতঃ ভিলে-ভিলে একটু-
একটু করিয়া নাথিকার চিত্তজয় করার অপেক্ষা না বাধিয়া
মাগিনীর পূর্ববধু সাহিত্য রাসকল্পায় মরণে টাকড়া পড়িলেন,
অথবা কোন পত্নী বা সৈবশক্তির সাহায্যে প্রহরীবেশে ঘোষ
এড়াইয়া একবারে রাসকল্পায় পদনগুণে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। কবিগণের বর্ণনা পড়িয়া মনে ওঠে, রাসকল্পায়
যেন 'শেটে জুয়া, মুখে লাহ' ব্যাভাকে বলে, সেই মবত।
একজন লুন্ডর নারকে যে তাহারই রূপাধিষ্ট হইয়া দূর দূরান্তর
হইতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাহাকে বরণ করিবার চক্র
উপস্থিত হইয়াছেন এ কথা ভাবিয়া নাথিকা অন্তরে অন্তরে
পুবই আনন্দিত হ'ন, এবং প্রথমদর্শনেই 'মন গ্রাণ ধা ছিল
তা' নারকের পদে মরুপণ করিয়া বলেন। কিন্তু দ্যাত্তরের
বশেই হউক বা নারকের প্রেমকে আরও উদ্দীপিত করার
বাসনায়ই হউক, প্রথমটা তিনি কোপ এবং বিতৃষ্ণা প্রদর্শন
করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উন্মাদ প্রেমসংবাদের মুখে সে
বাসা কুলের মত ভাসিয়া যায়।

চন্দা বলে—আবে তোব মাই হ'ত ওঠে।

ওমন! স্রাস্ত হ'লে যাবে বায়লর।

গাফি বলে প্রাণ তোব তোমার কলোরে

কলার কলোরে আর, অমাকে মাইতে।

কুহি যদি মার তবে মল মানাবে।

শিবীতে কুহিয়া প্রাণ করে হাফাকার।

গাফি কাদু ও চন্দাবতী)

নাথিকা নারকেকে নিম্ন প্রাঙ্গণে গোপনে সমাগত
দেখিয়া তার ঘেবাটলেন, কিন্তু দু একটা চাটুয়াকো নারকে
তাহাকে বল করিয়া বিলেন। নারকে-নাথিকার প্রেমদীপা
আরত হইল—গোপন প্রেমের বিশদ ও গুণ পাতিয়া রহিল,
কখন তাবের গোপনতার লাল ছিল করিয়া দিবে। কিন্তু
প্রেমের দেবতা—ইন্দ্রশ্যামি কবিরের আশঙ্ক দিনি—তিনি
অন্ধ। অভিনায়ের পথ যে বিপদ-বাধা মৃত্যুভয়ের মধ্য দিয়া
শাভা, এ কথা জানিয়াই তিনি অভিনয়ে বাহির হইয়াছেন।

ঐবিষয় সেন

সরণের ভয় যদি রইত আসকেরে ।
তবে কি ক'ল ভিত্তে পায়ের একেই লাগেরে ।
যে মল আসিক হয়,

সরণের ভয় তার কি হয়
কেনল মানকের কথা জানে তার অন্তরে ।
[তলে বকাওলী]

অভিসার শুধু নাথকেই একচেটিয়া নয়। নাহিক;
যেখানে মিলনের উৎকর্ষের একান্ত অধীরা, সেইখানেই তারার
অভিসারিকার বেশ। অভিসারিকার অন্তরে একটা আকাঙ্ক্ষা
দুরিষা-কিরিষা বাজে ।

যদি যিনি নিদার আমার সেই পুরুষতন ।
যতনে রাখিব সমাট, সিংহ প্রাণ মন ।
কল্মাশকে বসাইব, যদুপাস কড়াটব ।
শ্রোতের সন্ধিলা দিব এ নব যৌবন ॥
[তলে বকাওলী]

এই বাণী শুদ্ধরূপে করিয়া নাহিকা অভিসারে বাহির
হইলেন। কবি পরায়ে পর পরায় বাধিরা প্রেমকাব্য বর্ণনা
করিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অন্তরের আবেগ পুঞ্জীভূত হইয়া
চরমে পৌঁছিয়াছে, সেখানেই তিনি পানের মূর্ছনা তুলিয়া-
ছেন। চিত্রকর যেমন চিত্রকে কীৰ্ত্তনমূল্য করার উদ্দেশে
কোনখানে বস্তু গাড়ি, কোনখানে বস্তু পাটলা করিয়া দেন,
কবির ভাষাও তেমনি কখনও পানে, কখনও পরায় বা অন্ত
কোন ছন্দে লীলাবিত্ত হইয়া উঠিয়া নায়ক-নাহিকার অন্তরের
সংঘাতকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলে। মনের কোণের একটু-
খানি বাধাও কবির চোখ এড়ায় নাই। নাহিকাকেও কবি
প্রমাণযোগে সাহসিক। করিয়া তুলিয়াছেন। অভিসারিকার
নাহিকা বলিতেছেন—

তোমা গেলে মনচোরা আমারই মন ছুরি করে ।
তব আবেগে কিয়ি যেন বেগে ঘরে ঘরে ॥
যদি বেশা পাই তোমারে, বরিষা। আসন তোরে
রাখিব আঁটক করে, পালাতে কি দিব তোরে ॥
যেহ তোরে কুলশালে, বাহুদারা ধাবিব কলে;
মনোমত লাভা দিব, যখন ইচ্ছা হুত যোরে ॥

মনযেউ গিরে পায়ে, যৌবন হাতকড়া দিবে ।
প্রেমপারকে বাসব কামরু লাবণীবনের তরে ।
[তলে বকাওলী]

‘বেগে বেগে ঘরে ঘরে’ কিরিষা নাহিকা চরিত
নাথকের দ্বাণ্ডাৎ পাটলেন। শিকারে যে বাহির হয়,
কাঁদও সে পাতে। নাহিকা অভিসারে বাহির হইয়াছেন,
কামেই নায়ককে বন্দী করিবার চক্র প্রেমের চাল
তাকেই বিস্তার করিতে হয়। কবির মত নাহিকার
চিত্রকলাই এ কারণে বিশেষত্বক।

নাথব আঠারো কল দুই ওয়া তার ।
ক দুকিতে পায় হল, সাধা অচেত করে
এমনি নাথর ভর, শাফা গলে লাগব দু
পুরুষ করে মূল, আশেতে করে সাহাব
নাথি এমনি সক্ষমাদি হুলাব মত মোলী ধং
বং মনমুহু দুপ, নাথর রাঃ পায় মনমোহ ॥
[বসু বিভাষণচন্দ্রাবতার কেতাব]

প্রেমকাব্যে যেমন বিশেষ রূপে সমাটের তুলিতে চক্ক
হয়, তখনই কবি নাথকের যতলে নাহিকাকে অভিসারে
বাহির করেন—নাহিকাকে সাহসিকা করেন। নাহিকা
প্রাণকেজেই এক বাণেই শিকার বিদ্ধ করেন। যেখানে
নাথক একাত্তই বিবৃণ, সেখানেই তিনি পরমজ্ঞান
করিতে ছাড়েন না।

তবরে তবের প্রমহ, চাপ মোহ পানে
বসন্তে রলবেলা খেলি কুটিলেন ॥
নাথব যৌবন মোহ রসে টলমল
তোমব হুইয়া মোট রসের কল
নুতন কলকালি বরজে বিকলি
খাওরে কুলের নু কুলমোহে বলি
[কলমল দুপক]

তিলে তিলে নাহিকা নাথকের ভিত্তে ছয় করিয়া
লগেন। কবির মত এইখানেই নাতীর নাতীর।



যৌবন ও প্রেম

প্রেমের প্রেরণা বসন্ত, শ্রেষ্ট কাল যৌবন। বসন্ত অবসান হইলে যেমন তোকিলের কণ্ঠ বাজেনা, যৌবন অতিক্রান্ত হইলে প্রেমও তেমনি জমাট বাঁধে না। যৌবন যেন একটা পূর্ণপ্রসূতিত পশু, প্রেম তার সুরতিসঙ্গার। এক একদিন তার আর সুরতিবাণী একএকটি শালুকি করিয়া পড়ে। তাই বাংলার সাধক কবি চণ্ডীদাস গাচিরাছিলেন,

জীবন থাকিলে বঁধুবে পাটব,
যৌবন যিমান তার।

প্রেমকাণ্ডে চুতে ছুয়ে যৌবনের এই প্রেমময়তা, প্রেমের এই যৌবনকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ ও পরিণতি। নাট্যকার ছন্দে ভরে যৌবনের প্রাবল্য আনিয়াছে, আর তার সঙ্গে আনিয়াছে চরিত্র প্রেমাকাখা। কিন্তু কোথায় সেই পরমতাম্বিত নাটক, যার স্পর্শে এই প্রেম পরমিত হইয়া উঠিবে? মর্দকতা চরিত্র জড়িত অনুভূতি। বিবাহিতা হইলেও চরিত্র তার স্বামী তার প্রতি বিকৃত। কাঁধেই নিরাশ্রয় প্রেম যেন দ্বিগুণিত বেগে ঠেলিতকে আশ্রয় করিতে চায়।

‘গোলেন্দু’ উভার চরিত্রবল। গোলেন্দু বন্ধন বালিকা মজা তখন তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের পর হইতে তিনি স্বামীপদ বর্জিতা, স্বামী উভার কোন লংঘন নেন না। প্রথমটা গোলেন্দু হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইলেন। কিন্তু ক্রমে বালিকার মেয়ে একদিন যৌবনের জোয়ার আসিল, কৃপিত্র নিঃখালের পরিবারে একদিন দাক্ষিণ্য অকৃপিত্র বড় বহিল। গোলেন্দু যৌবনের চাক্ষুণ্যকে প্রশমিত করিতে না পারিয়া বলিলেন,

এ নব যৌবন কালে, গতি মোর না আইল,
কিসে নব বাঁধি হুঁচুইয়া।

চিত্র বিরাটী নাট্যকার এই যৌবনমালা অন্তরকে বিশেষ করিয়া স্পর্শ করে। তার মুখে হাসি নাই,

চক্ষু নিভ্রা নাই, সারা রাতি বাতি জ্বালাইয়া প্রভাতের প্রতীকার উৎকলিত থাকেন। কিন্তু দ্বাদশী পোষায়, প্রভাতমত কই আসেন না।

মাঝার অঘিলান মত তলে কবি কি টাট
সারা রাতি জ্বালাই রাতি নিশি যে পোষায়
এ নব যৌবনমালা কত লব হাস্য
দহেনা দহেনা ছাপ স্নেহমালায়...

নাট্যের নব যৌবন যেন জীবন দৃশ্যে কৃত্রিম তপসীর প্রায়। নাটক তার একমাত্র কর্তব্য। নাট্যের যৌবন যেন বিকলিত মধুকল, একমাত্র নাটক তার মধুশানে অধিকারী। কিন্তু

পূরন নিষদ,
এমন সময়,
যার তবে মরি
কি কবি, কি কবি,
আমি এ অবলা,
কত লব হাস্য,
কণ্ঠবাঁধিবে,
রাখিবে কেমনে,
এ নব যৌবন,
গতিব বিহনে,

নাট্যিকা যদি স্বামীনা হইতেন তবে চরিত্র এ যৌবনমালা প্রশমন করা সহজ হইত। কিন্তু প্রায় কেহই তিনি কুলবতী কুলবধু। ইচ্ছা না থাকিলেও লজ্জা-ভরে উভাকে বেদনাময় পঙ্কজের মধ্যে থাকিয়া যৌবনের আশা পোষাইতে হয়।

বাঁধি নাতী কুলমালা, কত লব প্রেমমালা,
কণ্ঠে পাটনা প্রেমের বেলা, বঁধুমাঝার ঘাম যৈল।
যাক্তে কানে চোখের বঁধু, শুকাবে খেল লয়ের মধু,
অদি কিসে বাহুর বাহু, কণ্ঠাঘেতে এই কি ছিল ॥

এ নবযৌবন কি করিয়া রাখা যায়, ইহাই চাইল সুবর্তী নাট্যকার প্রধান সমস্যা।

প্রিয় বিনা নারীর যৌবন অকার্য্যকর ।

কাহারে সঁপিষ আঁমি একলে যৌবন ॥

পাণ্ডুরাসের ত্রাণ নহে, কাটরা খাটাই ।

যেতিয়ার চিত্র, নহে, বাজারে যেতি ॥

পাটখার চিত্র, নহে, দিব খরে খরে ।

প্রিয় বিনা এ যৌবন সঁপিষ কাহারে ॥

যৌবন অদ্বন্দ্বা ধন নবান বহলে :

ছুটাইয়া গেলে আর না পাইব পেলে ॥

ফুল তুকাইয়া গেলে যেমন পুঞ্জী করিয়া, তুষ্টি হয় না,
যৌবন অতীত হইলে তেমনি প্রেম-নিবেদনেও তুষ্টি হয় না ।
তাই নারিকার এ আকর্ষণ, এ করুণ অর্থবোধনা । ধরতির
কক্ষে কক্ষে নয়নারী প্রেমের লীলায় বিস্তার । নারী তার
বাঁহকের মস্ত নিজকে প্রসন্ন করিয়া লাগাইয়া তাহার প্রতীকা
করে, ফুলের মাথা গাঁথিয়া বসিয়া থাকে, কখন ত্রিনি
অদিবেশ, কখন তার পলায় মালা পরাইবে । এই চিত্র-
বিরচিনী নারী ফুলের মাথা গাঁথিয়া উদ্ভাস হইয়া বসিয়া
পাকে ।

‘পাঁথিয়া ফুলের মালা কিব কার বলে ?’

দিন আসে দিন যায় । গলে গলে বর্ষক্ষে নবান অতু-
লীলার ছন্দে আবর্তিত হইতে থাকে, কিন্তু বিরতিশীল বৃক্ষে
বোকার পর বোকা চাপিতে থাকে । অতুলীলার বিভিন্ন
ছন্দ তাহার লঙ্ঘন না । তাহার তপু মনে হয়,

যার স্রিহ বগে আরো আনন্দিত যব ।

আঁমি অত্যাচার তিরে তুংগে আতন ॥

একলা যৌবন রাপি নারি বোর ফল ।

তেজিব পয়ান আঁমি বাটকা পয়ন ॥

নতুন পরিয়া মালা ছব বৈখানিষি ।

সেমে সেমে কিছু বাটন (= সুখিণ) স্রিহ ভগনি ॥

এই গেল পতিবিজ্ঞান নারীর অবস্থা । পতিপূর্ব্বাঙ্গিনী
কিষ্ট পতি কর্তৃক অনাদৃত নারীর ভাগ্য । আরও বেদনাময় ।
এ যেন শেষ ফল সাদ্ধনে পাঁথিতে তুকার জালা পড়িতে
চাইতেছে ।

শান্তে পতি তার কাছে উপবাসে বাট ।

এমন কপালে কেন পাড়ে মাঝে বাট ।

এই খেদোক্তি মথ্যে তপু যৌবনের মালাই নয়, অলীম
মানি এবং আত্মবিকারও আছে । সুবস্তা হইয়া যদি পুরুষকে
ময় করিতে না পারে তবে নারী নিজেদের জীবনকে বার্থ
মনে করে । নারী পরাক্রমের মানিতে ক্ষুদ্র ও লজ্জিত হইয়া
পড়ে । রসীকানাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’র মায়া-চরিত্রের এই দিক্‌টা
সুন্দর করিয়া ছুটাইয়াছেন । ইসলাম কবিগণও এ দিক্‌টা
ছুটাইতে চেষ্টা করুণ করেন নাই ।

অনাদৃত নারী কেমন ?

যেমন

‘নদিহাযা কং, জল কিনে যৌন,’

মাখন বিনে তত্ব কণ

কতিপ আঁমাই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ ।

যেমন

ভায়েকর পোতা জালি খোট । কেহেরেব পোতা খোট ॥

বীতের পোতা মিশি । ছেলের পোতা হাসি

বুড়োর পোতা কানি । হামার পোতা মুলী ॥

বুড়কের পোতা মাখুলা । মমির পোতা চাখা ।

হাতিব পোতা সর। । আঘনার পোতা পাখা ।

বোতার পোতা লাতি । হাতের পোতা হুড়ি ॥

পাখোবাহের পোতা বোল । বাস্তের পোতা চোল ॥

সমার পোতা হুঁদুলি । পাতের পোতা শেমলি ॥

হাতের পোতা চুড়ি । খোড়ার পোতা ছুড়ি ॥

খোসেন্দ

এমন যে বামী, তাহার বিধনে নারীর জীবন বার্থ ছুইয়
হাইবে না তো কি ! তার বর্তমান হাফাফেরে ভবিষ্যে যাব,
তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আগছার কালো হইয়া উঠে । ব্যথিত
বকপঞ্জর হইতে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে, তাহাতে একটা অতি-
যোগ জনিত হয় !

যে ভাবে পিরাঁতের মর্গ, সে অর্থ করে না ।

মৃত্ত বসি বর করে ।



মননযোগ্য আদিত্য দত্ত, সে ভেব করে চাতুর্বি
এল না কি উপাধি কবি, সে ত কিসে চাহেনা।

(গোলন্দ্য)

প্রণবীর এট অনাবর সময় সময় নারীর মনে প্রতিফ্রাণ
হুতপাত করে। নারী ভাবেন, চাহতে! 'এত পাতের
শ্রেয় ক'রে অট্টে আর হুৎ হ'ল না',—'সামেতে বিদ্যাব'
উপস্থিত হইল। এই প্রতিফ্রাণ শুধু হাঙ্কায়েই
পলাবসিত হয় না। পতি প্রবলে থাকিলে নারীর সাক্ষ্য
পাকে, কিন্তু পতি বিরূপ হইলে নারী অসন্তুষ্ট হইয়া গুঠে।
শৈলসমারিত নদীপ্রান্ত যেমন যেখানে পথ পায় সেইখানে
ছুটিয়া চলে, নারীর যৌবনও তেহি যেখানে আদর পায়
সেইখানে লুপ্ত হইয়া পড়ে। কুলের সাধন বসিয়া পড়ে।
সত্যেরে রাখন রূপ হয়।

উল্লেখ্য কবিরা অনাদৃত নারীর ছবি আঁকিয়াই থাকেন
নাট। পুরুষজীবনের সার্বকথাও যে নারীকে পাওয়া,
একথা বুঝাইতেও চেষ্টা পাইরাছেন। নাটিকার রূপ রূপ
বর্ণনা তবিতা নাটক আঁকেপ কহিতেছেন,

—

এখন বহুত, নারি তেহি চোব মত।
না তেহিলি তোরা হুৎ নরন করিহা,
না তেহিলি বহু-কল প্রদানোত পিরা।।
এহিলি সে বসে, হরি হাথ, চাহ।
হাটিল চাকর মাথা হটাই বিহত
পানে বলে, কল কান, কাল। কুই মিল।
সে চোভার মূখে কথা মিলাই না তেহিলি।।
নাটক মিলি, কল নাট, আর কি মন্তঃত,
সে ভলসে মোনু-টুট নারিলি হাকিহে।।
মুখে বলে, আরে মুখ, কি কর এখন।
সে চাক-মুখেতে মাকি অবিলি কখন
কোন কথা নাকি কৈলে হাৎকল মায়ে।
আল বোব, বৈল তেহা কৈলোবী থাকিহে।।
হাট বলে, শুবে হাট, বল কি আঙ্কেলে।
লাকুৎ বহনে হাট কেন না কৈলোলে।

(বিদ্যায় পাশলা)

যৌবনআলাপ পালা পারিহা। লকল কবিত মিলায়ে
পালা পরিহাঙ্কেন।

মিলন

নাটকনাটিকার চিত্র-উল্লিখিত মিলন-মাফলিক পাঠিতে
দিয়া কবি বসিতেছেন,

হুতপাত তার পথে, মল্লের মল্লের পথে,
পসিতে লাগিল প্রেমের কান
চাক চকু খেলো বাকি, উল্লিখিত প্রেমের কান,
প্রেমের মিলন নারীর
কল কল আর তলে, কহিতে নারিক পথে,
বহু-বাহুর মত আলাপ
বিদ্যায় পাশলাই কৈলো

প্রথমে চোখে চোখে মিলিল। তারপর প্রেমের নদী
উল্লিখিত উল্লিখিত। নাটক নাটিকার চক্রে মল্লের বহির্ভাগ
পূর্ণ হইয়া পিরাছে। একমাত্র জাগিয়া আছে সেই উল্লিখিত
নদীতে একপাশি প্রেমাসুত মুখ। কলা নাট, সাজা নাট,
মিলনক পাশাপাশির মত একে আর এককে দেখিতেছেন।
আনন্দাভিলাষের এট বিলুপ্ততা ক্রমে কাটিয়া আসে।
নাটক নাটিকার তখন মনে জাগরিত হয়, তার চক্রে তার
বৃত্তে এত কলা ছিল, এই সে।

মহাকালের পিরাণা, নাম সে মিলাপাশি
মিলে মা মানে চিত্র বহলে কৈলো।।

(হুতপাতপূর্ণ)

নাটক নাটিকা পুরুষকে তপ্ত আলিঙ্গনে বন্দী
করিয়া লইলেন। তারপরে মূখে হুটিয়া উল্লিখিত পূর্ণের মত
লাগিয়া, চোখে আনন্দের আল্পত বারী—

সাহায্যে বিদ্যায়ের বসনই বৈল।
মাথে মেলিবার মত কুটীয়া উল্লিখিত।।
কি বসিতে কিয়া বলে, প্রিয়না না বলে।
মরকর কীয়ে খ'বে বিদ্যায়ের বলে।।

(বিদ্যায় পাশলা)

এ মধুর মিলন বেধিয়া মনে হয় যেমন, 'দোঁদা' পাছে পত্র
মেলে বসন্ত পানে । 'কাঁড়াল' বেন পরশমানিক শাইয়া
ধ্বজ চটাইছে ।

শব্দনা ধীরেতে যেন বরিলেক কল ।
শব্দনা ভালোব যেন লয়েদবলল ॥
নাগাধিন বোঝা থাকি যেন রোজাঘর ।
নাহনে শটিলখানা বোজার উপর ॥

(গোলেদুঃ)

শ্রেমিক শ্রেমিকার মিলনের বাসনা অকুরন্ত । দুগ
দগ মিলনেও এ বাসনার তৃপ্তি হয় না । তাই বৈজ্ঞব কবি
কিভাপতি সাধিরাছিলেন,

নাগো নাগো কুল, বিহা বিহে বাগত,
তবু হিচা মৃতন না পেল ।

ইসলাম কবিরাও এই অন্তরীনমিলনের ভাবটিকে
ছুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

শোন ওয়ে প্রাণবন !
টঙ্কা হর তোমারে রাপি ওহরে আগন ॥
এ বাসনা হয় মনে, রাপি তোমারে সর্বকণে,
হাযের সহিত বলে করিয়া ঘটন ।

(ভগ্নে বকাওলী)

নারিকার পূর্ণ যৌবন, অপরিণীত প্রেম উপেক্ষা করিয়া
নাথক দূরে চলিয়া যাবে, এ চিন্তাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ।
নারিক : এই আসল বিশ্বাসভঙ্গর ব্যাঙ্গল চইয়া বলিতেছেন,

কেমনে তেজিয়ে প্রিয় মোরে চেতুৎ যাবে ।
সিনে সিনে আমি যিনে কমলাকলি শুকাইবে ॥
যেহের সৌন্দর্য তুমি, কেমনে ছাড়িব আমি ।
লমবে কে চাড়ে খাবী ? অলমবে কিবা হবে ॥
জিনু বড় আশা করি, প্রিয় হবে প্রেমকাণ্ডারী
বাহিনে প্রেমের তরী ।

(মাদুদী ও রসনেদা কজার সুনি)

নাথক উত্তর দিলেন,

ওয়ে প্রাণ প্রেরনি যো ! টাবকবনি ! টাটক কণ
না বেশ তোমার তরে আর ত প্রাণ যাতে না ।
তুমি প্রাণ থাক রেদা, আমি ঘাই পেয়ে দাখা
দিবারিদি তেরা কণা, ও প্রেরনি ! তুলবন।
ঘাই ঘাই কেনে ঘাই, তুমি বই প্রিয়া নাই
পাখে ঘাই, কিবে চাই, মন বলে, পাও ঢলে না।

পা না চলিলেও নাথককে ছোর করিয়া পা চালাইতে
হয় । শ্রেমিকাবোর প্রাণ যে সংঘর্ষ, তাহাই আঘাতে নাথক
নারিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন । এ আঘাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিয়া জয়লাভ করা অসম্ভব করিন । ভেলোরাপ্রসন্ন্যার
পুঁথিতে এ চিত্র স্পষ্টর ভাবে ফুটিয়াছে ।

আমির ভেলোথাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন—
এক মুহূর্ত ক্ষেত্র অাড় করিতে চাহিতেন না । কিন্তু

পাতকী নমনা জানে যে ঘর বরে ঘাড়ে
কোন মতে গুণ নাটবে, সে যদু কাত্য

ভেলোরার কপালেও এত গুণ টাঁকিল না । ভেলোরো
হুন্দরী, ভেলোয়া বামোসোহাঙ্গিনী, আমজিনী, তার নমনা
বিরলা তার গুণ দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল ।

এই মত দেখিয়া বিরলার বাড়িল বিষম ।
আমরি ভিত্তিয়া কেলে বে আসনার বেশ

গুণ বেশ ছিঁড়িয়াই বিরলা কান্ড হইল না । হির
করিল, যেমন করিয়া হ'ক, ভেলোরার এ প্রেমের স্বপ্ন ভাঙিতে
হইবে । আমির এক ভেলোরার এ মিলনকে বিচ্ছিন্ন
করিতে হইবে । বিরলা মাকে আগমনে টানিয়া লইল ।
মাঝে-ঝিরে চক্রান্ত করিয়া আমিরকে পরছাড়া করিয়া
চৌর লাগিয়া গেল । বলিল, 'যবে বলিমা থাকিলে রাজাত
ডাণ্ডারও সুরায । যবে বলিমা না বাইয়া আমির বাণিজ্যে
যাউক ।'

মা-বোনের ঈর্ষান্বিতিতে আমির রোজটই বলিত, কাল
বাণিজ্যাত্য্য করিব, কিন্তু কাল আর ফুগাইত না । বিরলা



হোমই উঠিয়া দেখিত আমিহ-ভেলোয়ার ঘুমে দেউ
মিলনানন্দ, সেই হাসি, সেই প্রেম। অবশেষে বিরলা
ভৎশনার বোমার মত ভাইয়ের পরে কাটিয়া পড়িল।
আমির বুড়িলেন, না ঘাইয়া উপায় নাই। আমিহ
ভেলোয়ারকে বুড়াইল, 'পুরুষ মানুষ আমি, আর না করিলে
চলিবে কেন।' তেলোয়া এ দুক্তি মানিল না। শমাজ
অপের জন্ত এ মিলন-নাটকে অসময়ে অবলিলাপাত হইবে।
না না, এ ঘে সে কল্পনাও করিতে পারে না।

না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ,
বল লাম তোমারে।
তোমার বাবা যেতিয়াই সাধু
বাখানু তোমারে
না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ,
কতি বার বার।
তোমারে বাখানু যেতি
সপনতির হার।
না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ
আমি করি মান।
তোমারে যেতিয়াই বাখানু
গলুর সোনার মান।
না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ
মোর প্রাণ ধন।
তোমারে যেতিয়াই বাখানু
হরের রতন।
না ঘাইও, না ঘাইও আমায়
আদকের গাফল।
তোমারে বাখানু যেতি
ফানের দিকল।
না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ
মোর জীবনের ভর।
তোমারে বাখানু যেতি
সোনালি চার।
না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ
তোমার পায়ে বরি।
তোমারে বাখানু যেতি
শিকরের দাড়ী।

না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ,
আমি তোমার বলি।
তোমারে বাখানু যেতি,
পলার হাবলি।
না ঘাইও, না ঘাইও মানুষ,
আমারে কেলি।
বের বং বারি ঘাইনু
তোমারে লইয়া।

স্বামী যে নারীজীবনের কতখানি জুড়িয়া থাকেন, এ
বিলাপ হইতে তাহা স্পষ্ট বোকা যায়।

কিন্তু নারিকার এ আকুল আবেদন সংগঠককে
ধামাটকা রাখিতে পারিল না। বিজ্ঞান তাহার বেধনাবিশুল
কাগিমা লইয়া বনাইয়া আসিল। আমিহ তেলোয়ার নিকট
হইতে বিনাশ নিলেন, এবং বাইবার সময় বলিয়া গেলেন,
আমারই ভেলোয়ারকে দিয়া বেন কোন শক্ত কাজ করানো
না হয়। শোবার কেলিলে কল্লুর গারে দাপ লাগিবে, উঠান
কুড়াইলে খুলা লাগিবে, মরিচ বাটিলে হাত ঝাণা করিবে,
পানি আনিলে কাঁকাল বাণা করিবে—অতএব ভেলোয়ারকে
যেন এর একটা কাজও না করিতে হয়। পরিণাম
পরিজনকে সামুলাইয়া আমিহ বাখিলাখায়া করিলেন।

ভেলোয়ার বিষয়ের প্রথম সপ্তাহ কোন হতে কাটিয়া
গেল। এক সপ্তাহ পরে এক শতীর অসুখগ্রে এক রাত্রির
জন্ত আমিহ সুদূর হইতে শ্রুতমার্গে উড়িয়া ভেলোয়ার কাছে
আসিলেন। সে রাত্রি হইলনের অপরিণীত আনন্দে
কাটিল। শেখরায়ে আমিহ যেমন নিঃশেষে আশিরাঙ্কিলেন,
তেমনি নিঃশেষে অস্তহিত হইলেন। ভেলোয়ারজন্মের বিজ্ঞপ্তি
অসংবতবেশে ঘুমের কোলে চলিয়া পড়িলেন।

এতাত উঠিয়া ননদী বিরলা ভেলোয়ার নিঃশব্দ অবস্থা
দেখিয়া পাড়া-পড়শি ডাক্তার আনি। তারপর সকলের
সাম্মুখে ভেলোয়ারকে অস্তিত্ব করিল—

দানিআতে সেয়েই তাই সাত দিন হইল।
দুখারী নতী তেলোয়ারে কোন বদিকে পাইল।
সারাজিবি সন্ধ্যা করে রদিকবু পাই।
তেকায়ে তেলোয়ার পোশ কৌল, নাই।

চেলেগাঃ-প্রাণপণে আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কাঁধে নীলক বসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল। হির হইল হেলোঃ অসহী। তাঁহার তীক্ষ্ণ শাস্ত্রবিধান করিতে হইবে পাড়া পড়ান; নানাবরকম শাস্ত্রের বিধান দিতে লাগিল। কুটীলা বিরগা এইবার চেলেগাঃ উপর তাঁর প্রতিহিংসা প্রকাশ করিল। সে বলিল, ওক আমার স্ত্রীভবানী করিয়া রাখি না কেন, তাহা হইলে এর উচিত শাস্ত্র চটেবে। মকল্ অহুঃমোদন করিলে চেলেগাঃকে জোর করিয়া বিরগার বাসীয়ে নিবৃত্ত করা হইল। বিরগার সেবা করিয়া, গোবর ফেলিয়া, উঠান ছুড়াইয়া, মরিচ বাটিয়া, চেলেগাঃর দিন কাটিত।

অতঃপরে কাশ্মীরে চেলেগাঃ মলিক হেখিঃ
‘নাহে তিন সেব মরিচ বাটীর চেলেগাঃ চক্ষে ধূল দিয়া।’

বিচ্ছেদের এই করুণ চিত্র দেখাইয়া কবি আবার নারক নারিকার মিলন ঘটাইলেন।

বিরহ

আলোক যে মাহুংয়ের কত বড় বন্ধু, অন্ধকারে বসিয়া তা
‘উপলব্ধি করিতে পারি।’ প্রেমরাগ্যের আলোক—মিলন ;
অন্ধকার—বিরহ। মিলনে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয় না, তা
বিয়হে। দুগ দুগ ধরিতা কবিকুল প্রেমের গভীরতা
দেখাইতে বিরহের অবতারণা করিয়াছেন। ইসলামি প্রেম-
কাব্যে শ্রেষ্ঠ আদম এই বিরহের। তাবাকুকের যে চিরন্তন
বিরহ-লীলা বাংলায় পন্নীতে পন্নীতে কীর্তন হয়, কবি যেন
তাহারই ভাবে ভাবিত হইয়া বিরহচিত্ত অঙ্কিত করিয়াছেন।
যখন পড়া যায়, নারিকা বলিতেছেন—

বিরহ-সেহরা বিষম বহর্য দখিতে না পারি বালা।
সহে মোর চিত্ত, সহ্য নাপারিত, মধু বানবরে কালা।
কৌম মেল লায়, প্রাণ না পাঠায়, জানিয়া বিবদ খালা।
(চেলেগাঃ দম্বাঃ)

‘মধুঃ নগরে কালা’ পাঠিয়া প্রেমের সে অভিনব করলোক
সহনে বস্ত্র। এ করলোকের ভিত্তি বিরহ। কবির বিশিষ্ট
নারিকা আজিও বলেন,

যেন মোর তপস্বী, রাতক কবিগু দিন,
এই দুগ বলিব কাহাং

এই রাতক-দিন-কত বিরহসম্মানে সন্তুপ্ত নারিকার
মনে একটা অস্তিত্বের মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠে। দিন-
প্রত্যেকের কড়ায়ে সে ঘুরে ঘিয়াছে, কিন্তু আর ত সে
আদিল না।

যেহা সাথে হুসিনের করিয়া কড়া।
সিহে বলিয়া খোহে, আদিল না আর।
(বিজাঃ পাখলঃ)

দিনের পর দিন এই বিলাপ করণ হইতে করণতর
হইতে থাকে।

মাহা মোর প্রাণনাথ, কইন বে চিত্তঃ।
অবলা কালীরে মেলে সাগরে তেলিয়া।
বিরহ সাগর ছেন—এল নাচি ঘরি।
পার কর প্রাণনাথ না জানি দাঁতাবে।
একবার দেখা গিয়া লাগে কং বন।
নহে ত তোমার পোকে তর্জিব ছৌবঃ।
‘মহা’ যতি বিত বিনি চানাক আমের।
উড়িকা উচ্ছেদ আমি কহিঃ তোমার।
ওকু প্রাণ চুনি মোর মোর রে লইয়া।
লালি তপু বহিঃকে ছৌতে নগা হইয়া।
তোমার পালক আর অসুখী তোমার।
বেখিতেই বলে যেন অস্তির আকাবঃ।
মহাংগর কোণ এই পালক অসুখী।
বেখিতে বেখিতে আমি কোন সময়ে মরিঃ।
(পাঠিকালু ও চন্দ্রাবতী)

তখন মনে হয় চণ্ডীদাস-বিজ্ঞাপতির বীণা আজিও
একবারে নীরব হইয়া যায় নাই। বাঙালী পন্নীকবি আজও

আত্মবিচারে বিরহের অনীতৃত্ব অবস্থা। বিরহিনীর চিত্ত
তাই বিলাপ করিতে করিতে বলে,



আমি অত্যাশঙ্কিত, কঠিন শাসনা

মণিল খসে ছায়ে।

এই প্রাণবিশিষ্ট হৃদয়ে মিলি যিনি,

অত্যাশঙ্কিত হৃদয়ে কেন।

নবীন বয়সে, প্রেমের আবেশে,

সীমিত করিলে বাটা।

যেহে কলকল, হৃদয়কলসে,

ফুলিল বিচ্ছেদ বাটা।

(হৃদয়কল ফুলে)

মিলনে যে প্রেম থাকে তরল, তপল,—বিরহের উত্থাপে
তাঁহা হয় গাঢ়, ধনীভূত। নরনের বহির্ভূত প্রিয়তম লক্ষ্যরূপে
বিরহীত অস্তরে ভিগ্নিয়া আসেন। বৃক্ষে মর্শ্বরক্ষণিতে
চমকিত। বিরহীত ভাবেন, ঐ বৃক্ষ প্রিয়তম আশ্রিতেছেন।
নবীর বৃকে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিরহীত মনে করেন,
ঐ বৃক্ষ প্রিয়তমের চাঁদ্রকান্ত মুখখানি নবীর বৃকে তাগিয়া
উঠিয়াছে।

চাঁদের 'বেদিয়া' ঝপ পানির মাঝার।

সাহায্যে বৃক্ষসেনে মনে আপনার।

প্রাণক'র বৃক্ষ যোরে চুক্তিতে আসিল।

বেশ না পাইয়া তাই পানিতে ফুলিল।

এমন সময় চাঁদে আঁধারে আসিয়া।

একবারে চাঁদে তবে মিলে যে গাভিয়া।

যার সেই হাতা যিনি সেপিতে না পার।

বেশে তবে মিলে বৃক্ষ পলাইয়া যায়।

'প্রাণনাশ যেরে করে পু'রে না পাইয়া।

তাই বৃক্ষ পানি-বিতে সেসেনে ফুলিয়া।

এতক বলিয়া যিনি কোয়ার বাঁধিয়া।

ফুলিয়া পানির পরে ক'ণ মিলে গিয়া।

(ক'ণ নিজামশাহার কেছ)

নবীকে প্রতিবিম্ব চাঁদ দেখিয়া অনেক বিরহীতই
হৃদয়চাঁদের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এত বিচ্ছেদ-বাস্তব
করজনে হন যে নবীতে ক'ণ বিরা থাকেন। বিরহীত
বিহ্বল, হৃৎশ্রাবী।

হৃৎ উৎসাহের ধানী, তার চুপে উথলিয়া উঠে। সে যে
কত নিঃশ্বাস, উৎসাহ যেন তারই পরিচয় দিতে আসে।
এই নর নারীর শাশ্বতী প্রকৃতি। যাঁহা শোভন, যাঁহা
মনোরম, তাঁহা একাকিনী উপভোগ করিয়া তৃপ্তি নাই।
উপভোগের বা আনন্দের কণে বিরহীত বার অত্যধিক
মর্শে মর্শে অহুত্ব করেন, যে আসিলে তাঁর আনন্দবজ্র
পূর্ণাঘ্রিত হয় সে তাঁর প্রাণী বানী। তাহাকে ভিগ্নিয়া
পাইবার ক্ষমতা নারীজন্যে যে কী অসুগত, সে কী আত্মনাশ!
বর্ষার সখন খাতার যখন দিগন্তল কাশে। হইয়া আসে,
যখন বাহিরের সব কিছু লুপ্ত হইয়া অস্তরের অবাঞ্ছিত
প্রকাশ হইতে থাকে, তখন বিরহীত বানী সেই বর্ষারই
মত করিয়া পড়ে। বসন্তের মলয় সমোদন, কোকিলের
মধু গুণ্ণবর্ণ—সকল যদুরতাই তার বিরহবাণীকে উদ্দীপ্ত
করিয়া তোলে।

আর ডাকিন্ না করে কোকিল, যখনে যখনে আসে।

বিগ্ন বিগ্ন গল্প বলে, যখনেই মন উঠান।

এক হোহ গল্প কালো, আর ফুলি মই তালো।

সৌরভেতে প্রাণকুল, হুটাইল কলহালো।

এই নিবেদন তোমার করি, যেহে না বিচ্ছেদের দুখ।

অনিকুলে ভ্রম তোমার, কলহের নিরে এ ভাস।

(গোবিন্দ)

বাঁশীর তানে বিরহের যত্না অরিত উত্থান জাগ।
বাঁশীর তানে কী যেন একটা মাদকতা মাখানো আছে!
তাই মদ-নন্দনের বাঁশীর তানে একদিন প্ররনাতীত
উদ্ভাসিনী হইয়াছিলেন। বিরহীত কর্ণে যখন বাঁশীর
তান আসিয়া বাজে, তখন তিনিও মায়াহারা হইয়া
ভাবেন ঐ হৃৎকতনের লহরে লহরে তাহারই কার্জিত
প্রিয়ের আকান আসিতেছে।

একবারে হৃৎকিত হৃৎকিত জাগার।

পতিব বিচ্ছেদে ভিগ্ন হৃৎ বেকারার।

ভেদন হইল বোর অভ্যাসে ধানীর।

ধর-আগুন কেহ হইল অগ্নির।

টুকিতে না পারি মিলে বেশে বিহ্বল।

কেনিহু বহৎ হাত আস্খাম জাখিহা ॥
 সেই অঙ্ক সেকালিহু থাকবে হুটে।
 হানীর আওরাত ঘরি হাই সে ঘিনেতে ॥
 একলা তাকালে সেকালিহা সেহু।
 তরুর কিছু আশি সে সময় না সেহু ॥
 আশির ঘরিতা এক লমবে দিলিল
 ঘরিতার পানে হানী বাড়িতে লাগিল ॥

বিরহিণীর সমস্ত অন্তরাছাড় যেন তখন এই আশালে
 সঞ্চারিত হইয়া উঠে।

তব আলার আগে, থাকি তবই বিধারতে,
 কতদিন প্রাণমাণ আসিবে হেথায় -
 কই কোথা এসে তুমি, হেথায় লাগিবে আশি,
 দিবানিশি বুঝে মহি বিরহছালায় ॥
 (হাইভলে বকাতলা)

বিরহিণী নারিক। কাউরনে মফ্যর তেলার সে ঘরিতা
 লার হইলেন। তারপরই গতিরোপ করিল এক দেওয়াল।
 তিনি তাহাও অতিক্রম করিলেন দড়িত্রমে শাপের লেজ
 ধরিয়া। এই দর্পণে রজ্জুত্রেম বিরহের প্রগাঢ় অম্বা।
 বিহ্বলগ ঠাহুরের কাছিনীর ছায়া এইখানে আসিয়া
 পড়িয়াছে। বিরহিণীর এই আশ্বাস্তা অম্বা অতি
 স্বাভাবিক। বাতা মাহুরের প্রাণের চেয়ে স্রিয়, তাহা
 সে হারাইয়াও হারাইতে চাহে না। মনে ভাবে, যে শিখাছে
 সে চিরদিনের মত যাব নাই। আবার সে আশিবে,
 আবার তার অনাবিল ভালবাসার সুধাধারার আমার এ
 বিরহবাণিত চিত্র সীতল করিবে। বাতাকে হারাইয়াছি,
 তাহাকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি, এ চিন্তা পর্ণাত্ত তাহার
 পক্ষে অসম্ভব।

ইসলামি কবিত্বের বর্ণনার নারিক। মালকের মত।
 বসন্তের অবসানের পরে মনে তুক হইতে পুষ্পসমূহ
 ধরিয়া পড়িয়াছে। পড়ুক না। আবার বসন্ত আশিবে,
 আবার ফুল ফুটিবে।

শোনহে মালক তুমি সেকচিরা কর মা।
 আশিবে বসন্ত কিহে, তাকি তুমি জানবা।
 পর্ণপুল বিকসিবে, ফুলদুলা আসিতা তহে,
 মত হইবা প্রেমভাবে পুরাইবে হাসনা ॥
 (হেলোতা হুম্বী)

অপর। বিরহিণী নারিক। যেন রৌদ্ররান প্রাণীপ।

মা কবে প্রাণীপ বেকী, যদি থত হউল শিশি,
 পুনঃ ফের আসিবে শিশি, সেই সময়ে তেখবা ॥

বিরহ-বারমাসী

এই বিরহজালা বুকে লইয়া বিরহী-বিরহিণীর মাসের
 পর মাল কাটাতে হয়। প্রত্যেক মাসেরই এক একটা
 বৈশিষ্ট্য আছে, তাই প্রত্যেক মাসেরই বিরহবেদনা
 বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। কবি তাহারই বর্ণনা করিবার
 উদ্দেশ্যে বারমাসীর আশ্বাসি করিয়াছেন। বাংলা
 প্রাচীন সাহিত্যে অসংখ্য বারমাসীর বর্ণনা আছে।
 ইসলামি কবিরা তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন।

বৈশাখ

মাসগণ বসন্তঃ।

আকিতা'জিরব,	না লাগ সময়,
লাগি লাগি মনে যোব	
মাহার কাহণ,	হাশিলাল
	কেন নাহি শাহ।
যৌবনধন্য,	হোকারের পান,
	তাউ লকে চলে যাব ॥

বৈশাখে প্রাণে করিয়াই বিরহিণী অনুভব করেন তাঁর
 যৌবনধন্যতা, তাই লাগিয়াছে। বৈশাখের মাৎলাত
 বিরহজালাকে প্রথরতর করিয়া তোলে। তখু তাই নয়।

বৈশাখ মাসেতে কোটি ফুল নানা রসি।
 তেহুহার মনু পাখ ফুলসহো বসি।
 তেহুবার জগতনে বসনে শরাদি।
 আমার ফুলের মনুক করিবে পানি ॥



ফোটা গুজুভরা মূল দেবিয়া মনে বহু, সে-ও তো একটি
দুঃখের মত সংসারকে ছুটিয়া আছে, কিন্তু বাহার ভক্ত ছুটিয়া
আছে, তেঁওর সে ভক্ত ? তারার মধু যে বিকণে বিরহ-মস্তক
বাঁতালে বিলীন হইয়া গেল ।

আর বিরহীর মনের খবরাও এইরূপ ।

এহিও বৈরাগ্য মাস, দাস্য। দুঃখের বাঁহাট ।
বাহার প্রিয়া কাছে, বলে যেহ পুন্সহাও রে ।
আর প্রিয় নাহি কাছে কারে কিং হাট ।
এ দুঃখের বাহার আবার অগ্নি-অবসাদে ।

জ্যোতি

যেন তৈর মল, ভক্ত কখন,
তাঁহিরা আবার পড়ে ।
আর কখনও, কখন নাই কোলে,
এ হাট কহিছে কারে ।

এ বিলাপের ছন্দে-ছন্দে বিরহিনীর বুকের ভক্ত যেন
টুং-টুং করিয়া করিছে। কাহারে এ হাট সে কহিবে ।
আঁখির বনে আশ পাঁকিয়াছে । লকল নারী নিম্নের হাতে
অতি ধীরে আশ কাটিয়া তাদের প্রায়তনবের বাওরাইয়া
গড়া হইতেছে । কিন্তু সে কি অত্যাশী ।

‘পতি বিসে কারে আশি চিন্তিয়া বিধ ?’

বিরহীও বুঝে বসিয়া, তাহে, চাহ, আজ সে যদি কাছে
থাকিত, তবে এই আশ পাকা সার্থক হইত । সে আসাকে
বাওরাইত, আশি তাকে বাওরাইতাম ।

এ হিট মোর মাস আর থাকে নাহে ।
হাসিনুগে ব্যথ বাওরাহ, হার প্রিয়া কারে রে ।
মোর প্রিয়া নাহি কারে, কে বাওরাহে মোরে ।
তারাত বকিত আশি শরণ বিসে রে ।

আবার

আবার-আকাশে সন্ম-সন্ম করিয়া বঁধীর গজা বহ । বিরহ
আকাশেও ভবন অক্ষ বঁধীর বন ধারা । বাহিরের বঁধী
দেখিয়া মনে হয় সমস্ত অসুখিত যেন বিরহী বিরহিনীর

হাথে সমবেদনার অক্ষ চাপিতেছে । বিরহিনী বিস্তার
অক্ষসিকা হইয়া গণিত মেঘচাঁড়ের দিকে চাহিয়া আছেন ।
হঠাৎ নীলোজ্জল বিংশলী-প্রভার স্নানত বহনীয় মুহূর্তের জল
আলোকিত হইয়া উঠিল, তারপরই ভীষণ গর্জন !

আটল আবার, দুই আনিবার,
চমকে লগবে হাসিনী ।
মেঘের গর্জন, ক্রমি গুহ মন,
সাপে অতি একাকিনী ।

একাকিনী নারী বহুজনিত শিখরিয়া উঠিয়া একাকিনীই
পথ্যাতলে লুপ্ততা হইয়া পড়েন । আর এই ভাবিয়া আতুল
হন যে, আজ যদি সে কাছে থাকিত, তারাইসে এই দুঃখভূত
বহুজন-কলিতা বিশ্বস্বিকে সে তার ককত কৃণার
আশের দিয়া বাঁচাইত—নারী সে, তাকে এমন একাকিনী
পথ্যাতলে ভরে কাঁপিতে হইত না ।

আবার হাথেও হত বন ধনিয় ।
মোর অক্ষর হত বিরহী গর্জন ।
প্রাণ কবে পর পর, বিরহী হত পড়ে ।
পতি বার করে আছে হুটাইয়া বসে ।

ভরের মুহূর্তে ভালোবাসার জনকে জড়াইয়া ধরায় যে কী
শক্তি, তাহা বাহার ভালোবাসার জন কাছে নাই নেই জানে ।
বিরহীও বুঝে বসিয়া তাহে, এ বঁধীবাঁহুলা ধরীয় তাহে
তাহে যে স্বল্প দুঃখ বনিনা। হাইতেছে, এ যেন তাহারই অবাক
বেদনার অভিবাঁকি । এক একবার বহুজন হই, আর সে
চক্ষু মুগ্ধ করিয়া তাহে, এই এমন সময় একখানি গুহলতা
ভক্ত-ভক্তে তাহারই বুকে আশিয়া আশ্রয় নিত । আজ সে
বুঝে, আজ প্রিয়া বুঝে, আজ এ বুঝে জড়াইয়া ধরিবার
জন কাছে নাই ।

এহিট আবার মাস, মেঘের গর্জন ।
প্রিয়া নাহি কারে মোর মেঘনাবে ক্রমি রে ।
অন্তরে হুটাইয়া বাত বরে সাপটাই ।
মোর প্রিয়া নাহি কারে, কে বরে আশিগে রে ।

শ্রাবণ

শ্রাবণ মাসেতে পানি উকলে লাগেবে ।
বালা-বালা-কলচল জোষাবের তোড়ে ।
অভাগ্যার যৌবন রোজার হুটল কখন ।
পতি বিনে সে জোণার না হবে বাণন ।

ভাত্র

বন্ধ বিদেশে গিয়াছেন । আবাচ-শ্রাবণের বর্ষণের অভ্যাচারে
তিনি ফিরিতে পারেন নাই । আজ ভাত্রের গাঙে
তিনি তরী ভাগাইয়া আসিবেন !

কী স্থান! কী আনন্দকল এই ভাত্রের নদী !
ভাবেরে আদিত্যি সাজিয়া নদী আজ সমুদ্রমিলনে চলিয়াছে—
আজ অপর্যায়ের প্রবহ, আজ নদীর লহরে মিলনগীতি ।
সে মিলনগীতির দুর্জনা গ্রেমিক-গ্রেমিকারে লসহেও মিলন-
বাদনা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে । গ্রেমিক গ্রেমিকাকে
লইয়া তরী ভাগাইয়াছেন । তরী ছেউয়ের বোণার
নাচিতেছে, আর গ্রেমিক ভরকম্পিত কলেবরে শ্রিঃের
বুক লবলে জড়াইয়া ধরিতেছেন । আজ বিরহী একাকী ।

এহিত ভাবে হাস হাশের অতি বেশ ।
'কেস' আরোহণে বেড়ার আসক-মাতক হে ।
যোর শ্রিত্য নাহি বেড়াইব কাক-মিত্য ।
মিত্য বিবাহ দিবানিদি কলে যোর মিত্য ।

আর বিরহী ? তাহার মনের অবস্থা আরও বাধাতুর ।
তাহার চোখে শুধু ব্যহিরের ভরা গাউই ছল-ছল করে না,
তাহার নিম্নের অন্তরের মধ্যেও যে একটা গ্রেমের গাউ
উজ্জলিত, তার বেহের অগুতে অগুতে আজ যে একটা
মৌবনের গাউ উজ্জলিত, তাই তাহার চোখে বেনী করিয়া
জামে । সে হাফাকার করিয়া বলে,

ভাত্র মাসেতে রত পানির প্রবহন ।
আনন্দে ঢালাও বন্য নটক সদাশত ।

আমার যৌবনকী কেনা পিনে পাড়ি ।
পতি বিনে কে হুটবে যৌবনের বাণশি ।

আশ্বিন

আগমনী হুতে নাড়িতে নাড়িতে দিউলি-হুলের বুক:
জড়াইয়া শবৎ অঙ্গিয়াছে । শ্রবাসী আজ বৃহৎ বৈশাখ
হইতে বরে ফিরিয়াছে । অভাগিনী বিরহিণীর পতি শুধু
আজও ফিরে নাই ।

আশ্বিনের শেষ, না আশ্বিনী .শেষ,
কোথ অতি হুতাব ।

এই হুতাবভরকর্মবিতা বিরহিণীর চোখে শবৎের লকল
শোভা বার্ষ হইয়া যায় । বিরহিণী বেধে শুধু আকাপ-জাউ-
হুশ । ই যে শবৎের উদ্ভাসে ছল ধরিয়াছে, উদ্ভাসে অলি
বসিতেছে না । উদ্ভা অনাবরে করিয়া পড়িতেছে । চার,
আশ্বিন কি ভাগ্যজনী ! বাহার জন্ত সে হুলের পলতা
সামাইয়া আছে, সে অলি ঠি কই আসিল
না ।

সেই আশি অভাগিনী
হুল না বঁ

কাষ্ঠিক

কাষ্ঠিক বানের ক্ষেত শবৎচারে অবনত । তাই ভং
করে আনন্দ । বিরহিণী শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন,
আমার ক্ষেত আজও নৃত, —কলম কাটার সময় আসিল—
আমি কি কাটিব ?

হাথে হুপ-হুপ করিয়া নিশিত গড়ে । বিরহিণী
ভাবেন, আকাপ বেন তাঁহারই মত বিরহব্যাথার গলিত্য
পড়িতেছে ।

'নিশিত নিশিত, অর বহু বিহ
' কোথা যাব বিরহিণী '



অগ্রাহ্যরণ

কুতীরের মাথানে উতানে তিলের চাঁচ করা ছইয়াছিল ।
আজ সেট তিলে মূগ খরিয়াছে । প্রাচাদের খিরিয়া মধুশবল
আজ গুলনহত । আজ আবার আনন্দের দাঁড়ি বাড়িয়াছে ।
কিন্তু

জায়েল অস্থির, দুখচী সঞ্চল,
হিম তার মনে ধনি ।
খাবী সঙ্গে খিনি, করে কোণোপুলি
অভ্যাসিনী একাধিনী ।
হিয়েতে বহিরা, সব মজ চিহ্না,
হটল আবার কালো :
যেন ঈতকালে, কার নারি কোলে,
কত সাহে গ্রাণে জালি ।
দ্বিধা—এচিত মাথ বাগ, ঈতের অতি যেন
লেশ খায়ে নারী পুঙ্খ থাকে এক সাথ ।
মোর গ্রাণ-প্রিষ্ঠা নাই, কে তাহিবে কাকে ।
দ্বিধা-অনলে গ্রাণ হারন হটতে ।

পৌষ

পৌষ হটল বেহী, মাঝি একেধনী,
তবাহের বাগ অতি ।
তবাহ নরীণ,
অগ্রাণীর কিম্বা পতি ।
হেমন্তের বাগ, বহু বাস খাবু,
* অজ কাণে খর খর ।
আহা! গ্রাণপতি, নিরুপ অকতি ।
না! লটকা বার্ষা মোর ।

গৃহে বসিয়া বিরহিনী ক্লিষ্টা করেন । প্রাণে বিলাপ
করেন বিরহী ।

এহিঃ পৌষ মাস নাস্য বাস্তবঃ বাহ্যঃ ।
নকলে খানে হুখে, কে পাওঘায়ে যোয়ে হে ।

প্রিয়ার হাতের শেলব স্পর্শ না থাকিলে কোন ব্যবহারই
যে সুসিষ্ট হয় না, বিরহী প্রাণে যসিরা মর্শে মর্শে তা
উপলব্ধি করেন ।

মায়

বিরহিনী—মায়ের ঘায়ে ঘায়ে অজ কাণে খর খর ।
পতিত নুকে যেই নারী পোয় একান্তর ।
ঈত জার বাহি কিন্তু সেই নারীর অঙ্গে ।
অভ্যাসিনী বহি জায়ে, পতি যায় সঙ্গে ।

কান্তন

কোকিল বসন্তের আগমনী গাহিয়া নিরহীর তটায়
আদিয়া যা মিরাছে । বিরহী তাবিতেছেন—

এহিঃ কান্তন মাস, বসন্তের বাহার ।
কোকিল করিয়ে গান, কুহ কুহ খর ।
খিরখিরিয়ে পোতা অধর বাহার ।
কোকিলের খর গ্রাণ বীড়া তার তার ।

বিরহিনীর কাছেও কান্তন আঙনের অবতার ।

অঙ্কুরে বনকবাগে কুহরে কোকিলে ।
নারীর নরী বহু বিচ্ছেদ-অনলে ।
যার পতি ঘরে আছে বিচার অনল ।
অভ্যাসীর পতি নাই কে চাখিয়ে বল ।

কোকিলের কুহরণে গায়ে আঙন আনিয়া উঠে ।
প্রিয়ার হাতের সে আঙন নিতাইবার একমাত্র বল ।
কিন্তু তিনি তো কাছে কাছে নাই । এ অধিরূপে সে
জল চাখিয়ে কে ?

এই আঙনে এমন করিয়া বদ্ধ হইতে হইবে, এ জানিলে
কে এ প্রেম করিত । এ যে সাধ করিয়া কাটাঠারি
সিলিগাফি; সিলিগেও পারি না, কেলিতেও পারি
না ।

নবমের বাণ, অঙ্গ পান্‌ পান্‌

মিষ্ট কান্তে মনে স্থিতি।

সংহিত বা নাথি, পাটল্‌ কাটাঁথি,

পানব চটল বৈতী।

চৈত্র

এমনি নাগার বাণের বর্ষ শেষ চইয়া চৈত্র আসিল।
গ্রামে তাহার অনললীলা লইয়া আকাশের কোণে দেখা
দিল। স্বরু কদিকা উঠা বাতাস বহ, আর তপ্ত ধূলিভাণ
বাতাসন লগ বাহিয়া উদ্যানে বিরাহিণির গারে তপ্ত
লোভলগাকার মত বিদ্ধ চর। বিরহিণী অঙ্গপূর্ণ নরনে ভাবেন,

চৈত্র মাসেতে বড় মূলেব তাড়ন

চুট চুট করে আর ঝালাতে বাহন।

গার লতি করে আছে, নীতল সে নারী।

পাতি বিনে অত্যাশিরা বসে পুতে ঘরি।

তুমু কি ধূলির তাড়ন? বলন্ত-চায়া কোকিল আদিও
কৃষ্ণকণ্ঠাও হয় নাই।

বাতাবনপাশে উদ্যান—উদ্যানে ফুলে ফুলে উদ্‌ম্ব
দ্বিময়ের গুহন। যেন নব-বোধনা পরীর বল পাখা
ছড়াইয়া বসন্ত বধুকে চমি-মুগিত মধুপানে আস্থান
করিতেছে, আর সুধুকরমুখ সে আস্থানের প্রতিফলি
তুলিতেছে।

চৈত্রেরেতে তপন, অধির পদন,

সদা হানে প্রেমবাণ।

মনি শিকনাগ, গটায় প্রাণন,

বিকল লগাট প্রাণ ॥

মায়া প্রাণবদ, ঘরে কালবদ,

চটল অগি প্রাণ বৈতী।

সদাই চক্রে, বসি মূলপরে,

মধু পান বোরে হেরি।

বিরহের বার মাস এইতপ এক অবিকল্পিত দুঃখের দীর্ঘ
ইতিহাস। প্রাণ দিয়া অহতব না করিলে এ ব্যর্থমানীর
সার্থকতা বোঝা যায় না।

পীরিত

প্রেমভবের আলোচনা বা উদাহরণ প্রদেহে উদ্‌ল্যামি
প্রেমকাব্যসমূহে প্রেমের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা
ব্যাকবিকই অপূর্ণ। প্রেম বা পীরিত কবির চক্ষে তুমু সুবক-
বৃহত্তর আলক্তি বা বহিমিলন নহ। ইহা চইল পবিত্র
আন্তরিক একাশ্রুতা। এই পীরিতের উপর ভগবানের
অমল আশীর্বাদ। ভগবৎ-অনুগ্রহ বাস্তবকে কেহ এই
পীরিতের মর্মে অনুধাবন করিতে পারে না। প্রেম আমাদের
দেহের অঙ্গুপরমাণুতে পরিবাণ্ড; কিন্তু তাহা আমরা
উপলব্ধি করিতে পারি না, যদি না ভগবানের ভূপার
অমোঘের দ্বিবা নেত্র উদ্বীলিত চর।

‘কবানব কাট বিনে, তুমু কান চকু পান

নাথি জানে দাঁকিরা’ অক্রেত

আমার দেহ, চকু, কান, আমার বিজ্ঞা, বুদ্ধি, জ্ঞান কেহ
তাহার মহান দিতে পারে না। ভগবানের রূপা চাই।
কারণ, এই প্রেম স্বয়ং ভগবানের স্বষ্টি। এমন এক দিন
ছিল, যখন ভগবান ছিলেন একা, আদি, অব্যক্ত। তখন
বিশ্বস্রাব ছিল না, গ্রহ উপগ্রহ ছিল না, বিচিত্র
জীবজগৎ ছিল না। সে একাকী বুদ্ধি ভগবানের ভালো
লাগিল না। তাহার ইচ্ছা হইল তিনি প্রেমের লীলা করেন।
তাই বিশ্বত্ববন সৃষ্ট হইল, জীবজগৎ সৃষ্ট হইল। আর
বিশ্বের অঙ্গুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রছিল প্রেম। এ প্রেম
আপাদ করিবার ক্ষমতা ভগবান মহামূল্যকণে অবতারণ
হইলেন।

দুর্গে অকু নিমাতাং, প্রেমবন গুই করি,

সেই প্রেম মজিলা নিঃক্রেত

আলোচনাতে বিজ্ঞা, আশ্রয় প্রেম,

লোকের মহত্তম নামেতে।

তাই প্রেমময় ভগবান তাহার সৃষ্ট নরনারায়ণ কাছে ভগ
চাছেন না, ভক্তিও চাছেন না। চাছেন জনহৃতকা বিখ্যাত
ব্যাকুল প্রেম। কিন্তু প্রেম হইতে পারে, নিরাকার জিন,



কেমন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিব? কবিশ্রী এর উত্তর
দিয়াছেন। মাত্রমুখে ভালবাসিলেই ভগবানকে ভালবাসা
হয়।

ইসলামি পাত্রে কথ্য জানি না, কিন্তু ইসলামি এই
প্রেমকাণ্ডের কথা বলিতে পারি, কবিশ্রী মনেবে
পরমেশ্বরের সাক্ষর বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।
আমি গাজি-কানুও তাঁকেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করি:
মেঘাইব, এ হারপা তাঁকের মনে কতদূরভিত্তি গাঢ়িয়া বসিয়াছে।

কানু বলে, নারি আছে যোবার সাক্ষর।
গাজি বলে ওই নারি সত্যই হারপা ॥

তাই মনেবে ভালবাসিলে সে ভালবাসা ভগবানের
চরণেই পৌছে। প্রেমিক-প্রেমিকার শুধু প্রেম উভয়ের
স্বরূপ শুধু নির্বল উজ্জল করিত থাকে। তারপর এক শুভ
মুহুর্তে তাই প্রাণ এক হইয়া যায়। তাই সেহ, এক প্রাণ।
প্রেমমগ্ন ভগবান সেই একমুখ প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বারা
আলি পাঠেন।

প্রেমিক গাজী ও প্রেমিকা চন্দ্রাবতী শুধু প্রেমে এমনই
একমুখ হইয়া গিয়াছিলেন। কানু গাজী তাই তাই ধ্যানে
বসিয়াছেন। কানু ভগবানের ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু
গাজি ধ্যানভিত্তিমত নেত্রের পক্ষপাত চন্দ্রাবতীর সৃষ্টি ভাসমান।

কানু বলে, এই ধ্যানে যোবার চরণে।
গাজি বলে, এই ধ্যানে যোবার লগ্ন্য হয়ে ॥
'চন্দ্রাবতী পাঠিয়ে কন' কানু সাধা বলে।
গাজি বলে শুই মন এক চইয়া বেলে ॥

তাই মন যখন এক হইয়া যায়, তখন গাণনা বা কামের
কথার উদয় হয় না। অন্তরে তখন অন্তর রূপের সমুদ্র ঢেউ
খেলিয়া যায়। তাহার স্তল পরমাণবিক। প্রেমিক মে-
শ্রমসাগরে ডুব দিয়া সে-বাণিকের দখল করেন।

কানু বলে কি করিবে পাঠিলে তাহারে।
গাজি বলে মিলে যাবে সে মল্লমল্লের।

তপ! তপ! তপ! সন্ধ্যা প্রিয়তমার রূপের সমুদ্র-
গীতা। যেদিকে চাই, সেদিকে সে।

কানু বলে, চন্দ্রাবতী কোথায় এখন।
গাজি বলে, চাই দেখে হোলাটা মন
কানু বলে, এইভাবে কতদিন হবে।
গাজি বলে চন্দ্রাবতী আর নাকি হবে

মগ্নবিশ্রুতির মধ্যে বাহ্যতা প্রিয়তমার মধ্যে মিলন চাই,
তাহাদের বিরহের জন্ম আছে, কিন্তু মিলনের ক্ষেত্র বাহ্যদের
বিষয় তাহাদের বিরহ কোথায়? এই ক্ষুধার বিরা
পাওরাকেই তাহার চরম পাওরা মনে করে না। তাহার
মিলন উপভোগ করে অন্তর দিয়া। প্রিয়তার কথা ভাবিতে
ভাবিতে বিশ্ব তাহাদের প্রিয়তমার হইয়া যায়। গাজি সেই
মিলনের সাধক।

গাজির যোগ্য লক্ষ্যবর্তী চন্দ্রাবতী এই মিলনামলে
বিতার। গাজি কাছে নাই, তাই বলিয়া চন্দ্রাবতী তাঁহাকে
ছাড়ান নাই।

বিবলে বলিয়া ধ্যান করে চন্দ্রাবতী।
ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রাবতী হইল এমন।
যেদিকে যখন চাই খেলিয়া নমন।
বেশের বাজির জগ করে খিকখিক।
মন ভরিয়া জগ বেলে চন্দ্রাবতী ॥
আকাশ পাতাল আর চন্দ্রাবতীতে।
গাজি মিলে আর কিছু না বেলে চন্দ্রাবতী ॥
ভাবিতে ভাবিতে সেই জগ মনোহর।
গর চইয়া বেলে চন্দ্রাবতী মনোহর।
আগমন কাশ-হাওয়া সব পাশবিক।
একভাবে চন্দ্রাবতী বেলে গাজি হইয়া ॥
গাজী হইয়া চন্দ্রাবতী ভাবে আশ্রিত।
কোথা ছিল চন্দ্রাবতী সুখিয়া না শয়

চন্দ্রাবতীর শব্দ অবস্থার ভিত্তি-মিলনের রাস্তা আলিয়া
পৌছিয়াছে। ইহার পরেই যোবা তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।

ক'ী প্রেমের প্রেমের এই পরিকল্পনা। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এক নতুন রঙের অর্থাল ঘরে ঘরে পুলিয়া বাইতেছে। সেখানে ভালবাসার মকে পাড়াইয়া ভগবানের নাসাল পাওয়া যায়। সেখানে কবির যৌগিকতার তুলিয়া বলে,

জাযতে জাযিতে নেই রূপ যনোহব।
শার হইয়া সেল চল্মা অংশে নানব।।

প্রেমিকের উপমা

প্রেম বিরটি। মাহুনের তাবা তাহার বিরটিগ্রন্থ বাজ করিতে পারে না। কিন্তু প্রবৃত্ত অধু পিত্ত যেমন চাঁদ ধরিয়ায় আশার হাত বাড়াইয়া থাকে, কবিকুলও তেমনি এই অসাধারণে তাহাদের সমস্ত উপমা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেমিকার কাছে প্রেমিক কি? না—

প্রাণনাথ, প্রেমরসের চাঁদ, সুখের বাগি, অনুলা রতন, হৃদের ঘোবন, জেকেশীর বাস, রঙ্গের উল্লাস, সুখের তকল, ঐশ্বরের পবন, নিশিকালের রক্ত, কানের কর্ণধ্বনি, চক্কর পতলী, মধুর ভাণ্ডার, অগ্নির শীতল, আনন্দমন্ডল, ছোটের বেগোয়ার, হকের পোষাক, কাকুলের চোরাগ, ছাননের আয়না, হকের ছাঁমান, নিশিত্রাহের সাখী, আঁখারের বাতি, নরনের জোড়ি, হার গজমতি, সুখের ভোমর, যেকনের চোর, কমলার অলি, রঙ্গের সুগলী, জলনের অলি, রঙ্গের রসিক, ধূপকালের ছায়া, নখাংগের মেওয়া, কস্তুরী কাকুর, শিখির শিখর, নরনের কামল ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রেমিক ও প্রেমিকাকে অহুতপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

রসিক

ইসলামি কবিদের ভাষায়, হার প্রেম একনিষ্ঠ, তিনি রসিক। রসিক বাহাকে একবার ভালবাসেন তাহাকে চিরদিনই ভালবাসেন। গত দুঃখ কষ্টের মতো গুণের প্রেম অব্যাহত।

প্রেম এমন বিবহ।
কলে, গোড়ে, তরু নারি
তোলেতা জিহায।

রসিকের কাছে প্রেম পরপদবিলম্ব। জননীতে হৃদের তরল উঠিতেছে, তাহারই তাঁরে বসিয়া রসিক প্রেমের মাধনা করিতেছেন।

অন্যনিক রসকের মত মধু-পিস্য।। রতনিন যৌবন-মধু থাকে, ততদিন তার আনাগোনা। শুভল মুলের লল ত্যাস করিয়া সে নতুন মূল পুঞ্জিয়া লয়। নারী হস্ত তাহাকে পীড়িত-মাথা প্রাণবানি উপহার দেয়,— সে পীড়িতের মত না জানিয়া তাহাকে অবহেলা করিয়া তাহার যৌবনকেই আকাজ্ঞা করে। তাই দৌকনের সঙ্গে সঙ্গে মরসিকের প্রেমও অস্তিত হয়।

মহাপ্রেমের কাছে রস মখিন থাকে
যেমন, শাকি আমে মখি বিতে যবে ব্যাধ পাড়াবকে।
সেখ, শক্তের নালর জোহরা বেটা, কোমর ভেঙে গোড়ে
তরু, মতাবনো মতাবে ব্যাধ মত কুলেব কাকে।
মহাপ্রেমের প্রেম তেমনি ঐক্য থাকে না আর।
দ্বিহাবল্য যেলে নিজে বেতারনাক আর।
শোড়াকাল পুড়ির আর, আর বলব কি
এমন শোড়া পীড়িতের সুখে আভব সি।
এমন, কয়েক সঙ্গে কয়েক পীড়িত মলে নাটকে মন
পথিকে কি মত জানে রস সে কেমন।।

মানভঞ্জন

প্রণয় অব্যাহত হইতে মানের ক্ষয়। মেঘ যেমন মাঝে-মাঝে স্বর্ষাকে ঢাকে, মানও তেমনি মিলনকে বিচ্ছেদের



কালিমাঃ অন্বহিত করে। বাবা কৃষ্ণের মানসীলাই পোতি-
কাষো মানের আদর্শ। ইসলামি কবিতাও ইহার মধুকরণ
করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মৌলিক্য কিছুই নাই।

নাথক বক্তৃত্তা নাথিকার মধুখে উপস্থিত হইয়া স্তুতি
কর্তিতেছেন,—

নাথিকা দুখ দীক্ষাটয়া সমানে জবাব দিলেন,—

শে মাপা সিরেত তাপে, তুলিতে কি পারি আর।
হাও হাও শারফালা, তোমার পৌরিতে অমথার।
খাপে নাতি তুতে মনে, মজিহাম সিক্‌বের মনে
শল সেল, কলক হ'ল, (এখন) প্রাণে বাতা জাব।
আলাবি অসেতি যত, তোব জগত তুল কব কত।
এই চ'তে চ'লেম দেহ, পোতিত না কবব আর।

(ভুলে বলাভলী)

নাথক তখন খোদামুসিবির হুজুর আর এক পক্ষী চড়াইয়া
দিলেন।

কিরে হ'লে কথা কত, তুলে আঁকি নিব।
মানে লাভ কেড়ে নাও, মোব পায়ে চাই।
বিক্রমে মধু কথা আমারে খনাত।

নাথিকা নিকত্তর। নাথক অদত্যা বলিলেন,

পোব প্রাণেবলী, ওশনী হুখলী,
জেরুখী মন গ্রাণ।
আমি তো তোমারে, তুমি তো আমারে,
নাথি করি অস্ত্র জ্ঞান।
বটে নাহা হই, তব চাড়া নই,
হাস তব চকণতে
গোহ-পের মোহ, মকলি যে তোব,
আপ সব তব হাতে।
এ দাঁদ তোমার, হুজুর-বদমার,
বাধা বল তাহা কহি।

(ভুলে বলাভলী)

নাথিকা তবু নিকত্তর। 'চরনের দাণ' 'হুজুরবদমার'
নাথক তখন বলিলেন, নাথের দরি, তিক্য কতি, কথা তও।

নাথিকা এত মধুখে কথা কহিছেন না। নাথককে সিঙ্গ
সতা সতাই পা ধরিয়া মান তাঙ্গাইতে হইবে,—নাথককে
নিজের পায়েত তলায় গোড়াইয়া তাহার গোমর তাঙ্গাইতে
হইবে। তাই নাথিকা মধু কিচাইয়া দ্রোব করিয়া কাহিলেন,

সখা, শার হরিতে কেন ডাঙে
দুখি হারে তাঙ্গোবাংস, তাব কণ্ডে যাত হে।

(নিজাম পাশলা)

নাথক তখন—

একথা তুমি, বিরাল হইয়া
কণ্ডে সাহা হারে জারে।
কাথিকা নাথিকা, আত্বর চইয়া
খিলি পায়েত প্যে।
প্যে হলে পাথ, বিবি কণ্ডে ডাব,
গাথিয়া উলম ধরে।
পায়ে পাশাটয়া, কণ্ডে বলাটয়া,

ইত্যাদি স্তপে পুনর্বিদলন হইল।

শেব কথা

ই হুজুরবর্ণনা ইসলামি প্রেমকাষো অন্তান্ত অমূল এবং
অপাঠ্য। কথিরা লকণ কবাই খোলাখুলিভাবে গিথিয়াছেন।
তথু একজন কবি সংঘত লেখনী চালাইয়াছেন বলিয়া হুজুর
লীলা মধুখে প্রাথমিক চু-এক কথা বলিয়া বলিয়াছেন,

যে জন বদিক হলে, হুজুর সাংঘ।
খোদলা কথিরা লেখা উঠিৎ না হত।

(নিজাম পাশলা)

ইসলামি কাষো একনিষ্ঠ প্রেমের নিবর্ণন পুথ কয়।
নাথক প্রায় কেনেই বহু নারীতে আসক। এক কবি এই
বহু-প্রেমকে কটাক করিয়া গিয়াছেন। তাহার কথা তুলিয়া
দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

তরুণ কিশোর

জসীনউদ্দীন

তরুণ কিশোর, তোমার ঘরনে লবে এ তোরেই দেখা,
তোরেই বাতাল তোরেই কুহ্মে জুড়েছে রক্তের খেলা।

হাতের কুহ্মে-তলে,

তোমার ঘরনে উদার আকাশে পিতৃ রবির মলে।
এখনো পাবো উঠনি আশিরা, শিশির রয়েছে স্নেহে,
কলকৌটাব পশ্চিমে 'রেলি' কোম্বৌলতা স্নেহে।
পূর্ব কোলেতে বধূ! স্নায়ু খোলেনি বাস্তব বাধ,
নিখীল কলেতে নাহিরা নাহিরা মেটেনি সত্যের দাধ।

এখনো আশেনি 'অলি,

মধুর লোভেতে কোমল কুহ্মে ওপরেতে 'দলি' 'দলি'।
এখনো পোশাক মা'বাদের হলে আলোকের নতুনল
মেঘে মেঘ লেগে বরণে বরণে করিতেছে উলমল।
এখনো বলিরা পেঁউতীর মালা গাঁদিকে 'তোরেই তরা,
তোরেই রক্তের শাওখানি তার বুনান তরনি সারা।

হাতের তরুণ হাথ,

এখনি যে লবে জাগিয়া উঠিবে অতীতের কিনারা।
এখন হইবে লোক জামাতানি, মূখ চেনাচেনি আর,
হিলাব নিকাশ হইবে এখন কতটুকু আছে কার।
বিহগ ছাফিয়া তোরেই তরুন, মা'বাদের লজ্জানে
বাতালে বাহিরা শাখা-পেছ-বাধ ছুটিবে সুখ-পানে।
পুত্র হাওয়ার পুত্র ভরিতে বুকখানি করি নুনে
ফুলের দেউল হবে না উজাড় আজিকে অতীতে পুন।

তরুণ কিশোর ছেলে,

আমরা আজিকে তাহিরা না পাই তুমি 'বেখা কেন এলে ?
তুমি ভাই সেই তরুণ রাখাল, পাতার দুকুট পরি'
তোমাদের রাজা আজো নাকি খেলে গেঁতো মা'তখানি ভরি'।
আজো নাকি সেই বাণীর স্রাবটি তমালপতায় কাঁদে
ওগে অজারে নূর হাওরে পথের স্মারক কাঁদে।

কেন এলে তবে ভাই,

লোনার গোকুল আঁধার করিবা এই মধুরার ঠাই।
বেখা ঘোবন মেলিবা ধরিবা জমা-খরচের খাতা
শাও লোকদান নিতেছে বৃষ্টিয়া পুণিরা পাতার পাতা।
ওগারে গোকুল এগারে মধুরা মাগে স্নায়ুর তল,
শাপ মধুরার কাল বিধ ল'রে চলিতে সে অদ্বিরল।
ওগারে কিশোর এগারে লুবক, রাজার দেউল বাড়ি—
পাখালের ঘেলে কেন এলে ভাই তাখালের লেল চাড়ি ?
তুমি যে কিশোর তোমার মেগেতে চিলাব নিকাশ নাই,
যে আসে নিকাটে তাহায়েই লগে আশন বলিরা ভাই।
আজিও নিকাটে বিকাইতে পার ফুলের মাগার দামে,
কলকথা ভনি তোমাদের 'দেলে কলকথা দে' নায়ে।
আজো কানে গৌজ শিরীষ কুহ্ম, 'কিন্তক-মজর'
অথকে বাহিরা পাটল ফুলেতে ত'রে লগে উত্তরী।
আজিও চেননি লোনার কাবর, চেননি মুক্তাচর,
হাসি মুখে তাই সোনা স্ব'রে লড়ে তোমাদের হার তার।
সখালী পাতাও লখাদের সঙ্গে কিনা ফুল লাগে প্রাণ,
এগারে মোদের মধুরার মত নাট দান প্রতিদান।
বেখা ঘোবন বত কিছু এর খাতার লিখিবা লগ,
শাপ হ'তে এর চাপ খেলে নাক—এমনি চিলাবমর।
হাসিটি বেখাব বাজারে বিকায়, পায়ের যেদাত করি'
বেখাকার লোক হুতের পরাণ ঘনে ঘানে লগে ভরি।

হাতের কিশোর হাথ !

ফুলের পরাণ বিকাতে এসেছ এই পাপ-মধুরার।
কালিন্দী-লতা গলার অজারে মোবার গোকুল কাঁদে,
তরুণ ফলাল বাধা নাহি লড়ে খেন মধুরার ফাঁদে।
মাখবীলতার লোলনা বাহিরা কদম-শাখ-পাখ
কিশোর, তোমার কিশোর লখা তোমারে যে ওহ ডায়ে



ডাক কেয়াবনে মূলমন্তরী ঘন-সেয়া-সম্পাতে
মাটির বুকেতে তমাল ভাগ্য মূল-বাঁধখানি পাতে ।

ঘরে ফিরে যাও সোনার কিশোর, এ পাগ-মধুখাপুরী
তোমার সোনার অঙ্গেতে দেব বিধবণ ছুঁড়ি ছুঁড়ি ।
তোমার পোকুল অকো শেষে নাই ভালবাসা বলে কানে,
তালবেলে তাই বুকে বেঁধে লগ আঁধারিমা ঘরে ভায়ে ।
লেখার তোমার কিশোরী বৃষ্টি মাটির প্রদীপ ধরি'
তুলসীর মূলে প্রণাম যে আঁকে চরত তোমারে 'সরি' ।
চরত ভাগ্যে জানেনা সে মেয়ে, জানেনা কুসুমহাভ,
এত যে আঁধারে গাঁথছে সে তার; গলায় বেঁধেছে কান ?
তুমিও চরত জান না কিশোর, সেই কিশোরীর গানি'
মনে মনে কত দেউল গেঁথেছ কত না রজনী জানি' ।
চরত ভাগ্যি অলকে বাঁধিতে মাটির কুমুম মূল
কত বৃণ পথ খুঁজিমা মরিছ কত পথ কহি' হুণ ।
করে তালবাল করে যে বাস না তোমরা শেখান তামা
আনোদের মত কাঁড়নার কাঁবে জেনি উছ ও আঁখা !
মোদের মধুমা উপমল করে পাগ-লালসার ভায়ে,
ভোগের লম্বিমা জালিমা গামরা মুড়িতেছি তারে ভায়ে ।
তোমাদের প্রেম 'নিকষিত হেম কামনা নাহিক তার',
কিশোরভজন পিথিচ্ছে কবি তাই ও ভ্রমের গাঁয় ।
তোমাদের সেই ভ্রমের মূল্য জেনে যে এত বড় বিষয় ।
সেই ব্রহ্মলী অকো ত বুঝেনি তোমার সোনার গায়,
কেন তবে তাই, চরণ বাক্যে যৌবন-মধুবার ।

হারের প্রলাপী কবি !

কেউ কতু পারে বুঝিয়া লইতে ললাটের লেখা লিখি ।
মধুবার রাজ্যে টানিছে যে তাই কালের রজ্জ্ব ধ'রে
'তরল কিশোর, কেউ পারিবে না ঘরিয়া জালিতে তোরে ।
ওপারে পোকুল এগারে মধুমা মাঝে যবনীর জল,
নীল নরনেতে তোরা বাখা বুকি বয়ে যায় অবিরল !
তবু যে তোমারে যেতে হবে তাই, সে পাখান মধুবার,
মূলের বদন্তি ভাঙিয়া এখন বাটবি ফলের গাঁয় ।

এমন করিমা ভাঙা বরষা মূলের কুমুম খুলি'
কম্ব-কুমু নিহবিয়া উঠে পরব কাণ্ডার ছলি' ।
এমন করিমা ভোরের নিবিব তকার ভোরের বালে,
মাঝেই চায়ার বুকের স্মৃতি নিদ্রাঘের নিদ্রায়ে ।

তোরে যেতে হবে চ'লে

এই পোকুলের মূলের বাঁধন ওপায়েতে বলে' ম'লে ।
তবু ফিরে চাও সোনার কিশোর, বিদায়-পথেব ঘায়
কি কুমুম তুমি ফেলে গেলে ত্রাণে দেখে লই একবার ।
ওই সোনা মুখে অকো গেলে আছে জননার পত চুমো
জুটি কাশো আঁখি অকো হ'তে পারে ঘুম গানে গুমুমো ।
ওই ভাঙা টোটে পড়াইয়া বেছে কত না ভোরের মূল,
বরণ ভানের আর পেলবতা লিখে গেছে নিরুণ ।
কচি শিত ল'রে দরার মাঝেরা যে আদর করিমাছে,
সোনা ভাইদের সোনা মুখে বোন বত চুম; বাঁধিমাছে,
সে সব আঁখিকে ভোর ওই মেয়ে ভরিতেছে টলমল ;
নিখিল নারীর মেহের লিলে কুই শিত লতল ।

যে কিশোর, এই মধুবার পলে লগা দেখিমা তোরে
মনে হয় যেন ও মণি কাকরে দেখেছিছ এক ভোরে,
সে আদার এই কৈশোরবিহা জীবনের এক তারে
কোখা হ'তে যেন সোনার শাবীটি উড়ে এসেছিল ঘারে ।
পাখার তাহার বেঁধে এনেছিল বৃণ গমনের লেখা
আর এনেছিল ব্রহ্মান উষার একটু শিশু-রোখা ।
সে পাখী কখন উড়িয়া গিয়াছে মোর বাণুর ছাতি,
আঁখিও তাহারে ডাকিমা ডাকিমা শূণ্যে হুগত নাকি ।

সোনার কিশোর তাই,

তোরা মুখ হেরি মনে হয় যেন কোথায় তাগিয়া বাই ।
এত কাছে কুই তবু মনে হয় আঁখায়েগে গেয়ো নবী
তার ওই পাতে দান্য বাণুর তকার মিষ্টল 'রোখি' ।
সেইখানে কুই ছুটি ভাঙা পায়ে আঁকিয়া পায়ের রেখা
চলেছিল একা বাণুকার বুকে পড়িয়া টেউএর লেখা ।

সে চরে এখনো মাত্রের কৃষাণ খাণ্ডে নাই ছোট ঘর,
 কৃষাণের বউ আঙলা খাণ্ডেনি তাড়ার বুকোর পর।
 পাণ্ডল দেখার সাড়িরে সূঁড়িয়া পাহেনি ঘানের পান,
 জলের উপর ভাসিতেছে ঘেন মাটির এ মেটো পান।
 বর্ষার নদী একেছিল বুকু ঢেউ দিয়ে আলপনা,
 বলা গিয়াছে ওই বাসুচর আঙো তাড়া হুঁছিল না।
 সেইখান দিয়ে চলেছ উখাও, চষা চষি উড়ে আগে,
 কমল পাখির বাতাল তোমার কমল মুখেতে লাগে।
 এগারে মৌদের করের 'গেরাম', আমরা মোকানদার,
 বাউখায়া দ'রে মাগিতে গিয়েছি কতটা ওজন কার।
 তবু রে কিশোর, ওইগারে হবে কিরাই নন্দনবানি
 এই কালো চোখে আঙো একে বার অমরার হাতছানি।

ওপারেতে ডর এগারেতে গুর মাংক বচে গৌরো নদী
 কিশোর কুমার, দেখিতাম তোরের কিছির: পঃভাতি যদি।
 জোর সোনা মুখে উড়িতেছে আঙো: নতুন চঃবঃ বালি,
 রাঙা গুটি পাও চলিয়া চলিয়া রাঙা চষি আঁতে পাণি।
 তুই আমাদের নদীটির মত চঃগারে চইটি তট
 তুই মেয়ে ঘেন তুইগারে টানে বুড়ারে কঃগের ঘট।
 ওগারে ডাকিছে নদা বাসুচর কিশোর কঃগের সাধী,
 এগারেতে ডর, তরা ঘৌবন কামনা-বাখার বানী।
 তুই কঃগ: ডাই খুয়াইয়া থাক্ গৌরো নদীটির মত,
 এগার এগার গুটি পাও দ'রে কাণ্ডক বাদনা হত।



ভ্রমণ-স্মৃতি

ত্ৰিবেণীচন্দ্র দাশ

আমরা তিনটি বড় তেলগাড়ির একটি কামরা দখল করিয়া বসিয়া আছি। সুকলা পতঙ্গাঘরা বঙ্গপক্ষীর মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। শ্বেতলাল গাড়ী কোন ঠেগনে অগ্ন্যেতনে গামিবে না; কাজেই পূর্ব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ক্রমে দক্ষিণ ঘনাইয়া আসিল। কোন খান দিয়া রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, বৃত্তিতে পারিলাম না, রেমটু-রেট-কারে আচীরের ডাক পড়িল। সেখানে আমরা দশগেট সমবয়স: কোন জাতি-ভেদ নাই, কাজেই আনন্দলভ্যকারে আহার চলিল। যাহুব আপনার মধ্যে করিত উচ্চ নীচ প্রভেদের পণ্ডা টানিয়া দিয়াছে—বিধা আপনি বকিত হইয়াছে।

আচীরপথে আমরা নিজেদের কামরার দিগিয়া আসিলাম: ক্রমে বৃদ্ধ হইলেন ঘুমাটয়া পড়িল, কিন্তু আমার ঘুম হইল না। আমি জানালা খুলিয়া বাহিরে তাকাইয়া যাইলাম। তখন পতীর রাত্রি। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে বড় কিছু দেখা গেল না। আকাশে তারা উই একটি মাত্র মিটিমিটি মলিতেছে। তিসিতাব-গুহিত রক্তনাতে অভিশাখিকাণ পাড়িতে খচিত হোৱকমালা মৃত পানি বিকাশ করিতেছে। দূরে কয়েকটা সাহাঙ্ক দেখা যায়। তরুকাচিত উপত্যকাভূমির মাঝে মাঝে কুটিরগুলি দেখিলে মনে হয় যেন সেগুলি পক্ষ সৈন্যের পুষ্টির মন্তরালে অবস্থিত শিবিরস্রোই। অন্ধকারে তরুকাচি নিবৃত্ত হইয়া পরস্পর মাথাগুলি স্পর্শ করিয়া কোন গোপন বাণী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ভাষায় বকিত বলিয়া মৃত বেদনা প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। সে গুলি কি গাছ জানি না, তবু 'তমাল-তালীধনবাগিনীলা'র কথা মনে পড়ে। বাতাসের আলো পাওয়ার মধ্যে কত কিছু আস্ত পাওয়া যায়। তিসির-রাত্রির এই শঙ্কিতরীণ স্রোতে দ্বন্দ্বের কি মর পড়িয়া দেয়।

মৃত্যুতোলাগর রাত্রি কাটিয়া গার। কখন ঘুমাটয়া পড়িলাম জানি না।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা তিনজন পাশাপাশি চুপ করিয়া থাকির তাকাইয়া আছি। চাতিবিকে তাঁবনের লাড়ো পাওয়া যাউতেছে: রাখাল গরুগুলিকে লটকা বাহির হইয়াছে। আমার মনও এই ভাপরলোম্বণ জীবনবাগিনীতে যোগ দিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। দূরে পথের উপর লগ্নে বহুল আছাদানের জন্ত ব্যাকুল হইয়া করিয়া পড়িয়াছে। নীল আকাশ-পটে তরল অকণ্ঠে দীপ্ত প্রকাশ হইয়াছে। গ্রাম-ছাড়া এই রাক্ষাসাঙ্গির পথ আমাকে কোন অজানার অভিসারে তুলিয়াছে। ও পথ জানি না কোথায় যেন হইয়াছে, তাবিতা বুল পাই না। দূরে হস্তাঙ্গের জন্ত এই আকাঙ্ক্ষা, এই ব্যাকুলতা এ যে মানবমনের শব্দে চিরন্তন। দূরে নৈশ, গ্রাম-ছাড়া পথে নৈশ মৃদুচকণ্য আশাই এই মানবকে এই জীবনমক্কেত ঘুরাইয়া বেড়ায়। তাহার শেষ কোথায় কেহ জানে না—জানে না বলিয়াই ভাল এত আকর্ষণ করে।

পথে মোগলদুয়াই ঠেগনে আমাদের চা-পান পূর্ণ শেষ হইল। তারপর আমরা কাণ্ডি কাউন্সেণ্ট ঠেগনে আসিয়া পৌছিলাম। তখন বড় তাড়াতাড়ি পালা লাগিয়া গেল। আমরা ব্যাগের মধ্যে যাবের কাপড় লইয়া মোটরবাগে উঠিয়া বসিলাম। আমাদের প্রথম উঠবা ছিল সাহানাব। সাহানাব সেখানে হইতে লাড়ো হাইল দূরে। সেখানে বৌদ্ধ বৃক্ষের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। দর্শনমন্টে অনেক অর্গ বং করিয়া এই ধ্বলোৎপলগুলিকে লাগাইয়া রাখিয়াছেন। পাথরের উপর স্থলর কাককাণ্ডার নানা প্রকার মুষ্টি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। চাতিবিকে কত ধন্যবাদ

জন্ম-মৃত্তি ঐশ্বর্যশতরূপ

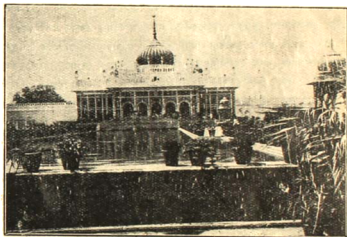
সহস্রাব্দে। অতীতের এক পৌরষময় যুগের এই মুকুটটি ভুলি যদি কোনরকমে ভাঙ্গা পাঠিত তথা চটলে কত কথাই কবিত্তে পাইতাম। এইখানে মাত্র একদিন থাকিবার কথা, কাজেই আমাদের বাস স্তম্ভবেগে পেটাল কপেল, গ্রামরূপ মিশন প্রভৃতি ব্রিটিশ কিল্‌বিল্ডিংসিডালয়ে আসিল। বিশ্ববিদ্যালয় বেবিয়ার বসে বটে। এমন বিস্তারিত মাস্টের অর্থঃ চারিদিকে বিস্তীর্ণ কারুকার্যময় মনোহরমণ্ডলিকা ভূগি বেবিলে কোন রাজার আবাস গলিয়া মনে হয়। ইহার পাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গাঁড় করাইলে শাখীর খাঁড়া বলিয়াই মনে হইত।

অন্তঃপুর আমরা রাণী ভবানী চূর্ণাবাড়ীতে আসিলাম। মন্দিরটি বড় সুন্দর; তামা চড়া বিদেশে বাংলাদেশের মন্দির বলিয়া আমরা চকুতে আরও সুন্দর। এই মন্দির কান্টার মত ঘেঁষাতাও মন্দিরবহল স্থানেও অতি প্রসিদ্ধ।

পূর্ণদিন প্রত্যয়ে আমরা লক্ষ্যে পৌছিলাম। প্রব চট্টেই লহর দেখিয়া মনে হইল “হ্যাঁ, এ অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী বটে। পলাশখানি টোকার এখন আমরা রাজপথ দিয়া ঘাইতেছিলাম তখন

চট্ট ঘরের বাড়ী হইতে লাহর সম্মুখ উৎসুকনয়নে এই পোতাধারা দেখিতেছিলাম। কয়েকজন বাঙ্গালী আসিয়া আমাদের লক্ষ্য তত্ত্বান্ত জানিয়া গইলেন। তাউসিল হাউস, উইলসনকিন্ড পার্ক, বেসিকেলি প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়াইলাম। বেশিকৈ তাকাই বাসি প্রাণাধরেন্দ্রী। আজ অযোধ্যার সে নবাব নাই; লক্ষ্যেরে সে ঐশ্বর্যও নাই। এক সময় লক্ষ্যে জোপবিলাসের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ছত্রমন্ডিল, মন্ডিমন্ডল, শিকারি বাস, কৈশরবাগ্য হরিয়াছে। এখনও গাঙ্গেনাথান প্রাসাদে নিয়ন্ত্রাসন হরিয়াছে; দিত্তেন নবাব চক্ষ্যমত বেগমমহের কাছে ঘাইতেন, কিঙ্ক গোলাকর্ণাধার

শিখি বিরা তাঁকরা নাচে আসিত্তে পারিতেন না। সে শিখি আজ কহ। মিলখুলা প্রাসাদ এখন তত্ত্বাবধেয় মাত্র। এষ্ট লক্ষ্য প্রাসাদ আর লুপ্তাশিত্তে সুবসিত্ত হইল। আর বিন্যাসের অবাধ প্রোত তাহাদের মধ্যে কহে না। কালক্রোতে লবহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবুও সুন্দরমানী শিল্পকলায় নিবন্দন-ভুলি আজও বস্তমান। কলিকাতার বড় বড় প্রাসাদে নানা প্রকার শিল্পকার্য মিশিয়া খিচুড়ীর সৃষ্টি চইয়াছে। কিঞ্চ লক্ষ্যে একটা বিশেষ শিল্প-প্রণালীকে অচরিতত্ত্ব কৃতকার্য্যতায় লুচিত্ত অঙ্গুলন করিয়াছে। পাঠনভকৈ পাঠাউকি ও তাঁহার বেগমমহের কবর আছে। এষ্ট নবাবের কবর



মাছি ভবন—লক্ষ্যে।

আসিয়া আমরা একটা নতুন অত্মভূতি পাইলাম। অবশ্য শাহজাহান তাকমতলে একটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার সন্নিহিত পাঠনভকৈও তুলনা হয় না। তবু মনে রাখিতে হইবে যে লক্ষ্যের অঙ্গুঠে মত বা কবর প্রসিদ্ধ করা বটে না। তাই বলিয়া অর্থা বা ব্যতির মানভকৈ প্রেমের তুলনা করা চলে না।

লক্ষ্যে তাগ করিয়া আমরা দর্শ্যকশে আসিলাম। তপন প্রথম উবার অগমনী গাথার লক্ষ্যে লক্ষ্যে চতুর্দিক অমনময় সৃষ্টি হারন করিয়াছে। নিবাসেদের অক্ষাণ স্থানীল। সেট নৌনিম। লক্ষ্যে ব্যাপ হইয়া মাস্টের উপরে, লক্ষ্যের তলে,



নিত্যে কল্পিত করিয়াছে। দুই বন্যের চঞ্চলতার উপর
মুক্তিত চট্টা বসিয়াছে। ধীরে ধীরে বার্ডি পাইনের অঙ্গুল
চট্টে বালক দেখা দিতে লাগিল। উষার পিছুনে
পিছুনে হংসের এই অনন্তকাল বহিরা অমৃতরসের শেখ নাই,
সমাপ্তি নাই। হংসের দ্বিধা কিরণমালা আমার দুখের উপর
আগিয়া পড়িল। এ কার মেঘস্পর্শ! মন নিবিড় আনন্দে
ভরিয়া গেল। অত্যাশীষ তলে ছায়াযোতের দেখা যেন
আমাদের স্নেহপ্রসঙ্গ জীবনের ছবি। আমাদের জীবনে
এমনি স্নেহোদয় হয় কিছু ভাঙার মধ্যে মেঘের ও ছায়া পড়ে;
পূর্ণ আলোক কোথাও ত পড়ে না। এ অনন্ত শোভাময় স্থানে
কবে কোন সময়ে জীবনের বনে দৌলবস্ত্র প্রথম মল্লময়
নিঃসার ফেলিয়াছিল, সে সময় যে চিরনবীন আনন্দ পুষ্পদল
চুটিয়াছিল, আরও তাহার শুকাইয়া থাকাবার লক্ষণ দেখা যায়
নাই, এখানে আছে কেবল স্বচ্ছ নীলাবরণের মধ্যে একটা প্রলয়
কণা-বুড়ি; প্রভাত শিখিরে ধীরে ধীরে হালি যেন স্বর্নবীণার
এই চট্টে কোন প্রত্যাশিকার চঞ্চক-অঙ্গুলি ছায়াতে
বলিয়া বলিয়া কীশে। সেই অস্বাভাবিক কানি কি লক্ষণের
কণে প্রবেশ করে? তরঙ্গের গতির মত, পুষ্পের স্নেহের
মত, শিশিরমিত্র তৃণদের মুকুলাবগোর মত তাহা শুধু
কারো মনে গোপন চরিত্র ফেলিয়া একটা নিভৃত স্থান অধিকার
করে। এ সৌন্দর্য্যসাগরের অশ্রুত কল্লোলধ্বনি সুদ সুদ
আখ্যাত লক্ষ্যবীণাতে যে তান জাগাইয়া তুলে তাহা আমাদের
মনে বিভ্রান্তের মত ক্ষণিক দিহন্তর তুলিয়া কোথায় যেন চলিয়া
যায়। সে সৌন্দর্য্য বৃষ্টি আর বিরম্ব ব্যাপ্ত হইয়া পিছাইছে।
সে যে লক্ষণক অবাক্ত তাহার ডাকে।

আমরা পর্ব্বতের উপর উঠিবার পূর্বে চরিত্রের মদ্রির
ধেপিতে গেলাম। নিকটেই খরস্রোতা গঙ্গা; নদীতে এত
শ্রোত যে হাত ডুবাইতেও ভয় হয়। সাহসলি নির্ভয়ে
শেলা করিতেছে। এখানে কেহ সাহা যায় না; সাহা নাম
গর্গত্ত উচ্চারণ করিতে নাই। তিনিগাম বালারীয়া সাহা
পায় বলিয়া লক্ষণে তাহাদের স্থা করে। আমরা চারিদিকে
ঘোরাঘুরি করিয়া অধঃপথে পাঠাড়ে উঠিতে গাঙ্গিলাম।
আমাদের গন্তব্যস্থল লক্ষ্মন কোলা এখান হইতে প্রায় পাঁচ
ঘণ্টা দূরে। অবিরত চড়াই ও উৎরাই তাঙ্গিয়া বাইতে

হইবে। দূরে গাভোরাগের রাজপ্রাসাদ দেখা দাটতেছে।
অতি উৎসাহে আমি স্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। লক্ষণে
ব্যস্ত করিল কিছু ইচ্ছা ব্যস্ত ত্রিবার বহন করে। আমি
চিরদিন এ উৎসাহ থাকিবে না। আমি জীবনের সবদায়ময়
অগন্তে যখন প্রাণের রস চুকাইয়া আসিবে, যখন চকুতে
সবট নিরানন্দ লাগিবে তখনও এই চিন্তার একটা স্পষ্ট স্মৃতি
স্ব মনে বাজিবে।

প্রাচীন কালের ভগবান আর আকার বহিরা আমার
লক্ষ্য-প্রতিভাত হইল। চারিদিকে শৈলমালা, নিম্ন প্রবহ-
যাঙ্গিনী, কলারদ্বীপী জলকুজা। চারিদিকে অরণ্যের বেলা,
উচ্চ পর্ব্বতচূড়া গুটি অব্যাহত করে; অমৃত আকাশের
কেবল একটা যন্ত্রের অঙ্গও রূপ দেখা যায়। দূরে তেমনট
বিটপী-বটীত প্রান্তর, তেমনট বিদ্যমিত্তিক পর্ব্বতগণ,
তেমনট বিষ্ণুতাকালী। ইতিমধ্যে অজীভ্রয়ের গতিত এক
চট্টা গিয়াছে। ইতিমধ্যে-বিকল্প উপত্যাকান্তলি যথেষ্ট
যালিকা-কুজার জাং বেলা করিতেছে; ধানগজীর ভূবরের
সেহিতে ক্রমেই নাই। আপন মনে হিমালয় গোপ সাধনা
করিতেছেন। চারিদিকে বৃদ্ধ তপস্বীর গভীর অগত মধুর
তথ্যনক অগত আনন্দবারক বৃষ্টি, চারিদিকে সাধকগণের মূগে
দেখাইছে ছায়া। যন তরুজাঙ্গির অভিনব লব্ধের মনন
মনোভর আবেদন, কণে কণে দিক্ত বায়ুর মধুর শিরণ
উপভোগ করিতে করিতে আমরা চলিয়াছি। কণে কণে
মেঘ পর্ব্বতচূড়াকে ঢাকিয়া দিতেছে। এখানে বৃষ্টি অল্প
বলিয়া কিছু নাই, অগাধি বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল
অতুল্য জীবনবনের অতুল্য অসুখায়া। এখানে সত্যাদিগণ
আমাদের সভ্যতাক্রিষ্ট জীবনের লক্ষণ কল্পিত মাঝেই ফেলিয়া
দিয়া এই অসাবধান আনন্দজোতে ভাসিয়া বাইতেছে।

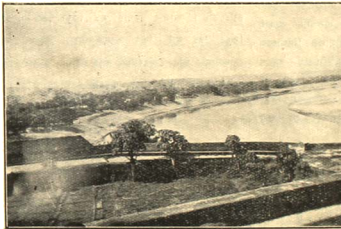
আমরা স্রুত না হইয়াই লক্ষ্মনকোলায় পৌঁছিলাম।
এখানে গঙ্গার উপরে একটি দ্বীপ সেতু ছিল। পরে
গন্তর্গমক একটি লোহার সেতু করিয়া যেন। তাহাও তিন
বৎসর হইল ভল্লের জোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা অতি
কষ্টে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া যান করিতে প্রস্তুত হইলাম।
এই তুর্জনসীতল জোতে অবগাহন বড় সুবোধনক
নহে। তবুও আমরা দল পাঁচিলা একটি বড় পাথরের পাশে

যেখানে আমরা কোনরকমে যান করিলাম। সেখানে শীতল
যেখানে যান করিয়া গভীর ওপরেই কিছু দূর চলিলাম।
অকস্মাৎ পক্ষতটুকাগুলির উপরে বননীর মেঘদকার হইল।
তাহার পরেই গুলফজমিনে নীল অরণ্যে নিবন্ধ লাগিয়াই প্রবল
বুড়ী হইতে লাগিল। জাহাজ সেখানে একটি ঘণ্টায়
আশ্রয় লইলাম। এদিকে বাহিরে বর্ষার অবিপ্রান্ত সুন্দর্যবান
হইতেছে।

সেদিন অপরাহ্নে আমরা হরিষারে। কনখলের বন্ধ
মন্দির দেখিয়া করিয়া আসিয়া চরকা পিছারী (হরপ্রাণ) -তে
লাড়াইয়া আছি। এখনকার সে দৌলখা তামা একেবারে
অতুলনীয়। মধ্যখানে একটি হটকেশবী; চারিধারে
শ্রোতবিন্দু আশ্রয় মনে ছুটিগাছে। সমুদ্রে চিহ্নালয়ের

স্বপ্নে করিয়া কলিগাছে। সাধা যখনই তরল বস্তুর
বাহিয়া দেখানে সীমা অসীমের নিবিড় লজ চার, দেখানে
রূপ ও কল্পনা এক হইয়া যায়, দেখানে অত্যাশ ও হঠাৎ
‘মিত্র মিলনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া পরস্পরের লবল দৌলখা
প্রকাশ করিয়া দিগন্তে। নিখিল বিশ্ব আচ্ছাদিত হইয়া
সেই দৌলখায় মোহিত হইতে পারে; কোন লাড়া পক্ষ নাই। বস্ত
বিবরণে সুখ বিধা আঁকা, বস্তুরের সঙ্গীতে মাঝে মাঝে
লগ্নোদগুণিলালে কত স্মৃতি, কত বার্তা রহিয়াছে, তাই
“আঁকা ভাষে বৈজ্ঞে আঁধারে অরণে অমর কোণের লিখা,
এলগো আলোকলিখা।”

দরবার তলে যখনই ছাড়াতে, পক্ষের গায়ে ও
অরণ্যে যে রঙীন জাভা অনন্ত নব বসন্তের জাভা বিস্তার
করিয়াছে সে-আলো চিরদিন
অরণ্যে উজ্জল হইয়া নন্দনবনমধুগ
স্বাদ বিস্তার করে না; আর
কলিকের মত স্বপ্নের ও পায়ের
আলোকলিখাকে মরীচিকার মত
প্রকাশ করে, সুখ শান্তির একটু
আভাস দিয়া আবার লুকাইয়া যায়।
চারিধিকে ‘শৈলমালা’; মধ্যে
নিরলার বাক্স নিখরপক্ষাপ্রবাহ।
গিরিশ্রৈষ্ঠ উপর যত দূর দৃষ্টি চলে
কেবল একটা তরঙ্গারিত রেখা দেখা
যায়। সুগন্ধি আলো জন্মেই
লক্ষ্যজাভার মিলাইয়া আসে;
দূরের অপকণ আলোড়িত।



গঙ্গাবক্ষে—হরিষার।

চূড়ার পর চূড়ার অনন্ত শ্রেণী। স্মৃতিতে দেখিলাম অদ্য
তরঙ্গারিত মেঘসুন্দর্যবান বনকমান পক্ষতটুকা। দূরে
বস্তুরে লক্ষণের তলে ‘অন্তর্গামী’ সুগন্ধি স্বপ্ন-কিরণে রচিত
পড়িখানির মত দূরপ্রসারী দৃষ্টির তলার কণে কণে পরিকল্প-
কল অপকণ দৃষ্ট উদ্ভাসিত। শত শত সুরবাণিকা দেবতাজা
নগাধিরাঙ্কের সুন্দর প্রান্তে বৃষ্টি বিস্তার করে। তাহাদের
স্বপ্নতরঙ্গিত অরণ্যের কিকিমিকি আলো, স্বপ্নতরঙ্গের
অঙ্গর হীরকজ্যোতি এই অপরাহ্নের অন্তরালে আমাদের

একটা মিল আলোকের মধ্যে পড়িয়া রানায়মান হইয়া যায়।
স্বপ্নকলিকার মত হেই অলকাপুরী ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়।
নিকটবর্তী পক্ষতের গায়ে ‘বার্তা’ ও ‘চিহ্নের’ প্রামাণ্যতা লক্ষ্য
তখনও অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। দূরের দেবদাক
ও কাউবন তাহাদের বন প্রাণাশ্রমার উপর অনন্ত নীলিমার
আবরণ টানিয়া দিয়া সেই অদ্যে বর্ণসুন্দরে আচ্ছাদিত
করিতেছে। ইজা হয়, ওই দেখানে লক্ষ্যের কুলে আকুল-
প্রাণ অকুল পক্ষতমালা উপর দিনের চিত্রা আলোড়িত।



যেখানে দিবস অন্ধভাবে চলছে আঁধা, এটখানে প্রচণ্ড কলক-
লাবলাসহকারে তরল ভাস্কর্য দিগ্গজ হৃদয়ের ছায়াপটভ-
কনে মাথা উন্মীলনের সাথে স্পষ্টতঃ লড়াই থাকে কেবল
প্রশ্নের স্তম্ভনতা ও অস্বস্তিভর মধুর বসন্তলোকে নির্ভাবনার
চলিত ঘাট।

স্বপ্ন ঘরে ঘরে ফুটল। প্রবীড়িত গাঢ়রক্তমাংস শব্দস্বরের
'চর্যাপিত লক্ষ্যমানার উপরে প্রকাণ্ডের উজ্জল শাখাশরীরের
মধ্য বিরাট মাংসিতা গেল। সমুখে স্বপ্নাক্তঃ স্পষ্টতঃ
চল্লোদয়। অপর দিকস্থের দূর আকাশলটে সূর্য্যত ছায়াবৎ
প্রকাণ্ডের প্রচ্ছন্ন নিবিড়তার অন্তরালে চইতে চলমা ক্রান্ত
বাবর শব্দে প্রাকটিকতা আছে। পশ্চিমাকাশের বিচিত্র
বর্ণমোহনের উপর বিরাট গেলকাবলন সন্ধ্যা পূর্ব্ব আচ্ছাদন
টানিয়া বিস্তাড়ে পথের মধ্যের কত ব্যাকুলতা! ঢকল
শোভনর ভলে অক্ষপটী চক্রে কোন মেঘের একখানি অক্ষল
চোখা পড়িয়াছে। পূর্ব্বসীমার মাধুরীমণ্ডিত স্রোতাজল
নাগলোব মধ্য দিয়া অক্ষপটীট চক্রে উঠিতেছে—আঃ ও
ঘরে ঘরে অস্বস্তি লগবে।

সন্ধ্যা পূর্ব্ব দিগে চল্লোদয়ে আবণ্ড ঢকল। বৃদ্ধ লক্ষা
পবনে আকোণিত চইল দূর প্রকাণ্ডরাল চইতে চই একট

ওচ নর রান্না তারার প্রবহমান রক্ত স্পন্দ করিয়া কি এক
মধুময় বাণতা প্রকাশ করিতা গেল। এক দিকে লীনপ্রাণে
অবলান বসীকৃত ভাগ্যর মধ্যে আলোক ঘাবে ঘাবে ছিলাবদ্য
বাগ; অন্য দিকে ভাগ্যময় নিবিড়তা ভেদ করিয়া অগ্রে অগ্রে
প্রশান্ত স্রোতলোকে কটিকা উঠে। পূর্ব্বাঙ্কিত কণ্ঠ তটুর্ম্মতে
দে সন্ধ্যার ছায়া আর থাকে না। চতুর্দিকে প্রাণিণ
বস্তুকরার উজ্জলিত স্থিতি। পূর্ব্ব দিকস্থবেলায় আকাশ
ধরলোকে স্পন্দ করিয়াছে। আর দেহী নষ্ট এখনই
দাইতে চইবে। শুভ্রালকমণে বিবৎ লাজুর চলমা পশ্চিম
গগনপ্রান্তে চলিয়া পড়িবে। দানময় গিরি!
অথমৌন আকাশ! হে ভাগ্যজর অবলান! অগ্নি বসন্তুয়ে
নয়! তোমাঘের সকলের কাছে পরিপূর্ণ জনের বিদায়
চোটেছে। আমার দিগার মত কিছুই ছিল না, তাত
কিছুই পাই নাই, কিন্তু অনেক লইয়া গেলাম। 'বড়
দোকদামর ছবি দেবিগাতি, অতঃপাশ্চাত্যে অক্ষপটীর
অটক দিগা বাধাইয়া স্বস্তির মন্ত্রমাদন্যের গতিষ্ট করিব।



মায়াব কোনদিনই মায়াবের মনের সন্ধান পাবে না ?
 তার সঙ্গে আশ্চর্য যোগ রয়েছে তাহি। থাকে সমস্ত অশ্রুর
 দিয়ে ভালবাসি, প্রভা করি, হঠাৎ বিশ্বের সঙ্গে দেখি
 আমি থাকে ভালবেলেছি এতো সে নর, একে তো আমি
 চিনি না জানি না। অথচ সেই তার মুখ সেই তার হাসি,
 সেই তার রূপ। বিশ্বস্তর চক্ৰবালয়েবা যেমন চিরদিন
 এমন ক'রে বুরেই থাকবে চিরদিন এমন ক'রে আমাদের
 অভিজ্ঞতার সীমানার পছন্দর থেকে আমাদের চানবে
 ভেদনি মায়াবের মনও বুঝি চিরদিন সুদূর রহস্যময় বিশ্বের
 পূর্ণপাত্র হ'বে থাকবে ! দতই কাছে আসতে চাই বতই ব্যাকুল
 ব্যস্ত বাঙ্কিরে তাকে ধরতে চাই, ততই বেন সে পূরে ল'রে
 যায়, সকল মারা সকল প্রলোভন এড়িয়ে কেবলি পাগিয়ে
 ফেড়ায়। নিঃসৃত প্রেমের উজ্জ্বলিত দীপাতলে জীবন
 তরলিত হ'বে ওঠে, চক্ৰকিরণের ছোছারে মায়াবের মন বধিন
 বাতাসের মত সৌরভে মদির চ'রে ওঠে, কিন্তু প্রেমের
 পরিকুলি কোথায় ? বড় বেনী ক'রে থাকে পেতে চাই,
 তাকেই আমরা হারাই। সমস্ত অশ্রুর সমস্ত ইঞ্জির দিয়ে
 থাকে আশ্রয় করি, তারই চক্ষুর বাবের বাবের তুল করি,
 মিছামিছি তার ওপর রাগ করি, আপনাকে বিচার দিই।
 একটু হাসি একটু চোখের চাপসা একটু কলম দৃষ্টিতে
 মন হতভাগতার ভ'রে বাস, একটু ক্রীড়িত ছোঁয়া পেলেই ভাবে
 যে এই বুঝি পেলাম, এই বুঝি আমার সন্ধান সফল হ'ল।
 কিন্তু হায়, তার পরে দেখি হাসিতে যে চোখের জল বেনানো
 ছিল সে তো দেখতে পাইনি, সুদেপ তলায় কীটা ছিল,
 মূল্যপাতের কানায় যে বিষ ছিল সে তো জানিনি। চক্ষুরের
 একটি কোণ মাত্র বেবেছিলাম। মহাশয়দের তরললীলা
 একবার হাত চকিতে আঙালে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু অজানা
 ভাবনমাগর তো অজানাই ক'রে গেল ; তার তরলত্বের
 যে কোন দিশেই অবদান, সে সন্ধান তো মিলল না।

তখন চক্ষুর কীদে, অভিমান করে, বাধার চক্ষুর চ'রে
 ওঠে। তাহে থাকে এত বিশ্বাস করেছিলাম, সেট এমন
 ক'রে আমায় আঘাত দিল ! হায়, বাবের বাবের তুলে বাট এ
 আঘাত সে তো ইচ্ছা ক'রে দেয়নি, চরিত্র ভেদেও দেয়নি,
 এ শুধু তারই চক্ষুরসিদ্ধির আর একটি তরল।

সে দিন একথা ভাবিনি। তাই নিজের কেঁপেছিলাম,
 তাবের চক্ৰনাকেও কানিখেছি। আজ শুধু ভাবি যে
 জীবন আবার প্রথম থেকে শুরু করা যেতো ! ওহো সে
 তুল আবার করতাম না, ওহো ভেদনি ক'রে আবার বাবে
 বাবের তুল বৃকে বাবা পেতাম বাবা বিতাম। ওহো
 জীবনের গতি আবার সে দিনেরই মতম চোত, সেই আপছা
 সেই মানন্দ সেই সফেত চক্ষুর সেট দিনের মতনই
 চলত।

তামের চক্ৰনাকেই আমি ভালবাসতাম। তামের
 নাম আজো আমাকে উত্তম ক'বে তোলে—তামের নাম
 আমি বলতে পারব না। কাকে যে বেনী ভালবাসতাম সে
 বিচার আজ করতে বসব না—তবে বোধ হয় তামের চক্ৰনাকে
 আমি চ'রকমে ভালবেলেছিলাম। দীপ্তির সঙ্গে যে আমার
 প্রথম কেমন ক'রে কোথায় পরিচয় হ'ল সে কথা আজ মনে
 নাই, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়েই আমার মনে পড়ে যে তার
 চেহারা এমন একটা তেল একটা দীপ্তি দেখেছিলাম যে
 তার প্রতি আমাদের আজো মুগ্ধ করে। বাঙলা দেশের
 লোকের চোখে ওহো তাকে মুগ্ধ লাগবে না কারণ
 তার রঙ ছিল শামলা কিন্তু তার মুখে চোখে কথাও চাবে
 ইজিতে এমন একটা আলো ছুটে বেরোত যে তাকে দেখলে
 মনে হ'ত এখানে প্রাণ বেন মূর্তিরতী চ'রে এসে পাড়িয়েছে
 কোথাও বেন তার কোন দৌলগা নেই, কোন কথা নেই,
 কোন লছোচ নেই। জীবের মতন কোনদিকে ত্রক্ষেপ না
 ক'রে সে আপনায় মনে চ'লে যেত, চারিদিকের কথা তার



গায়ে বেনে স্তিতরে পড়ত, ঢাকৈ স্পন্দন করত
পারত না।

আমি তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসেছিলাম।
আমার গলরের ঘোঁষা বোধ হয় প্রেমের জন্য বৃত্তাকার হয়ে
ছিল, সে অংশেই বিনা ঘিঘরি বিনা প্রেরে তাকে বরণ ক'রে
নিলাম। সেও বোধ হয় আমাকে প্রথম খেঁকট ভাল
বেসেছিল কিন্তু তার বিরুদ্ধে তোর ক'রে আমি কিছু বলতে
পারি নে, আজ পর্যন্ত সে আমার কাছে রহগাই হ'য়ে গেছে।
আমার মনে আছে আমি তাকে প্রথম যেদিন বললাম, দীপ্তি
আমি তোমাকে ভালবাসি, সে বেশ অস্বস্তিতে ভাঙল
ওটা আমার বিকে কুলে উত্তর জিল, সে তো আমি অনেক
দিন জানি।

আমি উষ্মপাতাল ভয়ে আশ্রয়ের লস্ক জিজ্ঞাসা করলাম
—আর তুমি? তুমি কি আমার হয়ে?

চাণ্ডালিতে চোখমুখ ত'রে বিচরণের তরল সুরে সে
এসে, ঠা একটু হাসি এই কি? কুল ভালবাসি, বই ভালবাসি
আকাশ বাতাস মাথায় পড় পাখী সব কিছু ভালবাসি।
তুমি কি অপরাধ করছে যে কেবল তোমাকে ভাল
বাসব না?

আমি তার হাত টেনে নিয়ে কান্ডরভাবে বললাম,
বেশ দীপ্তি, সব জিনিষ নিয়ে তুমি এমন বিচরণ ক'রে
না। আমার অন্তরের ভালবাসাকে যদি তুমি এমন
ক'রে অবহেলা কর সে আমি সহিতে পারব না।

সে হাত না ছাড়িয়ে নিয়ে বেশ সহজ সুরেই বল,
তা আমি কি করব বল ত? আমি যদি তোমার মত
দক্ষীণ না হ'তে পারি, বা নাটকের নাটিকার মত প্রেম-
বিশিষ্ট হয়ে তোমার প্রাপন্য ব'লে ছাড়িয়ে যত্নে
না পারি, তবে সে কি আমার বড় কৈরী বোধ?

আমি তার হাত ছেড়ে দিলাম। কান্দ, কান্দাই অপরাধ
হয়ছে, কমা কর, আমি চানাম। তোমার যদি কখনো
অন্যদিকে ক'রে থাকি তবে কমা কোরো, আর আমকার কথা
কুল বেও।

আমি কিরতই দীপ্তি বাধা দিয়ে কল, এত সহজেই
চ'লে যাবে—এই তোমার ভালবাসা? আর তোলা কি

এতই সহজ কথা? আমি
যেতাম না।

আমি বাগ্গভাবে তার হাত বুকে চেপে থ'রে
জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তুমি আমাকে ভালবাসি? এত কল
ছল করছিলে?

দীপ্তি হেলে উঠল, কল, এই দেখ আমার তুমি
আমার এমন ভাড়া দিতে লুভ করলে যে তোমাকে
আর আমি সেবে লামলাতে পারব না! এত অশান্ত
কেন হও?

আমি বললাম, মনে পারি নেই ব'লেই অশান্তি—
আমার প্রেরের লবে উত্তর বেবে না?

আজ নর, আর একদিন, ব'লেই আমাকে কোন
কথার অবদর না দিয়ে সে চ'লে গেল—বহুকলণেও বুঝন
কিরে এল না, তখন আমি অবশেষে চ'লে এলাম।

২

দীপ্তিকে লস্ক ক'রে বটানিকুলে বেড়াতে গিয়েছিলাম।
আগের দিন লুকা কোলা তাকে বলতেই সে এখন জাতি
চ'ল তখন একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। সে যে বিনা-
প্রেরে এমন ক'রে যেতে স্বীকার করবে সে আমি ঠিক
আশা করতে পারিনি। লুকা কোলা চকনে এসে
চাঁদশালে টামারে উঠতেই দীপ্তি হঠাৎ ব'লে উঠল,
গোন, আজ নাই বা গেলে। আমার একটু কাজ আছে।

আমি আশ্চর্য হ'য়ে কলাম তুমি তো বেশ! কাল
রাখি হ'লে, আজ চাঁদশালে এসে, এতকল কোল কিছু
বলনি, আর এখন জাহাজে উঠে মনে প'ড়ে কল যে
দরকারি কাজ প'ড়ে রয়েছে, আজ বাওয়া হবে না। তার
চেয়ে লোকাহলি কল না কেন যে একা আমার লস্ক
যেতে তর পাছ?

দীপ্তি কুল হুগিয়ে বাধা নাড়া দিয়ে কল, কল, তব?
তুমি বাধ না কালুক যে তোমাকে বেখে তর পাখ?
আমার কাজ ছিল, ধরাম আজ থাক, তা তুমি এখন
কলনে না তখন চলে।

আমি বললাম, না, লজিত যদি তোমার কাজ থাকে,
তবে আজ না হর নাই বা গেলাম।

দীপ্তি আনবারের হুরে বন, বেশ তার চেয়ে বন না
কেন সে আমাকে নিয়ে গেতে তোমার ইচ্ছে নেই, সেই
একটা ওজর পেয়েছ অমনি পালাবার জন্য হাত চ'রে
উঠেছ! তা তুমি থাকবে তো থাক—আমি ত চলি।
না হয় একটী বান।

আমি কিছু না বলে তার সুখের দিকে তাকিয়ে
রইলাম, সে পরম নির্জিকার ভাবে বহুদূরে যে ভরকটি
সাদা পাড়ছিল ভাদছিল তাবের গতি লক্ষ্য করতে
নাগল। কাছাকাছি ছেড়ে দিল। মল্লের এক ক্রমে সে
চকিত হ'রে আমার সুখের দিকে তাকিয়ে বেগল যে
আমি তখনো তার সুখে তাকিয়ে আছি। আমি না
আমার সুখে কি দেখে যেন একটু ভয় পেলে, হঠাৎ অস্ত
কণ্ঠে বলে উঠল, তবে থাক, আজ যাব না। চল
দিও হাট।

তখন সীমার অনেকটা চলে এসেছে। আমি বললাম,
আর তো কোথা যাব না, দীপ্তি। আর আমার ক্ষেত্রবার
বিশেষ ইচ্ছাও নাই। সেই কবিতাটি মনে আছে—It
is too late to say farewell?

সে কিছু না বলে মুখ সিরিরে চুপ ক'রে বলে রইল।
আমি বলে বলে তাকে দেখতে লাগলাম। হঠাৎখানি
শিকিঁস জন্মে কোলের উপর প'ড়ে বয়েছে, চরকটি চুল
খোঁচটার পাশ দিয়ে বাতাসে উড়ছে, সমস্ত দেহ শিথিল
চক্কল, কিন্তু কতখানি প্রাণশক্তি ওরই মধ্যে। চুপাতে
থবে ওকে তো মাটির মত নোড়াতে পারি, কিন্তু ওই
কিছোড়ের মতন দীপ্ত মনকে কি কোনদিন বশ মানাতে
পারব? নাগের মত নিচুর আর সুখের লাগছিল ওকে
—কিন্তু সত্তা সত্তা ওর গুণও করুণার তরা সে কথা
তুলবে কেমন ক'রে?

হঠাৎ আমার দিকে তাঁক চোখে তাকিয়ে বন,
তুমি কি আমার কোন অসুস্থ মানোয়ার পেয়েছ যে হা
ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছ? বাতাসের সবাই যে
তোমাকে বেঁচে হাসছে।

আমি লক্ষ্য পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। সারা রুপ
কেনা ওরই বাগানের চারিদিকে ঘুরে বেগলাম। আমি

তো সারাষ্ট ওখানে যেভাবে যেতাম—দীপ্তি মাগে কখনো
হাসেনি—তাকে আমার বত গ্রির পরিচিত ভাবনা-
গুলি বুঁজে বুঁজে দেখাতে লাগলাম। দেখানে বালানের
শেষে নখোটা ছাড়া বৈকে গেছে দেখানটা সারা সুখের
দেখার, হৃৎকানের সময় তার অশ্রুণ শোভার কথা ওকে
বললাম। সকাল বেলা তখনেই মধ্যে কেমন একটা
সফোচ, একটা লক্ষ্যের ছায়া এসে পড়েছিল, তাও ক্রমে
কেটে গেল। ওকে লক্ষ্য পড়ার পাকতে বলার
তপনি আজ হ'ল।

বিকেল বতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই আমার
মনও যেন চকল হ'রে উঠতে লাগল। বেগলাম দীপ্তিও
যেন কেমন বিবণ অগত চকল হ'রে উঠেছে। তার যে
এত হাসি এত গান এত কথা সব যেন বহু হ'রে
গেল। কথার কথার তার বিস্ত্রল শাসিত তরবারির মত
বিকটিক ক'রে উঠেছে, এখন তার সুখে যেন আর
কথা মাগছে না। আমিও কিছু বলতে পারছিলাম না,
ওরই মতোই পাশাপাশি চলেছি, এক-একবার আমার
দেহ স্পর্শ করছে, আর ওরই শিউরে উঠছি।

তখন কাননের হৃৎ তপ্ত মাগেয়ে পৃথিবী পূর্ণ ক'রে
পশ্চিমে চলে পড়েছে। সাতাধিন কোথায় ছায়াও বলে
একটা কোকিল ডাকছিল, এতকাল আমার নিম্নেবের কথার
মত ছিলাম, বাইরের পৃথিবীর কোন কিছু যেন আমাদের
স্পর্শ করে নি। কিন্তু এখন সে নারসতার মধ্যে কোকিল
যেন বড় বেশী আকুল হয়ে গাইতে লাগল—তার হুর যেন
আরো মধির, আরো মোহনর হ'রে উঠল। দক্ষিণের
বাতাস সাতাধিন ত'রেই বয়েছে, এখন কুল বরিরে পাড়া
ছড়িয়ে আমাদের গুণেরও এসে যেন মাতামাতি করতে
লাগল।

সে নীরবতা অবশেষে আমার অঙ্গ হ'রে উঠল। আমি
বললাম, ঠা একটা কোকিল ডাকছে, ওরই না?

দীপ্তি মাটির থেকে মুখ না তুলেই বন, হ্যাঁ।

আমার কথাও আবার হুরিয়ে গেল। ওরই চলেছি,
দক্ষিণ, তার দেহসৌরভ আমাকে উন্নত ক'রে তুলছে,
এক একবার আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখছি, চোখে চোখে



পড়তেই শুকনে ভাড়াভাড়ি চোখ সিরিষে নিষ্কি। আমার এক চকচক করে কীংকং, বৃকংত পারছি যে দীপ্তিরও বৃক কীংকং। চন্দ্রলক্ষ্মীর বক আর মাকে মাকে শুকনো পাটার পা পড়লে মরমর করে উঠেছে। তলপাথার দিকের বাতাসের অশ্রুত করোণ।

আমি চটাত ব'লে উঠলাম এম, এবায়ে বলা থাক।

দীপ্তি গেল মমকে উঠল, বর, না চল।

পরক্ষণেই কি ভেবে বর, আচ্ছা, চল, বদি।

চুপে একটা পাড়ের তলার ঘাসে বসলাম। আমার পানিকলপ কারো মুখে কোন কথা নেই। দীপ্তি তার পাড়ের তলার ঘাস ছিঁকছিল, আর থেকে থেকে ঠাতে কাটছিল। আমি একবার তার দিকে একবার ঘুরে গাছ-গুলির মাঝে সবুজ পাভা লক্ষ্যহীন চোখে দেখছিলাম।

অবশেষে আমি বয়াম, দীপ্তি তুমি তো জানই যে আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কিন্তু কোনদিন আমার কলুনি যে আমাকে তোমার ভাল লেগেছে কিনা। আজ আমি তোমার উত্তর চাই। এমন ক'রে সোটাটার মধ্যে আমি আর চিকুতে পারছি না।

আমি কথা বলতে আরম্ভ করতেই দীপ্তি আমার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই দৃষ্টী নামিয়ে নিয়ে ঘুরে একটা পাড়ের ছাঁড়ির দিকে অশ্লক নেড়ে চেয়ে বসল। আমি কিন্তু দেখছিলাম যে বাস ছিকুতে ছিকুতে তার আঙুলগুলো একটু কীংকং।

আমার কথা শেষ হ'তেই সে উত্তর দিল, তাই বদি আজ আমাকে তোমার কলনের মধ্যে গেয়ে ছোর ক'রে আমার কাছ থেকে উত্তর আবার করতে চাও। এত জন্তেই বদি আমাকে বেড়াবার চল ক'রে বটানিকুদে নিয়ে এসেছ?

আজ তাব এ খোঁচার আমি চটললাম না। লক্ষ্য করলাম যে তার মুখে হাসি এল না কেবল ঠোঁট দুপানি একটু কীংকং। চোখে বাতুল চকল পুটী, সর্পাকে তথের চিল।

আমি উত্তর দিলাম, বিচ্চন ক'রে আমার অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছে, দীপ্তি—আজ আর পারবে না। আজ

আমি তোমার মন জানবই—এ লক্ষ্যে আর আমি দইতে পারছি না। আমার পরে তুমি এত নিরুত কেন, দীপ্তি?

দীপ্তি দাঁকিয়ে দাঁকিয়ে বর, আমি চলাম, তুমি আসবে তো এলো। আমার কাজ থাকে অনেক তো বলেছি। এখন ভাড়াভাড়ি না গেলে এ ভাড়াভাড় আর পারো না—বসে বেরী ক'রে থাকে তা' চলে।

আমি তার হাত ধ'লে তাকে বসিয়ে জাম, দীমার আসবার এলো অনেক দেরী। তোমাকে আমি জানি বাবু, এককম ক'রে তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না। আজ যদি লাভ্যান্তির এখানে থাকতে চর, তবু আমি আমার কথার উত্তর না দিলে তোমাকে যেতে দেখো না।

দীপ্তি ভাব্যাকুল করে বর, কি আমাকে সাবা রান্তির তুমি আটকে রাখবে, আমি উত্তর না দিলে?

আমি বয়াম, ই।

দীপ্তির মুখ নিম্নে করে কঠিন হ'তে উঠল, বর, এই আমি চলাম, যদি পারো তো আমাকে আটকাও।

ব'লেই সে দাঁকিয়ে চলতে লাগল। আমি উঠে তার হাত জোরে চেপে ধ'রে বয়াম, দেখ এ ছেলেমেলা নয়। তোমাকে পাঠের জোরে আটকে রাখবার অধিকার আমার নেই সে আমি জানি। কিন্তু তুমিও কেনে রেখো যে আমি আর বেরীদিস আমাকে নিয়ে এ রকম খেলা দইখ না। বর আমি ছোর ক'রে তোমাকে নেবই, নইলে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধের শেষ হবে।

দীপ্তি কিছু না ব'লে চলতে শুরু করল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলাম। বয়াম, তুমি কি মাহু, না পাথার?

সে কোন উত্তর দিল না।

দীমার এল। একটা কথাও না ব'লে শুকনে পাশাপাশি বসলাম। লাভ্য পথ কেউ কোন কথা বলিনি। তাকে বাড়া পৌছে দিয়ে চলে আসছি, এমন সময় চটাত সে বর, ভাল আসবে না? এলো কিন্তু।

আমি পতীর মুখে 'আচ্ছা' ব'লে চলে এলাম।

পরদিন দীপ্তির দলার সিরে বখন তললাম সে কোথায় থেকেতে বেয়িরে থেকে, তখন কেবল নিম্নের অশ্রুত রাগ

হ'তে লাগল। আমার মনে হ'তে লাগল যে সে
এরকম ক'রে বিস্তার করতেনই আমাকে ডেকেছিল।
তবু কেন যে তার কথা বিশ্বাস ক'রে এসেছিলাম তা ভেবে
নিজেরই আশ্চর্য লাগতে লাগল। একটু চুপেও পেলাম
কিন্তু তার চেয়ে বেশী হচ্ছিল রাগ। বাড়ী কিংবেই তাকে
একটা চিঠি লিখলাম—তোমার ব্যবহারে আশ্চর্য আমি
মোটেই ছইনি; তবে নিজের দৌলীলা ও নির্জুড়িতার
নিজেকে বিচার দিতে ইচ্ছা করছে। থাক, সে কথা
নিজে তোমাকে কোন অঙ্গুরোধ আমি করতে চাই না।
আমি দুঃখকিননের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, বোধ
হয় শিশুর কেঁরবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ হয়তো
তুমি বুঝতে পারবে। তোমার যদি কখনো বিরক্ত ক'রে
থাকি তবে আমার এ অজানকৃত অপরাধ কমা কোরো।
তোমার সঙ্গে হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবে না—অন্তত
আমি তো সেই চেষ্টা করব।

মনটা ভারী লাগল হ'রে গেল। সেদিন বা তার পরদিন
কোথাও বাইরে গেলাম না। মিনিলগড গৃহিণী বহুদিনের
পুরাতন চিঠিপত্র মাঝিরে ঘরে কি কাজ করছিলাম, এমন
সময় দীপ্তির একটা চিঠি পেলাম, তোমার সঙ্গে
তখনক পরকারি কথা আছে, আমি বিকলে
অবস্থা অসুস্থ এসো। আমি তোমার ক্ষম্ম অগেছ।
করব।

কোন রকমে অশান্ত মনকে বেশ এনেছিলাম—সে
আবার উতলা হ'য়ে উঠল আবার আকাশস্থল্লম রচনা করতে
লুহ ক'রে দিল।—হাংকে সাহুধের মন, এত সহজেই আনন্দে
নেচে ওঠে, আবার একটু আশাতেই চোখে পৃথিবীর আলো
জান হ'য়ে যায়। মনের অবস্থা যে কি রকম হ'ল ঠিক ক'রে
বলতে পারব না। আবেগ, আশা, আশঙ্কার পৃথিবী যেন
টলছিল, আমার দেহমন ত'রে যেন শাসল হাওয়ার
মাতাঘাতি।

দীপ্তি বল, তুমি বাড়ী গায়ে চুনলাম, তোমার সঙ্গে তো
বহুদিন দেখা হবে না তাই ডেকেছিলাম।

আমি প্রায় হতাপ হ'য়ে বললাম—এই তোমার পরকারি
কথা।

দীপ্তি আমার কথা গ্রাহ না ক'রে বল, এমন সময় চট্টাং
বাড়ী বাগাড়া কেন? তোমার কি না খেলতে নয়?

আমি বললাম, সে কথা তুমি আম আর কি হা:

সে বল, তুমি যেও না, এখন থাক।

আমি বললাম, না সে আর হয় না, দীপ্তি। এ সময়ে
শশুরের মধ্যে আমি আর থাকতে পারব না—আমি
তোমার কাছে থেকে দূরে চ'লে যেতে চাই—

মাটির দিকে মুখ নাগিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে প্রায় জড়িত
কর্তে দীপ্তি বল, আমি যদি বলি, তবু থাকবে না?

আমি তার মুখে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, তুমি
যদি বল, তবে থাকব। কিন্তু তাই অবর্ণ কি সে তো
জান!

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে বসিলাম। সে চোখ তুলে
একবার আমার চোখে চাইল। চোখে চোখ পড়তেই চকিৎ
মুখ নাগিয়ে নত হ'য়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল। সেখান থেকে তার মুখ
বিবর্ণ, ললাটে ঘেঁষাবিষ্ণু, সমস্ত শরীর অবসর, অসহায়।

দীর্ঘ দুঃস্থগতি যেন ক'টে না। সুভাসনের জনরের
শ্মশন আর বাইরে বহু দূরের একটা অশ্লষ্ট অশুট
অবিপ্রায় গুহন ভির কোথাও কোন দৃশ্য নেই। বহুক্ষণ
পরে সেই নির্বিজ্ঞ নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে দীপ্তি একটা পার্থক্য
কেশল, বল, না তবে থাক। বাড়ী থেকে কিংবে কবে?

কোন রকমে উত্তর দিলাম, জানিনে।

আবার দীর্ঘ দুঃস্থগতি মধ্য পনকেশল চলতে লাগল।
আমার সামনে নত মস্তকে দীর্ঘ বাক:হান। দীপ্তিকে দেখে
মনে হচ্ছিল যেন স্মৃতিমতী প্রাণধারা এখানে এসে
নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। আবার জ্বর কণ্ঠার ত'রে গেলো,
আমি বললাম, দীপ্তি, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ,
নিজের কষ্ট পাচ্ছ। তুমি যে আমাকে ভালবাস সে কথা
আর লুকোতে পারবে না—আর আমার কথা তো জানই।
তুমি এল আমার তার না নিলে আমার সমস্ত জীবন
হারবার হ'য়ে গায়ে। দুটো জীবনকে এমন ক'রে বাপ
করবে কেন দীপ্তি? বল, আমি থাকব?

দীপ্তি মাটির থেকে মুখ না তুলেই বলতে লুহ করল
ওর মুখে আমি কখনো এত অসুস্থ কথা শুনিনি, হাড্ডাকট

কথা যেন অস্তরের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে বস, তোমাকে ভালবাসি সে কথা অস্বীকার করব না। তুমিও আমাকে যে ভালবাস সে কথা জানি। কিন্তু এখন যেমন আছি তির্যকিন তেমনি থাকতে পারব না কেন? তুমি কেন আমাকে অত্যাচারে চাপ? না, না, না, সে আমি পারব না। তুমি আমার কাছে যা চাপ, সে আমি নিতে পারব না।

আমায় মন কঠিন হ'য়ে উঠল, বললাম, তোমার ভালবাসার অর্থ আমি বুঝি না। ভালবাসার বর্ণনাই আমারো নিষিদ্ধ ক'রে চাপা, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে অলক্ষ্যে আমার কাছে বসে দিতে পারবে না কেন?

লীলি হঠাৎ কণ্ঠে বস, না, সে তুমি বুঝবে না।

আমি বললাম, তবে ঘাই লীলি। আশা করি এ জীবনে যেন আমাদের আর দেখা না হয়। ঘুরে থেকে তুমি শ্রুতি চলেছো: প্রলেটে আমি শ্রুতি হ'বো।

লীলি আঁত ধরে বস, আমার কথা কর—যাবার সময় আমার সমস্ত অপরোধ কথা করেছ বলে খাপ। আমি তোমার 'যোগ্য' নই—কেন তুমি আমাকে ভালবাসলে?

এত চুপেও আমার চালি এলো। বললাম, তুমি ত আমার সকল অপরোধ কথা কোরো। অনেকদিন তোমাকে অনেক আগ্রহ দিয়েছি, সেগুলো ফুলে যেতে।

লীলি আরও গভীর বিষণ্ণ বসে আমার দিকে চেয়ে রইল।

৪

বড় জাবালা ঘুরে অবশেষে দাখিলিংয়ে গিয়ে আজ্ঞা প্রদান। জীবনে যেন সব বিষাদ হ'য়ে গেছে—কোন কিছুই কোন অর্থ নেই যেন। সবার সঙ্গে কথা বলি, গল্প করি, গান গাই, ঘুরে বেড়াই, সবাই ভাবে মোকটা কাঁ হুশে আছে। অথচ অন্তর যে অস্বস্তিপূর্ণ মন দিনরাত্রি অলক্ষ্যেই, তার খোঁজ কে রাখে?

সেদিন তির্যকিন পার্কে বোকাতে গিয়ে বেদি, একটা বৃটল ডালিয়া গাছের পাশে শ্রীতি গাড়িয়ে।

আমাকে বেবে সে আশ্রয়ী হ'য়ে গেল—আমিও চমকে বসলাম, আরে শ্রীতি, তুমি এখানে? অনেকটা বড় হয়েছিল তো!

শ্রীতি দলদল হাসির সঙ্গে মুখ মত করল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আশ্রয়ী হ'য়ে গেলোম, বললাম, তুমি এত অল্পের হাসি কবে থেকে?

লক্ষ্যে সে খেমে লাল হ'য়ে উঠল। লীলি, ডালিয়া গাছের পাশে গাড়িয়ে তাকে একটা ডালিয়া ফুলের মতনই দেখাছিল। পরনের নীল শাড়ি উজ্জল দৌরবর্ণকে আরো উজ্জল ক'রে তুলেছে। শিশুর মত সরল মুখখানিকে ঘিরে চুপেচুপে কৌতুহ্য চুল বাতালে উঠছে। প্রত্যাহারের সকল চালি এসে যেন তাকে ঘিরে গাড়িয়েছে, আর তারই মধ্যে প্রত্যাহারের প্রাণের মত সে গাড়িয়েছিল। তাকে এমন সবুজ, এমন সরল, এমন নবীন দেখাছিল যে হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ে গেল। বিভ্রান্তের দীপ্তিতে দেখানে সব অ'লে গেছে—বৃদ্ধ বিদগ্ধ মক্কুম। অজান্তেই বুক থেকে একটা নিশ্বাস পড়ল।

শ্রীতিতে আমি ছেলে বেগা থেকেই জানি। যখন ও এক বছরের শিশু তখন থেকেই আমার সঙ্গে ওর ভাব—তারপরে যখন একটু বড় হ'ল তখন তো সে আমার মত তক। ওর বিশ্বাস ছিল যে আমি জানি না, আমি করতে পারি না এমন কিছু চরিত্র নেই। আমার মা ওর মায়ের ছেলেকেই সেই—মা মারা যাবার পর থেকে আর ওদের কোল দবর পাইনি। তার পরে আম পাচ ছয় বছর পরে এই দাখিলিংয়ে বেগা।

শ্রীতির মা আমাকে বেবে পুঁজি পুঁজি মেলন। কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটল। দেখলাম শ্রীতি সেই ছেলেবেলায় মত নেহাৎ ছেলেমানুষই রয়েছে। তাকে যা বলি তাই বিশ্বাস করে, কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা কোন সন্দেহ তার শৈশবের স্বর্ণযুগেই প্রবেশ করেনি। প্রায় যৌবনের সীমানার এসে গাড়ালেও সে আশা মনে বালিকা হ'য়ে গেছে। বালিকার চাকলা বালিকার উল্লাসে তার দেহ মন এখনো উজ্জল।

আমার মনের অন্তর্দ্বার ধীরে ধীরে নিতে এল। কিন্তু প্রীতিক প্রীতি আমার যে মনের ভাষা সে স্বপ্নে আমার কোনদিনই ভুল হয়নি। তাকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু সে ভালবাসার কোন দাফ ছিল না কোন উত্তাপ ছিল না। মনে হ'ত সে বৃষ্টি অদ্বার নিত্য—সংসারের আঘাত থেকে তাকে না বাচালে সে বৃষ্টি বাঁচবে না। সপ্ননা ভর হ'ত এই বৃষ্টি থেকে বাধা দিলাম।

সেও আমার ভালবেসেছিল। কিন্তু সেদিন আমি তা জানতাম না। ভাবতাম যে আমি তাকে ঘোনের মত স্নেহ করি, সেও বৃষ্টি তেমনি আমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসে, স্নেহ করে। সে বোধ হয় নিঃশব্দ তখন জানত না যে সে আমাকে ভালবাসে—তা হ'লে রমন অলঙ্কারে সে আমার লকল বিধায়েই কথা কইতে পারত না।

আমার মনে আছে আমি তাকে নিয়ে একদিন অগা-
পাহাড় বেড়াতে গিয়েছিলাম। মত উঁচুতে উঠতে
পরিশ্রমে সে হাঁশাচ্ছিল। আমি তাকে বললাম, তুই আমার
কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ওঠ। সে অলঙ্কারে আমার
দেখে ভর রেখে আমার সঙ্গে উঠতে লাগল।

সেদিন কেবলবার পথে একটা পাথরের গুপার ব'লে
বিগ্রাস করছি, হঠাৎ প্রীতি নিজের ক'রে বলল, তুমি আজো
বিয়ে করেনি কেন?

আমি হঠাৎ এরকম প্রশ্নে অপ্রস্তুত হ'য়ে পেশাম।
পরলক্ষ্যেই সামনে তার দিকে তাকাতেই দেখলাম তার
গভীর বহু বিকলভরা চোখ চুটি আমার দিকে মেলে ও
চোরে রয়েছে। সেখানে কোন ছল নেই, কোন সন্দেহ
নেই। ও বেন স্বর্গচাঁড়ির পূর্ণের ঐজেন-অনের দেবশিঙ।
ওই শিঙার মত সরল আঘাত চোখ আমাকে নিরুপার ক'রে
কলে—ওর কাছে কিছু লুকোতে লক্ষ্য করে।

বললাম, সে যে অনেক কথা, প্রীতি।

প্রীতি বলে, হোক অনেক কথা। আমি আজ গুনবই।
তুমি এ রকম গভীর হ'য়ে রইলে কেন? আমাকে
বলবে না?

তার কালে চোখের তারার মল জ'মে এল। আমি
বলব চ'রে বললাম, বলছি, তোকে কীভাবে হবে না।

বহুব্রু সংক্ষেপে এবং বহু কথা বাদ দিয়ে তাকে দাঁপ্পর
কথা বললাম। সে শুধু একবার বলে, দাঁপ্পি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনিই নাকি?

সে কোন উত্তর না দিয়ে গাড়ির বেল, চল, বাড়ী
কিতে গাই।

৫

তার পরে কয়েকদিন প্রীতির বাড়ী গাটনি। সেদিন
তাকে দাঁপ্পির কথা বলার পর থেকেই দাঁপ্পির ছবি এনে
আমার জন্য থেকে আর সব মুছে ফেলেছে—বিনম্রাত
কদিন শুধু দাঁপ্পির কথাই তেবেছি। কি প্রাণময়, কি সন্তোষ
অথচ কি কঠিন। আমার মনে হ'তে লাগল সে যেন পশ্যাক-
গড়া সূত্রি। শিলা যের পাথর কৃষ্ণ তাকে তৈরি করেছে,
সেখানে একটু বাদলা নেই, একটু জ্বালা নেই। পা থেকে
মাথা পর্যন্ত সমান কঠিন, সমান মন্থন, সমান উজ্জল।

হঠাৎ দাঁপ্পির চিঠি পেলাম সে দার্জিলিং আসছে। তার
সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে এই প্রথম তার বদর পেশাম। তারি
আদর্শ লাগল—কিন্তু মন তবু খুসী হ'য়ে উঠল। সেদিন
সন্ধ্যার প্রীতিক বললাম, প্রীতি, দাঁপ্পি এখনো আসছে।

প্রীতি দ্বির অবিলম্বে সূত্রি মেলে বলে, সে আমি জানি।

আমি অথচ হ'য়ে চোরে রইলাম প্রীতি মাতার দিকে
চোরে ধীরে ধীরে বলে, আমি দাঁপ্পিককে আসতে
নিবেছিলাম।

কতকটা বিতর, কতকটা কোতূহলের সঙ্গে নিজস্বা
করলাম, তুমি তাকে কি লিখলে?

এই বোধ হয় ভাবনে আমি তাকে প্রথম তুমি লেখান
করলাম। আমি সেটা লক্ষ্য করিনি কিন্তু প্রীতি লক্ষ্য
করেছিল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে চুপ ক'রে
গাড়িরে রইল।

বিশেষ কিছু বৃত্তে পারলাম না। অথচ মন না খুশ
অকারণেই আনন্দে ত'য়ে উঠল। আমার কেবলি মনে
হতে লাগল, দাঁপ্পি আসছে—সে আসছে। এবার কি
আমাদের ছবনের স্বপ্ন পূর্ত? ভালবাসাটা সোঁকে কি
আমার কাছে আত্মদান করবে; ভাল সে আমাকে
নিশ্চয়ই করবে, তা নইলে কেন এখন হঠাৎ দার্জিলিং



আমার? আর খ্রীতি? তার প্রতি পড়ার সিদ্ধ ভালবাসার আমার জন্ম পূর্ব হ'য়ে উঠল। ছোট বোনটির মত সে আমার বদন্যার তপ্তমাণার পও শীতল কোমল মল্ল হাত বুলিয়ে নিল—মল্ল হোক তার মল্ল হোক।

আজ কিন্তু বৃহতে পেরেছি যে খ্রীতির প্রতি আমার ভালবাসা কেবলমাত্র তাই-হরই ভালবাসাই নয়। হয়তো সে ভালবাসার কোন উত্তাপ ছিল না, কোন ব্যর্থ ছিল না, কিন্তু উত্তেজনা না থাকলেই কি ভালবাসা পড়ার হ'তে পারে না? তার প্রতি আমার ভালবাসার ছিল পড়ার প্রশান্তি ব্যর্থ সত্যনা। দীপ্তির জন্ম আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল উগ্র মনোর মত জ্বালাময়, তাঁর অর্থ মদন, মধুর। তার ভালবাসা আমাকে সচেতন ক'রে রাখত—সমকক্ষের ওপর আধিক্যের দাবী ছিল তার মধ্যে। আর খ্রীতির প্রতি আমার ভালবাসা ছিল বঙ্গের মত, ধীরে ধীরে সফল দেখমন ছেতে আসে, মনে হয় আপনকে নুগে ধাই। তবু ধোঁয়নে চিরদিন দীপ্তিই চেয়েছি, দীপ্তিকে চেয়েই মরব।

দীপ্তি এল। তেঁথনে তাকে নামাতে গিয়েছিলাম। মনে হ'ল আমাকে ঘেঁষে তার চোখের তারা নিমেঘের জন্ত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, পতকপেট জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেমন ছিলে এদিন? সে কোন উত্তর না দিয়ে চলতে লাগল। দেখলাম যেন আগের চেয়ে একটু কণামা হ'য়ে গেছে পলার হাড়টা যেন একটু বেশী স্টাইল হ'য়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা বাক্য ব্যাক্তিরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি না বলেছিলে এ জীবনে আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না, তাই তোমার কথা জোড়াইল না?

আমি বললাম, তোমার ইচ্ছার কাছে আমার কথা কবেই যত্নেই?

দীপ্তি সে কথার উত্তর না দিয়ে বল, চ'লে যেতে বল; তার আঙুলি দিয়ে ব্যক্তি, এখনো কোরবার সময় আছে।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে তার দিকে চাইলাম।

আমার দৃষ্টির সামনে সে বৃহ মত করল। বানিককল পরে আবার জিজ্ঞেস করল, খ্রীতি তোমার ছোট বোন নয়?

আমি বললাম, না, কেন বল ত?

সে বল, ও আমার বোন হয়। তোমারো যদি বোন হত তবে তোমার আমার একটা লম্বক হ'তে পারত। লেগানে আমারের কোন সন্ডোচ থাকত না।

আমি বললাম, তোমার আমার লম্বক শুধু একটাই হ'তে পারে সে তুমিও জানে: আমিও জানি। তা ছাড়া আর কোন লম্বক হ'তে পারে না আমিও চাই না।

দীপ্তি ধীরে একটা দীর্ঘবাল ফেলে বল, তুমি বক নিছুর।

আমি তার বুকে চেয়ে শুধু একটু হাসলাম।

আবার দুইনে মৌবে পথ চলছি। দীপ্তি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, খ্রীতি তোমাকে বুঝ ভালবাসে, না?

আমি একটু বিরক্ত ভাবেই বললাম, তা কেমন ক'রে জানব?

দীপ্তি বল, আর তুমি?

আমি রাগ ক'রে বললাম, কেন মিছামিছি এসব কথা জিজ্ঞেস করছ? আমি কাকে ভালবাসি সে তুমি জানো। তবে নিরর্থক এ প্রশ্ন কেন? সে আমার ছোট বোনের মত, সেও আমাকে ছেলেবেলা থেকে দাদা ব'লে জানে।

খ্রীতির না দীপ্তিকে শেষে মোতে উঠেলাম। বহুদিনের অশান্ততার অনেক কথা জ'মে উঠেছিল, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আর উত্তর মিতে সজো হ'য়ে এলো। যমেন, তোমরা এখন বেড়াতে যাও।

খ্রীতি বল, তার মাথা ঘরেয়ে সে যেতে পারবে না। তাই তুনে দীপ্তিও যেতে চাইল না, তাকে বল, কাল একদাথে বেড়াতে যাওয়া যাবে, আজ না হয় থাক।

খ্রীতি কিছুতেই তনল না—প্রায় জোর ক'রে দীপ্তিকে আমার সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দিল। দীপ্তির যেতে ইচ্ছা ছিল না বৃহতে পাঠছিলাম, কিন্তু তবু সে এল। তাকে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে সে-কথা কোনদিন ভাবি নি। চিরদিন যেবেছি লম্বকে দীপ্তিরই ইচ্ছা যেনে এসেছে এবং সে নিমেঘে বেধালের হাওয়ার ভেসে চলছে, কিন্তু আজ দীপ্তিকেই অস্ত্রের খেতালে চলতে হ'ল। তখনই তেখেঁচিলাম খ্রীতি এত জোর কোথায় পেল? আর বুঝি, তার নিজের কোন দাবী ছিল না ব'লে তার দাবী কেউ ঝেঁপতে পারত না। আমাকে সে

ভালবেসেছিল এবং সে-ভালবাসার মধ্যে তার কোন কামনা ছিল না—সেই নিছক ভালবাসার জোরেই সে দীপ্তিকে একদিনের মধ্যে বশ করে ফেলল।

দীপ্তির সঙ্গে গবেষোলাম। তখন সন্ধ্যা হ'লে এসেছে। উত্তরে চারিদিকের ছায়াবিহীনতার মধ্যে এখনও কাকনন্দকার স্বর্ণকীর্তি কিরণ-দীপ্তি—একটা কুয়ালার পর্দা ঘীরে ঘীরে ওপরের দিকে উঠে আসছে। গবেষোলায় মালার সঠক যে কি সুন্দর দেখাছিল বলা যায় না। গাছপালার কাঁক দিয়ে ওপরে দীর্ঘ বেখানে সেখানে আলোর দীপ্তি—মালার মালার সঠক প'রে রক্তাক্তালি কোথায় দীর্ঘ নেমে গেছে কোথাও বা ওপরে উঠে—দূরে দূরে জ্বলকটি পাখাফের গাধা বাসোতে বাতি জ্বলে উঠেছে।

দীপ্তির হাতটা টেনে আমার সুতোয় ত'রে গুজনে পথ চলতে লাগলাম। বললাম, দীপ্তি এত দিন তোমার অস্তাবে যে আমার ভাবন কি চরমছাড়া হ'লে গেছে সে যদি তুমি জানতে তবে তোমার দয়া হোক। মনে আছে সব কথা?

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। বানিককণ নীরবে আমার গুজনে চলেছি। রাস্তার ওপরে এক এক ছায়ায় পাশ পাছের ঘন ছায়া—কোথাও বা কোণমত হ'লে বানিকটা অন্ধকার ক'রে রয়েছে। চলতে চলতে একটা ইউকেলিপটাস গাছের ছায়ায় একটা পুত্র বেক দেখে গুজনে গিয়ে দেখানে বললাম—দীপ্তির হাতটা আমার কোলেই রইল।

আমি আস্তে আস্তে তার হাতে চাপ দিয়ে বললাম, দীপ্তি আমার কথার উত্তর দেবে না? দীক্ষিনিং থেকে কি গুজনে একসাথে কিরণ?

দীপ্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল, সে আর হয় না।

আমি জ্ঞান, কেন হবে না, দীপ্তি? তুমি আমার চোখে তাকিয়ে বল যে তুমি আমার, দেখো পৃথিবীর কোন নক্ষি তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বল তুমি একান্ত আমারই।

আমার বাহু যে এখন তার কচিটট বেঁধে ক'রে তাকে আমার বুকে টেনে নিয়েছে তৈরি পাইনি। ঠাণ্ডা দেখলাম আমার বুকের ঠিক দীর্ঘই তার বুকের বক আমার

বকপাশে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, তার সমস্ত বেগের কোমলতা ও উত্তাপ আমার দেহকে বিহীন ক'রে ফেলছিল। কালো চোখ দুটি অন্ধকারে তারার মতন জ্বলছে—কী উন্নত দৃষ্টি তার সঠক পক্ষরে। আমি আশ্চর্য্যতায় আবেশে তার সরল রক্তাক্তের প্রসাদ চুষন করলাম—যে বৃক্ষের পাতলায় যে বিভ্রান্তপ্রবাহে গুজনের ঘেরই যেন টা'লে উঠল। পাগলের মতন তাকে ধীরে ধীরে চুষন ক'রে কঠিন বাহু-বন্ধনে তাকে আমার দেহে নিমগ্ন ক'রে তার বুকের উপর স্থল রেখে বললাম, তুমি আমার একান্ত আমার। বিহীনভাবে কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। শুধু একবার বল তুমি আমার।

দীপ্তি আরকণ্ঠে প্রাণ নিকলকটে বল, ছেড়ে দাও।

আমি তাকে মুক্ত ক'রে বললাম, কমা কর, আমারে ধরলে ছিল না যে তোমাকে বাঁচা দিচ্ছি। আমার কথার উত্তর দাও না ব'লেই তো আমি আশ্চর্য্যতায় হ'লে পড়ি তখন তোমাকেই আঁত ক'রে বলি।

দীপ্তি দীর্ঘকাল উঠে আসত নখনে অস্ত কং বল, আমার কমা কর। বাড়ী ফেরবার যে বড়ই দেবী হ'লে গেল। আমি এতদিন চোম।

ব'লেই কিরে না তাকিয়ে সে অস্তপনক্ষেপে চলে গেল—আমি যে উঠে তার সঙ্গে দাব সে নক্ষিও আমার ছিল না।

৩

পরদিন যখন দীপ্তির সঙ্গে দেখা হ'ল তখন সে সঙ্গে দান ক'রে উঠেছে। মোটা লালপেড়ে আলুপাকার শাড়ীতে খোলা চুলে তাকে যে কি সুন্দর দেখাছিল সে কথা আমার আরো স্পষ্ট মনে আছে। আমাকে দেখেই এক বলক রক্তে তার সমস্ত মুখ রক্তা হ'লে উঠল—চোখ দুটি নিজে থেকেই বত হ'লে এল। পরক্ষণেই চোখ তুলে আমার চোখে তাকিয়ে অজ্ঞেস করল, কাল কখন বাড়ী কিরণ? তখন তার চোখে লজ্জার লেগে ছায়া নেই।

বিশ্বের প্রচায়ে প্রেমে আমার সমস্ত জীবন পূর্ণ হ'লে উঠল। বললাম, অনেকটা হান্তিরে। কিন্তু তুমি অমন ক'রে আমার কথার উত্তর না দিয়ে চলে এলে কেন? তার শেষেছিলে বৃত্তি?



বাণি স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকিয়ে বল, কালকের
কথা যদি আমার আমাকে বল তবে তোমার সঙ্গে আর
কোন দৃষ্টি আমার হইবে না। কেনিদিন যদি আমার
তোমার সঙ্গে কথা বলি তবে আমার নাম বললে দেখে।

জামি কাঠ দপ্তিতে তার দিকে তাকিয়ে বারাম, জামার
 লীখনে যার মূলা অনেক, তাকে বুজ্জু করবার মত শক্তি
 জামার কোথায় ? তুমি জামায় তো কোবাগ ঠাকো
 চেয়েছ—যদি বা অসুগ্রহ ক'রে কিছু ঠিকো দিয়েছিলে তাও
 দাবায় এখন কিরিয়ে নেবে ?

দীপ্তির চোখে হাসি ঝিকরে পড়ল—আমি হোমার নিরহিংস
না আমার অলসার শেষে অতর্কিতে আমার কান্ড থেকে
কেড়ে নিচ্ছে ? দস্যুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই সে কথা
স্পষ্ট ব'কে দিচ্ছি ।

পরকণ্ঠেই কণ্ঠের কোমল করে বস, যেহেতু তোমার সোঁধ
 মিচ্ছ না বা কোন কথা তুলতেও বসছি না। তবে ও-সব
 কথা ভবিষ্যতে কখনো আমার বলতে পারবে না। আর
 তোমার আচরণটা যে আদর্শ হয়নি সেটা কি অস্বীকার
 করবে ?

মিষ্ণু হাসিতে তার মুখ ভরে গেল। আমি বেমনাকুর
কণ্ঠে বললাম, দীপ্তি তোমাকে বোকা মনে হবে। সত্যি কি
আমার মনে নে। কোনদিন ?

नीति यत्, ना ।

বিশ্বাস করলাম, এই কি তোমার শেষ কথা ?

* অশেষ : ২। ক'হেই রাশির মত অষ্টট মহিয়ার সে চ'লে দেখ।
আমি বহু বিপন্ন বাধিত ছোঁখে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

9

প্রায় এক মাস পরের কথা। দাঁড়ি আমাকে এছিরে
চেমনি বটে কিন্তু তাকে আর বহনো একা পাইনি। দাঁড়ি
ত্রিপুর তার ঠিক আগের মতনট বসে উঠেছে, ঠিক তেমনি
করেই দে আমাদের সকলের সকল অঙ্গুরে'ব অঙ্গুরে'ব
পান কাটির আশনার খোঁসে চলেছে, কিন্তু একটু
সাবধানতা তার সব সময়েই ছিল। তাই দে-দিন সন্ধ্যাবেলা
সে এখন নিজে এসে আমাকে বস, শ্রিত্তি কোথায় গেছে

যেন, চল বেড়াতে বাই। তখন একটু বিখিতই হয়েছিলাম।
একবার তার মুখে জাকলালাম, কিছু বুঝে পারলাম
না।

পথে বেড়িয়েই বীণা বস, ঘেঁষা পেন্সিলের মত যেন করতে
 চেষ্টা কোরোনা। তুমি ব'লে পেন্সিল তোমাকে কিছু বলনি
 আজ করলে আর কিছু কথা কহব না।

আমি হাসলাম। বললাম, দীপ্তি, তোমার কথা মনে
কামার কি হবে? আর দেখিন অশ্রদ্ধা করেছি মনে হব না।
তুমি নিজে এসে আমার হাতছাৎনে বসো যে কোনদিন দেবে
শে করো তো আর নেই।

দীপ্তি দীপ্তনয়নে আমার দিকে ডাকাল। চঠাৎ বলে উঠল, আমার একটা কথা রাখবে ? যদি রাখ তবে বলি।

আমি বললাম, কবে তোমার কথা রাখিনি দীপ্তি? অবশ্য
যদি আকাশের চাঁদ এখনি এনে দিতে হুঁই বল তবে হয়ত
পারব না—কিন্তু তাও বোধ হয় তোমার আদেশ পেলে
একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

দীপ্তি বর, শ্রীতি তোমাকে ভালবাসে, তুমি তাকে বিয়ে
কর। তোমরা দুজনেই সুখী হবে।

আমি কোন কথা না বলে তাঁরদৃষ্টিতে তার মুখে
তাকান্বয়—আমার দুটির মাঝনে সে চোখে নত করল।

বীরে বীরে সে বলতে লাগল, আমাকে শেরে তুমি কোন-
দিন হারী হতে পারবে না। আমার মধ্যে যে সাহস আছে
সে তো তুমি জান। তুমি নিজেকে অস্ত্রভুলি, তুমি আমার
সইতে পারবে না। ক্রীতির লিভ দেহই তোমার গন্ধ মশলা।
তোমাকে যে ভালবাসি সে কথা কি ছাচ নতুন ক'রে বলতে
হবে ? তবু বেখেছ তো যে বগনি আমার কাছে এসেছে
ওগনি পছন্দপকে বাধা দিয়েছি।

আমি তার চোখে চোখ রেখে বলছি, আমাদেরও যথেষ্ট
যে সংস্কারের কথা বলছি সেটার কারণ তো জানি।
ভালবাসার আমরা পরস্পরকে আত্মদান করতে পারি নি—
কেননি আত্মত্যাগ করে এসেছি। তুমি আমার হৃদয়, আমিও
তোমারই হব এখন, তখন এক হব আর থাকবে না। এ
বিশ্রোধের একমাত্র কারণ আমাদের পরস্পরের প্রতি
আকাঙ্ক্ষা এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের বিস্ত্রাণ।

দীপ্তি ভাল, বর, তোমার কথা সত্য বলে আমি।
তোমাকে পেলে আমার জীবন দখ হ'য়ে থাকে সে-কথা
আমি। নিবিড় ক'রে তোমাকে পাওয়ার পরে জীবন যদি
আমার মকতুমি হ'য়ে যায় তবু আমার খেদ থাকবে না।
কিন্তু সে তো আর হয় না, বন্ধ। মৃত্যুর হাতের পাক
খোঁজে গেছে। এখন সে এখি আর খোলা থাকে না।
দমহস্ত্রী ভিঁড়ে ফেলে আর কুঁকি পেতে চলে। আমাকে
তুমি কমা করো।

আমি অবাক নরনে তার দিকে চেয়ে রইলাম।
দুশছায়া বাড়ী তার তোমার মুখানিতে অপূর্ণ আভা এনে
বিয়েছিল—মিছ নখন প্রেমের ক্রিশে পরিপূর্ণ ক'রে সে
আমার দিকে চেয়ে বসে, আমার কথা ঠিক বুকে
পাকছে না?

আমি তার চাতচুটি বুকে টেনে নিলাম। বসাম,
আমরা এমনে গুজনে ভালবাদি। আমাদের মিলনে
কেউ বাধা দেবে না—মিতে চাইলেও পারত না। তবে
কেন তুমি এমন ক'রে নিচুর প্রাণে আমার ছেড়ে চলে
যেতে চাও?

সে সঘোরে আমার বুকের একান্ত কাছে এসে
গড়াল। আমি বাহু দিয়ে তাকে ঘিরে তার বুকের
দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলতে লাগল, তোমার বিয়ে
কি আমি বেদনা পাইনি? তুমি কলকাতা থেকে চলে
এলে, আমার সমস্ত জীবন যেন মকতুমি হ'য়ে গেল।
বার্জিসিয়ে যখন এসেছিলাম তখন প্রথম ভেবেছিলাম
যে তোমার কাছে এবার বসে দেব। এমন ক'রে
তোমাকে আঘাত দিয়ে নিজেদের কীদব না। কিন্তু
এখন তো সে আর হবে না। প্রীতি তোমাকে
ভালবেসে ফেলেছে। আমি যদি তোমাকে তার কাছ থেকে
ছিনিয়ে নিই তবে সে আঘাত সে সহ্যে পারবে না।
মুখে সে কিছুই বলবে না জানি, বুদীই হ'লে সে চাইবে,
কিন্তু বুকের মধ্যে যখন আগুন জলে তখন হাসি দিয়ে
কি ভাবে আর চেপে রাখা যায়? তুমি ওকে বিয়ে কর,
তোমরা সুখী হবে। আমি তো তখন তোমার গুজনে
হ'ব, তোমার আশীর্বাদ করব, ভালমন্ত হব!

পেথের দিকে চাপা হাসিতে তার কর্ণের তরল হ'য়ে
উঠল। আমি আমার বাহুবন্ধন আরো একটু নিবিড়
ক'রে রাখা, এখনই কেন আশীর্বাদ কর না আমাকে?
যে আশীর্বাদ আমি চাই সে তো তুমি জান, আর তুমিই
কেবল বিতে পারো। ছিনিয়ে নেবার অভিপ্রায় তোমার আছে
কি না জানি না। কিন্তু আমি তো'কারো সম্পত্তি নই
আমাকে না ভিজেন ক'রেই এমন ক'রে আমাকে প্রীতির
মদিকারী লাগান করলে। তুমি ভুল বুকেছ। প্রীতি
আমাকে বোনের মত ভালবাসে। সে তোমার কথা কানে
আর মেনেই তো সে তোমাকে আশ্রিতে চিঠি লিখেছিল।

দীপ্তি বিবর ভাবে মাথা নাড়ল, বর, তুমি প্রীতিকে
বোঝনি, অপরা বুকেও না বোঝার ভাল করছ। আমি
এত বড় হার্পার হ'তে পারব না। আমাকে তুমি কমা
করো। আমার যাবন বোঝার আমি বার্ষ ক'রে
বিলাস, কিন্তু এ কথা মেনে যে তুমিই আমার লিহস্তম—
চিরদিন তুমিই আমার প্রিহস্তম থাকবে।

আমি চতাল কর্তে বসাম, দীপ্তি, তুমি কি হবে?

কামাচ আমার বুকে ত'রে এলো। বেখলাম তার
চোখের কানার কানার জল। বর, বন্ধ, এ আমাদের
মৃত্যুর পরিচাল। আমাকে তুমি কমা কর।

আমি নীরবে তাকে আরো কাছে টেনে নিলাম।
তার বুকের ওপর মুখ রেখে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, চতায়
সে চমকে উঠে বসে, এবার ছেড়ে বাও। কিবে যেতে চাবে,
কিন্তু কোঠার পথ যে বড় কঠিন।

তার দিকে চেয়ে কলপায় বুকে ত'রে গেল। বসাম,
বাঁধের প্রতি ভগবানের কল্পনা, তাঁদের পথ কোন দিন
গছ হয় না। তোমার কঠিন পথে তুমি চলতে
পারবে, কিন্তু আমার বোকা কি আমি সহ্যে পারব?

সে উদ্ধৃষ্টিত কঠে বসে, সহ্যে পারবে, পূব সহ্যে
পারবে। তুমি না সহ্যে বেদনার তার কে সহ্যে?
তোমার পথ সহ্যে হোক বলব না—কঠিন পথে চলবার
কঠোর গেরব তোমার হোক।

আমি আবার তাকে বুকে টেনে নিলাম। এক দুহুট
ঘির থেকে সে বসে, এবার তবে বিদায়। আমার পথে



তুমি আর এলো না--কাছে এলে আমরা তুজনাই এ
বাঁধান সইতে পারব না। যদি আমার কোন দিন সরকার
হয় তোমাকে ডাকব, তুমিও যখন তোমার সরকার হবে
অঙ্গুলীতে আমাকে ডেকে। আমি যেখানে থাকি
অঙ্গুলীতে।

সে চ'লে গেল। সন্ধ্যা-আকাশের রক্ত রেখার বিকে
ডাকিয়ে আমি একা ব'লে রইলাম। পশ্চিমের অন্তরাগ
কখন যে বুড়ে গেল, নিশ্চিন্তীর মৌন বহনিকার আকাশ
বাতাস ঢাকা পড়ল জানিনে।

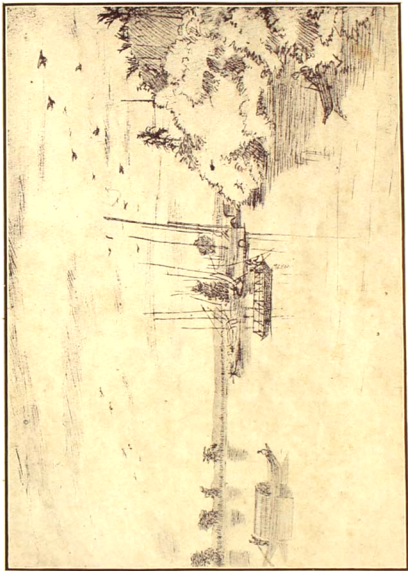
মহলা চণ্ডকে দেখলাম, তুফা পক্ষমীর সৌন্দর্য ভিত্তি চান
পাতুর লোহিত আভার আকাশকোণে দেবা বিয়েছে।
জনহীন পথ, নিস্ত্রিত পুরী। হতাশা পৌষপরবর্তী
ভয়ে কেমন ক'রে যে বাড়ী কিত্তে এলাম বলতে
পারব না।

ভারগরে আর কোন দিন খ্রীতি বা দীপ্তি তার মনে
দেবা হয়নি। তবু তরসা ক'রে ব'লে আছি যে দীপ্তি একদিন
আমাকে ডাকবেই—সেদিনের প্রতিজ্ঞার আমার সমস্ত
জীবন উদ্ধৃত।

গোধূলি

শ্রীনাথনন্দা দেবী

কে তোমারে পরিবে দিল
সন্ধ্যা তারার টিপটি মরি,
আমর ক'রে লগটিগটে
বগ পদীর দীপটি মরি।
শাক্য মেখের রক্তিন নাহ
যে তুই এলি বৃহৎ বায়
উড়িয়ে দিগে মল্ল বোম
মাথায় চাক নৌশাবরী ?
উড়িয়ে পায় পথের ধূলি
গৃহপানে আসছে খেতু ;
রাশালবাণক উৎসাহেতে
কি আছে দার বাসিয়ে বেণু।
অজনিমা লুপ গোখূলি
বেণুজের দিক উজলি'
অভ্যন্তর এক কোনও কালে
এই ভগ্নেতে কিরচ মরি ॥



লেখা: দাট, ডিগকাই নদী, অসাম

শিল্পী: ডি, বহ



শীর্ষ, ১০০৪

গুজরাটি ও বাঙ্গলা সাহিত্য

শ্রীনবীগোপাল চৌধুরী

প্রাচীন যুগ

পূর্ণ ভারতের বাঙ্গলা সাহিত্য ও পশ্চিম ভারতের গুজরাটি সাহিত্যের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, বিশেষত প্রাচীন যুগে, তাহা প্রাণধানযোগ্য, সাদৃশ্য কেবল ভাবে ও রীতিতে নহে, এমন কি উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশেও পরিলক্ষিত হয়। উভয় ভাষার প্রাচীন যুগ বলিতে তাহাদের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বুঝা যায় এবং আমাদের আলোচ্য বিষয় এই দীর্ঘায়ুয়ের মধ্যে বহু থাকিবে।

ভারতীয় ভাষার মধ্যে কেবল গুজরাটি ভাষার পৌরষ করিবার একটি বিষয় এই যে তাহাটির উৎপত্তির ইতিহাসে কোথাও ক'ল নাই কিংবা কোন একটা স্তর অশ্পষ্ট নহে। নবীন্দ্ৰ দত্ত এই ভাষাটি ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা-লম্বুয়ের উৎস সংস্কৃত হইতে উৎপত্ত হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত। নবীন্দ্ৰদত্তে বর্ণিতব্যু প্রায় অনেক বৈদিক শব্দ ও ভাষার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগে রূপান্তরিত হইয়া গুজরাটি ভাষায় স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসে স্রোত কোথাও প্রবল, কোথাও কঁপকরা আবার কোথাও লুপ্ত হইয়া পুনরায় বহুদূরে দেখা যায়। এই বাঙ্গলা ভাষার অপভ্রংশ যুগের চিহ্ন খুবই কম পাওয়া যায়, সুতরাং অনেক লক্ষ্যত শব্দ আঁকিতে রূপান্তরিত হইয়া ফাঁদে বাঁধা ভাষার ভাষায় দেখা যায় কিন্তু অপভ্রংশ যুগে ঐ শব্দটি কি আকারে প্রকাশ করিয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

স্থাত অপভ্রংশ তাহা হইতে ভারতীয় ভাষালম্বুয়ের উৎপত্তি। পৌরষদেী অপভ্রংশ কখন যে যৌরে যৌরে লোক-চকুর অঙ্গুলানে গুজরাটি ভাষায় পরিণত হইল তাহা অল্পদূর

করা চকুর। প্রায় সমস্ত শতাব্দীতে চারশগণ গুজরাটের রাজপুত রাজত্বকর্ণের ক্ষতিগান অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করে এবং তৈলন সাদৃশ্য জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উক্ত ভাষায় 'হাস' রচনা করেন। প্রচাদের মত এই 'হাস' রচিত হইত বলিয়া জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য তাহাদের ভাষাতে সে সময়ে প্রচলিত দেশীয় শব্দের অনেক প্রয়োগ হইত। এই অপভ্রংশ ভাষায় মধ্যে ভাষা গুজরাটি ও মাকড়গাড়ি প্রভৃতি ভাষার আগমন ঘোষিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত সমসাময়িক "বৌদ্ধ গান ও বৌদ্ধ"র ভাষা লব্ধে যেমন স্বাক্ষরার পদ্ধতিবর্ণনের মধ্যে স্বতন্ত্রে দেখা যায় সে লক্ষ্য এই 'হাসের' ভাষা লব্ধেও গুজরাটি পদ্ধতিসম্মত মতঃকর্ম: সূত হয়। কাহারও মতে এই 'হাসের' ভাষা খাঁটি গুজরাটি, আবার কাহারও মতে গুজরাটি মতে তৎ গুজরাটি ভাষার উদ্ভবকালীন চিহ্ন চোঁতে বর্তমান অর্থাৎ হইয়া পড়ন যুগের ভাষা। তাহ ও ভাষার অশ্পষ্টতানিবন্ধন অনেক "বৌদ্ধগান ও বৌদ্ধ" গ্রন্থকে লাক্তাভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'হাস' সাহিত্যের ভাষাও সে লাক্ত: যুগের ভাষা। 'হাস' সাহিত্যের অনুন্না ভিলাব নিয়ে ভটটি শব্দ উদ্ধৃত হইল।

"কালী কব্ধত কাপড়া' বলিউ আ'ই ছ'।

নারী বিয়া টললার, খাখীবু তা হ'র।"

ছুরিকা কিংবা কড়াত বিয়া কাটিলে শিরই মুচা :হয়। নারী যায় যে বিক হইয়াছে সে যাবজীবন দহু হয়। "কাপড়া" শব্দটি গুজরাটি "কাপড়" (কর্তন করা) হিবার বর্তমান ক্রমঃ এবং "আ'ই ছ' হইতে গুজরাটি ক্রিয়া "আবে যে"র (মাটিতে দহু অর্থঃ মুচা আনিতেছে) উৎপত্তি হইয়াছে।

এই 'হাস' সাহিত্যের ভাষার কৃষ্ণিতে গুজরাটি ভাষা



গঠনকার্য সাধিত ছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার স্পন্দন দেখা যাইতেছিল। ১৩৩৪ খ্রীস্টাব্দে জনৈক গুজরাটী কৈন “মুখ্যাব্যবহাৰ মৌক্ষিক” নামে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈদ্যর ভাষায় প্রণয়ন করেন। মাতা এবং শস্ত্রানের মধ্যে অব্যবহাৰ যে সাধু থাকে, এই উভয় ভাষায় মধ্যে সে সাধু গৃহ হয়। এই ব্যাকরণের ভাষা অশুদ্ধও নহে, আধুনিক গুজরাটীও নহে। এই ব্যাকরণের ভাষাটি ‘রাস’ সাহিত্যের অঙ্গভাষা ও নরসিং দেহেতার সম্বন্ধকালীন গুজরাটী ভাষার সংযোজক। এ যাবৎ বৈষ্ণব যুগের আলি কবি নরসিং দেহেতা গুজরাটী সাহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত হইতে কিন্তু এই ‘রাস’ সাহিত্যের আবিষ্কারের কলে নরসিং দেহেতাকে সে পদবী হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব যুগের পূর্বে গুজরাটী সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ যাবৎ উপেক্ষিত অঙ্গের আলোচনা করা কঠিন। সে অংশটি হইতেছে কাবিগোষ্ঠের ‘গৌড়িক সাহিত্য—গীতিকা (Ballads) ও “ভঙ্গী বাকা”। “ভঙ্গী বাকা” ও গীতিকাবলির এ পর্যন্ত সন তারিখ নির্দিষ্ট হয় নাই। আমরা মনে করি ইহাদের অনেকগুলি বৈষ্ণব যুগের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের “বনা”র বচনের জায় গুজরাটী প্রদেশে ও “ভঙ্গী বাকা”র বঙ্গ প্রচলন আছে। বনা ও ভঙ্গী উভয়েই স্ত্রীলোক। বাঙ্গলা দেশের বনার বচনও গৌড়ী বচন বনা নহে, এই গুজরাটী প্রদেশের (কাবিগোষ্ঠ) “ভঙ্গী বাকা”র রচয়িতাও ভঙ্গী নহে। এই সব বাকা ও বচন কৃষ্ণদেব বহুযুগের পক্ষে কবিবিরতার অস্বীকার নয়। প্রকৃতির অধ্যাত্মত্বের পক্ষে ও স্বয়ং বসুন্ধরার নন্দনকল হই একটি পদে ব্যক্ত হইয়াছে এবং কাব্যকালেও এই সব বাকার সত্য উপলব্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের বনার বচন ভাষাভাষার স্ত্রীক সৌন্দর্যের সেন বোধ যুগের প্রভাব সেনিভে পাইয়াছেন এবং তাহার মতে স্ত্রীলোকের রচনাকাল ৮০০—১২০০ শতাব্দীর মধ্যে। এই সব “ভঙ্গী বাকা” বোধ কিংবা কোন কৈন প্রভাব গৃহ হয় না এবং কতকগুলি নব যে প্রকৃতি তাহা প্রাচীন বলিয়া নহে, আংশিক এবং ভগ্নাঙ্গবিশিষ্ট বলিয়া। কবি বৈদ্যন দেশের লোকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছিল বৈদ্যন হইতে এই সব বাকা ও বচন রচিত হইতেছিল এবং লোকমুখে অধিক প্রচলন হইতে ভাষার পরিবর্তন হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি “ভঙ্গী বাকা” নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

“প্রাচীন পল্লী পাটদিন, মেঘ ন মাতে মাল।

পিতৃ পথেরে মালাবে, হসে ভাত্ত মোদালে।”

প্রাচ্যের পাটদিন পূর্বে যদি বৃষ্টি অস্তিত্ব না হয়, প্রিয়! তুমি মালাবে বাইও, আমি বাপের বাড়ী বাইবে (অর্থাৎ বৃষ্টি হইবে না সে ক্ষত শস্যাদির অভাবে দুর্তিক হইবে।)

কাবিগোষ্ঠের গৌড়িক সাহিত্যের অঙ্গ অংশ হইতেছে “গাথা” সাহিত্য (Ballads)। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই নগর হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে একপ্রকার গৌড়িক গীতিকার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি “গীতিকা” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোতলায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কাবিগোষ্ঠ প্রদেশে এইপ্রকার অনেক “গীতিকা” বঙ্গ যুগের ভাষায় প্রদেশে ছড়াইয়া আছে—কেহই তাহাদিগকে ভারতীয় চরণ-যুগল অঙ্গলি দিবার উপযুক্ত মনে করে নাই। নগরের দূরিত বাহু হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে অজানা কৃষ্ণ-কবির দ্বারা রচনা করিয়া তাহারা পরিপুষ্ট, কবে কোন অজাত দিবসে কোন অজান কৃষ্ণ-কবি দ্বারা রচিত হইয়াছিল ইতিহাস তাহার বহর রাখে না। কৃষ্ণদেব যুগের কৃষ্ণের গীতি, রাজপুতযুগতিলকবির সৌখ্য-গাথা, প্রেমিক প্রেমিকার বিচ্ছেদের মেঘদূত, এই সব গীতিকা আমাদের দৃষ্টির স্পষ্ট ভাবরাশিকে আলোড়িত করে। প্রাচীন কাবিগোষ্ঠের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপলব্ধি এই সব গাথার মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে রচিয়াছে যে কাবিগোষ্ঠের ইতিহাসপ্রণয়নকালে তাহাদের দান অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদিও অনেকগুলি গাথার সময় নির্দেশ করা দুষ্কর, তথাপি এই একটির রচনার সময় সন্দেহ দূর্য্য। অন্তিমগোষ্ঠ পাটনের রাজা শিবদাস দ্বারিহ কল্কি রূপকসেবীর হরণরক্তাভি দ্বারা যে গীতিকার রচিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গল কিংবা অন্ধ্রদেশ পতাভার মধ্যে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শিবদাস দ্বারিহের

স্বাক্ষরকালে একাদশ শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটয়াছিল। হুতরাঃ স্বাক্ষর কিংবা প্রয়োজন শতাব্দীর মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। এই প্রকার একাদশ শতাব্দীর হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক পৌত্তিকা রচিত হইয়াছিল, এখনও কাশিগড়ের ঘাটে, মাঠে কংকরা দল বাধিয়া এই সব অতীতের পৌত্তিকা পাওয়া থাকে।

এই আলো আঁখিরের দৃশ্যে গুজরাটে তন্ত্রাভিত্তিক। নরসিং মেহেতা ও মীরাবাইয়ের বহুশ্রমগণে গুজরাটের জঘরে দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল—জাগিয়া উঠিয়া যেখান নরসিং মেহেতা ও মীরাবাই প্রবৃত্ত গুজরাটবাসী কুরুকর্তনে যত্ন, কী যেন নব জীবনের সাদা পাইয়া আনন্দে মাতোরাগা। পুস্তককে বিদ্যার দিগা নরসিং মেহেতা ও মীরাবাই উদীয়মান পুথোর দিকে মুখ করিয়া গুজরাটের নব উদ্বোধনপৌতি আরম্ভ করিল। ঠিক সে সময়েই বাংলা দেশেও চণ্ডীদাস এবং বিভাগতি * পুস্তককে বিদ্যার দিগা

* বিভাগতি কবি হইলেও তাঁহার মৈথিলি ভাষায় রচিত পানগুলি একেবারে লোকমুখে মিথিয়ার বসভাষায় অনুবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য তাহাকে বাংলার কবি বলিয়াই।

নব বাংলার উদ্বোধনপৌতি পরিচালিত—ভক্তিগায়ার বন্দেবন্দকে প্রাণিত করিয়াছিল। প্রাচীন গুজরাটি ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই কবি চতুর্দশের একই স্থান। বাংলার চণ্ডীদাস খাঁটি বাংলানী, গুজরাটের মেহেতা খাঁটি গুজরাটি। বাংলার বিভাগতি ও গুজরাটে মীরাবাই উভয়েই বিদেহী। মিথিয়ার কবি বিভাগতিঃক বাংলাদীয়া ও যেমন দাবী করিতে পারে, সে রকম মেহেতার মীরাবাইকে গুজরাটবাসীরাও দাবী করিতে পারে। নরসিং মেহেতা ও মীরাবাই পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি, হুতরাঃ আমাদের আলোচ্য সময়ের বহিষ্ঠিত। সে ক্ষণ বিস্তারিত ভাবে তাহাদের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে তবে প্রাচীন এবং নবীনের সম্বন্ধে গড়াইয়া একের বিনাধ এবং অপরের আত্মনপৌতি পরিচালিত বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইল। তবিত্তে গুজরাটি ও বাংলা সাহিত্যের বৈকল্য দৃশ্যের তুলনামূলক সমালোচনার তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।





বেশী গুণে বাগরতে বাস্তব অধ্যয়ন সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি অজ্ঞানতার ভাষে সন্দেহ দূর করা দিয়া দু'কিছা উঠানে পা দিতেই কি এমন একটা লজ্জা সঞ্চিত হইবে যত্নে আটকাইল ও লজ্জা লজ্জা কি একটা শব্দ কহিয়া ছিড়িয়া ঘাটবার লজ্জা গুণে ও চতুর্ভুজ গুণেই উঠা কি উঠান তিনে গুণে পড়িয়া সমস্ত কান্দেট চক্রে নিম্নে গুণে গুণে কহিয়া কহিয়া দেখিবার কি দৃষ্টবার পুণ্যেই।

কিন্তু তাহার দেখিবার অবকাশও ছিল না—একবার গাটের দেখিবার ভাবিল—আমি কিত্তি বস্ত্র উল্লুটি কাণ্ড ও ছোটো—পাথর মাঝখানে আবার কি একটা টাট্টেরে রহেছে—

অন্য দিক পথেই অল্প বাড়া আসিল। দরজা পার গুণে উঠানে দিতেই সে থমকিয়া গাড়াইয়া গেল—নিজের চক্রে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি! বায়ে? আমার টেলিগ্রাফের তার ছিড়িলে কে?

কতকাল অকস্মিকতার ও বিপুলতার প্রথমটা সে কিছু ভাবব করিতে পারিল না—সব একটু সামলাইয়া লইয়া গাটের দেখিল উঠানের মাঝেই ভিকার শায়ের লম্বা এখনও মিলার লম্বা ভিকার মনের ভিতর গুণেই কে ডাকিয়া বলিল—মা! ভাড়া আর কেউ নয়। কখনো কেউ নয় ব্রিক মা। বাড়া দু'কিছা দেখেছিল না বসে বসিমা বেশ নিশ্চিন্তমনে

কীটাল-বীচি ধুইতেছে। সে গাটের গাড়াইয়া পড়িল এবং ঘাটের লম্বা অতিমাত্রার মত ভিকারে মাঝের দিকে কুঁকিয়া বলির লম্বা মের মত ব্রিকেরে ভীত মিটে গুণে কহিল—আজ্ঞা মা, আমি কহে ক'রে ছোটো গুণে ব্রিক বন বাগান টে নিজে আসিলি? লম্বা গাটেরে গাটেরে গাটেরে ব্রিক—কি নিজে এসেছিল? কি গাটেরে—

—আমার ব্রিক কহে গুণে? কীটাল আমার গাট পা ছিঁড়ে যাই নি ব্রিক?—

—কি বলে পাগলের মত? গাটেরে কি?

—কি গাটেরে? আমি এত কহে ক'রে টেলিগ্রাফের তার টাট্টালাম, আর ছিঁড়ে যেওয়া গাটেরে, না?

—তুমি বস্ত্র উল্লুটি কাণ্ড ছাড়া তো একমুণ্ড থাকে না বাণু?—পাথর মাঝখানে কি টাট্টালামে গাটেরে—কি জানি টেলিগ্রাফের কি কি গিরাণ—আমি তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেলাম—তা এখন কি করবো বলে?

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ কি ভীষণ ভয়জনক! আগে আগে সে ভাবিত যে যে তাহার মা তাড়াতাড়ি ভাল বাসে অল্প ব্রিক তাড়াতাড়ি সে বাস্তব লম্বা অনেক দিন পুটিয়া গিয়াছে—তবুও মাঝে এতটা নিরুত্তর, শাণ্ডিল্য? কখনো ব্রিকেরে কখনো করে নাই। কাল সাহায্যিন কোথায় লম্বা ব্রিকেরে ভীত, কোথায় লম্বা ব্রিকেরে ব্রিক অমোঘ্যাম, কোথায় লম্বা ব্রিকেরে

মশায়ে বাপবন—ভরানক ভরানক জলসে একা খুঁটিয়া বত
কটে ঈঁচু ভাল হইতে বোলানো। কলক লতা কত কটে
যোগাড় করিয়া সে আনিব...এখনি রেল বেল খেলা হইবে
সব টিক ঠাক আর কি না...

হঠাৎ সে হাৎ একটা খুব কড়া, খুব জড়, খুব একটা
গ্রান-বিধানের মত কথা বলিতে চাহিল—এবং আনিব
পাঁড়াইয়া যোগ দর অস্ত কিছু তাহিয়া না। পাঁছা আগের
চেহেরে ও তাঁর নিধানে বলিল—আমি আর তাত খাবো না
বাও—কখনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না বাবি না বাবি বা—তাত খেয়ে
একেবারে রাজা ক'রে দেবেন কিনা? এমিকে তো রাজা
নামাতে তল সব না—না বাবি বা দেখবো বিদে পেলে
কে খেতে পার?

বাস! চাকের লগকে—সব আছে, আমি আছি, তুমি
আছ—সেই তাহার মা কাঁটাল বীচি ধুইতেছে—কিছু অণু
কোথায়? সে যেন কর্পুরের মত উবিয়া গেল! কেবল
টিক সেই সময়ে ওঁরা বাড়ী চুকিতে বরষার কাছে কাছাকাছে
পাল কাটাওয়া কড়ের বেগে বাঁহির হইয়া বাঁহিতে দেবিয়া
বিস্মিত হুরে ডাকিয়া বলিল—ও অণু, কোথায় ঘাছিস্
অমন ক'রে—কি হয়েছে ও কর্পু গো—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি বত সব অনাছি
কাজ বাপু তোমাদের, বাড়ি মাস কালি হ'য়ে খেল—কি এক
পথের মাঝখানে টাঙ্কিরে রেখেচে, আসি, ছিঁড়ে গেল—
তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়ি? তাই
ছেলের হাপ আমি তাত খাবো না—না বাস্ বা তাত
খেয়ে সব একেবারে স্বপ্নে গড়া হৈবে কিনা তোমরা?

মাতা পুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গা:কেই মধ্য
হইতে বহ—সে অনেক ডাকাডাকির পরে খেলা দুইটার
লম্বা ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুক মুখে উদাস
নয়নে ওপাড়ার পথে সারোদের বাগানে পড়ন্ত আম গাছের
গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুত্রের বাড়ী আসিয়া তাহাকে
বোম্বত, তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে এ সেই
অণু—যে মাস কালে যারের উপর অভিমান করিয়া দেশ

ত্যাগী হইয়াছিল। উত্তানের এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম পর্যন্ত
তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অণু বিচরের সহিত চাহিয়া
চাহিয়া দেখিতেছিল কিছুই বাড়ী নাই, টিক যেন একেবারে
পতাকাহার রেলসড়ার তার। বনের বিকৃতির তার
খাটানোর লম্বা কেবলই মনে হইয়াছে যদি বেশা ছোট।
পাওয়া যায়, তবে সে এগাছে ওগাছে বাঁধিয়া বাঁধিয়া তাহার
তারকে পাঠাইয়া দিত বৃহৎ হইতে বহু দূরে, একেবারে ওই
বাপবনের ভিতর দিয়া কোথায়। বনের নির্বিড় গাছ-
পাশাকে ভয় করিয়া তাহার খেলাধুলার রেল-লাইনের
তারটা পতাকারের টেলিগিরাপের মত নিরুদ্দেশতায়
করিত এই বাপবন, কাঁটাঝোপ, শিপরিসিক, মজনা লুভ
বনের ভিতর দিয়া দিয়া। সে লুভের বাড়ী গিয়া বলিল—
লুভা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙাতে যেনেছি আমাদের
বাড়ীর উত্তানে, চল রেল রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিলে রে?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিমিছোটা এনে কিতছিল—
লুভা বলিল—তুই খেলগে বা আমি এখন খেতে
পারবো না—

অণু মনে মনে বুকিল বড় ছেলের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া
খেলার যোগাড় করা তাহার কণ নয়। কে তাহার কথা
গুনবে? তাহাদের বাড়ীটা গ্রামের এক প্রান্তে, নির্জন
বাপবনের মধ্যে, কেই বা সেখানে খেলিতে আসিবে? তবুও
আর একবার সে লুভর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোজকের
কোণটা বহিয়া নিরুদ্দেশভাবে বলিল—চল না লুভা, যাবে?
তুমি আমি আর দিবি খেলবো এখন? পরে সে অশ্রোজন-
জনকভাবে বলিল—আমি টিকটের গুঁড়ে এতগুলো বাতাবী
নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেছি। সে হাত কাঁক করিয়া
পরিমাপ দেখাইল।—যাবে?

লুভা আসিতে চাহিল না। অণু বাঁহির বড় মুখ-চোরা, সে
আর কিছু না বলিয়া বাড়ী করিয়া গেল। গুঁড়ে তারি
চোখে প্রায় চল আসিয়াছিল—এত করিয়া বলিয়াও লুভা
চলিল না।

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিবি ওজনে দিলিয়া টট
দিয়া একটা বড় দোকানখর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের যোগাড়



বারিষ হইল। চুর্ণী বনজলনে উৎসব প্রবোধে লক্ষ্যন বেশী
রাখে—ভক্তনে মিলিয়া নোনাপাতার পান। মোটে আসুর
সলসে আলু, রাধালতা ফুলের মাড়, তেলাচুটার পটল,
চিড়িডেব বরকট, মাটির ঢেগার লৈলব লখন—আরও কত কি
সংগ্রহ করিয়া আসিয়া যোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া
কৈলিল। অণু বলিল—তিনি কিসের কর্ণি রে দিদি ?

চুর্ণী বলিল—বিশতলার পথে সেই ডিবিটার ভাল বালি
আছে—মা চাল ভাঙ্গা। তাক্‌বার ভক্ত আনে ?...সেই বালি
চল আনি গে—সাবা চক্‌ চক্‌ কছে—ঠিক একেবারে তিনি—

বালবনে তিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার পথের ধারের
বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন চট্‌কা গাছের
আপড়ালে একটা বড় লতা উঠিয়া দায়া মাথাটা ধেন চক্‌ চক্‌
সবুজ পাতার খোকা করিয়া কৈলিরাছে—তাহারই বন সবুজ
আড়ালে টুকটুক রাসা, বড় বড় সুগোলা কি ফল হুগিতছে !
অণু ও চুর্ণী ভক্তমেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এ রকম
তল তাহার জীবনে কখনো দেখে নাই তো ! অনেক
চৌর্য গোটা করেক-দল নীচের দিকে লতার বানিকটা অল
ছিঁড়িয়া তলার পড়িল। মহা আনন্দে ভক্তনে একসঙ্গে
ছুটয়া দিয়া ফলগুলি, মাটি ছীতে তাহার তুলিয়া লইল।
বাগা তেল চুক্‌চুক্‌, তুমি হাত দাও, তোমার সাহা যের
যেন স্পর্শ মন্থপ্রায় শিরিষা উঠিবে ! কি সুস্বাদ
ফলগুলি ?...

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রাধান্যে বিশপা-সম্মা
উষেস্ত্রেই তাহা দোকানে এতদ ভাবে রক্ষিত হইল যে
খরিদবার আসিলে প্রথমেই যেন সম্মা পড়ে। পুরাদমে
বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। চুর্ণী নিজেই পান কিনিয়া
দোকানের পান প্রায় ছুটাইয়া কৈলিল। বেলা ধানিকটা
অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় বরজা দিয়া সত্‌ক চুকতে
দেখিয়া অণু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে
দৌড়িয়া গেল—ও সত্‌ক, ভাবোনা কি রকম দোকান ধরেচে
কমল ফল এই ভাণ্ডা—আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম—
কি ফল বেলা দিকি ? জানো ?...

সত্‌ক বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে
ক-ত ছিল ।...

সত্‌ক আসিতে অণু যেন কৃতার্ব হইয়া গেল। সত্‌ক
তাহারে বাড়ীতে ভো কর একটা আসে না—তা ছাড়া
সত্‌ক বড় ছেলেদের দলের চাই। সে আসিতে বেলায়
ছেলেসাহায্যটুকু যেন ছুটিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরহমে বেলা চলিবার পর চুর্ণী বলিল—
তাই আমাকে চমৎ চাল দাও। খুব দক্‌,আমারি কাঁল পুতুলের
বিয়ের পাকাদেবা, অনেক লোক খাবে—

অণু বলিল—আমাদের খুঁজি নেমস্তর না ?

চুর্ণী মাথা তুলিয়া বলিল—না বৈ কি ? তোমরা ভো
হোলে কনে-বাড়ী—কাল সকালে এসে নকুতো ক'রে
নিরে গাঝে—সত্‌ক রাহকে বস্‌বে আর ভাতিয়ে একটু
চমল বেটে রাখে ?—সত্যিকারের চমল কিছ—সেই যেমন
খুনিপুত্‌রের দিন ক'রে রেবেছিল—কাল সকালে নিরে
আসবে—

অণু বলিল—এক কাছ কর্ণি দিদি—কাল তোম
পুতুলের বিয়েতে লক্ষ্যন তৈরী কর না কেন ? নেড়াকে
ডেকে নিরে এসে—নেড়া দেখিয়ে দেবে এখন—

চুর্ণী বলিল—নেড়া না দেখিয়ে দিলে খুঁজি আমি আর
সক্‌তে পারব না—কাল সকালে দেখিলু এখন—রাতি বেশ
ক'রে লল দিগে বেবে আমি কত কি দ'ড়ে দেবে—মেটাই,
নারকালের সম্মা, পাটাইল—পলোর মধ্য হইতে
দোকানের রক্ষিত বিক্রয়ার্‌ চুর্ণী কথাতাল করিয়া শেষ হয়
নাই এমন সময় সত্‌ক কি একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া
দরবার দিকে ছুটিল—দক্‌ সঙ্গে অণুও গুচে দিবিরে—নিরে
গেল যে—বলিয়া তাহার স্মৃতিরনে তীর মিটে পলার চাঁৎকার
করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল !

বিশিত চুর্ণী তাল করিয়া ব্যাশাটো কি খুঁজিবার আগেই
সত্‌ক ও অণু দৌড়াইয়া দরবার বারিষ চইয়া চলিয়া গেল !
দক্‌ সঙ্গে বেলা-ঘরের দিকে চোখ পড়িতেই চুর্ণী দেখিল
সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই ।...

চুর্ণী একটুতে দরবার কাছে আসিয়া দেখিল সত্‌ক দাব-
তলার পথে আসে আসে ও অণু তাহা হইতে আর নিচটে
শিঙ শিঙ ছুটিতেছে। সত্‌ক বদল অণুর চোয় ওর কলসের
বেশী, তাহা ছাড়া সে অণুর মত ও রকম ছিশ্‌ছিশে ঘেরিল

গড়নের ছেলে নয়—বেশ মোরগো। হাত-পা-ওঠাণা ও শব্দ—তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে—তবুও যে সে বার-বার করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে সত্বে ছুটিতেছে পরের এবং আশ্রয় করিয়া এবং অশ্রু ছুটিতেছে প্রাণের দ্বারা।

হঠাৎ ওগা বেধিল যে সত্বে ছুটিতে ছুটিতে গবে একবারটি বেন্দু নীচু হইয়া পিছন করিয়া চাছিল—সবে সঙ্গে অশ্রুও হঠাৎ পাড়াইয়া পড়িল—সত্বে ততক্ষণ ছুটিয়া গুটির বাহির হইয়া গেল; ততবার গবে গিয়া পড়িল।

হুগা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপূর কাছে পৌঁছিল। অপূ একদম চোখ বুজাইয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া ফুঁকিয়া ছই হাতে চোখ রগড়াইতেছে—হুগা বলিল—কি হয়েছে রে অপূ ?

অপূ ভাল করিয়া চোখ না চাঁহিয়াই যখনকার হুগে হুঁহাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সত্বে। চোখে খুলে ছুঁতে মেয়েতে বিধি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে যে—

হুগা তাকাতাড়ি অপুর হাত না মাইয়া বলিল—সব্দে সব্দে দেখি—ওরকম করে চোখ রগড়াস্ বে—দেখি ?—

অপূ তখনি হুহাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল হুগে বলিল—উহ ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন কছে—আমার চোখ কানা হ'রে গিয়েচে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিলে—সব্দে—
পরে সে কাপড়ে ছ' পাড়িয়া চোখে তাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপূ একটু একটু চোখ মেলিয়া চাঁহিতে লাগিল—হুগা তাহার ছই চোখের শান্তা তুলিয়া অনেকবার ছ' দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস্ ?—আজ্ঞা তুই বাড়ী যা—আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর থাকে আর ঠাকুমাকে সব ব'লে দিয়ে আসছি—রাহুলকেও বলবে—আজ্ঞা চুট্টে ছেলে তো—তুই যা—আমি আসছি এখনি—

রাহুলের বিড়কি দরজা পথান্ত অন্ধার হইয়া হুগা কিন্তু আর বাইতে দাশ্য করিল না। সে ঠাকুমাকে সে ভয় করে—বানিতকণ বিড়কির কাছে হাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া যে বাড়ী গিরিল। সদর দরজা দিয়া চুকিয়া সে দেখিল অপূ দরজার বাম দ্বারের কণাটখানি একটুখানি

সামনে টোলিয়া দিয়া তাহারই মাড়ানে পাড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচুকাঁদনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁবে না—রাগ করে, অতিমান করে বটে, কিন্তু কাঁবে না। হুগা খুবল আশ তাহার অত্যন্ত হুগে হইয়াছে, অত সাধের কণকণি দেখ...তাহা ছাড়া আবার চোখে খুগা দিয়া একদম অপমান করিল! অপূর কারণ সে সত্বে করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন খেন করে।

সে দিয়া তাইয়ের হাত ধরিল—সামান্য হুগে বলিল—কাঁদিস্ নে অপূ—আর তোকে আমার সেই কড়িওলো সব দিচ্ছি—আমি—চোখে কি আর বাথা বাড়তে ?—দেখি কাপড়খানা খুঁচি ছিঁচে কেমনে ?

১১

বাওরা দাওয়ার পর হুগুর কণা অপূ কোথাও বাঁহির না হইয়া থরেই থাকে। অনেক দিনের দাঁশ পুরাতন কোটা বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিষপত্র, কাঠের সেকালের দিম্বুক, কটা রংএর সেকালের বেতের পেঁটুয়া, কড়ির আলনা, জল চৌকিতে ঘর তক্তানো। এমন সব ব্যস্ত আছে দাওরা অপূ কখনো খুঁজিতে দেখে নাই, তাকে রক্তিত এমন সব হাঁড়ী কলসী আছে, দাওর অত্যন্তত এবং সব্বদে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব তত্ব মিথিয়া বহুতে পুরানো জিনিষের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাঁহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ তাহা সে জানে না, কিন্তু সেটা খেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুর দোবার বেতের কাঁদিতা ছিল, ঐ বড় কাঠের দিম্বুকটা ছিল, ওই যে পৌঁদালি দাওরের মাথা বনের মধ্য হইতে বাঁহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জললে তরা দাওরাগাটতে কাঠাখের বড় চৌকিওণ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলে মেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তাহা ছাড়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে কতকাল আগে!

যখন সে একা থরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত মোহ হয় ওই বাড়ীটা, বেতের কাঁদিতা খুঁজিয়া দিনের আলোয় বাঁহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অতীত রহত



উজ্জ্বল, মনো-জুগ্ম আছে। কাঠের লিঙ্গকূটার উপর তাহারে
বড় খামাটা উপকৃত করিয়া তাহার উপর থাড়াইয়া বরের
অড়ার সলোজ তাকে কাঠের বড় বারকোদে যে তাল-
শক্তির পুঁথির তুল ও পাতাপত্র আছে বাবাকে জিজ্ঞাসা
করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার প্রাক্কুরবাল্য
সামান্য তর্কালভারের—তাহার বড় টাঙ্গা ওইগুলি ঘনিষ্ঠতার
নাগালে বহা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাকিয়া
চাড়াই দেবে। এক একদিন বনের হাতের জানালাটার
বদলা চুপে বেলা সে সেই ছেঁড়া কাপড়ের মধ্যকার
খানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে পিথিয়াছে,
আলোকার মত আর মার মূখে ভিত্তি হয় না, নিজেই কপের
মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াচুনার তাহার বুদ্ধি
খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাকে মাকে তাহাকে গাঙ্গুলি বাড়ীর
চৌকিমণ্ডলে বসিয়ে বসিয়ে লইয়া যায়, তাহাৎ কি
পাঠানো পড়িতে দিয়া কল, পড়ে তো বাবা, এবের একবার
ভিতরে লাগ তো ? বুঝেই খুব তারিফ করেন, দীর্ঘ চাটু-
বলে—আমি আমার নাতিনী, এই তোমার খোকাই
কল হবে, ওখানে বর্ণ পরিচয় ছিঁড়লে বাপু, তুলে বিশেষ
করবে না, এখনো ভাল ক'রে অঙ্ক চিনে না—বাপের ধারা
পেরে য'লে আছে—এ যে ক'দিন আমি আছি যে বাপু, ওক
বুজলেই লাঙলের মতো বসতে হবে। পূত্রপলে ঘরিরের বুক
হুলিয়া ওঠে। মনে মনে তাৎ—ওক তোমাদের হবে ?
করে তো তিরকাল হুদের কারবার !—খালামই বা। পত্নী,
হাজার কোক পণ্ডিতবংশ তো বটে, বাবা মিথোই তালপাতা
ভরিরে কেনে নি, পুঁথি লিখে বাংলা একটা ঘরা দিয়ে
গিয়েচেন, সেটা বাবে কোথায় ?

ততপোষের পাশেই কলচৌকিতে মাঘের দিনের
পেটুয়াটা। চিনে মাটির একরকম পুতুল তার মধ্যে আবদ্ধ
প্রটা বড় বড় মেন পুতুল, একটা হাতী, একটা হরিণ, মাঘের
বাক্স গুলিবার সময় সে দেখিয়াছে। চিনেমাটির পুতুলে
তাহার মন তেমনি টানে না কিং তাহার বিধি সেজন্য
কত একবারে পাগল। কতদিন চুপে লুপে, সন্ধ্যার
বাড়িতে বসে না। না থাকে, বিধি প্রস্তুত মনে মাঘের
পেটুয়ার মাঝে-মাঝে খুঁজি কোথায়, একবার প্রকবে বসবে

করিয়াছিল খুব অবদার মাঘের আঁচল হইতে চাখির দিটা
গুলিয়া পুকাইয়া রাখিবে এবং—কিছু কার্যে কিছুই হয়
নাই। অণু বিধিঃ কুকাইয়াছে যে বিবাহের পর সে এখন
যত্ন বাড়ী ঘাইবে, সব চীনে মাটির পুতুলকলা বাকির
করিয়া মা তাহার পেটুয়া সাধাইয়া দিবে, পাছে সে তাড়িয়া
কেনে একত্ব এখন দেয় না।

তাহারে বরের জানালায় কয়েক হাত মুয়েই বাড়ীর
পাটিল এবং পাটিলের ওপাশ হইতেই পাটিলের পা খেসিয়া
কি বিশাল আগছার ললল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায়
বিদ্যা শুধু চোখে পড়ে সবুজ সবুজের চেউয়ের মত তাঁট-
পেঙকা গাছের মাথাঙলা, এগাছে ওপাছে মোড়লানান কত
রকমের লতা, প্রাচীর বীশবনের শিখ বরষের তাহে বেখানে
পৌঁছানি, বন-চালতা : গাছের উপর কুঁকিয়া পড়িয়াছে,
তাহার নীচেকার কালো মাটির বুক বসে পাখীর নাচ।
বড় পাঁছাপাশর তলার ললুণ, বনকটু, কুঁচলের ঘন সবুজ
ললল মোলাটেলা করিয়া হুগের আলোর দিকে মূখ ফিরাইতে
আপনপ করিতেছে, এই জীবনের মুখে যে পাছটা অপরগ
হইয়া গর্ববৃশ প্রতিবেশীর আগতায় চাপা পড়িয়া দিয়াছে,
তাহার পাতাগুলি বিধর, বৃত্তাশাধুর, তাঁটা গুলিয়া আসিল,
মরগাহত পুষ্টির লম্বুখে শেখ-বরষের বন-তত্তা পরিপূর্ণ
কলমে ত্রোত্র, পরগাছার ফুলের আকুল আত্ম হুগত
মাঝানে গুণিযোটা তাহার সকল সৌন্দর্য, রহত, বিপুলতা
লইয়া ঘীরে ঘীরে আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে।

তাহারে বাড়ীর বার হইতে এ বনকল একদিকে
সেই কুঁচর মাঠ, অপর দিকে নদীর বার পর্যন্ত একটানা
চলিয়াছে। অণুর কাছে এ বন, অসীম অসুখত ঠেকে, সে
বিধির লকে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের
শেখ দেখিতে পার নাই—ওখুই এই রকম ভিত্তিমাছ গাছের
তলা দিয়া পথ, ঘোটা ঘোটা গুলকলতা হুলানো, খোদো
বন-চালতার কল চাখিয়ারে। হাঁকি পথটা এক একটা
আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওপাছের
তলা দিয়া বন-কলমা, নাটা-কাটা, মনো-কোণের ভিতর
দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া দিয়া
কোঁতেছে, ওখুই বন-খুঁজনের লতা কোথায় সেই বিশুভ

দোলে, প্রাচীন শিবীয়া পাহাড়ের শেওলা-পড়া ডালের গায়ে
পলগাঙার কাঁক মজরে আসে।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মন্দির, পুরানো পুকুর
আছে, তারই পথে যে ভালো মন্দিরটা আছে, আজকাল
যেমন পকানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোন্‌ সময়ে ঐ
মন্দিরের বিপাণাকী দেবী সেইরকম ছিলেন। তিনি ছিলেন
গ্রামের সমুদয় বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময় কি
বিধের লক্ষ্যমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নতবলি
যেন, গ্রামেতেই কষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি
তিনি মন্দির পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো
কিরিছেন না। অনেক কালের কথা, বিপাণাকীর পূজা
হইতে দেখিরাছে একজন কোনো লোক আপ জীবিত নাই,
মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সমুদয় পুকুর
মজিয়া কোথায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বন ছাইয়া
কেলিরাছে, সমুদয় বংশেও বাতি মিতে আর কেহ নাই।

কেন্দল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের বঙ্গপ চক্রবর্তী
চিন-গা হইতে নিমগ্ন হইয়া কিরিতছিলেন—সন্ধ্যার সময়
নবীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি
‘সুন্দরী’ বোড়শী মেয়ে গাড়াইয়া। হানটা লোকাল
হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও
নাই, এ সময় নিখোঁজ বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী
মেয়েকে দেখিয়া বঙ্গপ চক্রবর্তী দম্বর মত বিস্মিত হইলেন।
কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই যে-খট্ট ঝেং
পর্শমিশ্রিত অমৃত মিষ্টত্বের বলিল—আমি এ গ্রামের বিপাণাকী
দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওণ্ডাটার মড়ক ছাড়াই হবে—
এলে দিও চতুর্দশীর স্নাত্রে পকানন্দ তলার একশ আটটা
সুন্ডা বলি দিবে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ
হইবার পক্ষে লজ্জাই স্তম্ভিত বঙ্গপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে
সেইটে চারিধারের শীত সন্ধ্যার সূর্যাসার ঘীর ঘীরে যেন
মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে লতায়ে
সেবার গ্রামে তখনক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব পর কতবার সে শুনিরাছে। জানাণার ধারে
গাফলেই বিপাণাকী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে।
দেবী বিপাণাকীকে একটীবার দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সে বনের পথে তরত গুলকের গতা পাড়িতে—
সেই সময়—

খুব হুল্লর দেখিতে, রাতা শাক পাড়া সরনে, চাতে পলার
মা-তর্পার মত তার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অণু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বয়স?

একটু পরে তাহার মনে হয় সে ঠাকুরদানার বেড়ের
কাঁপিতা—গুলিবার চেষ্টা করিবে। সেপের খোলে ছেঁচে
চেলির টুকুরা বাধা চাষির পোছা থাকে, সে টানিয়া বাধির
করে। কিন্তু অস্ত্রাভিন্নের মত অনেক গুলিখাট করিয়াও
কিছুতেই কোনো চাষিটাই সে লাগাইতে পারে না, অণুও
চেলির টুকরা লাগাবনে বাধিয়া সে বিছানার থিরা শোর।
এক একবার কিংকিরে গাওঁয়ার কত কি লতাপাতার তিত
মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক হুপুং বেগ। অনেক দূরে
কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাওঁ-চিল টানিয়া
টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রাম খানিক অতীত ও বর্তমান
সমস্ত ছোটো খাটো ছাং ছাং শান্তি স্বপ্নের উর্কে লত-
মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য, নীল নির্জন আকাশপথে এক উড়াস,
গহ-বিবাহী পখিক-দেবতার হুঙ্কারে অবলান দূর ভীতে
দূরে মিলাইয়া চলিরাছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইতে
উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানাণার বাহিরে
পাড়া বনটার ছায়া পড়িয়া আনিরাছে, বাপগাছের আগার রাতা
রোষ। প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভব
বৈকালটিতে, নির্জন বনের দিকে চাইয়া তাগার অতি অদ্ভুত
কথা সব মনে হয়। অণুসব বৃষ্টিতে মনে চরিত্রা ওঠে, মনে
হয় এ রকম লতা পাতার মধুর গন্ধভরা দিন শুনি হওয়া
আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব যেনেব
অজুত মানবের অশ্লিষ্ট বৃত্তি আসিয়া এই দিন শুণিক
ভবিষ্যতের কোন্‌ অনির্দিষ্ট মানবের মাথার ভরিয়া তোলে।
মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বৃষ্টি পড়া
গাইবে না—একটা বড় কোনো মানব ইচ্ছার পেরে
অপেক্ষা করিয়া আছে যেন। এই অপরূহভঙ্গির লত



আজ্ঞা দানী, তপস্বিচিত এই অমল-ভরা বহরশী বনটার
সঙ্গে কত রক্তময়, মন্ত্র শেখের বাকী যে চড়ানো আছে !
দানবাদের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটাও বিকে চাটখা
সে সোঁপিতে পার এক তখন বোরের উদারতার সুখোদ
শাইনা— কে গ্রামী একজন তাহার চক্ষু কবচকুণ্ডল
মাগিয়া লইতে ছাত পাতিয়াছে, পিটুনি-গোলা পান করিয়া
কোণাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুকের কাছে 'তখ
খেয়েছি' 'তখ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে,—ঐ সে
শোড়ো ভিতর বেলতলাটা—ওই খান্নেই তো শরণধা পারিত
প্রবীণ বীর উদ্ভেদের মরণহস্ত ওঠে তীক্ষ্ণ বাণে শূন্য
কুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতীভায়া দিকন করিয়াছিলেন ।
প্রথম যৌবনে মরণ-রটের কুহুমিত কাননে বুগা করিতে
গিয়া রাজা মনরথ দুগুপ্তের যে অল-আহরণত দরিদ্র বালককে
বধ করেন—সে খটখাছিল ওই রাহু দিগিরের বাগানের বড়
কান গাছটার তলায় যে ডোবা ?—তাহারই ধারে ।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাভাঙলা সব
চলবে, মলাটটায় ধানিকটা নাই, নাম লেখা আছে,
'বীরসেনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার
দিকের পাভা শুনি ছিঁড়িয়া গিয়াছে । বইখানা বড় ভাল
লাগে—তাহাতে 'পে'পড়িয়াছে :—

অদূরে দেখেছ হুং ; সে হুংের তীরে
রাঙারদী একজন বান গভাগড়ি
তবউক !...

কুসুমটাই ত্রৈলোক্য দিন মাথের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে
যে পুরানো, মজা পুস্তকের ধারে সে বন-ভোজন করিতে
গায়—কেউ জানে না—চাট খারে বনে ঘেঁষা সেই ছোট
পুকুরটাই মনোভারভের সেই বৈপারন হুং । ঐ নির্জন
মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভয়ঙ্কর, অবমানিত বীর পাতে একা
একা, কেউ দেখে না, কেউ বোঁধ করে না । উত্তর
মাঠের কণা বেগনের ক্ষেত হইতে তৃণপেথা ফিরাই। আসে
কেউ থাকে না কোনো দিকে—সোনাতাঃ মাঠের পারের
মনাবিক্ত বন্যতপ্ত, অজানা ঘেঁষে চরমহীন রাত্রির ঘন
অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে তখন হাজার
হাজার বছরের পুরাতন মানব বেদনা কখনো বা দরিদ্র

পিতার প্রবন্ধনাত্মক অথবা বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক
ভাগ্যহীন, নিঃসঙ্গ, অসুখের রাক্ষুসের ছবিত্তে তাহার
প্রবন্ধমান, উৎসুকমনের লগ্নাকৃত্তিতে ভাগ্যত সার্পক হয় ।
ঐ অজ্ঞাত নামঃ লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে
কতদিন যে তাহার চোখের পাভা ভিড়িয়া মাগিয়াছে !

তাহার বাবা বাড়ী নাই । বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক
মনে ঘরে বসিয়া মগুর খুলিয়া পড়িতে হয় । একেবারে বেলা
শেষ হইয়া যায় তবুও ছুটী হয় না । তাহার মন ব্যাকুল
হইয়া ওঠে । আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভরায় আর্ধ্য
মুখস্থ করিবে ? আর আর বুকি সে খেলা করিবে না ? খেলা
বুকি আর আছে ? বাবার উপর ভারী রাগ হয়, অভিমান
হয় । হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটী হইয়া যায় । বই মগুর
কোনারকমে তৃণ করিয়া এক কাগজের ভেলিয়া রাখিয়া
ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুঁপিতে সে নাড়িতে থাকে । অপরূপ অসুত
বৈকালটা...নিবিড় ছায়াভরা গাছপাশার ধারে খেলাঘর...
শুকল-পতার তার টাঙানো...খেজুর ডালের দাঁপ...বনের
দিক থেকে ভাঙা ভাঙা পক্ষ বাহির হয়...ভাঙা বোদটুকু
ভোমরাগুণের পোড়ো ভিটার বাতাবী মেঘ গাছের মণ্ডায়
ভিক্ ভিক্ করে...চক্চক বাদামী হাংর ডানগ্রাণা তেড়ে
পাখী বনকলনী ভোগে উড়িয়া মাগিয়া বলে... তাহা মাটির
গছ...ছেলেমানুষের অগত তরপুর আনন্দে উড়িয়া ওঠে...
কাগজকে সে কি করিয়া বুঝিবে সে কি আনন্দ !

সন্ধ্যার পর দর্শনজা তাত চড়াইয়াছিল । অপরূপ বাগায়
মাগুর পাতিয়া বসিয়া আছে । পূর্ব অন্ধকার, একটানা 'কি'
কি' শোকা ভাকিতেছে ।

অপরূপ দিভাগা করিল—পূজার আর কদিন আছে না ?
হুঁবা বীট পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল । বলিল—
আর বাইশ দিন আছে না না ?
সে কিংবা ঠিক করিয়াছে । তাহার বাবা বাড়ী মাগিবে,
অপরূপ, মাগের, তাহার মগ্ন পুস্তক কাগজ, তাহার ওত
আলতা ।

আলকালে সে বড় হইয়াছে বসিয়া তাহার মা অস্ত্র শাড়ার
গিয়া নিম্নস্থণ খাইতে দেহ না । কতদিন যে সে কোণাও

নিমন্ত্রণ বাব নাই। লুটি বাইতে কেমন, তাকা সে জাহ
ভুলিয়া বিয়াছে। হুটুহুটে কোণাসরী পূর্ণিমা ত্যাগ-
তরা রাজে বাপবনের আলো-ছায়ায় জাপ-বুনানি পথ বাহিয়া
সে আগে আগে পাড়ার পাড়ার বেড়াইয়া লক্ষীপুতাব বই-
বুড়ি ভাঙা আঁচল তরিয়া লইয়া আসিত, বাড়ীতে বাড়ীতে
শাঁক বাজে, পথে লুটি-ভাঙার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার
কেউ পুজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে
পাঠাইয়া দেয়, সেও অনেক বই-বুড়ি আসিত, তাহার মা ভই
দিন হরিয়া তাহাদের গলপান লাইতে দিত, নিজেও বাইত।
সেবার সেজ ঠাকরুন বলিয়াছিল—ভরুর লোকের মেয়ে
আবার চোখা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে বই বুড়ি নিয়ে
ফেঁদাবে কি? ও সব দেখতে পারাপ...ওরকম আর পারিও না।
বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না।

—তর্গা বলিল—মা তাস খেলবে?

—তা যা ও ঘর থেকে তালটা নিয়ে আর—একটু
খেলি—

তর্গা বিম্বদ্রুখে অপুর দিকে চাহিল। অণু হাসিয়া
বলিল—চল আমি বাড়ীভি—

তাহাদের মা বলিল—আঃ হা, মেয়ের ভর দেখে আর
বাঁচিলে—সাগরদিন বলে হেঁটু মাটি ভগ্নর ক'রে বেড়াবার
বেলা ভর লাগে না আধ রাত্তিরে এঘর থেকে ওঘর যেতে
একবারে সব ফাঁকট!

বৃন্দের বাড়ী হইতে আনা অণুর সেই তাল ভোড়াটা।
তাল খেলায় তিনজনের কুতিবই সমান। অণু এখনও সব
রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাল বিপক ঘরের
খেলোয়াড় হাকৈ দেখাইয়া বলে—এটা কি হুইত্তন—খালো
না মা? পরে সে বলে—তাল খেলতে খেলতে সেই গরটা
কলো না—সেই গমলভার গরটা? খানিকটা খেলা
অগ্রসর হইতেই সে হঠাৎ সরিয়া গিয়া মাঝর কোলে মাথা
রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গারে হাত বুলাইতে
বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছকাটা খলো
না মা—সেই শামলতা বাট্টা বাটে মাটিতে লুটাবে কেন?
তর্গা বলে—খেলার সময় ছকা বুলে খেলা হবে কি ক'রে—
ওঠ অণু—

তাহার মা মংগেই যায় আর ছেলের দিকে চাহিয়া
দেখিতেছিল—সেদিনকার সেই অণু—আর চান আর চান
লোকনের কপালে জী-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে আর বার
কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অতুলিবহ হস্তে
দিকে ফুঁকাইয়া দিত—সে কি না আজ তাস খেলিতে
বসিয়াছে! তাহার মায়ের কাছে দৃষ্টটা অণুক, বড় অহিম
ঠেকে।

তর্গা বলে—আজ কি হয়েছে জানে না মা—বলবো
অণু? বলি?

তাহার মা ভিজ্জা করে—কি হয়েছে?...

—বলবো অণু? এই—

—হাঃ তা হোলো তার গল্প না আজি করবো—বলে
তাহা—

অণু মুখে বলিল বটে কিন্তু মিসিকে সে আজকাল
বড় ভালবাসে। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল
কলঙা লুটনা লইয়া পানাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি
লাগদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে
আঁচলে বাঁধিয়া এক রাপ মাকাল কল আসিয়া তাহার সমুখে
পুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন হোলো তো এখন?
বড় যে কাঁদছিল সকাল বেলা? সে সকাল কিসে সে বৌ
আনক লাইয়াছিল—মাকাল কলঙা হইতে কি মিসির
মুখের বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের সমস্ত ভরা
নিখ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

—চকার খেলা অণু বুকে মুখে খেলিঙ্গ?—তর্গা
মহাপুসির লিহিত তাল কুড়াইয়া লজাইতে লাগিল।...

—কি কুলের গন্ধ বেরছে না মিসি?

তাহাদের মা বলিল তাহাদের ভোঁসমশারদের ভিটার
শিঙনে ছাতিম গাছ আছে, সেট কুলের গন্ধ। অণু ও
তর্গা চকেনেই অগাধের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা ওই
ছাতিম তলার একবার বাথ এসেছিল—খেলছিলাম না?
কিছ তাহার মা ভাড়াভাড়া তাস খেলিগা উগ্রিয়া বলিল—
ঐ হাঃ, তাত পড়ে গেল, বরাগক খেরিয়ে—ততটা নামিয়ে
গাড়া কচি—

খাইতে বলিয়া গুণা বলিল—পাতাল কোঁড়ে তরকারীটা
কি কুম্ভের খেতে চাচ্ছে মা? গুণে সঙ্গে অশুও বলিল—
বাবা! খেতে দিক মাংসের মত, না দিবি? পাতাল
কোঁড়ে এক আখলাও কত কুটে আছে মা, আমি তারি
বাগ্গের ছাতা। তাই তুলিলে—উভয়ের উদ্ধৃষ্ণিত প্রাণদিত
বাগ্গে সলজ্জায় বুক থেকে ও তুলিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি
খার উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়ীতে
ভাতে রাখিতে ভাতের গের ঠাক্করকে ডাকুক না দেখি
একবার তাহাকে রাজা কাককে বলে দেওয়া কখনকে সে—
হাঁ! সলজ্জায় বলিল—অপুর ভাতে জল ঢেলে দে চুঙ্গা,
ওকি ছেলের কাত? ই তাহার মাথ খানে দুখ ধোর?
রাতট রাত্রে কুমি ওই পথের উপর—

অশু কিং আর এক পাও মজিতে চাহেনা, লম্বে
সেই ভায়া প্যাঁচিলের কাক অছকায় বীশবন ফেড়
ভরনের অছকায় বিঁড়ের বিচির মত কানো। শোড়ো
হিটেবাড়ী...বাখ...মারও অজানি কত কি বিভীষিকা! সে
বিকতে পারেনা যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের
উপর আঁজানটাই কি এত বেশী?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। ত্রাণি গভীর
৩য়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে চেমন্তের আঁচলাগা শিশিরার
নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। রবা রাতে বেগুনটীরে রুক
পক্ষের টানের প্রাণ জোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত পাছপায়ার
ডালে শতায় চিক্চিক্ করে। আলো আঁধারের অপরূপ
মায়ায় বনপ্রান্তে ঘুমর পতীর খেপের মত তরত গুর।
পূর্ণ পূর্ণ করিয়া ওঠাৎ রাত্রে এক কলক হাওয়া বৌদালির
ডাল চুপাইয়া তেল্যকুণ্ডে কোণের মাথা কাঁপাইয়া
বহিয়া যায়।

এক একদিন এই সময় অশুর ঘুম তানিয়া ধাইত। সেই
দেখা বেন আনিয়াছেন সেই প্রানের বিকৃত অধিষ্ঠাত্রী বেদী

বিশালাক্ষী। পুলিশবাগিনী ইজ্জামতীর ভাগিনের রোগার মত
বৃদ্ধ অলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাবায়, কতদিন
আগে বাহাঘের চিল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁরের প্রাচীন লপ্তপর্প-
টাও হরততা বাঘের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী
দেবার মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল ফল নৈবেদ্যে পুতানিত,
আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে? তিনি কিন্তু এ
গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিভতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে
ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহবশিকমের ঘোষা শুনা করেন,
জোৎস্না রাতের শেষ প্রহরে ছোট ছোট মৌমাছিরে চাক
গুলি বুনা-ভাঁওরা নট্‌কান, পুঁজে ফুলের মিষ্ট মধুতে
ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন কোণের কোণে বাসক ফুলেরমালা
লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল
কোথার গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইজ্জামতীর কোন্‌ বাকে লব্ধ
শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল পাপড়ি কলমী ফুলের দল
ভিক্ত লাকাইয়া তুলিতেছে, ঠাঁটা গাছের ডাল শালের মধ্যে
ছোট খড়ের বাগায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়ের কোথায়
ঘুম তাহিয়া উঠিল।

ঊরু রূপে মিত্র মাগোব বন বেন ভরিয়া গিয়াছে।
নীরবতার জোৎস্নায় হুগড়ে, অস্পষ্ট আলো আঁধারের মায়ায়
রাত্রির অপরূপ ঐ।

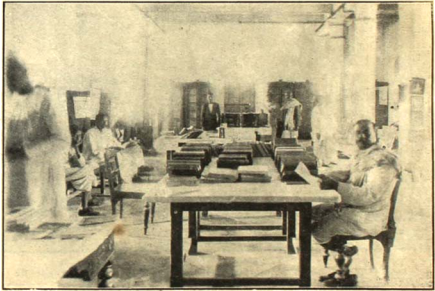
দিনের আলো ফুটিবার আগেই বনপ্রান্তী কোথায় মিলাইয়া
বান, অরূপ চক্ৰবর্তী পর আর তাহাকে কেত কোনদিন
দেখে নাই।

লাইব্রেরী আন্দোলন

শ্রীশ্রীলকুমার ঘোষ

লাইব্রেরী আন্দোলন প্রধানত শিক্ষাবিস্তারের লইয়া থাকিলে চলিবে না। যে আদর্শ সমাজের মধ্যে আন্দোলন। যাহাতে শিক্ষার বীজ জনসাধারণের মনে অতি সহজে বপন করিতে পারা যায় তাহার প্রচেষ্টা লাইব্রেরী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষিত সমাজে নানা তৎপত্তি চলিতেছে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে অল্প আয়সে লাইব্রেরীর পাঠ্যো

পুস্তকাদি সংগ্ৰহ করা যায় তাহার প্রচেষ্টা চলিবে না। যে আদর্শ সমাজের মধ্যে লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, তাহা পরিপূর্ণতার জন্য লোকমতের প্রয়োজন। যে প্রথা দেশের মধ্যে প্রচলিত তাহার কামনা গুরুত্বপূর্ণ। তাহা সর্বদা চিন্তিত উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাইলে, জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা একান্ত বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরী আন্দোলন দেশের মধ্যে চলিতে



লাইব্রেরী প্রদর্শনী

শিক্ষা বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্য সচা ভাতি যাহা এই এখন বিশেষ দৃষ্টিতে।

কোন আদর্শ দ্বারা কার্য করিতে হইলে তাহা একাকী করাও চলে, পরকে লইয়া করাও যায়। তবে যে কার্য পদ্ধতি লইয়া, তাহা সুসঙ্গত করিতে হইলে একাকী তাহা

হইলে আমাদের মূলমন্ত হওয়া আবশ্যিক। যে কোন আদর্শ কোন এক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তাহা বেদন কার্যকরী হয়, যতই চেষ্টা যতই বল কাহনা করা চাহা না মাত্র। এই জন্য দেশে যায় সমস্ত চেষ্টা Probelian Movement এর



কণ্ঠশঙ্করণ kindergarten পদ্ধতি দ্বারা বালক বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারণার চেষ্টা করিয়া ছিল। এই সমস্ত Shakespeare Society একত্র সম্মেলনে অমরকবি শেকসপীরের গ্রন্থাবলী আয়োজনার উন্নয়ন ও ইংলণ্ডের বোড়াল পড়াশোনার পৌরসভাভিত্তিক অসীমমতিয়া জাগ্রত রাবিত্তে বিশেষ বস্তু। আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশনও সম্ভবতঃ তাই চেষ্টা করিতেছে তিলে লাইব্রেরীর সাহায্যে অংশমত জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা উত্তেজিত বহিঃ

পাঠ বঙ্গের বাবু মেসের মধ্যে লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারই অঙ্গবৃত্ত হইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ বাঙ্গলা দেশে লাইব্রেরীগুলির অবস্থার উন্নতিবিধান ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ভার লইয়াছে। যেখানে লাইব্রেরী বা গ্রন্থালয়ের সংখ্যা কম সেখানে গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা এবং যেখানে গ্রন্থালয় আছে, তাহার পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা গ্রন্থালয় পরিষদের কৰ্ত্তব্য। ইহা কার্যে পরিণত করিতে



ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ও আমেরিকা হইতে সংগৃহীত লাইব্রেরী আন্দোলন লব্ধে গ্রন্থ ও চিত্রাদি

করা যায়। লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার সমস্ত আমাদের দেশেও গ্রন্থালয় পরিষদ (Library Association) বিশেষ প্রয়োজন।

বাঙ্গলা দেশে লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত অল্পদিন হইলেও করোয়া, মহাপুর, মাদ্রাস প্রকৃতি দেশে ইহা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। “নির্বিল ভারত গ্রন্থালয় পরিষদ” নাম দিয়া ভারতবর্ষের বাঙালী গ্রন্থালয় গুলির অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি প্রায়

হইলে, প্রতি মেলায় একটি মেলা গ্রন্থালয়পরিষদ স্থাপন করা অসীম আবশ্যিক। ঐ মেলা গ্রন্থালয়ের কার্য হইবে মেলায় মধ্যে কতকগুলি লাইব্রেরী বা গ্রন্থালয় আছে, তাহার সংখ্যা সংগ্রহ করা, তাহাদের আর্থিক অবস্থা লব্ধে জ্ঞাত হওয়া আর কোথায় কোথায় নতুন গ্রন্থালয় (Library) বা পাঠাগার (Reading Room) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করা। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের অধীনে অল্পনা চারিটি মেলা গ্রন্থালয় পরিষদ

কাগজ করিতেছে, একটি ছগলী জেলার, একটি সৈমনসিংগে, একটি নোয়াখালিতে আর একটি ২৪ পরগণায়।

লাইব্রেরী আন্দোলন এই কথায় দেশবাসীকে জানাইতে চায় যে লাইব্রেরীগণিকে শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে চাইবে। পড়া শুনার চর্চা, গবেষণার কার্য প্রভৃতি, যে কোন জাতিবা বিধের সন্ধান বলিয়া বিদ্যা সাধারণকে সাধারণপ্রদান প্রভৃতি লাইব্রেরীর অন্ততম কার্য হওয়া উচিত। নাগালে পাঠ্যক্রম শুদ্ধি পায়, সে ক্ষত্র নান।

মহারাষ্ট্রের Library Department আমেরিকার মত, প্রত্যেক লোকের বাঁকী বাঁকী পুস্তক সরবরাহ করে। বিনা আশ্রয়ে, বিনা পরদায়, যের বসিয়া যাওয়া বই পায়, তাহার্য্য বই না পড়িয়া ছাড়েন। এই রূপে ক্রমশ পাঠের বেনা কমিয়া গেল, তাহার্য্য আপনই পুস্তকশাঠের ব্যবস্থা করিবে এক ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, পুস্তকস্তানের পুস্তকপাঠে উৎসাহ দিবে।

মহীশূর রাজ্যের সাধারণ লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আ



মহীশূর সাহিত্য পরিষদ

২৪০১ অব্দে মার্চ মাসে তোঁহ, কলিকাতা।

সকাল চিত্তাকর্ষক ছবি, chart, map, motto ব্রহ্মণঃ। যাহার লাইব্রেরীগণির দেওয়াল পরিবেশিত করিয়া থাকে। যেন তাহার্য্য অলঙ্কার পাঠক পাঠিকার গবয় আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্যপণে চেষ্টা করিতেছে। সে mottoগুলি লাইব্রেরীর সভ্যদের স্মরণ তাহার্য্য বলিয়া দিতেছে—“যদি আনন্দ চাও, বই পড় আনন্দ পাইবে।” “যদি শিক্ষা চাও, বই পড় শিক্ষা পাইবে।” “যদি মাহুদ হইতে চাও, বই পড় মাহুদ হইবে।” বাক্যাদি-

চমকপ্রদ। দেখানে লাইব্রেরীগণিকে একত্র একত্র আকর্ষণের কেন্দ্র করিয়া রাখা চাইতেছে যে, সকলেই মন ঐনিকে আকৃষ্ট হয়। অতি সহজে ঐখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা চাইতেছে। বাঙ্গালোয়ের Central Public Libraryতে যে হাজার হাজার বাধ্য আছে, তাহা অনেক লাইব্রেরীর আদর্শ হইতে পারে। তাহার্য্য আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রকার লোককে ছবিয়া দিবার ক্ষমতা লাইব্রেরীটি এই করটি বিভাগে বিভক্ত :—পাঠাগার বা Reading



Room; Lending Section; Childrens' Department (হস্তপুস্তক বিভাগ); Ladies' Department (মহিলা বিভাগ); Reference Section; এমন কি মানসগার ও ভোজনালয় পর্যন্ত মহাপুত্রবাণীনের শিক্ষাপ্রচারস্বত্বা এত প্রবল যে তাঁহার বিববিভাগের মাতৃভাষা Vernacular language-এর সাহায্যে শিক্ষা প্রচার করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন।

আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণের

পায়েন, তাঁহারাই সাধারণ পাঠ্যপাঠ্যে কার্য করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

প্রাচীন পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, এখনও দেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উচিত মত রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, অল্পদিনের মধ্যে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। স্বাভাবিক প্রকৃতির দ্বারা পাত্তুলিপি ক্ষতি লগ্নে হকিত হওয়া উচিত। স্বাক্ষরিতপত্রের দ্বারা আশ্রয়ের উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণ পাঠ্যপাঠ্যগুলি যদি একতরফে রাখা হয়, তাহা হইলে অনেক মূল্য



বরোদা গ্রন্থাগার পরিদর্শনের লাইব্রেরী

প্রদর্শনীর অন্তর্গত বরোদা-বিভাগ

জানকৃষ্ণ বাবু করিয়াছে। সঙ্গসাধারণের সুবিধামত classification-এর পদ্ধতি এবং বিবিধ অঙ্গণের পুস্তক-বিভাগ সম্বন্ধে নানাতর পক্ষেপাদুলক পুস্তক তাহারাই প্রকাশ করে। এতদ্বিধ প্রতি মাসে নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা পাঠাইয়া তাহাদের দ্বারা লাইব্রেরী-গুলিকে পুস্তকনির্মাণকর্মের বর্ধিত লাভসা করিয়া থাকে। লাইব্রেরীপরিচালনা ক্ষেত্রে মূল্যবোধিত করিবার ক্ষমতা, নিরাসিতরূপে লাইব্রেরীমানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাহার হস্তপুস্তক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, পরোক্ষ উন্নতি হইতে

এই কারণে কল হইতে রক্ষা পায়। কোথায় কোন গ্রন্থে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা যেমন বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি সাধারণের গোচরে করিতে পারা বা পুনরায় প্রকাশিত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ততোধিক লোকহিতকর। এই সংবাদসংগ্রহ ও প্রকাশের ফলে সম্ভবপর হইতে বিশ্বগুণী প্রয়োজন মত পড়াশুনা করিয়া সেইগুলি হইতে নানা তথ্য আহরণ করিতে পারেন। সেগুলি পুনঃপ্রচারে উত্তমের দ্বারিদ্র সম্বন্ধে সম্বন্ধ বুঝিয়া যায়। নব জীবন লাভ

করিয়া উভয় নানাবিধ জ্ঞান রত্নের অঙ্গুলী আকরত্বকে জনসাধারণের অন্বেষ্য কলাপণাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁপি, পাণ্ডুলিপি, ভ্রাম্যমাণ পুস্তক প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া ও সর্বত্র সংরক্ষণ ও সুবিধামত প্রকাশ করিয়া, জ্ঞানবিস্তারকার্যে লাইব্রেরীগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

লাইব্রেরীর কাজ শড়াপ্তানার মেনা ভাগানো। যাহার যেমিত্তে কটি সেট মত পুস্তক তাহাকে দিতে পারিলে,

অনুমানমাত্র প্রায় দুইবিংশতি লাখের সম্পত্তি Behaviourist আধা লাইব্রেরী, উদ্ভাৱণ ও এ সিদ্ধান্তের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। অতএব বৃদ্ধিতে শাখা বাধ, দৃশ্যকর্মের পাঠ্যপুস্তক বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে, যে সকল পুস্তকে পুঁপি-লিখিত প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যার বিশদ রূপে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত করিতে পারিলে, দৃশ্যকর্মের মূল লাইব্রেরীর মেনা কোনও মতে কাটাটকা উদ্ভিষ্টে পারিলে না। বিতরণ ব্যক্তিকে যদি লাইব্রেরীস্থান



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৃহে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিত্ব গ্রন্থের শিল্প-প্রদর্শনী

জনসাধারণ লাইব্রেরীর দিকে ছুটিয়া আসিলে : আশ্চর্য লক্ষ্যবিধান যাহার নিকট হইতে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, মানব-মন সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকর্মের কাব্যকলা, সাহিত্যিকতা, উদ্ভাৱণ, প্রমাণজ্ঞা, অঙ্গুলীভিৎ প্রভৃতি মনোবৃত্তির অধিক বশবর্তী বলিয়া মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মানব-মনের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া

করা যায়, তাহা হইলে অঙ্গুলীভিৎ আগন্তকের পাঠ্যজ্ঞা, লাইব্রেরীতে আসিলে, ক্রমশঃ বাড়িয়া বাটবে কোন পুস্তকে কি কি সংবাদ পাওয়া যায়, সাধারণ তাহা লাইব্রেরীস্থানের জানা যেতল প্রাণোজন, কোন বিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্ত করিতে হইলে, কোন কোন পুস্তকে তাহা লাইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবার্য্য, লাইব্রেরীস্থানকে সাহায্য লাইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবার্য্য, লাইব্রেরীস্থানকে সাহায্য লাইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবার্য্য, লাইব্রেরীস্থানকে

গীতাঞ্জলি

শ্রীনবেন্দু বসু

পর্যায়কণ্ড অঙ্কিত চক্রবর্তী তাঁর সমালোচনার
ঐতাল্লিক কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে গ্রহণ করতে চান
নি। তিনি ঐতাল্লিকে দেখছিলেন বিনেব ক'রে দর্শকরা

Sacred Poetry চাষে। কিন্তু এই সঙ্গীতমণ্ডিতে
কাব্যবসের বে বৈচিত্র্য দেখতে পাই তা থেকে মনে হয় যে
গীতাঞ্জলি বৃত্তি কবির কল্পনাকল্পনহারাের উচ্চতম
পারিজাত। সে রস তুখু বিচিত্র নয়, বড়ই গুণসমৃদ্ধ।
লেখার নাম দেবার অধিকার লেখকের নিজের। পাঠক সেই
নামাত্রণারী পরিচয় গ্রহণ করতে বাধ্য। গীতাঞ্জলি নাম
কবির দেওয়া, তবে গীতাঞ্জলি কল্পনাপ্রিয়ণে কাব্যাকল্পনালিও
বটে। গীতাঞ্জলির গানগুলিকে চুটি গ্রন্থান অংশে ভাগ করা
যায়: সঙ্গীতগ্রন্থান এবং কাব্যগ্রন্থান। তাবের প্রেরণা
এক হ'লেও গানগুলিতে কাব্যগ্রন্থপন পার্থক্য আছে। এই
ডই গ্রন্থান অংশের মধ্যে আবার তাবের ঐক্য, ভ্রম, আর
ত'ণের বিভিন্নতা অল্পগারে আরো লক্ষ্যতর শ্রেণীবিভাগ
আছে। ত'ণের বৈচিত্র্যই গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য।

এ তাবে শ্রেণীবিভাগ করা যে কবির কল্পিত বা অর্জিত
তা বলতে চাই না। তবে যেখানে বিস্ময়গী সমালোচনার
সমগ্ররণের সমাধান হয় সেখানে সেটার প্রণয়ই ব্যাকরণ।
বিশেষত বর্তমান কেরে কবির ভূমিকা। এই:—“এই প্রণয়
প্রথম কেরকট গান পূর্ণে অল্প ডই একটি পুত্রে প্রকাশিত
হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে
পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি তাবের
ঐক্য থাকে সমস্তপন মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই
পুত্রে একত্রে বাহির করা গেল।” ১০১৭ সালের এই
বিজ্ঞাপনই ১০২১ সালে উদ্ভিগ্নান গ্রন্থ থেকে প্রকাশিত
চতুর্থ সংস্করণ গীতাঞ্জলিতে দেওয়া হয়েছে, একা ঐ পদ্যপট্ট এ
প্রাথমে ব্যবহৃত হয়েছে।

সঙ্গীত আর কাব্যের প্রকৃতি এবং ব্যক্তিগত পার্থক্য
আলোচনা ক'রে দেখলে উপরোক্ত অংশবিভাগের পার্থক্যতা
সহজেই বোকা যায়। স্মরণার্থে অবজ্ঞিত তাবাবেষের
নিরলস মধুর বিকাশকেই সঙ্গীত বলি। তপার সাধ্যকে
চিত্তাঙ্গাঙ্গে সে তাবের প্রকাশ হ'ল কাব্য। গানের লেখা
কাব্যগুলি এই চুই গাঙ্কোর সংযোগস্থল। তবে লিখিত তাবের
সাধ্যকে প্রকাশ শেতে হয় ব'লে সেই রচনা নির্দিষ্ট সীমারেখা
যেনে বেতে চায় না। কখন এদিকে কখন ওদিকে কোঁক
যেয়। শ্রেণীবিভাগের এই ভিত্তি। আরো স্পষ্ট ক'রে বলি।

তাবপ্রকাশের দিক থেকে গান কবিতার পূর্ণাংগ।
অন্তএব সব গানের মধ্যে কবিই না থাকতে পারে কিন্তু সব
কাব্যের মধ্যে গানের অবস্থা নির্দিষ্ট আছে। সঙ্গীততাব
কাব্যের প্রাথমরূপ। তাকেই পরিচ্ছন্ন মান ক'রে লিখিত
আর পঠিত কবিতার সৃষ্টি। কবিতার মূর্ত্তনা গানের সঙ্গার
ভিত্তরূপ। কবিতার ছন্দ, মিল, গতি প্রভৃতিতে সে মুক্তনা
বা সঙ্গীততাব পরিণত হয়। তাবমাত্রকেই প্রকাশকে সঙ্গীত
বলি না। যে তাবের উচ্চারণে আমাদের মনে একটা
আবেগের স্পন্দন জাগে, আর হর্ষ, শোক, আশা, নিরাশা,
সংসার, ভয় প্রকৃতি অল্পবৃষ্টিপত্ন রূপের রূপ হয়, সেই তাবই
সঙ্গীতগ্রন্থ। আর মাত্রের স্টই স্বরপ্রাণে এই স্পন্দনের
অল্পবৃষ্টিকেই সঙ্গীত বলি। আবার এই স্পন্দন বা উদ্ভাবনা
যখন তাবের সাধ্যকে অস্তের মধ্যে প্রকাশিত করবার চেষ্টা
করি তখন সেটা তাবের কাব্যরূপ। এই কাব্যরূপ দিতে
দিয়ে কবি বাইরের অল্পবৃষ্টি চাকলোর মধ্যে গুলিয়ে দিয়ে
অল্পবৃষ্টির সাধ্যকে ভিতরকার স্পন্দ সঙ্গীত রূপিত দেখতে পান।
তখন উল্লেখ করনা থাকার মোহনোর মধ্যে শব্দে অল্প
হ'লে আসে। প্রকাশ কবিতা বৃষ্টি সঙ্গীত আকারে বিলাস
করতে থাকে। এই তাবে সঙ্গীতের স্মরণবিজ্ঞিত অংগটি

কায়ের হেতুগুরুত্ব অবগাম করে, এবং বাতাপরম্পরা দিয়ে পুষ্করোত্তীর্ণ শব্দের গান পুরণ করা হয়। কণ্ঠের বাহুল্যে গানের উপলব্ধিটুকু ব্যক্তিগত হয়। সেই সাহায্যে আনন্দের চিত্তারাজ্যে সুরবোধ আর সৌন্দর্য্যাহুত্বের একটা সাক্ষ্য তোলে। বাক্যযোগ্যতার সমীক্ষিত মনে একটা কনিষ্ঠকল্প অল্পবয়সী আগার আর মণ্ডের অল্পবয়সী প্রবেশে বা কিছু বিচ্যুতি, বা কিছু মনন, বা কিছু স্মরণ, সে ভাবগুলি বড়ই বিকাশ পায়। কাণ্টাইল বলেছেন গানময় চিত্তাই কাব্য।

অতএব যেখানে পাই যে গান আর কবিতা ভাবাবেগের গুণী বিভিন্ন প্রকাশরূপ। এখন ভাবভরতের উচ্ছল, সাবলীল আশোজন আর প্রাবলী বোধ ভাবের বাঁধের মধ্যে আটক হ'য়ে একটা দ্বির বাহু রূপ পায়, সেই পুরুষের গান কবিতার রূপান্তর গ্রহণ করে। গানের রূপ ভাবের নিত্যই স্নানচরিত্র রূপ, বা তার আকাশ ও গঠনপ্রকৃতি। কবিতার রূপ সামাজিক রূপ। তাতে বসন ভূষণ আছে।

সঙ্গীত আর কাব্যের এই প্রকৃতিগত প্রভেদটুকু স্বীকার ক'রে নিজেই গানেরচিত্রিত গানের কথাগুলি রচনা করেন। গানের কথা সুরের অবলম্বনস্বরূপ, তার আত্মপ্রকাশের সহায়ক মাধ্যম। সুরতরঙ্গ মূল ভাবাবেগের নয়, আত্মবর্ণনাত্তেও সুরের কাক চলেতে পারে। মাত্র সঙ্গীত-ভাবটুকুকে সার্থক ক'রে তুলতে গানের কথাগুলিকে কাব্য-রূপে ভাষাভাষ্য করবার ভেতন গঠোৎসাহ নেই। প্রকৃত অনিচ্ছানীতির ভাব একটি দৃশ্য থেকে উদ্ভাসিত হ'য়ে আর একটি দৃশ্যকে স্পর্শ করতে গিয়ে স্বেচ্ছাচল ভাবা ও অলম্ব্যতার রূপের বঁধার মধ্যে আত্মহারা হবার অসম্ভব পায় না। গানেতে মূলভাব বখালম্ব্যব পোড়তেই বাস্ক হয় এবং শব্দবান্ধব নানা আবেদনের মধ্যে তার পুনরুৎপত্তি হ'তে থাকে। গানের প্রধান পরিচয় ভাবের নিরলস নিশ্চল রূপটিকে স্তব্ধ ক'রে তোলোতে। কবিতায় ভাব নিজেতেই নিজে বিকশিত নয়। সে মাত্রবোধে জীবনকে আশ্রয় ক'রে তাকে নানা রূপে, রূপে, গন্ধে, স্বর্ণ শাঙ্খের দেয় এবং জীবনের অবস্থাক্রম আর ঘটনা-বিশৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে আনানোনা, গুণানানো করতে থাকে।

অনেক গান চোখে পড়ে যেগুলিকে গান না বলে গুণবদ্ধ কবিতা বলাই সম্ভব। যেমন, 'যম তমস্ফুট অমর ধরণী' নামক কবিতা দ্বি এল রায়ের জনপ্রিয় গানটি। এর কথাগুলি বর্ণনাপূর্ণ এবং সমগ্র গানটি বিচিত্রমূলক কবিতা। কোন অবচ্ছিন্ন আবেগের ক্ষমিত প্রকাশ এতে নেই। অতএব বলতেই হবে যে এটি গানটি সঙ্গীত অঙ্গলোকাবাসিন্দার অধিকতর সম্পন্ন, যদিও সুরম্যযোগে যে গানটি গাওয়া চলে না তা নয়।

আশা করি এতকণে দেখাতে পেরেছি যে গীতাঞ্জলির গানগুলি মোটের ওপর বর্ণনাত্মকগোষ্ঠিত হ'লেও সেগুলিকে রূপভেদে শ্রেণীবদ্ধ করা অসম্ভব নয়। সেই অঙ্গুসায়ে প্রথমে সঙ্গীতপ্রধান গানগুলির কথাই বলবো। এগুলি যে পরিমাণে কাব্য-অলম্ব্যবর্ণিত্বের সূচী পরিমাণে সঙ্গীত-ভাবশ্রব্ধ। এতে প্রকৃতিবর্ণনা বা কল্পনার লীলা একেবারে নেই তা নয়, তবে কম। গানগুলি ভাবের দিক থেকেই বড়। এই গানগুলিই গীতাঞ্জলির চিত্তি এবং সাংখ্যার কেন্দ্রী। এখানে বলে রাখি যে প্রবন্ধে অঙ্গুলিভিত্তি গানগুলি এই দৃশ্যসঙ্গীত গোষ্ঠীতেই পড়ে, কেবল তার মধ্যে ১০৭, ১০৮, আর ১১০ নং গান তিনটি বিশেষভাবে মনেপড়ল। যদিও ধর্ম্মভাবের প্রণোদিত।

গান আর কবিতার প্রভেদ অল্পাধারে এ গানগুলি সমন্বয়ী সঙ্গীতগণবাচ্য। আত্মনিবেশনে যে আত্মলগ্না থাকে, যেটা তার উচ্ছল উচ্ছ্বাসে মনকে প্রবীড়িত করে আর আগে লমবেদনা ভাগ্য। এ গানগুলিতে সেই ভাবেরই বাজনা। এতে আছে বাতুল প্রার্থনার একটা সরল বিশ্বস্ততা যেটা ধর্ম্ম বা নীতিভাবের প্রধান লক্ষণ। এ গান সুরাসরি মনে গিয়ে লাগে, এতে কোন স্তম্ভিত মারপ্যাচ নেই। এর প্রথম কথা প্রথম, আর সে প্রেমের নিত্যস্বরূপ পরল অস্তিত্বটিকে এ প্রেমী গান বা কবিতার প্রধান সৌন্দর্য্য। এখানে মৌলিকতার কোন আভাস নেই এবং এগুলি এসটা বিশেষ পুরুষের চিন্তার বিচ্ছিন্নতমক নয়, এগুলি কবির চম্পক স্বভাব জীবনের মনোভাবচালিত সরল নিবেদন। এ প্রেমী গান বা কবিতার সুর বা ছন্দও সেই কারণে



একটা ভাবগত লয়গতায় গুণের নির্ভর করে। সেটা গভীর এবং আত্মনির্ভর, আত্মল অথচ সংগত, উন্নত আছে অথচ চপলতা নেই। সঙ্গ কিছ্ লঘু, শান্তি, শান্তিপাট্যবোধ কিছ্ মনোভারী। কবি লেখেন তাঁর প্রেমের আশ্রিত মনকে চোখের তলে ঘুরে উজ্জল, তুচ্ছ আর বিদ্বৎ ক'রে তোলাবার জন্যে, অস্ত্রের মনে চমক লাগবার ভয়ে নয়। এই সকল কারণে এ গানগুলিতে বসন্ত কিছ্ কল্পনাসম্পন্ন, ছবি রং প্রভৃতির আয়োজন আছে সে সমস্ত মূল বাণীকে ছুটিয়ে তোলাবার মতোই। সে গুলি উপকরণ মাত্র, নিবেদন নয়।

বীতাক্ষণের লক্ষণসমূহগুলি এই সকল সত্যে অঙ্গপ্রাণিত। কিছ্ মূল আর্থ্যের স্বরূপিত কত বিচিত্র ছন্দেই বেজে ওঠে। একটা লম্বা প্রভৃতিগত বিনয়ের মধ্যে বিয়ে নানাভাবে এবং মাধুর্যের মনের নানাবিক থেকে এই চিরন্তন আবেগ-টুকু ছুটে ওঠে। প্রত্যেকবার নতুন নতুন আবেগের মধ্যে ঘিরে বার বার মনকে চকল ক'রে তোলে। তা ছাড়া সমস্ত গানগুলির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একতা আছে যেটা পূর্ণ অক্ষুণ্ণতার মনোমত প্রকাশের একমাত্র নিদর্শন।

প্রথমে চারিটিকে চেয়ে দেখতেই কবির মনে আসে একটা বিষয়ের তাৎ। সে দেখে একজন পূর্ণ পরিচিতির মূর্তি। এখানে এভাবে তার আনগোনা কেমন ক'রে হ'ল? এ স্পষ্ট সভ্যত্ব রূপ কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল? কবি ভিজ্ঞাস্য করেন—‘কেই আলোতে প্রাণের প্রতীপ আলিখে তুমি ধরায় আস?’ (৪২)। কবি লক্ষ্য করেন যে তিনি আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, মাধুর্যের মনে সঞ্চিত বিভাজিত। ৩,৫১,৩৭,৪০,৪৬,৭৪,১১৩,১২২ নং গানগুলি এই ভাবেই। কবি গুণ্ড পান তাঁর আসার পায়ের ধানি। ‘নির্ভাল ভালোক ভুলোক’ প্রাতিষ্ঠ ক'রে তাঁর ‘অমল অনুত’ ক'রে শব্দে। গুণ্ড সাইয়ের প্রকৃতিতে নয়, সে আলো কবির গারে তাঁর ভালবাসার পরশ ছুঁইয়ে দেয়, কবির গারে ‘পুলক লাগে’, চোখে ঘোর ঘনিরে আসে।

তাঁর এই আপনভালা হ'য়ে নিজেকে ফিলিয়ে দেওয়া, অজ্ঞতার এই বাহুসা, অগৌন হ'য়ে শীঘ্রার সারে এই সুর

বাহুনাতে একটা গ্রহণা আছে। কবি বৃহতে পারেন যে পরে এই ছোঁয়াচ সংক্রামক হবে, এবং তখন হঠাৎ তাঁরও ঐ আনন্দের লীলার যোগ দেওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠবে; কারণ ইতিমধ্যেই যে তাঁর প্রাণের লাড়া তেজে উঠেছে। এ ভাবটি বড় চমকপ্রসূরী ভাবে প্রকাশ পায় ২,৩,২২,২৩,৩৪, ৩৮,৪০,৪৪,৬৭,৯৪, এবং ১০২ নং গানের মধ্যে। কবি খুব উৎসুক হয়ে ভিজ্ঞাস্য করেন—‘হে মোর দেহতা, তরিয়া এ দেহ প্রাণ, কি অনুত তুমি চাহ করিবারে পান’। নইলে কেনই বা ‘আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে, আমার মাকারে নিঃসের করিয়া পান?’ তা ছাড়া আয়োজন কি এক দিনের, সে যে অনেক কাল থেকে চ'লে আসছে, অনেক কাল হ'য়ে এ আনন্দের রস লকার হুকে। একটি গানে যেন এই সমস্ত গানগুলির স্থগল নিকাশন করা হয়েছে। তাই তাঁর সম্ভা উচ্চুত করলুম—

হানি হানি কোন্ আদিকাল হ'তে
জালালে আমারে কীভাবে স্নোত,
সহসা যে গির তত ঘূষে গলে

বেধে বেধে প্রাণে কত হৃদয়।

কতবার তুমি বেধের আড়ালে

এমন মধুর হাসিমা বাঁড়ালে,

অলপ কিয়ৎ ভাল বাড়ালে,

মলোটে মাঝিলে গুত পলক।

লক্ষিত হ'বে আরে এই চোখে

কত কালে কালে কত মোকে মোকে,

কত সব সব আলোকে আলোকে

অলপের কত ভগবদল।

কত মূগে মূগে কেহ নাহি জানে

করিয়া করিয়া উঠিয়ে পরানে

কত ঘুং ঘুং কত জেলে গানে

অবুজের কত রসবহন।

এই সকল আভাস পেয়ে কবির মনে হয় ‘যেন লম্বা এসেছে আম।’ তাই এখন তাঁর নতুন শব্দক হয়েছ যে ‘লব বাসনা বাবে আমারে খেমে, মিলে পিয়ে তোমারি এক প্রেমে’ আর তখন ‘হৃৎ হৃৎয়ের বিচিত্র কীধনে তুমি ছাড়া আর কিছু না হ'বে।’

কিছু কেমন ক'রে আশা সফল হবে? কবি প্রবুদ্ধের প্রার্থনা জানান, "আমি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি" (৪৪)। তিনি নিজের ব্যাকুলতা সজ্জ করিতে না পেরে নানা উপায় পরীক্ষা করেন। তিনি মানের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে (১২৬), বলেন—"আমার মাথা নত করে' দাও রে তোমার চরণ ধূলায় শুণে" (১) কেননা "তোমার কাছে খাটে না কবির গরব কথা" (১২৬)। ৮৮, ৯৮, ১২৪ নং গানগুলিও এইরূপ। নানাভাবে নিষ্পত্ত পাপ আর লোভ স্বীকার ক'রে কবি চিত্তশোধন করবার প্রয়াস পান। তিনি স্বীকার করেন যে "অনেক দোষী হ'য়ে গেল, দোষী অনেক দোষে" (১০১)। তাঁর প্রধান দোষ এই যে "ভেঁকে তোমার হাতের লেখা কাটি নিজের নামের রেখা" (১৪৪)। তিনি তাঁকে স্বীকারের "প্রেরণা" কেনেও ভাঙাচোরা স্বরতে বা শোভা আছে তা কেলে দিতে পারেন না (১৪৪)। নানাবিধ থেকে এই স্বীকারোক্তিপূর্ণ কবিতা অনেকগুলি, যেমন ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৪, ৯১, ১০৮, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৭, ১৪০ নং প্রকৃতি।

দোষ স্বীকার মাত্র ক'রেই কবি বশে থাকেন না। তিনি দেখেন এ ছাড়া আরো অনেক বাধা রয়েছে। ভগবতের বৃত্ত হুচ্ছ ঐশ্বর্য আর বন্ধন দেখলোও ছাড়তে হবে। এখনও "ধনে জনে" জড়িয়ে আছে (৩০)। তাই তো চোখে আবরণ নামে (৩৪)। ফলে যদিও "হারের সন্মুখ দিয়ে সে জন করে বাগড়া আসা" এমিকে কিন্তু "ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকবো কেমন ক'রে?" পথ দেখতে না পেয়ে এই কীরে কীরে বাগড়া দেখে কবি আজ পণ করেছেন যে মলিন অন্ধকারের বস্ত্র ছেড়ে, জান ক'রে এসে প্রেমের কলন প'রে (৪২) নিভৃত বাগা মাঝিবে তিনি আজ এগিয়ে যাবেনই যাবেন—

"যেথা নির্ধনের সাধনা

পূজালোক করে বসনা

এবার আমিও যদি

একটি মোড়ির রেখা।" (৫১)

কিন্তু এ সাধনার শক্তির প্রয়োজন। সেই বরই তিনি চান, "নর তো বত কাল কুই নিষ্ঠুর মতন রইবি কলীনা অন্ধরের অন্ধপুরে থাক রে ততদিন" (১২৭)।

শক্তিপ্রার্থনার পর তাঁর দ্বিতীয় প্রার্থনা সাধন আর বিষাদের (৪, ৩৩), যাতে তিনি নিজের সফল চিন্তা সফল জীবনটাকে একাগ্রতাতে বেঁধে উত্থাপন করিতে পারেন (২২), আর তাঁর পর যেন সেই "অন্ধরতর" কবির অন্ধর বিকশিত করেন (৫)

একাগ্র সাধনা করতে হ'লে আবার সব নৈরাস্ত্র দূর হ'য়ে গিয়ে মনের শান্তির নিষ্ঠাশ্রম প্রয়োজন। সেটাও কবিকে খুঁজে নিতে হয়। তাই তাঁর প্রার্থনা, এবার যেন মূখর কবি নীরব হ'য়ে যাব (১০), যেন সপ্তলোকের নারদতা দেখানে এসে বিরাজ করে (১৫)। তিনি বেড়ে চান "অশান্তির অস্তরে সেখা শান্তি হুমহান" (৭৫)। যেন তিনি তাঁকে তাঁর সিদ্ধ নীতল পতীর পবিত্র আবারে ডেকে নেন, (২৬) যেন তিনি তাঁর মধো "দূরে দূরে" দূটে যান (১৩৮) যেন তিনি সফল হিয়ে তাঁর মাঝে মিশতে পারেন (১৩৯)। তিনি মনকে কার্যকে ঐ চক্রে গলিবে দিতে চান (১৪২)।

তারপর কবির শেষ প্রার্থনা সেট অস্তরের আনন্দময় প্রেমাস্বীকারের ক্ষেত্রে (১০০, ২০), যাতে তিনি তাঁর "আদম-তলের মাটির পরে সূঁটের" প'ড়ে তাঁর "চরণ ধূলায় ধূলায়" হ'য়ে যেতে পারেন (৪৭) এবং আত্মনিবেদনের সেট পত্রম সুর্য্যে—

"যার যেন ঘোর সফল ভালবাসা

অনু তোমার পানে, তোনার পানে,

আজ কবি অনেক আশ্রয় ক'রে, "অনেক ঘরে নিজেই প্রবৃত্ত ক'রে, দেবতার ঘরে এনে উপস্থিত হয়েছেন। এখন প্রধান ভয় দেবতা সম্বন্ধে হয়েছেন কিনা। তিনি তাই তাঁকে বলতে চান যে বোধ হয় এতদিনে সমর্থ হয়েছেন, বোধ হয় এইবার তিনি তাঁর মহাদানের গোণা হয়েছেন। রহত তাঁর চোটা অলস্পূর্ণ হ'লেও বার্ষ হয়নি, কেননা তার মধো তো কোথাও কম্পিতা বা কর্ণেত ছিল না। সুতরাং তিনি নিষ্ঠুর মনে মনে ভক্তের ওপর সম্বন্ধে হয়েছেন (১৪৭, ১৪২)। এই সফল কথা তেবে কবির মনে সাফল হয়। তিনি জানতে চান "প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ হবে?" (১৪৩) সাফল পেরে কবি নিজের সাধনার



পূর্ণ ইতিহাস বলতে আরম্ভ করেন। স্থান, কাল, প্রকারের
একটা বিস্তৃত বিবরণ দেন (১১, ১২৬)।

“কবে আমি ব্যক্তি হইলম তোমারই গান বলে
সে ত আমার নয়, সে আমারই নয়।”

তবু ধীরে সাধনাই নয়, তাছাড়া আরও “এ গান ছেড়েছে
তার সকল অস্তিত্ব”। অতএব আরও তাঁর যা কিছু
সুকিত্ব ধন, যা কিছু আরোহণ, সম্পূর্ণটো হোক বা
অসম্পূর্ণটো হোক তাঁর পায়ে কাছ দেলে দিয়ে নিজেদের
গ্রহণ করতে বলেন (১১৫, ১৩০, ১৪২, ১৫০)।

গ্রহণ করার এই অসুযোগের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে।
তবু গ্রহণ করতে ব’লেই কাঁচ হন না। অধীর ত’রে
অশ্রুৎকৃত করেন শেষে অস্বস্তিক্রমে প্রশ্ন করেন—“যেখান
ছুনি বস নামের আসনে, চিত্ত আমার সেখান দিয়ে
কেমনে” (১২৭); কবেই যা “প্রাণের রূপে ব্যক্তি হতে পারব”
৮৫); “ভগত ছুঁতে উদার হুরে আনন্দ গান বলে, সে
গান ক’রে গভীর রবে ব্যক্তিরে হিমা মতে” (১৩৬)।

এই অস্বস্তিক্রমের তাই ও আবার কত রকমে দেখা
যেবে। তখন কানে যাবে একটা ঐক্যমূলক স্বর—
“অনর আকাল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলেব না” (১৪); কখন
আবার প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলে যে আঘাত সইতে তিনি
তাই পান না; যেন “সুত হুরের খেলায় এ প্রাণ বার্ষ” না
হয় (১১)। তখনকার তার বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেউ
আর তাঁকে ধ’রে রাখতে পারবে না (১১৮); তিনি আর
নিজেদের নিজের পিঠে বসেই বসে না (১০৬)। কখন সৈধ্য ধারণ
করেন (১২)। আবার মধ্যে মধ্যে মিলিততে ভেঙে প’ড়েন
(১১২) নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেন (৭৬)। কখন ঘেঁষি
আত্মতর্কনের ভাব আর নিজেদের সন্ধান রাখবার চেষ্টা
(২৫, ১১০, ১১৪); কখন গভীর আবাহন (৭, ৪৮, ৫২, ৭৮,
১০৫)।

কবির সৈধ্য, অসুযোগ, আবেগ বার্ষ হয় না। তাঁর
প্রার্থনা সফল হয়। বোধ হয়, সেই সূত্রেই তিনি আনন্দে
বহু বহু ক’রে গঠন (১৫)। তখন তিনি তাঁরই
আবেগে গান গান, গর্বে তাঁর বুক ত’রে গঠে (১২),
গরম তুলিতে বলেন—“আছে আমার দগর আছে ত’রে,

এখন ক্রমি বা বুদ্ধি তাই কর” (১১১)। তিনি উদ্যমে তাঁর
রূপ টানতে এগিয়ে যান (১১২), তাঁর সঙ্গে কণ্ঠযোগে যোগ
দেন (১২০), এবং শেষে বহুবারে অস্তরের কৃতজ্ঞতাটুকু
তানিয়ে দেন—“যা দিয়েছে আমার এ প্রাণ তবির, খেব ত’বে
না এখন যদি মরি” (১৪০)।

এই খানেই বর্ষ সঙ্গীতগুলির তাবের পূর্ণ বিকাশ আর
বিগ্রহ। তাবের আবেগের তাঁর শক্তি প্রকাশে এগুলি কাবের
সঙ্গত রূপ, বর্ণনার সঙ্গার বা বর্ণনার রঙে চাক্ষুসমান
নয়। তার স্থানে আছে একটা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আর
ঐকান্তিক নিবেদনের প্রবল উদ্ভাসনা। এই পার্থিব জীবনে
মানুষের মনে হত বাক্য আবেগের সঙ্গার ১৪ শ্রেণী সফল
এখানেও তেমনি সফল সফল তাবেরই দেবতার কানে তক্তের
প্রার্থনাটুকু শোঁতে দেয়। আমাদের বৈদিক কীর্তনের
সাধারণ জালি কাল্পিত হুরের সঙ্গে এই গানগুলির স্বর এবং
তাবের এত যোগ আছে ব’লেই এ গানগুলি আমাদের এত
ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করে। উপরন্তু গান এখানে মানুষের
প্রেমের কোঠার মধ্যেই থাকে হুয়েছে। কবির স্তন নিঃসর
হুয়েছে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে আমাদের এই নিকটকার
রূপভেদে আশা, নিরাশা, বহু, শোকের মতন চিন্তে পারি
ব’লেই তাঁর আকুলতার নিঃস্রোত আকুল হই, তাঁর ভরসাতে
নিঃস্রোত সাধনা পাই, তাঁর আবহায়ে নিঃস্রোত স্বর মেলাই,
তাঁর আনন্দেই নিঃস্রোত শব্দ আর তুল্য করি।

এইবার কাব্যরচনা থেকে রূপরাহস্যের দিকে যাব। এ
শ্রেণীর গানগুলিতে যে ভাব মধ্যাধীন জান, তেমনি
গরিমার ছায়া উজ্জ্বল, তবে অলঙ্কৃত। তার পূর্ণ অস্তিত্ব
রূপের বিলাসের মধ্যে দিয়ে। রূপই এখানে প্রধান অঙ্গলবন।
সেই মধ্যে এই গানগুলিতে ছবি আঁকা, অলঙ্কারদান,
প্রকৃতির চিত্রবর্ণন গঠন আকৃতি সফল হয়েছে।

এই রূপপ্রধান গানগুলি বিশেষ ভাবে চরকম—বৃত্তাক-
বর্ণনা আর কল্পনাকাব্য। এর মধ্যেও বহুতর শ্রেণীবিভাগ
আছে, বৃত্তাকবর্ণনামূলক গানগুলিতে যথোপযুক্ত রূপ-
সঙ্গার আর তার বিভিন্ন প্রকাশনোপায় গানের প্রধান বস বা
উপকরণ। দ্বিতীয় বিভাগে বিশেষ ক’রে বর্ণনাত্মক
কল্পনাস্রষ্ট।

১। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি গান চোখে পড়ে যেগুলি প্রাক্তন বংশদ্ভূত আর প্রকৃতিকাব্যবসায়িক। সেগুলি যেন মাংসোপভোগ—এখানে ভাষা অল্প অল্প রূপকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আনন্দটা প্রকাশ পাছে প্রকৃতিকৃত বস্তুরূপের সাধ্যাঘো। ২৬ নং গানটি থেকে উদাহরণ দিই। প্রথম দুটি কপি এই :—

হেরি অহরহ তোমারি দিগধ
তুফনে তুফনে মাঝে রে,
কত জন বহে কাননে তুফনে
আকাশে সাগরে সাগরে তে
সাম্য দিশি ধরি তাহার তাম্রধ
অনিমেধ তোমারি দীপনে পাঁচুধ
সংবলনে প্রাণে প্রাণধ
তোমারি দিগধ মাঝে তে।

প্রথম কলিঙিতে ভাবটুকুই বাক্য হর যে, বিরহ নানারূপে গারণ ক'রে কাননে তুফনে, আকাশে, সাগরে বিভাজ্য ক'রে,—কিন্তু দ্বিতীয় কলিঙে সেই বিরাজিত রূপ আমাদের দৃষ্টিপোচের চর, আশ্রয়। তাকে দেখতে পাই তাহার চেয়ে-থাকতে পাতার ওপর বর্ষার জল-পড়ার মতো। ২, ১২, ১৪, ২১, ৪০, ৭০, ৭২, ১৪১ নং গানগুলিও এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর। এখানে ভাবের ছায়া বহির্ভূতদের গায়ে লুটিয়ে প'ড়ে তার মোহন স্পর্শে প্রতি বৃহৎই স্পষ্ট-এর হ'লে যেন আমাদের মনের পটে স্থায়ীভাবে একে ধার। কবির প্রেরণা ক্রমাগত প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে বিকশিত হয়। প্রকৃতি-গুণের যে দিকটা স্ববীজ্ঞানার্থে সঙ্গোপনো প্রিয় এ গানগুলির মধ্যে সেই দিকটাই উদ্ভাসিত হয়েছে—স্ববীজ্ঞান বর্ষার বাগ্যের নদীজ্ঞানোভিত পল্লীপল্লীর কবি।

২। স্বভাববর্ণনার মধ্যে দ্বিতীয় ধরনের গানগুলি ৮, ৭১, এবং ১০০ নং। এখানে ভাবের বাক্য রূপ আরো জীর্ণ, এবং সমস্ত রসটুকু বর্ণনার মতোই পর্যাবসিত। গুণবর্ণনাও সেই ভঙ্গি খুব উজ্জল রেখাতেই আঁকা। গানগুলি সাধারণের পরিচিত—“মাঝে গানের ক্ষেত্রে রোহিণীমাধব লুকোচুরি খেলা,” “মাঝার এগেছে আবাড়” এবং “চির মাঝে হারাণ আমার মেঘের মাঝখানে।” এখানেও বর্ণনার উপকরণ সেই একই, উভার আকাশ, বিদ্যুত মরি, বসন্তের প্রবাহিত

উজ্জল নদী, ভ্রামল পল্লভেক্ত, মেঘ, কড়, বিহাং, বহু—বাগ্যের বর্ষার সমারোহ,—বড়ই বাস্তব আর মনোজ।

৩। কখন কখন প্রকৃতির কোন বিশিষ্ট রূপ এত প্রবলভাবে কবিকে আকর্ষণ করে যে তিনি সেই রূপের ধ্যানে একবারে আত্মহারা হ'লে গিরে একান্তভাবে সেট রূপটিরই বন্দনা করেন, একা সেই স্তবগানের মতোই তাঁর দেবতায় আবদ্ধন হয়। রূপের সাক্ষত সৃষ্টি শিল্পীর আঁকবার ভিনিস, আর রূপের প্রতিবীল ছবিই কবির বর্ণনার সম্পদ। এ গানগুলিও তাই। একটিতে উভা বাগ্যের কব, স্ব, পৃথি পড়ার কলযোগজনিত উল্লাস এখন—

শালের মনে থেকে থেকে
কড় তোমার মনে থেকে থেকে,
কল তুটে যায় একে থেকে
ময়েন পয়ে।
মেঘের ভট্টা উড়িয়ে গিরে
পড়া কে করে (২৮)

একটিতে পাই শরতের মিষ্ট চরণলক্ষ্মীতে আবির্ভাবজনিত কবির মনের শান্ত তৃপ্তি এখন সে অতিথি হ'লে “প্রাণের ছায়ে” এনে উপস্থিত হয় (৩৯)। আর কত মনোরম সে আগা—

শিখরী তলার দলি পালে
সব তুলেই রাখে রাখে
শিখরী তলার দলি পালে
কল পড়া চরণ তোলে।

তার “আলো ছায়ায় আঁলগাখানি লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে গলে।” মাঝার কল্লের আগমনে আনন্দে কবির ভ্রম-জ্ঞান তিনি তাঁর বন্দনার—“আজি বসন্ত লাগেত ঘারে ; অতি নিবিড় বেবনা ঘন মাঝেরে, আঁচি শরৎ শরৎ পাত্রে রে ; এই সৌরভ-বিলম্ব হরনী কার চরণে পড়ইতলে জাগিছে ?” (৪৩)। বহিঃ-প্রকৃতিকে ভাবের বাহন করা, তাই আর রূপের মিলনসাধন করা, রূপের অভিনন্দনের মতো ধরিতের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করা এই কবিতাগুলি স্ববীজ্ঞ-কাব্যে বড়ই উজ্জল, বড়ই সজীব, বড়ই স্পষ্ট। তিনি সূক্ষ্মকণ্ঠ রূপ ঘের বহন বলেন—“ওগো মাঝার এই আঁকনের শেষ পরিপূর্ণতা, বরণ আমার মরণ, তুমি কও



আমারে কথা," (১৭)। ৩০ ও ১০১ নং গানে ঘর্ষিত রূপ পূর্ব উচ্চল রঙে আঁকা। আবার একটু গানে শব্দের যে বাজ রূপ দেখি সে-ব্যকম উচ্চ মূল্যের objective poetry লক্ষ্যে চোখে পড়ে না। শব্দ শুধু আধার—

সে তো শব্দ লক্ষী, তোমার
তম সেবে রূপে,
এ নিখিল নীল পথে
এ পৌষ চাবল
আলো হলল
বনদিরি পক্ষিতে
দে মুকুট পরিচয় লভল
সীল নিশির-তাল।

এমন মত: স্বভাববর্ণনা, এত উচ্চল রূপাধার গীতাঙ্গলিতেও বেশী নেই।

স্বভাববর্ণনার গানগুলির মধ্যে বিরহভাবের গান কয়েকটি এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এগুলির মূল বস,—বিচ্ছেদ, বেদনা। বিরহের এই বিবাদবাধাকে মত ক'রে তুলতে বাহরের প্রকৃতিচরিত্ত কবিত্ব দেখতে সাহায্য করে। প্রকৃতির প্রশান্তি আর বৈরাগ্যের রূপ-কল্পনার যে গোপন, বেদনার ভাব নিহিত থাকে সেটুকু কবির মনে প্রতিফলিত থাকতে থাকে। কবির ভাবাতেই বলতে গেলে—“এই নিশেটে নিস্তর নিস্তর নিস্তর পল্লভের মধ্যে এমন একটি রূপে সৌন্দর্যপূর্ণ নির্জীবতার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় নিঃশব্দ মধ্যে এমন একটা লুপ্ত লুপ্তে সঞ্চিত শব্দের ক্ষুদ্র নিভা নৈমিত্তিক অশান্তি চোখে পড়ে যে অতিদূর নদীতীরের ছায়ায় নীল বনরেখার বিকে চেয়ে নিভা উদ্ভব হ'য়ে যেতে হয়।” (“ললপথে” শীর্ষক প্রবন্ধ)। অতএব বহিঃপ্রকৃতির চিত্রার মধ্যে বিরহের ভাব সহজেই বনিয়ো গঠে। তাই প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তার দ্বারা মূর্ত বৈশি, তারই গটে চরি একে, তাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে, তার মধ্যেই সহস্রকৃতি বুঁজে গেছে, তাতেই নিরুত্তরা আত্মোপ ক'রে, কবির অন্তরের কারা বণিয়ে গঠে। রস, কড়, মেঘ, বিচাং, অন্ধকার রাত, পল্লব বন, নিরাশা পথ—তার হাকস্থান দিয়ে কবিরনের

নিপাতারা বিরহিত তার ভাবনের প্রেরণার ব্যার চয়। বৈরাগ্য কাব্যের কমনীয় পরিণতি!

বিরহ কবিতাগুলিকেও ভাবের ইচ্ছা অনুসারে সাধারণে পারি। প্রথমে আছে বিচ্ছেদের ভীরু বেদনা আর খুঁচে পাবার ক্ষেত্র একটা ব্যাকুলতা যখন “গগনন্তর গিরিছে মেঘে তরি, বাদলজল পড়িছে তরি তরি” (১৮)। সেই সময়ে প্রাণ মেঘে গঠে, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে উদ্ভত বাতাসে কেঁবে বেকায়, কেবল “দূরের গানে মেঘে আঁখি” চেয়ে থাকে, আর ভাবে, যদি দেখা না পার তো এমন বাদল বেদা ছেঁদন ক'রে কাউকে (১৭)। চোখে মূখ নেই, আকাশও তার লগ্নে হত্যাণ ভাবে কাঁদে। বায়ে বায়ে সে উদার মূলে দেখে প্রিয়তম আসছে কিনা, কিন্তু—“বাতিরে কিছু দেখিতে না পাই” (২১)। শেষে আর থাকতে না পেয়ে, ঘত বজ্রন সব কাউকে সে নিঃশেষে খেঁচিয়ে পড়ে। ফলে—“একলা আমি বাতির হলেম তোমার অভিসারে” (১০৪)।

তখন এই বনিয়ো-আলা অঘোর লঙ্কার মধ্যে বাধনহারা বৃষ্টিধারার মধ্যে, ঘর্ষিত বনে সজল হাওয়ার শিরে সে যেন তার মনোভাবনা পূর্ণ হবার আভাস পায় (২০)। তারপর দেখে হঠাৎ কখন নিশার মত নীরব হ'য়ে সবার দিগ্গি ডিগ্গি “শ্রাবণ বন গহন মোরে” গোপন চরণ ফেলে তার প্রাণকায় এসে থাকিয়েছেন।

গীতাঙ্গলিতে প্রকৃতিবিত্তা উপাত্তাক তার প্রকাশের। আমরা আরও বুঝতে পারি যে প্রকৃতিবেদা অনেক ভাবেই করির কাব্যে আসন গ্রহণ করেন। কখন ভাবের মূল আবার স্বরূপ, কখন শুভ্রসুভায়ে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রকাশ-লীলায়, কখন রূপসুষ্টি পরিগ্রহণ ক'রে, আবার কখন বিরহভাবের সূক্ষ্মনা আগিয়ে।

এই সব বর্ণনার মধ্যে কিন্তু একটি বিশেষ প্রত্যোক কেন্দ্রেই বর্তমান। কণাটা বসীপ্রাণের বস্তুবাদ (objective) কবিতার মর্যাদা লক্ষ্যে মনোভব নিয়ে। চমকন সাহেবই এই বিতণ্ডাইচ্ছ একটু যেন স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছেন এবং সে লক্ষ্যে চ'একটি কথা এখানে পূর্ব প্রাণকিক ভাবেই এসে পড়ে। যে বিশেষের কথা হলছি

তা এই যে প্রকৃতির বর্ণনা। স্থানে স্থানে সতেজ বা স্পষ্ট হ'লেও সর্বত্র তাতে একটা আচ্ছন্ন ভাবের স্রব্দ ছাড়া পড়ে। সেন কিসের টান তাকে শিঙন করে দেখতে হয়। সমর সমর উদ্ভাস গতিতে ছুটেও আবার পরস্পরে ঘীর সংঘাত হয়ে পড়ে। মনে হয় বৃষ্টি বস্ত্রবর্ণনা করতে কবি আত্মপ্রসার করে গঠন। তাঁর কাব্যে অল্পজগতের তপের বস্ত্র লীলার অন্তিমালি মাতৃবৈষ্ণব মর্মেণ্ডের কাব্যের মতো একসঙ্গে মড়াগেলো, এক সারে গাঁথা। একটার মধ্যে অল্পটা পর্যাবসিত। একটা কাপলে অল্পটা কাপে। মনে হয় কবি মাতৃবৈষ্ণব কথ্য কিছুতেই তুলতে পারেন না—তাকে কেবল প্রকৃতির কোণে পাতাতে চান আলা দ্বাড়াতে, কোননা দেখানে আছে একটা লাক্ষনার প্রলেপ। কবির কথার—“সৌন্দর্য আছার সচিত্র জড়ের মাক্ষানকার দেহ”। কাজেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আছা আর বড় গুটিতেই টান পড়ে। তাই কবি কবির রূপ দেখে বৃদ্ধ হ'লেও তিনি দেহকে দেখেন, “মানবের মতো” (১০১)। মাঝে শুধু মাক্ষান ছেঁয়েই আসে না, সে “নরনে এসেছে স্রবণে এসেছে ঘেয়ে।” (১০০)। “তব্বা বাবু” এর কবির কবির একটা পূর্ব লক্ষিত এবং মূল্য বর্ণনার মধ্যেও কবির অন্তরে কলরোল ওঠে, জমর-মাতে পাগল ভাগে, ঘর কলে ভেতর বাঁচ এক হয়ে গিয়ে যেন “কে যেতেছে ব্যাধির ঘরে।” প্রকৃতির বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে নিজেই তুলে যাওয়া নেই, একটা সংবোধের গাঁথ রয়েছে। প্রকৃতি ছাড়া মানবজীবনের কোন অবতারণা কাব্যে বিস্তারিত করতে সেলেও কবি ঐক্যবোধে সে বর্ণনার মধ্যে নিজেই জড়িয়ে কেমন। বর্ণিত ছবিখানি যেন নিজেতেই যথেষ্ট নয়, তার বা কিছু সার্বকতা যেন কবি-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা গুলির অবলম্বন বা প্রতীকরূপে। বস্ত্রবর্ণনার চেয়ে যেন সর্বাধিকারীই বেশী মূল্যবান হয়ে ওঠে। কিন্তু কবি নিজে এই আভাসবর্ণনার মধ্যেই তুলে বেয়ে মাতৃবৈষ্ণবের মতটুকু অল্পজগৎ আর সায়না পেয়ে তৃপ্ত হন। তাঁর কাছে সেই ছায়াই সম্পূর্ণ জাগরান আর স্পষ্ট। হুত্বা তাঁর “কীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।” তার প্রতি তাঁর কত গনিষ্ঠর, প্রেম, আবেগপূর্ণ ভাব—

মিলন হবে তোমার মাঝে
একটি নর বৃষ্টিপাত,
কীবনের রস তোমার
নিভা অঙ্গণে।

সেদিন আছার হবে না বর
কেই বা আসন, কেই বা মরণ,
মিলন বাতে পতির মাঝে
মিলের পতিরতা।

ব্যক্তিক ভাবের এই চরম কবিতার নিবিড় মিলনের কি উচ্চ পরণ!

তা হ'লে কি রূপাঙ্গনারের স্বভাবকবিতা বা Nature poetry তাঁর মানবপাঁচার বাহন মাত্র? স্বভাববর্ণন ব'লে এ গানগুলিকে পৃথকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাবে কোন অবাঞ্ছিত ছিল না? এবং কবিতাগুলি কি তাঁর স্বাভাবিকতায় গুলির একটা রূপান্তরিত সংস্করণ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলি যে উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এই স্বভাববর্ণনগুলির প্রকৃতি-কবিতা হিসাবে একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত লক্ষ্যভাবে গীতিকল্পনা (lyric imagination) বস্তু বা বস্তুগত হ'তে পারে এগুলি তাই। কাব্যমাত্রই কবির ব্যক্তিবৈষ্ণব প্রকাশ, কিন্তু গীতিকাব্যের সে প্রকাশ আত্মপরিপূর্ণ, egotistic। গীতিকাব্যের মধ্যে তথু বিহীন ভাব খুঁজে নয়। তার মধ্যে একটা কীবন-কল্পনা বর্ণিত প্রাণের গোপ ভাবে। অতএব এ কবিতার কবির মন প্রকৃতির রূপ দেখে ছবিটি দেখার মানস পেয়েই তৃপ্ত এবং ক্ষান্ত হয় না, একটা অবস্থা সংস্থানের মনস্ফা মাত্র তাকে আত্মতৃপ্ত করে না। তার চোখে সে বৃষ্টি হয়ে গাঁড়ার তার মনোভাব রঞ্জিত বাসনা আর আবেগের একটা লক্ষ্যার্থী প্রত্যাক। তাই কবির প্রেরণার দৃষ্ট রূপটি তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্ত করলেও আত্মপরিপূর্ণতা বাক্ত হয়। অতঃপর সে কাব্যের ছায়া ব'লে অবিলম্বেই বটে,—বিচ্ছিন্নত লাবণ্যের মিষ্ট পরিমণ্ডল। চোখে দেখা তপের অবিকল বাজনার কবিকল্পনার আনন্দ এবং তুলি আছে, আবার “কবিস্বকল্পন” বৈষ্ণবের শারক বা উত্তেজকভাবে প্রকৃতির বর্ণনাও কাব্যগোষ্ঠ এবং তার নামও স্বভাবকবিতা। একরূপের কাছে যেটা মাত্র রূপ,



অন্তের কাছে গেলো তখন, একজনের উল্লাস অন্তের দোষা শাস্তি। তার কাছে কাব্যের পূর্ণ সৌন্দর্য ও গরিমা বর্ণনাতই সম্পূর্ণ নয়। তার কাছে বর্ণিত দৃশ্য বর্ণিত ভাবের পশ্চাত দৃষ্ট, মাঝে থাকে স্বর্ভি চাকলোর ছায়ায় আচ্ছন্ন middle distance—মধ্যভূমি। সে ছবি কেমন? কবির অন্তর বাবদত বর্ণনার ভাষায় বলি—“পরপারে দেখি দাঁকা তরুতারা মসৌমাথা, গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।” আলোটা বড়ো কবিতাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য। তাই গীতি কবিতার প্রকৃতিরও বৈশিষ্ট্য।

ছিত্তার এই আরপেই লম্বত বর্ণনার বর্ণিত দৃষ্টের বেড়িও নেই, অল্প কণার সেগুলি মোটের ওপর অনেকটা একই ভাবপত্র বর্ণনা বাংলায় পল্লীপোতার ছবি। কবি যেখন যে তাঁর মনোভাব সব চেয়ে বেশী অল্পলিঙ্গিত হয় বাংলার পল্লীর প্রাথমিক পাত্র পোতার আর মূল্য পল্লীর মধ্যে বর্ণার ঘন রূপান্তরিত মতো। তিনি তাইসেই অল্পলিঙ্গিত হয়ে যান। নিপদের সৌন্দর্যের অন্তর্য অতিবিক্রির দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর হয় না। এই বৈচিত্র্যের অন্তর্যক কল্পনাশক্তির দৈর্ঘ্য মনে ক’রে টেমপন সাতের একটু বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি ভুলে যান যে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যের চেয়ে লক্ষ্যের পরিমাপটাই প্রসঙ্গ। “Great genial power, one would almost say, consists in not being original at all, in being altogether receptive.”—Emerson এর কথা। রূপ-গন্ধারে নতুনই আর সজীবতা যান করতে পারলে একের মতোই ভূব পাঠ্য কেন কল্পনার দৈর্ঘ্য হবে? ইচ্ছার সিতবার সব সময়ে পল্লীর অপরায় নয়। একের বহু রূপ দেখতে পাওয়াটা বিশ্বস্ততার প্রোট কল্পনাধর, উৎসর্গ বৈচিত্র্য, মহান নৈশিকতা। এই দিক থেকেই এই প্রকৃতিসঙ্গীতগুলির বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করি। একে মন থাকলেও কবি বৈচিত্র্য লাভন করেন কল্পনার প্রাথমিক আর অল্পলিঙ্গিত প্রাথমিক দিয়ে। এও কাব্যের একটা সীতি। আরো মনে হয় যে পুন্নাভপুন্না বর্ণনা কবির প্রকৃতিবিকক। তাঁর দৃষ্টি স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ। ইচ্ছার কবির কল্পনার প্রকৃতির দৃষ্টে আশাদের সম্পর্ক অল্প রকম। কবি বহু বলেন—

“আমরা জন্মাবই আশা, আমরা মৃত্যুবই এক। আর ইচ্ছার প্রকৃতির বাস্তব হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে আমরা আশার করি নাই, কারণ আমরা সন্তোষ করি নাই, প্রসঙ্গ করি নাই”— পঙ্কজ ।

এই থেকে প্রতীক্ষমান হবে যে বৈচিত্র্যবাদের প্রকৃতি-কবিতার রূপের মধ্যেও রূপের প্রাধান্য থাকে। পট্টের আশ্রয়ত ভাব বহুদূরির বর্ণিতটার মধ্যেই উচ্ছল।

এর ওপর non-alienation এর মোহন পরশ, সংস্কার ওপর দৃষ্টতার আবেশ।

মাত্র কল্পনার তীক্ষ্ণতার ফলে কেমন ক’রে একটা উচ্ছলতার দ্বারা গ’লে ব’য়ে যায়, মাত্র অল্পলিঙ্গিত প্রাথমিক কেমন করে সমবেদনার উৎস ছুটে উচ্ছলনে ডানিয়ে নিয়ে যায়, তার ও’র একটা উদাহরণের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমে একটা সমস্ত ভূমির দৃষ্টে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা ঘটনা সংজ্ঞানের ছবি।

প্রভাত আলি সূর্যের খানি

বাতাস গলা মেঘেরে ছাঁকি,

নিম্নের ঝিল মাঝান ঢাকি

নিবিড় মেঘ কে ছিল মেলে :

দূরবর্তী কাম্বলুনি

ছায়ার বেগুলা মল্লক অর

একলা কোর পলির চুমি

পলিকরীম পলির পরে :

স্পষ্টতা হিসাবে এই কব ছয় যদি প্রকৃতিকবিতা না হয় তবে আর কোথায় পাব? খুঁটিনাটি বা detail নেই, তবে কবির দেশও তো উদার আকাশ মাঠের বিস্তৃতির বেশ! কবির উচ্চ নীতির প্রাথমিক লুপ্ত করা সমস্তের প্রেমিক। তাঁর যেহে তীক্ষ্ণাঙ্গল মাগো আর ঘনঘোর আঁধারের বিপন্নপ্রাণী একাকার করা খণ্ডিতিক আর লুপ্ত প্রাথমিক রূপের যে উদার বৈরাগ্য তাই তাঁর মনকে ছেয়ে থাকে। তাই সে যেহে দৃষ্টবর্ণনার পাঠ্যের গোপে, ঘনর কোপে, বাকের নুখে half highlight এর দরস কোমল ইচ্ছারাল পটভূমির গোপে পড়ে না। কিন্তু এত মদ্র কথা

পুস্তকের সম্পূর্ণভাটুকু আর কোন্ কবি হৃদয়ে তুলতে পেরেছেন ? বাৎসরিক বর্ষীয় পুস্তকের এমন মনোজ্ঞ ছবি আর করটা পেরেছি ? এমন একটা দিনের অংশ নিষ্কল ভাব অবাভাবিক চাকিত নিস্তব্ধতা, থেকে থেকে উভল বাতাসের আকালন, আকাশ আর পৃথিবীর মাঝের দূরভাটুকু কামরে এনে, গাঢ়ের মাধ্যম ওপর দিয়ে দৃষ্টিয়ে দিতে, কারণ পুস্তক-তার মাঝখানে সর্বত্রের প্রাণমিমা অথবা উজ্জল ক'রে, মেঘের দৃক পাখীর ভাবের ঝাঁপন অথবা স্পষ্ট ক'রে তুলে, সাহসের চোখে একটা দ্রিষ্ট আবেগের অতন লাগিয়ে, প্রাণে নবীনতার মরম সিকন এনে দিয়ে, মেঘের আবরণের ভেতর তার দৃষ্টিকে একটা সুদূরের বাসনার বিস্তারণ ক'রে, নির্বিড় আঁখলের আবেগের মতো বিধ্বস্ততার আরতন ছোট ক'রে এনে তার মনে পরম নির্ভর আর বিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে দিয়ে বহুসময়ের যে পূর্ণ রূপটি আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ায় তার সম্পূর্ণ প্রকাশ, নির্মূল চিত্রণ, কি উচ্চ লাইনগুলিতে পরিণত নয় ? অল্প কথার অনিত্যের পথিকের কী স্পষ্ট জীবন্ত ছবি—সমস্ত চরাচর তখন নিস্তব্ধ, চরত বা পাতার কীকে একটা দৃষ্টি পাখীর করণ বর আর নিঃসহায় চাহনি দেখানে একমাত্র প্রাণের পরিচয় ; গাছগুলি নিঃকুম, কেবল বিপন্ন থেকে বর বর বৃষ্টি পড়ার শব্দ কানে আসে। চোখে পড়ে বাতাসের সোলাস নামের শিবগুলির সিন্ধেপ। মনে লাগে পল্লীসুখগুলির বহু উন্নয়ন নিঃসহায়, আর বৃষ্টির কাছে বুক পেতে দিয়ে খোলা হাতের নন্দ মত বৈশেষ্য ভাব। তার মাঝখানে দেখি প্রাণের ঝবৎ উঁচু একটিমাত্র সত শব্দ দিয়ে পথিকের শিখিল চরণে চ'লে যাওয়া, তার চোখে আশ্রয়বিকিতের নিঃসহায় ভাব, প্রত্যেক কুটারবানির দিকে বাগ্ন চকল দৃষ্টিপাত, সামনে ঘন অন্ধকার। অহুত্বের আবেগপ্রাবলাই কাবোর প্রাণবন্ত, আর তারই উজ্জ্বলে দিকিত ব'লে বর্ণনা এত মরম, এত নবীন, এত জগৎপ্রাপ্ত, এত সুলাভান। তেমনি যখন কবি তাঁর ভিন্নপরিচিতকে দেখতে পান না তখনকার অবস্থা—

যদিহি কিছু দেখিতো যদি পাই
তোমার শব্দ কোথায় জাতি তাই।

হৃদয় কোন মর্মান পায়ে
গমন কোন্ নামের বায়ে
স্বপ্নের কোন্ অন্ধকারে
চরত কবি পাবে,
সংসারের বন্ধুরে মাঝারে।

অকল্পিত ভাঙের দৃষ্টি একটা মরম লক্ষ্য রেখার কিক্র তানে কেমন সাধা বনানীর পুত্র চোখের ওপর চেলে গড়ে। কড়ের ভাঙে, কাশলা অন্ধকারে, বহু অলৌকিক কালো ভাঙার মধ্যে অবেদী মনের সঙ্গে সঙ্গে দেন আমরাও নিজেদের চারিত্রে বেশি। ঐ পুত্র আর মর্মানভঙ্গ্য কথাত্তি কেমন ক'রে পুস্তকের অংশটুকু মাঝে গাড়িয়ে তোলে, বা থেকে আমরা বুঝতে পারি কত আশ্রয়সাধা এত অহুত্বকান। সুদূর নদী, গহন বন, গভীর অন্ধকার তার মাঝখানে দিয়ে যে চ'লে যায় সে নিজে আশ্রয় ক'রে অংশটুকু। এই অন্ধকারে কি কিয় তার গতি? গানের ছন্দে লক্ষ্য যুক্ত গতিতে তার প্রতিবন্ধি এমনতে পাই; চরত অলৌকিক মাঝে গুনতে পাই স্বপ্নভাঙা নদীর চ'লে তরু বেগ, নিস্তব্ধ বনের মধ্যে গাছের মাধ্যম কৃত বাতাসের বন্দন, গভীর অন্ধকারে শুকনো পাতা আর ভূগের ওপর এক প: পড়ার শব্দ; চরত কীটো গুণের মধ্যে উদ্বিগ্ন গোশনচারা পথিক গলেতে গলেতে কৃতবার বন্ধকে গাড়িয়ে পড়ে। কোন্ সে বিদ্যুত নদীর ওপারে মলের ওপর রূপালি মাগো আর এলাবের গহন বনের অন্ধকার মিলে একটা নির্বিড় রহস্যলোকের সৃষ্টি করে ? তার মধ্যে উৎসব-কটকিত অচল দৃষ্টিতে অভিভার ! সেতো একগুণের শব্দ চলা নয়, সে কোন কল্পলোকের সনে সুদূর-গমন।

এই প্রাকৃতিক স্বপ্নভাঙা থেকে বিদ্যার নিঃসহায় কল্পনার সীমানার এসে পড়ি। এ কবিভাটুকুকে বিশেষ ক'রে কল্পনাগ্রন্থান বলেছি এই কারণ—এতে কোথাও যেহি বাস্তব জীবন থেকে অহুত্ব অটনবলী বা চরিত্র বেছে নিয়ে তাদের একটা কাহিনিক ভঙ্গিতে সংস্থান ক'রে এক বিচিত্র মাধ্যমলোকের সৃষ্টি করা হয়েছে; কখন যেহি সামান্য একটা কথার ব্যবহারে, মাত্র তার শব্দসম্মার বা



ভাবের আভাসে, সমস্ত বর্ণন: একটি অধ্যাত্মিক-
মৌলিকতার প্রত্যয় উদ্ভাসিত করে উঠেছে, আবার কোথাও
অবাঞ্ছিত কল্পনার শাওনোটি নিম্নপ্ত স্তম্ভ বাস্তবতার মনোরম
বিস্তার করেছে। বর্ণন শক্তি—

“তোমার সোনার আলোর লাভার আর
প্রবেশ অলম্ব্য”।

কিংবা প্রচুরতার পাণ্ডুর কারে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে।

তখন বৃত্তে পারি এ মাত্র ধ্বংসলীতা নয়, স্বভাববর্ণনা
নয়, এ কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির রঙ তেজস্ব
ছক। এ চিত্রকাব্যগুলি চরকম, কোনটি নিশ্চল ছবি,
কোনটি গুলি। ২৩, ৪২, ৮৪, ১৩৩, ১৩৫, ১৪৫,
১৫৩, ১৫৭ নং গানগুলি প্রথম শ্রেণীর। এতে কবির
ভাবের বাস্তবতার কোন একরকম মধ্যস্থতা পূর্বে পেরে
তার প্রকাশেই নিজে প্রকাশিত হয়। তার পেছনে
কোন জড়ত্বের আশ্রয় নেই। জগতের সব মাথাগল থেকে
বিচ্ছিন্ন করে কেবল ভাবের অসীম শূন্যে প্রত্যক্ষার মতন
নিঃসৃত জ্যোতিতে নিজেই উদ্ভাসিত হয়ে প্রভা
বিকীরণ করতে থাকে—হির অমণ্ডল নিশ্চল ভাবে।
যেমন—

যখন বাতাস আঁধার ভলে
চাঁপ বাতাস বহু পড়লে।

এখানে আনন্দের একটি আত্মিক সৃষ্টি তার নিজস্ব
ভরমার প্রতিভাত হয়। রক্তশতদল ছিন্নিষ্ঠ মনে না
ভাবলে বা চোখে না দেখলে কেন বৃত্তে পারি না
চাঁপ বাতাস পারিবে কমনীর তপটি কমন। এখানে এ গুলি
হির ছবি, চলচ্চিত্র নয়। আনন্দের হির জ্যোতির মাঝে
আমরা চেয়ে থাকি হির নির্বাক বিষয়ে; কোন মৌলিক
বা মানসিক চাকলা প্রকাশ করি না। তাবের এই
নিঃসৃত আনন্দপ্রাণের ছবিতে নানা মনোভাবের রং বেগুলা
হয়—১০ নং গানটি চোখের চিত্রিত রূপ। ২৫ নং গানের রূপ;
সুরকে দেখি আশো, হাওয়া বা কবীর উলসরণে। ৪২ নং
গানটির আকাশের পারে তারা বা সোনার পতঙ্গল্লপে

আনন্দের উজ্জল স্রি। ১০৫ নং গানও আনন্দের রূপ :
৮৪ এবং ১৩৩ নং গান দুটিতে ভাব নিজে কোন বিশিষ্ট বেশ
না পরিগ্রহণ করে একটা বিস্তৃত জীবন রূপের মধ্যে
পরিব্যাপ্ত হয়ে সেটাকে চিত্রিত করে। ৮৪ নং কবির
চিত্রময়ের মাঝের সঙ্গে জীবনলক্ষ্যের সৃষ্টিমাধ্যমে তেলে
ঘাতের ছবি দেখতে পাই। অস্তিত্বে গান গেয়ে গেয়ে
যেলে বিবেচন অমূল্যমানের আবেগে ঘুরে বেড়াবার ব্যস্ততা।
বাঁকা তিনটি গানও এই রকম গীতোচ্ছাসের আনন্দবিরতির
সজ্জিত বেশ, তবে বর্ণন বড় লক্ষ্য, আভ্যন্তরীণ সুল্লভটি তেমন
করে চোখে পড়ে না—

বসন্ত ফুল মলিন ফুল দুলায় অংশমানে
শরিত পার শরিতে চাক টুটে,
চাকিরা মিক তামার কত বসন্ত
কল্যাণ-বন দলীর পোশাক

মূল শ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবির রূপসৃষ্টি মধ্যে সমস্ত
আগ্নেয় স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। এটি প্রত্যক্ষ
গানগুলিতে একটা নাটকীয় সঙ্গতি আর পূর্ণতা চোখে
পড়ে। বেশ বড় শব্দের ওপর ছবি আঁকা হয়েছে। এ গুলি
কবির স্বকল্পনার উজ্জলতম স্রুতির স্রষ্টা অংগ ভাবের
ঐক্যসূত্রে প্রথিত। ৪৫, ৪৮, ৭৭ নং গান তিনটিতে কবির
অন্তরতম বাসনার প্রকাশ। ৩১, ৩২, ৩৮, ৮৭ নং গানগুলি
অবহেলাজনিত অসুযোগের ও পঙ্কজাশ্রয়ের স্বাক্ষর।
৫৭, ৮১, ৮২, ১৩৬, ৩২ নং এ বিষয়প্রসূত বিষমজ্ঞানভাত।
পেয়ে ১৩৫ নং গ্রাণ্ডজনিত হর্ষোচ্ছাস। এ কবিতাগুলির
বিষয়বস্তু ভাবের বৈচিত্র্য অমূল্য কল্পনার মীমাংসা ও বৈজ্ঞানের
বৈচিত্র্য। সে বৈচিত্র্য অংশমানে বা ধ্বংসপ্রাপ্তপ্রসূত
নয়, বড় অনিবার্য। উপরোক্ত শ্রেণীতেই সমস্ত
গানগুলিতে ভাব আর ভাবের অংশমানে স্রুতি আছে।

বাসনামূলক গানগুলি সবই সত্যসূত। আনন্দবিরতির
পারে চরম সাধনার সল উৎসর্গমাননে কবির বিনীত
নিবেদন আর অসম্মতিভিঙ্গা—যেবহার পাঠে হৃদয়ের অর্ঘ্য।
আনন্দমূলক বাসনার যোগে হয় সব চেয়ে সহজ ও সরল প্রকাশ;
গানগুলি সুপরিচিত—

কণ সাধরে তুল দিলেছি
অতপরতন আশা করি
যাটে যাটে দুঃখ না আশ
ভাসিয়ে আবার জীবিত্তী
সমর-যেন হুসরে এখার
টেই পাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
কথার এখার ভলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে র'ব মরি ।
যে খান কানে যাবে না শোনে
সে খান যেখান নিভা থাকে ;
আগের মীমা নিয়ে যাবে
সেই অতলের সমাধানে ।

চিহ্ননিম্নের দুইটি পোনে
পোনে খানে তার কাটা কেটে
নীলব-খিনি ঠাকুর পায়ে
নীলব বীণা দিয়ে বরি ।

ভাবের এট পতি, অনাড়ম্বর এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য।
এট যৌবন অনিবার্যতা পঞ্চ উপলব্ধি করা যায় ।
সত্যের পোনের খান গেয়ে পাওয়া ছাড়া উপায় নেই (৭৭) ।

অল্পশোচনা আর পশ্চাত্তাপশূলক পানগুলিও বড়ই সুন্দর ।
এগুলিতেও প্রকাশ তরুর লালুপ লক্ষ্য করবার বিষয় । সব-
গুলিতেই প্রথমে বিদ্রব, বেলীর ভাগ নিভাভয়ের পর ; এবং
পরে হতাশা বগুয়া । সবগুলিতেই অবশেষে এবং অনবধানতা-
জনিত বিবেকের ভঙ্গনা । সবগুলিতেই কবির বীণা কোন
কমৌকিক করে থেকে গুঠে ; তার শব্দের বাতাস, তার
রাত্রের স্বপ্ন কোন হুয়তিতে ত'রে বার ; পুনিকম্পাতেও
দুঃখনা লাগে, কিন্তু দুখ ভালে না । প্রতিবার চাতের বদন-
মালা হাতেই থেকে যায় । ৩৮ নং গানটিতে নাটকাত্মকতা
পরিণতি আর লুপ্তবর্ণনা রময়িত । বর্ণনার মধ্যে দিয়ে একটি
পদ গ'ড়ে গুঠে, বার পোনের দিকের সমাপান প্রকৃত নাটকের
চমৎকতিপূর্ণ—

সত্যের আমি কোথায় চাই উঠ
আমর ত্যাগিত্য পোনে যাঁহিরাই চুটি
চাইব যখন তখন গিয়ে য'লে
যেবা দুটি আঁখি হ'ল না তেমনার মানে
যখন দুটি এসেছিলো আঁখি লাগে ।

কল্পনার চাতুর্ঘা এবং ক্ষুষ্টির ক্রি মনোহর উপাধরণ ।
কোন্ রাতে কবির ভাগে এ আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল ?
তখন—

নিহিত পুত্রী, পথিক ছিল না পদে
এক চলি বেলে তোমার সোনার বা
যায়েক বাড়িয়া মোর ব্যাভ্রন পানে
তোমারো তব কলম বরনপায়ে

কত নীলব পুত্রী সে যাঁর বাইরে গ্রিক ভোজের পুণকণে
নিখর রাজপথ প্রকাশিত ক'রে একটি রবের চকিত কনকনা
তনতে পাওয়া গেছলো ? কবিদের হাতে যেমন কত আশা

কাব্যে কপাটচূর্ণা (Eloquence) একটা বড়
সম্পদ । সেটা ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বাহিনীর আর অলম্ব্যের
প্রাথমিক এবং প্রকৃত পরিণতির ফল । মিশ্রিত
অলম্ব্যের ছোট গীতিকবিতার আকীকতা প্রতিষ্ঠিত হয়,
আর তার ফলে রচনাটি ঘটে । শেখরীর সুখে কল্পনা
আর রক্তের হবির অবিরল প্রোতকে প্রতিবুদ্ধিতে সংঘত করতে
হয় । কপাটচূর্ণার এই স্বতঃস্ফূর্ত উপাধরণবল এই গানটি
উদ্ধৃত করলুম । কোথায় এবং কেমন সে ক্ষণের মাগর
তা কেউ জানে না, তাতে ভুব-সেওয়া হরত কামনিক অগতের
ঘটনা, কিন্তু গানের শেষ লাইন পর্বত সে ঘটনাটি চাণিত
হয় প্রাপতিক নিরমবন্ধনের দ্বারাই, তা নীলে মরমগতের
কবিপ্রাণ বিধানে উচ্ছ্ব হই না, তার চকল মন আবাদ মানে
না । ভুব-সেওয়ার এই হবির ক্রম আর পরিণতি সারা
কবিতাটির মধ্যে কোথাও ব্যাহত হয় না । হবি-মেখে
কাম্যদের মনে পর পর যে আশা আগে সে গুলি পূর্ণ হয় ।
রূপমাগরে ভুব দিলে প্রভা ছাড়া আর কিসে তলিয়ে যেতে
পারা যায় ? আর তার তলার কি মন্ডর প্রোদ্য, ক্ষুষ্টির
তত্ত নেই ? তার চারিদিকে কি ভীষণ মরমের তীম
পারাবারের গর্জন আর আকাশন তনতে পাই না ? তার
ভোরের পামনে মর্শর সোপানে মাছড়ে গ'ড়ে সে কেনোচ্ছাস
কি লাভ হ'রে যায় না ? কল্পনোলের মাঝখানে সে এক
সুপ্রতির স্বপ্নপুত্রী, চকল প্রাবনের মধ্যে নীলব তত্ত প্রকাশিত ।
সেই সত্যের গিয়ে—



নিধে কে সে এক বার ব্যগ্রভাবে বাতাসের পানে চেয়ে দেখলে
এক অমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই বা চ'লে গেল কেন ?

যাক্, অনেক নিষ্ফলতা, অনেক ভেগে থাকার পর
কোন এক কোণাখরী রাতে কবি তাঁর বাহিরের ঘোষা
পান। সে শুভ দুহুকের ইতিহাস জানা নেই, রহস্য সেটা
কবিরই অগোচর কেননা তাঁর তখন দ্যাননিগ্ৰহ আপন
ভোলা অকথা—“একলা ব'লে আপন মনে গাইতেছিলাম
পান”, এমন সময়ে “তোমার কানে গেল সে সুত্র, এলে তুরি
নেমে।” দেখা গেল কবি বলেন—“আমাকে যদি আগলে
আজি নাথ, কিহো না তবে কিহো না, কর কর
আঁধিপাত” (৮১)। এই প্রাপ্তির দুহুর্ন্ত ভলিকে কবি তাঁর
স্বরের আলোয়, করনার রঙ অতিথর উজ্জল ক'রে
রেখেছেন। নানঃ রূপে, নানা ভাবে তাঁর পরম প্রি়তমকে
বরণ করেছেন। কেথোত তত্বকে অতর্কিত অবস্থায়
পেরে দেবতা খেলাঙ্কলে তাকে ছলনা করেন। কখন
কে বেন “বরিত্র ক্ষৌর মলিন বেগে লজ্জাচেতে একটি
কোণে” এসে লুকিয়ে থাকে, রাতে কিছু প্রবল হয়ে পলে
দেবালয়ে আর “মলিন রাতে পুঙ্খার বলি চরণ করে”
(৮২)। কখন আবার প্রাণে দেখা দি়ে ডাক দি়ে
বার, তার পর কোন্‌খানে লুকিয়ে থাকে তা কেউ জানে

না, কিছু দেই চাখিবে কোণার ততাপার মধো কোণা
ত'তে আবার লাড়া বেগ” (১০৩)। কবিকে তাঁর
বিশ্ববিজ্ঞান হ'লে বীকার করতে হয়—“তোমারে অস্ত
নাই গো অস্ত নাই, বায়ে বায়ে নূতন লীলা তাই।”
অতএব এই কালের রাত্রি তোর হবার পর নবজীবনের
আলোর গিরে যখন “আবার এ চাত ধরবে কাছে এসে,
লাগবে প্রাণে নূতন তাবের ঘোর” (১০৪)। সে নূতন
দেখা পরম দেখা, সব চোঙা সব লাগতার সমাপ্তি।
সেখানে উষ্মের বড় কড়াবাত নেই, সেখানে আছে
স্থির শত্রুপূর্ণ শান্তির বিড় উজ্জল আলো আর চিরন্তন
শ্রোমের মলয় পরণ। সেই মহান প্রশান্ত নিশ্চলতা—

হায়ে কোর নেব আর কি বেশি চরি,
পুষ আকাশ, নীরব নই রহি,
তোমার চরণপানে নবন করি নত
চুম্বন বাড়িকে মাঝে কখন।

কবির করনার ঐশ্বর্যের এই সস্তার পিমেব নণিকোণার
সামগ্রী। ভাবের সংহত প্রতিবেশ এক শুভ দুহুকে
শিয়ার তুলির অপেক্ষা করতে থাকে। কবি আর
শিয়ার সৃষ্টির সে এক পরম দুহুর্ন্ত; একটা চলিত
সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে পূর্ণ সৃষ্টির দরক।



নয়নামতীর চর

বন্দে আপা মিয়া

বরষার জল পবিয়া গিয়াছে জাপিরা উঠেছে চর,
 গাঙ পানিকেরা গঠ খুঁড়িরা বাধিতেছে লবে ঘর ।
 পঠিন নদাস ভই পাত দিবে অঁাধি দার বত ঘূরে
 আকণের মেঘ অতিশি বেন গো জাহার আঙিনা ছুড়ে ।
 মাছরাঙা পানী এক মনে চের ককিতে 'আছে বদি'
 অঁড়িতেছে ডানা বজ্রহংস—পালক বেঁতেছে বদি' ।
 তট ততে ঘূরে হাঁটু মগে নামি' এক পায়ে করি' ভর
 মংগোর ধ্যানে বক চুটি চাবি লাগিয়াছে পবিবহ ।
 পান্‌না মেলিয়া কচি রোদে তরে উমানী তিত্তির পানী
 ব্যকেবারে ভটি ডানা ঝাপটিয়া ধূলাবাণি লর মানি' ।
 বিরহিত চন্দী চব্বারে পাইয়া কত কী যে কথা কহ, কহ,
 গাঙটিল শুধু উড়িয়া বেড়ায় লকল পদ্যময় ।
 'চুনো না'রের গল্লের 'লরে তরে তরে কাঁচা রোদে
 দারি কঙ্কণ নিত জনপাল আগলে নয়ন মোহে ।
 বুনা সাউ গাছে টি টিড শাখা বেঁথেছে পাতার বালা,
 বাবুয়ার ডাণে হুয়-বন্দিত জানাইছে ডালোবালা ।
 ভোগ না হইতে ডাছক ডাছকী করিতেছে হলকলি ।
 বনতর: ক্ষেতে খুঁজিছে শাবুক পানিকেরা'র সারা বেলি ।
 কাঁচা পানুতটে চরণচিৎ রেখে গেছে বজ্রনা,
 লুচ্ছ লাজের হুঁইচোর শাবী—চাঁহু হুয় আন্‌মনা ।
 ভড়ি খুঁজিতে পানিকের কাঁক করিতেছে কলতব,

তপুয়ের রোদে খাঁ খাঁ করে চর ঘূর গ্রামে মাথা কাণী,
 উত্তরে বায়ে পিঠ মক হতে উড়ে দার মুখু বাণি ।
 অশবের তলে চলিমান দারি' চাবীরা বেঁথেছে কুঁড়ে,
 কাঁচা ববনীস আলোর ডাকতে এসেচে সে মাটি কুঁড়ে ।
 ছায়া আর রোদে তিকিমিকি মলে চাতার উর্দিবল,
 কুলে কুলে তার আছাড়িয়া-পড়া দিনে রাতে কোলাহল ।
 তপুয়ে যেদিন নেমেছে সন্ধ্যা মেঘেতে ঢেকেছে বেলা,
 গায়ের মেহেরা ঘাটে জল নিতে আসিতে না করে হেলা ।
 ক্ষেত আদে একা—বল বেঁধে কেহ—চলে তাবা ভাড়াভাড়ি,
 পথে যেতে যেতে খুঁজে দিবে পক ভাড়াইছা, আনে বাড়ী ।
 গোচালের শালে শুকানো যে খুঁটে ধামে তরি' তা গর'
 ককির বেড়া দরিয়া বন্দা প্রায়-পথ চেয়ে রয় ।
 হোকারার বউ ননী পানে দাখ কোথা গেছে নেয়ে তার,
 এমন বাবলে কোন্‌ হাটে তার বিকাইবে সন্ধ্যার !
 মাল বোনা ভূমি জেলের বুঝী বিতর দিবল পথে,
 কোথা ঘরে মাছ সে গে যে তাগাব এমন উতলা অগে ।
 কানো মেঘে ভায় পূর্ণ ঈশান ভোরে জোরে বায় বহ,
 বলাকার দারি লক্ষ্মের কাঁক উড়িছে আকাশময় ।

আলোচনা

বালা বিবাহ

শ্রীমায়া দেবী

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি শ্রীযুক্ত হরবিলাস সারদার বিল লইয়া একটা মহা আলোচন চলিয়াছে, কাগজও মতে তাম্রা ভাল,—কাগজও মতে মন্দ। বালা বিবাহ ভাল কি মন্দ, তাগারে উপকার হই কি অপকার হয়, সে সব বিষয়ে আমি কোন কলাই বলিতেছি না, আমি শুধু উভয়ের প্রতিবাদ করিতেছি ঘাঁড়ারা বলিতেছেন ইহাতে দর্শকের হানি হয়। উভারা মত দুইতে প্রত্যেকের পর স্নোকে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছেন, দৃষ্টি ও তর্কমাণা সঙ্গমাণ করিতে চাহেন, ইহা দর্শকের গানিকত। প্রকার করিয়ায়:—আমিও তাহাদের কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, আপা করি উত্তর পাইবা।

১) কখন কখন সন্তান এখনও বালায় গুরুগুণে সম্বরণীয়বলন করিয়া পাঠ্যভ্যাস পূর্ণক যৌকন গৃহী হন?

২) কখন কখন গুণে বজাতি প্রসঙ্গিত রাধেন?

৩) কখন কখন অধাধন ও অধ্যাপনার জীবন অস্তিত্বকিত করেন?

৪) কে পকাশ বংসর অস্তিত্বকিত করিলে বাপপ্রত গ্রহণ করেন?

৫) কখন নির্লোভ, সত্যব্রত, বিদ্যান, ব্রহ্মবিশ্ব, রাখন আছেন?

৬) কহিহ বা কায়বের মতো কখন গুরু বিগ-চাষিতে মণে লয়েন?

৭) আদীনতা সীনতার কে বাচিতে চাহ, দাদন মুখ্য বল কে পণিবে পাথ? বলিবার মত নকি অর্গিও কখন কবিরের মাচে?

৮) কখন কহিহ বিশেষের বকা, আর্ন্তের সাহায্য, নারীও লভন, এবং শিও ও উদ্ধেব প্রাণ বকাপে দাপ্তরন হন?

(৯) কখন বৈত্র আতিও দলভোভাবে বৈত্রগতি অকলখন করেন?

(১০) কখন কখন কখন কখন কখন পুজিত হন?

আপা করি মহুহ পদ্ধতি ও ইহাদের আদি কালিকাল জীবন যাত্রা অনেক প্রভেব হইয়াছে। আমার ধারণা ইহাও গুরুগুণে কহই দিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ, কহিহ, কায়ব, বৈত্র ভাষিতে সমাজের পার্শ্ববর্তী; ইহাদের ভিতর হইতে সন্তান সন্তান বাকি লাগর পাবে বাইতেছেন,—ইহাও ত এককালে দর্শকের কতি জনক ছিল, তবে তাহা চলি কি করিয়া?

এ বিক ছাড়াই বালা বিবাহ দয়া দাক! এ

জিজ্ঞাসা—আমাদের আধুনিক সভ্যতার বর্তমান লালিয়াছে, উভারা সত্যই কি দ্বোতা দানের পক্ষপাতী?

মুখে দিনি দারাই বলুন, পিরোমণি, তর্কচূড়ামণি, নাস্তী বা বাচস্পতি,—কেহই আজকাল খীহ কভাকে দ্বোতা দান কহিয়া পদমার্গ লাভের বাসনা করেন না, বরং দেখা যায় কভা, একটু শিকিও ও বরহা হয়, এবং ১০ বা ১২ বংসরের অধিক বংসরের সতি তাহাও বিবাহ না হয় ইহাই প্রত্যেক পিতামাতা ইচ্ছা করেন। তৎপূর্ণ পাত্রও পুজিয়া থাকেন। অষ্টন বর্ষী কভাকে চতুর্বিংশ বর্ষী দূতকের হস্তে সম্ভবান করিবার কখন বর্ষপাল বিদ্যুও আজকাল করেন না।

প্রস্তরঃ দেখা বাইতেছে উভবর্ষের ভিতর বালা বিবাহ বহুই কমিয়া আসিতেছে। বালা বিবাহ এখনও অধিক্ত নিরস্ত্রণীয় ভিতরেই পণ্ডিত। তবে কি বুঝিতে হইবে কিস্থ-বর্ষ-সংস্রপ রূপ মন্ত বর্তবা, কেবল মাত্র ভাটি, ভোম, কামার, কাগজের কর্তবা? তাহায়াই চতুর্দশী কভার বিবাহ বিশেষ কিস্থবর্ষ পতিত হইবে?

বিবিধ সংগ্রহ

চলচ্চিত্রে ক্রাইস্ট

দশ বৎসর পূর্বে চলচ্চিত্রে পুট মূর্তি প্রদর্শন বিশেষ অপব্যয়ের বিষয় বহিরা পরিগণিত হইত। পাশ্চাত্যের মতে ইহা স্বাভাৱ উৎসাহজনক প্রতীতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আটের দিক হইতে চলচ্চিত্রের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য এখন আর, ত মত পোষণ করিতে পারেন না। এখন নির্জাত



খ্রীষ্টের চিত্রিত্ব ডা. ডেব্‌ ডাব্‌

উপাসনার সময়ে চলচ্চিত্রে পুটচিত্রিত প্রদর্শিত হয়। দশ বৎসর পূর্বে ধর্ম্মবিরোধক কিন্তু যে আসৌ ছিল না। তাহা নহ, তবে বাস্তবিক মনে তত্ক্ষণ উল্লেখ করিতে পারে এমন ক্রিয়েটর একতাই অভাব ছিল।

বেনেডিক্ট নামক চিত্র লগুনে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইচ্ছা পূরক এত বেশী দিন যাবৎ কোনও চিত্র ত্রুটি প্রদর্শিত হয় নাই। বেনেডিক্টের দীর্ঘ একপান্নি চার মাত্র দেখান হইত।

কিং অব কিংস নামক চিত্রেই দশপ্রথম পুটের সম্পূর্ণ মূর্তি প্রদর্শিত হয়। এই চিত্রখানি প্রথমে বিচ্ছিন্ন প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রদত্ত হয় পরে যখন দৃশ্যসমূহের প্রদর্শিত করা হইবার আয়োজন হয় তখন ইচ্ছা বিচ্ছিন্ন নামাধিক হইতে নানা আয়োজনের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতের সংবাদপত্রগুলিও এই আয়োজনের দৃষ্টি সংগঠিত ছিলেন। বিলাতের কিশ দেসব এই চিত্র প্রদর্শনে অসুস্থমতি যেন নাই, লগুন কাউন্টি কাউন্সিলের অসুস্থমতি হইয়া ইহা সাধারণে প্রদর্শিত হয়। কাউন্টি কাউন্সিল অসুস্থমতি দিবার সময়ে কতকগুলি সত্ত্ব করা হইয়া লগুনাছিল, যথা, এই ক্রিয়েটর দৃষ্টিত অপর কোনও চিত্র প্রদর্শিত হইবে না, প্রদর্শনের সময়ে বর্ণকণা ধূমপান করিতে পারিবে না ইত্যাদি।

এখন মনে হয় এই প্রকারের দৃষ্টি যদি থাকেই প্রচার দৃষ্টিত প্রদর্শিত হয় তবে পাশ্চাত্যের দিক হইতে কোনও আপত্তি উঠিবে না।

কিং অব কিংসের মত এত বেশী দিন আর কোনও চিত্র প্রদর্শিত হয় নাই। আমাদের বৈদ্যিক জীবনের দৃষ্টিত ব্যাধি-রোগ এমন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে ধর্ম্মবিরোধক কিন্তু বস্তু বৈদ্য প্রদর্শিত হয় ততট মূল চলচ্চিত্র প্রদর্শনের স্বাভাৱ্য ও ন্যাতিবিরোধক উপদেশ দানে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। আশা কর:



গার—ইংল্যান্ডের ধর্মগুরুজন এই বিষয়ে আমেরিকার
উদাহরণ গ্রহণ করিলেন। আমেরিকার হুতিমুখ্যই
নৈতিক ও স্বতন্ত্রপ্রাণেরা চেলভিয়ার দ্বারা প্রচুর উপকার
পারিয়া গিয়াছে।

বিলিভিয়ার্স মোশন শিক্ষার ফাউন্ডেশন নামক এক
সমবায়ী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের তত্ত্ব কতকগুলি চিত্র প্রস্তুত
করিয়াছিলেন। চিত্রগুলিতে বিশেষ করিয়া পুই নৃসিং
নানাভাবে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।
এই সমবায়ী ট্রান্সমিটর পুই উলিয়ার হারমোন নামক

পরিচালিত হইত। অল্পের অনেক মনে করেন ধর্ম-
মন্দির কোনও প্রকার চিত্র দ্বারা পরিপোষিত হওয়া উচিত
নয় কিন্তু জানালায় চিত্র দিবার পোস্তার মত অতি
হইত না পরন্তু যুগে যুগে জনসাধারণের মধ্যে
বাইবেলের কাহিনী জনপ্রিয়তা করিয়া প্রচার করিবার
উদ্দেশ্যেই চিত্রিত হইত। প্রাচীন বাণিজ্যিক যুগে
একখানি ভাল চিত্র দ্বারা দশ সহস্র বাকের কাণ্ডা হয়।
বিলিভিয়ার্স মোশন শিক্ষার সমবায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা
জানাপার কাঠের চিত্রের অল্পকরণে পুই চিত্রের ফিট-

একজন মাস্টার জনসমূহ কণ্ঠক
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রধান
উদ্দেশ্য ছিল পুই উলিয়ার
অভিনেতা দ্বারা কতকগুলি
অসাম্প্রদায়িক চিত্র প্রস্তুত করিবার
যাচাই কর্মসমিতির উপাদান সমগ্র
এই চিত্রগুলি উপাদানকে মনে
ভুক্তি আনয়ন করিতে পারে।

পুইর উপাদানকরণ উপাদান
সাধারণতঃ এই চিত্রগুলিকে কি
ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা লিখ্য:
এক আশ্বাসের উৎপত্তি হয়।
কারণ পুইর পাত্রাণের মধ্যে



শেষ ভাগ

অনেকেরই ধারণা যে চেলভিয়ার দ্বারা জনসমাজে
নৈতিক অধনতি হইয়াছে এবং ইহা অনেক পরিবারে
অনেক অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। এখন কিন্তু
তাঁহাদের আর সে মত নাই, এখন তাঁহাদের মধ্যে
অনেকেই চেলভিয়ার সাহায্যে উপদেশ গ্রহণ
করেন।

পুরাতন ধর্মসমিতির জানাপার বিচিত্র কাচ হইতেই
ধর্মবিষয়ক কিছু পরিচালিত হয়। বহু শতাব্দী ধর্ম
/সিদ্ধান্ত চিত্রিত জানাপা ধর্মসমিতির পৌরষের বিষয় বলিয়া

গুলি প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই সকল চিত্র বাইবেলের কাহিনীগুলি লক্ষ্য ভাবে
নিরূপণ করিতে তাঁহাদের অনেক ব্যাধি বিশিষ্ট অতিক্রম
করিতে হইয়াছে। নানাপ্রকার লোকমতেরও অল্পমরণ
করিতে হইয়াছে। কারণ ক্রাইষ্টকে নানা লোকে নানাভাবে
বেখিয়া থাকেন। রোমান কাথলিকদের মতে ক্রাইষ্ট
পৃথিবীর ছাং, কঠোর এত ব্যক্তি ও মর্মান্বিত হইয়াছিলেন এবং
মানুষের নানাপ্রকার পাপাচারে এত ক্রোধাবিত হইয়াছিলেন
যে তিনি কখনও মাপেন নাই। আর এক সম্প্রদায়

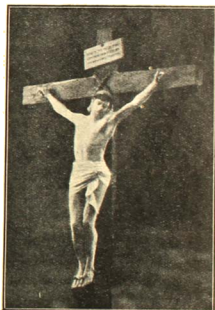


খ্রীষ্ট ও মেরি ম্যাগডলিন

ক্রাইস্টকে বলিষ্ঠ, পেশাবল্ল, বলবান যোদ্ধার চক্ষে দেখেন। তাঁহার্য্য মনে করেন যিহুদী বীরের জাতি তিনি লক্ষ লক্ষ বিপদ আপদের সম্মুখীন হইতেন। নিজের মনের গির্ঘে তিনি লজ্জা। উদাশীন থাকিতেন এবং মানবের চক্ষে দেখিয়া যেমন ব্যথিত হইতেন তেমনই তাঁহার্য্যের আনন্দে তিনি আনন্ডিত হইয়া উঠিতেন। এই প্রকার নানা সম্ভাব্যের লোকের নানাপ্রকারের মনোভাবের সামঞ্জস্য করিয়া ফিলিপ্পি প্রেরিত করিতে হইয়াছে। কোনও সম্ভাব্যের মনে বাহ্যতে কোনও প্রকার আঘাত না লাগিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তথ্যনিরূপণের ক্ষমতা অনেক পরিপ্রদ করিতে হইয়াছে। ইজ্রায়েলের জাতি ও পুণ্ডতন যিহুদায়েলের অধিবাসীকৃত তাঁহার্য্যের বৈমন্ডিন জীবনের সম্পূর্ণ ভাবে কোনও প্রকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায় নাই। মেজর ডলি ও তাঁহার লবকদ্বিগণকে লক্ষ লক্ষ বিঘ্নে নানাভাবে অহুসস্থান করিয়া সেই সময়ে প্রচলিত রীতি নীতি, শোষণক পরিচ্ছদ ও সাম্প্রদায়িক আচরণ ব্যবহারের বিষয় বহু পক্ষেপা করিতে হইয়াছে। চিত্র-গুলিকে স্বতন্ত্র লক্ষ্য বস্তুকি ভাবে প্রতিকলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

চারিখানি ফিলিপ্পি প্রদর্শনের চিত্র প্রেরিত হইয়াছে (১) ক্রাইস্ট তাঁহার লম্বাশোচকগণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। (২) অনাহৃত অতিথি। (৩) আনন্দের জন্য হইতে মুক্ত কর। (৪) নব-ধর্ম-পালক। এই চিত্রগুলি হইতে কতকগুলি চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল। চিত্রগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় অভিনেতাদের তাঁহার্য্যের কার্য্যে কতটা লক্ষ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার্য্য লম্বাশোচকগণের চিত্রের সচিৎ পরিচিত তাঁহার্য্য এই চিত্রগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যবিত্ত হইবেন।



খ্রীষ্ট

সামান্যত বায়োফোপে শোষণক পরিচ্ছদ ও আদ্যব-ইতিহাসিক দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় কিন্তু



লাটাটাস-এর পুনর্জীবন

মেজর ডলি দে সব দিকে খুব বেশা মনোনিবেশ না করিয়া বাইবেলের গল্পটি যাহাতে জমজমাটী করিয়া অভিনীত হয় সেই দিকেই তিনি তাঁহার সমস্ত উত্তম ও গুটী নিয়োজিত করিয়াছেন।

চিত্রগুলি প্রদর্শন করিবার সময়ে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া চিত্রগুলি প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহাদের উপদেশ বক্তের সহিত পালন করিতেন। এই ভাবে চিত্র-গুলিকে তিনি সঙ্গীতসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।

অভিনয়ের সময়ে যখন বাগোকাশের সাহাবো কটো তোলা হইত তখন অনেক লোক আসিয়া ভিড় করিত—

সেই ভিড়ের মধ্যে দেখা গিয়াছে—অনেকেই বিশেষ প্রকার সহিত দাঁড়াইয়া দেখিত কেহ কেহ বা অশ্রুসঞ্চার করিতে পারিত না।

আর একটি সুবিধা হইয়াছিল অভিনেতৃগণের মধ্যে তিনশত বিয়োগলিখ্য কলেজের ছাত্র ছিলেন—তাঁহারা

তাঁহাদের সমস্ত মন দিয়াই অভিনয় করিতেন। এই লক্ষণ কারণে অভিনয়গুলি যেনো হইয়া উঠিতে পারিত।

এই চিত্রগুলি আমেরিকা প্রায় তিনশত পিয়ার উপাসনার সময়ে ব্যবহৃত হয়। অনেক সুবিধালয়ীরা বিদ্যালয়ে বা লোক বালিকাদের নিকটও প্রদর্শিত হয়।

যদি এই ভাবে চলকিতের উন্নতি সাধিত হয়, তাহা করা যাইতে পারে যে এমন সময়ে আসিবে যখন সমস্ত ধর্ম-



“কিং অব্ কিংস্” নাটকে বাগোকাশের ভূমিকায় এইচ. বি. ওয়াগনার

মন্দিরে উপাসনার সময়ে চলকিতের সাহাবো অভ্যন্তরীণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শ্রীমদাখ্যায় যোষ

সাকারা মেমফিস নগরীর সমাধি

মত পাঁচ বঙ্গের বাবৎ মিশর গভর্ণমেন্ট কার্যে। সহরের
ব্যবস্থা মাইল দক্ষিণে সাকারা সমাধির বননকার্যে নিরত
আছেন। কয়েকটা পিরামিড ও নানা মন্দির মত পারি-
বারিক সমাধি মিনগ্রাই সাকারার সন্মুখ। এই সকল
সমাধির মধ্যে দুইটি মাত্র অলঙ্কারিত আধুনিক। বীভূ-
তির এত বহু সমাধি মিশরে আর নাই। সাকারার সন্মুখের

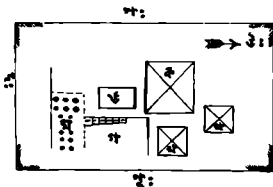
কোতুলপূর্ণ কয়েকটা
হইয়াছিল।

মেমফিস যে প্রাচীন মিশরের সঙ্গপ্রধান নগরী ছিল—
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকল দেশেই বহু নগরীর
চতুঃপার্শ্বের স্থান ক্রমে ক্রমে নগরীর অঙ্গভুক্ত হইয়া পড়ে,
ক্রমে ধনে জনে ঐখানো এত সমৃদ্ধ হইয়া যে, পূর্ণ-নগরীর

প্রাধিকার বহুলাংশে কমিষা আসে—এ
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তেমনি মিশরের রাজধানীও
মেমফিস হইতে সরিষা প্রথমে ফসলাই
ও পরে কারখানাতে আসিয়াছে এবং
মতে মতে মেমফিসের পূর্ণ-নগর ও সমৃদ্ধির কথা
লোকের মনে হইতে শুদ্ধিঃ পিতাঃ বর্তমান
বননের কালে এমন বহু প্রমাণ পাওঁয়া গিয়াছে—
যাচাতে অবশ্যসেই বুঝা যায় সাকারাতে
পূর্বে সমৃদ্ধিবানী নগরীর মত একটা কিছু ছিল। পূর্ব
দিকবর্ত “সাক্সেবা”—নামক—প্রথম রাজবংশই

ইহার স্থাপয়িতা। খ্রিষ্ট-পূর্ব ২৮০০ অব্দে ইহা মিশরের
রাজধানী-তপে পরিণত হয়। খ্রিষ্ট ২০০ বঙ্গের খ্রিষ্টাব্দে মেমফিস
তাহার এই প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়াছিল। পরে তাহার
অবস্থা ধীরে ধীরে লক্ষ্যে গাঁবু ভিন্ন আর কোন নগরীর
তাহার অলঙ্কার অধিকতর উন্নত হয় নাই। শুধু যে রাষ্ট্রীয়
কার্যেই মেমফিসের এত প্রতিপত্তি ছিল তাহা নহে;
আলেকজেন্দ্রিয়ার অভ্যন্তরের পূর্ণ পদাঙ্ক ইহা
উত্তর আফ্রিকার একমাত্র প্রধান বাণিজ্যস্থান
ছিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কারাও জোসেফের পিরামি-
ডই (সিঁড়ি-গালা পিরামিড) সাকারার প্রথম আকর্ষণ।
মিশরের প্রাচীনতম রাজবংশের রাজত্বের সমাধিগুলির অলঙ্কার
বহু অংশে তাহা এই প্রকার পিরামিড জাতীয় সমাধি
জোসেফের কবরের উপরই সঙ্গপ্রধান নিশ্চিত হয়। মাত্র



ক—সিঁড়ি-গালা পিরামিড।

খ, খ—রাজপরিবারের সমাধি, ছোট পিরামিড।

গ—উৎসব-গৃহ।

ঘ—প্রবেশ-দ্বারের স্তম্ভশ্রেণী।

ঙ—অলঙ্কারবিশিষ্ট ছোট অট্টালিকা।

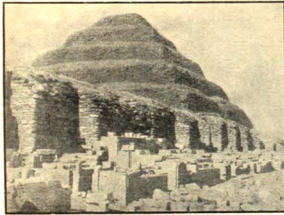
আকর্ষণ—রাফা জোসেফের (Zoser) সিঁড়ি-গালা
পিরামিড (Step-Pyramid) এবং পবিত্র ওসিরিস
(Osiris) দেবতার প্রতীক বৃদ্ধের সমাধি (Apis Bull)।
কয়েক বঙ্গের বিপুল জৈষ্ঠর কালে বিগত যুদ্ধের পুণ্যে
আরও কয়েকটা অট্টালিকার ক্ষতির আভাষ, নানা
মূলের কতকগুলি স্থাপত্যের অংশ ও প্রত্নতাত্ত্বিক



ছোট মণে এই সমাধি মন্দির ২০০ ফিট পণ্ডে উড়ে উঠিয়াছে। ইহা হইতে এক একটী ঘাণের বিশালতা লক্ষ্যে আশ্চর্য করা যায়।

সিঁড়ি-পিরামিডের উত্তর-পূর্বে কোণে আরও দুইটি ছোট ছোট পিরামিড পাওয়া গিয়াছে। এগুলি নিশ্চয়ই রাজ-পরিবারের লোকদের সমাধি। এই ছোট পিরামিড দুইটির উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া দুইটি ভজনালয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। উৎক আগিনা ও পিরামিড-ঘেঁষা দেওয়ালের পাশে একটা কুলুঙ্গি ভিন্ন এই ভজনালয়ের আর কোন সাজসজ্জা নাই। তবে এই মন্দিরের পটভূমিতে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। কেন না দেওয়ালের পাশে যে

রাজবাণেশ্বর আমলে মিশরে যে সব প্রস্তর নির্মিত হইয়াছে, সেগুলি মন্দির। কিন্তু এই ভজনালয়ের প্রস্তরগুলি 'পল তোলা' (শির-বিশিষ্ট)। স্বর্গদেশে, আবার প্রস্তরের গা বাহিয়া দুইটি কৃষ্ণপ্রাকৃত পদার্থ মাখিয়া আদিত্য। ইহা অত্যন্ত বিশেষত্ব বিধর। কেন না, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্দেশ করিয়াছেন যে, এইরূপ পল-তোলা প্রস্তর বহু কাল পরে বেনিচালান এবং আন্তরান-এর সমাধিতে প্রথম নির্মিত হয়। তাহা হইলে বেনিচালানের রাজ্যের বংশের পূর্বে নির্মিত সাক্ষ্যের ভজনালয়ের ইহার অস্তিত্ব প্রথম বিশেষত্ব বস্তু নহে কি? বিশেষত্ব এইরূপ প্রস্তর শুধু অজ্ঞাবধি মিশরের আর কোথাও পুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।



সিঁড়িওয়ালা পিরামিড

প্রস্তর নির্মিত হইয়াছে, তেমন প্রস্তর এই যুগে আর কোথাও দেখা যায় না। কোনওরূপ অবলম্বন ভিন্নও যে প্রস্তর সূচ নির্মিত হইতে পারে—সেই যুগে সেই ব্যাপা লোকের ছিল না। কিন্তু সাক্ষ্যের ভজনালয়ের এই প্রস্তরগুলি ঘেঁষিয়া 'মনে হয় উহার পুণ্ডিতরা এই বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিল না। ঐতিহাসিকভাবে আবলম্বী প্রস্তরনির্মাণ (মিশরের পক্ষম রাজবাণেশ্বর রাজবংশের প্রথম প্রবর্তিত হয়) প্রবর্তিত হইবার প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বেও যেখানে ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে বেশ ডাবিয়া ঘেঁষিবার বিষয়। পক্ষম

প্রধান পিরামিডের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিশাল একটা আগিনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিরামিডের কাছাকাছি এই আগিনার একদিকে পর পর অনেকগুলি ভজনালয় সজ্জিত আছে। প্রত্যেকটি ভজনালয়ের তিনের সমান্তরালভাবে দুইটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। এই ভজনালয়গুলির সঠিক ইতিহাস এখনও উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। তবে অনেক আশঙ্কা করেন যে, মিশরের অতি প্রাচীন যুগে অস্তিত্ব "হেব্রেন্ড" উৎসরের সঙ্গে ইহার নিশ্চয়ই কিছু লক্ষ্য আছে। মিশরীয় রাজবংশের সিংহাসন-আরোহণের মিশ্রব্যাবিক

উৎসবের নাম ছিল “উৎসব” উৎসব। এই কথা মনে করিয়াই পুনরুজ্জীবিত এই ভজনালয়গুলির নাম দিয়াছে— “উৎসব”। এই ভজনালয়গুলির পশ্চাতের দেয়ালেও পূর্ণ-বর্ণিতরূপ “পদ্ম-ভোজা” পত্রবিশিষ্ট গুহ-সারি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গুহগুলির দীর্ঘ পত্রের মধ্যে আবার নৃত্যদত্তর কারুকার্য আছে। পত্রের মধ্যস্থলে ছিত্র কনিষ্ঠা ভাষায় ভিতর দিয়া একটা ভিত্তিনির্মিত চৌক্য বা নল সমূহে গুহগুলির পশ্চাতের ছাওয়ার সঙ্গে লাগানো হইয়াছে। সমস্ত ছাওয়ার অংশিকাগুলির ভিত্তি এই বাবু হইয়াছিল। কেও কেও আবার বালক ভজনালয়ের চিত্রসমাদি প্রকাশনের জন্যবরাহের অন্তরে এই নল লাগানো হয়।

এই সকলের অংশিকাও বেশি কোক্কোলাস্ট্রিক ভজনালয়ের অভ্যন্তরস্থ অচল চিত্রবিরচিতসমূহ। এই বহুভাগগুলি অচল প্রস্তরনির্মিত। কিন্তু এইগুলিকে উৎকৃষ্ট বা বন্ধ করিবার উপায় নাই, একেবারে চিরতরে প্রাণিত। এই বাবের প্রস্তরগুলি এমন ভাবে কুঁদিয়া তোলা হইয়াছে যে, বেশিলে মনে হয় বেন উঠা কাঠনির্মিত। প্রস্তরগাত্রে প্রাণিত এইরূপ কাঠ-প্রমোৎপাদক কারুকার্যই এই অট্টালিকাগুলির প্রধান বিশেষত্ব।

“উৎসব” পশ্চিমে আর একটি ছোট অট্টালিকা আছে। ইহাতে প্রস্তরনির্মিত অচল দ্বার

দ্বার আর নাট।

সাকার্য বাবদ প্রস্তরগুলির একটা বেশ লক্ষ্য করিবার মত বিশেষত্ব আছে। এগুলি সাধারণ প্রস্তর নহে। যেমতিন চটতে কয়েক মাইল দূর “লীম” নদের পূর্ণ তীরে টুবা নামক স্থানে “লীম প্রস্তর” (Lime Stone) খনি আছে। মিশরের পুত্রবিদান আকাশের নির্দেশ আলোকে এই অচল প্রস্তরভবনগুলি যে কি মনোরম দেখাইতে পারে তাহা সচেষ্টই অনুসরণ। বিশেষত প্রস্তর কাটা টুবা চটতে সাকার্য আনিত এবং এট ভবিষ্যৎ অট্টালিকাগুলি নির্মাণ করিতে যে কি পরিমাণ প্রসঙ্গ ও অর্থব্যয় চাইয়াছে, তাহা ভাবিতে বিশেষে নির্দোষ হইয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞের দ্বারা করিয়াছেন, প্রাচীন আমেরিকান স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে মিশরের এই মন্দির-শিল্পের সাদৃশ্য আছে। এই সময়ে অট্টালিকাগুলিতে চটকের সঙ্গে কাঠ, কাকি প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পূর্বেই উক্ত চটকাছে সাকার্য প্রস্তরভবনগুলিতে কাঠ কাঠশিল্পের অঙ্কন-চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। ভাস্কর্যের পূর্বে আর কখনও প্রস্তর-ভবন নির্মাণের কথা শুনা যায় নাট। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রস্তর-ভবন-নির্মাণ-শিল্প মিশরে একেবারেই অতি উন্নত অবস্থার উপনীত হইয়াছিল।

ঈদোজাশ্রনাথ সেনগুপ্ত



প্রসঙ্গ কথা

আচার্য্য ভগদীশচন্দ্রের জন্মদিনোৎসব

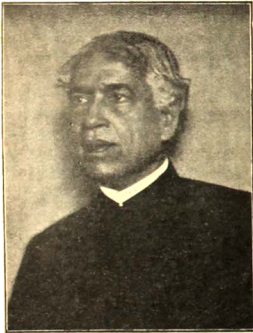
সনিকাতা আগার সাকুল্যার সোডে বহু-বিজ্ঞানমন্দিরে গত ১লা ডিসেম্বর আচার্য্য ভগদীশচন্দ্র বহু মণ্ডপবর সপুষ্টিতম জন্মদিনোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে। যে-লকল মহৎ ব্যক্তি নিঃকলত্র জ্ঞান অথবা প্রতিভার সমাধিভাষ কলত্রের জন্মদিনোৎসব করিতেছেন তাঁহের কলত্রকাল কলত্রের লক্ষ্য-কলত্র-

উপস্থিত হয় এবং আত্মলোকের বহুসকল-সংখ্যা। একটি সংখ্যার ব্যক্তির দিগে চলে যায়। সেই ভক্ত-বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান করে যায়। কোনো মহৎ ব্যক্তির প্রতি প্রজ্ঞাগুলি অর্পণ করেন তাঁহের কারবার সেদিন শুধু দেওয়াই নয়, পাওয়াও। মহৎকে স্বাকার করিতে হলে মহৎকে পারিষা অনিবার্য। শুধির কৌতুক শুধির কৌতুক শুধির আর কিছুই নয়।

অনন্তল্যাবরণ প্রতিভাবলে অগণ্যগণের যে ব্যক্তি অর্জন করেছেন তার প্রকার কেবল মাত্র ভাবতবর্ষের চতুর্দশীমার সংখ্যাই থাকে নয়, সমস্ত পৃথিবীময় তার পরিব্যাপ্তি, বিশ্বের প্রজ্ঞাবেশ ধর্মোন্মত্তির সে ব্যক্তি তাঁর মস্ত উদ্ভাসন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েচে। তাই সেদিন তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর নানা প্রদেশের বর্ণিত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান লক্ষ থেকে অভিনন্দন-লিপির অভাব হয় নি।

ইংরাজি ভাষায় একটি প্রচলন আছে,—A black hen can lay a white egg। আচার্য্য ভগদীশচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ জীবন এবং প্রকৃতির সংগ্রামের লক্ষ্যতার এই লক্ষ্য সত্যের নিগূঢ় মর্মহুই অনেককে উপলব্ধি করতে লক্ষ্য হয়েছেন। যে-সত্য ভগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন তাঁর সত্যবোধের এবং অগুণ্ণবোধের প্রভাবে অনেককে স্বাকার করতেই হয়েছে যে বিশ্ব-জ্ঞান-সত্যতার ভারতবর্ষের দান করবার কিছু থাকতে পারে।

ভগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের অভিনবদের মূল কারণ তাঁর অগুণ্ণবোধ-প্রক্রিয়ার ব্যাধি— যা একাত্তই প্রজ্ঞা প্রণাল্যগত। চিত্তকে অহরণ করে; চতুর্দশীমাত করে তিনি যা দেখেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি দেখেন চতুর্দশীমাত



আচার্য্য ভগদীশচন্দ্র বহু

কণ, অতএব সর্বতোভাবে সারদীর্ঘ এবং বহুদীর্ঘ। প্রতি বৎসর তারিখ অথবা তিথি হিসাবে একদিন সেই ভক্তদিন



চিত্রকাক্স

শিল্পী—ইলিষ্টেবের মিত্র



মাস, ১৩৩৫

বিচিত্রা

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড

মাস, ১৩৩৫

দ্বিতীয় সংখ্যা

কলাগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বিবে আমাদের চারদিকে নানা বস্তু নানা বিষয় পড়ে আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বস্তু জিনিষ আছে, সে হচ্ছে আমি আপনি। এই যে আমার আপনি আছে তাকে জানি কি ক'রে? সে ভগবতের বস্তু ও বিশ্বকে আপন করে। সে যখন বসে এইটি আমাদের আপন তখন সে আপনাকে জানে। বিবে কোন-কিছুই যদি কোনমতে তার আপন না হয়, তা হ'লে সে নেই। তাই উপনিষৎ বলেছেন, পুস্তকে পুস্তক বলে জানি বলেই যে সে আমার প্রিয় তামহ, পুস্তকের মধ্যে আপনাকে জানি বলেই সে আমার প্রিয়।

যেটা আমার আপন আর যেটা আমার আপন নয় তার মধ্যে তফাৎ কত বড় সে একবার ভেবে দেখ। রাস্তা দিয়ে কত লোক চলেছে, তারা আমার কাছে ভাষা বলেই হয়, অর্থাৎ ভাষের সত্তা আমার কাছে স্বীকৃত নয়। কিন্তু যেই ভাষেরই মধ্যে একমন আমার বস্তু হয় অমনি এত বড় তফাৎ ঘটে যে তার পরিমাণ পাওয়া যায় না। মাঝে যখন কিছুই লগে দখল স্থাপন করে তখন-তার

বাক্য আত্মত্বি প্রকৃতি প্রবৃত্ত কোন প্রভাব ঘটে অথচ পুস্তকের থেকে এমন একটা প্রভাব ঘটে যে অমিরঞ্জনার; সত্তা ছিল না তা সত্তা হ'য়ে ওঠে। যদি বেশি স্পন্দন ছুঁতে চেষ্টা করে মোনা করা তা হ'লে সেটাকে আমরা বলি অলৌকিক। আমাদের স্পন্দনবিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্ত যে কাজে ঘটে সে এর চেয়েও অপরম।

রাগা দিয়ে লোক থাকে, তার দিকে চোখ দেগিনে। কিন্তু যদি বেশি সে গাড়ি চাশা লড়ল তবে তখনও সে আমার কাছে কোন বিশিষ্টতা লাভ করে? কারণ তখন তার বেদনা আমাদের বর্জিত করে। অর্থাৎ এতক্ষণ যে মানুষ আমার লগে কেবল ছিল মাত্র, এখন আমার বেদনার সঙ্গে সংস্কৃত চরামাত্র অল্প দূরত্ব পক্ষিপদ থেকে হঠাৎ হ'য়ে আমার লগে বড় ক'রে উঠল। এটি গিঙের মধ্যে তার চোখ ধান মানে এবং অল্প বিধে যে মানুষ বড় এটি পথিক ভ্রমের দৃশ্যের চেয়ে আমার কাছে পাণ্ডার লাভ কবল। তার একমাত্র কারণ, আমার সমস্ত আপন বাস্তব ধারা তাকে স্পন্দ করেছে।



এমনি ক'রেই দেহেত পাঁচ গতোক মাত্ৰ বিধাতার
স্বীকৃত মাফখানে মাঝার একটি আশন স্বীকৃত
করে। অর্থাৎ গতোক মাত্ৰেবের নিজেব জনা তিনিবে
এবং বেছে বেওয়া তিনিবে তৈরী একটি স্বকীয় জনং
আছে। সেই জনংবের উপকরণ প্রত্যেক মাত্ৰেবের লক্ষ্য
পৃথক। শুধু উপকরণ নয়, সেই সব উপকরণের মূল্য
ও বিবরণও পৃথক। আমি আমার জনংবে যে তিনিবে
সামনে রাখি ও তাকে যে মূল্য দিই তার একজন স্বত
সেই তিনিবেকেই শিকনে রাখে এবং তাকে অল্প মূল্য
দেয়। এমনি ক'রে উপাভ্যাসের বিচার সমাবেশে ও
মূল্যভেদে এই স্বকীয় জনংবের পার্থক্যের আর
অর্থ থাকে না।

এই জনংবে দেহেত পাঁচ বিধাতার জনংবে তারার
তারার মিল আছে। সৌমস্রণে গ্রহগুলির বুড়া
পরাশর তার কাটাফাটি করেছে না। কিন্তু মাত্ৰেবের
স্বকীয় জনংবে পরাশর সংখ্যাত চলছেই। কেবল
প্রতিবেশীর লক্ষ্য প্রতিবেশীর বিরোধ ঘটছে তা নয়,
এক পরিবারের ভাইয়ে ভাইয়েও কত বিরোধ। তার
পরে রাজার সঙ্গে প্রজার, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের
বিরোধ। এতেই সব জনংবের অন্তর্ভুক্ত উৎপত্তি করেছে।
মাত্ৰেবের সংসারে পাণ্ডি বড় চল'ত, মুখ বড় অভিরহারা।

এই জনংবে কি ক'রে গোড়া বেঁধে দূর করা যেতে পারে
সেই আলোচনা আমাদের বেগে অনেক দিন থেকেই
চলছে। সেই জনংবের কারণ বুঝতে দিয়ে অবশেষে আমাদের
সংসারের মাফখানে যে আমিটা আছে তাকেই অপরাধী
ব'লে প্রেক্ষতার করা হল। সেই বত ভের ঘটছে। এই
ভের না থাকলে ত কোন বিরোধই থাকে না।

এই জনংবে বিচারে তাকেই দণ্ডনীয় করা চল। বরং
সামান্য নয়, একেবারে আশংক। কোমর বেঁধে পদ করা
হ'ল এই আমিকেই একেবারে বিচলু করা হবে। তার
বত বকম ইচ্ছা আছে সমস্তকেই নিজিয়ে ফেলবার চেষ্টা
চলতে লাগল। শুধু তাই নয়, অপর তার কানে জপ

করা শুরু হল যে, পৃথিবীতে প্রবণে মন্দে বা কিছু অমৃত্যব
এবং মনের মধ্যে বা কিছু প্রকৃতিতে যে সমস্তই ভেঁটি মায়,
তার মতা অস্তিত্ব নেই।

তর্কে এসেব পরাশর করা শুরু। কেননা একটা কথা
অস্বীকার করার মতো নেই যে, এই জনংটা তার বিশেষ
বিশেষ জনং ব'লে গড়ে মন্দে তার বিশেষ বিশেষ অর্থে
আমার আমি-বোধের উপর তার ক'রেই গাড়িয়ে আছে।
আমি-বোধ মূল্যেই এই সব বোধই গুচবে। আমি-বোধের
গুণের পরিবর্তন হ'লেই এই সব বোধেরই গুণের পরিবর্তন
হবে। তা ছাড়া যে ভের-বোধটা লক্ষ্য বিরোধের মূল সেই
ভের-বোধ যদি লুপ্ত হয় তা হ'লে কোনো বোধই থাকে না।
তা হ'লেই গাড়াতে ভোগলোপচেষ্টার আমিকে লোপ করলে
বিষ-আকাতে বা-কিছু আছে সমস্তকেই কাড়ে মূল লোপ
করা হয়। তবু এতেও একদল শিকলো না, তারা মদা-
পূর্ণনামের সাধনাকে স্বীকার করলে, নির্দোষসুখের সন্ধান
প্রদত্ত হ'ল।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা বরকার, শুধু ভেরই
ত বড় কথা নয়, ঐক্যও আছে। এক আমির জনং
এবং আর এক আমির জনং যদি আকাশ পাতাল
তফাক থাকত তাহলে আমাদের না থাকত ভাষা, না থাকত
সমাজ, না থাকত সাহিত্য শিল্প ধর্ম তত্ত্ব। মাত্ৰেবের বা-
কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অর্থাৎ যাতে তার গুণী মানল, সে
সমস্তেরই ভিত্তি হচ্ছে মাত্ৰেবের সাধারণ ঐক্যের মধ্যে।

তা হ'লে গাড়াতে এই যে, মাত্ৰেব যখন এই ভেরটাকেই
ক'রে ঐক্যকে বর্ণ করে তখন বত বিরোধ আর
অমঙ্গল উপস্থিত হয়। জনংবে বিরা মনোভা গুণী গুণের
আমির মধ্যে মঙ্গল আমির ঐক্যটাকেই বত ক'রে য়েবন।
অন্তএব একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, "আমি" কেবল ভেরকেই
বেঁধে, সেই ভেরের মধ্যে ঐক্যকেও সে বেঁধে। সেই জেখাই
লক্ষ্যকে দেখা মঙ্গলকে দেখা দুঃস্বপ্নকে দেখা।

তা হ'লে "আমিকে" লুপ্ত করা আমাদের লক্ষ্য হ'লে
পারে না, "আমির" পার্থক্যসাময়ই আমাদের লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্যকতা ভেদের মধ্যে নেই, ঐক্যের মধ্যে। এই ঐক্য একাকারের নয়। একটা মাত্র লোকা লাইনের ঐক্য কিছুই নয়, কিন্তু ভাবের মধ্যে নানা লাইনের যে ঐক্য সেটাই ঐক্যের ঐক্য। সেখানে ঐক্য আশ্রয় বিচ্ছিন্নতার ভিত্তির মতো নিকটস্থ পূর্ণরূপে লাভ করেছে, সেই লাভের মধ্যে আনন্দ আছে।

“আমি” তেমনি বহু আমিদের মধ্যে যে ঐক্যকে উপলব্ধি করে সেই ঐক্য সত্য ঐক্য, আনন্দের ঐক্য। একে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ পাশে পাশেই অনেক বিরোধ অনেক হুঃ। তাই হ’লে সেই বিরোধকে হুঃকেই চেনা বলা যায় না। না যেমন চলে, না তেমনি অন্তর্ভুক্ত হয়, তাই হ’লে বলা যায় না যে, অন্তর্ভুক্ত হবার ভয়েই পাথের সৃষ্টি। কারণ অগণ অনেক বেশি হ’লেও অগণ চলায় মূল্যও তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই এ সংসারে বিরোধ-ভরিত হঠই হুঃ পাঠি না কেন, মানুষ সেইটেকেই একান্ত হ’লে গ্রহণ করতে না। নিজস্ব স্বাক্ষর সাধনার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত কতদিন চোটা কল্যাণকে লাভ করা, কল্যাণকে স্থায়ী ও সফল করা। এই কল্যাণই হচ্ছে ভেদের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে-সংগঠন, বিরোধের মধ্য দিয়ে মিলনকে লাভ করা। যারা মিলনকেই বড় করে

সেখে তারা বলবে এ লাভ মিলন কই? তারা এটা দেখতে না প্রতিদিনই মিলে। সেই মেলার শেষ নেই। যাদের উদ্দেশ্যে ফল কল্যাণ, কিন্তু সমস্ত গাছটাই আগাগোড়া ফল হয় নি হ’লে তাকে নিষ্ফল ক’রে লাভ নেই। যাদের মধ্যে ফলটাই পরিমাণে কম অথচ সৌন্দর্যে বেশি। মানুষের মধ্যে তেমনি কল্যাণ। যুখে বাই বলুক কিছুতে মানুষ তাকে অবিশ্বাস করতে পারে না। হাজার বিচ্ছিন্নতাতেও এই বিশ্বাস টুল না। কেন না এই বিশ্বাস মানুষের “আমির” অন্তরে নিহিত। এই ভয়েই এই বিশ্বাসমত চলাকেই মানুষ বদল বলে।

“আমি”র মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাকেই একান্ত করার ভাবন ফল সংসারের চারদিকেই প্রচুর পরিমাণে দেখতে অসচ তাকেই মানুষ আপনায় স্বত্বাবলম্ব্যে না; যদি বদল তা হ’লে সেই স্বত্বাবলম্ব্যেই প্রবল কণা ও রক্ত। তারা মানুষের একমাত্র কর্তব্য হ’ত। মানুষের “আমি” নদীর ধারায় মত; সে এক তটের সঙ্গে অনেক ঠটক নিখিল করতে, আবার মিলিত করতে—কেন না তটের মাক্ষানে সে হল, সে গতি, সে গান, সে সংগতি, সে স্বাভা, সে সৌন্দর্য। সে একেই বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিচ্ছিন্নকেই এক করেছে।





—উপস্থাপন—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধুসূদনের সংসারে তার স্থানটা পাকা চলেচে বলেই প্রামাণ্যবাহী প্রত্যাপনা করতে পারত, কিন্তু সে কথা অনুভব করতে পারচে না। বাড়ির চাকর বাকরদের পথে ওর কর্তৃত্বের দাবী চলেচে বলে প্রথমটা ও মনে করেছিল, কিন্তু লগ্নে লগ্নে বুঝতে পারচে যে তার ওর মনে মনে প্রতাপদে বসাতে সাজে নই। ওকে সাহস ক'রে প্রকট প্রবলতা দেখাতে পারলে তারা বেশি বাঁচে এমনি অবস্থা। সেই অজ্ঞেই প্রামা 'তাদেরকে' বহন তখন অনাবশ্যক তৎসনা ও অকারণে করমাস ক'রে কেবলি তাদের ঘোষ ফুটি ধরে। খিট খিট করে। বাপ মা কুলে গাল দেয়, কিছুদিন পূলে এরা বাড়িতেই প্রামা নগ্না ছিল, সেই ক্ষতিটাকে সংসার থেকে মুছে ফেলবার অস্ত্রে খুব কড়াভাবে মাল্যবহার কাঙ্ক্ষ করতে গিয়ে দেখে যে সেটা সূর না। বাড়ির একজন পুরোনো চাকর প্রামার তর্জনি বা সইতে পেরে কাজে ইস্তফা দিলে। তাই নিজে প্রামাকে মাথা টেট করতে চেলো। তার কারণ, নিজের হনতাপা লক্ষ্যে মধুসূদনের কতকগুলো অঙ্গ সংসার আছে। যে সব চাকর তার আর্থিক উন্নতির সমকালবর্তী। তাদের দৃষ্টি বা শব্দগাণকে ও তৃপ্তি পান করে। অল্পবয়সে তারই সেই সমস্কার একটা মনো-চিহ্নিত অভ্যাস

পুরোনো ডের অসম্ভবভাবে আশ্রয় করে গেল অমিলেও নামী আসবাবের মাঝখানেই অদৃষ্টোত্তর প্রতিষ্ঠিত আছে, তার উপরে সেই সেদিনকারই দস্তার দেয়াত, আর একটা লজ্জা বিলিতি কাঠের কলম, যে-কলমে সে তার বাবদারের নবপুণে প্রথম বড়ো একটা দলিলে নাম লই করেছিল। সেই সমস্কার উড়ে চাকর দলি বহন কাজে লগ্না দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্য করলে না, উল্টে সেলোকটার ভাগে বকশিস ফুটে গেল। প্রামাণ্যবাহী এই নিজে ঘোরতর অভিমান করতে গিয়ে দেখে গলে পানি পার না। দখির চাপিষু তাকে দেখতে চেলো। প্রামার দৃষ্টি এটা মধুসূদনকে সে লজ্জাই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের হেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন্ দীয়ার স্পর্শের এসে পৌঁছবে খুব ভয়ে ভয়ে তারি আশ্রয় ক'রে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে প্রামার লক্ষ্যে সমস্কার বা ভাবনা নষ্ট করবার দরকার নেই। আদর-আবদারযুক্ত অপব্যবহার পরিমাণ সজ্ঞা করলেও ত্রুটিময় আগত। অথচ প্রামাকে নিয়ে ওর একটা হুল হকম মোহ আছে, কিন্তু সেই মোহকে বেশি আনা ভোগে লাগিয়েও তাকে অসম্ভব সামলিয়ে চলতে পারে এই আনন্দে মধুসূদন উৎসাহ পায়—এর ব্যতিক্রম হ'লে বহন ছিঁড়ে যেত। কণ্ঠের চেয়ে মধুসূদনের কাছে বড়ো কিছু নেই। সেই কণ্ঠের জন্তে ওর সব চেয়ে দরকার অবিচলিত আশ্রয়

কর্তব্য। তারি সীমার মধ্যে প্রামাণ্য কর্তব্য গ্রহণ করতে
দাওল পাও না। অর্থাৎ একটু পা বাড়ালে গিয়ে উঠতে
পেরে ফিরে আসে। প্রামাণ্য তাই কেবল আপনাকে জানই
করে, দাবী করতে গিয়ে ঠেকে। টাকাকড়ি লাক-লজ্জামে
প্রামাণ্য চিরদিন বঞ্চিত—তার পরে ওর শোভার অস্ত্র নেই।
এতেও তাকে পরিমাণ রক্ষা করে চলতে হয়। এত
বড়ো দাবী কাছে যা অনাচারে প্রত্যাশা করতে পারত
তাও ওর পক্ষে হ্রাস। মধুসূদন মাঝে মাঝে এক
একদিন বুদ্বি হ'য়ে গুরু ভাপড়চোপড় গান-পত্র কিছু
কিছু এনে দেয়, তাতে ওর সংগ্রহের সূখা মেটে না।
ছোট খাটো শোভার সামগ্রী আচ্ছাদ্য কবচার জন্মে
কেবলি হাত চকল হ'য়ে ওঠে। সেখানেও বাধা।
এই রকমেই একটা সামান্য উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে
ওর নিকটবর্তনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু প্রামাণ্য লক্ষ ও লেবা
মধুসূদনের সমগ্রতা হ'য়ে এসেছিল—পান-তানাকের
অভ্যাসেরই মতো লজ্জা অমল গ্রহণ। সেটাতে ব্যাঘাত
ঘটলে মধুসূদনের কালেক্টরী ব্যাঘাত ঘটবে আনন্দের
এবংকার মতো প্রামাণ্য লক্ষ রত্নে যোগে। কিন্তু লক্ষের
তর মাঝার উপর স্থগিত লাগল।

নিম্নের এই রকম হৃদয় অধিকারের মধ্যে প্রামাণ্যমূলক
মনে একটা আনন্ডা পেয়েই ছিল কবে আবার কুসু আপন
সিংহাসনে ফিরে আসে। এই সিংহার পীড়নে তার মনে একটুও
শান্তি নেই। জানে কুসু লক্ষ ওর প্রতিযোগিতা চলেই
না, ওরা এক ক্ষেত্রে গাঁড়ের নেই। কুসু মধুসূদনের
আয়ত্তের অতীত সেই বানোঁ তার অশীম কোষ; আর প্রামাণ্য
তার এত বেশি আয়ত্তের মধ্যে যে, তার ব্যবহার আছে
সুদা নেই। এই নিয়ে প্রামাণ্য অনেক কালারি কঁদেছে, কতবার
মনে করেছে আমার মরণ হ'লেই গাঁড়ি। কপাল চাপড়ে
বলেতে এত বেশি লজ্জা হৃদয় কেন? তার পরে তেমনে
লজ্জা ব'লেই ভাবনা পেলুম, তার পর বেশি তার আদর বেশি,
যে লজ্জা সে হজতে লজ্জা ব'লেই জেতে।

মধুসূদন লক্ষ-প্রামাণ্যে গ্রহণ করেনি, তখন প্রামাণ্য
এত অলঙ্কার ছিল না। সে আপন উপলব্ধী ভাগ্যকে
একরকম ক'রে মেনে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে লামাত

যোগাকর্ষেই থকোঁ মনে জোতো। আজ অধিকার পাওয়া
আর না পাওয়ার মধ্যে লামাত্ত কিছুতেই দটচে
না। হারাই হারাই ভয়ে মন আতঙ্কিত। ভাগ্যের
চেল লাইন এমন কাটা ক'রে পাঠা যে, ভিরেলের তর
সমগ্রই এগু প্রান্ত বুদ্ধিহীন। মোতির মার কাছে মন
খোলাপুণি ক'রে সাহসী পাবার জন্মে একবার চেষ্টা
করেছিল। সে এমন একটা কাকের দ্বারা মাথা কাঁকনি দিয়ে
পাশ কাট্টিরে গেছে যে তার একটা কোন দাঃঘাতিক শোশ
কুলতে পারলে এমনি কুলত, কিন্তু জানে সংসারগাবহার
মধুসূদনের কাছে মোতির মার দাম আছে, সেখানে একটুও
নাড়া দইবে না। সেই অবধি গুরুনের লক্ষা বন্ধ, পাও-
লক্ষে লক্ষ দেখাবেই নেই। এমনি ক'রে এ বাড়িতে
প্রামাণ্য হান লুকের চোর আরো সন্ধান হ'বে গেছে।
কোথায় তার একটুও সন্ধানতা নেই।

এমন সময় একদিন লক্ষ কোলার শোবার ঘরে এসে
দেখে টেবিলের উপর দেখালে কোনো কুসু কটোয়াক।
যে বন্ধ মাঝার পড়বে তারি বিভ্রান্তিমা ওর চোখে এসে
পড়ল। যে মাছকে বঁকনি বিধেতে তারি মতো ক'রে ওর
লুকের ভিতরটা বন্ধক বন্ধক করতে লাগল। ইচ্ছা করে
ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পারবে না। এক চুটে
তারি ত্রাকিরে দেখতে থাকল, লক্ষ বঁকনি, দুই চোখে
একটা দাঃ, দুটা দৃঢ় ক'রে বন্ধ। একটা কিছু ভাঙতে,
একটা কিছু ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এ ঘরে থাকলে এমন
কিছু একটা লোকলান ক'রে দেখবে এই ভয়ে দুটে বঁকিরে
গেল। আপনার ঘরে গিয়ে বিভ্রান্তার উপর উপলু হ'য়ে
প'ড়ে চাষরখানাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ফেললে।

হাত হ'য়ে এল। বাইরে থেকে যেহারা বন্ধ দিলে
মহাশয় শোবার ঘরে জেতে পাঠিয়েছেন। বন্ধবার লক্ষ
নেই যে বাব না। তাড়াতাড়ি উঠে লক্ষ ঘরে একটা বৃত্তকার
চাকাই পাঠি প'রে রাখে একটু দৃঢ় রেখে গেল শোবার
ঘরে। ছবিটা হাতে চোখে না পড়ে এই তার জো। কিন্তু
ঠিক সেই ছবিটার নামলই ঘাতি—লক্ষ আলো বেন
কাজে দীপ্ত লক্ষের মতো ঐ ছবিতে উদ্ভাসিত ক'রে আছে।



সমস্ত ঘরের মধ্যে ঐ ছবিটিই সব চেয়ে চূড়মান। প্রামা
নিরমমতো পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে,
তার পরে পানের কাছে বসে পায়ের হাত বুঝিয়ে নিতে
লাগল। যে কোনো কারণেই হোক আজ মধুসূদন প্রসন্ন
ছিল। বিশাভা হোকনের থেকে একটা রূপার
ফটোগ্রাফের ফ্রেম কিনে এনেছিল। সস্তারভাবে প্রামাকে
বললে,—“এই নাও।” প্রামাকে সমাদর করবার উপলক্ষেও
মধুসূদন মধুও রসের অবভারণায় খেতে কার্পাস্য করে।
কেন না সে জানে তাকে অল্প একটু প্রসন্ন দিলেই ও আর
মথ্যনা রাখতে পারে না। ব্রাউন কাগজে ছিনিবটা মোড়া
ছিল। আন্তে আন্তে কাগজের মোড়কটা বুলে ফেলে বললে,
“কি হবে এটা?”

মধুসূদন বললে, “জানো না, এতে ফটোগ্রাফ
রাখতে হয়।”

প্রামার বৃকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চাটিয়ে
দিলে, বললে, “কান ফটোগ্রাফ রাখবে?”

“তোমার নিজের। সে দিন সেই যে ছবিটা তোয়ানো
হয়েছে।”

“আমার এত সোপানে কান নেই।” ব’লে সেই ফ্রেমটা
ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন আশ্চর্য্য হ’রে বললে, “এর মানে কি
হ’ল?”

“এর মানে কিছুই নেই।” ব’লে মুখে হাত ঘিরে কেঁদে
উঠল, তার পরে বিছানা থেকে মেজের উপর প’ড়ে মাথা
চুপ্তে লাঙ্গল। মধুসূদন ভাবলো, প্রামার কম ঘানের
ছিনিব পছন্দ হয়নি, ওর বাৎকরি ইচ্ছে ছিল একটা বামা
গল্পনা পাখ। সমস্ত দিন আকিদের কাত গেরে এসে এই
উপস্রবটা একটুও ভাল লাগল না। এ যে গ্রাম বিস্তুীরিয়া।
হিস্তুীরিয়ার পরে ওর বিষম অবজা। খুব একটা বসক
বিরে বললে, “ওটা বল্টি, এবনি ওটা।”

প্রামা উঠে ছুট খর থেকে বেটিয়ে ঢ’লে খেল।
মধুসূদন বললে, “এ কিছুতেই চলাবে না।”

মধুসূদন প্রামাকে বিপদভাবেই জানে। নিশ্চয়
ঠাণ্ডেরছিল একটু পরেই ফিরে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে প’ড়ে

মাপ চাইবে—সেই সময়ে খুব শক্ত ক’রে ছুটা কথা শুনিবে
দিতে হবে।

দশটা বাজল প্রামা এলো না। আর একবার প্রামার
ঘরের দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এলো—“মহাশয়
বোশাখা।”

প্রামা বললে, “মহাশয়কে বোলো আমার অস্থ
কয়েছে।”

মধুসূদন ভাবলে, তো আশ্চর্য্য! কম নয়, ছকুম করলে
আসে না।

মনে ঠিক ক’রে রেখেছিল আরো বানিক বাধে
আসবে। তাও এল না! এগারোটা বাজতে মিনিট
পনেরো বাকি। বিছানা ছেড়ে মধুসূদন ক্রতপদে প্রামার
ঘরে গিরে ঢুকল। বেধলে ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে
বেগ বেখা পেল—প্রামা মেজের উপর প’ড়ে আছে।
মধুসূদন ভাবলে এ সমস্ত কেবল আমার কাকুবার মতে।

পর্জন ক’রে বললে, “উঠ এদো বল্টি, খীর উঠে এলো।
জাকামি কেয়ো না।”

প্রামা কিছু না ব’লে উঠে এলো।

পর্জন আদিসে বাবার আগে বাবার পরে শোবার
ঘরে বিশ্রাম করতে এসেই মধুসূদন দেখলে ছবিটি নেই।
কত দিনের মতো আজ প্রামা পান নিয়ে মধুসূদনের সেবার
মতে আগে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। আজ সে অস্থগহিতও।
তাকে তেকে পাঠানো হোলো। বেশ খোখা পেল একটু
কুস্তিভভাবেই সে এল। মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে,
“টোবলের উপর ছবি ছিল, কি হ’ল?”

প্রামা অত্যন্ত বিব্বয়ের ভাণ ক’রে বললে, “ছবি!
কান ছবি।”

ভাবের পরিমাণটা কিছু বেশি হ’রে পড়ল। সাধারণত
পুরুষদের ইতিহাসের শব্দে মেয়েদের অপ্রজ্ঞা মাজে ব’লেই
এটটা লম্বা হয়েছিল।

মধুসূদন ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, “ছবিটা বেখোনি।”

ভ্রামা নিত্যই ভাগ্যোন্মাদব্ধের মত মূগ ক'রে বললে,
“না, যেখিনি তো !”

মধুসূদন গর্জন ক'রে বলে উঠল, “মিথো কথা বলচি !”

“মিথো কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কি ?”

“কোথার বেবেছ বের ক'রে নিয়ে এসো বলচি !

নইলে ভালো হবে না ।”

“ওমা, কি আপদ ! তোমার ছবি আমি কোথার পাব
যে বের ক'রে আনব ?”

বেহাগাকে ডাক পড়ল। মধু তাকে বললে, “মেজো
বাবুকে ডেকে আন ।”

নবীন এলো। মধুসূদন বললে, “বড়ো বৌকে আনিবে নাও ।”

ভ্রামা মূগ থাকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ ক'রে
ব'সে রইল।

নবীন খানিকখন পরে মাথা চুলকতে চুলকতে বললে, “দাদা,
এখানে একবার কি তোমার নিজে বাগতা উচিত হবে না ?
তুমি আপনি গিরে যদি বলো তা হ'লে বৌরাণি খুশি হ'বে না।”

মধুসূদন গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ শুদ্ধভক্তি টেনে বললে,
“মাজা, কাল রবিবার আছে, কাল যাযো ।”

নবীন মোস্তির মার কাছে এসে বললে, “একটা কাজ
ক'রে কেসেচি ।”

“আমার পরামর্শ না নিয়েই ?”

“পরামর্শ নেবার সময় ছিল না ।”

“ত: হ'লে তো সেবাচি বোমাকে পত্তাতে হবে ।”

“সমস্তই নহ। কুঞ্জিতে আমার বুদ্ধিহানে আর
কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিখের স্ত্রী। এই করে সমস্ত
তোমাকে ভাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে
এই—দাদা আম ছুঁদ কহলেন বৌরাণিকে আনানো
চাই। আমি কসু ক'রে ত'লে বললেন তুমি নিজে গিরে
যদি কথটা ভালো ভালো হয়। দাদা কি মেজাজে
ছিলেন রায় হ'য়ে স্কেনেন। তারপর খেচকই ভাবচি
এর কলটা কি হবে।”

“তাসো হবে না। বিশ্রাম-বাবুর যে রকম
আবদানা দেখলুম কি বলতে কি বলবেন, দেখকালে

কুকুকেরের লড়াই
কেন ?”

“প্রথম কারণ বুদ্ধির কোটা ঠিক সেই সময়টোতেই
শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অজ্ঞত। ঘটীর সঙ্গে সেদিন
বৌরাণি যখন কলেন, ‘আমি যাব না’ তার ভিতরকার
মানোটা বুকেছিলুম। তার দাবা কর পরীর নিজে
কলকাতার এলেন তবু এক দিনের ভর্তে মহামাছ দেখতে
স্কেনেন না,—এট আনানটো তার মনে সব চেয়ে
বেচেছিল।”

কেনই মোস্তির মা একটু চমকে উঠল, কথটা কেন
যে আগে তার মনে পড়েনি এইটাই তার আপদা লাগল।
আমলে নিজের অগোচরেও শব্দর বাড়ির মাগামা নিয়ে এর
একটা অজ্ঞার আছে। অত সাধারণ লোকের মত মহামাছ
মধুসূদনেরও কটুখিতার দারির আছে একথা তার মনে বনে না।
সেদিনকার তর্কের অগ্রবস্তিধরণে নবীন একটুখানি উগনি
বিরে বললে, “নিজের বুদ্ধিতে কথটা ‘আমায় গহতো মনে
আগত না, তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।”

“কি রকম জানি ?”

“ঐ যে সে খিন বললে, ‘কটুখিতার দারির আশ্চর্যগণ্য
দারিবেক চেয়েও বড়ো’। ‘তা’ মনে করতে লাগল কোনো
যে মহামাছার মতো অত বড়ো লোকেরও বিশ্রাম-বাবুকে
দেখতে বাগতা উচিত।”

মোস্তির মা হার মানতে তামি নয়, কথটাকে উদ্ধিরে
দিলে, “কাজের সময় এত কাজে কথাও বলতে পারো ! কি
কথা উচিত এখন সেই কথটা ‘তাবে দেখি ।”

“গোড়াতেই লকল কথার শেষ পর্যন্ত তাতে সেনে
তকুতে হয়। আত ভাবা উচিত প্রথম কথটা কি। সেটা
হচ্ছে বিশ্রাম-বাবুকে দাবার দেখতে বাগতা। দেখতে
গিরে তার কলে বা হ'তে পারে তার উপায় এখন চিন্তা
করতে বললে তাতে চিন্তাপিলতার পরিচর দেখা হবে,
কিন্তু সেটা হবে অতিচিন্তাপিলতা।”

“কি জানি আমার বোধ হচ্ছে বুদ্ধি বাধবে।”

(ক্রমশঃ)

পর্দাপ্রথা

শ্রীমতী অমরুণা দেবী

পর্দা-প্রথা ভাল কি মন্দ এ আলোচনা প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়াই চলিতেছে, আমিও এ বিষয়ে কিছু বলিবার উক্ত অগ্রসর হইয়াছি এবং আমার বখাআজ ৫টার কথা বলিব।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে 'পর্দা' পদ্ধতিই আমাদের যুগের নব, এটি বৈদেশিক কার্যসৌ মত। এদেশে মূল্যমান আশ্রমের পূর্বে যে 'পর্দা' প্রথার প্রচলন ছিল না তাহা নতুন হারাই প্রমাণ হয়, পর্দার মত দাবায়ন-প্রচলিত অপর কোন নতুন আমাদের লক্ষ্যকোষে লেখা নাই। বহনিকা পদ্ধতি সন্তুষ্টির দ্বারা উদ্ভূত হইতে, কিন্তু আমূল এটিও সন্তুষ্টি নক নলে, বহন পদ্ধতিতে উৎপন্ন বলিয়া যেন মনে হয়! বহনিকা (বাহনিক?) পদ্ধতি বহন-চর্চায় ঐতিহাসিক ভারত-আশ্রমের পূর্বের কোন কাব্য নটকবিবর্তে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। আমার মনে হয় বহনিকার বা পর্দার ব্যবহার এক্ষণে সর্বপ্রথম আকস্মিকের দ্বারা ইহাতেই আধুনিক আশ্রম হইয়াছিল, চরম পূর্বে আমাদের ঘেঁষে পর্দা কোথায় হীতি ছিল না।

পর্দা ছিল না হউ, কিন্তু 'পর্দাপ্রথা' বলিতে যাহা বুঝার তাহা ছিল কি না সেটা একবার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আশ্রমবিশেষে যথেষ্ট বয়স প্রচলন কালে বহনপ্রথা ছিল না, তাহার বসন্তে প্রমাণ আমরা কেউ উপলব্ধিবিধি এক চাইতে জানিতে পারি। অকস্মিকপ্রথা প্রচলিত থাকিলে আশ্রমভিত্তি লক্ষ্যমাত্র, ব্যবহারপ্রথা সর্বত্রই নারীর মত বয়স উচ্চাধিকার দেখা দাইত না। রাজ্যভিত্তিক রাজ্য পটভূমিতেও পঠিত সত্যমত্রেয় সম্বন্ধীয় চর্চা। অতিথিক চাইতেন। বিবাহ-সভার সমবেত জনগণের সম্মুখে কতক-সম্প্রদায় শাস্ত্রবিধি, রাজকল্যাণে দায়বদ্ধ ও রাজসম্প্রদায় একত্রায় নবী বা কলকৌকী সম্ভাবনাগত নিম্নের মনোমত পঠিনীকাজন করিয়া

লইতেন। মনে করিয়া কেমন,—অবশ্যেবাহিনী, পুরুষ-সংস্পর্শবিবর্তিত। অশিক্ষিতা বালিকা কখনই মতগুলি পুরুষের মধ্যে পটভূমিগে নিতীকভাবে পঠিনীকাজন করিতে পারিত কি?

বয়স প্রাচীনকালে বৈদিক কালে যে যেখানে অধ্যয়ন-বাহিনী এবং অশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা হইতেন না। তাহার প্রমাণস্বরূপে আমি কতকগুলি আশ্রমভিত্তিক নামোদ্ভব করিয়া,—ইহারা লক্ষ্যেই বৈদিকের রচনাই। বয়স-বাহিনী পাণ্ডা বৈদিকের নামই আমরা সত্যের উদ্ভবিত পাই। অনেক বলিয়া থাকেন 'ও রকম হ' একজন নিম্নের বাতিকস্বরূপ সর্বকালেই দেখা দেয়; কিন্তু সত্যি ধর্মীয় বিচারপুঙ্খক দেখিলে অধিকাংশই অশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা ছিলেন বলা যায়।'

কিন্তু যে দেশে মেয়েদের শিক্ষা compulsory, সে দেশেই বালক লক্ষ লক্ষ লেখাপড়া-লেখা ছেলেদের মধ্যে লজ্জার হাজার বৎসরের কালপ্রাপ্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়া পাঠ্য-পাঠ্যের যোগ্য হইয়া কতগুলি সত্যি চাইতে? বৈদিক-যুগের অশিক্ষিতা ও অশিক্ষিতাদের মধ্যে 'মহত্ত্ব' অর্থাৎ বৈদিক-রচনা-কর্মের লক্ষ্য সে দিগেই নিতান্তই কম বলা চলে না। অপর দিকটিতে হইবে, 'তখন আশ্রম-ভিত্তিক লক্ষ্যও পূর্ব বৈদিক ছিল না (এ ঘটনা অশ্রম-ভিত্তিকের পূর্ববর্তী কথা) বৈদিক-রচনা-কর্মের মধ্যে আমরা ইহাদের নাম জানিতে পারি—অপভ্রান্ত-পটী গোপাল, বমী, বিবাহ, আশ্রম, সত্যকর্ম, সত্যপ্রথা, গোপা, স্মিতি, ক্রিয়া, স্মৃতি, অগত্যমতা, ভাষ্যমতা, যেনও, নিম্নবর্তী, গোপাল, সত্যমতা, সত্যমতা, বাসুদেবী, বাসুদেবী, অশ্রম, আশ্রম, সত্যমতা এই বাইজয়ন পূর্ববর্তীকালকাল বিদ্যা নারী বাস্তবিক বিবাহ-কর্মী পানী বৈদিকের নাম লক্ষ লক্ষিত নবনারায়ণী প্রপণ্ডিত। সত্যবিশ্বাসমত,

পর্দাপ্রথা
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

বেদমন্ত্রচর্চারী, মহীষমারী এই সকল মহিলা নিম্নেই অব্যবহৃত-
নিবাসিনী ভৌকস্বভাবা অবলা ছিলেন না। সে যুগের নারী
ব্রাহ্মণের স্ত্রীর পরম পণ্ডিত মহর্ষির সহিত তর্ক-বিচারে
জয়লাভ করিতে পারেন, সে যুগের রমণী নিভাত্ত অবলা বা
কামিনী ছিলেন না। তাঁহারা আৰ্য্য এবং মাতাক্ষপেই
গৃহ ও তপোবনে অধিষ্ঠিতা থাকিতেন তাহাতে সন্দেহ
কি।

ভারতের পূণ্য তপোবনে সেদিনে বাগ্‌দামিনী ব্যক্তির বীণার
স্বাক্ষরে সুখরিত হইয়া উঠিয়া অনাগত নব-যুগের উদ্বোধন-
সঙ্গীত গাহিয়া বিশ্বের সাক্ষাতে নবীন আলোকেরবা
প্রতিফলিত করিতেছিল।

সেদিনের কথা শ্রবণ করিয়াই এ দেশের কবি
পাণ্ডিয়ার্জুন,—

“প্রথম সাধবণ তব তপোবনে,

প্রথম জ্যোতিত তব ধন-ভবনে

জান-বুঝ কত কাব্য কামিনী।”

সভাতা ব্যক্তি, নূতন নূতন সম্পত্তি লাভ হইতে
লাগিল। ধনে জনে ভায়তবর্ণ পরিপূরিত হইয়া গেল,
এক বহুদা হইল। আদ্য সভাতা পত পত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
অনাগা-সভাতাকে নিজের মধ্যে গ্রাস করিয়া লইয়া এক
বিভাত বিংশল মহাভাতি এবং মহত্তর সমাধের সৃষ্টি করিল।
ইহার মধ্যে কোল, তীল, সাঁওতাল, মাগা, বুড়া, ওরাও,
কুকি যেমন, শক, পাখিয়ান বা পায়ল, জন, গুজর, তেমনই
একে একে বা একসাথে মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্রতর তগদিনীসমূহের
মতই আত্মবিলাস সাধন পূর্বক ইহাকে পূর্ণ এবং পরিপত
করিয়া ফুলিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ হইল।

সমাজ-বহুদলে প্রয়োজন ঘটিল। নানা জাতের
সম্মিলনে নব নব সভাতার উদ্দেশে নূতন নূতন আচারের
স্বাক্ষরকতা, নবীন বিধি-নিষেধেরও সন্নিবেশ প্রয়োজনীয়তা
ঘোষা দিল।

নারী পুরুষের সমান অধিকার বর্ণ হইল। তপোবন
এবং কুটীর পরিবর্তিত হইয়া গ্রাম নগর এবং গৃহ স্নানাগার

সকল সম্বন্ধেই গৃহাভিষ্ঠাভাদিগের মধ্যেও কৰ্ম-বিভাগের অবগত
প্রয়োজনীয়তা ঘোষা দিল।

দ্বীপন-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, বস্ত্র শত্রু এবং কলমূল্যদি
মাঝে আর সমগ্রের জীবনযাত্রা-নিষ্কাচ সম্ভব ঘটিল না, সঙ্গে
সঙ্গেই জীবিকাক্ষেত্রের ক্ষয় পথ এবং লব্ধবস্ত্রের সৃষ্টি হইতে
লাগিল। ধর্ম, কৰ্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে,
আচারে, সভাতার ভারত সেদিনে ভগ্নভর ঈর্ষান্বিত এবং
বহনীয় ছিল। ধনজন, বিধব, বিতব, কৃষি, বাণিজ্য
এবং সুবাদি সম্পত্তি রক্ষা এবং ঐ সকলের অক্ষয়
একই ব্যক্তির উপর স্তবত থাকা চলে না, কৰ্ম-বিভাগের
অবগতাব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা ঘোষা দিল,—নর এবং নারীর
শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার উপর ব্যবস্থা করিয়া
উভয়ের কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। একজন ব্যক্তিরেণ কৰ্ম-
কঠিন, দুলি-লাহিত উপার্জনকরত্রে, অপর কৰ্ম-সরল,
শান্তি-মীল গৃহ-সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন।

নারী সৃষ্টিনিধিমে জীব-জন্মনীরাপেই সৃষ্ট,
সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির কার্যে নিয়োজিত হওয়া
সম্ভবপরই হইতে পারে না।

রূপাঙ্গদাক উপনিষদে লিখিত আছে—

“সোমপ্রবীক্ষা নাস্ত্রমস্বান্যনোহপশ্রবঃ। সর্বৈবৈব রেমে।
তস্মাদেকাকী ন সমতে। স বিতীকসিজেৎ। দটীকসি-
নাস বধা গ্ৰীপুমাঃ সৌ সম্প্রিস্কতে। সমমেবাম্বানঃ বেদাহ
শাতরন্তঃ পণ্ডিত পঠো চাহতবত্যা।”

সৃষ্টির পূর্বে গরমাত্মা একা ছিলেন, একা সৃষ্টি করণ,—তাই
তিনি তাঁর বিভীতি ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁর ইচ্ছামতে
তাঁর লগ্না বিদ্যা বিভক্ত হইয়া উঠা হইতে পুরুষ ও পত্নীতর,
নর এবং নারীর সৃষ্টি হইল এবং উভ্যাহা পণ্ডিত্যকে
সম্মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।—জন্ম।

অতএব সৃষ্টি এবং পালনের মধ্যে চকনকারই সম-
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধনীয়কৃত এবং অবিলম্বাদী সভা তর।

পরে নারীর মত অস্ত্র-পুত্রের সৃষ্টি হইল। নানা কারণে
সকল দেশের মূলভা ও মন্দিরভা যানবসনভায়েই
সামাজিক নব-নারীর মধ্যে গৃহকর্ম নিষ্কালাপ ব্যক্তির এবং
অন্তরগুহীকে চই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখা নিষম আছে।



প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত সভ্য সভ্যতায় এ গ্রন্থ বিরাম্য। কোথাও এটো অস্ত্র-পুত্র বিজ্ঞান পাঁচিল দিয়া খেরা, কোথাও বা পদা দিয়া ঢাকা, কোথাও পাহারা দিয়া মাঝ, কোথাও বিধি নিষেধ ব্যাঘ্র নিবদ্ধ। নর বালিরের সমবয়স কার্যে নিমুক্ত রচিত, নারী পুষ্কি ও ভ্রমণী রূপে অস্ত্র-পুত্রের স্থান লইলেন, গার্হস্থ্যপন্য পালন এক সম্মান লাগেনের জন্য ইহাও নিয়োগ এবং প্রমত্ত ইহাতে সন্বেহ নাই। এটরূপে কৰ্ম্মসময় হইল।

তা চউক, এই পৰ্যন্ত আমরা যেইহু দেখিতে পাইলাম ইহাতে বদ্যবার কোন কথা নাই; স্বত্বনিয়মে নারী মাতা, তিনি মানবজননী, সাধারণতঃ নারীকর্ম্ম পক্ষিত্রতা উন্নতিশীল হুমান প্রজনন্য একনিঃ স্তম্ভপূর্ণক। এবং সম্মানের স্থাপনেই, তবে ইহার যে ব্যতিক্রম ঘটবে না এমনও ভো হয় না। সমস্ত মানবপ্রকৃতি এক নর, কেহ সামান্য অর্থেও ভ্রম তুরি ভাষ্যতি ও ঠাইগিরি করে, কেহ বা ভাণ চারখণ্ডের মতই সমস্ত রাজ্য হন অবলীলাক্রমে কোঁচা গার। এই ভ্রমই ভবি বলিয়াছেন—

“কর্ম্ম বৈচিত্র্যং স্বত্ব বৈচিত্র্যং”—এক বহু কুটিল নান।
পক্ষক্যাম্—সকলের কর্ম্ম এক নর,—সকলের পথ এক নর।

পূর্বে যেহী তপোজননিবাদিনী ঋষিকল্পাপন চিত্র কোমারী অকলন পূর্বক বোধ্যায়ে ও তপস্তায় ক্ষীণাতি-পাত করিতেন, এ হুণে সে তপোজনও নাই, সে ঋষিও নাই, কিন্তু সাহসের প্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রেরণাতো আর তা বলিয়া চিত্র-নিষ্ক হইয়া যায় না!—যে সব ঋষি-বাদিনী যেহী পূর্বে চিত্রকোমারী বৃত্ত হইয়া পূজকের সম্বন্ধকতা লাভ করিতেন, এ হুণেও তাঁদের সেই মনোবৃত্তি থাকেও মধ্যে কার্যকরী হইয়া আছে তাঁরা; অস্ত্র-পুত্রের পত্নী কাটায়া প্রী এবং মা হইতে না গালিয়া চাখিতেছেন—যেহ-পূজকের তুল্যাবিকার।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার খুব বেশি কিছু নাই। চিত্র হুণে হুণেই এমন হইয়াছে। আজ সে তপোজন নই, ঋষি-নাই, বৈদ্যবিদ্যার সে পূর্ব গৌরব বর্তমান নাই, তপসী বোধ্যাদিনী ঋষিবাস্য তপো হইতে স্বত্ব হইবে? সহজে ইহাভৌনবিশ পিতার ইংরেজী-পড়া ঘেয়ে কার কাণের বা

শিখা বোঝা আসন্ন, তাহারই জন্য বাবী কুশিরাছে মাস! যাক্কাবক কোণার যে গাগী দেখা দিখেন? যদি সেই পুরু-তপোজন এবং ঋষিপিতার পুনকল্প সম্বন্ধ হয়, ত্র্যম্বিকা-বিশারদা ঋষিকল্পারও ক্ষতাব ঘটবে মনে হয় না। কিন্তু সে বতকন না ঘটতেছে বিবর্তনের বেগ কি বহু থাকিবে?

এখন অমরোবের লব্ধে অহুসন্ধান করিয়া দেখা যাক, এবং এই অহুসন্ধান কলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভারতবর্ষে অমরোব-প্রথা যে আরো ছিল না তা' নহ। প্রাচীন ক্ষত এবং পানী সাহিত্য হইতে প্রমণিত হয় পূর্বকালেও রাজ্যতঃপুত্রবাদিনী কুলকল্পাপনকে ‘অস্থাপ্যজ্ঞা’ বলিয়া বিশেষভাবে সর্ম্ম করা হইত। ‘অস্থাপ্যজ্ঞা’ বলিতে এমনই বুঝায় যে তখনকার তাঁরাও আধুনিক বিচারনিবাদিনী বহু বহ্মানাদিপের মতই অমরোববাদিনী ছিলেন। এখনকার বিহারী অমরোববাদিপের তাঁরা তাঁদের বহুও ব্যা-মানাদার সন্ধিগে ক্ষতাব থাকিত, পথে ঘাটে বাহির তো হইতেনই না। বহ্মাত্যত প্রী-পর্কে দেখা যায়, কুলকুলমদিস্যপের লক্ষ্যে উন্নতি হইয়াছে যে, “পূর্বে বেদপণ্ডে গায়ত্রের হুণাঘোজন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অমরা হইয়া সামান্য লোকের মধ্যেও পণ্ডিত হইতে পারিল।”

গ্রাম্যে অমরাধ্যাক্ষে সামন্তের সক্তি নীতাবেবীর বনগমন উপলক্ষেও এই ব্যাঘ্র কথা বেশ ঘোরের দলই উচিত হইয়াছিল।

এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিককালের পরেই রাজ-রাজ্য-দিপের ক্ষে সাধারণতঃ রানী বা রাজবধূগ লোকসমকে বাহির হইতেন না, তাঁহারা ‘অস্থাপ্যজ্ঞা’ই ছিলেন, কিন্তু তদাৰ্পি এই অমরোবকে আমরা এখনকার মত পদ্য। দিস্যটেন বলিতে পারি না। ইউরোপে বা ইংলেও প্রী-বাদিনীতার বৈদ্যকলেও রানী বা রাজ-বধূগা সাধারণের মত পারে হাটীয়া পথে বাহির হন না, রাজ-রাজকুলের সক্তিবিধির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সর্ম্মভাবে এক সমস্ত কালেই হইয়া থাকিত এবং এখনও বহু ইহাতে পূর্বকল্পে

অর্থাৎ পৌরাণিক কালে নারী হাতেই অবস্ত্রাবাসিনী অম্বাশাশিতা ছিলেন, এমন কথাই প্রমাণ করে না। বৈশাখের অম্বাশাশিতা নাই, কিন্তু তাহায্যের ময়োরের সেবানেও বোলাখুলি ভাবে পথে বাহির হওয়া ঐতিহাসিক।

হাটীয়া রাজ্যান্তিকে, রাজকন্তারা যত্নবহনতায়, প্রাণের দ্বিগুণে দুঃখেরে স্বামীদয় তীর্থ ভ্রমণ বিপদমূল বিজ্ঞানরূপে, সর্বাঙ্গ পতি-নির্ভাচন-করে নগরে বা বনে বহু ভ্রমই প্রবাসিকার উপযুক্ত পাত্রী হইলেই পাইতেন; ইহাও ঐ সকল পুত্রাণ কামিনী মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই পর্দার বিধি তাঁদের ঠিক বলিতে পারি না।

বৌদ্ধধর্মের প্রধানতঃ আমরা রাজ্যান্তার বাহিরের সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত কতকটা পরিচিত হইবার সুযোগ পাই, যেখানে কিছু গম্বুজভাষা ও পুণ্ড্রিকের আমরা অম্বাশাশিতা দেখিতে পাই না অর্থাৎ অম্বাশাশিতা হইলেই অম্বাশাশিতা নহেন। তাঁদের মধ্যে কেহ বুদ্ধতলে তপস্যার লক্ষ্যেরে কত আশায়া প্রদান করিয়া আইসেন, কেহ জীবন-ভিত্তিক সাধকের চরণে বৃত্তপুত্র লইয়া দিয়া দুটাইয়া শূন্য, তাঁদের মধ্যে স্বল্পলক্ষণ পতিপুত্র সর্গভাসিনী হইয়া কত পত্নী প্রভাষাশ্রয়িতা নবমণ্ড ও নৃতন মার্গকে আশ্রয়পূর্ণক বাহিরের কাছে দূর দূরান্তের পথে প্রান্তরে বাহির হইয়া যান। এমন কি সুদূর দিগন্তে যেনে পর্দার রাজ্যান্তঃপুত্রিকা স্বর্গপ্রাচ্য করিয়া আইসেন। বুদ্ধপুত্রী যোগা স্বতন্ত্র প্রভৃতি গুরুজনদের সাহায্যে অম্বাশাশিতা প্রদান করিতেন না, তিনি এ সম্বন্ধে অস্বস্ত হইয়া যে পাখাটি বিনয়িত্বলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করিলে অসম্ভব হয় না—

“পতীর ধীমতের সংঘত, বাক্য ধীমতের সংঘত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ধীমতের সংঘত ও মন নির্মল, বদন আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের কি হইবে? ধীমতের চিত্ত স্বরূপিত, ইন্দ্রিয়সমূহ সংঘত থাকে, অস্ত্র পুরুষের মিত্র ধীমতের চিত্তগমন করে না এবং অ-পতিতেই ধীমতা সমুদ্র থাকেন, চন্দ্র-সুর্গের জায় তাঁহারা উপযুক্ত তাহে একাধা পান, তাঁহাদের বদন আচ্ছাদন করিয়া প্রয়োজন কি?”

“জানকি আপনাদের মন কখন মহাত্মা
পতিত দুঃখ হৃদয়প্রবণে বদনতঃ।
যে মহাশীলপুত্র সংঘত অম্বাশাশিতা
বদনবস্ত্রবস্ত্রঃ প্রদেয়মিতি বিদ্যে—”

“কুখিল ও যৌবন পনের চিত্ত ভানিতে পারেন, আমার মনেরে তাব কি তাম্রা গীতাগীত জানেন, তাঁরা আন ও ভানেন আমার ঐশ্বর্য, যৌবন ও অগ্রমায় তিরস্র, অস্ত্রের আমি আমার বদনে অম্বাশাশিতা করিব কেন?”

অস্ত্রের বুদ্ধা যার যে সুসলমান আমার পূর্ণ হইতেই বনী সম্প্রদায়ের অম্বাশাশিতা এবং অম্বাশাশিতা আরও প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে ভারত হইয়াছিল। কিন্তু সুসলমান আমরনই তো আর এ দেশে প্রথম বৈশেষিক আক্রমণ নয়। গ্রীক, শক, হুন এ সব আক্রমণ তো সেই কবেকার পূর্ণতন কাল হইতেই ভারতের উপর দিয়া। কড়ের ধ্বংস চিত্ত হইছে। চর্চ ও অশিক্ষিত বহিঃকর হইতেই ভারত পতিতে হতভাবতঃ চর্চলতা নারীকে রক্ষা করিবার জন্যই অম্বাশাশিতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বাভাবিক বলিয়াই বেন মনে হয়। সে বহিঃকর হইলে অনেকলক্ষ্যেরে সময় হইতেই ব্যয়েবারে এবং ক্রমগতই দেখা দিতে দ্রুত করে নাই। ইহার পুণের কথা অম্বাশাশিতার সঠিকরূপে জানা যায় না, তবে তখনও ‘মহুদ’, ‘রাশক’, ‘শিশা’ ও ‘গানব’রূপী প্রবল গুরুশক্তের অস্বাভাবিক প্রমাণ কুর-কুরিত্বপে পাওয়া যায়। কাজেই বাধন ক্রমে দূর হইতে দূরতর করিতে হইয়াছে।

তবে আমার মনে হয় অম্বাশাশিতা বিনশিত। নারীকোষে চিত্ত বাসাবিক লক্ষ্যশীলতা-সমুদ্র, এবং স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে অম্বাশাশিতা বস্তুটিকে মনকে মনও লাগে না। লক্ষ্য হইলে অম্বাশাশিতা একটি লক্ষ্য মনুর সৌন্দর্য্য অস্বাভাবিক রহিয়াছে। যেটি নবীনা পত্নী ও বধূর আদর্শটিকে একান্তই পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, মনুরও করিয়া দেয়। নৃতন বউয়ের নৃতন পুণের যৌবন। পাণের জন্ম যে একটা অম্বাশাশিতা কৌতুক এবং উদ্ভাবন। থাকে, সেটি অম্বাশাশিতা মনুর মনকে মনকে নাই, সেটুকু বধূই নিজের বস; সে তাবটুকু ভারতের নিজের ভাব, ইহার উদ্ভাবন আমার কামা নয়। অম্বাশাশিতা এবং অম্বাশাশিতা ঠিক এক বস্তু নহে। অম্বাশাশিতার মধ্যে চর্চলকে চর্চলতর



করিয়া সাধারণ জনম আছে, চকলের প্রতি প্রবেশ কতকটা সম্ভাব্যও যে না আছে তা নয়, এবং এ প্রকার ক্ষেত্রভিত্তিক সমগ্র ন্যায়-সমাজের পার্যায়িক এবং মানসিক ক্ষতি ও অপজয়ের প্রবলতম কারণও নিহতই খটীয়েছে। কিন্তু অস্বস্তিতে যে সব কিছুই নাই, টাংগে তারত-মহিলার স্বাধীনতা নষ্টতা, কষ্টতা ও শোভনশীলতার একটুখানি ক্ষতিয়ায় প্রকটিত হয়। আভিলাষিকার অর্থাধিকতাবন্ধা টেউরোপায়ার সঙ্গে তুলনা করিলেই ইহা সহজে সহ্যতব হইবে। নারীর নারীত্বকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলায় নামই নারীশিক্ষা, ইহার বাস্তবিক বাস্তবে হয়, তাহা আমাদের উদ্বেগসাধনের বাধ্যতাক, সহ্যতব নহে।

আমাদের 'আধুনিক' হিন্দু সমাজে অনেক বিষয়েরই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা খটীয়েছে আমিও তাহা স্বাক্ষর করি না, কিন্তু সে সংস্কার প্রচেষ্টার লক্ষ্য সংস্কার বিবর্তিত সম্পূর্ণ ইউরোপীয় প্রথাগ্ৰাহীভাবে হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় বোধ করি না। আমাদের দেশের এবং অবস্থার উপযোগিতাবেই টাংগে ওয়া উচিত এবং ইহারই আমাদের পক্ষে প্রকৃত স্বাক্ষরনক হইবে বলিয়া আমার সূচিব্যাস।

সাম্প্রদায়িক এই সংস্কারের বৈধত্ব। শুদ্ধবুদ্ধিসংগ্ৰাহী বাস্তব সম্পূর্ণত্ব সংস্কার বর্জন করিতে কেহই পারে না, যদি কেহ করিতে চাহে সে ভ্রান্ত, ভুল পথের পথিক; অথবা সে এক সংস্কার ছাড়িয়া সংস্কারের প্রবণ করিতে বাধ্য। নিজ সংস্কারের লক্ষ্য সংস্কারকেই কৃষ্ণতার অধ্যায়া বিস্তারিত করিতে চাহিয়া ফিরিয়া প্রাক্কলনোচিত নহে। প্রত্যেক সমাজেরই স্বতন্ত্রগতি সমাজবিধি বা সামাজিক সংস্কার থাকে এবং আছে, সেই বিধি সংস্কারগুলি প্রতি সমাজের বিশেষত্ব। বাঙ্গালী সংস্কার ভাষার সমস্ত বিধি নিষেধ ও নিষেধনিষ্ঠা হারাইলেই যে ইংরাজ সমাজভুক্ত হইয়া উঠিবে তা' নয়, এমন কি এ দেশী সংস্কার (বাঙ্গা কৃষ্ণতার বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে) ত্যাগপূর্বক, ইংরাজী সমাজের "কৃষ্ণতার" (যেহেতু ঐ সমাজের এইরূপ সংস্কারভুক্তের অভাব নাই) গ্রহণ করিলেও না। মাত্র সজ্ঞানিয়মিতা ও বিশেষত্ববর্জিত এক নতুন কিছু হইতে পারে এই পর্য্যন্ত! তবে যে সব সাময়িক বিধি-নিষেধ,

কারণ বা কারণান্তরের প্রয়োজনীয়তারোপে সমস্ত-বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যেসব কাণ ও পামাগুলারে সে সকলের স্বকিণে পরিবর্তন বা পরিবর্তন অগ্রহীতবিশেষ হওয়া সম্ভব নহে। বর্ষ সমান্তরিত্তি আচার কখনও সমান্তরিত্তি হইতে পারে না—যেমন পর্বাগ্রহা। যেহেতু বার মূলমান-অনুযোজিত প্রবেশগুলিতেই বিশেষ করিয়া এই প্রথাটি চাঁড়িয়া বসিয়াছিল। ৩-৪ম উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু পাঞ্জাবে অস্বস্তির প্রথা থাকিলেও অপর্যায়ের প্রথা এক্ষণে খুব কম। বাঙ্গালার সহর তিন্ন পট্টগ্রাম ইহার কারণে প্রায় পড়েই নাই। এখনও ইহার পূর্ণ প্রকোপ চলিতেছে বিহার ও বৃহৎ প্রদেশের অধিবাসিনীদের উপর বিস্তারিত। এমন কি যে রাজপুত জাতির নারীশিক্ষা একসময় বৃহৎক্ষেত্রে অগ্র বরিয়াছিলে, আজ তাঁহারা পর্বাগ্রহে জেনানা!

বাঙ্গালার পট্টগ্রামে পর্বাগ্রহ বর্ণিত বা বৃহৎ, বহুতরু বর্ণিত। তেমন কিছু দেখি নাই; বরং এখনই ইহা বাস্তবিত্তেছে। কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠেই বেশিখাছি মেয়েরা পারে হাট্টা নিমন্ত্রণ বাইতে যায়; ঠাকুর বেশিতে, গঙ্গায়ান করিতে, পাকু বেকাইতে পারে হাট্টাই গাভারত করিয়া থাকে, কোন নিষা নাই। বাঙ্গালী আত্মপর্বা বাঙ্গালী চাঁড়িয়া বেহারে আসিয়াই শিখিরাছে, বেহার-বাঙ্গালীর মধ্যে পর্বাটা বেশী। গুজরাৎ বাংলায় কিরীয়াও সেই অভ্যাসটি ছাড়িতে পারেন না এবং তাঁদের গুজরাতে তাঁদের পক্ষীয়তাও পথে বাহির হইতে মুক্তি হইয়া পড়েন। আর সহরে থাকা বাঙ্গালীও অত্যাশ বলাইতে বাধ্য হইয়া আত্মপর্বা করিতে শিখিয়াছেন। সমস্ত বাঙ্গালীর সমস্ত পর্বা আঁটাখাটি ক্রমশঃ কমিয়া এখন নাই বিন্দুসেই হয়।

এখন কথা হইতেছে তবে এ পর্বার চাপাচাপি কাদের উপর? পর্বাগ্রহা উত্তারের ক্ষত্র এত বৈষ্ণব পক্ষিতাই

* বসন্ত এক্ষণে অনেককাল মূলমান-পারিত এবং অধিবাসিত শাবীর বাঙ্গা হইতে পর্বাগ্রহা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে মেন কলকাতা সব কিছুই বৈষ্ণব বিশেষ হইতে আসিয়া চিরকালী বসন্তের লটারিতে, এ প্রথাও তেমন ছাড়িতে ইচ্ছুক বলিতেছে।

বা তবে কেন?—এ প্রস্তাব উত্তর এই যে পর্দার কঠোরতা বাংলায় নাই বলিলেই সব কিছুই নাই এমন কথা বলা যায় না।

বাংলার পর্দার চাপ না থাক, বাংলার বাহিরে 'ডিমসাইলু' বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের (সে লগাখা তো নিত্য কমও নয়) অবস্থারের তার জো একটা আছেই? আর তারই ফলে বর্তমান অবস্থার অর্থাৎ বর্তমান গৃহস্থ লগাখা অনেক সময় অনেক অত্যাচার ও অসুবিধা উপভোগ করিতেও হয়। বসন, কাহারও পাচটি ছেলেমেয়ে লইয়া বৈধবা খটিল। ঘরে পয়সা নাই, বাড়ির খাতেও খাওয়াইতে হইবে; সেলাই বোনা করিয়া পাঁচ বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া আসিতে পারিলেও পরশা উপার্জন হয়,—গাড়ীভাড়া করিয়া ঘুরিতে পাড়া কি লম্বা? গাড়ীর মেয়েটি কোন প্রকারে 'জি' করিয়া ফুলে বিল, গাড়ীভাড়া দিবার পয়সা নাই, ফুলে যায় কি করিয়া? কম বাহিনীর (শিক্ষিত) হইয়াও কিছু হোলপার করা যায়, দরকর ত পথে বাহির হইবার বাস্তি নাই! এমনই এমনই চের অসুবিধা নিবৃত্তি এই লক্ষ্যই দেখিতে পাটতেছি।

“গৃহে অসুবিধাভাং বিজ্ঞান”—দর্শন-শাস্ত্রের ইচ্ছা মূল্যে। ভারতবাসীর অস্তর বাহিরে দুঃখের অভাবের আত্মকৃত্যবলতঃ এদেশে দর্শনশাস্ত্রের বিস্তার ও তাহার গাথা গ্রন্থাচার সৃষ্টি ও প্রচার ঘোষ করি এত বেশি! বাস্তবিক চঃসুবিধাভাং বাস্তব বিজ্ঞানস্বরূপ উদ্ভব হয় না। অত্যাচারিতাই অত্যাচারিত হইয়াছে। এই যে পর্দা উঠানর জন্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐকান্তিক আগ্রহ জাগিয়াছে, পর্দাপ্রথা যদি সকলের পক্ষে সম্ভব হইত, তবে একসঙ্গে সঙ্গে বিহারে উত্তর-পশ্চিমে, উড়িষ্যাতে ভারতের পর্দাপ্রথাভুক্ত সকল প্রদেশের নারী সমাজ মধ্যে পর্দাপ্রথা পরিবর্তনের জন্ত এতখানি আগ্রহ এবং বিস্তার একসঙ্গে আশা জাগিয়া উঠিত না।

অবশ্যে কাননিক গৃহে লইয়া জনকতক ভাবপ্রবণিত মন বা নারী অতিক্রম হইতে পারেন, কিন্তু যেখানে জন হাড়িয়া পূর্ণের মধ্যে বাস্তি হাড়িয়া লম্বীর মনে অত্যাচারিত লক্ষ্যিত হইয়াছে দেখা যায়, সেখানে মুক্তি হইবে সেই

প্রকার মধ্যে পরিভ্রম হইবার মত বিলম্ব বহু আছে, অথবা ইহার পরিবর্তনের কাল জাগিয়াছে।

আমাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার সবচেয়ে কঠিনতা ভোগ করিতে ওর সামান্যের বিহারবাসিনী-কন্যাসমাজে। এদের বড় ঘরের মেয়েরা আর অসুবিধাভুক্ত! ঘরে জানালা থাকে না, অমন সজীবিত, তাই বাপ দাদীপুত্র গ্রাউট চিরকটীন, বোন মেয়ে স্ত্রী মায়েদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ লম্বক সম্পর্ক বড় কম; যার মধ্যে বহুবাহু, চাকরবাকর, রায়ে বিভিন্ন লক্ষ্যময়ের ভাড়া কথা স্ত্রীলোক এই সব লইয়াই তাদের জীবনযাত্রা গ্রাউট নির্ভর হয়। ঘরের মেয়েরা থাকেন বহু অবস্থার “কনিয়া” বনিয়া। অর্থাৎ হুঁচকীন একটি কুহুরিতে ভাড়া ভোরবেলা গিচা চোকেন,—সঙ্গে থাকেন বাপের বাড়ীর দাসী, তা বড়লোকের মেয়ে হইলে এই দাসীর লগাখা বেশ বড় হইলেই বহুত থাকে বড়লোক দেখিয়াছি,— সেই ঘরেই লারবিন এবং বর্ডেক গ্রাউট গাথা কিছু কার্য সম্পন্ন করিতে হয়, বর্ডেকন নিবৃত্তি। অর্থাৎ তাত্র লম্বক বাড়ী নিবৃত্তি হইলে বহুটি পতিগৃহে লগাখাখাচার লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যদি এর পতিবৈধতা এই অস্তরভাংয়ের পটীলম্বনের জন্ত প্রতীক্য করিয়া ‘বাঁচার টান’ ভাগ করিতে লম্বকন তবই,—নতুবা বাঁচার লগাখাও ঐ বাপের বাড়ীর দাসীটিই। ছেলের মা হওয়ার পূর্বে স্বতন্ত্রভাংর কাকপকীটার লহিত কথা কহিবার প্রথা নাই, তা’ বাস্তব যদি সত্যতাও যায়, ছেলের বউ তাঁর ঘরে একটু লগাও দিবে না। এ পর্দা কি ভাল?

আমি জানি বিহারের এক কুমিয়ার কামনা-স্বাভাব বাড়ীর বাবী, বসন্তা রাবার পুরাতাপটী, একবার বৈশাখের এক প্রত্যাহার স্বাগ্রহণে জান করিতে লম্বাখাখাখাটে লগা করেন। বিহারীর মধ্যে কুমিয়ার ও কয়েক এই হই স্রেইই বৈশাখ ভাগ কলোকে, পর্দার লগন এঁদেরই বেশি। রাষ্ট্রীয় পাকী কন্যাতের খোয়াটোনে হুঁচকী open truck এর উপরে চড়ানো হইল। তারপর সাত আট ঘন্টা ঘুরিয়া ট্রেন চলিল। বৈশাখের অস্ত্রবী প্রচণ্ড সৌন্দর্যে লগনিত হইতে হইতে সেই জরিবার মোটা খোয়া ঢাকা পাকীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহার যে কি অবস্থা হইল সে খবর রাখার



প্রয়োজনীয়তা, বাণ কথার ধোয়াবুড়ি নিশ্চয়ই তাঁর শাংক। শঙ্ক-
মিশ্রণে মধ্যে ছিল না। অবশেষে পল্লভৌয়ের পটাবাদের
মধ্যে আনিব। তাঁদের পাঠ্যবানি পদ্যের মধ্যে। গানপনশুক
বাক্যগণ চলিতা পেনে দাইএর। আদিরা। শাবীর পরজা
পুনিয়া চল্লানভৌকে নমিতা। আদিতে অমুংবাব করিতে গিয়া
কেনিল যে তাঁদের গ্রামান্যার সকল পল্লভি মিশ্রণে হইয়াছে,
তিনি যথিতা কাঠে হইয়া আরেন।

এর উপর আর কেনী কথার বলায় পরকার আছে মনে করি
ন, তবে কথার কথারই কথা বাড়ি,—সেবার রেল ট্রেনের
একটা কাণ্ড হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। বিহারের এক বড়িছু
গুরু মন্তর হাটতেছেন, সঙ্গে বিহার মন্দিরবাটের সঙ্গে মোটা
চাকর আশ্রয়মন্তকমতিতা গুমিটিও সেই মোটের মধ্যে।
মোট বনিয়া পুট্টনী পাঠাইয়া বসিয়াছিলেন। ট্রেন খালি,
দুট্টায়া মোটি কুনিয়া প্রত্যহলে কামচার মধ্যে কেলিয়া অল্প
লাগত আনিত ছুটিব, কাড়াচাড়ির গোটে সেই আশ্রয়ের
মোটে পরিণত সিদ্ধান্তিকও তাহারা। মোট আনিয়া কুনিয়া লইয়া
কামচার মধ্যে কেলিয়া ছিল এবং অল্প কুনি সঙ্গে সঙ্গেই
অপর একটা ভারী বোকা ঐ মেয়েটির বাড়ির উপর
কেনিল। আশ্চর্য যে তথ্যটি ইচ্ছা-জানির ভয়ে মেয়েটি
চাঁকর করিয়া কাঁদিয়া উঠে নাই। এখন নরক পুঁজিয়া
অবশেষে মোট-পুট্টার তলা হইতে উঠাকে চানিয়া খালি
করা হইল, তখন তারার অর্ধসুখিত অধরা।

আচ্ছা, যে পর্দা-প্রথা মানুষকে তার পিতা বা পতির
/ স্বাধীন সম্পত্তির মধ্যে পরিণত করিয়া ফেল, মানুষ রাখে না,
সে প্রথার কি কোন পরকার আছে?

আমাদের দেশের লোক যে তারমিত্তার জড়বে ডুবিয়া
মিনে মিনে জড়পদার্থে পলিত হইয়া যাইতেছে, এই সব
জড়বুড়ি ও জড়পদার্থী মাতের পর্তে হানলাত করিয়া তার
চেয়ে ভাল আর কেনন করিয়াট বা হইবে? যাদের
মায়েরা “বুড়প্রাণোম্মানো ৭৭ পড়িয়া ক্রিয়তে তপঃ”—
তাদের মজানদের যে “ন স্ত্রীং ন পরাপতিং”, “ন চ
স্তং প্রোতা নো ইহ”—তপ চর্যপত্র হইতে হইবে, সে এখন
আশ্চর্য কি? এ রকম আন্তিকারী পর্দা-প্রথা যে মন
এক এনকার মিনের পক্ষে একান্তই অগ্রয়োজনীয় তাহাতে

সন্দেহ নাই। নারীর স্বাধীনতা ভগতে নারীকে সর্বাপেক্ষা
পূজা ও বসিতা করিয়াছে। তাঁর সেই স্বাধীনতার সম্মাননা
রক্ষার জন্যে তাঁহাকে স্ত্রীমতা করার জন্যে তাঁহার নিকা জ্ঞান
খর্ব্বুড়ির পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অবিলম্বীয়রূপে
হীত। পত্ন-জননী এবং নর-জননী একইরূপে কেবলমাত্র
গর্ভধারিণী হওয়াই সমস্ত নয়, নদীধিত্তা কর্ণিকতা জননী
তার সন্তানকে পূর্ণ মানবরূপে প্রসিক্ত করিবেন কেনন
করিয়া, তাই উচ্চতর ভাবে মাতা হইতে গেলে তাঁহাকে
উচ্চতম শিক্ষা নীক্ষা সংগর্গ লাভ পূর্ণরূপেই করিতে হইবে।
পর্দা-প্রথা ইহার বিধোদী।

বাংলা দেশ পূর্বে প্রাচিনেও আজকাল পর্দার
কড়াড়ি নাই, তবে পূর্বোক্তর সময় ধনী সম্প্রদায়ের খেত
এখনও পাঠ্যবোর মধ্যে সমন্যমানের রীতি কোথাও
কোথাও আরে তনিয়াছি। ও সব দিকে বহু-ব্যাপারের মধ্যে
চাকর বাকরের সামনে গিয়া গৃহস্থালীর কথ বোকা বড়ই
নিষ্কার কথা, থাকে বলে বাসনাও চান। এই সব হইতে সেবা
দায়, আমায়া কতকাল ধরিয়াই কত পরাপ্রকাশ করিয়া
আদিতেছি। মাঝামাঝি রাজার আভির পর্দা-প্রথা প্রকাশ
ছিল, তাই তাঁদের অধিকতর ও আদর্শে আমায়াও আমাযের
খের পর্দা বাটাইলাম। (অবশ্য সবটাই তর্কিতে নয়, এর
মধ্যে অনেকখানি ভরও ছিল। মেয়ে দ্বারা ভর স্থলমান
আমলে যে কতখানি প্রকাশ ছিল পল্লভী, বেলা বেদী
প্রভৃতির উদাহরণে সে তো কাহাে অমান্য নয়। আর তার
ছোটখাট পুট্টার আশ্রয় পূর্বোক্তর বন্ধে থাকারটাই বর্ত্তেছে
তাও সর্বোপ পত্র বুদ্ধিগেই দেখা যায়)। • বাসনাযের
প্রতি স্বভাবিকভাবেই আলস্ত এবং আমোদপ্রিয়। মাঝামাঝি স্বর
করের মেলপুরুষও তাই তাঁদের অগ্রকরণ “সুফের বাসনা”
এবং “পটর বিবি” বসিলেন। বাক সে বা হইয়া গিয়াছে তা
হইয়া গিয়াছে,—সন্ত পোচনা নাহি—এখন দিন আদিয়াছে
সে তুল শুভমাইবার। “রস মানব বর্ষ” এ বাণী দুল
মেলেরই। এখন আদা গিয়াছে মেয়েদের জড়ব ও অবাধতর

• পূর্বে কতক কতকট প্রথা বা কাহাে দেখিত পাট বুদ্ধ, কর্ণার
স্থলমানের তাই মেয়েদের বাবা করার প্রয়োজনীয়তা দেখিত
হইয়াছে; একটা এইকণ বাবা না হ’লে কি, কুক মিলে কামা কি?”

আমাদের জাতীয় জীবনকে যেমন গড়তার নাগশাশে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তেমন ইংরাজগণের আইনেও পাশেও রাখেন নাই। অশিক্ষিতা বা কুশিক্ষিতা জননীর গর্ভাশ্রয়ের সন্ধান যে শিক্ষার যৌক্তিক বা বিধি রক্তের মধ্যে মিশাইয়া লইয়া লম্বা, সে কি কেউ ভিন্নভাবেও আর বুলাইয়া দিতে পারে? পুত্রগণ যে অতিপ্রাকৃতদোষহীন উপাখ্যান বলিয়া আমরা শুকসেবের নগ্নপাত্রবিধি চাইয়া লম্বাগ্রহণ, মাতৃগর্ভে থাকিয়া অভিমুখ্য বৃদ্ধতের শিক্ষা প্রকৃতি কান্দনীর উপলব্ধি করিয়া থাকি, কিন্তু হৃদয়গর্ভে বিভাগ করিয়া দেখিলে এই সকল পুণ্য কথাকে তিরিগণ মনে করিবার কারণ থাকে না।

মাতৃ বা কিছু বলির সফল লইয়া আসে, তাহা মাতৃগর্ভে হইতেই লইয়া লম্বা, একেবারে নুতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই জাতিতে বড় করিতে হইলে জাতির জননীকে শিক্ষার ও ব্যবস্থা বড় করিতে চাইবে। জেমস রাসেল সত্যই বলিয়াছেন "Earth's noblest thing; a woman Perfect."

আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, বড় বড় জাতীয় জীবন পত্তনের মূৰ্খ পুত্র, মস্ত বড় ধার্মিকের অধাৰ্মিক সন্তান এই মাতৃগণ্যবোধে নিবদ্ধই অদ্বিত্যে। মাতৃশিক্ষার অভাবে বা প্রত্যয়ে শত সহস্র মানব সন্তান লভ্যই অমায়ুবে পরিণত হইতেছে, এ কথা আর নুতন কথা বা গোপন কথা নয়। আত্মপক্ষিত আত্মপক্ষিই অপসংস্কৃতির মূল, সে মলিনবর্ণ পরিপূর্ণ না হইত, আমরা এক অসম্পূর্ণ বিকৃতজাতির লক্ষ্য হইত। তেমনই যেমন সমষ্টিগত যেমনই ব্যক্তিগত প্রতি যাক্‌বের লগ্নতের লক্ষ্যকান্দিই বহাগতিকগণি জননীদের শুদ্ধ জীবন সম্পত্তির মতই তখন ও বোধন মায় করিয়াই পুত্রদের কর্তব্য সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁদের সেই উপনিষদের মূলে মতই "স ইমেবাস্তানঃ বেদাঃ পাতকন্তঃ পতিক পত্নীচাঃ তবতাঃ" এই মহাবাক্যের অর্থগত করিতে হইবে। আপনাকে ধিমা করিয়া পতি পত্নীচাঃ উভয়ে মিলিয়া নুতন সৃষ্টি করিতে হইবে, তারতে নবমূল আনিতে হইবে। ইহার মধ্যে দুষ্ক, ক্লম, অশান্ত, অপ্রয়োজনীয় মোকাচারের বাহা

সে দিনের প্রায়শ্চিন্তে সমাজ-পন্থী ইহা দাঁড়াইয়াছিল মায়, যাহা সঠক ধোয়াটার মাত্র, অচল শাস্ত্রবিধি নয়—সাধারণ জ্ঞান নাই। যদি ইহার লক্ষ্য আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা চাইতেছে এ কথা সত্য হয়, এ বিধি উত্তীর্ণ হইয়া উচিত; যদি পরোপকরণ সংস্কারে সামাজিক লক্ষ্য অগ্রহ ও অগ্রবিধা চাইতেছে হয়, যদি এর লক্ষ্য বালিকাদের কুলে পক্ষা পাওয়া চাইকর হয় এ নিয়ম শিথিল চওয়া বন্ধ যা বিচারে লক্ষ্য কর্তব্য।

অবশ্য আমি পর্দা-প্রথা বদ করিয়া অগ্রপন্থী মেয়েদের ও পুত্রদের মতই 'মহাদ হউন' অধিকার দিতে এখনই বলিতেছি না। কিন্তু যারে দরকারে অবগ্রাহ্যবোধে মেয়েদের পথে বাধার চাইতে পারার অধিকার পাকা উচিত। মহাদই যার পুত্র অতিভাবক থাকে না, —কেউ থাকে না; দারী চাকর এ বিনে ক'জন গম্ভীর গুরু রাখিতে পারেই বা? এ অবস্থার পল্লীগোমে বাহিরে যাত্রা পুৰ্বই সীতি আছে, কিন্তু সফল নাই। আর লোক এখনকার বেশির ভাগই সচরে। তারপর বাড়ার লক্ষ্য মেয়েদুল লেট এক মহাদ। এটার আমি নিজে ভুক্তভোগী; জি-এর গলে ছোট মেয়েটা যদি হাঁটুয়া ঘাইতে পারে, কম টাকার মূল চালান পক্ষ হয় না এক অধৈর্যনিক পাঠশালা খোলাও যায়। এই সব নানা কারণে পর্দা-প্রথা থাক। আর চলে না। আর সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'নাহে' বলিয়া বক্তৃতা শোনা যায় কারে আর ততটা নাইও, তবে সদর বক্তব্য শোনা না থাকিলেই বাস্তবতার পথ পাঠিয়ে তাহা পথেই চলিতে থাকে। ইহাতে যাত্রা এবং পাঠিয়ে অধিকারী হৃদয়বদই লোকদান, লক্ষ্য পক্ষেও বুঝি পোহন হয় না। জিহ্বা অগ্রহণে আমাদের কার কি? আমাদেরই দেশে, আমাদেরই সমাজে এবং যখনই মহাদেবী এবং বালিকাভো মেয়েদের সবচেয়ে উদারতাপূর্ণ ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ হইতেই চলিয়া আসিতেছে (এখানে মন্তব্য আছে, যথাসম্ভি আছে, মন্তব্য নাই, কখনও ছিল না উহা ভারতীয় আদর্শ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সকলে তাহারই অগ্রহণ লোক, এ ছাড়া আমাদের আর বেশী কিছু বলিবার নাই।



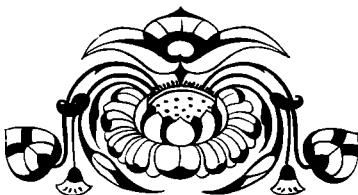
একান্তিচরিত্রমণের প্রতি আমার
আমাদের কঠোর এমন আমাদের উপদ্রবের প্রমাণ কবিতা
এই পদ্যচিত্রের ব্যবহার করে নিজেদের
প্রোডাক্ট ব. বাডাবাডি
ও অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ পাঠ্যে,
কল্যাণ হইবে না। “সংসার পথ্যে”
সব সোশাইজ কোকে বুকে। কড়িও গতি
একত পথে শেষ হয়।

যেই যাবে বেশকালোয়াচিত্রাবে এই আবরণমুক্ত
চাবমকে আমাদের নিঃশব্দ কঠোর তুলিতে হইবে।
যাদোঁতে সব বড় জিনিষ বটে, কিন্তু বীজভাঙ্গা জল, শেফল-
চেঁড় ভাঙে, গাডালে ছড়ান মাখন ঘেঁষে বাধোনমুখি
পুষ্ট নিঃশব্দ নয়। আমরা যদি সংসারমুক্ত হইতে চাই
প্রথমে নিজ পিঠে কঠোর বস্ত্রমণের পুজাচিত্র উড়তে।

মোহনের শিকারমণ্ডলের জীবনযাত্রা না কবিতা নিচা পুষ্ট
অন্তর্ভুক্ত অনিশ্চিত্র অস্ত্রমুক্ত মোহনের পাঠ্যে বাধন পুণ্ডিয়া
বিলেই তাদের সেবা শেষ হইল না। এই কথাটি আমাদের
পল্লবটে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। আর তাদের
অলপার সবুজ শিকার মণ্ডে ঘেঁষে মল্লপ্রধান শিকার
পাঠ্যের ও মাড়র এটুকুও তুলিতে চলিবে না। যতক
বাচিব এবং বাহিরকে সব কঠোর নয়, যতক সব রাখিব
আমাদের বাহিরকে কঠোর করিয়া লইতে হইবে।

পুস্তকের সচিত্র বিশেষ কঠোর আমাদের বাধোনভাব
সমস্তব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমাদের
এ মাঝা মস্তার নহে। বরং কঠোর সচিত্র মনোভাব সচিত্র
তাদের বলিতে হইবে,—

“We mutually
path.”



ঐচ্ছিকপদ্য রস

কোটাং কেমনে সুবায় ভাবনে
 কিশোরের কোকনদ !
 কোকনদ পরে গড়িবে কি-ক'রে
 কিশোরী-ভূমি'র পদ !
 বধিরা দেবীর প্রণাম প্রারম্ভ'
 পূজারী নিবাসে গিয়াছে আরতি ;
 সে-দিনের ডাকে সাজা মিলে বা'কে
 আমি সে-পূজারী নই !
 যে-পূজা যেমতে আজি তার মিছে
 হযো নাকে অভিনয়ী ।

কত দাগ ঘোঁচা বলি, "গেছে বোকা
 তোমার প্রেমের রীতি !
 যত না চপল ততোধিক ধল
 তোমার বুকের স্রীতি ।
 আজীবন নাকি রহে অপেরা'
 আপনা-পাদরা সঁচা প্রেম সে কি ?
 সে কি হুগুড়ী ? সে কি অনবীর ?
 সে কি প্রেম ! সে কি সোনা !
 গেছে গেছে বোকা তোমার দে-খোঁজা
 নিছক্ বিকারাপনা !"

বেশ, তাই হোক ! বুকে ফেল শোক—
 আহারি বভেক ক্রটি ।
 অক্ষমে কমা করো নিকপমা,
 পলাতকে দাগ ছুটি ।
 চিরটি জীবন একটাই থেমে
 কোরো তবে পূজা নিম্নল প্রেমে !
 আপনা পরমি' মিটাইও মাঝ
 পর-বিচারের সাধ !
 আজি শুধু কমা
 বিবুকের অপরাধ ।

বিচিত্রা-



এইচ সাহু

চিত্রশালা

পৃষ্ঠ ৫ মিউজিয়াম

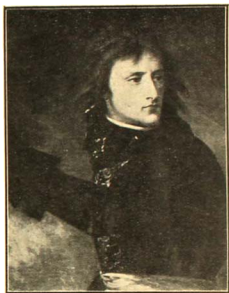


আফ্রোদিতে,

ডেন্ডুস্ ব' মিলো



মণির ডাক



ବୋନାପାର୍ଟ ଏଠା ଆସ୍କୋଲେ



ଡଫ୍ଲମ୍ ଲାୟାର୍

ହାରିଜ୍-ବେରୋ



সেভেরাস্

সিগনো অর্থাৎ



অভিযান

সিগনোবিরে

বাংলা গদ্যের ভাষা

খ্রিস্তোশচন্দ্র ঘটক

মাছুষ পড়ে কথা বলে, পড়ে নর। কিন্তু বেলা যায়
সকল বেগের সাহিত্যই রস লাভ করে পড়ে। পদ্ম যেন
সাহিত্যের রসনা, পদ্ম পরিপূর্ণ বসের সুধি।

এক সংস্কৃত সাহিত্যই এই পড়ার জন-জীবন প্রমাণ।
বেলাই সংস্কৃত সাহিত্যের মূলধন—কিন্তু ঐ বেলা যে পদ্ম
তা বেলা না পড়েও এই থেকে বেলা যায় যে বেদের আর
এক নাম ছন্দ।

অবশ্য বেদের সংস্কৃত শৌকিক সংস্কৃত নর, কিন্তু
শৌকিক সংস্কৃতেরও আদিম গ্রন্থগুলি নিছক পড়ে লেখা।
সাহিত্যিক হতে যেহেতু পূর্ণতা যে একটানা পড়ের প্রোত
ব'য়ে গিয়েছে, তার আগে পাণ্ডের পদ্মের পদ্ম
দেখতে পাই না। যে লব ক্ষেত্র দিয়ে পড়ের ব'য়ে বাবার
কথা—অর্থ্যৎ নন্দন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ইতিহাস—
সেখানেও দেখি পড়ের তরঙ্গলীলা। অর্থ্যৎ পদ্ম কাণ্ডের
বাগে না নিবদ্ধ থেকে একদিন চন্দ্র-ছায়া দিয়ে ঐ সব
ক্ষেত্রকেও ভাসিয়ে দিলে—যদিও তাতে ক'রে ঐ সব
ক্ষেত্রের উপরতা কত দূর বেড়েছিল তা বলা শক্ত।

পদ্ম বদন মরিয়া হ'য়ে উঠে জানের বাজার বিধিবিধি
ছুটে বেড়াচ্ছিল, তখন পদ্ম বেচারী যে, তবু আকৃষ্ট হ'য়ে
সৈন্যধিন কথাবার্তার মধ্যেই পা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ব'লে
থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে আছে আছে
তখনই মাথা তুলতে সাহস করলে বদন পদ্ম অনেকটা
নিভেলে হ'য়ে হাঁপিয়ে পড়েছে। কাবুতরী দেই
দুপেরই কাবা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও গ্রিক এই। বৃত্তীর মত
পতাকা হ'তেই এই সাহিত্যের মাঝে পড়ের মৌলিকতার
সন্ধান মেলে, কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে বদন বিভাগতি
চৌধুরীর দুই উজ্জল নক্ষত্র জ'লে উঠেছে। তখন পদ্ম

পড়ের উত্তর বাংলা যে একটুও তমতি বাধেনি তা বলা
দুরবীণ। তখনই জানেন 'ভাষাট চল' ক'রে ব'লে গেলেন।
ভাবের মতে বৃত্তীর যোজন পতাকাতে কল গোছামীর
'কারিকায়' বাংলা পড়ের প্রথম অংশই মনুনা চোখে পড়ে।

কিন্তু এর কারণ কি? ভাবেন ব'লে গল্প পড়ের
অগ্রগতি তার তব সাহিত্যে তার উদ্দেশ্যে দেখি কেন? এর
প্রথম কারণ যোগ্য এই যে, সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি
হ'লেও—সাহিত্যকে মাছুষ এমন কল দিয়ে গড়তে চায় যা
ভাবেন নেই। সাহিত্য যে সৈন্যধিন জীবনের সাগর উপর
সাগর ধুলিয়ে চলবে না—সে যে তারও অতিরিক্ত কিছু
হবে, এই কথা নিভা দ্বিধা মাছুষেরও অন্ধি মজার ভিতরে
নিহিত আছে। দ্বিতীয় কারণ, পড়ের চেয়ে গল্প লেখা
শক্ত। একটা গল্পে অনেক গল্প চমকে উঠবে, কিন্তু
তলিয়ে দেখলে ঐ আচমকার চমক এক নিমিষের ভেদে
থেকে যায়। পড়ের চমকে একটা 'সহজবোধ্য' নিয়ম
আছে—তার উপরে পতন নিশ্চিৎ কালের গজন যেনে চলে।
তার সুরও, গোলায় মোছাকা যা বলেচেন, সকলের কানেই
অজান্তারে কানিত হতে—একটা মাছুষের নাম, একটা
সাহিত্যের নাম, একটা শাবীর ডাক—সবই যেন এক এক
ছন্দে কবিতার এক একটি ছন্দ।

পড়ে হু হু ভালে যে নেই তা নর, কিন্তু তা যেনন হু হু
ভেমনি চটল। তা যেন সব নিম্নমতে উন্নয়ন ক'রে
নিবন যেনে চলে। তার ভিতরও হিলাব আছে, মাথা
আছে, গজন আছে, কিন্তু তা সকলের কানে বাজে না।
তারি থাড়া পদ্ম লিখতে পারেন, ভাবের পক্ষ পদ্ম লেখা
তত সহজ নর, ব'লে থাড়া পদ্ম লিখতে পারেন ভাবের পক্ষ
পদ্ম লেখা সহজ। আর এট চতুর্দশ আমরা দেখতে পাই—
বড় শেখবের পড়ের চাতিও যেনন পাকা পড়ের চাতিও



তেননি। গায়েব চাত কাঁচা থেকে গেলে—গয় পড়ে অনেক সময় তখন যা যা হ'য়ে ওঠে, গড় কেপে উঠে প্রায়ই পদ্যের চাপে চলে—কিয় সে যথার্থুজ্ঞানবোধের বিভ্রম না। সে না চর পদ্য না চর গদ্য—বা ইংরাজীতে বলতে গেলে—joke, mal and poetry lane.

রূপ গোহাতীষ কারিকার পর বেচ-কড়চা ও ভাষা পরিচ্ছন্ন ভাবনি নবাবিগত সুঁথির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বেচ-কড়চার ভাষার নমুনা এই—তুমি কে? আমি কে? আমি তটুই তাঁব। থাকেন কোথা? তাতে। হাও কিভাবে হইল? তবু বস হইতে। তবু বস কি কি? শক আছা একাবলজ। ছহু টিপু টকা এই লুকন একযোগে ভাঙে হইল।

ভাষা পরিচ্ছন্নতার ভাষার নমুনা এই।

গোতম দুমিকে শিশু সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তারা কুপা করিয়া বলত। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাহাৎ পদার্থ জানিবেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিশুরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন পদার্থ দগ্ধ প্রকার।

ভাবগর বদ্যাবনশীলা ও বদ্যাবনশিক্রমা নামে দুখনি বৈকর গয়। বদ্যাবনশীলার নামান্তর একটু অংশ উদ্ধৃত করছি—

তাহার উত্তরে এক পোরা গণ চারণ পায়াকির পর্কতের উপরে কুঞ্চক্সের চরণ-চিহ্ন দেখ-কসের এবং উটের এবং ছেলির এবং মচির এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন। যে দিবল শ্রেয় লইয়া সেই পর্কতে গিয়াছিলেন সে দিবল ব্রহ্মার গানে বদুন। উজান বহিয়াছিলেন এবং পাশাপাশি গিয়াছিলেন। সেই দিবল এট সব পদচিহ্ন চাইয়াছিলেন।

এর পরই পাই কানীকর হলের কামিনীকুমার। এখানি অষ্টাদশ পতাকীর দেবভাগে রচিত। যে ভাষায় টেকচাঁয় ঠাকুর আশালের ঘরের দ্বন্দ্বাল রচনা করেছিলেন এ সেই ভাষায়ই পুঙ্ক প্রবর্তক। একটু নমুনা দেখুন—

“কামিনী করিলেক গৃহে চোর তুমি আমার কি কণ করিবে, কেবল হুঁকার কণে মদমা নিমুক্ত থাকত, আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া দলল বা কীচাতক ডাকি—আজ হইতে আমি তোমার নাম রামবরড রাখিলাম। এই প্রকার রামবরড তামাক সাজ তখনে নিমুক্ত হইলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবরডের তামাক সাজার এমন অভ্যাস হইয়া গেল যে রামবরড বদ্যাপি ডোজনে কিবা শব্দে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওরে রামবরড কোথায় গেলে ও—রামবরডের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি।”

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হাজীবগোদেন দাস ‘কুঞ্চক্স চরিত’ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এ খনিখানি বেশ খাঁটি বাংলায় লেখা—এর উপর ইংরাজী পদ্যের কোনই প্রভাব নেই। চরার লাইন উদ্ধৃত করলেই বুঝতে পারবেন।

“বৃদ্ধ ভাল চরিতেছে না দেখিবা নবাবের চাকর মোহনলাল নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেন—আপনি কি করেন—আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে নষ্ট করিতে বলিরাছে। নবাব সঙ্গে প্রশর করিয়া বণ কহিতেছে না—অন্তএব নিবেবন আমাকে কিছু সৈন্ত দিয়া পলাবার বাগানে পাঠান—আমি ঘাইয়া বৃদ্ধ করি।”

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার মত কলিকাতার কোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাংলা ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। দ্বুত্বাঙ্কর তর্কালঙ্কার তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ‘প্রবোধ চক্রিকা’ নামে নবা সাহেব-জাতের শিকার মত একখানি বই লিখলেন। খইখানি আভাসা সংস্কৃতই, কেবল অল্পখার বিসর্গ বাহ। এ বাংলা লোকের মূখের বাংলা নয়, বারো প'ড়ে সন্তত ভেঙ্গে গড়া। এই ক্রিয়াম ভাষাই আমাদের চুচাগাক্রমে আধর্ষ শব্দ। বাংলা হ'য়ে গড়াল, এবং আর একখ বছরের উপর হ'ল আধরা এও ক্রিয়াম ভাষায় গড়ার চাপে আরি আরি ডাক ছাড়েছি—কিছু এড়াতেও পারছি না। যদি এ ভাষার নাগদান কটিয়ে

কেউ বাইরে বেড়াবার চেষ্টা করেন, অমনি সাধুবানীর দল ভাষার জাত নষ্ট হ'ল ব'লে চাঁৎকার করে ওঠেন; এমনি ঐ ভাষার মোহ অমায়ের বাড়তে চেপে বসেচে। সেদিনও বহুদূর বাবু ঐ ভাষার আংশিক সমর্থনে বলেছেন—“প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষার অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী সার্বভৌমতা পায়নি, তাইবা: একজন লগুনী কক্কোর বা একজন কৃষকের কথা মাজে বুঝতে পারেন না এবং এতদ্বশে অনেকদিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর লিখিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজরা বাংলা লিখিবাছেন তাইবা: প্রায় একখানি বাংলা গ্রন্থ বুঝতে পারেন না।

বাংলায় লিখিত এবং কথিত ভাষার বট্টা। প্রভেদ দেখা যায় অল্পের তও নহে। বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্বে উইটি লুখক ভাষা বাংলায় প্রচলিত ছিল—একটির নাম মাধুভাষা অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কথিবার ভাষা।”

এ কথার উত্তরে এইটুকু বললেই যথেষ্ট নয় যে একদল কামিনিকালেও কানগল কলমেয় বাইরে লাখুভাষার অস্তিত্ব ছিল না। তিক বেদন মাথাবের বড় সৌর্যবর লংকৃত ভাষাও কোনদিন কথিত ভাষা ছিল না। কথিত বৈজিক ভাষা ও পরবর্তী প্রাকৃত ভাষাকে টেকে ছলে থাকারনব্বদ ক'রে উঠার কথা হতেছিল। ঐ শ্রুতিভাষা অনেকটা তাই। তবে হাংয়ের বিবরণে এ মাথার সেই লংকৃত ভাষার অগ্রকারী—অন্ধের গণ প্রবর্তক যজ্ঞ—মৃতের যজ্ঞ মৃতদেহ।

ইয়েরদী নিষিদ্ধ ভাষা কখনো বা কখনো ভাষা না
হ'লেও উচ্চশ্রেণীর ইংরেজের কথিত ভাষা। এখনই নিষিদ্ধ
ভাষা কথিত ভাষা। হুতে একটু দূরে গড়ত তখনই তাকে
স্বাভাব্য শ্রেণীক ভাষায় গুলে সমন্বয়ে তৈরি ম'না হচ্ছে—
একটাই সে ভাষা এখনো মরেনি। বর্তমান জীবিত ভাষায়
কল্যাণের ঘাটাই ক'রে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বলেই—তার
খাটটুকু মাপনা হ'তেই বেঁধের ঝঞ্ঝে এবং সে নতুন পোনা
হয়ে গড়ছে। প্রাতি বলছে পাপের খোলস ছাড়বার সত
সে ভাষাও গুলে গুলে তার পার্বকোষ আবর্জনা দূর করে'

କେଳେ କମିତ ଡାହାଣ ନଂରେ ଶୀଘ୍ର ସହାୟକ କ'ଣ ଦେଖା ଓ
ତାହାର ବାଜୋ ଅଗ୍ରମର ଡକ୍ଟର ।

বহিঃস্বার্থে সে যুগের লোক—ঠাণ কথ্য হ'তই, কিন্তু শ্রীমত মোহনচন্দ্র দেন সেদিনও ঠাণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বা লিথেরেন তা কি ক'রে মানা চলে? তিনি লিথেরেন—“কবিতা ভাষা কখনই লিখিত ভাষার পরিণত হইতে পারে না। বৈশেষ ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্ত লিখিত ভাষার ব্যতীয়া আবশ্যক। বহিঃকলিকাতার কবিতা ‘গৌলু’ লিখিত এন্টার বান শাহ ভাষা হইলে শ্রীমতের ‘পাণ্ডবামই’ বা সে কবিতার বাক্য হইবে কেন?”

কথিত প্রাদেয়িক ভাষার বিরোধ প্রকৃতিবাক্যের সমা-
ধান নিম্নম অঙ্গুলারে আপন হৃদেই হোমোপিত হ'য়ে যায়।
যেটি বলবন্তম দেহিউই দাতিভ্যাত মথো টিক বাক্য—এ
সূত্রা শুণু ইংলেত ফ্রান্সে কেন—এই বাংলা দেশেই যে প্রতি-
পন্ন হুকে তা বলবন্ত্যত ব্যক্তি মাজেই বলবৎ। ঐশুক
রহীজ্ঞানব নিজে তাঁর “ভাষার কথা” নামক প্রবন্ধ এত
কথা সূক্তকঃ ঐক্য করতেন—এমন কি ঐশুক প্রমণ
চৌধুরী হালি বাংলা ভাষা যে তাঁর ভাষার চেয়েও বেশী
পরিমিত এবং অস্তিত্ব-প্রাপ্ত। বেশী টিকবার উপযুক্ত—তা
তাঁর উদ্যোগ অকণ্ঠে চিত্ত বাক্য করত গোশেন।
দাক দে কথা।

মুহূৰ্ত্তৰ বিচালভাৱে যে ভাৱাৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে, সে ভাৱা
কটটা অথবা শব্দব্দ ও সমানবিভাৰিত—তঃ এই উচ্চ
অঃপ্ৰণালি হতেই বসন্তে পাকিলে।

অসংখ্য ককাদ্বন্দ্বকোষ। যন্ত্রণা পকাদবন্দ্বক
কিবা এককাদবন্দ্বক। কিবা এককাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক।
সংখ্যা পরিকল্পিত। যন্ত্রণা এককাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক।
ককাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক।
ককাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক। যন্ত্রণাকাদবন্দ্বক।

ଦୁଇବର୍ଷି ହଟିଆବା ମୋକେରକ ଅବସାନସିବୁତ୍ତ ହଟିଆ ଓ କା-
 ନାହାଜକ, କନଳ କୋଲାହଳ ହୁ ଅନବର କା ଓ ମର ମର ଅଧିନୋର



তা বলাই বাহুল্য। 'পপ, নম্ব' প্রভৃতি শব্দ টি 'ক'রে 'হা' 'গুলা'র উপস্থিতি হ'ল এবং 'আর' এর আকস্মিক 'এবং' লক্ষণ সেনের মত বিড়ম্বিত মনসা ঘিরে কোথায় যে পালালো কে জানে ?

অণী প্রসঙ্গ সিংহের ভাষায় নমুন্য—

একিৎ বিধের বঁড়িতে টা টা টা করে বাত চারটে বেজে পেলো—সারকটিকা লালুয়া বহুধুগো হলেও। উড়ে যায়নিরা বদলার কোকানে মনসা গিয়ে আরম্ভ করেছে। বাস্তব আলোয় আর তত তেরক নাই। কুহু-ব হাওয়া উঠেছে।

ওজন করে তোপ পড়ে যায়। কাকতলো অণী করে যায়। কোড়ে উড়বার উচ্চারণ করে। কোকানীরা কোকানের খাঁপতড়া গুলে লোককটিক প্রণয় করে কোকানে বহাওয়াসের চড়া। বিহর হুতায় হল কিতাবে নিজে। লনে কল্লাহায়ে এলো। বাস্তব জারিয়া কোড় জালতে লেগেছে—অনুনিরা মনসা কহতে কহতে তার পেছ পেছ কোড়ছে।

লুটী কোড়কোড়। কোলরা খই হাতে করে বাস্তব হো কো কহতে কহতে কুলে চলেছে। কোতাজী বুদ্ধোয় তেল মেখে বাসতা করে করে আকিবের কোকানলির আড়ার কলমে। কোটা বাপারীয়ে হাওয়ায়ে বাতা কোব। শেখ করে বাসি বাসতা বিহর ফিরে যাচ্ছে। কলকতা মনসা বড়টী জলজার। বাস্তব হুতা, বিহরের পল্লি পল্লি শব্দ কোব কোব। ওলোয় ও লবাজির চালেতে বাস্তব বেগে উড়ে।

অতিসের হুগানে বকা হাউচ ও কুত নবাবে লং বড় চমকবার চলেছে। বকা বাবিকের লবীরা বুদ্ধির কুহুতের মত পুহুর বাস্তব—হুটী বিল্যাতী কুহুতের মত। বাস্তব কামায়ে ত্রস্তন ককা হুটী করে খাং। কলার বাস্তব ও কোট চাকের মত ভলি করে কলার বাস্তবী—হাতে উঠি কহ—চুলে শু পোঁত কলপ কোড়া—কামায়েতে হুট, কামায়েত প্রজিত হুট। কাম—বত বস্তর আদি পেরিয়েছে—অন বিস্তর—কিত প্রাণ হামাওতি বিস্তে—হাফায়েত লালটি বুদ্ধেন।

কুত নবাব বিহিৎ বেগে। চুরে আসতার মত বা। আলকট কোলনে কল কোলনে—চীসের কুহুতের মত লবীরা বুদ্ধি বদলো, হাতে কল কল ও শিঙের ঝিক—নিম্বের কিলকিল হুতি মালকোতা করে পড়া। হুটবে বেগে বেগে হত বাস্তবকতার পৌহু—কিন্তু পল্লির বেগেয়ে বিহে কোলার বাতি।

পারিচীটায় সিংহের ভাষায় নমুন্য—

ওলব, নবাবে ও লজিয়াস পৌহুসের বাস্তব প্রাণ কোড়া, বাস্তব মনে বাস্তব চাই কহ কাপার ও ককা পনে বা কাহাকেও

মানে বা হত তাস, বত লগা, বত বুদ্ধি, বত পাচতা, বত বুদ্ধিল, একটা বা একটা লইবা লবীরাই আনোনে কোড় (বাস্তব অকলপে নাই—লোথার অকলপে নাই। বাস্তব কিতর বাস্তবায় চত লোক জাতিতে আনিলে অকলপে বলে—কা বেটা বা—আনো বা বত—) ললী আনিতা বলে—আনো বা হাউকল যে ত্রস্ত পল্লি বা তাহা কহে 'বলে বত হা হা হা হা হা হা'। ললী মনে বহে' বলে আ হা হি কিত বিহি কহাটি বিহে () তবে তবে পল্লির বত চত লগা বা ললী হাটা। উল্লীকুত বহাওয়া কোড়োয় হুটতে আরম্ভ হইল। বিহায়াসি হুটোয়—বৈকল্যবায় কনে পাচতা হাউ—কোল হো হো লক—হাউস হুতা ও তামাক চরম লাল্লাহর কলো। কোড়তে অকলপ হুটতে লালিল। কহ লগা সে কিত বিহা হাউ—কাই বাস্তব লগা' লগা করে। কোড়ায় বাস্তব একবার লক পাল—লক টিপে মনে আর বসে 'ব' 'ব' 'ব'।

প্রসিদ্ধ লালিল কোলনে কো নটী কলো মনসায়ে মনে নটী টিক টিক পটাল—খিলায়ান পাড়াহান এক একবার লান কহিতেছে, টিককারি নিত্যকে, ও লালির বত চলেতে পারে না বলে কোল হুটুটীয়া মনসা মনসা হাউস্তের। একটু একটু বেগ হুটতে একটু একটু হুটী পড়িতে—লক হুটা চমক কলিয়া। লগিয়া একবারে হুটুয়া বহাওয়া পিয়ে লগিয়া গেল। কোট চকচাক প্রেক্ষাভাণে অনুসার বাস্তবহিসে—বাতিলাস বাস্তবে কোলে—কোটা হুটী কোটা কোড়ার বাস্তব পল্লাহের লগ—উল্লী টিক টিক চক চক কলিয়া চলিতেছে, পটাল পটাল চক চকিতে কিন্তু কোলনেই হাল কোড়ার না।

বাধু লালোর লগে ললিৎ বাস্তব হাউচাবীপক কলর যে অনেকটা বই লবীনের প্রেক্ষায় কলর মত—কুই পা বিহে চলবিত্ত আমি হাত বিহে লগে—কুই পাতে বাবিত্ত আমি কুই বাব—তা আর কেউ না বুদ্ধি বুদ্ধি বাব বুদ্ধিতে পারলেন। তিনি তাঁর বাংলা ভাষা বীর্ষক প্রবন্ধ লিখলেন—পতিতী মনের বাংলা বাংলাই বহু—কেননা যে ভাষা সাধারণ লোকে বুঝে না, শক্তিতে লগে জাতি জাতি জাক ডাকে সে ভাষার জ্ঞান বিস্তরণ হয় না এবং সে ভাষার প্রাণ লগা শুধু নির্ভুজিতার নহ, বার্ষিক পরতার পরিচায়ক। তাঁর মতে যেখানে ভাষের অনুপ্রাণ লগ বাংলা ভাষায় সেই লগানে চিত্তকেলে লগালন পল্লুতের কহে বার কহাই ভাণ কিন্তু নিম্নলিখিত অর্থাৎ ললিৎ বাংলা লগ বাস্তবে অপ্রচলিত বা অলপ লগত লগকে

তার বিশ্রামস্থির থেকে টেনে আনা একেবারে নিষেধ ও নিন্দার কাজ। তারপর মালালি ও হুতমি ভাষাকে লক্ষ্য করে তিনি যা করেন তা এই—“বাংলার লিখন পঠন হুতোমি ভাষার কখনই হইতে পারে না। কারণ কখনের ও লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কখনের উদ্দেশ্য কেবল সামাজ্য জ্ঞান—লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান চিন্তনকালন। এষ্ট মত উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষার কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত পদ্ধতি নাই; হুতোমি ভাষা নিষ্পেষ ইহার তেমন বাদন নাই; হুতোমি ভাষা অস্বন্দর এবং বেধানে অসঙ্গল নহ—সেখানে পবিত্রতা-পুত্র। হুতোমি ভাষার কখন এই প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। টেকটাইবি (বা মালালি) ভাষা হুতোমি ভাষার এক কোঠা উপর মাত্র।”

আমরা স্বীকার করি হুতোমি ভাষা অস্বন্দর ও স্থানে স্থানে কঠিনবিশিষ্ট, কিন্তু তা যে নিষ্পেষ তা কখনই স্বীকার করবো না। তাতে দৃষ্টির মত ঘোর ছে—তা চোখের সামনে ছবি একে দেখে—তার প্রকৃত শ্রেয় হতে elevation বা elevation। ঘাই হোক, বি বাবু চেষ্টা করলেন বিদ্যাপ্রসাদ ভাষার সঙ্গে হুতোমি ভাষার সম্বন্ধ বা একটা আপোষ করতে। এ আপোষ কতদূর সার্থক ও সফল হয়েছিল তা ঝাঁট ঝাঁট উপগ্রাম পড়েছেন তাঁরাই বলতে পারেন। তাঁর প্রতিভা ছিল, তাৎ ছিল, ভাষাতত্ত্বা ছিল, তাই উপর উপর দেখলে মনে হয় যুঁজি তিনি আপোষ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু একতরফে এতটুকুও পারেন নি। উত্তর বঙ্গীয় সাধা কালো বা তেল গলের মধ্যে আপোষ অসম্ভব—তিনি অসম্ভব সত্যব করেন কি করে? চলতি ভাষা হাজার হলেও সত্য ভাষা, আর সাধু ভাষা মিথ্যা ভাষা— সত্য মিথ্যার মেনালে উত্তম এজাহার হতে পারে, কিন্তু লাভিতা হতে পারে না।

বঙ্কিম বাবুর প্রথম বয়সের লেখা সাধু ভাষার দিকেই বেশী তুঁকে পড়েনা, এবং শেষ বয়সের লেখা চলতি ভাষার দিকে। পরা কখনই সত্যব রাখতে পারতেন না, কলে চতুর্দিশেরগণিত ভাগ করারমতই স্যাহিত্য উঠতে নাহুঁতে

গাপলো; কেননা কোনটা বৈ একেবারে বঙ্কিম ভা তিনি কিছুতেই বুঝলেন না।

বঙ্কিমের প্রথম বয়সের লেখার মনু—

কোমরালোক, যেতনিকতুলিমমঃখারিতী নীলমিলা
মদুলা উপলুপ্তে মল্লীকঃ-সদায়া মল্লীকঃ মিতী স্রীপু মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ

এ আলমলে কল্যাণত মল্লীকঃমল্লীকঃ, যে কন-
মিলাতী মল্লীকঃমল্লীকঃ, যে মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ
মল্লীকঃমল্লীকঃ, কিবা মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ
কিবা মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ মল্লীকঃমল্লীকঃ
মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ মল্লীকঃমল্লীকঃ
মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ মল্লীকঃমল্লীকঃ
মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ মল্লীকঃমল্লীকঃ
মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ মল্লীকঃমল্লীকঃ
মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ মল্লীকঃমল্লীকঃ

বঙ্কিমের শেষ বয়সের লেখার মনু—

কোমরালোক, যেতনিকতুলিমমঃখারিতী নীলমিলা
মদুলা উপলুপ্তে মল্লীকঃ-সদায়া মল্লীকঃ মিতী স্রীপু মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ
মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ মল্লীকঃ

*

কাল ১৬ মার্চ ১৮৮৩ সালে ঢাকা। বাহাদুর ১৮
আমি বঙ্কিম মল্লীকঃ, কত কাঁট কাঁটে মনে, মল্লীকঃ
কিবা মল্লীকঃমল্লীকঃমল্লীকঃ মল্লীকঃমল্লীকঃ
১৭ মার্চ
১৮৮৩ সালে ১৮ মার্চ, ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে
১৮৮৩ সালে ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে
১৮৮৩ সালে ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে
১৮৮৩ সালে ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে
১৮৮৩ সালে ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে
১৮৮৩ সালে ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে, ১৮৮৩ সালে

ওলোট-পানোট

অসম্ভব সুপোপাদ্য

পুরুষ

মীনেল

সীতানাথ রাহ
রমেশ
দীনদয়াল ঘোষ
শশী রাহ
দীনেল
ডাক্তার
নিমাই বাণ
সকাল মণ্ডল

বাবা, জমিন কখন কোন বাবা ? পরীয়ে কি যখন
কছে কোন ?
শশী রাহ
ওগণা ?—কছে না ?—বহুপাই ত কছে তে !
ডাক্তার
কি যখন কছে, গায় মণাট ?
শশী রাহ

দীনেলের ইয়াতগণ, কালাহাড়ীৰ ব্যাতিগণ,

জমাখাৰ, চৌকীয়াৰ, তিৰ্য্যাপণ

গোমবাসিগণ

স্ত্রী

সীতানাথের শোহী

দীনেলের বন্ধিতা

পোপানী কি, কুমারী বালিকা

দীনেল
কাওয়া কৰা বাবা ? সুপোলা ? পাখা ! ঈশজিৰ !—
কি একম কছে বাবা ?

শশী রাহ

কছে ? (উত্তৰিত হইব) বুকের ভেতৰটী

যাচ্ছে ! বেগে নহ—অহুগে নহ !—কিছু ক'ৰে
পায়লু না ব'লে ! সীতানাথ কামেৰ সন্মান ক'ৰে গৈত
পায়লু না ব'লে ! বুৰতে পেরেতিস ?—উঃ—ডাক্তার !—
জল—ভেটী !

দীনেল

এই যে বাবা, জল দি ।

ডাক্তার

জল দেবেন না, সোডাৰ সকে ঐ গুৰুটী আৰ এক
ডোজ মিশিয়ে দিন । বেগে, দিন আমাৰ কাছে ।
সোডাৰ বোতল পুৰিয়া : খলসে তাহাৰ গহিত ওখ মিনাটীয়া দিল
এই, জল খান রাহ মণাই । আ-তা-তা-তা— উত্তে
ধাবেন না—তয়ে তয়ে খান ?

[শশী বাহ বহুদিন হওক কঠিন ব্যাচৰাখে লগপত দীনেল,
ডাক্তাৰ ও যখন ডাক্তাৰ : শশী বাহ বেগ-বহুগায় হটুটু কৰিতেছে]

দীনেল

কেমন দেখলে ডাক্তাৰ ? ক'বিনেৰ চেৰে আত
অনেকটা ভাল ব'লে বোধ কছে না ?

ডাক্তাৰ

নিশ্চয়ই । এবাৰ ত সাহায্যৰ পথে কিৰে এসেছেন ।
নাড়ী পুৰই ভাল,—তবে 'হাটী' বা একটু 'উইক' আছে ।
ওখৰে মিহিছি সেই মন্তে—বাক্তে 'হাটী'এৰ 'হাটকস্কাটী'
—মোটের ওপর এ ব্যক্তি আত কোন ভয় নেই ।



দশী রাত্রি

(পান শব্দ:) ছাঃ (কণ্ঠস্বর মীনে) দাঁড়িয়ে

ডাকার! বলতে পার, আমি পাঠ্যো কি টিক? বৌদি
বিন নয়—একটা বন্ধুর। আর একটা বন্ধুর কোনমতে
দশি—পার ডাকার: কোনমতে একটা বন্ধুর পাঠ্যো
বাক্যে। তা' চলেও তার সন্দেহ করে যেতে পারবে।
কিন্তু যদি না পাঠি—

ডাকার

রাত্রি মশাই বেচে ত এবার উঠছেন—আর ভর
কিদের।

দশী রাত্রি

ভর? ভর মশার ভর নব ডাকার! ওই যে বললুম,
পাঠ্যো রাত্রের সন্দেহটা তা' হ'লে ক'রে যেতে পার
না। মরতে ভর নেই ডাকার? তোমরা কেউ এখনি
খবর এনে বাও—বছাড়াতে সে, তার নাহদী, নাহদীমাই,
হেলোটা সব মরতে, আমি হাসতে হাসতে একুনি মরতে
পারবে। (সংকট হঠাৎ) পার কেউ এই খবরটা
এনে দিতে! শরিত্ত বৌদি? পার ডাকার? তোমাকে
বন হাজার টাকা বোঁবে। আমার এট বুকের কথাটিকে
মতি ক'রে দলিবে—আর একটা বাও, ডাকার—আর
একটুকু। (পাঠ্যো মশাইতে দাঁড়িয়ে)

ডাকার

রাত্রি মশাই, দ্বিত হোঁ। এখন ও-সব কথা ভাববেন না।
এই নিম্ন—বল। (আবার সোফার দিকে গমন মিশাইল কখন)

দশী রাত্রি

(পান শব্দ:) কি বোলবে ডাকার, গারের ভেতর
জলে আছে! বৌদি, বৌদি, যদিই আর না পাঠি, তা' হলে
—আর ত বাবা, আমার এই কান্ড আর একবার। হাত
হেঁচি। (বৌদি হাত আগাইল শিল, দশী মগ্ন হওয়া নত করিল।
বলিল) আমার ছুঁয়ে দিকি ক'রে বল বেঁচি—কল—

দৌল

কি বোলবে বাবা?

দশী রাত্রি

বল—বহুদিন বেচে থাকবি, পাঠ্যো রাত্রের সন্দেহ
করবি? বল—আমার ছুঁয়ে বল।

দৌল

এলি বাবা—করবে।

দশী রাত্রি

দশী রাত্রি

করিল, কিছুতেই ছাড়িল নি। তিন পুরুষের পক্ষতা
এ যেন বুলে থাকিল নি বাবা! আমি জানি, আমার
চেয়ে তার ওপর তোর আকোশ আরও বেঁচি। এর
শোধ কিছু নেওয়া চাই, নেওয়া চাই, নেওয়া চাই। ডাকার,
ডাকার! সব জাননা তুমি, কী পক্ষতা আমারে
সঙ্গে কবের। উঃ উঃ উঃ (গলাগতে গলাগতে)
রামেশ্বর চৌধুরী সম্পত্তি। অর্ধেকের হুদার আমি—
অর্ধেকের ও। জাল উইল তৈরী ক'রে সেই সম্পত্তি
আমায়! (গলাগতে দাঁড়িল) যে দিন নতুনগুয়ের
মাস্তার রাত্রি বেলেবে, ওর নাহদীমাই—সব তখন বে
হবে—কোণের ভেতরে পাঁড়িয়ে আমাকে কী মগ্নমান!
—উঃ—বেলেবে মত গারে সব বিধে রয়েছে। প্রতিশোধ!
প্রতিশোধ! বৌদি, প্রতিশোধ চাই-ই! আর যদি
না শরিত্ত বল আমার, আমি নিজে হাতে প্রতিশোধ
বোঁবে—তারপর মরবে। একখানা ছোঁয়া তা'হলে
আমার বে, আর এক 'কোঁক' ডাকার, তোমার খুব ডেজাল
জুখ বাও, (হাতে হাতে গাঢ়া মিশে উঠলিত হঠাৎ)
আমি একুনি গিরে। তার ওই ওই দুখ দুখের দুখ—
(বাবা হঠাৎ হঠাৎ দৌল উঠেছিলো হঠাৎ হঠাৎ দৌল
দৌল বেলে)

দীপেন

চলছে না।

কি হল—কি হল—ডাকার! ক'মে আসছে।

ডাকার এ কী হল?

ডাকার

তাই, এ কী হল! এ কি 'গার্টেল' নাকি?

— 'গার্টেল' ত! দীপেন বা—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেলডাক

দীপানব রাতের বাটার অলস

আপা

(পরিচালককে হাঁকিরা ঢাকিল) হ্যাঁয়ে, যা গোলাপী!

[গোলাপী দিব অবেশ]

গোলাপী

কি দিবিদনি?

আপা

হ্যাঁয়ে, তোরা বাবা বাবু বাবির নেই?

গোলাপী

না, দিবিদনি। ত্রেনকে বোধ হয় ঐ ডাকাত্তি বাড়ীতে
কা'র অস্থ—জেকে নিয়ে গেছে।

আপা

দাত কোথায় রে?

গোলাপী

তিনি, গাট, মানের ঘাটে ব'লে কাষের সঙ্গে গর
ছেন।

আপা

দেখ,—তোরা বাবা বাবু কিত্রে এল, তেতরে পাঠিয়ে
দিবি; জলখাবার খেয়ে বান্দি ক—বুঝিচি, ত?—
আজ্ঞা, বা। (খিদ্র সরাই) —খোকনের জালায়
গাণ্ডোনিংয়ের ঢাকাটা আর কিছুতেই দেওয়া থাকবে না।
বতবার মোহো, ততবারই ঢাকাটা পূলে পূলে যাবে।
কোলকাত্তা থেকে এগ্ন একটা বাচ্চ না আসলে আব

রয়েন

বাধিব হইতে যাব চুক্তি হইতে—এন্কোব—এন্কোব!

পাশ্বে হবে না।

আপা

পালা দেবার বেলায় কিছু নেই, শুধু শুকনো 'এন্কোব' এ
কে গাটবে?

রয়েন

যা পুঁজিপাটা ছিল, পলি বেড়ে সব ত বিয়েট বিটটি,
এখন আবার নতুন ক'রে পালা দেহো কোথ; থেকে
বল?

আপা

সে সব আমি জানি নে, পালা কিছু দিতেই হবে।
উট্রিবা বাড়ীটির ওরকারীতে হল খাবার বিতে বিতে কহিতে লাগিল
নইলে, নইলে, নইলে, নইলে,— আসন প'তিয়া জলখাবার
একান্নো রাঁ দীঘ্রীর জল খাবারটা খেয়ে নাও।

রয়েন

পালা বরক এনে দিতে পারি—ডিকে সিকে ক'রে,
কিন্তু এখিনিঘটা আজ আর পেরে উঠ্‌যোনা আপা—পেট্
একবারে কলস—সুঁতি বলটি।

আপা

হাত বন্ধা) দেখ বাজে বোঝ না বলছি। পেয়েছেন
সেই বেলা খপটীং লম্বা, আর এখন লম্বা ত'তে চলে
এখনো পেট্, কলস!

সুঁতি বলছি; যাঃ— আজ্ঞা—বাগি ঐ
ছোটো বাড়ি।



আশা

আচ্ছা, ডাট-ট পাও বোলে।—তোমার ক'রে? হাত বখশা
বলাটো দি। ওকি ব'লে রটলে যে কিছু? শুধু মিষ্টি টাটাই
পাও।

রমেন

সেই "কুজ-কোটা কুলে"র পানটা একবার পাও—তা না
গাটলে কিছুতেই খাব না।

আশা

আচ্ছা, গা'ব এখন, কুমি খাও আগে।

রমেন

আশা

রমেন

আশা

ঠ্যা গো, ঠ্যা। 'রমেন বসিবে লাগিল। পাটেরা রত খাটেরা
শোয়াস লাগিবা চিনে কুমিরা পার লটল

রমেন

কট, পাও এইবার।

আশা

কি?

রমেন

সেই "কুজ কোটা"।

আশা

রমেন

সেই যে খো—"কুজ ত্যা",

আশা

কেন? আকাশের?

রমেন

ও সব উজারকী চপথে না—চিন পাতি পেলেচ!

আশা

তাই না কি? তা' চ'লে ত গাটতেই হবে।

শ্রুত

সে আবার, নীল আকাশের জা'তারা, ক'চ কোটা কুল
মাথারের পরম তলেব রতম আবেহ, কেন? কপালের কুল
দেব দোরে না'তামল মাথের মাথের ও আশার কীত বদ

দীতানাব

হা'রে শালা,—হা'রে শালা, একটুখানিও জেগে আকাশ
হয়েছি, আর অমনি ওঠিতে প্রেমের বতে ছুটিয়েছি!

রমেন

দানামগাই, দেখুন না কিছুতেই শুনবে না, মোর
ক'রে—(বলিতে বলিতে পাশ কাটাইয়া প্রস্থান)

দীতানাব

হা'রে শালা!—দাখু—তপখি! কিছুতেই শুনবে না
—ও'কে ছোর ক'রে—! পালাছিল কেন?
(আশার দিকে চাহিয়া) বলি, থাকলে কেন গো কবতারা
লোক না। বুজোর কাছে গাইতে বুঝি গলা বুকে আগে?

আশা

দাড, আশনি দিন দিন বড় হুই, হচ্ছেন।

দীতানাব

বড়। তার কারণ, হিংসটা দিন দিন বড় বেণী হচ্ছে
কিমা তাই। একরত্তি—রক্তের ডেলা থেকে, কত আশা
ক'রে সাহুং করুয়, যাটার রেখে লেখাপড়া শেখানুয়—গান
শেখানুয়, আর এখন আমার তোমার আর ভাল লাগে
না। বলি—জটাকেই আক পেণি কোথেকে যে? সে-ও
এই বুকে! ওকে বখন শেলুম, তখন ও মোটে লাভ বহুয়েছটি।
সেই তখন থেকে সাহুং ক'রে, লেখাপড়া শিখিয়ে, তার ত
এখন আকাশের কবতারা—

আশা

পাতি বদতি সাহু—ভাল হবে না কিয়।

দীতানাব

তাল যে আমার হবে না, সে আর কুই বলনি কিরে
পাশী—সেও দেখতেই পাছি। নইলে তোমরাটা উকে
এসে ছুকে ব'লে কি আর এমনটা কতে পারে তখন?

আশা

হান; আশনার লুকে আর কথা কব না।



প্রিয় প্রত্নকায়

সীতানাথ

তা কইবে কেন এল—তরুণ ক'রে কথা বহু করায়
একটা অধিলে চাইত ?

আমি

খাচ্ছি, আশনার কি আর কোন কাজ টাক নেই ?

সীতানাথ

তা আমার নেই ? কিছু সব কাজ যে শক্ত ক'রে যায়
ঐ সুখখানি ! ঐ চণচণে সুখখানি দেখলে কেন হ'রে হাই
কিনা—তাই আর কাজের কথা বলে থাকে না । তা
আমায় তাকবার ক্ষেত্রে এত তৌক কেন বল দেখি ? আমি
এখন যেন শক্ত শক্ত হ'য়ে উঠিয়েছি, না ?

বাহিরে হু হুতে সৌন্দর্যের পান পোবা যেন ; শক্তকণে বাহিরে
বাহিরে হীনমুগ্ধা স্রবণ করিল

সৌন্দর্য

আমি আছি তাই না যা সে—রাখিল আমার ঝাঁঝ যৎ
আলোর যে চুই থাকিল না সে—থাকিল যে যা অকস্মাৎ

সীতানাথ

কি দাঁতু খবর কি ? সমস্ত দিন আমি দেখা লাগায়
পাইনি, কোথায় গুরে গুরে বেড়াচ্ছ ?

সৌন্দর্য

পাগল ছাগল মোক, আমার কি কিছু ঠিকানা আছে !
মোকের কাছে ত বাবার উপায় নেই । পাগল বাটা
ব'লে সকলেই ল'রে যায় । তাই কাজ আছে ত আর হাত
না, এক পথে পথে মাঠে মাঠে গুরে বেড়াচ্ছিলাম ।

সীতানাথ

বেড়াবার কারণ ছিল বটে মিশ বছর আগে । সে
বেগডাকি আর নেই । এখন যা দেখছ—এ ত অশনি ।

সৌন্দর্য

অশনিই ত বরফের গো রাহ মশাই ! না আমার যে
দশানেই থাকেন । অশনিই যে গুটির সব চেয়ে প্রিয় ।
না না—ভিনি অশনিবাদিনী ? (কহে)

অশনি সেলে ভাল বান না, তুচ্ছ কর বলিগোটা ।

আশনি সেমশ, হাকুর ভেদন, বুঢ়ালা না আর মিথি খোটা ।

বলে রাধ, বুঝে রাধ, করতো কি আর নিজে কোটা ।

মনে মোতে কেনন যাডাখ, টহার দরু জানবে কোটা ।

সীতানাথ

দাঁতু, আমাকে তোমার মত পাগল ক'রে দিতে পার ?
(যানক দীর্ঘ থাকবার পর) আচ্ছা সে হবেখন । সমস্তদিন
খাওনি—এখন এস, তুটি খেতে দেখে নেবে চল ।

সৌন্দর্য

অশনি সেলে ভাল বান না, তুচ্ছ কর বলিগোটা

বাহিরে বাহিরে প্রকাশ)

তৃতীয় দৃশ্য ।

সোণাপুর—সৌন্দর্য হাঠের বাগানের দর

ইন্ড্রময়, সৌন্দর্য ও মালতী

(একজন একবারে ব'লে আসন মনে বিভ্রান্তকর ক'রিত্য হ'কিত্য
প'ড়তেছিল অতীতের আর একজন বাঁধাভক্ত—সুইদ
সবিত্তের)

যা তে রে কিট হাক
তাতে রে কিট হাক,
না তে রে কিট হাক
বিত্তে রে কিট হাক ।

প্রথম ইয়ার

প্রাচীরতলরে চলুক চলুক—কৃষ্ণি চলুক ।

If a body meet a body

Coming from the Rye

If the body kiss the body

Should the body cry ?

সৌন্দর্য

আচ্ছা ! মতে, তোমার ও চাকচাক্যখানি বহু কর—
না বাবা !

প্রথম ইয়ার

মালতী সুন্দরী, নাও, আর একখানা গাও ।



দ্বিতীয় ইয়ার

না, বাবা! আর গায়ে কাঁক নেই, কান খালাপালাও নেই
কেউ। তার চেয়ে, মাগতী, তুই যিতিয়ার পাটো। ন'লে
না, আমি যিতিয়ার বলি : -

শাক'তানি।

এই বন্ধুগণ কবে

এই নও বিদ্যোদিত আমি মম

বিনবিত করে তব লিখ,

কি কলিত পার তুমি -"

কৈ—বল, 'কিনি' উত্ত'ও'য়ে যাতে, বল—বল—অ
মাগতী ?

মাগতী

কি বলবে বাপু কিনি নে!

দ্বিতীয় ইয়ার

মা: নরপ তোর! কি বললুম তবে ভোকে? তুই
নোংরা একটা থাকে তাই!

তৃতীয় ইয়ার

ওকে শোন—শোন। 'বহুভুজ' কারণে কি গিথছে
শোন,—কৈলাসপতি মহাদেব বহুকাণ পরে পৃথিবী
ঘর্ননাভিলাষে কৈলাস হইতে বোঝায়ের কোন স্থানে
আসিয়া হস্তবেশে গোদীপঙ্ক পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। গত
থই ছন তারিখে অম্বাভ্রাজে বোঝায়ের একজন পুলিশ
আসিয়া জে, এল, বিলকোর্ড লুন্ডেরে বংশে তাঁতাসের ঘরিয়া
কেন্দ্র। কলে খুব একটা বখাওয়াত হয় এবং তাহাতে
ধুর্কতার ভীত বানিকটা অংশে ছিঁড়িয়া আসিয়া বিলকোর্ড
লাগেবের হাতের ঘবে—

দানেশ

পাম্‌ পাম্‌ তম্বা, বাজে বকিম্‌নি ক! গত
গাভাপুতী—

(জাকার ও পুলিশ ইনস্পেক্টার নিমাইধারু প্রবেশ)

আরে এল এল, ইনস্পেক্টার সাহেব এল। পুলিশই ত
সকলকে শাক্‌ভাও করে,—ভাকার, তুমি যে বেখাছি—
পুলিশকে শাক্‌ভাও ক'রে এনে ফেলছে! তোমার বাগ্‌পুতী
আছে বাটে! তারপুত্র, পুলিশ সাহেব, যখন কি বল?

ইনস্পেক্টার

যখন ত তোমার কাছেই কে? জমীদার লোক!
তা'তে আবার কুমার নাম খুঁচে—এখন অর্ধেক মজারাক!
জা—জা—জা—জা—হ!

দানেশ

পুলিস সাহেবকে আগে একটা 'লেগ' দাওকে মতি।

ভাকার

মতি দেবে কি বন্ধু! তোমার কথার বড় ভাগের
তুল ধর দানেশ বাপু। মাগতী থাকে মতি দেবে কি
বন্ধু?

দানেশ

ত্রিকট বলেছে যে ভাকার, 'তিমালায়ান রাগার'। মাগতী,
নচুন অস্ত্রবিষের পাতির কর।

মাগতী

তব খেয়ে লইবা! আমুন, ইনস্পেক্টার বাবু!

ইনস্পেক্টার

। বখা পানো! মা!—ওকে জিনিব হে! 'গোয়াইট
লস'—না?

ভাকার

হাতের শুণবালা—হাতের শুণ! হাতে ক'রে কে দিলে
যেটা দেখতে হবে! হাতের শুণেতেই—খাঁড়ী 'চন্দনপুত্র'
'গোয়াইট লস' হয়! আমাদের হাতের বিগনে মা! 'কাটিলার
লামার'ও'য়ে যায়।

বিজানুসার-শত্রু-ইয়ার

(গোয়াইট) — তুমি যত্নর ঠাকুর, তুমি যত্নর ঠাকুর,

আমার বাপের নাম বিজার যত্নর।

তবলাবাক ইয়ার

তেরে কেটে—বাগ্‌, বে—জিতা—যিনি কি টি—বাগ্‌, যে
বে রে কে টে তাক।

ইনস্পেক্টার

ওবে দানেশ, তোমার মাগতী হাঠি হু একখানা পান-
টান চমুক। তোমার জিনিব, তোমার বন্ধু মা হ'লে ত
আর উনি—কি বল গো বিবিসাহেব?

মালতী

মাশনাতা পুলিসের গোচর—মাশনাতার হুকুমই যথেষ্ট !
তার ওপর আর কারও হুকুম দরকার হয় না—আর তা
হ'তেও খেল না।

ইন্দুপেক্ষিত

জ্যেষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা তা'লে হোক একখানি। মাও
চকোতি, চাকোনিয়মটা বিবলচেবের কাছে—এগিয়ে
বাও।

দীনেশ

গাও—গাও—মালতী, —ভাল মেয়ে গাও। এদের
দখল না করতে পারে,—বুকেছ ত ?

মালতী

না বলে আর পাতে নে, আমি বোর ঘুম না আসে
তু'র বই আমি—আমার মশা মাগে পড়তে।
যে দশক পনের দুয়ে, এল মোর জন্মভূমে,
সে কি আর সেই মিহতির বাবা মনে
এল যে, এল সে তার মাঝল টুটে,
খোলা বার দিয়ে আবার বার টুটে,
খেলালের হাওয়া সেয়ে, যে কাশা শুয়ে রেখে,
সে কি আর সেই মল্লার বাবা মনে।

ভাকার ও ইন্দুপেক্ষিত

জ্যেষ্ঠা! জ্যেষ্ঠা!! বি চিয়ার! ক'র মিল মালতী
স্বস্তী।

(নীলু চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

বাকবাস! বাকবাস! কেকা কুর্জি! সকলেই
বাবা বিবির মজা লোটাও হয়েছে—আর আমি শালাই তথ্য
ক'ক! আর একটা হোক বিবিজান।

১৪ ইয়ার

তুমি এতকাল কোথায় ছিলে নালমণি ?

দীনেশ

ডটডাক, বোস বোস—বামে কোলমাল করিস নি।
ভালকথা,—হায়ে জাকার, ককীরের বাকীর পর কি বল
মেধ। তার তাই আর তাইপোর অবস্থা কেমন ?

ভাকার

বহর বড় হুবিং ব'লে বোঝে হয় না। কেকারের এসিষ্টান্ট
কলের। পৌরস্বতী তার ওখান থেকেই ত বরাবর আসে।
রাতির শগুত কি হয় বলা যায় না। ওই ত মাশনার
ককীর আসছে।

(ককীরের প্রবেশ)

দীনেশ

এমো—কি বহর ককীর ?

ককীর

ছোটবাবু, বহর খুবই খাশাশ। এ'র ত ভাকার বাবু
বেগে এলেন। ক্রমেই অবস্থা খাশাশ হচ্ছে। একটাবার
ফেতে হবে ছোট বাবু। মোটাই ছোট বাবু!

দীনেশ

আমি গিবে আর কি করা ককীর ? এলচ—চল—বাই
একবার। তোমার লম্বটা খুবই খাশাশ পড়েছে। এই
সেদিন চৈতন্যসুখ নিয়ে রমেন তারের সঙ্গে দাড়া-ভালমা—
মাথা কাটা-কাটা চল। আর আবার এ'র বিশল ও
মোকর্দমতার ঘিন ত থই—না ?

ককীর

তা একটাবার যা তুলুন ছোটবাবু।

দীনেশ

চল—বাই একবার। এল চে ভাকার। তোমরা সব
বস—আমরা বটোখানেরের মতোই খুঁর আসছি।

(প্রস্থ)

চতুর্থ দৃশ্য

বেলভান্দা—দীতানাপ তাহুর বাটা

দীতানাপ

দীতানাপ

মাছা, এইটেই কি তোমার উচিত হ'ল। বস্তুও ত
একটা আছে।



কি—গো ?

সীতানাথ

আমি তোকে ডাকলুম—“কি” ভাট, আশা ?” তার উত্তরে তোর কি বলা উচিত নয়—“কি ভাট মলমলভাট !”—তা’ না “কি দাট ?”—তুই কি এমন ক’রেই আমাকে আশাবি ?

আশা

লেন্ন—চুপ করুন বলছি ।

সীতানাথ

আজ্ঞা বেশ চুপই করলুম ।

আশা

সীতানাথ

আশা

সীতানাথ

আশা

কেন্তে শাচ্ছেন না ?

সীতানাথ

কেন্তে কেন শাখন—কিন্তু চুপ করবার হুকুম হয়েছে

আশা

আজ্ঞা, যিহিমার ক্ষেত্রে আপনায় খুব কষ্ট হয় ? আজ্ঞা যিহিমা খুব দুঃখী ছিলেন, না ? যিহিমাকে আপনি ভালবাসতেন ?

সীতানাথ

বোধহয় ।

আশা

ও কি “না-কী-বোধহয়”—এ বুঝায় কি ?

সীতানাথ

সের একবারে পাশাপাশি তিন রকম উক্তর ।

আশা

আপনি কি কবির উত্তোর পাইছেন না কি বাই ?

সীতানাথ

সারো-চকর ! আমি আমার প্রেরণার মত প্রেরণাণ করছি ।

আশা

সত্যি বলুন না,—যিহিমাকে খুব ভালবাসতেন না—?

সীতানাথ

বাসন্তুম বটে—তবে খু-উ-ব নয় । অর্থাৎ যেমন তাকে ভালবাসে—তেনন নয় ।

আশা

ভাল হচ্ছে না কিন্তু ! (খানিক দীর্ঘ থাকিয়া) হাট্ট একটা জিনিষ কিনে দেবেন ? আপনায় শারে পড়ি দাট ! তা’রলে বে আপনায় ওপর কী—

সীতানাথ

অন্ত ভূমিকা কেন, কতলাগটা কি ব’লেই ফেল না ।

(বাহিরে বাসন্তুমের দীর্ঘ শোনা শোনা)

এল দীট ! হাটে ও কি ? টেলিফোন ?

এশো !

দীনদয়াল

খোলসে আঁটা, বাইরে থেকে ত কিছু

নেই, খুলে দেখুন ।

(টেলিফোনবার্নি মূলি এবং পর্যায়ে সীতানাথ উঠিয়া পড়িয়া)

দীনদয়াল

কি হোল তার মশাই ? অমন ভোরে শোড়লেন কেন ?

আশা

হাট, কি কোয়েডে ? কোথাকার টেলিগ্রাম ?

সীতানাথ

(কখন দীর্ঘ থাকিবার পর উঠান কদ পরে) আশা,

দীট,—আমার সব গেম—ব্যাড গেম হয়েছে ।

দীট ও আশা

ব্যাড গেম হয়েছে !

দীভানথ

হ্যাঁ ! বাবু ফেল ! আমার দখলপত্র ! উঃ—শাখা !—
(টিনতে টিনতে উঠিয়া খাড়াইয়া) না—পালুকা ! কোলকাতার
বাঘো—পালকা—দীহু—দীগুণী । আচ্ছা, বাবু, আমিই
বাড়ি ।

দীহু

ভাষাই বাবু কোথায় বিদ্যি ?

আশা

পায়চটোর সেই দক্কোর মস্তনের বাকী—অস্থ, সেখানে
ডাকে পেছেন ।

দীহু

তাহেই নহে না কোন্‌ দ্বারী আমলা বেঁধেছে বিদ্যি ?

আশা

হ্যাঁ দাদা । তা সে অনেক ক'রে কৈদে কেটে এসে
পড়ল । মোকদ্দমা না কি তুলে নেবে । শেষে হাতে
ধরাধরি ক'রে ত নিয়ে গিয়েছে ।

(গোলাপীর প্রবেশ)

গোলাপী

বিজিহাদি, কর্তাবাবু দীগুণীর ডাকচেন একবার ।

(উভয়ে প্রস্থান)

দীহু

তারি ভবর থবর । একেবারে বাবু ফেল ! বাড়ি আর
হাট থাকলেই, একদিন তা ফেল হবারও তার থাকে । এত
ক'রে বলি তার মধ্যাক্ষে যে দাদা—হাডা হও—কোন
চ্যাক্সাম থাকবে না, সে ত আর গুনবেন না । খালি বিষয়
দাপর, টাকাকড়িতে নিম্নে এক অগুণ্ডর তারি ক'রে রেখে-
ছেন ! বাবু ফেল লুকে লুকে তার মধ্যাক্ষে ফেল ! কই—
কক্কর দেখি কেউ একবার আমাকে ফেল ! সেটি বাবা
হবার যো নেই । দীনবংশ ফেল-প্রকৃৎ হয়ে ব'লে আছে । কিন্তু
বেটা পাশও ত এখনো করছে না । ছাড়ুচি না বাবা—
ছাড়ুচি না—পাশ করিয়ে নোবই । পাশ না করলে বেটা
তোমার ছাড়ান নেই ! পাশ তোমার করাতই হবে ।

(ঘরে ঘরে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

পায়চটী—দক্কোর মস্তনের বাড়ী, বাড়িখের একপানি গুচ
(দীভান ও বনেন্দ্র)

বনেন্দ্র

আর দেখছি কি দক্কোর, ক'রে খেল আর কি ! চেষ্টার ত
কটা করি না ; ছাবু নেট ট'কনের, তার আর তুই করি
কি ? এখন আর দুখড়ে পড়িলনি, বক্ত হয়ে শেষ কাজ
লগে দেবে ফেল । আচ্ছা আমি উঠলুম ত' হলে । ভাষার
পাকী খানতে ব'লে দে কাজকে ।

দক্কোর

বহন ভাষাইবাবু । আর একটুখানি বরেন,—আমি
আলুচি । (প্রস্থান)

বাড়ির দ্বিতীয় অস্ত্র একপানি দ্বার ব'লে, চাকর ও
টিন্‌স্টেইন নিমাই বাবে)

নিমাই

চাকর, বেশ ক'রে ডেবে দেখে দেখি এমন সুযোগ
হয় ত আর কীকনে নাও পেতে পারি । কীম কি বল তে
নিমাইবাবু ? 'হ্যাগেই' তো তোমাকেই ক'রে হবে ।

নিমাই

একনি ত 'চাকর' দ্বিধে 'হ্যাগেই' করা যায় ।
বেটা মোড়ল তোমার রাজী হবে ত ?

দীনেল

কক্করেক আমি যেমন ক'রে পারি রাজী করাইছি ।
কিন্তু কেদটা ঠিক ঠিক করিয়ে প্রমাণ করান বাবে ত ?

চাকর

তা বাবে না কেন ? ও বলবে “আমি ‘পয়সান’ ছিই নি”
কিন্তু শিশি ছুটার পরে তোমারি হাতের লেখা—“রমজানের
মস্তে”—“লতিবের মস্তে” ।

নিমাই

আর শুধু তাই নয়,—প্রমাণ ভাল ক'রে হবে বাবে,
কৌমদারী মাথা কাটাখটি ফেল পেত্তিঃ হয়েছ, হুতরাং
অক্সেল রে হুতিমত, সে লহছেই প্রমাণ হয়ে রয়েছে ।
তারপর, তুলে না হয় এককনের দ্বিধিতে ‘পয়সান’ দ্বিধে



কেন্দ্রে আর, কিংবদন্তির স্তুতি শিল্পেই তুলে 'শরৎকল' দেওয়া ক' কিংবা, চরিত্র বলবে যে 'কল্যাণ কল', কিং 'কল্যাণ' যে নত, তা পাড়ার চুড়ার কনের সাক্ষাতে প্রমাণ করিয়ে দিতে চাবে। মোট কথা, প্রমাণের অভাব হবে না। এখন ভাড়া আরও 'টু এজেন্স' অনেক রয়েছে। তবে, এখন ব্যাপারে শাটিকেও সীতমত কিছু বরফ কতে হয়। সেটা গেলে উঠবে ত? অবশ্য কামকে কিছু দিতে চাবেন। কিং, তাঁ ভাড়া ত, চাই :—বৃষ্ণে না? লাস ওয়া জালিয়ে কেন্দ্র—সে 'রিং' আমার—সে আমি ভাট্টিয়ে নেবে। অরবার আগের মুহূর্তের বসিটাই মেটিকেল একজামিনের ভাঙে পাঠিয়ে দিয়ে কাজ পারবে, আর ডাকাতের 'উইটনেস' সবচেয়ে কাজে লাগবে। এই ত ককৌব এসেচে—ও একবার ভিজেন কর তাহলে দানেশবাবু ভাব ক'রে।

সীমেন

ওকে সে সব আমি বলেছি। টাকা যা খরচ হয় আমি করবো। এ সুবিধে আমি ভাড়াবো না নিমাইবাবু। তুমি ওকে 'ছায়েটে' কর। তারপর যা হয়

নিমাই

তা হলে ফকীর, এক কাজ কর। পাড়ার চুড়ারজন লোক টিক ক'রে এখানে ভাটির থাকবার ব্যবস্থা কর। আর, একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি—জারকে দিয়ে খামার হেড কমন্টেল হারিয়ে কাজে এলুনি পাঠিয়ে দাও।

৯. সীমেন

ফকীর, তা হলে আর বেড়া কোরনা। চুইপটু সব ব্যবস্থার ক'রে ফেল। আমি আর এখানে থাকবো না। তা হ'লে। আমি স'রে পড়লুম। ডাক্তার, লাক সব জোমরা তা হলে। গর ফকীর! রহমান কাছে গিয়ে ব'লে ত'একটা এ কথা—সে কথা ব'লে ওকে আটকে রাখবে যা। আচ্ছা, আমি চমুম তাহ'লে। শুভ্রাই।

গফান)

নিমাই

ফকীর এই চিঠি নার। যাও, জুজিও চলে যাও। চু'একটা কথা ক'রে ওদিকে আটকে রাখবে—খামরা তোমার পেছন পেছনই বাজি। (ফকীরের প্রস্থান)।

(ফকীরের বাহিরের ঘর, রমেন ও ফকীর উপবিষ্ট)

রমেন

তা'হলে আমার পার্থক্যনা। এইবার জানতে বলে দে,— আমি খাট।

ফকীর

হ্যা, কি জামাইবাবু। আচ্ছা, জামাইবাবু, কোজদার মকদমার আসামী ত দাবাও একজন ছিল। ওট বন্দন ম'রে গেল, তখন—

রমেন

হ্যা, তাকে এই ব'লে একটা 'পলিট্যান' কলিগ করত হবে যে, দাবা তোম কলোতে মাত্রা বাড়ায়—

ফকীর

কলোতে মাত্রা বাড়ায় কি গো। তুমি বিধ দিয়ে তাই আর তাইপোষ্টিকে মেরে ফেরে, আর বলছ "কলোতে"। জার! জার! তোমাকে বিশ্বাস ক'রে চিকিৎসা করাতে এনেছিলাম, আর তুমি বিধ খাইয়ে এমন ক'রে পক্ষতা লাগলে—

রমেন

(চমকিত হওয়া) কি বলছিস রে ফকীর। বিধ কি বলছিস?

[নিমাইবাবু, জাকার ও সত্যজ্ঞ পথেকমন প্রস্থান]

জামায়াত (চৌকীদার প্রভৃতির প্রবেশ)

নিমাই

জানেন না আপনি—বিধ কি?—ইগটিওট জানতে পারবেন। এই ফকীর মণ্ডলের দাবা আর তার ছেলেকে ওষুধের সঙ্গে বিধ মিশিয়ে খাইয়ে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকে গোপ্যার করতুম। রহমৎ আলি, পণপ-লাল,—হাতে হাতকড়ি লাগাও।

রমেন

কি? আমি বিধ—

নিমাই

হ্যা—ইগ—বিধ? নিজে খাইয়েছেন, এখন কিছুই বুঝতে পারছেন না? রহমৎ, বাহ-বাড়ীতে নিয়ে এস। ডাক্তার বাবু, আপনি, বাহ-বাড়ীতে বাই চলুন।

[হঠাৎই হাতে হাতকড়ি ওয়ান চটপ এমন কানেবিসব
সড়াইয়া বহিল তারপরে তাৎক্ষণিক টানিত লটকা ঘাইবেব দিক
এটা বেশ : নিজন নিজম সকলে চমিল]

বড় পুন্ড

বেগডাল:

[নিজেদের মামলের সবুসবতঃ ধারোহাটীতলা জনবহুল
সামবাসী : বাবানো বকল পড়ের ওয়াই বসিমা মাঝাপ মালাপ
আমোদনা কবিতাছিল : হটাচাং মহাপদ চাঁকা হয়ে টাটকাই
তাবাক নাট্যেরিলেন]

ভট্টাচার্য্য

আশার ত তা'হলে 'তকব্ব' ক'রে উঠো। দেখছি, কি
বলিস যে মোনা ? [তামাক টানিতে টানিতে বাবানো বকল
উপর উঠে উঠা বসি

হরিচরণ

আজ্ঞা, জনতে পাট, আনা চালাক মেয়ে,—কিন্তু এ
কি তকম কাজটা ক'রে করে! একখানা চিঠি পেলে আর
অর্থনি একটা অজানা-মচেনা লোকের সঙ্গে টাকাকড়ি
নিরে বেরিয়ে পড়ল ?

মদ্রথ

আরে আর কি আর মাথে! কি লজান অবস্থাটা
একবার ভাব দেখি। তার মশাই নেই বাড়ী। ব্যাক
কেলের দর পেরে তিনি পাগলের মত হয়ে চ'লে গেছেন
কোলকাতায়। এ দিকে দ্বারী পুলিশের হাতে গ্যাছেট
হ'য়েছে! কি অবস্থাটা একবার ভাব দেখি!

ভট্টাচার্য্য

[চাঁকা দাব একটা টাব দিচ্চা] দেখ, মোনা, এর ভেতর
মত একটা বড়বর রয়েছে, নইলে জোয়ার গিরে—

মদ্রথ

আরে বড়বর ত রয়েছেই।

ভট্টাচার্য্য

বড়বর ত বটেই। নইলে, বেই তার মশাই পাগলের
মত হয়ে কোলকাতা ছুটিলেন, অমনি রুমেনকে পুলিশ বিব
খাওয়ানর মশরখে হায়েবট ক'রে করে। বিখ খাওয়ালে

আবার কাজে ? না—কর্তার মন্তব্যের তাইকে মাথ
চাটলোকে! তারপর এক দিন পরেই ভগলী থেকে
অমনি হাট মশাইএর চিঠি বিনেব লোক এল, আর সেট
মহাশয় মেয়েটাকে বেন জোকাখাটী মত উড়িয়ে নিয়ে
গেল। বলি এ সব কি আর বুঝতে পারি না? প্রকৃত
বড়বর! প্রকৃত বড়বর!

বিকু পাল

অঃ চাকতি মশাই, চিঠি পানিও কি
তা কিছু তুমিও ?

মদ্রথ

আরে, সে আমি জানি। লেখা আর চাকতিপাল কি
পাকবে। তার এলাই যেন কোলকাতা থেকেই দর পেরে
তখনই ভগলী চ'লে এসে তাঁর উকীলের বাড়ী থেকে
লিখছেন যে এই লোকের সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে পরপার
ভগলী চ'লে আসবে। কিছু চিঠা কোয়ো না—কোন ভর
নেই। রুমেনকে পালাস ফলই। এই তারের টেলিট
চ'লে আসবে। এই লোক খুব বিশ্বাসী, এ সব সঙ্গে আসতে
বিধা কোয়ো না। দৌরকেও সঙ্গে ক'লে এনে।
রুমেনের সঙ্গে—

ভট্টাচার্য্য

তা এই চিঠি পেয়েই, ভাগ্যময় একটু ভেবে চিন্তে না
দেখেই, টাকাকড়ি নিয়ে লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া—
বিশেষ রাজিকাল—তারপর দর গিরে,—আমাদের হেঁদর
মেয়ের মত দুগু দুগু নর—লেখাপড়া জানা মেয়ে! হাতের
লেখটাও একবার দেখলে না, যে তার হাতের লেখা
তারপর দর গিরে, ভগলী থেকে কোলকাতা, এমন যে অনেক
দূরের পথ—তা'ও নর, মোট কোল বাড়াই ভিন পথ।
তুঁপে মাগতে মিনিট পথের। তার মশাই ত নিজেই
তা'হলে বাড়ীতে এসে টাকাকড়ি নিয়ে আবার গেছে
পারতেন।

মদ্রথ

বেশ ভট্টাচার্য্য, তোমাদের মাথা গোল ছাড়া আর যে
কিছু আছে ব'লে ত আমায় মনে কর না। তোমরা এটা
মোটেই বুঝ না যে আশার তখন মনে অবস্থা কি।



অবস্থা

চরিত্র

আরে চার, ওলং কিছুই নয়—কিছুই নয়। এ হচ্ছে ভূপা। প্রহর শেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। বার বাড়ীর চাণের ঢাকা উল্টো ঘুরতে শুরু হল আর কি! 'তা' নইলে, ভেবে দেখ দেখি, দেখতে দেখতে কি ব্যাপারটাট করে গেল। সাতান ঘাত্তার আগলে এ খেন আস্তান লেগে গেল। কি বল তে বিট, পাল?

বিজ্ঞ পাল

টিক—টিক! ভগবানের আর ডাক।
নয়। খাই তোক অমন বেবতার মত
এমন ব্যাঃ—

ভট্টাচার্য্য

দেখ, তার মশাই লোক যে মত তে টিকই, কিছু সকলে
যে তাঁকে বেবতা দেবতা বলে গ'লে যায়, সেটাও লোকের
গাড়াবাড়ি।

চরিত্র

বাড়াবাড়ি বই কি,—খুবই বাড়াবাড়ি। আমার সঙ্গে
ও বছর—

ভট্টাচার্য্য

সকলের উল্লসিত হটক! অশোকের উত্থাপন! মিন্দুরট
বাড়াবাড়ি। আমার ঐশ্বর্য্য বিধের সময় বড়-বড় করে
গিয়ে তোমার কাছে গাড়লুম, তুমি একশোটা টাকা দিতে
পারলে না! শকাব্দাটা টাকা নিয়ে খেন তিকিঁদী বিধের
করলে। ছেলে নেই, পুতে নেই, বিধের আশ্রিত নিয়ে
ব'লে কয়েক,—তুমি কি না—

চান্দুল

কুলে যদি তবে বলি। আমার বিড়কার পাখাড়ে গুজ
সেই একগুণ শিবাই গাছটা গেল বছর ক'ড়ে গ'লে।
তা মদ্যপানের মধ্যে গোট্টা দুই ম'ড়কে ছোট্ট ভাল আমি
এনেছিলুম। তা তিন দিন না বেতেই তুমি আমনি বরষাটা
নিঃস্রব্দ আর মদ্যপানে নিয়ে চেয়ে পাঠিয়েছ! এ বছর
ছোট নজর কার আমি দেখি নি। তোক চারটে করে

কিবেল লাগিয়ে গোট্টা তিনটে দিন গেল আমার সেগুলো
চেলিয়ে ফেলতে! পাচ ছ'টা টাকাট গেল আমার বছর
করে। তুমি দেখিকে দেখলে না, তুমি এলে কি না
সেগুলোর ওপর নজর দিতে। গাট বল, চোখের পর্দা
একবারেই নেই।

মদ্য

ওবে তাই, 'বতটা গাটের উত্থাপন বর্ষা না'। সাতা
কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। আমার সেই
জমী বড়কের মতল শিবায়ের টাকা খুন হয়েছিল, কত
ক'রে বহুম, কই, লব স্রবী ছেড়ে দিতে ত আর পারলে
না তুমি! ইচ্ছে করলে কি আর তা তুমি পারতে না?
ছাড়লে বটে, কিন্তু তখন বলে পাচটা টাকা নিলে ত! বলি,
ভগবান অস্ত্রাট্টা কি চিরকাল কখন মজ় করেন?

ভট্টাচার্য্য

আরে, লোক মোটেই ভাল নয়, তা নইলে—

চরিত্র

ছেড়ে পাও—ছেড়ে যাও। যা হয়েছে—টিকই
হয়েছে। বেবতার বিচার, বাবা, বড় হুজ বিচার!

বিজ্ঞ পাল

(গলা খাট করিয়া) এখানে আর কেউ নেই—চুপি
চুপি বলি তা' হ'লে—শাবও! শাবও! মহাপাশও—
নরাধম!!

ভট্টাচার্য্য

(হ'কার একটা টান দিয়া একমুখ খোঁচা ছাড়িত ছাড়িত
উল্লসের সহিত কথা কহিতে দিয়া পলায় খোঁচা লাথিয়া দিয় খাট
এবং সেই অবস্থায় কহিতে লাগিল) আরে বাট্টা মো—মো—
মো—মো—ক্যা—ক্যা—ক্যা—ক্যা—

সপ্তম দৃশ্য

কালী মন্দির—জারি মণ টার পর

একজন স্ত্রী

'রে'হের ক'রে—

খিনি উমা বল না তাই।

কত লোক কত বলে

পরে আসে ম'লে খাট।

লৈন না কি না সেজে বসে,
চিহ্ন-গুণ মাগে বলে,
কুই না কি না তারি বলে
সোনার অঙ্গে বাধিল বাঁট।
হাসাই নাকি ত্রকা করে,
সত্যই নিরে থাকিল যবে,
আন না দ্বিধা করে পরে
চক্রে করে দিখ বাঁট।

—মা—মা—সম্মতী, তাঁরা! [সত্যন]

[একটি পুরুষ ও একটি বীমোক খাতির প্রবেশ]

পুরুষ

এম—এম—মারি হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখতে? ঘরজা
ত বড় ভোলে গেল!

স্ত্রীলোক

মাঠকে মায়ের মুখের ভাবটা দেখলে? বেন কত
মাদুরগেতা! মালা, মাপো! কটকের আমার একটা
কাপড়ের ভিমে ক'রে দাড় মা—তোমার আমি ভাল ক'রে
পূজো দিবে খাব মা!

পুরুষ

আরে, এম না ছাই! মেয়েমানুষ নিয়ে মালা—এক
সকাট! চলতে পার না? হুপো! গভীর নিরে এক
ভারপাতেই যে জ'বে বইলে। চ'লে এস না!

স্ত্রীলোক

আরে বাসবে! বেন গেল ছুটতে আরম্ভ করে যে!
একটু আক্ষেপে চল না পা!

[উভয়ের প্রস্থান]

[ছুইয়ন বুঝকের প্রবেশ]

১ম বুঝক

কুই বেটা যেমন অনড়নে! বদলুম একটু সফাল
সফাল চ', তা' এখন হোল ত? আমি জানি যে তাত
দশটার পর মায়ের মন্দিরের দরজা বন্ধ চ'রে যায়।
জেন্ডার! এই এতটা পথ এসে—

২য় বুঝক

বেণ্ দেবা, মিছে বকিসনি। জোর জেজাই ত দেবী
হ'ল। জোর আর পাছগোজাই হয় না। আসবি—মায়ের

মন্দিরে, তা সামগোজের মত দরকার কি ছিলবে টুপিড?

১ম বুঝক

বাং, বাং, এই পাঁচ আনা পঞ্চা টামেতাড়ি কিছু জোর
কাড় থেকে আদায় করবো আমি। তা জানিস।

[ছুইট কুমারী বালিকাঃ প্রবেশ]

১ম বালিকা

বাবু, একটি পরমা দাও বাবু!

২য় বালিকা

লাল লাল বাটা চ'বে তোমার, একটি পরমা দাও বাবু!

১ম বুঝক

পরমা উরমা চ'বে না—নেই!

১ম বালিকা

রাজাবাবু তুমি, পরমা নেই বোল না বাবু। মোহাট বাবু,
একটা পরমা দাও বাবু!

২য় বুঝক

আরে আরে, কাপড় ছাড়! মাছা, এই একটা পরমা
ত'মনে ভাগ্যকবে নিগে বা! [একটা পরমা একতরফে চ'লে গেল]

১ম বালিকা

২য় বালিকা

সাতা বাটার বাপু চ'ও বাবু।

১ম বুঝক

ওরে দেবা,—ওই একদল আসচে আবার। পা
চালিয়ে পাগিয়ে আর—পাগিয়ে আর। কি লক্ষ্যনাশ! হাত
দশটা বেলে গেছে, এত রাতেও এর ঠিক চালির আছে।
[২য় বুঝকের হাত খসিয়া উঠিয়া লটকা প্রস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে
একদল ছিবাফার প্রবেশ]

১ম ভিখারী

বাবু, কানাকে একটা পরমা দিবে দাও বাবু।

২য় ভিখারী

খোঁড়া পাংড়াকে কিছু দিও বাবা।

৩য় ভিখারী

পালিও না বাবা, পালিও না বাবা, পুনিঘের
আশ্বপুকে একটা পরমা দিবে দাও বাবা—



৪র্থ ভিখারী

সুখদাসকে গোটা পরমা দিই বাবা—তখন তুমি
ভাগ করিবা—

৫ম ভিখারী

[এক চাপড়াটো চাপড়াটো] হেঁই বাবা, হেঁই বাবা, একটা
পরমা—হেঁই বাবা—হেঁই বাবা একটা পরমা ।

গোপা ভিখারী

খা—উ—অ—অউ—হাঃ—উঃ—আ—হাঃ—উউ—
আঃ—

৬ম ভিখারী

দিলেনা বাবু, তবে জাহাজে যাও !

১ম ভিখারী

দূরত—দূরত—আমার মত কানি হয়ে পাক্ ।

২য় ভিখারী

'লে পুড়ে গাক—অ'লে পুড়ে গাক—

৩র্থ ভিখারী

দূর ৪৩, এমটি ভিকা কিরি কিরি খা—

গোপা

অ—উ—আ—উউ—উউ হা—অউ—হুউ ই—

সকলের প্রধান)

[মালতী ও দীনেশের প্রবেশ]

মালতী

গছের আগে এসে বেখে গিছি, এই মনহাতলাটার
তুই প'ড়ে ছিল । কাকর কাঁচ থেকে চারটা মায়ের
কোপ চেয়ে চিত্তে করে তুই ছেলেটাকে লাগিয়েছিল । খসি
যেহেমাগুণ বাবা ! মরতে বসলে, তবু নোথাতে কিছুতেই
পাতা সেল না ! বাই হোক্ শবে বার ক'রে দেওয়াটা
ভাল হয় নি । [চানিদিকে ঘেঁষা] কৈ, কোথায় গেল ?

দীনেশ

ঐ তাকো বারান্দাটার তেতর কে গেল তুই বসেচে না ?
ঐ যে,—ঐ কোণের বারান্দায় ?

মালতী

মাতৃশ্রবণ মতই ত বলে বোঝ হ'ছে । এস দিকি দেখি ।
[কানে থাট্টা] টিকিই গো—এই যে ! অ আশা ! বা

এসেছেন । বাপ ক'রে তোকে রক্তাক্ত বাক ক'রে দেছিলেন,
তোই ওপর আর ক'রুণ বাপ ক'রে থাকতে পারেন ? দেখ্
দিকি কী ভালবাসা ! ওরে তোমার বগাত ভাল । এমন
ভালবাসা পারে তেলিসনি । ওই, আর ।

দীনেশ

আশা, এখনো বন্ধি কথার বাধা চ' । এখনো আর
আমার লুকে । বা বলি—শোনু । এমন ক'রে ক'দিন
থাকবি ? নিজেও মরে যাবি, ছেলেটাকেও মারবি ।

মালতী

মাথ লো আর । না মলে বাবু আমার রূপ কখনে ।
'মাঝা, বলি এত রংপু তুই আর কার সঙ্গে সহিছিস্ । ভাল
ক'রে বুকে বেধ্ দেখি । এই ক'দিনে তোর কি চেতারা
কী চ'য়ে গেছে, আশি ঘ'রে একবার চেয়ে দেখ্ ।

আশা

আমার সন্ধান ক'রে আমার তোমরা কেন এসেছ
আপাতন করতে । যাও, দ'রে যাও আমার সব
থেকে ।

দীনেশ

কথা কুমবিনি তা'লে ? এইবার কোর ক'রে
কথা শোনাও ।

মালতী

ছড়ি গাছটা বহ ত । ওকে কোর ক'রে এবান থেকে
তুলে নিয়ে যাও, দেখি ওর কোন বাবা ওকে তকে করে ।
[দীনেশ পরা বগাত ঘাইল]

আশা

[উত্তেজিত ঘটনা] পরদার বন্ধি, গারে চাত দিবি ত
লাবি মেয়ে বুঝ ভেদে দেখো । আশিস পাও, আশি
মায়ের মন্দিরে মায়ের আজ্ঞায়ে আছি । একবার আমার
ছ'রে দেখ্ দেখি—পাখাও,—পঙ—নরকের কাঁট !
[গালাগায়ে লাগিল]

দীনেশ

[চাপা কণক কণ] বুটে ! তাই না কি ? মায়ের
আজ্ঞায়ে আছি ! তবে, ভিকালের জন্ত মায়ের আজ্ঞায়েই
পাক্ । [দুকণপেট লাগি বাহিরে মারতে] থাক্—থাক্—
থাক্ ! কেনন, হ'চ্ছে ত ?

আশা

ওহা... কু... ওহা! ... কু...

দীনেশ

মাগতী, আর দেখছি কি! রক্তধর্মি কহুচে। চ'লে
আম—পালাই এইবার। ঐ কে আবার পান গাইতে
গাইতে এই দিকে আসচে। পানিয়ে আর মাগতী।

[ক্রত প্রস্থান]

[বাহিতে বাহিতে হাঃ]

তক্ত

এত কহা কে দিল তোর পর।

যে না চুটো বহা ক'রে আমি যে মাগাঃ

বাহাঃ কহা পলকো,

কে তোরে নিয়ে মাগালে,

এই নদী পহরলে কত গোড়া দার।

[বাহিতে বাহিতে প্রস্থান]

[সীতানাম ও হীনকালের সংলাপ]

সীতানাম

তাই ত দীহু, আজ সাত দিন ম'রে এত খোঁজাখুঁজি
ক'রেও দিহির আমার সন্ধান করতে পারলুম না। আজ্ঞা,
কালোঘাটে এনেই তোমাকে তারা তাকিয়ে দেখে? না সে
আর কোন জায়গা? দেখ বেঁধি ঠিক ক'রে—তোমার
চুলটলু হচ্ছে না ত?

দীনদয়াল

না রায় মশাই। ওই দোতালা বাড়ীটার আমার
দিকিকে নিয়ে তারা চুকল। আর ওইখান থেকেই তারা
আমার গলাধাক্কা দিয়ে তাকিয়ে দেখে। কাককে ত চিন্তে
পারলুম না রায় মশাই?

সীতানাম

হা ভগবান! আমার একি কসে তুমি? তর তর
ক'রে সব বাড়ীই ত খুঁজলুম দীহু, দিকিকে আমার
তা হলে আর আমি পাব না। এই সাতদিন ধ'রে কোথাও
ত খুঁজতে আর বাড়ী রাখলুম না। 'পাব না—পাব না!—
পাবই যদি তা'হলে বাবে কেন? আমার কি হ'ল দীহু?
মা গো! একি করলি মা! আমার সমস্ত আলো

নিভিয়ে দিলি? আমার মহোৎসবের মাকদানটাও

এমন ক'রে প্রলয়ের কড়া বহিরে দিলি মা!

আশা

(দূরে মাগাঃ হইতে) ওগো—মাগো! পেলুম!

হাট!

সীতানাম

ও-ও—ও-ই হে! আমার দিহির গলা! দীহু কই—

কই—দিহি—দিহি?

[চুটখা বাগাওর আসিয়াঃ]

আশা! দিহিরদহি!

আশা

দাঃ! তুমি? কি ক'রে এলে? কাছে এস।

ওগাঃ—দাঃ, আর হল না—চ'ণে পেলুম দাঃ! ওহা... কু!

ওগা... কু।

[ব্রত মন্দ]

সীতানাম

একি চ'ল তোর দিহি! দীহু, এ যে দিহি আমার
রক্তধর্মি করতে লাগলো! দিহি—আশা—কে তোকে
এমন করে একবার বলতে পারিল দিহি? আমার বান্দী
কই?—বান্দী—বান্দী!

আশা

ওগাঃ—মাঃ—গাঃ—উঃ—উঃ—দাঃ—হু! দাঃ—

[ব্রত!]

সীতানাম

[চাকর করিয়া] দিহি চ'লে গেলি? দীহু, আশার
যে হয়ে গেল আমার! আশা! দিহি! [অব্যবহৃত দীহু
'দিল' দ্বাক্ লব নিশ্চিহ্নি!—দাঃ বেশ!—বেশ চ'ল!
বেশ চ'ল! বড় আলো জ'লে উঠেছিল—বেশ হ'ল। দীহু,
—আমি চললুম—চললুম! তাইত! কোথার গাই? কোথার
গাই?

[চুটখা হকালিক চলিয়া গেল]

অষ্টম দৃশ্য

সীতানাম গ্রামের বাটী

দীনেশ

প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! বাবার পেন
আদেশ এতদিনে তবে শেষ হবার মত হ'ল! রমেন!



বড় অত্যাচার ছিল তোহর,—রক্ত বস্পূর্ণপানি আরম্ভ করেছিলি !
 এমন কেমন হোল ? জেল থেকে কিহর এসে দেখনি—
 সব ক'কে ! সব অত্যাচার ! তোহর হাতের অগ্নির ডেকে-
 চুরে তখন হু'য়ে গেছে—তোহর গোলাপ বাগান মাঠ হু'য়ে
 গিয়েছে ! কে এমন করলে জানিস ? দীনেপ রায় !
 হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ ! (বানিক দৌলত খানিকটা দূর) ছেলেটা
 এখন ম'লেই হয় ।—ছেলেটা ত মজেই—বা গুপ্ত
 ডাক্তারকে ঘিরে দেওয়া গেছে—ও আর কতকণ ?
 আমাকে কিছু লাগে সাবাস ! গোড়া থেকে কি রকম
 ঝুঁকটা বাড়ির আসিচি ! খালি ব্যাক ফেলটা—ভগবান
 মটরে দিলেন, তা ছাড়া আর সবই ত আমার হারার হ'ল—
 অথচ খ'তে ছুঁতে যিইনি । বরাবর মাড়ালে থেকে কাজ
 করিচি । মাতনি আশাটা যা জানতে পেরেছিল—তা দে
 ত কারার । মীতানখ এখনো বুততেও পায়নি যে এ
 স'বের মূল এই পর্বা ! সামান্যদিনি এ সব কাজ
 না ক'রে 'মাড়াল থেকে যে কাজা হয়েছে, তাতে পুথ
 পরিবেষ্ট হয়েছে । বাবা—বুড়ি থাকলে কি আর পুতর
 বাড়ীতে প'ড়ে প'ড়তে হয়—দাত্রেই আছে—'বুড়িও
 প'ড়তি ।"—থাক—ছেলেটা যে ম'রেও মরে না !
 আর তিন দিন 'টাম্‌মাটাল' ক'রে কাটাচ্ছে ! তিন
 বছরের ছেলেটার কি রকম কাজা গ্রাণ্ডে বাবা ! আদকে
 ভরল তোম ডেওয়া গেছে—আজ সাবাস হতেই হবে ।
 'ভাগিনা তরাট'র মধ্যে আর কোন ডাক্তার নেই—নইলে
 গরে এ ছবিখোটা হুত খ'টেই উঠে না ।—এই যে !
 কোঠামশাই, কি রকম আছে এখন ?

মীতানখ হাতে প্রবেশ ।

মীতানখ

দীনেপ, বাবা,—সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েচে—এখনো
 একটু ঘুমোওনি । ঘুমিয়ে নাও বাবা, একটু ঘুমিয়ে নাও ।
 তোমার ধার বাবা আর শুভেতে পাল্লম না । রমেনের
 মোকদ্দমন্তেও বগেট করেচে—আপার জেজেও চারিদিকে
 অনেক খোঁজ খবর করছে । এখনো প্রাণ দিয়ে পাটছো
 —কিছু, বাবারে—কিছুই বুঝি আর হলনা—উঃ—
 ভগবান—[হাঃ-হাঃ-হাঃ অত্যাচার হুত বগেতে লাগিল]—

দীনেপ ! দীনেপ ! কি করে বাবাকে আমার বাচাতে পারি
 বলতে পারিল বাবা ? ওহে, তার বরণ আর ব'লে ব'লে
 চোখে দেখতে পাল্লম না ব'লে পালিয়ে এসুম । একটু-
 খানি—মাথের ভেগা—কি—ঘরখাই যে ভোগ কতে
 দীনেপ—হো হো হো হো হো—কি করবে ?—কি করবে
 আমি ?—দীনেপ—বাবা, অনেক কলি—বাবা, তার এই
 বরণটা সাত্বিয়ে দেবার কিছু কতে পারিল বাবা ! আমার
 ববা সন্ধ্যা তোকে দোবো ।—ববা সন্ধ্যাই আর দোবো
 কি ? ওহে, আর ত কিছু নেই আমার । আমার যে সবই
 গেছে । আছে শুধু গাঁয়ের এই মনিবাতীটুকু,—ওহে যা নিয়ে
 তোদেরি সবে বাবা, ভিতকালের মামলা মোকদ্দমা ! বাবারে,
 আমাকে তুই কমা করবি বাবা ! দীনেপ আমাকে তুই—

দীনেপ

কোঠামশাই ! মত উত্তলা হবে না ।

উঃ—আপনি কিছু ভাববেন না ।

মীতানখ

না বাবা—তার ও রকম বরণ আর আমি চোখে
 দেখতে পাপোনা—পাপোনা । তাই আমি পালিয়ে এসুম
 এখন থেকে । বত বরণার ছট্‌কট্‌ কতে, ততই মা বা
 ক'রে খালি তার মাকে খুঁজছে । কি কর্য দীনেপ, তোমরা
 আমার বলতে পার ? সন্ধ্যা বাবর যেমন জমায়েনের
 ব্যাধি ভগবানের কাছ থেকে চেয়ে নিছের থেকে নিয়েছিল,
 তেমনি তোমরা কেউ খোকার বরণটা আমার পরীর দিতে
 পার ? এমন কি কেউ নেই যে—এ পারে ? উঃ—আর
 সহ কতে পারি না । বাবা আর ঠিক ভাবতে পারি না ;—
 সব আমার গুলিয়ে যাচ্ছে । উঃ-হুঃ-হুঃ । কি হ'ল
 আমার—কি হ'ল আমার ! [দোড়াক্টা বাইবার উপস্থান]

দীনেপ

কোবার যাচ্ছেন কোঠামশাই ?—কোঠামশাই ?

মীতানখ

আমি আর সহ কতে পারবোনা । [দোড়াক্টা প্রস্থান]

দীনেপ

বাই—ওপরে গিয়ে একবার ব্যাপারটা
 আসি । [প্রস্থান]

পট পরিবর্তন। খোকার মুত্ৰা পথা।

দৌনেপ

কোথায় গেলেন তার মশাই?

পড়ল।

দৌনেপ

ডাক্তার, একটু ভাল ক'রে দেখ। একম হয়ে গেল
কেন। দেখ ডাক্তার, দেখ— দেখ। বাতাস! পাখা!
[পাখা নটর্য্য ভূত বাতাস কবিতা পাঠিল]

গোলানী

[বাবিরা]—ওগো—একি হল। বাবু গেলেন কোথায়?
—খোকন—খোকন?

দৌনেপ

[পাখা বাবির্য্য অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে] হল—হল—। দৌত্র—
বাতাস কর। হল—হল, দৌত্র,দৌত্র হল।

গোলানী

[কানিতে কানিতে] আর হল দিবে কি হবে মো বাবু।
ওগো সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল গো। ওগো, বাবুকে কেউ
খবর দাও না গো।

ডাক্তার

এত চেষ্টা ক'রেও ত কিছু হোলনা। হীন
চলুন দৌনেপ বাবু—এ'কে একবার দেখ।

(প্রস্থান)

ক দৌনেপ

মাগতী, আর দেখছিল কি? তার মশাইকে
খবরটা দিলে বা। এই রকমই হয় আর কি? নতুন নব—
নতুন নব। গোলাপী! এ আমি কালের পুরাণে
বাপরি। এবে মঙ্গল! স্বপ্ন! স্বপ্ন! অতি
চমৎকার!

নবম দৃশ্য

বেল ডাক্তার—স্বপ্নান
(শীতাব্যস্ত ও চৌকর্য্যাল)

দৌনেপ

তার মশাই!

দৌনেপ

বলি, সমস্ত দিনই কি এটা স্থানে বসে থাকবেন?

দৌতানাব

চুপ্—চুপ্, কথা কোরো না, কথা কোরো না দৌত্র—
একটা পর তুমিও দৌত্র! পুর ভাল পর!—এই-এই-এই
একটা মেয়ে ছিল—সে গেল ম'রে। আমার তার একটা
মেয়ে ছিল। সে বড় আদরের ছিল গো—বড় আদরের
ছিল! তার নাম ছিল—মাশা। সেই মাশার মাশাতেই
একটা বুড়ো বেটে ছিল—সেও গেল মরে; তার আবার
ছেলে ছিল—সেও গেল মরে! [হঠাৎ উচ্চ গীতকার্য্য] দৌত্র—
সেও গেল ম'রে! সব ফুলকটা—একদল ক'রে গেল।
দৌত্র!

দৌনেপ

তার মশাই—একি হচ্ছে? চুপ কগে না!

দৌতানাব

চুপ ককো—চুপ ককো—নিশ্চয় চুপ ককো। চুপে
গিয়েছিলুম—আমিও চুপ—তুমিও চুপ!—সব চুপ।
বাতা ঢেকে গেছে—সব চুপ! আমি একটু ছুটোছুটি
ককো। আমি একটু কানকো—হানকো—গাইব। আমি
কী ককো! দৌত্র, [ভাবকান কানকো] বল না, আমি কি
ককো? না-না-না, কিছু আর কতে পারবো না। আর কি
পারি—কত পারো [হাত তালি] তো হো কুকুরটা ছুটেছে—
কুকুরটা ছুটেছে। হা-হা-হা-হা! পালিয়ে গেল। ও কি
ছুট্! পাড়াত—আমার লক্ষ পাখি? তারাম-
মাশা—বদমাশ! দৌত্র ছুটেতে পারবে? আমার ম'তে
পারবে?—এই চুরে তাং চাং সোনা দিবে বাবাংকো ডাং—
মারবো ডাংয়ের বাড়ি—পাড়াবো ঘরের বাড়ি—চু-চু-চু—
[ছটকা প্রস্থান]

দ্বয়নিকা

স্বপ্নলীলা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হে মার মানল লক্ষ্য, হুচির বাঁকতা,
হাতিশেখ আমি মোর স্বপ্নে তুমি

দেখা দিলে সেই কলাখিতা,

সেই প্রাণা বিড়ম্বাতি স্বপ্নচাতিমত,
সেই দীর্ঘতরী ধারা চাপলা-নিগর,
সেই কলতরঙ্গজা হু-উজত নাগ,
তু উজ্জল হু-লগাতি স্বপ্নবর্ণে ভাল,
অতুল অদর এটি শ্রীতি-সদাধৰ্মে সুখা দুটন-উজ্জ্বল,
নয়নে করিছে বাস শিক্তগণি মার গুণ গুণ,
কায় পশু পরিপূর্ণ যিহু কোমলতা,
হেমদণ্ড এটি হস্ত যেন দুই লতা,
ও জীণার মনি মরি যৌর রাধি' কর
আঁকড়ি' মরিতে চাই কল জমাত্তর ।

স্বপ্ননে চেহিহু তোমার, পার্শ্বে মোর বসিয়া
ধাম করে দেহ মোর কোমল আঁকড়ি'
মোর মূগপানে চেয়ে চাপিতেছ মিষ্ট-চুই-কানি,
মৌদামা-দম্বিহু আমি স্পর্শিতে তোমার তর বাঁস ।
চাপলা-ধ্রুতি তুমি কহু নতে চাচিহু উদাস,
খেতে খেতে মোর মূখ চুকাইছ হাসি

কুণ্ডল তাল তাল ;

তুহু তুপ ব'সে ব'সে চেহি তব লীলা ;
কল বাধিবারে চাই তরী তোমা শাক-চুই-কীলা ।
তোমারে তুলিতে কল বাগ হুখে পাড়াইয়া উঠি,—
একি একি লীলামরি, আমার চরণতলে লুটি'
আঁকড়িয়া ও চরণ কহ তুমি—"বল বল, শ্রিয়,
আমারে রাধিবে কাছে চিরদিন ? চিদ শ্রীতি সিও ।"
করি আমি—"সান্দী, বাঁকতা, সিগা,

স্বপ্ন-কীলক লক্ষ্য, সুখা,

তোমারে তেঁ'বারে আমি নির্ধিনি চৌকি' নরান'
গৃহে ও কলগো পথে নভতলে চিত্ততলে লুটি'
সদুখে লভিহু আমি ; নিঃক জীবনের তুমি লুটি ।
তোমারে রাধিব কাছে !—একি আম গুখাইলে নাগা !
তোমারে লভিতে কল আপনারে নিছাড়ি' নিছাড়ি'
যেমনার পরিপ্রমে জেগে কাটে জীবন-প্রচর,
এল মোর স্বপ্ন-লাব !"—বলিয়া, প্রদাতি' চুই স্বয়
কল তুলি তারে আর চক্রে বাঁধ সে বিহু বগান,
সেই মূচকাত্তর নোতিপথ উজ্জল নগান ।
বাতর বন্ধনে মোরে বাঁধিবারে মোর আকাঙ্ক্ষতা,
জুইত খেটনে মোর বন্ধনটে সে রং-বেঁটিতা,
উজ্জ্বল মোর মূখ অশ্লক বিটি বিহে চায়,
নত নেতে আমি তারে করি পান পূরি তুলসার ।
কহ হেসে বলে মোরে—"হেনা তুমি মোর ।"
আমি বলি—"চিরদিন চিরদিন আমি তোরা তোরা ।"
চারি নেত্র পূর্ণ বাণ, চারি নেত্র হুচেছে ভাবন ;
বাঁকাহারা হুচনার নহান নহনে আলাপন ।
বলিতে সে চাহে বাঁকা নহনে তা কলোশিয়া লাগে ;
আমি বা বলিতে চাই চলে বিহু পুষ্টি-মুদ্রাণে ।
নাহি বাঁকা, নাহি গতি, হুজনে নিম্ন হুজনার ;
কোথায় লগত, কল, কোলাইল ? সুখা তাতা

কোথায় মিলাহ ?

আমি বেঁচে আর বেঁচে রকে মোর মানদী স্মরণী,
এ হুটি অপ্রত গ্রাণে কল লক্ষ গ্রাণ গেছে মরি ।
জীবন্ত এ হুটি প্রাণি, মার লব বরণ-নিবল ;
আমি চেহি, প্রিয়া হেহে,—কুট প্রাণে লগত চকল ।
বোহে বোহে নিবিসেব লেখা লেখা, নাহি তার লেখ ।
সুখা হুটিল স্বপ্ন !—কোথায় প্রিয়া ? কোথায় কলমেণ ?

পুত্র দ্বারা 'পরে মোর বাখা-ক্লিষ্ট বিবদ্ধ পরাণ
মাছড়িয়া ব্যর্থব্যর্থ মাগে তুহা, ক্রুত অবগান ।
কোথা স্বপ্ন ? কোথা মোর স্রিয়া সে মাননী ?
লজ্জিত যে পারিষাত, কোথা সেল খসি' ?
গভাত-অাকাশে নানে চাটি' ব্যর্থব্যর্থ

তুইই খুঁজিয়া মরি যন্ত্রণাক্ষ মাননী আমার ।
দেখে কি কত সে মোরে এ জনপথে বিধে নাকো স্রাখা ?
আর বস্ত্রে চেঁরিব না মিছে দুখস্রাক ?
তুমু চিত্তে চিহ্নদিন তারি অশা করিব গোপন ?
অসহ এ অশান্তিলে পলে পলে করিব পোষণ !

নারীর মূল্য

জিইলা দেবী

আমাদের "বিভিরা"র "নারীর মূল্য" নামক প্রবন্ধে
জিইলাদেবীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কত মূল্যাহীন। এই নারী
জাতিটা, সেটা উপলব্ধি করে তারই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
করেছেন। আর হ'লে নিজেছেন Lulovicar যুক্তিসঙ্গত
অনুগ্রহ প্রমাণ স্বরূপ।

গোকে যখন কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়,
তখন প্রকারে তা অনেক চিন্তার, অনেক গবেষণার ;
যদি 'বিপুল্য,'—এখানে পূর্ণে পূর্ণে বহু মনোবী বহু তথ্য
তিনিই পেছেন নানা বিষয়ে ; নূতন কত মন এসেছেন,
কত ব্যক্তি নিয়ে। সুদী যখন কোনও বিষয়ে আলোচনা
করেন, তখন প্রকৃতির মতামত ঘেঁষে শুনে স্থির মনে
অনুকূল প্রতিফলন সব যুক্তি মিলিয়ে বেখে, তার সঙ্গে
নিজের জ্ঞান নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে যে যুক্তিপূর্ণ মতামত
হাস্ত করেন, সেটাই দর্শন্য ; আর যদি কোনও বিষয়ে
প্রতিফলনপূর্ণ নূতন ধারণার একখানা বই পড়ে, তার ভাল
মন্দ, সম্ভবতা অসম্ভবতা চিন্তা করবার অবকাশ না নিয়েই
যেতে উঠি, তা হলে সেটা দেখার প্রাপ্ত বয়সে
অপকুত্বি বিভ্রান্তির বালকের,—ব্যাপারটি কি অদুরাত
না বুকে, তুমু ব্যাকের কাছে বসে হ'লে বক্তাকে প্রাণপণে
চাতুর্য্য দেওয়া মত।

লেখক Lulovicar আজল থেকে শিশুতীর মাড়ালে
অন্ধুরের মত, প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে নারীর গুরুত্ব

পুরুষের সমান অধিকার লাভের। একান্ত অসম্মত। কিং
"সমান অধিকার" বলতে লেখকের মতে যে কি বস্তু বোঝায়,
তা, তিনি আমাদের বিশ্বদর্শনে জানবার চোখের থেকে
বঞ্চিত করেছেন। নারীর যে 'স্বতন্ত্র' অধিকার ব'লে একটা
বস্তু আছে ও তারই কথায় বিশ্বমানবীয় আছে যে নিম্না টুটে
থেকে, এ সংবাদটা বোঝার লেখকের মনের কোণে
স্থান লাভ নি। সৃষ্টির তারতম্য হ'লে ভগবান নারী ও
পুরুষের মাঝে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট পার্থক্য রেখে দিয়েছেন,
নারীর "অধিকার" বলতে নারী যে সেই সব পার্থক্যকে
খুঁজিয়ে দিয়ে খোঁজার উপর খোঁজাকাঠী করতে চায়—এমন
দারিদ্র্য লেখকের নিশ্চয়ই নেই,—আশা করি। মানবজাতি
মাত্রকেই বিশ্বস্ত্রী কর্তব্য অধিকার দিয়েছেন, আনন্দ
উপভোগ করবার অধিকার দিয়েছেন ; নারী সেই কর্তব্য,
সেই আনন্দ ভোগই চায়,—ভগবানের আশীর্বাদে।
প্রকৃতির দানের বস্তুর অংশটুকু সে সম্পূর্ণভাবে পেতে চায়।
এই হল নারীর জন্মগত স্বতন্ত্র অধিকারের দাবী। তাই
জন্মমাত্র ভগবান তার কলাটে এই দাবীকে চরমরূপে পরিণত
দিয়েছেন, কারণ সাধা নেই এই দাবীকে অস্বীকার করে।

সম্ভবতঃ যখন নারীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র হ'লে যার
লেখকের এ যুক্তি খুবই সঙ্গত। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা
যায় নারীর জীবনশক্তি (vitality) পুরুষের চেয়ে অনেক
বেশী। যে সব কারণে, যে সব ব্যাধিতে শিশু-পুত্র বাতল



না, সেই সব কারণ ও সেই সব বাঘি স্বপ্নেও শিক-করা
 বেঁচে গেছে এমন ত কত দেখা যায়। “মরে মাস্ত্রের
 গ্রাণ বড় কঠিন”—এট সত্যলিত উক্তি পৃথক পড়া। সম্মান
 ধারণ কালে নারী মনস্তত্ত্ব হ'বে থাকে বটে, কিন্তু সে সময়
 ছাড়া যখন সে মুক্ত থাকে, তখন যে কোন সে পুরুষের সঙ্গে
 সম্মান তাগে পা কেনে চলতে অক্ষম হ'বে। লেখক মতামত
 তার কোনও বিশদ কারণ উল্লেখ করেন নি। আমাদের
 বৈদম্বিক জীবনের অভিজ্ঞতার কি বলে? নারীর অবিবাহিতা
 বঙ্গবাণী মাথার সঁকড়া চুল কঁধের খেলার সান্না সমবয়স
 বালকদের লজ্জা খেলায়না করে, উক্ত গাছের ভাল থেকে
 দল পেড়ে আনে, বনে চকলে শাখার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়,
 একথা কি লেখক মতামত জানেন না? পাচাত্তা যেনে
 নারী দুঃখ পক্ষত লক্ষ্য করছে, আকাশের বৃষ্টি চিরে
 পৃথিবীর প্রায় ক্ষতে প্রোজ্ঞাস্থের উড়ে থাকে, তরলারমান
 সমুদ্রে অবলীলাক্রমে নীচের কেটে প্রতিযোগিতা করছে, দত
 রকম খেলা বুলা আছে সব তাতেই অবাধে যোগ দিচ্ছে,
 পুরুষের সাথে চিত্রায় কর্তব্যে যোগদান করতে তার কোনও
 বাধা নেই। এই পূর্ণ যেনেও ত নারী লৈঙ্গ-নেত্রী হ'বে
 সমসামান্য করে; পুরুষের আনন্ড পৃথিবী দিলে আবার
 যে নারী অন-নেত্রী হবে না তাকে বলতে পারে?

এখন অল্প আমাদের বেশে অধিকাংশ নারীই লেখকের
 ভাব্য “পরম নির্ভরশীল লক্ষ্যবিন্দু নভেব”—এইশব্দে পুতুল
 খেলার ও অভ্যাস তিসিরে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটিবে,
 কৈশোর আসতে না আসতেই কোনও এক পাশের
 নানাদেশবৎ তরুণের তাহাজ্জাত পুত্রের উপর যোবার উপর
 পাকের আঁটির প্রায় স্বরূপে বসী হ'বে,—যোমটা, হৈসেল
 হাফ্টিবুর্কি এঁটোকাটা এবং তাহারই সান্নিধ্য বটলীত
 নভেবের চিত্তের নিমজ্জিত হ'বে নির্ভরে দিন কাটান।
 চোখে তাঁদের পর্দার আচ্ছন্ন বাঁধা, পলার গুর অন্ধরের
 ঘন প্রোজ্ঞার মাতে বিবীন। নিছের পাগে দাঁড়াবার চৌকোও
 ওঁরা পছন্দ লক্ষ্যার বিপর তাহেন। কিন্তু আমরা আশা
 রাখি, যে নিখিল নারীসমষ্টির আন্দোলন করবার সময়
 লেখক কেশবরায় এই আশংকাকেই চোখের সামনে হ'বে
 ছাড়বেন নি।

Oscar Schultze প্রকৃতি প্রতিভাশালী ভাস্কর্যদের
 অভিমত না নিয়েও এটা লক্ষ্যেই আঁকার করতে পারেন
 যে নারীর ও পুরুষের পার্থক্য—দঠন-পার্থক্য সম্বন্ধে।
 নারীরের পঠন-পার্থক্য বুজান এবং দেহের পরিশুষ্টি সাধন
 যে, সম্পূর্ণ হুইটা আলাদা জিনিষ তা লক্ষ্যেই জানেন।
 নারীরের পৃষ্টি-সাধন যে মানুষ মাতেই বাঁধা, পথা ও
 বাঁধার উপর নির্ভরশীল, তা ছোট বড় লক্ষ্য ভাস্কর্যই
 বলবেন। এর প্রমাণও আমরা নিত্যকার জীবনে দেখতে
 পাই। তাগরাই-এর মত নারী দুলত বটে, কিন্তু গোবর,
 গাছের মত পুরুষও যে পরম মূলত, বিশেষতঃ আমাদের এই
 “তৈলরসে গ্ৰিহ তহু” স্বদেশে,—তা নয়। লেখক আমার
 এও বলেছেন পুরুষ মাতেই নারী হ'তে ৫ তিন ইঞ্চি অধিক
 লম্বা হয়। কোনও কোনও পুরুষ কোনও কোনও নারী
 অপেক্ষা দীর্ঘকায় হ'তে পারে, কিন্তু এটা কি সাধারণ
 ভাবে বলা চলতে পারে? বেশীদূর অস্থানবাদের প্রয়োজন
 নেই,—ভারতবর্ষের রাধাপুতান কিবা পাঞ্জাব অঞ্চল যান,
 —যে যেনের মেয়েরা যে শুধু দীর্ঘকায় তা নয়, ইচ্ছা কর্তে
 জীমান্ন ভক্ষমান যেমন একথা স্বর্গদেবক বঙ্গল পুরোহিতেন,
 তাহাও তেমনি ভরততে পুত্র ৫ তিনটি পুরুষকে—অল্পকমে
 ছুঁপিপত করে ফেলতে পারে। আমাদের দেশেও
 লম্বোদরী, ক্ষেমকরী, ওজাকালীর বল আশিও বিদগ্ধ নয়।

লেখকের মতে, নারীর দেহের অসুত্রপ চিত্রটাও অসুট
 থেকে যেতে বাধ্য। যখন দেখা থাকে নারীর ও পুরুষের
 উভয়েরই দেহ অবস্থা অল্পবায়ী পুত্র ও অসুট রাখাই প্রকৃতির
 ব্যবস্থা, তখন সর্ব অবস্থাতেই নারীর দেহ যে অসুট থাকেই
 এ দৃষ্টিকে দৃষ্ট বৃত্তি বলা যায় না। চিত্র লক্ষ্যেও
 একথা সম্পূর্ণভাবে ঠাট্টে। প্রকৃতি বৈচিত্র্য তালমাসে,
 তাই দেখা যায় নারীর মাঝে প্রকৃতির লীলা সব থেকে
 বেশী প্রকাশ হ'তে। নারী মত দেহ প্রাপের, তাই
 স্বভাবতই তার মাঝে প্রাপের প্রাচুর্য্য ভরা থাকে।
 প্রাপের প্রাচুর্য্যক স্বভাবতই আঁকার দিবে পঠন করবার
 ক্ষমতা স্বভাবের প্রয়োজনীয়তা। যে পদার্থের মধ্যে স্বভাব
 কোণল সব থেকে বেশী আছে, তদন্থান তাতেই স্তম
 পৃথকনের তার, পঠনের তার, সম্পূর্ণ করে তোলায় জায়।

এক তার ক্ষেত্রে যে সব সৃষ্টান্তের প্রয়োজন, সেগুলি প্রচুর ভাবেই যেন, যাতে তার নিজের ক্ষয় না হয়। লেখকের শক্ত-ভাষালাভ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য সৃষ্টিতর প্রয়োজন, এবং যাতে সেই সৃষ্টিতেই ক্ষয় না হয় সে লক্ষ্য বিখ্যাত অগ্রভেদী পিরিয়ডে চিরন্তন কুহারাযবর্ণন ভঞ্জে বিবেচন। লেখকের মতে "পুরুষ থাকে পানবুলে অথবা লগোজ শিখরে, আর নারীর পথ মধ্যপথ। প্রকৃতির নিয়মে কালক্রমে অযোগ্যের উচ্ছেদ হয় এবং যোগ্যতম আরও উপরে উঠতে থাকে; পুরুষ এমনি ক'রে এগিয়ে চলে, আর নারী বিকাশের মধ্যমে যে ত্রিমিত্রে সেই ত্রিমিত্রেই অবস্থান করতে থাকে।" এই কথাটির কি যে মর্ম তা আমরা অনুধাবন করতে পারলাম না। যোগ্যের ক্রমোন্নতি এবং অযোগ্যের উচ্ছেদ-সাধন তা প্রকৃতির নিয়ম, সেই নিয়ম লেখকের মতে শুধু পুরুষের বেলায় যাতে আর নারীর বেলায় নয়; কেন, নারী কি সৃষ্টির বহির্গত? নারীর সৃষ্টির অন্তর্গত, সুতরাং তার বেলাও এই ক্রম-বিবর্তন (evolution) নিয়ম চলবে না কেন লেখক মহাশয় তার ভাবাব দিতে একেবারে ভুলেছেন। আবার লেখকের উপরিউক্ত কথা যদি সত্য হয় তা হলে পৃথিবীর পুরুষ অধিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছেন মনোবীর স্ত্রীতর ব্রজতে আলোকিত এবং অবাণীত সংখ্যা হীনতার নিয়মত মানব মাত্রার। নিউটন, নেপোলিও, ক্যারাকো, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর বংশ সৃষ্টিময় বললেই হয়, সুতরাং লেখক মহাশয়ের বুদ্ধি অস্বাভাবিক কতকর অসমংখ্যক মনোবা ছাড়া অপর পুরুষ অধিবাসীর প্রায় সমস্ত ভাগ অজ্ঞানতা ও হীনতার বন পঙ্করে অবস্থিত। নারীকে কিছু লেখক মহাশয় অগ্রগত-পর্যন্ত ক'রে মধ্য পথ দিয়েছেন। এতএব লেখকের বুদ্ধিতেই প্রতীকমান হয় যে, লক্ষ্যের অধিকাংশ নারীই অশাশ্বত থেকে প্রায় সমস্ত অজ্ঞানতামির মধ্য পুরুষ অপেক্ষা দক্ষিণবর্তী প্রেই। উর্দাভাষেই যেমন কখন কখন আপনায় তত্ত্বলগ্নে আপনাই থাকা পড়ে, লেখকও তেমনি আপনায় বুদ্ধিতে আপনাই ঠিকিয়ে পড়েছেন।

লেখক বলেছেন নারী পুরুষকে বুঝতে পারে না, তার প্রিয় পুরুষ-চরিত্র অমনে নারী-শিল্পীর অক্ষমতা। লেখকের

যদি তর্জী ইলিষ্টা, দার্শনিক তর্জী, যারী কবেলি ক'রে যে কোনও আধুনিক লেখিকার রচনা পড়া থাকে তবে এ ধারণা কি ক'রে হারী হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। পুরুষ-শিল্পী যেমন নির্ণীত ভাবে চিত্রাঙ্কন করেছেন, নারীও সমান দক্ষতার, সত্ত্ব আরও বেশী নিপুণতার সঙ্গে, মাতৃবীর অন্তরটাকে বাহিরে ছুঁতে চলেছেন। লেখকের অন্ততঃ এমন ক'একটা উদাহরণ দেওয়া উচিত ছিল যাতে নারী-শিল্পীর অক্ষমতা প্রতীকমান হ'ত। এটা বোধ হয় লক্ষ্যের ব্যাকরণ করছেন যে, নারীর অক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা বেশী। নারী শুধু পুরুষের বৃত্তে ভাব দেখেই তার অন্তরের গুঢ় চিন্তা সংবোধিত বুঝে নিতে পারে। আমরা স্ত্রী বন বছর একত্র থাকলেও প্রায় জন্মের অনেকটা সময় কাছের অজ্ঞাত থাকতে দেখা যায়, কিন্তু স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামীর অন্তরের সমস্তটাই সম্পূর্ণ ভাবে মনে নিতে পারে। নারী যে পুরুষকে বুঝতে পারে না বলে ভয় করে—এ গুটি নিত্যকথই অসার।

পুরুষের প্রতি নারীর যে ভয়ের বর্ণনা লেখক করেছেন সেটা প্রধানতঃ আমাদের দেশের অশিক্ষিত প্রাচীন নারীর মতোই দেখা যায়। লেখানো নারীর পুরুষের প্রতি প্রেম, প্রীতিটা অনেকটা ভয়ের রূপান্তর। "সে বকম ভাবন কারণও পূর্বে কতকটা বিবৃত করা গেছে। পদ্মাব আচ্ছাদনে চোখকে অন্ধ ক'রে তারা পুরুষের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর ক'রেই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে,—মহুর বিধানে শৈশবে পিতা, যৌবনে পতির ও বাড়িকো। পুত্রের উপর ভর দেওয়াই তার পরমার্থ। এই সংসার তাদের জয় হ'তেই মনে গাঁথা আছে, তার মনে এ ছাড়া "নাশক পলা বিড়তে।" পুরুষ বিমূঢ় হ'লে তাদের পক্ষে ঠাড়াতে হবে, সামান্য উদ্বাহের ক্ষণও তাদের কোনও সাধন থাকবে না,—এই চিন্তা তাদের মনে গাঁথা, তারা যে পুরুষকে ভয় করবে এতে আর আশংকা কি? কিন্তু এটি বিপুল পুণ্যের মধ্যে তারতম্যই একমাত্র দেশ নয়, এত প্রবিশাল মানব জাতির মধ্যে মনুষ্য একমাত্র সমাক-নিরস্তা নয়। যে দেশে শিক্ষা ও চিন্তা সংস্কারকে একিধে বেড়ে উঠতে লক্ষ্য হয়েছে সে দেশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মাত্রাব্যবধান রহিত



চ'রে বক্স ও স্ট্রিটের বন্ধন দাঁড়ে উঠেছে। সে দেশে পুরুষ ও নারী সমানরূপে প্রাচীনকৃত করবে শিখবে, তাতে দেশের কল্যাণই সাধিত হয়েছিল। মধ্য-নাট্যভাষ্য-সমাজের চার্ন শিকড়ের তলায় বসে মনুষ্যের মত ভারতবাসী যে মমর আশ্রয় ও উদ্ধার খোঁজে অপব্যয় করেছে, সেই সময়ের ভিতরই মধ্য-ভারতীয় অনেক দেশ অনেক মানব-পরিবার উন্নতির লক্ষ্যে মার্গে অনেক-এগিয়ে গিয়েছে।

নারীর ভাব-ভাবের সে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরা আছে লেখক সেটাকে অস্বাভাবিক "অভিনয়" আখ্যা দিয়েছেন। স্থিতির আদি যুগ হ'তে নারী ও পুরুষ উভয়ে উভয়কে পরস্পর মাতনব ক'রে আসছে, বিবাহের স্বজন-নীলাই এইখানে। পুরুষ নারীকে দেখায় তার শৌৰ্য্য, তার বলি, তার তার কৌশল; নারী পুরুষকে দেখায় তার কমনীর রূপ, তার বিভিন্ন মাধুর্য্য আর তার নৌর্য্য। এই দুই করবার ইচ্ছা যে কি ক'রে নিজের সৈন্ত গোপন করবার ইচ্ছা চল তালী লেখক মহাশয়ই ভাল বুঝতে পারেন, আমরা পারি না। আর ভাব-গুণে দুই করবার ইচ্ছাটা নারীর চেয়ে পুরুষেরই বেশী তা স্বীকার করবার উপায় নেই। কেশর কুলিরে গিছে গিড়িয়ে গিড়িয়ে দুই করে : গুণোক্তির পান পায়; অমর্য্য উৎসাহে অমর্য্য মাধুর্য্য লদা-নিহত পক্ষর মাথা এনে তার সম্বিনীকে উপহার দেয়; তাকে শৌৰ্য্য দেখিয়ে দুখ করবার ভক্ত। এই সবের ভিতর যে romance টুকু রয়েছে সেটাকে বিকৃত ক'রে পিঠেচৌরী চঃ বলে তাই বিকৃত বিভারের পরিচায়ক।

লেখক নারীর যত কিছু অভাবের দোষ প্রকটের দাঁড়ে চাপিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু অভিব্যক্তির মাথে প্রমাণেরও বরকার হয়, নইলে সে অভিব্যক্তি না বক্তব্য নেহাতই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। লেখক মহাশয়ের মতে নারীর অধিকারের দাবী চাওয়ার ক্ষেত্রে দাবী হচ্ছে পুরুষ-ভাবের অবনতি; অর্থাৎ, পুরুষ যদি আক "নিহ" হ'লে না পড়ত, তখন মাথা কি যে নারী তার দাবীর কথায় 'হু' শব্দটি করে। অনেক মূল-নারীর আভ্যন্তরীণ দাবী চাওয়ার একটু কথা বলতে ভুলেই, কেরা-বক্তার অন্তরাত্ম মত আক্ষেপ করেন। ইংলণ্ডে পুরুষ

প্রভোক্তা দাবীর দাঁড়ে মারবার ক'রে এখন করবার অধিকার ছিল; পরে যখন absolute ক'রে সে অধিকার লোপ করা হ'ল, তখন common men তাদের common lawর ভিত্তি আক্ষেপ ক'রে আর দাঁড়ে না। আশা করি, লেখক মহাশয়ের এ মনেভাব নয়। নারীর স্বতন্ত্র অধিকারের দাবীর দাঁড়ে পুরুষের উন্নতি-অবনতির কোনও কার্য-কাণ্ড-ঘটতি সম্পর্ক থাকতে পারে না, — চ'টো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। লেখকের এটা মন্তব্যও যোগ্যতমঃ ৩৭ নি যে, লক্ষ্যের এই উন্নতির বিকাশ নারীরও চিত্তরত্নে আলোকিত হ'লে তার যুগ ভাঙতে পারে; তাই নারীরও একদিন, জেগে উঠে—তার নিজের অধিকারের দাবী করাটা স্বাভাবিক। ইতিহাসে বহু মহামায়ে বহুজাতিব নিদর্শন পাওয়া যায় যায়। বর্ষে দিন কতিন হাজারে অথবা বিদেশীর শাসনবৃত্তে বর্ষা চ'রে মুক্তাঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু ভিন্নদিনই যে এমনই একই উদ্ভার কটিবে না তাদের, এ কথা মনে মনে সকলেই জানত। এমন কি শাসকদেরও অস্বস্তি ছিল যে শাসিতরা একদিন জেগে উঠে—তাদের অধিকার ফিরে চাটবে। যে দিন তারা জেগে উঠেছে, দস্যুরেব নিজেদের অধিকার পূর্ণ বলল ক'রে নিজেই,—তাদের শাসনকার্য্য অবনত বা চীনবাগী হ'লে পেছল বলে নয়,—শাসিতদের সুমের অবসর দেখে ত'রে পেছল, উদ্ভার খোঁজে কেটে পেছল বলে। উদ্যোগের ১৮৪৮ লালের আন্তর্জাতিক নব-ভাষ্যরূপের ইতিহাস তার দাক্ত।

নারী পুরুষের দাসী ছিল, কোন শাস্ত্রকারের মত এ, লেখক সে কথা কিছুই জানানি। নারী নিজের হৃদয় দিয়ে বলি দিয়ে বিবাহ সাম্রাজ্যে স্বেচ্ছা পালন করেছে, তার বৃত্তিক পূর্ণ ও পক্ষিমে অনেক পাওয়া যায়। পুরুষ তাকে যদি ছাড় ভোগের সামগ্রী আদরের খেলনা বলে ভাবে, তাহ'লেই প্রমাণ হয় না যে নারী শুধু পুরুষের হাতের ক্রীড়নক। এতদিন যদি নারী আপনাকে পুরুষের ক্রীড়নক ক'রেই জেগে থাকে, তা থেকেও ত প্রমাণ হয় ৩৭ না যে নারীর স্বাধীনতার কোনও কলম নেই।

নারীর নীপকির অভাবের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে যথেষ্ট কোনও উদাহরণ আমরা তার কাছ হ'তে

পাঠ নি। উদাহরণস্বরূপ নি, কারণ দেবার মত কোনও উদাহরণ নেই বলেই। পুরুষস্বত্বা কথু বুদ্ধিবলে দেশ ও সমাজ শাসন করতেন সে কালে, কিন্তু নারী নাকি কখন কালেও দেশ ও সমাজ শাসন করেন নি। মলিভারোভ, বিজিয়া, ফ্রিড্রিখসবার্গের কথা নাই কুল্গাম,— কিন্তু কসাকৌর্গ মন্তব্য দিয়ে দেশ-শাসন রূপ উৎকট ব্যাপারের যে একটি বিকট পরিণাম হওয়া আশ্চর্য্য নয়, এইটাই প্রশংসা হয়েছিল পরকুরামের পিতার বলা। অগ্রিমণ্ডা পিতা যাবেন করলেন—‘যাও, তোমার মায় মণিটা কেটে ফেল।’ সুবোধপুত্র তখন যেরে কেটে ফেলেন। কিন্তু তারপরে তাঁকে শত্ৰুতে হয়েছিল হয় ত রক্তকর্ণের কত; কিন্তু এইটুকু বোধ হয় তাঁর সত্যনা ছিল যে, পরীক্ষিত নিঃস্বার্থ করবার সুযোগে নিরুদ্ভব ক’রে ফেলেন অস্তিত্ব; কাজের সমাজটাকে তিনি প্রাণী শাসনের (বিভাদিকা) হ’তে গড়িয়ে ফেলছেন।

Landovici, হুতরাং লেখকেরও মতে মাতৃবে ও পত্নীকে নারীর কোনও আত্মত্যাগ নেই। নীতিজ্ঞানও নারীর অধিক নেই। এবং তা সবেও যে পুরুষ নারীকে শ্রমণ করে, তার অনেকগুলি বোধের মধ্যে একটি হচ্ছে impotency মাত্র। এই কথাটি কখনও একটু আলোচনা করবার।

প্রাচীন লেখকরা বলেন বহু বাতনা সহ্য করবার পর মাতৃবে নারী যে আনন্দ পায় সেটা যতাই একটা নিঃস্বার্থ আনন্দ। তাঁদের মতে নারীর ধর্ম হচ্ছে ত্যাগধর্ম। কতক হ’লে পিতাকে, পত্নী হ’লে পক্ষিকে এবং সব শেষে মাতা হ’লে সন্তানকে সে জঘন্য উদ্ধাড় ক’রে, ভক্তি গোপ ও যের দিয়ে আত্মসমর্পণ ক’রে ফালে। তাইসেই সে আনন্দ পায়, তাই সন্তানকে বুকের হৃদয় বিনিয়ে চরম দান করে বলেই তার আনন্দও চরম হয়। এই আনন্দে আত্মত্যাগ নেই, এ কথা বলা একান্ত অসম্ভব। লেখকের মতে বোধ হয় আত্মত্যাগ অর্থে নিরানন্দ আত্মত্যাগ। কিন্তু নিরানন্দ আত্মত্যাগ বস্তুটা কখনো বুঝি বিতল। কেনের কয়েককে যে চাকুরের চোটে খানী খোরাতে হয় সেটা বুঝি নিরানন্দ পুষেই নেই এবং চাকুরের ব্যারে সে যেটা করত বাধা হয়

সেটা নিশ্চয়ই আত্মত্যাগ নয়। কিন্তু কয়েকটা ভাঙা সপন তৈরীক ভগ্নস্তরের ব্যর্থদয়ার উদ্ভবের পক্ষে উপাত্তের বলেই বর্ষিত করেন, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের নিদর্শন বলে লেবেল মীটা শিখিতে চ’রে কোনও প্রদর্শনীতে লটকে রেখেছেন, এর সংবাদ ত আমরা আত্মও পাটনি। মাতৃবে ও পত্নীকে নারীর বখেটে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, থাকুক না সে তাগে তার বখেটে আনন্দ।

নারীর চেয়ে পুরুষ সন্তানের ভিতর নিজের মধ্যে কত মনোভব করে, এই হচ্ছে লেখকের মত। আমরা কিন্তু বেশি সন্তান, হয় তার পিতার মত হয়, নয় তার মাতার মত হয়,—অধিকাংশ ফলেই সন্তান তার পিতার মত হয়ে থাকে। বংশোদ্ভব বলতে যা বোঝায় সেটা বোপ হয় পিতার সবচেয়ে বড় বাটে, মাতার সবচেয়ে নয়। সন্তানের মধ্যে পুরুষের সহ অধিক আছে বলেই মানবজাতির প্রধানতঃ patriarchal হয়েছে, matriarchal নয়।

লেখক বলেছেন মনস্তত্ত্ব মতে পুরুষের হ’তে নারীর দৈহিক আকাঙ্ক্ষা অধিক। কোন পতিত্বের মতবাদ এ, তা লেখক কিছু জানান নি। পরে দেখছি নারী রোগসুখের সাথেও লেখকের পরিচয় আছে। নারী রোগসুখ বহু সংখ্যক নরনারীর চরিত্র অধ্যয়ন ক’রে যে সংবাদ দিচ্ছারা উপনীত হয়েছেন তা সংক্ষেপে তাঁরই কথার বলা যায়, “Man’s desire is perpetual and woman’s intermittent.” (“Married Love”—৫৩ পৃষ্ঠা) এবং এই কথাটাই তিনি ঐ পুস্তকে graph দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ সব যদি লেখক মতাবল জানতেন তবে “পুরুষের হ’তে নারীর দৈহিক আকাঙ্ক্ষা অধিক” বলতেন না।

লেখকের মতে নারীর নীতিজ্ঞান পুরুষের অপেক্ষা অধিক হ’তে পারে না এবং “মস্ত কোনও ক্ষেত্রেও তার এমন কোনও খাতীর নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় নি যার ভিত্তি সে দর্শনের সঙ্গদর্শনীয়।” Landovici বাঙালী নন, তিনি না হইনা জানতে পারেন, কিন্তু লেখক নিজে বাঙালী হ’লে এ কথা কি ক’রে বলেন তা আমাদের করুণারও বহির্ভূত। বাঙালার খবর করে যে সব ক্রমচ্যুতির বিষয়া কষ্টের ক্রম, সাধনে আত্মদান ব্যাটের বান তাঁরা



কি লেখকের "লবিশের প্রশংসা" উদ্ভূত করেন না ? পুরুষের নীতিজ্ঞান শুধুই "টনটনে"—তাই পত্নী বিয়োগ না হ'লে হ'তেই নেহাৎ পিঙ্গী মানীরা উপহাসে প'ড়ে ঢেঁকী দেবার মতই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে তাঁদের বিপুমাত্র বাধে না। লেখকের কথাটা খুবই ঠাট্টা—পুরুষের নীতিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য পুরা খুবই তাঁর, কেবল বসত ঘরে হচ্ছে হান-কাল-শান্তের। আরও বেশে খেজুর যেমন সূতা, আমাদের দেশে কতটা তেজুনি সূতা। কতাদায়গত পিতার সঙ্গল অহুরোহ মরবিপণিত চন্দর বিশদ্রীক পুরুষের কটোর উচ্চচর্য্য বস্ত্রের গ্রাথতে মিচ্ছে কই?—মইলে অবশ্য বিপদ্রীকের উচ্চচর্য্য একটা আশ্বর্ষের ভিনিব হ'য়ে থাকত, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? পুরুষ শৌক্যবান (impotent) না হ'লে নারীকে সন্তান করে না, এই কথাটা লেখক আমাদের মনেগিয়েছেন। কিন্তু "এই রুদ্র সত্যো লোক বিচলিত হবে" ব'লে লেখক যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এটা নিশ্চয়োক্তন ছিল, কেননা এই কথাটা রুদ্র যে, সে বিধির সন্দেহ নেই কিন্তু সত্য কিনা সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। গ্রাভিন প্রভৃতি কখনও impotent ছিলেন ব'লেই তাঁরা নারীর অধিকার বাগানের মস্ত চৌকিত হয়েছিলেন, Ludovici মহাপ্রভুর এ বৃত্তি কাক-তাণীর প্রমাণ হাফা আর কিছুই নয়। মরতে তারা চিরদিনে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই দেখা যায় দীর্ঘকেন ছিল। তাহ'লে কি বলতে হবে চিরকলায় যুগোপার্জনের মত দীর্ঘ কেনই হচ্ছে প্রোথ উপকরণ? গ্রাভিন প্রভৃতি impotent হুতরা সেই মস্ত নারী-মহিমাত পক্ষপাতী, এই হ'লেই কি প্রমাণ হচ্ছে যে মহাপ্রাকৃত্যশালী পুরুষেরা নারীকে দাসীরাণে দেখে এসেছেন? নারীকে ব্যাধা মদান করেন তাঁরা impotent হবেনই এ বাধ্য করলে বলতে হবে এই যে বিখ্যাত বীর নেপোলিওনও শৌক্যের আতাব ছিল, কারণ নারীর প্রতি তাঁর প্রচুর সন্মম ছিল, chivalry তাঁর ব্যাত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে নারীর প্রতি পুরুষের সন্মম বিখ্যাত, কিন্তু তাই ব'লে পশ্চিম দেশটাকে কি impotent-দের দেশ বলতে হবে? এরকম বৃত্তির মধ্যে conviction নেই, হাতরল প্রচুর আছে। এই ধরুন না, আমাদের বোঝাবিধের মহাদেব,—বিনি কালীর

চরণ অনন্তকাল একে বারন ক'রে আছেন, হুয়ধুনীকে বিনি শিরোভূষণ করেছেন—নারীকে এতখানি উচ্চ ভুলেছেন, লেখক মহাপ্রভুর অশব্দ বৃত্তিতে তিনিও impotent,—তা থাকুক না তাঁর কাগির গলেন আদি নানা সন্তান!

নারীর প্রেরণা ব্যতিরেকেও পুরুষ যে মরতে কৃত্তা হ'তে পারে তার করেটা দুটো লেখক দিয়েছেন। কিন্তু এই করেটা সোপা-এপতি মৃত্যুর মাধারন নিয়মকে প্রমাণ করে না, বরং মাধারন নিয়মের ব্যতিক্রম ব'লেই বর্তব্য। লাক্ষ্য ভাবে নারী ত প্রেরণা দিয়েই থাকে, পরোক্ষ ভাবেও যে না দেখে তাড় নয়। অনেক স্থলে দেখা গেছে নারীকে পার্থিব ভাবে না পেলেও, অন্তরে তাঁকেই অবলম্বন ক'রে পুরুষ প্রতিভার অমর হ'য়ে গেছে। Dante তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নারীকে সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের প্রতিভার দীপ মালাতে ওর না সত্য, কিন্তু সৈমলিন জীবনে, এটাই দেখা যায় যে নিত্যকাল কতক পুরুষকে নারী প্রাণের যোগান দিয়ে চলে,—সেই প্রেরণা পেয়েই, সেই মমতা, আশ্বাস পেয়ে পুরুষ করিন জীবন-মধ্যমে সকল মস্ত অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নারীর প্রেরণা পেণ না ব'লে মরতে কত উৎকৃষ্ট উদ্ভূত তালমালা রান হ'য়ে গেছে, কত অলঙ্ঘ্য উদ্যম নিতে গেছে, কত লাক্ষ্য বাগান ভাঙিয়ে গেছে। পুরুষের চরবারি বৃক্ষক্ষেত্রে কতবার অলঙ্ঘ্য করেছে ইতিকাদের পুষ্ঠার সোনার আঁখরে তা দেখা আছে, কিন্তু হাজার পুরুষের ইতিকাস! নারীর যে কত প্রেরণা, কত ত্যাগ, কত অঙ্গ, কত ধরম তার মাঝে নিহিত আছে তার ল'খাম নাও নি। নারী নীরবে তার কার্গা ক'রে চলে ব'লে পুরুষ তার কলাতে লহজেই থপা করতে চলে যায়।

লেখকের মতাহুতী নারীর স্তম্ভিকার্য্যে অক্ষমতাই না কোথায় এবং সেই অক্ষমতা কি ক'রে নারীর স্তম্ভিকার্য্য-জ্ঞানের বহুতার পরিত্যক্ত হ'ল তা দাময়্য বৃক্ষের অক্ষম লক্ষ্য। নারী যে শৌক্যের অহুরোহ, নারীদীন পুণ্ডরীকীকতা দেখলেই তা বোকা যায়। নারী যে স্বাভাবিক বর্তমান, তার আশে পাশে চারিদিকে সে লক্ষ্য-ঐ বৃত্তির তোলে, অতোক্ষ কামটি করার ভীতে—প্রতি বিশিষ্ট লাক্ষ্যের শৌক্যে।

লেখকের মতে নারী নিজেকে সাজাতে চায় সেটা তার coquetryর লক্ষণ মাত্র। এ কথার উত্তর আংশিক ভাবে পুণ্ডেই দেওয়া চলেছে। কষ্টির প্রায়শঃ হ'তে তার নিজের বরণের সজ্জার কিছুমাত্র সজ্জা করতে পুঙ্খবাক্যেও দেখা যায় নি। বৈকল্য কবিত্যবলীতে রাধিকার সাজ ঐক্যকরণ ও মতিসার পমন কাণে সজ্জার সহস্র বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বৈকল্য হৃদয় ক'রে সাজাবার সূচী জীব মাত্রকেই প্রকৃতি দিয়েছেন সামান্ত পশুপক্ষীর মাঝেও এ নিঃস্বের বাস্তবিক হ'ব না— তারও নিজের বৈকল্য দেখেন ক'রে অথবা কেড়ে স্থানীয় হৃদয় রাখতে চায়।

নারীর রূপ লক্ষ্যে অধিক কথার সম্পূর্ণ নিঃসারণ। আগে বৈকল্য কবিত্য কতকটা কথ্য রচনা ক'রে গেছেন নারীর রূপ গান ক'রে, চিত্রকরেরা সৌন্দর্যকে এঁকেছেন নারীর ছবি এঁকে। দার্শনিক ও শাস্ত্রকাররা সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের সূত্রি লক্ষ্যেছেন লক্ষ্যরূপে নারীর। নারীর যেমন বস্ত্র সৌন্দর্য আছে, পুরুষের সৌন্দর্যেরও তেমনি ভিন্ন ধরণ আছে। কিন্তু নারী ও পুরুষের রূপ যথেষ্ট বিভিন্ন বরণের, সেহেতু তাদের মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট তার বিচার করা চলে না। তবে, তার রূপের কত প্রভাৱ তার কুলনা কতা চলে। নারীর রূপের ক্ষত্র কত মহাবেশ ধন্য হ'য়ে গেছে, কত সময়ের কবির স্রোতে বহিঃ প্রাণিত হয়েছে—কত মনে লক্ষ্য হাণি হুটে উঠেছে। কিন্তু কেবলমাত্র রূপের ক্ষত্রই লক্ষ্যবিশ্যাক্ত, এমন কোনও পুরুষের নাম বড় শোনা যায় না।

পুরুষ যে পুঙ্খের পৌত্র্য ঘাণিয়েছে—এই বিশ্বাসের উপরই লেখক বারবার তার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এমন pessimistic মতবাদের কোনই দার্শনিকতা নেই। জগতের রূপে, রূপে, যে ক্রমবিকাশের পুত্র হোমারি প্রকৃতি মেলে দিয়েছেন পার্থক্য প্রাক্করণের মত মানব-সমাজ সে অধিক নিশ্চিন্ত হ'তে দেয় নি, মানবজাতির গুণ-অঙ্গ-বাসরে যে উন্নতির পুত্র হোমারি জগতের মানব-বংশের একমাত্র চিতাভস্মই সে অর্থ নিশ্চিন্ত হ'বে, তার পুঙ্খের নয়। উন্নতির ভেতর দিয়ে পুঙ্খের ক্রমবিকাশ চ'লে

আসছে। বর্তমান বিপ্লবের চেয়ে উন্নত,—ভবিষ্যতের ক্রম-বিকাশ আরো উন্নতির মধ্যে প্রসঙ্গ আছে। নারীর খাতি ত চিত্রিত এই নিঃস্বের চ'রে আসে। কবির প্রাণে এ মতের পতিজ্ঞা বিদ্যমান পড়েছিল তখন তিনি পেয়েছিলেন—

"Yet I doubt not through the ages one
increasing purpose runs ;

"The thoughts of men are widened with the
progress of the suns."

পুরানো বা কিছু ছেড়ে দিয়ে নতুন পন্থাকে গ্রহণ করাই এ পুঙ্খের পুঙ্খবাক্য। মানব জাতি বিশ্বাসী বীর—এবং চিত্র-বিনীত যোগেশের বিনিময়তার তাঁকে সে পুঙ্খের পত্নাত্মপতিক মনোগতির বিকল্পে বিশ্রোচ বোধনা করতে হয়েছে। তাতে পত্নাত্মপতিক বাক্যভাষ্যে বোধ করা হয়েছে বটে কিন্তু এতে আকর্ষণের কি আছে? মানবের আত্ম বাক্যভাষ্য শোণ পেয়েছে ব'লে এই যে চাইকার, এতে কতিপয় পরম খ্যাতিশ্রী পানবী ছাড়া পুণিবায় কোনও কাজের মাত্রই যে শোণ দিতে পারেন নি, এ আশ্রয়ও যেমন জানি, লেখক মহাশয়ও তেমনি জানেন। আর এত ত একটা কথা যে, পত্নাত্মপতিক বাক্যভাষ্য যে শোণ পেতে বসেছে, তার কারণই হচ্ছে আত্ম কালকার মাত্রই সেই চিত্রিত-চিত্রা পানবীতির মত তার চিত্রিত-পাড়ে ব'লে চিত্রিত-বংশের ভোগা শান্ততার প্রগতি থেকে মহা পুঙ্খের পাড়িয়েছে।

লেখক বলেছেন, এ পুঙ্খের পুঙ্খ মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবে না, হৃদয় দিয়ে ভাবে, তাই সে এত হৃদয়। এ কথাটা শ'ড়ে একটু আশ্চর্য না হ'লে থাকে যায় না। আশ্রয় ত দেখছি মাত্রই আত্ম তার 'খনি-বনিত-নব-বিনীত' পক্ষে তড়িত, অস্তর, উদ্যান, অরুমান আর বনিত-জন্ম রশ্মির বিরাট বোকা মাথার নিয়ে উচ্চবাসে উন্নতির রথ চালিয়ে দিয়েছে— বিরাট প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে এখন "বহুরাজ" মানব এসে প্রকৃতির বাস্তবাত্মকভাবে কাঁচা মাল ও পাকা মাল লবণরাসের বিপুল আয়োজন করেছে—এ সব কি তার হৃদয়ের শক্তির লক্ষণ, না মস্তিষ্কের শক্তির ফল? হৃদয় দিয়ে আবার যখন মাত্রই ভাবতে শিখবে তখন মানব সমাজের এই প্রমিত ও আভিমান-লগ্ন্যয়ন,



এই সারিত্রা ও অশ্বশনের চাকাকার পুত্র হ'বে যাবে। তখন মাতাপুত্রীর গাঢ়পূত্র এসে ঘরবাড়ির ঘরে রক্তা বহু-পারকে মুক্ত-বাধা ক'রে দেবেন, তখন 'রক্ত-করবীর' রক্ত-রাগে 'রক্তন' আবার প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠবে, 'অনিমী' আবার আনন্দে নেচে বেড়াবে, মানব-অনুষ্ঠানের বাস্তবতার পাশে সেই যে সোনার জামিন পাছটি তাতে নীলকন্ঠ পাখী আবার এসে বাসা বাঁধবে।

লেখক মধ্যযুগের মতে নারীকে জীবিকার জন্তে নাকি অতি অল্পই পরিশ্রম করতে চায়। এটাও পূর্ব বৃত্তি-সমস্ত কথা নয়। যেখানে নারী পুরুষের সমান হ'বে কর্মক্ষেত্রে সেখানে সেখানে অসংখ্য পুরুষের না পরিবে দিলে তার স্থান হয় কোথায়? আর সে কাজ কম পরিশ্রম-সাধকও নয়। যে সব নারী গৃহ-কাছেই রয়েছেন, তাঁদেরও উৎসাহের খাবারী যে একটি সামান্য বস্ত্র ভাঙে নয়, তবে তাঁরা সংবাদ-পত্রে তাঁদের অতিরিক্ত প্রেমের তালিকা দিয়ে কলহ করেন না, এবং ধমকও করেন না—একথা সত্য।

এ কালের পুরুষ আনন্দ বলতে যাকে 'সুখের শিখর', এবং সুখের বর্ষা মনেবনে সে নাকি নিজেকে 'তিলে তিলে ক্রিয়ান' করতে, লেখক বলেছেন। এ কথা এ কালের তেনে সব কালের পক্ষেই সত্য। গ্রীষ্ম বন জলে তখন আমতা তার একটা ছির আভা দেখতে পাই। কিন্তু আরও হৃদয় চোখ দিয়ে যদি দেখি ত বেগব, গ্রীষ্মের ঐ একটি জলার মধ্যে কোটি কোটি তৈলবাশ্প-বিন্দুর বিস্ফোটন রয়েছে। আনন্দটা হচ্ছে গ্রীষ্মের ঐ শান্ত জ্যোতির মতন, আর সেটা প'ড়ে ওঠে অসংখ্য সুখের অসংখ্য শিখরের সমষ্টিতে। বহু আভা দান ক'রে গ্রীষ্মও যেমন নিচে যায়,—আনন্দও তেমনি শেষ হ'তে বাধ্য, কারণ সাত্বিত অধিনব্বর নয়।

আমাদের দেশে পুরুষের বিধা chivalry লেখক বলেছেন ইউরোপ থেকে আমদানী হয়েছে। এবং এটা নাকি হচ্ছে 'দাস মনোভাব'। কিন্তু সত্য এই যে, যে সব দেশে লেখকেরই মতাবলম্বী chivalry অর্থাৎ এই দাস মনোভাবটা বেশী দেখা যায়, সেই সব পান্ডাভা দেশ স্বাধীন, আর যে দেশে এই দাস মনোভাব সব জানীত

মাত্র সে দেশ এককাল পরাধীন। Chivalrous পোকে নারী নাকি বিভ্রমের ঢেকে দেখে। যারা নারীকে শব্দ অগ্রাহ্য দেখায়, দেখা হ'লে যাদের উপর দিয়ে চলে যাওয়া ও উদ্ভতা দেখানকে আদর্শ বলে মনে নেয়, তাদের যে প্রচণ্ড শৌক্য আছে তাতে লোভ করি না। কিন্তু যারা নারীকে সম্মান দেখাতে সজ্জিত হয় না, নারীকে কাছাকাছিতে শৌক্যের হানি বোধ করে না, তারাই যে সকল নারীর সম্মানের পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নারীর কাছে পুরুষ কোমল হয় তখনই, যখন নারীর বাহিরে বিভীষিকা সংসারক্ষেত্রে পুরুষের কঠিন হবার প্রচুর ক্ষমতা আছে। আর নারীর কাছেও যে পুরুষ কঠোর, তার নিশ্চয়ই এই প্রকৃতি পৃথিবীতে আর কোথাও কঠোর হবার কারণ মেলে নি।

লেখকের মতে পুরো Love institution একমাত্র পুরুষের কার্য ছিল, এখন সেটা একমাত্র নারীর কার্য হয়ে গাড়িয়েছে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, সংসারে নারী ও পুরুষ দুজনেরই পরস্পরের প্রেমের প্রয়োজন, তখন তার প্রতিমা বাণেশ্বরটাই বা এক জনের দ্বারা কি ক'রে সম্পাদিত হয়? সে রকম এক তরকা প্রেম নিয়ে মাছ চলে কি ক'রে? পুরুষের জন্তে খোঁজার আরাধনা, স্বামী পাতের লগ্ন গ্রীষ্মের পূর্ণা, চিরজ্ঞান কালের সেরেযেত জেই শিবলীলা,—এ সব যে অতি আধুনিক বাণেশ্বর তা ত মনে হয় না। রামচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বও যেমন ছিল, স্বামী-পাতের লগ্ন নারীর আরাধনাও তেমনি ছিল।

মাছ যে আদ্য পেছিয়ে যায় নি, সকল বিষয়েই মনে আর এগিয়ে এসে আদ্য নিয়েছে, এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে এইটাই দেখা যাচ্ছে। যে দেশ যত উন্নত হয়েছে সে দেশ নারীর মর্যাদাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পতাবীতে জ্ঞানিত পতাবীর ওপর নারীর মর্যাদা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। পুরুষ আদ্য এগিয়ে এসেছে ব'লেই, আর তার প্রাণ উপর হতে উপরতর হয়েছে ব'লেই যে নারীর বাণা অসুতর করবার শক্তি পেয়েছে। যে দিন সে সকল হ'তে এগিয়ে যাবে আদ্যের সর্বোচ্চ শিবের পরিবার মুকুট প'রে বসবে, সেই দিনই সে সম্পূর্ণভাবে নারীর মর্যাদা

বৃত্তান্তে পাত্বে, নিম্নের সিংহাসনের পাশে নারীকে । নারীকে ঘাবড়ার রোগে পুঙ্কণ্ড ভেদনি বাড়তে পারে না । তার নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে দেবে । নারী আর পুরুষ ভগবানের ভারতবাসীও যেদিন সেই সত্যটা উপলব্ধি করে নারীকে বৃত্তিতে একই ভিনিষের দ্বিবিধ অভিব্যক্তি, একই পরীক্ষার তার সম্পূর্ণ অবিকার ছেড়ে দেবে, ভারতও সেটাবিন তার চুটুটি চোখের মত,—সেখানে কেউ কারো হ'তে ছোট বড় সারা অস্ত্রটাকে লুপ্ততা হ'তে মুক্ত শেষে ঘেঁগে উঠবে,— বা কম বেশী হ'তে পারে না । নিম্নের অর্ধেক অর্ধেক বিপুল বিজয়ে লগাটের সকল ফলই সংগোপন হুছে লজ্জা বেধে যেমন কেষ দিবিজয়ে বাত হ'তে পারে না, ফেলে ।

রজনীগন্ধা

ঐশ্বর্যমিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্বস্তিতে ছিলে তুমি পুন্সবতী ভাষার নন্দিনী
 ব্যক্তির স্থল ! গলোয়ত জীব-ভক্তি তরে,
 গভীর পালকের কেল্লাসীনা, "দুট বিধাবরে ;
 সোনার মধ্যায় বেশী বিনয়িত রূপণী বন্দিনী ।

বেত চকনের চিত্র আঁকি লয়ে চাক গয়োগনে
 মায়ত-নয়ন তটে টানিয়া কক্ষল তলু লেখা
 নিতম্বে ভূলাগে বিরে মুক্তাময়ী রশনার রেখা
 পাড়াইতে মেঘদুস্ত চক্রে করে প্রাসাদ-পিত্তরে ।

আজ তুমি দিবাগোকে ধাঁড়াও মলমল অভিমান
 লম্বুচিত নভমুখে সূচিয়া কাতর আঁধি চুটি :
 সন্ধ্যায় ঘেঁষে ঘোষা প্রবর্তী নিঃশাল সব আনে
 মর্শের নিগুঢ় কথা—আধো বাণা, আধেক ক্রুটি ।

বর্ষায় প্রাচ্যনে সব হুছে গেছে চোপের কক্ষল,
 অধিমায়ে মিশে গেছে অক্ষর কোমল পরিমল ।

হরিশের দুর্গাপূজা

—গল্প—

—শ্রীশ্যামাপদ সেন

হরিশের কণ্ঠ-জ্ঞান বিস্ময়াজ ছিল বলিয়া বোধ হইত না। তাহার কাজের প্রবলতা ও চিন্তার নূন্যত্ব এমন অদ্ভুত স্বকমেব অসাধারণ ছিল যে তাহাকে সময় সময় লোকের ক্ষেপা বলিয়া ভীত করিত। হরিশের স্ত্রী ভামিনী তাহার এই গোয়েচাচরী বাসিতিকে লইয়া মাঝে মাঝে বিষম বিরত হইয়া পড়িতেন।

হরিশের ক্ষেপামীর ভই একটি উদাহরণ, যথা—মধ্যম পূব বলরামের সচিত্র কনিষ্ঠ নিমাইএর বিব্রোধ বাছিল হরিশের স্নেহে রামলালকে অতিরিক্ত ভিন্নভাব করিতেন,—নতুবা ভামিনীকে ডাকিয়া বলিতেন,—“তুমিই বড় নষ্টের গোড়া।” ভামিনী কান্ডকন্ঠে ইহার প্রতিবাদ করিতে উত্তর হইলে হরিশ গম্ভীরভাবে জবাব দিতেন,—“শাসিত্রকে উদাহরণ দেখাইয়া শাসন করিলে ফল লাভ হয়; অর্থাৎ উপদেশ চেষ্টে উদাহরণটী স্রেয়ঃ।” কিন্তু উপদেশ চেষ্টে উদাহরণ যে অনেক সময় ভীষণ মাকার ধারণ করে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বহুটী বলকের কলহ একটা প্রকাণ্ড পারিবারিক কলহে পরিণত হইত। শোনা যায়, ইহারও উত্তরে হরিশ গম্ভীরতর ভাবে বলিতেন,—“কুত কলহের মূল যে রক্ত কলহের বাক সুকাইয়া আছে,—তাহাকে জাগাইয়াই তবে তাহার শক্তি ক্রিতে হয়। তথা গোঁয়া রাখিলে ফল অত্যন্ত খারাপ হয়।”

এলা বাস্তবা ভামিনী এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের উপযুক্ত নাম দিতেন কণ্ঠের ঘর পক্ষ হইতে মগ্ধে চড়াইয়া। গুরুত্বের অস্ত্র রামলালকে ডাকিলে যদি অনতিবিলম্বে বলরাম আসিয়া হাসির না হইত তাহা হইলে সে দিন রামলাল এবং বলরাম উভয়েই দুগ্ধং হরিশের নিকট ভিন্নভাবের বলিয়া বিবেচিত হইত। হরিশের বৃত্তি এইরূপ ছিল,—আবেশ শালনের ভাবটাকেই দাম দেওয়া হইতছে; যাহার চিত্তর সেই ভাব বিশেষরূপে বহিত হইয়াছে সে

সুযোগেব অপেক্ষার বলিয়া থাকে না, অর্থাৎ রহিমের ভবন পড়িলে হাম এবং রহিম উভয়েই দুগ্ধং সেই ক্রম চাষিব চণ্ডা উচিত।

এই সময় প্রত্যয়ে হরিশের পরিবারে বিস্ময়াজ ব্যক্তি ছিল না। হরিশের বৃত্তি যে কখন কি রূপ অবলম্বন করিতে পারে পূর্ক হইতে তাহার ঠাহরও পাওয়া যায় না। এক একদিন পারিবারিক কলহ (বামী-বীর কলহ) এরূপ গুচ্ছ পাইত যে একপক্ষে হরিশ কেবলই দার্শনিক বৃত্তিসমূহের অনর্গল অবতারণা করিতেন, অস্ত্র পক্ষে স্ত্রী ভামিনী কণ্ঠের ঘর এত অধিক মাত্রায় চড়াইয়া দিতেন যে, পাড়ার লোকে কোন আধিপত্যিক বিপদ ঘটিলেই ভামিনী চোড়াইয়া দৌড়িতে আসিত। কিন্তু আসিলেই বেগিতে পাইত যে একটি আশাশ্রিত সংগ্রাম চলিতেছে। চুল-দুন্দ, কারণ-কাঁকাল, নিয়ম-বাহিরের কলহ ছাড়াই! অগত্যা হাসিতে হাসিতে সকলের বাড়ী দিগ্বিদ্য যাত্রা বাতীত উপায়ান্তর থাকিত না।

এ হেন হরিশ একবার তাকিলেন যে, দুর্গাপূজার কথাটা নিশ্চয় উচিত। পরা ভামিনীকে বহুটা আগে দিলে তাহার এ বিষয়ে উৎসাহ ক্রমেই মন্দীকৃত হইয়া পড়িত পাতে বিবেচনার কথাটা নিজের মনেই গোপন রাখা হির এবং শুভ বিবেচনা করিলেন। কুতক্যের বাড়ীতে প্রতিমায বান্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া পুরোহিত পর্যন্ত পয়সটা সকলেই পাইল। ফলে ঘোড়াইল যে, এক স্ত্রী ভামিনী বাতীত সংসারের গ্রাঘ সকলেই হরিশের মতলব জানিতে পারিল। কিন্তু ভামিনী না জানিতে পারিলেও যে কিছু আর সংসারের বাহিরে বসতি করে না। কপটা ভীষণ কর্ণে পৌছাইতে বড় বেলা দিন লাগিল না। হুতরাং তিনি একদিন দুর্গার রূপ লইয়া না চউক ডগার ভগ্না লইয়া আসিয়া তার কণ্ঠে বাসীকে জুটাইলেন,—“বাপাঠা কি?”

চরিশের দুর্গাপূজা প্রস্তাবনামূলক

হরিশ বিঘন ক'পরে পড়িয়া গেলেন। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিলেন, “হঁ, জা না,—হঁ। এই ঘর গিরে ময়ূর জীবনে দেবার্জনার বিশেষ প্রয়োজন। কুচানকজা নৃত্তিপূজা না করিলেও বীত ও ক্রোধের পূজা করে।” ইত্যাদি ইত্যাদি। ভামিনী বলিলেন,—“কুচানকজা কিসের পূজা করে তামা আমি ভুলিতে আসি নাই। তুমি কি করিবে তামার ভূমিবার আছে।”

হরিশ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—“জুর্গোৎসব।”

ভামিনী সহসা বান্ধ বান্ধ করিয়া উঠিলেন,—“ভাত পাখ না তার মুক্তির জগ-পান! খরে নাই চাপ, তার চপগোচ্ছে! এক পরশা রোষগার নাই মগচ নবাবের আর পাখ নেই।”

হরিশ বলিতে গেলেন—“নবাবেরা জুর্গোৎসব অথবা চাকুরী কিছুই করিতেই বলিয়া ইতিহাসে লেখে না।” ভামিনী ছিটকিয়া উঠিলেন, “ইতিহাসের মুখে আস্ত। যিহে কালির কেবল নিম্নের ঘরে বোলে। নিয়ে এল না কিন্তু দেখিবে টাকারোপকার করে, বৃত্তি কনকতা।” হরিশ, কহিলেন “বিজ্ঞা ও শক্তি এক নহে।” ভামিনী বধন দেখিলেন একরূপ লোকের সহিত তর্কে পারিয়া উঠা দায় তখন সহসা হৃদয়ের স্তর-শক্তি অতিরিক্ত অত্যধ দেখিয়া খেদ করিতে করিতে কার্ণাচারে চলিয়া গেলেন।

বধনসময়ে দুর্গা-পূজার দিন উপস্থিত হইল। কুন্তকার বাড়ী হইতে প্রতিমা আনা হইয়াছে। ছোট প্রতিমা। ছোট মণ্ডপ। বাস্তবজ্ঞানর অভাব ভামিনীর দিবারাহবাণী কান্ড-কর্তে মিটিল। জোতপুত্র হামলাল বিষমবদনে ঘরের দাগের খুঁটি ফেলান দিয়া বসিয়া রহিল। মধ্যমপুরে বল-রাম কনিত নিমাইটাদের সহিত উল্লঙ্গ হইয়া বর্ষণপুট পানী-গ্রাসের আড়ার আড়ার পরিধানের জীর্ণ বদন দ্বারা বেশ দিয়া মস্তক-উপার্জনে ব্যস্ত ছিল। পূজার সময় প্রাপ্তদের বস্ত্র কয়েকখণ্ড নুতন বদন ক্রয় করিবারও সংস্থান নাই।

হরিশ শাস্ত্রের প্রতিমার মণ্ডপের সমুখে বসিয়া আছেন। পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছেন—বেগার বাড়িবার মত সমস্ত ত্যাগ নাই। অগত্যা চরিশকেই পুরোহিতের আসন দখল করিতে হইয়াছে। মঙ্গলা, ঘটমা, নবমা তিন দিন ব্যত

পূজা হইল। কি যে পূজা, আর কি যে তামার মন্ত, কেহই বুলিল না। তিনদিন ব্যত চরিশ সাত ভিতাটয়া সৈনিক আহার গম্য করিলেন। এ করদিন তিনি কাতারও পতিত বিশেষ আলাপ করিলেন না। দ্বী ভামিনী নবমোঘ দিন মায়ে অমরোঘ করিয়া গেলেন এবাং যেন দেবীর সন্তি শুভ বিবাহ প্রণ কহা হয়। প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হরিশ সংক্ষেপে কহিলেন, “মাকে জানাও।” ভামিনী কহিলেন—“মাত কি কান নাই যে বিশেষ কথিয়া জানাইবার প্রয়োজন আছে?”

মঙ্গলায় আদি প্রভাত হইল। সকাল হইতে টপ টপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রামের চকল এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে যে কোন এক গৃহস্থের বাড়ী পাড়াটয়া মনে হয় যেন মাত এই একখানি পড়িই এ গ্রামের সমল। একটা অম্বাতকব বাপ পাল নামা ও জোবা হইতে উত্তীর্ণ চারিদিক ধোঁয়ার মত কুহেলীতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মলক-লক্ষ্মণার এতবধি বাড়িয়া গিয়াছে যে মনে হয় যে তাই যদি ইচ্ছা মাতৃয়ের বিকছে বৃদ্ধ যোবনা করে তাৎ হুর্গাক্তের পুঙ্খই মলক-ভাঙতর তানবের পক্ষে কলিকাতা বাধ্য নাই।

হরিশ প্রতিমার মণ্ডপ হইতে বাড়ির হইয়া আসিয়া দেখিলেন প্রভাত,—মঙ্গল প্রভাত যেন উঠিতেই যুগ চাকিয়া কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাটিতেছে। প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, দেবীর আনন বিষাদ-মাচ্ছন্ন। হরিশ মাথের সমুখে গিয়া পাড়াটয়া বিশেষ-বরেই কহিলেন,—“আনন্দময়ী নাম গ্রহণ করিতে লক্ষ্য করে নাই? এত বিষাদই যদি,—এত দুর্গতিই যদি,—তবে দুর্গা নাম রাখিছাছিল তোর কে মা?”

প্রতিমা কহা করিল না। ঘর নিস্তব্ধ। চাপেল ব্যতঃ একটা টুকটিক টিক টিক করিয়া যেন মাত দিগা উঠিল।

মঙ্গল প্রভাত অকসরে কাটিয়া কাটাটল। মধ্যাহ্নে অকালের মস্তকে কাণ জালা একবার রোগীর মুখের হাসির ছায়া গলিয়াই কিছুকণ পরে নিভিয়া গেল। গ্রেত তুলু নাই। ভামিনী মুখতার করিয়া ঘরের দাগের



গিয়া আছেন। ছোট ছোটো জুগার তাকনাও তাঁরকার
করিয়া গুণ মাখায় করিয়া লটকাছে।

অপরাত্তেব দিকে চরিত্র করিলেন, “তল যা,—স্বাধানে
গমন করিবে।” প্রতিমা তাঁকে করিয়া একা একা হস্তি
নদীর দিকে চলিলেন। তিন দিনের উপবাসে শরীর খর খর
করিয়া কাঁপিতেছে। নদীর কূলে বহন পৌঁছালে,—
তখন স্থল ধারে তটী আশ্রয় চাইয়া গিয়াছে। পথ-ঘাট
অনুসৃত। তাহানের কূলে পৌঁছিয়া শুধু একটা তালগাছ
লক্ষ্য করিতেছে। চরিত্র বহন উদ্ভক্তের মত নদীর
কূলে প্রতিমা লটকা পৌঁছিয়াছেন তখন বিষ্ণু চিহ্ন
এপাশ ওপাশ স্তম্ভের আশ্রয় পরিয়া কান্দা চটয়া গিয়াছে।
“ওহ মা আনন্দময়ী” বলিয়া চরিত্র যেমন মাখার উপর

চইতে প্রতিমা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে গাইবেন—
—ভাঙ্গন ভগ্নিরা অমনি স্বপ্নে সেই গরীর প্রবেশ
চিত্র অঙ্ককারে তলাইয়া গেলেন।

তাহার শুধু জলের গর্জন, বাতাসের স্তম্ভার আর
স্তম্ভের গাঁই গাঁই শব্দ! স্তম্ভের অনিষ্টম স্তম্ভের
অনিষ্টমের কোলে চিত্র লাগিয়াত করিলেন।

• •

পরদিন চরিত্রের শব্দেবননদীতে ভাসিতে দেখা গেল।
ভাসিনার উক্ত ক্রমণে আকাশ ক্ষুণ্ণ হইল। পুত্রের
কাঁদিয়া স্তম্ভিকা তালগাছের দাঁড়িল। কিন্তু এই সকল
ক্রমণের দার্শনিক বাগ্য শুনাটবার জর আর আর কে
বর্জনান নাই।

কাল

শ্রীঅরীক্ষাজিৎ সুখোপাধ্যায়

মাঝ চলেছে রাহুর ঘণা, বৃহস্পতি লাগবে কাল,
আজকে দেখা, কালকে সাঁজে উঠবে সো ঢাদ মোনার খাল।
আজকে তোমার নাইক দেখা, দিনটা বৃষ্টি কুণ্ডাই চর ;
কাল সকালে ডাকবে পাখী, আসবে তুমি অনিষ্টর।
কল্যাণটা আজি অমল না'ক পানের পেল তাল কেটে ;
কালকে আগার জ্ববে সুরে বিত্ত বাহার মাল কেটে।
আজকে পথে একলা চলি সন্ন্যাসীরা—মৌন মুক ;
কাল বিদগ্ধ পথের সাধী আসবে তুলে কী কৌতুক
আজকে যদি খেগার হারি—নৈক তাতে কিছুই চর ;
কালকে দেখা গড়তা নতুন, কালকে হবে দ্বিগুণ অর।
আজ যা কুঁচি হয়েই গেল, কাল তা হুটে উঠবে মূল,
আজ যে মানিক পা গনি পুঁজে, কাল তা' পাবে নাই'ক তুল।

নাগকরের ভেদীভরা কুহক ঢালা মিন্ত কাল,
তা'রির লাগি কাটিয়ে দেব আজকে গুপ্ত শাঁজ সকাল !

ভ্রমণ-স্মৃতি

শ্রীশ্রীবেশচন্দ্র দাস

(পূর্বাভ্যুত)

পরদিন সকালে জাপিগা দেখি আমরা নৃতন দিল্লী
ট্রেনে পৌঁছিয়াছি। তখনই জল-যোগ সাবিদ্ধা আরম্ভ দিল্লী
উপাতিপুথে চলিয়ায়। পথে জল-যোগ সাবিদ্ধা চলিয়ায়।
দেখানে জল-উচ্চ মিনারে উঠিয়া দিল্লী নগরের একটা
দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। মনে পড়িল—সত্যজ্ঞানার্থের

“জল মনসে হৈ চির-কাঁথি।

নুনের দুইর চাপিতে গুণ।

একবার ভোজ গ্রহণ করি।

যেখিনি জল-যোগ নবর চড়া।”

এখানে রতনচন্দ্রের উপস্থিতির শেষ দিন শুব চৌধুরী ৩য়;
দিল্লীর সকল সুন্দরস্থান সমবেত হইয়া নমাজ পড়েন।
উপর হইতে দিল্লী দেখিতে দেখিতে আর একদিনের
বটিকা মনে পড়িল। সে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ, যে দিন গির্জার
নামের শাহ এই মিনার হইতে দিল্লীর জল-যোগীরা দেখিতে
ছিলেন। সে প্রথম দিনে পার্শ্ববর্তী সৈন্যগণ দিল্লীতে
রক্তপ্রোত বহিয়াছিল। তারা ছাড়াও কত বীর কত
আক্রমণ, কত অভ্যাচারের ধারা ইতার বুকের উপর দিয়া
চলিয়া গিয়াছে। সত্যি

তবু আবার দিল্লী সোমন বৈশ ধারণ করিয়াছে। নৃতন
রূপে আবার গাঝিয়াছে; ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইয়াছে।
পাশ্চাত্যের লোভিত প্রকৃতির দিল্লী-দুর্গ প্রকৃত
করাইয়াছিলেন; তবু ত নর সবই প্রাণ-দান। শিবের

এমন শব্দ নবর আর কোনও ভূগে শাওনা যায় না।
ইহা আগ্রার ভূগের মতকরণে নির্মিত হইলেও শাহজাহানের
দুগের কাকর্ণি, কাকর্ণির দুগের অপেক্ষা উন্নততর।
ভূগের পুণের অবস্থা আর নাই; এখন ইহা গোরা সৈন্যের
আবাসস্থল হইয়াছে। এখন আর মোগল সৈন্য নীচু ভাঁ-
রবে আকাশ বাতাস সুব্রিত করিয়া সাম্রাজ্য-বিস্তারের জল
অভিযানে বাতির ৩য় না; দিল্লীর পুণের পুণি আর ভূগ-
গজভাগে উচ্চতা আকাশকে দুগর করে না; চৌদশী-চক
আর নৃত্যগতে ঘিটার ‘ইন্দু-সভার’ স্মৃতি করে না।
মোগলের সে দিন নাই; ভারতের সে দিন নাই। সে
ঐশ্বর্য, সে শৌর্য-বীর্য, সে ভোগ-বিলাস সবই এখন কল-
কথার পরিণত হইয়াছে। মতিমহল, সাম্রাজ্য-বরজ, রতনচন্দ্র
অভ্যেতের সেই সূত্রগুলি বাক্যভাষ্য বর্ণকর্তার ভাষা-
মলিন। মন্তব্য-বিশেষণে মোগল রাজসম্মতির সঙ্গে সন্তোষ
চলিয়া গিয়াছে। ভূগের সারস্বত প্রাণদানমালার জল জল-
পুণের মধ্যে বসে ধনরাশি, ভলরাশি ও পাণরাশি ছিল
বিষয়গত বোধ ৩য় ভাষার উপমা নাই। ইহা ক্রুরের ও
কল্মষের রাজ্য; প্রজা, স্বর্গা তথ্য স্বর্গে প্রবেশ করিতেন
না; ঘর গোপনে ভিন্ন চরণ ফেলিতেন না। এত
নব-নাম উচ্চান, এত রতনরাশি-পাণিরাশি রতনী, এত
ভোগ-বিলাস ও এত পাণ্যচরণ আর কোথাও ছিল না।
যে ঐশ্বর্যের নিকতন নিত্য কত নর কোমল গদ-গদ-বর
মল্ল লাত, করিয়া বসে হইত, আজ আমরা মল্লকণ্ঠে গদ
চরণে সেই মল্লকণ্ঠে কলা-কাকর্মের মন্তব্যের অবমাননা
করিতেছি। হান-হুগো উৎস-মুখ হইতে গোলাপ জল
উখিত হইত আর শব্দ-শব্দে নিত্য গুণে শিলাসনে
বসিয়া কত তরুণী ভ্রাক্ষণের গরল গাখিত; কত নারী
কর্ণের কলকাকর্মী নিকরের শব্দভাষার ভাষা দ্যাক্ষক
উচ্ছ্বিত হইত; প্রমোদকল লোকলের মুখ বামনে কত



বসন্ত-সমীরনের নিঃশব্দ উড়িয়া যাউত; আবার হয় স
ঐক্যফেনিল বহুধনবহুল ঐক্য-প্রবাহে ভাসমান। কোন
অভাগিনী মতকুরির শূন্যমস্তকী স্তম্ভ সখ বিরা নিভুর
মুহূর্তের হুটে নিকিল হউত। ঐক্য ও ভোগবিলাস
কোন দিন মাহুতকে পবিত্র সন্তোষ দেয় নাই; এ প্রমোদ-
পিঞ্জল সখে যে পদার্পণ করিয়াছে তাহাও নষ্ট মিলে
নাই, শুধু মদুর অকৃপিত লেলিহান শিখাময় বালনার অনলে
শুভ্রি মরিয়াছে, আছাড় কৃষ্ণ চর নাই। এই দল



কুতব মিনার

গালাপে কত উচ্চা কামনা, কত উন্নত লক্ষ্যের আশায়
নিখা আনোড়িত হইয়াছে; আরও বৃহি তার চ-একটী উচ্চ
পূর্ণ অমৃতত্ব করা যায়। সে চিত্তবাহের নিখল অতিশায়ে
বৃহি এ প্রমোদ-প্রাসাদের প্রতি প্রস্তর-বণ্ড সুখ্যত, তুফার
হইয়া আছে। যে সভাপুণে লেখা আছে—“যদি পৃথিবীতে
দুর্গ কোথাও থাকে, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই”—সে

গুহর আর শোক-বিস্ময়। তার বর্গাশীলী প্রাসাদ!
ভোমার নিখাতা ভাসিতেন না যে, মাহুত দাঙা করে
নিখাণ করে মহাকাল তাহা অনাগ্রাণে ধ্বংস করে; মাহুতের
কত উচ্চা, কত কামনা, কত ভবিষ্যৎবাণী অবলীলায় গহিত
যশ মাহুত স্মরণসিদ্ধ হয়!

বিকালে আমরা কুতবমিনারের পথে বাতির চইলাম।
নুতন দিল্লীর গৌরাময় দরল প্রবৃত্ত রাজপল্লভি রাজধানীর
উপবৃত্ত। সখে চারতের পাল্পেটে, সেক্রেটারিয়েটে,
গভর্ণমেণ্ট হাউস, মান-মন্দির এ সব দেখিয়া গইলাম।
কাশি, দিল্লী ও জহপুত এই তিন জাহপার মানমন্দিরই
ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষিকতার পরিচয় দেয়।

তারপর বিজন পথ। চারিধিক সমাধি ও স্তম্ভবলয়,
গুহগুলি ইত্যন্ত বিকীরিত হইয়া রতিয়াছে। কেবল
শকনবলয় এখনও অটুট অবস্থায় বর্তমান। এই
হস্তের হিতলে উঠিয়া আমরা আর নীচে আলিবার পথ
দুর্ভে পাই নাই। অনেক বৃহিা কিরিয়া অবশেষে
এই খোলক-খাঁচার পথ পাইলাম। হুমায়ূনের
শাহাধার এখনও বর্তমান, কিন্তু পুস্তকপাঠিত কোন
মোগল সম্রাটের সৌমা মানন আর দেখিতে পাইব
না। মুখিতির নির্মিত পুরাতন কোরা দেখিলাম।
শেরশাহ্ ইমার সংহার করাইয়াছিলেন। দুর্গে চিত্তুর
শিল্প-কলার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। কুতাবদৌর
মন্দির এখনও রহিয়াছে; কিন্তু সে কবরাজা আর
নাই। হয় ত নরোত্তমদিগের সমাধি এখানে
এখনও পড়িয়া আছে, কিন্তু গীতার যশ প্রচারের
গভীর বাণী আর উচ্চারিত হয় না। নিরাসুদীন আউ-
লিয়ার কুণের নিকট আতানবার মন্দির সমাধির
উপরে লেখা, আছে “আমি দক্ষীরী, আমার কবরের
উপর মাটি ও ঘাস দিও!” শাহাজাদা বোধ হয়
বৃহিাছিলেন ঐক্য নবর, বৃত্তিস্তম্ব স্পন্দন; তাই
আজম বিলাসে লালিতা রাজকতা মোগলের তিমির প্রভীর
পুস্তকবৃত্তেই সাংখ্যান ইয়াছিলেন!

সেখান হইতে আমরা কুতবমিনারে গেলাম। আমরা
দলসেই তরল বহন, তাই আমাদের উপরে উঠিতে কোন



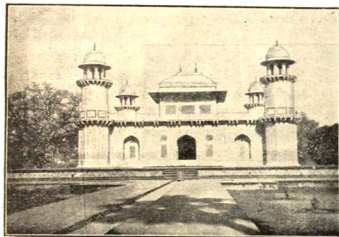
সমস্ত রক্তনীর এক একটা রক্তনীর কাঠিনীর মধ্যে আলোকপাত করিয়া সব প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা ভূর্ণের অন্তর্য্যামে চলিয়া আসিলাম, কিন্তু নগরোৎসবের মাহাত্ম্যবির অাকর্ষণ আমাদের দূর দূর টানিতে লাগিল।

অনন্তরই তাহাঙ্গীরের ইতিহাস-বিখ্যাত যেত-কক প্রস্তরের সিংহাসনখানি এখনও ছোট ও বৃষ্টির অন্তর্য্যামে ভাসমান হৃদয় রক্তাঙ্কে। পাৰ্শ্বেই তাহাঙ্গীরী একটি ককাকার উপর সম্রাট ও গুরুভাগান

বেলিভেন ও বাদীরা গুটি লাভিত। দূরে দেওয়ানী দাল : লেখান হইতে রাষ্ট্রেরবীর অমরগিঃ প্রাপককার ভক্ত পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিকিত প্রভুত্ব অথ একলক্ষে ভূর্ণের প্রাচীর লজ্জিত করিয়াছিল। প্রভু বন্ধা পাইলেন, কিন্তু অথ আর নাচে নাই। তাঁহার গুটি বন্ধার ভক্ত একটি ভোরণের নাম ছিল "অমরগিঃ সমগ্রগা"।

বহু-মহলে প্রবেশ করিতেই চারিদিকে আমরা সুখের নত নত চবি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তাহাতে

বিশেষ সুখী হইতে পারিলাম না। যাহাদের চোখের হৃদয় তাহাঙ্গীকে প্রত্যাহ স্বমুখলে হাইতে উপদেশ দিই। আর এক দিকে সমতাকের পরনকশ। নিকটেই একটি গলাধার রক্তাঙ্কে : তাহা কি হৃদয়! এখন কলপূর্ণ হইত তখন বোধ হইত যেন নিজে অধিত পদাটী তাহাঙ্গী উগ্রগাছে। দিল্লীতে আর একটি গলাধার আছে, তাহাতে গল পড়িলেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে আপনি গুরু হইয়া থাকিত। নিকটেই একটি হৃদয় বদ্যার গান। আঙ



বেককা—আকবরের সমাধি

আগিয়া ঠাণ্ডাইতেন আর ভূর্ণের বাহিরে যখনই পাতে ধর্মান্যার্থী জনতা ভাষণ করিত। নিজে রক্তপূক্ত হইত, উপরে আসনের উপর বসিয়া সম্রাট দেখিতেন। তরতপুত্রে আর তাহা আঙা কর করিয়া বিহবগলে সেই ক্রিয়াসনে বসিয়াছিলেন। অনন্তরই যে বোধলগাধপদী সেই অকমান। লক্ষ করিতে পারেন নাই, তাই অকমানীয় সিংহাসন বিলোপ হইয়া গিয়াছিল। সেই স্বে তপ্ত বন্ধ ও বাহির হইয়াছিল। বোধলের সৌভাগ্যবির অন্তর্য্যামে রক্তিত সে শোণিত-বেধা এখনও বেধা যায়। নিকটেই চৌলর বেলিবার গুট; এখানে স্বয়ং বাবলাহ ও বেগমগণ

রক্তবেধ যখন পিতাকে বন্দী করিয়া রাখেন তখন পাঠভাগান সমতাকের প্রতিবর্তিত ককটির সমুদ্র বসিয়া গালে হাত দিয়া নগীর অপর পাতে তাঙ্ক-মহলের দিকে নির্বিষেব নরনে তাকাইয়া থাকিতেন। জাহানারা পাৰ্শ্বে বসিয়া কোরাণ পড়িয়া তনাই-ভেন আর বিরী সম্রাট অকমলে ভাসিতেন। এখন পক্ষ্যতে দিহিতেন তখনও গৃহে বচিত মদি-গুণিতে তাহের সম্পূর্ণ আকৃতি প্রতিফলিত হইত। এখানে আসিলে মন আপনি কিভাবে উদাস হইয়া যায়। বিহী-চিত্তের অবাক বেদনার একটা

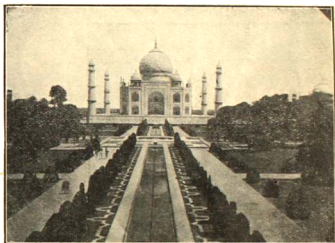
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତିକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହି
ବିବରଣୀ ସେବାକାଳ୍ପନାର ଗ୍ରନ୍ଥାବଲମ୍ବନ କରିବା
ପାରିବୁ ।

সাক্ষরতার "বিশুদ্ধ মন্ডলের মরণ-ভয়" সেকেন্ডারী
অসিলাস। প্রবেশ দ্বারের কারিকারী কত মরণ,
মল্লচ ইত্যাদি যথো এমনি এমনি একটা অশুভ
দৌন্দর্য্য আছে বাহ্যিক সর্বকালের স্নেহে মৃত্যুই না করিয়া দা
না। চারিদিকে চারিদী স্তোত্র
ও বিদ্যুৎ উজ্জ্বল; মধ্যস্থলে
সম্মান-প্রদ। কবির উপরে স্নেহে
যে স্নেহ কারিকারীরা মরণ
অবরণ রহিয়াছে তাহা একটি
মরণ প্রস্তর চাইতে ক্ষোভিত। পার্শ্বে
একটি স্নেহ আছে; কথিত আছে
যে তাহার উপর কোমল মণি
পাকিত আর কবির উপর মণি
আলো পড়িত। অনতিদূরে বিশুদ্ধ
বিশুদ্ধ, মূল্যবানের অর্ঘ্যে ও
সীতার ক্রম বহির্ভূত। আকর
কোষিত কালে? সব মরণে গতি
সমান অস্বাভাবিক। তাঁহার
দিনব্যাপী বসন্ত বৈশাখ ছিলেন। এই

‘ମନସଂସାରମୟ-ଆଶିଷ’ ମନ୍ତ୍ରାଂଶର ଗୀତି ‘ସହସ୍ରତ ୧୩’ ଗୀତି
ବଳିଆଇଁ ଆଜି ମୋମଳ ନାମାନ୍ତର ସୁଧିର ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଚାରିଛି ।

সেখান হতে আরম্ভ ইতম্ উদ্যোগের পেলাম। এখনে
স্বরাজ্যভাঙ্গের পিতা নির্জা পিতাশের কবর আছে। এখনকার
মত এমন হুন্দের বেত পাথরের আলির কাজ আর কোথাও
দেখি নাই। কোথাও কোথাও এমন হুন্দের লতা-পাতা
আঁকা আছে যে মনে হয় সেগুলি বৃষ্টি তলানি পাথরে বহিত।
পাথের বরঙলিতে আরও কয়েকটি কবর বহিয়াছে। একটি
বয়ে লাতালকা হুঁমায় আবুর্কিমানা করিয়াছিলেন। বহুটি
কালিমায়র চইকা গিয়াছে। দৌলখোঁ দাফা অভুলমীর
তাহার খংই একটা দিয়ালমীন মাধেদন আছে। কিছু
পাথর পুঁনি কসারীমদের গ্রাণে লৌকর্গা-বোম কেনেও গাফ

জাপান নাই। বরং অক্লান্তকায়ী দেববল প্রাণার
 ভাবিয়াছে, যখনতখন কথিয়াছে ও গৌলবময় স্বতন্ত্রিত্ব
 নষ্ট করিয়াছে। কেহ এট যোয্য ঠিকত বুলি ছিল না।
 রাজ্য ও বস্তুভাষ্যের মধ্যে প্রভেদ এট খানেক; বরং
 পরিমাণে বাক্য করিলে যোয্যও ও বস্তুভাষ্যের, ব্যাপকভাবে
 তাক্য করিলে সেতক কিছু হয় না। বিদ্যার প্রাণার, অপ্রাণার
 প্রাণার এমন কি আত্মবৃত্ত কাম্বির দ্বারা ভাষ্যভরণ পৰ্য্যন্ত



ଉପାଦେୟ ବ୍ୟବସାୟ

ଏହି ସାହିତ୍ୟସମୀକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

স্বাভাবের সৃষ্টি প্রত্যক্ষক উপেক্ষা করিতে পারা যায় না।
প্রাকৃতিক পোড়াকে মানুষ একটি সুখের ভাবে; কারণ
সে প্রকৃতির নির্মিত পথে চলে নাই। পর্বতের একটা
শিখরকে পাহাড়া, একটা আয়তাকার ভাবে, মানুষকে
সমতাকাকে অক্ষয় তুল্য করার প্রবণতা; অথবা নদীর আপন
মনে গান এবং নৃত্যরূপে অপ্রাণ পতিকে মানুষ অদ্বৈতের
অপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার মধ্যে
নিকষের মধ্যে হওয়ার অস্তিত্ব অস্বস্তির ও ক্রান্তির
আচ্ছাদের সূচক সূচক মানব মন ভাল কলিঙ্গ চলিতে পারে
না। তাই দেহকোষের সিংহাসনের অবশ্যীয় কাককাণ্ড; এ
আগার যতি মলিনের মূল, যোজন সৃষ্টি প্রকৃতি মৌলিক



মনে হয় মাতৃবৎ সৌন্দর্য্য-সঙ্গি করিতে পারে; তাহারও মনে এমন একটি কবির কাছে বাতা কৃতলে স্বগন্ধও চটনা করিতে পারে। লোকোপরি তাহা মনে এই বাতলা বহুদূর হইয়াছে।

মমতাকের প্রেমকরণ সৃষ্টিই অনন্ত ব্যাপিমা। একটি অখণ্ড স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীতে বড় পৌরমিক, বড় ভাবুক ও বড় বাতায় বাতী আছেন, তাঁহারও মনে সেখানে গেল করণোক্তের মানস অভিধারী। মমতাক ও নারী জীবনের প্রেম সন্ততি বহুদূর বাতী মনে

তাঁহার কি জীবনের সঙ্গে সংঘর্ষে লব কুঠাটা যায়? তাহা ত যায় না। তাই প্রেমদ্বীর সৃষ্টিক অমর করিয়াছে জল, নিজের গেমবৎ কুলতাকে একটা তল বিহার জন্ত এই মন্থর স্বপ্নেও গতিষ্ঠা। সন্ধ্যাজী আত মুক্তার ঈশ্বর ফোড়ে চরমনিগ্রাহ অধিকৃত্য কিন্তু শাহজাহানের গেম বোধকর পরলোকেও তাঁহাকে অমূল্য করিয়াছিল; সেই কল্প ও সূতকে বরণ করিয়াও তিনি অমর।

‘কাংথো বহুত বিস্ত মলিনে’

জৈনসেই,

যে নামে ডাকিতে বীরে বীরে—

সেই কানে কানে ডাকা যেন খেল এই নামে
‘কন্থের কানে।’



তলকেলি—চূপার চূর্ণপাথে

ধাপন করিলেন, কিন্তু বিরচী সন্ধ্যাটুকি করিয়া মাথা জীবন একাকী ধাপন করেন? মমতাক যায়—

‘গোব পত্নীজয়মুতবলিনমায়ো’

এদানন্ত্য: সর্গে: বসুধি অলকখন চন্দ

যা: কণ্ড বাহা: শিখি বহুগো: বৌদ্ধিকসঙ্গ

অথবা তাঁহাকে যিনি “বং জীবিত্য, কসমি যে জগত: বিচীরা, বং কোদুদী নরনরোত্তমুতা: কসমে” বলিয়া ডাকিতেন,

সেই কানে কানে ডাকা আনও নাবব হয় নাই; আনও প্রেমিকের উদাত্ত কণ্ঠস্বর অনীমে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিতেছে, “তুলি নাই, তুলি নাই, গিয়া।” শাহজাহান বলিয়াছিলেন— “জব্বেরে বেবতা একটি, জেব্বেরে বৃথা একটি! পৃথিবীর তাকও একটি।” এ ‘নিহিত সৌন্দর্যের’ তুলনা নাই, বহুতে পারেনও না। তাকমহলের অনবদ্য মন্থরকান্তি ‘কুটিল বা সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জ এনাথ পাখ্যে’, ‘ভাষার অর্জাত তারে’, অমূল্যত অমূল্যত অমূল্য রূপে জব্বেরে নিহিত নিল:র বার চিরন্তন একাধ তাহাকে কুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা বৃথা, ভাষা সেখানে মৌন, বৃক। তাহাকে জব্ব বিজ্ঞ উপলব্ধি করিতে হয়। এ ‘মন্থরীকৃত শোকাহ’কে পুনরাব তরল করিতে বাওবার চেষ্টা বৃথা। এ প্রেমের কন্থাবাহতা এ ‘বিহোদের পাখ্যে

প্রতিমা’ জব্ব বথো একটি অমূল্য সুর বিনা ভাষা, বিনা হৃদে উদ্ভাট চইয়া রখিয়া উঠিতে লাগিল; অত্ৰিচিহ্ন মেম্বলখা সেখানে বেদনাময় ছায়াপাত করিতে লাগিল। বহুদূর অপর পারে জৈমিক সন্ধ্যাটের ইচ্ছাকৃত অপর কোন সৌব নির্মিত হয় নাই; বহুদূর কোন স্বর্গের সেতু বহুদূর বাঁধা পড়ে নাই; কিন্তু জৈমিক ধূমল পাখ্যাপাখি স্থান পাইয়াছেন। জীবনে ধাক্কাবের বিচ্ছেদ খটে নাই, অরণ্যও তাঁহায়া একত্র মিলিত চইয়াছেন।

আমরা শেষবার তাক দেখিলাম লক্ষ্যের পর সেকুর উপর
 চটতে। তখন চতুর্দিক চক্রে কিরণে ছাটিতেছে; ঘনানার
 কণরাপি বিধানে উপলব্ধি হয়। বহিরা ঘাইতেছে; দূরে
 তাজের গুহ্র নীরবতা আরও হৃৎকর। আরও মধুর। কেবল
 সেই বসন্তাশোকে একটা কলশ হৃৎকরের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের সম্মুখে-বাস্তি ভ্রমণ কাহিনী শেষ চটক! গোল।
 পত্রদিন দুনারে থাকিরা আমরা প্রত্যাহতন করিলাম।

“রবণ-দুর্জি” গাথের চিত্রগুলি মৃদু কালে চান্দা কর্তৃক পৃষ্ঠা আয়োজিত-চিত্রের প্রতিমূর্তি।

বাসস্তী

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

বসন্তের প্রথম তাপ বইছে—
 কোন্ বিরটার গোপন কথা কইছে।
 দীর্ঘবাসের কৃষ্ণের বাণা থামল,
 স্বর্ণ হ'তে মন্দিরিনী নামল।
 কল-কোটার দিনটি যে ঐ কিবুছে,
 সূর্যের আলো চোবিকে ঐ কিবুছে,
 নীল-অঁচলে আকাশখানি ঢাকল
 রঙ-কেন্দ্রে বনের পাভা অঁকল;
 চাই-তোলা ঐ ফুলের হাওয়ায় ভবে—
 মন-উপসী! আজকে শুভে মন যে!

পাতার বুকের নতুন নেশা লাগল,
 মনের ভায়ে সূর্যের গরল লাগল।
 ছন্দ-চমক হাওয়ায় কত ছুটুছে,
 তাপ-করতার তালে গলে ছুটুছে।
 কোন্ ধরনের ভাসের চোখের চাউনি,
 মনের বাগে কাপন নাচের চাউনি;
 মন ছোটে না চাঁটা পথের চোখে,
 চায় যে শুধু ফলফেরতে কিবুতে।
 বসন্তের প্রথম তাপ বইছে,
 কোন্ বিরটার গোপন কথা কইছে;



১৫৫

দিয়া বলিয়াছিল, সে এইবার ওঠার পালা আসিয়াছে তাহিরা বাড়াইল। তার মহাপ্রাণে মাথা মাখনে একটু নীচু করিয়া চলবার উপর হঠাৎ তাহার বিকে চাহিয়া বলিলেন—
কে! তোমার মাথা কি!

কৃষ্ণ-বৃষ্টি খাঁড়লের খুঁটি খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—বুই কিছু টাকার খোঁজাচ্ছি করিচি অনেক কষ্টে। মোর টাকাটা নে—আর গোপনে চাবীটা খুলিয়া জান্না, বসে কই থাকে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বল্বে—

অথবা হায়ের মুখ আগল হইল, বলিলেন—চাঁদ, নেওতো ওর টাকাটা কখন? খাড়া খানার দেখো তারিখটা, হুন্টা আর একবার হিসেব ক'রে দেখো—

কৃষ্ণ বৃষ্টি খাঁড়লের খুঁটি হঠাৎ টাকা বাঁহের করিয়া হরিহরের লম্বে হোয়ারের বাহুর রাখিয়া দিল। হরিহর তালিয়া বলিল—পাচ টাকা?

তার মশার বলিলেন—আজ্ঞা কমা ক'রে নাও—তার পর আর টাকা কৈ?

—ওই এখন জান্না তার পর দোব—বুই পতর খাটিলে শোধ ক'রে তোলাকে, এখন ওই নিয়ে মোরে গোলায় চাবীটা খুলিয়ে জান্না, মোর মাত্তরেতে জুটো বেইয়ে জো মাগে বাচাই, তারপর পরমোর জুটো হ'য়ে গিয়েছে, সে না হর—সে এমন নিক'সে কথা বলিতোছিল যেন গোলায় চাবী তাহার করতালপত্র হইয়াই গিয়াছে। তার মহাপ্রাণকে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

তার মহাপ্রাণ কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ও! ভাবী যে দেখিচি মাসীর আবদার—চলিগ টাকার কাছাকাছি হুন্ডেআগলে বাকী, পাচ টাকা এনিচি নিয়ে গোলা খুলে জান্না, ছোট গোলের কাঁড়ই লাগায়া—বা এখন হুপ্ত বেগা বিক্ করিম্ নে—

কৃষ্ণ-বৃষ্টি খাঁড়লের অস্ত কান্নারও বোধ হয় অপরিচিত। নকে, দীহু ভট্টাচার্য্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অথবা?

—ওই ওপাড়ার তম্বুরের বৌ—দিন চারেক ভাল তম্বুর না মারা গিয়েছে? হুন্ডে আগলে চলিগ টাক। বাকী, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবী দিয়ে

যেখিচি, এখন গোলা খুলিয়ে দিন—হেই কখন—তেন কখন—

পায়ের তলা হঠাৎ মজি দরিয়া গেলেও তম্বুরের বৌ অস্ত চমকিয়া উঠিত না—সে ব্যাপারটা এখন অনেকটা সুস্থল, আশাহী আসিয়া বলিল—ও কথা বলবেন না মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা তপের নিমন্তল ছেল, ও বড় গড়িয়ে দিইছিল তাই তোলা দেওয়ার বোঝানে বিভী কল্ল পাচটা টাকা দেলে—ছেলে মানুষের জিনিস বাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি এখন তো ওকে ওটা বেইয়ে বাচি, ভাবলাম এরপর দিন যেন মালিক তে মোর বাছারে মূর্খ আবার নিমন্তল গড়িয়ে দেখো? তা যেন মনিব ঠাকুর, চাবীটা গিবে—

—যা বা এখন বা—এ সব টাকাকড়ির কাজ কি নাকে কান্ধেই মেটে—তা মেটে না। সে তুই কি বুঝি, থাকতো তের গোয়ামা সে বুঝতো, বা এখন বিক্ করিম্ নি—ওই পাচটাকা তোর নামে কমা দৈল—বাকী টাকা নিয়ে আর তারপর দেখা যাবে—

অথবা তার চল্য়া খুলিয়া বাপের মধ্যে পুঁতেতে পুঁতেতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাছীর ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্ভোগ করিলেন। তম্বুরের বৌ আকুলতার বর্ণিতা উঠিল—কনে জান্না ও মনিব ঠাকুর। মোর খোকার একটা উপায় ক'রে যান, ওরে বুই পাওয়াবে কি, এক পরবার বুড়ি কিনে দেবার যে পরল। নেই—মোর গোলা না খুলে জান্না, মোর টাকা কভা মোরে ফেরত জান্না—

তার মহাপ্রাণ মুখ খিচিয়া বলিলেন—যা বা মনে বেলা মাপী ফ্যাড ফ্যাড করিল নে—এক বুটো টাকা তলে থাকে তার সঙ্গে পৌছ নেই, গোলা খুলে আগ, টাকা ফেরত নাও—গোলায় আছে কি তবে? কোর নলি চারেক যান, ভাঙে টাকা শোধ যাবে? ও পাচ টাকা ও উল্ল হ'য়ে বৈল, আমার টাকা আমি দেখ্বে না! ওর ছেলে কি যাবে বলে ভাগ—ছেলে কি যাবে তা আমি কি জানি? বা পারিল তো নাশিল ক'রে খোলাগে বা—

তার মশার বাছীর মধ্যে চলিয়া গেলে দীহু ভট্টাচার্য্যি বলিলেন—হ্যাঁবা বৌ, তম্বুরের কবিন যোগ, কৈ তা তে:—



বৃষাবাসের দিন বাবা ঠাকুর চাট খে গাভন মাছ আনলে, পেরাঙ্গ দিয়ে খাওয়ালাম—তাঁর খেলায়—সরু মাছ খাওয়া খালে দিবা—পেরে বগলে নোর স্নিগ্ধ কফ, কাঁধে চাশা দিয়ে ছাও, খেলায়—ওমা! পইতে তারা উঠে না উঠে মাছ দেখে আর লাড়োপ দেবে না, তপুস হুঁত না হুঁত ঘোরে গলে বলিবে—মোর খোঁকারে গলে বলিবে—তোমার গলে তাকার গলা অটুকাইয়া গেল। মিনতির সুরে বলিল—আপনারা এটু বেলন—বলে গোছার চাবিটা ছিটকে জান্, সঃসারের বজ্র কই চলেচে—কর্ক কি দুই বাকী রাখা—বে ক'রে হোক—

দীপ্ত বলিলেন, কে বলতে বাবে নাপু, জানাতি তো সব—জাণো যদি—এই সময়ে মগনত জাতি-পুতী আলিয়া পড়াতে কথাবাদী বজ্র হইল। দীপ্ত বলিলেন—এস চে নীরেন বাবাকি, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুধি? এই তোমার বাপ ঠাকুরদাদার বেশ বুলে যে, কি রক্তম দেখলে বল?

নীরেন একটু হাসিল। তাঁতার বস একশ বাইশের বেশ নয়, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুংখ। কলিকাতা কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ—কাক-কর্ণ দেখিবার কল্প শিতা। কর্তৃক প্রেরিত হইলেও কাক-কর্ণ সে কিছুই দেখে না, বোকেও না, দিন রাত নভেল পড়িয়া ও বপুচ ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটা বসুন্ধা আনিয়াছে, শিকারের কোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিম্নের ঘরে চুকিতে গিয়া দেখিল, গোন্ধের দ্বী করের মেঝেতে বলিয়া পড়িয়া মেঝে হইতে কি বুড়িয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরের কাছে বাইতেই তাকার মজর পড়িল তাহার দানী বিলাতী আলোটা মেঝেতে কানো। উত্তর কাঁচের ভুট্টা ভাঙিয়া চুরবার হইয়াছে, দানী মেঝেতে কাঁচ ভুট্টানো। বোরের কাছে জুতার নক পাওয়া গোন্ধের দ্বী ওমকাইয়া শিখম দিগিয়া চাটিল, সে আঁচল পাতিয়া মেঝে হইতে কাঁচের টুকরাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিল—তাবে মনে হয় যে প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জালিতে গিয়াছিল, কি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, এবং অদোষ মালিক

আদিবার পুকেই নিজের অপরোধে চক্ৰগুলি ত্যাগাতিয়া সরিয়া ফেলিবার চেষ্টা ছিল চটাব বামাল বরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল।

কতিকারিলীর লম্বার ভারটা লুপ্ত করিয়া দিবার কল্পই নীরেন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটি চেতে খ'লে আছেন বুঝি? এই বেশুন সরা প'কে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি? আচ্ছা এমন একটু চা ক'রে নিরে আগুন তো বৌদি চট ক'রে, দেখি কেমন কাকের লোক? হাঁতান আলোটি মেলে নিঃভাগিন্দ্যস্তে আর একটা ভুন্স আছে? নৈলে আপনি বৌদি—ঐ জানেই সে কণাটা শেষ করিয়া ফেলিল।

গোন্ধের দ্বী সলঙ্কঘরে বলিল, বেশ লাই আদ্যো ঠাকুর গো?

নীরেন কোঁকুরের সুরে বলিল—দেশদায়ী আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বু এবার হাসিয়া ফেলিল, নিরঙ্কুরে বলিল—বুল প'কে যথেষ্ট, ভাবলাম একটু দুখে দিই তা যেমন কাঁচটা। দামাতে গোলাম কি জানি ও লং ইংরিজ কলেজ আলো—কথা খেব না করিয়াই সে পুনরায় সলঙ্ক হাসিয়া নীচে পলাইল।

নীরেন লগ হাওয়া দিন আনিয়াছে খটে, সলঙ্কে বৌদিদি হইলেও গোন্ধের দ্বী সলঙ্ক তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ তাহার সজ্জা হইতে কিছু উত্তরের মধ্যে নুতন পরিচয়ের সজ্জাটা কাটায়া গেল। নীরেন অকথ্যপন পিতার পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের গাফাংগে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ, আনন্দহীন প্রাণে দিন কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সী বৌদিদির সহিত পরিচয়ের লবটা সলঙ্ক হইয়া যাওয়ার পর সকল সজ্জার চা-পানের সমস্ত প্রাণ আনন্দ-প্রাণের মাধুর্য আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সকালে সোদন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রাস্তাঘরুর দ্বারা ডাকি মাঝিঃ বলিল—কি রাঁধাও ও বুড়ীমা? বপু বলিল—সার না আর, একটা কাক ক'রে দিবি লম্বাটি? আর মাছগুলো কুটে দিবি? ওমা মার পেতে উঠিলাম। দুর্গা মাকে মাকে বলতে আসে, বুড়ীমার কাণে সাধাং করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল—হাঁ, বুড়ীমা, একাকুদা কোথা গেলেন? একাকুদা তো যায় না?

—কেন থাকে না রে ? হু ! বিদু জেলেনী বলে যেন এ
কাঁকড়া লবাই যায়—

হ্যাঁ পুড়ীমা, ওমা সেকি, একি ভূমি কিস্তে ?

—কিস্তিমাট তো, ওই অন্তরালো পাঁচ পয়সা দিচ্ছে
বিদু

তুর্গী কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—পুড়ীমার
আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা ; এ কাঁকড়া অথাত
পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খাই বা কে ? ভাল মানুষ
গেয়ে বিদু ঠিকিয়ে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সরল পুড়ীমার উপর
তাঁহার অত্যাচার বোধ হলো। সে দিন নাকি গোমুল কাকা
পুড়ীমার মাথার বড়মের বাড়ী মাথিরাছিল, স্বর্ণ গোয়ালিনী
তাঁহাদের বাড়ী গর করে। সেও সে দিন নখীর খাটে রান
করিতে গিয়াছিল—পুড়ীমা রান করিতে আসিয়া মাথা
চুকাইয়া যান করিল না, পাছে জ্ঞান করে। সে দিন ভগ্নে
তাঁহার বুক কাটিয়া বাইরেছিল। কিছু কিছু বনে নাই পাছে
পুড়ীমা অশ্রুতিত হয় কি একখাট লোকের লামনে লক্ষ্য
পায়। তবুও যার জেদী মিলাগা করিয়াছিলেন—বোমা
নাইলে না ? পুড়ীমা হাসিয়া উত্তর দিল—নাথো না আজ আর
বিসিমা, নখীরটা ভাল নেই। পুড়ীমা বুক ভাষিয়াছিল
তাঁহার মার খাওয়ার কথা কেউ জানে না। কিছু পুড়ীমা
যাট হইতে উঠিয়া গেলেই যার জেদী বলিল—দেখেচো
বোটাকে কিয়ৎকম ঘেরেচে গোন্ধলো, মাথার চুল রক্ত
একধারে আটা হ'য়ে এঁটে আছে!—যার জেদীর ভাবি
অগ্রাহ্য, জানে তো বাপু তবে আবার জিজ্ঞাসু করাই বা
কেন, লক্ষ্যকে লবাই বা কেন ?

হাঙ্কধূর্তা মাথিরা চপিয়া বাইবার সময় তুর্গী ততরে
বলিল—পুড়ীমা তোমাদের চিড়ের রান আছে ? বা বলছিল
অপু চিড়ে যেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এখার রান
কেনা হয়নি। গোন্ধলের বৌ চুপি চুপি বলিল—আদিগ্ একন
তুপরের পর। বাগানের দিকে ইলারার বেখাইয়া কহিল—দুর্গে
আদিগ্ একটু গীড়া। পরে সে রাত্রাখন্ডের সুলভ শিকা হইতে
গোচাকতক মাথিকলের লাকু পাঁড়িয়া হাতে দিয়া বলিল—
জুটো অগুকে দিস্, জুটো জুই খেয়ে বা। জলদি বাইতে বাইতে
তুর্গী মিলাগা করিল—পুড়ীমা, তোমাদের বাড়ী কে এসেছে,

আমি একদিনও দেখিনি।—হাঙ্কধূর্তাকে ঘোঁসনি ? এখন
নেই কোথায় বেতিয়েচে, বিকেলবেলা আদিগ্ আদেব এখন—
পরে গোন্ধলের বউ হাসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে হাঙ্কধূর্তার
বিয়ে হলে দিকির জানা? তুর্গী লক্ষ্যের দ্বারা হইয়া বলিল—দুর্—
গোন্ধলের বৌ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে, হু কেন ?
কেন আমার মেয়ে কি খাওয়া ? দেখি ? পরে সে তুর্গীর ভিনুকে
হাত দিয়া বুখখান। একটু উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিল বলিল—
জানু তো এমন টুকটুকে লাভ বুখখানি চোলেই বা বাপের
পয়সা নেই। তুর্গী কাকুনি দিয়া নিজেই চাড়াইয়া শটয়া
কহিল—বাও, পুড়ীমা এখন কি—পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই
খিড়কো ঘোর দিগা বাহির হইয়া গেল। বাইতে বাইতে সে
ভাবিল—পুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা,
নৈলে থাকে না ? হু !

তুর্গী চলিয়া বাইতে না বাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী তত
চম্বিতে আসিল। বৎসর হইতে বলিল—ও সম, আমার
হাত মোড়া, বাহুটো অই বাইরের উঠানে শিটলি গাচে
গালা আছে নিরে আর, আর রোয়াকে দটো; মাথা আছে
ভাখ। সদা হাঙ্কধূর্তার এতকণে পুরাতন সমাপ্ত চটল।
তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালী মন্দিরের
দিকে বুখ কিরাইয়া উৎসর্গে প্রণাম করিতে করিতে গানিয়া
চলিয়া আসিত্তির হুই বলিতে গাখলেন—মোড়াট মা
দিচ্ছেবরা, দিন দিগরা মা। তব সমুদ্র পাখ কোরো মা—
মা রক্তকালী, রক্ত কোরো মাগো—

গোন্ধলের বৌ রাত্রাখন্ড হইতে জাকিয়া বলিল—ও
শিসিমা, নাত্রকালের নড়, রেখে দিইচি রেখে গল যান—
হটাত দবীটাকল রোয়াক হইতে জাক দিলেন—
বোমা, দেখে বাও এসিকে।

হু তুলিয়া গোন্ধলের বৌএর প্রাণ উড়িয়া গেল।
সবীটাকল সে হুইর বউ জর করে, মাথানখ বিতরণ
দখছে ওগরান সবীটাকলের গ্রাট কোনো পক্ষপাতের
কোন নাই, একখা নিঃসন্দেহে কলা চলে। রোয়াকের
কোনে জোড়া-করা মাথা বাসনগলির উপর জুঁকিয়া
পড়িয়া তিনি কি খোঁজেনমন আনুল দিয়া দেখাইয়া
কহিলেন—জানো তো চক্ষু দিখে—দেখতে পাচ্ছে ?



কেবল সপ্তম মণের দাগু দেখলে তা? এট খেল থেকে সর খসি তুলে নিয়ে গিয়েচে তার পর সেই শূকরের ছোঁরা এটো বাসন আবার হেঁলেলে নিয়ে লাঠ রাখা মকানো চরেচে, যাঃ কান্তমো একে বাঁধে গেল!

সবোঁ তাঁকরণ হতশতাবে রোগাকে বলিয়া পাকলেন। উপদ্রুত পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইলে ইচার বৈধি চতাল তিন হইতে পারিতেন না।

বাঁধের হাড়কাটাতে স্বরের মেঘে আশ্বেষ্ট অমনি উদ্ধবলোকের তাঁত শিশুকে কোথা থেকে, জান্বে কোথেকে? বাসন মাঝুলি তা দেখুলি নে এটো। পেল কি বৈল? তিনপত্র বেলা হয়েচে, তাৎক্ষণিক একটু বল বুঝে নি শূকরের এটো, একখুনি নেয়ে মঠে ফোত, তা ভাগিল খটীটা ছুঁই নি।

গোকুলের যৌ বিষয়যুগে গাড়াইয়া কাটিতেছিল কেন মতে সর শোড়ারদ্বীকে খসি তুলে নিতে ক্রাম, নিজে বিশেষি চোত!

সবোঁ তাঁকরণ মুখ খঁচাইয়া বলিলেন—খসি সেজে গাড়ির ঠেলে যে? ব্যত হাড়িকুড়ি সেলে দাগ গিরে—বাসন কোসন মেজে আনো কেন্ন। রাজ্যের গোবর দিয়ে নেয়ে এসো, বত লম্বাছাড়া স্বরের মেঘে জুটে লম্বারটা ছারে বাঁধে দিলে? সবোঁ তাঁকরণ হাসে গল্পের করিতে করিতে স্বরে ঢুকিলেন, বাঁধেরে পর যৌর তাঁতার লহ হইতেছিল না।

ছকুম মত লকল কাল পারিতে বেলা একধারে পড়িয়া পেল। নদীতে সে বখন পুনরায় জান করিতে গেল, তখন চোত্রে, ছুদাকুকার ও পরিভ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। ষাটে বৈকালের ছাড়া গুব বন, ওগারের বড় শিশু পাছটার রোম চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর বঁকে একখানা পাণ-ভোলা নৌকা গাড় বাঁধিয়া বাক খুসিয়া বাইতেছে, হালের কাছে একজন লোক গাড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মত উড়িতেছে। মাক নদীতে একটা বড় কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস বইয়া আবার ভুবিয়া পেল—সোঁ-ও-ও-ও-ও! নদীর ভগ্নের কেনন একটা

ঠাঙা ঠাঙা লুন্ডর গন্ধ আসে; ছোট নদী, ওগারের চরে একটা পান-কৌড়ি মাছ-খরা বাঁধের মোহাঁড়ির উপর বলিয়া আছে।

এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে।

পান কৌড়ি, পান কৌড়ি, জাঙা ও গোঁসে—

গোকুলের বৌ খানিকক্ষণ পান-কৌড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। মাছের মুখ মনে পড়ে। সংসারে মার কেত নাই যে বুকের দিকে চায়। মাছের কি অবিচার বহন হইয়াছিল? গরুর শিক্তুলে কেবল এক গাড়াখোর ভাই আছে, সে কোথায় কখন পাশে, তার ঠিকানা নাই। গত বৎসর পূণ্যের সময় এখানে আসিয়া চিনি ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া তাকে নিজের বাস হইতে বাসা সামান্য কিছু পুঁজি দিখিটা, চর্যানিটা বাঁচির করিয়া দিত। পরে একদিন সে মঠাৎ এখানে হইতে চলিয়া যায়। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে এক কানুলী আলোয়ান-বিভ্রান্তার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে তিনিয়া তাঁতার খাতার তরীপাড়ির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক ১০ ১৫ হইল। শিক্তুলের অনেক লম্বাডোনা, অনেক অশমান—ভাটটির সেই হইতে আর কোনো লক্ষ্য নাই।

নিঃসহায়, ছরছাড়া ভাটটার মত লম্বাবেলা কালের কঁকে মনটা ছয় করে। নিফন মঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা শখিক তাইটা হুত্যা এতক্ষণ বুকের কোন্ জনহীন আঁধার মেঠো পথ বাঁধা একা কোথায় চলিয়াছে, বাঁধে মাথা ভাঁজিবার স্থান নাই, বুকের দিকে চাহিয়ায় কোনো মাছুষ নাই।

বুকের মধ্যে ঝেঁপে বইয়া ওঠে, চোখের চলে ছাড়াভরা নদীমল, মাঠ, ষাট, ওগারের শিশু পাছটা, বাঁকের মোড়ের সেই বড় নৌকাখানা সব তাপসা হইয়া আসে।

অণু সেদিন কেশপাড়ার কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুই বা ত্রাড়াইটার কম নহে, রোজ অত্যন্ত প্রথম। প্রথমে সে তিনকড়ি কেশের বাঁধী গেল। তিনকড়ির ছেলে বড়া শেরাভাটগার বাঁধারী টাটিকেরিছিল, অণু বলিল ওট, কড়ি খেলি? খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বড়া বলিল

তাড়কে এখনও নৌকার বাইরেই হইবে, খেলা করিতে গেল
বাধা থাকিবে। সেখান হইতে সে গেল রামচরণ ভেলের
বাড়ী। রামচরণ দাওয়ার বসিয়া তামাক খাইতেছিল, অশু
বলিল—কদে বাড়ী আছে ? রামচরণ বলিল—কদেকে কেন
ঠাকুর ? কড়ি খেলা খুঁজি ? এখন দাও, কদে বাড়ী নেই—

টিক ভপুৰ বেগার খুঁজি। অশুর মূখ ভাঙা হইয়া গেল।
দাও কয়েক দানে বিকল মনোরথ হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে
বান্দাস পাড়ইয়ের বাড়ীর নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে
আদিয়াই তার মূখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলার
কড়িবেগার আছে। পূব ভরিয়াছে ! সন্ধ্যায় ভেলেরপাড়ার
ছেলে, ভেলর ভাঙল পাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু।
অশুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই কারণ পটুর যে পাড়ার
বাড়ী, অশুরের বাড়ী হইতে তাহা অনেক দূর। অশুর চোখে
বহলে পটু অনেক ছোট, অশুর মনে আছে প্রথম পেরিন সে
পল্লভ গুরু মণ্ডারের পাঠশালায় ভর্তি হইতে আর এই ছেলে-
টিকেই সে পাঠভাবে বসিয়া তাগপাড়া নুখে পুরিয়া তিরাইতে
দেখিয়াছিল। অশু কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি ? পটু
কড়ির গেলে ব্যতির করিয়া দেখা দিল। হাতা হুতায়
খানি ছোট পেরেই,—তার অস্তায় মনের ভিনিস।
বলিল পেরেইটা এনিতি—সাতটা সোনা পেরে—ছেরে গেল
দাও আনুবা—পেরে সে পেরেইটা দেখাইয়া ছাদিমুখে
করিল—কেনন, পেরেইটা একশন কড়ি ধরে—

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে
জিতেছে শুরু করিল। কয়েকদিন দাও মাগে পটু আবিচার
করিয়াছে যে কড়িবেগার তাহার হাতের লক্ষ্য অস্বাৰ্থ হইয়া
উঠিয়াছে, সেই জন্তই সে দিবিজয়ের উজ্জাপান প্রস্তুত
হইয়া একদূর আনিয়াছিল। খেলার নিয়মতালারে
পটু উপর হইতে টুক করিয়া বড় কড়ি বিজা
মারিয়া ছুক কাটা ধরের সব কড়ি জিতিয়া লইলে
তাক্ টিক করিয়া হারিতেই যেমন একটা কড়ি পেরে
করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে বহু হইতে ব্যতির হইয়া দাও
অমনি পটুর মূখ মণ্ডার আনন্দে উজ্জল হইয়া ওঠে।
পেরে সে জিতিয়া পাওয়া কড়িগুলি ভূমির পেরেই
মধ্যে পুরিয়া গোড়ে ও আনন্দে আর আর পেরেই

দিকে চাতিয়া দেখে, সেটা তড়ি হইবার আর কত
দূর।

কয়েকজন ভেলের ছেলে কি পরামণ করিল। একজন
পটুকে বলিল—দাও এক হাত তক্বে থেকে তোমার
দাওতে কদে তাক্বে, তোমার হাতে টিপ্বেই

পটু বলিল—বারে তা কেন—টিপ বেঁধে তাই কি ?
তোমরাও জেতোনা, আমি তো কাউকে বারণ করিনি—

পরে সে চাতিদিকে চাতিয়া দেখিল, ভেলের ছেলেরা
সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এত বেঁধে কড়ি
আমি কোনোদিন জিতি নি, দাও দাও খেলি নি—
যেহে কি এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যোগে পারবে ? দাওর
একহাত বাক্বে বেঁধে। সব ধরে দাও। হঠাৎ সে কড়ির
ছোট খণিটা হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেঁধে
নিয়ে খেলবে না, আমি বাড়ী যাচ্ছি। পরে ভেলের
ছেলেদের ডাবভরী ও চোখের নিরুৎসাহ দৃষ্টি দেখিয়া সে
নিজের জ্ঞাতপণের নিজে কড়ি খণিটা পল্লভ
চাতিয়া রাখিল।

একজন আলাইয়া আনিয়া বলিল—তা কদে না ঠাকুর,
কড়ি জিতে পালাবে বড়ি ? পরে সে হঠাৎ পটুর পল্লভ
হাতটা চাতিয়া ধরিল। পটু ভাড়াইয়া লইতে গেল কিয়
কোরে পারিল না, বিব্রতমুখে বলিল—বারে, চেকে
দাও না আমার হাত ? পিছন হইতে কে একজন জামাক
প্রো মারিল সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ি খণি
চাতিয়া না—সে ব্রিয়ারে এইটাই কড়িবার জন্ত হইয়াছে
চোটা। পড়িয়া মিথ সে প্রাণশয়ে খণিটা পেটের কাছে
চাতিয়া রাখিতে গেল কিন্তু একে সে ছেলেমাগুধ, তাড়াত
গায়ের জোরও কম, ভেলেরপাড়ার বলি ও তাড়ার চেয়ে
বহলে বড় ছেলেরের সঙ্গে কতকণ পারবে ? চাতিয়া
হইতে খিরায়া তাড়কে মারিতে শুরু করিল—চাতিদিকে
উত্তম আক্রমণ সামলাইতে সে দিশালায়া হইয়া পড়িল।
এক জনকে টেকাইতে দাও, দাও দিক হইতে দাও ;
হাত হইতে কড়ি খণিটা অনেককণ কোন্ দাওে ভিটকাইয়া
পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারদিকে ছড়াকার হইয়া
গেল ; অশু প্রথমটা পটুর হৃদয়বীর একটু যে খুঁদা না



হঠাৎ ভিল ভাঙা নহে, কারণ সেও অনেক কড়ি জরিপাচ্ছে। কিন্তু পটুতে পড়িয়া ঘাটেতে দেখিয়া, বিবেক করিয়া ভাঙাকে অলসারভাবে পড়িয়া মাত্র খাটতে দেখিয়া ভাঙার বৃকের মধ্যে কেমন ভয়িরা উঠিল—সে জিজ্ঞাসিতে ঠেলিতে অগাধতা দিয়া বলিল—ভেলোমাহু এক তোমরা মাঘ কেন? আর, ছেড়ে লাও—ভাঙো! পরে সে পটুকে হাটী হঠাতে উঠাটতে গেল, কিন্তু পিছন হঠাতে কাটার চাতের গুনি খাটো! মানিকম্প সে গোথে কিছু দেখিতে পাইল না, ঠোকাঠিলিতে পড়িয়াও গেল।

অপুকেও দেখিল বেলায় প্রচার খাটতে হঠাৎ নিবুহট, কারণ ভাঙার মেরেলি বস্তুর হাতে পারে কোনো জোর ছিল না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়তে বিপক্ষমল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল গুব খেনি, নীরেন ভাঙাকে হাটী হঠাতে উঠাইয়া গায়ের দূর্য্য কাড়িয়া দিল—একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিমিকে চাতিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলার হু একটা ভাঙা পাখীগুলি অঙ্গুর, আর কড়ির বলিটি পর্দাত! পরে সে অপূর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপূ হা, তোমার লাগে মি? এতদূরে ঠিক চপুয় বেলা কেনের ছেলেকের হয়ে মিলিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন ভজনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাকার ছেলেকের লইয়া অরুণা হাতের চৌমসপুণে পাঠিলালা পুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হঠাতে পড়িবার জন্য ভজনকেই বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে গুপ্ত চাতিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গেছো! আমার, সে দিন অত ক'রে ছিবালোর কাছে চেয়ে নিলাম—গেল! আমি যদি কড়ি মিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে

মধুসূক্তান্তির ত্রস্তের পূর্ণদিবস লক্ষ্যতা ছেলেকে বলিল—কাল ভোর মাতার মধ্যাক্ত নেমজার ক'রে আসিল—বলিল চপুয় বেলা এখানে যেতে;

ঘোটা চালের ভাত, পেশের ডালনা, ভুসুয়ের দুধ, নি, খোড়ের কট, চিড়ি মাছের বোল, কলার বড়া ও পাসেস। চর্পাকে ভাঙার বা পরিবেশন কার্যে নিদ্রাক্ত করিয়াছে,

মিঠায় আনাড়ি—ভরে ভরে এমন লক্ষণে সে ভালের হাটী নিম্নস্তিতের লম্বুখে হাবিরা ছিল—যেন ভাঙার ভর হঠাতেই এখন কোর বকিয়া উঠিবে। অত ঘোটা চালের ভাত নীরেনের খাওয়া অধ্যায় মাই, এত কম তৈল রুতে বাছা তরকারী কি করিয়া দোকে বাস, ভাঙা সে জানে না। পায়ের পান্সে—জল-মিশ্রাবনা চুইর তৈরী, একবার বুখে বিছাই পায়ের ভোজনের উৎসাহ ভাঙার অর্ধেক কমিয়া গেল। অল্প কিছু মহা খুসি ও উৎসাহসহকারে খাইতেছিল; এত সুখাত ভাঙারের বাড়ীতে কুসংগে চ একদিন মাত্র হু—আজ ভাঙার উৎসবের দিন। বেশ খেতে চলেচ না? আপনি আর একটু পায়ের নিন্ মাটার মধ্যার—মিঠা সে এটা জটা বার বার মাঘের কাছে চাতিয়া লইতেছিল।

বাড়ী কিরিলে সোফুলের বৌ ভাসিমুখে বলিল—চপুয়াকে পড়ক কর ভাঙার সে? বিবি দেখতে শুকুত, মাথা, পরীষের কেরের বেয়ে, বাশের পল্লা নেই, কার মতে যে সোফুবে? লাগা জীবন পোড়ে পোড়ে ভুগবে—তা তুমি জ্বক কেন নেও না ভাঙারপো, তোমাগেই পাটু বর—মেয়েও বিবি, ভাই বোনের চুইনেরই কেমন বেশ পুতুল পুতল পড়ন—

অবশেষে তাঁহু হঠাতে কিরিতে দিয়া নীরেন সে দিন প্রানের শিঙ্কনের আমবাগানের পথ পরিচাছিল। একটা বনে-বেড়া লক পথ বহিরা আসিতে আসিতে ঘেঁষিল বাগানের ভিতর হঠাতে একটি মেয়ে লম্বুখের পশের উপর আসিয়া উঠিতেছে। সে চিনিলা—অপূর বোন্ চুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল—কি পুকা, তোমাগের বাগান নৃত এইটে?

চুর্গা পিছন কিরিয়া চাতিয়া ঘেঁষিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

নীরেন পুনরায় বলিল—তোমাগের বাড়ী বুঝি নিকটে? চুর্গা হাড় নাড়িয়া বলিল—এই পশের ঘায়েই একটু আসিয়ে—

পরে সে পশের পাশে হাঁফাইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া মিতে গেল। নীরেন বলিল—না না পুখী, তুমি চল মাগে আসে, তোমার সঙ্গে বেলা হ'রে ভাল হোল, ঐ দিকে

একটা পুকুর ঘাড়ে গিরে পড়েছিলাম, তাবপর পথ
খুঁজে বেরান, যে ঘন জেঁমিসের বেলায় ?

চুপা ঘাইতে ঘাইতে হঠাৎ খামিয়া অন্ধকারে নীরবের
মুখের দিকে চাছিল। একবারে একটু বাড়ি হেলাইয়া
বলিল—পুকুরের ঘাড়ে ? একটা বড়, পুরোনো পুকুর ?
ওখানে কি করে গেলেন ?

ভাঙার কাগড়ের তিতর চাইতে কিসের কল
গোটা কতক পথের উপর পড়িয়া গেল। নীরব
বলিল—কি কল পড়ে গেল খুঁজী—কিসের কল ওড়ানো ?

চুপা নীচু চাইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সমুচিতভাবে বলিল
—ও কিছু না, যেটে আলুর কল—

—যেটে আলুর কল ? যেতে ভাল লাগে ব কি ? কি
করে যায় ?

এ ক্রম চুপার কাছে অত্যন্ত কৌতুকজনক ঠেকিল।
একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চুপা-পড়া একজন
বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না। সে বলিল, এ কল তো ঘাঘা না,
এ তো ভেঁতো—

—তবে তুমি যে—

চুপা লম্বকহরে বলিল—আমি তো নিজে যাচ্ছি এমনি
খেলবার—এ কথা ভাঙার মনে ছিল যে, এই চুপা-পড়া
ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন বুড়াম। ভাঙার বিবাহের কথা
তুলিয়াছিল, তাহার ভাবী কৌতুকল চাইতেছিল
ছেলেটিকে সে ভাল করিয়া চাচিয়া দেখে। কিন্তু
মধু সংক্রান্তির ত্রৈত্য দিনও তাহা সে পারে নাট, আরও
পারিল না।

—অথুকে কলো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—
বলবে তো ?

চুপা চলিতে চলিতে সমুচিতভাবে বাড়ি বাড়িল।

—বাড়ীতে পড়ে টেকে বুকা ?

ভাইয়ের কথা শুনে চুপা আর চুপ করিয়া থাকিতে
পারিল না। বলিল—খুব পড়ে। কিছুকাল খামিয়া
পুনরায় বলিল, বাবা বলে অপুর পড়ানোয় বড় ধরু।
আর একটু থিরা পাশের একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই
পথ দিয়ে গেলে আপনায় খুব সোজা হবে।

নীতেন বলিল,—আচ্ছা, আমি চিনে যাব এখন,
তোমাকে একটু এগিয়ে দিই, তুমি কি একলা যেতে
পারবে ?

চুপা আশুপল থিরা দেখাইয়া চলিল—ও
বাড়ী একটু এগিয়ে গিয়ে, আমি তো ওটুকু
এখন—

চুপাকে এবার অত্যন্ত নিকট চরতে দেখিয়া নীরবের
মনে হইল এখনও ছেলেমানুষ। এর আগে সে কখনও
ভাল করিয়া দেখে নাই—চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব
কবল সে দেখিয়াছে ইহারই ভাট অপুর।

যেন লজা-পাত্তর নিম্নত চুপা বকুল বোধির লম্বক
ক্রম দ্রুততঃ তাগব চোখ দুটির মধ্যে অর্ধগুরু আছে।
প্রভাত এখনও হয় নাই, ত্রিদি পথের আলল অন্ধকার
এখনও জড়াকৃত... তবে গাধা প্রভাতের কথা শ্রবণ করাইয়া
বের বটে—কত হলু আঁধার তাগব, কত কুমারীর ঘাটে
যাওয়া, যবে যবে কত নবীন তাগবের অমৃত উৎসব—
জানালার জানালার মূগ গন্ধ।

চুপা ব্যতিকল্প দাঁড়াইয়া কেমন যেন উল্লুপ করিতে
লাগিল। নীরবের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিয়া
বলিতে পারিতেছে না। সে বলিল—কি খুঁজী তোমাকে
দেখো এগিয়ে ও চল তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাউ।

চুপা ইতস্ততঃ করিত লাগিল, পরে সে একটু আনাড়ির
মত হালিল। নীরবের মনে হইল এইবার এ কথা বলিবে
পরক্ষণে কিন্তু চুপা বাড়ি বাড়ি ভাঙার দৃষ্টি ঘাটতে
হবে না জানাইয়া থিরা বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

চুপার বেলা। ভাবে কাগজ তুলিতে আদিয়া পোকপোক
যে নীরবের ঘরের চুপার উঁকি থিরা দেখিল। পরমে
নারেন বিজ্ঞানার চুপা খানিকটা এশাপ ওশাপ করবার
পর নিভার আশার ললাভি থিরা মেঝেতে হাতের পাঠিয়া
বাড়ীতে পর লিখিতেছিল।

গোন্ধের যে হালিয়া বলিল—বুঝেও নি যে তাকু
শো ? আমি তাবলাহ তাকুর শো খুমিয়ে পড়েছে ব কি,
আমি যেটার কই সে বড় খেলে না, পাতেই রেখে এল,
সে দিন তো সব খেয়েছিলে ?



—আজুন বৌদি, মোচার বসন্ত বাহো কি ? বাগানে কাজ
সব, যে কাল ভাতে খেতে ব'লে কি চোখে দেখতে পাই,
কেলুটা ঘট, কোনটা কি ?

গোকুলের বৌ অরের চরারে কবটে মাথাটা হেলাইয়া
ঠেলু দিয়া অভ্যন্তরারে বুকের নীচুদিকটা আঁচল দিগ
চাপিগা পাড়টল।

—ইল, ঠাকুর পো, বড় দরহে চাল বিক বে, ওইটুকু
কাল আর চোমাসের দেখেনে কেউ খায় না—না ?

—মাশ করবেন বৌদি, এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে
আপনারের বৈশিষ্ট্য একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান
থেকে বাড়ি বে, যা থাকে কপালে—বীরা বাহার তাঁরা
তিমার, দিন একদিন চকু-লজা। কাঠির বস্তু বুনি লজা।

গোকুলের বৌ খিলু খিলু করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—ওমা আমার কি হবে ? চকু-লজার ভয়েই শিশু-
মোচার পাটু তুলে দিয়ে চুপ করে ব'লে আছি না কি ঠাকুর
পো ? পোনো কথা ঠাকুর পোর—কেন কি না—আমার—
ব'লে—রি হি—হাসির চোটে অরার চোখে জল আদিয়া
পড়িল। গানিকটা পরে সামলাইগা লইয়া বলিল—আজ্ঞা,
তোমাদের দেখানো গরম কেমন ঠাকুর পো ?

—দেখানো কোথায় ? কল্‌কাতার না পশ্চিমে ? পশ্চিমের
পরম কি রকম সে এখান থেকে কি বুঝতে পারবেন। সে
বাংলাদেশে থেকে বোকা হয়ে না, আমকাল রাজে কি
কেউ অরার মধ্যে ভুতে পারে ? ভয়ে ঝিকলে জল ঘরে
ছান ভাঙা করে রেখে তাইতে রাজে ভুতে হয়।

—আজ্ঞা তোমরা যেখানে থাক এখান থেকে কত দূর ?
অনেক দূর ?

—এখান থেকে ছেলেছনিনের রাজ্য, আর সকলে গাড়ীতে
সাতের পাকা ট্রেনে চকু-ল জল চপু রাজে পৌছানো যায়।

—আজ্ঞা ঠাকুর পো, তিনটি বাকি প্রাণালীর মিকে
পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি ? পাহাড় কেটে
রেল নিয়ে গিয়েচে ?

—অনেক অনেক, বড় বড় পাহাড়, ওপরে জল, তার
তলা দিয়ে বদল রেল বার একেবারে অচকার, কিন্তু বোকা
যায় না, গাড়ীর আলো জ্বলে দিতে হয়।

গোকুলের বৌ অবাক হইয়া বেল। উৎসাহভাবে
বলিল—আজ্ঞা তেঁকে পড়ে না ?

—তেঁকে পড়বে কেন বৌদি, বড় বড় এলিনিয়ারে তৈরী
করেচে—কত টাকা খরচ করেছে, ভাঙলেই হোল, একি
আপনারের রাধাপাড়ার খাটের বাপ যে ওবেলা ভাঙে ?

এলিনিয়ার তোলু ভিনিব গোকুলের বৌ তাঁরা খুঁজতে
পারিল না। বলিল—পাহাড়টা হাটীর না পাখরের ?

হাটীরও আছে, পাখরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি
একেবারে পাহাড়ে—আজ্ঞা আপনি তেল গাড়ীতে
কতদূর গিয়েছেন ?

গোকুলের বৌ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল।
চোপ জায় বুঝাইয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া
ছেলে মাহুদের ভলিতে বলিল, ওঃ তারো দূর গিইচি, একেবারে
কাণ্ডী গয়া যকা বিইচি ! সেই ও বহর শিল্পাঙ্কুরী আর
সহর মার সবে আড়খোটার মূলকিশোর দেখতে
গিইছিলাম, সেই আমার বোদুদু বাওয়া—

এই মেয়েটি অন্ধদের যথেষ্ট সামর্থ্য দূর দরিদ্র তার
চারিপাশে এমন একটা হাসি কৌতুকের জল বুনিত
পারে যা নায়েনের তাই ভাল লাগে। এক একজনের
মনের মধ্যে আনন্দের অকৃত্রিম ভাঙার থাকে, কারণে
অকারণে তারাদের অগ্রসরিত আনন্দের উৎস মনের শাস্ত্র
উপচোইয়া পড়িয়া অপরকে ও প্রভাবিত করিয়া তোলে। এই
পটাবলী সেই মনের একজন। আজকাল নারেন মনে মনে
ইয়ারই আগমনের প্রতীক করে—না আসিলে নিরাশ হয়,
এমন কি যেন একটু গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আজ্ঞা, বৌদি আপনারের সন্ধ্যাই চলুন, একবার
পশ্চিমে সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এ বাড়ীর গোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিম কুমিও যেমন
ঠাকুরপো ? তাতেলে উত্তর মাসের বেঙ্গল থেকে জেঁকী
দেবে কে ?

কথার শেষে সে আর একদফা বাম মিশ্রিত কৌতুকের
হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গভীর হঠাৎ বলিল,
হ্যাঁ জায়ে ঠাকুরপো, একটা কথা রাখবে ?

—কি কথা বলুন আপন—

—হাসি বাধে তো বলি

—বাবো, লক্ষ্য করগেজ সঠি কবা আমরি কবো কবে না

জেনেন আসেন পড়ি, আগে কথটো জনাবো,

তবে আপনার কথার উত্তর দেবো।

গোড়ালের বৌ গুয়ার ছাউনির বরের মতো আসিল।

কালকের ভিতর হঠাৎ একটা কাগজের মোড়ক বাতির

করিয়া বলিল, এত মোকড়া তুটো বেলে আমার পিচিটা ঢাকা

দেবে ন



চীনে হিন্দু-সাহিত্য

শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ব্রহ্মাচারী দেবী

ইংসিং:

ইংসিং-এর নাম অপরচিত। ভারত ও মালয় উপদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লক্ষ্যে তাঁহার যে গ্রন্থ আছে তাহার টংগাতী অম্বুবাচ ভাষানী পণ্ডিত তাকাকাস করিয়াছেন। কিন্তু কেবল যে তিনি ভারত পদটুকু বলিয়া বিখ্যাত তাঁচা নহে, বহুদূরতঃ গ্রন্থেরও তিনি অম্বুবাচক।

১১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংসিং: সমগ্রগণ করেন, তখন তান্ত্র সন্ন্যাসী তাত্‌সংগ: এর রাজত্বকাল। শৈশবে প্রচলিত চীনা পদ্ধতি অনুসারে তিনি শিক্ষাগত করেন। কিন্তু বাস্তব বংশের বংশ চর্চাতে বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহ শ্রুতিতে আদৃত করেন। চৌধ বংশের বংশে তিনি প্রত্যাঃ অবলম্বন করিলেন। আঠার বংশের বংশেই ভারত ভ্রমণের বাসনা তাঁতার মনে উদিত হয়, কিন্তু তাহা পূরণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দাঁটখ্রি বংশের এষ্ট ইচ্ছা তাঁতার লক্ষ্য হয়। এষ্ট উনিশ বংশের মধ্যে তাঁতার বৌদ্ধের সকল উত্তম তিনি বৌদ্ধ সাহিত্য: আলেচনার নিরোচিত করেন; অস্ত্রান্ত বিবরণের বিস্তারিত বনক: বিকল্প করিয়া জাবনকে বাধ করিতে চাহেন নাই।

কারণে ও করেন সান্তেব প্রতি তাঁতার পতীর প্রভা ছিল। পূব সম্রাৎ চাং: আনে তিনি তখনসান্তেব কাণ্ড করিতে দেখিয়াছিলেন। তখনসান্তেব মৃত্যুর পর রাজার আদেশে তাঁতার অধ্যাপিকাঃ যে বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহার চবি বাধক ইংসিং-এর মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। তদবধি তারতম্য দেখিবার আগ্রহ উক্তগোষ্ঠের তাঁতার ব্যক্তি থাকে।

১৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্টন চর্চাতে দক্ষিণে লঙ্কর পল দিয়া তিনি তারতম্যবিশেষে বাস: করেন। সম্রাজ্ঞার

চন্দ্রাবাসী শ্রীবিজয়ে আসিয়া তথার কয়েকমাস অবস্থান করেন। এখানে তিনি সম্রাট শিখা গন। তৎপরে পুনরায় বাস: করিয়া ১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিখ্যাত বস্ত্র তারমিধিতে আসিয়া পৌছান। নান্দাবিহার, পয়া ও অস্ত্রান্ত প্রসিদ্ধান তিনি দেখেন ও বৌদ্ধবিশ্বের অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। অকশে ১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তারমিধি হইতে অশেষাতিমুখে বাস: করেন। ১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবিজয়ে আসিয়া ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তথার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া রত থাকেন। ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অশেষে করিয়া যান। শ্রীবিজয় তখন হিন্দুসভ্যতার একটা বড় কেন্দ্রভূমি ছিল। ইংসিং: সেইসময় এইখানে থাকিয়া কয়েক বৎসর কাটা করেন। এখান হইতে ১৯০ খ্রীষ্টাব্দে এক চীনা প্রবন্ধ দেশে ছিড়িতেছিলেন, ইংসিং: তাঁহার সহিত কতকগুলি পুত্র ও পাত্রের একটি অম্বুবাচ ও তখনকার স্রেষ্ঠ অশেষদিগের কতক-গুলি ভাবনকাণ্ডিনী পাঠাইয়া দেন।

পশ্চিম বঙ্গকালে ইংসিং: কিরণে ছিলেন, তঁরপতী য়ানে তিনি গিয়াছিলেন। ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বড় গ্রন্থ লেখা তিনি চীনে করেন। তাঁতার সহিত ৪০০টা বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ ছিল; বুদ্ধ সম্রাট সুদেব বঙ্গানদের একটি নিবৃত্ত প্রতিলিপিও তিনি আনিয়াছিলেন। ১৯৩ গ্রন্থ তিনি নিজে অম্বুবাচ করেন। ১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে ইংসিং: মারা যান।

সম্রাট পতাকার শেষভাগে তারতম্য: যে বহুটা বৌদ্ধধর্মের পাখা ছিল তাহাদের হ্রাসষ্ট একটি বিবরণ অম্বুবাচ ইংসিং:এর নিকট হইতে পাই। বৌদ্ধধর্মের আচারোচী পাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সব পাখাগুলি তাহাদের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিতে পারে নাই; ক্রমশ: কোন কোনটা একে অস্ত্রের সহিত লুপ্ত হইয়া যায়। ইংসিং: তদানীন্তন বৌদ্ধ পাখা-গুলিকে প্রাধান্যে চরিত্রী তাপে ভাগ করিয়াছেন, চারটা ভাগকে চারটা নিকায়ে বণা হইয়াছে।

মহাসঙ্ঘিকানিকায়—ইহার মধ্যে সাতটা বিভাগ। এই সঙ্ঘিক নিকায়ে প্রভাব ইংসিংএর সময় ভেদন আশিক ছিল না।

২। শ্ববীর নিকায় চার তিনটা বিভাগ। পালী গ্রন্থগুলি এই শাখারই অন্তর্গত। দক্ষিণ ভারত, সিংহ ও পূর্ববঙ্গে চার প্রভাব খুব অধিক।

৩। মূলসর্বান্তবাদ নিকায়ের চারটা বিভাগ। উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র ইহার প্রভাব ছিল; অগণ ছিল চার কেন্দ্রবৃত্তি।

৪। সান্দ্রতীয় নিকয়ে চারটা বিভাগ। লাট ও সিদ্ধ প্রভৃতি বান্ধে ইহার প্রাধান্য ছিল।

মগধে এই সকল মতেই নানাবিধ প্রাচুর্য দেখা যায়; কারণ মগধ ও নালন্দায় সকল মতবাসী ব্যক্তির সমাবেশ হইত। বরেন্দ্রও ছিল এইখানে উদার।

বৌদ্ধবিশ্ব উত্তরভাগে অধায়েন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানত ইংসিং ভারতে আসেন। তিনি একটি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “চীনে ব্যবহারিক জীবনে বিনয়ের কিছু কিছু ব্যতিক্রম চলিয়া আসিতেছিল, কারণ বিনয়ের অর্থ ও বাধ্যগত কোন কোন স্থলে অল্পতল করা হইত; বিনয়ের মূলগত যে নীতি তাহা হইতে এই নীতির প্রভেদ হইত অলম্ব্য। এইজন্যই ভারতে প্রচলিত বহাণ বিনয় বাধ্য তাহাই আলোচনা করিয়া আমি এই গ্রন্থে পরিচিতি করিলাম।” গ্রন্থটির নাম *Nan-kue-chi-kuei-nai-fu Anan*; ৪০টা অধ্যায় ইহাতে রহিয়াছে। ইহার বিষয়-সূচী হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কি পুণ্যগ্রন্থসমূহে ইংসিং ভারতীয় বিনয় পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। কয়েকটি অধ্যায়ের উল্লেখ করিতেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে বিজ্ঞ ও ৬৩তম অধ্যায়ের প্রভেদ দেখান হইয়াছে; পঞ্চম অধ্যায়ে অধিকারের পর অধিকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে; নবম অধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা উপবাসের নিয়মাদি। একাদশ অধ্যায়ে পরিবেশের প্রাণী নির্দেশ করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তুলু রত্নের প্রাণী কল্পন ‘তাহা বলা’ হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ধ্যান-ধারণার প্রকৃষ্ট উপায় কল্পন। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে শুদ্ধশুদ্ধের ব্যবহার, ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ে

অপমৃত্যু ও মৃত্যুর প্রতি ব্যবহার নির্দিষ্ট হইয়াছে। চতুস্তম অধ্যায়ে ভারতের শিক্ষাবান-প্রাণী কল্পন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্যঃ—৭২ অধ্যায়ে কেশবদাস নন্দকবিরের নিম্নাবস্থার রচিয়াছে।

এই সকল বিষয় মূল স্বাভাবিক বিনয়ের অন্তর্গত। মূল পবাস্ত্রবাদের দশম বিনয় ১৭০ খণ্ডে ইংসিং অগ্রবাহ করেন। ইংসিং তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানী-প্রাচীনগুর, মহাপ্রবোধ, তাঁহার কিছু পূর্বকার ও তাঁহার সময়কার বহু বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিতবিরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইংসিং এর দিক পূর্বকার যুগে ভারতে বহু প্রাচীন লোকের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি প্রভাব পরবর্তীকালে একটি বিশেষ লোক-মূল গঠিয়া উঠে। মহাপ্রবোধ এই নৈমিত্তিক আটটি গ্রন্থ লিখেন বলিয়া প্রবাদ। জ্ঞানদাতা, তাঁহার চট্টি গ্রন্থের অগ্রবাহ করেন জ্ঞানদাতার তর্কশাস্ত্র ও আলম্বন-পরীক্ষা। আরও একটি গ্রন্থ ভবেন্দ্র, ‘অগ্রবাহ করেন—জ্ঞানপ্রবোধ; চীনা পণ্ডিতবিরের মতে ‘পঞ্চাশত’ চার রচিয়া; তিব্বতীয়গণের মতে ‘নির্ভুলগ। ইংসিং বিজ্ঞানগণের কতগুলি গ্রন্থ অগ্রবাহ করেন; জ্ঞানদাতার তিনি পুনর্বার অগ্রবাহ করেন। আলম্বনপরীক্ষার এক চীনা লিখেন নাগদার মধ্যপাল; ইংসিং এই চীকার অগ্রবাহ করেন।

ব্রহ্মবুদ্ধ চীকারমতে অঙ্গের গুণি গ্রন্থের অগ্রবাহ ইংসিং করেন। ইংসিং-এর আর চট্টি অগ্রবাহের বিবরণ এখন দেখা গ্রহণ্যম। একটি হটন মাতৃচেতা রচিত একটি গান, অপরটি নাগাজুনের লিখিত একটি পত্র। “মাতৃচেতা” অর্থোৎসাহের অপর একটি নাম এটম্প মনে করা হইত, কিন্তু গুইজেন যে সম্পূর্ণ নিষ্কর ব্যক্তি এ লক্ষ্যে এখন আর কাহারও সম্বন্ধ নাই। মাতৃচেতার মূল সংস্কৃত গালাগুলি চাড়াইয়া গিয়াছে, মহা-এশিয়ায় সম্ভাবিত কোন কোন অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। ইংসিং-এর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতীয় বৌদ্ধবিরের মধ্যে এককালে মাতৃচেতার নাম স্মরণিত ছিল। ইংসিং বলিতেছেন যে, ভারতে পুণ্ডরীকায় সময় গালাবাহ মত

ঐতিহাসিক কথন পুণ্যপাখ্যাত্ত ঐতিহাসিক পুণ্য

পরিভ্রাজকপণ্ড পণ্ডে অল্পকাল আগের পান মাই, পঞ্চমস্তী
বিভিন্ন দেশের অধিবাসীবিশেষ নিকটতম সম্রাটের লাভ
করেন মাই এবং সম্পূর্ণ নৃতন ভাবনাব্যায়ের মধ্যে পড়িয়া
ঐতিহাসিক অনেক অল্পকাল ভোগ করিতে হইয়াছে।”
এই কৃষিকার পর ঐতিহাসিকের প্রথম পণ্ডিতাজকদের
জ্ঞানবাহিনী বিস্তৃত করিয়াছেন ঐতিহাসিকের নামের একটি
তালিকা দিয়াছেন। ইতিহাসের মধ্যে কোথ কোথায়
পরিভ্রাজকপণ্ড আসেন, কোথ আসেন গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।
ইতিহাসের অনেককেই নানাব্যবহারের দিগা কিছুকাল থাকেন।
কাহারও কাহারও পক্ষে চীনা গ্রন্থ কিছু কিছু ছিল। ইংলি
ভারতে আসিয়া নানাব্য ব্যবহারের কোথাকী চীনা গ্রন্থ দেখেন,
ঐতিহাসিক পূর্ববর্তী পরিভ্রাজকপণ্ড পণ্ডিত লেখানে রাখিয়া যান।

ইতিহাসের মধ্যে প্রথম কথনকালের বিবরণ আমরা
এখানে দিবা। তখন চাও ঐতিহাসিকের অন্ততম। The
বিদ্যার Siu chang নামক গ্রন্থের এক সত্যত
পরিবর্তে ইনি কল্পগ্রন্থ করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া
যখন প্রথম হন তখন “প্রকাশমতি” নাম গ্রহণ করেন।
ভারতের পশ্চিম স্থানগুলি দেখিবার লক্ষ্য করিয়া ৬৩৬
খৃষ্টাব্দে তিনি চাও আসেন। তথ্য একটি বিচারে
থাকিয়া সংস্কৃত পিথিতে আদৃত করেন। কিছুকাল পরে
তিব্বতের দেশে তিনি পশ্চিমভিত্তিতে যাত্রা করেন। Siu
(Sogdiana)র নব্য বিদ্যা তুর্কী স্থান লাভ হইয়া তিব্বতে
আসেন ও তথা হইতে কাশ্মীরে আসিয়া পৌছান।
পরিমধ্যে সম্রাটের ঐতিহাসিক প্রাণ বাইবার উপলক্ষ হইয়াছিল।

মালাক্কেয় চারবৎসর অবস্থান করেন। তথাকার রাজ্য
ঐতিহাসিক বহু স্থান প্রদর্শন করিয়া ঐতিহাসিক থাকিবার
লক্ষ্য রাখিয়া করিয়া গিলেন। জেরেনচাও এখানে দুই
ও বিনয় অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ
বৃৎপতি লাভ করেন। ইতিহাস পর তিনি কশ্মীরভিত্তিতে
যাত্রা করিয়া মহাবোধিতে পৌছান। এখানেও চার বৎসর
তিনি অতিবাহিত করেন। এখানে অভিজ্ঞ বিবেচনায়
আদৃত করেন এবং বুদ্ধের কাণ্ড লক্ষ্যে পত্রা ভাবে স্থান
করিতে থাকেন। মহাবোধি হইতে এই চীনাগ্রন্থ
নানাব্য আসেন। এখানে তিনি বৎসর তিনি নানাব্য আসেন

মহামক্কেয় ও মালাক্কেয় পত্রা অবস্থান করেন ও
যোগ লিখা করেন।

তাহার পর পলানকীর চারবর্তী দিগ্ধ বিভাজের যাত্রা
ঐতিহাসিক অত্যন্ত করিয়া গিয়া যান। সেখানে তিনি চীন
বৎসর থাকেন। চীনমধ্যে ইতিহাসের লভ্য যে চীনা
দুই আসিয়াছিলেন তিনি চীনে কিরিয়া গিয়া জেরেন চাওএর
উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেন, যেন চতুর্থে কিরিয়া বাইবার
লক্ষ্য জেরেন চাওএর ডাক আসিল।

লোহোএ ঐতিহাসিক অত্যন্ত সম্রাটের দিগ্ধ সম্পদ
হয়। তাহার পর একমল চীনা তিব্বত পুণ্যপাখ্যাত্ত
সর্বান্তিমস্তি বিনয় সংগ্রহের অধ্যয়ন আবশ্য করিয়া
যেন। কিন্তু এই কাণ্ড সম্পূর্ণ করিবার পুণ্ডিত প্রকার
আগেই ঐতিহাসিক পুণ্যপাখ্যাত্ত ভিত্তিতে যাত্রা করিতে হয়।
প্রাথমিক পোকারতক চীনে গিয়া আসাই ঐতিহাসিক এই যাত্রার
উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রাথমিক ছিলেন উদ্ভিদাবাসী এইতপ
অধ্যয়ন করা হয়। ঐতিহাসিক করিবার বিচার তিনি ছিলেন
পারবর্তী। জেরেনচাও পান্ডা পণ্ডিতের পণ্ডিতের
তিব্বতে আসেন। তথা হইতে উত্তর ভারতের পান্ডা
আসিয়া পৌছান। সেখানে লেখিলেন চীনাভূত পোকারতক
চীনে গিয়া বাইতেছেন। জেরেনচাও তখন কয়েকটি স্থান
খুঁজিয়া কিরিয়া অবশেষে নানাব্য আসিয়া উপস্থিত হন।
এখানে ইংলিএর দিগ্ধ ঐতিহাসিক লাক্কা হয়। ইতিহাস পর
উত্তর পশ্চিম পণ্ডিতা তিনি চীনে কিরিয়া বাইতে প্রকাশ
পান। কিন্তু সেখিলেন তাকিকপণ্ড (আববদেস্তার মূলমন্ত্র)।
সে পণ্ড বহু করিয়া আসেন। তৎপরে তিব্বতের পণ্ডিতা
কিরিতে চোঁ করেন, কিন্তু এখানেও সেখিলেন বাণ্ডে
লক্ষ্য সে পণ্ড বহু। প্রতারণা ঐতিহাসিক মগ্ধে কিরিয়া
বাটতে হইল। সেখানে বাট বৎসর বহুদে তিনি যাত্রা
যান।

১৩৬ খৃষ্টাব্দে Hsuan-Yeh নামক কেরিগাবাসী
জৈনক প্রথম ভারতে আসিয়া নানাব্য বিচারে অবস্থান
করেন। ইংলি পিথিয়াছেন যে, যখন তিনি নিজে নানাব্য
আসেন তখন এই প্রমণের পাইত্রুতী দেখান দেখেন, তাগাতে
চীনা গ্রন্থাবলী ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে প্রতিনির্ণা ছিল।



তথাকার প্রমথপণের নিকট গৃহে ইংলিশ' অবগত হন
 যে Hwang-ah সেই বঙ্গবর্ত মাথা বান ।

সম্ভবম্ নামক মধ্য এশিয়াবাসী এক প্রমথের নাম
 ইংলিশ' করিয়াছেন । Khand-এর অধিবাসী ছিলেন তিনি ।
 Khand চাইল Sogdiana'র চীনা নাম । অল্প বয়সেই মস্তমহ
 পথ ক্ষতিক্রম করিয়া তিনি চীনে আসেন । ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে
 ১১০ পৃষ্ঠাবন্ধের মধ্যে যে চীনাচ্যুত ভারতে আসেন, বাতাবেনে
 সম্ভবম্ তাঁহার লক্ষ্য বান । মধ্যাশিয়া ও বঙ্গদেশের বিষয়ে
 দীর্ঘকাল সত্যবিন সত্যসারি ক্রমাগত তিনি আলো আলোইয়া
 রাখিয়াছিলেন । মধ্যাশিয়া বিষয়ের বাগানে একটি
 মনোহরকণ্ঠের উপর বোধিদর অবলোকিতকথের একটি দৃষ্টি
 তিনি খোদিত করিয়া আসিয়াছিলেন । তাঁহার সমসাময়িক
 কয়েকজন চীনা পরিভ্রাতৃকর সঠিক কিছু কাল পরে তিনি
 চীনে ফিরিয়া বান ।

সেখানে বাণিজ্য করতাল পথেই Kino (কোচিন চীন)
 :কালর চর্চিকের ও মধ্যাশিয়া প্রকোপ দেখা দেয় । তাঁহার
 আলোশে তিনি লেখেন বান । চর্চিকপীড়িত অর্ধমিশ্রক
 প্রতিভা তিনি অল্পকাল করিতে, তাহাযেই চুপে ব্যক্তি
 হইয়া চোখের মল ফেলিতেন । ঐখানে কাল কথিতে
 কলিতেই বাণিজ্য চৌরাসে লাগিয়া তিনি মায়া বান ।

মহাযান প্রদোশ নামক এক প্রমথ সত্ত্বতপণে নিজে
 আসেন । মধ্যযান প্রদোশ নামক হইতে বুঝা যায় যে, ঐ
 নাম তাঁহার প্রকৃত নাম নহ, উপাধিমাাত্র । নিঃশেষে ভক্তপূর
 বিচারে বাইবে পুণ্ডরান সত্যেন । তাহার পর দক্ষিণ ভারতের
 মধ্যাশিয়া অঙ্গুর হইতে হইতে তাম্রলিপিতে আসেন ।
 সেখানে হইতে মধ্যাশিয়া পরিয়া পূর্বাভ্যন্তে (বঙ্গদেশে) আসেন ।
 তাম্রলিপি তখন কেবল বঙ্গর মাত্র ছিল না, কিন্তু শিলা ও
 সভ্যতার এক কেন্দ্র ভূমিও ছিল । কাহিলেন এখানে কয়েক
 বঙ্গর ক্ষতিক্রম করেন । প্রদোশ এখানে ছিলেন বাত্যা
 বঙ্গর । লক্ষ্যে তাহা তিনি উত্তমরূপে আঁতর করেন ।
 এইখানে নিদানশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা তিনি লিখেন ।
 ক্রমশঃ নানান মধ্যাশিয়া ও বৈদ্যলী পর্বতিন করিয়া কুশীনগরে
 আসেন, এইখানে বাত বঙ্গর বঙ্গের পরিচিতিবান বিচারে
 তাঁহার বৃত্তাঃ ৪৪ ।

তাও গিন নামক এক চীনা প্রমথ 'নীলপত' এই বিশ্ণু
 নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । একটি কাহাণী উল্লিখিত তাম্র-
 ময় লক্ষণগুলি তার হইয়া তিনি মধ্যাশিয়াতে (গোম) আসেন ।
 এই লক্ষণগুলি সব পৃষ্ঠাবন্ধে এক চীনা দেবদাসক নিখাদ
 করেন । বাতাবর্তী হইতে কলিঙ্গ আসেন । পথে লক্ষ্যেই
 তিনি সমাদর লাভ করেন । কয়েক বঙ্গর পরে কলিঙ্গ
 হইতে বাত্যা করিয়া তাম্রলিপিতে আসিয়া পৌছান । এখানে
 তিনি বঙ্গর থাকিয়া লক্ষ্যে অধ্যয়ন করেন । লক্ষ্যবাদের
 বিষয়, বোধ্য ও লক্ষ্যেই তত্ত্বও তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন ।
 তৎপরে বঙ্গদেশ ও মধ্যাশিয়া দর্শন করিয়া নালকায় বান ।
 এখানে মধ্যাশিয়ার দ্ব্য ও পাশ্চাত্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন
 এবং অভিজ্ঞতা কোষের তাৎপর্য্য বিবেচনায়ে আগ্রহ করেন ।
 সেখানে হইতে বানদেশে বৃত্তি লাগল আসেন । এখানে
 তিনি এককঙ্গুর কাটান । এইখানে তাওগিন . নুতন
 করিয়া ধানলক্ষণগুলি লক্ষ্য লাভ করেন । এইলক্ষ্যে
 লক্ষ্যেই বঙ্গ হইয়া বিশ্ণুধর্মের পাটক : এই নাম বিদ্যার
 প্রথমলিখিত ১০০,০০০ শ্লোক ছিল বর্ণিত প্রবাদ । ইহার
 অনিশ্চয়ই হাতাইয়া যাক, মধ্যাশিয়াতেই হইয়া নাই । বাগাচু ন
 প্রায় সমগ্র গ্রন্থখানি আলোচনা করিয়াছিলেন । নন্দ নামক
 বাগাচু'র এক শিষ্য এই দ্ব্য গুলির সুকীর্ষ
 আঁতর করিতে পারিয়াছিলেন । বিখ্যাত নৈমিত্তিক বিজ্ঞ-
 নাগ ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন । ইহার পর আর
 বিশেষ কেহ এ লক্ষ্যে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনা
 যায় না । সেই ভজই তাওগিন এবিষয়ে অঙ্গলক্ষ্য করেন ।
 ইংলিশ' বঙ্গর নালকায় ছিলেন তখন ইহার মূলমন্ত্রগুলি
 আলোচনা করেন ; কিন্তু এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানিতভাবে কোথাও
 তিনি বলেন নাই । হতভাগ বিজ্ঞাধর পুটক লক্ষ্যে
 বিশেষ কিছু মায়া জানিতে পারি নাই । বাতবিজ্ঞা ও
 মধ্যাশিয়া বিজ্ঞা বিবরণ এই গ্রন্থেই প্রথম । বাগাচু'র
 মধ্যাশিয়া বিজ্ঞা আলোচনা করিয়াছিলেন ইহা মায়া জানি ।
 উক্তর ভারতে কিছুকাল অবতান করিয়া তাওগিন
 কাপ্তানে বান ; সেখানে হইতে বান উভাঙ্কেন । তাহা
 হইতে তিনি কলিঙ্গ বান । তাহার পর তাঁহার লক্ষ্য
 আর ইংলিশ' বর্ণিত পারেন না ।

কর্ষকর্ষনের সময় সে চীনাভূত আসেন Che-hung
হইলেন তাঁহার ভাগিনেয়। ইনি সমুদ্রপথ দিয়া ভারতে
আসেন; এবং বিখ্যাত স্থানগুলি সমস্ত পরিদর্শন করেন।
মধ্যযুগে তিনি ভবনগর গায়েন; সমস্ত সার্বভৌম
অভিধর্ম, কোষ, গ্রাম—এই সকল তিনি এখানে অধ্যয়ন
করেন। নানান্য মহাশয়ন হুস্তসমূহ আলোচনা করেন।
উত্তর ভারতের Sin-Che বিহারে চীনদেশে অধ্যয়ন
করেন। ইংলি: যখন তাঁহার জীবনী লিখেন, তখন
তিনি কান্দারে।

Che-hung-এর সহিত Wu-hing নামক অপর এক
প্রমথ ব্যক্তি করিয়াছিলেন। ঐবিধেরে আসিয়া তিনি তৎকাল
রাজার আশ্রয়ে করিয়া পনের দিন পরে যাত্রা করেন,
তথা হইতে আরও পনের দিনে আসেন Kiechatch। Kiecha
হইল য়ুনার উত্তর পশ্চিম অংশ Atchen এইরূপ
অর্থমান। পশ্চিম পতাকাতে এগুনটি ছিল হিন্দু সভ্যতার
একটি কেন্দ্রভূমি। সেখানে ঐতকাল কাটাইয়া পরে
এক মাঠকে যিশ দিন ধরিয়া পশ্চিমভাগে চলিয়া যান।

পশ্চিম আসিয়া পৌছান। এখানে হইতে চট্টগ্রামে যাত্রা
করেন। সমুদ্রপথ দিয়া আসিয়া অপর একটী
ভাগ্যকে করিয়া তিনি একমাস উত্তরপশ্চিমভাগে চলেন।
একমাস পরে জম্বুদ্বীপের পূর্বদিকায় আসিয়াকালে আসিয়া
পৌছান। এখানে তিনি এক বন্দর থাকেন। ইহার পর
Wu-hing ও Che-hung একত্রে ভ্রমণ করেন। তাঁহাদের
একত্রে মহাযাত্রা ও নলেয়ার যান। Wu-hing
যোগাচারভূমি অধ্যয়ন করেন ও কৌশলের ব্যাপার
করেন। তাঁহার পর তিনমাসকি যাত্রা করেন।
হিন্দুদেশের জ্ঞান আলোচনা করেন।

আরও কয়েকটি প্রমথ সমুদ্র পথ দিয়া ভারতে আসেন।
কেষ্ট কেষ্ট ভারতে আসিতে না পারিলেও ইন্দো-চীন পদ্য
আসেন। ইংলিশের কাহারও কাহারও সহিত ইংলিশের
ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ হয়। এই সকল প্রমথের সাংকল্প ভাবনা
হইতে বোধ্য যায যে জহেনসাতের ভারত প্রদেশের পর ১৪৫৩
চীন ও ভারতের মধ্যে কি নিবিড় একটী সংকল্প স্থাপিত হইয়া
গিয়াছিল।



বোকা-পড়া

—গল্প—

—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত—

নন্দ ডোমের স্ত্রী মেনকা সপ্তমী একদিন নিশ্চিতি রাতে অশ্রুচিত হইল।

নন্দ বামা-কুলা ব্রাহ্মণ, এবং ঘরের মাটে সে সকল বিক্রয় করিয়া খেয়ে খেনে নেয়ে বাঁড়া করিত। তাহার দেহ বেশ মজবুতই ছিল। খাটুনির মত সে ভয় করিত না। বেত, বাণ আর দা তড়ি লইয়াই সে বিবাতাক্ত পড়িয়া থাকিত। কাজেই মসাগরে অশঙ্কলতা ছিল না। মেনকা বলিত, “কানের ভাষাচুরো মূলকলপ্তো রহচে, বেনে ভোকে একটু তোড়মোড় ক’রে দাও না?” নন্দ বলিত—“কোড়া-তাণি দিয়ে ভোকে পড়াব কেন রে? দুতন কুম্ভা, পড়তে দিটনি বৃষ্টি ভেংগেছন্? খুটা দিন সবুর কর—এসে পড়ল ত!” এইরূপে ঠেঙে তাণি, কুম্ভা, মল—এই সকল জলদ্বারে একে একে সে মেনকার পা হাত পা ছাইয়া ফেলিত। এ সকল করিয়াও তাহার হাতে ত’পরদা জমিতেনি। লোকে বলিত—“নন্দ একলা মাহুর হ’লে কি কন—কাত ক’রে খেন চার কোড়া হাতে!”

নন্দ মাটে বাইবে। মেনকা তোর ত্রায়ে উঠিয়া হাঁড়িয়া বাড়িয়া বর করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিত। আবার ফিবিয়া আশিলে এমন এক টুকরা হাসি কিম্বা দিয়া তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িত যে, নন্দর সেখো মার স্মৃতি থাকিত না। সে তখন-তখন চুপড়ি জ্বীতে লিচু, পেঁতাংরা আনারস বা এই রকমের কিছু ফলসকল গায়ত্রী বাহির করিয়া দিয়া ক্ষুদিত বেয়ে মেনকার হাসিটুকুর সঙ্গে বিনিময় করিত। তারপর দোরভির তলব পড়িত। সে আসিয়া জুটলে আমন দাপ্রিতে পিতামাতার মূখ ত’খানা উজ্জল হইয়া প্রানটুকু অসুত-স্পর্শে মাঝিত হইয়া বাইত। মেনকাকে বুঝিয়া দেখিতে এইটুকুই নন্দর হাতে ছিল।

এইরূপে যুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিতেনি। ঠাণ্ডা একদিন একটা হাড়সলীষ গুবক আসিয়া নন্দর কাছে আগ্রহপ্রার্থী হইল; এবং চোখের চুখু নিবিড় জটিনিতে মেনকার জীবন বস্তুবিভোর করিয়া পাড়াইল।

নন্দর ঘরের সুস্মরিত দাল এবং টাটকা মাছের সোল বাইয়া বখন তাহার সেখটি মেঝে-মাংসে পুড়িয়া উঠিল, তখন নন্দর আনন্দ দেখে কে? মেনকাকে ডাকিয়া সে বলিল, “বেশলি যেনি, এমন মজা কন্য বোবে বোরে জুটো জাভের পেতামাশী হ’রে ক্ষইরে ফেল্ছিল। আর তুটি মালি যদি গুর মস্কে শোকামাকড় না ঢোকে—আমার মতের অপিকে রেবে অমনি ধারা খেটে ভাল—নন্দর হেঁদেল চেটে বার—লোকেব এ জিহেব বড়াই আমি বুড়ির দেব। একটুকরো জমী কিন্তে পাড়কুড়ি টাক।—আর বর একখান; কুড়ি টুই টাকা হ’লে হ’রে বাবে।”

কিন্তু এই লাভের বস্ততে ইহাও লোভ জড়িল না। লোভ জড়িল নন্দর ইচ্ছাতের উপরে। মেনকার চিত্ত ইতিপূর্বেই সে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অকপেবে একদিন মসাগট বেমনার তরিয়া দিয়া মেনকাকে লইয়া সে উবাও হইল। নন্দ ‘তা’ ‘ছতাপ’ করিল না মতা, কিন্তু মানিতে তাহার রক্তমাখপুত্র পাণ্ডে ওঁর ত’খানার সকল কলরবই খেন খামিডা দেল।

দোরভির তখন বয়স হইগাছে। সে-ও বুক চাপড়াইল না। কিন্তু শুধু ঘরে নয়—পথে ঘাটেও যে লজ্জা সে ছড়াইয়া গেছে তাহারই কুটার পিতামাতা উত্তবেই খেন তজ্জামর হইয়া রছিল।

পরীর মত রূপ লইয়া নন্দর মেয়ে দোরভি পাজার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছে যেখিয়া প্রতিবাসী নারীমহল পতিসুখ্যবির করণে একটা পড়ার সাক্ষা পড়িয়া গিয়াছিল। কি জানি এই রাকসীটার সুনন্দরে কেত কোনদিন পড়িয়া যায়!

ছোটলোকের মেয়ে হইলে কি হয়—মেয়েটি দেখাপড়া শিখাচ্ছে। ঐ-ছাঁও আছে। সে যে চেলেদের দুষ্ট আকর্ষণ ছবিবে বিভিন্ন কি !

হৃদয়-পরিধি কভাবতী কিছু বেশী জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কুমুদ প্রতিদিন রাগার উপর ছিগ লইয়া মাছ খরিত বসে। শৌরভি যাতে না আসা পণ্য মাছ-খরার তাহার অল্প মনোযোগ দেখা যায়। আসিয়া খাট সাহিয়া চলিয়া গেলে মাছা পিঠে হঠাৎ খিল খরিয়া উঠে। চারপাশ এককালে কুণবাপ করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া কুমুদ মনে সে বাড়ী কিতো। ইহাও কভাবতীর চক্ষু এড়ার নাই। শৌরভির দৃষ্টিতে ইহা সমাজেই পড়িয়াছিল। একদিন সে বলিয়াছিল, “কান্দার দিকে চোখ না রাখলে মাছ পাণিরে যাবে বাবু।”

কুমুদ কুণবাপ। তাবিল,—মাছের চোখের চেয়ে চোখের চাইই দেখি বেশী কাজ করিয়াছে। সে বলিল, “শিকার করা উদ্ভট ত শৌরভি? সে যা’ হোক একটা কিছু হলেই হ’ল।”

শৌরভির চোখবুখ লগা রাঙা হইয়া উঠিল। কিছু সে আপনাকে লম্বুত করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“শিকারের অর্থটা ত খুবলসি না বাবু! বিয়ে করবেন না কি আমাকে?”

কুমুদ কুণবাপ।—প্রাকারি। একটা কি রসিকতার উত্তর দিতে যায়। জিজ্ঞাসি কিছু তাহার কড়াইয়া গেল। শৌরভি বলিল, “তোমার মেয়ে—খাট যাবে। ঘর ছাডেন ত আপনাদের ত একটা পৌত্র আছে—তারই এক পৌত্র নিয়ে ঘরে রাখবেন হরত। না হর, হৃদয়-পরিধি মাছ, পণ্য আছে—ভর নেই—বাপানের এক কোনে একখানা মোচালা তুলেও দেখানে রাখতে পারেন। এর কোনটা করবেন বলুন ত?”

কুমুদ আকাইয়া দেখিল, শৌরভির চোখ বিয়া অধিবর্ণ হইতেছে। সে কিছু ঘমির গেল। তাহাতে শৌরভির প্রশ্নগুলি—নিরন্তর করিবারই প্রশ্ন। কাগেই সে চুপ্ করিয়া রহিল।

শৌরভি শাড়ের চারিটা দিক একবার দেখিয়া গেল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার সুখিবে মত এর যে

কোন একটা পথ আপনি মনবেন। এ পথ সস্তা কথা। কিন্তু নিজের মস্তের মেয়েদের মধ্যে এই রকমের কিছু দেখতে কি আপনি পছন্দ করেন? না—তোমার মেয়ের আর মর্যাদা কি!”

এই বলিয়া আর বিলম্বমান না করিয়া জলন্ত চোখে আঙনের হলুতা বিকিরিত করিতে করিতে কুমুদকে ঘেন সেইখানে মুক্তিভাঙ্গুণের নাচে সমাহিত করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

শৌরভিকে লাদারণ কথার বলিতে গেল—চোট-কাটা মেয়ে। তাহার মস্তের বাহা লতা হইয়া পুঠিয়া উঠে তাহাকে বাবাইয়া রাখিয়া সৌভাগ্য প্রকাশ করা তাহার স্বভাব নয়। ক্রোধের সঙ্গে ভর মিশাইয়া চলিতে কোনদিন সে শিখে নাই। মোট কথা, রাখিয়া ঢাকিয়া লম্বু করিয়া চলিবার মেয়েই সে নয়।

কুমুদ কিছু ছিগ লইয়া মাঝার আসিয়া মাছ খরিতে বলিতেছে, এবং কুমুদ চাইনিতে মেয়েটির দেখের সমস্ত দোষেরা লেগন করিয়া গাইতেছে। লগারের পক্ষিম্বানের উপর গরু নাই—পানন নাই—কাতের তাঁহাদের বগেজা-চারিতা নিফটক। এ ঘেন তাহাদের সম্প্রদায়গত অবনন অধিকার হইয়া হাজাইয়াছে।

শৌরভি পারত পক্ষে যাতে আসে না। বখন আপে কুমুদকে দেখিতে শায়। এবং সে সময়ে কুমুদ চক্ষু গোলাকের ঘাটা কত কি পুনরাবৃত্তি করে।

কিন্তু ঘেনন বখন যাটের শাড়ি এক চটি বৌ-বির মধ্যে চমিদার-দিল্লী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা যা এখন কোথায় রাখব করছে রে শৌরভি?” তখন নিজের কাঁড়ের উপর মেয়েদের এই বৃত্ত ভাগবাগার আশাপ পাইয়া শৌরভি কল্কাল বিষয়ে এমন অবাগ হইয়া চাটগা রহিল যে, হাস-প্রশয়ের চারিদিককার বায়ুটুকু পণ্ডিত ঘেন তাহার কাছে বিবাক হইয়া উঠিয়াছে। একশ আঘাত অনেক সময় অনেক করিতেন। কিন্তু আজ তাঁহার মনে হইল, তাহার এই দীর্ঘ কুমারীকাল লইয়া যতদিন এই গ্রামে বসিয়া সে দিন গর্ভবেততদিন তাহাকে জীবাবধি স্বরিতে হইবে। সে তৎপর হইয়া উত্তর করিল, “সে ত আমার বাইরে চলে



গেছে তাঁকুর মা! প্রায় ত অমেকে ঘরে ব'সেও করে।

ক'র চিপাবটা আগে রাখলে উপকার বেশি হয়।"

স্বল্প কথার সৌরভি যেন সকলকে অভিভূত করিয়া গেল। কামদেব-গৃহিণী চাচিয়া দেখিলেন, আপ-শাপের মেয়েরা সকলেই এই চুড় মেয়েটির লাস দেখিয়া মুগ্ধিত হইয়া গেছে। কিন্তু সকলকারই চোকের অন্তর রশ্মি যেন ভিন্নভাবেই আকারে ইহার সমস্ত মেয়ের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি আহত হইয়া গর্ভিণী উঠিলেন। বলিলেন, "ছুড়ীর লাস দেখ! বড় সে চাস্টেসে কথা শিখেছিল?" এই বলিয়া তিনি ক্রোধের কতকটা চোখ দিয়া ছাড়াইয়া নিজকে সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "নম্র বৃদ্ধি চোখ পড়ে না তোমার উপর? বসলক ত সাহ শব্দই নেই। কতকাল মার ঘরে পুবে রাখবে তোকে? তোদের কেতেরও বলিগারি বাছ! শেবটা মার মত কুলে কালি দিবি না কি? না—ভিটে আগলে ব'সে ব'সে পাড়ার কচি ছেলেকুলোর মাথা চিবিয়ে থাকি?"

তল্লী বপুরা নিজ নিজ স্বামী-সেবতার আশ্রয় বলিয়া উঠিলেন, "এ আশ্রয় একুনি গা-ছাড়া কখন তাপনি। বর ত'ওর হাতা-ঘাটে গড়াপিড়ি থাকে।"

এ প্রস্তর ভাবব সৌরভি লস্সা দিতে পারিল না। ছেলেকে এই বাটের পাড়েই তাহার উপর নম্র দিতে দেখিয়া কদাবতা মনে মনে বিরক্ত হইতেন সে ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতোছে। কিন্তু ছেলেকে দাসন না তরিয়া মেয়ে হইয়া অপর মেয়েকে অথবা আঘাত করিয়া মেয়েদের ক্ষম যে ইলার। মুগ্ধ করিলেন—জাফা যেন তাঁহার চোখেই পড়িল না। যে থালাখানা তু'ব বাড়ির দ্বারা সে ঘসিতোছিল, তাহার উপর তাঁতের চকুগুণ জোর দিয়া ঘসিতে ঘসিতে বাড়ী নীচ করিয়া সে বলিতে পারিল, "ছাড়াইয়া পুনির চেয়ে গাভের জোর যদি বেশি হয়—চিবিয়ে খাব না ত কি?"

এই বলিয়া বশাস্ বশাস্ করিয়া থালা ক'বানা কলের উপর আছড়াইয়া একত্র করিয়া জোর পরে সে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত পড়াই এই অল্পশোচনায় তাহাকে বিসিতোছিল যে এই ছত্র-ভাবিনীর ছেলেকির আচরণ বয়িয়া মারও কত কথা শুনাইয়া আসিতে যেন বলিয়া গেছে।

নন্দ তখন নিড়েন দ্বারা একটা কুমড়াগাছের পোড়া পরিষ্কার করিতেছিল। সৌরভি লাগেয়ার উপর বাগনের কীকাটা তদাং করিয়া কেলিয়া রাখিয়া পিতার নিকটে আসিয়া বলিল, "অত মেননত কচ্ছ, ঐ গাছের ফল খাবে নাকি তুমি? তার চেয়ে ভগাভগো কেটে দাও, চোকড়ি হেঁদে দি।"

মেয়ের বিকে বিষয়ে তাকাইয়া নন্দ তাঁহার অভিজ্ঞায় বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছটির বৃদ্ধির কামনার কালও ইহার পোড়ার ফল ফল ফল ঢালিতে বাহার আগ্রহের অবধি ছিল না, যাহি প্রত্যন্ত না হইতেই সে কেন তাহার ভগাভগির মাথা লইবার তাগিদ দিতেছে ত্রিক ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, "গাছের দাত ত বেশ ভালই আছে। ফল যথেষ্ট না, কে বললে তোকে?"

সৌরভি বলিল, "ফল আর খেয়েছ তুমি। সমস্ত অশ্বখরের বোখটা ত তোমার মার আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল সে। চল, বদ ফলদে গিয়ে এস করি। আমার আর এ ক্ষম হয় না।"

হাতের নিড়েনটা কেলিয়া রাখিয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ তাকিয়া লইয়া সে বলিল, "অশ্বখ যে কিন্নলে সে ত ঘরে নেই। তোম বোকা ভাবি হ'ল কিসে? অশ্বখের কাণি তোকে ঘেরে পৌছয় কি ক'রে?"

"কি জানি, কি ক'রে পৌছয় বাবা।"

এই বলিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। জালার চকু গুটি বিয়া ফল পড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

নন্দ চোখ রাখাইয়া মেয়ের বিকে তাকাইয়া বহিল। কিন্তু মেনকার শোকটা এ সময় তাহার মনেই অধো আশাগোড়া ভোলশাড় করিয়া উঠিতে লাগিল। মেয়েটিও চোখের অঙ্গের উল্ল-বুধ সেই-ই যে ভাল করিয়া হাতকাইয়া গুঁমিয়া পাইত। তাহাকে বুলিল সে কিসের জোরে? নিড়েনটা সেইখানেই কেলিয়া রাখিয়া পুনিরুতে সে হাতজার উপর আসিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "ঘেবটার মত

পরগণাও যে শস্ত—যেন এ দেহাক আমার ছিল। সে ত মিথ্যা হয়ে গেল। হরের আদ্যাত তুই বলি মুখ তারি ক'রে বড় ক'রে তুলিবি, আমি পাড়াই কোনখানে ?”

সৌরভি কোন কথা বলিল না। হরের মধ্যে উঠিয়া গেল। হরের তালুতে কিছু নারিকেলের টেল চালিয়া লইয়া মাথার ঘসিতে ঘসিতে পুনর্বার সে বাহির হইয়া আসিল। এবং আদিসার উপর যে আলো তলল ছিল, তাহা হইতে মল নড়াইয়া লইয়া বসি হই তল মাথার চালিয়া সে বস্তু ত্যাগ করিতে লাগিল।

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “খাটে গেলিনে ?”

সৌরভি সাক্ষেপে উত্তর করিল, “খাটের পাড়ে কাটা পড়েছে যে ?”

এই বলিয়া চুলের ডগায় একটা গ্রন্থি বাঁধিয়া—চাকার পুনর্বার মত যে চটা চাকা ছিল হাতে শায়ে তাগাই মড় মড় গলে সে ভাবিতে লাগিল।

নন্দ কিছু বিমিত্ত কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, “বুড়ি চড়ি হারালি নাকি তুই ? ওগুলো ঘিমে চাকার ঘূমক যে ?”

সৌরভি আলম মনে কাঁক করিয়া বাইতে লাগিল। বলিল, “এখন চুলের ত দি। চাকার ঘোনার সময় হবে না।” আব চাপ টিড়ের মত পুটলি বেঁধে সঙ্গে নিয়েও বাগড়া ধাবে না।”

নন্দ ব্রহ্ম হইয়া বঁসিয়া তাবিতে লাগিল। মেয়েটির এই অচিন্তিত আচরণ তি বেশ একটা গুসেব লাগল। ও অশ্রমের গানি অঙ্গুলি স্বেতে দেখাইয়া দিতেছে। একটা কৃষ্ণ আখাতের পতায় তা নিঃসংশয়ে অগ্রস্ত করিয়া বকমাংস সে লতায় উড়ির হইয়া উঠিল। সৌরভি তখন ঘরে ঢুকিয়া উঠন প্রয়াসেছে। নন্দ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া—কথাট বহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোকে কি কেউ কিছু বলেছে সৌরভি ?”

সৌরভি তখন আশনাকে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে আনকটা সতর্ক করিয়া কোঁদাচ্ছে। শিতাতেও সে জালিত। তাই এ সময় বাড়াইতে সে আর ইচ্ছুক হইল না। কড়ার বানিকটা তেল চালিয়া তরকারি পত্র

মাকো চাকার খাগা ‘হুগাকু’ ‘হুগাকু’ পদের মধ্যে আলোচনাটা তলাইয়া দিতে সে চোটা করিল। শুকু বলিল, “রাগোটা বেশ হ’তে লাগে বাবা! এখনও কিছুমান্ন শুছিরে নিতে পারিলি।”

নন্দ বুঝিল, ইহার অর্থিক কিছু ইহার কাছে মিলিবে না। কিছুক্ষণ ঘোঁন হইয়া সেখানে পাড়াইয়া থাকিবার পর বাঁধের লাঠিবান। হরের আড়াই হইতে সে টানিয়া লইল। বলিল, “তোর বাবা পরাব, আর তেতে ছোট—তাই ঠাণ্ড করছি।” বুঝি বড় লোকের ভবে তোর অশ্রমটাও আমার কাছে ছোট ? পাড়া, একবার পুঙ্ক বাটটা বুঝে আসি।”

এই বলিয়া নন্দ স্তম্ভগতি বাঁচিয়া হইয়া গেল। সৌরভি রাসা কোথা বাহিরে ছুটয়া আসিল, এবং চাকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। নন্দ সে কথার কর্ণশ্রবণ করিল না। সৌরভির বুকের মধ্যে চিল্ চিল্ করিতে লাগিল।

নন্দ খাটে আসিয়া দেখিল, খাটটি শূন্য—লোকজন নাই। সে একবার খাটটা ঘুরিয়া আসিল। হজ্জ—কড়ার এই মোড়াকের ঘি কিছু চেঁচু ঘরিতে পায়। গার। সে একে শরীরাধী লোক, তাহাতে বলিও প্রচুর, লোকে তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। গারের অনেকেরই সঙ্গে দেখা হইল, কিন্তু কাগারও ঘূমে কোন কিছুই আসিল সে পাইল না।

বাড়ী করিয়া দেখিল, সৌরভির গায়া হইয়া সিঁদাছে, তিনি পত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতেছে। করিয়া আসা পরাণ্ডও অশেষ করিয়া খাচ্চা চলে নাই। কোঁকের মাথার যে ইঁদিত সে তখন করিল, তাহার ভিতর এতটা দুফতাই ছিল। সৌরভির একান্ত পরিচিত অচল আচরণের কথা ভাবিয়া নন্দর মনে তখন এই আতঙ্ক উঠিতে লাগিল যে, এই বাবা-চালার পর ইহাকে ধামাইয়া দিতে কোন হিতোপদেশই কাজে লাগিবে না। কিছু পরে খাটোতে জিনিষপত্র উঠিয়া গেলে সে যে কোন্ অজ্ঞাত স্থান নির্দেশ করিয়া পাড়া হাঁকাইতে অসুখতি করিবে এই আশঙ্কায় নন্দ যেমন তলল হইল, সব ছাড়িবার সাক্ষরে মেয়েটি লখন যে এখন দুঃ হইয়া উঠিল সে এতটাও



ভেননি মনের মধ্যে বাব বাব খজা বিয়া ডাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। সে আর উঠিয়া সেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে আসন পাড়িয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, “কে তোকে কি বলেছে না বল্লে ত এক পাও মড়ত পারিনে আমি। কারেত বাহুন চোকে আর ভদ্রমণ্ডার লোকই চোকে, নামটা চুই বলে’ যে, তার মাংস চিরে নুন বসিয়ে দিয়ে আমি নড়ি।”

সৌরভিও হাতের কান বন্ধ হইল না। একটা ছানার ভিতর হাতা বেঁকি, ছাঁকা কলিকা, পানের সজ্জা, তেলের বোতল, দড়াকড়ি কত কি পুরিতে পুরিতে সে বলিল, “মনের মধ্যে রাত্রির দিন লড়াই করুছ তুমি—আবার মাহুয়ের মধ্যে লড়াই? একটু হুপ পাতি খোঁজা যে তার ছেঁচে চের ভাল।”

নন্দ আর কোর কণা না বলিয়া সেইখানে বসিয়া বলিয়া সৌরভির কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল। সৌরভি ছাঁকা কলিকাতা আবার টানিয়া ব্যক্তির করিয়া তামাক সাজিয়া পিতার দস্ত দিল। তখনকার কাল চমার মত কলার পাতা কাটিয়া রাঁধিয়া বানান কোনমতলি মাজিয়া বসিয়া সে পরিবার করিয়া রাঁধিয়াছিল। সেগুলি সেই বস্তার মধ্যে পুঁরয়া ফেলিল। তোরগটি ইতিপূর্বেই সাজান হইয়া গিয়াছিল।

ভিটার সঙ্গে যেহেটি এই যে সর্বপ্রকার দাবী উঠাইয়া গইতেছে ইহাতে সত্য সত্যই নন্দ একটা নিশ্বাস ছাড়িল। সে বলিল, “কিন্তু কোথায় দাবি দেবে দৈবেদিস্ ত?”

সৌরভি বলিল, “শিসিমার বাড়ী ছিল—তোমার বোনেরও বাড়ী ঘর ছিল, সে ত ঘাব না। সে গেলে তাব্বার সময় অনেকটা পাপস্ত; এ আর সে ঘালাই নেই। বেয়ে দেয়ে গাড়ী একখানা তুমি ডেকে আন, কোলাবেলি দতটা পারি এগিয়ে নিই।”

নন্দ বলিল, “কোথায় দিয়ে বাসুনি তুই, যে গাড়ী চালাবে সে ত জানতে চাইবে। তা’কে কি বলে’ কাজে লাগাবি?”

সৌরভি বলিল, “মত ভাঙতে গেলে এখানে ব’সে ব’সে লোকের কাঁটা লাগি বেতে হবে। গাড়ী তুমি আন,

চুক্তি পত্তর যা’ করতে হয় আমি করব—তোমার তাবনা নেই।” এই বলিয়া সে ধামিল। তারপর বলিল, “কিন্তু সব চেয়ে ভাল ছিল ছ’জন্যর মাথার চুটি পুঁটলি ছাড়া ব্যক্তি সব পুড়িয়ে ফুড়িয়ে যাওয়া।”

নন্দ কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল,—“তোরগটা একবার লুপ্‌বি যা?”

সৌরভি তাগাটা পুলিয়া দিল। মেনকার যে লকল পোষাকী কাপড় মাঝা পাটে পাটে গোছান ছিল, নন্দ সে লকল টানিয়া বাহির করিল, এবং এক জাহগার গুণাকার করিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

সৌরভি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—“গতি সতি এক করলে বাবা?”

নন্দ বলিল,—“এ ভালই হ’ল সৌরভি। এ সব তুই পরদিনে সে আমি আনি। আল্লা যদি চলি—বোতা তামি করিস্ কেনে?”

মাঘের এই লকল পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সহ্যইয়া তুলিতে তাহারও মনে কণা হইতেছিল। যে লকল বাহলা জিনিসপত্র সে ইতিপূর্বে গুছাইয়া লইয়াছিল, এখন তাহারও টানিয়া বাহির করিয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল, বিচানা ও জিনিস-পত্তর একটা আর তাগা-বন্ধ করিয়া রাখিল।

নন্দ কিছু মারিয়া বসিয়া রছিল। পরে চারিদিকে চক্ষু স্ক্রাংগে স্ক্রাইতে সে বলিল, “কুমড়ার ডগাগুলো রেঁবে বিলুনি ভালই করেছিস্। ওখ বিচিগুলো তোর হাতের গোতাও না—আমার হাতেরও না।”

সৌরভি বুলিল, পিতার অন্তরের নিবিড় বাধা বাধা একধিনে তথু অতুভব করিবার ছিল, এমন যেন তাহা রূপ ধরিয়া গরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

নন্দ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। বলিল, “মনের কোলা ভিটে ছাড়বার উৎসব করল, তাতে যত লজ্জা না—লোকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে পরাপটা নাহেহাল হবে—আর লজ্জার ম’রে ঘাব। রেতের কোলা সেলে হয় না।”

সৌরভি বলিল, “তাই বাব।”

দৌরভি দেখিল, লংগরে তখনও কিছু জলের প্রয়োজন আছে। কলস ক'টি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, এক ক'টিও জলও নাই। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সে জল আনিতে চলিল। কিছু ঘাটের দিক্‌টির উপর পা দিতেই সে বম্‌কাইয়া বাঁড়াইয়া পেল। দেখিল, কঙ্কাবতী জলে কটিলে পর্বাত চুবাইয়া পাত্র সাজ্জনা করিতেছেন। সে আর তথায় না নামিয়া আখাটার কলস চুবাইয়া জল পুরিতে লাগিল। কলসের বক্‌ বক্‌ শব্দে কঙ্কাবতী বিজ্ঞান্য করিলেন, “কে রে?”

অত্যাশ্চর্যের সহিত সে উত্তর করিল, “আমি দৌরভি।”

“ক্রেতের বেলা ঘাটে এলি যে? দিনে সমস্ত পান্থনে? এই ভপ্‌ভপে বয়েল—গঞ্জি মাগল তোর বাপের। একবার যা খেয়েও ছাঁল চর না? দাঁক-দেখে চাওয়া যেতে হলেগুলো দিক্‌টির উপর এসে বসে, দেখতে ভাল লাগে বুঝি?”

দৌরভি উত্তর করিল: বলিল, “আমার শিছু এমন ক’রে লাগলেন, কিছু কি করেছি আমি আপনাদের? বংশ ত আমার হাতে নয় যে, ত্রৈলোক্যে ছোট ক’রে রাখব? আমার দেখতে ভাল লাগে কি বাবা ঘাটে এসে বসে ত্র্যদের লাগে, বিভাগ ক’রে দেখতে পাতেন।

কঙ্কাবতী চট্‌টা গেলেন। লঙ্কায়ে বলিলেন, “বুকের উপর তেঁটি কাটিল—আঃ! মলো! লাক্ষ্মী দেখ। তু’ যদি সত্যি মাথের মেয়ে হুতিস!”

দৌরভি পা মালা করিয়া উঠিল। বলিল, “অদস্তার মেয়ে কিনা আপনি ভাল জানেন না। কিছু আপনাদের পাড়াতেই আমি বাস করি। এটা ভাল জানেন যে, আমার লংগরে পোড়ার কোন কালি নেই। অত্যাশ্চর্য যে বাবা আমাকে আর আমার বাবাকে আপনাবা দিলেন, এর চেয়ে বড় শাপ লংগরে আর কিছু নেই।”

এই বলিয়া সে আর উত্তরের অংশজনা করিয়া ক্রত পথে চলিয়া গেল। গৃহ-ত্যাগের বিধি-বাবা সে যে

পূর্ণক্ষণে দারিদ্র্য কেলিতে পারিয়াছে ইত্যাদি সে মনে মনে আরাম বোধ করিতে লাগিল।

বাকী মায়া: বাবা কালগুলি সে দারিদ্র্য স্তুতিয়া লইল। অথচ যে বাওয়া মাওয়া শেখ করিয়া ফেলিয়া বলিল, “এইবার গুট বাবা!”

দৌরভি লেখাপড়া জানে—তার ভিতরে বুঝি আছে, শক্তি আছে, বিচার আছে, এ কথা নন্দ বিশ্বাস করিত। মেয়ের দৌরভি সে করিত—তাঁহাকে ভালও বাসিত। সে যখন ‘বো’ বকিয়াছে তখন গৃহত্যাগ তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু যে যে ছাত্র সমস্ত সুখ ও স্বার্থ বৈজ্ঞান্য কেন বিশুদ্ধ দিতে বলিল—এ সম্বন্ধে গীতন বন্দন করা চলত। বাপের কাঁকাটা তেল দিয়া অশ্রু:র মত সে সেখানে এলাইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, “যদি ছাত্রের শাস্ত্রে আমিও বেঁচে থাকি। কিন্তু এ নাগোত ত কথা পাড়িল নি—ঘাটে যাবার বেলাও কিছু বলিলনি—বৎ তাদি পুণিতেই গেলি। পা-টা এখনও কিছু আমি আনিবে দিবে যেতে পারি।”

দৌরভির কাছে কোন উত্তর না পাইয়া সে বলিল, “তার ভবিষ্যৎটা আর ছ’দিন বৎ বসে চাওতেও ত মিলিলে।”

দৌরভি বলিল, “এখানে বসে চাকতে লোকে ছুরদং দেবে না। জুড়ি উঠে এসে বাবা!”

দৌরভি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে নন্দ দেখিত। কিন্তু তাহাকে পদের খরে দিতে হইবে মনে হইলেই এগোটা চাও করিয়া উঠিত। ছ’এক মাহগার সম্বন্ধ করিতে বাইয়া লামনা লামনি কিছু না শুনিতেও তাহার কানে বাজা পড়িয়াছে তাহার ভাবগত কল্পনারও অঙ্গনা। তাই বিবরণী আর কেবলই অঙ্গলার চর নাই।

বাবা চটক নন্দ উঠিয়া ছাড়িয়া গেল। বলিল, “কিন্তু একটা বৎ ত মিটল না বা! এখনও ক’তোর গারে কেউ খাঁচড় কেটেছে কিনা? বাবা মাগে বেক্‌টা তার টুকুহো টুকুহো ক’রে রেখে বাই!”

স্বকণে বাবা মাড়: দিয়া দৌরভি বলিল, “সে মায়া কাক জেই বাবা, সে সব কিছু নয়। কিন্তু এ বাড়ীটা দুখে পড়ে—এখানে বাস করলে মরণ হবে না।”



নল বাড়ীখানা একবার পদক্ষিপ করিয়া আসিল। তারপর বাসনের কাঁকাটা মাঝার তুলিয়া লইয়া বলিল, “জোরকটা নিতে জোর কতে হবে না?”

সৌরভি বলিল, “না ও ভালুক আছে।”

তারপর পিতাপুত্র নিঃশব্দ ভ্রতপদ-সঙ্করে গভীর মন্ডকায়ে ঘিনিয়া গেল।

আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। বগু বগু মেঘে কখনও ঢাকিতেছে—কখনও ছাড়িয়া দিতেছে। নানাতর তিস্রাতরে কিং হইয়া, কখন বলিয়া—কখন চলিয়া—সমস্ত স্রাস্টিটা ইতারা গল চলিল।

সৌরভি ঘনিষ্ঠাছিল। লোকালয়ে থাকা হইবে না, কোন বন-জঙ্গলে বাইরা বাদ করিবে। ঘটনও তাই। সকালে এক চল্টি নৌকার টোয়া উঠিয়া গড়িল। নৌকারোহীরা লুক্করকন কাঠ কাটিতে বাটতেছিল।

ইতারা সে স্থানটার নামিল, সেখানে গভীর জল। লুক্করকনের অংশ-বিশেষ। নিকটেই বন বিভাগের একটা অফিস। নদীর পরগারে লোকালয়।

বনের মধ্যে পোঁটলা-পুঁটলি লুপিয়া সৌরভি বাহা ডাঁধল, নন্দর কাছে তাহা উপরের টেকিল। উপরে গাছের পাখ-প্রশাখা পাতায় পাতায় ঘিনানো। দীর্ঘ কাঁট, পট্ট দিয়া শিঙাকে সে কখন বিভ্রান্তাছিল। ছোট ছোট চাষালাহের ভগ্নর কাপড়-চোপড়, বৈজ্ঞান-পত্র স্থপিত-হে—পৃথগাছ। নিকটেই রায়র ঘন—গতিপাট্ট। নদী বেশী দূরে নয়। বাসনগুলি নদীর জোটে লইয়া বাড়িয়া ঘনিষ্ঠা সে বকবকে করিয়া আনিয়াছে, এক-সেকলি সাজাইয়া রাখিবার কস্তে ইজিনাথো একখানা বাচাও প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপে লোকালয়ের উপদেশে স্তম্ভির হাওয়ার মধ্যে ভাগানের সংসার চলিতে লাগিল।

বন-প্রশের এই হুংগটুকু তাহারই হাতের এবং অকারণে দেওয়া—পাড়ে পিতার প্রাণে এত আঘাত বাজে—এই বাস্তবতার তাহার চোরে জোর যেন চতুর্ভুজ বাড়িয়া

গিয়াছে। সে একা চোরে এষ্ট-নির্জন ঘেমে সরল গৃহস্থালী পাতাইয়া ফেলিল।

বাওয়া লাওয়ার পর একদিন সে পিতার লগাণাথে উপবেশন করিয়া কহিল, “বাঘ ভালুক বনের পত্ত এখানে যে বয়েছে—সত্যি কথা, কিন্তু বাছুরেব মত শুভ বড় হিঙ্গে এদের নেই। তোমার মনে এখনও কি গুণ আছে বাবা?”

“না না, হুং আর কিছুই নেই।”

কিন্তু একথা গ্রীক ছুতা নহে: নন্দর জন্মের নিকট বেরনা—মেনকার তপ্ত-বৃতি—ভিতরে ভিতরে যে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সৌরভির গুহু জন্মের সেবা-থরে মত তাহা ঢাকা পড়িতে পারিত কিন্তু মেঘটির রূপ ও বৌদন যে দিন দিন বাড়িতেছে, এ বৌদনের গতি কি হইবে—এ প্রশ্নের কোন উত্তরই তাহার মাঝার আদিত না। সৌরভির গুহু চোখের জমাট-মজ্জা চোখে বেধা বাইত না, কিন্তু নন্দ ত জানিত কোথায় কি সঞ্চিত আছে! কাহাকেও ছোট করিয়া রাখিতে কিয়তারা চকিরপট্ট বড়ী কাহারও পক্ষে অচল কাহারও পক্ষে মলল হইয়া ত চলে না? সে মিনিটে মিনিটে, সেকণ্ডে সেকণ্ডে প্রত্যেকেরই আয়ুফল সমানভাবে চিহ্নিত করিয়া বাইতেছে। তাহাতে চাহিতে নন্দ পলে পলে নিজেও হত্যা করিয়া চলিল।

সংসারে তখন অল্প কোন কষ্ট নাই। একটু দূরে যে ছাড়ের আফিস ছিল তাহার বড় বাবুটী বৃদ্ধ এবং বর্ণভীক। নন্দ তাঁহার সহিত লাকাত করিয়া কাঠ কাটাবার জল কিছু জমল লুবিধাজনক গর্ভে ব্যব্যবস্ত করিয়া লইয়াছিল। জমি বইতে হাঠি কাটাওয়া নদীর ধারে সে গড় করিয়া রাখিত। কাঠ-বাধ্যদীরা আসিয়া খুদা দিয়া লইয়া গাইত।

এদিকে অবসর সময়ে পিতার লগাণাথো সৌরভি একখানা বড় ও একখানা ছোট ঘর ও দেই মণ চাঁকি ও সোয়াল বগ প্রস্তুত করিয়া বেশিয়া পুঁছিয়া শুদ্ধতক করকের করিয়া ফেলিল। সমস্ত বাড়ীটা ভালপাখার খাতা পাঁচিলে খোদা। পাঁচিলের গা বেশিয়া পাখাফুণের শোনা। নদা গভীর পরিচ্ছন্ন ও কিন্তু রাত্তা। গুটি হুগুগতা পাতা, কবেকটা ভাগল, একটা টিরা পাখা, একটু মরনা।



মাঘ, ১৩৩৪

“ঐ আসে ঐ”

ঐদুল্ল মজিৎ ঘোষ মহাপুত্রের প্রাচীন
চিত্র-পাণ্ডা চাইতে

কিছু এত উদ্যোগ ব্যায়োজন করিয়াও পিতাকে সে খরিসা রাখিতে পারিল না। নব্ব ছুতাবনার দিন দিন শীর্ণ হইয়া অবশেষে একদিন পীড়িত হইয়া পড়িল। সৌরভি গোপে অন্ধকার দেখিল।

নন্দর রোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কখন চেষ্টনা থাকে—কখন থাকে না—এই রকম অবস্থা। পিতার কাপড় গোপড় এবং বিছানার গাফড়গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বিহার রক্ত আগের দিন রাতে সৌরভি সে সকল করে দিচ্ছ করিয়া রাখিয়াছিল। সকালে বেশ এক পল্লা টুট্টি হইব। বেশ। তখন টুট্টি ছিল না। গাছের পাতার সজিত মূল টিপু-টিপু-করিয়া করিয়া পড়িতছিল। পিতাকে পথা বিজা দিচ্ছ কাপড়ের চুপড়িটি লইয়া সে ঘাটে আসিল। পাটে মাছ,ভাইয়া কাপড়গুলি কাড়িয়া বেশ করিয়া সে সম লইতেছে এমন সময় দেখিল একথানা পানলী নৌকা মূল পরিয়া আসিতেছে। আরও দেখিল, ছায়েদের উপর একটি দ্বক তাহার উপর দুই প্রাণ করিয়া রাখিয়াছে। সে চকু নত করিল।

নৌকাখানা কাছে আসিতে দ্বকটি বিজ্ঞান করিল। “সৌরভি না ?”

সৌরভি এক নজর চাহিয়া দেখিল, তাড়াতাড়ি গায়েন কমিয়ার পুর কুন্দরজন।

কুন্দর বলিল, “ভাই তোমাদের কি হ’ল বল দেখি ? কেউ জানিলে না—ভুলে না—এখানে কোথায় এসেছ ?”

সৌরভি তেমনি বৃথ নৌক করিয়া জবাব দিল, “এই মঙ্গলে এসে বাবা বেঁচেছি ?”

কুন্দর বলিল, “এই ঠাই থাকতে বাবা-ভালুকের বেপার উপর মারা হ’ল—হেতু ?”

সৌরভি তেমনি নতমুখে জবাব দিল, “মাহুকের দেখকে মারা ভর হ’ল বলে।”

বহিও এ মেয়েটির মুখে একপ্রাণ জবাব এই মূর্তন নহে, তবুও অনেকদিনকার মলাফতের পর এই কথাই ভিতরে এত অধিক ভাঁসনা ছিল যে কুন্দর লক্ষ্যই কিছুক্ষণ নিকর হইয়া রছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, “নব্ব কোথায় ? কেমন আছে ?”

সৌরভি বলিল, “বাড়ীতে। বড় মাহুগ ঠাণ্ডা।”

“কি মাহুগ ?”

“মহ, কাশী—বারিহে ত একটা আছে। তিওরে আরও কত কি—আমি সব জানিবে।”

মাহুকের নেত্রের করিতে বলিয়া কুন্দর নামিয়া পড়িল।

বলিল, “কাপড় কাটা হ’বে গেছে তোমার ? কোথায় বাবা বেঁচেছ চল, নব্বকে একবার দেখে আসি।”

এত বড় প্রণয়নে নিম্নলিখ অবস্থার চোরা আগেকার আচরণে মনের সজিত রূপের অবশেষ ছাপাইয়া এক একটুখানি হেতের স্পর্শে সৌরভির গোপেন শান্তাটুটি তখন ঠিকিয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল, “একটু থাকান আসনি—কাপড়গুলো ধুয়ে নি।”

এই বলিয়া সে হাঁটু তলে নামিয়া বসন্তলি রূপের উপর মাড়োকা করিয়া দুইতে প্রস্তুত হইল। কুন্দর তবৎসরে পিছন দিক চাইতে সেই পুশিত পরাবিত দেহের বস-যৌবন চুটি গোপে শুষ্কিঃ লইতে লাগিল।

অমনে পা দিতেই বাড়ীখানার পারিপাট্যে দেখিয়া কুন্দর বুদ্ধ হইল। সমস্ত প্রহর রচনা-কুশলভার চোমরা কিরাইতে যে দুখানা নিপুণ চম্ব কাচ করিয়াছে, সে ও ইমার নেপা-পোছা এবং পুশ্চল্যব মধ্যে গতি আছে বরা হিঃছে।

কুন্দর দেখিল, খয়ের বেড়াগুলি মাটির প্রলপে দেওয়ালের মত করা হইয়াছে। উপরে খড়ের শাবন্ধর ছাউনি। পাড়িলও মটি বিরা দেয়া। চুইংক খড়ের ছোট ঢালা। অমনটি পরিচ্ছন্ন। পার্বে একদিক একটা তুলসী গাছ—পিড়ি গাথা। চারিদিকে গালা ও চব্বা হুণের প্রেই। খয়ের মধ্যে আগমাত্রা, কুণ্ডি, ডাক সমস্তই মাটির। টেকি খর, বাগা খর, গোলা খর সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুন্দর অবাক হইয়া গেল। সবে মনে তারার লালদায় মাজো বাড়িয়া উঠিল।

খয়ের ভিতরে নন্দর রোগব্যাগার পার্বে সৌরভি তাকে বসিতে আসন দিল। নন্দর তখন জান ছিল না।



কুম্ভের কাছে অবশ্যটা চালবোধ চটল না। ভিজ্ঞান্য
ক'রিল, "ওহুৎপত্রের ব্যবস্থা কিছু কর নি?"

সৌরভি বলিল, "এন বাবাড়ো ভাতার বন্ধি ত নেই।
এখানে মঙ্গলের এক আফিস আছে। কাল গিয়ে বড়
বাগুর পা ছড়িয়ে দি। তিনি পাইক দিয়ে চারকোশ
দূরের এক ভাতারখানা থেকে আট দাগ ওহুৎ আনিবে
তেন। তাই বাওয়াছি।"

এট বলিয়া ওলবের শিশটা সে উঠু করিয়া
দখিয়া দেখাইল।

কুম্ভ বলিল, "না সেখে তুনে চিল ছুঁড়লে কি
বোনের গায়ে লাগে? এখন ত ভাঁটা। ভোজনের সময়
নৌকা ছেড়ে দিয়ে ভাতারকে আমি সঙ্গে ক'রে আনবখন।
তুমি কিছু ভেবে না।"

আবও কিছুক'ল থাকিয়া সৌরভিকে সাধন মাখনা
দিয়া কুম্ভ খাওয়া দাওয়া করিতে নৌকার চলিয়া গেল।

সৌরভির ঘরের উপর যে একটা গুহার শোভ
কুম্ভের অন্তরে দলের উপর বল মেলিতেছিল, তাহা
স্মরণশূন্য চটল সেদিন—যেদিন গুহের তার মাথায়
লইয়া সৌরভি দেখতগাঙ্গী হইল।

অদূর হইয়া কুম্ভ চতুর্দিক খোঁজ করিতে
গাণিল। অবশেষে সে এক কাঠ-বাঘদায়ী নিকটে
পদ্য শাইল যে, তাহাঘেরই নৌকার চড়িয়া
টোরা স্থলবখনের এক গভীর অরণ্যে নামিয়া পড়িয়াছে।
সে একথা ভাতারও নিকট প্রকাশ করিল না। শিকারের
উপলব্ধ করিয়া একদিন নৌকাযোগে বাহির হইয়া পড়িল।
খিলেণ খোঁজ করিতে হইল না, পথ চলিতে চলিতে নদীর
ধারেই সৌরভির সাক্ষাৎ মিলিয়া গেল।

কুম্ভ মনে মনে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াছে, এমন
সময় সৌরভি উর্জ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বাগুর
চড়ার উপর দাঁড়িল।

কুম্ভ তাড়াতাড়ি মুখমত দুইজা ভাতার নামিয়া আসিল।
ভিজ্ঞান্য করিল, "কি হয়েছে সৌরভ?"

সৌরভি বলিল, "আপনি একবার আগুন।

কেন্দ্রন তক্তে দেখবেন।"

ভাতার উত্তরে আসিয়া দেখিল—নন্দর জীবন-লীলা নিকা-
শিত হইয়া গেছে।

সৌরভি 'বাবা!' 'বাবা!' বলিয়া কিছুক'ল সেই
মৃতদেহের উপরে বিশ্রুতি হইল, তারপর হিরে হইয়া উঠিয়া
বসিল।

হাঁটুর উপর দুখ রাখিয়া পিতার তত্ত্বলেনদীন বিবর্ণ
মুখের দিকে তাকাইতেই ভাতার চকু চটি চটতে পুনর্বার
অজ্ঞানতা গড়াইয়া পড়িতে গাণিল।

কুম্ভ কি মাখনা দিবে সুখিয়া পাইল না। নিশ্চল
হইয়া বসিয়া রহিল।

সৌরভি কিছু উঠিয়া গেল। যে ওখাড়কলি সে কাটিয়া
কুড়িয়া শুকাইতে বিছাটল তাহা আসিয়া তোষক ও বাণিলে
পর্যাইল, এ—একটা। বাহুর টানিয়া লইয়া পরিষ্কার থায়া
রচনা করিল। ইচ্ছা—শিতাকে তাহাতে থান, করাষ্টয়া
মগানে লইয়া যায়। কিন্তু ভাতার আঁততে জোম—কুম্ভ
আত্ম, সে কি মৃতদেহ স্পর্শ করিবে।

ভাতার চকলভাব লক্ষ্য করিয়া কুম্ভ তাড়াতাড়ি উঠিয়া
হাইয়া নন্দর প্রাণশূন্য দেহ স্পর্শ করিল এবং সৌরভির রচিত
পথার উপর পদমের তুলিয়া লইয়া ভাত-পাণ্ডলি সুবিস্তৃত
করিয়া দিতে গাণিল।

সৌরভি আব কোন প্রশ্ন করিল না। অন্তরের সমস্ত
কৃতজ্ঞতা ওই হাতে টানিয়া লইয়া কুম্ভকে সে নমস্কার করিল।

কুম্ভ সেই অবধি বাড়ী যায় নাই। নৌকার হাঁদিয়া
বাড়িয়া খায়, আর সৌরভির তত্ত্ব তত্ত্বান লয়। কাল সে
বলিতেছিল,—নৌকা। সে ছাড়া দিয়াছে, নদীর পরপারে
একটা বাগা লইয়া সে অবস্থিতি করিতেছে। ইহারই বা
সুদীর্ঘকাল ঘর-দ্বার ছাড়াই পড়িয়া থাকিবার চেতু কি?
অশাচিত দ্বার দ্বারা এই যে একান্ত অচেতু লীলা না জানি
সতর্কতার মাফকান্ডে ইহার পরিণামান্তি। কি আকারে
ঘটিবে? উৎসে ও আশঙ্কার সৌরভির অন্তরটি পাবশুণ
হইয়া রহিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নব্বয় সুহৃৎ কুঠারখানা হাতে গইয়া কোমরে কাপড় শুকাইয়া দোরতি কাঠ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুই হইতে কুহুকে আসিতে দেখিয়া সে ভাড়াভাড়ি ছুটিয়া আসিয়া অরের মধ্যে ঢুকিয়া পানের বাটা গইয়া বসিল।

কুহুদ খেতে ঢুকিয়া একখানা আসন টানিয়া গইয়া বসিয়া পড়িল। আশ্চর্য্য হইয়া সে ভিজ্ঞান্য করিল, “এত বেয়েন্ড কেন?”

দোরতি সুখ শীত করিয়া উত্তর করিল, “কাঠ কাট-ছিলাম।”

“কাঠ কাটিতে এত বেয়ে গেলেন? রাত্তার কাঠ নেই বুঝি? সে ত শুকনো ভাগপালা হুঙ্কিরে নিলেও চলে। জামাকে বলনি কেন? যোগাড় ক’রে দিয়ে যেতাম।”

চমিদার পুত্ৰ সে। এতটা অসুখ একটা অশুভ ডোমের মেয়ের ভ্রত দোরতিয় ভাগ টেকিল না। মনের ভিতর যেন খচ্ খচ্ করিয়া হুট গিহিতে লাগিল। তখালি সে হালিতে হাসিতে কহিল, জামানি কাঠ নয়।”

“তবে?”

“বাবা যে মতানবের কাঠ বিত, তার্য কাল এসেছিল। বতটা পারি কেটেকুটে দিতে হবে তাখের।

কুহুদ বাগ্ন হইয়া কহিল, “কতটা আর পার হুয়ি? ঐ সব মোটা মোটা কাঠ নিয়েয় হাতে কেটে বাবলা চালান কি তোমার কার?”

দোরতি কহিল, “না পারি, একটা পেট চ’মে বাবে।”

কুহুদ খপ করিয়া বলিয়া বসিল, “কিছু আমি হা! চলেতে দেব না সৌরত!”

অর পক্ষিরা কে যেন বাপ হুঁকিল। দোরতিয় লগ্নাখ বিন্দব হইয়া সুখখানা লীচু হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাস্য করিল, “কেন?”

এই একটি কথার প্রস্তের কুহুদ হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। সে বিজ্ঞপ্তাবে দোরতিয় বিকে ভাকাইয়া রহিল।

অসীতভাবে দোরতি বসিল, “কলুন না, কেন?”

পথ্যকুল ভিত্তে জড়পড় হইয়া কুহুদ কহিল, “অনেক দিনই বলেছি সৌরত! এমন অনেক কথা আছে, যা’ কেমন চোখ মিছেই লোকে বলে আর গোনেন।”

যে কথার আভাস সে সুখ বিয়া প্রকাব্যের বাক্য করিল, তাহা একান্ত অপ্রত্যাশিত না হইলেও হঠাৎ পন্ডাতে আশ্চর্য্য ভীত কীটা পরবার এবং চলা-কোরার পথটিতে পথান্ত উত্তর হইয়া আছে সৌরত তাহা দেখিতে পাইল। হুঙ্কিরের প্রবেশে অশুভ লোকের হুত খেচ ছোঁবা, সংস্কার কত্যা—চক্ষণ্য নারীর শ্রমের কুঠার চালিয়া দগ্ন, কথার কথার দোরতিয় হুপ-কইলাফবর ভর ঔৎসুক্যপ্রকাশ কত্যা—সমস্ত লগ্নদরতার আবরণ বসিয়া গিয়া অভিলক্ষিত হুঙ্কি প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

পানের বাটাটা ঘুরে থেলা মাঝিয়া ছিটকাইয়া ফেলিয়া বিয়া সে উদ্ভিগ্না দাঁড়াইল। “ওঃ! এত বড় মোচা!” এই বলিয়া বুট ভাঁটিতে ভাঁটিতে কুহুদ লগ্নের মত পাড় হাকাইয়া বর হইতে সে পারির হইয়া গেল।

কুহুদ বিবর্ষ বিবল মুখে কিছুকল বসিয়া পাকিয়া চলিয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে সে আবার আসিল। একান্ত নিরাশ্রয় দোরতি—এই ভাবিয়া এই পাচ দিনে বোধ করি তাহার অস্তরে কিছু সাহসেরলগ্নার বইয়া থাকিবে। দোরতিও এই লম্বেরে মধ্যে নিজকে কতকটা দান্ত কথিয়া গইয়াছে।

কুহুদকে অমনে দেখিয়া সে বর হইতে একখানা আসন দাগ্গার উপর ফেলিয়া দিল। খয়ের মধ্যে আড়ালে পাকিয়াই সে বসিতে লাগিল, “একটা কথা জিজ্ঞাস্য করি। চোখ দিয়ে কথা বলার যে কথা দেখনি বলছিলেন সে কী ভাষা? সে কি লগ্নাই চলে? না, শুধু এই ডোমের মেয়ের কাছেই চলে? সে দিন সে ভাবায় ত মনের কথা কতকটা বলে গেছলেন, আর আবার কি বলতে এসছেন?”

মাহুদ বখন নিম্নগায়ী চয় তখন তাহার অগ্নমানে পরিপাক করিবার শক্তিও বাড়িয়া বাহ, তাই কুহুদ নিল:অর মত সেই অনাবের আসনখানার উপরই বসিয়া পড়িয়া বসিল, “কুহুদ ত নিরাশ্রয় হ’য়ে পড়েছ। তোমার একটুপানি সুখ হুবিবে—”



দুইয়ের কথা কাড়িয়া লইয়া সৌরভি বলিল, “সে দেখবার কোন অধিকারই ত নেই আপনাব। এতদিন যা দেখেছিলেন সেটুকু পাওয়াও আমার উচিত হয় নি। তখন ত জানি নি, দেবতার খেলসে মানব ব’লে রয়েছে! সে জান্লে বাবার সংস্কারের সময়ের দাখখাটুকুও আমি নিতাম না।”

সৌরভির চক্ষু হ্রী দিয়া যে নিশ্চক্ষে অদ্রবণ হইতেছে কুমুদ তাহা দেখিতে পাইল না। কিছুকণ জড়ানন্তর এত বসিয়া থাকিয়া একটা কিছু শেষ করিবার অতিপ্রায়ে প্রবল উত্তেজনা গুণে হঠাৎ সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ডাকিল, “সৌরভ!”

সৌরভ কান পালা করিয়া উঠিল। সে আর কাণে বলি নাই করিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিশেষ ও লক্ষ্যের হস্তবৃত্ত হইয়া কুমুদ কিছুকণ বসিয়া এতল। তারপর ঘরের ধারে সে উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর সে বহুদিন আর আসিল না। সৌরভও হাঁপ ছাড়িয়া গাটিল।

কিন্তু এই অপাশ্রিত বহনিকালান্ত এইখানেই হইল না। বাড়ী ঘর ব্যতীত কিছুকাল পরে কুমুদ হঠাৎ আবার একদিন দুমকেভর মত আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌরভ তৎক্ষণে দেখিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ও কবট বন্ধ করিল।

কুমুদ বলিল, “মাগুন দেখে—সে যে রকমেরই হোক, কবট বন্ধ করা উচিত হয় না সৌরভ!”

সৌরভ ঘরের মধ্যে হটেতে অব্যবসিল, “খুবই অসুচিত। কিন্তু সে বিন্যাস্ত বাবহায়ে প্রমাণ হইবে গেছে যে, আপনাব দামদ আছে—আর—আমাবও দামদান হবার পরকার আছে।” কিছুকণ পরে সে বলিল, “কিন্তু এই কবটটাই হুজুরের মধ্যে যেহা দেখার প্রধান অঙ্গ করিছে—তহা হুজুর আমি নই। আমি ত আমার কবটের বন্ জানি; তার চেয়ে আপনাব ব্যাধি কোর বন্দী।” এই বলিয়া সে দরজা খুলিয়া, বাহির হইয়া আসিল; বলিল, “আপনাব সবটুকু বলের পরীক্ষা আজ শেষ ক’রে ফেলুন। আপনাব সঙ্গে অকারণ কথা তাড়াকাড়ি কর্তে আর আমি পারি নে।” তার চক্ষু হ্রী তখন হির—অচকল—কিন্তু বল করিতেছে। ইহার প্রতি বিম্বুটর কি ভরকর গতি! কুমুদ

চোখে অচকল দেখিল। সেদিন কথার কোনো শেষ হইল না—কুমুদ চলিয়া গেল।

ইহার পর সে প্রতিদিনই আসিতে লাগিল, কিন্তু কথার দূর বদলাইয়া ফেলিল। বেশ ভূঁই বাড়ী-ঘর থাকিতে এই বন-বাদ্যকে একলাটি পড়িয়া থাক। সৌরভির কোন মতেই কর্তব্য হয় না, এই রকমে দেখে লইয়া-বাইবার ভর তাহাকে সে পান্ডানীড়ি করিতে লাগিল।

এই ভিত্তিঘণার মূলমত কারন বিশেষ হুজুর না হইলেও কি তাবিয়া একদিন সৌরভি সহসা রাঙা চটল। বলিল, “আজ্ঞা! কিন্তু এক নোকার?”

কুমুদ বলিল, “নোকার ত অভাব হয়নি।

হ’ গানাই কতা যেতে পারে।”

সৌরভি বলিল, “আপনি ভ্রমিয়ার লোক, তাড়াতী ইরত নিজেই মিতে চাইবেন। কিন্তু সে অর-বর তাঁক। আমারও আছে।”

তারপর গরু হ্রী বিকর করিয়া হস্তর নোকার কুমুদের নোকার পালাপালি হইয়া দেখে চলিয়া আসিল।

সে নিজেই বাড়ীতে ঘাটাই উঠিল, কিন্তু আশ-বিশ্বত হইল না। এখানে নির্ভরে বাস করিতে পারিবে কিনা বুঝিয়া দেখিতে সে আর বিশদর্শ পৈখিলা করিল না। পরদিন প্রভাতেই কুমুদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদ তখন রকের উপর বসিয়া হাত বুথ বুইতেছে। কড়াবতী পুরের নিকটে শিকারের গদ্য তনিতেছেন। সৌরভিকে দেখিয়া তাঁহার চোখের লক্ষ্য ঘামিয়া গেল। বলিলেন, “সৌরভি যে! কোণার ছিলি এতদিন? কখন এলি?”

সৌরভি হাসিমুখে কহিল, “আপনাব ছেলের সঙ্গেই ত এলাম ঠাকুরবা!”

কড়াবতী পুরের দিকে তাঁর দৃষ্টিতে চাইলেন। কুমুদের হুথানা তখন ভারি হইয়া মাটির দিকে কুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কড়াবতী হোথবীণ কটাকে বলিলেন, “তুই বলি না কুমুদ! শিকারে গিয়েছিলি?”

ইহার উত্তর সৌরভিই বলিল। বলিল, “শিকার উনি অনেক রকমের করেন। পুতুর ঘাটে মাছও ধরেন, আবার

সোঁদর বনে বাসে মায়েন।” একটু চুল করিয়া থাকিয়া বলিল, “পাছে আপনায় কচি ছেলেটির মাথা চিবিরে খাই, সেই ভয়ে আমি নিজেই ত উদ্‌বুদী হ’য়ে জঙ্গলে চ’লে গেলাম। কিন্তু আপনি কি ক’রে আমার মাথাটা চিবুতে সেই ছেলেকে জঙ্গল পৰ্ব্বাত দাওয়া ক’রে পাঠালেন?”

সৌরভির মনে যে কথা উঠে—তোহা বত তরুই হউক না কেন, বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিলে সে ঘেন পালাল পার। কঙ্কাবতীর কোথোখাঁপু মুখ এবং কুম্বুকের অরবী চক্ষু দেখিবারে সে হটিল না। বলিল, “কিন্তু আপনায় তথেন কারণ নেই। অনেক ভুখে অনেক কষ্টে ভালর ভালর আপনায় ছেলেটিকে কিরিরে এনেছি—তার মাথা চিবিরে

খাইনি; কিন্তু তিনি বাঙে আমার মাথা চিবিরে না পাম তার বাবরা আপনাকে করতে হ’বে ঠাকুরমা!”

কঙ্কাবতীর মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, কেবল অধর বংশন করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

সৌরভি কহিল, “সম্রাজ হিন্দাবে আপনি আমার একজাতি না হ’লেও মেয়ে হিন্দাবে আমার একজাতি। তাই আপনায় সঙ্গে একটা বোকা লড়া করতে এসছি। আপনি যদি নিম্নের ছেলেকে না সামলায়, তা হ’লে আমিও পরের ছেলেকে আর সামলাব না, এই আপনাকে ব’লে গেলুম।” বলিয়া আর উত্তরের কস্ত অপেক্ষা না করিয়া সৌরভির দৃষ্টপদে প্রস্থান করিল।

হাস্য-হাস্য

শ্রীলীলা দেবী

হাস্য-হাস্য! হাস্য-হাস্য!

ছোট্ট লাদা সখু বান!

বাড়ের বাহার বোলায় হাওয়া

গছে তোমার হাস-পাওয়া!

কার পরাণের মূর্তি তুমি?

আপান না সে স্বর্গতুমি?

হাস্য-হাস্য! হাস্য-হাস্য!

অপের পত্নী জিজ্ঞা বাহু

তোমায় নিয়ে লাকায় চুলে,

নৃত্য তোমায় উঁছে ছলে

বদতুমি শাখার বুকে

মৌমাছির গড়ার সুখে!

হাস্য-হাস্য! হাস্য-হাস্য!

কেমন মিঠে গুণ্ণবান!

গছে তোমায় টাবের আলো

বলু না আমার হাস্বে ভালো?

নাও না আমার একটু চুমি,

মিষ্টি তুমি! মিষ্টি তুমি!

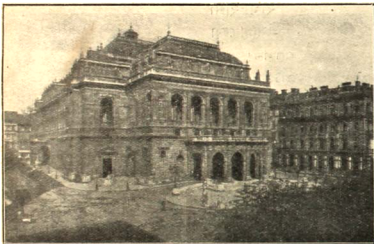
বুডাপেস্ট

শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু

বহুবাক্য.

ভূমি লিখেছিল, বুডাপেস্টে বহি বাই, তার একটা বিবনে
তোমার চাই-ই। ইরোতোপের অস্ত সব বড় সতরের চেয়ে
বুডাপেস্টে সবচেয়ে ভোমার উৎসুকতার কারণটা আমি বেশ
বুঝতে পারছি। বুডাপেস্টে আমাদের অতীত, ওখানে ভারতীয়
হুমকিরিরা পুণ কইই যায়; কিছু দৈর্ঘ্যে নয়, মাঝার
Magyar) ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রটি দেখবার জায়গাই
বুডাপেস্টে দেখলুম। কেনা পর্বত এসে বুডাপেস্টে দেখবার

দেখতে পেলাম না; বহুতঃ পারি, বাসিন, ভিৎহেনার মতই
বুডাপেস্টে ইরোতোপের একটি আধুনিক লক, বুডাপেস্টে নেমে
হলে হ'ল এ ভিৎহেনারই একটি ছোট সংস্করণ, তেঁরি রিং
ট্রাঙ্গে, তেঁরি উনবিংশতাব্দীর স্থাপত্যের বাড়ীর পারি,
তেঁরি কাচের পারি, তেঁরি ছাউনেকোট-পরা নরনারীর জনপ্রোত;
বুডাপেস্টের প্রধান রাস্তা: 'আন্ড্রাসি উট'এর সমিত পারির
যে কোন বৃহৎতারের তুলনা দেওয়া চলে; আন্ড্রাসি ট্রাউটের
অপেরার বাড়ীটি দেখে মনে হ'ল এ দিক ভিৎহেনার অগেরা
হাউস।



বুডাপেস্টের অগেরা-হাউস

লোভ সামলতে পারলুম না; ভিৎহেনা থেকে বুডাপেস্টে হৌণে
প্রার পাঁচ ঘণ্টা।

ভিৎহেনাতে সবাই বার, বুডাপেস্টে সহর খুব সুন্দর। কিছু
বুডাপেস্টে এসে কিছু নিরাশ হইলুম, সবচেয়ে সুন্দর ছোট কিছু
আমি ভেবেছিলাম পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘাত ও সন্ধিরনের
একটাই বিশেষণ ওখানে দেখব, তা সহরের চেহারাতে কিছু

বিকলবেণা টেনন থেকে নেমে সহরটা তেমন মনে
হইল না ঘটে, কিছু সজোবেণা এখন ডানউন-মন্ডার ওপর
ম্যায়গার্ট-সেতুতে থাকিবে ডানদিকে ছোট সিরিমালার
ওপর থাকে থাকে লাজানো বাড়ী, মির্কা বাজারাদি মজিত
বুড়া সহরের দিকে চাইলুম, আর বামদিকে শেট্টেগোটেদ-
মোকানির-পারি-পার্লমেন্ট শোভিত সমতল শেট্ট সহরের

বিকে চাই পূর তখন বৃদ্ধ হ'য়ে সেপুস, নদীর ওই তীর ঘোড়া
এই লুটতরাজ সত্তা একটা সৌন্দর্য্য আছে। নদী ও পালাক
যোগানে মিলেছে দেখানে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আপনাই
প'ড়ে ওঠে, তারপর স্নান্য বখন সে স্নান্য হান তার প্রাণের
অধির দিয়ে সাধার, তখন তা আঘাত কাছে আরও মনোরম
মনে হয়। বিশেষতঃ সেই স্ফার আলোয় গিরিমালায়
বুড়া অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-স্মৃতি উজ্জলতর সৌন্দর্য্যে
প্রকাশিত হ'ল। পূরীর বিতীর্ণ পতাবীতে রোমানরা বখন
এখানে তাদের নগর স্থাপন করেছিল, তখন এখানে এক
কেল্টিক উপনিবেশ ছিল; তারপর রোমানরা তেড়ে গেল,

কনরা এল, অটুপথেরা

এল, তাদের দলও চ'লে

গেল; আভাররা, তাদের

পর স্মৃতিরা এলে ওই

পালাক দলও ক'রে

বলল; তারপর, প্রাণ

এসারোপ' বছর আগে

মাজাররা (Magyar-)

এল ডানিউবের নির্মল

জলধারা হ'য়ে তাদের

দিশন্ত প্রাণিত এশিয়ার

সমস্তলুহি থেকে;

তাদের রাধা আর-

পাড়ের নেকড়ে মাঝারের

দল লুটতরাজ বুড়ে

চারিধে বটাতে বটাতে এল, চারিধিকর সুবিশৃঙ্খল আকাশপূবী
স্নান্যের মতো অদৃঢ় চরিত্রের মত অস্থির বুড়ার পাছার
মালা দেখে দেখানে তাদের বিজয় বাগ বামালা, তাদের
নগর প'ড়ে তুল, তারপর চারিধিকর সমস্তলুহির লুটতরাজ
তাকিয়ে অধিকার ক'রে দল, লুণ্ঠারদের, কোড়ার,
দাতার চারিধে আপনাদের অধীনে, আনলে। তারপর
কত শত বৎসর কেটে গেছে; চারি বছর আগে যে চর্চব
এক মাজার-অসারোহীর দল সমস্ত ইয়োমোপের আস ছিল,
তখনোতে আইনলান্ড পঞ্চা, টজালীতে বুরগেণ্ড পঞ্চা

তাদের মত ঘোড়ার দল টাকিয়ে নগর গ্রাম লুটতরাজ ক'রে
কিরত, তাদের বাগেররা ঘোরে ঘোরে নদী সৈনিক থেকে
রসক হ'ল, লুট ক'রে আনবার ঘোড়া লাঞ্চে ছুটলে; ঘোরে
ঘোরে তারা ইয়োমোপের সভ্যতার স্মরণে এল, তাদের রাজা
সাপু স্কিকানের নেতৃত্বে পুটানবন্দ গ্রহণ করলে, চাকারিতে
মাজার-রাজ্য গ্রহণ প্রত্যাশে প'ড়ে উঠল। প্রাচীন মাজার-
রাজবংশের শেষে বখন মানি-রাজবংশ এল, ইতালীয়ান
পতাবী, ফরাসী পতাবী; চাকারিতে গ্রহণকালে এল; তারপর
ইতিহাসের পৌরবসন কাল বলতে আমরা যেমন প্রাচীন
তারকের কথা এবং লুণ্ঠনময় তারকের কথা ভাবি, সেপতল



সমাজের মেয়ে চরকা কাটছে

মাজাররাও তেঁতি যাব ইতিহাসের পৌরবসন লুণ্ঠ বলতে
প্রাচীন চাকারীর কথা—রাজা মাধবল কর্তৃত্বের সময়
(১৪৪৮-১৪৮০) ভাবে। কুরকর নিকট পরাভব ও বাসার
কথা বা অষ্ট্রিয়ার রাজার নিকট পরাভব ও অধীনতার গলে
তাহার অতীত ইতিহাসের এ অংশের ভেত্রে তাহা লক্ষিত
বটে, কিন্তু এখানেও তাহার গল করবার আছে; কোন
অত্যাচারে অধীনতার এ মাজার-কতি প্রাণহীন আশাটীন
হব নি, মত হ'য়ে পড়নি, আধীনতা লাভের ভর বার দাঁড়
প্রাণপণে সংগ্রাম করেছে। চাকার বছর আগে

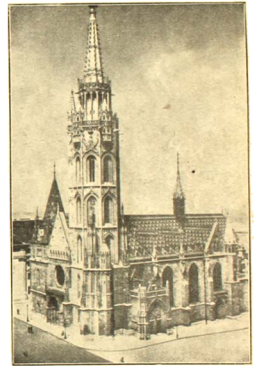
বুড়াপেট ঐতিহাসিক নগর

করলে, কোথায় যাবেন? বড়ুয়, রাজপ্রাসাদ দেখতে। সব ভিয়েনায় রাজপ্রাসাদের পরশেষটী। রাজপ্রাসাদের চারিদিকে সুন্দর বাগান আছে, এখানে থেকে উল্লেখ্য চেন-সিক ও গুপ্তায় প্রাসাদ-প্রদীপ সজ্জিত সেন্ট স্টিকান চার্চ-মন্দির পেটের প্রদক্ষিণা পোতা: বেলা যায়, তারও একটি ছবি নিলুম।

রাজপ্রাসাদের উত্তরে একটি পেলেট বুড়ার সব চেয়ে পুরাতন চার্চ "কোরোনারাটোয়ুসুম" অর্থাৎ Coronation

চার্চ। এখানেই বুড়ার সব চেয়ে পুরাতন চার্চ "কোরোনারাটোয়ুসুম" অর্থাৎ Coronation

চার্চ। এখানেই বুড়ার সব চেয়ে পুরাতন চার্চ "কোরোনারাটোয়ুসুম" অর্থাৎ Coronation



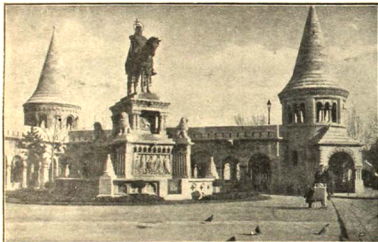
কোরোনারাটোয়ুসুম বা রাজ্যভিত্তিক-মন্দির Church; বুড়ার প্রাচীন মূলভিত্তির এই চার্চে রাজ্যভিত্তিক হোত। এই চার্চটি চতুর্থ শতাব্দীতে তৈরি। এখানেই বুড়ার সবচেয়ে পুরাতন চার্চ। এখানেই বুড়ার সবচেয়ে পুরাতন চার্চ। এখানেই বুড়ার সবচেয়ে পুরাতন চার্চ।

একটি বড় রাজ্য শেষ করে মারগারেট সেতু দিয়ে নদী পারের তারপর নদীর ধারে রাজ্য দি়ার বহুগু গিরে চেন-সিকের মোড়ে ট্রাম থামলে, সেখানে নামলুম; নামনে পাড় উঠে গেছে, তার ওপর রাজপ্রাসাদ। কিউনিফেলের ক'রে পাড়ের মাথায় উঠে একেবারে রাজপ্রাসাদের দরজার এলে পৌঁছালুম। প্রাসাদটি যেমন বিরাট তেহি পঙ্খীমুখি, বাকিংহাম প্যালেসের সঙ্গে বেশ তুলনা করা যেতে পারে, বিশেষত: নদীর ধারে পাড়ের ওপর ব'লে তার বিরাট মহানরূপ সুন্দর দেখায়। রাজপ্রাসাদের একটি ছবি নিলুম, তাতে বুঝতে পারবে তার স্থাপত্যটি কি ধরনের। এই পাড়ের মাথায় প্রাচীন রাজা চতুর্থ বেলা (King Bela IV) তাঁর গুপ্ত-প্রাসাদ গড়েছিলেন, পরের রাজারা সেই প্রাসাদ বাড়িয়ে যান, তারপর তুর্কীদের হাতে সে প্রাসাদ জ্বলে পরিণত হয়। বর্তমান প্রাসাদ রাষ্ট্র মন্ত্রিস্থা থেকেতার গড়া, অল্প পরে কিছু কিছু সংস্কার হয়েছে, প্রাসাদটীতে নাকি ১৬০টি ঘর আছে। একটি পরিচালকের তত্ত্বাবধানে খ্রিস্টীয় ভ্রমণকারীদের যে ভ্রমণালি দেখান হ'ল, তাতে দেখলুম, ঘরের আদ্যাব-গতর সাজসজ্জা



বর্ত্তান বংএর নক্সা আঁকা, চার্জের ভাণ্ডটিও নানাবর্ণের বৈকল্পিক টালিতে ছাওয়া, এই বর্ত্তান নক্সা ও টালি বোধে তর মূল্যমানের প্রত্যাহার চিত্র মনে হ'ল, এই ছোট চাক্ষুসীতে যেন রোমানের, গথিক, বাইজেন্টাইন সকল প্রকার স্থাপত্যের সুস্থিগন হয়েছে।

চারুটির সমুখে প্রাচীরে নৃপতি মাধু ষ্টেকানের প্রতিমূর্ত্তি। মধ্যস্থগেব মাটটবেশে রাজা ষ্টেকান চারিবিধে চারি দিকে-বকিত মন্ডের ওপর অধঃপরে, এ মূর্ত্তি যেমন মাঝার রাজা-পরিগ্রহতা: ঐষ্টানবন্ধ-প্রত্যেক প্রাচীরে নৃপতির স্বতঃচিত্র হেরি চিব-ভাগ্যে মাকার-ভক্তি-আম্বা-বাধের প্রতীক।



সেন্ট ষ্টেকানের প্রতিমূর্ত্তি

রাজপ্রাসাদের পাশ্চাত্ হ'তে সিঁড়ি দিগে নেমে নদীর তীরের রাজ্য দিগে বকিত দিকে কিছু দূর গিয়ে আব একটি ছোট পাশ্চাত্দের সমুখে এসে। পাশ্চাত্দের নাম "ব্লক্স-বের্গ" (Blockberg); তুর্কীয়া এর মাধ্যম "ব্লক হাউস" গড়েছিল, তাই থেকে এর নামকরণ। এখনও পাশ্চাত্দের ওপরে একটি চূর্ণের কংসাবেশে আছে। প্রবৃত্ত ধাবান সিঁড়ি পাশ্চাত্দের পা দূরে ওপরে উঠে গেছে; সিঁড়ি দিগে ওপরে উঠে সমস্ত নৃপাণ্ডের বড় স্কলর দৃষ্ট পেশুম—তলার ষ্টিকার তরা ডানিউব নদী বদমল ব'য়ে চলছে; ডানদিকে পাশ্চাত্

খাড়া নেমে গেছে, তারপর বিপত্ত-বিশ্রুত প্রান্তর, তাব মাত দিগে ত্রপালি পুতার তার ডানিউব নদীর পাশে বৈকে চ'লে নীলাকাশে কোথায় গািয়ে গেছে; বাম দিকে পাশ্চাত্দের ভেঁট খেলান, তাবের ওপর রাজপ্রাসাদ, পিক্সা, বাড়ীর সাহি, তাবের তলার নদীর তলবার ওপর শোলের পর শোল; ওপারে স্কলর পেট মচর, বিকীর চূড়াগুলি মাকাশে গিয়ে রেখেছে। প্রাচীর চূর্ণের কংসাবেশে-মস্তি এই ছোট সিঁড়ি বিশেষী ব্রমণকারীর চোখে অতি তুচ্ছই মনে হয়, উল্লেখ্য হ'তে বুড়াপেট মচরের সম্পূর্ণ দৃষ্ট বোঝার সুবিধা হিলাবে এই পাশ্চাত্দের সার্থকতা মনে

হয়, কিন্তু রাজ্যের ঐতিহাসিকের নিকট এ গিরি পূর্ণাঙ্গু, এ গিরি যে গিরিমালায় প্রথম চূড়া, প্রবেশ-স্বায়, সে গিরিমালায় ইয়োডোপীস সভ্যতার ভাগ্য-পতীকা হ'য়ে গেছে। এ বিধের একটি কদমী লেখক বা লিখেছেন তা তোমার অস্থায় ক'রে লিখি—

"এই প্রাচীর সহব বুড়া (Ruda) বাহাখবের মত, সাক্ষিসের মত, কাটালো-বিষের সমস্ত স্কলর, মত; পুর্বেই লিখিত মাঝে মাঝে

পন্ডনের সমস্ততার তাবা এখানে নির্ধারিত হয়েছে। এই পাশ্চাত্দের বালা বেগা বাজেরীর সুবিকৃত দমতলকৃষি এনিয়াবানীর প্রবল আকর্ষণ ছিল, এই পাশ্চাত্দের তলার আউলা (Aula) তার তার খেড়কিৎসে, তার পর, তাবের বদ খোখলের বদ খোড়া ধাকিয়ে চ'লে গেছে; তাহা বুগির মেঘের বত এসে খেড়ের বত সুবিকল্পে দিগিয়ে গেল। তারপর রাজ্যেরিমাঝটী এখানে তাবের প্রাস নদর তৈরী ক'রে বদবাল আরও করলে, বহনিন তাহা পন্ডন ইয়োডোপীসের মাল ছিল। কিন্তু বদব তাহা White Stallionর পূজা হেড় হোমের নিকট পুর্বেবর্ধে ঐকিত হ'ল, তাহা এনিয়াবানীর বিকল্প ইয়োডোপীসের ব'ইনবর্ধের বকত হ'ল :

পতাকীর পর পতাকী এই গাছাড়ে ফুলে ও পশ্চিমের বন সম্ভাভ
চালিছে। কুত-কুত শীতল মল্লবের বন উজ্জ্বল পর উজ্জ্বল এই
খিচিখিচি অবিকার করিতে দেহা কথোতে, আর সমস্ত *Genial* উজ্জ্বল
এবং একত্র হইতে যিন্দেহ।

তারপর ইংরেজাণীক সভ্যতার আর এক নূতন পুরুষ আবির্ভাব
হ'ল, আটলান্টার ভবনের চেয়ে বা মটু পার তাভাবের চেয়ে তাহা আরও
মোহন। আর পতাকী হ'য়ে ট্রান্সিলভানিয়ার কোথা কুত-কুতের
আত্মকম অস্তরের ছটিকে রেখেছিল। সেই আশিচাশ কণ্ঠিত্বসেব
একাকাল দুতার লব রেখে

সৌরবসর সমর পেতে : হায়া।
কণ্ঠিত্ব তার আমলভায়ে
ইতালীর শিল্পীর হৃদ
কবলে, এসেই সাহায্যে
ক'ও প্রাণস, চাউই তৈরী
কবলেই : তার পুণ্যতন কণ্ঠ
খিচিখিচি টানেলী বা উজ্জ্বল
লহরভিলের মত লুপ্ত সহ
কণ্ঠ উঠল : সৈন্যভিত
গ্রহণ ঘানে, জাতিভায়ে থেকে
বহু আলভ, হাটন থেকে
এক আলভ : কুত-কুত চাউই
গ্রহণ বোকা দহ ডানিভায়ে
কণ্ঠ হাটভায়ে করত,
ভেনিসের বহিকদের লকে
বাকল। চলত, বুড়্যপেট্ট সমস্ত



ইংরেজাণীর আট ও ঐখক সজিত হ'ত।

তারপর সত্বে বিলম্ব ঘনিয়ে এল, সব জাশ হ'য়ে গেল। কুত-কুত
জাশিআলিসের (jashimarini) কণ্ঠে হাউজিআল সৈন্য পাহাড়ে বিলম্ব
হ'ল, কুত-কুত হুত কলম করলে : হাউজিআল ইংরেজাণীক সভ্যতা লুপ্ত
হ'য়ে গেল, এলিচ। এসে এ বিলম্বিত বদলে : লহরের লকল বন, লকল
আট-লম্বের হলভান সৌমিআলের বৌকর কুতবে চালান হ'ল।
লহরের সব প্রাণস বাকী চাউই লুভিত হ'ল। আড়াই পতাকী সৈন্য
চল'ল স্টো সোমের ঘন ইংরেজাণীর বিভিন্ন জাতি হ'তে লগুতী ও
বিলুপ সৈন্তের বেতা। হ'তে কুত-কুতের হাউজি এই খিচিখিচি অবিকার
করলেই তখন কুত একটা লালকলব মাংস, পুণ্যতন দিলের কোন
খিচি কোন ঐখক নেই।

'লুকস্বেথার্গো' গাঁড়িয়ে ডাকলুম—দারাই ইংরেজাণীর জাশ
হ'য়ে এলোছিল তারাই পরে ইংরেজাণীর ভদ্রা হ'ল, কিন্তু

মাক্যাহরা যদি তাদের জাতি-জাতি কুত-কুতের মত পুতানবদ্য
গ্রহণ না ক'রে লুললমান পদ্য গ্রহণ করত, কুত-কুত মাক্যাহরে
মিলে প্রথম ভাষা। গ'ড়ে তুলত তা হ'লে ইংরেজাণীর ইতিহাস
কি রূপ নিত কে কণ্ঠতে পারে। কিন্তু মাক্যাহরাই কুত-কুতের
লমজাতি মাক্যাহরাইয়ের লগোয় তা তাহা বহুদিনই তুলে
পেড়ে : এমন কি কোন হাউজিআলকে যদি বলা যায়,
তোমরা ত লকলান মেগের লোক ; তাতে সে বিশেষ কুত হ'ল,

গেই ও জে-ব্রিগ

কুত হ'য়েও উঠতে পারে। কোন হাউজিআলকে প্রশংসা বা
খুশি করাবার লুপ্ত উপায় নকে, তাকে বলা, তোমরা ত
লকলান-মেগের লগ, তোমরা পশ্চিম ইংরেজাণীকান,
জাশিআল, ইতালীকানদের মত তোমাদের সভ্যতা পশ্চিমের।

'লুকস্বেথার্গো' থেকে নেমে শোল পার হ'য়ে গেটে এসে
এক রেস্তোরাঁতে লাক খাওয়া গেল। লুপ্তবেলা এই লম্বক
অনেক রেস্তোরাঁতে লম্বক লাক পাওয়া যায় ; কিন্তু সে
লাকের মেহু রেস্তোরাঁ-পাওয়াইই ইচ্ছামত করে। ভাল
মেহুই (Menu) পাওয়া গেল, একটা লুল, মাংস ও আলু
লিঙ, ফুলকপি, ও শেষে পুডিং। মাংস রান্ধাটি বেশ লালল,
এ লুললানী ধরলে মাংস রান্ধা, "হাউজিআল ভদ্রা" নামে এ
ভদ্রা লম্বক ইংরেজাণীক এলিঙ। নাম নিলে, আড়াই শেকে।

বিশু মৎ ক'রে
লালমণি বহু কল-
মল; তাদের মাঝে
ত'চারটে মৌলুল
সাদা মূল চকান;
এই রঙা লালকোঁঠের
পানের রাত্তা
মিখে একটি ছোট
যেয়ে নলে হাওয়া
মাথার পলি বহু
লাল টুকুকে কমান
জড়িয়ে চলেতে, সেও
যেন একটি লালমূল;
এই রঙীন গোড়ার



অবলম্ব

হালোদি-অভিত

‘শাইলটের লম্বু বহু বহু’ বৃত্তান্ত-অভিত

ওগু বহু মীল আকাশ নত ক'রে পড়েছে, তাতে
রাখা তুলার মত সাদা ময় চকান। এই
মত-মতের আন্তরিক দৃষ্টি শ্রীরা তীব্র অন্ধরের
লগ্ন দিয়ে এখন সজীব করে প্রবেশে, যে
বেশেষত শুধু চোখ নয় মনও তোলে। লোকোৎসাহ
ভিনার খেয়ে একটা কামেতে বেশ আরাগে বহা
গেল। সমস্তদিন লহরের পরবাক্তি আশাদ
মিউজিয়াম দেখেছি এবার লহরের নরনারীদের
বেশতে বহুগুন। কেউ খবরের কাগজ
পড়ছে, কোন টেবিলে বেশ গল্পের আভা
মমেছে, কেউ কাকির খাট সামনে বেখে রাখার
জনস্রোতের দিকে চোখ আছে, কেউ বা কোন
বাড়ির প্রতীক্ষার একটু চকল হ'য়ে উঠেছে।
কাফের ভূতা কয়েকখানি খবরের কাগজ পড়তে
বিরে গেল, দেখলুম কাফেতে শুধু কয়েকজন
নয়, ইংরাজী, কাম্পান, পরগণী ইত্যাদি নানা
ভাষার খবরের কাগজ পড়িকা আছে। কিন্তু
কোন কাগজ পড়তে মন লাগল না, পথের
জনস্রোত, কাফের নানা বহুদের নরনারীদের
দেখে বহুমান হালোদীর কথা, অবিদ্যুৎ হালোদীর



কথা তাৎক্ষণিক লাগলুম। হাঙ্গেরী এখন ইটালোপের
একমোট বটে কিন্তু উইগোরের সমতা হ'য়ে আছে।
হাঙ্গেরী এখন শান্তির রূপ ধ'রে আছে বটে
কিন্তু তার অন্তরে শান্তি নেই। একখান: পুরাতন
ইটালোপের মাথার সঙ্গে যুদ্ধের পরের নতুন
ইটালোপের মাথা যদি তুলনা ক'রে দেখো ত দেখতে
পাবে, নতুন হাঙ্গেরী কতটুকু, মহাদেবের আগের হাঙ্গেরীর
অনেকটা মত। যে ট্রিয়ানো-সন্ধিপত্র (Treaty of

১৮৬৭ সন লোভার, রুপার, ভানার, লবণের ও শান্তির বনি-
গুলি হাঙ্গারে হল, তার প্রায় সব লোভার বনি পরের হাতে
চ'লে গেল, তার সব ভাল ও বড় করবার বনিগুলি ও
প্রায় সব বন হারতাক্ত হল, এ সব দম্পদ কমে নিরা
চেকো-স্লোভাকিয়া ইউগোস্লাভিয়ার মধ্যে ভাগবটরা হ'য়ে
গেল। শুধু এই দুইটি নর এর লুকে তিন লাখ মজার
পরের অধীন রয়েছে, হাঙ্গেরীর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় আশি
লাখ, অতঃপর যুদ্ধের পরে ট্রিয়ানোর সন্ধিপত্র হাঙ্গেরিগানদের

আগে কি বকম বেছেছে। মজারদের
সব চেয়ে আগে যেমন রয়েছে, ট্রান্সিলভেনিয়ার
কমেনিয়ার হওযতে, এখানে পনেরো লক্ষ
মজার আছে, ট্রান্সিলভেনিয়ার সঙ্গে
হাঙ্গেরীর বিচ্ছেদ তারা কিছুতেই সহ্যে
না, এর জন্যে হাঙ্গেরী কমেনিয়ার মধ্যে যে
মনোমালিন্য চলেছে তা ত কিছুতেই মিটে
না। ট্রান্সিলভেনিয়া না গেলে এ অধ্যাক্তি
দূর হবে না। অগত, ট্রান্সিলভেনিয়া
কমেনিয়ার দেওয়া হবে এই প্রতিজ্ঞা এই
সঙ্গে কমেনিয়া ইংরাজ-করাশী-রুশিয়ার সহিত
জার্মানি-অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল;
দেওত যুদ্ধের পর সে অংশ তাকে বিতে হয়েছে।
ট্রিয়ানোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পর সমস্ত মজার
জাতির চিত্ত কিরূপ অশান্ত বিস্তারিত হ'য়ে
উঠেছিল তার চিত্র হয়ত সব ট্রানে ট্রানে
বাড়ার দরজার দরজার আছে। প্রায় প্রতি
মজার-বাড়ার গ্রন্থের দরজার একটি ছোট
মেটে লেখা আছে, "Nem, nem, solus"—না,
না, কখনও না, আমাদের দেশের এ দুর্গতি
আমরা, কখনও দূর করব না।" প্রতিদিন
'বার বার মস্তের মত এই কথাগুলি শ'ড়ে



মোচাচ মা ও মেয়ে

Trianon) হাঙ্গেরীর সহিত Allied and Associated
Powers সঙ্গে শান্তিচাপনা হ'ল তাতে হাঙ্গেরীকে জেটিয়া
স্লোভেনিয়া ও ট্রান্সিলভেনিয়া ছাড়তে হ'ল, তা ছাড়া হাঙ্গেরীর
কিছু অংশ চেকো-স্লোভাকিয়া গেল; এই অংশগুলি ছাড়াতে

মজারদেরা তাদের তীব্র জাতীয়তাবোধকে শাণিত
করে। শুধু বাড়ার গারে মত, পথে ঘাটে ট্রানে
অন্তরক মজার রাখবার অরি-বাধী সব লেখা;
প্রতি ট্রান্সিলভেনিয়া মজার-জাতির বিশ্বাস-মত লেখা—

“আমি এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। আমি আমার অন্তর্ভূমিকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি এক পরমী নুতুত আসছে। আমি আমার হাঙ্গেরীর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করি। শান্তি।”

এটি বুকের পর শান্তিস্থাপনের দৃষ্টিপট্রেই আগামী দুই বছর বীর থাকে, কারণ বিজ্ঞতা কখনও বিজ্ঞিতের প্রতি স্মারকিয়ার করে না, আব পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়

ক'কে থেকে জোটেরে কেরবার পথে পাস্ত জনগোষ্ঠের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে এসুম, মতাই কি এখনও হাঙ্গেরীর আত্ম একাগ্রভাবে জল করছে, “না, না, কখনও না, আমাদের দেশের এ ভূগতি আমাদের লক্ষ্য করবে না;” অথবা: বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার লক্ষে সে একটা আপোষ ক'রে নিচ্ছে, সে মন্তব্যনি স্পষ্ট চ'রে গেছে। নরনাগোষ্ঠের দুই বছর দিকে চেয়ে মনে চ'ল যেন



পদ-কেন্দ্র

তৃপ্তিনির্ভার-স্বাধীন-অস্তিত্ব

অজায় কিছু দিন টি'ক্রে পারে কিন্তু তিরদিন টে'কে না। হাঙ্গেরীর প্রতি অজায় বিচার করা হয়েছে কি না তা আমি ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু প্রত্যেক মাফ্যার হাঙ্গেরিয়ান বিশ্বাস করে, তাদের স্বদেশের স্বরাজ্যের কথা হয়েছে, এর অবিচারবোধের আশা যদি আপোষে দ্বিগুণ করা না হয়, ত চরিত কোনদিন অশান্তির আন্তন ঘ'লে উঠবে।

সবার মুখে একটা বিশ্বাসের চিহ্ন, প্রাণে মানবের উচ্ছ্বাস বেই।

এইখানে শেষ করি। বুড়াপেটে সবচেয়ে তোমার তানার উৎসব। বোধ হয় পূর্ব বেশী মিটল না। বসন্ত: হাঙ্গেরী সবচেয়ে উৎসব: আগাবার অস্ত্রই আমার এতগুলি পাতা লেখা, কমাবার লক্ষে নয়।



পান্ডাজ চুংরী

মন না বড়াই কি তুল করিয়ে তাপড় ঝড়ান গোপী ।
মন্দির তলে আদম পাঁতল নিলা পূজনেরি লাগি ।

চরম বনে, গিরিশিবে,

বহু ক্রোশে মরিগ দে দিয়ে—

রাজ, তাঁরে নাতি মিলে, বসে মেবে কোন অহুহানী ।
অনুরবানী অনুরবানী অস্তরে কবী একা—

নাও গেম, আরো গেম, আরো আরো আরো গেম,
আরো গেমেরে মিলিয়ে বেথা ।

বোল বোল বোল বার বোল,

তাঁর পানে অঁপি ঝট তোল,

তাঁর গেমেরে আশনরে তোল, তাঁর সাথে রু নিবি আদি ।

কণা, হর ও বরদিপি—নির্দিষ্টগতঃ বকাল

না সঁ । ১ । সঁ নসঁ রঁ সঁ নাঃ - ৩ সঁ নসঁ ।
তা রে কি হু ন ক কি হু ন ক

পা বা পা মা । নসঁ - রা পা বা পা মা ।
কা ল ড র পাঃ কা ল ড র

বাঃ
ডঃ

স্বরলিপি
ত্রিবিংশচত্ৰ বড়াল

ধা পা পা । অধা -রা গা মা । গমা -পা ।
না পু অ রে০ হি না গ০

II { পা না না না না সী গমা -সঁরা সঁরা
৩ • রে গি হি রে

সী রী সী সী
৩ ৩ ৩ ৩

ধসী- গধা সঁপা- । -। -। (পা-না) } I
• •

মা -ধা ধা ধা
৩ ৩ ৩ ৩

ধা সঁরা ধসী- গধা পা- । -পা -মা
না হি০ মি • গে

গা সঁরা I ধসী- গধা পা-
না হি০ মি • গে

রা গমা -পা পা-
অ রা • গ

I: { মা
অ

ধা পা
অ এ

না না -পা পা না সী না । সী না সঁরা -রা ।
হো হো ৩ অ হো অ অ হো হো • ৩



} II

স।

পা ন। } I
 ~~~~~  
 . . .

ধর্মা-

সর।

ধর্মা - গধা পা।

ধে

ল



# সমস্যাগী-সাহিত্য

## আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

জীতশীলচন্দ্র মিত্র

পারম্পর্য ও বৈজ্ঞানিকতা

রোমান্টিক সাহিত্য যখন সত্যের অনুলক্ষ্যন করিতেছিল, কল্পনার পথে আরোহণ করিয়া;—বিজ্ঞান তখন তাহার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চুল করিয়া বসিয়াছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সে উড়াইয়া দিল তাহার স্বপ্ন-পতাকা,—তাহার বিজয়-গৌরবে সকলের চোখ কল্মসিয়া গেল,—মানুষ জীবনের একটা নূতন রূপ দেখিতে পাইল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের এই অভিযানটিকেও রোমান্টিক বলা গাইতে পারে। রোমান্টিক্সের অন্তরে ছিল যে অগ্নুপ্রেরণা,—ইহার মধ্যেও সেট এক অগ্নুপ্রেরণা,—কেবলমাত্র প্রণালীর প্রভেদ। এই অগ্নুপ্রেরণা যাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের উপর এমন একটা অগাধ বিশ্বাস ধরা তাহার অন্তরের মধ্যে একবারে শিকড় গাঁথিয়া বসিল। বিজ্ঞান যাহাদের এক রকম দর্শন হইয়া উঠিল। বার্মিংহাম ঘোষণা করিলেন,—বিজ্ঞান আনিয়া দিবে এমন একটা কল্যাণের লগ্ন। যখন বাস্তবের বন্ধনে বিশ্বমানব এক চটয়া বাঁধে।

আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের এই অভিযান রোমান্টিক্সেরই একটা প্রসারণ,—একটা টানিয়া-বেঁটরা ধারা; ইহাকে রোমান্টিক্সের বিরোধী বলিয়া মনে করা চুল,—তাহাতে রোমান্টিক্সের প্রতিষ্ঠা স্থগিত করা হয়। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা অবিস্তার করা হয়। অবশ্য একলা পৌঁছার কঠিন,—রোমান্টিক্সের মধ্যে যেটুকু ছিল ছুটা,—যা

উজ্জ্বল ও অসংযত কল্পনার ধারা তেবলট একটা অলৌকিক রূপের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল,—বিজ্ঞানের সব আবিস্কারের কটিকা-খণ্ডে সেটুকু উড়িয়া গেল; কিন্তু যেখানে রোমান্টিক্স ছিল বাঁটি,—যেখানে কল্পনার গল ছিল অল্পদৃষ্টিগ পক্ষুণ্ডে সংঘত,—সেখানে বিজ্ঞান ও রোমান্টিক্সের মধ্যে কোনো বিরোধ ত ছিলই না—অপর পক্ষে এই অল্পদৃষ্টির অল্পটি আত্মসাৎ করিয়া বিজ্ঞান আপনাতঃ সত্য-বিশ্বাস করিয়া চলিল,—বাহিরের সচেতন জগৎ চটতে অস্থির হইতে লাগিল মতো,—পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, অর্থাৎ-বিজ্ঞান, যেহেতু ইত্যাদি হইতে সাহিত্য, ধর্ম, মনন, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদির মধ্যে।

পূর্বেই বলিয়াছি,—রোমান্টিক সাহিত্যিকেরাও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। উৎসাহের আঁচলতো তাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন,—আপনাদেরই আবেগের বিকসে। ‘সত্যের মধ্যে প্রাণ’,—এই ছিল তাঁহাদের আদর্শ,—কিন্তু উদ্বেগজন্য ও অতিরিক্ত উৎসাহে তাঁহারা কল্পনার রথে আবেগের সব ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন,—অলৌকিক যাত্রা-বাহারের মধ্যে ছুটি। অবশ্য রোমান্টিক্সের মধ্যে গাভারা ছিলেন মনোবা,—তাঁহারা ভুল্ল মৈনামিন বাস্তবতাকে একটা আদর্শের আলোতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, কল্পনার রঙে বাস্তবতা বিবাহছিলেন,—আবেগের অগ্নুপ্রেরণার তাহার লুপ্তকৃত্যু নাশ করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—কিন্তু এই মনোবার অভাব ছিল যে সকল লেখকদের মধ্যে,—তাঁহাদের মধ্যে কেবল ছিল আবেগের বাড়াবাড়ি, ভাববিলাস আর অর্থহীন শব্দের সজ্জার।



সাহিত্যে এসবল তিনিশ কখনো ব্যাধা হইতে পারে না, তাঁর বিকল্পতাও ডেউ উঠিল,—আবার কিয়দা মাদিল, জীবনটাকে টান্দিগ-প্রত্যেকের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করিবার বাসনা,—স্থির ঐতল দৃষ্টির বিষয়ে ব্যাধার পরিমাণ করা যায় না, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার আশ্রয়।

কিন্তু অহুঃপ্রেরণা সেই একই। ‘সত্যের মধ্যে প্রকাশ, সমগ্র জীবনের সন্দোহহীন প্রকাশ,—আটো’ স্বাধীনতা’—রোমান্টিকদের এই বাণী মাঝেবে মধ্যে মর্মে প্রাণিত হইয়া গিয়াছিল। এ আশ্রয় সাজু ত্যাগ করিল না, কেবল বিভিন্ন প্রাণীকে অবলম্বন করিল মাত্র। কল্পনার সাহায্যে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক-অনুভূতির দাড়াইয়া গ্রহণ করিল। ফলে, মস্তকের আশ্রয়ের যে আলো তাহা নিতিয়া গেল, কল্পনার রঙ মিটিয়া গেল,—রহিল কেবল নিছক্ প্রত্যেক সত্যের একটা নিরাতরণ দৃষ্টি,—জীবনের কিছু সৌন্দর্য্য, সবটুকু কখনো, জীবনের আশা, জীবনের বিতর্কিত্যর একটা হৃদয় প্রতিভা। এমনি করিয়াই হইল ফরাসী সাহিত্যে ব্যক্তব্যতার জন্ম।

কলা বাস্তব, যে, রোমান্টিক যুগের অবলম্বন হইলেও ফরাসী সাহিত্যে এর বাস্তবতা বা রিয়ালিজমের আবির্ভাব রোমান্টিক আবেগেরই ফল। যে সকল লেখক এই ব্যক্তব্যতার যুগের প্রবর্তন করিলেন,—ভীতাহের মধ্যে অন্যতমই ছিলেন রোমান্টিকদেরই বলচুক। একজন স্ত্রীলোক। তাঁহার লেখার অনেক গুণ ছিল, বাংলা রোমান্টিক,—কিন্তু তাঁহার বর্ণনা-ভঙ্গী ছিল প্রধানতঃ বস্ত-স্তর। তবে সাহিত্যে ব্যক্তব্যতার সূর তিনি বধন তুলিলেন, তখনো তাঁহার ষ্টিক সমর আসে নাই,—তাই জীবনব্যায় তাঁহার লেখার ভেতন আবহ হই নাই। এই দলেরই একজন লেখিকা ছিলেন (George Sand)। তাঁহার প্রথম উপজাতগুলি ছিল একেবারেই রোমান্টিক,—কিন্তু পরে তিনি কতকগুলি উৎকর্ষশূলক-উপজাত রচনা করিয়াছিলেন। এই দলের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য বেট্রানার নাম, তাঁহার মধ্যে একজন বাস্তবতাক্ ও আর একজন সু-বোয়াল। ইঁহাদের সকলের লেখার মধ্যেই এমন অনেক ক্রিয়াদি ছিল বাংলা রোমান্টিক,—তার কারণ রোমান্টিকদের

বাণী তাঁহাদের মধ্যে মগ্নে প্রাণিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ত্রুটিবৃত্তির দ্বারা বেচার ত্রুটিয়া তাঁহারা প্রচলিত করিলেন যে—আধুনিক উপজাতগুলি রোমান্টিক হইলে চলবে না,—কেম না, কেবলমাত্র অবলম্বন-বিনোদনের জন্ত একটা অলোক ক্রিয়াদি বিস্তৃত করাই ত উপজাতের কাজ নহ, উপজাতের দ্বারা চাই সত্যের একটা অবিকল প্রতিচ্ছবি। এমন কিছু উপজাতের মধ্যে পরিচিতি কব; উচিত নয় বাংলা অলোক, কল্পনা-প্রসূত, বাংলা মিথ্যা, বাংলা উপজাত-রচনিত। বচক প্রত্যেক করেন মাত্র। এমন কি তাঁহার জীবনের অচিহ্নতার ভিত্তরে তিনি যদি এমন কিছু পাইয়া থাকেন, বাংলা সাধারণতঃ দেখা যায় না বা খুঁট না, তবে সেগুলিও উপজাতের বিষয় হইতে বাদ দিতে হইবে,—কেম না সেগুলি পরিচিতি করিলে উপজাতটি মিথ্যা ও অসঙ্গত মনে হইবে। উপজাতের ব্যর্থ বিধ হইতেছে। মাঝেবে প্রতিদিনকার একেবারে অতি সাধারণ-জীবন-ব্যায়,—বাংলার না আছে আরম্ভ, না আছে শেষ;—সেই সব নিত্যক তুম্হ সাধারণ ঘটনা, বাংলা প্রতিদিন সকলের জীবনেই ঘটয়া থাকে,—ইউক-না-কেম তাহা ঘটই নীচ, বসই ইতর, ঘটই কখনো। স্বভাঃ বাংলা হৃদয়, বাংলা মনল, বাংলা কল্যাণ,—জীবনে ত তাহা বসে। ঘট না; সেগুলির জীবনের নিয়ম নহ,—সেগুলি জীবনের ব্যতিক্রম।—তাই সেগুলি উপজাতের বিবর্তিত হইতে পারে না।

বিজ্ঞানের অহুঃপ্রেরণার ব্যক্তব্যতার এই মস্তগুলি সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলা বলিলেন,—উপজাতের শুধু ব্যক্তব্য জীবনেই একটা অবিকল ছবি থাকিলে চলবে না,—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকেই পরীক্ষা করিতে হইবে,—বাস্তব জীবন হইতে উপজাতের সাহায্যে সেগুলিকে প্রাতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আশ্রয় অফরের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিলেই উপজাত-রচনিত চলবে না,—তাঁহার কাজ নিরন্তর বাহিরে দাঁদিয়া মাঝেবে বৈদ্যনিন জীবন-ব্যায়ের শত সহস্র দৃষ্টান্তে নিরীক্ষণ করা,—মাঝেবে সেই সব প্রগতি আকাজ্ঞা, বাংলা পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা,—বাংলা লইয়া সত্যকার জীবন গড়িয়া উঠে। মাঝেবে বাংলা ব্যর্থ জীবন, তাহা ত জন কয়েক বড় বড় লোকের জীবন নহ,—সে জীবন



ত মিশ্রণ, কৃত্রিমতার পরিপূর্ণ,—মাত্রের বাহ্য সত্যকার ভাবন,—তাহা বহুপ্রকারে ঐতিহ্যগত নতুন-নতুন জীবন, সত্য ভাবের বাহ্যের আশ্রয় বলি ছোট পোত,—কিন্তু বাহ্যের ভাবের মধ্যেই প্রাণ-বোলা সত্য সত্যতার সন্ধান মেলে। মাটির কাজ এই ঐতিহ্যগত জীবন হৃদয়ভাবে পরীক্ষণ করিয়া তাহার, রঙে, সৃষ্টিতে মুগ্ধতা করিয়া ফুটাইয়া তোলা। অতএব উপজ্ঞান-লেখককে সনাতন মূল্যবোধ প্রাণ পরিভ্রমণ করিতে হইবে,—যথার্থ ভয়, অশ্রুত পলায়ন,—এই মার্গে আশ্রয় ফুটাইয়া তুলিয়া পাঠককে আর মিথ্যার মধ্যে ডুবাইয়া রাখা চলিবে না,—প্রাণের আর বাহ্যই হউক, সত্যের প্রতি সন্ধান দেখানো হইবে না।

এই ধরনের কবিতা লেখকের মধ্যে বিবেচ্য করিয়া উল্লেখযোগ্য নাম,—মোনা ও মোহন। অনেক বাঙালী পাঠকই আজকাল ইহাদের লেখার সহিত সুরমিচিত, এবং ইহাদের এই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার বস্তু আকর্ষণ বাংলা সাহিত্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সত্যমতে বড়ই ইঁদারা বৈজ্ঞানিকতা প্রচার করুন না কেন, মনে প্রাণ ইঁদারা ছিলেন রোমান্টিক,—যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সত্যমতের ভয় বড়ই ইঁদারা বহিঃপল্লবের পরীক্ষণ-প্রাণী প্রচার করুন না কেন, আগলে সত্যোপলব্ধি ও সত্যপ্রকাশের অস্ত ছিল ইঁদাদের মস্তকের মধ্যে, করুন, আবেগ ও অস্বস্তি। বস্তুতঃ সত্য-সত্যতার পথ ত কখনো বিজ্ঞান-বিকল্প হইতে পারে না, তাই এই সব লেখকের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রবৃত্তি ও রোমান্টিক প্রবৃত্তির একটা সম্মিশ্রিত ক্রিয়া চলিতেছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিজ্ঞান ও আট এক মিনিট নহ, উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা উভয়ের একেবারে প্রকৃতিগত। বহিঃপল্লব হইতে অন্তর্ভুক্তের মধ্যে বিজ্ঞানের যে ভয়স্রোতা, তাহাতে এই প্রভেদ দুইটা পেল না, বহু আশ্রয় মুগ্ধতা হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি উপজ্ঞান-সন্ধানের কাজে লাগাইতে দিয়া পল্লব বুঝে আবিষ্কার করিলেন—দুই বিবেচন ও পল্লব আশ্রয়, —তাহা স্বতন্ত্রভাবে সত্য ঐতিহ্য, তাহাতে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা বেশ চলিয়া যার, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান-পাথর হই না। এমিল বুত্রো (Emile Bultoux) বলিলেন

নহ; কেন না বাহ্য কিছু বিবেচন করা যায়, তাহার মধ্যে আর প্রাণ থাকে না। তবু বুত্রো উপজ্ঞানগুলি এই বৈজ্ঞানিক মতপ্রাণের প্রতিফলন করিতে পারে না,—যদিও তাহাদের বিবরণ, বহু-বহু ও অন্তর্নিহিত সত্য কোণা-স্বতন্ত্র উপজ্ঞানগুলির একেবারে বিবরণ। বুত্রো উপজ্ঞানের চরিত্রগুলি সমাজের নিরপেক্ষ জন-পাথর হইতে পৃষ্ঠাও নহে, এমন কি কোনো অপ্রাণ চরিত্র, ছাড়াও, মাতাল প্রবৃত্তি সমাজের আবরণ-জাতি নহে; তাহারা সকলেই উজ্জলময় হইতেই নহেন,—অন্য বিলাসে বাহ্যের দিন কাটিয়া যার,—অন্ততঃ পক্ষে বাহ্যের কর্মজীবন বৃদ্ধি ও কার্যবিচার চোখ আবদ্ধ। সমাজের নিরপেক্ষ হইতে আর উচ্চ জাতের চউক, মানবজীবনের যে জটিলতা, তাহা সত্যই বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ লব্ধকে ছাপাইয়া যার। সৌভাগ্যক্রমে এই জটিলতা বুত্রো সৃষ্টি একাইয়া যার নাট। ইনি বুঝিয়াছিলেন যে জীবনী-শক্তির বিকাশের যে অস্বস্তি প্রাণী—তাহাকে ঠিক বিজ্ঞানের বাহ্য নিয়মে মধ্যে বহা যায় না। তাই মানবজীবনের যে বৈজ্ঞানিক আশ্রয়, তাহা একেবারে বস্তু চোখ আবদ্ধ, যদি তাহার মধ্যে শুধুই একটা জীবনের জটিলতার বৈজ্ঞানিক বিবেচনের প্রাণ থাকে, যদি তাহার মধ্যে জীবনের যে অস্বস্তি পরিবর্তন, জীবনীশক্তির যে অস্বস্তি হইতে ভয়, অস্বস্তির মধ্যে যে প্রভেদ তাহা,—তাহার প্রতি একটা হস্তিত না থাকে।

এমনি করিয়াই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি মাত্রের যে অস্বস্তি বিবরণ, তাহা ক্রমশঃ লিপিত হইয়া আসিতে লাগিল। বাহ্যের এই বিবরণ লইয়া অস্বস্তি উৎসাহে কর্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন,—তাহাদের মধ্যে অনেক ক্রমশঃ নিরাস হইতে লাগিলেন। এতদেক অনেকদিন হইতেই মানবজীবন বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান যে, সত্যের সন্ধান বহু তাহা চেনা সত্য নহে,—তাহা বাহ্যের সত্য মাত্র, তাহাতে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা বেশ চলিয়া যার, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান-পাথর হই না। এমিল বুত্রো (Emile Bultoux) বলিলেন



যে বিজ্ঞানের নিঃস্বের মধ্যে আমরা যে উপলব্ধি করি  
একটা সুস্বোভাৱিত নিষ্কিষ্টতা ও নিশ্চয়তা,—তার কারণ  
তুই এই যে, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনব্যাপী একবারে  
অনিষ্কিষ্টতা ও অনিশ্চয়তার ভয়া। বিজ্ঞানের নিঃস্ব চেষ্টা  
অস্বচ্ছন্দ ও বহির্ভাগ্যের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন করা,—  
দাঙতে প্রতিদিনের কাজ চলিতে পারে,—মাহুয়ের সঙ্গে  
আর অগ্ৰেণে সঙ্গে কোনো বিরোধ না বাধে। বার্পস

পরিষ্কার প্রমাণ করিয়া দিলেন, মাহুয়ের যে বুদ্ধি-শক্তি  
তাঁহা কেবলই তাঁহার বাহ্যিক জীবনের একটা  
অঙ্গ মাত্র। সত্যের মনঃপ্রবেশ তাঁহার কাজ নয়,—তাঁর  
কল্প চাই অঙ্গ অঙ্গ। মাহুয়ের মনঃ-শক্তি intuition)।  
মাহুতো বৈজ্ঞানিক অহুঃপ্রবেশা এমন করিয়াই সম্ভব।  
আবির্ভূত হইয়া অল্পদিনেই মরিয়া গেল।

( ক্রমশঃ )

## দূরের কথা

জীমলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা পায় না নাগাল

এমনি তালের দূর,

তাই বেঁধেছি গানে আমি

তাই বেঁধেছি স্বর।

সূর্যের গলে ঘূরের হাসি,

আনমনেতে বাঁধার বঁশি,

কায় সে আলো কায় সে বাঁধা

অপেক্ষ সাগরে,

অনেকখানি হাসি ঘরে

একটু অগ্নিরে।

কে সে আমার গুহ হারা

কে সে আমার দূর,

কতু হারার গোপের কথা

কতু গানের স্বর।

কতু ভালে নখন কোণে,

কতু হাসে লহন মনে

লবার গেবে সেই ত ঘোটে

অতি গোপনে,

হঠাৎ হেরি হস্ত ধরেছে

কুঁড়ির বশনে।

## বন-ভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

“যেহে কেন আশো ?”

“গিন্নী গেছেন বন-ভোজনে, সবাই আছে তালি।”

“ওখানে কেন কাটা ?”

“গিন্নী গেছেন বনভোজনে ছেলেরা লোগার চাঁটা।”

“ভাবপর কি মা ?”

“আর নেই মা, এই চুটী—”

চরিত্র চাড়ির স্ত্রী আদিয়া বিজ্ঞাসা করিল, “বাবু মা, কাল কি দাঁড়া দাঁড়া বন-ভোজন হবে ?”

“তাইত সবাই মত করছে, মা। কাল দিনটে তালি, পুনিমা। তাত মাসে আর তেরন দিনও ত নেই।”

“বেশ, তোমার যেটা বললে বাবু মায়ে একবার শুধিরে আর। তাহলে কাল সকালে মাঝাল-তলাটা টেতে তুলে পরিষ্কার করে রাখতে হবে, পাঁচঘন ভাতের লোকের সঙ্গেছেলে ভোজন করবেন।”

“হা, তবিলকে রাজ্যখাটগুলোও একটু কোণ-কাল কেটে পরিষ্কার করে রাখতে বলিল।”

চাড়ি বৌ চলিয়া গেল।

শ্রী মুচি আদিয়া বলিল, “বাবু মা, তাহলে অল্পমতি লোক—বন-ভোজনের চোলাটা দিবে আসি।” সে অল্পমতি গাইয়া চোলে কাঠি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

তুষণ পরামর্শিকের মা তাহার মেয়ের বাটী চুটেতে করিতেছিল। চোলের কাঠিতে বন-ভোজনের ঘোষণা জন্মিয়া সে যেন একটু চোঁটা গেল। কোমরের পুটিলিটা নিজের বড় ঘরের ঘরে তড়াহাড়ি নামাইয়া রাখিয়া বাবু মায়ে বাড়ি আদিয়া বলিল—“বলি, বাবু মা, আমাদেরও ত একটা মত নিতে হয়। স্বয়ং মুচি বাড়ত, গোপাড়া নেই—”

বাবু মা একটু চাণ্ডিয়া বলিলেন, “নাশতে বৌ, তুমি ত বাড়িতে ছিলে মা বাড়ি! তে-মাকেও খোঁজ করা হয়েছিল। এ মাসে ত আর দিনও নেই—”

নাশিত-বু বাবু মায়ে মিষ্ট কথায় একটু নরম হইয়া বলিল, “ত গোন্ধ বাড়ি। আমি এখন কি করি—

বাবু মায়ে নাশিন বির নাম বিভা। সে বলিল, “নাশতে দিদি, ভাবনা কি ? প্রায় রক্তিতের বাতানে চিড়ে, মুচিক আছে ; তোমার গোম্বালে পক আছে।”

নাশিত দিদি একদুখ চাণ্ডিয়া বলিল, “দূর বাবু! বাতান রাতে রিনিয়ের অভাব কি ? এদিকে যে—কি বল। ‘চাঁড়ে নেই আমনি, ঘেঁষ মা ভাবনী’—”

বিজা চাণ্ডিতে চাণ্ডিতে বলিল, “কেননা নাশতে দিদি, তেওয়ার ত এক ভাঁড় টাকা সেট ঘরের দেওয়ালে পোতা আছে ; আরও এক ভাঁড় ভুঁড়ি হ’লে এল বলে—”

“গুন্দ বাবু মা, বিভার কথা। আমার কোথায় টাকা পোতা আছে, তুই কি দেখে এসেছিস্ মা ?”

সন্ধ্যাপদের অতুলের মা আদিয়া বলিল, “ঘোলা-পুলি জুটো বাঁর ক’রে দাও, বাবু মা, এক খোলা বুড়ি তেঁকে দিবে গাই। হউএর আবার সব এসেছে। দিবে আমাকেও তাত চড়াতে হবে।”

“হউএর আবার আর এল ? এই সোমবার বয়েল, কোথায় খাবে পরবে, কাছকণ্ড করবে, তেঁসে-পাল বেড়াবে, মা ত্রাঙ্ক আর জ’ জ’ আর পেটরোডা পি-ল—”

“তাই ত বলি বাবু মা! পাটা ত নিচুম হ’লে গেল। এই ক’বছরে কত উঠতি বয়সের লোককেই যেতে দেখলুম—”

“তোরাই বা কি বেবেছিস্ মা! আমি এখন প্রথম ঘর করতে আসি, তখন এ গাঁয়ে যেত হাজার লোকের বাস।



গত ব্যয়ের মত বড় উঠানেও ঘটানবর্ষার দিন নয়-পাথর।  
নখন খেতে বলত, দাওয়া হ'ত না—”

“মত লোক খেল কোথা, তি মা ?”

“মরে গেল। সন্ধ্যাকই এক দিন না একদিন খেতে  
হবে, তা নয়। কি যে কাল মালেকির মত এল !  
আমার বেশ মনে আছে আমাদের উনি গরল। বাবুদের  
চৌমণ্ডলে শালা খেতে যেতেন। সে দিন রাত্রির  
কিটে একটু বেশি ঘেরি হ'বে গেল, আমি ভাত নিয়ে  
ব'লে চুলচিলেম, একটু একটু রাগও হচ্ছিল। উনি এসে  
তা বুঝতে গেলেন বললেন, ‘বাগ করো না, আর কোথাও  
গাতি নি।’ জ্বলন বাড়াইবে এমন কৈশে ছর এল যে তাকে  
তিনখানা বেশ চাপা দিয়ে তিন চার মনে খটখানেক চোপ  
রাখতে হচ্ছিল। ‘তাই রাত হ'রে গেল।’ আমি বললুম,  
‘সে কি ?’ তিনি যে মত অথাক ক'লে, জ্বলন ঠাকুরপোর  
আমার মত।”

পানের বদিলবার চাপতে অতুলের মা বুদ্ধি ভাষিবার  
শোলাটা উঠানে চকোটেভিছিল,—জিভাসা করিল, “কেন,  
জ্বলন ঠাকুরের কি কথা মত হ'ত না ?”

“ছর দেখলে কারই বড় একটা হ'ত না। তোমরা  
কি ক'রে জান্বে মা ?”

বিভা বলিল, “জ্বলন ঠাকুরের কথা কি বলছিলে  
তি মা ?”

“ঈদ। জ্বলন ঠাকুরপোর কথা—সে ছার কি ক'বে !  
তার বেঘম ছিল গায়ের চোব, তেমনি ছিল খোরাচ !  
আমার সঙ্গে সেওর সম্পর্ক কি না, কত যে ভাকর। কহত !  
একদিন—সে দিন তাই-বিঠারে—আমার তাই বেবেধ  
এসেছিল ; জ্বলন ঠাকুরপোকেও উনি খেতে বলেছিলেন।  
খেতে ব'লে কত ঠাট্টা মজাইবে সে ক'রছিল ! এখনই  
পাতে কিছু দিই—ব'লে উঠে, ‘ওইহু কি যিহু বউঠাকুর,  
ওতে তোমার তাইটির দহরে পেট ভরতে পারে, আমার  
পাক্কাগেরে ডাবা পুকে না।’ শায়েল খেবার সময় আমি  
খোমটার ভেতর থেকে ইলাল। ক'রে বাট্টে পাঠের উপর  
তুলে নিতে বললুম। তারপর হুড় হুড় ক'রে আর আর  
টাকি পাঠে পাতে চলে দিলুম। বাট উপহু ন'কে খালাটা

চ'রে খেতে ঠাকুরপোর কি কৃষ্ণি : ব'লে উঠল, ‘এই ত  
দেওয়ার মত দেওয়া, বউ ঠাকুর।’ বেবেধর ঠাট্টা ক'রে  
বললে, ‘এইবার বাড়াই : মশাই, আর ত আমাদের মত  
ব'লে বাট্টে চুলচিলে হবে না, চতুশনের মত দুখ  
জুড়ে লোপে যান !’ জ্বলন ঠাকুরপো উঠর মিলে, “চা-  
পেরে হ'তেও হাজি আজি, ভাড়া, বনি খোরাচটা : তেমন  
ছুটে।’ বেবেধর হেলে বললে, ‘চতুশনের খোরাচ ত  
কেন !’ তারপর কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে কেন খাবার  
যাকি হ'ল। জ্বলন ঠাকুরপো এক বোকা ক'লে একটু  
জ্বল মিলিয়ে চুলচি বিধে নো' নো' ক'রে মেরে দিলে।”

অতুলের মা বুদ্ধি ভাষিতে ভাষিতে বলিল, “বাবু মার  
কাঠিন্যের কিছু খেই হারিয়ে যায়। কোথার ময়ের কথা  
থেকে জ্বলন ঠাকুরের কেন খাওয়া—

বিভাও হাসিতে হাসিতে বলিল, “কি-মার ঐ, ক'মার  
গল্প বলা—”

কি-মা উঠরে বলিলেন—“বধগ যে তোার কি-মার  
চাও ছুটি পেরিয়ে পড়ে, অনেক দিন মা—”

“তা হোক। যে বছর প্রথম ছর এল, তখনকার  
কথা বল, তুমি।”

“কি আর বল্বে মা। জ্বলন ঠাকুরপোর রাত্রিতে  
এল ছর ; তারপর দিন সঙ্গে হ'তে না হ'তে তাকে  
হরিখোল দিয়ে নিয়ে গেল। সেই দিন আমার জ্বলন  
ঠাকুরপোর দিদির আর তাইপোর অগ্রহ হয়েছিল, তাদেরও  
ছদিন পেছলো না। তারপর এ বাকি, ও বাকী, সে বাকী,  
কোন বাকীই ফাঁক গেল না। টাকাল-পাকি, বাবী-পাকি  
আমি নিকুট হ'রে গেল ; কে কাকে দেখে, কে কাকে  
ফেলে ! যোষেফের তুফানিকে তার মা আর পিতা তাইটি  
পারে দিদি কেবল লরকারেরে বাপ-ভগায় টেনে ফেলে রেখে  
গেল ; স্থাননে নিয়ে খাবার লোক ছুটল না। বহু রায়ের  
যাকিতে যে পুরান চাকবাখীটা লকো দিত, সেটা বাকীর  
মধ্যেই কবে ম'রে পু'কে ছিল। সেই খানেই তাকে দিগাল  
হুকুরে খেলে। কেউ জানত না। টান মালাই কতকটা  
খেবে গেলে ময়ের মেঝের তার লাড়লো দেখে বোকা  
গেল।”

বিভা বলিল—“বহু রাতের তত বড় বাড়ীতে আব কেউ ছিল না! এমনও কত ইট কাঠ, উচু ডিটে—”

তারার কি-মা বাবা দিয়া বলিলেন, “বহু রাতের কথা কুনি কিছু পোন নি, অতুলের মা?”

“কিছু কিছু শুনেছি। ঐ ডিটেটার না কি অশমেবতার আগর—”

“সতিয়া মিথো আমি না মা, অনেক দিন বেগুনে আসছি। তবে বহু রাতের যে অশমেবতা হয়েছিল কথা সতিয়া।”

বিভা কি-মার কাছে গিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি রকম অশমেবতা হয়েছিল কি-মা?”

স্বয়ং একটু বৃদ্ধ কতিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “অতুলের মা, সবই ত আমার দেখেতা। তোমার পাড়ি সে বছর সমগ্র স্বয়ংকন্তে আসে। তখন না’বার বেলা, স্বাক্ষর-পুত্রে আমার ক’জন বৌদি নাইছি, তোমার পাড়িও ছিল। স্বাক্ষর-পুত্রের ভাইয়ে ছিল, পাছে জলের ডিটে গায়ে লাগে ব’লে আমাদের থেকে একটু দূরে বাড়িয়ে গুণ করছিলেন। এমন সময় সতী স্বাক্ষর-পুত্রের ইশান কোণের দিকে আকুল বেশেরে ব’লে উঠল, ‘দেখ বৌ, ওরা কারা হচ্ছে।’ চেয়ে দেখি, ক’জন চোখাড, তাদের মধ্যে আমার জন চার পাগলাটাওয়ালা চিন্তাহানী, কারও হাতে লম্বা লাঠি, কারও হাতে বা গুলিও ছোঁড়ার বহক। স্বাক্ষর-পুত্র একবার সে দিকে তাকিয়েই হুঁ হুঁ স্বাক্ষর-পুত্রের বাড়ি ঘুরে হ’লেন।”

“কেন কি-মা?”

অতুলের মা বলিল, “বলছেন পোন না।”

কি-মা বলিয়া বাইতে লাগিলেন, “আমি তাবহিলুম, স্বাক্ষর-পুত্রেরা কেনে দেহেন, সেটা হাতে ক’রে দিয়ে—”

বিভা বলিল “তোমার কথা?”

“আমরাটা কীবে—”

অতুলের মা বলিল, “তোমার শরীর তো আমার দেখেছি মা। বহুস কালে তুমি যে বহু বড় গুল দিয়ে—”

“সে অনেকবার এনেছি।”

বিভা বলিল, “তারপর স্বাক্ষর-পুত্রেরা—”

“হ্যাঁ, বলছি। হঠাৎ একটা বিষম গোল উঠল, এবং একটু পরে বন্ধুর আগ্রহ—”

“বন্ধুর আগ্রহ! কেন কি-মা?”

“আর কেন! বহু রাতের দিকে তখন গা-এর নতুন জমিদারের বিবাহ চলছিল। স্বাক্ষর-পুত্রের বাগানের স্থানিকটা জমিদারের লোক দখল করতে এসেছিল—”

“তোমার ঘাটে বাড়িয়ে বইলে?”

“পোন কথা! পোনে অতবড় একটা দোকা গা-মার আমরা নিশ্চয় হ’লে ঘাটে বাড়িয়ে দাকব! স্বাক্ষর-পুত্রের হুঁস হ’ল, বৌদি স্বয়ং দক্ষিণবাদের স্বাক্ষর-পুত্রের বাড়ির দিগে ঢুকে পড়। আর আমার বৃদ্ধ-বৃদ্ধ ক’রে গুল থেকে উঠে পড়লুম। কিন্তু, জান অতুলের মা, বহু বন্ধুর পাটা ছিল সেই পথলাদের ভিত্তি। তাকে তুমি দেখেছ?”

“হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ে।”

“সে আমার ঘুরে দাক! দেখতে গিচ্ছ। তখন বেলা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে বললেন, ‘বৌ, সৈ কি কাণ্ড! বহু বার পাড়িলের উপর বাড়িয়ে একটা বন্ধু হাতে গায়ে মত কাঁচছে। পাড়িলের নাচে ছুটা লাগ পাড়ি আছে আব স্বয়ং জমিদারের লোক ভেগে গেছে। গা-বৃদ্ধ লোক ভেগে পড়েছে, কিন্তু স্বয়ং মলারের হাত থেকে বন্ধুটা নেই কাঁচ পাগি। খেল উদাম! দেখে স্বাক্ষর-পুত্র এসে বললেন, ‘তুমি ছেলের কাক করছ, নেমে এস বাব—’”

বিভা বলিল, “স্বাক্ষর-পুত্রের ত খুব দাক।”

“তিনিই ত ঘাট থেকে দিয়ে স্বাক্ষর-পুত্রেরা বলছিলেন, ‘বহু, হুঁ ঘনি আমার মাই খেয়ে থাকিল, তোর মায়ের তপের মান রাখিল। ঐ চোখাডগুলো বেন আমার স্বাক্ষর-পুত্রের না গুটে।’”

অতুলের মা জিজ্ঞাসা করিল, “কেনেই স্বাক্ষর-পুত্রের কালীপুত্রের হাতে নববাহ হ’ত। সতিয়া বাবুন মা?”

“সতিয়া। বহু রাতের বৌ আমার অনেক-কথা ছিল, — সে সবকে দেখেছে—”

বিভা বলিল, “তারপর বহু রাতের কি হ’ল?”



“কোম্পানির আমলে চু চুটো খুন হুম কত কি সহজ। বড় রায়ের তিন বছর জেল হয়েছিল।”

“জানি হ’ল না?”

“না। সে জমিদারটার অনেক ঘোষ ছিল। তার মলাং ফেলে বাবার সময় তাঁর মার পায়ে মত দিয়ে দিলে। ক’রে গেলেন যে, ফিরে এসে জমিদারকে নিকপে ক’বন। তাঁকে কিছু আর কিছুতে হয় নি। কখনগরের জেল থেকে যে দিন খানাদ পান, তার এক দিন না দু দিন পরে তাঁর লাদ ক্রিবেটের ঘাটের উপর পাওয়া পেছল—”

“কি ক’রে মারা গেলেন?”

“তবেছি সেই জমিদারই না কি তত্বে তত্বে লোক রেখেছিল। তাহেই এক জন যে নৌকাতে বহু তার আশুছিলেন তাকে আশ্রয় নিয়ে তাঁকে বিধ খাইয়ে মেরে ফেলে।”

“লাসটা যে বহু রায়ের কি ক’রে ঠিক হ’ল?”

“লাসের সঙ্গে কাশড়ের খুঁটে একখানা ১০ টাকার নোট ও এক টুকরা কাগজ ছিল। তাতে লেখা ছিল ‘এ ব্যক্তি জুমাগুয়ের বহু তার, সত্যজ্ঞান। এর মাঝার-বক্তাকে শবর দিয়ে সত্যকার করলে পুণ্যকার্য হবে।’ একই বলে গরু ঘেরে ছুতা দান। সেই জমিদারেরই কাগজি—”

“অতুলের মা বলিল, ‘এখনও তার বংশ আছে মা?’”

“বাবুন মা হাসিয়া বলিলেন, ‘পুত্র ব্যক্তি বাড়র। বোম্ব হা বাবুনকে উদ্ধৃত্যার পাঠক পাশে না।’”

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, “বহু রায়ের ছেলেপিলে বো ছিল না?”

“একটি বছর বানেকের ছেলে ছিল। ধার-পরিচর সূতার পর সেই ছেলেটিকে নিয়ে তার মা বাণের বাড়ি চ’লে যায়—”

“তাঁরা বেঁচে আছে?”

“ছেলেটি বহু হ’লে শক্তিম কোথার বিয়ে ক’রে সেইখানে বসবাস করছিল, তবোধিন। সেও মারা গেছে। তার ছেলেপুলে কেউ আছে কি না—”

দরদা তৈলিয়া নদী চুলি বাড়িতে ঢুকিয়া বলিল, “একটু পানের খুশা বাও, বাবুন মা।”

তার পরার ঘরে বাবুন মা একটু আশ্রয় চাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে নদী, তুই অমন—”

অশীতিপর স্তম্ভ নদী উঠানে বলিয়া পড়িয়া বলিল, “বসুতে নেই, বাবুন মা, উত্তর-পাড়ার চৌকি দিয়ে কিংবার পথে ভায়েদের ভিটের পাশ দিয়ে আশুচলুম, জোৎস্নার উচু পোতাটা চিক্ চিক্ ক’ছে, আর তার পাশে যে সেকেন্দ্রে বহুলা গাছটা,—তাই ভাঁড়িতে হেলেন দিয়ে কে একজন বাড়িরে রয়েছে, গলার সাদা বসণে নদীতে, গোয়ো হা, তার মশারের মত ঠিক তার নাকটা—”

বিভা তাহার কি-মার পা বোঁদিয়া বলিল।

অতুলের মা বলিয়া উঠিল, “তা’হলে মা শোনা বার নতি?”

শশী চুলি উত্তর দিল, “নতি নয় ত কি ঘোষ-বো? আমি বলকে—”

খোলা দরজা দিয়া কে একজন লোক যেন গ্রানের ভয় এড়াইবার আশ্রয়ে যেয়ে সেখানে আসিয়া পড়িল। লকলেই চাকিত চাইয়া চাইিয়া দেখিল আগন্তকের খোলা পা, বাণি পা, ফের উত্তর এক গোড়া ত্ত উপবীত। তাহার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবারাত্র নদী চুলির মোহগ্রাস্তির অবস্থা চাইয়া আসিল। কিন্তু সে দিকে ফাহারও দৃষ্টি পড়িবার আগেই সে মরণান্তের ঘরে বলিয়া উঠিল, “আমার পায়ে সাপে কামড়েছে।”

বাবুন মা ত্রস্তে নিকটে গিয়া দেখিলেন তাহার হাঁটুর নীচে কি একটা ঠাট্টাট্টার কণ নগের মত এবং তাই দিয়া রক্ত পড়াইতেছে। মুহূর্ত মধ্যে তিনি ত্রাশ্বঃগু গাএর শৈত্যার গোছটা খুলিয়া লইয়া তাহার হাঁটুর উপর জোরে তাগা দিখিয়া দিলেন, এবং তারপরই ত্রাতের কাছে একটা খোতল পাটয়া তায় আছড়াইয়া ত্রাখিয়া ত্রাতের একটা টুকরা দ্বারা অতি নিম্নমতাবে দর্পনটো ব্যক্তিত আত হানটা চিরিয়া দিতে দাশিলেন। সে পরবার আন্তরান করিতে করিতে দরিদ্রা বাইবা। বাস্তাবিক চোটা করিতেছে দেখিয়া বাবুন মা নদী দৃষ্টিকে ত্রাখিয়া বলিলেন, “ধর দরদা, একবার ছোঁড়াটাকে চোপে ধর।” কয়েক মুহূর্ত যোগী পরবার টংকার এবং জজ্ঞাপিত করিয়া যেন একটু

অবশর তাহা ধারণ করিল। ইতিমধ্যে কাচের বায়ে ক্ষতস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারে ধানিকটী নীচু পর্য্যন্ত কাণা কাণা করিয়া চোরা হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহা দিয়া রক্ত শাউয়া তাহার না-এর তলার ধানিকটী মাটি জিজিয়া গিয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণী অতুলের মাকে একটা নুতন হাঁকি ভাঙিয়া আনতে বলাগতে বিভা জিজ্ঞাসা করিল “এইবার রক্ত চুষে নিতে হবে,—নহ কি-মা?”

কি-মা তাহার মুখের উপর দুহুত মাত্র চাটিয়া একটী দাবনিঃশ্বাস ফেলিয়া তরল পৌষ্টিভর ক্ষুদ্র মুখশ্রীর উপর দৃষ্টি স্থত করিয়া বীরব রহিলেন।

“দুহুটা মুখে বেধ, কি-মা?”

কি-মা শিররিয়া উঠিয়া বলিলেন, “কেন মা?”

“গেই যে সে বছর মাকে বন্দে সর্পাঘাত হয়, সকলে বলেছিল যদি রক্তটা চুষে নেওয়া হ’ত—তা’হলে হয় ত—” বলিতে বলিতে বিভার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং কণা বন্ধ হইয়া গেল।

অতুলের মা গিলিল, “চুষবেকে?”

“কেন আমি। আবা যদি বাচে—”

বাসুদেব মা আত গভীরভাবে করেত দুহুত কি ভাবিয়া বলিলেন, “নেবি মা তোরা মুখের ভিতরটা। একবার—হী কর্ত।”

বিভার মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া বাসুদেব মা বলিলেন, “পারবি মা? কুই বার ঘেয়ে সে ত গরের জন্ত গরীব দিতেও কাড় হিল না। তোকে এ কাজ করতে দিতে আমার গ্রাণ কিছু চাহে না, তবে ব্যরণ কহাও ঠিক হবে না। আমার গাঁত নেই, চোখা থাকে না। অতুলের মা যদি—”

অতুলের মা বলিয়া উঠিল, “আমা হতে হবে না, বাসুদেব কোথাকার কে, আর আমার মুখেও না—”

এই সময়ে সর্পদেবী কিশোর বলিয়া উঠিল—“না বাছা, ও সব কল্পতে হবে না। হয় ত এমনিই বেঁচে যাব।”

বিভা সোনীর মরণকাতর মুখের দিকে চাটিয়া বলিল, “কি-মা, আমার মুখে ত কোন দাটা নেই। আর তা না থাকলে কোন জাই নেই, কুমি কল। আবা যদি এ

বেঁচে যায়। আর মরণের সব খেংক আমার কেবলই মনে রেখা নাগে-কাটা কারওরত চুষে নিলে বাঁচে কিনা একবার দেখি।”

সোনী হেমন্তকুমার তরলীর করণ কোমল মুখের উপর একবার দৃষ্টিপাতের পর তীর প্রতিধাব করিয়া উঠিল, “এ কিছুতেই চ’তে পারে না। আমি কিছুতেই চ’তে দেব না।” কিন্তু হঠাৎ বা বিভার স্নানিকত অতুলের, হঠাৎ বা বাসুদেবের মুক্তির প্রভাবে, হঠাৎ বা প্রাণের স্বাভাবিক মায়াব, কল্পকণ বাহ্যবাবদের পর সে আর বাধা দিল না। বিভা তাহার কিশোর বয়সের কিশোর কুলা ওঠপট দিয়া সেই তরল অপরিচিতের বিয়াক রক্ত চুষিয়া গেল।

২

গত রাত্রিতে বিভা দুমাইতে শায়িত। পূণ্যকালঃ অমঙ্গল হয় না, আত্মক অভ্যন্ত এই বিধানেই বলে তাহার কি-মা আশ্রয় থাকিলেও তাহার বেহাঙ্গুল অনিষ্টপত্রী মন ভাবিয়াছিল যদি ঘেরের মুখে কোথাও কোন অজাত দা থাকে। এবং কলে বাহাতে বিভা না দুমায় তাহার মস্ত তিনি সোঁটে ছিলেন।

তাহা না হইলেও হয়ত সে রাত্রিতে তাহার নিদ্রা হইত না। সর্পদেবী হেমন্ত পাছে চলিয়া গড়ে এই ভয়ে ওয়া তাহাকে ঘরের ঘরের একটী মোটা দৃষ্টিব লগে এমন প্রাবে বাধিয়াছিল যে সমস্ত রাত্রি তাহার মৃত বা কীৰ্তিত নগরের খড়্গ হইয়া থাকে ছাড়া আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাহার পর কাঁক-ক, অবোধা মস্ত এবং তাহার ভিতর দিয়া বিভিন্ন ঘরে অজাতনামা সর্পক শত সম্ভাবিত নামে অভিহিত করিত, বিনয়, অতুল, অতুলগোপ, অভিগোপ, দিব্যাবলগোপ, জোখের আত্মগোপ, গর্পের অভিগোপ, ভগ্ন মৈত্রী গোত প্রদর্শন, বিভার কিশোর চিত্তটিকে সমস্ত রাত্রি ঘরিয়া বিশ্বকোষলগ্নে চুইয়াই রাখিয়াছিল।

সকলের উপর যে অপরিচিতের জীবন মরণ লইয়া সে রাত্রিতে ঘমে মাথুবে লড়াই চলিতেছিল তাহার বরণাবিকৃত তরল মুখ হঠাৎ মাঝে মাঝে যে আত্মদান, তাহার পূর্ণ-সম্মান-স্বাক্ষর শত চোঁককে বিকল করিয়া দিয়া, বাহির হইয়া আসিতেছিল তাহাতে এই কিশোরীর কোমল তরল অতঃ-করণ করণার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল।



কিন্তু বিভিন্ন মনের উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, চেমন্ডকুমারের রক্তাক্ত কণ্ঠস্বর। সেটি যেন রক্তাক্ততার ভাবে আক্রান্ত অবলম্বিত হইয়া সেই অপরিসীম প্রাণ-ধাতিক আহ্বান করিয়া বলিতে চাহিতেছিল, "তোমার সঙ্গে ত আমার এ ভয়ের কোন পরিচয় নাই, কিন্তু তুমি এই অপরিসীমের সত্ত্ব গ্রহণ করিলে তাকে করিতে হইত অনেকের নিকটতম আত্মীয় ইত্যন্তঃ করে।" তত বহুবার মধ্যেও হেমন্তের দুই যেন বিভার সরল শান্ত মুখের কল্পনামাণিত চকু দুইটির ভিতর বিরাগিত্য। তাহার রূপের ভিতরে চকিয়া দেখানকাল কল্পার উৎসর্গ উপভোগ করিতে বাটতেছিল। সেই আগ্রহ পূর্ণ মনে কুমারীর মনোপরি মধুরতম স্তব্ধ অংশ, প্রবৃণ্ণময় রক্তকল্পা বেলন নবায়ন পুরাতন সোনার কাঠির মনে উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই রূপ তাহা অগিয়া উঠিতেছিল।

একদা অভিনব বলিয়া এবং গান কাল ও অস্তিত্ব পারিপাট্যের প্রতিফলিতাবলম্বিত এই আগ্রহ প্রায় মনোপরি বর্ষা প্রাণিত বিভা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু ইহার অনাস্থ্যকিতপূর্ণ মধুর মোহ তাহার মনস্তিত্ত প্রথম মহিমা পানের বেলার আবেশ আনিতের ছাড়িতেছিল কি না, কে জানে? কিন্তু ইহাও বীর যে বিভা পরমেশ্বরের নিকট হেমন্তকুমারের সত্ত্ব, প্রায় আত্মবের প্রাণ-স্বাক্ষর এক লোকে যেমন আগ্রহে প্রার্থনা করে, সেইরূপ ভাবেই তাহার মনোমহলা জানাইতেছিল।

এইরূপ করিয়াই পরের রক্ত রাতিটি কাটিয়া গেল, এবং ভোরের দিকে শুকা যোগ্যে নিরাপদ যোগ্য। করিয়া, অক্লেশে মা গৃহীত প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন বিভার মনে একটা পার্থক্যের স্মৃতি ও নিতিবস্তার স্মৃতি আসিল; এক সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি তাহার মুখের দাবী এখন তাহা জ্ঞান করিল যে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি তাহার বহিল না। এই সময়ে যখন তাহার কি-না তাহাকে দেখের সুরে আহ্বান করিয়া বলিল, "দুখ পেয়েছে মা? তুলসী

যে, এখন আর সুখেই কোথায় নেই, কোথায় চল।" তখন সে একটা অনাবশ্যক ব্যস্ততার দ্বিতীয় বলিয়া উঠিল। "মা কি-না, কই আমার ত দুখ পাশ নি!" সে কথা বান্দু মায় যে হাসিটুকু আসিয়াছিল তাহা হঠাৎ বিভার স্মৃতিতে না পড়ায় পার্থক্য, কিন্তু তাকে বহু হোপের মুখে যে দৃষ্ট দেখে হৃদয়ের অতি দৃষ্ট একটা রেখা স্মৃতি উঠিতে না উঠিতেই মুখে মিনাইয়া গেল, তাহা সেই কিশোরীর সত্যক লোকের অজ্ঞাত থাকিল না; তাহার ফলে একদিকে তাহার অধরে হাসির রেখা এবং নতুন লক্ষ্যের নতুনতা আসিয়া পড়িল। অত লক্ষ্য করিবার বহল বিভার শি-মার ছিল না এবং সেজন্য কোনো সম্ভাবনার কথাও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, স্তব্ধতা তিন বিভার ভাত বহিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া; "তা হোক, এইখানেই না হয় একটু ঘুমিয়ে নাও," বলিয়া নিজের অবলম্বিত প্রাচীন খেচরকে আঁচলের উপর বিছাইয়া দিলেন এবং বিভাকেও পাশে শোয়াইলেন। রক্তাক্ত অরুণময় মোহে নিদ্রার পাড়তার আঁধার হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখনই মানসপটের উপর গাহির গত স্মৃতিভাণ এত বিভিন্নবর্ণ এক মিশ্রণে ছড়ানুড়ি করিয়া খাতাখাত করিতে লাগিল যে, শুধু অনেকক্ষণ নিদ্রাবোধী অধিকার হইতে তাহার মনটি মুক্ত হইল তাহা নাহে, তাহার স্মৃতিও মাকে মাকে বিস্ময়ভাষে তাহার স্মৃতি আর চকু দুইটির পাতা সবলে উন্মুক্ত করিয়া সমুদ্রের চূর্ণশাখার কবীর দিকে চাহিয়া লইতে লাগিল।

সে মাতৃহৃদির পা-এর তাগা তখনও খোলা হয় নাই এবং খেচর খুঁটিতে রাখা ছিল; স্তব্ধতার রক্তকলাপের অভাবে মনসপট অস্তিত্ব ভাঙি হইয়া এবং মশার কামড়ে লক্ষ্য আসিয়া পড়িয়া তাহার যে যরণা হইতেছিল তাহা নীরবে পাড়বুঝে সঙ্কর। মানব প্রকৃতির সাধের বাহিরে। মৃত্যুর বিজীবিদ্য সে সন্ধ্যা-কালে কল্পনার দেখিয়া জীত হইয়াছিল মৃত্যু, কিন্তু এখন তাহা হইতেছিল যে এই যে অক্ষয় পার্যায়িক বরণ ইহা অংশক। মৃত্যুই ভাল। ওকার কাড়নের মধ্যে এবং মনসপট মানব-মণ্ডলীর নানা ককবোর মধ্যে হেমন্ত একাধিকবার



এই অসহনীয় বহুলা জ্ঞাপন করিয়া তাগা বুনিয়া দিবার চক্ৰ কাঠর প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার কথার কেহ কর্ণপাতও করে নাই। কলং কথেক বঁটা বহিয়া ক্রমাগত বহুলাভোগের পর এখন সে উদ্ভাবের মত হইয়া পড়িয়াছিল। দাঁতে করিয়া তাহাণ বহুনের দড়িটা কাটিয়া ফেলিবার বার্থ চেষ্টার পরেই হঠাৎ তাহার দৃষ্টি বিচার করণ-কাঠর চক্কর উপর পড়িতেই সে উগ্র তিরস্কারের স্বরে বাগতা উঠিল, “তোমরা! নিষ্ঠুর! ম’রে সেলুম যে বহুলা! তোমার পায়ে পড়ি একবার হাত ছুঁতে খুণে যাও!”

তাহার করণ মিনতির স্বর শুনিয়া এবং চক্কর হল বেধিয়া বিভা যেন নিষেধ বজাঙ্গসাবেই তাহাকে বহনমুক্ত করিবার চক্ৰ উঠিয়া পাড়াইল; কিন্তু পরক্ষণেই হাত শুটাইয়া লইয়া বলিল—“কিন্তু দবাই যে ব’লে গেছে, তা হলে আপনাকে কিছুতেই বাচান বাবে না।” কথা কহিতি বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হেমন্তকুমারের উদ্ভাব চাকলাও যেন দুহুতের মত শব্দ হইয়া আসিল। সে একটা দাঁধ নিখাসের সহিত উত্তর দিল, “আমি যে আর লজ্জা কহতে পারছি না, বিভা! পাঁচি যেন তারি পাবর চ’রে এসেছে, আর দড়িটা যেন ক্রমাগত চামড়া কেটে বসছে।”

“আমি একটু চুঁতে দিই” বলিয়া তাহার কি-মার দিক একটুমাত্র চাহিয়া লইয়াই বিভা ঘতি সম্বর্ণনে এবং লক্ষ্যে তাহার পরক্ষণমত হাত চুইটি হেমন্তের পায়ে উঠাইতে এবং নামাইতে লাগিল। তাহার করতলের নিয়ন্তর দক্ষই বোধ হই হেমন্ত কিংবা কালের মত কতকটা শান্ততার অবলম্বন করিল। এইরূপে লগতের কোৎসাহিত্য দেখাচ্ছে সেই তরল তরুণী, দুইটি গোফ-চক্কর অঙ্গুলানে নৌব সত্যসুহৃতির হুত্রে প্রবিত হইয়া আসিতেছিল। প্রকৃত দেবী কিন্তু এরূপ গুলেও মানবধরীর উপর গীতার যে চিরন্তন দাসী তাহা কিছুতেই ছাড়িলেন না; এবং প্রভুদের আগে ভাল করিয়া দেখা দিবার পূর্বে যখন কাক কোকিল ডাকিতেছিল, তখন তিনি বিতার একলক্ষে আনন্দ ও যাপার ভরা মনটিকে মাছুর করিয়া দিয়া এবং তাহার প্রান্ত পত্রীবানিকে নিয়ন্ত্রাধীন

করিয়া হেমন্তের পা’এর কাছে লুপ্যায় শোয়াইয়া গেলেন। কতকাল পরে বাহুন-মারি বুকের উপর প্রান্ত-সুখোব রক্ত-সম্পাত হওয়াতে তিনি কাণিয়া উঠিয়া বলিলেন। বহু হেমন্তের দুপের উপর দৃষ্টি পড়িতে বলিলেন, “কাল রাত্রিতে বড় বহুলা পেয়েছ বাবা। আর ভর নেই। বিহগরি রক্ষা করেছেন।” তাহার পর নিশ্চিত বিচার দিক চাহিয়া সংকে বলিলেন, “মা আমার বড় ভাল হয়েছে।” তাহাকে দেখিয়া উঠাইয়া, হেমন্তকে বহনমুক্ত করিয়া বলিলেন, “তুমি এইবার হাত মুখ ধুয়ে এস। কাল বিশেষের সময় গোমার পরিচয় লওয়া চরু নি। তবে এখন যে তোমার কোন আশার স্বপন নেই, তা বলেছিলাম। এত ক্রোধের পর তোমাকে চুটি না পাঠবে ছাড়তে পারি না।”

বাহুন হার অঙ্গুলানে হেমন্তকুমারকে সে দিন সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। অথবা তেমন লগত অঙ্গুলানে না হইলেও তাহাকে থাকিতে হইত। পত্নীর বংশধরের পর তাহার আর চলিবার মাথা ছিল না; এবং কহত বা এই অনাচারি দহিত গৃহস্থের আন্তরিক স্নেহের লেখার মাফাক্স এই ভবনুত্রে ছেলেরি লজ-শীড়িত এবং বহুত পত্রীরের অভাববহু হুলস মনটিকে লোভাত্তর করিয়া তুলিয়াছিল। বাহা হউক যখন লগত রায়ের ভিটে চুইতে তাহার গত রাত্রির পরিচাক পেজিটি একটি ছিটের কোট এবং এক ছোড়া ছুতা সমত বিভাদের বাড়িতে কিরিয়া আসিল তখন আচারের আঘতেরি গুণীত হইল।

বিভা বহুই-করের ঘরের উমানটি নিকাইতেছিল, পদক্ষেপে হেমন্তকে দেখিয়া বলিল, “কি-মা, এই যে ইনি এসেছেন।” কি-মা আদর করিয়া হেমন্তকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু গুণত লগতুকু পাইলেন না। যেটুকু পাইলেন তাহাতে ছেলেরি যে মন্তাঙ্গণ, তন্ত্র এবং লেখাপড়া-কানা এইটুকু বুঝিলেন। হুলাপুত্রে আসিবার কারণ এবং রাত্রিতে সে যখন নির্জন বহু রায়ের ভিটার দিয়া কেন যে পাড়াইয়াছিল সে কথা



কিভাবে করিয়া তাহার কোন সন্তান পাইলেন না।  
পরিচর ভাপ করিয়া পান আর নাই পান, তাঁহার বহুবিনী  
পুত্রী হেমন্তের দুখশ্রীর অঙ্গুরীর এবং তাহার আশ্রয়বৎ  
সন্তান সবারাশের বিশেষত্ব আকৃষ্ট হইতেছিল তাহাতে  
কোন দরকার নাই।

সে দিন বাহুন মার বনভোজনের উপবাদ। বিভা  
যাচা কিছু রন্ধন করিয়াছিল তাহা পরম পরিভূপ্তির  
সহিত আহার করিয়া হেমন্ত নিদ্রাস্থের পাশে গতির  
অনিদ্রায় অঙ্গ-পরিঃপাথের ক্ষত লগ্না লইয়াছিল। অপর্যায়  
নিদ্রাতর হইলে চক্ষু পুণিবার আশেই তাহার কানে  
টুকিল “তব না, মা ? উঠিতে কিছু বেশ মানাধ—” বিভার  
কি-মা ধরত মনে মিয়াছিলেন, তিনি মুগ্ধিত-মন্ত হেমন্তের  
দুখের উপর এক দুঃস্থের মত পুণিবার করিয়া উত্তর করিলেন,  
“ভাতিকুল ত লব মিলে মা, কিছু আর ত কোনপরিচর—”

বিভা পাথের বাড়িতে চুল বাগিতে গিয়াছিল। বন-  
ভোজনের ক্ষত দাক্তর গুণিয়া, দুখটি মুছিয়া পুছিয়া,  
কপালের মাঝে ছোট একটি টিপ পত্রিয়া, শুকতাগাটির মত  
দীপ্ত প্রহর মুক্তিতে সে আশিয়া গাভরিতেই তাহার কি-মা  
কথা-বহু হইয়া গেল।

বিভা বলিল, “আর বেশি কিছু কেন কি-মা ? ও পাড়ার  
সবাই যে বেগিরে পড়েছে, আর রাজামালীমাগাও”  
—এই সময়ে বনভোজনের হাতীগুলি তাহাদের  
মুক্তি-মুক্তির পুটলি-পোটা ও গুণ-দইয়ের বাটি খোয়া  
সমস্ত কলরব করিতে করিতে দেখলেন আশিয়া  
পৌছিল।

হেমন্ত নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে বাইতেছে দেখিয়া  
কি-মা একটু হানিয়া বলিলেন, “আমরা এইবার বন ভোজনে  
চলুগুম। তুমি বর আগলাও, বাবা !” ঘর হইতে বাহির  
হইবার পথে হেমন্তের পুত্রী একবার মাত্র বিভার মাজিত  
দীপ্ত দুখশ্রীর বিকে আকৃষ্ট হইয়াই পৌণ্ডার সময়ে সমুখে  
কিরিল। সমর ঘাটটি পার হইবার সময়, তাহার কানে  
গেল তে তরুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে—“বিভার বর মুক্তি,  
কবে বিয়ে হ’ল, বাহুন মা ?” কে একজন উত্তর করিল,  
“তা, চৈত্ মাসে।” একটা চান্দা হাদির মতো সেই তরুণী  
বিশিত হইয়া আবার বলিল, “চৈত্ মাসে বিয়ে ?” আবার  
হাদির বোলের মতো উৎকর্ষ হেমন্তকুমার ভবিল,  
“সে কি, দেখছ না বিভার দিখের লিম্বর নেই !”

( ক্রমশঃ )











তুল্যি; কিন্তু আদ্যন্তরীণ এই কৃত্যেরে নিম্নাঙ্গসিদ্ধা—  
আমরা কৃত্যকে জানতে এসেছি। আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা এই  
জিজ্ঞাসার মত; এ কথা হইবে কোনো ইচ্ছা-পরিচয়কে বুঝিতে  
কেননা যাহে না, কিন্তু এ কথা আমাদের প্রত্যেককে স্পষ্ট করি  
বুঝতে হবে।

## উল্লেখ্য পর্দা প্রণা

পত কাহিনীর “মোহাঙ্গি” শ্রীকৃষ্ণ সাহসিত আদ্য বা আদ্য  
“উল্লেখ্য পর্দা প্রণা” বিষয়ে যে প্রথম নিবন্ধে আমরা এই পর্দা-  
প্রণা সম্বন্ধে আবেগের বিনে ভৌতবাস্তবিক হইবে বলিয়া  
উক্ত প্রথম আবেগপ্রণা আমরা বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া।

১০০ আবেগিক কৃত্য বাহুর ধন অসংখ্য ছিল তখন। (তাহারা উক্ত  
প্রাচীরের ভিত্তি একই নিয়মে করিত)। পর্দা-প্রণা ছিল না। সমস্ত  
বিচারের মত সর্বল বসে সর্বল জাতির সমুদায় ব্রীজাতির মত  
ও পরিচয় প্রাপ্তি বাহাতে বিশেষ সম্ভাব্য প্রদর্শন করে তখন  
পর্দা-প্রণা প্রচলিত হইত। তখন সমস্তের বসন্ত উজ্জ্বল হইতে  
লাগিল, বাহুর ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ব্রীজাতির অতি সম্ভাব্য হইত  
পরিচয়; ব্রীজাতির অতীত সমস্তের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন প্রদর্শন হয়।  
এই তাহারা সমস্তের নিষ্ঠুর অতি আকর্ষণীয়। অতএব তাহাঙ্গিকে  
অতি দ্রুত রক্ষা করা কর্তব্য। তাহা আবেগের, বাহুর বস্তুর তাহা  
বসন্তে হইতে হয়। কোনও কঠোর কাজের ভিত্তি তাহাঙ্গের  
প্রতি দ্রুত বসন্ত সমস্ত নয়। উল্লেখ্য ব্রীজাঙ্গিক কেবল পূর্বের  
সমস্ত আবেগের প্রদান করে নাই, বরং পর্দা-প্রণা বাহুর ব্রীজাঙ্গিক  
পূর্বের অনেক উচ্চ আসন দান করিয়াছে। পূর্ব সমস্তকে পর্দা  
পূর্বের বাহুর সমস্তের রক্ষা করিতে বাহুর, তাহাকে কোন  
কঠোর পক্ষে ব্রীজ হইতে প্রায়ই দ্রুত বাহুরে বসন্তে হয় না।  
কোনো কঠোর নারী পর্দার অর্থমানে বাহুরা সমস্তই দেখিতে  
পারিত কেবল তাহাকে দেখিতে পারি না। একই তাহারা অসং  
লোকের সম্ভাব্য-বিস্তৃত ব্রীজাঙ্গিক অসংখ্য হইতে অব্যাহতি পায়।  
পর্দা সমস্তে পূর্বের কোনও বাহুরা বিস্তৃত:—“এক বিবাসিনী  
(পূর্বের) নারীঙ্গিকে হল যেন তাহারা বাহুর ব্রীজ-সমস্তে  
বসন্ত করে, ও বাহুর ব্রীজ-সমস্তে পূর্বের যাবে, ও বাহুর  
ব্রীজ বাহুর তাহা হইতে বসন্ত হয় তাহাতে একজন বা করে,  
এবং যেন তাহারা আপন কঠোরের আপন ব্রীজ-ব্রীজাঙ্গি রক্ষা,  
আপন নারী, বা আপন পিতা, বা আপন বসন্ত, বা আপন পূর্ব

(এবং পূর্বের) বা আপন নারী পূর্ব (সমস্তের পূর্ব বা আপন  
প্রাচীর, বা আপন ব্রীজ-পূর্ব, বা আপন ভবিষ্যৎ, বা আপন  
(ব্রীজ-ব্রীজ) নারী, বা তাহাদের ব্রীজ বসন্ত বাহুরে উপরে  
ব্রীজাঙ্গি করিতে সেই (নারী, বা আপন অসংখ্য) পূর্বের  
এই সমস্তের ও বাহুরা নারীঙ্গের সমস্ত-ব্রীজ ইঞ্জিন সমস্ত-আন  
যাবে না সেই পিতৃঙ্গের নিবৃত্তি জির তাহারা আপন আকর্ষণ যেন  
প্রকাশ না করে এবং তাহারা যেন আপন ব্রীজ-ব্রীজ (ব্রীজ-পূর্ব)  
সমস্ত বিবেচনা না করে, তাহাতে তাহারা আপন ব্রীজ বাহুরে আপন  
কঠোর থাকে তাহা (লোক জাতিতে পারিবে এবং যে বিবাসিনী,  
তাহারা এক যোগে আপন দিকে ফিরাই আসি, সমস্ত: তাহারা  
বসন্ত হইবে।” (ব্রীজ-পূর্ব—সমস্ত হইবে)। “যে বিবাসিনী, তাহারা  
আপন পূর্ব নারী (ব্রীজ) পূর্ব যেন পূর্ব তাহাঙ্গ নারীঙ্গ দিকট  
অসংখ্য প্রার্থনা ও সাহায্য দান কর—প্রদান করিত না, ইহা—তাহাদের  
কত কঠোর হয়। সমস্ত: তাহারা উপরে লাভ করিবে।”  
(এবং আকর্ষণ)

সমস্তের পতনের বিস্তারিত আছে। কোনও কালে এ পতন  
প্রদান হয়। সমস্তের ব্রীজ-পূর্বের একই সম্ভাব্য প্রণা অসংখ্য  
নাই একই প্রণা পূর্বের, “পূর্ব-পূর্বের” নারী, তাহাদের  
এবং পূর্বের। একই কোরান পূর্বের বসন্ত করিতে বিস্তারিত  
পূর্ব-পূর্বের সমস্তে বসন্তে দিবে করিতে এবং তাহাদের  
ব্রীজ-পূর্বের ও ব্রীজ প্রদর্শন করিতে দিবে করিতে। কেন না  
ইহাতে সমস্ত ও সমস্তের ব্রীজাঙ্গ হইবে। এই প্রণা অসংখ্য  
কোরাঙ্গিকের বসন্ত করিত, এমন কি বিবাসিনী, পূর্বের  
প্রণা পূর্বের পূর্বের উপরে হইত। কোরাঙ্গের আবেগ  
সীলকে বসন্তবসন্ত বাহুর কঠ ও বসন্ত আকর্ষণ করিবে, অর্থাৎ  
আপন ও পূর্ব প্রদর্শন করিবে না, বসন্তের বসন্ত জাতি ব্রীজাঙ্গ  
ব্রীজ। ব্রীজ-পূর্বের কালে বসন্ত বসন্ত হইবে, সীলকে বসন্ত পূর্বের  
ব্রীজাঙ্গের পূর্বের। পূর্বের ইতিবৃত্তি আছে, ব্রীজ বসন্তের অসংখ্য  
কঠোর হইত। এই সমস্ত ব্রীজ করিতে পর্দা-প্রণা  
প্রদান হইত। সমস্তের বা পূর্বের সীল এবং ও প্রদান হইতে  
অসংখ্য অসংখ্য বসন্ত ব্রীজাঙ্গের একই সম্ভাব্য কঠোর পূর্বের  
সমস্ত তাহা সম্ভাব্যে বিস্তারিত করিবে। বসন্তের নারীঙ্গের  
সম্ভাব্যের যে বাহুরা ও বাহুরা তাহাদের সমস্ত পূর্বের সম্ভাব্য  
লোকের সমস্ত। ইহা নারীঙ্গের অসংখ্য বিবাসিনী লোকের চরিত্র-  
সংলগ্নের বসন্ত করা হইতেছে। উল্লেখ্য তাহাদের পতন বসন্ত পূর্বের  
বসন্তের অসংখ্য বাহুর তাহা বিবিত্ত করিতে। পর্দা উল্লেখ্য  
কোনও-ব্রীজ করিতে, পর্দা তাহা উল্লেখ্যের বসন্ত। ব্রীজ  
হইতেছে। ইহা ব্রীজাঙ্গি উল্লেখ্যের অসংখ্য লোকের বসন্ত









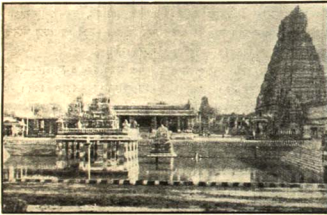
কিন্তু সেট সময়ের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

পার্মানির ব্যাকরণের পাঠ্যগুলি কৃত চাকার কাকীর উল্লেখ দেখা যায়। পাঠ্যগুলির সময় ঠিক পূর্বে পতাকীর পূর্বে। ৩র্থ ও ৪ম পতাকীর শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে অনেক পূর্বে সময় হ'তে এখানে জৈনধর্ম প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত চান-পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি একাকী এখানে এসেছিলেন—তাঁর উল্লেখ ক'রে লেখেন যে তাঁর পূর্বে বুদ্ধদেব ঐ নগরী দর্শন করতে আসেন—এতদসম্বন্ধে জনহবের বিষয় কমেছেন। তাঁর গ্রন্থে কাকীপুত্রম্ কি-এন-চি-পু-লো এইভাবে তাঁর নামের উল্লেখিত। সে সময় চাকা ব্রাহ্মণ রাজার রাজধানী ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম উভয়েই পূর্বে প্রবল ছিল। সে সময় সেখানে ১০০টি স্তম্ভা-রাম (বৌদ্ধ-মঠ) ও ৮০টি বেদ-মন্দির ও দিব্যর জৈনদিগের মঠ বিদ্যমান ছিল।

৪র্থ পতাকী হ'তে ৯ম পতাকী পর্যন্ত পনের জাতি তাদের ক্ষমতার উচ্চ-নিচের উল্লেখিত। তাদের রাজ্য অল্পদেয় হ'তে হসিনে কাকী পর্যন্ত বিস্তৃত হ'তেছিল। ৪র্থ পতাকীতে তাঁরা কিছুকালের জন্য কাকীকে রাজধানী করেছিলেন। কিন্তু এ নগরী শুধু রাজধানী হিসাবে প্রসিদ্ধ হয় নি—দক্ষিণে উত্তর ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ও বিখ্যাত ও ধর্মের জন্য খ্যাত হ'য়ে পড়ে। বর্ধ-অহুসজিৎসু যাকি ও দার্শনিকেরা সমস্ত ভারত হ'তে এখানে আসতে

লাগলেন ও ভ্রমণ: এখানে সংকৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। এ সুখাম এখনও মঠের নি-দ্রিক পূর্বেব মত বর্ধায় আছে। এখন কি পরবর্ত্তকালের সময় শুধু যে হিন্দুধর্ম উন্নতি লাভ করেছিল তা নয়। হিউয়েন সাংএর বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে ৭ম পতাকীতে এনগরী বৌদ্ধ-ধর্মের কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে, এমন কি তথ্য জৈন-লক্ষ্যদায় কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ৮ম পতাকীর শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এখানের সেই সময়ের রাজা নরসিংহ বর্ধ পৈব ছিলেন। তাঁর সময় পৈব-ধর্ম বিশেষ প্রবল হ'য়ে ওঠে। ৯ম পতাকী চৌলরাজ কুলোত্তম কাকী-

পূর্ব বংশানুসারে আনয়ন করেন। ১০ম পতাকীতে ১১ম পতাকীতে চানুকা রাজারা এ নগরী ব্যাধি-কায়ে আন-বার মত অনেক



বরনারাজ গ্রামার দেউল ও তৎকালের নগরোবর

কয়েক কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁরা বিফলমনোরথ হন। ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনি-বংশীয় মহম্মদ কাকী জয় করেন। তাদের হাও হ'তে বিজয়নগররাজ এ নগরী উদ্ধার করেন। তৎপূর্বে কুম্ভমেব রায় রাজপদে অভিষিক্ত হন (১৪০৮); ও ১৪১৪ খ্রী: অ: এ নগরী দর্শন করতে এসে পর-স্তুত-সন্তপ ও শিখ-মন্দিরের দংড়ার করেছিলেন। ১৪৪৪ খ্রী: অ: বিজয়নগর জয়গের পর গোলাকুন্ডার লুণ্ঠনানের অবশ্যে আসে। ১৫৭১ খ্রী: অ: লর্ড ক্লাইভ করানীয়েব নিফট হ'তে কাকী কেড়ে নেন—কিন্তু রাজ্য সাধারণত এ নগরী ছেড়ে দিতে হয়। ১৭৫৭ খ্রী: অ:

## বিবিধ সংগ্রহ ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী

৪

চৌধুরীরা পুনরায় করানীধের দাঁত হ'তে উদ্ধার করেন।

এ নগরী বর্তমান হ'তে পূণ্য তীর্থ ব'লে গণ্য। জনসাধারণের বিবাহ এ পূণ্য নগরী মর্গনে পাশ-বিমোচন ও সিদ্ধি-লাভ হয়। মোক্ষদায়িকা সপ্ত তীর্থের মধ্যে অন্যতম ব'লে গণ্য। এ তীর্থ মর্গ তীর্থ হ'তে প্রের ব'লে পরিচিত। কথিত আছে—মহাদেব সমস্ত শাস্ত্রে আত্মরূপে বেধে নিয়ে লিঙ্গরূপে একাদেশ নামে অভিহিত। এ স্থান দক্ষিণাংশের বাসিন্দা ব'লে খ্যাত। উত্তর ভারতের লোকেরা যেমন শিব তীর্থে কানীয়াস করে

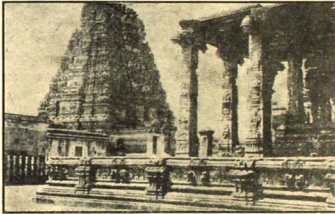
দক্ষিণাংশের লোকেরা তেহি মুক্তিলাভের আশায় কানীতে বাস ক'বে থাকে।

যে সব প্রাচীন ও বৈষ্ণব দেউলার মস্ত অঙ্গ ও কাকী-পুন্স প্রখ্যাত তার অধিকাংশই পল্লবপ্রাচীরের সময় আরম্ভ হয়। প্রাচীন সময়ে রাজসামন্তরা একপ নানাবিধ অস্ত্রাধানে তাদের আত্মরূপ বর্ণাশ্রয় প্রকাশ করতে মতান্ত ছিল। মনুস্মৃতি হ'তে জানা যায় যে চোল রাজারা এ কার্য চালিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ বিহারপ্রাচীরের সময় অবিকারিত মন্দির বর্তমান রূপকারে পরিণত হয়েছিল। সেখানেও কতক দেউল দাঁত ও অলঙ্কৃত হ'ল। অধিকাংশ বৃহৎ গোপুরস্ এ সময় নির্মিত হয়েছিল। এ সব এত বিরাট যে অনেক ক্রোশ দূর থেকে দৃষ্টমান। বিজয়নগর-রাজারা বহুদূর এযাদি তাদের তত্ত্বির চিল্লবরণ দৈব-মন্দিরে উপহার দেন। মন্দিরের খোদিত লিপিতে এ সব

বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বসিও ১৭৭ ও ১৮৭ শতাব্দীতে এ নগরী কিছু কালের জন্য মুসলমান শাসনাধীনে আসে—তবুও সৌভাগ্যক্রমে উত্তর ভারতীয় দেব-মন্দিরের মত এ সব মন্দির অক্ষতভাবে মুসলমান কবচক বিদগ্ধ হয়নি।

এ নগরী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খ্যাতনামা বৈদ্যাস্তিক পঞ্চরাত্রাণী ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক রামানুজের দীনাভূমি বলে মনে করা হয়। পঞ্চরাত্রাণী ১৫ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন। তিনি এখানে অবৈতন্য প্রচার করেন, তদবধি এখানে অবৈতন্য প্রচলিত আছে। তাঁর নগরীতে আগমন

স্বত্বে একটা প্রবাদ আছে—  
কামাকী দেবী  
বিনয়ানের পর-  
গাড়ী তক্ত-  
পিনাকি ছিলেন,  
কিন্তু পঞ্চবা-  
চালের আগে  
মনের পর তাঁর  
সমিত তক্তে  
হেরে সিত্তেতিনি  
সমিত হন।  
এই বিবরণ চিল-  
বৃত্তপ পঞ্চবা-



কামাকী দেবীর গো-পুর ও মণ্ডপ

চারণের সৃষ্টি কামাকী দেবীর মন্দিরে আজও বিরাটমান আছে। অনুষ্ঠিত একপ যে পঞ্চরাত্রাণের স্তম্ভমতি-বাহিরেকে তাঁর মন্দিরের বাইরে সবার ক্ষমতা পণ্ড-নেই। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে এর পূর্বকোণ এখনও নব্বুত্রি আশ্রয়। এতে অস্তমিত হয় যে বিখ্যাত কেরল-জ্ঞান সমিত এবং কিছু সংশ্রব আছে। কাকী ১৫ ও ১৬ শতাব্দীতে দৈব ধর্মের কেন্দ্র হ'য়ে উঠে।

মাত্রাচ হ'তে কাকী যাবার পথে—এ স্থান হ'তে ৪৭-ক্রোশ পূর্ব দিকের মন্দির রামানুজের কল্প স্থান ব'লে খ্যাত। তিনি বৈষ্ণব ধর্মে কণ্ঠপ্রদ করেন, প্রথমে তিনি কাকী

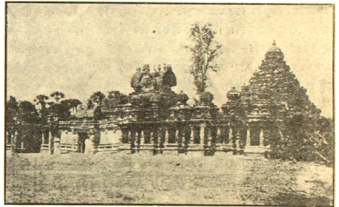


জনপ্রতি এটৎ—কোন এক সময়ে পার্শ্বদেবীকৌতুকজ্ঞানে, যথার্থেবের পন্থাতে গিরে চাত গিরে তার চমুহর আনত করেন। হিন্দুন মাছানিত হওয়াতে সমস্ত দেবার মন্দির হ'রে গেল। এট অগ্রায় কার্যেব জন্ত দেবী শাক্তীর পাগ সংঘটিত হওয়ায় এ দেশের প্রাচীনত্ববৎস মন্দিরদের মাঝেব কাছীগুরে একাদ্রনাথের মন্দির-প্রাক্ষণে কম্পানদী নামক তাঁর্বে তিনি উন্নয়ন তপস্তা করেন। এট তপস্তার ফলে তাঁর পাণ-কালন হ'লে মন্দির পুনবার তাঁকে প্রদত্ত করেন। মন্ত সন্ন্যাসেরে মধ্যে একটি ক'রে সন্ন্যাসের প্রতিনিধির কারেব জন্ত উৎসর্গিত। কথিত আছে যে, সন্ধ্যাপেকা রূহৎ সন্ন্যাসেরে পার্শ্বদেবীর তপস্তা দেবতার জন্ত ভারতের সমুদয় নদী এইভাবে মিলিত হয়। কামাক্ষ্যদেবীর স্বতন্ত্র মন্দির আছে—তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কামুন মন্দির দশ দিন ধ'বে একাদ্রনাথের মহোৎসব হয়। এট মহোৎসবের সময় দিনে কামাক্ষ্যদেবীর ও একাদ্রনাথের মূর্তি একত্র করা হয়।

কামাক্ষ্যদেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট এক প্রাক্ষণে পত্নাচার্যের সমাধি।

উপরে তাঁর প্রস্তরনির্মিত মূর্তি বিরাজিত। একাদ্রনাথের মন্দিরের দক্ষিণাভিমুখে কিয়দূরে স্থাপিত। মন্দির অপেক্ষাকৃত রূহৎ—প্রাক্ষণে তার কবাত বিজয়নগররাজ হরিহর নির্মাণ করিয়ে দেন। বরদায্যাক স্বামীর মন্দির দক্ষিণেব রূহৎকর। তিনি কল্পতরু নামে খ্যাত। দৈর্ঘ্য ১২০০ ফুট ও প্রস্থ ৮০০ ফুট—২০ একর ভূমি নিয়ে আছে। পত্র তন্ত্রমণ্ডল ও বরদায্যাকের প্রাচীর বিহর নগর রাজাধিপের সময়ের খোদিত কালের অনুমান পূর্ণ। এতে সন্ধ্যাপেকা প্রসিদ্ধ কাকদার্য।

বর্তমান। কিন্তু অনেকের মতে একাদ্রনাথের মন্দিরের কাকদার্যের মত অনুমান নয়। মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী চলিত আছে। কোন এক গ্রামেব বিজয় তপস্যার পুত্র সন্তান লাভ হওয়ার তিনি ব্রত নিষেড়িলেন যে প্রত্যন্ত অন্তঃর দশ টাকা মন্দির প্রতিষ্ঠার তক সংগ্রহ না ক'রে চলগ্রহণ করবেন না। এ উপায়ে তিনি ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করেন। কাছীগুরে বরদায্যাকের বিজয়-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পৌরাণিক রূহৎ অল্পতম। বিজয়-মন্দির থেকে নাম হয়েছে বিজয়কাছী। বিজয়-মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাক্ষণে রূহৎকর কতক নিদিত পত্রতন্ত্র 'দেবমান। একদ্রনাথ পাথর ফেটে এ মন্ত নির্মিত। প্রাক্ষণের



কৈলাশনাথের মন্দির

দেবদেবার জন্ত ৩০০০ টাকার আয়ের ভূমিদারী ও মাত্রাজ পত্নাচার্য কতক ১২০১ টাকা বরাদ্দ আছে। মন্দির অতিথর স্মৃতিপাঠ। লট রাইব একবার লুণ্ডে বিহর লাভ ক'রে ১৯৬১ টাকার মূল্যে একদ্রনাথ কতক করেন। কাকিতে অনেক মহোৎসব হয়—সন্ধ্যাপেকা প্রধান হচ্ছে এ মন্দিরের সম্পর্কে। বৈশাখ মাসে এ মহোৎসব নিম্পন্ন হয়; বশ দিন ধর্ম এট উৎসবের জন্ত নির্দিষ্ট—আরো ত'চার দিন বেশী হয়ে যায়। বশখাতা-উৎসব এত দ্বিত পবিত্র হয়। কিন্তু বশখাতা-উৎসবের সময় এ



যে সব ইষ্টের ও পাণ্ডরের অস্ত্র নৃত্যমস্তির পেশিতে পাওয়া যায় তাহা এই সব কল্প প্রসঙ্গবাহারই চরম উৎকর্ষ। কোন কোন মহাম্মা ব্যক্তি আবার ইহার সচিত্র বীর ভীষ্মের সহস্র বটনাবলীর প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য নিমেষের বাণী নৃত্য-কলকে জোড়িত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই প্রকারের বহু পুরাতন সমাধি-স্থূপ ও দ্বিতীয়েষ্য আছে, কিন্বেতা বৌদ্ধস্থপের। প্রথম প্রথম নৃত্যিকার স্থূপ, তাহার পর প্রকৃতির এক শেষ পর্যায়ে উঠে-কাদির দ্বারা নিখিত দ্বিতীয়েষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অর্ধ-গোলাকার হইতে উচ্চ চূড়ার আকৃতির এবং শেষ পর্যায়ে গম্বুজাকারের স্থূপ নির্মিত হইয়াছে। বারানসীর অষ্টম-পাতী মারনাথের বিখ্যাত স্থূপ তাহার একটি নিদর্শন। মাগধিখা দ্বিতীয়েষ্যগুলির মধ্যে প্রমে প্রমে চিত্রাঙ্গ ও কাঙ্ককাণ্ড বচিত হওয়ার উজ্জ্বল অক্ষের সৌন্দর্য ও গঠন-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাইল। স্থূপ গঠনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ-পথ ও বৃল স্থূপটিকে ঘিরিয়া বাহিরে চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মিত হইল। ইন্দ্রকোণে প্রথম প্রথম কলৌচ-ছত্র ও পরবর্তী যুগে প্রকৃতির ছত্র সম্বলিত হইল। অধিকাংশ বৌদ্ধস্থূপই সমাজ-পন্থতের স্বর্ণকোণে নির্মাণ করা হইয়াছে।

তৎকাল বহু অক্ষর উজ্জ্বল কোন উপস্থূপ বিস্তৃত চিত্রা-ভবের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সঙ্গতিপূর্ণ করিয়াই বৈদ্য হান বৌদ্ধস্থূপগুলি রচিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে কলৌচ-ছত্র ও বৌদ্ধস্থূপগুলি উজ্জ্বল-পাণ্ডর-কলৌচ-বস্ত্রই নির্মিত হইয়াছিল, উজ্জ্বল বস্ত্র অথবা তাহা কিছুই প্রাণিত করিয়া রাখা হয় নাই। বোধিসত্ত্বের দেহভাগের পর তাঁহার চিত্রভবের উপর মাত্র মাত্র-মাত্র হানই স্থূপ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজা অশোকের সময় এই স্থূপগুলিকে পুনরায় খনন করান হয় এবং তাহার চিত্রভব বা দ্বিতীয়েষ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ভারতবর্ষের নানা স্থানে লইয়া গিয়া তত্ত্বপরি অলংকার স্থূপ রচনা করা হইয়াছিল। বর্তমান যুগে এই সকল স্থূপ খনন করিয়া কোন স্থানে বুদ্ধদেবের মস্তিষ্ক কোন অংশ, কোথাও তাঁহার ত্রিকোণাক্রমের ক্রিয়াকলাপ ভাষ্য-বিশেষ, কোথাও তাঁহার গাতের চূড়ার, আবার কোথাও

বা কোটার মধ্যে তাঁহার মাপার চুল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। স্থূপগুলির বাহিরের চতুর্দিকে সাধারণতঃ শাক্য ইট বা পাথর দিয়াই প্রকৃত, ভিতরটা কাঁচা ইট বা মালি দিয়া ভরাট করা থাকে। এই সকলের অভ্যন্তরে আর একটি শাক্য ইটের ক্ষুদ্র প্রকার থাকে এবং উহার মধ্যেই দ্বিতীয়েষ্যগুলিকে রাখা হইত। কোন কোন স্থূপে উপত্যাক অষ্টাঙ্গরূপ প্রকারের মধ্যে ভক্তগণের সমস্ত তেজস্বাত উপত্যাকরূপ পড়িয়া বচিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কোন প্রকারের দ্বিতীয়েষ্য পাওয়া যায় নাই।

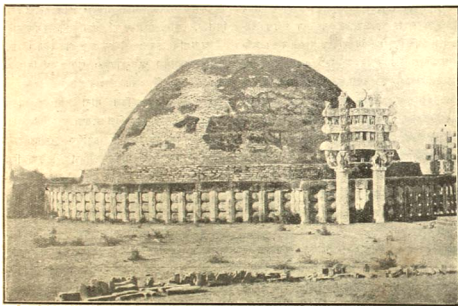
স্থূপগুলি ক্রমশঃ ভার্যক্রেতে পরিণত হইল। ভক্তগণ মনে মনে মাগধি স্থূপ-পাণ্ডর্যে পূজার অর্থ নিয়ে দান করিল। বুদ্ধ-মুর্তি অথবা তাঁহার ভাবনের কোন বস্ত্রই ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া নানা প্রকারের মস্তিষ্ক বা পাণ্ডরের প্রাকৃত মানস করিয়া ভক্তগণ স্থূপ-পাণ্ডর্যে রাখিয়া দিত। বড় বড় স্থূপের চতুর্দিকে দেয়াল অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থূপও মানস রাখিয়া প্রকৃতি নিশ্চয় করাইয়াছেন।

পূর্বেই কহা হইয়াছে যে, সমস্ত স্থূপগুলিই যে কোন না কোন দ্বিতীয়েষ্যের উপর নির্মিত হইয়াছে তাহা নয়, বুদ্ধদেব বা তাঁহার শিষ্য-স্বাক্ষরিত কোন বিবেক কাম, কলৌচ বা কোন স্থানে ভক্তগণের সহায়-চিত্র-স্বাক্ষর অনেক স্থূপ রচিত হইয়াছিল; যেমন বুদ্ধদেব পুণ্ডর নিশাণ-প্রাণিত স্থান বদ্বিগ্ন প্রসিদ্ধ, মাগধি যে তিনি প্রথম বুদ্ধ-প্রচার করিয়াছিলেন ও কাশ্মীর তাঁহার দেয়াগদান ওঃ। রাজা অশোক এই প্রকারের বহু স্থূপ ও পুত্র নিশাণ করাইয়াছিলেন। আমরা প্রসিদ্ধ চান্দ্র পরিভাষক ভবন মাগধের বিবরণী হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি প্রাক্য অশোককে সিদ্ধ প্রদেশে যে স্থানে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানেই স্থূপ নিশাণ করাইতে দেখিয়াছেন। চূর্ণশের অষ্টম-পাতী 'শাক্য' প্রসিদ্ধ স্থূপও সম্ভবতঃ এইজন্য কোন ঘটনার সচিত্র দাঁড়ি, কারণ খনন করিয়া এ পণ্ডিত কোন প্রকারের দ্বিতীয়েষ্য ইহার মধ্যে হইতে পাওয়া যায় নাই।



'সাকীর' স্থাপন করিতে দ্বিগুণ তৃপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাকী হৈশন হইতে কয়েকশত গজ দূরের স্থাপনালীকেই বুঝায়। তদু এই প্রাচীন স্থাপত্য হইতে বিক্ষিপ্ত আরও অনেক স্থান ইহার ব্যাড়া মাটিরের মধ্যে উদ্ধিগাছে। জি. আই. পি. রেলওয়ের 'ভিলসা' নামক হৈশন হইতে এই সব স্থান দাওয়া দাওয়া ইত্যাব মধ্যে 'সোনাতী'র, 'শতধারার', 'লিলাবিহার' ও 'অধোব'র স্থাপত্যগুলিই গণিত। বর্তমানে

শকভের উপর নির্ধন স্থানে নির্মিত ৪০০০ বর্গ উপাসক ও উপাসিকা সঙ্গবাই তথায় গিয়া ভগবান বুড়ের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারিত। সমবেত ভক্তসঙ্ঘের মিলিত কণ্ঠের "বৃদ্ধা শরণা গচ্ছামি, ধর্ম শরণা গচ্ছামি, শরণা শরণা গচ্ছামি"-কন্নি চতুর্দিকের আকাশ, বাতাস ও পৃথিবীকে এক অশূল ভক্তিবলে আশ্রুত করিয়া জেলিত। সাকীতেই আমর। বৌদ্ধ স্থাপতি-বিদ্রাষ্ট ও ভাষ্কর্যের চরম উৎকর্ষ দেখিতে



মহাশূন্য সাকী

পরিভ্রাঙ্ক ও লোকালয়বর্জিত স্থানে কি করিয়া যে এতগুলি স্থাপত্য ও বৌদ্ধ-বিহারের একত্র সমাবেশ হইল তাহা অপ্রসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা অশোকের রাজত্বকালে বর্তমান 'ভিলসা' নগরীর পরিধিতেই 'বিদিসা' নামক এক জনাকীর্ণ নগরী ছিল। তথাকার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভ্রমণেরা নির্ধন স্থান বাছিয়া সহস্রের চতুর্দিকে পর্কতোগরি এই সব স্থাপত্য ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরগুলি

পাই এবং ইহার সঙ্গাঙ্গান উন্নতির মূলে রাজা অশোকের ধর্মপ্রবলতা ও কর্মকুশলতার তুঙ্গী প্রমাণ। না করিয়া থাক।

সাকীর প্রায় সমস্ত স্থাপত্যগুলিই প্রস্তর-প্রাচীর বিহা বেষ্টিত এবং ইত্যাদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) স্থাপত্য—উচ্চা বিবর পুর্কোই বলা হইয়াছে যে, ভগবান বুড়ের কোন না কোন স্থিতিরূপের উপরেই সাধারণতঃ ইহা নির্মিত হইত; বুড়ারের পূর্ণ জগতের যে







## গিবিথ সংগ্রহ ঐতিহাসিককর্মাবলি

বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী কাঠিওয়াড়ের জুনাগড় নামক স্থানেও আর একটি তুল ১৮৮২ খৃঃ অব্দে করা হয়। এখানে অনেকগুলি অশোকস্তম্ভ স্থল স্থপতির চতুর্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্থানের মধ্যে ইটের স্থিতিভিত্তিক বাতির কতিপয় বিশেষ বৈশেষ্য প্রয়োজন হয়, কারণ এই তুলটি আগাগোড়াই ইটের তৈয়ারি। অনেক পরিপ্রস্থের পর মনুষ্য পাথরের চুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ টুকরা প্রথমে আবিষ্কার করা হয়। উপরোক্ত পাথরের টুকরাটিকে দুরাইবার পর নীচের পাথরের মধ্যে ক্ষুদ্র বাতির আকারের একটি গঠন দেখা গেল এবং সেই সঙ্কেতের মধ্যে জুনাগড়ের একটি পেটিকা পাওয়া যায়। এই পিতলের পেটিকার মধ্যে সন্নিবেশিত স্থল-পেটিকার এক টুকরা স্তম্ভধর্মের প্রস্তরের দ্বারা পদার্থ ও তৎসঙ্গে পক্ষ-মধ্য্যে চোঁবোতে লাগিয়া যায়। স্তম্ভধর্ম পদার্থটি প্রস্তরের টুকরা বলিয়াই প্রস্তরমান হয়, তবে ইহা বৃক্ষমূলের বাবদত কোন বস্তুর টুকরা কি না বলা কঠিন। এইগুলিকে জুনাগড়ের দ্বাণ্ডবৎ রাখা হইয়াছে।

পাওয়া ও সিদ্ধ প্রদেশের অনেক স্থানেই অনেক স্থাপতির স্তম্ভাংশের দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থাপত্যের আবিষ্কাংশই পাক্ষা ইটের দ্বারা প্রস্তুত। বেঙ্গালের কোণ ও বহিরাভঙ্গ্য স্থিতিকা-নির্মিত চিত্রাঙ্গি ও অলঙ্কারাদির ব্যয় সঙ্ঘিত করা হইত; তাহার অংশ-বিশেষও পাওয়া গিয়াছে। মিত্রপুর-খাল নামক স্থানের স্থাপতির মধ্যে ইহাতে একটি পিনের মাথার দ্বারা অতিশয় ক্ষুদ্র একটি স্থিতি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। এই স্থিতিভিত্তিক

ধর্মের পাতে নুড়িয়া একটি স্থল-পেটিকাও মধ্যে রাখা হইয়াছিল।

পেশওয়াদের সম্রাটের তৎকালেই কাঠিওয়াড়ের নিকটে একটি তুল পাওয়া গিয়াছে। এই তুলটির কণা চৈনিক পদ্ধতিবৎকরণে পদার্থ নিশিদ্ধা দিয়াছেন, এবং ইহাও সকলেই এই তুলটিকে ভারতবর্ষের মধ্যে দৃশ্য-প্ৰত্যক্ষ



প্রাকার দেখির ভার্য্য বৃক্ষমূলের নিদান বর্ণনাছেন। ইহা আগাগোড়ার মাংসের অতি ক্ষুদ্র ভাবে নির্মিত, এবং ইহার চতুর্দিক বৈশেষ্য বস্তুনা প্রস্তরাদি বহুদানে আছে। এই স্থানের মধ্যে ইটের একটি কাকদাঁড়-খচিত স্তম্ভের পেটিকার মধ্যে আর একটি পদার্থের পেটিকাও তিন টুকরা অকারীভূত অতি পাওয়া গিয়াছে

ঐতিহাসিককর্মাবলি





পরদিন সকালে নিরাভয়ের পর বিনয় বেগলে হুকুমার  
ওড় প'রে অতিশয় ব্যস্ত হ'লে কোন একটা জিনিস অপ্রত্যা-  
কৃত্ত—একবার দেখাও টানকে, একবার ব্যস্ত ভাড়াডাঙ্কে,  
একবার টেবিলের উপরের কাগজপত্রগুলো উল্টে পাশেই  
বেধাচে, কিছু উপস্থিত বসন্ত যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না  
তা তার মুখ-চোখের ভাবে প্রত্যক্ষমান।

শব্দায় উপর উঠে ব'লে বিনয় বেগলে বেলা অনেক  
খানি হ'লে গেছে। আর আলত না ক'রে লম্বা তায়  
করতে করতে হুকুমারের দিকে চোরে করে, "কি রে,  
সকালে উঠে বাছবেল খাবণ ক'রে চলেছে কোথায়?"

"টাক, এজিনিয়ারের বাড়ি তাই।"

"কিছু লে পাখে বাধা হচ্ছে কি?"

"যাধ্যা হচ্ছে টেলিফোনিয়ালের ক্যাবলেটে কোথায় রেখেছি  
পুঁজে পাচ্ছিনে। আর সমস্ত জিনিস—এমন কি যে সব  
জিনিসি বহুদিন থেকে হারিয়েছে ব'লে জানকুম, পাচ্ছি—  
তুমি পাচ্ছিনে উপস্থিত যেটার একান্ত দরকার।"

স্বতঃ চেষ্টে বিনয় ব'লে, "ভগবান এমন কোঁক্ক সন্দেরই  
সঙ্গে মাত্রে মাত্রে ক'রে থাকেন। কিছু লে বা হ'ক, টেলিফোনি-  
য়ালের ক্যাবল ব্যাণ্ডারটা কি তা ত' বুঝলাম না হুকুমার?   
তাকে সন্তত ক'রে টেলিফোনিয়াল নাচ করলে কোন লব  
বাতির কাছ থেকে, এ জানবার কোঁক্কল কম হচ্ছে না।"

জ্ঞাথের সলজ্ঞ চাদির কাণ রেখা টেনে হুকুমার বললে,  
"ওহ! কাজই কখনো করলাম না ত টেলিফোনিয়াল আমি  
কোথায় পাব? ও সব দামামাচারের টেলিফোনিয়াল।"

চকু বিস্ময়িত ক'রে ক্ষণকাল হুকুমারের দিকে চোরে  
থেকে বিনয় বললে, "তোমার দামামাচারের টেলিফোনি-  
য়ালের জোরে সাড়েবের কাছ থেকে তুমি কাজ জোগাড়  
করবে?" তার পর খুব খামিকটা উচ্চস্বরে চোরে নিয়ে  
বললে, "এ সন্তা গতিই অসুখ! সে দিন যেমন দরখাস্ত  
দিয়ে এলেছ, আল টিক তার উপস্থিত টেলিফোনিয়াল নিয়ে  
যাচ্ছ,—যেমন প্রার্থনা, তেমনই দাবী—উভয়ের মধ্যে  
কোন পরমিল নেই! কাজ জোগাড় করবার এ-ও যে  
একটা উপায় হ'তে পারে তা আমার খাড়াগাই ছিল  
না!"

উৎস অপ্রতিভমুখে হুকুমার বললে, "তুমি বুঝত না  
বিষ, এ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় উপায় নেই।"

বিনয় হালতে হালতে বললে, "তুমিও বুঝত না হুকুমার,  
নিরুপায় অবস্থা ব'লেও একটা অবস্থা আছে। 'Theory of  
heredity'র নিশ্চয়তা বিষয়ে টাক, এজিনিয়ারের মনে  
সম্পূর্ণ বিশ্বাস জগায়ে না পারলে তোমার কিছুমাত্র  
আশা নেই। সে যদি ব'লে বলে 'তোমার দামামাচারের  
টেলিফোনিয়ালের জোরে তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করলাম  
বটে—কিন্তু কাজ যোগো তুমি যার দামামাচার হবে

তা'কে তা হ'লে এ বছর নৃসিংহ বিকছে তোমাবই বা  
বলবার কি থাকবে বল ?”

পর্দা ছেলে প্রবেশ করলে পৈলজা : বললে, “ঠাকুরপোর  
গদি তুনে দেখতে এলাম বাপশার কি ?” হুসুমারের  
মিকে চেয়ে বলল : “আমাকে মত ভাড়া দিয়ে তুমি এখনো  
বাও নি যে ?”

বিরর মুখে হুসুমার বললে, “জায়ের কথা বল কেন,  
টেটীমোনিহালের ভাড়াটা কিছুতেই পুঁতে পাচ্ছি ন।”

“কোথায় রেখেছিলে ?”

“সেই- মনে থাকলে দেই যান পেকে বার ক'রে  
মিডাম ।”

বিরর বললে, “বলতেই হবে, এ মুক্তি অকটা !”

মজারমুখে পৈলজা জিজ্ঞাসা করলে, “সব ভাষণা পুঁকে  
দেখেচ ?”

“দেবাম, টেবিল, বাজ—সবই ত পুঁকে দেখলাম  
তোমার নেই ।”

“পকেট দেখেচ ?”

পৈলজার কথা শুনে বাহু হ'রে পকেটের মধ্যে গভ্র  
চুকিয়ে দিয়ে একটা কাপড়ের ব্যাগিল বাহ ক'রে প্রদর  
মুখে হুসুমার বললে, “এই পকেটে তরোঙা—ঘরবান  
পৈলজা, তোমাকে ঘরবান ! তুমি নটলে আমি  
দেখছি একবারে—”

বিরর বললে, “অচল ।”

“টিক বেলেছ—অচল । আচ্ছা চমাম ভাই । তুমি  
চাটা বাও—আমি খটা খানেকের মধ্যে খুঁর আসছি ।”  
ব'লে হুসুমার দ্রুত গবে বেরিয়ে গেল ।

বিরর বললে, “মাশনার অতমানলকি ত' পূব উচু  
দয়ের বৌবি ! কি ক'রে জানলেন পকেটে টেটীমোনি-  
হালের ভাড়া আছে ?”

ভিত্তমুখে পৈলজা বললে, “অতমান নয়—অভিজ্ঞতা ।  
ওঁর যা মিনিদ হাজার গভ্র অর্ডেক পাওয়া যায় ওঁর পকেট  
থেকে—অথচ কোনো বার যদি প্রদর পকেট দেখেন ।  
একবার একটা হাতুড়ি হারিয়েছিল, তিন দিন পরে হঠাৎ  
পাওয়া যেন ওঁর ওজার-কোঠের পকেটের ভিত্তর থেকে ।

চার পাঁচদিন পকেটে হাতুড়ি নিয়ে মর্নি ওয়ার্ক করেছেন—  
অথচ পকেটটা যে মত ভারী কেন হ'ল তা খোঁজা হয় নি ।”

পৈলজার কথা শুনে বিরর হাসতে লাগল ।

পৈলজা বললে, “ওঁর ভুলের পেটটা তিন চার পর যদি  
যোনের ত' ঠালতে ঠালতে পেটের নাকী ছিঁতে থাকে ।  
যাক, সে আর এমন কাজ নেই, অল্প সময়ে হবে, এখন  
আমনি তরোর হ'রে নি—আমি খোঁজাকে চায়েই বাধ্য  
করতে বলছি ।” ব'লে প্রত্যানোদাতা হ'য়ে দিয়ে এসে  
বললে, “হঁ, ভাল কথা, কাল কল্লদাসার পকে ত' আমনার  
আলোপ হ'ল, কেমন লাগল ওঁকে ? বেশ মাতুর : না ?”

“লজোবাবুর নাম কয় ?”

“জী, বাড়িতে ওঁর ডাক-নাম লবু । আমাদের লকে  
ছেলে বেলা পেকে পরিচর ব'লে আমি কল্লদাস ব'লে  
ভাকি ।”

বিরর বললে, “জী, বেশ মাতুর ।”

এক দুহুটী চুপ ক'রে থেকে মুখে চাপা মুচ হাসির  
উদ্ধাস ছড়িয়ে পৈলজা বললে, “কাল না কিছু প্রা-খানদা  
নিয়ে কমলার লকে আমনার বাড়িমত বাগুদে ত'রে  
দেখেচ ?”

মজারমুখে বিরর বললে, “হঁ, কতকটা । তবে সতিও  
তারপর হঠকে । কে বললে আমনাকে ?—হুকু বুঝি ?”

পৈলজা বললে, “হঁ, বাড়ি এসেই শুনলাম । সেখানে টেব  
পেলে কমলাকে একটু ভাড়া ক'রে আস্তান—বল্লাম  
এখনি কল্লদাসার পকে নিয়ে এমন ক'রে লড়াই করলে,  
একটু খানি চোট লুচ করতে পারলে না, বিয়ে হ'য়ে সেলে  
না জানি কি কাণ্ডট কবে ।”

হোপ্রোচ্ছদ আকাশের উপর দিয়ে একখান লবু ঘেঁষ  
চ'লে গেলে নিয়ে প্রবীণ ভূমি সহসা ঘেরন মিনি হ'রে বায়,  
বিররের বসমত্তলের অধর্যাত টিক তেমনি চ'ল । এক  
দুহুটী কি চিত্রা ক'রে সে বললে, “লজোবাবুর মত কমলার  
বিয়ে হবার কথা হচ্ছে ?”

পৈলজা বললে, “কথা হচ্ছে কেন, অনেকদিন থেকেই  
সে কথা টিক হ'য়ে আছে । জামাইয়ের মতই কল্লদাস  
আসেন যান থাকেন । এতদিন বিয়ে হ'য়েই যেত—ভদ্দু



কমলার মার শবীর পাখাশ, ঢেঁকে সেগেন, ব'লেই চ'ল না।  
তিনি শিয়ট দিগে আস'লেন, তারপর অস্ত্রায় মাগে বিধে  
হবে।”

ছোট একটি ‘ও’ ব'লে বিনয় ভোরালগেটা আস'ল। সেক  
নিধে ক'বে ফেলে বাধকমে বাধার মতো উভত হ'ল।

“বাই, তোমার চা-টা পাটিং বিই দে”, ব'লে শৈলজা  
প্ৰণাম করলে।

ভিতরে গিয়ে শোভার কাছে উপস্থিত চ'রে শৈলজা  
সম্মোখিত শোভার মধ্য মুখি আর কুঁকিত বসনের দিকে  
দৃষ্টিপাত করে বসলে, “কি কান্ট্রিকুনির মত চেহারা ক'রে  
বয়স্কিন। একদিন রাত্রি বায়োটা পর্বাণ জেগে, উঠে  
একবারে বেগা আটুটা! বা, শৌগণির বাধকমে গিয়ে গুত  
পা মুখে সাবান দিয়ে একখানা কাপড় ছেড়ে চুলটা টিক  
ক'রে যায়।”

দখিঘরে শোভা জিজ্ঞাসা করলে, “কেন, কি হবে?”  
কুঁকিত ক'রে শৈলজা বললে, “তোকে দেখতে  
আসবে।”

পাশে ডাক্তারঘর গিরিবালা পূজার আস্তোজন করছিলেন,  
শৈলজার দেব কথটা শুনেই পেয়ে ঈশ্বর উভয়ের জিজ্ঞাসা  
করলেন, “বউমা, কি হয়েছে গা?”

শৈলজা বললে, “ও কিছু নয়। তুমি পুরো কত রা।”

আর কোনো কথা না ব'লে গিরিবালা পুনরায় চন্দন  
গাথার মন দিলেন।

আর গটীটাক পয়ে বদন একটি কাঠের ট্রে উপর  
চা ও বাথার মাজির শোভা বিনয়ের নিকট উপস্থিত হ'ল  
তখন বিনয় মুখ তাত খুঁজে বাতানার একটা চেয়ারে ব'লে  
সিঁড়ের মনের সঙ্গে একটা বোকাপড়া ক'রে নিজে বাস্ত।  
নিজের মনকে একটি বস্তর পুসক সত্তা দিয়ে তার পিঠে  
গাত বুলিয়ে সে তখন বোকাছে,—বেশ, বাপু চিত্রকর,  
তুমি হজ্ঞ বাতানার মাতৃ, মাতাজান কুল ক'রে  
বেশালা হ'লে তোমার গুণে কেন? কতলোকের মনের  
চিত্র আঁকুত গিয়ে তার চিত্র খ'য়ে টানটানি করা তোমার  
পক্ষে একান্ত অসুচিত— গণেশবত: ও বসন্তি বদন এমন যে,  
টানপেই সব মনকে ছাড়ে না, আবার না টানলেও সময়ে

সময়ে এসে উপস্থিত হয়। তোমার হৃৎকলির কারবার  
শেষ ক'রে দক্ষিণা বৃক্ নিধে খাদ্যসত্ত্ব শীত ল'রে পড়।  
চিত্র নিধে নীলা বসি করতের হর ত' অস্ত্রত:—অর্থাৎ বহু-তজ  
নয়। চাওয়ার শিল্পে দেখানে পাওয়ার একটা প্রবল  
লক্ষ্যবনা থাকে না, সেখানে চাওয়া একটা মত বড় অকল্যাণ।  
পাওয়ার লক্ষ্যবনার অর্থ ক'বে যে চায়ে সেই বুদ্ধিমান, সে  
অর্থ না ক'বে যে চায়ে সে নিরোষণ।

মুহ মুহ মাথা নেড়ে মন বললে, “তোমার এ হিসেবের  
অর্থ সংসারের মোটামুটি জিনিশেরই বিঘরে খাটে—কিন্তু বে-  
দব বহু মাছুষের সাধারণ খাতাপঞ্জের বাইরে তার হিসেব  
ততত্বটা দাখ্যশাতের নিয়মে চলে না। বিবেচনার লাগি খ'বে  
দখি মাটির উপর খুঁবে বেড়ানো যায় তা হ'লে অকল্যাণের  
ভয় অনেকটা কম থাকে বটে, কিন্তু বাগনার পক্ষ  
বিস্তার ক'রে যদি আকাশপথে পাড়ি বিতে হয় তখন  
বিবেচনার লাগিটিকে অন্যবস্ত্রক স্তরবোথে পরিভাগ ক'রে  
থেকে হবে। মাছুষের মন শুধু পায়ের হেঁটে বেড়ায় না,  
তানো মেলে ওড়ে। ওড়ার বিশদ থেকে নিরাপদ করবার  
মতো মনকে যদি শুধু বিবেচনার লাগি খ'রে পায়ের হেঁটে  
বেড়াতে বল তা হ'লে কেবল মাত্র মাটির অর্থ ক'বে ক'বে  
মন মাটি হবে।

মনের এতদ প্রভাব অতিবাকিতে বিনয় পঠিত হ'য়ে উঠল;  
তীব্রকণ্ঠে সে বললে, আচ্ছা, বিবেচনার কথা না হয় ছেড়েই  
বিলাম, কিন্তু বিবেক ক'লেও ত' একটা জিনিস আছে?—  
যে বয়স্রায় মনরের অধিকারকৃত হয়েছে, সে বয়স্র প্রীতি  
শোভে কথা নাতিশয়ত হয় কি?

লক্ষুণীত হ'য়ে এতটুকু হ'য়ে গিয়ে মন বললে, এবার  
সংসারের কথা তুলেও ত?

আরক্ নোহে বিনয় বললে,—তুমি নিজেই যদি না  
তুলতে তা হ'লে নিশ্চর তুলতাম।

দ্রিক্ এমনি ভাবে বিনয়ের মন বাসনা আর বিবেকের  
তাকনার ঝাঁপে এমন সময় শোভা উপস্থিত হ'য়ে বললে,  
“কিছু না, আপনাদের চা এনেছি।”

পাশ দিগে শোভার প্রতি দৃষ্টিপাত করত প্রথমই  
বিনয়ের চোখে পড়ল শোভার দ্বিত পাব মাঝা-ঝা

দুখদানিতে কপালের উপর একটি বড় সিঁড়রের টিপ। লক্ষ্য  
মনে চ'ল এই টিপটিই যেন সমস্ত সমস্তার সমাগম,—এ যেন  
বিগতের উপর পুনিবার চাঁদের তলটি বহন ক'রে এনেছে,  
এবং ক্রমে স্বর্গীকরণের মত উজ্জলতা না বাতুল,  
কমনীয়তা কম নেই।

শোভার হাত থেকে ট্রেটি নিয়ে পাশের টেবিলে রেখে  
বিলম্ব বল্লে, “লক্ষ্যে উঠেই অতবড় একটি সিঁড়রের টিপ  
পড়েছে যে শোভা?”

এই টিপটি লক্ষ্যের সমস্ত শোভা বায়বার অপরি  
করেছিল, কিন্তু শৈলজা আর ক'রে পরিচয় দিয়েছিল,  
শোভার কথা শোনে নি। সেই টিপ নিয়ে প্রথমেই কথা  
উঠে শোভা লক্ষিত চ'ল, মনে মনে শৈলজার উপর  
রাগও একটু করলে। আরক্ত মুখে সে বল্লে, “বউদিবির  
কাণ্ড!”

“ও—তাই?” ব'লে বিনয় একটু হাসলে। সে বেশ  
বৃকতে পারলে সিঁড়রের এই টিপটিকে আশ্রয় ক'রে রয়েছে  
শৈলজার কত আশা, কত আশ্রয়, কত চেষ্টা,—আর তার  
সঙ্গে রহত ভক্তিত হ'রে রয়েছে একটি কুমারীজন্মের কত  
আশঙ্কা, কত লক্ষ্য, কত বেদনা! নিরতিবৎ এক নিষ্টুর  
কৌতুক! যে বেদনা সে নিজে পেয়ে বাণিত চক্ষে সে বেদনার  
অসবকে বহিত ক'রে সে নিশ্চিন্ত হ'রে আছে। উৎসাহ  
আগ্রহ, উজ্জ্বলিত আবেদনকে অগাধ ক'রে সে ঢেকে

যেখানে কোনো লাড়া কেই কোনো অস্ত্রভাও নেই  
শিঙেনে। মোতব্বাতকে পরিচয় ক'রে চলেছে মরীচিকার  
প্রলোভনে।

“শোভা?”

“হ্যাঁ হুঁ”

“বউদিবির এখন অবকাশ আছে?”

“আমি বেগে এসেছি তিনি যানের সঙ্গে চুকো।

“কত ঘের হবে?”

একটু তেবে শোভা বল্লে, “আমি বউটাক। ডাকব?”

মাথা মেড়ে বিনয় বল্লে, “না, তাও কি ও?”

কথা ছিল, তা সে অল্প সময়ে বলব অখন। গাড়ি  
পড়ল, এখন আবার কখনার ছবি আঁকতে যেতে হবে।”

আঙুলে আঁচলের কোণে তক্তাতে তক্তাতে শোভা বল্লে,

“আমাকে যদি বলে যান আমি বউদিবিকে বলতে পারি।”

মনে মনে একটুখানি কি তেবে বিনয় বল্লে, “তামাশা  
বিধরে কোনো কথা—কিন্তু সে বউদিবিকেও প্রথমে বলব  
আর একটা কথা শোভা, যে সব কথা তোড়'ব সঙ্গে  
চ'ল সে কথাও বউদিবিকে এখন বলো না—একশে?”

আগন্ত মুখে শোভা ঘাড় নেড়ে কানোলে বল্লে না  
তাড়াহাড়ি যা আর চলখাবাব খেয়ে ছবি আঁকবার  
লাজ-সরজাম নিয়ে বিনয় গাড়ি ক'রে বেরিয়ে গেল।

(কমলঃ)



## দেহাতীত

ঈরামেন্দু দত্ত

চোখের দেখায় শুধু বাড়ে প্রাণ,

বুকে এলো, ম'রে ঘাই !

দাঁমি তব চিত্রা নাহি দিতে পাঠো

শ্রু শু চাশি নাহি চাট !

চাঁচনা ও তব মিঠে মধু বুলি,

নড়নে কি হ'বে ও নড়নে তুলি' ?

বাতর পীড়নে শুধু ধরা দিলে

তোমায়ে ত নাহি পাই !

অঙ্করে মনে প্রেমের বাঁধনে

দোপনে বাঁধিত চাট !

আমি চাহি তব বাসুকল দগর,

আমি চাহি তলবাসা,

আপল প্রেমসী ধরা নাহি দিলে

করিনা দেহের আশা ।

প্রিয়ে, তুমি নও তুই হুকোমল,

লীলা ঠকল নড়ন-বুগল !

নবর, তরুণ, অধর ভেবল,

সবল, মধুর ভাষা !

তরু-মাদুরীর অতীত স্বপ্ন

মিটিবে আমার আশা !

কে চাহে তোমার মজু দেহের

কোমল পরশবাণি

অঙ্কর দিবা কাঙ্কালের স্নিঃ

রাঙাইয়া তোলে। হাট্টি !



ତୁମି ସାଜା ହୋଇ ଲାଓ ଲଜା କରି'  
 ତାଳବାଜା ନର ଦଧିନି ଗୁଆ' ଅଛି,  
 କେ ଦେନ ଆଜାର ଲୋନାର ଦୋଷ  
 ଶିଳାଟ, ଦୁଲାର ଡାନି' !  
 ତୋହାର ଓ ତତ୍ତ ଚାହିଁବେ ଗୁମ୍ଫା,  
 ତୋହାରେଟି ଚାହିଁ ଗାଳି !

ଆହାର ଅକାଶେ ଶେଷ କରେ' ଆସେ,  
 କାଳ-ବିଳାସୀ ଯାତେ,  
 ଆମି ଗ୍ରାସନ କ'ରେ ଚାଲି ବସ  
 ଗତିକୂଳ ଗତ ଯାଏ ।  
 ତଦନ ତୋହାର ଚିନ୍ତା-ବୁଦ୍ଧି  
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲବ୍ଧ ନବ-ବଳ ଲାଭ,  
 ସରଳ ବେଶର ଯୋଗାଡ଼ି ତୋହାର  
 ଇନ୍ଦ୍ର-ବିଭୁଷଣ ଶାଢ଼ୀ !

ଆମାର ସ୍ବଚ୍ଛଳ ଯାହାର ତାଳି,  
 ଶୁଦ୍ଧେର ଆକର ଯମ !  
 ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀ ବିହାର ଏହି ବାସନାର  
 ଅସନ୍ତୋଷରେ କହ !  
 ତୋହାର ଓ ଶ୍ରମ ଦୂଳିହାରେ ଚାହିଁ !  
 ଗାଢ଼ି, ବୁଝି, ନାହିଁ ଓଡ଼େ ନାହିଁ  
 ଅନ୍ତର ନାହିଁ ଅନ୍ତର ବୁଦ୍ଧି  
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତର ଆଶୋ,  
 ବୁଦ୍ଧିଶୀଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମ !

## নানাকথা

### পদ্ম মহাসাম্রাজ্য

পত্নী ১৯৪৫ সালে কলিকাতা গেজেট্‌ ফলে কবি রবীন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে দশমবার্ষিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। অতি-ভাষণের একস্থলে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বর্তমান কালের অঙ্গন এই যে, আমাদের মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করাতে মন যে কেবল নিষ্ক্রিয় সমীকৃত্য অত্যাশি করিবে তাহা নহে, বরং আমাদের মন নষ্ট, সেট পূরের মর্শ প্রস্তুত প্রস্তুত বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। বৃত্তিতে হইবে যে পূরের মর্শ আর কিছুই নহে—সমান্তর সত্যের বিশেষ একটা রূপ, ঐশ্বর্যভূত্বের একটা বিশেষ প্রকাশের অস্তিত্বাক্ষর। তিনি আরো বলেন,—সাম্প্রদায়িকতা নাস্তিকতা অপেক্ষা বেশীর বড় শত্রু। পরমেশ্বরের প্রতি আমরা বহুতর ভাব-ধর্মের তত্ত্ব নিবেদন করিয়া দিতে পারি, তাহার প্রধান অংশটাই সাম্প্রদায়িকতা তাহার নিম্নে প্রাণ বহিয়া দায়ী করে। সাম্প্রদায়িকতাকে হস্ত হইয়া আমরা ঐশ্বরকে পূর্ণ তত্ত্ব নিবেদন করিতে পারি না।

### কংগ্রেস

পত্নী ২০শে ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতার কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশন অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এবারকার প্রধান আলোচ্য বিষয়—ডোমিনিয়ন ট্যাট্‌স্‌ বৃদ্ধক নৈরোয় কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেস অধ্যয়ন করিবে অথবা মাত্রাক কংগ্রেসে অবলম্বিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শই অঙ্গুর হাতিবে—এই সমস্ত মূল্যে একটা বিরোধের আশঙ্কা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন সভাপতি নৈরোয় কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেস কর্তৃক এমতাব্য এই সমাধান হইয়াছে যে, ১৯২২ সালের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ একবৎসর কাল, ব্রিটিশ সভ্যবর্তী কর্তৃক নৈরোয় রিপোর্ট অধ্যয়ন এবং অবলম্বনের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা হইবে, কিন্তু এক বৎসরের

মধ্যে উক্ত রিপোর্ট পূর্ণমাত্রায় কর্তৃক গ্রহণ না হইলে কিংবা তৎপূর্বে অগ্রাহ্য হইলে অঙ্গব্যয় নীতি অবলম্বনে পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হইতে হইবে।

এবারকার কংগ্রেস জনসম্মেলনের বিশৃঙ্খলতা এবং সাধ-সংক্রামের পৌরবে পূর্ণ অধিবেশন তুলনিক পুরাতন কথিয়ারে তথ্যের সন্মত নষ্ট। বিরাট মণ্ডলীতে অসুস্থ বিশ্রামের লোকের বসিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই বিশৃঙ্খল জনমণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যাধিতে বক্তৃতার প্রত্যেক কথা স্পষ্টভাবে শুনিতে পান তদন্ত পাউন্ড স্পীকার বক্তার সমাধতা গণ্য হইয়াছিল।

কংগ্রেস সমিষ্ট প্রদর্শনীও এবার আরও বিশৃঙ্খল অস্তিত্ব বৎসরের প্রদর্শনী অপেক্ষা রক্ততর হইয়াছিল; কিন্তু শিল্পের বহু মূল্যের অস্তিত্ব বৎসরের প্রদর্শনীর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কংগ্রেসটি বিধি ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেস-প্রদর্শনী এবারকার প্রদর্শনী অপেক্ষা উচ্চতর অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়—নাট্য বিভাগ স্তম্ভবতঃ তদ্রূপে অস্তিত্ব।

বর্তমান প্রদর্শনীতে লোক শিক্ষার্থে যে বিভাগগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল তদ্রূপে স্বাধীনতা, জনকল্যাণ, কৃষি, শিল্পশালন প্রভৃতি বিভাগগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর ক্ষেত্র-বিস্তার, পথ-প্রণালী বিভাগ-বিভার, সাধ-সম্মেলন মূল্য-বর্গ সকলেরই প্রশংসা উল্লেখ করিয়াছিল।

কংগ্রেস এক প্রদর্শনী শৃঙ্খলার পৃষ্ঠিত পরিচালনা এবং নিয়মের তত্ত্ব পূর্বক এবং নাট্য লইয়া একটি রূপে বৈজ্ঞানিক-সেবক-সম্মেলন গঠিত হইয়াছিল। সাধারণ কার্যসম্পন্ন, তৎপরতা এবং মূল্যবোধে জনসাধারণকে, বিশেষতঃ মহিলাসম্মেলন, সত্যতঃ দান বিষয়ে এই সম্মেলন যে ব্যাতি অঙ্গন করিয়াছেন, তাহারা তাহার মূল্য-অধিকারী। তবে বৈজ্ঞানিক-সম্মেলনের বিদ্যেই সামগ্রিক প্রণালী মায়াকরণ এবং সাধ-সম্মেলন সকলের মনোপূত হয় নাই।

বেঙ্কোপেবক-পল্লের অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণ সুভাষচন্দ্র বসু  
মহাশয় এবারকার সম্মেলি পরিিত করিয়া উন্নত লক্ষ্যচলন-শক্তি  
পরিচয় দিয়াছেন ।

### লগুন বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনী

কিছুকাল হইল লগুনের প্রবাণী বাছাণীদেব উদ্ভোগে  
লগুনে একটি বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।  
বিলাতে বাঙলা সাহিত্য চর্চায় এই বীজ বপন হওয়ায় সংবাদে  
আমরা; আনন্ডিত হইয়াছি এবং লক্ষ্যান্তরেণে কামনা  
করিতেছি যে, এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট এবং  
পরিপত্তির পথে পতিত্বিল হউক । সম্মিলনীর কণ্ঠসব্দে শ্রীকৃষ্ণ  
বীরেন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমতা গণবালা দাস ও শ্রীকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ  
সেনের দাক্ষিণ্য উক্ত সম্মিলনীর যে বিবরণটি আমরা; পাইয়াছি  
দাখ্যবর্নের অধস্তির লগ্ন নিয়ে তারা উদ্ধৃত করিয়া নিলাম ।

“লগুনে অনেক বাঙলা ছাত্র । অষ্ট তাবের পরস্পরের  
মুখে জানাভনা আপাণ পরিচয় হ’তে পারে এমন কোনও  
কৈক লগুনে ছিল না । অনেকদিন ধ’রেই বাঙালী ছেলেরা  
এ বকম একটা সমিতির অভাব মজুতব ক’রে আসছিলেন ।  
তাই কয়েকজনের উৎসাহে, বিশেষ ক’রে শ্রীকৃষ্ণ নোহারেন্দু  
বসু মজুরদারের চেষ্টায়, গত এই চৈত্র ইং ১৯ই মার্চ এই  
সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয় । এর উদ্দেশ্য এই যে, বাঙলাভাষা  
লোকদের একত্র ক’রে তাবের মধ্যে বাঙলা ভাষার নানা  
বকম প্রদর্শন আলোচনা করার সুবিধা ক’রে দেওয়া ।  
সম্মিলনীর অধিবসনভূমি সাধারণতঃ চ’লপুত্র অস্তর অস্তর  
হ’তে থাকে । এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়লাল গুপ্ত, নলিনাক্ষ  
শাহাণ, নোহারেন্দু বসু-মজুরদার ও সুপেন্দ্রনাথ বোস অতি-  
সুন্দর রকমে সমিতির কাজ চালিয়েছেন । লগ্নর যে সমস্ত  
লক্ষ-গুণ বিবর আলোচনা হ’রে সেজে তার কয়েকটির  
নহা নাচে বেওয়া গেল ।

“বঙ্গীর বিবিভাগরে বাঙলা ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী  
ভাষায় বিজ্ঞানবিবি বিবি পাঠের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়  
নয় ।”

“বিলাক-অভ্যন্তর সম্পূর্ণরূপে বন্ধনীয় ।”

“প্রাচীনভাষা প্রাচীর অর্ধদৈনন্দিক বিকাশের  
অনুরণ ।”

“আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানবদুঃখের উন্নতির উদ্দেশ্যে  
সুচবিপ্র সম্পূর্ণরূপে বন্ধনীয় ।”

“ভারতীয় নারীর আদর্শ ।”

“ভারতে পরী-সংগঠন ।”

“ভারতে প্রজনন-শাসনের প্রয়োজনীয়তা ।”

“উত্তরাধিকারসূত্রে অর্ধলাভ বিধিবিকল্প চণ্ডা উচিত ।”

এই সমস্ত বানিত্যবাদের ভেতর সিরে আমাদের ভেলেদের  
মনস্তব্দের দানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় । “বিলাক  
অভ্যন্তর বন্ধনীয়” এই প্রস্তাবের বিল্ডে বেনীর ভাগ লগ্ন  
মত দিয়েছিলেন, “প্রজনন-শাসনের প্রয়োজনীয়তা” সম্বন্ধে  
লকলেই একমত এবং অধিকাংশ লগ্নই মনে করেন যে  
“উত্তরাধিকারসূত্রে অর্ধলাভ বিধিবিকল্প চণ্ডা উচিত ।”

লগুন প্রবাণী সমস্ত বাঙলা-ভাষী লোকদের সম্মিলিত  
করার লগ্ন ও লুগ্ন ছাত্র ছাত্রীদের অর্জনকর করণ উদ্দেশ্যে  
গত ১৪ই অক্টোবর একটা উৎসবের আয়োজন হয় । এই  
উৎসবে প্রায় ১০০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন । শ্রীমতা  
সুভাষিনী নাইটু, শ্রীকৃষ্ণ বীরেন্দ্রনাথ বসিক ও তাঁহার স্ত্রী,  
লগ্ন দিগ প্রভৃতি এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন ।  
একজের বক্তঃপ্রস্তুত হ’রে অনেক আমাদের গাভাধা  
ক’রেছিলেন—মরদের মধ্যে শ্রীমতা তটনী দাস ও শ্রীমতা  
সুগামিনী সেনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ।

গত ২৪শে নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তদ্বার লগ্ন “লগ্নের কাজ”  
সম্বন্ধে সম্মিলনীতে তাঁর বাতাবিক চিত্তাকর্ষক ভাষণ একটি  
বক্তৃতা বেন । সমিতির কাজ আরও বেড়ে চলছে বলে  
কিছু টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে । তাই দিয়ে সামান্য  
কণ্ঠমত বাবুৎ বলে আণা করা যায় । আশান্ততঃ  
এই সম্মিলনীর লগ্নাবের লগ্ন একটি লুতকাপাণের বলাবল  
করা হচ্ছে ।

আমরা আমাদের দেশ থেকে এটি কাজে উৎসাহ  
ও সাহায্য পাৰ বলেই আমাদের অধিবসনীদের কাছে  
আমাদের ইতিমুদ্র জ্ঞান্য ।”



## নিম্নলিখিত ভারত মহিলা সম্মিলন

বিখ্যাত কংগ্রেস উপদেষ্টা কলিকাতার বিভিন্ন বিধেয় বিভিন্ন দেশের অনেকগুলি সভা সমিতি উদ্বোধিত—নিম্নলিখিত ভারত মহিলা সম্মিলনের অধিবেশন তন্মধ্যে একটি। উক্ত অধিবেশনে ময়ুরভট্টের রাজমাতা শ্রীমতী প্রভুচি দেবী সভাপতি, সন্মিতির, এবং ত্রিবাঙ্কুরের সভাপতি মাননীয় প্রমুখশাস্ত্রী বাই মূল সভার অধিনেত্রী হইয়াছিলেন। পক্ষ প্রথা, বাংলা বিবাহ ও বৈবাহ্য-বিপত্তি, ডাটাস্টার্ম রীতি অবলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত অধিবেশনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী অমৃতকণা দেবী অধ্যাপক প্রধাণ বিজ্ঞে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পক্ষ প্রথা বন্ধন দৃষ্টে সভা সম্মিলে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যাহা সভাসকল গৃহীত হয়। বিচিত্রায় বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল।

## বাঙ্গালী সাহিত্যে মুসলমানের দান

বিষয় ২২ নম্বর গ্রন্থকার অসহায়ের কারমাইকেল হইলেন প্রমুখ একটি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক বংশ—সুসাহিত্যিক শ্রীমতী এম. ওরফে আলি মহাপুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডক্টর বীর্জেন চন্দ্র পেন মহাপুর সভার আলোচনা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিচিত্রায় এই সংখ্যায় সে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইল।

বাংলা ভাষার মুসলমানদের মতিভাষা বাংলাভাষা পরিভাষা পরিভাষা উদ্ভাষা পরিভাষা কত উচ্চিত বাংলাভাষার মুসলমান সম্প্রদায় দুল কয়েকজন ব্যক্তি এই মতবাদের বিজ্ঞে শ্রীমতী মুসলমান মনসুর উদ্দিন এবং এ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রত্যাবর্তি সভাসকল গৃহীত হয়। সভাসকল সভাসকল মুসলমান দৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা ভাষার মুসলমানের দান এবং বর্তমান মুসলমানের বঙ্গ ভাষা পরিবেশনের অসমীচীনতা ও অসম্ভবতা বিষয়ে চিন্তাশীল ও সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা সভাপতি মহাপুর প্রোতসাহিত্যে পরিভূক্ত করিয়াছিলেন।

## সরোজ মলিনী দারীমঙ্গল সমিতি

গত ১৯শে জাহাঙ্গীর কবি শ্রীমতী কামিনী রায়ে মহাপুরি কলিকাতা এমবাট হলে উক্ত সমিতির চতুর্থ বার্ষিক বৃত্তিসভার অধিবেশন হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নারীতর শিকারিয়ার ও কল্যাণকামনের জন্য এই সমিতির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই সমিতি ভারতবর্ষের ব্যক্তিগত শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,—সমিতি উত্তরভারতের উদ্দেশ্যে ও উত্তর মহা বিদ্যা ভারতবর্ষের নারী বংশের হইয়া উক্ত উদ্দেশ্যে কামনার বিষয়।

## শ্রীমদ্বীপধাম পরিভ্রম

আগামী দশম্বর ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বত্র পুণ্য পথে প্রাচীন নবদ্বীপের শ্রীমদ্বীপের শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বিরাট শোভা-যাত্রাবহক্রে গন্তব্য নগর ব্যক্তি পরিভ্রম আয়োজন করিয়া নয় দিনে নবদ্বীপ (অমৃতদ্বীপ, দীপদ্বীপ, মহাদ্বীপ, সোমদ্বীপ, ফোলাদ্বীপ, দ্বীপদ্বীপ, অমৃতদ্বীপ, মোক্ষদ্বীপ, জয়দ্বীপ) পরিভ্রমণ করিবেন। শ্রীমদ্বীপের রাজসভার দলভ্রমণ সর্বসাধারণকে এই পরিভ্রমণ-উদ্দেশ্যে আশ্বাসন করিবার জন্য দায়িত্ব নিমন্ত্রণ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ বিনাভায়ে দৃষ্ট ব্যক্তিগণের আগন্ত, আগন্ত ও প্রবাসি বহনন সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন। সন্মিলনের জন্য বহনন ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতা শ্রীমদ্বীপের মঠের সন্মিলনের নিমিত্ত হইতে বিজ্ঞিত বিষয় প্রকাশিত।



# বিচিত্রা

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

তৃতীয় সংখ্যা

## বিজ্ঞাসমবায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এলাচাপান টংবেজি-বাংলা কুলের কোনোছাত্রকে একদা  
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, "River" শব্দের সংজ্ঞা  
কি। মেধাবী বালাক তার নির্ভুল উত্তর দিয়েছিল। তার  
পরে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "কোনোদিন সে  
কোনো river দেখেছে কিনা," তখন গল্পগম্বীর ভাৱে  
বলে এই বালাক বললে, "না, আমি দেখিনি।" অর্থাৎ  
এই বালাকেও ধারণা হয়েছিল যে ছোট্ট ক'রে কই ক'রে বাসান  
ক'রে অভিধান হ'তে পথের ভাষাংশে যা বাব তা আশান ভিন্নি  
নয়, তা বহুদূরবর্তী, অথবা জা কেবল সুখিলোকভূক্ত।  
এই ছেলে তাই নিজের জানা মেনটাকে মনে মনে জিজ্ঞাসাকী  
বিজ্ঞা হ'তে বাব নিয়েছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে সে  
শিখেছিল যে, যে-দেশে তার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলে বিজ্ঞার  
গামগী, সেও একটা দেশ, দেশানকার river ও river।  
কিন্তু মনে করা থাকে তার বিজ্ঞাতার দেশ পর্যন্ত এই ধরটি  
সে শয়নি, শেষ পর্যন্তই সে ভেবেছে যে, আর সকল  
জাতিবই বেশ আছে কেবল তারই দেশ নেই, তারলে  
কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত সুখিবার জিওগ্রাফী মশাই ও  
মশমশু থেকে বাবে জান, তার মনটো অন্তরে অন্তরে  
গ্রহটান গৌরবটান হ'তে থাকবে। অবশেষে বহুকাল পরে  
যখন কোনো বিশেষী জিজ্ঞাসাকী-পত্রিত এসে কবাজলে

তাকে বলে যে, তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড় দেশ আছে,  
তার জিমালার প্রকাণ্ড বড় পাঠাড, তার দিক গজা  
রক্তপুল প্রকাণ্ড পড়নগা, তখন জ্ঞান এই মস্ত স্ববটাপ  
তার মাথা ঘুরে যায়, নতুন জ্ঞানটাকে সে স্মৃতিভাবে বচন  
করতে পারে না, অনেক কালের অগোঁবটাকে একমিনে  
শেষ করার সঙ্গে সে চিন্তাকর পড়ে চারিদিকে ঝেঁলেবেড়াই,  
আর-সকলের দেশ দেশ-মাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।  
একদিন যখন সে মাথা হেঁট ক'রে আঁওড়েছে যে, সুখিবারে  
আর সকলেরই দেশ আছে কেবল আমাদেরই নেই,  
তখনো বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ বাঁচিলা,  
আর আর যখন সে মাথা তুলে অঙ্গস্ত ভাববরে ঠেকে  
বেড়ায় যে, আর সকলের দেশ আছে আমাদের আছে যথ,  
তখনো বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পুণের বিচ্ছেদ  
ছিল অজ্ঞানের, হুতরাং মাক্কাব, গ্রন্থকব বিচ্ছেদ  
শিক্ত নুতরাং, হুতরাং তা চানকব এবং তাচারিক  
অনিষ্টকর।

সাধারণত ভাবটায় বিজ্ঞা সবচেয়ে আমাদের যে ধারণা  
সেও এই মেলি। শিক্ষাব্যবহার মধ্যে আমাদের নিক  
দেশের বিজ্ঞার স্থান নেই, অথবা তাই স্থান সব পিছনে,  
সেই মস্ত আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কণাটি প্রজ্জ্ব



থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিজ্ঞা ব'লে সমগ্রটিকেই, যদি থাকে—সেটা অসম্ভব বললেই হয়। এমন সময়ে তখনই তৈরী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিশ্বাস লব্ধক একটুই যদি বাতাব্য তখনই পণ্ডিত অমনি উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে থাকি, পৃথিবীতে আর সকলের বিজ্ঞা মানবী আমাদের বিজ্ঞা তৈরী। অর্থাৎ আর সকল দেশের বিজ্ঞা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ স্তর কাটিয়েওড়ে উঠছে, কেবল আমাদের দেশেই বিজ্ঞা স্তম্ভ বা শিবের প্রাণে এককল্পে কৃষকের তল্লাসে পিঠে সমলেশ-বিবর্জিত হ'য়ে অনন্তকালের উপযোগী আকারে বার হ'য়ে এসেছে। ইংরেজীতে থাকে বলে Special Creation এ চাই, এতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটেনা; এ ইতিহাসের ব্যাবহারিক পথের অস্তিত্ব, প্রত্যয় একে ঐতিহাসিক বিচারের মনোন করা চলে না; একে কেবল মাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করতে হবে, বুদ্ধি দ্বারা গঠন করতে হবে না। অত্যাশ্চর্য্য আদি লেগে একথা আমরা একবারে তুলে দিই যে, কোনো একটি বিশেষ জাতির ক্ষুদ্রত বিধাতা সর্গাপেক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখা বসন্তে ক'রে দিয়েছেন, এবং কথা বস্তুর কালের কথা। Special Creation এর কথা আরেকের দিনে আর ঠিক পার না, আজ আমরা এই দুটি যে, সত্যের সহিত সত্যের লব্ধ, সকল বিজ্ঞার উদ্ব বৈ নিয়মে বিশেষ বিজ্ঞার উদ্ব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েকটি মনস পাখারদের সহিত বিজ্ঞার হ'য়ে Solitary cell এ থাকে, সত্যের অধিকার লব্ধক বিধাতা কেবলমাত্র তারত-বর্জকই সেই Solitary cell অস্তিত্বের ক'রে রেখেছেন, একথা তারতের সৌখনের কথা নয়।

দ্ব্যর্থকাল আমাদের বিজ্ঞাকে আমরা একবারে ক'রে রেখেছিলাম। প্রথম ক'রে একবারে করা বার—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর এক, অতি-সম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েরইই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাজো তার হুজুত রাগকীর সম্মানের বেড়ারে মধ্যে প্রজ্ঞার থাকুতন, প্রজ্ঞারের সঙ্গে তার লব্ধ ছিলনা বললেই হয়। তার ফলে, পোণ্ডন ছিল সত্যকার রাজা, আর মিকাজো ছিলেন সত্য মাত্র রাজা। এখন মিকাজোকে

দ্ব্যর্থকাল অধিপত্য দেবার লব্ধক ৮'ল প্রদান তাঁর অতি-সম্মানের লব্ধক প্রাচীর তেজে তাঁকে সর্গদ্বারার পোণ্ডন ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদের ভারতীয় বিজ্ঞার প্রাচীরও তেমনি লব্ধক ছিল। নিজেকে তা সকল দেশের বিজ্ঞা হ'তে একান্ত বস্তুর ক'রে রেখেছিল, পাছে বিশৃঙ্খল পাখারদের সম্প্রদায় তার মধ্যে বিকাব আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে ৮'ল বিজ্ঞাবাহকের মিকাজো; আর যে কয়েকটি বিজ্ঞা বিশ্ববিজ্ঞার সঙ্গে অধিতত্ত্ব যোগ দ্বারা ক'রে নিয়ন্তাই আনন প্রাপ্যত্বকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে সেই পোণ্ডন হ'তে আমাদেরকে প্রথমপ্রত্যয়ে লাগন করতে। আমরা অতীতকে উল্লেখে লব্ধক ক'রে একেই প্রত্যক্ষ সোপান করলুম; একেই খালাস দিলুম এবং এরই কান-মলা খেলুম। যার বলে একে রেজ ব'লে গান দিলুম, এর পাশে আমাদের মতিগাত বিস্তৃত হুজুত ব'লে আক্ষেপ করলুম; এদিকে তার পছন্দ যেহে, নিজের বাস্তবিক বস্তুকে যেনে এর খালাসের শেষ কড়িটি খোঁজ করার ক্ষেত্রে তেল-টাকে নিতা এর কাছারিতে টাটাইটি করতে লাগলুম।

শিখ যে, সেই দ্ব্যর্থকাল কোলে থাকে। সাধারণের ভিত্তি হ'তে তাকে তলা ক'রেই লব্ধক করতে হয়। তার বস্তুটি নিত্য, তার সোলাটি নিয়ন্তন। কিন্তু তাকে যদি চিরদিনই চোকাটুকি দিয়ে বস্তুর কোণে মকলের আড়াল ক'রে রাখি তা হ'লে উল্টো ফল হয়। অর্থাৎ যে-লিখ একসা অস্তিত্ব বস্তুর ও ব্রহ্মকিত ছিল ব'লেই পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, সেই শিখই বসন্ত হ'য়ে তার নিত্য বেইনের মধ্যে অক্ষমতা কান্ত জানবিবর্জিত হ'য়ে গুটে। হুজুত যথো যে বীজ লাগিত হয়ে, ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্জিত হওয়া চাই।

একদিন তৈম পারদিক মৈসর গ্রীক রোমীয় প্রজ্ঞুতি প্রত্যেক বস্তু আঠিই ভারতীয়ের মতই নানাবিধ পরিমাণে নিম্নের ব্রহ্মকিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিম্ন সত্যতাকে বস্তু ক'রে তুলেছিল। পৃথিবীর এখন বসন্ত হয়ে; আতিপত বিজ্ঞা স্বাতন্ত্র্যকে একান্ত ভাবে লাগন ক'বার বিন আর আর নেই। আজ বিজ্ঞাপনবারের বৃগ এসেছে। সেই সময়েই যে-বিজ্ঞা যোগ যেনে না, যে বিজ্ঞা কৌশলভের অতিমানো অনুভূত হ'য়ে থাকবে, সে নিম্নল হ'য়ে যাবে।

অতএব আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্বাদের একটি বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিজ্ঞান জ্ঞানগ্রন্থাদি ও তুলনা করে, যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানকে মানবের সফল বিজ্ঞান ক্রম-বিকাশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে।

তা করতে গেলে ভারতীয় বিজ্ঞানকে তার সমস্ত পাখা-উপপাখার মধ্যে সমগ্র করে জানা চাই। ভারতীয় বিজ্ঞান সমগ্রভাৱে জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পেলে তার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞান সৃষ্টিনির্ণয় ব্যাভাবিক প্রণালীতে চ'তে পারে। কাজের তিনিষের বোধ হরের তিনিষের বোধের সহজ ত্রিতি।

বিজ্ঞান নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, গ্রন্থানন্ত এই চারি পাখায় প্রবাহিত। ভারত চিত্ত-পল্লবিত্তে-এর উদ্ভব। কিন্তু যেন যে নদী চলছে কেবল সেই বৈশেষ জলের সেই নদী পুঁই না চ'তেও পারে। ভারতের গভীর সঙ্গে ত্রিকবের ত্রুণগুণে মিলেছে। ভারতের বিজ্ঞান স্রোতেও সেইরূপ মিশ্রণ ঘটেছে। আর চ'তে মূলগম্যন যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন ক'রে এনেছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে তুরে তুরে অভিবিক্ত করেছে, তা আমাদের চাষার আচায়ে শিরে সাহিত্যে সঙ্গীতে নানা আকারে প্রকাশমান। একশেষে সম্ভ্রুত যুগোপীয় বিজ্ঞান বজা সফল যদি তেজে দেশকে স্রাবিত করেছে, তাকে দেশে উড়োঁতেও পারিবে, কেঁদে তৈকানোও সম্ভবপর নয়।

অতএব আমাদের বিজ্ঞানতত্ত্ব বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মূলগম্যন ও পাসি বিজ্ঞান সমবেত চক্রের

আত্মবলিক ভাবে যুগোপীয় বিজ্ঞানকে গান বিতে হবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যারা ভারতকে একাধ ক'রে দেখে তারা ভারতকে সত্য করে দেখেনা। তেমনি যারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা চ'তে শক্তিত ক'রে দেখে তারাও ভারত-চিত্তকে নিজেদের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে না। এট কারণবৎসর গোণিতিকাল ইকোর অংশক গভীরতর উচ্চতর মস্তুর যে ইকা মাতে তার কথা আমরা প্রচার দর্শিত প্রকাশ করতে পারি নে। পৃথিবীর সকল ইকোর যা পাশ্চত ত্রিতি তার সত্য ইকা। সে ইকা চিত্তের ইকা, আচার ইকা। ভারতে সেই চিত্তের ইকাকে গোণিতিকাল ইকোর চেয়ে বড় গ'লে জানতে হবে; কারণ এট ইকো সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষে জ্ঞান মননে আচ্ছাদন করতে পারে। অগত উভাঙ্গক্রমে আমাদের বর্তমান (শকা) এমন যে, সেই পিচ্চার ভগ্নেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তার স্বভাৱে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি নে। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মূলগম্যন পিক, পাসি, স্ত্রীমতকে এক বিরাট 'চিত্তক্ষেত্র' সত্যসাধনার যন্তে সমবেত করাই ভারতীয় বিজ্ঞানতত্ত্বের প্রধান কাজ। চিত্তবিশপকে কেবল ঠংগেজি স্থাপু করানো, অথ কখনো, মাগল দেখানো নয়। নেবার জন্তে অত্রণিকে বাঁহুতে হয়, দেখার জন্তেও—মল আত্মগ দাঁক ক'বে দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একই স্রবিত্বিত করলে তবে আমরা সত্য ভাবে নিজেও শাবন নিতেও পারব।







—উপস্থাপন—

—প্রবন্ধলেখক—

সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে কুমু তার দাদার ঘরে খেলে গান বাজনা করেছে। সকাল বেলাকার ভরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিষ হ'য়ে অসীমভাবে দেখা দেয়। তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। পাশগুলো যেন মহাশয়ের কঠোর প্রকাশ পায় কুমু হ'য়ে। বাথার নবীগুলি বাথার সমুদ্রে গিয়ে প্রচণ্ড বিসর্জন লাভ করে। তার রূপ বললে যায়, চকলিটা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রবাস নিঃশাস ছেড়ে বললে, “লগ্নাসে কুমু কাগজটাই লতা হ'য়ে দেখা দেয় কুমু, চিত্রকাগজটা থাকে আড়ালে; গানে চিত্রকাগজটাই আসে সামনে, কুমু কাগজটা যায় তুচ্ছ হ'য়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।”

এমন সময়ে খবর এলো, “মহাত্মা মধুসূদন এসেছেন।”

এক মুহুর্তে কুমু মুখ ক্যাকাশে হ'য়ে গেল; তাই দেখে বিপ্রবাসের মনে বড়ো ব্যক্তিগত, বললে, “কুমু, তুমি ব্যক্তির হিতের বা। তাকে চরিত্রোৎসাহ দেবে না।”

কুমু ক্রতপনে চলে গেল। মধুসূদন ইচ্ছে ক'রেই খবর না দিয়ে এসেছে। এ পক্ষ আয়োজনের দৈব চাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তার লক্ষ্যের মধ্যে। বড় ছরের লোক খ'লে বিপ্রবাসের মনের মধ্যে একটা বড়ই আছে বলে মধুসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাই সে লইতে পারে না। তাই আজ সে এমন ভাবে এল যেন দেখা করতে আসেনি, দেখা দিতে এসেছে।

মধুসূদনের সাক্ষাৎ ছিল বিচিত্র, ব্যক্তির চাকর বাসীরা অভিজ্ঞ হ'য়ে এমনভাবে বেশ। তোর কাটা বিশিষ্ট

গাঠের উপর একটা রঙিন কলকাতা দিগের ভেঁটে কোট। কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, ধরে কোঁচান কাশ্মীরী পাতিপুত্র খুঁটি, বাণিশ কড়া ভালো দরবারী ফুতো, বড়ো বড়ো চোরে পাগড়িগালা মাটিতে মাটি, কলম কলমে। প্রথম উত্তরের পরিসি বৈঠক ক'রে খোটা দোনার খড়ির শিকল, গাড়ে একটা সোবীন লাঠি, তার দোনার চাতলটি হাতীর খুঁড়ের আকারে নানা জগতে দড়িত। একটা মলমল রমমারের ক্রান্ত মাভাল বিধে খাটের পাশের একটা কেরামের খ'লে বললে, “কেনন আছেন বিপ্রবাস বাবু, পথীরাটা তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।”

বিপ্রবাস তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, পটীর ভালোই আছে দেখছি।”

“বিশেষ ভালো যে তা” বলতে গাড়িন—সড়ের দিকটা মাথা ধরে, আর কিসের ভালো চর না। পাওয়া লাগবার আর একটু সময় হ'লেই লুটে পারিবে। আবার অনিচ্ছাতেও মনে মনে কুণি, ইটের পথ, চোরে গুণ দেখ।”

প্রস্তাবের দোতোর যে লগ্না দরকার তারই কৃষিক। পাওয়া গেল।

বিপ্রবাস বললে, “যেহাওয়ার আগের কাজ নিয়ে বৈঠক পরিশ্রম করতে হচ্ছে।”

“এমনিই কি! আগের কামকর্ম আপনিই চ'লে যাবে, আমাকে বড়ো কিছু দেখতে হয় না। মাক্সটন দ্বায়েতের উপরই বেশির ভাগ কাজের ভার, পায় আর্থর পীড়িত আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।”

ভক্তভক্তি এল, পানের বাটার পান ও মদনা নিয়ে চাকর এসে পাড়ালো, তার থেকে একটি ছোট এলাচ নিয়ে মুখে পুরল, আর কিছু নিলে না। ভক্তভক্তির মল নিয়ে দুই একবার মুখ মুচ টান দিলে। তারপরে ভক্তভক্তির নলটা বা হাতে কোলের উপরেই থাটা রইল। আর তার ব্যবহার হ'ল না। অম্বাপুর থেকে খবর এলো গলখাবার প্রস্তুত। বাস্তব হয়ে বললে, "ঐটি তো পারব না। আগেই তো বলেছি, খাওয়া দাওয়া সবচেয়ে খুব বহুকাটু ক'বেই চলতে হবে।"

বিপ্রদাস বিতীরাবার অনুপ্রাণিত করলে না। চাকরকে বললে, "পিসিমাকে বললে, ওর নতীর ভালো নেই, খেতে পারবেন না।"

বিপ্রদাস ভুল ক'রে রইল। মধুসূদন আপা করছিলেন, কুমুদ কথা আপনাই উঠবে। এতদিন হ'লে সেল, এখন কুমুদে বক্তার বাড়িতে কিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব বিপ্রদাস আপনাই উঠির হ'য়ে করবে—কিন্তু কুমুদ নামও করে না যে। ভিতরে ভিতরে একটু একটু ক'রে রাগ জন্মতে লাগল। তাবলে এসে ভুল করেছি। সমস্ত নবীনের কাণ্ড। এখনি গিয়ে তাকে খুব একটা কড়া শাস্তি দেবার ভজ্ঞে মনটা ঝুঁকুটু করতে লাগল।

এমন সময় দাবাদিতে নক কালাগেড়ে একখানি লাড়ি ন'রে মাথার ঘামটা টোনে কুমুদ করে গবেশ করলে। বিপ্রদাস এটা আপা করে নি। সে আতঙ্কী হ'য়ে গেল। প্রথমে আশীর্ষ, পরে দাবাব পারের ধুলো নিয়ে কুমুদ মধুসূদনকে বলল, "দাবাব নতীর ক্রান্ত, ওকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তুমি এই পাণের খবর এলো।" মধুসূদনের মূখ লাগল হ'য়ে উঠল। ক্রান্ত চৌকি থেকে উঠে পড়ল। কোল থেকে ভক্তভক্তির নলটা মাটিতে ন'ড়ে গেল। বিপ্রদাসের মুখের দিকে না চরেই বললে "আজ্ঞা, তবে আমি।"

প্রথম ভেঁকটা হোলো হন্ হন্ ক'রে গাফিলত উঠে বাড়িতে চ'লে যায়। কিন্তু মন ন'ড়েছে বাহা। অনেক দিন পরে আর কুমুদে বেবেছে। ওকে অভ্যস্ত দাবাদিতে আটপৌরে কাপড়ে এই প্রথম দেখলে। ওকে এত প্রশংসা

আর কখনো দেখে নি। এমন লম্বিত, এত লম্বক। মধুসূদনের বাড়িতে ন'ছিল পোষাকী মেয়ে, যেন বাটেরে ঘেয়ে, এখানে সে একবারে খবর মেয়ে। আক ঘেন ওকে অভ্যস্ত কাছের থেকে বেখা গেল। কি দিও সুখি! মধুসূদনের ইচ্ছে করতে লাগল, একটু ঘেরি না ক'রে এখনি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। ও আমার, ও আমারি, ও আমার খবর, আমার ঐক্যবর্ত, আমার লম্বক ঘো মনের, এটা কথাটা উলটে পাগটে বলতে ইচ্ছে করে।

পানের খবর একটা সোকা দেখিরে কুমুদ বদলে বললে, তখন ওকে বদলেই হোলো। নিত্যন্ত যদি বাটেরে খব না হোত তাহ'লে কুমুদে খ'রে সোকার আপনাব পাশে বসাত। কুমুদ না হ'লে একটা চৌকিত পিড়নে তার পিঠের উপর হাত রেখে পাড়াল। বললে, "আমাকে কিছ বলতে চাও?"

ঠিক এমন জুবে প্রস্তুত মধুসূদনের ভালো লাগল না, বললে, "যাবে না বাড়িতে?"

"না।"

মধুসূদন চমকে উঠল—বলল, "সে কি কথা!"

"আমাকে তোমার তো দরকার নেই।"

মধুসূদন বৃকলে প্রামাণ্যকরাব খবরটা কানে এলে, এটা অভিমান। অভিমানটা ভালোই লাগল। বললে, "কি যে হলো তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কি? নৃত্ত ঘর কি ভালো লাগে?"

এ নিয়ে কথা কটাকাটি করতে কুমুদ প্রস্তুতি হ'ল না। সংক্ষেপে আর একবার বললে, "আমি যাব না।"

"যাবে কি? বাড়ির বৌ বাড়িতে যাবে না—?"

কুমুদ সংক্ষেপে বললে, "না।"

মধুসূদন সোকা থেকে উঠে বাড়িরে বললে, "যাবে না! যেতেই হবে।"

কুমুদ কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন বললে, "জানো পুণ্ডি ভেঁক তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নাও খ'রে! 'না' বললেই হোলো!"

কুমুদ চুপ ক'রে রইল। মধুসূদন পর্জন ক'রে বললে, "দাবাব ধুলো নৃত্তনগরী কথায় শিকা আবার আরস্ত হ'বে?"



কুসু নামার ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত ক'রে বললে, “চুপ করো! অমন চেঁচিয়ে কথা কোরো না!”

“কেন? তোমার নামকে নামলে কথা কইতে হবে না? জানো এই ঘরুতে ওকে গণে বার করতে পারি।”

শতকণ্ঠের কুসু দেখে গর দাঙ্গা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষকায়, ঈর্ষমৈত্র, পাজুর্ষন মুখ, বড়ো বড়ো চোখ ওটো মালামব, একটা মোটা লম্বা চামর যা তাকে মাটিতে দুটিয়ে পড়ছে, কুসুকে ভেঁকে বললে, “আর কুসু, আর আমার ঘরে।”

মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠল, বলে, “মনে থাকবে তোমার এটো আশঙ্কা! তোমার নরনগরের নৃত্ত বুড়িরে দেখ তবে আমার নাম মধুসূদন।”

ঘরে গিয়েই বিপ্রদাস বিচানার তরে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে, কিন্তু ঘুম নয়, স্নায়ুচিত ও চিন্তার। কুসু শিরেরে কাছে ব'লে শাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। এমন ক'রে অনেককণ কাটলে পর ক্ষেমা পিসি এসে বললে, “জান কি খেতে হবেনা কুসু? বেলা যে অনেক চোলে।”

বিপ্রদাস চোখ বুজে বললে, “কুসু, যা খেতে যা।—তোমার কালুস্বাক পাঠিয়ে দে।”

কুসু বললে, “দাদা, তোমার গায়ে পড়ি, এখন কালুস্বাক না, একটু সুমোবার চেষ্টা করো।”

বিপ্রদাস কিছু না বলে সুমুড়ীর বেঘনায় দুটিতে কুসুর মূখেরদিকে চেয়ে রইল। দানিকবাসে নিখাস ফেলে আবার চোখ বুজল। কুসু ঘরে ঘরে ঘেরিয়ে গিয়ে দরজা দিল ভেঁজিয়ে।

একটু পরেই কালু স্ববর পাঠালো যে আসতে চায়। বিপ্রদাস উঠে ত্রাকিকার হেলান দিয়ে বসল। কালু বললে, “তোমারই এসে অরুণ পতাই তো চ'লে গেল। কি গোলা কলোতো। কুসুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি?”

“হ্যাঁ বলেছিল। কুসু তার কথাই মিছেছে, সে যাযো না।”

কালু বিকম ভীত চ'য়ে বললে, “কলো কি দাদা! এ যে দলনেগে কথা!”

“দলনাগকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসদ্ব্যনকে।”

“তা' চ'লে তৈরি হও, আর ফেরে নেই। বকে যাচ্ছে, যাযো কোথায়। জানি তো, তোমার বাবা ম্যাভিট্রুটেকে হুঙ্ক করতে গিয়ে অস্ত্রতা ত'লাশ টাকা লোকদান করেছিলেন। সুক সুসিথে নিজের বিশদ ঘটনো ও তোমাদের গৈজিক সুখ। ওটা অস্ত্রত আমার বাপে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ ক'রে খুঁতে পারিনে। কিন্তু বাচবে কি ক'রে?”

বিপ্রদাস উঁচু বা হাঁটুর উপর জানু পা তুলে দিয়ে ত্রাকিকার মাথা রেখে চোখে মুখে দানিককণ চাবলে। অবশেষে চোখ বুজে বললে, “দলিলেদ সন্ত অরুণারে মধুসূদন ছ'মাস নোটসি না বিয়ে আমার কাছে থেকে টাকা দাবী করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ মাথাড় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে—তখন একটা উপায় হ'তে পারবে।”

কালু একটু বিরক চ'য়েই বললে, “উপায় হবে ব'লি কি। বাতিগুলো এক সমকায় নিবৃত, সেইগুলো একে একে তর্র রকম ক'রে নিববে।”

“বাতি তলায় খোপটার মধ্যে এসে মলুচে, এখন যে করলে এসে তাকে যে রকম ছ' দিয়েই নেবাক না—তাতে বেশি হা হুতাল ঈর্ষবার কিছু নেই। ঐ তলানির আলোটার তবির করতে আর ভালো লাগে না, ওর চেয়ে পুয়ো অরুণারে সোয়াতি পাওয়া যায়।”

কালুর মুখে বাবা বাজল। সে দুলে এসে এটা অরুণ মাথুরের কথা, বিপ্রদাস তো এ রকম চালচড়া প্রকৃতির লোক নয়; পরিণামটাকে ঠেকাবার জন্যে বিপ্রদাস এতদিন নানা রকম দান করছিল। তার বিশ্বাস ছিল কালুকেউই বা অরুণ ভাবতেও পারে না,—বিশ্বাস করবার ও কোর নেই।

কালু সিদ্ধ দুটিতে বিপ্রদাসের সুখের দিকে চেয়ে বললে, “তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না তাই, যা' করবার আমিই করব। বাই একবার দালাল মহলে ঘুরে আসিগে।”

পরদিন বিপ্রদাসের কাছে এক ইংরাজী টিট্ট এসে—মধুসূদনের লেখা।—তাখাটা ওকালতী ছ'দেব—হয় তো বা এটর্নিক বিয়ে মিথিয়ে নিয়েছে। নিশ্চিত ক'রে জানতে চায় কুসু ওদের ওখানে ফিরে আসবে কিনা, তার পরে কথা কর্তব্য কথা হবে।

বিশ্রাস কুহক জিজ্ঞাসা করলে, "হুঁ, তাণ্ডে ক'বে সব ভেবে দেখছিলাম?"

কুহু বললে, "গাবনা-সম্পূর্ণ শেখ ক'বে মিরেচি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হতে যেমন এখানে ভিশুয় ভেদনি আছি—মাকে বা' কিছু খটেছে সমস্ত বস্তু।"

"যদি তোকে জোর ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয় তুই, জোর ক'রে শিমলাতে পারবি?"

"তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো পূর্ব পারবে।"

"এই কাজে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি শেষকালে কিংবে যেতেই হয় তা' হ'লে বস্তু খেরি ক'রে যদি ততট পেরা বিস্তী হ'য়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে সমস্ত বস্তু তোমার মনকে কোথাও কিছুমাত্র কড়িয়েছে কি?"

"কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবানন্দকে, মোতির মাঝে, লবলুকে ভালোবাসি। কিন্তু তারা ঠিক যেন অস্ত্র বাড়ির লোক।"

"বেশ কুহু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করার কসতা ওদের আছে। সেই ক্ষেত্রে সেটাকে মদ্রাঙ্ক করা চাই। কবতে গেলেই লজ্জা, লজ্জা, ভয় সমস্ত বিশুদ্ধন বিধে লোকসবীষের সামনে পাকাত হ'বে, যের বাইরে চারিদিকে নিষেধ তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাক। চাই।"

"যাণা, তাতে তোমার মনিট, তোমার অপর্য্যক্তি হবে না?"

"মনিট অপর্য্যক্তি কাকে তুই বলিছ কুহু? তুই যদি সপ্তমাসের মধ্যে খুব থাকিস্ তার চেয়ে মনিট আমার আর কি হ'তে পারে? যদি আমি যে, যে-যে তুই মাঝিন্ সে তোমার বস্তু হ'য়ে উঠে না, তোমার উপর বার একান্ত অধিকার সে তোমার একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অপর্য্যক্তি ভাবতে পারি। বাবা তোকে খুব ভালো বাগতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কতারা থাকতেন পূরে পূরে। তোমার পক্ষে পড়াভেনার দরকার আছে তা' তিনি বুঝেই করতেন না। আমিই নিয়ে গেলো থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মাহুয় ক'রে তুলেছি। তোমার বাগ-মায় চেয়ে আমি কোনো

অংশে কম না। সেই মাহুয় ক'রে তোমার দাবির যে কি আছে তা' বুঝতে পারছি। তুই যদি অস্ত্র মেয়ের মতো কতিপাতা হ'লে কোথাও তোমার ঠেকত না। আজ দেখানে তোমার বাতায়কে কেউ বুঝবে না, দেখানে দেখে তোমার দরকার। আমি কোন্ প্রাণে তোকে দেখানে নির্দগ্ধিত ক'রে থাকব? যদি আমার ছোট ভাই গাউল তা হ'লে যেমন ক'রে থাকিস্ ভেদনি ক'রেই চিরদিন থাকি না; আমার কাছে।"

বাবার বৃক্কর কাছে বাটের প্রাণে মাথা

দিকে মুখ কিরিয়া কুহু বললে, "কিছু আমি আর হ'য়ে থাকব না? ঠিক বলচ?"

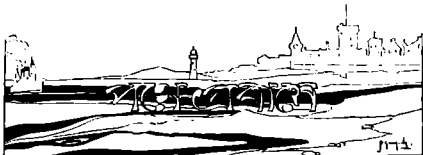
কুহুর মাথা হাত বুলতে বুলতে বিলম্বাস বললে, "তার কোন দাবি বোল? তোকে খুব খাটিয়ে দেব। আমার সব কাজ হবে তোমার হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন ক'রে কাম করতে পারবে না। আমাকে তোমার বালনা শোনাতে হবে, আমার ঘোড়া তোমার হেঁচ থাকবে। তা' ছাড়া জানিন্ আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোমার মতো ছাত্রী শাব কোথায় বস? এক কাজ কর্তা বাবে, অনেক দিন থেকে পার্শি পড়বার সব আমার আছে। একলা পড়াতে ভালো লাগে না। তোকে নিয়ে পড়ব, তুই নিশ্চর আমায় চেয়ে এদিয়ে যাবি, আমি একটুও ছিগে করব না দেখিন্।"

ভুক্ত ভুক্ত কুহুর মন পুলকিত হ'য়ে উঠে, এর চেয়ে মাঝে মুখ আর কিছু হ'তে পারে না।

যানিক পরে বিশ্রাস বাবার বললে, "মারো একটা কথা। তোকে ব'লে রাখি কুহু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের গলত বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে পরাবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের পরাবের ঐশ্বর্য্য হ'য়ে।"

কুহুর চোখে ঘল এলো, বললে, "আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে থাকি।"

বিশ্রাস মধুপুনের চিঠি হাতে রাখলে, উত্তর দিলে না।



### —শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ইংলণ্ড দেশটা যে কি দার্শনাতিক ছোট একটি গুরে কিংবদন্তি দেবলো বিশ্বাস হয় না। ছোট তো আমাদের এক একটা পারলও, তবু তাদের ছোটের মাত্রাধিক ভাবে বড়। আর ইংলণ্ডের ছোটের মৈলমিক। এর দক্ষাৎ ঘিরেছে আঁট গোঁষাকের মতো সহন, এর মাথার উপরে চাপ দিতেছে টুলীর মতো আকাশ। আকাশ নয়, আকাশ বলতে আমরা যা বুঝি তা এখানে নেই। সেট ভাঙত বেশটাকে অস্বাভাবিক ছোট বোধ হয়। একটা মকসুদ বিশেষ। এর ভিতরে যারা থাকে তারা পরস্পরের বড় কাছাকাছি থাকে, পরস্পরের নিখিলের লক্ষ্য চুম্বিত লাগে, জ্বলন্তের স্পন্দন সোবে। ইংলণ্ডে যখন যে এসেছে সে যেহাস্যের উল্লেখ করে গেছে। এর উল্লেখের ভাষিক বসু এটাই প্রবল যে আমিষ ও নিরামিষ তবু ও তামাক খনন খাই গেছে তখন তাই পরিপাক করে এক রক্ত মাংসে পরিণত করেছে। ইংলণ্ডের আদর্শ একতার কারণ ইংলণ্ড দেশটা বৈধো প্রেত ও উচ্চতার অত্যন্ত আঁটশাট ও ছোট।

ভারতবর্ষে যখন সারা দিনের পাটুনার শেষে তারা-ভরা আকাশের তলে বসে নিখাস ছাড়া তখন সে নিখাস লক্ষ যোজন দূরে নিলীম গুকে মিলিয়ে

দাধ, মনে হয় না ডাবতর্ণ আমায়ের বেধে রেখেছে। আমায়ের বিশাল বেশ, বিরাট আকাশ। আমায় ছোট তারকার দল পেয়ে বড়, মানবসংসারের প্রাতিভিক চুচ্চতাকে আমায় চুচ্চ ব'লেট জানি। আর বো? এদের কিবা বাতি কিবা বিন—দমন্ত ভাবনটাই একটা non-stop dance কিংবা non-stop flight। ছন্দহীন গতিহীন বেতলা ভাবন, জগৎ থেকে মুক্ত। অবধি অগ্রাণ্ড বজ্রাধম, এক দুহস্ত বিশ্রাম কবতে বদলে প্রতিযোগিতা লাগি মেয়ে এগিয়ে যায়, বৃদ্ধ বয়সের অগ্রচিহ্ন অস্তিত্ব ক'রে রাখে। দিনের পরে কখন রাত আসে, রাতের শেষ কোনো দিন হয় কি না, ঠিক নেই। এদেশের যুগা যাতায়াত শাখা বিতে বেরিয়ে যরাজো চাকিরা দেবার সময় পার না। মতি ও আকাশের মাফপানে মেঘ ও কুশনার প্রাচীর, মাথার প্রাণের কথা তাহালোকে পৌঁছায় না, যতের কোণের ছোট ছোট গুণে প্রথকে মগজপতের বড় বড় গুণে তথের লুকে মিলিয়ে ধরবার প্রয়োগ ফলে না, "the world is too much with us night and day।"

ইংলণ্ডের দৌত্যগা ও চর্চাগা ইংলণ্ড দেশটা কলীম ও আকাশগর্ভ। ইংলণ্ডের দৌত্যগা ও চর্চাগা ইংলণ্ডে কাতটা বক্তৃৎসর্কে এক ও বৈলকিন কীয়ে perspective-তান। একে তো এদের ঠিকতাল ছোট, আতিগত

অতিজটিল এরা পিতৃ। তারপরে এদের আকাংক্ষার  
আধার এদের মনকেও আধার করেছে, হৃৎকোষে হৃৎকোষে  
তখন খেঁচু সত্য পায় তখন সেইখুঁচু এদের কাছে লব,  
এরা কত বড় একটা সাম্রাজ্য চালায় নিজেরাই জানে না,  
সাম্রাজ্য এরা গড়েছে অর-মনস্ব তাৎ। পাঁচি প্রাণবিক্রম  
থাকে বলে তা বীণাবাদীতেই সম্বৎ এবং আকাশলীন  
বীণাবাদীতে। এরা তিন dimensionএর বীণাবাদী।  
ইংলণ্ডে দলদলিগর অস্ত্র নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই স্বতাবে  
ইংরেজ অর্থাৎ আকাশলীন বীণাবাদী। কোনো একটা  
আন্তর্জাতিক আন্দোলন ইংলণ্ডে টিকবে না, জীইবল  
টিকল না, সোভিয়েত টিকছে না। একদিন যেমন  
চার্লস অফ ইংলণ্ড নিজস্ব জীইবল সৃষ্টি করল আজ তেমনি  
লেখার-পাঠি নিম্নস্ব সোভিয়েত সৃষ্টি করছে। নির্জলা  
ক্রান্তনামিচ্ছ ইংলণ্ডেই প্রথম সম্বৎ হয়, ইংলণ্ডেই শেব  
পদার্থ স্থায়ী হবে। এর কারণ বৈজ্ঞানিক। তবে নিম্নের  
উপরে বোমকারী করছে মানুষ। বাজারের বা মাধ্যমীত  
ছিল এরোপ্লেন তাকে মাধ্যমীত করছে, channel  
lunnel চর তো অস্বাভাব্য শাবন করছে, ইংলণ্ড আর বীণ  
থাকবে না। কিন্তু মেঘের প্রাচীর ?

দক্ষিণ ইংলণ্ডের নানা স্থানে খুরে ফিরে দেখা গেল  
নিম্ন ও মানুষ মিলে অকণটাকে লক্ষ্যভোগে একাকার  
ক'রে দিয়েছে। একই রকম অন্তর্নিহিত ছোট শব্দ,  
প্রত্যেকটাতে একই ছোটদের শাবা-চোটেণ ও একই  
বোকারের শাবা-বোকার। স্থায়ী সংবাদপত্র ও খিটোরাও  
বহুখুর গোক চালিত। রেদ্ ও বাস্ বনিও অন্তর্নিহিত তরু  
একই ভোপানীর। একই আবহাওয়া, একই রকম  
ভিচ্চুটিগনে বাকশ, অসমতল ভূমি। মানুষও বাইরে  
থেকে একই রকম—পোথাকে চলনে বুলিতে আবব  
কায়গার। সমাজ বা উত্তর বিশেষ তা বিশেষীর চোখে  
স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ক্ষণে প্রত্যেকটি  
মানুষ ইংরেজ ক'রে গেছে, প্রিন্স-ওফালা বা টরকী-ওফালা  
ব'লে কেউ নেই। অধিকাংশ বাড়ীই এখন বাসা, পূর্ব-  
পূর্বের ভিটা ঘাটির মধ্যমা যদি থাকে তো পূর্বপূর্বের

গোরস্থানে। বাড়ীর মালিকরা হয় বাড়ীতে থাকেন না,  
নয় বাড়ীতে বোড়িঃ হাউস্ বোলেন। এই সব শব্দের  
লক্ষ্যপ্রধান বাক্যায় অতিখিটল। অতিখিটা হয় দুটিতে  
থোকাতে আসে, নয় বাণিজ্য-প্রাণ কাকে আসে। থারা  
স্থায়ীভাবে বদলায় করে তাদেরও চ'তালে বিতরু করা  
থায়, তারা হয় দুর্বলিত পিতামাতার বোড়িঃ স্থলে পড়তে  
থাক। সমাজ, নয় প্রাপ্তবয়স্ক সমাজের পেন্সনপ্রাপ্ত  
পিতামাতা। ছোটদের কাছে বোড়িঃ স্থল ও ব'ড়াদের  
কাজে নাসিঃ চোম সমুদ্রতীরবর্তী বহুশত পরের ও গ্রামে  
বহুল পরিমাণে বিস্তারিত ;

ইংলণ্ড যে দিন দিন socialised ক'রে উঠছে, এর  
প্রমাণ ইংলণ্ডের এই সব বোড়িঃ স্থল নাসিঃ চোম চাঁদ-  
শাতাল পার্ক লাইব্রেরী ইত্যাদি। এদা অস্থান জন-  
সাধারণের চান্দাও চলছে, এ সব অস্থানে বাসা থাকে তারা  
অনেক সময় জনসাধারণের চান্দাও থাকে, এ সব অস্থানের  
লিফট বা চিকিৎসার কোনো একজনদের প্রুতি পদপাত  
নেই। পর্ব্বমেন্টের বরচে চলেও এগুলি এমনি ভাবেই  
চলতো। যে দেশে জনসাধারণ বা পর্ব্বমেন্টও তাই,  
সে দেশে জনসাধারণের চান্দাও চলেইত যে-সরকারী  
হাসপাতাল ও জনসাধারণের বাজনার চালিত সরকারী  
হাসপাতালে তকাত কতটুকু ? ইংলণ্ডের অসমতল চার্চ  
প্রুতির মধ্যস্থতার সম্বলদের কাছে থেকে যে চান্দা পায়  
পর্ব্বমেন্টের মধ্যস্থতার সম্বলদের কাছে থেকে সেই চান্দাই  
পেতে চায়, যদিও তার নাম চান্দা হবে না, হবে লাগনা।  
কিন্তু সেই লাগনা ও এই লাগনা তলে তলে একটু ভিন্ন—  
এমনি বোড়িঃ স্থলের অসমতল লিকা, হাসপাতালের  
অসমতল চিকিৎসা, নাসিঃ বোমের অসমতল সেবা।  
এতে আত্মীয় বন্ধনের হাত নেই, লম্বা নেই, এর উপরে  
সমাজের কর্মমাস্ প্রাবল, বাস্তব কতি-অকতি ক্ষণ।  
সমাজের অলিখিত চক্কে মা তার কোলের ছেলেকে  
বোড়িঃ স্থলে দেয়, কর ছেলেকে হাসপাতালে  
রাখে। নিজের গুণের দাবীকে সমাজের দশকনের  
মতো নিজেও সেন্সিবেলিট্ ব'লে উড়িয়ে দেয়।



এইসব হোটেল বোড়ি: হাউস স্কুল ও নানি: হোম সাধারণত ঘোমতের ভাঙে। চুকের সাথ খোলে মেটাবার মতো এরা home-এর সাপ হোটেলের ও আত্মীয় স্বজনসহ সাথ অভিজি দিয়ে মেটায়। Community kitchen আর কাকে বলে? Collective motherhood কি এ ছাড়া অল্প কিছু? ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই আদর্শই উপস্থাপিত হ'তে চলে। নাম নিয়ে মায়ামারি করে কল নেই, এও এক রকম পোস্তালিজম্। তলিয়ে দেখলে পোস্তালিজমের আদিত কথটা কি এই নয় যে সমাজ ও ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থ থাকবে না, সম্পর্ক ও সম্পত্তিতে "private"-অর্থাৎ বেড়া থাকবে না? যে জননী গৃহের পর ঘুরতে সম্মানকে Dr. Warnardose home-এ ত্যাগ করে ও যে জননী ভ্রমের অন্ধকাল পরে সম্মানকে বোড়ি কলে পারি:র দেহ ভাদের একজনের সম্মানের পরচা বহন করে এলাজ জনসাধারণ, অপর জনের সম্মানের পরচা বহন করে দুঃস্থিত পিতামাতা; শিকা উঠয়েই পাথ অসাম্প্রদায়িক অশকণ্ডাভিত্তিকতা বহন, পক্ষপাতী পিতামাতার পরিচা কেউই পাথ না আধিক্যে ফলে। এদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন বিশ থাকলেও এরা পোস্তালিজম সমাজের হাতে পড়ে, community kitchen-এ খায় ও শাকসবজি শিকড়িয়ার কোলে collective মাতৃসেহের খোলে আশাবান করে।

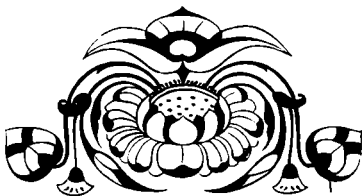
প্রাণীপদের মুখে চোখে কথাবার্তাধ এমন একটি বিদ্যতা ও শক্তি লক্ষ্য করা গেল বা কোনো দেশবিশেষের বিশেষ নর, বা যুগবিশেষের বিশেষ। অজগামী চন্দ্রের বিদ্যতার মতো উনবিংশ শতাব্দীর দ্রাবিড়ের বিদ্যতারও দিন শেষ হ'য়ে এলো। এর পরে কিংবদন্তীর স্বভাব নারীর প্রথম জালা, দাব্যমীলন শিশুগারব চুসারদিক অক্ষরগণ। ভারতের কল্যাণী নারীকে তিত্তোমী হেরেজ নারীতে কত ফলে প্রত্যক্ষ করেছি, বহুসংসদগণিষ্ট প্রথম গৃহমানে এঁদের বালাকাল

কেটেছে, বহুযুগের জীবনদঃগ্রামে কীংকির করে এরা প্রাণপণ করেননি, পাঁচ জনকে খায়ে পুসী ক'রেই এঁদের তৃপ্তি, অগভের সাম্রাজ্য এঁদের ভাবনে ও একটি কোণেই এঁদের বিত্তি, উজ্জ্বলভার তরী এঁদের স্বভাব ও উজ্জ্বলপুষ্পের সুখিত এঁদের অচরণে। অনুচা হ'লেও এরা গৃহিণী নারী, এরা স্বভাব নারী নন। আর এঁদের পরবর্ত্তিনীরা ক্রাটে বা বোড়ি: চাউলে পাকা সাবধানী পিতামাতার স্বল্পগোদগণিষ্ট সম্মান, গ্লিগ জনের সহু প্রাতিতিক দান প্রতিদান কলহ মিলনে বেশিকা হয় বেশিকা অল্পবয়স থেকে বোড়ি: ফুলে বাস ক'রে হয় নি, তারপর কীংকির দায়িত্ব সাধারণ নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াফালে এঁরা বহন হরিণীর মতো ছটফট করেন তখন স্বভাবে খোলে স্বভাব, আচরণে খোলে স্বভাব, এবং বিবাহের দৌতলা ফটলেও স্বভাবের নীরব নিভৃত কীংকির মন বলে না, মন চাষ অত্যন্ত মনোভা, আগের মতো খাইনি, আগের মতো নাচ, আগের মতো সম্মানবিত্তি ওশিত্তার প্রতি বিতুকতা, সাম্প্রদায়িক তত্ত্বভার প্রতি অসিদ্ধা। এ নারী গৃহিণী নারী নয় স্বভাব নারী। সমাজের কালে এর অতুল উৎসাহ, অতুল গোপাতা, নারী হিসাবে শিকড়িয়ার হিসাবে হোটেলের মানেজারের হিসাবে খাপসের সুগামি-টেটেটে হিসাবে এ নারী নিখুঁত, সচিব দণ্ডী ও শিখা ফলে এ নারী পুরুষের প্রভা মিলে নিয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সর্বকষ্টে বিভ্রমানে বেশি থাকে যে নারী এই স্বভাব নারী—গৃহীণ, পক্ষপাতহীন, জনহিতগণ্য, সামাজিক কর্তব্যে অটল। এ নারী সহ পুরুষের সহকর্মিনী, কোনো একজনের রাণী ও দাসী নয়, পুরুষের সম্মানের পাত্রী, কোন একজনের প্রেম ও যুগার পাত্রী নয়। কথটা অবিস্মৃত পোনালেও কল্তে হবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধার socialisation of women চলছে, ভারতবর্ষও বাস বায়নি। এর ফলে কাব্যলোক থেকে প্রেমালী নারী অবহিত হলো, তার স্থান নিলে সন্ন্যাসী নারী, passion-এর স্থানে এলো under-landling।

পূর্ণলক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ইংরেজ নারীর কতক বিশেষ আছে—প্রাণী ও নারী এ ক্ষেত্রে সমান।

পঞ্চমতঃ হংসের নারী চিরদিনই স্বামীমুগ্ধ, শূন্যমনস্ক।  
 হংসের পুরুষও পুরুষদের উচ্চারণ সঙ্গে ঠাট্টা মিলিয়ে  
 দেওয়া তার দ্বারা কোন বসে চরনি। সে নিজের চক্ষুকে  
 নিজের হাতে রেখে খেঁজার সমাজের নীধন স্বাক্ষর করে।  
 সামাজিক ডিমিগিন যেনেছে।

এই চিত্রের বিবাহটি ড'কন বাথান মাস্টারের contrast,  
 এতে পুরুষদের ছাত্র পড়াক। বিবাহিত নারীদের কোনো  
 ত্রিভুজমিক বা পৌরাণিক আদর্শ এ দেশের নারীর সম্মুখে  
 তেমন ক'রে দরা চরনি যেমন আমাদের দীর্ঘ সাবিত্রীর  
 আদর্শ। এর ফলে এ দেশের নারী সত্যোক্ত এক একটি  
 আদর্শ, কোনো ড'কন হংসের নারী কেবল ব্যক্তিগতভাবে  
 নয় type-গতভাবেও এক নয়। দীর্ঘ সাবিত্রীর ছাড়ে তালতে  
 পিছে আমাদের নারীকাতিকে আমরা দীর্ঘ সাবিত্রী জাতি







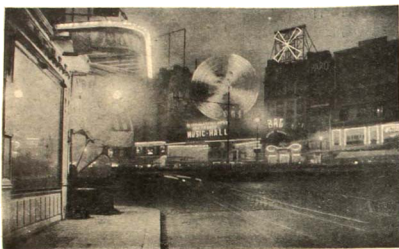
আবিগত

চিত্রশালা

রাতের প্যারি



গ্র্যান্ডপ্যালে, প্যারি



ସୁନାମ, କଲ୍, ଓ କୋଟିଶାଳୀ



ଅନେକା-ମୂର୍ତ୍ତି



ମାନ୍ସନ୍ ଟାଉନ



ଇଫେଲ ଟାୱର



ସିମ୍ପୁର ସରମାସବର-ନାମ ବର୍ଷା  
ବିରାଡ଼ିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ

ନାମ-ନା-କାମା ଟେଲିଫୋନ ବ୍ୟବ

# সার্বজনীন নারীশিক্ষা

শ্রীমতী অমুরুপা দেবী

বাপর্গাধিব লক্ষ্যকৌ বাপর্গপ্রতিপত্তয়ে ।

ভগতঃ পিতরৌ বন্থে পার্জাতাপরমেধকৌ ॥

—প্রচুররূপে লক্ষ এবং অর্থ সম্পত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত লক্ষ এবং অর্থের ভ্রাব পরম্পর নিভা লব্ধে লব্ধ, ভগতের জননী পার্জাতা এবং ভগৎপিতা পরমেধর অর্থায় ভবানী। পতিকে বন্দনা করি ।

মহাকবি কালিদাস তাঁর সুবিখ্যাত মহাকাব্য ‘রঘুবংশে’ প্রচুতি পুরুষের অভিজ্ঞত, পরম্পর অচ্ছেদ লব্ধ প্রদর্শন-পর্বক এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ।

“ভগতঃ পিতরৌ”—এই কৃত্ত কাবিকটুকুতে লক্ষের বিবরণ্যের স্মৃতিরূপ সাংবাদ্যর্পনের মূলমন্ত্র সুনির্দিষ্ট ।

“ভগতঃ পিতরৌ”—‘পিতরৌ’ লক্ষ পিতৃ-মাতৃ উভয়-ব্যক্ত : তাই ভগতঃ পিতরৌ বন্ধিতে মাতাপিতা উভয়কেই বুঝায় ।

সেই ভগৎপিতা এবং ভগমাতার কি লব্ধ : না “বাপর্গাধিব লক্ষ্যকৌ”—বাক্ এবং অর্থ যেমন পরম্পর নিভা লব্ধ, এককে ছাড়িয়া অপরকে অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, প্রচুতি ও পুরুষের সেইরূপ অচ্ছেদ, অচ্ছেদ, অপরিহার্য নিভা লব্ধ । কৃত্ত একটি স্নোকে সুবিদ্যান মহাকবি নিজ অমর এরের মঙ্গলচরণে স্মৃতিরূপের লক্ষ লম্বা বিবৃতি করিয়া একলক্ষ প্রচুতি-পুরুষের, নির্ভল ও লক্ষ তচ্ছেদ, ব্রহ্ম ও মায়ার, ভগৎপিতা এক অমম্মাতার বন্দনা প্রদিয়া লক্ষ চাইয়াছেন ।

বাপর্গাধিব লক্ষ্যকৌ বাপর্গপ্রতিপত্তয়ে ।

ভগতঃ পিতরৌ বন্থে পার্জাতাপরমেধকৌ ।

নারীপুরুষের মধ্যে এই অপরিহার্য নিভালব্ধ বৃত্তিই স্মৃতির প্রাণে চটতে প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রাচুর্য চাইতে ।

মিথিল ভাবময়িতা পদ্যময়িতা পাটনা অধিবনেও লক্ষ লক্ষিত ।

লক্ষ এবং অর্থের ভ্রাব ইভাব অমম্মাতায়ে নিভা লব্ধে লব্ধ । একের বাস্তবকে অস্তিত্ব অস্তিত্ব বর্তমান থাকিতেই পারে না । একজন সুবিখ্যাত পাণ্ডিত্য লেখক লিখিয়াছেন, “নারী এবং নর একটি পানীর দুইটি লক্ষ, ইভাবের একজনকে ছাড়িয়া বন্থে আব একজনকে উড়িয়া চেষ্টা করিতে দেখি, তখন আমার মনে হয় পানী তাই একটি ডানার ভর বিতা উড়িতে চেষ্টা করিতেছে ।”

যদি মাতার মঙ্গল কামনা করিতে চাই, তবে লক্ষ প্রদর্শনই লক্ষপ্রদর্শন দেখের লম্বা নর এবং নারীকে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত এবং উচ্চাধর্মে দীক্ষিত করিতে চাইবে । লেখবারী বীপুরুষকে অমম্মাতায়ে লম্বাতি বাগিয়া দেখের উন্নতির কথা কথ্য এবং মাতাপুরুষের মালা গাথ একটি কথা ।

এখানে পুরুষের শিক্ষার এ লক্ষ্য বাধ্যতামূলক কথার চেষ্টাচারেও তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারে না । এক্ষেত্রে মেধেবের শিক্ষা বাধ্যতামূলক কথার কথা বলিলে চরিত্র তাহা অনেকগুলি কানে একটু চুইবার মতই চলাইবে । কিন্তু আমি বলি এটা লক্ষ অমম্মাত প্রার্থনা নয় । যে দেখের কবি নরনারীকে বাক্ এবং অর্থের ভ্রাব পরম্পর নিভা লব্ধে লব্ধ এবং যে দেখের পত্নিত নারী পুরুষকে একটি পানীর দুইটি লক্ষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেও চুই দেখের ভগমম্মাত এবং বাতপুরুষের একটি লম্বা নরনারীর শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কথার চেষ্টা কনিতে এবং ই চেষ্টাকে লক্ষ করিতে না পারিলেন কেন ? পানী বন্থে উড়িতে চাইতেছে, তাই একটি পানী ঢালিয়া বন্থা থাক । কি লব্ধ ?

এ বিষয়ে আর একটি প্রধান কথা এই যে, বীপিকা বিজ্ঞায়েন ভজ লক্ষের ৫ একটি বীপিকা-বিজ্ঞায়েন সাংগতি ৫







# চীনে হিন্দুসাহিত্য

ঔপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও জীৱনামৱা দেবী

১১১ খৃষ্টাব্দে শুভকরসিংহ নামক মহা এশিয়াবাসী এক প্রথম হু চীনে আসেন। প্রাথমিক এই যে শুভকরসিংহ হইলেন পাণ্ডারামির পিতৃব্য অনুভোবনের বংশধর। তিনি মলয় বিহারে বহুকাল ছিলেন। আশী বৎসর বয়সে যত সন্তুষ্ট ওয় গিয়া তিনি চীনে আসেন। ইহার মধ্যে পাঁচটি মাত্র গ্রন্থ তিনি নিজের অগ্রহাণ করিতে পারেন।

শুভকর প্রথম চীনে তাত্ত্বিক সাহিত্য প্রচার করেন। তিনি মনে করতেন যে চীনের অধিবাসীগণ ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন বুঝিতে সক্ষম নহে; হুতরা তাত্ত্বিকের নিকট দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যথা। এই দায়িত্ব বহনই হইল তিনি হিন্দুধর্ম বা মহাবোধ—কোন পাণ্ডারই মত ব্যাখ্যা করিলেন না। তিনি একবারে বুদ্ধ ও বোধিবৃত্ত, সকল হিন্দু দেবতা ও দ্বন্দ্ব চীনে Shienদের প্রভাবে মানিয়া লইলেন। এইরূপে পৌড়িত ও হাত্ত ব্যক্তিবিশেষ নিমিত্ত তিনি একটি নূতন দেবতার দল সৃষ্টি করিলেন। মহাবোধী আত্মান করিলে এর সকল দেবতা মাদিরা আত্ম ব্যক্তিবিশেষে রূপে আসেন করিয়া যেন, ইচ্ছাট হইল এই নূতন ধর্মের মত। শুভকর সন্তুষ্ট ও মহাশয় চীনে অকস্মেৎ দিগন্তে; কিন্তু এরূপ লেখাতে চীনে অধিবাসীবিশেষের নিকট সেগুলি সম্পূর্ণ ভ্রমব্যবস্থা হইয়া উঠিল। হু-বোধী চীনাগণেরই বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের প্রাতি আত্ম আরও ব্যক্তিরা যেন। বুদ্ধ ও বোধিবৃত্তবিশেষকে আত্মান করিবার নিমিত্ত যে সকল মন্ত বহিরাছে সেগুলিতে তাহাদের সমাজিক বিভিন্ন মাঝে অভিভূত করা হইয়াছে; এ সকল নামই উপকল্পিত। বৈরেন ও বহুগণি—এই দুইজন চীনে আসেন যেহেতু—হু-হু-ই সকলের পালকিত্য ও প্রকাশ্যতা।

শুভকর বলিলেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে অন্ততকারী দানব সকল উৎপাত ঘটাইবার জন্য পৃথিবী বোড়াইতেছে। আর্য এই পৃথিবীর উপরে পক্ষিমাংস দেখানাপ রক্ষিছেন।

অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে মহাবোধী আত্মান করিলেই তাহারা আশিষ্টা পরগণনকে বিশদ হইতে উদ্ধার করেন।

শুভকরের চীনে আগমনের চারিশত বৎসর পূর্বে ( ১০৭ খৃষ্টাব্দে ) জীমিত্র নামক কুচাবাসী এক ব্যক্তি চীনে আসেন। চীনেও একটি ইতিহাসে দেখা যায় যে জীমিত্র মহামহা ও খ্যাত্ত বারমী এক চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার সমসাময়িক আরও বহু ভারতীয় তাত্ত্বিক শক্ত চীনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাত্ত্বিক গ্রন্থের ভেতন একল প্রচার হয় নাই। চারিশত বৎসর পরে শুভকর চীনে এই তত্ত্ব সাহিত্য বিস্তারের অগ্রণী হইয়া যান। তাহার পর ১১২ খৃষ্টাব্দে আসেন একব্যক্তি ও তাহার শিষ্য অমোঘবর।

একব্যক্তি এগারটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। 'এক-ব্যক্তি' এই নামটি সম্ভবত তাহার সম্ভাষণেই উপাধি। এই বুদ্ধ তাত্ত্বিক তিনু তত্ত্ববিজ্ঞান ব্যক্তি বিশেষ ভাবে স্মৃতিভন; হুতরা যে কোনও ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ করিতেন না। কেবল দুইজন চীনে তিনু নিকট ইহার রহস্য তিনি উন্মোচন করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রচলিত অমোঘবরকে এই বিজ্ঞা উন্মোচন শিখাইয়াছিলেন। শতকাল হইতে এই শিখিটি তাহার লক্ষ্যে লক্ষ্যে করিতেছিল। একুশ বৎসর বয়সে তিনু সহিত অমোঘবর চীনে আসেন। শুভকর পুতুর পর অমোঘবর তাহার কাণের ভারগ্রহণ করেন। তদ্ব্যয় আলোচনা ক্রমশঃ চীনে বিজ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাত্ত্বিক গ্রন্থাবলীর চারিখণ্ড এতই অধিক হইল যে ভারত হইতে তদ্রূপ গ্রন্থসমূহ আনিবার যত চীনা সম্রাট অমোঘবরকে ভারতে পাঠাইলেন। ভারত হইতে যখন তিনি ফিরেন তখন সম্রাট তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া Chu Tsang অর্থক্যে বিচার্য—এই উপাধি দিলেন।

## ঐশ্বর্যভাষ্যের দ্বাণাধারে ও ত্রিধামধাণে

অমোঘ মল্লভূত ১০৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বাক্যবোধের প্রভাব ছিল অসামান্য; তৎপরি ছিল তাঁহার নিষ্ঠা। মনে মনে লোক আপাদ্য তাঁহার সম্ভারভূক্ত হইল। একটি বিধেই আমরা লক্ষ্য করি যে ভারত ও ঐক্যভেদ কোনও কোনও গ্রন্থের মধ্যে যেমন কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়, অমোঘের কোনও গ্রন্থে তাঁহার আভাস-মাত্রও নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিলেই বুঝা যাইবে তাঁহার বক্তব্য কি। এই সকল গ্রন্থ লক্ষণ, এমন চম্পাপাণ্ড বটে। তিনি বলিতেছেন, “রক্তার ক্তার মাহুৎ অস্ত্রোপাধনু নয়। তাঁহার দেহের মধ্যে এক অমর আত্মা রহিয়াছে। শিশুর মূলের জ্ঞান সেই আত্মা সরল ও নিম্পাপ। দেহভাগের পর বিভিন্ন মানবের আত্মা যার বিভিন্ন নরকে সেইখানে প্রাণ্য বিচার হয়। তাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে উপরিভূক্ত কোনও পুণ্যদ্বারা পানী আত্মার ক্ত প্রাণ্য করেন। সেই প্রাণ্যের ফলেই পাপকালন হইয়া যায়। পানীকে নরক-বহন্য ভোগ করিতে হয় না। সেই পুণ্যদ্বারা প্রাণ্যের বলে পানী আত্মা নরকোপন পাত্ত করিয়া কোনও সংকারণের দ্বারা আপনাব পুণ্যভূক্ত পাপের প্রাণ্যভক্ত করে। এই প্রাণ্যভক্তই পানীর পাপকালনের উপায়, নরক বহন্য ভোগ নয়। নিম্নোক্ত কোনও তাত্ত্বিক যদি তাঁহার বৃত্তার পূলে কোনও বুদ্ধলোক লক্ষ্যভক্ত করিবার নিমিত্ত আত্মাভক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ্যনা পূর্ণ হয়। দ্বাধাভের নিম্নোক্ত কোনও পুণ্যভক্ত নাই, সেই সকল অবিদ্যাগী পানীধিরের বৃত্তার পর তাহাদের ক্ত পুণ্যদ্বাধা প্রাণ্যনা করিলেই তাহারা মুক্তিলাভ করে। মুক্তবাক্তির মুক্তিবিধানের নিমিত্ত তাত্ত্বিকগণ মতি নিম্নোক্ত লিখিত লিখিয়া করেন।”

তাত্ত্বিক প্রথমধিরের অনুদিত ও অলিখিত বহু মতের ভিত্তি দেখা যায় যে নানাতপ দানবের অস্ত্র প্রভাব দ্বী-ভূত করিবার নিমিত্ত লেখ্য উদ্ভারিত হইত। এইপ্রণ বহু গানবের প্রভাব তাত্ত্বিকগণ যানিতেন। তাঁহাদের মতে পাহাড়, বন, কৃষ্ণভূমি, বাসুকা, মতি, লক্ষ, বাহু, পাছ, পথ, মতি—বসন্তেরই অবিদ্যা এক একজন দেবতা রহিয়াছেন। এইরূপে সমস্ত পৃথিবী প্রাণময় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহার নিজস্ব আত্মা নিহিত, তাঁহার তাঁহাদের দ্বারা।

গ্রন্থের ক্ত অমোঘভূতের প্রতি চীনবাসী দুইই প্রভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, লুয়াট দ্বারা তত্ত্বপ্রভাও লুয়াট্য করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনবাসী তত্ত্ববহু ভবনের লিখিত গ্রন্থে করিয়া লয় নাই। আশায়ে কিছু এত গ্রন্থের প্রভাব দ্বারা হইল। Kobo Daishi নামক জাপানী প্রথম বৌদ্ধধর্ম আশোনার ক্ত চীনে আসেন; তিনি মতুর বহুত পিত্তা করিয়া পিত্তা আশায়ে Shingon নামে এক পাহার প্রবর্তন করেন।

এই Shingon পাহারভূক্ত বাক্তগণ মনে করেন বিশ্বের সকল বস্তু একটি ঐশ্বর্যের দ্বারা অলিখিত। এই ধর্ম দ্বাধার মতের সমস্ত করিবার প্রভাব হইয়াছে। হুয়াতে এককিৎ যেমন অস্ত্রভূক্ত দানবিক তথা সকল রহিয়াছে, অপরদিকে নানাতপ ক্ত প্রাণ্যকালনের বিধি দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শ্বিক, চীন ও জাপানের সকল ধর্মের সকল প্রকার দেবতার সমাবেশ করিয়া বুদ্ধকর্ত তাঁহাদের ক্ত প্রভা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন প্রভাভক্তনয়, বিভিন্ন উদ্ভেতে বিভিন্ন দেবতা অলিখিত আছেন—Shingon মতে হুয়া দ্বীকার করিয়া লওয়া মর্শোপরি বলা হইয়াছে যে এ সকল একটি বাক্তির দ্বারা প্রভাবিত। যে সকল অলিখিত দেবতা, অস্ত্রমানব, শিক্তমানব লারা বিশ্বের দ্বানে দ্বানে আশানাবেদ রহিমার অলিখিত আছেন, তাঁহাদিগকে অমূল দৌলদা ও দ্বীকর্তে ভূষিত করিয়া চিত্র ও মতিব মধ্যে প্রাতিফলিত করা হইয়াছে; ইহাওব উদ্ভেতে নানাতপ প্রাণ্যকালনের বিধি বাবদা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে অস্ত্রনব একটি শিক্তকালর লুটি হইয়াছে।

মহ ও তত্ত্বভানের মধ্যে মুক্ত্য অর্থাৎ দেহের বহু-প্রভা প্রভাব ও অমূল্যের বহুপ্রণ লিখিবের উপর বিশ্ব প্রভাভক্ত দেওয়া হয়। এ লিখিত বহু বুদ্ধ প্রভাব প্রভ লিখিত হইয়াছে। এতদ্বিত্ত কোনও কোনও গ্রন্থে বুদ্ধকে মতাবিলু করিয়া লিখিত দেব, দানব, অস্ত্রমানব ও শিক্তমানবের বহুপ্রণ লিখিবেন একটি ক্তের পথিকলতা দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বা প্রভা



বিভাগ করিয়া এক একটি চতুর্ভুজ বা চক্রে মধো খিটম শ্রেণীর দেবতামিগের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই চতুর্ভুজ বা চক্রগুলির নাম মণ্ডল। মণ্ডলগুলি যথোপযথ সন্ধ্যা বৈশ্বের ব্যতীতি পরিদ্রুত করিয়া তোলা হইয়াছে। চীনা ও তিব্বতে এই সকল মণ্ডল লম্বা এক গ্রন্থিগ্রন্থি। ইহা তিব্ব চীন, জাপান ও তিব্বতে নানাতরু চিত্রকলায় ব্যাধ। এই মণ্ডলের বহুল মণ্ডল প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। তিব্বত, চীন ও জাপানের প্রতিক্রিয়ায় পুরীকণ এই সকল মণ্ডলের চিত্রকলায় পরিবর্তন করিয়াছেন এবং ঐশ্বর্যের নিম্ন গুলিক মণ্ডলের মধ্যবিন্দু বৈরাটনকে অবলম্বন করিয়া কত মনোহর প্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। জাপানের এক চিত্রকরের অঙ্কিত অচল বৈরাটনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অচল বৈরাটনকে জাপানে বলা হয় Kinko।

চীনা হিপিটকে বহু প্রকার সুচারু চিত্র রচিত। ইহা তিব্ব অচল মণ্ডল প্রাচীন গুপ্ত শিল্পে ইহার মধো রচিত। তাহার সহিত তাহার চীনা উচ্চারণ ও বেত্তা হইয়াছে। এই চীনা উচ্চারণের সাহায্যে সংস্কৃত পদটি বখাব উচ্চারণ করা যায়। \*

৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রজা নামক কলিঙ্গবাসী এক প্রথম চীনে আসেন। চারিটি গ্রন্থ ইনি অগ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে মহাযানমূলজাতকুলবস্তুমিধ্যানসূত্র ইহল একটি। মহাযানের স্বতন্ত্রগুলি গ্রন্থের স্তোত্র ইহাতে রচিত। Suzuki শ্রেণীর অগ্রহণ করিয়াছেন। একটি প্রোক্তের অগ্রহণ এখনে বিবেচ্য—

“মহাযানবাসীর মনে পলাত সাগর সন্মত সমগ্র পৃথিবীকে অগ্নি যেমন জ্বল করিয়া কেবল তেমন ধূমুগাত্ত বৈধ অগ্রহণে অগ্রহণ করিলে, সেই অগ্রহণে সকল পাপ সম্মলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।—পার্বি বানানগণ অচল অগ্রহণাধিত ভব হইয়া যায়, অগ্রহণ বর্ধের পথ প্রবর্ত করিয়া দেয়। অগ্রহণ চতুর্বিধ যানের আনন্দ সফল করে, অগ্রহণে মনিষ্যগণের পুণ্যটি হইতে থাকে।

হীরকের জ্ঞান সুদূর পশ্চিম জাতি অগ্রহণের দ্বারা লাভ করা যায়। অগ্রহণ ব্যক্তি মিত্রবনের কাহাণীর হইতে মুক্তিলাভ করে, বোধিজ্ঞান তাহার প্রবর্তিত হইয়া উঠে।

তাঁহা রাজ্যের প্রথম পতাকাঁর মধো (১১৮—৭১২) খ্রীস্টাব্দে অচল চীনা প্রথম ভারত ও ভারতীয় উপনিবেশ সম্মলে সমন করেন। এদিকে প্রায় পচিশজন হিন্দু প্রথম চীনে আগিয়া গ্রন্থ অগ্রহণ করে। চীনে কাটাটা মেন। প্রথম পতাকাঁরই প্রায় চারপাশ গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়, তাহার মধ্যে এখন ১০৮টি পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়া এগুনে অগ্রহণ কেবল হিন্দুদিগের প্রচল দেখা যায়। Hsing নামক এক চীনা প্রথম পতাকাঁর আগে এক চীনা মালপত্র (Calendar) প্রস্তুত করেন। তাহাতে হিন্দু জ্যোতিষী পৌত্তলিকের প্রচল দেখে ছিল। এই সময় চীনা পণিত পাণ্ডের (Arithmetic) বহুল উদ্ভূত হয়। হিন্দু প্রথমপণ সংস্কৃত পণিত পাণ্ডের কতিপয় গ্রন্থ চীনা অগ্রহণ করিয়াছিলেন; Su রাজ্যের গ্রন্থপত্রের মধ্যে গ্রন্থগুলির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থের বিবরণ স্পষ্ট এখন বিলুপ্ত। চীনা পণিতপাণ্ডে গ্রন্থের প্রচল দেখা যায় বহুই সম্ভব।

যে সকল চীনা সম্রাট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত কেহ কেহ বৌদ্ধ অগ্রহণ কিছু কিছু চীনা আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন। ৭১০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট, Su T'ang তাঁহার সম্মেলনের উদ্যোগ বৌদ্ধ প্রচারসাধনে সম্পন্ন করেন। রাজবাড়ীর মণিমাণ্ডপ বৃদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের ভূমিকার সম্মত হইলেন। সম্রাটের সম্রাটের সম্মলে বৌদ্ধ অগ্রহণাধি সম্পন্ন করেন।

৯৮০ খ্রীস্টাব্দে নানাতরু অগ্রহণের দমন করিয়া Chao Kuan Yin উত্তর চীনে, হুই রাজ্য স্থাপন করেন। দেশের ভিতর বহু চীনা রাজাদের সহিত বৈবেগ Sung সম্রাট-দিগের শক্তিতে হইয়াছিল এমন নহে, উত্তর ভারতীয় ভাষার Khitan মিশের সহিতও তাঁহাদের বিরোধ আছে। রাজ্য নৈতিক এই সকল সোলমাল সম্রাট সাহিত্য শিল্পকলায় তেমন কতি করিতে পারে নাই। Li Lung Mien এর জ্ঞান বিখ্যাত পুরীকণ বৌদ্ধভাবে অগ্রহণিত হইয়া তাঁহাদের অভিনব পিঙ্গ স্বপ্নন করিতেছিলেন। এই ব্লে বোধিবর্ধের বান-পাথার প্রচল চীনের শিল্প ও সাহিত্যকে অগ্রহণিত করিয়া তুলিয়াছিল। বহু পতাকাঁতে বোধিবর্ধ

ঐশ্বর্যভাষ্যের মূলোপাধায় ও ঐশ্বর্যমণ্ডা দেখা

তখনকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্মের আভ্যন্তরীণ বিশেষ 'খান'-  
পাখার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই মৌলভাব সম্বন্ধেই  
ক্রমশঃ বহু গ্রন্থ লিখিত হয় এবং একটি বৃহৎ সাহিত্য পাণ্ডিত্য  
টপে।

১১০০ খ্রীস্টে ১০৮৫ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম চারিজন "প্রজ্ঞ"-  
সম্রাটের রাজত্বকালে একশত বৎসরের মধ্যে তিনশতেরও  
অধিক চীনা প্রমথ ভারতে আসেন। ভারতের ইতিহাস-  
লেখকগণ এই সময় ভারতে মুসলমান বিজয়ের কাহিনী  
বর্ণনা করিয়া তাঁহার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইল মনে করিয়াছেন।  
কিন্তু সেই সময়েরই বলা বলা চীনা প্রমথ পার্শ্বি রাজ্যের  
উদ্দেশ্যে একটি শাস্ত্র সম্প্রদায় স্থাপন ভারতে ব্যাভাষ্যত  
করিতেছিলেন এবং ভারতও তাঁহার স্থানসম্পদকে মৈত্রী ও  
কল্যাণ বাদি প্রচার করিবার ক্ষমতা উত্তরে চীন ও তিব্বত,  
এবং দক্ষিণে সিংগল, বর্ম প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতেছিল।  
এই গভীর বিষয়ের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়  
নাই।

খান পত্রাবলীর শেষভাগে মধ্য এশিয়ার একটি নতুন  
যাযাবর জাতি প্রথম হইয়া উঠিল। চীনের উত্তরে মঙ্গোল-  
গিয়া ছিল তাহাদের কেন্দ্রভূমি। বেনিটে হেনিটে একটির  
পর একটি বেশ বহু করিয়া তাহারা সে ভাবে পৃথিবীর  
চতুর্দিকে বিজয় নিধান উড়াইল তাহা তাহিলে অসম্ভব হইতে  
চর। মোগল সম্রাট Chenghis Khan ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে  
বিভিন্ন মোগল বংশগুলিকে একত্রিত করিয়া সমলবলে  
এশিয়ার দক্ষর দিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পশ্চিমে  
বুলগেরিয়া, মাদিয়া, হাঙ্গেরী ও ক্রিশা, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর  
পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে চীন, তিব্বত ও ভারতের সীমান্ত  
প্রবেশগুলি তাহাদের মৌলভা দখল করিল।

চৌলসের মুক্তার পর তাঁহার পুত্র Ogolai, Kitan  
বিশেষ পরাধিকার করিয়া উত্তর চীন দখল করিয়া লইলেন।  
Ogolai এর মুক্তার পর Mankon Khan সিংহাসন  
অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা  
'কুবলুই খাঁ' (Kublai Khan) দক্ষিণ চীন দখল করিয়া  
Yunnan পর্য্যন্ত মোগল প্রাধান্ত স্থাপন করেন।  
১২৭২ খ্রীস্টাব্দে কুবলুই খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাঁহার রাজত্বের নিবংশোদ্ভূত দাঁপের ভ্রাতা যৌদ্ধধর্মের শিখা  
একবার উচ্ছাদিতভাবে মলিয়া উঠিয়াছিল।

কুবলুই খাঁ সম্রাট হইতে ১২৬০ খ্রীস্টাব্দে Phingmu  
নামক তিব্বতী এক প্রমথকে রাজাভক্ত করণে বরণ করিলেন  
এবং বৌদ্ধ বিহারগুলির ক্ষেত্রের ভার তাঁহাকে  
দিলেন। এইরূপে তিব্বত ও চীনের মধ্যে বিশেষ একটি  
সম্বন্ধ তিনি স্থাপন করেন। এখন হইতে তিব্বতী সাম্রাজ্য  
চীন ও মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারকার্যে অগ্রসর হইলেন।  
মঙ্গোলিয়ার দক্ষর দিকের সংস্কৃতকার্যে ও অসম্ভব বিষয়  
Phingmu প্রাদ্য পাঠ্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ। এই বিবরণ আমরা মধ্য  
এশিয়ার প্রবন্ধে বলিব। চীন বৌদ্ধ গ্রন্থ অসম্ভবের কাহিনী  
পুনরাবৃত্তি নির্মিতরূপে চণোইবার ব্যবস্থা তিনি করেন।  
যাহা তিনি চীনস্থানবিনয়ের একটি গ্রন্থ অসম্ভব কথন  
গ্রন্থটির নাম 'মূলদর্শনবাস্তববাদকর্মবাচ্য'। মোগল  
সম্রাট তাঁহাকে খুবই স্থান করিতেন এবং 'মহান অমূল্য  
ধর্মের রাজা' (Prince of the Great and Precious  
Law) এই উপাধি প্রদান করেন।

মোগলসম্রাট বিদ্যের প্রায় সকলই বৌদ্ধধর্মের প্রতি  
সম্মানবান ছিলেন। বিহারগুলির সংস্কারকার্যে, বৌদ্ধ  
ভাষাভাষার নিবন্ধ এবং বৌদ্ধ অসম্ভব সম্পন্ন করিতে  
তাঁহাদের বহু অর্থ ব্যয় হইত।

১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে Phingmuর পিতা Shalopa তাঁহার  
দুহর একটি গ্রন্থ চীন ভাষায় অসম্ভব করেন। গ্রন্থটিতে  
কয়েকটি স্থল ও শাস্ত্র হইতে বিভিন্ন মত উদ্ধৃত  
করা হইয়াছে।

গ্রন্থ অসম্ভবের মূল গ্রন্থে একতরপ শেষ চটল।  
মোগল রাজত্বকালের শেষদিকে তিব্বতী 'সাহিত্যধর্ম'  
বৌদ্ধধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।  
শেষ মোগলসম্রাট রাজসভায় কুচিচিম্পার তান্ত্রিক  
অভিনয় সম্পন্ন করাইলেন। তাঁহার পতনের পর  
অসম্ভব কারণ। মিং (ming) নামক খ্রীস্টাব্দ চীনা  
রাজবংশ মোগলসম্রাটকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন  
অধিকার করে। মিং রাজ্যগুলির সময় গ্রন্থ অসম্ভবের  
বিষয় কিছু জানা যায় না, তবে চীনালেখকগণ ইতিহাসিক



ও নানা বিবরণক সঙ্গিত এই সমস্ত বচন করেন। তাঁহার মধ্যে Hio-shi-tai-tang-ssai নামক বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসটি উল্লেখযোগ্য। Nien Cheng টোকা বচনিত। কেবল বৌদ্ধধর্মের কাহিনীটিকেই বিবরণ টোকাতে যে আছে তাই নয়, কৃষ্ণগ্রন্থের লক্ষ্য ও তাৎপর্যেরও কিছু কিছু কাহিনী আছে।

মিং বাওয়ে ১৩৩৮ খ্রিঃ ১৩৯৬ অব মধ্যে হিপটেকের সংস্করণ সম্পন্ন লক্ষিত হয়। প্রথম মিংসম্পাদিত গ্রন্থকালে নানাকংও টোকা প্রথমে প্রকাশিত হয়। অতঃপর বৌদ্ধগ্রন্থগুলি টোকাতে লক্ষিত হয়। তৃতীয় মিংসম্পাদিত বাওয়ে কতকগুলি নতুন গ্রন্থ যোগ করিয়া টোকা পুনর্বার প্রকাশ করা হয়। তাঁহার পর আবার Mitsang নামক এক চীনা প্রথম কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

হিপটেকের অজ্ঞাত সংস্করণের মধ্যে মিংবাওয়ে সংস্করণটিকে জাপানী পণ্ডিত Nanjo টোকারী অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার catalogue বইতে সংগ্রহের পুস্তক এখানকার যে ৪১২ বৌদ্ধ সাহিত্য ছিল তাহার একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে চীনা হিপটেকের তত্ত্ব মূল্য নয়, বরং মূল্য সাহিত্য ও ইতিহাস হিসাবে। ইহাতে ভাবনী, ভ্রমণ কাহিনী, অভিধান ও নানা বিবরণক সঙ্গিত লক্ষিত হইয়াছে। প্রত্যহাঃ চীন ও

জাপান ধর্মগুরু ভারতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

ইহাও পর চাইতে চীন ও ভারতের লক্ষ্যবস্তুটি ভিন্ন হইয়া যায়। সুদীর্ঘ বিজ্ঞানেন্দ্র পর পুনর্বার দীর্ঘ দীর্ঘ সেট গভীর বর্ণিত লক্ষ্যবস্তুটি স্থাপিত হইবার অভিধান বইখানে পাওয়া যাউতেছে। ১২২৬ পুঁথিতে বর্তমান ভারতের গণি চীনকে জনাবার কত ভারতের লক্ষ্যবস্তু বর্ণনা করে অভিধানের বিবরণ আমবা লক্ষ্যবস্তু চীন। বর্ণনা করে বচন চীন ও জাপান উভয় স্থানেই তাহাদের দেশের যে কোনও কবির রচনার প্রায় সুপরিচিত। তাঁহার লক্ষ্যবস্তু ১৩৫৫ চীন ও জাপানী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। কিছুদিন পুঁথি চীন কাঁচ প্রায়ের ভারত ভ্রমণের কথা লক্ষ্যবস্তু যাত্রা আছে। অজ্ঞাত নানা বিবরণের সঙ্গিত বিবরণবস্তুতে চীনা সাহিত্য অভিধানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

চীনের সঙ্গিত ভারতের সম্পদ আত্মপ্রকাশ বস্তু ছিল। বর্ণনা করে পুনর্বার সেট লক্ষ্যবস্তু স্থাপনের লক্ষ্য চীন যাত্রা করিয়াছিলেন। যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ এই বস্তু দেশকে ও প্রাচীন জাতিকে একদিন এক করিয়া ছিল তাহা আত্ম উভয় দেশটিকে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই যোগসাধনের লক্ষ্যই বিবরণবস্তুতে আত্ম অভিধান হইয়াছে। এবং এই নব যুগের প্রধান পুঁথি হইতেও বর্ণনা করে গণি নিজ গতিভাবে তাহাদের সাহিত্যে স্থান পাউয়াছেন।



## একশ বছর

—গল্প—

—ঐচ্ছিক চরিত্র

তবিশত্ব জীবনের একটা মোটাটুকু ডালিভা পক্ষের মনেই থাকে। আমাবও ছিল; এবং তাগার মধ্যে দুইটি বিনিময় তলার খুব মোটা করিয়া লাইন টানিয়া রাখিয়াছিলুম—ডেপুটিগিরি এবং সেই পক্ষে একটি বিদ্রোহী স্ত্রী। প্রথমটার কোনো বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই,—কেননা, কপাল ও মুকুন্দ চুটাই ছিল। কিন্তু অনেক ব্যক্তি: প্রুতি: বিজ্ঞান মকর যখন শৌক্যানে গেল, এখনও তখন তিরিশের কোঠ পাড়ি থাকা কোপলকে। ঠিকভাবে বন্ধুত্বকে ছেপেব অগ্রগ্রাণন পুরানো হইয়া গিয়াছে। তাগারও ক্যাবও মেয়েব ক্যাবের চিন্তাকাল আমায় হইয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্য নয়। বাক্যে ছেপেব: এই বিধের শিতাষাতার অতি বাধা তরু লখন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোকা এডাইবার পুঙ্কেই একটি খোমটো: খোম, মলকপরা চলত-পুতুল জোপড়ে করিয়া পক্ষের এবং মা: হইয়া পুজা একপক্ষেই হুক করিয়া যেন। আমি এই দেবতাবকে দূর থেকেই মন্থার কানাইছি। হুতরা: আমার কৃত্রিম বন্ধুদের মত অতি পনিবাণে শাখিয়া গিয়া। ঐশেনে চুটিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই; জি:বা কোন্ এক কথামতো পণ্যায়ের গ্রামা দেবীর উচ্চত্রে সাত আদিয়া লখা লখা মধ্যকাব্যে ততি নিবেদনেরও প্রয়োজন বোধ করি নাই। একত্র কোনদিন আপসোব কতিয়টি, এমন কথা সায়ার অতি বড় পরুও: বলিতে পারিবেন না।

বিবাহ করিয়া কতটা পুণী হইয়াছিল, মোড়বেলে সে কথা আর এখনে তুলিবার প্রয়োজন্য্য নাই। কেননা লেখাটা গৃহীতর সাত পড়িবার অন্তিম আদে। কবে তেরার বংশে বেটন এবং প্রণবিত্তর ফুলে সোকা থেকেট গৃহীত সার করিয়া যে কোন-কিছুতে বিন্ত হইয়াছি

এমন পক্ষেই কোন কালেই হয় নাই। কিন্তু বন্ধুতা জানিতে চায়েন। সেই কড়ের স্মৃতিষ ঘটনাটাকে কোন কোন ক্রমেডর ছাত্ত এমন সব ব্যাখ্যা দিতে হুক করিয়াছেন, বাগার পরে আর চুপ করিয়া থাকিবার উপায় নেই। হুতরা: বাগারটা এবার খুলিয়াই বলিতে চাই।

বেশিদিনের কথা নয়। সবে করিমপুরে বসি গিয়া আসিয়াছি। একটা খুদী মোকদ্দমার তদন্তের তার পড়িল। শাকা তিরিশ মাইল পর্য; আগাগোড়া নোকাই। কবিদের জিন্সের চল আদিবার কথা, কিন্তু আমায় আসিল জোষে। উপায় নাই; চাকরি।

হুতর প্রুতি খার, কল, মল, মল। হুতরা: উপবে খানপাছের শাতাগুলি কোনরকমে মাথা আগাইয়া পাড়িয়া আছে। পাড়ের কলে নাটিকা নাটিকা বজরা চলিয়াছে। আর আমি ভিতরে চিন্তাশত হইয়া পড়িয়া আছি। মাথা তুলিবার উপায় নাই। বিকালের দিকে দেবিলার উত্তর পশ্চিম কোণে কালো ঘেঘ পাড় চাইয়া উঠিয়াছে। দেবিতে দেবিতে তাগার বড় আশ্রনের মত হইয়া গেল। মাঝিয়া শাপলে তীরে পড়িতে না পড়িতেই বড় আসিল। সে যে কি ধান, বুকাটবার মত স্পষ্ট। আমার নাই। মনে চটল আমরা যেমন করিয়া কপোত ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া ফেলি, তেমন করিয়া কে সেট আকাশ ছোকা সাদা মেঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছুটিয়া ফেলিতে লাগিল। গুটিবার গুঁড়াইয়া, পাড়ের মাথা নিরুদ্ভাষ্ট, ভুগ্ন নদীটাকে ক্ষোণীয়া তুলিয়া যে খুবার মাভাল তাহার তপনবৃত্তে সমস্ত স্মৃতিকে লইয়া মলমলোড়ার গোপকের মত খেলিতে লাগিল। তাগাকে চোখে দেখা গেলনা, কিন্তু তাগার রক্তাক্ত



অধিক পাকিরা পাকিরা মাফাশেব গ্রামে এসে গেল তখন অন্ধকার ভিঁরিয়া ভিঁরিয়া দেবিতে লাগিল; এবং তাহার কোথাক গন্ধিন মাফাশ, মাত, বাড়ী সব গুলার কাটিয়া পড়িতে লাগিল। আমার সহস্রার পাশেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ তাহার আশ্রিত্বের লক্ষ্য মাফাশ করিয়া নদীর তলে লুটাইয়া পড়িলেন। বন্যস্তির পক্ষ অগ্রসর করিয়া তাহার আর কোন বহুর পাছে আমাকে নিবাই পড়েই, সেই অন্ধকার তাঁর মত বৃত্তিগার মাফাশ করিয়াই ছুটিলাম। এবং কাছেই যে বাড়ী গাঠিলাম, উঠিয়া পড়িলাম।

গাঠিরে বহু আঁঠোজনের বাতলা ছিল না; কিন্তু যেটুকু ছিল, তাহা আঁঠো কোমল এবং সৌজনে মধুর। বিদ্যায় বৃত্তি এই কথাই বোধ হয় সত্যিই ছিল। ব্যক্তি তখন কতই বেশ পড়িতে, কিন্তু আঁঠো-পড়ে নাই; মাত মাত শব্দ শব্দ শব্দ শব্দ শব্দ। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বৃত্তি পড়িতেছিল। হঠাৎ মনে হইল, মতকার মতো কী একটা স্মৃতি উঠিল। দেখিলাম বেড়ার টান্ডালা একখানা চুনি—একটি বিগত-মোহনা স্মৃতি, চারিদিক চুনিতেই কেলে মেরে; তাহিলাম, বোধ হয় গৃহিণীর স্মৃতি—কেননা, আমার শোবার বাগান কতই মেরেই হইয়াছিল। বোধ হইল যেন চেনা মূখ; যেন বহুদিন আগে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু আর কিছুই মনে করিতে পারিলাম না। হঠাৎ আলোটি নিবিয়া গেল, চুনিখানাও আর-কোথা গেল না। কিন্তু সে-যেন বেড়ার পাশ থেকে উঠিয়া আসিয়া আমার মনের মধ্যে ছুঁড়া বসিল। তাহার প্রত্যেকটি বেগা কত মনের নানা অনিবার্য মন বিদ্যা আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার আলো আলোতেই বেশ আমার মনটির ঠিক পাশেই একটি অনিবার্য বহুর কিশোরী স্মৃতি লক্ষ্য আমার মনে চাইয়া আছে। চমকিয়া উঠিলাম। এ যে বিকল্পের আরোহন দেখিতেছি। কিন্তু শব্দগান। নগ্নপ্রাণের মত বুল যেন কিছুতেই না করিয়া বসি। তাহার বহুগুণী লোক ভালো ছিল। কিন্তু আমার।—একই ভাবে সবই করিলাম, কে? জবাব নাই। এবার স্পষ্টভাবে বলিলাম, কে তুমি? জবাব আসিল। স্ত

স্তনের বহুর যেন বহুর কোন্ বহুর কোন্ গ্রাম থেকে করিল, আমার চেয়ে না? আমি তোমার লগ্ন মেরে।

স্বর্জন! কোন প্রেমই তিনিলাম না, তা আমার লগ্নম। এর পরে বিত্তের আছে নাকি? করিলাম, তোমার বোধ হয় তুল হুজ্জ। ঐ প্রেম-টি মেরে বোধ আমার জীবনে একময় করি।

কিশোরী বিলবিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে কি ভেঙে-বা? কি করেই আঁঠো মেরে বোধ হয় না? কেন, তোমার ভেঙে বহুর কনে বোঁ এর মেরে? একদিনও না? বহুগার তাত্ত্ব না?

মেয়েটা তো অত্যন্ত ভাড়া। একটা কড়া মেরে লাগাইব তাহাতেই, মেরা অপর কল কল গুনিলাম, কেননা ক'রে হ'বে? তার কি আর উপায় ছিল? সে তখন কোথায়?

বিলিলাম, কে সে? তার কথা বলত? লগ্ন কল করিল, সে তোমারি ছিল। কিন্তু তুমি তো মানি? সে তোমার এক বহুর।

একটু বহুর মেরেই বলিলাম ও: তা, 'লে দেগছি একু না পেরেই একবারে চুনি প্রেম তেললাম।

সহস্র চুনি উত্তর করিল, তুমি যাকে পেয়েছিল সে তো পত্রিকার একু। কল্পের শান্ত্য তার পারের চিল রেখে গেছে, কিন্তু মনের পাশ স্পর্শ করতে পারেনি।

একটু মাঝি যেন আপন মনে বলিয়া চলিল, "কত-কাল! কিন্তু মাঝি যেন চোখের উপরই বেরি। কলেক গাইবোর পক্ষি যাবে এক লাব আলমারী। কলেক কলেক এক একখানা চোখ টেলি। তারি একটিতে সে-বল আছে। কলের কাছে মর্শনের বই খোলা। চোখে তার বহু —এক বহুর মেরে। সেই কতী মাঝি একবার জানা দিয়ে তাকাল। মারিকেল পারের শান্ত্যলো পরের চোখটি কে বহুর কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। চোখে গুলু স্মৃ-খের বহুর কল, বেড়ার মেরে একময় ব'লে কাঁপ লেগেই কল। তাদের ছোট বাহুরি আরো ত'রে শ'ড়ে চোখ বুলে জবাব কল। অদূর একলার দেবতার পাছ কলেক ক'রে থাকিবে আছে। তাহি ক'ল দিয়ে দেবা

দেখ দু' আকাশের এক টুকুড়া গাঢ় নীল। একটা চিল উড়ে বাড়িল। মনে হ'ল আর একটু উঠলেই তার কান্ড ডানার নীল জড়িয়ে যাবে। একুশ বছর যুদ্ধ করে চোরে রইল। এক নিমেষ, তবু একটা নিমেষের তরে আমি তার মুকুটিত গলবের শাপড়িটির উপরে গিরে ঝাঁড়ানাম। যৌবন-নেপথ্য আকাশ বাতাস মাতাল হ'য়ে উঠল। দেবদাসের বাখিরা, আকাশের ক্রামলিমাধ, যৌবনের কল্পনে তেলে উঠল একটা সঙ্কল্পের শলাশখ, একটা পরিচিত পুঙ্খের খাট, একটা লাজ-কোমল কিশোরীর চকল পতি। তার মুখ-খানি—একি? একুশ বছরের গোপন লজের বারবার চমকে উঠল। কণেকের কত। তারপর চোখটুটি আবার বোমের এল কাঁটের শাস্তর। কিন্তু তার সবুখে শুকনো অক্ষরগুলো এমন বেড়ে বেড়েতে লাগল।

মাকশানে চটায় আমিরা জিজ্ঞাসা করিল, 'মনে পড়েছে?' আমার সমস্ত সোচ্চমন যেন আজ্ঞার চটয়া শিঁড়িয়াছিল। কথার দিতে চোটা করিলাম, পারিলাম না। সে বলিয়া চলিল,—“আর এক দিন এবং সেই শেষ। সেদিনও আকাশ-ভরা এমন মেঘের খটা। প্রাণের ত্রাতির লুকু তাগিরে এমনি ব্যাকুল কায়া। ইন্ডেন হুইলের আলোগুলো অনেকখানি নিয়ে গেছে। ‘গোতাগার পূব ধারের ছোট ছোট কাঠের বগলগোটে লম্বাই রুহোত। দুমিরে পড়েছে। একুশ বছর জেগে বসে ছিল। জানালা দিয়ে অন্ধকার ত্রাতির বুকের মধ্যে কী দেখছিল, সেই জানে, অথবা জানেনা। সেই আনত বর্ষার সন্ধ্যায় অলপ হুতাশ ত'রে নিয়ে বীরে বীরে তার কাছে গিরে ঝাঁড়ানাম। দিগন্ত জোড়া আঁখার লগরে তেলে উঠল চুট পথ চাওজা চেনা চোখ। কি যেন তরা বগলে চাইল, কিন্তু ভাষা বুঁজে পেল না। আঁখের অস্ত্রধাঙাগুলো খণ্ডে খণ্ডে পড়ে গেল। একুশ বছরের অনাহত যৌবন শিউরে উঠল। তার সমস্ত সোচ্চমন দুপের বুক চূষন-নত প্রকাশ্যতির ডানা চুটির মত কেপে কেপে বিবল হ'য়ে আগতে লাগল। তারপর লগলা সেই মুকুমান চেতনাকে তড় ব্যাধার কাপিরে তুলে সোঝা হ'য়ে ঝাঁড়িল। সবুখে জানালা বন্ধ ক'রে একটা মোমবাতি জালিয়ে বাতা পেলিল নিয়ে আঁক কথতে লুক ক'রে গিল।

সেই দেখ।”

একটু খানিয়া আবার করিল, “কেমন, সভা নহ? একুশ বছরের এই আঁঠিগুণ সকলের কাছেই লুকানো ছিল। তবু জেনেছিলাম আমি। কেনেও, তার জীবনের চরম বকন: থেকে তাকে বাঁচতে পারিনি। সেই রাতে প্রতিষ্ঠিত কামিনার গোপন লজ: গোপনে রেখে অন্ধকারের মধ্যে যখন অলপ হ'য়ে গেলাম, একুশ বছরের স্বপ্নশেখর চকু হুট বৃকে লেগেই রইল। একটা প্রর কেবল ‘আমার’ ক'রে মনের মধ্যে তেলে উঠতে লাগল, কী পেল সে? কা পেল?”

একটানা কবিরের মত্যাগারে অভিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলাম। বিভক্তির ব্যাধার আজ্ঞার তাকটা তাকিতেই বলিয়া উঠিলাম, কী পেল, সে তুমি কি বুঝেছো?—

কিশোরী বাবা কি চোখের দৃষ্টি, “হানি, হানি। তুমি বলবে, সেই পেল। পুণিবীর সমস্ত মান, অনাদি মানবের সমস্ত চিন্তা-সম্ভার। এই না? কিন্তু হাজার, প্রকাণ্ড জ্ঞান সমুদ্রের চেয়ে কি বড় নয় এক কোটা অলপ? একটা তবুই গোপন লজের রক্ত:কাপটিতে এতটুকু মাদন— সে কি তোমার কিশি মায়াজোর সিংহাসনকে তার মানিরে দেয় না? সে কথা কেমন ক'রে বোকাবো! রক্তাক্ত আলো বোকাবো কেমন ক'রে? সে কথা যে বৃত্ত সে চ'ল পেল; নিরে গেল সেই সোনার কাঠি বার ম্পর্শে পুণিবী হ'য়ে ওঠে স্বপ্নময়, জীবন হ'য়ে বার মায়াকানন। তাকে যে হাজার সে কোথার পাবে সেই সস্তি-নাগ, একটা চকু কিশোরীর বুকের মধ্যে যে রক্তনা করে বর্গা, মায়াজ: যে ক'রে তেলে করনা। সে মোহ কেটে গেল। সে অজ্ঞান-অস্ত্রের আজ-সমাদি রইল না। কেমন ক'রে পাকবে? একুশ বছর যখন চ'লে যায়, চোখের ভিতর থেকে নিঃসৃত নিয়ে বার স্ত্রেরঙ্গির মায়কতা, আর নারীর উপর থেকে বুলে নিয়ে বার রক্তের আবরণ। তারপর আর কীই বা পাকে? কীই বা পেল?”

এমন অমৃত প্রর নিজেও নিজেও কোনদিন করি নাই, অস্ত্রের কাছেও তানি নাই। কিন্তুখন চূপ করিয়া থাকি। কহিলাম, “এই লম্বা বস্তুটা শোনাবার তরুই কি হাতদুপুরে আমার হৃৎকর করেছ? কিন্তু তোমার কানো





উচিত ছিল, আমি মোটেই তখন প্রেমিক নই, একটি বিবাহিত স্ত্রীক ছাত্রশোক। সুতরাং নারীসম্পর্কে জান নেই। ক'র জানি।”

কিশোরী উত্তর করেছিল উঠিল, “তাই নাকি? তাই নাকি? বিবাহিত! নাকি বিয়েটা কেমন লাগল তেলুটি বাবু? কিংবা জানতে কি কথা হল? বলনা?”

তার নিলক্ষ্যে আমারও লক্ষ্য হইল। সফল যুগে কথা যোগাইল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে শব্দ কোমল করে কহিল, “স্বা স্বা।” হোমাকে বলে আর কি লাভ? কিন্তু একুশ বছর যে আমার জিজ্ঞাসার বন্ধ। তার সঙ্গে বন্ধ লাগে। যেদিন তার বিবাহের খেতাব বিবাহ নিয়ে, তাই, ফিরে গেলাম সেই ছোট্ট গ্রামে, যেখানে তার জোলা বৈশব গান পাঠিত, তার পুতলাই কৈশোর গান করত। যেখানে সেটো ছাত্রাবাস, যেখানে সে জুয়ে জুয়ে চোখ রাঙা করে অবলার বাড়ী ফিরে বহুনি খেত; সেই বটর তল, যেখানে সে দেখেছে মেছো খেলত, সেই বঁকো অস্তর কোণে পিউলি সাইট যেখানে সে তার কোলাহল কুল কুড়িয়ে মালা গাঁত। সব ভেঁমনি আছে। কেবল সে শিশুত্বের সলটি আর নেই। সন্ধ্যা সব চ'লে গেছে, কোন সময়ের কোনখানে জড়তা কেউ জানে না। সন্ধ্যার কোথার গিরে কে নীড় বেঁকে বুঁকে পাওয়াই যায়। কারো নীড় হঠাৎ এমি মধ্যে তেড়ে গেছে; কিন্তু এসেছে, সিঁধির কোলে শিশুর নেই। কেউ হঠাৎ হিস ছেলেবেলা—সেলে আর গুঁথে লক্ষ্য, কারো হঠাৎ নৃত্য কোণে গোঁধের হলে শব্দ কাটে না। গুপ্ত সব চেষ্টা যে ছোট্ট মেয়েটি তার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াত, আর সমস্ত অসময়ে শুক চাপড় আর বহুনি খেয়ে টোট হুড়িয়ে-কাঁদতে গিরে কাঁদত না, যে একদা ক'র বাঁধনি। যেখানে আর তার চোখের কোণে বৌদ্বন্দ্বের আঁধার ভাঙা, পারে কিশোরীর চকল হাল। চপ্পর বেলা লম্বা বাওয়ার শেষে সে এ বাড়ীতে চ'লে আসে। আমার বছর না কামাল জনতে ভালবাসেন। লীলাকে না চ'লে তাঁর চলেই না। কখনো জড়তা বলেন, দাঁখতো না, শোভা কি লিখেছে?—ব'লে একটা সময়ে কুলে রাখা পোষ্টকার্ডের চিঠি এসে লীলার হাতে যেন। চুট লাইন।

পড়তে গিরে বুকে ক'লে উঠে, কথা বেঁধে যায়। না একটু চেষ্টা দেখে মনে মনে চাপেন, জানেন আমার শোভার সঙ্গে বেশ মানা। লীলা চিঠিখানি কুল ক'রে বাড়ী নিয়ে যায়। একদা খর ব'লে যায় বার পড়ে। চোখের জলে অক্ষতগুলো জাপনা হ'য়ে আসে। মাঝে মাঝে তার না বলেন, বলি ওগো, মেয়ের বয়স কি বাড়ছেনা? বাপ মেয়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেলে। এমন সোনা কেউ চিনলেনা? স্বা স্বা চার জগাথ চাক্তি। বলেন, এইতো মিঠাপুরের, কি বলে, রাম চাটুখোর কাছে স্তো লোক পাঠানোর, যেদি কি হয়। বাটার চোখে তো—ইত্যাদি। লীলার কানে সে কথা যায়। সে শিউরে ওঠে। সেদিন রাতে খুম হ'র না। বাপিল ভিড়ে যায়।

“তারপর এল গ্রীষ্মের ছুটি। বহু বাড়ী ফিরল। সমস্ত গ্রামখানি চকল হ'য়ে উঠল। কিন্তু গ্রামের ছোট্ট আঁধার চকল হ'তে পাওয়া না। বুড়িমার ভাঁড়ারের আঁধার আর কাশী বিহির বাগানের কচি আম এবার নিরুপস্থানে মিঠা বিতে লাগল। মাঝের সঙ্গেও তেমন কথা জবাব না। যার জাগার এতদিন গ্রামের পাখাটি পর্যন্ত আঁধার হ'য়ে উঠেছে, এবার হ'মদেই হেঁটে নৃত্য মেছো, মাটারের সঙ্গে তার ক'য়ে-এল; ভাঙা লাইব্রেরির কোণে ব'লে বেড়বকী অসুস্থতার পড়ল; আর বাড়ী লম্বাটা খরর কোণে মোটা মোটা ছই নিয়েই প'ড়ে রইল।” মা বাবা পেলেন। কিন্তু পরকণ্ঠে মনে মনে হেসে বললেন, ছেলের আমার মাকে নিয়ে আর চলেছে না; এবার একটা বই চাই। একদিন জল খেতে গিরে কপাটা ব'লেও ফেললেন। অস্তায় স্বরে ছেলের আঁধার যুগ লাগ হ'য়ে উঠল। আর নিঃশব্দে যুগ তুলে মাঝের দিকে তাকিয়ে গুপ্ত একবার উল্লেখ হ'লি হাসল। তার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল। ছেলে ‘না’ বলল না বটে, কিন্তু সে হাদি বেঁধে মাও কিজের মধ্যে কোন আঁধার পেলেন না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফুৎ চুপ ক'রে পেলেন। পরদিন আঁধার মাঝের খর জ্বাক পড়ল। গিরে বেঁধে লীলা। কচি সুখখানার উপর একটা কৈশোর-সজ্জার আঁধার ছাড়া। সমস্ত মেছো একটা দুটোখান লম্বাখান দ্বি-জোড়। দুহুর্নের জল

তার বুকখানা ন'ড়ে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে চোখ  
রাঙিয়ে লম্বাভাবে হুঁ একটা কথা বলে চ'লে গেল। লীলার  
মুখে ভাল জবাব জুটল না। চোখ কুলেও চাইতে পারলো  
না। মা বুদী হ'লেন। গ্রামিন পরেই বন্ধু হঠাৎ কোলকাতায়  
চ'লে গেল, এবং মাসিকপত্র প্রবন্ধ লিখে বৃন্দাবনের  
কিশোরী-গ্রেম এবং মনস্যাকলাকে খুব ক'লে গাল দিল।  
এদিকে মা অশেষ ক'রে রইলেন। কিন্তু লীলার বরল  
অপেক্ষা করল না।"

"শান্তিমেধা কুটুম্বের মল যত তিক্ত করতে লাগল,  
তাদের অস্থির দাঁড়িয়ে লীলার মাথাটা ততই বেশি ক'রে  
কুঁড়ে লড়তে লাগল। বরের বৃন্দ বন্ধু দলটাকে বঙ্গালাবা  
দ্বিগ্ন করবার চুপা চেষ্টা ক'রে দৃষ্ট বিফল ক'রে এখন এমন  
করতেন, আপনি রবিবারে কোন বই লড়ছেন? লীলা  
প্রাণপণ চেষ্টা করে 'না' এই ছোট্ট কথাটাও যেন মুখ দিয়ে বা'র  
করতে পারত না। সবাই ভাবত, বরল হ'য়েছে, লজ্জা  
হ'বেই তো। আমি তার বৃন্দা মতো বলে মাথা  
নাড়তাম। কুটুম্বের চ'লে-গেলেই সে ভুটে এ বাড়িতে  
আসত। মা লম্বী বুঝতেন। বীরে বীরে মাথা হাত  
বুলিয়ে নিতেন। বলতেন, তবু কি মা? সে কি আমার  
কথা ঠেলতে পারবে? তারপর শিবলগায়ের দোকানের  
বারাংগের সঙ্গে এখন এক উচ্চ কথা টিকটাক করার  
উপক্রম, তখন মা রীতিমত তার পেয়ে ছেলেকে চিঠি  
লিখলেন। সব কথাই জানালেন। পেরের দিকে জোর  
দিয়ে লিখলেন, লীলাকে তিনিই পূর্ববৎ করেন, এই তাঁর  
শেষকীর্তনের দাব। টিক সময়েই উত্তর এল,—এক  
লীলাই ন'ড়ে পোনাল। ছেলে মাথের অস্থিরতা-রাগে  
না পেয়ে কথা প্রার্থনা জানিয়েছে; আর ল'লার খেয়ে  
লীলাকেও আশীর্বাদ করেছে, সে যেন তার-বুঁচন লগ্নারে  
দিয়ে সুখী হয়। লীলা চিঠি শেষ ক'রে মাথা নীচু ক'রে  
ব'লে বইল। মা বীরে বীরে ডাকলেন, লীলা। জবাব  
দিতে গিয়ে লীলা বুঝতে কুঁড়িয়ে ফেঁদে ফেলল। মা  
তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে অস্ত্র যিনের মত  
আলো বীরে বীরে হাত বুলিয়ে দিলেন কিন্তু একটাও  
লজ্জার কথা বলতে পারলেন না। তবু তার শিখিল

চকু দুটির অশ্রুত রেখাভা দেখে অশ্রুপাশ কাণো চুল  
ভিজিয়ে দিতে লাগল।"

"পরদিন লীলা কাগজ কলম নিয়ে নিজেই চিঠি  
লিখতে বসল। করেকখানা ছিঁড়ল, করেকখানা কাটল।  
কি লিখবে হেবে, লল না। যাও, লেল, তাও লেখা চ'ল  
না। অবশেষে অনেক চোখের কলের ভাপ নিয়ে হাঁকা  
হাঁকা অক্ষরে যেটা হ'রে দাঁড়াল, তাও পারেন চ'ল না।"

"তারপর—আরো বলতে হবে? আচ্ছা শোন—তারপর  
একদিন ছোট্ট গ্রামখানি চিকিত ক'রে ডোহের শানাই  
বাকল। ছেলে মেয়েরা তিক্ত ক'রে কলরব করতে লাগল।  
লীলা কাঠের মত লম্বা বেরের উপক্রম ন'য়ে যেতে লাগল।  
মনে মনে আশা ছিল, এমন কিছু ঘটবে, যাতে লম্বা  
লম্বা হ'য়ে যাবে। হয় তো আশুন লাগবে; হয় তো  
সে এসে বলবে, লীলা, আমি এসেছি; হয় তো বা অস্ত  
কিছু। বেলা গেল। সন্ধ্যা ঘনিজে এল। শান্তি চড়ে  
বর এলেন। শাঁখ বাকল, এতরাটা উলু দিলেন। জালনা-  
তলায় লতপাক খোঁজা শেষ হ'য়ে গেল। বর বাসর ঘরে  
চুকে কাপড়ে ঢুক করলেন। কনে তপি লাগে মুক্তি  
হ'য়ে পড়ল। একজন প্রবীণ হেজের সুবে বললেন, আতা  
সারাদিন উশেলে ক'রে আছে। আর একজন চোখ চুটে  
টেনে বললেন, নাও আমাদের যেন আর খিটে হয় নি।  
আলকালকার মেয়েদের ঐ এক চরু। ফিটু না কাগান।  
চুখু তক্কীরা চুল ক'রে রইল। আর আমি আঁচল চোখ  
মুদলাম।"

কিনারীর একটানা গুপ্ত গুজব ঘনি চ্যং খামড়া  
গেল। লম্বা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, তারপর—  
তারপর? কেহ জবাব দিল না। সেখানায় কেহ কোথাও  
নাই। ভাড়াভাড়ি উত্তিতে দিয়া সেই ছবিটা আবার  
চোখে পড়িল। সেখিতে সেখিতে ছেলেমেয়ে কহুটি কোথায়  
মিলাইয়া গেল। মিলাটির সুবের উপর থেকে একটি  
একটি কহিয়া বসলভলি ভাড়া পড়িতে লাগিল। বীরে বীরে  
জামিরা উঠিল একটি লাজবর কিনারী—আঁ—এ তার  
মুখ! বিছানা ভাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। স্পষ্ট গুলিতে  
পাইলাম, কে যেন হুঁপাইয়া কামিয়েছে। মনে রইল টিক



আমার পানের ঘরেই। সে কাঁ কাগা! বৃক কাউগা  
থাইবে, তু শেব নাই। বেন সে কতদূর—কত বনরের  
সমাবিধ তিতব খোক শুমরিয়া তেলিয়া উঠিতেছে।

তখন হবে বেলা উঠিয়াছে। বলিবার ঘরে একটা  
গাভলভাঙা চোরায়ে বলিয়া কি ভাবিতেছিলাম, জানি  
না। মনটা বেন কেমন ছাছুর চাইয়া পড়িয়াছিল।  
সুখ গুরুত্বা কানিতে কানিতে একটা লাঠিতে ভর করিয়া  
আসিলেন এবং আমাকে একটা নমস্কার করিয়া কি বলিতে  
দিয়া লগ্না ঘরের দিকে চাটিয়া চমকিয়া উঠিলেন,  
আপনার কি অল্প করেছে?

বলিলাম, না।

তিনি লগ্নাঘরটিকে ঘরে বসিলেন, কাল বজ্র কঠকঠেছে।  
এক তো দেখে কিছুই মেলেনা; বর্ষাকাল। তাতে আলোর  
বে ছায়াগ। তা' আভকার এ বেলাটা অস্তিত পরীবের  
বাঁকী চাটু ঘরোঁক—বসি ঘেরি হবে না।

আমি জানাইলাম, সে সময় হইবে না।

সুখ কুণ্ডিত নৈরাশ্রের ঘরে বসিলেন, আপনার হস্ত  
বাক্সকে এ অত্যাশ্রয় করা অধিক্তি—। কিন্তু আমরা  
একবারে পর নই। খুঁজে দেখলে—যাক্ সে সব। আমার  
দাঁ আপনাকে একবার ডেকেছেন। যাক্ করে ঘরি—

একটু বিম্বয়েব মধ্যেই উঠিলাম। মহিলাটি আমার  
জন্তই অপেক্ষা করিয়াছিলেন। চিনিলাম। কিন্তু না  
চিনিলেও মোহ ছিল না। সেই ভর মাঝের দিকে চাটিয়া  
কপকপে ভাবিত হইয়া রহিলাম। সেই কথা কহিল। প্রশ্ন  
করিল, শরীর কেমন আছে, ছেলেমেয়েরা কেমন হ'য়েছে,  
বৌ কেমন আছে—ইত্যাদি। আমি বহুচাণিতের মত 'হা,'  
'না' বলিরা গেলাম। লগ্না অসংলগ্ন ভাবে বলিরা কেলি-  
লাম, "কাল রায়ে তুমি কা'হিলে?" বলিরাই অপ্রস্তুত  
হইলাম। সে কিছুকল বিম্বলের মত চাটিয়া বসিল।  
আজ্ঞে আরে সেট বিপত্তী গুরুত্ব উপরে একটা তুমার  
আভ্যন্তর বকতান চাঙ্গি সর্পিণ কুকনে আঁকিয়া গাটিয়া  
উঠিল। কোটরপত চকুতটী কোলা হইতে একগল আস্তন  
জড়ো করিয়া ফেলিল। অজ্ঞাতগারে এক মনমাইয়া গইলাম।  
একটি উলল ছেলে মা খলিরা ছুটিয়া আনিয়াই লগ্না সেই  
দিকে চাটিয়া চোচাইয়া উঠিল।

পরদিন যখন বাসার ফিরিলাম, শরীর প্রাণিতম অগ্রস্ত।  
মনটাও কেমন অচিন্তিত হইয়াই ছিল। গৃহিণী আনিতেই  
জোর করিয়া একটু সমীচ ভাবে আনিবার জন্ত বলিলাম,  
"কি বাগিয়ার? পরণ্ড মাছের কোলে সিঁচি টাঙি দিয়েছিলে  
নাঁকি?" গৃহিণী ব্যতভাবে কহিলেন, "তোমার এত ঘেরি  
হ'ল যে? হা জাপ, আমি এতদুনি বেগোছি। মহিলা-  
সমিতির মিচি হয়েছে। আসতে হাত হবে।"

বলিলাম, "বাচ্চা।"



# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ঐনরেজুনাথ ভট্টাচার্য

যে মহাপুরুষের পুত্র-পুত্রের নামবা তরুী হয়েছি, আমারে মধ্যে অনেকটাই তাঁর নাম চেনেছি—তিনি বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা। কিন্তু তদু-এই ভাবে তাঁকে জানলে তাঁর প্রতি অস্বাভাবিক হয়। তাঁর জীবনের নিজস্ব বিশিষ্টতাই তাঁকে আমাদের পুত্রিত্ব দিব কাগজক ক'রে বাস্তবায়ন থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর প্রতি বশ্যবাস্তা সন্ধান আমাদের করিনি। ৮-দেবেন্দ্রনাথকে আমাদের পত্রিকাতে বস্তুত্ব জানা পরকার ততটুকু আমরা জানিনি। তাঁর চরিত্র-ইতিহাস আমাদের বৈমলিন জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁর জীবনের বিশিষ্ট দ্বারা বৃত্তে চোঁ করব।

ভগবানের চরণে সমস্ত মন প্রাণ অর্পণ ক'রে তিনি যে ভাবে নির্জন এবং শাস্ত্রিময় জীবন গাশন করেছিলেন, তা থেকে আমরা যদি তাঁকে কেবল একজন সন্তোষ সাধক বলে ধ'রে নেই তা হ'লে যোগ হয় তাঁকে লম্বা ভাবে বলা হয় না। তদু-চাইতে মর্ষি কল্যাণী তাঁকে 'ভাগ্যে' ক'রে বুঝতে হিঁতে পারে। বেদের মত গানের কাছে এসে বসে বিরহিল, গায় সাধনার বগে মরকে বেব'তে পেরেছিলেন তাঁদের আমরা ক'বি বলি। বেবেজুনাথ ঠিক তাঁদের মত একজন মহাপুরুষ। গায় জীবনের সাধনার দ্বারা তিনি তবুও হয়েছিলেন,—ঠিক বেদের কবির মতই আধ্যাত্মিক উন্নতির উত্তর দিয়ে নানা ঠককে বেব'তে পেরেছিলেন। সে তবু কেবল দর্শ-পত নর, সমাধ এবং আত্মহত্যার অন্তর্গত।

হিমোত্তর বার বেবে নবদ্বীপ আমরন করেছিলেন,—দর্শ-পথেও ত্রাণ পণিককে লতা পণের দৃষ্টান হিঁতেছিলেন—কল্যাণের অন্ধ কল্যাণ হ'তে বেব'কে মুক্তি-পথে আনোকে টেনে এনেছিলেন,—সুত লম্বা-ক'মেই একটা প্রাণের লম্বা জাণিবে তুলেছিলেন—এক কল্যাণ, লম্বা লম্বা এবং

বেদের বিরাট কল্যাণ সাগর ক'বেছিলেন; দেবেন্দ্রনাথ চতুর্থ মতটা শরেন নি। বিবেকানন্দের মত একটা প্রচুর পণিক নিঃ। একটা বিশ্ব-প্রাণী কল্যাণ-পেদগা নিঃ হয় তা তিনি জগাননি,—টাব কল্যাণের তাঁদের চাইতে বাটো ছিল, কিন্তু এটা অতিবহু লতা কথা যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাঁদের কাণের চাইতে কম ছিল না। লব-ব্রহ্মে একান্ত বিশ্বাস, সমস্ত বিশ্বকে ভগবানের পূর্ণ অভিধাত্মিকপে ধারণা ক'র। পরমাধার লক্ষ্যে নিবিড়তম যোগ সাধনা—এই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টায় তিনি প্রাচ্য এবং পান্ড্যতায় তরু-জালের ভাণ্ডারকে আলোড়িত ক'রে, ক'রেমিষ অমু-মুখ্য—বাক্য-সেধ মত সাহচল্য আচরণ করেছিলেন। ভগবৎ-ভর মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে তিনি কোথাও গিয়েন নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দর্শকে এই উপায়েচোঁ: মহাপুরুষ সমভাবে বৃত্তে চোঁ করেছিলেন। জুকাবর্ষ, কবীর এবং মলিক-পদী লম্বা তাঁর ভগবৎ-প্রেমকে তজ্জি-গণের মধুর সান্নিধ্যে তপাল ক'রে তুলেছিল; দৌলগাঁ-উপালনার একটি কল্যাণী কিয় ভাবেদেই প্রেমকে প্রাণবন্ত করে দিঁতেছিল। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর ভগবানের বহুত উপলব্ধি করতে, প্রকৃতির অমৃত সৌন্দর্য্য জাণির মধ্যে প্রবৃত্ত পরভককে বেব'তে ঠনি কতট না প্রাণ প্রেখেছেন। হিমালয়ের শান্ত পঙ্খায় পরিবেষ্টনের মধ্যে বাসিনিকেতনের নির্জন তপোবনে,—প্রকৃতির মৌল্য-নিকেতনে তাঁর জীবনের অনেক দিন তিনি কাটিয়েছিলেন ভগবানকে মনে প্রাণে অহুত্ব কল্যাণ কর। তাঁর সৌন্দর্য-উপালনার বাট্যিক প্রেরণা পুস্তকভাণ্ডার মধ্যে লুজমিত হয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে অজ সমস্ত ভগবৎ-উপার দিয়ে অমৃত-ভাণ্ডার প্রবাহিত ক'রে দিঁতেছেন তাতে ক'রে লম্বা বিশ্ববাসা অভিভূত লক্ষ্যে, বিশ্ব-প্রেম বিশ্ব-মানবতায় বাটী নিয়ে তিনি



যে আজ পূর্ণ এবং শান্তিমেয় যথো একটী বিশদ-পত্র পৌঁছে  
বিশেষতঃ, তার অনেক কিছুই ঐ ভগবৎ-প্রমিত কৃষ্ণিকল্প  
শিতার ভিত্তি।

সমাজ-সামাজিক কালে আমরা দেখেছিলাম যে বালক  
বিত্তে পারি না। অল্প কথায় লড়াই যে তাঁর বন্ধুত্বের  
কর্ম-জীবনের চেয়ে বেশি ব্যাপক, বেশি বিকশিত। কিন্তু  
টাকাট্টিকি যে, রামমোহনের মত তিনিও সমাজ-সামাজিক  
অবস্থা প্রয়োজনীয়, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। যা কিছু  
কৃষ্ণ-স্বভাবের সত্যকে প্রকাশ করেছিল তাঁদের মূর্খ ক'রে দিয়ে  
যে লড়াই এবং কল্যাণের তাই তিনি রাখতে চেয়েছিলেন।  
তবে পুরাতন সমাজকে আগাগোড়া বদলে ফেলা, পুরাতনকে  
ভেঙে ফেলা একবারে মৃতদের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁর উদ্দেশ্য  
ছিল না। তিনি সমাজের ভিতরে থেকেই রাষ্ট্র-সমাজকে  
পাঠে তুলতে চান, কিন্তু সমাজ ক'রে রাষ্ট্রসমাজকে বিচ্ছিন্ন  
করা চলে না—কারণ তাঁতে সামাজিক এবং জাতীয় কল্যাণ  
সাধিত হওয়া, এটা তিনি বেশ ক'রে বুকেছিলেন। পান্ডাভা  
সব কিছুকেই যে অগ্রসর করতে হবে সেটা তিনি ভাল  
মনে করেন নি। "নিজের যা আছে তাইই উপর প্রতিষ্ঠিত  
ক'রে সমাজ, ধর্ম এবং জাতিকে পাঠে তুলতে হবে, প্রয়োজন  
মত অন্তরে কাছ থেকে ছাড় পেতে নিজেই আপত্তি নেই—  
হেঁচিল তাঁর কর্মজীবনের মূল মন্ত্র। এখানে তাঁর বৃহৎ-  
প্রাণতায় পরিচয় পাই।

তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল, ব্যক্তিগত বাণীবাদ  
সম্মান রক্ষা। নিজে যা ভাল বুঝে তাই সবাইকে মেনে নিতে  
হবে এটা তাঁর জীবনে কখনও দেখতে পাওয়া যায় না।  
পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্ম জীবনে তিনি পূর্ণাঙ্গর এই  
নীতি অগ্রসর করেছিলেন। সমস্ত জীবনকে একটি বিশিষ্ট  
নিয়ন্ত্রিত ভিতর দিয়ে চালিয়ে নড়াচড়া ছিল তাঁর লক্ষ্য; বিধিগত  
তিনি নিজে কখনও করেন নি অপরকেও করতে দিতেন না।  
ফোন কাছ করাবার পূর্বে তিনি বহুদিন পণ্ডিত ভাবতেন।  
এই মত অনেক সময় তাঁকে নির্জন বাদ করতে হত।  
ভগবানের সঙ্গে যোগ যোগ, ইচ্ছা জীবকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি  
নিরুৎসাহিত্য তথা কথোপকথন—এই ভাবটি নিয়ে তিনি জীবনের  
অন্তেও সমস্তার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন।

রাষ্ট্র সমাজ তাঁর কাছে অনেক ভাবে ছড়ি। রামমোহন  
যার যোগ্য পতন ক'রে গিয়েছিলেন তাঁকে প্রাণময় ক'রে  
ভোলায় তাঁর পড়েছিল মনুষ্য বৈশিষ্ট্যের উপর।  
রামমোহন সত্যের সন্ধান ব'লে বিবেচনায় : লোক মনে সেই  
সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈশিষ্ট্যবোধ। রাষ্ট্র বর্ষ এবং  
রাষ্ট্র সমাজ মাঝ-প্রাণের করেছিল তাঁরই চেষ্টার।

যার তাঁর কাছে ছড়ি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সেট  
আজ সমাজিত যোগ্য তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনার ফল দিয়ে  
তাঁদের ভাষার সম্পদ ক'রে গেছেন।



# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ত্রিপুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ধর্মজীবনের গৃহ বহুতল সম্বন্ধে বলতে চেষ্টা করা ভারই পড়ে। যার কাছে সেট রহস্য পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনে, সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল, নিজ নিজ কৃত্ত্ব স্বর্গ নিয়ে সনস্কোপ করে চটাত বসন্তের একদিন গভীরভাবে গাড়িয়ে কোন জীবির বা মস্ত বাক্তির জীবনী আলোচনা করতে চেষ্টা করার বিশেষ কোন কল হর না। তাই অনেক কৃষ্টি ও বিদ্যার সহিত মাল আপনাদের মায়নে গাড়িয়েছি। তবে এর আর একটা দিকও আছে। দাবক না হ'লে যে সাধকের কথা বলার অধিকার নেই তা নয়। যদি প্রকৃত প্রজ্ঞা ও অহংস্বপ্ন আমার ভেতরে থাকে সেই সাধনার দিকে, তবে তা বৃত্তে তা বলতে চেষ্টা করবার অধিকার আমার আছে। আর প্রোত্যার দিক থেকেও তাই। যদি প্রজ্ঞাবান হ'লে, প্রকৃত অহংস্বপ্ন মনে নিয়ে সেই মহাপুরুষের পুতি-পুজা করতে ও তাঁকে আমাদের দ্বন্দ্বের পুস্পাঞ্জলি বিতে এসে থাকি, তবে নিশ্চয়ই এখানে আজ আগার অধিকার আমাদের আছে। নতুবা এখানে এসে শুধু আত্ম-ধ্বংসনা করেছি মাত্র।

জীবনের প্রথম উদ্যমে আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব হুটিয়ে তোলাবার মজ্ঞ অস্ত্রের এই প্রজ্ঞা ও অহংস্বপ্নই হচ্ছে আমাদের প্রধান উপাদান ও সাহায্য। আমাদের মধ্যে সেই হুঁসাগা যার এই প্রজ্ঞা নেই, যে হৃৎক "অকালপক" হ'লে চারিদিকে প্রণোদোষগা কিছুই পায় না, লবই বার কাছে পুরাতন সে বাস্তবিকই কপার পাত্র। নতুন নতুন সৌন্দর্য্য বতই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে প্রজ্ঞাবান করে তোলে, ততই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে এগোতে থাকি। এ হৃৎক আব্রাহামা কিছু উঠো দিকে ব'লে চলেছে এবং প্রজ্ঞা তিনিবটাকে "সেবেলে" ব'লে "কোপটাপা" করে রেখেছে। নিজেই ক্রুর ক্রুর বিদ্য ও অধিকার নিয়ে আমরা এখন এত বাস্তব যে বৃহত্তর জগতের স্মরণ ও মস্ত

তত্ত্বগুলির বহর আমাদের "বার্ণ-প্রাচীর" কেন করে আগতে পায় না। আমরা সকলেই এ হৃৎক স্ব স্ব প্রদান ও প্রত্যেকেই এক একটা জীবনের ভাগ্যের স্বত্ব; মাপ্য নত করে প্রজ্ঞাতের শিক্ষা গ্রহণ করাটা মেচাবে বাপ মা জোর করে ব'লে স্থল কলেজে না পাঠালে—একটা penance বা দণ্ড ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ হচ্ছে অজানতার ও দুর্ভতার ভরী! যা কিছু স্মরণ, যা কিছু মন ও উদার তার প্রতি তক্তি ও আকর্ষণই প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের ভিত্তি। যদি মানুষ তক্তিবিহীন হয় এবং উচ্চ হ'লে উচ্চতর সত্ত্বের অহংস্বপ্নে না ছুটে কেবল নিজের জীবনের ক্ষুদ্র পত্তীর ভিতর থেকে নিজের জীবনের চমৎকর্ত নিজেই বাস্তব থাকে, তবে তার মনুষ্যত্ব এককল বিকলেই থাকে।

দ্বিতীয় বদন মার আগের "আর চান, আর" চান-বুলিতে হুদ হ'লে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রথম দান গ্রহণ করে, তখন তার মনে কি তাই হয় অবশ্র আমরা বিরোজন করে বলতে পায় না। তবে সে ভাবটা যে আনন্দের তা বেশ বুকি। আমরা "অসুভের পুত্র"—এই আনন্দ নিজেই আমরা এসেছি—সেটা আমাদের "birth right," অম্বগত অধিকার। এই আনন্দের অধিকারী আমরা সকলেই। এবং বত দিন তক্তি অহংস্বপ্ন ও প্রজ্ঞা আমাদের চিত্তগতি-গলিকে লাগিয়ে রাখে এবং জ্ঞানের ও গভীর দিকে উদ্বুধ করে, তত দিন এই আনন্দের অধিকার আমাদের থাকে। কিন্তু আমরা জীবনপথে বত অগ্রসর হ'লে থাকি ততই আমাদের প্রজ্ঞা, তক্তি পেছনে ফেলে লাগি, এবং এই আনন্দের আশ্রয় ক্রমে হারায়ে। যারা তগবানের অন্তিম কল্যাণ ও অশীম্যাবে নিজ নিজ অহুত্বিতকে প্রজ্ঞা ও তক্তিরিগলিকনে সজীব রেখে এই আনন্দ চারিদিক হ'তে গ্রহণ করতে পারেন তাঁরাই ধন্য, তাঁরাই অপসাগরে চুব দিয়ে



“মতঙ্গ বসন্তের” লক্ষ্যন পান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ ভূবরিত অতীত। বিদ্যার মুগ্ধ, নব্যসাধর্মে ব’লে, চাঁদের আলোতে ও বায়ুর সর্গরঞ্জনিতো যখন মধুর হরিনাম ভেলে এসে তাঁর কানে পড়লো, তখন পার্থিব স্বার্থের উপর একটা বিচ্ছিন্নতার তাঁর মন ভ’রে দেল, আর অগ্নীম সূর্য্যাসন্নে প্রাণ উজ্জ্বলিত চ’রে উঠলো। এই আনন্দই তাঁর জীবনকে রূপায় মধুর ক’রে অগ্নীমের মতো ভূমিরে রেখেছিল। মহর্ষি নিজেই বলেছেন, “এই আনন্দ তর্ক ও দৃষ্টিভাষা কেউ পাঠতে পারে না, সেই আনন্দ চালিবার জন্য তাঁর অমলর যোগেন।” আমাদের মতো অধিকাংশ সেই অবশ্য সেই সুযোগ সব সময় হারায়। এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই যার আমরা ঠিক ভাবে এই জীবনকে বৃত্তে ও গ্রন্থে করতে পারি, আমাদের এই অবশ্য আসে এবং আনন্দের স্বাদ দিয়ে যায়, তাই’লে মনে হয় “স্বকর ভব, স্বকর সব, স্বকর পণ্ড-পাখী”। আমাদের দৈনিক জীবনে দৃষ্টি, চিত্র, গ্রন্থ, ভাবনা, নদ, নদী, বন, ফুলে যে সৌন্দর্য্য দেখতে পাই, তাও মতো যে আনন্দের লক্ষ্যন আছে তাই খোঁজ কি আমরা রাখি? মহর্ষি প্রকৃতিতে ‘Divine Immanence’ অর্থাৎ ভগবানকে ওজস্বীভূত ভাবে জড়িত সব সময় অগ্রভব করতেন। বস্তুর পর বস্তু চ’লে যেতো এমি-কমি Wordsworth-এর জায় তিনি তাঁর বাণেশ্বর দৃষ্টি অগ্নীমের সৌন্দর্য্যভাষিতে চুম্বিরে রাখতেন, এবং নিজেকে হাথিরে ফেলাতেন। আবার পারিবারিক জীবনের কঠোর কঠোর মতো যে নিগূঢ় আনন্দ রয়েছে, তাই কি আমরা স্বাধাধ-ভাবে অগ্রভব করতে সক্ষম হই? সংসারের বন্ধন কঠোর পথে নিজ কর্তব্যবৃত্তিকে ওসববিষয় দ্বারা চালিত ক’রে নিতে পারলে যে কত লাভ কত আনন্দ হয় তাঁর দৃষ্টে মহর্ষির জীবনে আমরা দেখতে পাই।

জিনি লসার ভাষী হ’য়ে ‘ভূমায়’ ‘অনন্তের’ লক্ষ্যনে ফোটেন নি। লসার যে সেই অনন্তেরই সৌন্দর্য্য এই লতা, শুষ্ক কবির বা বার্নিকের ভাষার নয়, নিজ বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। অগ্নীম ও সঙ্গীমের মতো থাকিবে তিনি লীলামের অঙ্গুষ্ঠ লীলা দেখতেন। পিটার

ভের, বন্ধু বাল্যকাল তিনি চ’রতে বিনিমে গেলেন। তাঁর সাংসারিক বা সাংসারিক জীবনে কোথাও এমন ক’ক নেই যা তাঁর তর্ক ও প্রেমিক প্রাণ পরিপূর্ণ ক’রে না দিয়েছে। কঠোর শাসক, অথচ কোমলতার পূর্ণ তাঁর মন। তাঁর শাসন-নিষ্ঠার প্রভাব তাঁর পুত্র কঠোর উপর ছিঁপ প্রসার। এই নিম্নে পাণ্ডিত সাংসারিক জীবন,— কিন্তু ইচ্ছা: মাত্র সব যাব ভেঙ্গে অনন্তের তাকে পক্ষে কাছারে, যাতে মাঠে অবাধ গতিতে পু’র বেঁকতো! যেন তিনি একজন তববুর, যেন সংসারের কোন বন্ধনই তাকে জড়ায়নি, যেন দুল্ল সাহায্যী অনন্ত সত্তার জ্ঞানে উজ্জ্বল, অগ্নীম সৌন্দর্য্যের অধিকারী—যে অস্বাভাবিক ভাবে, ‘তুমি আছ, আর আমি আছি; ‘Thou art’ and ‘I am.’

এতদ অঙ্গুষ্ঠ লসার ও অজুত মিলন—ভাষীর ও ভাষীর, সাংসারিক ও লসার জীবনে (যনক কবি ছাড়া) আর বড় দেখা যায় না। মহর্ষির জীবনের এই দিকটাই অক আবার বিবের ক’রে মনে হচ্ছে। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি কিছুই বলবো না। তাঁর প্রভাবে হিন্দু-বর্ণ কতখানি লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ত্রাশ বর্ণের চিন্তি কতটা দৃষ্টান্ত হয়েছিল, তিনি বাঙ্গালার নবজাগরণ (Renaissance) বা বাঙ্গালার সাহিত্য ও culture-কে কতখানি উজ্জিতর পথে নিয়ে গিয়েছিলেন এমত গ্রন্থ আজ আমরা মনে উদিত হচ্ছে না; আমরা মনে হচ্ছে শুধু তাঁর মহান্ তুল জীবনের উজ্জ্বল বিকৃতি।

এই মহান্ জীবন কাবওক রবীন্দ্রনাথকে কতখানি উজ্জ্বল ও প্রভাবান্বিত করেছে তা আমরা সর্বশেষে জানি। দেবেন্দ্রনাথের লক্ষিত পূণ্য ও সাধনা আত্মসংযমের দুপপ্রবর্তক মহাপুরুষ রবীন্দ্র নাথের উপর বর্ষিত হয়েছিল— তাই তাঁর গানে আর ভগত সুবর্ষিত, জাতিনির্দেশে নয়-নাথী পুত্র, আর তাই তাঁর ভাষা ও ছন্দ আর অগ্নীমের লক্ষীতে ও সৌন্দর্য্যজটায় তরপূর।

## বালির কথা।

### শ্রীমন্তরেন্দ্রনাথ কর

বালি (ডেনমার্ক) মণ্ডক

৪৩১৮।

১৩ই আগষ্ট আমরা পেনাঙ, হাভি, তার পর দিন সকালে সুবাজার বন্দর বলওয়ানসেনোতে পৌছাই। সেখানে Dr. Roelgers ও কয়েকজন ভারতবাসী উপস্থিত থেকে গুরুদেহকে অভ্যর্থনা করেন। Dr. Roelgers একজন সিংহলী ক্রীড়ান, খুব ধনী। ম্যাসেজে ও অস্ত্রের তাঁর টিমের খনি আছে; একটা খনির মুনকা মাগে চার মজ্জা উপায় পান। এখানে খনির সন্ধানে এসেছেন।

অন্ত জাহাজে মালপত্র তুলে দিয়ে আমরা বেজান সহগ অভিযানে রওনা হ'লুম। চক্কিষ মাইল দূরে পহর, সেখানে লব চেরে বড় এক হোটেলে আমাদের কয়েক ঘন্টা বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। সমুদ্রে চোকার আগে প্রায় ৭ ঘণ্টা ভারতবাসী বায়তাক দলযোগে গুরুদেহের পুরোণমন করতে লাগলেন। আমাদের দেশে এটা চোখে পড়ে না, কিন্তু এখানে বড় চোখে পড়ছিল, আর গুলনজানের খুব অভাব ব'লে মনে হচ্ছিল। বাই হোক, হোটেলে পৌছে শানাইয়ের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। সেখানে Royal Dining Room এ খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই বিখ্যাত মধ্যাহ্ন ভোজন, যাকে হলান্ডীয়রা Hyslaaffin বলেন, প্রথম খাওয়া গেল। পরিবেশন বন্দন করতে আসে, সে একটা রীতিমত procession। প্রায় বিশ জন ক্যান্ডিনী বিচিত্র শোষাকে সার বেঁচে ত্রয়ালস্তার নিয়ে গাড়াল। মান্যরকম হাস, মাছ, তরিতরকারী; তাই খাবার ভজ্ঞ এত আয়োজন দেখে খাওয়াটা একটা বিভ্রম ব'লে মনে হচ্ছিল। এত রকম খিঁচি তরকারী, শেঁকটা আর কুরর না। প্রথম সেবার পালা, তারপর দ্বিতীয় খেতে আহার। সবগুলোই মজিকার রংগা তরকারী; কেবল মিষ্টি কড়া নয়, কালের পরিমাণ বেশ বেশী; আমাদের অনেককেই হার মানতে হয়। এত খাওয়া

পাখার পর বিছানা অশ্রয় না ক'রে উপর মেই, জীহ ডাচরা সকালে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অফিস ও মোকান-বারি করে, মধ্যাহ্নে এই গুরুপাক আহারের পর ঘন্টা গুই খুঁমাং, তারপর আবার ৪টা থেকে ৭টা পর্যন্ত অফিসারি করে। এই ছাড়া বেলের আবহাওয়ায় ক'রকার ক'রে নিচ্ছে, আমাদের প্রতুবের মত নয়। বেশভূষার বেশ তিলে ঢাণা, বাজিতে বাওয়া ছাড়া প্রায় সব সময়েই রাত-কাপড়ে থাকে।

বৈকালে ৬টা থেকে আহার করতে বেরুনে গেল। ৪টা৩ জাহাজ ছাড়ল; জাহাজটা খুব বড়, অনেক ঘাটী, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গুরুদেহের তাক্কা নিল না, আমাদেরও অর্ধেক তাক্কার নিয়ে গেল। জাহাজের ডিনিন এক রকম ক'রে কেটে গেল। দিল্লীপুরে ভিড়ল জাহাজ সকাল বেলা। আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর গুণানে গেলাম, গুরুদেহও সঙ্গে গেলেন, খুব আশা ক'রে যে এতদিনে নিশ্চয়ই চিঠি এসেছে, কিন্তু হতাশ হ'রে ফিরতে হ'ল। পথে গুরুদেহ কিছু বই কিনলেন পড়বার জন্য। আমরা কয়েকটা প্রাচীনকীর্তি মিনেখল কিনে লাহোরে ফিরলাম।

পাড়ার বিকে আহার ছাড়ল। এই পথে অনেকগুলো ছোট ছোট দীপ পড়ে। খুঁর খুঁর জাহাজ চলল। ডান দিকে সুমাত্রা দেখা গেল। রেলের খার থেকেই রাসা বন, বতসুর চোখে পড়ে কেবলি বন, বনবাস কিছুই নেই। মাঝে মাঝে ব'লে একটা দীপের কাছে ঘন্টা দুই জাহাজ থামল ঘাটী তুলে নিতে। এখানে নাকি কয়েকটা টিমের খনি আছে। মোটর বোট ক'রে সব ঘাটীরা এল। সমুদ্রের এই অংশটা হাফ-পল্ল, কিন্তু অনেক চোটা ক'রেও একটা চোখে পড়ল না। শুধুমাত্র কিছুদিন আগে একমল করাণী খিচেরটার পাটী বাটেটিয়াতে বাজিল, জাহাজে খুব নাচ গান হচ্ছিল, কাপ্তানও তাতে যেতে ছিলেন, ইতিমধ্যে পাভাড়ে





শাক্সা গেলো ভাড়াভাড়া ভূবে যায়। যারা নৌকা ক'রে  
তারের দিকে গিয়েছিল তাদের সকলকে হাকরে ধরে, কেবল  
একজন ছাড়া।

আমরা সকলে বাটেভিয়ার পৌছলুম। ভাড়াভাড়া  
অনেক ভাড়াভাড়া, চীনা ও ডাচ উপস্থিত ছিলেন। ভাড়াভাড়া  
পৌছতেই বিভিন্ন ধল এসে, লম্বা করা পর গুরুদেবকে  
হোটেলের দিকে গেল। বরের মত আমাদের দেশে যেমন  
মূলপাতা দিয়ে মোটর লাগায়, সেই রকম ক'রে একথানা  
মোটর লাগিয়ে এনেছিল; গুরুদেব তাকে উঠলেন না, কিন্তু  
সেখানে পিছনে পিছনে হোটেল পর্যন্ত গিয়েছিল। বাকেতে  
(Mr. Bake) আর আমাদের মালপত্র খানাদ ক'রে  
হোটেলের bus-এ তুলে দিয়ে বাত্রে মাইল দুখতী সড়ক  
অতিক্রম করে যায়। কয়েকগুলো সবই প্রায় এক  
চেহারা—এমনকি মাগেতে সড়কগুলো ছোট ছোট, কিন্তু  
চেহারাগুলো সব এক ছিল, ভাড়াভাড়া কোনও বিশেষ ছিল  
না। পেনাও ও সিঙ্গাপুর ছাড়া অন্য সড়কগুলো একই  
সড়ক, কেবল নাম বদলায়। বাটেভিয়ার প্রথম চোখে শেখ  
রাভার মধ্যে বিধে কেন্দ্র, আর তাই বেরে সাধারণ লোকের  
জীবনযাত্রা চলেছে। বেশ ভাল লাগল। ভাড়াভাড়া প্রথম ধন  
সড়ক পত্তন করেছিল অনাস্থপত্তন; তাদের মনে হয়েছিল  
কেন্দ্র না থাকলে বদলায় কেন্দ্র ক'রে করা যাবে, তাই  
প্রথমেই কেন্দ্র করেছিল। ভাড়াভাড়া সড়ক এমন  
যাতে বরফ আর কচে না।

সব চেয়ে বড় হোটেলই আমাদের স্থান টিক ছিল।  
প্রত্যেকের আলাদা ঘর, bath room ইত্যাদি, বেশ আনন্দের  
কাহা, তবে আমরা যেদিন পৌছলুম, সেদিন রবিবার, লোক-  
জন নেই, সকাল থেকে ব্যাংক্‌ চলে, অস্থির ক'রে কুলে-  
ছিল; তবে এখানে তিন দিন কাটাতে পর আমরা বাসির  
অতিক্রম করে যাব সেইটে ছিল বাচক।

প্রথম দিন সন্ধ্যা বেলা Kunuking Societyর সভার  
গুরুদেবকে তাঁদের সভাস্থলে অভ্যর্থনা করেন। আর  
মূলযোগের পর ছোট ছোট কয়েকটি লম্বা হয়। এখানে  
বিভিন্ন লম্বাঘরের উচ্চ কথাকাটা ও পণ্ডিতমূল উপস্থিত  
ছিলেন। পরদিন ভাড়াভাড়া এক অভিনয় দেখে, এবং

যাত্রা British Consul ভেদে দেখে। British Consul  
লোকটিকে বেশ ভাল লাগল, জাতির বিশ্বাস নেই,  
গুরুদেবের প্রতি অগাধ ভক্তি, এমন কি সময়ে সময়ে  
একটু বেনী বলে মনে হচ্ছিল। প্রতিদিন তিনি হোটেল  
এলে খবর নিতেন। আমরা মাঝে মাঝে যে সময়টুকু  
পেলাম একবার চকর দিয়ে আসলাম। তিনবার ভাড়াভাড়া  
এত সময় যেত যে লোক লাগায় বড় মুক্তি প'ত,  
ভাড়াভাড়া বাসিরে যাবার ব্যবস্থা করা, জিনিষপত্র কেনা-  
কাটা, ব্যাংক্‌ যাওয়া, টেলিগ্রাম করা—সেখার খুব অল্পই  
অবদার গিয়েছিল। এখানকার মিউজিয়ামটি খুব ভাল,  
কিন্তু কটা স্তরের বেনী সেখার স্থানীয় বসি।

জিনিষপত্র এই এক মাসে এতবার খোলা যাবে অল্প  
হয়েছে ভাবলে ভয় করে, কিন্তু উপায় নেই। জিনিষপত্র  
অস্থির গাছিরে তৃতীয় দিনে লোকের পর আসে; ভাড়াভাড়া  
যাত্রার রতনা গুলি। Mrs. Bake আমাদের সঙ্গে  
ভেঁকেছেন, তা ছাড়া গুরুদেবের তরফ থেকে একজন ডাচ  
ভ্রমলোক আমাদের সঙ্গে যাবেন মোতাযীর কান করাযার  
মত। তিনি হুয়াংহাংতে উঠবেন, তাহলার বাসিতে Dr.  
Kuperburg আছেন, সব বন্দোবস্ত করবেন, তিনিও কান  
সঙ্গে থাকবেন। কয়েকই আমাদের দলটি মোতাযীর কান  
হ'ল না—মোট কাট গুন; তাদের লটব'র নিয়ে বাসির মত  
ভাড়াভাড়া পনের দিন মৌজামৌজি করা লম্বা ব্যাপার নয়।

ভাড়াভাড়া ছোট, বাজীর লম্বা বখেটে। লোক খোলা  
ভাড়াভাড়া ছাড়া।

পরদিন সকাল বেলা প্রাসাদে পৌছলুম। লম্বা দিন  
ভাড়াভাড়াটার লম্বা ক'রে আবার রতনা হ'রে পরদিন  
সকালে হুয়াংহাংতে পৌছন গেল। হুয়াংহাং ভাড়াভাড়া  
এল গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করলেন ও হুয়াংহাং ভাড়াভাড়া  
ভক্ত নিয়ে গেলেন। আমি আর লম্বা গুলি। সকলে  
বৈকালে কিলেন। আবার ভাড়াভাড়া ছেড়ে পরদিন  
সকালে বাসি পৌছলুম। মাক লম্বা ভাড়াভাড়া লম্বা,  
নৌকাতে জিনিষপত্র বোঝাই বিধে আমরা জাহাজ দিকে  
চললাম। Dr. Kuperburg এসেছিলেন, তিনি আমাদের  
সব বন্দোবস্ত তার নিজেছেন। লোকটি ভাড়াভাড়া

দিয়ে, কিসে আমাদের সুবিধা ও স্বাধীনতা হবে তাঁর  
দেখিকে সব সময়ই নুষ্ঠি আছে, তবে হ'চারটা ইংরাজি  
কথা ছাড়া কথা বলতে পারেন না—ভাভেই বিচড়ে মিছে  
তিনিও বোঝান, আমরাও বোঝাই। অপর ডক্টর  
Dr. Drows, তিনি একজন কথী, খুব কব কব, ভাভেই  
সব খবর জানেন, সংস্কৃতও জানেন।

বাণির বন্ধর মধ্যে বৃন্দালাভ। এটা এখনও ঠিকমত  
বন্ধর হ'রে গুঠনি, তাই তীরটা বাতাবিক অবস্থা আছে।  
আজ বড় বড় পোডাউন ফ্রেন্ড ইত্যাদি দিয়ে ছাপ দেবনি।  
প্রথম Custom House (একখানি ছোট চালাঘর)  
মালপত্র কমা করা গেল। ইতিমধ্যে রামকুমারী কতিমা, ইনি  
মোটর গাড়ীর মালিক, তাঁর সঙ্গে কল্যাণী ঠিক ক'রে  
তিনখানা গাড়ীতে আমাদের জিনিষপত্র ও আমরা বোকাই  
কনুম। বন্ধর থেকে মাইল বানেক দূরে বাণির আধুনিক  
রামধানী স্থগায়। সব ভাভেগার যেমন আধুনিক কালের  
ছাপ পড়েছে, এখানকার গাড়ী ঘর গাভা ঘাটে ছোট  
আকারে বর্তমান দস্তাভা ছাপ মেরে দিয়েছে। সৌভাগ্য-  
বশতঃ এখানে আমাদের থাকতে হবে না তাই বাচগা,  
তা না হ'লে এত কলহের পর সব মাটি হ'রে যেত।

আমাদের ঘাটা মুক হ'ল। এ বীণটা পাঠাড়ে, মোতা  
গাভা নেই, কখন উঠে কখন নামচে। পাঠাড়ের গা  
কেটে থাক থাক পত্রক্ষেত, ঘন সবুজ মাছপালা, অসংখ্য  
সরসার বীণটা ভাভি মনোহর। গ্রামগুলো গাভার চ'ধারে,  
প্রত্যেক বাড়ীর সামনে একটা ক'রে গ্রোবলার—গ্রাউ  
মোটা চোখে পড়বার মত নানা রকম গছন ও কাচকাচের  
সুশোভিত, গাভা থেকে বাড়ীকে ছোট পাঁচিল দিয়ে  
আগায়া করা, বাড়ীগুলি বাঁশের পোলা দিয়ে বা বড় দিয়ে  
ছাওয়া। কাঁঠের খুঁটির উপর বা পাথরের বেড়ীর উপর এক  
একটি ছোট ছোট ঘর, ঘানিকট গ্রাউপ, আর আর ধারে  
ছোট ছোট দেবমন্দির ও বৃত্তের আবাসস্থান। সবই  
ছোট, চোখটা চারিদিক ঘুরে আসতে পারে; সম্পূর্ণ  
দেখতে পার ব'লে একটা দেখার আনন্দ পাওয়া যায়।

আমাদের সন্তোষান মতে বাড়িগুলি ব'লে একটা জায়গায়।  
সেখানকার গাভা কি একটা অল্পমান করলে, খুব দুখান

হবে। তবে একটা বিশ্রামাগারে আমরা নামলাম, এবং  
মুখ হাত পা ধুয়ে লম্বাট রকম প্রান্তরান দেবে নিয়ে  
আবার বসনা হওয়া গেল। বিশ্রামাগারটি একটি পাঠাড়ের  
উপর অবস্থিত, নিচটে গ্রাম নেই, চারিদিকে পাঠাড়,  
নামনেই বাণির সব চোখে বড় দিগ্বিজয় এক ভাভে নাচে  
Crater Lake। তার পাশের একটা ছোট চূড়া থেকে দোহা:  
উঠে, আর তার চালা গাভা অল্লার ও ছাউনে ঢাকা;  
সবকালের এই ঘটনা হয়। তার গা ব'লে গাভা দিয়েছে।  
এক বিরাট ধানের চোরাগা চোখে পড়ে।

আমরা এগিয়ে চললাম। তবে মাঝে মাঝে গাম  
মন্দির, থাক থাক গামক্ষেত, মারিকেল ও অল্লারের পরিচিত  
গাভের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই বাণিনীরা কেউবা লম্বা মাথা  
কেউ বা কলনী মাথার চলেছে,—চোখে পড়তে লাগে। পরনে  
কাল সুতির মত একখানা ক'রে কাপড়, বাঁকি ব'লে অল্লার,  
কিন্তু পাঠাড়ের নুনভা ভাদের চোরাগার নেই। পুরুষেরা  
বাঁকির লুটি ও মাথার একটা ক'রে কেউ ব'লে চলেছে;  
কোমরে একখানা ক'রে কিনিচি।

বেলা প্রায় ১২টার মাঝরা বাঙালীর কাছাকাছি  
হ'তেই দেখি বলে বলে পুরুষ ও মেয়ে নানারকম বিভিন্ন অর্থা  
মাথার নিয়ে অল্পমানহলে চলেছে। কাল সুতির নীচে রজিন  
একখানা ক'রে কাপড় পরা, কেউ কেউ বসন্ত রংয়ের ছোট  
ছোট চালা একখানা ক'রে গাভে দেবেছে, দেহাবরণের মধ্যে  
নয়, কারিগরিক সেরকম ভাবে এরা আধারণ ব্যবহার করে না।  
কোমরে কেউ বা সবুজ কেউ বা গাল রঙের চক্কড়া কিনিচি  
দিয়ে কোমরবন্ধ পরেছে, মাথার বড় বড় এগো চুলের  
কবরী—যাকে দিখিণ বলা যেতে পারে, কারিগর আঁট ক'রে  
ঘোটেই এরা কবরী ব'লে না এবং কিছুনা বা কিনিচি কোন  
কিছুর বলাই নেই। গলবার মধ্যে কানে তাল পাঠা,  
মোটা সোনার মতই দেখায়; অল্প কোনও গছন পরে না,  
বোধ হয় গ্রোবলারও নেই।

ক্রমশঃ আমরা অল্পমানহলে গিয়ে পৌছলাম। চারি-  
দিকে উঁচু মাঠা কাপড় দিয়ে ঢাকা, নানারকম ভাবে  
বিনিচি ক'রে বিবিধ অর্থাগাভার সাজান। কোথাও উচ্চ  
মাঠার ব'লে পুরোহিতেরা রামক্ষেতের মত বেশ কুখার কুখিত



৩'র মত উচ্চারণ করতে, পিঠে একখানা ক'রে ক্রিচিৎ ওখনও আছে, কোথাও গামাশন বাজে, কোথাও বাজা নেই। এই মতো শত শত নর নারী বিবিধ অর্থসম্ভার মাথায় নিয়ে আসচে। গ্রন্থম গুলিতে মনে হ'ল যেন ছবি দেখি সেই অমৃত্যু যুগের; মনে হ'ল এরা ঠিক আমাদের মত মানুষ নয়, যেন একটা স্বপ্নপুরীতে আমরা এসে পড়ছি। বাস্তবিক রাতা ও বাস্তবিক গভর্ণার গুরুত্বকে অত্যাধিক্য ক'রে মগ্নে নিয়ে গেলেন; আমরা যে কোন দিকে দেখব কিছু দৃশ্যে পরলাম না। বাস্তব হ'লে পড়লাম। সবই মৃত, মস্তব্য, বৈশিষ্ট্য, সম্বন্ধিত মস্তব্যবসী ও তারি মতো চারিদিকে গামাশনের সঙ্গীতধ্বনি। রাতা চলেছে যেন অমৃত্যু যুগ। কাককাব্যধ্বনি শোনাচ্ছিল, পরিচিত বলনের প্রান্ত ভূমিতে দুটি গায়েছে। শিখরে শিখরে রাজনতবাই হস্তধারী, অশ্বলগ্নকবচা চলেছে; চারিদিকে লোকজন, এক হ'লে রাতা ছেড়ে জোড়হাত ক'রে বসে পড়ছে।

আমরা খটা ছই চারিদিকে ঘুরলাম; কিন্তু সবই এত মৃত যে দেখা মনে হ'ল কিছুই দেখলাম না। ইতিমধ্যে lunchএর বস্ত জাক পড়ল। চার পাঁচজন বড় বড় রাজা ও অনেকগুলি অফিসার জড় হয়েছেন, তাড়াতাড়ি যে lunch সারা হবে তার আশা নেই; তারি আগশোষ হ'তে লাগল, কারণ lunchএর পরই গুরুত্ববোধ সঙ্গে কর্ণসিন রাজার বাড়ীতে যেতে হবে প্রায় ৩০ মাইল দূরে। উপায় নেই। কর্ণসিনের রাজা, গুরুত্ববোধ আদি রাজা করলাম, বাকি সকলে পিছনে রইলেন; ওঁরা খটা ছই বাসে যাবেন। ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না।

মোটর খটা ৪-১০ মাইল বেগে ছুটে চলল। পথের দুধারে কত রকমের বিচিত্রতা—বাড়ী ঘর, সম্মিহ লোকজন, **জি** বাসার,—কিন্তু চোখের গতি মোটরের চেয়ে বেশ কম; লোকজনের মধ্যে দেখতে না দেখতে আর একটা মৃত্যু জিনিষ এসে পড়ে। মোটরের উপর তরানক হাস হাঙ্গল, ইচ্ছা করছিল যদি কল বিস্ফোজ বালিককন অলো হ'লে বাকি একটু সেবা বার। রাজার মোটর বলা হ'ল, ছুটেই চলল।

কর্ণসিনের রাজা মাগর ভাষা জানেন, কিন্তু আধরা আবার জানি না। নেতৃত্ব প্রাধান্যবোধী চ্চারাট

কথা ভাড়া অস্ত্র পুঁজি নেই, তাও ইসারায় বোকাতে হয়। সকলে চূপচাপ চলেছি, শানিককন বলে রাজা সংকত, সমস্ত, নবনবী, মহাভারত, হামেশা ইত্যাদি ক'রকটা সংকত কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু উচ্চারণ থেকে কবাকলো হচ্ছে বলা যায় না। বাক, কোন রকমে পথের শেষ এসে, চাওবাড়ীর সিংহদেব গাড়ী ধামল।

পথমে একটা আভিনায় দুধারে লোকজন অশ্লোক করবার মত ঘর; তারপর আবার একটা তোরণ পেরিয়ে আর একটা আভিনা, তাতে গাছশালা কলশ, তার মধ্যে কলটুপি ঘর। দ্বিতীয় তোরণ পেরতে যেখা শালা কাপড় দিয়ে সম্বন্ধিত ও কচি নাটিকেল পাভা দিয়ে সাজান একাও চ্চারাটপ,—তার শেষের দিকে বেনৌ উপরে হ'ল চ্চারাটপত্রাণ বৈশিষ্ট্য ক'রে মাথার বড় বড় কাককাব্যধ্বনি মুকুট কতকটা টুপি মত প'রে খটা বাকিয়ে মস্ত আয়ত্তি করছেন; নামনের বৈদ্যেতে নানা রকম অর্ধা সাজান রয়েছে। গুরুত্ববোধ কল্যাণকামনার ও তাঁর চ্চারাটপমের মেনের বাত শুভ হবে তার মস্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বুদ্ধকে স্তব করছেন। তারপর শুভ ধামভেই কলটুপির উপরে গামাশন বাসতে লাগল,—অনেকটা মলভরদের মত শুভে, তবে আরো গভীর নান।

এই প্রারম্ভের একধারে অত্যাধিক্যপূর্ণ; সেইখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা ঘর গুরুত্ববোধের মস্ত, একটা আমায় মস্ত, ও একটা আমাদের সঙ্গে মোতাযী যিনি মধ্যে মাগাং এসে পৌঁছবেন তাঁর মস্ত। এক রকম ক'রে দিন কাটতে লাগল—তবে গুরুত্ববোধ পকে *Lyttel* রোজ হুবেলা খাওয়া ও চান ইত্যাদিতে একটু অনুরোধ হ'ল। তাতে হ'ল এই যে উনি বাসিতে থাকতে চাইলেন না, মাতাতে ফিরে গিয়ে কলকাতার অভিমুখে রওনা হবার মতলব করলেন।

বাণিতে পা দিয়ে গ্রন্থম দিনেই মন ব্যাপন হ'লে গেল। কি হবে আমরা ও ভেবে অস্থির। রাজা যেটাই সব সময়ে নামের বাসির, তার আর বিপ্রাম নেই। রাজ্যে খাওয়া মাওয়ার পর মাগের খন্দোবত ছিল, খটা ছই নাও দেখা গেল। ছোট ছোট ঘরে গামাশনের স্তব ও তাদের সহযোগে মহাভারতের একটা অংশ অভিনয় করতে লাগল। গ্রন্থমে নাকি স্তবে

খানিকটা পান পান, তারপর সেইটেকে নাড়ের তিতর দিয়ে জাবটা ঘ্রাণ করে। পানটা মগ্ৰাণা, তবে নাচটা সমস্ত শরীর দিয়ে নাচে, খুব ভাল লেগেছিল।

আমাদের বাঁক দলবল, আইনখানেক ঘুরে একটা বিশ্রাম আশ্রয় আছে, সেখানে থাকবে তার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনদিন এখানে কাটিয়ে আমরা তামপকশিঃ নামে একটা জায়গায় পাছাড়ের উপর বিশ্রামাণ্ডে বাব ঠিক হয়েছে। বেগতে বেগতে তিনদিন কেটে গেল। গ্রাম, বাজার, মন্দির ইত্যাদি একটু আঁচু ঘুরে দেখে গিয়েছিলাম, বেশী সময় পেতাম না, শুকদেবের কাছাকাছি থাকতে হ'ত কখন কি এসেছেন হু, তার উপর ভরানক মন ব্যাথা। বেণা এটার তামপকশিঃ এর মজ মোটর ছাড়ল, সঙ্গে Dr. Kuperburs ও আমি আছি।

বিশ্রামাণ্ড একেবারে পাছাড়ের উপরে নির্জন জায়গায়, নিকটে গ্রাম নেই, তবে ঠিক নীচে একটা জীর্ণ-স্থান আছে সেখানে গ্রাম সমুদায়নই মেয়েরা মল নিতে আসে। আমাদের ওণারে আর একটা পাছাড়, তার গা কেরে গ্রামের মেয়েরা মল নিতে আসে যায়, মণো একটা ছোট নদী আছে। বিশ্রামাণ্ডের নামে একটা বন্যার জায়গা আছে, তারি বাড়ী নীচে করণাঙলা; কালেই সেখানে বনলে যা দেখবার তা সবই দেখা যায়। এখানে আমরা তিনদিন কাটালাম। শুকদেব একদিন এক রাতের মজ দিনরাতের মজার অতিথি হলেন, এখানে সুনীতিবাহু সঙ্গে থাকবেন। সব বন্দোবস্ত ক'রে ওঁরা দিনরাতের মজ রওনা হলেন, সঙ্গে যোরাবীও গেলেন, বাকি আমরা চল্লিশ কুঃ কুঃ ব'লে একটা জায়গায়। এটা একটু সহজে স্থান। বিশ্রামাণ্ডে রাত কাটিয়ে, পরদিন lunch বেয়ে দিনরাতের মজ বাকি হওয়া গেল।

পথে উত্তর পড়ে, এইখানেই সেই বড় অস্থান হবে। তার খানিকটা বন্দোবস্ত দেখলাম, দেখে দিনরাত পৌঁছলাম। মণো বেণা গ্রামে সুখোণ প'রে নাচে ও অভিনয় হ'ল। তারপর dinner এরপর মেয়েদের নাচ। সুখোণগুলো এক একটা চরিত্র ক'রে করেছে, লোকগুলোও ঠিক তার তার বজায় রেখে চলাফেরা তাব জড়ি করে, কোনও ভঙ্গ বেমানান দেখা না, তবে বেশিক্ষণ ভালও লাগে না।

বাণির:

আনন্দ শায়।

রায়ে আঁচরের পর মেয়েদের এক রকম নাচ হ'ল। মজর মেয়ে সাজ সজ্জা ক'রে গায়ালানের সঙ্গে কেবল নাচলে, পান নেই, পরাবটা এমন নমনীয় যে, প্রতি নড়াচড়াতে সমস্ত মজ সজ্জা দেহ। তারি চমৎকার লাগে। রাত অনেক হ'ল, ক্রিঃতে হবে,—কাজেই নাচ শেষ ক'রে দিয়ে,—আমরাও ফিরলাম।

পরদিন সকলে মিলে Denpasar ব'লে বাণির দিকের একটা সড়কে বাড়ী গেল। পায় কয়। খোকাই দেওয়া একটা বিধম কাণ্ড, উপায় নেই। আমাদের পাকের সব ঠিক হয়েছিল Assistant Controller এর বাড়ীতে, সেটা খালি ছিল। হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া আসত। বাণির মণো এই খানেই একটি হোটেল আছে, কিন্তু এই উৎসব উপলক্ষে ভরানক ভিত হয়েচে, আট জন থাকার ব্যবস্থাও চলিঃ মন এসেছেন। আস্তাবল, শুদাম, চাকরদের ঘর সব ব্যবহার ক'রেও ফুলতে পারছে না। তবে দোঁভাগ্যক্রমে আমাদের বেশ আরামেই কেটেছিল। এ ছাড়া মজ সব বিশ্রামাণ্ডেরও তত্ত্বি। মোটর ক'রে উত্তর, দেখানে উৎসব মজিল, খাড়াগাত করতে হ'ত। সেখানে যেতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগত।

উত্তরে উৎসব তিন দিন। আমরা বোলই যেতাম। ওপরে উত্তরের রাজার বাড়ি lunch খাওয়াও বন্দোবস্ত ছিল। শুকদেব কেবল দুদিন গিয়েছিলেন। রাজবাড়ীতে বড় বড় মজ করেছে, নানাবরকম ক'রে কাপড় দিয়ে সাজিয়েছে, কোন মজ পণ্ডিতরা মজ পড়ছেন, কোথাও রামায়ণ পাঠ হচ্ছে, কোথাও পুজা হচ্ছে, কোথাও বাজনা বাজছে, কোথাও নৈবেদ্য লাগিয়ে রাখছে। এই রকম বিরাট ব্যাপার। অদ্বাখা লোকজন ঢুকতে বেকছে, তাদের বেশভূষা, এমন কি বদনবিয়লত, সবই ভাল। সকলেরই মজর সুপুট পণ্ডী।

একটা মজের মণো সুতদের ও তাদের উৎসর্গ করবার তিনিঃ লাগিয়ে রেখেছে। বৈকালে মিছিল বেঙ্গল।



প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মিছিলের ব্যতীরাভের ভক্ত রাক্ষা থেকে একটা বাণের মক-সিঁড়ি কবেই বাত রাক্ষা থেকে সিঁড়ির উপর দিয়ে একেবারে উৎসব স্থানে আগতে পারা যায়। বাহিরের প্রাঙ্গণ ও রাক্ষা ঘাট লোক লোকারণ্য। প্রথম চলল পুজুরো চামর নিয়ে, বরম নিয়ে, ভাতা নিয়ে। এই প্রকমে প্রায় শ তিন চার লোক শু লাইন ক'রে গেল।

প্রায়শ সন্ধ্যাতরা গরু পুষ্ক ইত্যাদি নিয়ে প্রায় শ তই মেয়ে চলল। সকলেই ব্রহ্মরূপে সজ্জিত, মাথার একটা ক'রে মাথার আছে, তার উপর বিনিস্তলো নানা রকম ক'রে রাখা। তারপর নৈবেদ্য নিয়ে প্রায় পাঁচশত মেয়ে ধারে ধারে মণ্ডাপ্রান্তের মত চলল। সব পেয়ে রাক্ষ-অস্ত্রপুয়ের প্রায় জন পঞ্চাশ লোক বিবিধ সামগ্রী ও রকম আচারের উপর নিয়ে গেল। তাদের পোষাক— ভিতরে রত্নিন ব্যক্তি কাপড়, উপরে কাপ কাপড় বুকের উপর থেকে পত্রা, তার উপরে খালি, উপরের অংশটা একপান: ক'রে হপনে কাপড় আচ্ছাদিত, কোমরে লম্বা, গাল নানা রংএর কোমরবন্ধ। মাথার বড় বড় এলো খোঁপা, কানে ভালপাতার পল্লব, কাহারও বা হাতে এক গাছি সোনার চুড়ি। হার মস্তর গমনে চলছে। মস্ত বেয়েরা, কেহ বা বুকে কাপড় বিছোড়, কাহারও বা খোলা। উৎসবের মস্তেই যে বিশেষ ক'রে দেখেচে তা নয়, তবে এত লোকের ভিতরের কাপড় বিভিন্ন রংএর হ'লেও কেবল বাহিরের কাপড়ের কাপ রং লম্বা জনতাকে একত্র দিয়েছে। আগে ও পাছে গায়লেন বাহনায় মল।

এই মিছিল—সিঁড়ি ঘেরে গুট-নামা ও মস্তর পতিতে আগিরে গো, মাইল খানেক লম্বা এক সারে শোভাময়ী, তার পর বড় বড় প্রায় একশ ছুটী উঁচু, বাণের মস্তর মত নানা রকম মক, তার মধ্যে বৃত্তাকার আছে,—পুজুরো ব'য়ে নিয়ে

চলল। তারপর রকম কৃত শ্রেষ্ঠ। সুতার না। বৃষ মিছিল আর

বিভিন্ন ক'রে পালায়। তাদের বড় বড় পেটের মধ্যে বৃত্তের প্যুত শোভান হবে। সব

চলল সংকরাধানে বাকপুত্রী থেকে এক মাইল দূরে।

সেখানে নানারকম মক বৈষ্ণব রংয়ে, মস্তর তার উপর তেঁবে শোভান হবে। এই বড় বড় মকগুলোর মস্তর উঠতে নামতে প্রকাণ্ড সঁজি লাগে।



তারপর শোভানর পালা।

এবার সামাজিক জীবনে মস্ত কোনও খরচ নেই, মস্তর সংকারই একমাত্র খরচ, সেইখানে সব টাকা কড়ি লসকারে লাগায়। মাথার খুব ভাল লেগেছিল মিছিল। নামাখি জিনিষ নিয়ে মেয়েরা লাইন বেঁধে-চলেছে, বিভিন্ন তাদের পল্লব, বিভিন্ন তাদের পোষাক—সবই জিনিষটার সমগ্র একীভূত বৃষ্টি সঁজাই চকু আর মন উভয়কেই বৃত্ত করে।

বাং, এরই মত একদিন কেটে গেল, আশ্বিনেরও ঘাসির পালা শেষ হল। এই তৃত্যসেব, 'স্বনীতিঘাত' আমি মনুক ব'লে পাহাড়ের উপরে একটা বিশ্রামাগার আছে সেখানে যা। Bakera আর একটা বিশ্রামাগার আছে। তারপর এই কিবা ৮ই সন্ধ্যাতরা বাঙা হবে। সেখান থেকে জালদায় নিয়ে ১৫ সন্ধ্যাতরা, তারপর দিন পনেরো কাড়ার খোজার পর ২০শো২০শে নাসাং দেশের দিকে রওনা হওয়া থাকে। এই রকম ঠিক আছে, তবে বলাতে এক, মিনিটও লগে না।

মনুক আমরা এসছি। বিশ্রামাগারটি 'মন' নয়, পাড়ার উপরে। সামনে শিখনে পাহাড়, তার গারে ছোট ছোট গ্রাম, বাংক বাংক কেত, একটী মস্ত রাক্ষা ঠিক বিশ্রামাগারের সামনে দিয়ে এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে, সেই পথ দিয়ে গ্রামের মেয়েরা অনাবৃত পেঁধে 'কন্দল' চিত্র ব্যতীরাভ করছে, চারি পানের পুস্তাখলার মক তারা বেশ মিলে মিলে আছে, এটা অল্প ব'লে মোটেই মনে হয় না, বরক এইটাই ব্যতীরাভ ব'লে তারি 'হললত' মনে হচ্ছে। সামনের পথের পাশ দিয়ে করবার কলের খাতা ব'রে চলেছে, ভাতের পুষ্ক মেয়ে একবারে নির্দিকারচিত্র মন করছে। হাটের পথে সন্ধান থেকে মেয়েরা পদযা নিয়ে চলেছে। এখানে হাট বাজার কেনা খোজা লম্বই মেয়েরা করে।



গ্রামে গ্রামে সাধারণের বদলার ভক্ত চিত্রটি ক'রে ছোট ছোট ঘর বাড়ার ধারে থাকে ; তাতে পুরুষরা জটলা পাকিয়ে গর ভরষ করে। তা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে একটা ক'রে বটীবর আছে। বটীবরগণে বড় বড় কাঠের, কোন কোন আশ্রম বিপদ হ'লে বটী বাসে। তা ছাড়া তথ্য প্রত্যয় পুরুষেরা একত্র হ'য়ে পানাদি করে, তাদের একত্র করবার গুহ্য এই বটী থাকে। মেয়েরা সাপেয়িক সব রকম কামাই করে, তা ছাড়া চাষবাগেতে গাভা বা করে। পুরুষেরা প্রধানত জমি তৈয়ারী, ফলবগন, মজল থেকে কাঠ সংগ্রহ করা, ও বাড়ীবর তৈয়ারি ইত্যাদি করে। কিন্তু অনেক স্থানে দেখেছি যে, এই সব ব্যাপারেও মেয়েরা সাহায্য করছে।

ঘেণটা ঘেয়ে-প্রধান। পুরুষকে গ্রহণ করা ইত্যাদি ব্যাপার মেয়ের সম্ভারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বিয়ে ব্যাপারটা পরামর্শের পঙ্কজের উপর হয়। তাতে যদি পিতামাতার সম্মত থাকে পাণিঘে গিয়ে বিয়ে করে। আবার অধিবনা হ'লে ছেড়েও বিতে পারে। কুমারী মেয়েরা কবরীর এক গোছা ভুল ছেড়ে রেখে দেয়। তাতেই কুমারী ও বিবাহিতা চিনতে পারা যায়। পুরুষ ও মেয়ে সকলেই খুব পান পায়, তা ছাড়া বোকাভার মত খানিকটা তামাকপাতা খুব কুচি কুচি ক'রে কাটা সব সময়ে খেয়ে রাখে, তার ভক্ত শিক ফেলে সর্কীয় চিহ্নিত ক'রে ফেলেছে। বাগারে তৈয়ারি আর এবং মজাভ খায় সবই পাওয়া যায়। অনেক তাই কিনে যায় ; পুরুষ মাংসের খুব খেই লেন ; এদের খাওয়ার কোনও বাচ-বিচার নেই, পুরুষ দুইশী সকলেই খায়।

ভোজ টোজ ব্যাপারে গ্রামের সকলে ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। গরুর দুধ এরা ব্যবহার করেন না ; গাই কলম কেবল চাদের মজ রাখে। গরুগুলো দেখতে অনেকটা করিগের মত, গলভল, বা ককুস নেই, হা সবই লাল, বেশ সুই সবল। গ্রামে প্রায় একুশানা ক'রে টোলা-পাড়া আছে, তাতে তারি সাপগজ চালিয়ে লোকজনকে টোলে নিয়ে যায়, বা বাপে ভুলিয়ে নিয়ে যায় ; মজ কোনও বাহন নেই। কোথাও কোথাও দুই একটা ছোট ছোট

খোড়া দেখতে পাওয়া যায়, তার পিঠে খান টাডাদি বোকাই ক'রে নিয়ে থাকে। বাহন কোনওর ভয় কাঠের, নয় বাপের, কেবল মাজ ভলের ভক্ত মাটির বড়া ব্যবহার করে। পুতার ভক্ত জল কিছু বাপের চোকে পুরে নিয়ে যায় মাটি শুক নয়।

তাতট এখনকার প্রধান খাদ্য ; বখেই পরিমাণে খান এখানে উৎসব হয়। বাগমাশ এখানে চাব চলে, ভলের অভাব নেই। জলসেচনের ব্যবস্থা খুব চমৎকার, খুব উচু ভমিতেও অন্যায়সে জল সেচন করতে পারে। খান, তামাক, আদা প্রধান ফসল। এ ছাড়া তরিতরকারিও নানারকম হয়। পেঁপে, আম, নারিকেল, কাঁটাল, জামরুল, ম্যালেস্তিন ও কলা প্রচুর পরিমাণে অবাচিতভাবে সর্কীয় ফলে আছে। খাবার অভাব এ দেশে নেই।

সর্গীয় বড়লোকে কাশড় চোপড়ে মাগর টাডাদিতে বিশেষ ভেদ নেই। কাশড় ছিঁড়ে সেলে সেলাই করেন। নুঠন কাশড় পরে। মাগরাগাও খুব ভাল। মগ্গুখ বা বিকল-মজ লোক চোপে পড়ে না ; চুট এক ভরকে দেখেছি কেবল গলভল আছে। সাধারণত চানে-মুতার (খিঁড়ি খাখা) চেন, ভাট মুতারও চেন আছে। পুরুষ-সকলেই একখানা ক'রে কিরিচ পিঠে বেঁধে রাখে আর হেঙোলা নামা রকম কাককায়ে খচিত দেখতে পাওয়া যায়। চান থেকে প্রস্তুত একরকম মজ এরা ব্যবহার করে। ভুটাব খোলায় তামাকপাতা ভড়িয়ে একরকম চুট ক'রে খায়। নানা রকম ফল সর্কীয় দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষেরা প্রায় কানে ফুল ভর্তি রাখে, মেয়েরা কখন কখন ঘোঁগার ফুল দেয়।

এখানে মন্দিরগুলো ঠিক আশাধের দেশের মত নয়, চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা কাঠগা—তোপে ও প্রাচীরে খুব কাককায়া থাকে, অনেক স্থানে কাঁটা ইটের তৈয়ারি। ভিতরে দুই তিনটি প্রাঙ্গণ, সে গুলোরও প্রাচীর ও প্রবেশদ্বারগুলো কাককায়া করা। প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারের চপাশে নানা রকম ছাত্রশাল থাকে, প্রায়ই ভগবত মূর্তি। ভিতরে ছোট ছোট চালাঘর পাখ-বহ বা কাঠের উচ্চ মকের উপর তৈয়ারি করা। তার 'ভতর



কিন্তু দেবতা থাকেন না; শুধু নৈবেদ্য ও মূল এবং অল্প  
দিয়ে সেট বেদান্তে পূজা করে; কখন কখন বা বাড়ী থেকে  
সেবতার বিশ্রুত এনে পূজা করে, আবার বাড়ী কিভাবে নিয়ে  
যায়। ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যের কাজ করেন, পুজার সময় মেয়েরা  
ঠাট্টা পড়ে বস। মন্দির প্রদক্ষিণও আছে, দেবতার  
সাপাশ ছাড়া ধরাও আছে। নারিকেল পাতার নানাবিধ  
বিচিত্র ছোট ছোট শক্ত বৈষ্ণবিক ক'রে তাকে নৈবেদ্য লাভায়।

পুরুষেরা একখানা ছোট বাটিকের কাপড় দিয়ে  
মাথায় যেটি বেঁধে রাখে, মেয়েরা পুজার সময়  
ওকে একখানা ক'রে কাপড় ছড়ায়। রান্নার সময়  
গায় উঠার পরই কোন রকম আবরণ থাকে না।

বাগানে আমরা এলেন্দ্রিয়াম ২৬শে আগষ্ট, আজ ৬'ল  
৮ই সেপ্টেম্বর, আজ ছেড়ে যাব। এই কটা দিনের মধ্যে  
মোটামুটি বা দেখায় একইরকম দেখা হচ্ছে।

বাড়ার কি এর সবই অনিশ্চিত, শুধুবেব মাতে মাতে  
সব সময় ভেঙে যেন; তবে ভরসা আছে কিছু দেখা  
হবেই। এখানে হল চোদ্দ দিন, চিঠি লিখবার চোদ্দ  
পাতা, লিখতে লিখতে হাত থাথা করছে, অত্যাশ নেই  
তার উপর কাবা কোণার না, আবার বানান চোখ রাখায়।  
এত উপদ্রবও মাহুদ স্বপ্নী করেছে!

এই শ্রমণের কিছু রূপ-প্রমাণ রাখার বহনকে দিগন্ত

## এই যে ছুঁয়েচি আজি

স্বদেশে আসারী হইতে অস্থায়ী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এই যে ছুঁয়েচি আজি তোমার অনুলি,  
গীতি-কুহ বন্ধ তব হে স্তম্ভি-চক্ৰা,  
দীপশিখাসম কল্প নাড়ীতে আকুলি  
নিরুহ-মিলন-বার্তা করে ফেলা-চলা।

এই যে কপোলে তব প্রভাতেতো আছে  
উষাস আভাস কাঁপে—পূর্ণরাসদম,  
রক্ত-গহীর তব কৃত্তকের রাগে  
অন্ধকার সুরভায়—এই কিবা কন?

মানি মানি গ্রহ নৃপা কিসের গিরানে  
পূজনীয়ারিকা হ'তে দূর তুলি তুলি  
আলোককলন বোনে; মানি মানি গণি,  
জিহ্বীন কোন্ পথে কর্ণে কর্ণে আসে  
নিশিরকুণ্ডিত বাণে জ্বাল জ্বলন্তলি  
ঠাং পৌরত দার দেখ রে চমকি!

## তথৈব

—গল্প—

—ঐগুপ্তসেবক বসু

ট্যাক্সিটা মোড় কোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা দিকে কুঁকে  
পড়ে তারপর ঝিক হ'তে বসে' নিয়ে পরিতোষক  
উইলো, "সুতরাং ?"

গানের তলতের পাঞ্জাবির ওপর একটু বে দিগেটের  
ছাই পড়েছিলো, বা গানের টাটী আত্মা দিয়ে তার কাঁড়তে  
সাক্ষতে ঐক্যে জবাব দিলে, "সুতরাং কাল কলকাতা  
চাড়াছি। এটা হচ্ছে সেই মাল, শিশুশায়া বইতে থাকে  
বলে' থাকে বহুকাল। দেপ্তে পাছি, কলকাতার  
আকাশই মাগের মহানগরের মত মীল হ'য়ে উঠেছে—  
কাছেই হাঁটির আকাশ আচ্ছিনে ধারালো টম্পাতের  
মত নক্ বক্ করতে শুরু করেছে। তা ছাড়া, দেখানে  
আছে ইলা, যা'র চোখ টাটি সেই আকাশেরই মত—  
কিহা তার চেয়েও—"

"তা ইলা তো আগ হুঁমিনেই মিলিয়ে থাকে না।  
বং হাঁটির আকাশের রঙটা ইলার চোখের আভেকটু  
কাছাকাছি আনক্, ইলার তল আতো ঠাতা বোকে—"

"সঙ্গে-সঙ্গে ইলার জরাজীর্ণ ঠাতা হ'য়ে থাক্ আর  
কি! নাহে—কাল আমি যাবোই। ইলা লিখেছে—  
যাক্, কি লিখেছে তা আর না-ই তুলে। আজকেই  
যেতাম, কিন্তু নাট্য-মণিরে কি-একটা নতুন গ্রে হচ্ছে.  
খুঁ মাক্ চলছে গুলাম। কি না বইটার নাম ?"

"'বোডক' ?"

"ই্যা, 'বোডক'ই বটে। শব্দ চাটুহো লেখেন  
তালো। 'তা, ওটা যেনে যেতে হ'বে। কখন আরম্ভ ?  
তোমার সঙ্গে যে থাকি। শুদিকে সেত্রি হ'য়ে যা'বে না তো ?"  
"কিসের সেত্রি হ'বে ? আজকে বেশভাষার—সাক্ষে  
আটটার আরম্ভ, এখন তো চ'টাও বাকুনি। এই জান্  
তরক্।"

"এশাম নাকি ?"

"প্রায়। ও, একটা কথা বলতে তোমার কুঁনে' গেছি।  
মাক্ কলকাতা আমার দালা-বোদি এয়েছেন। তাঁরা  
যাকেন যুজের—যুদ্ধদিন পর এবার দেখে এলেন। দালা  
কছেন ইকুলমাট্রি—বাগ-বার বাওরা-আদার বহুচ পোষাতে  
পারেন না। বোদি মাগুটি বেল।"

"কট ?" ঐক্যে একটা কালিকে চোঁটের মাঝ-পথে  
এয়েই ছেড়ে দিলে।

তারপর ট্যাক্সিটার হাত থেকে পুড়ুরো নিতে-নিজে  
বললে, "চলো দেখে আসা যাক্."

ওরিন বুখাতির হোড্-এর ওপর ছোট্ট একটি দোতলা  
বাড়ি। বাইরের বন্ধার খরটি এমন ঢাং পাড়ানো,  
যা'তে অধিবাসীদের চটু করে' পড়লোক বলে' তুল চ'তে  
পারে, কিন্তু আসলে সে সাক্ষদক্ষ ভেতরকার দাবিপ্রাণ  
লক্ষ্য চাক্ষার একটা কৌশলমাত্র। বহুটির মেকের  
লতরকি পাতা, মাঝখানে একটি ফর্সা কাপড়ে-ঢাকা  
বেতের গোল টেবিল, তা'র ওপর রঙিন টিনেমাটির  
মুদ্রাবিহীন এক শুদ্ধ রজনীগন্ধা। চাক্ষদিকে গদি-আঁটা  
খেতর চেগা, হুঁ-একখানি সোফাও আছে। মেঝে  
গৃহবাসীর হুঁচারজন পুরুষকণের এলুকাচ্, কোটোগ্রাক্,  
একখানা মোনা মিলা ও একটি landscape ছবি। জান্-  
শ্রুতি সব বন্ধ ছিলো; পরিতোষ সেজ্ঞা খুলে' নিতে-নিতে  
কললে, "বাড়িতে কেউ নেই বলে' মনে হচ্ছে। হুঁমি একটু  
বোকে, হর্গ—আমি ঘেবে আসছি। যদি দখাই বেগিরে গিছে  
থাকে, তা'লেই হচ্ছে। তোমাকে খেতে বললাম—"

আপন মনে বিচ্ছিন্ন করতে করতে পরিতোষ গাল  
বনাতের পর্দা সরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। যেন





স্বাধীনতা চাব আর বইতে পাচ্ছে না। এইভাবে ঈশ্বর কাম নেভ, একটা স্বাধীনতা পেলেও পিছনে না ফেলে, ঈশ্বর একটা চেহারা বসে' পড়লো।

পানের বাড়ির চিন্তা-ভাব ভিতরে, মাকানকার পাঁচিলটা উপরে, পশ্চিমের জান্না বেয়ে একরাস সোনার ভাঁড়ের মত মাকানকা স্বর্ণময়র আলো তখন সেই ঘরে লুটিয়ে পড়েছে। সে আলো যেন চাত বিকে ছোঁয়া যায়, হাতের দাঁড়ায় তব'ে ঘরে' রাখা যায়, হাত তুলে' নিয়ে বুকেও রাখা যায়। শালা রজনীগন্ধার গন্ধ অনেকগুলো কীর্ণবিহার মত মনে' উঠলো, যোনা লিঙ্গার ছবির কাঁচে আভ্রন ঘরে' গেছে, ঈশ্বর ফেনার মত শালা চাবরের বে-জনে মেয়ের গুটান্ধে, পেটুকতে কে যেন এইমাত্র আবার ভেলে বিয়ে দিলো। প্রকৃতির শোভা-ভোভা ঈশ্বর মনকে কোমোবিনাই বিম্বের টান্ধে পাতে নি:—কিন্তু আজ যেন তার কি হয়েছে—সে চুপ করে' সেই লাল রজনীগন্ধার বিকে তাকিয়ে প্রায় আবিষ্টের মতই বসে' রইলো।

আগলে পাঁচ মিনিট মাত্র গেছে; কিন্তু ঈশ্বর মনে হ'তে লাগলো সে অস্ত্রত ভাড়াই বসে' ধরে' ঐ চেহারা বসে' আছে। সজ্জার আলোও নিবে' আলুছে—অন্ধকার হ'বে এলো বলে—পরিতোষ হতভাগাটা এককল ঘরে' করছে কি?

বিরক্ত হ'বে ঈশ্বর উঠে' গাড়িয়ে আলোটা আলবার মত গ্রাইচ-এর ওপর হাত রাখলো। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড-এর মত দুটোটা টেপবার মত শক্তিও তার' দেখে ছিলো না।

অস্তরীর পেছনে লাল বনাতের শর্কা, সুবে, গলায়, হাতে টাটকা রক্তের মত গাঢ় লাল আলোর ছিটে, কপালের নিম্নে টুকটেকে লাল, পাড়ির পাড়ি আরো উজ্জ্বল লাল। সারা বর সোনার বৃষ্টিতে বৃষ্টিময়, অস্তরীর চোখ দু'টি বনের মত, চার বছর আগেকার মত।

অস্তরীর ঘরে চুকে'ই ভয়ানক চমকে উঠে' একটুকু চুপ করে' গাড়িয়ে রইলো; তারপর টেবিলটির বিকে এগিয়ে এলো।

টুক করে' শব্দ হ'ল, উগ্র কলবে আলোর বর ভেসে গেলো, মোহ গেলো কেটে।

পরিতোষ বলতে লাগলো, "ইনি ঈশ্বরী অস্তরী মিত্র, আমার বো-দি, আর ইনি আমার বন্ধু ঈশ্বরী সৎকার বি-এ (ম্যান্ ডি-লিট্ গডন্)।"

ঈশ্বর শেষ পর্যায়ে তব'ে আত্ম-মাত্রের দু'টি হাতে একত্রিত করে' আত্মজ্ঞান কল্পে, "নমস্কার!" তারপর অস্তরী প্রতিদন্দ্বিতার কল্পে কিনা, তা না দেখবার ভান করে' বললে, "ওহে পরিতোষ, আমার ঘেরি হ'বে ঘাবে না তো? I say—আমি বর: এখন চলে' যাই।"

পরিতোষ বললে, "সে কি কথা? না খেরে কি করে' ঘাবে? হা, দেখলাম, তোমার মত কত-সব আয়োজন করছেন।"

ঈশ্বর তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে' গাড়িয়েছে। বে-জানালি বিয়ে একটু আগে সোনার ভাঁড়ের মত আলো আলুছিলো, সেই জান্না দিয়ে বাইরে রাখা গাড়ির বিয়ে করলে, "আজকের দিনটা হঠাৎ তারি পরম পড়েছে—না? চলো না পরিতোষ, বাইরে থেকে একটু ঘুরে' আসি। মার্কিট-এ ঘাবে? না:—আইন্সট্রীমন্তলো আর তেমন ভাল সেই।"

অস্তরী কলপানি থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছটি একবার তুলে' আবার টিক করে' বসাতে বসাতে একেবারে কথা লম্বা উচ্চারণ করে' বললে, "আপনি কি 'যোড়নী' মেয়েতে ঘাবে, ঈশ্বর বাবু? চলো না টাকুরগো, আমরায় ঘাই।"

ঈশ্বর জান্না থেকে সরে' এসে টেবিলের উল্টো বিকে অস্তরীর একেবারে মুখোমুখি গাড়ালো। তারপর অস্তরীর চোখের ওপর চোখ রেখে—বে-জ্ঞানো, বীরল গলায় বিলেতে গ্যাকতে সে ল্যাঙ্কশেইজিক বায়ু বলতো—সেই বরে বললে, "আপনি ঘাবেন? তা বেশ, চলুন না—আমার একটা পুরো বইই আছে"—তারপর পরিতোষের বিকে তাকিয়ে, "ডক্টর চ্যাপলিনের বাড়ির মেয়েদের আদ্যবার কথা ছিলো কিনা—তা ওঁদের আজ হঠাৎ গ্রেনেডস পুজির বিকিতে মেমবর হ'বে গেলে। পুজিরি নাম শোনো নি? মত বড় orientalist—বুঝিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। চমৎকার লোক—দারিদ্র্য কীবন কালের মানিতে বুললেন, কিন্তু মনে যদি একটু কুপ থাকে' তার চ'হাতের আঙুলে যে ক'টা কড়া আছে, প্রায়

## ঐশ্বর্যসেব বহু

ততটা ভাষা জানেন—যার তামিল-ভিষ্ণবী। আর  
অকৃত অবাধ্যতা! ছেলেকেবার মিলান্-এর সাতার  
বন্ধের কাগজ কিং করে' বেড়াতে, তারপর আশুপল্ল  
ভিত্তিরে ঘেঁষেভার—কিন্তু সে থাকে! ...আপনি যাহেন  
তা'লে : শিশির বাবুকে কখনো দেখেন নি বুঝি? হ্যাঁ,  
বেষ্ণার মত বটে—বাঙালী দেশের পক্ষে আশুপল্ল। তবে  
এ-দেশের nature এখনো বন্ধুর cradle হ'তে হয়—এখনো  
সীল টাঙার—হাসিটা পার দেখলে। তা আপনি—ওহে,  
পরিচোব, তোমার বাবার সঙ্গে তো পরিচয় হ'ল না!”

ইতিমধ্যে অতলী একটি দোকান গিয়ে বসেছিলো :  
সেই রকম দিলে, “উনি বায়োফোন্স দেখতে পেছেন—  
এক্সপ্রেস-এ—”

পরিচোব তুচ্ছ কুচুকে বলে উঠলো, “এক্স-  
'ভরসেব' দেখতে? নাঃ, লাবা একবারে গেল  
দেখছি! তোমাকে নিয়ে গেলেন না যে বৌদি?”

যুব বাঁচের লাল হ'বে না ওঠে, সেই চোটা কহুত কহুত  
অতলী বললে, “আমি যাঁই নি। মাণিকের একটি স্রব  
হয়েছে কিনা”—চোরাবাণিতে ছুঁতে-ছুঁতে হঠাৎ যেন  
অতলীর পাখের নীচে পাখের টেকলো—“এই তো সাহায্যিন  
পর এখন একটি সুমিরেছে, কোণে উঠলেই আমাকে  
খুঁজবে।—আপনি বুঝি বায়োফোন্স-টাছোড়োয় বিপদ  
জানেন না, ঐশ্বর্য বাবু?”

“পূব কয়। লিনেমা জিনিগটাই আমার কাছে ভেঁমন  
কোনো-কোনো ত্রেক, তবে কয়েকটা ফিল্ম দেখছি বটে  
পূব ভালো। সেবার বোয়েন্স কোয়ার্টের পান্নার পড়ে—  
সেই যে যে, বাঁচ কথা তোমার বদ্বিলায়, পরিচোব—  
ছোড়ো নাটক লিখে' এরি মধ্যে মিথি নাম করে' কেলেছে  
—হ্যাঁ, বোয়েন্স কোয়ার্টের পান্নার পড়ে' একটা ছবি দেখতে  
হাট—নাম, 'Grass'। সে এক আশ্চর্য্য জিনিষ! পৃথিবী  
তৈরী হওয়া থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্যন্ত মানুষের—না,  
প্রাণী জাতির ইতিহাস! এ-দেশে এখনো আসে নি ওটা,  
না?...না যে, সাতটা খাজতে চলেছে”—

“কত নেই তোমার, হ্যাঁ এই হ'ল ব'লে। কি বৌদি,  
তা'লে তোমার খিরেটার বাওয়ার কথাটা সব জুতো?”

“না—ভাবছিলাম, মা যদি একটু ওর কাছে এসে—  
থাক সে, আর না-ই বা গোলাম—” অতলীর আবার বোধ  
হ'ল, তার পল্লার প্রতি শিরাটি ধরে লম্বা রক্ত যেন  
হুড়হুড় করে' মুখে উঠে' আসছে। হাত নিয়ে একবার  
মুখ মুছে নিয়ে বললে, “বাব না ঠাকুর শে, একবার দেখে  
এসো আমার কদুর। মিছিমিছি একে আটকে রেখে  
গাভ কি?—আমরা কেউ বাজি না যখন।”

“কেন, চলুন না। পরিচোব না হয়—স্বাভাবিক না হয়  
পরিচোব রাখবে।”

যে-জগতের অর্থ-ভরা মেধা-বাক্যিক না-যার হাঙ্গি এক  
মেরেই হাঙ্গত পারে, সেই হাঙ্গি চেলে, চোখ কপালে টেনে,  
বা হাতের কড়ে' আঙুল দিয়ে শূন্য টোকা মেয়ে অতলী  
বললে, “ওঃ! পরিচোব! রাখবে! তা'লেই হয়েছে!”

পরিচোব আর ঐশ্বর্যে চটু করে' চোখের বেতার  
হ'রে সেলো।

পরিচোব উঠতে উঠতে ব'লে গেলো, “চা, চর্চ?   
আশক্তি নেই? বৌদি? না? ইস—কোয়ার্ট বা গুজ  
বেরিয়েছে! আশিটাইটু, হর্ষ?”

পরিচোব যে মুহুর্তে ঘর ছেড়ে গেলো, সে মুহুর্তে অতলী  
লোকা থেকে উঠে পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য শেকুন  
দিকে ছাঁটতে ছাঁটতে একবারে জানলার কাছে গিয়ে  
শাশির কাঁচের ওপর মাথা কেলান দিয়ে ঝড়ালো। ঐশ্বর্য  
চাখের প্রান্তভাগ স্পন্দ না করে' তার হতটা কাছে  
ঝড়ানো সম্ভব, অতলী তার ততটা কাছে গিয়ে ঝড়ালো,  
এক পলা দিয়ে পর-দুন্দ না করে' হতটা কোরে কথা বলা  
লজব, ততটা কোরে বলে উঠলো, “শিঙ্গির! করে  
মেখে ফিল্মে?”

কতাল কথা কহিতে পারলে যে ঘরে কথা বলতো, সেই  
ঘরে ঐশ্বর্য জ্ঞান দিলে, “জুন মালে।”

“কি কহছে?”

“আশাত আশুসের।”

“এখানে আজ কোথায়?”

আশ্রয় চৌপদেও ঐশ্বর্য সত্যি কথা না বলে' পারলে  
না—“বহুলাপান।”



“ও, তোমার মাখার বাড়িতে?”

“হ্যাঁ।”

“হেঁদে—ওহো কি এখন এখানে?”

“খামি বিশেষ বাঙালার আগাই বেবার বিয়ে হয়।  
বছর খানেক পর বছর এসো। সে ছেলে হ’তে মাক্সা গেছে।”

“মতি?” অতীতা প্রায় চোঁচিয়ে উঠেছিলো।  
তড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললে, “তা তুমি—  
তুমি এখানেই আছ?”

ঈর্ষ্য বাইরের নিকে তাকিয়ে যেন নিজের মনে মনেই  
বললে, “কোথায় আর থাকো?”

অসমার সলা চিরে’ বেঠিয়ে এসো, “কিন্তু তুমি এখানে  
এ বাড়িতে আ? এসো না বুকে? আর কক্ষণো এসো  
না,—আমার এই একটা কথা তুমি রাখো, ঈ।”

ঈর্ষ্য মনে মনে তাবলে, অতীতা ঘোঁষনে এই ঘিটামার  
তাকৈ এক কথা বললে। একবার—ক’ বছর আগে? ক’দিন  
আগে?—একবার অতীতার বাবা যখন তাকৈ নীরবে বাইরে  
যাবার বরতা দেবিয়া দিয়েছিলেন, ঈর্ষ্য একটু বেলে শুষ্ক  
বলেছিলো, “কিন্তু আমি তো আপনার কাছে আসি নি।”  
তারপর অতীতা তাকৈ—থাক্, থাক্, সে সব কথা সে  
আর মনে করতে চায় না;—বিশ্ব সেনিমনো অতীতা এমনি  
করেই এই কথাই বলেছিলো, “কেন তুমি আমার সঙ্গে  
অপমান লইতে যাবে? তুমি আর এসো না—কক্ষণো এসো  
না—কক্ষণো এসো না,—আমার এই একটা কথা তুমি  
রাখো, ঈ।”

দেই অতীতা! আর কিছু নয়, ঈর্ষ্য আজ শুষ্ক তাকৈ  
একবার লগে করে’ বুকের দিতে চায়, কত বড় তুল সে  
করেছে, সে বা হারিয়েছে তা কত ন্যায়ান—অবচ একটু  
ইচ্ছে করলেই সে-সবই তা’র হ’তে পারতো।

তাই, কঠোর হঠাৎ অপূর্ণ কোমলতা এনে, একটু  
নত হ’য়ে অতীতার হুঁটি চোখ তার হুঁটি বিধে বিধে রেখে,  
সেনিন ওকবার উত্তরে সে বা বলেছিলো, আজ একটু  
বলে সেই কথাগুলি উজারণ করলে, “তাই হবে, নী।  
তোমার বড় মনোবাহার মন্থে গেলেও আমার জুপি হ’বে  
না।”—তারপর বেশ ধীরে-ধীরে উঠো। দিকের দেয়ালের

কাছে গিয়ে আবার শেঁষ তুলে: বরে বলতে লাগলো,  
“ঈ্যা, বুকেলেন—যেমনা লিগা’র কত খেঁকল হয়েছে, তার  
ইমত্ব নেই। প্যারিসের লুজ্—এ আসল ছবিখানা আছে—  
দে-বরে আর কোনো ছবি নেই। সে দে কো জিনিস।  
এই wretched print দেখে তা কখনোও কথা যায় না।  
ছবিটার কত নাম নিয়েছে হে পন্ডিভোব? এতখানা তান্  
ডাইক্ তাবলেই পারতে! জানি নে কেন, জেমিণ্-গেইটিং  
আমার কাছে সব চেয়ে ভালো লাগে। একবার ত্রাসেন্-  
এ—কিন্তু কদু? পরিতোষ? আর তো থাক বায় না।”

“প্রাভা রেডি: কিন্তু চা? ওটাকে অ্যান্টিসাইট্-  
কিনার বলে’ বর্জন করবে না তো?...”

দরমার কাছে এসে অতীতা মিটি হেসে বললে, “কাল  
আবার আসছেন তো, ঈর্ষ্য বাবু? আপনার সঙ্গে আলোপ  
হ’লে পরিতোষের দামা খুব খুশি হ’বেন;—বিলত-টিলেত-  
মুখে তাঁর ভক্তিস্রভা এখনো যে কি অসাধারণ, সেখানে  
অবাক্ হ’য়ে যাবেন। এমন কি, মানিককে পাঠিয়ে  
বলে’ এখন থেকেই একটা এস্‌ভাউমেণ্ট করেছেন।”

পরিতোষ হজাপভাবে বললে, “হর্ষ কালকেই র’টি  
চলে’ যাবে;—কত করে’ নন্দান—”

অতীতার মুখ ভালো করে’ রান হ’তে না হ’তেই আবার  
উজ্জল হ’য়ে উঠলো।—“তাই তো! কিছুতেই আর থাকতে  
পারেন না বুকি? কিরে এসে গুঁর বা আপ-পোষটাই হ’বে।  
থাক্—তবু ভাগিন্স্ আমার সঙ্গে দেখা হ’ল।”

বলতে বলতে অতীতা দেহের এমন একটা জ্ঞানী  
কক্ষণে যে ঈর্ষ্য যখন যে রাস্তায় বেঠিয়ে হাচ্ছিলে কোনো,  
তা পরিতোষের চোখেই পড়তে পারলো না।

রাস্তায় প্রত্যেকটি লাইটপোস্ট তখন ঈর্ষ্যের কানে  
চাঁৎকার করে’ কলছে, “বাও, বাও, পাগাও—পাগাও  
এখন থেকে, ঈর্ষ্যগিরি বাও।” কোথায় যাবে সে? যেন-  
একশোটা কুতে তা’কে তড়া করেছে, এই তাই হুঁইতে-  
ছুঁতে—গা, হুঁতে-ছুঁতেও এ বলা: রোডে এসে উপস্থিত

হ'ল। "এহ, টাকুদি!" কোথায় যা'বে? নাটো-মনির? চুলোয় থাক নাটো-মনির! "বাও—হাঁকাও, মোরসে হাঁকাও!" কোথাও যা'বে না!—এমনি বুঝে বেড়ায়ে খানিকক্ষণ, বহুক্ষণ না তাঁর ঘুম পাৰে।

এইমাত্র যা'কে চিত্তেই তুলে' গিয়ে, নিরুদ্ভাসে কাঠে আঙন ঘুরিয়ে শুধু এক মুঠো ছাই চাতে করে' নিয়ে এলাম, বাড়ি ফিরে'ই থি' দেখি, সে চোরের বসে' আমার চক্কর অংকল! কলঙ্ক—সে বিষমগ্র বৃদ্ধি এর চেয়ে নিমাকল, এতখানি মর্মান্তিক নয়! তাঁর চেয়েও আশঙ্ক্য। বোঝ হুগ এই যে একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে একদিন তাঁর মনে খেঁপকড় খেঁড়ছিলো, এতদিনেও সে সেটাকে উপড়ে ফেলতে পারলো না। একদিন লক্ষিণা হাওয়া নিরেছিলো, কুল ফুটেছিলো—তারপর চার বছরের অনাটন, গর্ভিক! কুল জলি তো ময়ে' গেছে, কিন্তু তাঁর গুড এখনো বুঝে' বেড়ায় কেন? ... এই চার বছরে ঐহর্ষ সারা পৃথিবী চরে' বেরিয়েছে; পাশ করে'ছে হু'টো, কিন্তু গ্রোম করেছে জায় হু'শো। তারপর বেলে খোয়ায় ফুটলো ইলা—সে কোনোমতে একটা চাকুরি বাগাতে পারলেই তাঁকে দিয়ে কল্‌ব, একথা সে তাঁকে বেশ পরিকার করে'ই বুঝতে দিয়েছে। ঐহর্ষ তো জানতো, 'মতঙ্গী তাঁর মন থেকে একবারে মুছ' গেছে—শিশুর মাঝুলের থবায় চোটের সতল 'মাকি'কি যেমন বুঝে' যায়; 'মতঙ্গী মরে' গেছে; এক কাল্পনে যে-কুল ফোটে, আরেক কাল্পনে সে আবার বেথা বেহা হু'টে, কিন্তু যে-মাহু'র জ্বা'ল মরে, কাল তো সে ফিরে' আসে না! সত্যি কথা বলতে কি, এই চার বছর সে 'অত্যাশঙ্ক' কিলেব 'অত্যাশ' করেনি;—মতঙ্গীর প্রতি দে-রোহ ও আক্রোশ নিয়ে সে বয়ে থেকে জাহায়ে উঠেছিলো, বিগেতে হালদানেক কাটানোর পর তাঁর কোনিটিই বৈধ ছিলো না; তারপর কিছুদিন রক্ত-চাঁক-কল' মতঙ্গীর কথা বলে' বেইন্ বা ছুঁয়ার স্রব্দ সে হালদানি করতো। বটে, কিন্তু ক্রমে অত্যাশঙ্ক মতখানি গাথা'কি দিয়ে বহু কল্‌বও তাঁর মন ত্রিভুব হয়ে উঠলো। গ্রামপড়—ঐহর্ষ সেই সব দিনগুলিকে তর-তর করে' ধুঁজে দেখলে—তারপর সে কিলেব বন্ধি ছিলো, মতঙ্গীর কথা কথাকি মনে পড়েছে, আর ধা-ও পড়েছে, তা কোনো ব্রহ্ম,

ওষ, ক্রোধ, প্রণ, বিপ্ল, লক্ষ্য, অনুভব, বাসনা—কিছুই সবেই নয়। এমনি।

সেই মতঙ্গী! চ'নদীর বল এক মানে যেখানে যেমন কিছুতেই তাঁদের আর আশালা করে' নে'য়া যায় না, তেমনি তাঁদের ও'লনের মোহনের ভক্তাভক্তি হওয়াও অসম্ভব—এই ব্যর্থতা নিয়ে পনেরো থেকে বাইশ বছর পর্যাণ সে কাটিয়েছে। এক লক্ষ্যের জেগে'না উঠেছিলো—ছাতে বলে' থাকতে-থাকতে হঠাৎ মতঙ্গী তাঁর বৃক বৃথ লুকিয়ে কাপতে বৃক করে' গিলে। ঐহর্ষ বাকুল হ'য়ে বলে'ছিলো, "ও কি? কি হ'ল?" মতঙ্গী তখন বৃথ তুলে' কাটার ভেতর দিয়ে কাপতে-হালতে জবাব দিয়েছিলো, "কিছু মনে কোথো না, ঐ; আর আমার এত ভালো লাগছে যে আমি না কেঁবে পারছি না।"

সেই মতঙ্গী! সেই নী! সে তাঁকে জাক্‌বার মজ তাঁর নামের শেষের অক্ষরটি বেছে নিয়েছিলো; সে তাঁর কাছে কবিতার সেই চির-রহস্যময় "নী" পত জাল'লেও তাঁর জানি হু'য়ো'না, আকাশের মেঘের মত সে ক-ক-ক-ক-ক-বল'ব, জলের মত সে অবাধ, 'আশোর মত সে সহজ। সে তাঁর চুল বা চোখ বা গা'সি বা কাপড়-পরা'র ভদ্রা কিছুই নয়, সব মিলে' যা সব বা'দ দিয়ে সে এমন একটা-কিছু, মাহু'বে যা'কে চেনে না এবং কবিতা যা'র একই মাহাভ পা'র মাহ। সেট নী!

কিন্তু ঐহর্ষেরা শেষে কবিতা লেখ'বার মত নৈতিক অবসতি হ'ল নাকি? এতক্ষণ সে গা হেঁকে দিয়ে শুয়ে ছিলো; এইবার বাড়ি হ'য়ে উঠে' বসে' একটা নিগ্রেট' বসলো। সাত লম্বু ভেঙো নদী শেরির শেষে কিনা একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ের কাছে এসে সে হা'লে পানি পাচ্ছে না, তাঁর নৌকোজু'ব হ'তে চলেছে! অসম্ভব! এ সে কিছুতেই হ'তে দেবে না। নিজে'র ওপর রাগ করে' সে একটা হু' পানি শু'ব শু'ব কর্তে পাগলো। পানের অং-কিলেব নিয়ে তাঁর কিলে'তি বন্ধুরের সঙ্গে কত বে হাসাখা'সি করেছে, সে কথা মনে ক'রে সে শব্দ করে' যেন উঠলো।

টাকুদিটা তখন চোরদা'র হালা রাতা দিয়ে আশে-আশে ঘা'জিলো; হঠাৎ ঐহর্ষাইনের পাশে এক সা'চের



নরিক পাড়িয়ে থাকতে দেখে ঐহব টাকাদি বামিয়ে নেমে পড়লো।

“হেল-ও ! তু’ত্‌নং !”

গায়েব আর, সি, এম্‌ পাপ করে’ হবে কালো। সেপের মাটিতে পা দিতেছে, অসফোর্ডে ঐহবর লগে পড়তো। একবার ঐহবর ঘরে বসে’ তা’রা ভ’লন এক তাড়াতে গেঁহতি ফেঁকতে নিয়ে চঃ বাচ্ছিলো, এমন সময়—বাগাবটা জানাচানি হ’রে বার এবং তাহের প্রত্যেকের চ’সিনি করে’ ফাইন্‌ কর। সেই থেকে তা’দের চ’তনে খুব ভাব।

এমন সময়ে এতন বছর বেগা গেয়ে ঐহব বেন চঃবত্র থেকে ভেগে উঠে’ গতির নিঃশাস কেলসো। চ’তনেই বহুব পুদি হ’তে বহু। তা’রা পার হ’রে তা’রা চুকলো গিয়ে কতিনেটল্‌ চোটলে। খেতে খেতে কবার বর্ষ, চাঙ্গর দিলারটি ! সে কত পুরোনো কথা। চানি কি কহছে, ওষট্টরম্‌ মন্তে কি ভাবন নবর পেয়েছিলো, নিরামিমতো’ী সুন্দর সিংকে একদিন ওঠা ফাঁকি দিয়ে মাগি বাইয়ে দিয়েছিলো—তারপর টের গেয়ে লোকটা ভেমন কপে দিয়েছিলো, শামেলার বিয়ে হ’ল কিনা—ইন্সপেক্‌জির ছাত্র ঐ ইদ্যাবারামটার সম্বন্ধে তো ! —যাগায়েটু কেনেতি আর কোনো বই লিখলে কিনা, কোনো প্যারিসে গিয়ে সতিা ছবি আঁকা শিখছে তো ! রোজামন্‌, সোয়ান্‌-এর লগে আর বেগা হয়েছিলো ? কে ? রোজামন্‌— ? ও, সেই নভেলিস্ট ! ইয়া—তা’র শরীর ভালো না, এখন ত্রিসটলে আছে, বুড়া বাগকেও নিয়ে গেছে লগে—খাশা মেরে ! খাশা চেতারা ! সেই বাড়িওয়ালা ছা’ল্লর চেতারা’র কল ওয়লোক সেই যে মিষ্টায়াপাখিত্তি-তিতি না কি কাঁচকলার নাম—ওয়লোক ওকে দেখেই খেগে গেলেন—এবুনি লাখ কথা !

কিছু লাখ কণার এক কথাটা ঐহব বসলে বাইরে এসে : “জানো, এইমাত্র আমার বহুচ্‌ হুইট্‌স্‌ট্‌-এর লগে বেগা হয়েছিলো।”

“কাকে বিয়ে করেছে ? বুড়া বড়লোক, না গরীব আর্টিস্ট ?”

“গরীব, কিন্তু আর্টিস্ট নয়।”

“তারপর ? তোমার অর্থটো কি ? সেই যে কি একটা

পত্র আছে—মনে নেই ?—

“When the swift-spoken when ?

slowly-breathed Arab !

Make us half-love the maiden and half-hate the lover.”

না র্কা ?—ভেমনি কি ? কা’র লেখা যে ওটা ? আর্টিস্ট ! নাম টামগুলো আমার কোনো কালেও যদি মনে থাকতো ?”—বস্তুতে-বস্তুতে লগেই গলা ছেঁকে গেয়ে উঠলো,

“My Rosemarie, I love you!”

ক্রিসি টেবিলের ধারে ছোট চেয়ারটির গায়ে চাবর আর শাঞ্জাখি ছুঁড়ে’ ফেলে ঐহব দাঁধ একটা নিঃশাস ছাড়লো—“উহ্‌..”

বাতলে। এক দমকে চার বকী কলম গিথে’ পদ্যকার হল থেকে বেরিয়েও এত জ্বাভ সে হয় নি। সাতাটা দিন মাঝাশে হাতার কেটে ছোট পাখাটি বে-ক্রাতি নিয়ে লঙ্কার সময় তা’র নাকে কিহে’ আসে, ঐহবর হুই চোখে সেই জ্বাভ ঘুন হ’রে ভুলছে। শাখা, নির্ভাল, সম্বলের মত কোমল তা’র বিছনার দিকে তাকিয়ে সে পতীর আরায়ে একটা হাই ভুললে। আর—এইবার শোয়া থাক।

ক্রিসি: আরনার দিকে তাকিয়ে সে চট্‌চ টুক্‌ উঠলো। আরনার ভেতর থেকে ইগা তীক্ষ্ণ-উজ্জল ছুই চোপ মেলে তা’র পানে তাকিয়ে আছে, তা’র ঠোঁটের এক কোণ ঈষৎ ঝাঁক। বিগলত-কেষত ডক্টরের কুকটীএ একবার লগ্‌ করে’ উঠলো। ও, ইলার সেই কোট্রিয়ার্‌হু ! ঐহব সেটা বিহরের কাছে রেখে শোব, কিন্তু এক-কেন ভুলে’ সেটা আরনার দিকে দুপ ঘুরিয়ে রেখেছে। জি ভাতা ! আর একটু হ’লেই সে তর পেয়ে সেতলো আর কি !

ছবিটি সরিয়ে এনে সে ভালো করে’ দেখে’ত লাগলো। ইয়া, সুন্দর বাটে ! অন্তরীণ চেয়ে—কথাটা সে বেন সিলের

অজানিতেই ভেবে ফেলিলো—অতীতের চেয়ে অতীত মনস্তত্ত্ব  
সুন্দর! এই মেয়ে তাঁ'কে নিয়ে কতই পারলে বেঁচে যায়,  
একথা ভাবতে আনন্দপ্রসঙ্গের সে নিভের মনে একটু  
হাসিলে। অতীতকে এই ছবিখানা দেখালে কেমন হয়;—  
তাঁই বা কেন?—আলপটীকি কি দেখানো যায় না? অতীত  
কী মনে করবে? যুগেরের ভক্ত একটা অনির্দিষ্ট ব্যাকুলতা  
কি তাঁ'কে প্রান করে দেবে না? একটুখানি কোমল, গুণে  
বা ঈশা—কিছুই কি হ'তে নেই? আচ্ছা পরব্ব্ব করে'ট  
দেখা থাক্ না। এক মাসের মধ্যেই ইলাকে সে বিয়ে  
করবে—এই কল্‌কাতায়। সে-বিয়েরে অতীতের নেমন্ত্রণ  
হ'বে—বাসীপুত্রপ্রমত্তিবাঘারে সে আসবে—কল্লসানো চোখ  
আর নিভুড়ানো গুবর নিয়ে কিরে' থাকে।

ঘুর লোক অতীত! ইলা—ইলা! সে আর চোঁচেরে  
ডেকে উঠেছিলো! ছবিটি হাতে তুলে' সে একবার চুপন  
করলো। 'ছবির ঠাণ্ডা চোঁচ তাঁ'র এ মাঝের একটুও  
লাড়া বিলে না। তাঁ'র কেমন সেন ভক্ত-ভব কহতে  
লাগলো। ইলার চোঁচও এমনি ঠাণ্ডা, নিরন্তর হ'য়ে  
সেলো না তো? না, না—আর যে'র নয়! সে আচ্ছাই  
হাঁচি বা'বে;—একুনি! ইলার হৃদয় চিত্তির কথা শ্রবণ  
করে' সমস্ত ছবর তাঁ'র গান গেয়ে উঠলো।

সাত্‌কেশনী! হাঁচি একু'গ্রেস্ ছেড়ে গেছে। কল্লিত  
হতে সে সেবিনকার "স্টেটস্‌ম্যান্"—এর পাতা উন্টাতে  
লাগলো। ইলা—এই যে, একখানা পেশপ্ দিয়েছে—  
এগারোটা বাইশ মিনিটে হাওড়া ছাড়বে, কাল বেলা লপটা-  
নাগাল পুকুরিয়া—ওপূর্ববেলা হানাহারের পর কাইয়ের  
ভায়ে হু'খানা রকি চেয়ার টেনে নিয়ে সে আর ইলা—!

কিন মিনিটের মধ্যে সে জিনিদপতর শুঁড়িয়ে ফেললো।  
বিব্রনা? থাক্ সে—অত জ্বাকাম ক'ব্বার সময় নেই।  
ভারপর এইমাত্র পরিত্যক্ত পাঞ্জাবি পড়ে', চামরটা কোনো-  
মতে পার হাড়িয়ে আয়নার সামনে ঝাঁকিয়ে সে চুলটা একটু  
ঝাঁকড়ে' নিতে লাগলো। ব্রেজি আয়নার নিককে আপা-  
দত্তক নিরীকণ ক'রে সে বেগ বুর্সিই হ'ল। লোকে বলে,  
সে নাকি দেখতে খুব সুন্দর! ইলা, তাঁই কটে। ছোট  
চোরাটতে বসে' গড়ে' সে নিজের মুখ ভালো করে' দেখতে

লাগলো। চওড়া কপাল—তাঁ'তে ছোট-ছোট নান  
শিরাতলো একটু-একটু দেখা যায়, চুল মাগলে কালো,  
কিন্তু এখন একটু হাল্কা বাবামীর আমেজ লেগেছে, চোখ  
ভাঁটো ভাঁটি বাগানী—অর্থাৎ মিল্মিলে কালো, নাকটা  
গ্রীক্, ওপরের চোঁচ নীচের চাইতে একটু পুরু  
হওয়াতে বুবে কেমন একটা সুহহার ছাপ পড়েছে—  
কোটল্-এরও নাকি ঐ রকম ছিলো—বুতনিটা ইবং দক্ষিণ  
হওয়ার হঠাৎ দেখলে লোকটাকে হতচির বলে' চুল হয়;  
রঙ, চিরকালই কদা, তবে বিশেষ যুগে' এসে জারো  
হচ্ছে। ইয়োয়োগ ও আমেরিকার বিভিন্ন ভায়গার নানা  
লোকে তাঁ'কে জিজ্ঞেস করত্বে, "তুমি কোন্ জাতি?"  
এ-প্রশ্নের তাঁ'র এক বাঁধা জবাব ছিলো, "Guess"। কেউ  
বলেছে ইতালিয়ান, কেউ স্প্যানিশ, কেউ বা জু, খেঁদ  
ভাগই বলেছে ফ্রেন্, একজন বলেছিলো পোল্, এমন  
কি অনেক তাঁ'কে ইংরেজ বা আইরিশ্ও ভেবেছিলো—  
কিন্তু বাগানী বলে' কেউ মনে করে নি। এবং সে এখন  
তাঁ'র পরিচর ব্যক্ত করতো, তখন মহারই চোখে সে যে-  
বিশ্বাস হুটে' উঠতে দেখেছে, তাঁ'র মানে—এই: "মহাত্মা  
বাগানীর এমন চোখটা হয়?"—নিভের প্রতিবিশ্বের বি-  
ভাকিয়ে সে পঙ্কিতভাবে হাসলে।

আচ্ছা, অতীত কি কপালের নীচে হু'তে চোখ ছিল  
না? আচ্ছা—এখন, এই যুগেরে একা বিচ্ছিন্ন—না, না,  
একা তো নয়! 'বাসীপুত্র নিয়ে বিচ্ছিন্ন হ'বে-হ'বে' কি ওর  
মনে একটুখানি অসুতাপও হচ্ছে না? সব মিলে' শ্রীচর্চ  
কি যথেষ্ট শোভনীয় নয়? কিন্তু অতীত তো ঈশ্বরত্বের  
আর ছাড়া পাবে না! অতীত কাছেরে সে এখন আকাশের  
চাঁদের মতই প্রস্পষ্ট অথচ দুঃসাপ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার  
সেই কাশীর মত সে বতই না কেন তাঁ'র পানে চাত  
বাড়িয়ে কাঁদক্, কখনো নাগাল পা'বে না। বাঃ, কী মজা!

আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? অতীতকে  
কি খুব স্পষ্ট করে' জামিতে দেখা যায় না যে, সে যা হাতের  
যুগের নিয়ে ভাঙপর পায়ে'র তলায় ফেলে দিয়েছে, তা  
তাঁ'র বুকের মনি হ'লেই মানাতো, কিবা ভাঙ মানাতো  
না! কীভাবে প্রাণগার পৌরবে সম্মানে আনবে উমল



তার জীবনের সবগুলো যদি একত্র করে' সেই মাঝামাঝ দাঁড়ি সে অন্তরীক দুখের ওপর ছুঁড়ে' মাঝবে; অন্তরীক থেকে উঠবে, বাবার তার বুকের কলকলানি ঘোড় দিগে উঠবে; যা সে চািরিয়েছে, অথচ যা তার হ'তে পারতো, তারি জন্তে প্রকল ব্যাকুলতার দারা মন তার সেটে পড়বে। সে তারি মন্য চর, না ?

এ কি ? এগারোটা-বারো ? হোকগে—আজ সে যাচ্ছে না। 'আজ তো নাই, ঈশ্বরিও না। ইলাকে লিখে' দেবে তার অল্প করেছে—আজ পরিতোষ, পরিতোষকে যা-তা একটা-কিছু বলে' বিশেষেই চলবে। শুকোনো ছাউকস্টির বিকে একবার তাকিয়ে সে আমো নিবিবে দিলে।

জাপন ও নিহার মাসামারি যে-একটা অপরূপী অপরূপী আছে, সেটুকু সময়ে তার মাথায় খেলে গেলে,

"Self-love the maiden and half-hate the lover !"

পরদিন সকালে—ঈশ্বর তখন খুব ডেঙেছে, কিন্তু তখনো সে বিছনা ছেড়ে ওঠেনি—পরিতোষ নিজেই এসে গাঝির। তারে দেখেই ঈশ্বর অগা হ'ল যে সে তারকে আবার কলকাতায় আয়ো কিছুদিন থেকে বাবার জন্ত অমুরোণ করতে এসেছে;—তা হ'লে ঈশ্বর শকে সবি স্তম্ভ হ'য়ে আসে! বানিয়ে কদা-বদার বাপারে সে চিবকালই কেমন একটু কাঁচা।

কিন্তু পরিতোষ পথম যে-কথা শুণালে, তা হচ্ছে এই, "কালকে 'বোড়সী' কেমন লাগলো?"

অসম্ভব নয়—ঈশ্বর মনে হ'ল—অন্তরীক জরতো পরে পরিতোষকে নিয়ে নাট্য-মঞ্চিতে গিয়াছিলো, এক তারকে দেখতে পার নি। তাই একটু ভক্ত-ভবে সে বললে, "মিড্‌লিং। কিন্তু শোক কল্লে, শিশির বাবু অধিনয় নাকি খুব কম রাস্তিরেই এমন perfect হয়েছ। বিশেষেই পাচ্ছ।"

"কোথার আর বাওয়া হ'ল তাই! তুমি চলে' বাওয়ার পর বোধির শুধু শায়ে দ্বস্তে বাক রেখেছি—অপট উনি কেন যে কিছুতেই রাগি চ'লেন না। উপরানই জানেন। তারপর আমার আর একা-একা খেতে ইচ্ছে করলো না।"

"তা করবে তো না-ই। খিচোরি-খিচোরি দেখতে গেলে একজন দলী; মইলে ভাল লাগে না। আমি একা কিছুম বলে'ই বোম হই ততটা ভালো লাগেনি। কিন্তু শিশির বাবু—ইয়া, আশ্চর্য্য বাটে। মানে বাঙালো বেশের শকে। বিশেষ বাওয়ার আগে আমি একদিন মাত্র বাঙালো খিচোরি দেখেছিলাম—কিছু যাই বল, শিশির-বাবুর দৌলতে বাঙালো খিচোরি এক রাগে পকাশ বছর এগিয়ে গেছে—ঈশ্বর যখন খই দুটো লাগলো। পরিতোষ কিছুতেই অস্ত কোনো কথা পড়বার সুদয় পাচ্ছিলো না, এমন সময় চাকর এসে বিজ্ঞপ্ত করলে যে, এখন তা মানতে হ'বে কি না।

দুনাচাখ'র কীষ্টি-কারিনীর মাঝখানে দ্বাং দেখে গিয়ে ঈশ্বর জবাব দিলে, "ইয়া, নিয়ে এসো। হ'রনের স্তত। না যে, উঠতে হয়।"

পরিতোষ ত্রেসি: টেবিলের বাপের ছোট চেয়ারটিতে বসে' ছিলো; সেই সময় মেঝের ওপর বৈবায় জোখ পড়তেই সে বলে' উঠলো, "এ কি ?" তারপর নীচু হ'য়ে ইলার কোটোগ্রাফ'ট তুলে' জোখ মিটমিট করে' বললে, "এত অব্যবহাং যে?"

ঈশ্বর কোটোটি নিজের হাতে নিয়ে গলাটা ঠঠে' ছুঁতলো করে' বললে, "ও ভিন্নস্, ভিন্নস্!" কি করে' পড়লো যে? আমি তো শোবার আগের একবার দেখে হেসেছিলাম!"

"শকণ বিশেষ ভালো নয় যে। ইলাকে লিখে দাও—না, লিখে আর হবে কি?—আজ তো যাঁহই। কেবা হ'লে বোশো—"

ঈশ্বর তাবুলে, এ সুযোগ ব্যবহারো উচিত নয়। চুলচুলির ভেতর হাত ঢালাতে-ঢালাতে সে অলসভাবে বললে, "না যে, আজ বাওয়া হয় কি না দেখে।"

"কেন ?" পরিতোষ দাঁতাই অমাক হ'ল।

## ঐশ্বর্যবোধ

চাপ্‌বার ভক্ত একটু সময় পাবে ব'লে ঐশ্বর্য বিজ্ঞান থেকে উঠে পড়লো, তারপর চট্টোষাড়া খুঁজে বা'র করতে বসলো। সুখ দেয় করে, আনন্দের কাছে দিয়ে থাকলো একবার খুঁজলে বসল, বোঝো না তাই বিশেষ কথা।" ব'লেই থেমে গেলো।

পরিচোব উৎকর্ষিত করে শুধালো, "কি?"

এতক্ষণে ঐশ্বর্য মনে গরটা আগাগোড়া তৈরী হয়ে গিয়েছিলো; সে তাকাতাকি এলতে লাগলো, "কাল চঠানি; কাউলিঙের সঙ্গে দেখা। নাট্যমন্ডিরে পবে একবার সাঙ্গু ভাগিনতে গেছলাম সিনেট, কিনতে—হুটপাখ-এ নাওতেই দেখা। ছিলো নৌভূ ইউনিভার্সিটিতে একটা লেকচারার, এখন নাকি হেজুন্-এ প্রফেসর হয়েছে—মাইনে চান্‌ছে লখা। বসল, শুধানে একটা চাকরি খালি হয়েছে, আমি যদি—ইত্যাদি। কাউলিঙ, এখনে কিছুদিন থাকবে, তাকে পটাতে সাঙ্গু চাকরিটা বাগানো যায় বোধ হয়। ছ'শোতে স্টার্ট—খোজ হচ্ছে হে! তাই ভাবছিলাম—"কি ব'লে যে ঐশ্বর্য কপাটা পের কল্পে, ভালো ক'রে বোকা গেছলো না।

পরিচোব কিছু বুনি হ'তে একটুও থিবা কল্পে না। পরম উৎসাহে বলে উঠলো, "বাং, ওয়ান্ডারফুল! বাই কলো, কপাল বটে তোমার! মাল ছ'লো, পাশে ইলা—বাং, এই পুখিবিটা 'is paradise now'! আর কি চাই!"

ঐশ্বর্য পরিচোবের উৎসাহে থাকা দিয়ে বললে, "এই যে, চা।" তারপর চা-য়ে এক চুমুক দিয়ে এক টুকরো কটি আঙুল দিয়ে নাকতে নাকতে সস্তীর ভাবে বললে, "Seriously, এটার ভক্ত ছোটো করবো, জাব্বি। একটোকিছু না কল্পে চলবে না এখন। তাই আর বোধ হয় আমার বাওগা হ'ল না। কিন্তু..."

ঐশ্বর্য যেন সজা-সজা চলে যায়, আর যেন কখনো না আসে—সে-মানে সে বসন্তের বেগে ছিলো, এবং সুমোবার

পরও ছেলেদের মধ্যে—অতীত এই প্রার্থনা করেছে। নিজের কাছে সে বার বার বলছিলো যে, ঐশ্বর্যকে সে পূজা করে—কিবা তা-ও করে না,—মোট কথা, তার বর্তমান জীবনের সুনির্দিষ্ট মায়েবনে ঐশ্বর্যর আলো কোনো প্রয়োজন নেই। পুণিয়ার আকাশে একটা মন্ত কালো পানী ডানা কাপটে উড়ে' গেলে নীচে নবীর বুকে দুহুস্তের ভক্ত খে-ছাখাখানি টপ্পল করে' ওঠে, এবেখা, দুপূর্ণ গোমুদিত প্রবর্ণ-পথে এই চকিতের দৃষ্টি-বিনিময়, যেন তার চোখও ক্ষণিক, তার চোখও অব্যবহ হয়। একৌবনটা যেন একটা প্রকাণ্ড ঘোষকখানা;—পক্ষ-পক্ষ পথ-এক-এক, বার-বার পরস্পরকে অতিক্রম করে' গেলে,--আমরা দাগা-জীবন অচিরে মত পূর্ব-পূরে হেঁটে গেলেছি—বেকবার পদ এক মুঠাই জানে। মাত্র চঠানি ঐশ্বর্যর পথ অন্তরী পথের ওপর এসে পড়েছে;—কিন্তু—অতীত প্রার্থনা করে—তার পথের পথের হাঁকই যেন তার একে অস্ত্র দিকে নিয়ে যায়। একাড়া কাটলে হঠাৎ চিরন্তনের মত সে বেঁচে থাকে।

কিন্তু পরের সন্ধ্যার মাঝার ঐশ্বর্যকে দেখে সে বসলো একপাশ করেছিলো, আসলেও ততটা বিশ্বাস অস্তব করেছিলো কি? অতীতই জানে। তার না-গাওগার যে-দব অনিবার্য কারণ ঐশ্বর্য বিজ্ঞান, করে' উজ্জ্বল করলে, লে-গুলো যেন সে গায়েই মাখলো না। বেব পরোব না মেখে কিছুই বলা যায় না—এই বসন্তের একটা অনিশ্চিত সম্বন্ধের উৎসে কি তার মনে আগাগোড়াই ছিলো? গতরাতে যখন সে সন্ধ্যাকরণে ঐশ্বর্যর বিহার-কামনা করছিলো, তখন সেই প্রার্থনার অন্তরালে আর একটা কাল ঐশ্বর্য-সুত প্রার্থনা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো—তা কিসের ভক্ত? অতীত নিজেই ভেবে গেলো না।

বহুর-হুঁসেকর একটা নিকার-গা ছেলেকে কোলে করে' যে-ভ্রমোক্তিকি ঘরে এসেন, পারসর না থাকলেও ঐশ্বর্যর তাকে চিন্তে ভূপ হয় নি। প্রত্যেক মাহুয়ের দুপেই কিছুকাল পরে তার পেশার একটা বিশিষ্ট ছাপ পড়ে' যায়; কিন্তু ইহুদমারিগিতে সে-ছাপ বস নাগদির ও ঘত দুচলবে পড়ে, তেমন আর-কিছুতেই নয়। ভ্রমণোক্তক যুখে ইহুদমারিগির সবলি লক্ষ্য করতলে অল্প প্রকাশ্য মত





হৃৎপট্ট বর্তমান। অকালেই যেন খুঁড়িয়ে গেছেন, কপালের নীচেরকার চান্দ্রাঙ্গ এগুনি চিহ্ন ধরেছে, চণ্ডমার পেছনের চোপ ও'টি মাছের চোখের মতই বড় ও পরিষ্কার, কিন্তু তেমনি নিশাণ। ঐর্ষ্য গভীরে আনন্দ-বেগা একটি প্রাণরসোজল মুখশ্রী কথা না চেবে পাগলে না; নিজের অনিচ্ছাসহে তার তেঁটে হালকা একটি হালি উঠে এসে।

মাণিক্যে শূণ্যকিণ ওপর নামিয়ে রেখে হৃৎপট্ট একটু ভেত-ভেত ঐর্ষ্যর দিকে এগিয়ে এসে নিভাঙ্ক হৃৎপট্টাৎ আলো আনন্দ করলে, "আপনার সঙ্গে আলো করবার পোতাঙ্গ হ'বে, আপা করিনি, উত্তর সহকার। কাল দিবে এসে পরিতোষের মুখে যখন শুদ্ধাম—এত ব্যাথা লাগে ছিলো। বাক, আপনি এখন থেকে নীলগিরি যাচ্ছেন না যখন—"

"কিছুই ঠিক নেই আমার। যদি ডাক পড়ে, তা'লে রিন-হাটেকের মতো হেঁচনের কাছাকাছি চাপতে হ'তে পারে। ওক'র নাকি আবার পুতোর ছুটি-ছুটি না বাকুবার মধ্যেই। আর, এটা কলকালে কবে যে আবার একটা ছুটেবে, কেউ বলতে পারে না।"

"আপনার আবার ভাবনা কি, উত্তর সহকার! আপনাতা হ'লেন দিবে দেশের পৌর, বেকানো কলেজ আপনাকে শেলে মজু হ'য়ে যা'বে।"

লজিত হ'লে মাহুদ বাবা করে ঐর্ষ্য সব জানুজো, সে ভেবে-ভেবে তাই করলে। প্রথমে মাথা নীচু করলে, তারপর চুলে একবার হাত বুগিয়ে আনু-আনু করে' কবাব দিলে, "না, না, ওসব পৌর-টৌরব কিছু কাজের কথা নয়। দয়া করে' কেউ একটা নক্সি বের তো করে' যাই।"

পরিতোষ মল করে' বলে' কলসো, "কেন রে বাবু, তোমার এমন কি দার ঠেকছে যে চাকির মজ মাথা বুঁড়ে' মজতে হ'বে? আমি যদি তুমি হ'তুম, তা'লে কি করতুম জানো?—অর্থাৎ কিছুই না। কিছু-না-করার বিবেচনা কিছুতেই তোমার আদত চল না;—ছুটকটানি তোমার একটা ব্যাধি।"

"এ-বাদি ও-দেশে সব লোকেরই আছে কিনা—আমারো বোঝে চর চৌরাজ দেখেছে। গাভী, হাটে কোনো কাল-কল না থাকলে প্রতিটি দণ্ড আমার কাছে যেন বিঘন মণ্ড মনে হয়। আপনিই বসুন হৃৎপট্ট বাবু, না বাটলে কি আর দিন কাটে?"

"আপনি এতখানি বলতে পারেন, উত্তর সহকার!"—হৃৎপট্ট একবার কাশলে—"কিছু আমরা—বা'র: খানি যেটে-খেটে জীবনটা কল করছি, তা'দের সঙ্গে একটু আশ্রম বা ক্রিয়াম এমনি ভূগত যে ক্রমে কাল বলতেই আমাদের গায়ে যেন কাপুনি দিয়ে জর আসে।"

"অথচ সেই কাজই তো করে' যেতে হচ্ছে! নিছক যখন নেই-ই তখন প্রতিদিন নিয়ের সঙ্গে ফলত না করে' ভালো-ভালোর একটা মাগোষ করে' বেশাই কি প্রের নয়? যেহেতু, ওদের সঙ্গে আমাদের গোড়াতেই তফাৎ। অর্থাৎ মনের দিক থেকে—বাইরের বিন্যাস বা রিক্ততার কথা ছেড়ে দিলেও। কাজে নিমিষ্টা আমাদের কাছে হচ্ছে একটা লাভা, আর ওদের কাছে মজা। জীবনকে আমরা একটা অম্ল বসে' জায়েতে শিখি, আর ওদের মতে বেঁচে থাকটাই হচ্ছে হৃৎপট্ট। না করলেই নয় বলে' আমরা কাল করি, তাই কালে মন বলে না—এব: সেই কাজের চাপে মন আমাদের মতের যায়।"

ঐর্ষ্য বোধ হয় বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞা করে' বেরিয়েছিলো যে, আজ সে ডাক লাগাবে। লাগালেও। হৃৎপট্ট তার বাকচালনার মবাক হ'য়ে হা করে' তাকিয়ে আছে, পরিতোষ তার সমস্ত চোপ মুখ দিয়ে ঐর্ষ্যর কথার সার দিচ্ছে। ঐর্ষ্য একবার অন্তর্গীর দিকে তাকালে—সে তা'দের দিকে শেহন দিগিরে বলে' মাণিক্যকে হাঁড়ির ওপর বসিয়ে তার সঙ্গে গজ করছে।

হৃৎপট্টের মজ ঐর্ষ্য এই একটুখানি যেনে' বাড়িলো, কিন্তু হৃৎপট্টের গ্রহণ কোঁকুল ও একান্ত প্রাণসো ঠেকতে না পেরে সে আগার আগালে জেনে' সেলো। অকস্মাৎ খানিকক্ষণ সেই তায়ে হুপ করে' বলে' রইলো, তারপর এক সময় উঠে' মাণিক্যকে নিয়ে ওপরে চলে' দেখো।

বাধার সময় পরিত্যক্তের নিজস্ব সূক্ষ্ম উত্তরে জানিয়ে গেলো যে, আশিকের গুণ বাধার সময় হয়েছে।

তিন বকী পরে অতীত একা বাইরের দূরে বসে ছিলো। একটু আগে আঙা ভেঙেছে—বাসীর প্রতি শব্দকণের সঙ্গে যেন ঐহিকের প্রশংসা উৎপল পড়ছে, পরিতোষেরো গুলি আর ধরে না—তারি বন্ধ কিনা! ঐহিক অতীতেরই শুধু কেউ নয়—কিছু নয়। অতীতের টেড়িয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছা করলো।

ইল—বহুটা কী মোক্তার হয়েছে! দিগন্তের টুকরো আর ছায়ে সারা বর একাকার! এখনো তেমনি বুড়ো আঙুলে ঢোকা দিয়ে ছাই কাড়ে! সে একটা টুকরো হাতে তুলে' বেব'লে;—সেই মটেই এক্সপ্রেস! আর—কাল থেকে একটা আন্-টো-ক্রে কিছু রাখতে হবে। গাজটাক থেকে একটু খাঁট বে'গাতে ৯৮—বা'স্ পে, সে নিজেই বেব'ধন। কালকের স্থলভালা একেবারে তকিরে পেছে, কল্ল কল্লতে ৯৮! স্থলধান থেকে সেই রজনীগন্ধার গন্ধ তুলে নিয়ে কল্লবার গন্ধ বাইরের দরজার কাছে যেতেই স্থলভালা আশনা হ'তেই তার হাত থেকে খসে' পড়ে' গেলো।

"এ কী? আবার এসেছো কেন?"

ঐহিক পাখরের মত মুখ করে' বললে, "দিগন্ত-কেমটা কেনেই ছাড়ালাম।"

আগুণের সর্বনাশ এখন হয়, একটা দুহুর্ন্তেই হয়। সেই দুহুর্ন্ত অতীতের ভাবনে এসেছে। একটা দুহুর্ন্তের গন্ধ তার মনের পানল আন্দা হ'য়ে গেলো; কেন, কেউ বলতে পারে না—সেই দুহুর্ন্তে, সে কে এবং কোথায়, সব যেন সে একেবারে তুলে' গেলো। সেই পুরোনো মাদি হেসে সেই পুরোনো কণ্ঠস্বরে বললে, "সত্যি?"

একাত্ত একটা বাড়ির তলাকার মাটি পয়রা ধারালো মল যেমন চুপে চুপে গেয়ে যায়, তারপর একদিন হঠাৎ একটা টেড়িয়ে কাশটেই সাহাটা বাড়ি শুড়িয়ে চুরমার হ'য়ে যায়, তেমনি অতীতের মুখে এই একটু কথা শুনে' ঐহিকের দুহুর্ন্ত আন্-আন্না ও এগাড়ি আন্-রক্তা কেটে ভেঙে চৌড়ির হ'য়ে গেলো। দুহুর্ন্তপূর্ণ বোধ-বুধ ছিলো জগৎব্যবের সূক্ষ্ম মতই

মাকসর, সেখানে জাগরিত মাংসের সমীপ আভা কুটে' উঠলো, একল রক্তের ঢলোফরাং সে-মুখ পরম হ'য়ে উঠেছে। ঐহিকের কণ্ঠে আর সেই পান-গাধানো পাণিল করা বর নেই; ছোট একটু "হ্যাঁ" বলতে গিয়েই তা এগাঙের আগাঙের মত কপে উঠলো।

যেন ঘুমের ঘোরে অতীত কথা করে' উঠলে, "ভালোই হ'ল।" শুধু তোমাকে দেখলাম। কিন্তু কি-কি—তুমি এ কী ছেলেমাছুরি আরক্ত করেছো বণো তো?"

ঐহিকের ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লেগেছে। চুপ করে' সে বাড়িরে বসিলো।

"আজকে সন্ধ্যার তোমার নিজের প্রেততা প্রমাণ করবার জন্যে কী কাণ্ডটাই করলো! চৌড়ি, গাও পা ছুঁড়ে, মালা-মোকা মূখভা' করে' নিজেকে বেশ লজ্জা দিয়েছিলো বা-হোক! তোমার সব কসরৎ বেবে আমার এত হাসি পাচ্ছিলো! কিন্তু কেন বণো তো? কাক'কে ভয় করবার জন্যে?"

ঐহিক নিকতর।

"মাথো ঐ, বাইরের জাঁক-ভরম চট্ট-ঠমকের তখনই সব চেয়ে প্রাণোন্ন বসি, আসল জিনিসটির ঘন ময়ল-বলা বটে। সন্ধ্যার আভিষমামায়েই গুণের দারিদ্র্যের পরিচয়। নিজেকে পকে-পকে জাহির করে' লুপার তোমার তো কোনো দরকার নেই! কিন্তু আমি কাক'কে কি যোচ্ছি? কপলে আর কাক'কে বলে!" অতীত কল্লবাসে খেমে গেলো।

খানিকক্ষণ গুমনেই চুপচাপ। রাস্তা দিয়ে গটুগটু আগুণ কল্ল-কল্ল-কল্ল একখানা টাক্সি ছুটে গেলো, মাকপ থেকে একটা তারা হঠাৎ ছুটে' পড়লো, একটা আশ্বিনিক মদ্যকা আগুণ পান্নের একটুখানি মজকার যেন শিরিষ' করে' কপে উঠলো। তারপর ঐহিক জাক্লে, "সী।"

"কি, ঐ?"

তারপর আবার গু'কনে চুপ করে' পরশপরের নিঃশ্বাস-টানার শব্দ শুনে' লাগলো। হ'জনে বুঝোমুখি বাড়িরে, কিন্তু আনন্ডা আগুণের কেউ কারো মুখ ভালে ক'রে বেবেতে



পাচ্ছে না। অথচ, একজন একটু হাত বাড়ালেই আর একজনের মাথুনে গিয়ে ঢোক।

কিন্তু স্নিক সেই মুহুর্তে পরিতোষের চাঁৎকার শেনা এগো, “খোঁদি!”

অভিনব ডেকে গেলো, ‘মুখোন্ খল’ গেছে। এইবার নিঃশব্দ সে পুকোবে কি করে?

ঔরঙ্গের ভাববার ক্ষমতা এখন কিরকি? এলো, তখন সে আবিষ্কার করলে যে সে অনেক দূর ও গভীর বোধ করছে। অনেক চরিত্র মন্দির নির্মাণে পড়িয়ে তোতাগাখীর মত তৈরী রাখার দরকার সেই আর,—মন খালস পেয়ে তার উপর এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে ব্রুক করেছে, এখন আর তাকে কোন মতেই বাগানো যাচ্ছে না।

কিন্তু বন্মজাতী বাগের কড়াকড়ির মাকধান থেকে সে যে কেড়ে নিচ্ছে, আর এক ভাগ্যোন্নত বামীর সঙ্গে কড়াকড়ি করে? তা কুড়িয়ে নিতে হ’বে—এই কথা ভাবতেই তখন তার পক্ষাঙ্গ কাটা ঘিরে উঠলো। এসব ব্যাপারে কোনো ভাগ্যচোরা জোড়া-তালিতে সে বিশ্বাস করে না; মাহুরের মনটাকে টান-আনা-শাইতে ভাগ করা চলে না বলে সে-ক্ষেত্রে হিসাব-করা বাগদারী বাটে না, তার ও সত্যার বিশেষতর হুঁটো ভিত্তিও খোঁজতে পারে নি। নির্বীণা একাধর বরং ভালো, কিন্তু একবেলা আলুসেভ-ভাতে সে নারীও।

কাজ কি আর কলাসদ ব্যাকির? মান থাকতে থাকতে মরে’ পড়া থাক! কিন্তু আগের রাজে প্যাক-করা স্ট্রাকেশনটির দিকে তাকিয়ে সে নিজকে বিশ্বাস করবার মত ভরসা পেলো না।...

সুখ বিজ্ঞানের সামনে আলো নিয়ে একথানা উপভাণ পড়তে পড়তে উপভাণ-বদিত চরিত্রের সঙ্গে ঔইখণ্ডে মেলাবার চেষ্টা করছিলো;—অতীত এসে তার হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে ধূস ক’রে তার পানে বসে পড়লো।

সুখ একটু বিরক্ত হ’য়েই ব’লে উঠলো, “ও কি? অহা—সাত বইখানা, একটা তারি মজার—”

“কি ছাই বই নিয়েই যে আচ্ছ বিন-রাত?” অতীত বইখানা বেশ চোরেই টোবলের গুপ্ত খুঁড়ে ফেললো। তারপর বামীর গা খেঁষে আধ-শোরা অবস্থার ছোট পুকার মত আব্দারের সুরে বললে, “গাড়ে মনটার পর বই খুললে এতোক মিনিটে এক জানা জরিমানা—বুকলে? আর থেকে এই নিয়ম হ’ল। জরিমানার পরসী আমার কাছে জমা থাকবে, এবং পরে তা মাগিকের শোষকের খাবার খরচ হবে।”

সুখের বাতবিকই উপভাণের পরিচ্ছদটা শেখ করতে ততানক লোভ ছজ্জিলো, কিন্তু অতীতের কোমল ও ঈষৎস্ন গাভ্রপর্শ তার কাছে ভালোই লাগছিলো, তাই সে কোনো কথা বললে না।

অতীত হঠাৎ পক্ষীর হ’য়ে বললে, “তোমার নামে’ একটা নামিন আছে।”

সুখ তীর সুখের দিকে চেরে বিজ্ঞপ্ত করলে, “কি?” অতীত বামীর একথানা গাভ্র পানের গুপ্ত টেনে নিয়ে বলতে লাগলো, “ঐ যে তোমাদের ভট্টর দরকার না কি—

“ইদ, তাঁর কি হয়েছে?”  
“ঐ লোকটাকে কাণ আবার আসতে বলেছো নাকি?”  
“কাল ব’লে বিশেষ-কিছু নয়, গাব্লে রোমই যেন আসেন, এই অহুতোছ—”

“আমাকে উদ্ধার করেছে একেবারে।  
একটুকো ভাগ্যে লাগে না।”

“সে কি কথা, অতীত? এমন চমৎকার—”  
“চমৎকার না হাতী! তত্নলোক যেন আর না আসেন—  
বুকলে?”

সুখ চুপ-মা-মোড়া চোখ থেকে নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রামসহকারে গ্রন্থ করলে, “কেন বলো তো?”

“কেন আবার? আমার ইচ্ছে। তোমরা যাই বলো, আমার ভালো লাগে না—”

সুখ প্রাণ বুণে হো হো ক’রে হেসে উঠলো। হাদি বাম্লে পর বললো, “সত্যি, তোমরা বাঙালী মেয়েরা

অনুগ্রহ কাশফের বন্ধা চ'রেই রইলো! তোমাদের থান-সব কেহুমানি ঐ যাত্রাবার আর ভাঁড়ার পথান্তই। তা'র বাইরে একটু পা বাড়ালে চ'লেই তোমরা ভিক্ষুনিম্ন খেয়ে একবারে বেহুৎ ব'নে যার। বাইরের প্রাকাত্ত ভগৎ থেকে আমাদের মেয়েরা বিছিন্ন হ'য়ে আছে বলেই তো আমাদের দেশের এত গ্লানি।... আর তাণো সে যিগেতে! নাথো কি ওরা সারা পৃথিবীর গ্লান প্রভূর খাটোছে!”

অতী যামীর আত্মপত্তো নিয়ে খেলা করতে করতে বললে, “বিলেতে যা ইচ্ছে তাই হোকগে! আমাদের এই জালা!”

সুখ একটা হাই তুলে বললে, “তা তোমার ইচ্ছে না হয়, ভক্তির সরকারের কাছে বেরিয়ে না। কিন্তু এমন লোক আমাদের দেশে পুই বিরল। যেমন বিদ্যান, তেহনি বিনয়ী! ওঁর মত লোকের কাছে আমাদের কত দেখবার, কত জানবার আছে! চেহারাটা দেখলেই কেমন স্রষ্টা হই! কী আশ্চর্য!—তোমার এই লোকলে ফুঁটা এখনো কাটেনো না, এখনো বেহাটাগু খেঁহা জন্মা-বো হ'য়ে থাকতে পারলে বেঁচে যাও! নাঃ—এদেশের কোন আশা নেই।”

কিন্তু এসব কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই সুখ বেশ একটু কৃত্রিম সখেই একথা ভাবছিলো যে আর্থিক শাস্ত্রা তো অনেক গোছেই থাকে, কিন্তু অতীত মত রা গ্লান—যাকবিভই গ্লান।

অতী আর কোনো কথা বললে না; শুধু মুখে এমন একটা মগতন হাসি টেনে এনে যামীর মুখের গ্লান কুঁকে পড়লো যে খানী ইচ্ছামতীরেতো মনের জাঁপ মেঘান ফেটে হঠাৎ মুটে উঠলো অমল পুষ্পময়রী; একটা ভবু হুহনের বুঝে তত্ব ক'রে জনব বসন্তের প্রাণাত্ম আকাশের নীচে একবার তাদের বর্ণবিবর্ণিত পুতল মেলে ধ'রে প্রতাপতি-ময় দান করলে।

অতী আশো নিখিরে দিয়ে যামীর পাশে এসে তরে পড়লো। তার মন এতকণে হালকা হইছে। মনকে সে

এই ব'লে প্রাণে বলে যে গভীরাত্তরে সে স্বামীরে সব কথা বুঝতে দিচ্ছেইতোহিলা—তখানি তিনি যদি কোনো সন্ধ্যের কারণ বুঁকে না গেরে থাকেন, সে কি তার মোহ মন বেচার প্রথমটার আশ্রিত্যক খাত নেড়িছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাকে তুলির তালিরে নিজের মতের সঙ্গে সাহ বিইয়ে ছাড়লো। মনের পিঠে চাত পুলাতে-পুলাতে মিষ্ট ক'রে বললে, “আশো বাপু, আর বেহাড়াপনা কোরো না, আর থেকে তোমার লক্ষ হজি।” তামিনার মতো সে তার নিহতকলচপরাণ মনের সঙ্গে বন্ধতা পাঠিয়ে ফেললে—সে আশ্রয়!

যামীর সঙ্গে এই আশা চ'বার পর অতী যেন রাঙার ঐ সাদা-পাটটার মতই স্পষ্ট ক'রে তার পল দেখতে পাইলো—বড়িমা সব উপলব্ধ ক'রে উঠছে, হাওয়ার বেগে গাল ফুলে উঠলো, নীল দিগন্তের একখানি আকাশবিহীন দিগন্তে যেন এই হাটকে অভিনন্দন করছে—দোকো ছাড়লো ব'লে!... যামীরে অতী যে-সময়ে গ'একটি কথা বলেছে—তাঁতে সে যেন নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে; কথার বললে এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে সে যামীরে জানাত পারতো না, কিন্তু তিনি নিজের নিশ্চিন্তিতে তাকে আশীর্বাদ—ইয়া, আশীর্বাদই করেছেন। থাক—যামীর অত্মত্ব সে পেলো।

হঠাৎ মারিক ঘুমের ঘোর কেঁদে উঠলো; অতী তাকে বুকের গ্লান চেপে ধ'রে চুমোর-চুমোর ছেলেটার নিঃশ্বাস প্রাণ বন্ধ ক'রে আনলে। একটু পরেই মারিত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। অতী ভাবলো—মারিক কেন আরো খানিকক্ষণ কাঁদলে না? ও যদি আর ম'রে লক্ষ কেন ক'রে সারারাত ত'রে ঘালি কাঁদে, অতী তা'লে সারারাত ওর পাশে জেগে ব'সে থাকে, ওক পার ক'বার নানা মজুত ও কষ্টসাধ্য উপায় আবিষ্কার করে। মারিকের কাছে কী যেন তার অপরায়ণ—তারি প্রাণান্ত ক'বার ওক তার চিত্তের বেগ-উৎসাহের আশা সীমা নেই।



পাখিন ওপরের বারান্দায় গাড়িরে অতলী রাত্তা থেকেই  
 ঐকথ্যে বেগুতে গেলে; বেগুতে মাস্তে-মাস্তে ঐকথ্য  
 কা'র একগলনা চিঠি কুট-কুট করে চি'ড়ে কেস্চে,—  
 ছেঁড়ি টুক'বাড়লো হু'ই ভ'রে চাওয়া উচিত বলে।

চিঠিখানি ইলার। —অতলী কি তা জানে?  
 অতলী ভাড়াভাড়ি ছুটে নেমে এসে ঐকথ্য ডাকাডাকি  
 বা বাঁকাবাঁকি কব্বার আগেই হুসুসর দু'পে বাইনের দরজা  
 খুলে বলে।

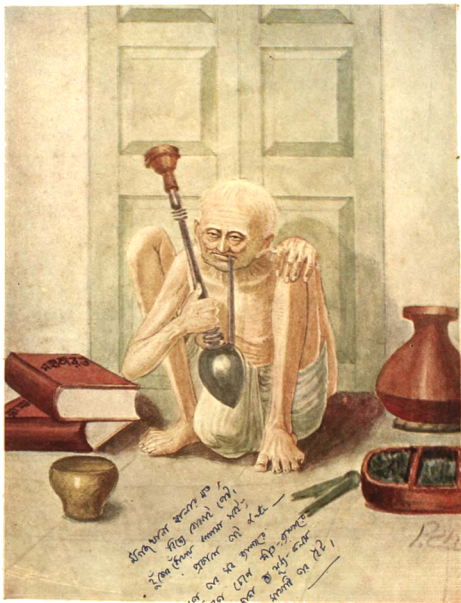
## তোমারেই ভালবাসি

শ্রীসরলকুমার অধিকারী

আমি পাঁচি নাট মাথবী কুঞ্জে প্র'দুট হুগ মালা,—  
 গন্ধে মধুর বর্ণে বর্ণে অপরূপ রূপ ঢালা।  
 তুমি চুড়ার মল্লকী আমি ছি'ড়ি নাই কতু তুলে  
 পরাতে তোমার অলকগুচ্ছে, মাঝাতে কর্ণমূলে।  
 আমার মালা তোমার কর্ণে চলিবে না তাই জানি'  
 করি নাই কতু গুয়ালা এমন আপন ভাণা মানি।

তবু তোমার কতজন ঐ জনগণের উপকূলে  
 নিত্য অর্থা করে বিরচন কত বরণের হু'লে।  
 যাচে গন্তব্য, করে শুভ্রন, পোনার কত না কথা।  
 অহুবাগ ভাষা কত উজ্জ্বল, কত চন্দ্রের বাণী!  
 দীনতম এক তবু আমিও, এই গৌরব নিয়া  
 অর্থা আমার রচিয়াছি রক্তা বস্ত্রপরি দিয়া।

তোমার শ্রীমুখ পঙ্কজ রক্তা, রক্তা সে আমার দু'পে.  
 রক্তের আভালে রক্তা হ'ল হের আশা-বাগনার মূল!  
 চ'লে গেলে কত নয়নের কোণে বিদ্যায় পরকাশি।  
 বিজ্ঞান বলে, ক'লে গেলে তুমি 'তোমারেই ভালবাসি'।



"સિંહ ગણ"



## থ্রেমের খেলা

ଆର୍ବୀନ ପିଠୁଗ୍ରାସ

અનુવાદક—શ્રીમતી સુલતાન વસ

**ଅସ୍ତିତ୍ବ**

[illegible]

આર્ચાત્મ વિઠ્ઠાચાર્ય

১৯৬২ খৃঃাব্দে ভিয়েনা নগরে প্রব্রূজারের রোগ ছড়ায়। তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়েন, শু ডাক্তারী পাশ করে কিছু দিন ডাক্তারগণে জীবিকা-স্বার্থের প্রয়োজনে কর্মেছিলেন। পরে ডাক্তারী ছেড়ে লেখকজীবন গ্রহণ করেন।

বিশ্বজ্ঞানের নীতিগুলিকে কোন সাধারিক মততা বা অভিমতের  
বিশেষ বিচারে বা মানবীয়ভাবে মূল্যায়ণ গ্রহণে ব'লে তার দার্শনিক  
চরিত্র লক্ষ্য করা যেই; হাইটম্যানের "সেন্সুয়ালাইজম পূর্ণ" (Vor  
Sensuellismus) বা "থিডিয়া" (Die Welter) এই সব নীতি-

[illegible]

"Es fließen ineinander Traum und Wachen,  
Wahrheit und Lüge. Sicherheit ist nirgends.  
Wir wissen nicht von andern, nichts von uns;  
Wir spielen immer, weil es keine ist klug."

(Purcellism)

শাক্তসম্প্রদায় দ্বিতীয় পারবেদমূল্যে যে কামাক্ষী বলয়ে, তা হইলে  
মিত্রজ্ঞানের দ্বিতীয়াংশের মর্মে-কথা-যদি ও জ্ঞানতল একাত্তর হইবে  
মিলে পোবে, যের দ্বিতীয়া এক হ'বে স্বর্গে চলবে, তাহা ও দ্বিতীয়া  
ভক্তির পোবে। সুমিত্রিত ভাব কোথাও খেই, প্রব্রজিত্রিত ভিত্ত  
যেই; আদ্যের অপরত্বের কথা কিছুই জ্ঞানিনা, বিবেকসকল ভিত্ত  
জ্ঞানিনা; আদ্যের বেলা ক'বে চলোহি; আদ্যের যে ভক্তির ক'বে  
জ্ঞানিনা এক ক'বে যে জ্ঞানে যেই সুখসাম।

জীবন একটা অভিনয়, সত্য জীবন একটা নাটক। তাই শিত্ত্ৰাৰেণ  
নাটকে সত্যজীবন যেন যন্ত্ৰেৰ মত বোধ হয় এ নাটকেৰ অলৌক

"Liebde" Von Arthur Schnitzler. — ১৪৪ পৃষ্ঠা। অমৃতসি  
দর্শন বক সন্নিবিষ্ট।





সরকার নেই । ( ঘনে স্রবেশ করিল ) বিগতঃকাল প্রতি ) তোমার  
ছড়ি, ওভারকোট রাখো ?

পাত্র-পাত্রী

কোলক ঠান্ড দিয়েটারের  
বেহালাবাদক

ফ্রিট্‌স্‌

তাইসিংএর মেয়ে

মিস্‌ সি সুপার

ফ্রিট্‌স্‌নের বাচ্চবী

কাথারিনা বিন্ডার

এক মোটা ঠৈরী করা উত্তীর ব্রী

লিনা

কাথারিনা বিন্ডারের

ন'বছরের মেয়ে

ফ্রিট্‌স্‌ গোব হাইমার }

তরুণ পুণ্ডর

পিওডর বাইকার

একজন চম্পলোক

হান—তিয়েনা

কাল—বর্তমান সময়

প্রথম অঙ্ক

( ফ্রিট্‌স্‌ লোবহাটসারের ঘর—সেখ লাকনে আসন্নজনক ঘর )

( ফ্রিট্‌স্‌ ও পিওডর প্রবেশ গ্রবেশ করিল, তাহার

এক হাতে ওভারকোট, ঘবে এসেখ করিয়াই

লগা হইল টুশিট খুলিল, হাতে ছড়ি ,

ফ্রিট্‌স্‌

তা হ'লে দেখা করতে কেউ আসে নি ?

চাকরের গলা

না, ছড়ুর কেউ আসেনি ।

ফ্রিট্‌স্‌

( ঘবে স্রবেশ করিল ) গাড়ী রেখে দেবার কোন সরকার

নেই, যেতে বলি ?

পিওডর

ঠাণ, নিকর, আমি ভাবছিলাম, তুমি চ'লে যেতে হ'লে  
বিবেছ ।

ফ্রিট্‌স্‌

( কাথার বাইরে গিয়া, হাবের কাছে দ্রুতবে প্রতি ) গাড়ীটাকে  
চ'লে যেতে বলা, আর...তুমিও যেতে পারো; আমার কোন

পিওডর

( লোবহার টেবিলের কাছে ) করকথানা চিঠি রয়েছে  
তোমার । ( সে চুপি ও ওভারকোট আঁচনে কোণের ওপর তেলিয়া  
রাখিল, চড়িট কিন্ন হাতে ব'হিল )

ফ্রিট্‌স্‌

হাডাডাডি নিখিবার টেবিলের কিন্নে থাকা । আ ।

পিওডর

ওহ, তোমার চিঠি খুলে দেখ ।

ফ্রিট্‌স্‌

... ( খ'ল এল )

পিওডর

তার ভগ্নে ভেবো না ।

ফ্রিট্‌স্‌

( চিঠির ওপর চোখ ফুটাইয়া গেল )

পিওডর

বাবা কি লিখেছেন ?

ফ্রিট্‌স্‌

বিশেষ কিছু না...লিখছেন উইলস্‌নটাইডে অটি বিনেপ  
কত গাছের বাড়ীতে যেতে ।

পিওডর

পূব ভাল কথা । আমার ইচ্ছে তোমার পাঁচ ছ' মাসের  
ভগ্নে বাইরে পাঠিয়ে দি ।

ফ্রিট্‌স্‌ টেবিলের কিন্নে খুল করিয়া হাডাটাইয়াছিল,  
পিওডরের সুখোদুবি বটকা গুড়াইল ।

পিওডর

ঠাণ, দেখানে খোড়ার চড়বে, খোলা বাতাস লাগবে—  
গ্রামের গোপিনীরা আছে—

ফ্রিট্‌স্‌

আমাদের ওখানে কোন গোপিনীদল নেই !

পিওডর

হ' আমি কি বলতে চাই, তুমি বুঝতে পারছ...



খিওডর

বেশ বন্ধু, তুমি আমার ভাল ক'রে জান না যেখনি ।  
কিন্তু ব'লে রাখছি, আমি আর এ বাশারটা বেশদূর  
গড়াতে দিচ্ছি না ।

ফ্রিট্‌স্

ফ্রিট্‌স্

মাই গড্! তুমি একেবারে নাছোড়বান্দা !

খিওডর

খিওডর

বেশ ত লামনে আমার পরীক্ষা! তা, তোমার  
সঙ্গে যেতে পারি, তোমার সেখানে রেখেই চ'লে আসব ।

ফ্রিট্‌স্

আমার অস্ত্র অত তাৎকালে হবে না !

খিওডর

বেশ, তোমার বা দরকার, আমি বেশ বুঝছি ; খোলা  
কাধগায় নির্মল বাতাস হচ্ছে তোমার দ্বি চোখে দরকার ।  
সেদিন যে আমরা সহরের বাইরে গেছলুম, সেই খোলা  
মাঠের মধ্যে সজিকার বসন্ত এসেছে, সেখানে তুমি  
একেবারে বধনে গেছলে । তোমার মন কত শান্ত তোমার  
প্রকৃতি কত মধুর হয়েছিল ।

ফ্রিট্‌স্

খিওডর

আর এখন, এখন তুমি আমার চেষ্টা পড়েছ । এখন  
এই বিশদভরা আবলগুয়ার মধ্যে—

ফ্রিট্‌স্

( বিস্কট চকল হইয়া উঠিল )

খিওডর

বেশ, সেদিন যে আমরা সেই বাড়ির বেকাতে গেছলুম,  
সেদিন তুমি কি বকম শাস্তাবিক দৃষ্টিতে ত'রে উঠেছিলে,  
তা তুমি নিজে কিছু বোঝ নি—তোমার মধ্যে তোমার  
পুরোপুরি দিনের সরল সফল আনন্দভরা রূপ কিরে এসেছিল—  
তবে অবশ্য আমাদের সঙ্গে সেই ভ্রমভরার মধ্যে গুটি ছিল । আর  
এখন,—এখন আর মনে কোন দৃষ্টি নেই, এখন বেলক  
করণভার সহিত এখন 'সেই মেয়েমানুষটির' কথা ভাবাই  
তোমার বিশেষ দরকার । ( ফ্রিট্‌স্ বিস্কটচকল উঠিয়া ঝাড়াট

বেশ, আমি বলছি না যে তুমি তোমার মেয়েমানুষটিকে  
ভুলে যাও...আমি এই চাই...বেশ তাই ফ্রিট্‌স্, তোমার এই  
হতজ্ঞাভা বাশারটাব ক্ষেত্রে তুমি যে সব সময়ই মনের ভেতর  
কাঁপছ এটাকে তুমি কোন মাধারণ আড়তব্জার ব'লে  
ভেবে না...বেশ ফ্রিট্‌স্, একদিন যখন তুমি ওই মেয়ে-  
মানুষটিকে আর পুছো করবে না, তখন তুমি ভেবে অবাক  
হবে ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কত দু'দর হতে পারত ;  
তখন তুমি বুঝবে ওর মধ্যে একটা কিছু ভরদর বা  
অসাধারণক নেই, তখন বুঝবে যে এক মাধুর্যময়ী পুথী ।  
অন্ত সব দু'দরী যৌবনচকলা যেজাক-গুণা  
নারীকেই সঙ্গে যেমন প্রেমের লীলা আমোদপ্রমোদ চলে,  
তার সঙ্গে তেরিই চলতে পারত ।

ফ্রিট্‌স্

তুমি কেন বলে, আমি সব সময়ে "মনের ভেতর  
কাঁপছি ?"

খিওডর

তুমি তা জান...আমি তোমার পুণেই বলছি, আমার  
সব সময় ভর হই, বৃষ্টি কোনদিন তুমি ভুলে নিয়ে পালাও ।

ফ্রিট্‌স্

তার মানে ?

খিওডর

( একই ভরভার পর ) আর এইটাই একমাত্র বিশদ নয়—  
আর এক বিশদ আছে ।

ফ্রিট্‌স্

ঠিক বলেছ, খিওডর,—আর একটা বিশদ আছে ।

খিওডর

তাই বলি, কোনরকম বোকাই কোরো না ।

ফ্রিট্‌স্

(যে নিরীহকে বলতে) আর একটা বিশদ—

বিগডর

কি?...তুমি যেন তা নিশ্চিত ব'লে তাবছ।

ফ্রিট্‌স্

না, না, নিশ্চিত ব'লে মোটেই জাবছি না...(জাননা দিতে  
একবার তাঁকি যেতে) সে গেলিনও আর একবার ভুল করেছিল।

বিগডর

....কি বলছ?...আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ফ্রিট্‌স্

বিগডর

না, কি পুঙ্খানুপুঙ্খ বল।

ফ্রিট্‌স্

দেখ বার সে মাঝে মাঝে বড় ভয় পাচ্ছিল।

বিগডর

কেন?...নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে।

ফ্রিট্‌স্

নাগুড্যান্স (যাকের সহিত) ক্রিকেটের দংশন

বিগডর

তুমি বলো, সে আগেও একবার ভুল করেছিল।

ফ্রিট্‌স্

হ্যাঁ—আবার আজও।

বিগডর

আজ? না, এর মানে কি?

ফ্রিট্‌স্

(অবশ্য নীমবতার পর) সে ভাবে...সে ভাবে,  
আমাদের লুকিয়ে দেখেছে।

বিগডর

ফ্রিট্‌স্

সে মনের ভয়ে কান্নালিক অলীক মূর্তি দেখে। (বান্দাসার  
বিকট বাইল) এই পর্দার ফাঁক দিয়ে সে দেখেছে একজনওই স্রাস্তার ব্যকে পাড়িয়ে, সে ভাবে সে হচ্ছে ওর আমি  
(সহসা আমিরা খেল) আজ্ঞা, এতদূর থেকে কোন মাগুয়ে  
মুখ চেনা যুব সম্ভব?

বিগডর

ফ্রিট্‌স্

আমিও তাই বলি। কিন্তু তারপরও ভয়ময়! এখানে  
থেকে বাহির হ'তে তার সাহস হয় না, তার অবস্থা ভয়ঙ্কর  
হ'য়ে ওঠে, যুব কীদে; বলে আমার সঙ্গে আশ্চর্য্যতা করবে—

বিগডর

ফ্রিট্‌স্

(একটু নাঃবতার পর) আজ আমি বাইরে গিয়ে গলে  
চারিদিক দেখে এসুম—কোথাও কোন জানা যুব দেখলুম  
না...

ফ্রিট্‌স্

এ বিশ্বর আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি, তোমার কি  
মনে হয়? একটা গোক কিছু আর ঠাণ্ডে মাটির মধ্যে ঢুকে  
বার না?...কি, উত্তর পাও?

বিগডর

কি উত্তর দেব? হাঁ, য়োকে ঠাণ্ডে মাটির মধ্যে ঢুকে  
অপূর্ণ হয় না। তবে বাড়ীও পরটার পেছনে কিছুক্ষণের  
লগ্নে পুঙ্খাতে পারে।

ফ্রিট্‌স্

আমি সব বাড়ীর দরজা দেখেছি।

বিগডর

তা হ'লে কোনরকম সন্দেশ জ্ঞাত্যে পাওনি।

ফ্রিট্‌স্

কেউ গবে ছিল না। আমি জানি, ও কান্নালিক  
মনোভব মূর্তি।

বিগডর

নিশ্চয়। কিন্তু তোমার এ থেকে যুব শতক ৯০তা উচিত।



ফ্রিট্‌স্

ওর স্বামীর মনে যদি কোন লোক থাকত, আমি তা নিশ্চয় বুঝতে পারতুম। কাল রাতে তার সঙ্গে আমি খিচুড়িটার পর খেয়েছি—তার সঙ্গে ও তার স্বামীর সঙ্গে—আমাদের রাতের ভোজ এত সুন্দর প্রীতিকর হয়েছিল।... হাঙ্গির ব্যাপার!

বিগডর

দেখ ফ্রিট্‌স্, আমার আত্মবিক অহুত্বে, এই চতুষ্কোণ ব্যাপারটা তুমি এখানে শেষ ক'রে দাও, আর নয়—আমার কথাটা শোন। আমিও সব বুঝতে পারি।... আমি জানি, তুমি যখন একটা গ্রেমের আচ্ছন্ন-চোর মুক্ কবেছ, তা যে পরমা ছেড়ে দেবে তা মোটেই সম্ভব নয়, সেজন্য আমি তোমার এই বিশদ-ভরা গ্রেমের আচ্ছন্নচোর থেকে আর একটা গ্রেমের লীলার মধ্যে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি...

বিগডর

হ্যাঁ, তুমি কি তাই? এই যে কিছুদিন আগে তুমি মিত্রপির সঙ্গে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম, তখন মিত্রপির যে তার সুন্দরী স্বাক্ষরিতিক এনেছিল, আমিই ত সে স্বাক্ষরিতিক আনতে বলেছিলাম। আর সে তুমিটিকে তোমার যে সুবই ভাল লেগেছিল, তা তুমি আশ্চর্য করলে পার কি?

ফ্রিট্‌স্

সত্যি, বেশ মনে পড়ে। কি মিত্র! সত্যি, এই রকম কোমলতার জন্য আমার অন্তর তৃপ্ত কোন মনিনতা থাকবে না, শুধু মিত্র মাথুর্গ। স্বাক্ষরিতিক সে মেরটির সঙ্গে আমি যে মাথুর্গ যে পাঠ্য অগ্রভব করেছিলাম তাতে আমার মনের এই সঙ্গীতের উৎস ও বেদনা দূর হ'য়ে গেছে—আমি যেন বেশ সেরে উঠেছিলাম—

বিগডর

ঠিক! তুমি ঠিক বলেছ! তোমার এই বর্তমান মানসিক অবস্থা দূর করতে হবে—এই উৎস ও বেদনা।

আমাদের মনকে দ্ব্যভাবিক পীড়িত করার ক্ষেত্রে নয়, সহক আনন্দিত করার ক্ষেত্রেই মেয়েদের সৃষ্টি। সেই ক্ষেত্রেই ত আমি তোমার এই interesting মেয়েদুটির বিকছে। নতুন interesting ইগোর দরকার নেই, মধুর জিভ ইগো দরকার। দেখ আমি যেখানে আমার জনতার প্রব পুঁকে পেয়েছি, তুমি সেখানে তোমার অন্তরের প্রব পুঁকে পাবে। এতে কোন বেদনা আশঙ্কাতর। প্রণয়ের লীলা নেই, কোন বিপদ নেই, কোন ট্রাজেডির ঘটনার ব্যাপ্রতিষেদ নেই; এতে গ্রেমের খেলা মুক্ করতে বিশেষ বাধা পায় হতে হয় না, আর খেলা শেষ হ'য়ে গেলেও তীব্র বেদনার জগতে হয় না। এ গ্রেমের প্রথম চুপন মিত্র হাঙ্গির সঙ্গে আদর হয়, আর শেষ চুপনে অন্তরে শুধু একটু মিষ্ট উদাসতা থাকে।

ফ্রিট্‌স্

হু—

বিগডর

অতি স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের দেখ, তারা সহজ প্রবেশ ভরা—আর অমর্য কেন তাদের হয় মানবী নয় স্বর্ণের পরী ক'রে জুগল?

ফ্রিট্‌স্

ব্যাবৃতিক তোমার ওই মিত্রপির বাবুদীট একটু রহ—কি মিত্র! লতার মত জড়ির থাকতে চায়। অনেকবার আমার মনে হয়েছিল, বড় বেশী সুন্দর আমার শকে।

বিগডর

তুমি বেশি লগোশনের বাইরে। দেখ, আমার যদি এ ব্যাপারটাও তুমি একবারে সত্যিভাবে নিতে চাও—

ফ্রিট্‌স্

না, আমি তা বলছি না। আমি তোমার মত মেনে নিচ্ছি মনটাকে প্রব স্বাভাবিক ক'রে জোলাবার ক্ষেত্রে।

বিগডর

না, তোমার আর কোন ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না। তোমার এই সব গ্রেমের ট্রাজেডি আমার ভাল লাগে না, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ওই অতি শাফের বিবেকটিকে তুমি যখন পূর করতে পারবে তখন, ইচ্ছে হয়, আমার কাছে এনা, এ সব বিষয় আমার সহজ সরল মত তোমার

দুঃখেরে বলব। অপর কারুর কাছে না গিয়ে আমরা  
কাজে এসে—

( হাটিলে পরজার বেলু বাঁজব। উঠিল )

ফ্রিট্‌স্

কি ? কে এখন ?

বিগডর

দেখ না—তুমি যে একবারে ফাকাগে হ'লে গেলে !

না, শান্ত হও, সেই মেয়ে ত'টি এসেছে ।

ফ্রিট্‌স্

( ঘাবাক ঠটকা ) বল কি ?

বিগডর

হ্যাঁ, আমি তোমার অহুমতি না নিয়েই এখানে তাবের  
আগতে নিমন্ত্রণ করেছে ।

ফ্রিট্‌স্

( বাহিরে ঘাটেরে ঘাটতে ) বেশ ! তা আগে বলে না কেন !

আমি এখন চাকরটাকে চ'লে যেতে বলেছি !

বিগডর

ফ্রিট্‌স্‌দের ঘর

( বাহিরে ) নমস্কার, মিত্র !—

( ফ্রিট্‌স্ ও মিত্রসি এসে পড়িল, মিত্রসি হাতে একটা প্যাকেট )

ফ্রিট্‌স্

আর, ফ্রিট্‌স্‌ কোথায় ?

মিত্রসি

সে একটু পরেই আসছে, নমস্কার জোরি ।

বিগডর

( মিত্রসি হর দুখন করিল )

মিত্রসি

মিষ্টার ফ্রিট্‌স্, আপনি নিশ্চয় অপরাধ নেবেন না।  
বিগডর আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ করেছে ।

ফ্রিট্‌স্

তা বেশ করেছে, চমৎকার আইডিয়া । কিন্তু বিগডর  
একটা বিনিময় ভুলে গেছে—

ফ্রিট্‌স্

আমাকে দিন, এই লাইডবোর্ডে বেধে দি ।

মিত্রসি

জোরি—আমি আরও কিছু মিনিম

তুমি তা দেখানি ।

ফ্রিট্‌স্

আপনার টুপিটা দিন—( টুপি ও হার সিআনোর উপর  
বাঁধা দিল )

বিগডর

( সকৌতুকে ) কি ?

কফি-ক্রীম-কেজ ।

বিগডর

ফ্রিট্‌স্

হ্যাঁ, ফ্রিট্‌স্‌ কেন আপনার সঙ্গে এলো না ?—

মিত্রসি

ফ্রিট্‌স্‌ তার বাবাকে খিচুটোর পেঁছে দিতে গেছে,  
তার পর টামে ক'রে দে এখানে আসবে ।

বিগডর

কি পিতৃশ্রাবণা কল্পা দেখছ—

মিত্রসি

হ্যাঁ, বিশেষত এই মুক্তার পর—

বিগডর

কার মুক্তা হল ?

মিত্রসি

বুকো তাইরিংএর বোনের ।



বিগড়র

ও! আশাদের শিদিয়ার।

মিত্‌লি

তিনি অবিবাহিত। জোতা ছিগেন—ওর বাবার সঙ্গেই  
বহাবর থাকতেন, সেভর বুড়োর এখন বড় একা একা  
মনে চর।

বিগড়র

ক্রিস্টিনের বাবা ত বেগতে বটে, আশ-পাকা ছোট  
চল—

মিত্‌লি

(মাথা নাড়িয়া) না, লখা চল।

ক্রিট্‌ল্‌

তুমি কোথায় গেলেন?

বিগড়র

কিছুদিন আগে আমি গেল্লির সঙ্গে জোসেফটোভ-  
ফিগেটোর পেল্লুম, ওখানে যায় কনট্রাবাল, বাজার তাদের  
ভাল ক'রে গেল্লিলুম।

মিত্‌লি

ওর বাবা ত কনট্রাবাল বাজান না, বেহাল বাজান।

বিগড়র

তাই নাকি? আমি ভেবেছিলুম তিনি কনট্রাবাল  
বাজান। (মিত্‌লি হাসিয়া উঠে) তা চালবার কি আছে,  
আমি কি ক'বে জানব।

মিত্‌লি

মিটার ক্রিট্‌ল্‌—আপনার এখানটি কেন, সুন্দর বর।

জানলা দিয়ে কি দেখা যায়?

ক্রিট্‌ল্‌

জানলা দিয়ে ট্রেসে আর তার বাড়ীগুলো বেশ দেখা  
যায়—

বিগড়র

আজ্ঞা, তোমরা এত formal চক্ক কেন বলত? এখনও  
‘আপনি’ ‘আপনি’।

মিত্‌লি

আজ্ঞা, আর বাবার সঙ্গে আয়গা মন পেরে ‘তুমি’ বলার,  
বন্ধুর স্থাপন করব।

বিগড়র

ও, সব একেবারে প্রথা-অনুপ্রথা চক্ক মরকার। ভাল—  
তারপর, তোমার মা কেনমন আছেন?

মিত্‌লি

(বিগড়রকে হিকে খুঁজা বলিয়া, সহসা মূখ পড়ীর উদিত)  
বল্লাব, জান তাঁর—

বিগড়র

জানি—পীতের বাবা! তোমার ম'র ত সব সময়ই পীতের  
বাবা। অবশেষে একদিন পীতের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

মিত্‌লি

কিন্তু ডাক্তার বলে, ও বাচ্চা ম'র।

বিগড়র

(হাসিয়া) ই্যা—বলি বাত হয়—

মিত্‌লি

(একটু হাসান সহ্যে করিয়া) খুব খুব সব কটো তরকেছে  
(পাতা উঠাইয়া যাঁতে লাগিল) এ কে? আপনি ক্রিট্‌ল্‌?  
আঁ, ইউনিকর্ন? আপনি কি মিলিটারীতে আছেন?

ক্রিট্‌ল্‌

মিত্‌লি

একজন ড্রাগুন!—আপনি চলুন না কালো ড্রাগুন  
শৈলভের সঙ্গে?

ক্রিট্‌ল্‌

(হাসিয়া) চলুন।

মিত্‌লি

(যেন পড়াখি) আ, চলুন ড্রাগুন!

ন. ছোট মুকুট নানা বা খুবক খুচরী নানা গলিই বন্ধুর পাড়াইবার  
'তুমি' বলা আরম্ভ করিবার এক স্থান গ্রন্থা গ্রন্থানিতে, যিগেবত  
তার গ্রন্থিগের যাবে, এতদিত আছে। পল্লর পল্লরগের পল্লরগনা ও  
বন্ধুর জানাইয়া, বন্ধু পল্লর করিয়া, 'তুমি' যিগেবত আরম্ভ করে। ইহাকে  
Brüderchaft trinken or Fellowship drinking বলে। এই  
'তুমি' করার যন্ত্রণাশি কি ভাবে হয় তাহা পাঠক পাঠিকা এ নাটকেই  
একটু পরে জানিতে পারিবেন।

খিওডর

কি মিড্‌সি, কি বস্ত্রে বিতোপ হ'য়ে গেলে, ভেগে ওঠ !

মিড্‌সি

আপনি তা হ'লে কি বিহার্ড্‌ লেক্টোনাষ্ট ?

ফ্রিট্‌স্

মিড্‌সি

ও, সেট কারের দাম প'রে আপনাকে মিশর পু বৃক্ষও  
দেখায়।

খিওডর

এ বিষয় তোমার বেশ জ্ঞান দেখছি—মিড্‌সি,  
আমিও ত সৈর্যবিভাগেই আছি।

মিড্‌সি

তুমি ওট ড্রাগন সৈর্যগলে ?

খিওডর

মিড্‌সি

হাঁ ? তা কোনদিন তুমি আমার বল নি

খিওডর

দেখ, তুমি আমাকে শুধু এই সাধারণ আমি কেনেই  
ডালবাল এই আমি চাই।

মিড্‌সি

আজ্ঞা ডোবি, এবার আমরা যখন একসঙ্গে বেড়াতে  
গিয়ে তুমি তোমার ইটেনিফ' প'রে আশেবে !

খিওডর

এই আগষ্ট মাসে আমাদের সূচকাণ্ডগাম হবে।

মিড্‌সি

ও, সেট আগষ্ট মাস—কতদিন ধেরী—

খিওডর

হাঁ, তা বটে, এই অসীম গৌরব অতদিন পরাভূট টেকে  
পাকবে না।

মিড্‌সি

আজ্ঞা, যে মাসে কে আগষ্ট মাসের কথা ভাবে।  
বলুন ত ফ্রিট্‌স্ ?—আজ্ঞা ফ্রিট্‌স্, কাল আপনি কেন

অমন ক'রে আমাদের কাছ থেকে লানিয়ে গেলেন ?

ফ্রিট্‌স্

কি রকম ?

মিড্‌সি

বা—কাল বিয়েটার পর।

ফ্রিট্‌স্

খিওডর কি আশ্চর্যের কাছ আমার হ'য়ে কমা  
প্রার্থনা করেনি ?

খিওডর

হাঁ, আমি ত করেছিলাম।

মিড্‌সি

রেখে দিন আপনার কমা প্রার্থনা, তাতে আমার—  
আত মাদল কথা ফ্রিট্‌সিনে তা ভুলবে কেন। আপনি যা  
কথা মিছেছিলেন তা আপনার বাধা উচিত ছিল।

ফ্রিট্‌স্

সত্যি, আমি যদি আপনার ল,  
অভিনব স্থায়ী করুম।

মিড্‌সি

ফ্রিট্‌স্

কিন্তু আমি তা কিছুতেই পাবলুম না। আপনি ত  
দেখছিলেন, বস্ত্রে আমি পরিচিত্তের লগে ছিলাম, তাও  
আমার কিছুতেই ছাড়লেন না।

মিড্‌সি

হাঁ, সেট লুক্করী মচিগাটকে আপনি বুঝি ছেড়ে ছাড়তে  
পারলেন না। তাবধেন না যে, আমরা গগলারি থেকে  
আপনারের সব দেখিনি।

ফ্রিট্‌স্

আমিও আপনারের দেখেছি।

মিড্‌সি

আপনি বলে গেছেন বসেছিলেন—

ফ্রিট্‌স্

দব দময় নয়।



মিত্‌লি

প্রায় অধিকাংশ সময়। ডেলভেটের বেশ-পরা একটি  
মহিলায় পেছনে আঁপনি বসেছিলেন, আর সব সময়  
(কোথায় ফল্ট বসেছিলেন) এরি ক'রে উঁকি মেয়ে  
দেখছিলেন।

মিত্‌লি

না, আমার কি! কিছু আমি যদি ক্রিস্টিয়ন হতুম  
কিছু পিওডের ত পিওটারের পর বেশ সময় ছিল? সে  
কেন পরিচিতির সঙ্গে নৈশ ভোজন করতে বাবে না?

পিওডর

বন্ধুদের সঙ্গে কেন সে নৈশ ভোজে

(সংসার বটা বার্মায়া উঠল)

মিত্‌লি

এই, ক্রিস্টিয়ন আসছে।

ফ্রিট্‌স্

(ডাড্ডাভি বারিহা পেল)

পিওডর

মিত্‌লি, লাক্টি, আমার প্রতি একটি অঙ্গুর কত।

মিত্‌লি

(কিলাপ্‌জাবে)

পিওডর

সেখ, ওটা ভুলে যাও,—অন্তত কিছুদিনের তে  
তোমার ওই মিলিটারি-বুটি আর মনে এনে না।

মিত্‌লি

আমার কোন মিলিটারি-বুটি নেই।

পিওডর

না! সেখ, এই মিলিটারি লাক্‌সজ্জা লব্ধে তোমার  
এতটা জ্ঞানপাত যে মিউজিয়েমের মডেল দেখে ধনি তা  
সবাই বুঝতে পারে।

(ফ্রিট্‌স্ ও ক্রিস্টিয়ন প্রবেশ, ক্রিস্টিয়ন হাতে কুণ্ডল)।

ক্রিস্টিয়ন

একই লাক্‌সজ্জার সহিত) ক্রিস্টিয়ন! (ফ্রিট্‌স্‌কে সর্টি;  
কি, আমার এসেছি বলে বুঝি?—না, চোখোনা?

ফ্রিট্‌স্

কি বলে সেখ!—হ্যাঁ, কখন কখন পিওডের সাপাস  
আমার চোখ ভাল আইডিয়া আপন—

পিওডর

কি, বাবা এখন পিওটারে বেচালা বাজারে

ক্রিস্টিয়ন

হ্যাঁ, আমি উঁকে পিওটারে পলায় পৌঁছে দিয়ে এসুম।

ফ্রিট্‌স্

মিত্‌লি তা বলেছেন।

ক্রিস্টিয়ন

(মিত্‌লিও প্রতি তারপর কাথারিন আমারকে কিছুক্ষণ  
দাঁড় করিয়ে রাখলে।

মিত্‌লি

হ্যাঁ, কি চুই মেয়েমানুষ।

ক্রিস্টিয়ন

না, না, আমার সঙ্গে ও খুব ভাল ব্যবহার করে।

মিত্‌লি

হ্যাঁ, তুমি ত সবাইকে ভাল বলে মনে কর।

ক্রিস্টিয়ন

কেন, আমার ও কি মন্য করবে?

ফ্রিট্‌স্

কাথারিনা আমার কে?

মিত্‌লি

এই এক মেয়েমানুষ আছে, তার নামী সোফা তৈরী  
করে; কাথারিনার সব সময় এই রাস যে আমার সবাই  
তার মত বুঝি নই, সব ভুলবী।

ক্রিস্টিয়ন

তারও ত বইখ খুব বেশি নহ।

ফ্রিট্‌স্

যাক কাথারিনার কথা—তুমি ও কি এনেছ?



ক্রিস্টিনে

কিছু ফুল।

ফ্রিট্‌স্

‘ফুলগুলি লটার’ তাহার হাতে ফুল কিনি। তুমি স্বর্ণের পরী !  
গোমো, ফুলদানিতে তাখা যাক...

বিওডর

আরে না ! ফুল সাজাবার তোমার কোন আইডিয়া  
নেই। ফুল খাবার টেবিলের চারিদিকে ছড়াবে... যখন  
খাবার টেবিল সাজান হবে, তখন এমন করে ফুল সাজাতে  
হবে যেন তারা গুলর থেকে আমাদের গুলর ব’রে পড়েছে।  
কিন্তু সে গুলর হয় না বৃষ্টি।

ফ্রিট্‌স্

হাসিয়া : ‘বোধ হচ্ছে ত না :

বিওডর

আজ্ঞা ততক্ষণ এইখানে থাক ( ফুলগুলি ফুলদানিতে রাখিয়া )

মিট্‌সি

অঙ্ককার হ’রে আসছে :

ফ্রিট্‌স্

‘ফ্রিট্‌স্‌কে তাহার ওজারকটি খুলিতে সাহায্য করিল, তাহার  
ওজারকটি ও খুলি পেলবের এক চেয়ারে রাখিয়া দিল।’ হ্যাঁ, এখন  
ল্যান্ডটা আসাতে হবে।

বিওডর

ল্যান্ড ! তোমার সাধারণ কোন আইডিয়া নেই।  
আমরা বাতির দারি আলোব, সে কি অন্ধর বল ত। মিট্‌সি,  
আমরা সাফাফা কর।

‘বিওডর ও মিট্‌সি বাতি আলোতে লাগিল,—ওজারকটির  
ওজার হুই বাতিখানে হুই বাতি, সেখানকার টেবিলের ওপর এক বাতি ও  
ওই অক্ষ ভ্রমের ওপর হুই বাতি আলো হটল।’

‘বিওডর ও মিট্‌সি বাতি আলোতে বাহ, ফ্রিট্‌স্ ও ক্রিস্টিনে  
পরস্পর কথা কহিতে লাগিল।’

ফ্রিট্‌স্

তারপর, কেমন আছে ?

ক্রিস্টিনে

এখন ত বেশ ভাল আছি।

ফ্রিট্‌স্

ক্রিস্টিনে

তোমার অন্ত্রে এত মন কেমন করত :

ফ্রিট্‌স্

কেন, কাল ত আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ক্রিস্টিনে

দেখা - দুই থেকে...না, ও তোমার মোটেই ভাল হয়নি  
...কাল তুমি—

ফ্রিট্‌স্

হ্যাঁ, জানি, মিট্‌সি আমার বলেছে। কিন্তু তুমি  
একবারে ছেলেমানুষ। আমি কিছুতেই আসতে পারলুম  
না। এ তোমার বোকা উচিত।

ক্রিস্টিনে

হ্যাঁ... আজ্ঞা ফ্রিট্‌স্, কালকে ওঠা বন্ধ ছিল, কে ?

ফ্রিট্‌স্

আমার আলোশী,—তুমি ভবের জাননা, নাম কেন কি  
হবে।

ক্রিস্টিনে

ওই যে কালো ডেলডেট প’রে মহিলাটি ছিলেন, ঐনি  
কে ?

ফ্রিট্‌স্

দেখ, বেশকিছু সন্ধ্যা আমার স্বাভাবিক বড় কম।

ক্রিস্টিনে

তাই না-কি ?

ফ্রিট্‌স্

অর্থাৎ, কাকর কাকর বেলা অবশ্য আমার মনে থাকে,  
যেমন হয়, তোমার সঙ্গে আমার তেজি প্রথম দেখা হয়েছিল  
সেদিন তুমি যে একটি বন্যপুষ্ট ব্লাউজ পরেছিলে, তা  
আমার মনে আছে। আর কাল পরটারে সাফা-কালো  
ব্লাউজ...

ক্রিস্টিনে

আজ এখনও ত সেই ব্লাউজই প’রে :



ফ্রিট্‌স্

‘হাউস, ... দেখ দূর থেকে আমার অন্তরকম দেখায়।  
... সন্ধ্যা।’ আর তোমার পলার সেই কয়েক আমার মনে  
আছে!

ক্রিস্টিনে

(চানিসা) কখন পরে ফিট্‌স্?

ফ্রিট্‌স্

সেই যে—ঠা, সেই যেদিন আমরা বাগানে বেড়াতে  
গেছিলাম। গাছের তলায় ছেলোমোয়ের মল খেলা করছিল  
সেখানে, তাই নয়?

ক্রিস্টিনে

হ্যাঁ, আমার কথাও কখন কখন মনে থাকে দেখছি।

ফ্রিট্‌স্

ও, প্রায়ই

ক্রিস্টিনে

কিন্তু আমি বড় তোমার কথা ভাবি তত নয়। আমি  
সব সময় তোমাকে ভাবি সমস্ত দিন.. আর তোমার মেধা  
না খেলে মন ভাল থাকে না!

ফ্রিট্‌স্

আমাদের ত প্রায়ই দেখা হয়।

ক্রিস্টিনে

ফ্রিট্‌স্

নিশ্চয়। তবে আলহে গ্রীয়ে আমাদের এত ঘন ঘন দেখা  
হবে না হয়ত আমি কয়েক সপ্তাহের ভেত্রে বাইরে  
বেড়াতে যাবো। কি বল?

ক্রিস্টিনে

(উদ্বিগ্নভাবে) কি? তুমি বাইরে চলে যাবে?

ফ্রিট্‌স্

হ্যাঁ, না.. তবে আমরা খেদাও চলে পাবো ত সাত  
সাত দিন একা নিশ্চয় থাকতে।

ক্রিস্টিনে

কেন?—না।

ফ্রিট্‌স্

কি বিশদ! আমি বলছি, ‘হ’তে পারে’, সবই ত সম্ভব,  
বিশেষত আমি যে রকম ধামধোলা। আর তোমারও  
টেকে হ’তে পারে, কয়েকদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে  
না... তোমার এরকম ইচ্ছে করাটা আমি ভাল বুঝি না।

ক্রিস্টিনে

কখনও আমিও এরকম টেকে হবে না, ফ্রিট্‌স্।

ফ্রিট্‌স্

তা কেউ নিশ্চিত ক’রে বলতে পারে না।

ক্রিস্টিনে

আমি জানি.. আমি তোমার ভালবাসি।

ফ্রিট্‌স্

আমিও তোমার পূর্ব ভালবাসি।

ক্রিস্টিনে

কিন্তু, তুমি আমার দর্পণ, ফ্রিট্‌স্, তোমার ভেত্রে  
আমি... (খাম্বা খেল) না, আমি কখনও করনা করতে  
পারি না যে, ভবিষ্যতে এমন কোন সময় আসবে যখন  
তোমাকে আমি দেখতে চাইব না। বর্তমানে খেঁচ থাকব,  
ফ্রিট্‌স্, স্বাভাবিক—

ফ্রিট্‌স্

(তাহার কথা খাম্বা খেল) আরো খুকি, খাম্বা... এরকম  
সব কথা না বলাই ভাল... ওসব বড় বড় কথা আমার ভাল  
লাগে না, ও সব চিরদিনের অনন্তকালের কথা বাক

ক্রিস্টিনে

(কখনভাবে হাসিয়া) তার ভেত্রে চিত্তিত ছোঁয়ে না  
ফ্রিট্‌স্... আমি জানি, এ চিরদিনের ভেত্রে নয়...

ফ্রিট্‌স্

তুমি আমার ভাল বুঝিন, ও খুকি! হতে ত পারে,  
(হাসিয়া) হয়ত কোনদিন আমরা কেউ কাউকে মোটেই  
ভালবাসব না? আমরা মাহুস বৈ ত নয়।

বিগড়ার

(ঘরের দাঁতগুলিকে দেখাইয়া) ওহে, অহুহুহু ক’রে আমাদেরও  
এদিকে দেখো দিকি... কি রকম.. তোমার ওই ল্যান্ডের  
আলোর চেয়ে অনেক ভাল দেখাচ্ছে না?

ফ্রিটস

লাজবাব তোমার কতদূর কঠিনতা আছে দেখছি।

পিওডর

ওহ, এখন তা হ'লে যেতে বললে হয় না?

মিত্‌সি

হী....ফ্রিটস্‌, আর!

ফ্রিটস

হোসো, স্টেট কীট। চামচ কোণার আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মিত্‌সি

আগে টেবিল রুখ চাই।

পিওডর

(ইংরেজের উচ্চারণ অনুকরণ করে ফিটাটারে ক্রাউনে গা যেমন বলে তেঁতি করে) "একটি টেবল রুখ।"

ফ্রিটস্‌

কি ব্যাপার?

পিওডর

আরে, বনে সেই অরকেউমতে সেই ক্রাউনটা। তেমন হলছিল, "এই একটা টেবল রুখ..." এই একটা ছোট্ট স্টেট..." এই একটা ছোট্ট খোকা।"

মিত্‌সি

ডোরি, বলি কবে আমার অরকেউম দেবাতে যিরে যাজ্‌ বল ত, তুমি ত কদিন থেকে আমার বলছ। হী, ফ্রিটস্‌নেও আমার সঙ্গে আসবে, আর মিটার ফ্রিটস্‌ও। (ফ্রিটস্‌-সাইরোড হইতে টেবল রুখ বাহির করিয়া দিল, মিত্‌সি তাহার হাত হইতে লইল) তখন আমারই কিছু বস্তুর আশাপী বন্ধ...

মিত্‌সি

তখন ওই কালো ভেলভেট-পরা মহিলাটিকে একাই বড়ো করিতে হবে।

ফ্রিটস্‌

[কি সব সময় কালো ভেলভেট পরা মহিলা -এ স্ত্রীতাপাল্যামি]

মিত্‌সি

আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে আমারেব কি...হঁ, বাবার সব কোণার? (ফ্রিটস্‌-সোনা সাইরোড দেখাইল) বের, আর স্টেট কীট। চামচ? বস্ত্রবাস এখন আমরা একাই সব সাজিয়ে দিক করছি... বান, বান, আশুনাকে কোন সাড়াবা করতে হবে না।

পিওডর

(সোফাতে হেলান দিয়া দুইটা পড়িয়াছিল সবুখে আছিল)

(মিত্‌সি ও ফ্রিটস্‌নে টেবিল সাজাতে দেখিল)

মিত্‌সি

আরে, ফ্রিটস্‌নের টউনিক-পরা কণ্টো দেখেছিল?

ফ্রিটস্‌নে

পিওডর

(সোফা হইতে) এই বকম সজ্জাগুলিরে

ফ্রিটস্‌

পিওডর

এক চমৎকার লাগে, নহ?

ফ্রিটস্‌

হী, এই বকম যদি সব সময় হ'ত।

মিত্‌সি

মিটার ফ্রিটস্‌, কবি কি যেদিনে এ দেওয়া থাকে?

ফ্রিটস্‌

হী, তবে প্লিরিট প্যাম্পটাতে কবি ক'লে যেদিনে কীর্তিতে সেলে এক বস্তুর ওপর লাগবে...

পিওডর

(১৮শের মত) এখন একটা লক্ষ্যে ঘেঁষের সঙ্গে আমি দশটা দানবী মেয়েমাঝকে ছাড়তে পারি।

এ ভাল কবি করিবার এক প্রকার নিয়ম হয় আছে। কবি তাঁর মত খবর কুঁচর লেলে ভেলিগা কবি হয় না। এই খবর লেখোনা এক কুঁচর বাশ হইয়া কবির আধাংবে মরা দিচ্চা দিচ্চা আধাংব হল হইয়া অপর পাতে গিয়া হয়।



ফ্রিট্‌স্

বেশ গুরুত্ব গুণের মধ্যে তুলনা: করা চলে না।

খিওডর

হ্যাঁ, আমরা যে মেয়েদের লিটা ভালবাসি তাদের আমরা  
পূণ্য কতি—আর বাক্য আমাদের ক্ষেত্রে কেবল তরে না  
তাদের আমরা ভালবাসি—

ফ্রিট্‌স্

মিস্‌সি

কি? আমাদের বলো!

খিওডর

ও তোমাদের ক্ষেত্রে নয় বাক্য। আমরা একটু  
philosophise করছি। [ফ্রিট্‌স্‌র সতি] বাক্য। এই  
কি আমাদের লেখকদের মিলন হয়, তাতেও আমরা ছুঁতে  
করব না, কি বলো?

ফ্রিট্‌স্

শেষবার...দেখ, তা ভাবলেই মন ভারী হ'বে আসে,  
বিদ্যার ভাবনা সব সময়ে মনে পেরনা আসে—এমন কি  
যখন হাতের চোঁড়ে বেতেই চোঁষে শুকনো?

ফ্রিট্‌স্‌নে

ফ্রিট্‌স্, বাবারগুলো কোথায়?

ফ্রিট্‌স্

(সাইলেন্সের পরে) ওই, এইখানে ডিয়ার!

মিস্‌সি

(সামনে আসিল, পোকার আব পোকা খিওডরের সুখার চলে  
হাত ধলাইল)

খিওডর

কি লম্বা মেয়ে!

ফ্রিট্‌স্

(মিস্‌সি যে থাকেই আসিলালি, তারা দু'জন) চমৎকার!

ফ্রিট্‌স্‌নে

(ফ্রিট্‌স্‌র সতি) দেখ, কেমন সব সুন্দর সাধান  
হয়েছে!

ফ্রিট্‌স্

হ্যাঁ... (পাকের হাতে বাবার বিনিময় সব সাধাইয়া রাঁ  
খাখিল লাটিন মাঝের বাস, হাতের মাগ, মগন, চির ইতাদি)

ফ্রিট্‌স্‌নে

ফ্রিট্‌স্, আমরা বলো না?

ফ্রিট্‌স্

ফ্রিট্‌স্‌নে

সেই মহিলাটি কে?

ফ্রিট্‌স্

বেশ, আসার আলিও না। (বাক্যে) দেখ, আমাদের  
মতো খোলাখুলি বোঝাপড়া হচ্ছে—কোন প্রশ্ন নয়। কোন  
কথা জিজ্ঞেস নয়, এই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল। যখন আমরা  
প্রশ্নের একসঙ্গে, বাহিরের পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব নেই।—  
আমিও তোমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি না।

ফ্রিট্‌স্‌নে

কুহি আমাকে তোমার বা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস করতে  
পারো।

ফ্রিট্‌স্

কিন্তু আমি ত কিছু জিজ্ঞেস করছি না, আমি কিছু  
জানতে চাই না।

মিস্‌সি

(কিরা আসিয়া) আ, কি অগোছাল করছেন টেবিলে  
—(বাবার বিনিময় লটিন, মোটেতে সাতটিয়া বাখিত লাখিল)  
এই রকম...

খিওডর

ফ্রিট্‌স্, কিছু মন আছে ত?

ফ্রিট্‌স্

হ্যাঁ, খুব ভাল বিনিময় পাবে। (ভেতরের খর চালাই খেল)

খিওডর

(সোকা হাতে টুটিল, টেবিলের সামনে আসিয়া গাড়াইল)  
বা, বেশ!

মিস্‌সি

সব ঠিকঠাক!

খিওডর

হা, গোলাপ ফুলগুলি কোথায়, সেগুলো ও ওপর থেকে ক'রে পড়বে, না ?

মিতু'নি

ঠিক, ঠিক, গোলাপগুলো কুলে পড়েগুম। (গোলাপ ফুলগুলি মিতু'নি ফুলবাগিচা হইতে উঠিল, একটু ডেবাবে উঠিয়া ঝড়ছিল, এবং ওপর হইতে ফুলগুলি টেবিলের ওপর চড়িয়া) বেশা দিল ) এই, চলেছে।

ক্রিস্টিনে

গড়, মিতু'নি কোথায় গেছে নাকি !

খিওডর

কিন্তু ভিদের ওপর নয়...

ক্রিস্টিনে

ক্রিস্টিনে, তুমি কোথায় রয়েছ ?

খিওডর

কক্কু কোথায় ?

ক্রিস্টিনে

(সাইকেল হইতে নামিয়া কথন) এই নাও।

মিতু'নি

(বোনের বোতল ঘুরিতে গেল)

ক্রিস্টিনে

ও, আমাকে দিন, পুলাছ।

খিওডর

আরে, আমার দাঁও...(বোতল ও কক্কু হাত হইতে উঠিল)

কুমি ইতিমধ্যে একটু...(নিম্নোক্তগুলির লীলাধিত ওজন আনন্দের মত আনন্দের ভাষা করিল)

মিতু'নি

হা, দে বেশ। (মিতু'নি তড়াতাড়ি নিম্নোক্তের নিকট গেল। নিম্নোক্তের ওপর মিতু'নি একটি ডেবাবে নামিয়া দিয়া নিম্নোক্তের দিল)

ক্রিস্টিনে

(ক্রিস্টিনের দৃষ্টি) দাঁড়াও ?

ক্রিস্টিনে

আমি তোমার আগের বন্ধু ভাবছিলাম।

ক্রিস্টিনে

(নিম্নোক্তের দৃষ্টি) তুমি ও ত কিছু ব্যাক্তিতে গিয়ে।

ক্রিস্টিনে

(কপাটা কাটাফলা দিয়া) ও, না।

মিতু'নি

হা, ক্রিস্টিনে, তুমি ও ব্যাক্তিতে গিয়ে ও গার্ডেও গিয়ে।

ক্রিস্টিনে

গতি ? একপা ত তুমি আমার বন্ধু।

ক্রিস্টিনে

তুমি আমার কোনদিন ভেজেন করেনি।

ক্রিস্টিনে

কোথা থেকে গান গাইতে শিখলে ?

ক্রিস্টিনে

আমি নিম্নোক্তের কোথাও শিখিনি। এই ব্যাক্তি যাকে মাঝে একটু শিখিয়েছেন—কিন্তু আমার ভেতর দ্বন্দ্ব নেই। তারপর জিনে, পিসিমা মারা যাবার পর, তিনি আমার দিকে বরাবর থাকতেন—তারপর থেকে এখন ব্যাক্তি চুপচাপ।

ক্রিস্টিনে

সাবধান কর কি ?

ক্রিস্টিনে

ও, আমার কত কাজ, বন্ধু।—

ক্রিস্টিনে

ব্যাক্তি এত কাল—কি বন্ধু ?--

ক্রিস্টিনে

হা, তারপর বরাবর কাল কাল, অনেক বরাবর--

খিওডর

বরাবর ?--

হা।



খিওডর

তা থেকে অনেক টাকা লাভ, তা হ'লে। (ঘণ্টা মরণে  
হাসিয়া উঠিল) নিশ্চয়, আমি হ'লে ত অনেক টাকা  
মিত্রম। পরগণিণি দেখ: নিচের খুব পরিচয়ের কাজ।

মিত্রমি

বাস্তবিক, ও যে কোন এত খেটে মরে! (কিন্টনের প্রতি)  
আমার যদি তোর মত সলা থাকত, আমি প্রভুদিনে  
বিগটাতে যেতুম।

খিওডর

তার ভেত্রে তোমার সলায় বরফার নেই...তুমি সাগ-  
নিই ত বিগেটাং ক'রে বেড়াচ্ছ।

মিত্রমি

হ্যা, জানো মশাই, আমার টাট্টি ছোট্ট তাই আছে,  
তারা ফুলে বাথ, তোক লজ্জাল বেলা ত্রায়ের জাপান, খাওচান,  
কান্ড পরান সব আমার করতে হয়, তাগের ত্রায়ের  
ফুলের পড়া শিখিয়ে দিতে হয়—

খিওডর

এর একটি কলাও সতি নহ।

মিত্রমি

তা যদি বিশ্বাস না করতে চাও!—আর গত পত্রকাল  
পর্গাত্ত আমি যে বোকানে কাজ করেছি লজ্জাল আটটা  
থেকে সাত আটটা পর্গাত্ত—

খিওডর

(১২৫ টপসায়ের ১২৫) কোথায়?

মিত্রমি

এক টপির বোকানে। মা'ই ইচ্ছে আবার আমি  
সেখানে কাজ নি।

খিওডর

তা সেখান থেকে ছেড়ে এসে কেন?

ফ্রিটস

(কিন্টনের প্রতি) আমাংদের পান পেনিয়েতে হবে!

খিওডর

এস কে, এস খেতে আরম্ভ করা থাক। আর তুমি  
হাকাবে নাকি?

ফ্রিটস

(উঠিয়া, কিন্টনের প্রতি) এসো! (তাহাকে হেঁচি-  
খেল)

মিত্রমি

কাকি! কাকি এদিকে ফুটে পেল, আমরা এখনও  
খেতে আরম্ভ করিনি!

খিওডর

তাতে কিছু আসে যায় না।

মিত্রমি

যে উৎপল পড়ছে! (এ শ্রিটসোপল বিগটাং)

(নকলে টেবিল পাটতে বসিল)

খিওডর

কি প্রথমে আরম্ভ করা যায়, মিত্রমি? কেক কি  
লেট দখলবে। প্রথমে তেতো জিনিষ, তারপর মিষ্টি।

ফ্রিটস

(নব আনিয়া সেলাসে ঢালিতে খেল)

খিওডর

মা যে ওরকম নয়, তুমি বদ চালবার নুচন কেতা  
জান না বুঝি? (খিওডর উঠিয়া বাড়াটল, খোচল হাতে করিয়া  
কিন্টনের প্রতি চাহিয়া চেতায়ের বান্দাখার মত মাথা নত করিয়া  
মহলের স্বত্বধারণ করিল, তাহার পর তাহার হাতে মহ ঢালিতে  
ঢালিতে, যে কোশানী মহ তৈরী করিগেত ও যে বংসরে মহ তৈরী  
হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল) ভোস্কাউ আর আউস্টিস,  
আট্রোয়েপত...( 'আট্রোয়েপত' পর লংখা এত তাড়াতাড়ি বলিল  
যে কেবল মুখিতে গাফিল না। তাহার মিত্রমির মূখ্যে আনিয়া  
তাহাকে মত হইয়া স্বত্বাধীন করিয়া তাহার খেলাসে মহ ঢালিতে  
ঢালিতে বলিতে লাগিল) ভোস্কাউ আর আউস্টিস আট্রোয়ে  
পত...( পূর্বের মত। তাহার ফ্রিটসের প্রতি পূর্বের মত)  
ভোস্কাউ আর আউস্টিস আট্রোয়ে পত...( তাহার নিজের  
হাতে আনিয়া নিজের খেলাসে ঢালিল, পূর্বের মত) ভোস্কাউ  
আর আউস্টিস (তারপর নিজের চেয়ারে বসিল)

মিত্রমি

আ! সব সমস্তই এর উপ!

খিওডর  
(তাহার মনে হান হুসিগ, সকলে হাসে হাসে ঐকান্তিক কবিতা)  
প্রোমিট!

মিত্‌সি  
পাৰ্শ্বমোহি হও, খিওডর।

খিওডর  
(উঠিয়া বাড়াইয়া) কল্পমহোবদা ও ভ্রমমহোবদন...  
ফ্রিট্‌ল.  
আরে এখন নয়!

খিওডর  
(বসিয়া পড়িল) আচ্ছা আমি অপেক্ষা করতে পারি।  
(সকলে বাইরে আরত করিল)

মিত্‌সি  
দেখ, খাবার টেবিলে বস্তুতা জনতে আমার এত ভাল  
পাগে। আমার এক গিলতুতো তাই আছে, সে আবার  
কবিতার বস্তুতা দেয়।

খিওডর  
কোন রেগিমেন্টে সে আছে?  
মিত্‌সি  
দা থামো...ক্রিস্টিন, জনহিগ, অবশ্র আগে থাকতে  
মুখস্থ করে আসে, কিন্তু সে কবিতার বস্তুতা দেয় চমৎকার,  
কিন্তু তার বেশ বয়স হয়েছে।

খিওডর  
হী, কেই বয়সের লোকেরা অনেক সময় কবিতার কথা  
বলে বটে।

ফ্রিট্‌ল.  
কিন্তু তুমি কিছু পছন্দনা ক্রিস্টিনে। (সিস্টিনের মনে  
হাসের সহিত তাহার মনে হাস ঐকান্তিক মন পান করিল)

খিওডর  
(বিতলিত মনে হাসে তাহার হাস ঐকান্তিক) যে গৌড়  
লোকটি কবিতার কথা বলেন তাঁর শুভকামনা করি।

মিত্‌সি  
(ক্লান্তি সহিত) যে তরুণ দুঃকরতা কোন কথা বলে না  
তাদের শুভকামনা করি...যেমন মিষ্টার ফ্রিট্‌ল...কি মিষ্টার

ফ্রিট্‌ল, এখন যদি ইচ্ছে করেন, আমরা বন্ধুত্বপাতার মত-  
পান (Fellowship drinking) করতে পারি—আর ক্রিস্টিন,  
তুমিও খিওডরের সঙ্গে তাই করবে।

খিওডর  
কি, এ মন দিবে নয়, এ মন বন্ধুত্বপাতার মন নয়।  
(খিওডর উঠিল, আর একটি বোতল আনিয়া, আনেকের মত অভিমত  
কবিতা লবায় হাসে মন দিতে লাগিল—এমন মূর্খে না কখনোই মিল  
উঠে ন'। নীকোত—হোবলু সে না কখনোই—হোবলু সে না কখনোই  
হোবলু সে না কখনোই)

মিত্‌সি  
(কি) বেদ।  
খিওডর  
তোমার বৃষ্টি আর তব লইল না?—আচ্ছা বন্ধুতা—  
এল, প্রথমে, এত সুন্দর ঘটনার কল্যাণকামনা করে মস্ত-  
পান করি

মিত্‌সি  
(একটু মন পাইয়া) বেশ মন।  
(কিটুপি বিতলিত হাত ধরিল, খিওডর কিটুপিনের হাত বদল,  
সকলে মনে হাসে হুসিগা বসিল, তাবল কিটুপি ও মিত্‌সি তাবলের  
হাসে ঐকান্তিক কবিতা, খিওডর ও কিটুপিনে তাবলের হাস ঐকান্তিক  
কবিতা, সকলে মস্তপান করিল তাবল কিটুপি মিত্‌সি সিকে চুবন মিল  
খিওডর ও কিটুপিনের দুয়ো পাতে বসে)

ক্রিস্টিনে  
(হাসিয়া) ওটা করতেই হবে?  
খিওডর  
নিশ্চয়ই এঁর মস্তেই ত এত কাণ্ড  
এখন যে তার তাবলার।

মিত্‌সি  
যর যেন আগুন হয়ে উঠেছে।  
ফ্রিট্‌ল.  
খিওডর যে এক পাদা বাতি আগিজেছে।

মিত্‌সি  
হী, এত মন খেয়ে...সে তাবলার  
৭০৫ এলাইয়া বসিল)



বিগড়র

আরে মিত্‌লি—এবার লব্ধিঃ ভাল জিনিষ ( ৭৫ কেজি  
এক টুকরা কাটিয়া সে মিত্‌লির বুকে পুরিয়া দিল ) নাও খাও মিত্‌লি  
মৌক—ভাল ?

মিত্‌লি

কেতু ! ( বিগড়র তাহাকে আর এক টুকরা দিল )

বিগড়র

নাও, ফ্রিট্‌ল্—এখন তুমি একটু পিঠানো বাগাতে  
পারো :

ফ্রিট্‌ল্

বাগাবো ফ্রিট্‌ল্‌ট্‌ল্‌ ?

ফ্রিট্‌ল্‌ট্‌ল্‌

মিত্‌লি

একটা chic কিছু !

বিগড়র

( সাদতলি আধাঘর মত তাবরা দিল )

মিত্‌লি

আমার আর চাই না ( বন্ধন )

ফ্রিট্‌ল্‌ট্‌ল্‌

( একটু চুপক দিয়া ) মমটা বড় স্ত্রী ।

বিগড়র

( বসন্ত হাসের দিকে দেখাইয়া ) ফ্রিট্‌ল্‌ !

ফ্রিট্‌ল্‌

( মনের দ্বন্দ্ব মূক করিয়া পিঠানোতে দিয়া বলিল )

ফ্রিট্‌ল্‌ট্‌ল্‌

( তাহাৰ কাতে দিয়া বলিল )

মিত্‌লি

মিটার ফ্রিট্‌ল্‌, 'ডপেল আডলারট' \* বাগাও না ।

ফ্রিট্‌ল্‌

'ডপেল আডলারট'—কি বকব সুইটা ?

মিত্‌লি

ডোরি, 'ডপেল আডলারট' বাগাতে পারো ?

বিগড়র

দেখ, পিঠানো বাগাতে আমি মোটেই পারি না ।

ফ্রিট্‌ল্‌

আমি জানি, তবে ঠিক মনে পড়ছে না ।

মিত্‌লি

আমি সুইটা পাইছি... না...না...না...না...না...

ফ্রিট্‌ল্‌

ও মনে পড়ছে ! ( পিঠানোতে বাগাইল কিন্তু ফল বাগাইল )

মিত্‌লি

( পিঠানোর সাধনে দিয়া ) না, এই বকব ( সে আঙুল দিয়া  
সুইটা বাগাইয়া বেশ )

ফ্রিট্‌ল্‌

ঠিক ঠিক... ( ফ্রিট্‌ল্‌ পিঠানো বাগাইতে ব্যর্থিল, মিত্‌লি এতদ  
সাহস পাঠিতে লাগিল )

বিগড়র

আর একটু সুমধুর স্বাদি, নয় ?

ফ্রিট্‌ল্‌

( কিছুকল ফল বাগাইয়া খাওয়া বেশ ) না, হচ্ছে না, আমাৰ  
ঠিক কান নেই । ( সে মিষ্টের সুস্বাদুত খাওয়াতে লাগিল )

মিত্‌লি

ও ঠিক হচ্ছে না !

ফ্রিট্‌ল্‌

( হাসিয়া ) এ আমাৰ তৈরী !—

মিত্‌লি

কিন্তু এটা নাচের সুই নয় !

ফ্রিট্‌ল্‌

বেখানো ছোট ক'রে, দেখ একবার...

বিগড়র

( মিত্‌লির প্রতি ) আর, দেখা দাক ( বিগড়র মিত্‌লির  
কোমর বড়াইল, তাহাৰা নাচিতে দৃক করিল )

\* অর্থাৎ Double Eagle "দুই ঈগলপক্ষী"—এক ফুডস্‌মার  
মুদ্রা ।



ফ্রিট্‌স্

( পিড়ানোর কাছে বাড়াইয়া পিড়ানোর কী ভুলির বিকে ডাইন )  
এহল )

( বাইরে দরজার খেল বাজিয়া উঠিল )

ফ্রিট্‌স্

( পিড়ানো, বাজান, বস, কবিয়া দিল ) বিগড়র ও মিট্‌সি কিস্ত  
বাড়িতে লাগিল ।

বিগড়র ও মিট্‌সি

( একসঙ্গে ) কি হ'ল ? খামাণে কোন ?

ফ্রিট্‌স্

কেউ দরজার খেল বাজাচ্ছে ( বিগড়রের প্রতি ) তুমি  
কি আরও কাউকে নিমন্ত্রণ করো ?

বিগড়র

:—তা দরজা খোলবার কোন দরকার

ফ্রিট্‌স্

( বিট্‌সের প্রতি ) কি হচ্ছে ?

ফ্রিট্‌স্

কিছু না...

( দরজার খেল আবার বাজিয়া উঠিল )

ফ্রিট্‌স্

( হুগ হুগে উঠিল, বাড়াইয়া এহল )

বিগড়র

তুমি এভাবে নেই, বেরিয়ে পড় ।

ফ্রিট্‌স্

কিস্ত বাইরে পিড়ানো বাজান শোনো যায় ।

বিগড়র

তুমি বেরিয়ে পড়, দরজা খোলার কি দরকার ।

ফ্রিট্‌স্

আমাকে nervous ক'রে তোলে ।

বিগড়র

কে আর হবে ? একটা চিঠি!—অথবা কোন টেলিগ্রাম

—( বাড়ির লোক শোনা ) এত রাতে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা  
করতে আসবে না ।

( খেল আবার বাজিয়া উঠিল )

ফ্রিট্‌স্

আঃ, যেতেই হবে দেখছি ! ( বাইরে খেল )

মিট্‌সি

তোমরা কি কাণ্ড গাড়িয়েছ—( পিড়ানোর বয়েসটো  
ওপর আসল লোটায়া খেল )

বিগড়র

আ, থাম্ ! ( ফ্রিট্‌সের প্রতি ) তোমার কি হ'ল ? খেল  
জনে তুমিও যে nervous হ'লে ?—

ফ্রিট্‌স্

( কবিয়া আসিল, ফ্রিট্‌স শাবুজাব )

বিগড়র ও ফ্রিট্‌স্

( একসঙ্গে ) কে ? কে ?

ফ্রিট্‌স্

( ফ্রিট্‌স হাসিয়া ) দেখ, তোমরা যদি অল্পগ্রহ ক'রে আমার  
করা কর, কয়েক মিনিটের মধ্যে লেছনের ঘরটার খেতে  
হবে ।

বিগড়র

ফ্রিট্‌স্

ও একটা ভয়লোক, আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই  
চলে যাবে... ( গানের বরষা শুলিয়া দিল, যোগে হুটী তড়াতাড়ি  
এবেশ করিল, বিগড়র ফ্রিট্‌সের সঙ্গে বিজ্ঞানসূত্রীত চাহিয়া রহিল )

ফ্রিট্‌স্

( হুটি হুটি, ভীতভাবে ) সে !

বিগড়র

ফ্রিট্‌স্

বাও, ডেভের বাও, চোকো—

বিগড়র

দেখ, বোকারি কোরোনা, এ একটা ক'ল  
হ'তে পারে...



ফ্রিটস্

বাণ্ড, বাণ্ড...

( কিছুটা সাপেক্ষ করে চুক্তি করা ) পরে ফ্রিটস্ আড়াআড়ি ধর হটতে বাহির হইয়া বাহিরের দোকান দিকে গেল। কয়েক ঘুরে গেল, অন্যদিকে গেল। তারপর পরদিন যখনই কাছাকাছি আসিল এক বিশিষ্টভাবে পরিচ্ছন্নিত কতলাককে দাখ করিয়া ফ্রিটস্ আবার ঘরে প্রবেশ করিল। অত্যন্তাধিকতঃ প্রথম ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া তাহার পশ্চাতে ঘরে ঢুকিল। ভক্তলোকটির পায়ে হস্তে কাচ ও তারকাটি, হাতে লাঠ, লাঠ হাতে খিচা।

ফ্রিটস্

( হুঁকিতে হুঁকিতে ) কহা করছেন, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম—

ভক্তলোক

( সহধর্মী ) হাত তুলে কহে। আমি বিশেষ ভাষিতে আপনাকে ডিহা, বা বিবর্তন করতে চাই।

ফ্রিটস্

না। অগ্রহণ করে কি

কোন যুগাইবা (কি)

ভক্তলোক

( ফ্রিটস্ আপনাকে সত্যিই চিন্তিত করায়, একটু আশ্রয় প্রদানে চাছিল )

ফ্রিটস্

এই ক্ষেত্রে কখন কিছু মিলে।

ভক্তলোক

( তখনই ঘনিষ্ঠ, সহযোগিতা সহিত ) কার্ণিকাল বোধ হয় ?

ফ্রিটস্

( পশ্চিম দিকে ) কেন ?

ভক্তলোক

না, আপনাতঃ বক্তৃতা দ্বারা যেহেতু চুপ, মেহেদেব ম্যান্টল—

ফ্রিটস্

"...( ঘনিষ্ঠ ) বাস্তবিকভাবে আপনাকে পাবে। ( নীরবতা )

ভক্তলোক

ভীষণতা মাঝে মাঝে আশ্রয় দিতে পড়ে...সহ...

( গোপনভাবে ফ্রিটস্কে আঁত ধারিল )

ফ্রিটস্

[ এক বিশেষের দৃষ্টান্তলোকে বিবেচনা করা। অতীতের চাইল ] অগ্রহণ করে আপনাতঃ আশ্রয় দিতে পারলে বিশেষ বাস্তব হয়।

ভক্তলোক

নিষ্ঠা... ( পরোক্ষ ) আমার স্ত্রী আপনাতঃ এখানে তাঁর বইটি কুলে কুলে পেয়েছেন।

ফ্রিটস্

আপনাতঃ স্ত্রী ? আমার এখানে ?...তাঁর... ( ঘনিষ্ঠ ) না, আপনাতঃ পরিচয় কিছু অগ্রহণ করছেন...

ভক্তলোক

( সহধর্মী হাতটি উঠিল, দুই কর্ণের দ্বারা, যখনই তা দেখিলে পোষাক হাত দিয়া পূরণ করেছিল ) হ্যাঁ, সে কুলে কুলে পেয়েছে।

ফ্রিটস্

( উদ্ভীর্ণ হাতটি, তাহার পরোক্ষের দৃষ্টান্ত কিছু কাছাকাছি আসিয়া গেল )

ভক্তলোক

( হাত তুলে কহিল ) ওখানে উঠিল, যেন সে ফ্রিটস্কে দুই কর্ণের দ্বারা—সহ ও কুল করে ) ওঃ।

ফ্রিটস্

( যেন দুই কর্ণের দ্বারা কয়েক পা পেয়েছে সত্যি বলে )

ভক্তলোক

( কিছুক্ষণ নীরবতার পর ) এই আপনাতঃ চিত্র ! ( সে ওখানে কোর্টের পকেট হটতে একতারা চিত্রের পকেট বাহির করিয়া দিগ্ভাষ টেকিলে হুঁড়িয়া গেল ) আপনি যে সব চিত্র পেয়েছেন অগ্রহণ করে দেখেন কি

( আশ্রয় দিতে )

ভক্তলোক

( ক্রোধ করে, নিশ্চয়ই সহিত ) আমি ইচ্ছা করি না যে চিত্রগুলি— পরে আপনাতঃ ঘর থেকে পাওয়া যায়।

ফ্রিটস্

( দুই কর্ণের ) কেউ তা পাবে না।

ভক্তলোক

( তাহার দিকে চাইয়া মিলিল, নীরবতা )

ফ্রিট্‌স্

আর কি চান আপনি আমার কাছ থেকে ?...

ডব্রলোক

( বিম্বের দিকে ) আর কি আমি চাই ?—

ফ্রিট্‌স্

আমি আপনার disposal এ...



ডব্রলোক

( একটু বাধা হইয়া ) বেশ—( ডব্রলোকট বনের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বাগারভায়া হাজান টোবল, যেতেনের দুপি ইত্যাদি দেখিয়া তাহার মুখ কুহু হইয়া উঠিল, যেন যাব একবার সে কোথায় নত হইয়া উঠিলে )

ফ্রিট্‌স্

( তাহা দেখিয়া আবার বলিল ) আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার disposal এ—কাল আমি আরটা পর্যন্ত বাড়ীতে থাকব ।

ডব্রলোক

নত হইয়া অভিব্যক্তি করিয়া হাঁটবার মত পুঠিল )

( ফ্রিট্‌স্ তাহাকে বাক্য পূরণে আনাইয়া বিতা আসিল, ডব্রলোক চলিয়া গেলে ফ্রিট্‌স্ গির্জাবার টেবিলের নিকটে আসিয়া এক মুহূর্ত্ত বাড়াইল । তাৎপর্য জানিবার কাছে ছুটিয়া গিয়া পর্দার দ্বার দিয়া ডব্রলোকটির চলার দৃষ্টি দৃঢ়বৃত্তিতে অনুসরণ করিতে লাগিল । তাৎপর্য জানিয়া হইতে যেন পালাইয়া আসিয়া বেহের দিকে চাহিয়া এক সেকেন্ড বাড়াইল । তাৎপর্য পানের দলের দরজায় গিয়া ক্ষেত্র পুঠিয়া গেল )—

ফ্রিট্‌স্

বিগডর, এক মিনিটের অন্ত্রে এসো...

( বিগডর এসে কহিল )

বিগডর

( কল ) কি...

ফ্রিট্‌স্

বিগডর

না । তুমি নিশ্চয় ওর কানে গড়েছ ! কি, শেষকালে confirm করেছ ? তুমি একটা fool...কি বল...তুমি—

ফ্রিট্‌স্

( ফ্রিট্‌স্ দেখাইয়া ) ও আমার চিঠিগুলো দিয়ে গেল—

বিগডর

( বিম্বের দিকে ) ও ... ( একটু খামিয়া ) আমি সন্ধ্যা তোমার বলেছি, কখনও চিঠিপত্র লিখবে না ।

ফ্রিট্‌স্

আমি বিকেলে ও লোকে হাতের ছিল ।

বিগডর

আচ্ছা, তার পর কি তোমো ?—বলো

ফ্রিট্‌স্

দেখ বিগডর, তোমাকে আমার এ কাজটি করতে হচ্ছে—

বিগডর

আমি ব্যাপারটা সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি ।

ফ্রিট্‌স্

ঠিকঠাকের আর উপায় নেই ।

বিগডর

ফ্রিট্‌স্

সব চেয়ে ভাল হয়... ( কথা শেষ না করিয়া ) না, মেয়েরা কতকগুলি অটিকে থাকবে ।

বিগডর

আর ওয়া আবার কিছুক্ষণ থাকতে পারে, বলতে চাইছিলে ?

ফ্রিট্‌স্

সব চেয়ে ভাল হয় যদি তুমি আত্ম এখনই লেন্সার কাছে যাও ।

বিগডর

বেশ, তুমি যদি তাই চাও ।

ফ্রিট্‌স্

এখন তুমি লেন্সার দেখা পাবে না...তবে এগারোটা থেকে বায়োটার ঘরো ও নিশ্চয় কাক-হাউলে আসবে... তখন তুমি ওকে নিয়ে আমার নিকট আসতে পারো...

বিগডর

হা, অমন মুখ করিস না...এ ব্যাপারে শতকরা নিশ্চয় নব্বইটাতে গেলে বিশেষ কিছুই হয় না ।



ফ্রিট্‌স্

কিন্তু এ ব্যাপারটাতে একটা এল্যার কি গুল্পার হবে।

বিগডর

দেখ, গত বছরের ঘটনাটা মনে আছে, সেই ডাক্তার বিনগার ও তারত্নের মধ্যে ব্যাপারটা—সে ত ঠিক এই রকম।

ফ্রিট্‌স্

সে হেঁড়ে দাঁড়, তুমি তা জানো—কিন্তু এ, এ একুনি এই ঘরে আমাকে গুলি করতে পারলে—আ, তা' হ'লে সব চুকে যেত।

বিগডর

(অস্বাভাবিক) বা, বেশ! ব্যাপারটা বেশ সুক্কে বটে...আর আমরা, লেন্নি আর আমি, আমরা কিছু নই? তুমি কি ভাব আমরা এ হ'তে দেব?

ফ্রিট্‌স্

বিগডর, ও সব কথা ছাড়ো!...তারা যা চাইবে তোমাদের তাই স্বীকার করতে হবে।

বিগডর

ফ্রিট্‌স্

তা হ'লে কি বিগডর। তা তুমি যদি না ইচ্ছে কর।

বিগডর

মনুষ্প! দেখ, আগলে ব্যাপারটা হচ্ছে ভাগা...

ফ্রিট্‌স্

(বিগডরের কথা না শুনে) হাঁ, তার এই ভর আগেই হয়েছিল...আমরা ট'হ'নেই এই ভর করেছি...আমরা জানতুম এই রকম হবে

বিগডর

যা তা বলছিলাম ফ্রিট্‌স্।

ফ্রিট্‌স্

(নিখিল টেকিল সেল, টিটলি ভিতরে হাফিচা দিল) সে এখন এই মুহুর্তে কি করছে কে জানে। তার হামী যদি থাকে.. বিগডর.. তুমি কাল নিশ্চয় খবর জানবে ওখানে কি হ'ল।

বিগডর

ফ্রিট্‌স্

আর দেখো, অকারণে কোন মেট্রী করা যেন না হয়।

বিগডর

পরভদিনের আগে কিছু হ'তে পারে না।

ফ্রিট্‌স্

(ইমিগ্রেশনে) বিগডর!

বিগডর

না, দ'ম'য়ে যেয়ো না—স্বাচ্ছন্দ কর!—দেখ, মনের তেতরে ছোর দরকার—আর আমার ত বেশ মনে হচ্ছে, সব ভালর ভালর ফেটে থাকে...আমি জানিনা কেন, কিন্তু আমার এই মনে হচ্ছে।

ফ্রিট্‌স্

তুমি ব্যক্তিবিকই বন্ধ!—কিন্তু মেহেদের কি

বিগডর

যা হয় একটা কিছু, ওদের এখন পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

ফ্রিট্‌স্

না। আজ আমরা খুব স্তি করব। ফ্রিটলিনে যেন কোন রকম কিছু না ভাবে। আমি শিরানোতে বসছি, তুমি ওদের ডাক। তুমি ওদের কি বলবে?

বিগডর

বলব, ওদের জানার কিছু দরকার নেই।

ফ্রিট্‌স্

(শিরানো বাহাইতে বসিয়াছিল, খুঁচা বসিল) না, না,—

বিগডর

বলবে, এক বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

ফ্রিট্‌স্

(শিরানো বাহাইতে বসিল)

বিগডর

(খরজা খুলিয়া) অরুএহ ক'রে তোমরা এছা—

(মিত্‌শি ও ফ্রিটলিনের প্রবেশ)

মিত্‌শি

বাক! চ'লে গেছে?

ক্রিস্টিনে

( কিছুসেব নিকট দৃষ্টিতে আসনা ) কে এসেছিল, ফ্রিট্‌স্ ?  
কে ?

ফ্রিট্‌স্

( পিছনে বাজাটতে বাজাটতে ) আমার তোমার সব  
জানতে হবে, কি curious !

ক্রিস্টিনে

ফ্রিট্‌স্, তোমাকে অহুযোগ করছি, বল বল ।

ফ্রিট্‌স্

দেখ, তোমার বলবার জো নেই, এমন লোকদের  
সঙ্গে বাশার, ঘরের তুমি মোটেই জান না ।

ক্রিস্টিনে

( অমনতর করে ) না, আমার প্রতিজ্ঞা বল ফ্রিট্‌স্ ।

পিওডর

ওকে পূব আশাচ্ছ ত...

মিস্ত্রি

ক্রিস্টিনে, অবুঝ কন না । কেন আর বার বার কল্লোল  
করছিল, — ও ভাবছে ওকে পূব না! মাঝে! —

পিওডর

আমাদের নাচটা শেষ করুন ( বিজাটারের ফ্রাউনের করে )  
অগ্রগত কর'রে বাজাবেন কি মিষ্টার ক্যাপেলমাইস্টার — একটা  
নাচের গান ।

ফ্রিট্‌স্

( পিছনে বাজাটতে লাগিল )

( পিওডর ও মিস্ত্রি নাচিতে লাগিল ) একটু নাচার পর )

মিস্ত্রি

আমি আর পারছি না ! ( সে এক চেয়ারে বসে ) পড়িল )

পিওডর

( তারাকে চুপন বিজা তাহার পাশে চেয়ারের হাতের ওপর বসিয়া  
পড়িল )

ফ্রিট্‌স্

( পিছনের দিকে ফিরাইয়া দিল্লীয়েন দ্রুত হাত বরিষা তাহার দৃশ্য  
দিকে গেল )

ক্রিস্টিনে

( খেদে মাগিয়া উঠিয়া ) কি তুমি আর থাকো না ?

ফ্রিট্‌স্

( হাসিয়া ) আজকের মত পকেটে...

ক্রিস্টিনে

জানো, আমার ভারি পিয়ানো বাজাতে ইচ্ছে করে...

ফ্রিট্‌স্

তুমি পূব বাজাও ?

ক্রিস্টিনে

আমার লম্বা কোণার — বাজাতে এত কাজ, আর তা  
ছাড়া আমাদের পিয়ানোটা বা বাজান ।

ফ্রিট্‌স্

আমি একবার তোমার পিয়ানো বাজাতে চাই । চাঁ,  
তোমার খণ্ডি দেখতে আমার এত ইচ্ছে করছে, কেমন  
শেখ ।

ক্রিস্টিনে

( হাসিয়া ) তোমার ঘরের মত এত লম্বা নহ

ফ্রিট্‌স্

তা হ'লেও, সে খণ্ডি দেখতে বড় ইচ্ছে করছে । আর  
তুমি এক সময় তোমার সব কথা বলবে... অনেক কথা...  
আমি তোমার কথা এত কম জানি ।

ক্রিস্টিনে

আমার বিবাহ কিছুই কিংবা বলবার নেই — আমার  
জীবনে কোন রহস্ত গোপন নেই — যেমন আর লম্বাটার  
লাফার জীবন —

ফ্রিট্‌স্

আজ্ঞা, আমার আগে কখনও আব কাকেও ভাল  
বাগনি ?

ক্রিস্টিনে

( কিছুসেব হুপে গেল )

ফ্রিট্‌স্

( তারার দাঁত চুষন করিল )

ক্রিস্টিনে

আর, পরেও আর কাকেও ভালবাসব না ।

ফ্রিট্‌স্

( লম্বা খেদামত করিতে ) ও কথা বলোনা... বলোনা,  
তুমি কি জান ? ..তোমার বাবাকে পূব ভালবাসো,  
ক্রিস্টিনে ? —



ক্রিস্টিনে

ও!—আপে তাঁকে আমি আবার সব কথা বলতুম—

ফ্রিট্‌স্

না, তার জন্তে নিম্নে এক দোষ দিও না—যাহুবের জীবনে  
এরকম ত খেটেই—সে কথা সে নিজেই মনের মধ্যে লুকিয়ে  
রাখতে চায়—এই রকম জীবনের জোড়—

ক্রিস্টিনে

আমি যদি শুধু জানি যে আমারই তোমার ভাল  
নাগে—তা চ'লেই সব ভাল।

ফ্রিট্‌স্

ক্রিস্টিনে

তুমি যদি সব সময় আমার সঙ্গে এটি ভাবে এটি শ্রবে  
গল্প কর, তা, তা চ'লে—

ফ্রিট্‌স্

ক্রিস্টিনে তোমার কাছে বড় অগ্রহিণী চলে

ক্রিস্টিনে

না না, আমি বেশ আছি ( ফ্রিট্‌স্‌কে পিঠানোর গুদর  
তাহার মাথা থেকেইটা বসিল ) ফ্রিট্‌স্‌কেইটা টাটকা ক্রিস্টিনের  
গলগলির (ততবৎক) আলু চলেইটা রাখার হাত ব্লাট্‌ক লাবিল )

ক্রিস্টিনে

বেশ!

( যা বিগড় )

বিগড়

ফ্রিট্‌স্‌, সিগারেট আছে ?

ফ্রিট্‌স্‌

( বিগড়র সাইডবার্‌কে সিগারেট খুঁজিতেছিল, ফ্রিট্‌স্‌ তাহার  
কাছে আসিল, তাহাকে এক বাজ সিগারেট দিল ) আর কালো  
ককি ?

( দুই কাগে ককি ঢালিল )

মিত্‌সি

( দুইটা গলিয়াকে )

বিগড়

কি, তোমার এক কাপ কালো ককি চাই ?

ফ্রিট্‌স্‌

মিত্‌সি—তোমার জন্তে এক কাপ...

বিগড়

ও, থাক খুব...কিন্তু তুমি আর ককি খেয়েনা—  
তুমি আজ সকাল সকাল খাবে, আর ভাল খুম ওয়া  
দরকার।

ফ্রিট্‌স্‌

( বিগড়র দিক চাখিয়া বাজের কলিতে হাসিল )

বিগড়

না, দেখ, অবুধ হোয়েনা, গতি কি ব্যাপার বুঝ ত...

ফ্রিট্‌স্‌

দেখ আর রাতেই লেন্ডির কাছে যাও, তাকে আমার  
কাছে নিয়ে এসো।

বিগড়

আজ রাতেই ? কাল বেলে খুব হবে।

ফ্রিট্‌স্‌

আমি তোমার অগ্রহণ করছি—

বিগড়

১, আচ্ছা...

ফ্রিট্‌স্‌

মেয়েদের বাড়িতে পৌছে দিবে আসবে নাকি ?

বিগড়

হঁ, আচ্ছা...মিত্‌সি! ওঠ, ওঠ!—

মিত্‌সি

তোমরা ত বেশ কালো ককি খেলে—! আমার একটু  
দাও!—

বিগড়

এই নাও, মিত্‌সি...

ফ্রিট্‌স্‌

( ফ্রিট্‌স্‌কে এটি পুঁজিয়া ) কি, ক্লাজ ম'নে হচ্ছে ?  
ক্রিস্টিনে...

ক্রিস্টিনে

তুমি যখন ওই রকম ক'রে বল, আমার স্বীকার লাগে।

কিটুন্স

ক্রিস্টিনে

( হাসি ) —মন ধরে—একটু মাথাও ধরেছে...

কিটুন্স

ও, বাইরে খোলা বাতানে গেলেই মেঘে বাবে ?

ক্রিস্টিনে

আমরা এখন বাবো ?—তুমি আমাদের সঙ্গে আসছ ?

কিটুন্স

আমি বাড়ীতে থাকছি,...মেগো, কিছু

ক্রিস্টিনে

( পূর্ণ বসনা নবন বসি ) এখন...এখন তোমার কি কাজ ?

কিটুন্স

( সামান্য একটু কড়া হলে ) বেশ, ক্রিস্টিন্, তোমার এ  
খডাণ ছাড়তে হবে।—( বিষহরে ) বেশ, বড় ক্লাস্ত মনে  
হচ্ছে...আজ আমি আর খিওডর বাইরে যাঠে হু'খন্টা  
দোড়ামোড়ি করেছি—

খিওডর

ও সে কি লুন্ডর—আগছে বার সবাই একদলে লুন্ডর  
বাইরে খেড়াতে বাবো ।

মিত্‌সি

আর তোমরা ইউনিকম' শ'রে

খিওডর

হী, মেটা তোমার প্রকৃতি-উপভোগের অঙ্গ হবে ।

ক্রিস্টিনে

আবাব হবে দেখা হবে ?

কিটুন্স

( একটু বিচলিত ) আমি তোমারে ঈগণির লিখে জানাব ।

ক্রিস্টিনে

( বিষহর ) অ্যাঙ্কা, এখন আমি । ( চলিত বাইবার  
নক সুবিল )

কিটুন্স

( তাহার বিমততা দেখিয়া ) কাল তোমার সঙ্গে দেখা  
করবো, ক্রিস্টিন্ ।

ক্রিস্টিনে

( আনন্দিতা ) প্রতি ?

কিটুন্স

হী, বাপানে...সেই লাটনের কাছে আমাদের তারগার...  
খরো, ছুটীর সময়...কেমন ? তোমার কোন অগ্রবিনে  
হবে না ?

ক্রিস্টিনে

( খাড়া নাড়িল

মিত্‌সি

( কিটুন্সের প্রতি ) কিটুন্স, আমাদের সঙ্গে আসছো ?

খিওডর

'তুমি' বলবার তোমার ক্ষমতা আছে দেখছি ।

কিটুন্স

না, আমি বাড়ীতে থাকছি ।

মিত্‌সি

তোমার দিদি মতা ! আর আমরা

হবে...

কিটুন্স

মিত্‌সি, অতবড় লুন্ডর কেকটার গ্রাফ লম্বাই যে প'ড়ে  
রইল । রোগো, কেকটা একটা তাগছে বুড়ে বিচ্ছি—  
কেমন ?

মিত্‌সি

( খিওডরের প্রতি ) রীতিবিক্রম ?

ফ্রিট্‌স্

( কেকট পাক করিয়া বিল

ক্রিস্টিনে

তুমি একবারে ছেলে মানুষ...

মিত্‌সি

( কিটুন্সের প্রতি ) খামো, বাস্তবলো নিবিরে যাই ।  
( বাস্তবলো হু' বিতা বিবাইটা ) বিল, কেবল শিবিরাক তোমাদের ওপর  
একটু ব্যতি অদিতে লাগিল )



ক্রিস্টিনে

তোমার জানলা খুলে দেব ? ঘরটা যা গরম । জানালা  
খুলিল, লম্বনের বাড়িটার দিকে চাহিল )

ফ্রিট্‌স্

আজ্ঞা, বন্ধুদা, দাঁড়াও, পথে আলো বরষি ।

মিত্‌সি

এই মধ্যে সিঁড়ির আলো নেভানো ?

খিওডর

ক্রিস্টিনে

আঃ কি সন্দের বাতাস, কি মিষ্টি বাতাস আসছে !

মিত্‌সি

বসন্তের বাতাস... ( বহুদূর বিকট ক্রিট্‌স্‌ খাতি খাতে দাঁড়াইয়া )  
মাক্কা, তোমার এট দায়র নিয়ন্ত্রণের জন্তে আমাদেও  
অপেক্ষ বসবাস !—

খিওডর

( তাহাকে লম্বিয়া ) চলো, চলো... চলো...

( ক্রিট্‌স্‌ লম্বনের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল । ঘরের খোলা দরজা  
দিয়া বাহিরের সৌন্দর্যের কথাবার্তা পোশা বাটতে লাগিল )

মিত্‌সি

আজ্ঞা, বেশ !

খিওডর

দায়বাস, এখানে সিঁড়ি ।

মিত্‌সি

বেকটির জন্ত অপেক্ষ বসবাস...

খিওডর

চুপ, বাড়িওছু, বাড়িরে তুলে চলেছ !

ক্রিস্টিনে

জুটে নাখট্‌ !

খিওডর

জুটে নাখট্‌ !

( ক্রিট্‌স্‌ তাহার ঘরের প্রবেশের দরজা বন্ধ করিল, চারি দিক,  
তাহার পক্ষ পোশা গেল । সে এখন বাহ্যিক ঘরে প্রবেশ করিল,  
টেবিলের ওপর বাতি রাখিল, তলার বড় দরজা খোলা শু ঘরের পক্ষ  
পোশা গেল )

ফ্রিট্‌স্‌

( জানালায় লিখা দাঁড়াইল এবং : তলার বন্ধুদের বিখ্যাত লম্বাঙ্গন  
জানাটিল )

ক্রিস্টিনে

( তাহা হইতে ) জুটে নাখট্‌ !

মিত্‌সি

( আনন্দ উচ্ছ্বাস ) 'জুটে নাখট্‌, যাও ছেলে'...

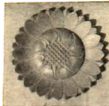
খিওডর

( লম্বাঙ্গন : বহা ) মিত্‌সি !

( তাহাদের কথাবার্তা, তাহাদের হাসি তাহাদের শব্দসমি—একল  
বহুদূর জানালা দিয়া বাহিরে আসিতে লাগিল । সবলেনে পোশা ঘাইতে  
লাগিল খিওডর 'ভগল আচলোভের' হুজুট শিল দিয়া বাহ্যিকভেদে ;  
তাহাও ঐদ হুজুট মিলাইয়া গেল । ক্রিট্‌স্‌ অনেক সেকেন্ড বাহিরের  
দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া বহিল, তাহণর জানালায় শাপে বড় তেজেরে  
বহিয়া গড়িল । )

বহুদিক পতন

( আশ্রয়ী লম্বাঙ্গন মনোহা )





# নারী

## জীজ্ঞোতির্ষ্য দাসগুপ্ত

আজকাল মানিক ও সাম্প্রতিক পত্রিকাগুলিতে নারী-বিষয়ক প্রবন্ধের পূর্ব এতলন দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বিষয় অধিকাংশ প্রবন্ধই মেয়েদের লেখা। এই নারীভাষণরূপ ও নারীস্বাধীনতার যুগে নারীরা নিজেদের নিজেরা চালাইছেন, নিজেদের কথা নিজেরাই বলছেন ইত্যাদি বাস্তব। তাঁরাই এই আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আমরা যুদ্ধ প্রাণসম্মান পৃষ্ঠিতে নিষ্ঠাক্ষণ করিয়া তাঁরাই কল্যাণপ্রচেষ্টায় সমাহৃত প্রতি প্রদর্শন করি, ইত্যাদি সমস্ত। এই নারীভাষণের স্রোত যুবকদের মধ্যেও ঢাকঢাক সৃষ্টি করিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যমন্ডল, চর্কাসভা প্রভৃতিতেও দেখিতেছি যুবকরা নারীর কর্মক্ষেত্রে পরিচি সন্মুখ আলোচনা করিতেছেন—তবে নারীদের পাড়ে মতামত দণ্ডাইবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের মধ্যে এ সব আলোচনা ভাল, কারণ তাহাতে নিজেদের স্বাধীন হইয়া বিচার করিবার ক্ষমতার প্রসার হইয়া থাকে।

বর্তমান যুগ হইতেই আত্মনিয়ন্ত্রণের যুগ। ছোট বড় কেই বসিতে ছাড়ে না, self-determination is our birth right। তাহেই বর্তমানে পুরুষদের উচিত নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষ পুঙ্খ করিয়া বেগা—এবং তাঁহারা যখন নারীর কথা বলেন তখন যে সন্মুখ নিষ্ঠাক্ষণ থাকে। তবে কেও যদি নারীর কথা বলিতে গিয়া পুরুষ ও নারীর কথা আলোচনা করেন তখন পুরুষদেরও যে সন্মুখ মতামত প্রকাশ করা উচিত বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহা হইলে পরস্পরের পরস্পরকে দেখিবার পৃষ্ঠি সহজ ও বৃদ্ধতার চইয়া উঠিবে।

পূর্ব আবার বিজ্ঞান ঐক্য আশা করা যেই নারী-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখাছিলেন, তাহাতে তিনি বস্তুত পুরুষ ও নারী সম্মুখ আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেক ভুলের কথাই অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ

বৃদ্ধতার অভাববশত বলাই যিহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারেন নাই। মনে হয়, চিন্তা বলি ভাল করিয়া নানা বাধিবার পক্ষেই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে এবং তখনই তাহাতে উপযুক্ত দোষ খটাইছে।

প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি মেয়েদের charm ও coquetry সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের ঐক্য রসোপমা ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মেয়েদের coquetry কখনও তাহাদের charm নয়। কিন্তু লেখিকা বলিতেছেন charm coquetry ছাড়া অন্য কিছু নয়। এখানে অনেকটাই বোধ হয় লেখিকার দৃষ্টি একমত হইবেন না। আমার মনে হয় যেখানে coquetry নাই সেখানেও মেয়েরা charming, এবং coquetry বাদ দিয়া যখন মেয়েরা স্বাভাবিক ঐক্য হইয়া কাছে আসেন তখনও নারীলোভন পুরুষের কর্মক্ষমতার উপর কম কার্যকরী নয়। তিনি বলিতে চান, নারী ও পুরুষ যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে তখন সেখানে তাহারা নিজেদের সত্য মধুর ভাবে প্রকাশ করিতে চাচ্ছে—অতি সত্য কথা, এবং ইহারই ফলে coquetryর জন্মলাভ। কিন্তু ইহাই যে ক্লাসিক পদ্ধতি মূল রহস্য, দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে তাহা শু মনে হয় না। ছোট ছোট ফলে ও মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যে, নয় নারীর পরস্পরের উপর যে charm তাহাকে instinet বলিলেও অসুবিধা হয় না। তিন চারিটি ক্রোড়ায়ত ছোট ছেলেদের মধ্যে যদি সমবয়স্ক একটি বালিকা আসিয়া গাঁড়ায়, বাহাড়া কেই chivalry বা নারীর কোনটা সম্বন্ধেই বিশেষ সচেতন নয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, বালিকাটির স্পৃহাতে পড়িবার রস বালকদের মধ্যে একটু প্রতিযোগিতার ভাব উপস্থিত হইয়াছে, এবং বালিকাটির যে আকর্ষণীয় শক্তি আছে ইহা অধীকার করা যায় না। ইহার দৃষ্টি



coquetryর কোন লক্ষ্য নাই। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই charmএর মূল রহস্য। এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের মূল ভিত্তি কি, তাহা ক্রমেই যৌন আকর্ষণের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমারও মনে হয় প্রকৃতিদেবী সৃষ্টিরক্ষার জন্য যে যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দিয়াছেন এবং তত্ত্বগত যে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য দিয়া সেই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই যৌন আকর্ষণই charmএর মূল ভিত্তি। দৈহিক ও প্রাকৃতিকত বৈশিষ্ট্য। বহিরাগ্রে বলিয়াই পুরুষ মনে করে নারীর চারিদিকে একটা হ্রস্বস্তরে আবরণ বহিয়াছে বাহ্য ছিন্ন করিয়া নারীকে পুরুষের শাইতে হইবে; এবং নারীও মনে করে পুরুষের খামখেয়ালী মনের স্বরূপনির্ণয়ের জন্য তাহাকে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মনের অন্তঃস্থল দেখিতে হইবে। এই charmএর মধ্যে খানিকটা কৌতূহলপ্ররুতি খানিকটা সত্যতার সন্ধানী কল্পনার বিকার এবং বাকী সমস্তটাই প্রাকৃতিক যৌন আকর্ষণ। এই প্রাকৃতিক যৌন আকর্ষণকে মানসশোকেব অবচেতন অবস্থার যৌন আকর্ষণ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। সোকা কথার charmই হইতেছে পরম্পরকে পরম্পরের নিকট মধুর ভাবে বাক্য করিবার প্রচেষ্টার মূল, বাক্য করিবার চেষ্টাটা ও তৎসমস্ত coquetryর ছন্দাক্ষণ্যর আশ্রয় লওয়া হইতেছে—কল। লেখিকা মূল এবং কল (cause ও effect) উভয়কে এক মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন।

Coquetry সম্বন্ধে যিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, তবে লেখিকা এক স্থানে দৃঢ় ভাবে বলিয়াছেন “যদি সে কোথাও বিদ্যাকাম কটাক্ষের মধ্যে একটু অধিক তীব্রতা থাকে, বেশ-পানের সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক সূত্ৰতাকে অতিক্রম ক’রে বাহ্য, বসনপ্রান্তের বস্তুসমূহ বায়ুস্তরে বিদ্যুত হ’লে লক্ষ্য হ’য়ে প্রকাশ পেল তার চেয়েও অগণিত হ’য়ে পক্ষ, তাতে কি হয়েছে?” তাতে কি হয়েছে বা কি হয় তার উত্তর দিয়া দেওয়া পক্ষ, তবে সে বলিয়া-পক্ষা আঁচল সলায় বাঁধিয়া অনেক যে আত্মহত্যা পর্বাঙ্ক করে এইজন্য নোনা দিয়াছে—ইহাতেই আপত্তি। লেখিকা coquettish মেয়েদের পক্ষ লইয়া coquetryর বৈধি মহিমাকীর্তন করুন না কেন—

ভাষাতে coquetryকে অনেক যে খুনজরে দেখিছেন ইহাও মনে হয় না। আমার মনে হয় coquetry জিনিসটা cultureএর বিরোধী। মনের সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে পুরুষেরা কখনই লেখিকার মতে মত দিয়া বলিতে পারিবে না যে, coquetryর ছন্দনা তাহাদের জীবনে একটা মত বড় “প্রাপ্তি”, এবং নারীভাতির পুরুষকে গুটা একটা মত বড় “দান”। Coquetry যে নারীর মাধুর্য্যবিকাশের একটা প্রধান লক্ষণ ইহাও মনে মানিতে চাহিতেছে না। Coquetryর ভিতর নিম্নোক্ত বাক্যত্ব সূক্ষ্মতর ও মোহন্য করিয়া অপরের চিত্ত আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টা আছে সত্য কথা, কিন্তু তাহাতে নারীর অন্তর্লোকেব মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ভাষাকে পুরুষের নিকট মজার ও বরণীয় করিয়া তোলে, বা তাহার কোন প্রকাশের পরিচয় আছে, ইহা বাক্যের করি না। তবে নারীর নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কিসে হয় এবং কিসে হয় না তাহা নারীরাই ভাল বলিতে পারিবেন;—আমি সত্যাকথা বলিতে কি নারীর কথাটার অর্থ সব সময় ভাল করিয়া বোঝিমা হয় না বলিয়াই বোধ হয় নারীদের বিকাশের সহিত coquetryর লক্ষ্যবিন্যাস ভাল করিয়া করিতে পারিলাম না। সাহিত্যে নারীর কথাটার এত বেশী প্রচলন হইতেছে যে, মনে হয় নারীদের শাস্ত্রা নির্ণয়ের সময় আনিগাছে, এবং বিধূরা নারীদের মধ্যে কেহ এই ভাষাটা লইলে পুরুষদের পক্ষে ও জিনিসটা বৃতিবার সুবিধা হয়।

ইহার পর লেখিকা এক স্থানে বলিতেছেন, “তরুণ তরুণী যখন একত্র হয় তখন তাদের বসংস্পর্শন এত দ্রুত হ’য়ে ওঠে, তাদের ভিতর এমন একজনতার সৃষ্টি হয় যে, কোথায় গিয়ে তারা গামবে, তাদের পরস্পরের মানস-সৌন্দর্য্যকে উন্মোচিত করবার চেষ্টা কতদূর নিরে গিয়ে নিরস্ত করতে হবে—এসব কি স্পষ্ট ক’রে শ্রবণ থাকে? এইখানেই দরত একটু তাবিবার রয়েছে।” তবে মনে হয় সত্য সত্যই যে এখানে তাবিবার কিছু আছে সে মধ্যস্থে বিধূরা লেখিকা বির-নিশ্চয়া নহেন। যদি বা তাবিবার কিছু থাকে তাহাও “একটু”, বেশী নয়। তরুণ তরুণীর একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের মানস-সৌন্দর্য্যকে উন্মোচিত করিবার প্রাণটা অবশ্য এখানে কম। লেখিকা বিধূরা; যেন বিশেষণে সংযত

যেই গ্রাফেন লক্ষ্যে নাই এবং কিছুদিন পূর্বে বিলাতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তরুণদের ভলন্টের সময়ে অবাধ হেলথমেণ্ড লক্ষ্যে যে নিবেদিত। প্রচার হইয়াছে তাহা জানেন বোধ হয়। স্নাতকপূর্ণ প্রভৃতি সমুদ্র স্রোতের দিনে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যায় তাহার খবর গ্রাফেন কি? কাজেই ভাবিবার যে যথেষ্ট আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে তখন তরুণীরা একত্র হইয়া পরস্পর মানস-সৌন্দর্য্য উত্তেজিত করে দেখানে সে-সব দেখে যে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহার সংবাদ ঐ আশাচরিত "গিটিনা"তেই ঐতিহাসিক অঙ্গাঙ্গিকতার স্রোতের দেখা পাইবেন।

তৎপরে লেখিকা বলিয়াছেন, "Traditional morality's উপর অমারস্ম্য একবারের নাই—" কোনো বিষয়ে তাঁহার স্মৃতি না থাকিলে তাহাতে অল্প প্রত্যাশাও কিছু নাই; কোনও বিষয়-বিষয়ে প্রচলিত মত অপেক্ষা তাঁহার ভিত্তির মত থাকিতে পারে,—ইহাতেও বলিবার কিছু নাই। ম্যাক J. S. Mill ত বলিয়া গিয়াছেন—"The whole mankind is not justified in silencing that man। সুতরাং আমি একা তাঁহাকে চুপ করাইবার চেষ্টা করিব না। তবে traditional morality's স্থানে artistic temperament কিস্তে প্রশংসা করিতে পারে তাহা ভাল বোধগম্য হয় না। এবং প্রকৃতই পারে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অল্প artistic temperament কি, সেটা তিনি বুঝিয়া বলিতে পারেন না? বলাও শক্ত। প্রথমত art ভিন্নিতা কি তাহাই আমাদের মত লাতার অঙ্গাঙ্গিকতার পোকেস লক্ষ্যে বোধগম্য হয় না—তাঁহার artistic temperament কোন পথ দিয়া চলিবে বোঝা বুঝি শক্ত। যেদিক দিয়া তিনি ইহার অর্থ বুঝিতে চাহিয়াছেন সেদিক দিয়া লবাই বুঝিবেন কিনা সন্দেহ। লেখিকা artistic temperament কি লক্ষ্যে বুঝিয়া বলিতে পারেন নাই অল্প তাহাকে traditional morality's স্থানে বসাইতে চাহিয়াছেন। এইখানে হইতে কিছুটা পর্য্যন্ত লেখিকা তাঁহার প্রবন্ধকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রায় অব্যবহৃত করিয়া তুলিয়াছেন। এইখানে আর একটা কথা লিখিয়া দিই, "মৌলিকের সঙ্গিত-বোধ" মনের ভিতর কতকগুলি করে? তখন তরুণ

মানস-পোকেসের সৌন্দর্য্য উত্তেজিত করিবার সময় দে সঙ্গিত-বোধ কখনোকে বোধ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবে? ভাবপোকে traditional morality's সঙ্গিত বোধী করে, না artistic temperament বোধী সঙ্গিত করে? এইখানে Emerson-এর একটা কথা লেখিকাকে স্মরণ করিতে দিই। একস্থানে Emerson লিখিয়াছেন, "Those who are esteemed umpires of taste are persons who have acquired some knowledge of admired pictures, sculptures and have an inclination for whatever is elegant; but if you inquire whether they beautiful souls, and whether their own like fair pictures learn that they selfish and sensual." তবে লেখিকার artistic temperament-এর সংজ্ঞাও অল্প প্রশংসা চাইল তাঁহার নিকট ঠোকা অবাধের মনে চটতে পারে।

তাঁহার লেখিকা হঠাৎ বলিয়া বসিলেন যে, "concubinage ভিন্নিতা পৃথিবীর সঙ্গিত সঙ্গিতকালেই পড়েছে কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গিতে কেমন একটা অল্পতঃ "বলিবে সেবেই।" দেখালে যে concubinage-এর উপর পোকেসের প্রভা ছিল ইহা লেখিকা হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন কিস্তে, তির বুঝা যায় না। দেখালের সাম্প্রতিক ইতিহাসই ভাল পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক ইতিহাস ত বের করা। যে টুকু পাওয়া যায় তাহাও ওপর কোন খাতিয়া না করাই উচিত। আমাদের পুরুষলক্ষ্যকে ভাঙত করিবার ভয় মেয়েদের যে সাহায্য বরকার, concubinage দ্বারা তাহা ওপর ওর বলিলে পুরুষ জাতিই মনোভাবের উপর যথেষ্ট ভাবিবার করা হয়। Illicit love-এর কথাই রোমান যুগের যে লোকের উদ্ভূত করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করি তাহা কোন সময়ের—রোমানের যখন সভ্যতার এক এক ধাপ উপরে উঠিতে ছিলেন তখনকার, না যখন তাহাদের অবনতির অবসারণ হুক হইয়াছিল তখনকার? Illicit love রোমান সভ্যতার উন্নতিপদের সহায়ক হইয়াছিল—না তাহাও অবনতির পন্থিকালে আসিয়াছিল? আমাদের সেবেও ত concubinage দেখিলে পণ্ডিত ছিল,



একটু অব্যাপ্ততার দ্বারা বিশেষ ভাবেই; কিন্তু তাহা যে পুরুষের কর্পণতিকে অগ্রস্ত রাখিতে পারিহাঙ্কিত তাহা ত মনে হয় না বরং বিপরীতই মনে হয়। যে নারীশক্তি পুরুষের কর্পণতিকে উদ্বোধিত করে, সেখিকা তাহার সহিত concubinage-এর খিটুড়ি করিতে চাহিয়াছেন কি উচ্ছ্রেস্ত তাহা ত বুঝিলাম না। পান্ড্যাতা সমাজে পুরুষ নারীকে একত্ব সহকর্ষিতরূপে পায় এবং এইরূপে পায় বলিয়াই তাহাদের নিষ্ঠাটাই হইতে কণ্ঠের অসুগ্ৰেহণা পায়। এমনে নারীত্বের সহকর্ষিত বা সহকর্ষিত রূপে পাওয়া শুল। Tolstoy-এর সাহিত্যজীবনে তাঁহার স্ত্রী সে ভাবে তাঁহাকে পাহাচা করিতেন। Madame Curie তাঁহার স্বামীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে কিতাপ চাপনা করিতেন, তাহা বোধ হয় অনেকটী জানেন। ও দেশে সাধারণ ভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর দায়িত্ব লাভ করে বলিয়াই পুরুষের কর্পণতিকে অগ্রস্ত পাই। কিন্তু traditional morality

সংজ্ঞাত্বক্য বিপরীত সেখিকা কি কারণে concubinage-এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সেখিকা প্রবন্ধের শেষ ভাগে বাহা শিখিয়াছেন সে কথাগুলি সত্য সত্যের নাই, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার পুরুষকার মতের কোন সঙ্গতি নাই। “প্রেমের দম্যকৌন পূর্ণতার জন্য প্রেমই যথেষ্ট নয়”—ঠিক কথা; এবং এই কারণেই traditional morality-র উপর লোকের স্পৃহা থাকে বরকার। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও artistic temperament প্রকাশের জন্য বাস্তব তাঁহাদের পক্ষে অমায় মনে হয় Emerson-এর ঐ উক্তি শ্রবণে। হৃদয়ের সত্য শিব মূর্তি coquetry-র ছলনার বা concubinage-এর আঁচলে পাওয়া যাইবে কি? যে সৌন্দর্য্য সত্য ও শিব নাই সেখানে কণ্ঠিকের মোহমাল ব্যক্তিগত পায়ের বটে, কিন্তু একত্ব সৌন্দর্য্যবুদ্ধির স্থান সেখানে নাই।

## মরণে

### সোহানী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী

বেশনা-ভাতর চুটি নয়নের পাতে  
ধীরে ধীরে বেয়ে আসে স্নান-বনিকা।  
ম্যানিকলে ঘুরে ঘুরে তব রূপ-শিখা,  
প্রবণ বখির হ'ল তারি বেশনাতে।  
ছব-স্পন্দন ধীরে বেয়ে আসে, হাতে  
তোমারে ধরিতে তবু দেখি মরাটিকা।  
অনগত হাটছানি দেয় বিমানিকা,—  
আজ রাতে ব্যক্তিশেষ... ব্যক্তি পুনঃ প্রাতে।  
কে বলে মরিবে নয়? মরে নাই কত,  
স্নান তার জন্ম-পথে—জন্মে স্নান তবু।  
স্নান সে তো স্নান কথা বুঝিবে। কখন?  
নিবতির তান-পড়া স্রষ্টার বিধান।  
সময়সরপে লাগে অনন্ত ধীরে,  
মোক না আঁধারে মোর আত্মার নিদান।

# পাতিয়ালা-রাজধানী

ঐহরিহর শেঠ

অনুভব হইতে রাজপুত্রের গাড়ী বদল করিয়া পাতিয়ালা ঘাইতে হয়। অনুভবের চাইতে ইহার দূরত্ব ১০০ মাইল। আমরা গঢ়াচড় পাতিয়ালা বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, কিন্তু পাতিয়ালা রাজ্যে এবং পশ্চিমের সকল স্থানেই দোকান পাতিয়ালা বলিয়া থাকে। এখানে বেড়াইতে আসিবার কথার লাতোর ও অনুভবের কেহই আমাদের উৎসাহিত না করিলেও, দেশের প্রত্যেক প্রাচীন ভাবভীর রীতি ও ব্যবস্থাদি যদি কিছু দেখিতে পাই এই প্রত্যাশায় আমরা এসব স্থান দেখিতে ভাল লাগে; সেই কারণে কাকারও কথার কর্পণাত



মহারাজা বাবা আলা সিং

(ইনি পাতিয়ালায় প্রথম রাজা)

ন। করিয়া কঠ ও বাহুবীকার করিয়াও কিরীয়ার পথে এখানে আসিলাম।

পাতিয়ালা উত্তর ভারতের প্রধান সমৃদ্ধ রাজ্য। রামের পুত্র সর্দার আলা সিং কর্তৃক ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পাতিয়ালা রাজ্যের রাজধানী। অতঃ

পূর্বন এখানে পৌত্তল্যের তখন সকল আটকা। লাতোরের কানীবাড়ীর পুজারি মহাশয় আমাদের বলিয়া দিয়াছিলেন এখানে হিন্দু ভক্তলোকদের থাকিবার জন্য হেমম সুবিধা-জনক চৌতেল বা দম্পালা মন্দির, পাতিয়ালা-প্রধানী তথাকাব ওজ্জ্বল এক, এবং বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বাইলে তিনি বসেই আল্লাদমচকরের উচ্চারণ বাজিতে স্থান দিবে। আমরা আসিবার কালীন ট্রেনে পাতিয়ালা-বাসী কতিপয় ভক্তলোকের নিকট জানিলাম লালো দাগিন্‌রাম নামক এক ভক্তলোকের প্রতিষ্ঠিত একটি দম্পালা আছে; উক্ত থাকিবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। নিত্যের অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হওয়ার ভক্তলোকের যদি অসুবিধা হয় এই মনে করিয়া আমরা উক্ত দম্পালাতেই আমাদের লাগেজ পত্র রাখিয়া রাজপ্রাসাদে গুপ্ত প্রবেশ দেখিবার জন্য গান সংগ্রহার্থ, বেশ, অধিক হইলে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পাছে কান্ডারিতে বাধিত হইয়া যান এত আশঙ্কায়, বরাবর বগুয়ারা মোড়ে তাঁহার বাড়ীতে বাইরা উপস্থিত হইলাম। তিনি সতাই তখন কাছারি ঘাইবার জন্য গন্ত ও হটতেছিলেন। আমাদের পৌঁছিয়া সাবের আলোয় কনিষ্ঠ অক্ষয় আলানের পর তাঁহার একক রাজকুমারদের গুরু-শিক্ষক ঐশ্বর্য্য মায়নলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া নিজে উঠিলেন। স্থানান্তরে তাঁহার সহিত স্থানীয় ও বাসিন্দার অস্তিত্ব বহু বিষয়ের যে সকল কথোপ-কথন হইল তাহার উল্লেখ না করিলেও তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি আশ্রয় আশাধনের কথা ও সাংখ্যিক ভোজনের অপ্র-রোধ উপেক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত চরল তাহা না বলিয়া পারি না।

যখন বাবু নিকট জানিলাম মহারাজার পরিবারবর্গ সম্প্রতি পাহাড় হইতে ফিরাই আসিয়াছেন, সুতরাং ঐ প্রাসাদ দেখার এখন আর কোন উপায় নাই, তবে দুই



হইতে ব্যক্তিগত যতটুকু দেখা যায় তাহাই দেখা হইতে পারে। আর তদ্ব্যবসায় প্রাচীন দেবিবার কোন চিত্রপট অবশ্যক হয় না।

প্রথমেই বর্গ সতর দেখার চিত্রের মূদ্রণ বাধ্যবাধক হইতে আদিম্মা অগ্রা মদার লক্ষ্যে বাধ্যবাধক প্রভৃতি দেখার পর



মহারাষ্ট্রা মদার সি

পাঠ্যমালা রাজধানীর মধ্যে দেখিবার মত আর কিছু থাকে, প্রাচীন ইলা দেবিবার ইলা তিনি কখনই বলিতে পারিবেন না; তবে বিনি দেশীয় নৃপতির রাজ্য বলিয়া এখানে দেখিতে আসেন তাঁহার কাছে যে দেখিবার জানিবার এখানে কিছুই নাই এমন কথা আমি বলি না।

দেবিবার মধ্যে এখানে পুণ্ডরীক রাজ্যসদয়, বাহ্যিক কোলা বলিয়া থাকে, এবং সতীবাগের প্রাণদেবী প্রধান। তাহা হইলেও আরও কতিপয় ব্রহ্মই আছে। সতরের ঠিক কেন্দ্র-বৃন্দেই প্রাসাদ বা তদ্ব্যবসায়। কোনো দিকে কোনো পরিচা নাই, কখন ছিলও না, তবে সমস্ত নগরটি পূর্বে প্রস্তুত প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভোরণ ছিল। এখন সে প্রাচীর আর নাই, কিন্তু সোনারি পেট, লাহোরি পেট প্রভৃতি নামীয় কয়েকটি ভোরণ এখনও দেখা যায়।

তদ্ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তি লোহিচ প্রভৃতিপাঠিত; আর সমস্তই বাহা দেখা যায় তাহা টুট চুন বাহির দ্বারা গঠিত। বাহ্যিক প্রভৃতি প্রভৃতি উদ্ভূত তরবারি হতে সমস্ত দিন ব্যক্তি প্রভৃতি নিগূঢ় আছে। স্থানীয় প্রভৃতিদ্বারা অন্যতমমস্ত লোহিতের ভিতরে প্রবেশ নিবেশ থাকার, টুপি পাগড়ির অভাবে আশ্রয়ও কেহ পারের কাপড় কেহ কখনো মাথায় রাখিয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে দৌধবেষ্টিত প্রভৃতি প্রাঙ্গণে সমুদ্রগুপ্ত দেখিলেই তৎকাল প্রাঙ্গণ বর্ণের কালগুলি জগৎপুত্র স্বপ্নভোর কণা মনে করিয়া বের। সমুদ্রেও এটীকালকার আত্মদ্ব-পূর্ণ দ্বারবেশেও তরবারি হতে প্রভৃতি নিগূঢ় রহিয়াছে। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে নিবেশ করার আশ্রয়ের অভাবপ্রভৃতি দেখা হইল না। লোকসমূহ চিনিলাম উভয় ভিতরে দেখিবার মত বিশেষ কিছু নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে প্রস্তরদোশান অস্ত্ররম করিয়া প্রায় একতলা



মহারাষ্ট্রা মদার সি

উপরে প্রাপ্ত চোরগাথে রাজকীয় দ্বারদ্বার কল, উল্লোকে বেগুনখানি বলে। কক্ষটি পূর্বে বড়, লম্বা অস্ত্রত: পত হুট এবং প্রাঙ্গণে চারিদিকে কক্ষ হইবে না। ভিতরে উদ্ভূত অস্ত্র পরিপাটি সোনারি কাম করা, তদ্ব্যবসায় সমুদ্র বনাতের আত্মরম বিস্তৃত। আসবাব পত্রের

মধ্যে প্রধানতঃ ত্রিশ পর্য্যবসিত দুলাবান খেলোয়ারি বাড় ও দেওয়ানগিরি এবং কতকগুলি সুন্দর কৌবর কৌবনপ্রদান প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানে দখিত আছে। একদিকে পাতিয়ালায় প্রথম রাজা বাবা আলানিহর হইতে লক্ষ্য রাজাপ্রদত্ত, অষ্ট-দিকে মহারাজি ত্রিষ্টোত্রিকা লক্ষ্য এডোয়ার্ড ও তৎপত্রী রাজা এলেকজেন্ডার এবং রাজা লক্ষ্য কর্তৃক ও রাণী দেবীর হৃদয় টেকচিত্রলক্ষ্য আছে। এখানকার কড়কুলি যেমন বৃহৎ তেমনিই সুন্দর। এখানকার রাজত্ববনের এইগুলিই স্রেষ্ঠ বলকার। লক্ষ্যের ছোট ইমামবাড়ীতেও পাতিয়ালা-রাজের উপহারপ্রদত্ত প্রদত্ত দুইটি সুন্দর ক্ষটিক বীণাধার দেখাযাইল। তুলিনাম এক সময় কলিকাতার অঙ্গার কোম্পানীর দোকানে রাজার একজন বিশিষ্ট কর্মচারী তাঁহার মাথেনে কয়েকটি বাড় ক্রয় করিতে গান। দোকানের লোক উক্ত কর্মচারীকে একটা সামান্য লোক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ার পর-দিন রাজা পুত্র দোকানে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারের বিশদেতে সে সময় যাহা কিছু মালগজ ছিল সমস্তই কিনিয়া গন। এই প্রথম হওয়া মতোই রাজাপ্রদত্ত দরবারদি ইহা থাকে। পুত্রোক্ত মাখনবাহুকে এ রাজা ভারতীয় আদব কারদা লক্ষ্যে কোথায় কি দেখা দাইতে পারে ত্রিষ্টোত্রিকা রাজা তিনি বসিয়াছিলেন, অষ্ট কোথায় কিছু সে-লব দেখবার কিছু নাই। শুধু দরবারের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিলে এখনও অনেক পুরাতন ভারতীয় প্রথা ও কারদা দেখিতে পাওয়া যায়।

দেওয়ানখানার পার্শ্বে একটি প্রাঙ্গণপ্রাঙ্গণ একটি ছোট-বাটো প্রদর্শনী আছে। উহার মধ্যে বে-লক্ষ্য ব্রহ্মলক্ষ্য আছে তদ্বারা একখানি রক্তনির্ভিত সুদৃশ্য অম্বান ও বিভিন্ন প্রকারের কতিনর তত্ত্বম চতুর্দোলা মাথানোটা, কতিনর মুক্ত বায়ু লিং ও বিভিন্ন জাতীয় পর্দা আর একটি সুদৃশ্য মনোরম ক্ষটিকপ্রদত্ত উল্লেখযোগ্য। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে কয়েকটি ত্রিষ্টোত্রিকা প্রকারের ভোগ আছে তদ্বারা একটির আকার অলপাংশ বৃহৎ। ইহা লাক্ষ্যের প্রুপ্রদত্ত লক্ষ্যমদ্য নামক ভোগ অলপাংশ বৃহৎ। লাক্ষ্যমদ্য ছাড়া এই ভোগনির্ভিত কামনির্ভিত লক্ষ্য প্রাঙ্গণ উনিশ ছুট।

এই ওর্গমধ্যে অঙ্গর পার্শ্বে একটি দরবার আছে, উহাতে বিভিন্ন প্রকারের পুরাতন ও নূতন বন্ধু তদ্বারা শিল্প তাঁর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যীত আছে। দরবারে ইহা মধ্য না হইলেও যে কক্ষে যে ভাবে ইহা দখিত আছে তাহা প্রাঙ্গণা কর্তব্যর মত নহে। এই প্রাঙ্গণ বা ভূর্গের লক্ষ্য দেখাযাই মনে হইল এখানকার লক্ষ্য বিদ্যেই বিশেষভাবে দৃষ্টির অভাব আছে। পরিচ্ছন্ন ও প্রদর্শনীত চক্ক কক্ষাতি বের্ত্তন মাথা করা দ্বারা তদ্ব্যবস্থা নহে।



মহারাজা মোতীলাল সিং

এখান হইতে কামদ্য মোতীলাল লক্ষ্য কলেজ দেখিতে দাইল। ইহা রাজার এবং পাতিয়ালা রাজ্যের একটি সুন্দর কৌটি। ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, এম-এ পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। ইহাতে অবৈতনিক এবং অনেক-গুলি কৃত্তবিত্ত ভোগপ্রদ মধ্যাঙ্গক আছেন, তদ্বারা বাস্তবী দুই তিন জন আছেন। কলেজ-ভবনটিও সুন্দর, এখানকার দৌবারলীর মধ্যেও ইহার স্থান অনেক উচ্চ। দৃকদেয় খেলা ও বেচ্যনর লক্ষ্য লক্ষ্য জমিও অনেক আছে। মনু-এ একটি বোর্ডিং আছে।

সভীবাগ ও উহার মধ্যস্থ রাজত্ববন ইহাওই অনতিদূর। মহারাজা এখন বিলাতে থাকিলেও মহারাজি ও পরিবারবর্গ



এখানে রচিতরাছেন এই কালে। পানাস বা মর্জাবানের কটক পার চওয়া সাধারণের পক্ষে মিথিহ, উহা জানিয়াও বাহির হইতে উহা দেখিবার মানসে আমবা নিকটে যাইলাম। দুই চইতে একটি অতি সুন্দর তরুণীবিহার পাশে তরুণীভির কাক দিহা পানাসের অতি সমান্ত্র অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। বহুতরু দেখিতে পাইলাম তাহাতে মনে হইল উহার আকার ও গঠন স্ত্রীস্বঃ এবং সুন্দর। শুনিলাম, এখানে শিলামচল নামক বাড়ীটি অতি সুন্দর এবং বহু তরুণ ও তরুণীপূর্ণ উদ্ভাসময়ঃ রুহিম নির্ভরশীতি



মহারাজা মহার সি:

বড়ই পোষাক। পাতিয়াণার মাত্ৰ চই তিনটি দেখিবার মত জিনিষ, তন্মধ্যে যেটি প্রধান তাহা দেখিতে না পাওয়ার হতান হইয়াই ক্রিয়াম। এই উদ্ভাসের পশ্চাত্তানে একটি বিহৃত নদী আছে। ইহার মত বৃহদাকারের জলাশয় এ প্রদেশে আর ঘিঠার নাই বলিগা শুনিলাম।

এদিককার পথ ভলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত। আমাদের আর একটু দূরিতে ইচ্ছা হইলেও ধর্মশালায় কিরিয় মানািগি পারিগা বংশোপাধায় মশাপের বড়ীতে সন্ধ্যাক্রিক-কার্যের ভক্ত দধন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি তখন আর বিলম্ব করা চলে না বলিগা ক্রিয়াম। বধা সময়ে বংশোপাধায় মহাশয়

দেব বাটীতে উপস্থিত হইয়া অতি পরিতোষদয়কারে প্রদান পাটলাম। একথা বোকার করিতে চইবে, বাফলা ছাড়িগা অর্থ একমাত্র লাভেরের কাণীবাড়ীতে কতকটা। মাত্র ছাড়া আমাদের আমরগণিচিত এমন সুন্দর তোলাঃ একটি দিনও আমাদের অধুটে ছুটে নাই। আহাঃ করিতে করিতে মাখনবাবুর দত্তিত পাতিয়াণা রাজ্য পথছে ও অস্ত্রান্ত বহু বিধের অনেক কথা হইল। তাঁহাদের দেশ ও সম্রাটান কলিকাতার উত্তর দক্ষিণের, তাঁহার গণ্ডদেব বর্গীর বিহারী লাগ বংশোপাধায় মহাশয় প্রথম এদেশে আসেন। তিনি বাহোরেরও অনেকদিন ছিলেন, তথায় এবং পাতিয়াণার অনেক সাধারণের কার্যে তিনি অগ্রগী ছিলেন। নবীন ওজ্জ্বল নামে আর একজন শিক্তি বাঙ্গালীও এ-প্রদেশে অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্তা এখানকার বালিকা-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, এক্ষণে রাজ-অধ্যাপকের মেরেবের শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত আছেন। বর্তমান মহারাজা নিজে যেমন শিক্তি, রাজামধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ভক্ত যে বাবরা আছে তাহাও তেমনি প্রশংসনীয়। পাতিয়াণার শুধু উচ্চ শিক্ষা অধৈতনিক নহে, সমস্ত শিক্ষাই অধৈতনিক। বাস্তবিক শিক্ষার গন্তঃ এখানে একটি বিভাগ আছে। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের নাম করিতে হইলে বর্গীর অধিনায়ক বংশোপাধায়ের নাম প্রশংসাই উল্লেখ করা উচিত। আর অধৈতন্য পূর্বে তিনি তদানীন্তন মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিঃ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বৃত্তি পরামর্শে রাজ্যের বহু বিষয় উন্নতিগত করিয়াছিল বলিগা শুনা যায়। এখানে এক্ষণে মোট ছয় লাখ বস্তের অধিক বাঙ্গালীর বাস নাই।

পাতিয়াণার ক্রিকেট সোলো প্রকৃতি খেলায় পুণ পুণ। ক্রিকেট বীর কলিকতের নাম ক্রিকেট খেলায় অগ্রগী ভগ্নতে কাহার নিকট অবধিত আছে। তিনি এবং তাঁহারই ব্রাহ্মসুত বর্গীঃ সিং, যিনিও ক্রমে পুরস্কারের জ্ঞায় খেলায় বর্গীর হইয়া উঠিছেন, তাঁহাদের অগ্রভূমি এই পাতিয়াণাঃ। পাতিয়াণা আর তাঁহাদের নামে পৌরযাচিত। শুনিলাম এখানকার ক্রিকেট-প্রাইভেটের মত খেলার স্থান আর কোথাও নাই, সোলো-প্রাইভেট পুণ ভাল। মাপন বাবুর



মহোদয় মণিবাণুর সহিত একটু ভাল কবিতা আলাপ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সমঝভাবে তাঁহার কবিতা আলাপ করিয়া অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তথা হইতে এই দূর পথে প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রমণোক্তদের আতিথেয়তার কথা ভাবিতে ভাবিতে বিনাম লইয়া বস্ত্রাব বিখ্যাত ক্রিকেট-গ্রাউণ্ড দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।



মহারাজা কর্ন সিং

গোণ্ডা গ্রাউণ্ডটী তাঁহারের বাটীর নিকটেই। উহার ভাল মন বুঝিবার মত জ্ঞান আমার নাই, আমরা আর টালা হইতে নামিলাম না, উহা দেখিতে দেখিতে গাইলাম। আমার দৃষ্টিতে উহা একটি পরিষ্কার কৃষ্ণমাছের মত মাত্র। এই স্থান হইতে যে সকল পথ অতিক্রম করিয়া বাগওয়ানি ও ক্রিকেট-গ্রাউণ্ড দেখিতে হয় তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন গণপথ এবং সরল। টালাওয়ালার বলিল উহার নাম ঠাণ্ডা সড়ক। এই জনবিরল পথপার্শ্বে এখানে-এখানে ছোট ছোট উদ্যান-মধ্যে কয়েকটি পরিষ্কার ও আধুনিক ভাবের বাড়ী দেখিলাম। পুরাতন সড়কের পার্শ্বে এই স্থানগুলিকে ঘেঁষিয়া পশ্চিমে কুখা নামে একটি স্বতন্ত্রবৈষ্ণব মঠ আরম্ভকের অপেক্ষা না রাখিয়াই যেমন ভারতের রাধাবাসী

হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রায় সকল প্রধান লোকগুলিতে প্রবেশ করিবার, এখানেও জাচার।

ঠাণ্ডা সড়কের পথই বাগওয়ানি। বাগওয়ানি একটি সুগন্ধ মৌলের নাম হইলেও যে বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে উহা বিস্তারিত তাহাকেও লোকে বাগওয়ানি বলিয়া থাকে। এই উদ্যানটি বেশ সুসজ্জিত ও রমণীয়। উহার ভিতরের তরুণাশ্রমমাছের বহু পথগুলিও চমৎকার। এই বাগওয়ানি ভবনটি ভিন্ন দেশীয় রাজা মহারাজা ও লাদি বৈষ্ণবদের অধীনে বাগওয়ানির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এখানে অল্প একটি গেটহাউসও আছে, উহা একটি সাধারণ বিতল অট্টালিকা মাত্র। এই বাগওয়ানি মহারাজা রাজেন্দ্র সিংহের একটি জননপ্রদান পাথরগুলি আছে। অল্পের পাথরের ভিতর দিয়া আর একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম, উহা কায়ার প্রতিমূর্তি স্থান।

এই বাগওয়ানির পার্শ্বে একটি চিড়িয়াখানা আছে। চিড়িয়াখান মধ্যে মন-পনের-টুকুটি কাক-তাহা প্রভৃতি পাখী



মহারাজা নরেন্দ্র সিং

আর অল্প কয়েক মধো সিংহ সিংহী মাতৃটি, বাঘ ছাউটি তরুণ একটি ও মেকা হইটি মাত্র আছে। এই চিড়িয়াখানার পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ ক্রিকেট-গ্রাউণ্ড ও রাজেন্দ্র চমৎকান।



ক্রিকেট পছন্দও আমায় কিছু মাত্র জ্ঞান না থাকিলেও এই মাত্র বলিতে পারি এত পছন্দকার ও এমন সমস্ত প্রণত ভূমিও অল্প কোথাও দেখি নাই।

নিকটে আর একটি লতাকৃৎ কৃত্রিম পালাড় গুল্ম-উদ্ভিদ ও বিবিধ প্রস্রবময়ী বৃক্ষবৃন্তিময় ছোট বাগান



দেখিলাম। বারভারি উদ্ভাবের শোভা সৌন্দর্য্য এখানে না থাকিলেও ইহা যৌক্তিকভাবে মধ্যস্থলে একটি বেশ শাস্তিপূর্ণ দীপ্ত স্থান। এখান হইতে বারভারি উদ্ভাবের মধ্যস্থ দেবদান্তকৌশিক দিয়া গায়েরি গেট পার হইয়া ফিরিলাম। এই পথটি অতি মনোরম।

গায়েরি গেটের বাহিরে তাকেন্দ্র হীসপাতাল নামে স্ত্রী ও পুরুষের দুইটি স্বতন্ত্র হীসপাতাল আছে। নারীদের শিশু দিবার জন্য এখানে ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগের জন্য বাড়ীটি সেডি কর্কিনের নামে উপহার করা হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মভা ও আর্থসমাজও এই স্থানেই অবস্থিত।

নগরের মধ্যে লালবাগ নামে আর একটি বেথবার স্নাত উদ্ভাবভবন আছে। প্রাক্কুমারবাগ সে স্থানে থাকেন বলিয়া সাধারণের তথ্য প্রবেশাদিকার নাই, সুতরাং

আমাদের উহাও দেখা হইল না। পাতিয়ালা-গামধানী মধ্যে বাগা কিছু দেখিবার ভাষা এই; তাহা হইলেও একটি বাগা চালাইতে হইলে বর্তমান কালে বাগা বাগা আবশ্যক তাহার কিছুমাত্র প্রাধিকার নাই। এখানকার বর্তমান অধিবাসীর সংখ্যা মোট প্রায় ষাট সহস্র হইলেও ছয় সহস্র সৈন্য আছে। এই প্রবন্ধে পাতিয়ালা-বর্তমানের কথাই লিখিত হইল। সমগ্র পাতিয়ালা: গ্রেটের পরিমাণ প্রায় পাঁচোড়ার বর্গ মাইল ১৮৭৭ উদ্ভাব: লোক



মহারাজা হৃদেহ সিং

সংখ্যা ছিল প্রায় বোল লক্ষ। দিঘা পাহাড় পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, উহা বারউলি জেলার কোন স্থান হিসেবের বিনিময়ে প্রদত্ত হয়। পাতিয়ালা রাজ্য মোট, শিশু, জঙ্গ ও মারবেলখনি দ্বারা সমৃদ্ধ হইলেও একটি কৃষিক্ষেত্র স্থান।

এখানে উল্লেখযোগ্য বড় শির বিলেব কিছু আছে  
পলিঃ জানিতে পারি নাই, কেবল করির ও রেণমেয়  
কোমরবন্ধ তৈয়ারির ভক্ত কিছু এসিছি আছে। তুলিনাম  
সমগ্র ভারতে যে কোমরবন্ধ ব্যবহৃত হয় তাহা এই  
স্থানেই প্রস্তুত হয়। এই স্থান ভাল পাঠ্যভূমির সমুদ্র  
খাত।

এখানে অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে।  
কান্টা ও শিবমন্দির-ধর্মমত আছে, মুসলমানদের মসজিদও  
আছে। উত্তরে শাখাপাশি বন্যাস করিয়া নিজনিক গুলি  
বজ্রপে লাগান করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রটিশ ভাষ্যভাষ্যে অধুনা  
যাক প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারেই উল্লিখ্যে, সেই হিন্দু  
মুসলমানের বিবাহ এখানে বড় একটা দেখা যায় না। ৯

## সতীর্থ

### ঐশ্বর্যচন্দ্র চক্রবর্তী

চণ্ডার পথেই মিলন মোদের

নিষ্ঠা প্রেমের দান,

কৃষ্ণ না তাই পরিত্যক্ত

অচিন্ত্য অতিথান !

শেই অঙ্গীমের শব্দে পদে

বাস্তব্যেরই মরণ মরে,

নৃতন বেশে নৃতন বেশে

ডাকে ধৌতার আশ্রয় !

চণ্ডার পথেই মিলন মোদের

নিষ্ঠা প্রেমের দান ॥

পাতার দোণার কোকিল ডাকে

বৃদ্ধ কানন ছায়ে,

নদীর ধারে বনের পায়ে

পথ চলেছে গাঁয়ে।

আগের সাধা, বশন ব'লে

লয় আসে মধুর হ'লে !

ধাপিত বাধা ধৌতার বেয়ে

কোনু করুণার বায়ে !

পাতার দোণার কোকিল ডাকে

বৃদ্ধ কানন ছায়ে ॥

ভিড়ের মাঝে সে পল জ্বরে

নাহল কোলাচলে,

সের প্রাণে জীবন মোদের

রৌদ্রবরণে অগ্নে।

বিচিত্র ঘোর হাওয়ায় পুকে

চেনাও লীলা চেউএর মুখে,

আশ্রম ঘেন নিবিড় চ'ল

স্বপ্নার সাথেরে চলে !

ভিড়ের মাঝে সে পথ ধমন

নাহল কোলাচলে ॥

দিন জ্বরণে রাত্রি মোদের

তারার অভিসারে,

চাওয়ায় হুগা ভরবে আবার

নিবিড় অন্ধকারে !

যাত্রী মোরা এই ত জানি

পথে পথেই নৃতন বাণী,

তুমি আমি এদিন ক'রেও

মিলেছি কোন্ ধারে—

দিন জ্বরণে রাত্রি মোদের

ডাকে অতিথানে ॥

## পঞ্চদশ

—গল্প—

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পূজার ছুটির পেরে দিনেপের বাড়ীতে আড়াটাই আর বেশ ভঁমিমা উদ্ভাসছে।

বৈঠকখানার সাজানো-গোছানো এই বরটিতে রাগের বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ। সেখানে একদিকে যেমন শিকানো বাক্সো, অস্ত্রফিকে আবার তেমনি বাঁরা-তবলা ও সাবিত। বেলাশ্রাও তাই—ভ্রাক্ষের পাশে খিন্তি। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী বিরোধ দেখা যায় বজ্রধ্বনি ভিতর। কনক বাবু বহন পক্ষাণের উপর, চুল ও পাকিলাছে—পট্টা-খোয়াণ খটপ তাঁহার চুইবার, কিন্তু আবার বিবাত করিবার ভক্ত অত্যাশে করিতে চাই নাই তারাক একবারের আদক। পোনের বহন চরিত্রের নোচে, চুল ও পাকে নাই—বজ্রা অত্যাশে করিয়া চারমান, কিন্তু তবু সে বিশপট্টাকট বজ্রা গোছে।

এই মজলিশে দুই যেমন চর বজ্রা আর বজ্রা দুই, তেমনি আবার দার্শনিক ও অদার্শনিক এবং অদার্শনিক দার্শনিক। অন্য বাক্ষ মত মাংসের বহন চাইলেও সজ্ঞা-আলিঙ্গ করে, কয়েকট সে একজন দার্শনিক দিষ্ট। পরের মান ও করে না, আলিঙ্গ করে না, কয়েকট সে একজন অদার্শনিক এখিই। কান্তি বাবু কলপ ভজা চুল, সজ্ঞা-পক্ষে কুচোনো কাশণ্ড এবং কিন্ফিনে পাড়াবি—দেবির: কে বলি:যে, সে বজ্র। আর পরের বাক্ষিক বজ্রার মত চুলটি করিয়া বসিরা—পুঙ্ক এককোড়া লেমা গোথে, মাথার টেরি নাই, আখিনের বোতাম নাই।

সকলে উৎসুক হইয়া দিনেপের কথা শুনিতেছে। এটি কংসর ছুটিতে কাছারি আদালত বজ্র চাইলে সে পক্ষিমে ব্বেদাইতে বাও, এবং যেমন সে কিগিয়া আসে বজ্রর বহন অমনি ক'কে ক'কে আসিয়া ছুটে বিজহার কোলাহলির পর মিলি বহন করিবার ভক্ত ও বটে, পর শুনিবার গোতেও বটে।

দিনেপ বলিতেছিল,—বুঝাবন সিরে সারাদিন খোয়া-খুগির পর সজ্ঞার একটু আগে মণুব্বার কিংলুম। যে ধর্ম-

পালার আমি উঠেছিলাম তারি সামনে রাগার দাড়িয়ে পাড়োয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছি। এমন সময় তখনুম পেছন থেকে কে ডাক্চে—বাবু মশায়! কিংস দেবি, একটি চমৎকার মেয়ে। বহন অর, মশা কি এগোতো হবে। পরনের আধ-মহলা কাপড়খান তার গানের মোদালি কটিকে বহক বাড়িয়েই তুলেছিল। নাকটি টিকোশো, চোপ চুটি ভাগব আত্ মাথার একগাণ চুল। তার বপালে মরু ক'রে একটি ভিলক কটা। তাতে তাকে দিখা মানাছিল।

আমি তার পানে অস্বাক হ'রে চেয়ে আছি দেখে মেয়েটি দুখ নামিয়ে বল্লে, আমাদের আব'ডায়া রাধাগোবিন্দের মূর্তি একবার দর্শন করবেন কি?

বাক্সানো বোটেমের মেয়ে। ভাবলুম, ভিকাই এদের মূর্তি—রাধা ক্রকের মূর্তি দেখিয়ে হ'চের পরমা-রোজগার ক'রে থাকে।

মনিষাগণি হাতেই ছিল। তার ভিতর থেকে একটি আখুলি বের ক'রে তাকে খিতে বাড়ি, সে বাড় নাড়লে—একটু অভিমানেই বেন বললে, বাবু মশায়, আমি ভিকাই চোট না!

আমি অপ্রতিভ হ'য়ে বললাম, ঠাকুরদর্শন যে আমার ভালো হ'তে উঠেছে না বা। আমি আজ সজ্ঞার বাড়ীতে এখান ছেড়ে চ'লে যাব।

সে বল্লে, এই গলির ভিতর কাছেই আমাদের আশ'ডা। আপনাদের বেশিখণ দেই হ'বে না।

আমি শুধনও ইতস্তত করছি সেবে মেয়েটির চোপ দুটি ফলফল ক'রে উঠলো। সে কাঁশো কাঁশো করে বল্লে, দেখুন আমার মায়ের তারি-অমহা। আজ সারাদিন তিনি কিছু খান নি। আপনি বা দর্শনী দেখেন তাই দিয়ে ঠাকুর সেবা হবার পর তিনি এসাদে পানেন।

আমার মন সমস্তই ত'রে পেল, আর কিছু না ব'লে  
আমি তার সমুদয় করলাম ।

আপ'ড়াটি একটি দল গণির ভিতর । উঠান হাত্তার  
চোরে নোড়, কোণে একটি তুলসী মক । ইট-বেহ-করা ওর্প  
নালায়, এতই ছোট যে সেখানে মনে ৪৪ কোন বাগবিলোর  
মত সেটি ভেতী হয়েছিল । তারই বাগান্ধার এক পাশে  
রংছে—সেই রাধাকঙ্কের সুগল মূর্তি ।

ঘরের ভিতর থেকে একটি রমণীর কৌশ পলা পোনা  
পেল,—কে ? ক'ণ এসেছিল ?

ক'ণ বললে, হা মা । একজন চর্য্যলোক এসেছেন ঠাকুর  
দর্শন করতে ।

স্রালোকটি চ'র্য্যত মাটিতে চেনে চান্দ্রিগুণি দিয়ে দরজা  
অবধি এসিয়ে এলো । কী শীর্ষ চোরা ! এইটুকু আলতেই  
সে যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল । তার বল সাড়ান আড়ালের  
বেশ্য নয়, কিন্তু এরি মধ্যে তার খৌবনের গাঙটি ত'রে দিয়ে  
সংখানি বাধুণা সেই উজ্জল চোপ গুটির ভোবার ভিতর এসে  
ক'য়েছিল ।

সে বললে, ঘর হোক বাবা । গোপাল আপনার মঙ্গল  
করুন । ক'ণ, গোপালের একটু চরণমুত বাবাকে দে ত  
মা ।—ব'লে সে বেজার কাণ্ডে লাগলো ।

তার চোরাগা দেখে আর কানির দল ত'নে বৃকতে আমার  
বাকি হইলো না যে সে কন্ডার ক'বলে পড়েছে । মনে তারি  
কই হ'ল, বললাম—তুমি শুবে থাক, মা । তোমার দেবচি  
খুব অমুখ ।

সে ক'ণ্ডটি ক'রে বললে, না, না । গোপালের ইচ্ছায়  
শিগ'রিই আমি ভালো হ'য়ে উঠেছি । নৈলে আমার  
মেয়ের গতি কি হবে বাবা ?

আমার চোখে জল দেখা দিল । হায় রে অচ্চ মা ! যেন  
তার মেয়েটির একটা গতি ক'রে না দেওয়া প'র্য্যন্ত গোপালের  
মনে শান্তি নেই ! ছানি বশ টাকার নোট তার হাতে ক'ড়ে  
দিয়ে বললাম,—এই টাকা দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর ।

হাত গুটি কপালে ঠেকিয়ে সে বললে, গোপালের চরণ-  
মুতই আমার অমুখ । অচ্চ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই । ও-টাকা  
তুমি কেতব নাও থাখ ।

আমি বললাম, বেশ । ঠাকুরের জোপ দিও ।

নোট ছানি নাড়তে নাড়তে সে যেন নিজ মনেই ব'লে  
যেতে লাগলো,—রোজের জোপ রোজের পরাম্বা নিতে হয় ।  
মানা চোরক পরমা বধেই । এতগুলি টাকা—

সে আবার কাণ্ডে লাগলো । কাণ্ডে কাণ্ডে তার  
বুধ থেকে একটু বক্তও বোধ করি বেরিয়ে পড়েছিলো ।  
এই আলমদুতা স্রালোকটির কাছ থেকে টাকাগুলি জিরিয়ে  
নিতে আমি পারলাম না । মিনতি ক'রে বললাম, তথা-  
শোন—গ্রাধ তুমি ও টাকা । তোমার মেয়ের ক'লে লাগবে ।  
একটু চিন্তা ক'রে সে বললে, আজ্ঞা ঠাকুর । আপনা-  
কেও একটু মিনতি দেব । ঈশ, তাকে থেকে থেকে মানত  
মা ঐ পঞ্চদশ ।

ক'ণ ঘরের ভিতর ঢুকলো সেই পঞ্চদশ মানতে । সে  
কন্ডে লাগলো,—পঞ্চদশের আবার ঐ পঞ্চদশ । আমার  
দীক্ষাতক, আমি এক বছর তিন বৈকুণ্ঠে—পঞ্চদশটি ছিল  
তারই । ক'কের আরাতি করতেই তিনি ঐ দীপের  
শিখার ।

আমি, জিজ্ঞাসা করলাম, ও দাপ কিবে আমি  
করবো ?

সে বললে, চক্ক বৈকবকে দিয়ে ককের আরাতি করিয়ে ।  
ঠাকুর তুল হবেন ।

আমি সেখান থেকে বেরিয়ে চ'লে এলাম—  
পঞ্চদশটি আমার গ্রাধ কন্ডে হয়েছিল । তারপর হুটো  
একটা কারাগা ঘুরলাম, কিন্তু যে দূত মণ্ডরাব দেখে এসে-  
ছিলাম তা আর ভুগতে পারি নি । সব সময় কেবলি মনে  
হ'ত, আহা ! কি হবেই মেয়েটির ?...

স্রোতা বধুর্গের বৈধা ছুয়াইয়া আসিতেছিল । জাঙ্কার  
কপাও বেশ হইল বতীনও বশিরা উঠিল,—আবে রোশে দাও  
বৌশে । ভরকম ত কতই দেখা যায় । ও নিরে ভাঙতে  
সেলে আর সংসার কথা চলে না, হা ।

বিচিত্র নশি বায়ু করিলেন, কর্ককল—তৎবানের বিচার ।  
ফলজোপ পার যা আছে, বুকেও কিনা—সে তা দুগাবেই ।  
ওর ওপর হাত নিতে বাওরা আর মেল থেকে কমেই বেব  
ক'রে আনা হই সমান অপরায় ।



একই পরেশ দীনেদের পানের চোয়ারটিতে আসি।  
খসিল। ট্রোট গুটী বুকের উপর পড় করিয়া চাপিয়া বুকের  
গ্রন্থ সে যেন চোখ মিছাই বাতির তাইতেছিল, কিন্তু কি  
জাখিয়া ওপনি আবার সকলের পিছনে নিজের স্থানটিতে  
কিরিয়া আসিল।

জাওয়ার পানে চাহিয়া কুমুদ বাবু বিজ্ঞাস করিলেন,  
তুমি যে বড় ন'চেন'ড়ে বড়াছো? ব্যাপার কি হে?

নবী বাবু পরিচয় করিয়া বলিলেন, ব্যাপার নাস্তিকের  
না হ'য়ে থাকে তাই—সমগ্রকৃতির দরদ, আর কি? হু-ব  
বৈক সবই ঠিকেরে বুলি, এই সোভা কথাটি কুলে অলটুটু-  
এর কতি খাড়া করলে ভাবন হ'য়ে উঠে বিশ্বাস। তখন  
নাস্তিকের ক'টার নাস্তিকের না না দিয়ে উদ্ধার  
নেই।

চোয়ের শেখাল্য ও দাবাদের সেট আসিয়া পড়ার  
আলোচনাটা অমানি চাপ পড়িল পেল।

বলা সমস্ত সত্য উত্তর হইলে একে একে সকলে উঠিয়া  
গিয়াছে—যার নাই শুধু পরেশ। উচ্ছল আলো পরের  
আলুদাব পত্রগুলিকে স্পষ্ট পরিষ্কৃত করিয়া অস্পষ্ট অপরিস্ফুট  
দা-কিন্তু সবট দিয়াছে বাতির ট্রোট—সেই অস্পষ্টের  
মহানৈট যেন তাহার ট্রোট বাহিরের অন্ধকারে কিরিয়া  
বেড়াতে লাগিল।

—দীন দা।

দীনে শ্রাব্যাকার ছিল। ভিতর পানে কিরিয়া কহিল,  
পরের এখনো ক'লে বৃত্তি? আমি ভেবেছিলাম, তুমিও  
চ'লে গেছ।

পরের কহিল, দীনদা আমি সেই সেই পক্ষীপাটী একবার  
কুলে চাই।

—তাই ত। অসল জিনিসই কাসিক দেখানো হয়  
নি। দেখবার জিনিস বটে। রোগ আনটি, বলিয়া সে  
বাড়ীর ভিতর হইতে পক্ষীপাটী লইয়া আসিল।

অনুস্থানদের দলার উপর পাঠে প্রদীপ অর্ধজ্যোকারে  
বসানো। ক্ষুদ্র জিনিস, পিতলের। কিন্তু কারুকার্য  
অসাধারণ—বিশ্রীক নিগুণ করনা রূপে বেখার অঙ্গান সৌরব  
লইয়া বিকশিত।

আলোর দাব্যে সেই পক্ষীপাটী প্রত্যেক সজিত পরাকা করিতে  
করিতে পরেশের বুকের উপর চাকলাসর আসিল হুটুয়া  
উঠিয়াছিল। তাহের প্রাণভাল ইচ্ছা কীপিতে লাগিল,  
নিখেল ঘন হইয়া আসিল।

দীনে চাহিয়া ছিল। তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া  
বিশ্বের সহিত বিজ্ঞানো করিল,—কি হে, অমন ক'বে কি  
দেখত?

পরের ক'বে বলিল বোকা পেল না।

—কি বললে?

—কিন্তু না। আমি এখন আমি দীনদা—বলিয়া  
পক্ষীপাটী রাখিয়া সে ভাড়াভাড়া বাতির চটকা হেল।

পরদিন মজাফালে মনালি সে ত্রীত্বে খেলা চলিতেছে।  
কারি বাবু ক্রি ভাষমতে ভবনের দ্বারা সামলাইতে বিব্রত—  
দীনে পালে বাড়াইয়া এনিক-ও-কি চাহিয়া ভিত্তাল্য  
করিল,—পরেরকে দেখি না যে? সে কোথা?

কারি বাবু ভাবাব দিলেন না, করিলেন তুচ্ছ—কুমুদ  
বাবু তুচ্ছ করিলেন না, দিলেন জবাব। করিলেন, যে  
উড়নচড়া ও। কতবার বলেছি, বিয়ে কর—মন বিশ্ব কোক।

ঘটান বলিল, ঠিক কথা। জায়েন ওর কোনো লক্ষাই  
নেই। লক্ষাহাটা লক্ষীছাড়ারও বেছে। ও এখানে আসে  
কেন বোকা তার। খেলেন না, লক্ষ্য করে না।

পরেরের সেই বিখ্যাত-তর্য্য জোয়া আপন ভোলা চলন  
শুষ্টির আলুর সকলের সমকক্ষ ছিল না বলিয়াই দীনেদের  
বেত করিয়া পড়িত তাহারি উপর সব চেয়ে বেশি,  
যেমন শাখাডের কল পড়াইয়া নামে নীচু গুহার ভিতর। ক্ষুদ্র  
হরে সে কহিল,—তখন, সকলেই যদি তোমার মত হলে  
বেলে জীবন কাটাও তা হ'লে মগার হ'য়ে গঠে নেহাৎ  
একথেরে কুচ্ছাওগারের মত। তুমি আনকে কাটাও,  
কাটাও। কিন্তু মোহাই তোমার, পরেশকে নিয়ে চানচানি  
করো না। যেমন আছে ও, তেমনি থাক।

তিন দিন কাটিল, তথাপি তাহার দেখা নাই। দীনে  
সতাই উত্তর হইয়া উঠিল। অমূল্য করে নাই ত? জ্ঞান,  
কিথেরে নিতু'য়ে বেড়াই একলা—যাপ মা স্ত্রী কেউই থাকিয়া  
নাই। পক্ষীর মৃত্যুর পর কত চা-বে সে বেশ ছাড়িয়া এখানে



ମି ଡାଞ୍ଚିନ ଅନ ମି ବକ୍ସ



କାହ୍ନ, ୧୦୦୫

ବିଶ୍ୱୋ—କା ଡିଜି

## পঞ্চদশ ঐশ্বর্যভ্রমের চট্টোপাধ্যায়

দাস করিতেছে, অর্ধের পর বর্ষ ছুটিয়া কী অস্বাভাব্যতা তাহার মধ্যমানে প্রতিভাচ্ছে, বাহা তুলিবার জন্য প্রতিদিন সে আশিত এই মঙ্গলদায়ক আমোদে অবগাহন করিতে, কিন্তু তলাইয়া বাইতে পারিত না—সেই বাখার ঘুরটির পরিচর বোনে পাইয়াছিল।

পরেরে বাকীতে বোঁজ লইয়া সে জানিতে পারিল যে, আজ কয়েকদিন সে বাড়ী নাই। কোথায় গিয়াছে? তুতা তাহা জানে না। বোনে ভাবিল, কোনো অসুস্থির কাজে চলেই যত তাহাকে দেখে বাইতে ছইয়াছে।

এক পক্ষ কাল পর যেদিন দুপুর বেলা জান পারিয়া বোনে আহার করিতে বাইবে এখন সময় সে পরেরেব হাতে লেখা একখানি চিঠি পাইল। সে পড়িল,—দীন-বা, আমি কাল এসে এখানে পৌঁছোছি। আজ দুপুরবেলা আমার বাড়ী একবার আসবে কি? বিশেষ কথা আছে।

দক্ষাকালে পরেরে বাকী বাইতে সে এখন স্নানার্থে বাহিত ছইয়া পড়িল। বৈঠকখানা ঘরে বস্তুই লগ তখনো ছুটে নাই। ডাকডাকির পর তুতা ঘরটা খুলিয়া দিলে বোনে ভিজায়া করিল, বাবু কোথা?

সে কহিল, পুকুরঘর কাছে।

দুকোমি! সে কে? কিন্তু ঘরে ঢুকতেই বিষয়ের চমক তাহার অস্তিত্ব ভিতর এমনি খেলিয়া গেল যে তেনমটি বোধ করি সে ভাবনে কখনো মনুভব করে নাই। সে দেখিল, পরেরেব পয়েল রুপ বসিয়া আছে—যেন একটি ছুটত গোলাপ!

বালিকার গানে ফিরাই পরেব কহিল, রুপ, দীন-বা-কে প্রণাম কর। ওজনাই আমার তার কাছে কৃতজ্ঞ।

রুপ উঠিয়া প্রণাম করিল।

বোনে অস্বাভাব্য ছইয়া বাঁড়াইয়া বসিল—মুখে তার একটিও কথা ছুটিল না। শুধু স্নেহভরিত্র কৌতুকী দৃষ্টি সেই বালিকার গানে নিবদ্ধ করিয়া বসিল। কোথায় তার সে তিলকের ছোট্টা আর কোথায় হু কি? পরনে আকাশ-রংএর স্নান একখানি লাগি, চুল কেঁচী বাঁধা, পায়ে তারি কাক করা জুতা।

পয়েল কহিল, তাহািস সেই রাতে হইল। হুজিগার। নৈলে কমলাকে দেখতে পেতুম না দীন-বা। পৌছবার পরদিন সে মারা গেল।

ঘরবার কাছে এক ছোট্টা মহিলা আসিয়া ভাবিল,—রুপ, এস।

পয়েল সময়ে রুপ গল ছুটি সেরং চিগিয়া নত ছইয়া চুপ করিল। কহিল, বাও মা—গড়গে।

সে চিগিয়া গেলে পয়েল কহিল, উনি শিকড়িত্তা। রুপকে লেখা-পড়া দেখাবার জন্য নিস্কৃত করেছি।

—কু-কে?

—আমার মেরে।

বোনে প্রতিশ্রুতি করিল, তোমার মে:

পয়েল কহিল, হা দীন-বা। রুপ এখনো জানে না। সময় হ'লে একদিন তাকে বলবে—আজ নয়, যেদিন সে বুঝতে শিখবে।

বাতি বাড়াইয়া দিয়া সে উঠিয়া ঘরটির এখান ওখান ঘুরিতে শুরু করিয়াছিল। বোনেরের কাছে বাড়াইয়া বলিয়া গেল, আমি দেব শুকে এক আশ্চর্য শিক্ষা দীন-বা। যেটম মায়ের মেরে—অর্ধের দ্বীপকতা ওর রক্তে মিশানো রঙেই। সেই স্নান ওর মন থেকে একেবারে উপ্ত ফেলতে হবে। দেখাতে হবে যে সে মে-মাহুয স্বার্থপর যে-মাহুয শুধু নিজের বৈকুণ্ঠিত্য নিয়ে থাকে, স্নানায়ের দিকে চায় না। দেখাতে হবে, রুপেরেব প্রব-শান্তি অস্বাভাব্য দেওয়ার নাম ত্যাগ নয়—ত্যাগ, অগতির সেবার।

দক্ষ-আশ্রমকে সে যেন তুলি দিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছে এবং সেই ছবি দেখিয়াই সে এখন বৃত্ত এমনি ভাবে সে কবাতুলি বলিতেছিল। সে ছিল তখন তারের পরিচরনাথ কিতোর—ভাবিতেও পারিল না যে বোনেরের মন পক্ষা ও স্নান দিয়া তাহারি অস্বাভাব্য বাড়াই করিতেছে।

সে কহিল, দত্তা বল পরেব—কমলা কি তোমার স্ত্রী?

পয়েল চমকিয়া ফিগিয়া কহিল, হা দীন-বা, সে আমার স্ত্রী। সে-সব বসবার জন্তই আর তোমাকে এখানে আসতে নিবেদিত্তাম। আমার নাসিন, অর্ধের উপর। কিলের জন্য এই অর্ধ? আশুন আল্লাবার জন্য না নিতাবার জন্য?





পৃথিবীর অদ্ভুত অশান্তি নির্ভরমতঃ সূত্রের উপশব্দ হ'ত ধর্ম যদি নাটক সঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যার না বলতো। আমার নাটক বলতে চাই, বলা—কিছু এক কথা ত্রিক কেনো যে নাটক পান করে বিধকে বিধ ব'লেই, সুখ ব'লে আপনাকে ও ভগৎক প্রভাবনা করে না।

মাথা নাচু করিয়া খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোটা অভ্যন্তরীণ একখানি ছাপা বই-এর মত প্রচার নথ্যের সমুদ্র, কোথা হইতে আরম্ভ করিবে তাই তাহা সে যেন ঐ পাঠ্যগুলি লইয়া মাড়িতেছিল। বিধা কটিকা'গেলে মূখ তুলিয়া সে ঘোরে ঘোরে বলিতে গািলিল,—আমরা শুভগ্রামের ভূমিদাতা। বাবার এক ছেলে—মার মৃত্যুর পর বয়স্ক ছন্দে দেখে তিনি কমলাব দ্বারা আমার বিবাহ দিয়েছিলেন। কমলার বাবা ছিলেন একজন গরম বৈজ্ঞানিক। নবদ্বীপ ও ব্রহ্মাধনের এক বড় অস্ত্রাঙ্গ এসে তার বাড়িতে পারের দুলো দিয়ে যেতেন। রোকেট সজ্জাকালে খোল করতাল নিয়ে প্রাঙ্গণ কীর্ত্তিনীয়াগা এসে ছুটতো, গান অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলতো, এবং সেই গানে সমস্ত পরিবার এমন কি কমলাও যোগ দিত। এমন ক'রে কমলার মনে ধর্মের প্রতি একটা অতর্কিত অক-ভক্তি ছেলেবেলা থেকে বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল—বা জানকে রাখতো আচ্ছর ক'রে, সত্যকে চালাতো পাঁতা পালে, আর কমলাকে বেগতো জগৎ থেকে পৃথক করে।

দর্শনধর্মের আঘাতের বাড়িতে কোনরূপ বাধাবোধ না থাকলেও ধর্মকে বাধা প্রচার চেষ্টাই দেখতেন, বিশেষ বৈজ্ঞানিক ধর্মকে। তিনি মনে করতেন ধর্ম আবাস্যান গোত্রের শকে অন্যত্রোই হওয়া ততটা সম্ভব নয়, অবিশ্বাসীয় শকে বসে—তাই, কমলার ধর্মনিষ্ঠাকে তিনি বরাবর উৎসাহ দিতেন। কমলার অহুত্রেণে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করলেন, জগৎ থেকে কারিগর এসে গোবিন্দজীর হস্তে একটি মন্দির সৃষ্টি গঠিয়ে সেই মন্দিরে করলেন তার প্রতিষ্ঠা। সামনে ক্ষুদ্র একটি চব্বর—কাছ-করা পামের উপর কাচ-করা ছাদ, মন্দিরটি ছিল যেন সেই দেবদ্বারই দিবা রোহ, আর চারদিকের বাগানে হুঁটর ফুলগুলি তাঁর প্রদান।

এই মন্দির ও বাগানের কাছে কমলার সঙ্গে যোগ দিয়ে তার ছোঁরাটো বোঝ করি শেখকালে বাবা মনেও গিয়ে লেগেছিল। যোগেই তিনি সত্য বলো মন্দিরে যেতেন পূজো দেখতে, সজ্জা বোলা যেতেন—আরতি দেখতে। আরতির পর কোনদিন বা কমলা তার হুমিট গলার কীটন গাইতো, তাই শুনে তাঁর মনে আনন্দে বিস্তার হয়ে তিনি এসে আমার বলতেন—কমলা আমার দাক্ষ্য শব্দ। দেখো বাবা, তার মনে যেন কখনো আঘাত দিওনা, কই সে যেন কোনদিন না পার।

বাবা যে এমন ক'রে আমার কোন সাবধান ক'রে দিতেন তখন আমি তার মানে বুঝি নি। কমলাকে আমি খুবই ভালবাসতাম, তা তিনি বিশেষ জানতেন। কিন্তু এটা বোঝ করি তাঁর দৃষ্টি এড়ার নি যে কমলার এই সব অহুত্রেণকে আমি মন-হুলানো খেলার চেয়ে বড় ক'রে দেখতে পারি নি। বিরুদ্ধাচরণ আমি তার কোনো কাছে করি নি, দেখে শুনে আমি বরক কোতুকই অহুত্রেণ করতাম। কিন্তু আত্মসং ইঙ্গিতে মনের অহুত্রেণ ঘর-ছাড়া ছেলের মত কোন ক'কে বেরিয়ে প'কে কমলাকে যেমন ক'রে তুলতো সুর বিরক্ত, আমিও হ'রে পড়তাম তেমন ক্ষুদ্র মপ্রতিভ।

যে বছর কুপের বছর হ'ল বাবা ও মারা পেলেন সেই বছর। শেষ কয়েকটা মাস মল্যেই তাঁর আর তেমন মন ছিল না। দর্শনধর্ম ঠাকুর-বাড়িতে থাকতেন, কমলাকে কাছে রেখে ভাগবত পাঠ শুনতেন আর ধর্ম আলোচনা করতেন। বলাচীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন নি ব'লে শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে একটা দুঃখ থেকে গিয়েছিল। বৃত্তাকালে কমলাকে ডেকে বলালম, মা শুকের পাটে দীক্ষা বেধে দ্বারাটি দ্বীপন শুধু ছাই মাটির সওয়া করেছি। এখন তরা পাঠে কেনে বাবার সম্মত দেখি মাঝিকই মনে নেওয়া হয় নি।

বাবার মৃত্যুর কথাগুলিই কমলার মনে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছা মাগিয়ে তুলেছিল কি না জানি না, কিন্তু তার সেই অভিজ্ঞাটি এখন বুঝতে পারলাম তখন আমি সেটা একটা অত্যন্ত গাড়াবাড়ি মনে করেছিলাম, এবং তাই নিয়ে তাকে বিচলিত করতেও ছাড়ি নি।

আমি হেসে বললাম, অমন কাঁচও কর না, কমলা।

সে বললে, বাবা কি ?

—বাবা তোমার তপ যৌবন। নীচা বিনি ঘিটে আদ্যেবন  
তিনি নিজেই যদি নীচকিত হ'য়ে লিখে যান তবেই বিপদ।

আমার কথা শুনে কমলা যেন আশ্রয় অসুতব  
করলে—কৌতূহলভরে সে এমনি ক'রেই কথাটা হেসে উড়িয়ে  
দিলে। বললে, তবু নেই। তুমি থাকবে আমার তপ  
যৌবনের ভাঙাটী, তা হ'লে আর তা কাটাটীর চোখে থা  
পড়বে না।

আমি বললাম, কমলা, তুমি তিনিস সাবধানে আড়াল ক'রে  
গাংলোই চোখে লাগে বন্ধী। বাতুলদত্তার কথা জান ?

সে হাড় নাড়ুলে।

আমি বললাম, বাতুলদত্তা ছিলেন অবস্ট্রীয় রাজকন্যা।  
অবস্ট্রীয় রাজা কৌশলগণিত উদ্ভেদকে ছল ক'রে আটক  
করেছিলেন তার কাছ থেকে কোনো গুপ্ত বিজ্ঞ শিকার  
কত। কিন্তু নীচকিত পদ্য ছাড়া আর কাউকে উদ্ভেদ  
সে-মত মান ক'রে না দেখে তিনি একটি চমৎকার কন্ঠি  
দ্বির করলেন। কন্যা বাতুলদত্তাকে পক্ষীর আড়ালে গাড়  
করিয়ে বললেন, ওখানে যে আছে সে একজন বামন—তার  
পানে চাইবে না, পিণ্ডিত গ্রন্থ ক'রে মন পিকা করবে।  
তারপর উদ্ভেদকে ভেঙে এনে বললেন, পক্ষীর ও পায়ে  
একজন কুঁড়ী ব'লে মাছ—তোমার পিণ্ডিত গ্রন্থ করবার  
কল্প—তাকে মন দান কর। এমনি ক'রে মন পিকা  
চলেতে লাগলো। শেষে একদিন পক্ষীর আড়াল গেল ব'লে,  
তখন উদ্ভেদ দেখলে, সে কুঁড়ী নয়—পরমা গুরুত্বী এক  
রাজকন্যা! আর বাতুলদত্তা দেখলে, সে বামন নয়—  
পরমসুন্দর এক রাজপুত্র!

কমলা হেসে ব'লে উঠলো,— বাঃ, বেশ গল্প ত।  
তারপর ?

আমি বললাম, তারপর যা ঘটলো সে আর শুনে  
কাক নেই।

কিন্তু, তাকে বলা হয়েছিল যেটুকু তা মত না বললেও  
চলতো, আর বলি নি যা সেটা স্মৃতি ক'রে বললেই হ'ত  
তাল। হাৎ, সে শরৎ কথা।

বাতুলদত্তা তখন যেমন পক্ষীকিতের কাছে এসেছিল,

পক্ষীকিত জানতেও পারে নি সে তখন, ঐকি তেমনি যেমন

এক কথক ঠাকুর মন্দিরে কমলার কাছে এসে দেখা

দিয়েছিল সেদিন সে-ও বোঝেনি যে সেই উদ্ভেদেরই

আবির্ভাব হয়েছে তার অদৃষ্ট ভবিষ্যতের পক্ষীর আড়ালকিত।

কথকঠাকুর ঘূণা, গৌর কাশি—চোখ দুটি যেন স্নিগ্ধ মন

ভক্তির কমলাদান, তারই বিভিন্ন বর্ণের ছটা ভ্রমণ রাঙিয়ে

দিয়ে গল্পের পরে অধঃস্রোতের পরে কমলা ক'রে উঠতো। সে

ছিল স্মৃতি ও স্থায়ক। তার গানের গুরটিতে যে পুরুষ

সেই মান কতিমান কটার বিয়ে বেতে উঠতো তা যেমন

সেবতাকে ক'রে তুলতো একান্ত আশ্রয়, তেমনি আশ্রয়কে

বলিয়ে দিত সেই সেবতারই আগুন। সে আর শুধু একজন

কথক মাত্র থাকতো না,—তার চেতনার তখন মানবের

কোন আদর্শ অধঃস্রোতের উঠে বিধি-নিষেধের সাধটিকে

দিত তারিখে এবং সেই অনাহত অধঃস্রোতের প্রথম উচ্চারণ

প্রাপ্তি হয়ে উঠতো উদ্ভেদিনী, চিত্রা হ'য়ে উঠত উচ্চারণ।

মহাপ্রতি বিদ্যাল আমি কখনো করি নি। কিন্তু তার

কথকতার শেষের মধুর কথার আমার মনে যেন সেই

বিদ্যালকেই অধঃস্রোত করেছিল। তার ও তারপর তখন

আবেশ, বেদনার বনীর মত ফেটে পড়তো ধ্বনি-সুত্রের

মালায় মালায়। প্রোজা বিদ্যাল জানলে সুদ হ'ত—কমলা

বিদ্যাল হ'য়ে পড়তো। কথকতা আরও করবার পূর্বে

শকুন্তল মেলে সে ঠাকুরের আশ্রিত করতো। পাঁচ হুং-এর

পাঁচটি শিবা মলতো শকুন্তলের আগের—সেই বর্ণকোটির

মিলিত আভাস সুবর্ণানি তার মৌল হ'য়ে উঠতো এবং তা

যেন সেই শাখারের ঠাকুরটিকেও ঐশ্বর্য ঘূষে মলিন

ক'রে দিত।

সে বলতো, বিদ্যেচেতনার মূলধার ঐ শকুন্তল। শকু

পিন্ধার পাঁচটি বর্ণ শকুন্তলের তদ্যাত্মা এবং তাতেই নাগর্য

মচেতন। শকুন্তলের মতো শকুন্তলের সামন্তত করবার

অন্ত আভাস প্রয়োজন।

কথার আলাপে এমনি একটা গ্রন্থের আকর্ষণ তার

দিকে আঘাত টানছিল দতা, কিন্তু সেই মতো বিবেচ্য এসে

দেখা দিত যখন দেখতাম যে তার সেই বাতুলদত্তার সভা



কমলার উপর শ'ড়ে তাকেও একবারে অতিক্রম করে  
কেনেছে। এমন নির্বিঘ্ন প্রভা পড়ার বিদ্যুৎ আর আল  
ওঁড়ের সে তার কথা ও গান শুনেছে। বৈ তা দেখতে  
দেখে আমায় মনের তিতর কিসের যেন একটা ছায়া  
ইন্দ্রাণের মত লিক্ লিক্ করতে—মনে হ'ত, এ যেন তার  
হাতা নিলে কুণ্ডাধোলা চলচে, হঠাৎ সেই বৃষ্টি নলবার হ'য়ে  
পড়ে বেরতে হবে। কিন্তু অজ্ঞানের কাণ্ডে পুরুষটি আমার  
নিঃসঙ্গ সাবধান ক'রে বলতো—তুমি কে? পরম্পরাগতীয়  
মত তুমি কেন তার উপর নিজের অধিকার অকুর রাখতে  
চাও? হাতা বার তার ক'রে ছেড়ে দাঁও সাধন করতে।

দিন কাটিছিল, এমন সময় এক ঘটনা ঘটলো যা আমার  
মনোপ্রতিপত্তি লাগানো বুটগুলিকে উলটে পাগলে একবারে  
ছত্রাকার ক'রে দিলে। আমি মহালে গিয়েছিলাম কাজের  
দল—সাবানি দেখানে থেকে প্রায় বেড়েছে রাতে যখন  
বাড়ী ফিরছি, কমলা তখনো মন্দিরে। কথক ঠাকুরের  
মদুর কণ্ঠের কীটন গান বাতাসের স্তরে স্তরে ভেসে  
আসছিল, চেউয়ের মাথার ঝললের মত। আমার স্বাভাবিক  
ও বরের প্রতি, কমলার যে বিদ্যুৎ পুষ্টি নেই, সে-কথা  
যেন ঐ স্তরের পর্দার বাতাসের উঠে নেমে আমার অন্তর  
ক'রে তুলছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই উঠেছিল অসুখের  
মত আমার ডিরবিনের অভিব্যক্তি—মনের অসিল, মনের  
অসিল, দিকার অসিল। আমি বিস্মিত হলো এই ভেবে  
যে আমার মনের দান-মন্দিরে তাপ-বরের এমন বৈষম্য  
থাক! প্রায় তেন এতদিন শুধু শুধু নি—কমল ক'রে  
আমার নিজের পরম্পরাগতিকে নিক্কিক্রমে উড়িয়ে দিতে  
পেরেছিলাম, পাক্তি-কল্পনার একটা মিথ্যা আবরণ দিয়ে  
তুচ্ছ লগারটিকে কীরে রাখার মত অকস্মাৎ যেন সেই  
পরম্পরারই ক্রম অতিমান 'দুর্লিন্দ' বারফের মতন জ'লে  
উঠলো, এবং তার বেশিমান মিথ্যা কমলার সঙ্গে আর কথক  
ঠাকুরের সঙ্গে একটা চরম যোঝাপড়া। কথবার উচ্ছেদে লক্  
লক্ ক'রে বেরিয়ে এলো।

মন্দিরের খিলানের নীচে থাকে তার ক'রে আমি এসে  
বড়োলাই। বারান্দার গান চলছিলো। কয়েকজন নর-  
নারীর মাঝে গাড়িরে কথক ঠাকুর, গাননে কমলা।

মুখ ও কণ্ঠস্বর সহযোগে সকলেই হাতা তখন ভাল  
ভালে পা কলে হাত চুটি উঠে তুলে সুত্তের ছন্দে যেন  
কোন প্রেমসিদ্ধি মগন করতে করতে চারিদিকে তার চেউ  
ছুটিয়ে দিচ্ছিল। অকস্মেৎ তখন তারই উচ্ছ্বাস আমার  
সম্মুখে বাধা দিয়ে মুখ আঁকশে আমার নিম্নে চললো  
উজান পথে তারের সঙ্গে তাসিবে। আমিও গাইতে  
ছক করলাম।

পরক্ষণে কমলার পানে চের আমার চক্ষু তাকলো।  
সেই চোখের কটাক্ষে, সেই মধুরের শাক্তচুটিতে—  
সারা যুগমানির উপর অপরিশোধ প্রেমের ষোড়শি প্রতি-  
বিম্বিত হ'য়ে শড়েছিল সেই কথক ঠাকুরের উপর, আর সে-  
ও তেমনি পবন আনন্দে প্রীতি ও তৃপ্তির সচিত্র বৈষ্ণব  
পাণ্ডুরাঙ্গিকে আপনায় ব'লে গ্রহণ করছিল। আমার  
দলীকে তাকিত প্রায় ছুটে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ নৃষ্টি  
কিরিয়ে চাইলাম মন্দিরের তিতর সেই দেবমূর্তির পানে।  
বাসুকীর মাথার উপর শকটপেগের শকট পিণ্ডাঙ্গল তখনো  
অদৃষ্ট এবং তার উপর যুগের আড়াল থেকে বৈষ্ণবাঙ্গিকে  
মনে হ'ল যেন হাফে—বসু কুর মন্ডাঙ্গিক গান। বৈষ্ণব  
গ্রেম অতিনয় ক'রে মাহুৎ করেছে তাকে আপনায় পাক্তি-  
রুক, তাই এখন তার লংম ও লংতারের বৈষ্ণবাঙ্গিকে ভেঙে  
বেঙকা ববি প্রতিফলই দিয়ে থাকে—বিচিত্র কি! এ যে  
তার অশম্যানের প্রতিশোধ!

অকস্মেৎ অগোচরে আমি দেখান থেকে চ'লে এলাম।  
নীচে ধীরে নিঃসঙ্গ বিছানার এল স্তরে পড়লাম, কিন্তু  
চোখে আমার ছুঁ ছিল না। এইমাত্র আমি যা শুনে  
যেবে এসেছি—সেই প্রেমের বাজনা, অজ্ঞাতনের অন্তিমাত্রিক  
এখন আমি আর কমলার বৈষ্ণবের উৎসব ব'লে যেনে  
নিত পায়লাম না। মিথ্যা যখন সত্য হ'লে সে তার তখন  
সত্যেরও বাড়া, তাই বৈষ্ণবের প্রতি তুমি প্রেম হ'য়ে  
গীড়ার যেন মাহুৎয়ের উপর অকস্মিৎ লাগলো!

আমার বৈষ্ণবী তিতিকা সব তেনে গিয়েছিল। অত  
পাক্তিকতার ফলে এতদিন আমার হারকই স্বাকার করতে  
হয়েছে, আজ তবে সত্য পাক্তিকতার বলে তিতর বাক্তি  
কেড়ে নিতে হবে।

তপস্বী হইলে কখন। কিন্তু এলে আমি বললাম, তাৎ  
থেকে মিলিয়ে গিয়ে আর তোমার কীর্তন পাওয়া চলেবে না,  
কখন।

সে ভিজ্ঞাপন করলে, কেন ?

আমি বললাম, কখন ঠাকুরকে আজই আমি বিদায়  
ক'রে দিচ্ছি।

কখনা চ'টে বললে, না—আমি থাকতে সে হবে না।

কখনই আমি জবাব দিলাম, বাড়ীর কর্তার হুকুম  
তোমাকেও মনতে হবে।

অথবা হ'লে কখনই সে আমার পানে চেয়ে উঠলো।  
আমার মুখে এমন ছোঁর কথা আগে সে কখনো শোনে নি।  
সে বললে, বেশ, তা হ'লে বাড়ীর বাইরে যেখানে কর্তার  
হুকুম পৌঁছবে না সেইখানে গিয়ে থাকবো।

প্রাণে আমার লক্ষ শরীর কাঁপছিল। বললাম, আমার  
অধিকার এড়িয়ে যাওয়া অত লজ্জা নয়, কখন।

দুর্ভাগ্যে তার হাত চেপে হ'লে আমি তাকে টেনে  
নিধে চললাম ভর গভীর উপর। কল্লু খুঁজাচ্ছিলো—কুড়ির  
মত কোমল মৃৎখানির উপর যেন কোন দেব-লোকের কিরণ  
হাসি ও দীপ্তির ছায়া পড়ছিলো। দুর্ভাগ্যে তার পানে  
চোখে চমকানি আমার। কখনই আরও দাঁড়িয়ে রইলাম।

কখনই হাত তখনো আমি ছাড়ি নি। একটু কাঁচ  
দিয়ে বললাম, কল্লু তোমার খেয়ে। তার প্রতি তোমার  
কোনো কর্তব্য নেই তাই কি কখনই মনে কর ?

তৎক্ষণাৎ বললে, না, তা আমি মনে করি না। ওর  
প্রতি আমার সব চেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে তোমার কাছ  
থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখা।

—তবে তোমাকেই দূরে থাকতে হবে। এই হ'লে পানের  
ঘরে তাকে কোর ক'রে তৈরি দিয়ে বাইরে থেকে বরফ  
বড় ক'রে দিলাম। সে যে মেজের উপর ছিটকে প'ড়ে  
পেল, আমি তা চেয়েও দেখলাম না।

উঃ !—সে হাত ধরে কি তাই কেটেছিল তা ভাবনা  
কানেন। আমার পালনের দল "তু" কখনো উপর  
প'ড়েই ফাট হতো না, এমন তা হক "তু" ক'রে "আমি"  
প্রতি উত্তর হ'লে উঠলো। প্রেমকে নামিয়ে প্রভুকে

বড় ক'রে আমি যেন ভবনান্ত্রির লোকের করেও বদলানের  
সোপান হইবে। অত লিখে বললাম। যে-দুগে নারী ছিল  
তু "আমি" পদাধিকার মতই যখন তাকে বড় ক'রে  
লাভ করা যেত, সেট মৃগকট আবার ক্রিয়ের এনে  
মহত্বের ঘোরতর দিলাম। ঠাকুর, এবং তারই লাকনা  
আমার মনে এখন মাথা কুঁটে লাগলো।

পঞ্চদশ লক্ষণে আমি নোকা প্রস্তুত করতে আদেশ  
দিলাম। নিজের প্রতি একটা বিভাব এ-বাড়ীতে আমার  
জিজ্ঞাসা তার ক'রে তুলেছিলো।

বিশেষ পর দিন ভেসেই গেলো—বহু। লক্ষণ না  
কোথাও। পান তুলে, গাড় বেছে, নদীর তেঁটে কাটতে,  
খালের প্রান্তে ব'লে কোথায় সে চলেছিল তা নিজেই জানি  
না। গাড়ি মাড়িয়া সব পরিপ্রাস্ত—হাত আর চলে না, দেহ  
আর পর না। তাবের গুদগা দেখে বললাম,—বা করিম-  
গরের হাটে নোকা বেছে বিজ্ঞান কর।

আজ হাটের দিন নয়। তবু পাড়ের উপর অলংকা  
লোকের চিহ্ন। তাবের মধ্যে কাক কাক হাটে গাতি।  
তাড়া লকলেই উত্তেজিত—উত্তেজিত কলরব করছিল।  
বেধে মনে হ'ল এখনই বৃষ্টি একটা মালা বেধে এসে—  
এমনি ক'রেই তাড়া হাত মাড়ছিল আর কখন কখন  
পিত্তবের দিকে এগুতছিল। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য  
কৌতুকী হয়ে তাবের মোড়লদেব ডেকে ডানতে আমি  
একজন গাইক পাঠিয়ে দিলাম।

খানিকক্ষণ পরে সে ফিরলো—দুঃ কয়েকজন  
দলমান। তাবের মধ্যে একজন কখনও বাকি অস্ত্রের  
হ'লে সেলায় ক'রে বললে, ছতুর, আমার নাম মেজের  
আলী—আমরা ছতুরের কলাকানি মতালের প্রভা।  
আমার স্ত্রী রাধিকা এ-পাড়ের করিমবরের বাড়ীতে পাঠিয়ে  
চ'লে এসেছে। আমি তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিলাম।  
ছতুর যখন এসেছেন তখন আর তব কি ?

আমি হতভম্ব হ'লে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হ'ল যেন  
আমারি অস্বাভাবিক মেজের আলী ছতুরের হ'লে হঠাৎ  
বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে আমার শরীক করবার মত। কিন্তু  
তৎক্ষণাৎ ঘোলায়মান মনকে পথের ক'রে লগতে মেজের



আলার পদক্ষেপে হাত দুখানি ধ'রে আমি তাকে বক্সার কামরায়ে মথো নিয়ে এলাম।

বললাম,—মেহের, সত্যি কি তুমি রাজিলা বিবিকে ভালবাসো ?

সে বললে, হ্যাঁ হুজুর, তার মত আমি জানি মিতে পারি।

আমি বাড় নেড়ে বললাম, তা'হলে তুমি জোর ক'রে তাকে কিরিয়ে নিতে চাইতে না। পাবকে বাঁচার পুরোচেষ্টা করা ভালবাসা নয়—লখ !

আমার কথাই সে কি-বে বুকলে বলতে পারি না। তার চোক চুটো ছল ছল ক'রে উঠলো। অনেকক্ষণ সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আমার শানে চেয়ে বললে, ঠিক কথা হুজুর। চিড়িয়া বন্দন উড়ে গেছে তখন তার বালি বাঁচাটা দি'র ঘর মাঝিরে রাখলে লখ মেটে না, বরং আপশোষই বাড়বে।

সে চ'লে গেল। কিন্তু তার কথাই ঘরে মতাকার বেদনার স্মৃতি স্মরণিকণ ছুড়ে আমার কানে বাজতে লাগলো। পশ্চিমে নদীর ওপারে গ্রামের আড়ালে দুর্বা তখন ঘোরে ঘোরে নেমে বাজিল। নদীর ঘাটে গ্রামবাসী এসে ভবেছিল, তাদের কাছে কলঙ্গী—বোম্‌টার কাঁক দিয়ে বক্সার দিকে চকিত-মুগ্ধিত হয়ে দেখছিল। কেন জানি না, আমার মনে হ'ল তারা সব গ্রহ নক্ষত্র। সংসারকে কেন্দ্র ক'রে নির্ধিষ্ঠি পথে নির্ধিষ্ঠি নিরয়ে চলেছে এক আনন্দ লবীতর তারে তালে—তাদের যেকোনো বন্ধন গতিকে মণ্ডলীর গণ্ডি মথো নিরস্তিত ক'রে রেবেছে, কেন্দ্রবস্তির অস্বাভাবিক শাসন নয়, মমতার লবন বহন !

মাঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম,—সোজা পথে যতগুলো পৌছতে কতক্ষণ লাগবে ?

সে বললে, হুজুর বালি দি'রে পুরো একঘিনিরে পথ।

বললাম, বেশ ! আজই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা ছেড়ে দিবি। কালকের মধ্যে পৌছানো চাই।

পরদিন বদল যতগুলো পৌছলাম তখন রাজি হুজুরে। ঘাটে জন মানব নেই—বাড়ী অছকার। চিলছত্রের সম্মুখভিকে দেখা বাজিল যেন আম বাগানের জলন্ত জোনাকীর ঝড়গুলিকে কুছ ক'রে নীলাকাশে নক্ষত্রগুচ্ছ

মথে মিলে

নিখুঁত।

সেউড়ির দরজা খুলে দি'রে ঘরোয়ান চুপচাপ প'রে ধাক্কাগো। বিস্মিত হ'রে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মধ্যে আলো সব নিভিয়ে দিয়েছিল বে ? ভেদের আঁধার হয়েছিল কি ?

কুছ গোসস্তা অস্থগীশ এসে বললে, লক্ষমান হুজুরে বাবু, রাশিমা চ'লে গেছেন।

তার পর কেঁপে উঠলো। হ হাতে চোখ ঢেকে ব'লে গেল, বাঁধুলীগ্রামে বিশালাকীর মাঝিরে কবক তাঁকুরের গান চলছে তখন সেখানে গিরেছিলাম রাশিমা'কে আনতে।

আমি ব'লে উঠলাম,—কেন গিরেছিলে ? কে বলেছিলো ?

সুখ মত ক'রে সে বললে, রাগ করবেন না বাবু, আমার মোহ নেই। আমার যা সাধা করেছে, কিন্তু তিনি কিছুতে এলেন না।

আমার মনে গড়েছিল, মেহের আলীর কথা,—চিড়িয়া উড়ে গেছে—তার বালি বাঁচা দি'রে কি হবে ?

ঘরে ব্যস্তাখ্যার সব আলো জ্বলতে আবেশ নিগূম। একে একে বাতিগুলি যেমন ছ'লে উঠলো, বাড়ীটিও তেমনি ইত্মপুতীর শোভা ব্যস্ত করতে লাগলো। প্রতিমা বিদ্যুৎনের দিনে দীপালির দীপ নিভানককে দেহ দূর ক'রে, এও কি তাই ?

দেই দীপ ঘরগুলির উৎসব সজ্জার মধ্যে আমি একলা অক্ষরান ছুটে বেড়াতে লাগলাম। চারখিক কাহাকার ক'রে উঠিল।

বিদ্যানার উপর মুঠিরে প'ড়ে অঘোর চ'রে ডাকলাম,—অস্থগীশ !

কুছ ছুটে এসে বললে, আজ্ঞা করুন।

বালিদের মধ্যে সুখ ভ'রে কাতককটে বললাম, ওরা কুণ্ডক নিজে গেছে। যেমন ক'রে পার তাকে নিয়ে এস।

—বুঝে আছো।

—সে চ'লে বাজিলো, আমি তৎক্ষণাত উঠে তার হাত চেপে ধ'রে বললাম, তুমি কি মনে কর সে আর আগুবে

না ? আমি বলছি, কতক দূরে নিয়ে একদিন সে আমারি কাছে কিয়ে আগবে । যেদিন তাকে কিরিয়ে দিত না — পর ক'রে আমার কাছে নিয়ে এসে । আমি সেই ভক্তদের প্রতীকার রইলাম ।

অমরান চোখে কাগজ দিয়ে কেঁদে উঠল ।

কথা শেষ করিয়া পরেণ করিল, তখন বৃষ্টি নে যে সকল মোহের ঘোরাই হয়ত এককালে কেটে যায়, কিন্তু যখন যখন চোখ দুটি অন্ধ ক'রে বোঁধে বেগেতে তার মোহ

কাটে না কোনদিন । না কোন-না, কতক নিয়ে সে আমারি ফেরে নি । শেষ দিন পর্য্যন্ত দূর বৃষ্টি নিয়ে একটিকারও সে চোখে দেখেনি যে আর একজনের কি সলসলানি সে করেছে । এর চেয়ে গোষ্ঠীর আর কি ভেত পারবে ?

ক'নের উত্তরা দাঁড়াইল । পরেণকে আলিঙ্গন করিয়া মাঝেদূরে কহিল, দয়াধন জানি নে তাই । তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি — ঐ-যে পঞ্চদশ একদিন কমলাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুকুমার মনো, সেই মাঝারি কতক কিরিয়ে দিয়ে তোমার এনেছে জীবনের পথে । তোমার ওয়ে কববার কাগজ নেই পরেণ ।

## রিক্ত ও মুক্ত

### ঐশ্বর্য্যময় দেবী

সে কোন রাত্রে ভেবেছিলেম একলা বাতির হ'ব,

সঙ্গে আমার লক্ষী নারি ল'ব,

পথ ছেড়ে উঠে এসে পুণে বিলম্ব হয়,

দুখেরে তব আকাশ পর্ভার অন্ধকার—

পৃথিবী যে সর্গদারা মহ-সাগর

আমি আনকে বিশ্ব-মাঝে নিয়ে মনে কর ।

পথের পাশে বাণের কোণে কুজুড়ার গাছে

আমার বুকের যেমন খেন নিবিড় ক'রে আছে !

দুখে যের চলেছে পথ কোথাও নাই জানি,

সুখা বেন দুর্ভ ক'রে ফেলেছে জাল পানি !

আমি এলম মেয়ে

কবেক আমার মুক্ত হুটি ঘরের পাশে পেয়ে ।

মনে ভাবি অন্ধকারে সকল হ'ল ল'ব,

চক্রে কিছু দেখতে নাই, একলা মনে কর !

অগ্রবিন্দ অগ্ররেতে চিত্তা নাকি কাণে,

আশনারে ভিন্ন ব'লে মুক্ত ব'লে লাগে ।

কখন যেদি দলুপে মোর বাঁধন পেছে ছুট,

রক্ত-উষার গুটপুটে হাজ মুটে উঠে ।

রাতের মাঝা পড়ল ছিঁড়ে দাঁধ পথ-মাঝে

দগের মোর এমন ক'রে বৈত কেন পাজে ?

পুণ যেলে মুখ অঁধি, পক্ষী উড়ে কোণে,

উদ্ভূতি পুরাকালের রশ্মিরেখা গেলে ।

গেতে নারি যেখন লাগে, চিত্তকলহায়ে

দিত্ত আলোয় আছারে মোর বাজ ক'রে জালে ।

হাতি-ধরা স্বপ্ন-মাঝে গর্শে ছিহু ভরি'

আশনারে মুক্ত ঘেঁষে মুক্ত মনে করি ।

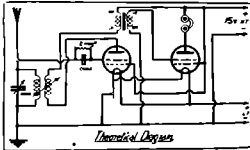
এখন মনে কর

আশনারে রিক্ত করা মুক্ত করা নয় ।

## হাত বাক্সে বেতার যন্ত্র

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

সাধারণত বেতার যন্ত্রের Valve এর তিনটি অংশ থাকে, 'Plate', 'Grid' ও 'Filament'। সমস্তই কঠকতুল্যে Valve বেরিয়েছে যাদের চারটি অংশ আছে, বাড়তি অংশটিকে চাক 'Extra Grid'। একরকম Valve-

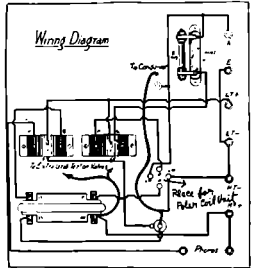


এর নাম Four Electrode Valve। ('বেতার যন্ত্র নির্মাণ' পুস্তক চুইন)। এই ধাঁজের তিনটি Valve নিয়ে একটি ৩৭ তৈয়ার করা এয়ার লেখা হবে। যেটি, সমস্ত ব্যাটারি, aerial এর তার, earth এর তার ও মাটিতে পুঁতে দেবার ক্ষেত্রে একটা ভাল লোহার খোঁটা, এমন কি একছোড়া Headphone শুধু সমস্ত লোক সরঞ্জাম ছোট একটি ১২" x ৭" হাত বাক্সের ভেতরই fit করা চলে। পাঁচ বছরের ছেলে পর্যন্ত বছটিকে খেলনার মত হাতে করে নিয়ে যেখানে বুদী বেতে পারবে, বছটি এতই ভালক। টেলিফোনে শুধু এই যন্ত্রে প্রায় আশি-বই মাইল দূর থেকেও বেতারের গান বাজনা শোনা হবে আর বেতার প্রেরকণের দল-পনরো মাইলের ভেতর বেশ হুন্সর সরবর্দক হয় বা Loudspeaker এ গান শোনা যায়। এই যন্ত্রে চার ছোড়া টেলিফোন একপাশে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং কলকাতা থেকে চম্পিন-পঞ্চাল মাইল দূরে ঝরা

বেড়াতে বা চড়ুইভাতি করতে যাবেন, তাঁরা এটরকম একটা ছোট হাতবাক্স নিয়ে গেলে বেশ মজা পাবেন। সাইকেলে চড়ে যারা বেড়াতে বেরবেন তাঁদের পক্ষে এই 'হাত বাক্স বেতার' সবচেয়ে উপভোগ্য বস হবে। এমন কি কি বস দিয়ে ২৫ টি তৈরী সে কথা বলা যাক—

প্রথমেই দরকার একটা হাতবাক্স যার ভেতরের মাপ হবে প্রায় 12" x 7 1/2"।

একখানা এবনারটেব



একটা Grid Condenser -0003

একটা Grid Leak 2 megohms

আটটা Terminal (Aerial, Earth, L. T., H. T., +, H. T. - ও প্রটো phones মার্কি চলেই ভাল)

One 'polar' coil unit •

One Eureka 'Dial-O-Condenser' \*0005 •

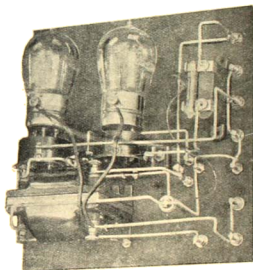
One Eureka L. F. Transformer 5-1 ratio

One Lissestal "Minor"

(এই filament resistance এর মত ব্যবহার হচ্ছে, এটা না পাওয়া গেলে মত ফিল. Res. ব্যবহার করা যেতে পারে)

এইটি four-electrode valve এবং দুটো ভাল valve holder ('Acromion' E type-এইটি চলবে।)

কিন্তু সরবেন কি, একগাঠ: যাট কিট লম্বা ববাবেস insulation দেওয়া flexible তার একটা সকলম্বা কাঠের কাঠের ওপর বড়িয়ে রাখবেন। তার তলার দিকে একটা ভাগী পাথরের টুকরো বেঁধে, উক্ত একটা গাড়ের ওপর তারটা ছুঁড়ে দিয়ে দেখটা aerial terminal এ লাগিয়ে দিলেই বেশ ভাল aerial হবে। Four-electrode Valve এর H. T. ব্যাটারি সাধারণত কুড়ি ভোল্টের বেশী থাকেন না: - হুতর: দুটা ৯ ভোল্ট ক'রে Grid-bias এর



একটি extra valve holder 'Polar' coil unit এর মত। এছাড়া ফ. connection এর তার এমনমতও চাই। এখন ধরে এই set নিয়ে বেড়াতে যেতে চ'লে ভাল earth করার মত একটা ১০ ইঞ্চি লম্বা copper rod এর সাপার একটা বোতলের terminal রাঙা দিয়ে ছুঁকির বেধেন। মাটিতে rodটা একেবারে ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরের terminal এ earth connection এর তার এঁটে দিলেই বেশ ভাল earth হবে। Aerial এর

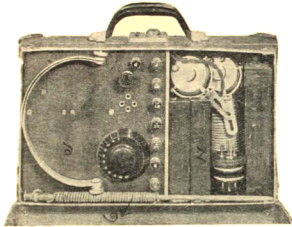
ববাবারের উপযোগী dry battery কিনে series এ করান একটা ব্যাটারির ৯ ভোল্টের সাপার একে একটা তার নিয়ে পিরে আর একটির zero ভোল্টের তারপার ছুঁড়ে বেধেন। তাহলেই মাঠারো ভোল্ট হবে। L. Zr করে একটা Portable type ও Non-spillable Accumulator কিনুন। Oldham কোম্পানীর বৈদ্যুতিক বকম আছে সেগুলি বেশ কাজে লাগে, মত চ'লেও হবে। এখন বহুটির theoretical diagram দেখুন ১নং ছবিতে। ২নং ছবিতে





জোড়া তড়িৎ দেবার একটা যথাগত সেধান চরিত্র। তার পথের ছবিতে কেমন ক'রে বহু জুলা বসিয়ে connection করা হয়েছে সেটাও বেশ ভাল ক'রে দেখে নিব। এখনাইটের ওপর বস্তুর অংশগুলি সমস্ত বসিয়ে, জোড়া তড়িৎ কান দেব হ'লে গেলে, তাড়াতাড়িই এখনাইটের ওপর যে সেটটি

ছবির '৩' চিহ্নিত অংশ। টেলিফোন receiverএর মাঝারি Band দুটাও যুগে '১' চিহ্নিত জারবার setএর ওপর কেমন ক'রে রাখা হয়েছে তা পাইই দেখতে পাবেন। এটো যেতার গাটিক বসেছে, তা হ'লেই দেখছেন, বা' কিছু দরকার সমস্তই এই ছোটো তাত বাস্কটির ভিতর চমৎকারভাবে রাখা



তৈরী করা যোগ সেটি fix ক'রে কেবুল। তার নম্বর ছবির বা' দিকে '১' চিহ্নিত জারবার set টি fix করা হয়েছে।

H. T. Battery, L. T. Accumulator, 'Polar' Coil telephoneএর headpiece দুটা ও aerial তারের কাঠিমাটি '২' চিহ্নিত অংশে দেখতে পাবেন। Earth এর জন্য যে copper rod তৈরী করা হয়েছে সেটি তারনম্বর

৪৪। আর একটা মজা হ'চ্ছে, বস্তুটিতে Four electrode valve ছাড়া ordinary valveও ব্যবহার করা চলে, তখন ২নং ছবিতে যে ছবি তার 'To extra grid of valve' দেখা আছে, সে দুটি পালিট থাকে। পথের মাধ্যমে অল্প দাঁতের মতন তরঙ্গ গাটিক বস্তুই 'অগলোচন' করবার চক্কো আছে।





তথা কাপার

অপু—ও অপু—

অপু জাগিবাচ্ চিল, কিস

বলে নাক। বলিল—'দিক জানাবো:

ঠা'ত' সাগর আসে—

তথা উঠিয়া জানাল বক ক'

'দিকের বিয়ে করে জানিস' য় আর

গুর হবে, হারিভ বাকুনা

হারিভ বাকুনা ?

—সেই দর মাগার তু' 'বে বাজার,এত বড় বড় গাল—

ময় বড়, আমি দেখি'চ—আর এক বকম গাল বাজা,

কালো কালো, ফুলোতু গাল বলে—এমন

চমৎকার বাজে ! ফুলোতু গাল জানি'চম' ?

তথা আর একটা কথা ভাবি'চাছিল।



পথে পাড়ার পাড়ার পুরেঁচা লটকা বেঁচেছে। ছাউ  
হাওরটা কেমন স্নানন্ত, লকালটা না গরম না ঠাণ্ডা। কেমন  
মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় নেবুফলের—যেন কি একটা মনে  
আসে, কি তাক সে বলিতে পারে না।

বাড়ীর বাড়ির চইয়া সে বাত্বের বাড়ী গেল। কখন  
কখনো মনোপায় গুচক, এটী তাঁর প্রথম মেয়ের বিবাহ। পূব  
ঘটা করিবার বিবাহ চইবে। বাড়িওয়ালা আসিয়া বাড়ির  
দরদর করিতেছে, সীতানীশ এ অফলের বিলাত রক্তন  
চৌকীবাঁধিবে, তাহারও বামন। হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে  
নানাবান হইতে কুইয়ের দল আসিতে শুরু করিয়াছে,  
তাঁহাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ীর উঠান সুরঙ্গম।

ওপার মনে ভাগি মানক হইল—মাত্র দিনকতক পরে  
ইকমেগট বাড়িতে কত ব্যক্তি পুড়িবে। সে কোনো ব্যক্তি  
কখনও দেখে নাই কেবল একবার গাঙ্গুলী বাড়ীর স্নানমাণে  
একটা কি ব্যক্তি দেখিয়াছিল স্নান করিয়া আকাশে উঠিয়া  
একবারে যেন মেঘের গারে গিয়া ঝেঁকে, দেখান হইতে আবার  
পড়িত, আর, এমন চমৎকার দেখানঃ...অশু বলে হাউই বাজি।

ওপরের শর মা মালানে আঁচল বিছাটকা একটু ঘুমাটকা  
পাড়ল সে স্নানন্ত করিয়া পুনরায় বাড়ির বাড়ির হইল।  
ফাল্গুনের মাকামাতি, হোতের তেজ চড়িয়াছে, একটানা  
তপ্ত হাওয়া বাঁশপাতা ও বাহুরের বাসানের বড়  
নিমগ্নাটকা হুন্দে পাতাভলা ঘুরিতে ঘুরিতে কারিয়া  
পড়িতেছে—কেহ কোনাধিকে নাই, নেড়াদের বাড়ার  
দিকে কে যেন একটা ভিন বাগাইতেছে। বুটী-উউ  
করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাউপোকা! জুঁপা নিলের  
অনেকটা অজ্ঞাতদারে তাকাতাকি আঁচল মূতার মধ্যে  
পাকাইয়া চকিত পুটিতে চারিধিকে চাঞ্চিতে লাগিল। একাক  
করিয়া সে একল অভ্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, মিস্ত্রীকলনে  
একশতের খোড়ার পুরের প্রথম দলি উড়িতেই সে তৎক্ষণাৎ  
কস্তবা ত্রাহারিয়া লইয়া হাতিয়ার বন হইয়া প্রস্তুত হইতে  
পারে; চোখ, কান, হাত সব কলের মত আপনা আপনি  
নিজ নিজ কাজ করিয়া আর; দেবার কোনো ছোঁচ  
প্রয়োজন হয় না।

কাউপোকা নহে ব্রহ্মদেব শোকা।

তাঁহার মূতার আঁচল আপনা আপনি গুলিয়া গেল...  
আত্মহের দৃষ্টি পা টীপকা টিপিয়া সে পোকাটার দিকে  
আগিতে লাগিল। মাখনের পথের উপর বসিয়াছে,  
পাথার উপর দ্বৈত ও রক্ত চক্ষুনের ছিটার মত বিন্দু বিন্দু  
দাগ। স্বপর্শন শোকা—টিক পোকা নয়—দেখিতে  
পাওয়া অভ্যন্ত চোখের কাজ—তাঁহার মার মুখে, মার  
অনেকের মুখে সে চিনিয়াছে। সে সতর্পণে পূণার উপর  
বসিয়া পড়িল...পথে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া  
আর একবার শোকাই কাঁছে বইয়া গিয়া বার বার স্তম্ভবেগে  
আত্মি করিতে লাগিল—স্বপর্শন, স্বতনাভালি রেখা...  
স্বপর্শন, স্বতনাভালি রেখা...স্বপর্শন, স্বতনাভালি রেখা।  
(অবিকল এই তপই সে অশপের মুখে বলিতে চিনিয়াছে।)  
পরে সে নিছের কিছু কথা ময়ের মধ্যে জুড়িয়া দিল—  
অশুকে ভাল রেখা, মাঝে ভাল রেখা, বাবাকে ভাল  
রেখা, ওপাড়ার পুড়ীমাকে ভাল রেখা—পবে একটু ভাবিয়া  
ইতস্তত করিয়া বলিল—নায়েনবাবকে ভাল রেখা, আমার  
বিষে যেন ওগানেই হয় স্বপর্শন, কসুই কিবির মত ব্যক্তি  
বাজনা হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিলয়ে পোকাটা পূণার উপর  
বিষমভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, হুঁপা মনের শাধ মিটাইয়া  
প্রার্থনা শেষ করিয়া প্রচার দৃষ্টি পাশ কাটিইয়া উঠিয়া  
গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম  
ফাল্গুনের হুঁপা, এমন কি অনেকটা মনুষ্যকল্পী, তংএর  
আকাশ গাছ পাণ্ডার কঁকে কঁকে চোখে পড়ে।

সেগুয়া বনের মাশবান দিয়া নদীর ঘাটের দূর পথ।  
জুড়ি পথের প্রমোদেই আম বাগান। তপ্ত বাতাস আত্ম-  
বউলের মিষ্ট গন্ধে বনে বনে মোমাছি ও ঢাক পোকার  
গুমনমবে, ছায়াপবন আম বনে কোকিলের ভাঙে, মিষ্ট  
হইয়া আগিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চক্কর ওপার মাত্র। খালে ওয়া  
মাটে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। জুঁপা কোপের মধ্যে মধ্যে  
শোঁকাল গুলিয়া কেড়াইতে লাগিল—কিছু শোঁকাল এখন

মাত্র বড় থাকে না, শীতের শেষের করিয়া যায়। একটা উঁচু চিহ্নিত কোণের মধ্যে একটা পাখে অনেক পৌষাকুল ছিল; এই পৌষাকুল সে বাহ্যে দিয়াছে কিন্তু এখন আর নাই, সব করিয়া গিয়াছে, পোষাকুলের মত শুকনা পৌষাকুল ঘন কোণের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক কঁচা শালিখপাতা কোণের মধ্যে কিছু কিছু কাটতে ছিল, তথা নিকটে বাইরে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে পুষির আবার একটা প্রধান চৈতন্য ছিল। উৎসবের নৈকট্য, বাণের রাত জাগা ও গান ভনিবার জাগা, লক্ষণের উপর একটা অজানা, অনন্তরূপ আনন্দের প্রকাশ্য তাহার মনে ভরিয়া উঠিল।

তাহা হইলে বৎসর বৎসর এই অল্প পাড়াগারে এমন উৎসবের বিন করতা বা আনিয়াছে; হু একটা বা আসে, শ্রোতা করাই শতাব্দীর সমুদ্র উৎসব-পুলক এক সঙ্গে লইয়া আনিয়া উদয় হয় পত্রী বৎসর এই মেসেটোর কাছে।

পুষিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এখার চইতে ওখার পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়। একবার সে হাত চুটা ছড়াইয়া ডানার মত লম্বা করিয়া দিয়া বানিকটা খুশশাক বাহিয়া বানিকটা ছুটিয়া গেল। সে উড়িতে চায়...খরার ডো তালকা জিনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাল কাটিতে কাটিতে ঘনি বাওয়া বাইত!

নদী বেনী ঘুরে নব, হুগার মনে হইল এই সমস্ত অক্ষর জেলের নৌকা হইতে যাতে লাগিয়াছে, তাহা হইলে সে মাছ কিনিয়া আনিবে। রোষ পোড়া মাটির পৌষা পৌষা পুষের সঙ্গে কথা শুকনা পাতা-লতার গন্ধ মিলিয়া এক এক দম্ভ। গরম বাতাস বহিতেছে...মাঝে মাঝে ফুটন্ত খেঁচু ফুলের ভেঁড়া গন্ধ। মাঠের কোণে একটা অল্পলা পাতা-করা আবহা; গাছের ডালডাল নতুন কতি মুকুলে করিয়া গিয়াছে। কোণে কোণে লেবু লাগে আভ্যাক কতি শান্তা লাগানো বৈঠি গাছ। শুধু লক্ষ করিবার আনন্দে সে শুকনা বরা পাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া কোরে কোরে পা কোলিয়া মচ মচ লক্ষ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙিয়া গিয়া শুকনা শুকনা, খুশা-মিশানো, বানিকটা পৌষা পৌষা, বানিকটা তিক পক্ষে আভ্যাক তাহা গেল।

এই পক্ষ তাহার বড় ভাল লাগে...এই পক্ষ শান্তির দলে লগে তাহার মনে হয়,—লম্বা বন জলপের পরিবার তলাডাল, কাটা-গুলা ডালপাটার আভ্যাক—লব একবারে করিয়া পড়া নাটকাল ও বড়ার বাঁটের ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু রঙা যে কত বড় মস্তাচিটা, তাহা সে কতবার দেখিয়াছে; এত করিয়া বনে জলপে খুঁজিয়া আভ্যাক সে তাহার ছোট মাটির ছোবাটার খুশাপুরি একজোবা নাটকালও সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

লম্বা একটু ঘুরে সোনাভাঙার মাঠের দিকে বাতবার কাটা পড়ত। একখানা বড় গাছী কাছ কাছ করিয়া মাঠের পুষের দিকে বাততেছে। ছুট নাই, টাটকা কাটা করিয়া দেখা বাহিয়া তাহার উপর কাঁচা ও চুঁচী লাগ নক্সা লাড় কাপড় খিচিয়া ছই তৈয়ারী করিয়াছে। ছইএর মধ্যে কাচাদের একটা ছোট্ট মেয়ে একধোলে, একটানা ছেলেমাছাখি মরল কাঁদিতে কাঁদিতে বাততেছে—কোন্ গাছের চাষাদের মেয়ে বোধ হয় বাণের বাড়ী হইতে খরার বাড়ী বাইতেছে। পাড়ার পাড়াগার পুষের চণ্ডারের খুশাক মাঝকুলের ঘন ঘনি পক্ষে প্রমাণেতে কিমাণ্ডে চলিয়াছে। ছইএর পিছনদিকে একটা ঘামাতে লাউ, বেগুন আরও কি কি তরকারী। পাড়ার পাশে গুটা তাল-বাখা মাঝে খুশী খুশানো—ফুটন্ত বাড়ীর লগায়া।

চণ্ডা মধ্যস্থ হইয়া একঘূটে সাতাখানার দিকে চাওয়া হইল।

পরে সে একটু অক্ষরনয় হইয়া পড়িল। খিচ হইলে মা, বাবা, অম্ম—সব ছাড়াইয়া এই বকম কোথায় কতদূর চলিয়া বাইতে হইবে; এখন তখন দেখান হইতে তাহার মাগিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বন, বাগান, বাগলফুলের কাড়, রাত্তী গাছটা, উঠানের কাটাগতলাটা, বাহা সে এত ভালবাসে, এই শুকনা পাতার গন্ধ, বাটের গন্ধ—এই সব ছাড়াইয়া বাইতে হইবে চিরকালের, চিরকালের জন্য! ছইএর মধ্যে ছোট্ট মেয়েটা বোধ হয় সেই ছেঁবেই কাঁদিতেছে। তাহার মনে বড় মমিয়াগেল।

কাটা পড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়া মাঠ পার হইলেই নদী। অক্ষর মাফির নৌকা। যাতে



আমে নাহ। বাবুলা গাছের নীচে কাঠরা দেওয়ার পাঠিয়া  
মাছ ধরিতেছে। ভূগা বৈশ্যের কিছু আসে নাই—যা ধরে  
কিছুপুরে কুঁচ তেলের আড়ালে তাড়ানের শাড়ির মানের  
মটির বাপ-কাটা কাটা খাট। ভূগা ভরে ভরে পিগা  
দেবিল মা খাটে নাই তো ?

ওপরে ছেলেরা কি মাছ ধরিতেছে ? খররা ? এপরে  
আসিলে সে ওপরদার মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত।  
অপু খররা মাছ খাইতে ভালবাসে।

বাড়ী কিনিয়া লুকার পর সে অনেকগুলি ধরিয়া পুতুলের  
বাস গোছাইল। ঘরের মেঝেতে তাহার মা ডেল পুরিতে  
দিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া বিখাছে, তাহার  
গন্ধ বাটার চটতেছে, কাওয়াটা ঘন একটু গরম। পুতুল  
গুড়ানো প্রাণ পেল ঠইয়াছে অপু আসিয়া বলিল—  
তুই বুঝি আমার বাস থেকে ছোট্ট আশিখানা বের  
করে নিখোঁচি মিনি ?

—ত—আসি তো আমার—আমিই তো আসে বেধতে  
শেঠাছলাম তক্তপোলের নীচে শড়েছিল—বাও, আমি আসি  
আমার বাসে \*বাধে। বেটাছেলে আবার আসি নিয়ে  
কি হবে ?

—ক যে, তোমার আসি বই কি ? ও-শাড়ার বুড়িমানের  
বাড়া থেকে মা তো কি বেঁজোতে আসি এনেছিল, আমি  
তো আগেই মার কাছ থেকে চেয়ে নিছলাম। না মিনি,  
দাও—

কথা শেষ করিয়াই সে বিদীর পুতুলের বাস্তব কাছ  
বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আসি খুঁজিতে লাগিল।

ভূগা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাওয়া দিয়া বলিল—  
ঠেঁসু কোথাকার—আমি পুতুল গছিয়ে রাখছি আর উনি  
হাতুল পাতুল করছেন—যা আমার বাসে হাত দিতে হবে  
না তোমার—বেব না আমি আসি—

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু কাঁপাইয়া তাহার  
বাড়ের উপর পড়িয়া তাহার কান চুলের গোছা ধরিয়া  
টানিয়া কাঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া  
তুলিল। কার-খটুকানো গলার বদিতে লাগিল—কেন  
তুমি আমাকে মাঝে ? আমার লাগে না বুঝি ?—দাও

আমার—মাকে বোলে দেবো—লক্ষীর চুপড়ি থেকে আশুতা  
চুরি কোরেচ—

আশুতা চুরির কথাই ভূগা খেঁপিয়া গেল। ভাইয়ের কান  
ধরিয়া তাহাকে কাঁকুনি দিয়া উপবি উপরি শটপট করেকাটা  
চড় দিতে দিতে বলিল—আশুতা 'মিটচি ?—আমি আশুতা  
মিটচি ? লক্ষাছাড়া, ঠেঁসু, খামত। আর তুমি যে লক্ষীর চুপড়ির  
গা থেকে কড়ি গুলো গুলে লুকাই রেখেচ, মাকে বোলে  
দেবো না ?—

চাঁৎকার কাহা ও মাতামারির শব্দ শুনিয়া মলকয়া  
ছুটিয়া আসিল।

ততকালে ভূগা অপু'র কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে  
প্রাণ পোরাইয়া ফেলিয়াছে—অপুও প্রাণপণে ভূগার চুলের  
গোছা হুতি পাকাইয়া টানিয়া একশ ধরিয়া আছে যে  
ভূগার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেঁধি। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,  
ভাবো না মা, আমার আশিখানা বাস থেকে বের ক'রে  
নিষেধ বাসে রেখে নিষেচ—বিচ্ছে না—এমন চড় মেঝেতে  
গালে—

ভূগা প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—না মা, ভাবো না  
আসি আমার, পুতুলের বাস গোছাছি ও এসে বল্লে  
দেগুলো সব—

লক্ষীয়া আসিয়া মেঝের শিঠের উপর চুপ্ চুপ্ করিয়া  
লজোরে করেকটি ফিল বগাইয়া দিল ; বলিল,—বাড়ী মেঝে  
—কেন তুই ওর গাছ হাতে দিবি এখন তখন ?—প্রভ  
আর তোকে অনেক তফাৎ জানিন্ ?—আসি ? আসি  
তোমার কোনো শিঙিতে লাগবে তুমি ? কথার  
কথার উনি বান গুকে তেড়ে মার্তে ! মরল আর কি !  
পুতুলের বাস—তোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেঝের গুড়ানো পুতুলের  
বাস উঠাইয়া এক টান্ মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া  
ফেলিয়া দিল।

—বাড়ী মেঝের কোনো কাজ নেই, কেবল বাওয়া আর  
পাড়ায় পাড়ায় তো টো ক'রে বেড়ানো—আর কেবল  
পুতুলের বাস আর পুতুলের বাস ! ও সব টেনে

একদিন বাণ-বাগানে বেলে দিবে আসি। দিভি তোমার  
বেলা বুটবে একেবারে—

গুণীর মুখ দিয়া কথা ব্যতির হইল না। পুতুলের  
বাক্য তাকার গ্রাম, দিনের মধ্যে বনবার সে পুতুলের বাক্য  
গোছায়—পুতুল, হাতা, ছোপানো কাপড়, আশুতা, কত  
কষ্টের সংগ্রহ করা নাট্যশল, টিন-ঘোড়া আসিধানা, পানীর  
বাগা—সব অন্ধকারে উঠানের মধ্যে কোথায় কি ছড়াইয়া  
পড়িল! মা যে তাকার পুতুলের বাক্য এখন নির্মমভাবে  
কেনিলা দিতে পারে একথা কখনো সে ভাবিতে পারিত  
না। কত কষ্টে কত কারাগা হইতে ছোপাড় করা কত  
ভিনিল উঠার যথো!

কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেমন  
যেন অবাক হইয়া রহিল।

অপূর কাছেও যাব ঘর পাড়িটা কিছু বেশী কঠোর  
বলিয়াই টোকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ  
দিয়া শুইয়া পড়িল।

গুণী বানিকন্দন এক তাহেই মেয়ের উপর বলিয়া  
হলিল। তানি অনেক ছইয়াছে, মেয়েতে কেহোদিন তেলের  
পদ্ম বাসির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাণ বাগানের মধ্য  
বিন্ বিন করিতেছে। কেমন যেন একটা বহু হাওয়া  
থরথ ভিতর। বানিকন্দন বলিয়া বলিয়া গুণী দিয়া চুপ  
করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাড়া কানোলা দিয়া কান্ডন কোথায় আলো বিছানার  
পড়িয়াছে। শোড় ভিটার দিক্ হইতে ভূর ভূর করিয়া  
লেগ্ন ফুলের পদ্ম আসিতেছে। গুণী বাসিনে মুখ তুলিয়া  
অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। একবার তাকার মনে হইল উঠিয়া  
দিয়া পুতুলের বাক্যটা শু ছড়াহো ভিনিলগুণা তুলিয়া আনে—  
কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের  
‘ভিনিলগুণা! কিছু লাভ পাইল না। মানিতে গেলে  
মা যদি আবার মারে? মার উপর তাকার কোনো  
অভিমান হইল না। যাহা আবার দিয়া আসিতেছে  
এক বহুর দিবে আনি-তাকার যদি হঠাৎ না দেয়, তবেই  
তাকার উপর অভিমান হও। কিন্তু গুণী দ্বন্দ্ববৃত্ত মনেও  
কদু ঠাক, কাগরও কাছে বেশী কিছু দাবী করিবার সাহস

তাকার নাই—কাজেই মার কাছে মার খাইয়া সে উঠাকে  
পাশ্চাত্যে মানিয়া লইল, অভিমান করিবার কোনো কারণ  
মনে উবয়ই হইল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। চতুর্থ গুণী গায়ের উপর তাকার  
হাত অগ্রসব করিল। অশু তরে তরে ডাকিল—বিনি?  
গুণী কোনো জবাব দিবার পূর্বেই অশু বলিলে মুখ শুকিয়া  
হাট হাট করিয়া কানিয়া উঠিল—আমি মার কখনো না—  
আমার ওপর রাগ করিসনে দিভি—তোমার পায়ে পড়ি।  
কাকার আরেগে তাকার গলা আটকাইয়া ধাটতে লাগিল।

গুণী প্রথমটা বিমিত হইল—পর সে উঠিয়া বলিয়া  
ভাইয়ের কাছা থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।—  
কানিসনে চুপ, চুপ, মা কখনো সেলে আবার আমার বন্ধুরে,  
চুপ কান্ডে নেই। আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কৈদে:  
না হিঃ—চুপ—

তাকার ভয় হইতেছিল অশুর কাছা তুলিলে মা  
চতুর্থ তাহাকেই মাঝিবে।

অনেক করিয়া সে তাহেই কাছা থামাইল। পরে  
গুণী শুইয়া তাকাকে নানা পদ্ম বিশেষত বাহুর দিবার  
বিবাহের পদ্ম বলিতে লাগিল। একথা ওকথাও পর  
অশু দিবার পায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা  
বলবো বিনি?—তোমার সঙ্গে মাটির মণারের কিছ হবে—

গুণীর লজ্জা হইল, দৃষ্টি দৃষ্টি তাকার অত্যন্ত কৌতূহল  
হইল; কিন্তু ছোট ভাইএর কাছে এলহকে কোনো কথা-  
বাটা বলিতে তাকার লজ্জাও যাব চওড়াতে সে চুপ করিয়া  
রহিল।

অশু আবার বলিল—বুড়ীমা বলছিল বাহুর মার কা-  
জা বিকলে। মাটির মণারের নাকি সমস্ত নেই—

কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া  
উঠিল। সে তাকিলোর গুয়ে বলিল—হ্যাঁ বলছিল—মাঃ  
—তোমার সব যেমন কথা?—

অশু গ্রাম বিদ্যানার উঠিয়া বলিল,—পাতা বলতি দিবি,  
তোমার পা ছুঁই বলতি, আমি দেখানে পাঁড়িবে, আমাকে  
যেবেই জো কথা উঠে। যাহাকে দিবে পত্র দেখানে  
সেই মাটির মণারের বাবা দেখানে পাচেন দেখানে—



—মা জানে ?

—আমি এসে থাকে জিপোস করবো ভাবলাম—  
তুলে গিটছি। জিপোস করবো দিবি ? মা বোঝে চর  
শোনেনি : কাগ পুড়ানো মাঝে ডেকে নিঃশব্দে বসেছিল—  
পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ী চুড়ি দেবিস, মাটির  
মলাটীয়া থাকেন এখন থেকে অনেক দূর—রেলবেথে চর—  
তুঁদা চুপ করিখা বসিল।

অসুখ না তুঁদা কখনও রেলগাড়ী চড়ে নাই : চকো তো  
বুকের কথা কখনও চক্ষেও দেখে নাই। মাঝের পাড়া  
দৈশন ও রেল লাইন এ গ্রাম চাইতে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে।  
এমন কখনো কোনো যুগোপ খটে নাই, যাতে তাড়াতাড়ি  
রেলগাড়ী চড়া হয়। তুঁদা কিন্তু রেলগাড়ীর ছবি দেখিযাচ্ছে—  
অসুখ কি একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা,  
অনেক পাতা ঢাকা, লাম্বনের দিকে কল, সেখানে অঙ্কন  
দেখা আছে, খোঁজা গুঁড় : রেল গাড়ীখানা আগাগোড়া  
খোঁজার, চাকো তাই—গরুর পাড়ীর মত কায়ের ঢাকা  
নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই, থাকিতে  
পায়ে না, পুড়িযাওয়ায়। রেল গাড়ী এখন চলে তখন তাহার  
নল চাইতে ছাত্রন বাহির হয় কিনা : সে ভাইএর পারে মত  
বুলাটীয়া বসিল—ডোকেও লম্বা ক'রে নিয়ে থাকে। তাহার  
পর গুলনেট চুপ করিখা ঘুমটিবার ঘোষাড় করিল।  
ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বারবার তুঁদার মনে চটতেছিল—  
আজ্ঞার হুদধন তাহার কথা ভুলিগাছেন ! আমেরি তো  
হুদধনের কাছে সে—আজ্ঞার বড় দয়া—মা তো গ্রিক  
কথা বলে !

অসুখ কাউকে এখনো বলে নাই—তাহার  
মিসিকেনো না।

সেদিন চুপি চুপি গুপ্তে সে যখন তাহার বাবার  
ঐ বই-বোকাই কাঠের লিখুড়টা পুলিয়াছিল লিখুড়টার  
মধ্যে একখানা বইয়ের মধ্যেই এই অদ্ভুত কথার লুকান  
পায় !

উত্তানের উপর লাম্বাডের ছায়া এখনও পুণী-পন্ডিতের  
দীপ তব নাই, গ্রিক-গুপ্তের মোনাড'লস তেপান্তি : মাঠের  
সেই প্রাচীন অথব পাছের ভাগার মত এক কারাগার একখান  
ভাড়া গম্বাট রাখিয়া ছিল।

একদিন সে গুপ্তের বেগ : বাগের অদ্ভুতগতিতে কবেই দরজা  
বন্ধ করিখা চুপি চুপি বইয়ের বাহুরটা লুকাইয়া পুলিল।  
অবশ্য আগেরের স্মৃতিতে সে এই ও বই পুলিখা খানিকটা  
করিখা ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিখা বইয়ের মধ্যে  
খাল গল লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা  
বইয়ের মলাট পুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'পল্ল-দর্শন  
লঃসঃ'। উত্তর অর্ধ কি, বা বইখানা কোন্ বিধের তাড়া  
সে বিদ্যুৎবিদগুণ বুঝি না। বইখানা পুলিতেই একদল  
কাগজ কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ষ মাংশল কাগজের  
নীচে চাইতে বাহির চাইয়া উড়িযায়ে যে দিকে চাই চোপ  
বার খোঁজ দিল। অসুখ বইখানা মাঝের কাছে লটকা  
গিয়া খাল লাইল—কোন পুরানো পুরানো গল্প ! যেটে  
রাঃ পুঙ্খ পুঙ্খ পাড়াগুনার এই গল্পটা তাহার বড় ভাল  
লাগে—গল্পটার কেবলট বাহার কথা মনে করিখা দেখ।  
যখনই এ গল্প সে শার তখনই কি জানি কেন তাহার  
বাহার কথা মনে পড়ে।

অতীত পুরানো মাংশল কাগজের বাহাই-করা  
মলাটের নানাতরানে চটা ইটীয়া গিয়াছে। এটরকম  
পুরানো বইয়ের উপরই তাহার প্রধান মোড়। সেটরক  
সে বইখানা খালিগের তদার লুকাইয়া রাখিখা অজ্ঞাত  
বই তুলিয়া বাহুর বন্ধ করিখা দিল।

অবসর মত বইখানা সে পুলিল। এক খানাও ছবি  
নাই ! কিন্তু মাংশল কাগজে ছিটবিটর কাল কথা  
আছে। এ যেন লিপ্যসিত মকবাতঃ গুপ্তগতিকার লুচ্  
করিখা তাহার লিপ্যলা আরও পতঙ্গ বাড়াইয়া তেলো।  
—হঠাৎবদ যদের ছবি ! নাঃ—কোথায় ? মাংশল  
কাগজের ওপং ছক্ কাটা কি দূর ডাইডং নয়া।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন  
বৈবাহ সে পড়িল--বড় অদ্ভুত কথাট : চড়াং তলিলে  
আত্ম আন্দর্ষ চাইয়া বয়ে বটে—কিন্তু তাহার অকবে

বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল।  
পাথের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,  
— নতুনীর ভিন্নে মধ্যে পাথর পুরিয়া করেকদিন ধোঁতে  
রাখিতে হয়, পরে সেই ভিন্ন মুখের তিত্তর পুরিয়া মাহুণ  
ইচ্ছা করিলে শুব্রমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অণু নিষেধ চক্রে বিন্যাস করিতে পারিল না,—আবার  
পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ভাষাভাঙা বাক্যটির মধ্যে বইখানা  
সুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে দিয়া কথাটা ভাঙিতে ভাবিতে  
সে অধাক্ হইয়া গেল।

বাপারটা সে বৎ সফল তাপিয়াছিল অতটা সফল  
হইল না। এখনটা সে অত বুকে নাই—বুঝিল বিন  
পনরো পত্র। যে নতুনী মাঠে, ঘাটে, মাথার উপরে,  
দব সমরই চোখে পড়ে—কে জানিত তাহার ভিন্ন  
যোগাড়করা এতল সমস্তার বিধর হইয়া পড়িয়াইবে! পাথের  
খোড়সে, ক্ষেতের কালে, নদীর ধারের গর্তে, কত জায়গায়  
সে খুঁজিয়াছে। নতুনী তো ঘরের কথা, কোনো পানীর  
বাগাই চোখে পড়ে না।

দ্বিবিধে বিভাজনা করে—নতুনীর বাসা বাঁধে কোথায়  
আমিস্ দ্বিবি ?

তাহার দ্বিবি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলের  
—যত্ন, নীসু, কিল্ল, পটল, মেড়া—সকলকে বিভাজনা  
করে। কেউ বলে—সে এখানে নয়; উত্তর দায়ে উকু সাহের  
মাথায়। তাহার মা বলে—এই গুপ্তবলো কোথায় ঘুরে  
কেদা! অণু বহু চুকিয়া গুইবার ভাণ করে, বইখানা  
পুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য!  
এত সফলে উকিবার উপাধটা কেউ জানে না? হঠাৎ  
এই বইখানা আর কাহাঝো বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাহারই  
আছে; হঠাৎ এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই,  
শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে দুখ ভঁজিয়া আবার সে আত্মন পর  
—সেই পুরানো পুরানো পড়ো! এই বইয়ের বাসা লেখা  
আছে, তাহার সত্যতা সন্দেহ অণুর মনে আর কোন  
অবিসাস থাকে না।

পাথের গুণ ভাবনা নাই—পাথর মানে পাতা সে  
জানে। আত্মনার শেঁছনে পাতা মাথানে থাকে, একখানা  
ভাঙা অরানা বাড়ীতে আছে, উত্তা যোগাড় করিতে পারিলে  
এখন। কিন্তু নতুনীর ভিন্ন এখন সে কোথায় যায়?

গুপ্তের খাওয়া লাগবার পরে এক একদিন তাহার  
দ্বিবি ভাঙে—আর পেন্ অণু, মতা দেখাও আর। পরে  
সে একমুঠা পাথের ভাত লইয়া বাড়ীর দিক্‌খিহোরের  
গণমাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আর ভুলো-তু-উ-উ-উ। ভাক  
দিয়াই চুপ। তাইয়ের বিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া  
থাকে সেন কি অণুকে রক্তপূরীর গুহায় এখনই তাহার  
চোখের সামনে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হঠাৎ  
কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই চুপ হাত তুলিয়া খলিয়া উঠে  
—ও এয়েচে! কোথেকে এলো দেখলি?—খুলিতে সে  
চিরি করিয়া হাসে।

হোক হোক এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর বাপারে  
চুপায় আঘাও হয় ভাতী।—তুমি হাঁক দেও, কেউ  
কোথাও নাই, চাতিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া  
চুপা চোখ বুজিয়া থাকে; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতার  
বুকের মধ্যে চিপ্ চিপ্ করে; মনে মনে ভাবে—আজ  
ভুলো আসবেন! বোধ হয়, দেখি দিক্‌ কোথেকে আসে।  
আজ কি আর ভুলতে পেরেচে!—

হঠাৎ ঘনকোণে একটা শব্দ গুহে—

চকের নিমিষে বন জরলের লতা পাতা চড়িয়া খুঁড়িয়া  
চাঁপাইতে চাঁপাইতে ভুলো কোথা হঠাৎ নক্ষত্রকোণে আসিয়া  
হাজির।

অমনি চুপায় সমস্ত গা ঘিয়া যে একটা কিলের শ্রোত  
বহিয়া যায়! বিষয়ে ওকৌতুকে তাহার মুখ চোখ উজ্জল  
দেখায়! মনে মনে ভাবে—গ্রীক ভুলতে পার তো! আসে  
কোথেকে! আচ্ছা কাল একই চুপি চুপি ভেঙে দেখে  
দিকি, তাও ভুলতে পারে?

এই আশোপ উপভোগ করিতে সে মাথের বসুনি লুহ  
করিয়াও হোক খাইবার সময় নিজে বসে কিছু কম  
খাইয়া কুকুরের ভাত কিছু ভাত পাত সফর করিয়া  
রাখে।





অপু কিছু বিবির কুতর ডাকবার মধ্যে কি অমোদ আছে তাই বুঝি। পার না। দিদির ও সব মেয়েদি বাপায়ের মধ্যে সে নাই। কদার আগেই ভোজনরত শূণ্য কুতরটার দিকে সে চাটখাও দেখে না—তুখু পঙ্কনির ভিমের কথা তবে।

অবশেষে পঙ্কনি মিলিল। ঠোক নাপিতের কাটাগল তলার রাখা দেখা গরু বাবির গরুরের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যাব। অণু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তারা কত মাঠে মাঠে বেড়স, পঙ্কনির বাবা দেখতে পাল? আমায় যদি একটা পঙ্কনির ভিম এনে নিদি আমি ওটো পরলা দেখো—

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের বলি হাতে ভইটা কাণো বা-এ ছোট ছোট ভিম বাহির করিয়া বলিল—এই কাণো ঠাকুর, এনিচি। অণু তাকানিচি হাত বাড়াইয়া বলিল, যেখা! পরে সাজ্যাদের গরিত উদ্ভাইতে শাটাইতে বলিল—পঙ্কনির ভিম! ঠিক তো! হা ঠিক পঙ্কনির ভিমর বটে। রাখাল সে লম্বা ছুরি ছুরি শ্রমাদ উপাশিত করিল। ঠাকুর পঙ্কনির ভিম কিনা এলম্বা নলম্বা কোন কারণ নাই, সে নিজের ভীবন বিশর করিয়া কোথাকার কোন উচু পাড়ের মাগুডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে;—কিন্তু দুই মানার কমে সে দিবে না।

পারিভ্রমিক পঙ্কনির অণু অলম্বা বলিল। বলিল, ওটা পরলা দেখো, আর আমায় কড়িগুলো দিবি? সব দিবে দেখো এক টিনের ট্রোকা কড়ি—সব এই এত বড় বড় সোনালগেটে; দেখুও, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অণুর অপেক্ষা অনেক দৃষ্টিমান বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পরলা ছাড়া কোনো বস্তুই রাখি হইল না। বাহা হউক দরজারের পর রাখাল আসিয়া তার পরলার থাকাইল। অণু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়াওটা পরলা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ভিম চুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়ি ওলা অণুর গ্রাণ, অর্ধেক তাকর ও হাতকতার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অলম্বা; কিন্তু আকাশে উড়িবার অমোদের কাছে কি আর যেত্তনবাচি বেলা!

ভিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা খেন খুঁ-মেওতা প্রবাসের বেগুনের মত হাফা হইয়া কুলিয়া উঠিল; লম্বা লম্বা খেন একটু লম্বাওর ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌছিল। এটুকু এতকণ ছিল না; ভিম হাতে পাওয়ার পর হইতে খেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা মিল—পূব অশ্বপট। লম্বার আগে আসন মনে নেড়ালের জামপায়ের কাটা গুড়ির উপর বলিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া বাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় বাইবে? আমার বাড়ীর ঘেপে! বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শাশিখু পাখী মরনা পাখীর মত উই আকাশের গারে ডায়াটা—যেখানে উড়িয়াছে?

শেই দিনই, কি তাহার পরদিন। বৈকালে দুর্গা মলিতা পাকাইবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া পুঁজিতেছিল। তাকের হাড়ি কলদির পাশে গোলা ছেঁড়া-পুঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতছাইতে হাতছাইতে কি খেন ঠুক করিয়া তাহার শিছন হইতে গড়াইয়া মেয়ের উপর পড়িয়া গেল। খয়ের ভিতর বৈকালেই অলম্বা, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেয়ে হইতে উড়াইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের ওটো বড় বড় ভিম এখানে। এ, শ'ড়ে একেবারে শুঁড়ো হ'বে গারেচে। সেখানে কি পাখা ভিম পেড়েচে খয়ের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না জোগাই ভালো। অণু সমস্ত দিন খাইল না...কাজ...বৈ বৈ কাজ। তাহার মা ঘাটে গরু করে—ছেলের সবই বিবুদ্ধি! ও মা একথা তো কখনও শুনি নি—তখনো লম্বা ঠাকুরবি—কোথেকে একটা কিসের ভিম এনে তাকের পেছনে লুকিয়ে রেখেচে, তা নিয়ে নাকি মাগুবে উড়তে পারে। পোনো কাজ! উনি না বাড়ী থাকলে যেসেটা যে কি ক'রে বেড়া—একদণ্ড যদি বাড়ীতে যা পাত্তে! ভই-ই সমান, যেমন সেসেটা তেমনই ছেলে—

কিন্তু বেচারী সর্বস্বাধা কি করিয়া আনিবে? লম্বা সেই তো কিছু 'পূর্ণবর্নসংগ্রহ' পড়ে নাই, বা লম্বা সেই কিছু পায়ের স্পর্শও জানে না।

আকাশে তামা হইলে তো লম্বা সেই উড়িত।

## তফাৎ

### শ্রীশ্রবণ রায়

পাঁচটা বাজে।

পড়ন্ত স্রোতের রক্তমাটুকু কিংবা হইয়া আঁপিতেছে।

গিটি-কলোজের হুঁপুখে দাঁড়াইয়া ছুটি তরল ছাত্র ভটল  
করে। কোন্ অধ্যাপকের বক্তৃতা সব চেয়ে চমকপ্রসাদী—  
এই বিষয়েই বিতণ্ডা।

বুক-খোলা-কোট-পরা ঘোটা ক্রমের চপমা-চোখে ছেলেটি  
পার্শ্ববর্তীকে বলে, গাই বলিস্ নরেন, প্রোক্লেস্ বুখাঙ্কির লেক্চার  
আমার সব চেয়ে ভাল লাগে... কত পড়াগুলো ঠিক, ছানিস্ ?

নরেন ছেলেটি দেখিতে বেশ সুস্থি। রাটা ক্রাম  
হইলেও প্রসাধনের কল উজ্জ্বল। বেশ-ভূষার সৌন্দর্যতা  
পরিচুত। পায়ে বাঘারি ছিটের ব্লু-জোন্ট স্টাট—বুক-  
পকেটে দোনা-লি-ব্রিগ-খটো 'ফাউন্টেন' পোঁজা। পায়ে  
বন্দা-চুটি। বড় বড় চুলগুলি পিছন-পানে লম্বা বিস্তৃত।

নরেন বলে, বুখাঙ্কির চেয়ে প্রোক্লেস' 'হ'—এর study  
কিছু কম নয়, প্রতুল ! তা' ছাড়া ঠন 'লেক্চার' দেবার  
এমন একটি ছাত্রও ভগ্নী আছে, বা' সহজেই ছাত্রদের  
মনোযোগ আকর্ষণ—

বুকের কথা মাত্র পশেই খামিয়া যায়।

নরেনের চকল চোখের চাহনি অহুসরণ করিয়া প্রতুল  
দেখে ও-ছুটাপনের খায়ে বেবুন্ কুলের 'বাস্' খামিয়াছে।  
একটি হুগোবী কিশোরী হ'তে বইখাতাগুলি লম্বা-বুকের  
আছে খরিয় মলমল ময়ূর পতিতে নাহিল। পরনে—চকড়া  
লালপাড় শাড়ী পায়ে রূপালি জরির জুপ-পাঞ্জা-অঁকা  
সাফা ব্লাউজ—পায়েও সাফা জুতো। শিগের ওপর ঘোলাপি  
য়েশ-মি-কি-তা-বা-বা সোজলু বৈদী।

পড়ন্ত স্রোতের ক্রিকেটের মেরেটির কানের সোনার জু  
ছুটি কিক্মিক্ করে।

সাধাশিখা বেশ, অলং মাধুরী-মণ্ডিত।

নরেন মুদ্র চোখে তাকাইয়া থাকে।

প্রতুল সুচকি হাসিয়া বলে, There is the  
more attractive !

ছুটাপনের খায়েই মোতলা একটা বাজীর ছাত্র-পাশে  
বেশ-পাখরের বুকে নিকব-কলো অক্রে লেখা—

Dr. P. C. Hasan M. B....ইত্যাদি।

মেঘটি সেই বাজীতেই প্রবেশ করে। চর ভো  
ডালাবেরতর কড়া। খায়ে নিকটে গিয়া নরেনের পানে  
অকরাবদেই একবার চকিত স্তম্ভিত করিয়া যায়।

মুদ্র শব্দে নরেন বলে, চমৎকার ওর কালো চোখছটি !

প্রতুল পরিচায়নের সুরে বলে, কালো-চোখের চাউনিতে  
কিছু পেটের কিংমে মেটে না ! এমিকে পাঁচটা বেজে  
যেছে তা' শুন্ আছে ভোগ ? বাজী খাওয়া থাক্ চল।

হই বক্তৃতে লখ চলে।

চলিতে চলিতে সহসা নরেন বলিয়া উঠে, ভীষনের  
সকলিগ্রণে যদি কাউকে বরণ ক'রে নিতে হয়, অম্মিচ  
একটি কিশোরীকে—সুন্দরী, শিকিতা। ব্যস্ত লগে শুধু  
দেহের নয়, মনেরও আদান-প্রদান চলবে—বিয়ে যদি  
কোনোদিন করি প্রতুল, তবে অম্মিচ একটি মনের মতো  
সকলি শুলে নেব। দিনের কাজের শেষে যখন ঘরে  
কিন্বে, সে হর ভো তখন অগামনি থাকিবে মিঠি হুগে গান  
গাইবে—কি মধুর হ'য়ে উঠবে লকার সেই অবলম্বন !  
কখনো বা জোখা-জোটে গেল রবীন্দ্রনাথ শুলে ভ'জনে  
মিলে কত কাব্য-আলোচনা—জীবনটাকে উপভোগ ক'রে  
নেব... 'I will drunk life to the lees !'

তরল-সৌন্দর্যের স্বপ্নে মনোমগ্ন হইয়া রক্তিম হইয়া ওঠে।

দশটা বজর কাটে।

সাধা-হারা মধ্য-পাশের দশটি বৃন্দ যেন।

সজা ছ'টা।



ছাড়া-দুপুর পরের বৃকে একটির পর একটি পাশ জলে ।  
পথে পথে অকৃত্রিম জনস্রোত ।

তিড়ের মাঝে নরেন চলে অবসর পথে । পরশে আখ-  
মরগা হুঁত, গায়ে তেজস্বিনী একটা বন্ধরের কোট । বগলে ছিন্ন  
ছাতা । হান ছাউ চোখের তারার বার্থতার বেদনা পুঞ্জীভূত ।

চলিতে চলিতে আর একটি পথচারী লম্বকের গায়ে  
হাতা লাগে—অসাবধানই ।

চাফিফা দেখে—প্রতুল !

প্রতুলের চোখে বিপুল বিষম । শুধায়, কে, নরেন  
না ? চিন্তে পারিল ? ও, কদিন পরে দেখা !

মানস্কোচ্ছল মুখে নরেন বলে, না চেনবার মতো এমন  
কোনো পরিবর্তন তোমার হয় নি তো, প্রতুল !

—তোকে চিন্তে কষ্ট হয় নরেন ? কি রোগা চেহারা  
হ'য়ে গেছে তোরা ? তারপর, করছিল কি আলকাল ?

মুখের ওপর শুভ দামির ছত্রাবরণ টানিয়া নরেন অবাধ  
দেহ, বাহা মারা বাবার পর কলেজ তো ডের দিনই ছেড়ে  
দিগেছলুম, তাও পর তেহাশিনির ।

—বাড়ীর সব ভালো তো ? আসি ভাই, তা হ'লে—

প্রতুল নিজের কানে চানিয়া ধায় ।

নরেনও ফের হাঁটিতে শুরু করে ।

শ্রী পলির মধ্যে মোতলা একটি ভাঙাটে বাড়ী ।

নরেন ফড় নাড়ে । বানিক পরে দরজা খুলিয়া ধায় ।

একটি কপ-তরু ত্রায়া তরুণী বৌ গাঁড়াইয়া থাকে—  
হাতে লঠন । হলুদের ছোপ-লাগাময়লা শাড়ী পরশে । হাতে  
তরু কচুপা-বস্ত্রের কাচের চুড়ি । সুবানিতে অবলাব ।

নরেন নীরবে প্রবেশ করে । তারপর, ফের দিয়া আপিসের  
গোছাক ছাড়ে । বৌটিও দরজা বন্ধ করিয়া করে আসে ।

দুর্ভাগ্যবান, বোকার বিহুটী এসেচ ?

—হ্যাঁ ।

—খুবী বালি ?

—এ-চি ।

—আর দেখ, সরলা চুখের দণ্ড দিয়ে গেছে ।

—হঁ ।

এদিকে, বিহুটীর মখল লইয়া থোকা এবং খুবী মথো  
তুলুল লংগাম বাধে । অবশেষে, কারাগ্রন্থিযোগিতা !

মননী অতিষ্ঠ হইয়া হু'লনের গিটে লমকে ঢক  
বদাইয়া দেয় ।

—একদণ্ডও স্থির হ'তে নেই হতভাগা ? হাড়-মাশ  
ভাঙা-ভাঙা ক'রে তুললে পা !

ফড়ার তুলিয়া বৌটি হেসেলে দিয়া ঢোকে ।

স্রাস্ত্র-কাতর দেহ তরুণাবের ওপর এলাইগা  
নরেন বিশ্রাম করে । একটা বিড়ি ধরাইয়া মুহুম্ব  
চান্দেয় ।

কলরব-মুখর প্যাড়াটি নিস্তা-নীরব ।

রাত প্রায় এগারোটা ।

বিদ্যানার শুইয়া নরেনের চোখে নিস্তার পরশ  
লাগে না । হেঁদেলের পাট চুকাইয়া বৌটি ঘরে আসে ।  
তারপর বাতি নিভাইয়া বিদ্যানার এক-শাশে শুইয়া পড়ে ।

অম্বি, ভানবার কাক দিয়া নির্ভাসিতা জোৎস্না গুটী,  
মেরের মতোই অন্ধকার করে ঢুকিয়া পড়ে । কাহিনের  
শেষাশেষি । বখিৎ হাওয়ার একটা আসনের আমেজ ।

নরেন সোহাগ-সিক হয়ে ঢাকে, ঢাক—

তরুণীর কণ্ঠের অবাধ শোনা যায়, উ—

—কি চমৎকার জোৎস্না উঠেচে ! এল না বানিক সর  
করি—

—পারি নে বাপু !...সারাদিন খেতে খেতে কুমে আমার  
চোখ চুল আসচে...

নরেন তরু ।

সরলা তার মনে পড়ে, প্রথম-মৌসুমের সেই মোহমর  
উজ্জ্বল-বস—এম্বিই জোৎস্না-নিশ্চেষ্ট শেলি-বীজনাথের  
কাবা-আলোচনার কল্পনা—

সেদিনকার কলনার সঙ্গে আজকের বাস্তবের কত  
তফাৎ !

একটা উজলত দীর্ঘযাপ চাশিয়া নরেন পাশ ফিরিয়া  
শুইল ।

# সালতামামী

শ্রীমুরেশচন্দ্র রায়

"ধরপ্রতি প্রিয়ভাবে কন বৈরবতী  
বঙ্গের মল্যাক্ষ কই পতপতি।"

বঙ্গবাসন্তে পতিকা কিলেই আমরা এই বর্ষকল পড়্তে  
খ'সে বাই। কিন্তু বিগত বঙ্গের ইতিবৃত্ত আমরা অনেক  
সময়েই ভেবে দেখি না। সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজনীতিতে  
কত বিপদার দে হ'য়ে গেছে এই অতীত ব্যর্থতার মধ্যে  
তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ চোখের সামনে ধরলে মনে হয় বর্ষকল  
অপেক্ষা এই বিগত বর্ষের বিবরণ অধিক চিত্তাকর্ষক।  
বাবুগারী যেমন বঙ্গবাসন্তে নিজের বাহ্যিকের হিসাব নিকাশ  
করে, ভগ্নের এই বিরাট কারবারেরও একটা বার্ষিক  
হিসাব মনে মনে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

## ইংলণ্ড

ভগ্নের ইতিহাসের সোড়ার কথা আমাদের কাছে  
ইংলণ্ড। "কাহু বিনা মোর গীত নাই।" ইংলণ্ডকে যদি  
বিলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস কোথায়? ১৯২৮ খ্রিঃ  
ইংলণ্ডে বাৎসরিক লক্ষ প্রধান ঘটনা সম্রাটের বৈশিষ্ট্য।  
জালা যে দেশের লোকের কতগ্রন্থ তা ইংলণ্ড থেকে ভাল  
বুজতে পারছি। কঠিন "মুর্তিসি" রাগে সম্রাট আক্রমণ;  
এ বাৎসরিক সমস্ত দেশের ওপর একটা বিধাৎ কালিমা ছড়িয়ে  
দিয়েছে। রাজার অস্থিরতা তীব্রতর বিবরণ পেয়ে বড়দিনের  
বাজারে কেনাবেচা কমে গেল, বাবুগারীরা মাথায় হাত দিয়ে  
খ'সে পড়ল। তারপর এখন সন্তোষজনক খবর পাওয়া  
গেল তখন আবার কেনাবেচা আরম্ভ হ'লো। বড়লোকের  
বিবাহ বাসরে বা অনুষ্ঠিত হ'য়ে আর সে উৎসব-আতিশয্য  
নাই। Lord Chancellor লর্ড হোলস্‌ব'রীক পরীতে  
সম্মোদনে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন ক'লেন। সমস্ত দেশের ওপর  
শোকের ছায়া প'ড়ে রয়েছে।

বেকার সমস্যা দেশবাসীর কাছে প্রবল হ'য়ে পাড়িয়েছে।  
এখনও প্রায় পনের লক্ষ লোকের কোন কাজ কর্ম নাই,  
সামান্য সরকারী ভাতার ওপর নির্ভর ক'রে দিন কাটাচ্ছে।  
দেশের মর্মান্বীপ অসুস্থস্থান করছেন—বেকার সমস্যা কিরূপে  
সমাধান করা যায়। প্রস্তাব হচ্ছে যে, কতক লোককে  
সরকারী খরচার কামান্ডার পাঠিয়ে দেওয়া হোক,  
সেখানে কাজ ছুটতে পারে। পার্লামেন্টের প্রমোদী  
(Labour Party) হল ইস্তাফার হারি কংগ্রেস যে, তাঁরা  
General Election ক্ষমতা পেলে বেকারখণ্ডকে সরকারী  
খরচার দায়িত্বের নানাবাহানে পাঠিয়ে কাজ ছুটিয়ে দেবেন।  
কিন্তু General Election তো মে মাসের আগে নয়।  
এমিকে ওয়েলসে আড়াই লক্ষ করণাধীনকারী বেকার  
অবস্থার কঠোর পরিস্রাব ক'লে পড়ছে। কারও হ'বেনা  
আহার ছোটো না, শীতের উপশ্রুত হয় নাই। খবরের  
কাগজে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হ'লো। লণ্ডনের লর্ড'  
মেরর টাওয়ার খাড়া গুল্লেন। পার্লামেন্টে যি: বস্তুই  
বল্লেন, আন্তর্জাতিকের জন্ত টাকা পাঠানো হচ্ছে, আর  
লর্ড'মেররের ক'লে বস টাকা আদায় হবে সর্বমোট আরও  
তত টাকা দেবেন। অসহিনের মধ্যে আড়াই লক্ষ পাউণ্ড  
আদায় হ'য়ে গেল। তখন দুবরান (Prince of Wales)  
শিতার অস্থিরতা সংবাদ পেয়ে আফ্রিকা থেকে তড়াতাড়ি  
ফেরে ফিরে এসেন।

সম্রাটের অবস্থার একটু উন্নতি দেখেই দুবরান মন  
দিলেন বেকার সমস্যার দিকে। বড়দিনের সন্ধ্যাবেলা  
দুবরান বেতারের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে অর্থের জন্ত  
মর্মান্বীপ আবেদন ক'লেন। পরদিন থেকে হাজার হাজার  
পাউণ্ড টাকা আসতে লাগলো।

বাক্সা বাগিকার বাজার মধ্য পড়ছে। ফ্রান্স ও



ভাষ্যানী ভ্রতবশে সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠছে। ইংলণ্ড তাবের সঙ্গে গেয়ে উঠছে না। কৃষি, কয়লা, গোলা, তুলা নগ্নই চাণ্ডাকার। নেপোলিয়ন ইংরেজদের বলেছিলেন "A nation of shopkeepers"—দোকানদারের জাতি। আজ ইংরেজরা বলছে, কই আমরা তো ভাল দোকানদার হ'তে পারছি না! বিপের বাজারে ইংলণ্ড তো আর সে স্বকম জিনিষ খেতে পারছেনা। এ যে দোকানদারীর দূর! এর ঘেড়ে রক্ত-নীতিজনপ নানা উপায় অবলম্বন করছেন। প্রত্যাহ হ'য়েছে আইন ক'রে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তিন চতুর্থাংশ টেক্স কর্ম্মের দেওয়া হবে। মেসেব লোকও ব'লে নেই। বড় বড় কোম্পানী চই তিনটে একত্রে মিলে যাচ্ছে (amalgamation); তলে কম খরচার বেশী কাম হবে।



দুসোলিনী  
(ইটালি)

আইবেং চি গিভেরা  
(সেন)

পিস্‌বর্ডার  
(পোলাও)

দুগ্রাক কোমল  
(তুরস্ক)

এরিন  
(ইংলণ্ড)

এই বংসরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনেক কাম হয়েছে, সমস্ত রাষ্ট্রের দিক দিয়ে বার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। মন প্রথম ক্রীলোকের ভোটার অধিকার। ক্রীলোক পুরেই ভোটার অধিকার পেয়েছিল; এবার পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে পেয়েছে। এক্ষণ বংসরের উর্ধ্বতন ক্রীপুরুষ সকলেই এখন পার্লামেন্টের নির্বাচক। কলে বর্তমান রাষ্ট্রের পক্ষের ভাষা নির্ণয় ক্রীলোকের হাতে। ইংলণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা ক্রীলোকের সংখ্যা বেশী—প্রতি মাকের পুরুষে এগার নত ক্রীলোক। ক্রীলোকেরা সমবেত হ'লে যে-কোন বলের হাতে রাজ্য পাশন তার ফলে নিতে পারেন। তাই সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে বৃহত্তম পার্লামেন্টের সদস্যগণ ক্রীলোকবিশিষ্টকে সম্বলিত করার চক্র বাত হ'য়ে উঠেছেন।

মিউনিগিপালিটির নিস্যাচনে এবার প্রমথীদীপল অধিক সংখ্যার জয়লাভ করেছে। মন্ত্রিসংঘে (cabinet) দুইটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য; লর্ড চ্যাংলারের মৃত্যুতে তাঁহার পদে অবস্থিত হ'য়েছেন লর্ড হেলগাম্—আর ভারতের ভাষা বিভাগে ভারতগণিত লর্ড বার্কেনহেডে রাষ্ট্র-নীতি ত্যাগ ক'রে বাণিজ্য ক্ষেত্রে লাভজনক কাজ গ্রহণ করেছেন, তাঁর পুত্র তাকে বদলেছেন লর্ড শীল। হাউস অব কমন্সের সভাপতি (Speaker) মি: হুইটলি অবদর গ্রহণ করায় ক্যান্টন কিম্বর তাঁহার পদে নিষাচিত হ'য়েছেন। ইংরেজ জাতি পাক বাবাগাদার হ'লেও তার ধর্মের পৌঁড়ানি এখনও আছে। প্রিন্সার Prayer Book এর সংস্কারের প্রস্তাব পার্লামেন্টে বিতীরাবার অগ্রাহ্য করলেন। এর পরেই এক নতুন ঘটনা ঘটলো। ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম-

বাগক (Archbishop of Canterbury) ডাক্তার ডেভিড্‌সন বাহুত: বশত: অবদর গ্রহণ করলেন। ইতিপূর্বে কোন ধর্মবাহকই জীবিত অবস্থায় কার্যে ভাগ্য করেন নি। তা: ডেভিড্‌সন লর্ড উপাধি নিয়ে অবদর গ্রহণ করলেন; তাঁর স্থানে

অভিষিক্ত হ'য়েছেন Archbishop of York, ডাক্তার ল্যাং।

দুই রাজকর্মচারী সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী এ বছরে দেখা গেছে—একটি নৌসেনা ও আরেকটি দিভিল পাবলিশ। উভয় ফলেই উপযুক্ত বিচারের পর দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে। মিস্‌ স্যাভিল নারী একটি বৃহত্তর কোনকল্প সম্বন্ধজনক আচরণের জন্য পুন্নিম তাঁকে বানার এনে নামা-রূপ সোয়া করে। বাণিজ্য আদালতে বার এবং পুন্নিমের মামলা ফেলে যায়। তাই নিয়ে বৈধে, পার্লামেন্টে তুলন তক এবং কলে পুন্নিমের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অঙ্গনছানের এক রাজকীয় কমিশন নিয়োগ। এমন সময় লন্ডনের পুন্নিম কমিশনারের অকলর গ্রহণ। গবর্নমেন্ট পুন্নিম শাস্তিপের

বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন লর্ড বী-এক পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করলেন। লর্ড বী পুলিশের আবুল সাব্বারে মনোনিবেশ করেছেন। ইতিমধ্যেই অনেক পরিবর্তন হ'য়ে গেছে।

এ বঙ্গের বঙ্গবন্ধু রাজপ্রাসাদে আকৃগান রাজ ও তাঁহার স্ত্রীদি অতিথি হ'য়ে এসেছিলেন। গুহরাজের পূর্ণ আফ্রিকা ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য। রাজকুমার হেনরীকে ডিউক অব স্টার ক'রা হ'য়েছে।

কয়েকটি খানতানাবা বাকি এ বঙ্গের উল্লেখ্য ভাগে রয়েছেন—পাতিভিক টমাস হাভি, কৃতপূর্ণ প্রধান মন্ত্রী লর্ড অর্ককোর্ড ও আর্কুইথ, সেনাব্যাক আল'রেপ, পণ্ডিত লর্ড ডাল্‌ডেন ও বাজনাতিজ লর্ড কের্।

### ক্যানাডা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্যানাডা গারহণশন ভোগ করে। যথোপা ব্যাপারে ক্যানাডা এক প্রকার স্বাধীন। প্রধান মন্ত্রী মি: ম্যাকেনজি কিং প্রস্তাব করেন যে, প্যারী ও টোন্টিওতে ক্যানাডার নিজের প্রতিনিধি থাকবে। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হ'য়ে গেছে। মি: কিং লজ্জিত এসেছিলেন। সেই সময় কথা হয় যে, ইংলণ্ডের কতকগুলি বেকার লোককে ক্যানাডাতে কাজ দেওয়া হবে। ফলে কয়েক লক্ষ বেকার ইংরেজ ক্যানাডাতে কাজ নিয়ে গেছে। এ বঙ্গের ক্যানাডার রাজস্ব উদ্ধৃত হ'য়েছে এবং সেই জন্য অনেক প্রকার টেন্ড করিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। মি: কিং ঘোষণা করেছেন যে পূর্বের মত পুনরায় ডাক মার্গের হার কমিয়ে এক পেনী করা হবে। দুইশু' সময় ডাক মার্গের হার বেড়ে গেছে—ইংলণ্ডেও বেড় পেনী হ'য়েছে। এখানে বেপের লোকেরা এক পেনী ডাক মার্গে করার মত আশ্বাসন করছে। কিন্তু রাজস্ব-সচিব মি: চার্লিস ব'লে বিবেচন্য তা হবে না। ক্যানাডা ইংলণ্ডের হার মানালো। ১৯২৬ সালের Imperial Conference-এর নির্দেশ অনুযায়ী সচিব, উইলিয়াম স্মাক ক্যানাডার প্রথম লাই কমিশনার নিযুক্ত হ'য়ে আগষ্ট মাসে সেখানে গেছেন।

### অষ্ট্রেলিয়া

১৯২৮ সালে অষ্ট্রেলিয়াতে সাধারণ নির্বাচনে হ'য়ে গেছে। মি: ক্রু পুনরায় অধিক সংখ্যক সমস্ত পেয়ে প্রধান মন্ত্রী হ'য়েছেন। এ বঙ্গের ভারতীয় প্রমিক বর্ষগট মেম্বের বাস্তব হ'য়ে তুলেছিল। চাকার চাকার সমস্তা: ছয় দশককাল বর্ষগট করেছিল—এডল্‌ফ ও মেম্বেরা: দাফা হাঙ্গামা হ'য়ে গেছে। আইন পরিষদে প্রমিক নেত্রা মি: চার্লটন পদভাগ করেছেন ও তাঁর স্থলে নির্বাচিত হ'য়েছেন মি: স্কালিন।

### নিউজিল্যান্ড

এ দেশেও এবঙ্গের সাধারণ নির্বাচনে হয়েছে। মি: কোট্টন ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু সমস্ত বিচ্ছিন্নল সম্মিলিত হ'য়ে অভিজ্ঞ মার্স কোলেক ওয়ার্ডের নেতৃত্বে মি: কোট্টনের মনকে হারিয়ে দি'য়েছেন। ফলে মি: কোট্টন পদভাগ করেছেন এবং মার্স কোলেক-টার পদ গ্রহণ করেছেন। রাজস্ব উদ্ধৃত হ'য়েছে এবং এক কোটী পাউণ্ড ব্যয় ক'রে বেপের উন্নতিকর কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। এ দেশের ইতিহাসে একজন মাত্রী প্রথম বিশপ নিযুক্ত হ'য়েছেন।

### দক্ষিণ আফ্রিকা

নানা রাজনৈতিক দলের মধ্যে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হ'য়েছে। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মারক্‌ উভর দলের লোক নিয়ে শাসন সংঘ (cabinet) গঠন করেছিলেন। কিন্তু তা ঠিক্‌ল না। প্রমন্ত্রী দলভাগে পোষণাল ক'রে বেবি: পড়েছে। সাধারণ নির্বাচনে মরিকট। ভারতের প্রতিনিধি ঐশ্বর্য ঐনিবাল শারী হির করেছেন ১৯২৯এব প্রারম্ভে কার্য ভাগ করবেন; ভারতীয়গণ তাঁকে রাষ্ট্রে চাইছে। ভিসম্বর মাদে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় সংগ্রাম হ'য়ে গেছে।



### আয়ারল্যান্ড

আয়ারল্যান্ড আবার স্বাধীন। তবু লোকের মনে নয়। একদল যা পড়েছে তাই নিয়ে কাজ চালাতে চায়। আবার একদল চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রথম দলের নেতা মিঃ কলগ্রেভ বর্তমান প্রেসিডেন্ট; দ্বিতীয় দলের নেতা মিঃ ডি ভ্যাণেরা। মিঃ কলগ্রেভ আমেরিকাতে বেড়িয়ে সামাজিক নবায়ন চানিয়ে এলেন। কেন্দ্রশালী মানে নতুন বড়লাট মিঃ জেমস মাকনীল কার্যভার গ্রহণ করেছেন। মিঃ ডি ভ্যাণেরা আইন পরিষদে প্রস্তাব করলেন, রাজনৈতিক-জাতিগত লক্ষ্য পরিত্যাগ করা হোক, কিন্তু ভোটে ভেদে বেগলেন।

### ভারতবর্ষ

এই এক বৎসরের মধ্যে ভারতে বা ক'রেছে তা ভারত-বাসীর স্বরূপ আছে আপন। করা বার। সাইমন কমিশনের আগমন ও ভ্রমণ, নৈরুত কমিটির রিপোর্ট, ত্রিভুজী বাজার বিল প্রজ্ঞাপন, প্রেসিডেন্টের অভিব্যক্তি ভোটের ক্ষেত্রে বোলশেভিক বিতর্কন বিল অগ্রাহ্য, বেঙ্গল নারায়ণ রেজি-লাইনে ১০৪ দিন বন্দবস্ত, জুজাটে সাম্প্রদায়িক বিবাদ, ব'রগোলা দস্যুগ্রহ ও তাহার জয়, লাণা লাগলত রাহের মুক্তা, কলিকাতার কংগ্রেস—সবই আমাদের স্বরূপকে আছে। রাজকীয় ভবি কামিশন রিপোর্ট ঘিরেছেন এবং করমরাধা পত্রিকা সংঘে বাট্টলার কমিটি তদন্ত করছেন।

ভারতের নিকটবর্তী সিংহলের শাসন লগাণী লুৎছে নতুন রিপোর্ট হয়েছে, এবং তা নিয়ে সিংহলে বিবদন আলোচনা ও তর্ক চলছে।

### বৈদেশিক প্রসঙ্গ

বৈদেশিক রাজনীতিতে লক্ষ্যমান ঘটনা কেলোগ-প্যাট (Kellogg Pact)। আমেরিকার সঙ্কল্পম সচিব মিঃ কেলোগের প্রস্তাবে ও চেষ্টায় কতিপয়ত বৃদ্ধ বৃদ্ধ করবার লক্ষ্য একটা চুক্তির প্রস্তাব করা হ'য়েছে এবং গত ২৭ আগস্ট ফ্রান্সে এটা লিখিত হ'য়ে গেছে। ১৫টি দেশ

এই চুক্তি লিখিত করেছেন এবং আরও ৫০টি রাষ্ট্র জানিয়েছেন যে তাঁহারা এই চুক্তি মেনে নেবেন। কিন্তু মত হ'লো চুক্তি পত্রের লক্ষ্যমান আমেরিকাতে; আমেরিকা এখনও চুক্তি অনুমোদন করে নি। জাতি সংঘ স্থাপনের সময়ও এমনি হ'য়েছিল। জাতিসংঘ (League of Nations) উত্থান করলেন আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ডাঃ উইলসন; কিন্তু শেষকালে আমেরিকা এই জাতিসংঘে যোগদান করলেন না।

গত ইউরোপের যুদ্ধের পরে সমস্ত দেশের মধ্যেই একটা নতুন প্রেরণা এসেছে। সকলেই চাইছে গণতন্ত্র স্বাধীনতা। লগে দেশে দেশে একটা বড় ব'য়ে যাচ্ছে এবং অনেক দেশেই গণতন্ত্রের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বা One-man-rule হ'য়ে থাকছে। এটা যে সব বাহ্যিক কারণ তা নয়, অনেক লম্বা জাতিক লক্ষ্যবিত্ত করতে হ'লে একজন অতি-মানব বা superman-এর নেতৃত্ব প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক বাস ক'রে স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয়। এ পর্যন্ত ইউরোপে নয়টি রাষ্ট্রে এই তরফ শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে যেখানে একজন লোকের ইচ্ছামতে কাজ চলছে।

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| রাষ্ট্র        | শাসক বা নেতা                |
| ইটালি          | মুসোলিনি                    |
| স্পেন          | প্রাইমো ডি রিভেরা           |
| গোলাণ্ড        | লিথলুইজ                     |
| ভুটান          | মুস্তাফা কেমাল পাশা         |
| পারস্য         | রেজা খা                     |
| জাভা           | চরুপি                       |
| আল্-বেরিয়া    | আব্দুল জব্বার               |
| লিথুয়ানিয়া   | ভালদে মেরালু                |
| মুসো স্লাভিয়া | রাজা আলেকজান্ডার বা জেনারেল |
|                | মিচকোভিচ                    |

এ সব দেশে যে লোকের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে তা নয়। অনেক জাতিগত পার্থক্যের বা ব্যক্তিগত পরিষদ এবং রাজ্য আছে। কেবল ঘটনাক্রমে লম্বা ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একজন লোকের করতলগত হ'য়ে পড়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বে তাঁর দেশের লোকেরা অধিদ্বারা শাসন

কাৰ্য্য চালনা কৰুৱে শোনাগৈ মাৰ্শাল পিলহুডৰি  
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ ভাৱ ক'ৱে ভাৱাত লক্ষ্যকাৰী মণিৰে ব'লৈলৈকে  
দিয়োৱেন; কিন্তু লম্বৰ ক্ষমতা প্ৰকৃতপক্ষে পিলহুডৰিৰ  
হাতে। নিযুয়ানিছাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অধ্যাপক ভাল বেমেয়াস  
শোনাগৈৰ লগে লগত চালোৱেন এবং এ বিষয়ে আন্ত-  
জাতীয় (League of Nations) কথাও উল্লেখ ক'ৰে  
ইউৰোপীয় স্বাধীনতাৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰূপভাৱন হ'ৱেৱেন।  
লগ্নাতিভাৱে ফ্ৰেণ্ট ও পাৰ্ট এট দুই দলৰ মখে বিৰম বাৰ  
বিস্থাৰ চলুৱে। দুই মাহেৰ ২০ তাৰিখে বাৰতা-পত্ৰিকাবৰ  
একটা লভাৰ তৰ্ক কৰুৱে কৰুৱে পাৰ্ট দলৰ একজন  
প্ৰতিনিধি বিলক দলৰ চাৰজন প্ৰতিনিধিকে স্তলি ক'ৱে  
বিলে—ভাৱ মখে তিনিজন মাৰা গেলেন। ফ্ৰেণ্টৰ দল  
পাকিৰে বদল এই একটা বিচিত্ৰ কৰুৱে হ'বে। বেগতিক  
দেখে ভাৰা বাৰতা-পত্ৰিকাবৰ ভেগে দিলেন এবং নূতন পাসন-  
তৰ লক্ষ্যকাৰীৰ আটন বা  
হুগা পৰ্য্যন্ত তাঁৰ নিজে  
নিৰ্দ্ধাৰিত মন্ত্ৰীপদৰ ওপৰ  
বাৰা পাসন ভাৱ অৰ্পণ  
কৰেৱেন—এৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী  
জিড কোডিচ্। এই নূতন  
মন্ত্ৰী নিৰ্দ্ধাৰণটা ক'ৱেৱে  
১৯২২ৰেৰ আৰুখাৰীতে।

১৯২২ মালে আৰুখানিহা

তুৱন্তেৰ অধীনতা থেক মুক্তি পেৰে বাৰীৰ হু। ১৯২৪  
মালে আৰুখানিহা সাধাৰণ-তৰ বা Republic হ'লো।  
আলোচা বৰ্ষ বাৰতা-পত্ৰিকাবৰ ভাৱে প্ৰেসিডেণ্ট আমেদ  
বেগ্ লগতকৈ বাৰা ব'লে খোষণা কৰেৱেন। আমেদ ওগ  
দিহোৱেন প্ৰহণ কৰেৱেন, প্ৰথম লগ (Zogou) নাম  
নিৰে। কোটা কোটা হ'ৱেৱেন তাঁৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী।

কমানিহাতে কলক বিহোৱে ক'ৱেৱে—ভাৱেৰ আৰুখানিহা  
প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰুখানিহা পৰত্যাগ কৰেন। নূতন নিৰ্দ্ধাৰণে  
কলকল লক্ষ্যকাৰী কৰেৱেন এবং তাঁৰেৰ নেতা ভাৱাৰ  
মানিউ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ প্ৰহণ কৰেৱেন।

পত এপ্ৰিল মালে লুগেৰিভাৱে প্ৰবল ভূমিকাল্প ক'ৱে  
গেৱে; তাতে প্ৰাৰ ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড স্তলি ক'ৱেৱে। নিকট-  
বৰ্তী বাৰতাৰ্ত্তলি একত্ৰ অনেক অৰ্থ সাধাৰা কৰেৱে। ফ্ৰেণ্ট  
মালে লুগেৰিভাৱে ভাৱণ বিহোৱে হু এবং তাতে প্ৰাক্ত  
ভাৱাৰ লক্ষ্য পুন সাধাৰ ক'ৱেৱেৱেন। বাৰোচ্ ১৯২  
সেপ্টেম্বৰ পাৰাণ চেক্ নূতন মন্ত্ৰীপদ পঠন কৰেৱেন এবং  
দেখে পাৰি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ৱেৱে।

বিশ্ব মন্ত্ৰীপদৰেৰ কলে অষ্ট্ৰিয়া সাম্ৰাজ্য তিনি ভাৱ  
ক'ৱে গেৱে—অষ্ট্ৰিয়া, ভাৱাৰী ও ভেৰোৱোভাৱিকিয়া।  
তিনটেই এখন সাধাৰণতৰ। অষ্ট্ৰিয়াৰ প্ৰধান বিলক  
খৰোৱা কলক; সমাজবাদী Socialist; ও ভাৱাৰ বিলক  
দলৰ (Anti-socialist) মখে। অষ্ট্ৰিয়াৰ মালে এট  
নিৰে বাৰা হাৰা উপক্ৰম হু; কিন্তু পৰ্য্যবেশী অষ্ট্ৰিয়া  
পাৰ্শ্বস্থাপন কৰেন। বাৰ্টুৰ প্ৰেসিডেণ্ট ভাৱাৰ হাৰ্টনাম



বিলাখ  
(পৰেৱ)

হাৰি  
(ভাৱাৰী)

আমেদ ওগ  
(আৰুখানিহা)

পৰত্যাগ কৰাৰ প্ৰাৰ লগে নিৰ্দ্ধাৰিত ক'ৱেৱেন ভাৱ-  
মিক্ৰাল্প। ভাৱাৰীতে বিশেষ খোলাৰাল নাই। ভাৱ  
সেখানে প্ৰাৰ লুগেৱেন। প্ৰধান মন্ত্ৰী বেগ্লেদ পাসন  
কাৰ্য্য চাললৈ চালোৱেন। কিন্তু লীমানা নিৰে কমনিহাৰ  
লগে একটা মনোমালিন্য় এখনৰ মেটে নি ২৮শে  
অষ্টোৱৰ ভেৰোৱোভাৱিকিয়া সাধাৰণ-তৰেৰ দলম ভাৱাৰ  
উৎসব হ'ৱে গেৱে। এই উপলক্ষে বাৰ্টনামৰ প্ৰেসিডেণ্ট  
অধ্যাপক সাধাৰীক লক্ষ্যকাৰী বক্তৃতা দিৱেৱেন; বাৰ্ট  
অনেক কাৰ্শ্বণ আছে; হুইজন কাৰ্শ্বণ মন্ত্ৰীৰ প্ৰহণ কৰেৱেন  
একত্ৰ তিনি মন্ত্ৰীৰ প্ৰাকণ কৰেৱেন। বাৰাৰ পতিৰ বৰেৱেন





কতিপূর্ব পর্যন্ত সমস্ত করবার জন্য একটি মন্ত্রিত্ব কমিটি নিযুক্ত হ'য়েছে।

## ফ্রান্স

গ্রীষ্ম মাসে ফরাসী দেশে সাধারণ নির্বাচন হ'য়ে গেছে। 'মসিও' পর্ষদকারের দল অধিক সাংখ্যিক প্রতিনিধি পেয়েছে এবং তিনি প্রধান মন্ত্রীর গ্রন্থন করেছেন। 'মসিও' পর্ষদকারে ফরাসী দেশের আর্থিক সুব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনগর দল নিজে তাঁর সঙ্গে জাংশনীয় মনোমালিন্য চলেছে। নভেম্বর মাসে মধ্যপরিষদে মত-বিভেদে চরমায় 'মসিও' পর্ষদকারে পদত্যাগ করবেন কিন্তু পেনিডেন্টের অত্যাচারে তাঁকেই মাঝে নতুন মধ্যপরিষদ গঠন করতে হ'লে। কিন্তু বছরের শেষেই মাঝের মধ্যপরিষদে কলঙ্ক উপস্থিত হ'য়েছে—বাবু-পরিষদের সমস্তপদের যেমন বুদ্ধির পাত্রা নিকে। প্রধানতা বড় পরচেন তিনিই (comatly attar)। হুগো পাঁচশো প্রতিনিধি নিয়ে শালন চালাতে হয়—উপের নির্বাচন বার্ষিক সবই অর্থব্যয় চাই। তারপর প্রতিনিধিরা তো শরের খেয়ে বনের ঘোষ তাড়াতে পারেন না। কালের প্রায় সব বেনেই বাবু-পরিষদের সমস্তপদের যেমন আছে। ফরাসী সমস্তপদ তাঁদের বর্তমান বেতনে সন্তুষ্ট ন'ন, বেশী চান। 'মসিও' পর্ষদকারে এর বিরোধ। কয়েকটি বালাহরণ চলেছে। আলোচ্যবর্গে লর্ড ফ্রান্সে দার উটলিয়ার টারেল ফরাসী দেশে জিটিন বাজুত নিযুক্ত হয়েছেন।

## জার্মানী

বিগত মহাসময়ের পাতনামা গোড়া তন চিন্‌ডেন-বার্গ এখন জাংশনীয় রাষ্ট্রনগর বা প্রেসিডেন্ট। নন নির্বাচনে সোভিয়েটদের ভয়ানক করেছে এবং ছাত্র সুলাতের নেতৃত্ব মধ্যপরিষদ গঠিত হ'য়েছে। আন্তর্জাতিক সমস্যার জাংশনীয় প্রধান ডাট কণা আছে, রাষ্ট্রনগর হ'তে নিবেদী সৈন্য অপরূপ এবং কতিপূর্বের দাবী সম্বন্ধে সুব্যবস্থা। চ'টো নিজেই কথা চলেছে। রাষ্ট্রনগরকে ইংরেজ সৈন্য যে আর বাধা উচিত নয় এ কথা ইংরেজরাও অনেক বলেছে।

## ইটালী

ইটালীতে সুসোলিনার একাধিপত্য অগ্রসরিত হয়ে চলেছে। নানাভাবে মাঝে মাঝে বিস্তার দেখা দেয়, মাঝের কঠোর পাঠের ফলে সব খেয়ে দার। আলোচ্যবর্গে শিশি, সারজিনিয়া ও বেনলুসে বিস্তার দেখা দিয়েছিল এবং মিলানে রাজ্যকে বোমা ফেল চরম। কণার নিফল চটো হ'য়েছিল। সুসোলিনা তাঁর দলের পরিষদ Fascist Grand Councilকে মাইন ক'রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলুপ্ত। ফরাসী ও সুবর্ষের সঙ্গে ইটালীর সমতা স্থাপিত হয়েছে।

## স্পেন ও পর্তুগাল

বিশ বৎসরের মধ্যে স্পেনে প্রথম রাজত্ব উত্থিত হয়েছে। দুলাই মাসে স্পেনের রাজা ইংলণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন। বিখ্যাত সামরিক ইবনেজ জাংশনীয় মাসে প্রাণত্যাগ করেছেন। ২২শে দুলাই পর্তুগালের লিদবেন বিস্তার হ'য়েছিল; কিন্তু ইন্ডীয় পারি স্থাপিত হয়েছে। পর্তুগাল সাধারণতঃ (Portugal Republic) ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

## ক্যান্টনভিয়া

নরওয়ে ও সুইডেন দু'টি পাশাপাশি রাজ্য। এ দুটি রাজ্য ইউরোপীয় রাজনীতির মধ্যে বিশেষ আসে না। মার্ক মাসে নরওয়েতে ইবনেজের শত বার্ষিক উৎসব হ'য়ে গেছে। ছুন মাসে সুইডেনের লোকেরা তাঁদের রাজ্য পট্টাভাসনে সপ্তর্ষি করোবন করেছে।

## সোভিয়েট রাশিয়া

রাশিয়া ইউরোপের মধ্যে এক হস্তময় স্থান হ'য়ে গাড়ি হয়েছে। ইউরোপীয় প্রায় সব দেশের সঙ্গেই এদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়েছে। এ দেশ সম্বন্ধে সঠিক খবরও অনেক সময় পাওয়া স্কটিন। বিগত মহাসময়ের পর রাশিয়া গণতন্ত্র

হ'য়েছে এবং সেখানে প্রমোদীরাই পেয়েছে অধিনায়কত্ব।  
কিন্তু প্রবোধ প্রদান নারক লেনিনের মৃত্যুর পর কর্তৃপক্ষের  
মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হ'য়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান অধিপতি বা  
প্রেসিডেন্ট—রাইকক। কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত অধিপতি  
পেট্রোভের হোদীস। হোদীসের সঙ্গে মতবিশেষ ভগ্নের উদ্ভি-  
ত্তিক তুলীয়াই নিবোধিত করা হয়েছে। জুলাই ও আগস্ট  
মাসে রাশিয়ার ভাষণ রাষ্ট্রের অভাব হয়; পর্যবেক্ষণ  
বিশেষ ক্ষেত্র আড়াই লক্ষ টন মস্ত এনে দেশবাসীর প্রাণ  
রক্ষা করেন। জাপান, পোল্যান্ড, গ্রীস ও জার্মানির সঙ্গে  
বাণিজ্য সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়েছে; কিন্তু রাশিয়া পারস্য,  
আফগানিস্তান ও চীনদেশে ব্যবসা চালাবার বিশেষ  
চেষ্টা করছে।

### গ্রীস

উপস্থাপিত ক্রীমকল ও ভেদু মহামারীতে গ্রীস দেশ  
বিলম্বিত হয়ে গেছে। ডেনিয়েলস পুনরায় ক্ষমতা পেয়ে  
প্রধান মন্ত্রী হ'য়েছেন। ডেনিয়েলস প্যানথালোসের  
অধিনায়কত্ব শেষ হ'য়েছে। ডেনিয়েলস ইটালী, যুগোস্লাভি,  
ও বালখিয়াসের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছে।

### ভূতত্ত্ব ও আফগানিস্তান

মুস্তাফা কামালের অধিনায়কত্ব ভূতত্ত্ব ইউরোপীয়  
লভ্যতার অগ্রপ্রাণিত হচ্ছে। ইংরেজি শোষণ লভ্য  
অবতরণে; মেরুদেশের অবতরণ ভাগ করছে হয়েছে।  
নুতন আইন হ'য়েছে যে, আত্মীয় অক্ষরের পরিবর্তে  
লক্ষ্যকেই ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার করতে হবে। বেশ  
লক্ষ্য শোষণ আবার বর্ণ পরিচয় করছে। আফগানিস্তানের  
সামান্য যে মাসে ভূতত্ত্ব এসেছিলেন, তার ফলে ২০শে মে  
ভূতত্ত্ব ও আফগানিস্তানের এক লক্ষ্যপত্র লিখি হ'য়েছে। ২০শে  
মে ভূতত্ত্ব ইটালীর সঙ্গে এক লক্ষ্যপত্র স্বাক্ষর করেছে।

আফগানিস্তানের সামান্য ভূতত্ত্বের মত পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-  
নাতি প্রবর্তনের ফলে ভূতত্ত্ব বিমোহিত আত্মতা হয়েছে।  
বাগা ও রাশি পাশ্চাত্যদেশে ভ্রমণ করে ভূতত্ত্বের অগ্রদূত  
বাগা নিজের দেশে করতে চাইছিলেন।

### আমেরিকা

মুক্তাভার (United States) প্রধান ঘটনা প্রেসিডেন্ট  
নির্বাচন। প্রতি চার বৎসরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়।  
Electoral College-এর সমাপণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন  
করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এই Electoral  
College-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন নিয়ে। কারণ যে দল  
এই নির্বাচনে ভরসা করে ভোটদেয় তাই মনোনীত বাজি  
প্রেসিডেন্ট হয়। এই Electoral College-এর নির্বাচনের  
সময়েই বলাইশেষ উচ্চাভেদ প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করিয়া  
রাখেন। এবার হ'লেন পদপ্রাপ্তি ছিলেন—মিঃ হুভার ও  
মিঃ স্মিথ। ৮ই নভেম্বর নির্বাচনের ফলে মিঃ হুভার  
ভরসা করেছেন। কেলোগ পাক্ষের কথা পূর্বে বলা  
হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকাতে বলিভিয়া ও পারাগুয়েতে  
গীমানা নিয়ে লক্ষ্য আরম্ভ হয়, কিন্তু Pan-American  
Conference-এর চেষ্টা পাশ্চিৎ স্থগিত হয়েছে।

### ইজিপ্ত

প্রধান ঘটনা প্রধান মন্ত্রী ও ব্রিটিশ হাইকমিশনারের  
বাদান্তবাদ। ব্যবস্থা পরিষদ Public "Assemblies-  
Bill" মালোচনা করছিলেন; হাইকমিশনার লউ লয়েড  
সাবধান করেছিলেন যে ও আইন পাশ করলে ভাগ হবে।  
প্রধান মন্ত্রী মুস্তাফা সালাহ হাফিজ ওয়া আফগান ক'রে  
অবশেষে আইন প্রত্যাহার করলেন। মন্ত্রী সালাহ  
সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না দেখে ১৯শে জুলাই মিশর রাজ্য  
ব্যবস্থা পরিষদ থেকে বিদায়িত এবং গিল বন্সরের ভাগ  
নির্বাচন স্থগিত রেখেছেন।

### চীন ও জাপান

দাখান প্রচলিতব্যয়ের পর চীনদেশে পাশ্চিৎ আগ্রাসক  
দেখা দিয়েছে। ১৯২২ সালে চীন সাধারণতঃ হয়।  
১৯১৮ সালে স্থান-কিকটিয়ের মৃত্যুর পর নান্দাং  
প্রদূষের ভাগ অবিরত বিবাদ চলছিল। শেষকালে চীন  
প্রাণ জুটো ভাগ হ'য়ে গেল। শিকিই একমল অধিষ্ঠান  
ক'রে উত্তর চীনে প্রভূত্ব করতে লাগলেন তাই দক্ষিণ  
চীনের অধিপতি শেল নানকিং-এর জাতীয় দলের হাতে।



জগতে অমর করেছে সেই গুরুত্ব দৌড়ানো, কেবল দুইজনের মত নয়, সমস্ত জীবন ধরে সে ভোগ করবে। কেবল এই নয়ত জীবনে কেন, অমর্যাবতীর নিম্নজ্ঞানবোধে তারা অনন্তকাল ধরে পরস্পরের প্রেম সুখ পান করবে। এত সুখের, এত মধুর, এত পবিত্র এই প্রেম—এর কি কখনও দুঃখ হ'তে পারে! বসন্তের মধুর হাওয়া তরল প্রাণে কি মন্থন মায়া-লোকের সৃষ্টি করে!

জীবনের সেই অতীত বসন্তে সুখখো এই ছবিটি তার বাজিত জনকে উপহার দিয়েছিল। মঙ্গল দিনের উপহার। কত আশা, কত আনন্দে তাদের স্মোহিত তরল প্রাণ গুটি সেদিন উবেলিত হয়েছিল। সে কি তার প্রেমাম্পদকে জুলিয়েটের মত ভালবাসে না! তার প্রেমাম্পদকে কি বোমিওর মত তার মস্ত সমস্ত বাধা, সমস্ত বিরোধের অতিক্রম করতে প্রস্তুত নয়! তাদের অন্তঃশব্দেই প্রেমের সুখের একটি অতিবাচক মনে ক'রেই সুখের ছবিটি তার বাজিত জনকে উপহার দিয়েছিল। আর তার প্রণয়ী! সে তার প্রণয়িনীর মনের কথা বুঝেছিল ব'লেই ছবিটিকে স্থান দিয়েছিল দেয়ালের ঠিক মাঝখানে; তার প্রণয়িনী যেমন বিরাম করে তার প্রণয়ের ঠিক মাঝখানে, তার অন্তরেও অন্তরতম বেগে! প্রেমের চিরন্তন স্রোতি!

এসের মল্ল মাকত প্রেমের দৌড়ানির আর করে না। বিজয়ের কাকলী জবর-তরোতে প্রেমের বাগিনী আর জাগায় না। প্রেমিকের হৃদয় আলো প্রেমিকার মনে অমর্যাবতীর মর্যাদিকার সৃষ্টি আর করে না।

বাজিত এমন বসন্তে আভাস। যে বসন্ত তাদের অন্তরে বহেছে, এ তারই বেন বিখ্যাতের প্রত্যক্ষ। যে কাল মেঘ তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করেছে, আকাশের মেঘ তারই বেন কৌণ প্রতিচ্ছবি! জীবন চক্রের নিম্নম আবর্তন!

কথা কেউ কবিতা সঙ্গে বসেছে না। বলবার কিছু নেই। নিম্ন নিম্ন মান ব'লে তারা ভাবছে। ভাববার বিষয় বসেই আছে। প্রেমিক ভাবছে এক জনের কথা, এই সেদিন

যার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে; প্রেমিকা ভাবছে আর এক জনের কথা, কণিক মেয়ের উত্তেজনার সাকে সে পরিচয় করেছে, তার বর্তমান জীবন সঙ্গীর মত। বৈচিত্র্যময় বর্তমানকে ছেড়ে একজন গোপন পৃষ্ঠে চটি-ছিল কুংলিকা সমাজের আলোয় উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের দিকে, যার একজন আশ্রয় আর অশ্রোভের পৃষ্ঠে চাইছিল কল্পনার ইঙ্গিত দিয়ে মোড়া হৃদয় অতীতের স্রোত। মেয়ের প্রাণিমা: কল্পার জ্বালা, প্রকৃতির কল্পন বৃক্ষময় বর্তমানকে হৃদয়ের পক্ষেই অতিরিক্ত করে তুলেছিল।

দীর্ঘা, পৌঁ ক'রে শুধু এল। সঙ্গে সঙ্গে মৃণময় আরিশাত আরম্ভ হ'ল। চকিতের পৃষ্ঠে তখনই বাইরের দিকে চাইলে। শানিতা অপ্রিয়ের অংশে বাণিজ্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা বাগটা এসে, কালো, কৃষ্ণকে একটা হাঁড়াকাকের মতের ভেতর উড়িয়ে আনলে। তখনই তাকে দেখে শিরে উঠলো।

সীত চকিত বিষমটি অতীত বসন্তের ব'লে-তারা গোময় জুলিয়েটের সেই ছবিটির উপর দিয়ে বসেছে। কণ একটা বক্ষুর উপর নিভর ক'রে শেউ তুলেছিল—তারের প্রণয় জীবনেরই মত। হাঁড়াকাকের ওর ম'লক্ষু সহজে পারলে না। কণাৎ ক'রে ছবিটি মেয়ের উপর এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমের কীট ভেঙ্গে পড়তে হ'লে গেল।

বিজয়ের কণে তরুণ ব'লে "ভালই হ'ল। ছবির নয় কামুকতা আমার প্রাণে মাথাৎ করতে। ওটা বিধার হ'ল। ভালই হ'ল।"

এতে পাড়িত, পকেট থেকে খাড়া বার ক'রে, তার জীবনসঙ্গী বাতকণে বললে, "না, আর দেওয়া করা যায় না। ছটার appointment, দুটো ছটা হ'তে চললো।" সঙ্গে সঙ্গে সে কণ ত্যাগ করতে উদ্বৃত্ত হ'ল।

তার সেই প্রেমোত্তপ্ত সৃষ্টির উপর অমর একটি সৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তরুণ বাগিনীর গিরে পাড়ালো—প্রকৃতির বিলাপ ভ্রমতে,

## লগ্নশেষ

### শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী

আলিঙ্গনা কিরে। তবু মাথা,  
একদিন আঁসিবে নিশ্চয়—  
তোমাতে আঁসিবে টানি' আমার পিপাসা ;  
অন্তরেব এ দৃঢ়-প্রত্যয়  
সত্য নহ' ?

হায়, চলে যায়  
যৌবনের মধ্যমিরা—চায় !  
তখন বৈকালী জাগে গগনের গায়ে  
শান্ত পেরুমায় ;  
জাঁঝ মোর পথ-পানে চরে,  
চায় প্রিয়া, তোমারি আশায় ।

এসেছিলে প্রথম যৌবনে—  
তখনো আকাশ রাঙা প্রোভাত-গুণনে ;  
মোর ফুল-কনে  
তখনো রয়েছে মাথা নির্দিয়ার ওল ;  
পথ-ভলে দিলে কৃন্দ-দল ;  
তখন কা' প্রিয়া,  
কি দিহা তুমিবে তোমা পাইনি ভাবিয়া—  
যাকা তুমি চাও ভাষা সারিহাই নিতে,—  
তুমিই পেঁথেছি মংলা বসিমা নিভৃত  
কবিতা-কুহুমরাগি আঁচরি' আঁচরি,—  
তোমাতে আঁড়াল করি' সন্নিহেছি কাব্য-পতননী ,  
তোমাতে তুমিবে বানি' তোমাতে বিম্বরি' বায়ে বায়ে  
তুমিলাছি মোত করনায়ে ।

তুমি চাওনাট মোর কুহুম-সত্তার,  
আমাতে চেয়েছ তুমি—বে চাওতে পেঁথেছি মংলা  
চায় বানি!  
পরিতে চেয়েছ তুমি সেই ছাত করি' কণ্ঠ-কার—  
দুখ ফুটে' বলনি সে কথা,—  
অভিমানে কিরে' পেছ বৃকে নায়ে বাধা ।

আজি মনে হয়,  
মৃগাহীন জাযা-কথা মিথ্যা স্বপ্নময়,—  
প্রাণতীন করনার রক্তান কাঁহুব ;  
রক্তে মাংসে গড়া এই মর্ত্যের মাত্রণ,  
স্বপ্ন নয়—এ যে চায়ে দত্তা প্রাণ, সত্য ভাগরণ,  
দুঃখ নয়—কুল কিছু পরশিতে, কহিতে ধারণ,  
দ্বিভে, নিভে :—চায়,  
মাত্রণ যে মাত্রণের চায় !

কিরে' এস, কিরে' এস প্রিয়া,—  
এবার তোমাতে দিব মোর দেহ, মোর লগ্ন তিয়া ;  
এবার তোমাতে নিব আঁকড়ি' কাঁড়িয়া  
একান্ত আমার করি' ।  
উজাড়ি' আঁচরি'—  
এবার মাত্রণ হ'য়ে সুখোদগি রহিব ভাগিনা,—  
তুমি হবে মাত্রণের প্রিয়া !





सहायक न्यायमहानिवासी १३३४

তীব্রতার কাছে আসিয়া কখন সার্থক্য করিতা বলিল। অবশ্যই অন্যভাবে উদ্ধারণ করিলেন এম। উপদেশ গ্রহণ করিলেন। গিহিবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহিত এই উপদেশ গ্রহণ করিল। ইহার পর সে গিহিবা-  
 তাই এখন প্রায় উপস্থিত হইল। ১০০ বৎসরকালের বর্ষা বৃষ্টিতে আসিয়া  
 জাম্বিত পারিবে, গিহিবায় বৃষ্টিবৎসকে হাই কহা হইল নাট। বাকের  
 স্তম্ভে বাহাতে স্বপ্ন করিতে না পারে যেহেতু একজন প্রতীতি মিলুক  
 করিয়া নদ্যাবধি তাকি রাখিত। ফেলার হুইটাইল। জাহা বিলিয়ার  
 তাহার বৃষ্টির কথা অবশ্যই দৃষ্টকৃত্য করিল। বৃষ্টি বৃষ্টিতেই নার  
 না করিয়া কহা করিত। জাহা জাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।  
 'অন্যকালব্যতীত কখন কিছুই বুজতেই প্রস্তাব দেথিতে পাইবে—ইহার  
 দিল তাহাযতের একম অনুগ্রহের উপযোগ। ইহারে প্রস্তাব বিলিয়ার  
 করিয়া কিছু। এ কথা অন্যজন করিতে সমর্থ হইতাইল যে, ফেলার  
 গিহিবা-হস্তের তাহারে কখন হই, কীটের দ্বারা কুক দূর এবং অশেষ  
 মাংস-বর্জিত হইয়া তাহারে হাউজটি পড়িত। দান। এমন নাথিক।  
 কেও গিহিবায় এই বৃষ্টিতেই দেখিতে পারে কখন হুইটাইল। জাহা  
 যোগ্য। কতই গিহিবা-হস্তের, এই বৃষ্টিতেই দেখিতে যে অশেষ  
 করিতে তাহারে মাটের বৃষ্টি অশেষ বৃষ্টি নান করিতে হইবে।  
 মনোবাহের সৌন্দর্য যে কত ভগবতী তাহারেই বাধ্য। প্রাণপ্রাণ উপস্থিত  
 কহাইবার বৃত্ত একম দান। অবশ্যই ইটাইল। (বৎসরকাল : ১  
 ৫৭, পৃ : ১৫৩-১৫৪)

পাখী। পানী ছিল বাগানের বায়বমিতা। তাহার এক স্তম্ভিত নন্দী  
 ছিল লহরী সুখ। জাহাজ সে যখন স্রোতগামী ছিল এন- তাহার  
 পাখড় ঘাড়ী ছিল। \* \* \*

କୁଳମ୍ବ । ବାହାଂଶୀରେ ଏକଟି ଦୁଧରୀ ବୌଦ୍ଧେକ ବାସ କରିଥାନ୍ତି । ତାହାର  
 ନାମ ଗୁଳମ୍ବ । ବାହାଂଶୀରୁ ଖୁମ୍ବର ବାଟ ତାହାଙ୍କର ମାତୃଗଣ ମହାତ୍ମୀ  
 ହିମ ଏବଂ ଏକ ପାତ୍ରର ଶ୍ରୀୟା ତାହାଙ୍କେଷୁ ସର୍ବମ୍ ହୁଏ । ମିତ୍ର  
 ହୁଅନ୍ତି । \* \* \*

কানীর কোঁক নদী বহাভয়ের পরিণামে লক্ষ্যকানীর জন্ম হয়। সে  
জন্মের বারোখিনী রূপ, পূর্বে বর্ণিতরূপে গ্রহণ করে। হীকী গ্রহেরের রূপ  
সে জ্যোতিষকারে বর্ণন করিতে অনর্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু পাশ্বে মহাভারত  
আছে জানিতে পারি। তাৎপৰ্য্যে তাৎপৰ্য্যে নিম্নোক্ত শ্লোক গ্রহণ করে।  
তৎপাশ্বে বৃহৎ একজন কানী এবঃ উপরুক্ত কিত্বশ্চ শাখায়াঃ। তাহ্যাক উপ-  
সংগাঃ। বিহারে লনা কিত্বশ্চৈঃ প্রতি আবেগঃ কথিতাঃ।  
লক্ষ্যে লক্ষ্যে এবে প্রাপ্যশ্চৈঃ প্রতি কিত্বশ্চৈঃ। এতৎ সত্যকালং যদেবৈ  
ভাষ্যে বর্ষঃ। এতৎপূর্বে জ্ঞান লাভ করিয়া বর্ষঃ প্রাপ্ত হইত।  
(বৈরাগ্য আশ্রম, পৃঃ ১০-১১)।

মহাশয় ব্রাহ্মমোহন বাপু ৬ শতাব্দী

গত যাব মাসের 'প্রবাসী'তে প্রীত অমৃতলাল  
 গুপ্ত মহাশয় উল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বাসবোহিন গ্রাম ৰে ব্ৰহ্মজ্ঞান-প্রদীপক শিববোৰ মহাপুত্ৰ বলিৰ। মনে  
কৰিছাৰিয়েনেৰ এৰ। যে ধৰ্মেৰ বিপ্লৱেৰ জন্তু সৰুপু জীবন উৎসৰ্গ কৰিছা-  
ছিলেৰ, সেই বিপ্লৱজীৱি ধৰ্মেৰ এক দাত ধৰম পূৰ্ণ হুইৰাংক : ০০০

[illegible]

















স্বাভাবিকভাবেই যেই শিক্ষার ক্ষমতা বর্ধিত হইবে— এমন সিদ্ধান্তই এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন নব্যযুগের গুরুত্ব কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। যেই ভাবেই হউক— চীনের 'Young East' পত্রিকা কয়েকটি যেই প্রস্তাব দিবে—

"We can take for our model—Tagore, the great master of the East and today the greatest poet of the world. এই প্রস্তাব দিবে। প্রাচীন নব্যযুগের গুরুত্ব কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। যেই ভাবেই হউক— চীনের 'Young East' পত্রিকা কয়েকটি যেই প্রস্তাব দিবে—

কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন নব্যযুগের গুরুত্ব কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। যেই ভাবেই হউক— চীনের 'Young East' পত্রিকা কয়েকটি যেই প্রস্তাব দিবে—

কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন নব্যযুগের গুরুত্ব কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। যেই ভাবেই হউক— চীনের 'Young East' পত্রিকা কয়েকটি যেই প্রস্তাব দিবে—

কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন নব্যযুগের গুরুত্ব কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। যেই ভাবেই হউক— চীনের 'Young East' পত্রিকা কয়েকটি যেই প্রস্তাব দিবে—

কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন নব্যযুগের গুরুত্ব কবিগণের হস্তে প্রাপ্ত হইবে। যেই ভাবেই হউক— চীনের 'Young East' পত্রিকা কয়েকটি যেই প্রস্তাব দিবে—



## বনভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

যত রাগের ভিটে হইতে পানিকটা ঘুরে বনভোজন হইতেছিল। সেখানে সতীসতের ভাবে কতকটা স্থান চাওয়া ছুটিয়া, গোবর জল সেপিয়া শুদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহারই উপর বিভিন্ন পংক্তিতে পত্রাবিক শ্রীলোক, বালক বালিকা, পরমানন্দে কলাহার করিতেছে। প্রচলিত প্রাণহুগারে ব্রাহ্মণকল্যাণ শ্রীভাষের টিড়ে দইএর অংশ অস্ত্রান্ত ভাতের পংক্তিতে বস্টন করিয়া দিলেন; শ্রীভাষাও শ্রীভাষের দল মূল লেখন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মহিলালোক উপহার দিলেন। বাছায়া ছুঁৎমার্শের সংহারে অস্পৃহ, শ্রীভাষাও অপর কাহারও হাফকৎ আদিকার উৎসবে উচ্চ জাতীয়লোক উপহার বিবাহের মত কিছু সামগ্রী আনাহায়া রাখিয়াছিলেন; এখন সে সকল বিতরণ করাইয়া আনন্দ লাভ করিলেন। আছার বন্ধ, জাতি কুঁচ, পরিচিত অপরিচিত, সকলের মধ্যে এইরূপ উপহারের আদান প্রদানের পর, শিশুগণের আনন্দকলরব ও অপর সকলের হাতপ্রদত্ততার মধ্যে বনভোজন আরম্ভ হইল। মহা গভীর বান ভাকার মত আঙ্গ বাগেলিত্তার দ্বিরম্মাণ লুকাপুসে বন্দরগোলে যেন একটা উৎসবের উৎসাহ ও আনন্দের বজা বেগা মিলাছিল। কেবল লম্বাসত বালক বালিকাগণের কথা নহে, বয়স্ক এবং বয়ীর্দীপনের মধ্যেও যেন একটা প্রাণস্পর্শের স্পৃহা এবং বাহ্যমূলত সুখরতা ভাষাধের চিরভোগ্য হুংগে দক্ষিততা ও অব্যাহার মধ্যেও আদম্য পড়িয়াছিল। আক এই অবসরের দিনে কুবক মজুতবিগের গৃহিণী, কত্যা এবং তস্ত গৃহের মহিলা, বালিকা একত্রে পাধার করিতে করিতে বাস্তবিকই মজুতব করিতেছিল যে তাহারা সকলেই যেন একই পত্রিবাতের, একই লম্বাসের অন্তর্ভুক্ত!

বনভোজন শেষ হইল। তখনও একটু বেলা ছিল কিন্তু লুকার সময় কিরিবার নিয়ম। সেহেতু বহুপ এবং প্রকৃতির ইনিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হাতমূল খুটবার পর লুকাবাতের লম্বাসের উপর মকলিগ করিয়া বসিলেন। নাগোজ্ঞল জলহাশি অস্ত্রগমনোন্মুখ রবির রক্তিম কিরণ-সম্পাতে যেখানে শোভার টল টল করিতেছিল, তাহার দরিকটে বসিয়া বিভার বস্ত্রগলগাপত লুকা হস্তাবিধি ভাটাকে মিলায়া করিল, “সতি সই, ওর সঙ্গে তোরা বিয়ে?”

“হু! তোরা যেমন আভিগুবি কথা?”

“ছি তাই, আমার কাছে লুকোনা!”

কাষেত গিয়া ই কথা বলিছিলেন।

বিভা যেন আগ্রহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, “কখন?” এমন সময়ে অতুলের মা আসিয়া বলিল, “বিভা! সনি, তুমি পাহা না? বাসুন মা যে ডাকডাকি করছেন। বাড়ী কিমতে হবে না?”

৪

বনভোজনের খাত্তাগুলি চলিয়া গেলে তেমন্ত ভাটাবর ভাটাবতে কি লিখিয়া রাখিতেছিল। এই সময়ে এক একজন “তোমরা সব কোথায় গো?” বলিয়া হাঁকিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া, সেখানে পরিচিত কার্যকেও না দেখিয়া তেমন্তকে বলিল, “এরা সব কোথায় গেল? তুমি কে বাপু?”

“এরা বনভোজনে গেছেন। আমি—”

বাস্তবমুখ আসন্তক বলিয়া উঠিল, “আমি পাড়তে পারছি না তোমাকেই বলে দাও, বিভার বিয়ের সম্বন্ধ, মামোজার বাবু নিজেই দেখতে এসেছেন। এরা এলেন তাঁকে কাছারি থেকে নিয়ে আসছি।”

অমরকণ পেরেই সোমুগের সঙ্গে মামলিক পক্ষান্তিতে বনভোজনের খাত্তাগুলির প্রভাববস্তন পুড়িত হইল। বিভাকে একা শৌছিতে দেখিয়া তেমন্ত মিলায়া করিল, “বি মা?”





একটু চানিয়া সে উত্তর করিল, “বাঁটের পাড়িরে  
আছেন। আগে আমি মাগোটা আসিব, তারপর তিনি  
মস্তর ব'লে ঘরে ঢুকবেন।”

“কি মস্তর?”

“বনভোজনের মস্তর। আপনি জানেন না?”

“না। কি?”

বিভা দুটি একটু নীচু করিয়া আগনার মনে একটু  
চানিয়া বলিল, “কি মা এলে শুন্তে পাবেন।”

ঘরের ভিতর প্রসাশক্তি আসিয়া, ঘরে একটা ফুল কাটা  
রাগিয়া বিভা নীচ বাজাইল। তারার কি মা ঘরের নীচে  
আসিয়া ভজাঙ্গা করিলেন, “ঘরে কেন মাগো?”

হেমন্তকুমারি সম্মুখে থাকার প্রসঙ্গ উত্তর দিতে  
বিভার ঘন ক্রমেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। সে কোন  
রকমে বলিল, “গিরা গেছেন বনভোজনে, লবাই আছেন  
ভাগো।”

“ভাগে কেন কাটা?”

আগের চেরেও দুপুরে উত্তর হইল, “গিরা গেছেন  
ভোজনে, ছেলেরা লোভার তঁটা।”

হেমন্ত বিভার দিকে চাহিয়া চানিয়া বলিল, “এই বুঝি  
তোমার মস্তর!” তারার পর বাহুন-মাঝে কোতুকের  
সজিত ভিজাঙ্গা করিল, “ছেলেরা কোথায় কি’মা?” তিনি  
দিক্‌জেরের হাসি চানিয়া উত্তর করিলেন, “কেন এই যে  
তুমি গরু, বাবা।” হেমন্তকুমারের ভাগে অনেকদিন  
যেহেতু এমন ঘরের লাবোব ভোটে নাই। তাই তারার  
সেহতুকার্ত মন ইহাতে পাহতুপ হইয়া গেল। হেমন্ত-  
কুমারের প্রসন্ন ভাবিয়া বিভার উজ্জল চুটি ঘরের ভিতর  
হইতে তারার বুকের উপর পড়িয়াছিল, এবং খিমার  
উত্তর ভাবিয়া তারার চোঁটের উপর দিয়া একটা গানির বেথা  
উল্লেখমাত্রই মিলাইয়া গেল।

এই সময়ে বাহির হইতে রামেশ্বর চক্রবর্তী “এরা  
কিহে?” বলিয়া উঠানে আসিয়া ধাঁড়াইল। বাহুন-মা  
ভাগ্যকে “এস দাদা” বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেই সে বলিল,  
“ভিহিতে গিরে চট্টাৎ শুন্দুন সতীশ বাবু, বোয় ঐকিহাঙ্গ  
হুয়েছে। বিভার ঘিরে কথা—”

“বল কত?”

“চলিলের ভিতর।

দেখতে এসেছেন।”

“না ব'লে ক'হে—”

“মাগাবি গুচপুত্র। মন বড় ব্যাগান হুয়েছে। ঐর  
ভুতকার্য শেষ করে ফেলেতে চান। বিভার রূপান্তরের কথা  
জনে রোক মাউড়ে ব'লে উঠলেন “চল হে দুখুগো, আমিই  
একবার তোমাদের গ্রামের পরমাঙ্গল্যটিকে চাকুর  
ক'রে আসি—”

“আর লকের ছেলে গিলে আছে?”

“প্রথম লকের চুই ঘের, তারার মস্তর বাড়ি। দ্বিতীয়  
লকের বড় মেয়েটিরও বিয়ে হ'রে গেছে। সেও মস্তর  
বাড়িতেই থাকে তবে দস্তারিত প্রসব হ'তে এসেছে। চুটি  
মাত্র ছেলে—”

“আমার বড় ইচ্ছে নহ।”

রামেশ্বর চক্রবর্তী বলিয়া উঠিল, “মবাক কবলে যে  
ঠাকুর মা। তুমি কী বরে ঘিরে দিতে চাও তুমি? বিঘর  
আগর, ব্যাগান বড়, লক মরাই, তুমি পুত্র, মাঙ্গল্যমান  
গুগোর। আমাদের ত আর ছাপা নাই, এমিকে যে বিভার  
বরণ চাকপুত্রা গিরিহে পেছে। বিয়ে হ'লে এতদিন ছেলের  
মা—” হেমন্তকুমারের চুটি চট্টাৎ একবার বিভার লক্ষ্য-ও  
বুঝায় বিবর্ন বুকের উপর পড়িয়াই ক্রোধে তাঁক হইয়া বস্তার  
বুকের উপর স্থাপিত হইল। বাহুন-মাও ঐর ঘরে বলিয়া  
উঠিলেন, “রামেশ্বর, তোমার মত বাথানে কাজ নাই।”  
একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হেমন্তর দিকে চাহিয়া বলিলেন,  
“বাহুনের ঘরের দূর্দ। মা পরমতীর কাছে ঘিরেও  
কখনও—”

রামেশ্বরও ব্যাগ বলিয়া উঠিল। কিছু আর বাথাই  
হউক—ভালদারী সেহেতায় বহুকাল নতলানবীণি করিয়া  
ময়ের ভাব চাপিয়া রাখা যে কার্যোচ্চয়ের একটু উপায়  
তাহা সে ভাল কুরিয়াই শিখিয়া লইয়াছিল। স্ততঃ  
অমাবিকভাবে হাসিয়া বলিল, “আমাদেরই ত দার, এক  
আমাদেরই সেখিয়া ভাবিয়া পাত্র আন্তে হবে। তবে  
মবস্ত তোমার পছন্দ না হ'লে ত আর হবে না। পাত্র ত

যহা উপস্থিত, একবার বিতাঃ  
দেখ—।”

বানুন-মা'র রাগ ধড়ের মাঝেই মত মালিয়া উঠিয়াই  
নিভিয়া গিয়াছিল, পূর্ণাপর বিবচনা করিয়া তিনি একটা দীর্ঘ  
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তাই হবে।” তাঁহার চকুর  
ফোপে হস্তাশ্রমের দারিত্র্যের যে অক্ষয় ভাসিয়া উঠিতেছিল,  
তাঁহা হস্ত কাটারও লক্ষ্য হইল না, কিন্তু তাঁহার দার্দ্র্যবাদের  
কাতরতা বিভা ও হেমন্ত চইকনেই বেশ বৃদ্ধিতে পারিল।

প্রায়েশর বলিল, “তবে নিরে আসি।”

“সত্যোবাসু যে যাহা এসেছেন তাঁহুর মা। কাল  
তোরেই তাঁকে বেতে হবে, একটা ঘর-মালাগনি মোক্ষদমা  
কুলেছে। কালের গোঁক, তাঁর কি একদণ্ডও বদলে থাকবার  
সময় আছে? আর, পায়েও বলে প্রভুত দেখা—”

তুচ্ছ ব্রাহ্মণী অস্তমন্ত চইয়া কি ভাবিতেছিলেন।  
প্রায়েশর বলিল, “তবে বাই?”

“আচ্ছা।”

প্রায়েশর ঘরবার কাছ হইতেই কি ভাবিয়া কিরিয়া আসিয়া  
বলিল, “একবারো ফরসা কাপড় পরিয়ে চুলটা একটু বেঁধে দেবে  
রাখতে হবে ত। হাজার হ'ক, বলেকনে দেখা—” ৩২০  
অস্ত্রের তিতর বিতার উপরনতর পড়তে সে বলিয়া উঠিল, “না।  
কিছুই করতে হবে না। এই যে চুল চুল বেশ বাধা আছে।”

যাইতে যাইতে সে পদত বলিতে পারিল, “ছুঁড়ি যেন  
পড়া! একবার এ তিনি বড়ো যেটাকে পড়তে পারবে,  
গোমতাসিরি একটা—হা মা কাশি, কস্তারিদি, মনোবালা  
পূর্ণ করিস, যেউ!”

৬

বিভা তাঁহার দিকে হস্ত চাতিয়াই দেখে নাই। আর  
যখন সে লোকটা তাঁহার চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া  
তাঁহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, “একবার এই  
দিকে চাও ত”, তখন লক্ষ্য তুলি বা তাঁদের কস্তাই হউক  
অথবা চিত্রাভাষ শ্রীমতার দাওয়ের কস্তাই হউক সে  
সেই অসভ্য সৌড়টার মুখের উপর এমন করিয়া চাতিতে  
পারে নাই, বাধাতে তাঁহার স্মৃতিত পড়নের লক্ষ্য ধারণা  
করিতে পারিত। কিন্তু দেখানকার মগর লক্ষ্যেই

মনে চইয়াছিল, য সমস্ত জীবনকালের মধ্যে এমন বীভৎস  
কদাকার লোক তাঁহার কখনও দেখে নাই। বয়স  
তাঁহার চল্লিশ কি পাঁচ, বর্ণ তাঁহার তামাটে কি ক্রান্ত, চুল  
এবং গোঁক তাঁহার স্বাভাবিক কটা কি কলস-মাখান,  
সে লক্ষ্য যুগতাবে পরবেষণ করার কথা তাঁহারও  
মনে হয় নাই। বরিত নিঃসঙ্গার প্রকার উপর আদম্য  
দহাত্তি করিয়াই হউক, বা তাল ভালিয়ারি মিথ্য।  
মোক্ষদমা ও মাঝা স্তম্ভ করিবার কুপ্রতিভে মস্তান্তর  
ফলেই হউক, তাঁহার মুখের উপর এমন একটা সন্তানী  
চাপ পড়িয়া গিয়াছিল যে তাঁহার উপর দৃষ্টি পড়িলেই  
দর্শকের সমস্ত মনটা একমাত্র সেই অসভ্যার উপরই  
কেন্দ্রীভূত চইয়া পড়িত। যাহা হউক বাস্তবীর অরক্ষণ  
কস্তার অভ্যাসবাদের অনেক ফলে পাছের তপের কথা  
ভাবিয়া দেখিয়াই অঙ্গুর হই না, তা আবার হাপের  
পক্ষী। এ ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য প্রতিবেদী আশ্চর্য্য করিতে  
আসিয়াছিলেন তাঁহারা, বিবেচন: বীভৎস সেই পাতনামা  
মাগোলাবতির একটু নির্যাস ভোবামুত করিতে  
আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একবারো বনিয়া উঠিলেন, “বাসু  
যদি বেঠিক পড়ল করিয়া পায়ে যান যেন তাঁহা হইলে  
ব্রাহ্মণ কস্তার জাতি বন্ধা হয় ও তাঁহার তুচ্ছ প্রমোজনই  
নিশ্চিতপ্রকার লহিত পরলোকে গমন করিতে পারেন।”

এবং এই অমুরোষের উত্তর যখন বাণী পরম উদারতার  
দহিত অমত নাই জানাইলেন, তখন সমাগত লক্ষ্যের  
মুক্তকর্মে তাঁহারই মস্তকের প্রবণা করিতে তুলিলেন না।  
কিন্তু বানুন-মা বিভার এই তাঁহা বরটিকে দেখিয়া কি  
মনে করিলেন তাঁহা তাঁহার মুখের বিপর্য্যতার উপর  
যাহারই লক্ষ্য হইল সেই বৃদ্ধিতে পারিল। অস্ত্রের মা  
মুখ ছুটিয়া বলিয়া উঠিল, “বাঁটার মড়া বে মা!”

কিন্তু সূর্য্যনের মেঘে হ'লে লম্বালে যে গঙ্গাবীরও  
গলার মালা দিতে হয়, অস্ত্রের মা!। ব্রাহ্মণী ৩২০  
অক্ষকার বসটার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বিভার  
সই স্তম্ভাবিও মস্তান্তর হইতে তাঁহার তাঁহা সত্যটিকে  
দেখিতেছিল। কিন্তু সেই লোকটার সঙ্গে যে বিভার  
বিবাহরূপ একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটিতে পারে, তাঁহা সে



কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না। তাই যখন অতুলের মা ডাঙা করিয়া বলিল, “এখন সোণার প্রতিমা! বাবরের গলায় কি না দুক্তার চার!” তখন জুতাখিনী বলিয়া উঠিল, “তুমি কোলেছ পুত্রি! তা কি কখন হয়, ত্রি বুড়ো চোখোড়ের সঙ্গে সইএর বিয়ে! মেবেছ ওর গৌল কুলো, যেন খাত্তার কাস্তি!”

অতুলের মা বলিল, “তাই বুঝি বা বিভার অমেটে আছে। আজ চার বছর ধরে কত ব্যাগা থেকে দেখতে আসছে। এমন পতীর হত মেয়ে, কিন্তু তোমাদের কাছেই বাসুন ভাতের মুখে আগুন! টাক: আর টাকা। টাকা নিয়ে ধরে দেবে!”

জুতাখিনী বলিল, “তবে যে গুন্ডামুন্ড, সইএর সঙ্গে এত কাল যে এসেছে তার সঙ্গে লম্বা হয়েছে।”

অতুলের মা বলিল, “বরষে ছোট হবে না ত? কাত কুল মেলে ত আমি একবার ওই চোলেটিকে বলি যে মেয়েটাকে পাঠাও।”

হেমন্ত এট সময়ে ভিতরে আসতে তাহাদের কথা বকু চুপা খেল। সে উঠান হইতে ঘরের নিকে চাহিয়া বলিল, “উনি বলছেন ওর মত করেছে, তা হ’লে দিন তিন একটা কির হবে খেলো—”। অতুলের ঘরের ভিতর কি-মা বিভাকে দলোক দিয়া আঁকাড়াইয়া বসিয়াছিলেন; যেন কে তাহার সঙ্গের কাড়িয়া লটতে আসিয়াছে। একটু যেন বিকৃত হয়ে তিনি বলিলেন, “ওহেত বল কথা পড়ে হবে।”

হেমন্তের সঙ্গে সঙ্গেই রামেশ্বর চক্রবর্তী ও তাঁহার পরে বস: তাঁরা ধর মহাশয় বাটার ভিতর ঢুকিয়াছিলেন। রামেশ্বর বলিল, “কথাত শাফাই হয়ে গেল। যখন বাবু কথা দিয়েছেন, তখন এমিকের পুত্রি: ওদিকে মেলেও তার নক চকু হবে না। আমাদের বিভা যে এত বড় ভাগ্যমানি—” তিনি বিভাকে উদ্ধার করিবার আগে ঘাচাই করিতে আনিয়াছিলেন সেই মাননীয় ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিলেন, “আমার খোলাপুণি কথা, কি বল তে রামেশ্বর। কি-মার ত অভিজাতক নেই, আমাদেরই সব ক’রে নিতে হবে ত। তা গহনা দিয়ে

আমি মুড়ে নিয়ে যাব, আর তা ঠেরিয়ে আছে। অতুলজীবা কতটা ভাত্রমাসে বাপবেমা, কাল পুত্র ঠাত্রকে দেখিরে দিনটির করে কোলতে হবে আর এই রপ্তার মতোই শুভকায়—” হেমন্তসুন্দরের চুটীটা হঠাৎ সুখো-পাখোড়ের মুখের উপর পড়ায় তিনি কি ভাবিয়া কথাতো শেষ করিবার আগেই রামেশ্বরকে ভিজায়া করিলেন—এ ছোকরাটি কে যে রামেশ্বর?”

রামেশ্বর বলিল, “বাসুন মাথের পতর বাড়ীর লোক, নিকট আখ্যায়। ছোলেটি বড় ভাল, লজ্জিহয়।”

দুতীল সুখোপাখ্যার পরদিনই শুভকায়ের দিনটির করিয়া শাত্রাশককে সংবাদ দিবেন/ বলিয়া ও নির্নিয়মে বাচাতে শুভকায়ী সম্পদ ইহ ভাঙার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইবার আশাস দিয়া চলিয়া যাইবার সময় হেমন্তকে আশায়িত করিয়া বলিলেন—“বলি, কিছু কাজ ক’র কর তে ছোকরা, না বেকার তবু?”

হেমন্ত কি রকম একটু হাসিয়া বেকার আছে বলায় দুতীল সুখোপাখ্যার পরম উদারতার সহিত বলিয়া উঠিলেন, “হাতের লেখা কেমন? হাতটা একটু শাকও। কুটুম হতে চলে, আমাকেই ত আবার ঢাকরির গল্পে ধবে।”

রামেশ্বর বলিল “তা নয়ত কি। কত লোকের আপনি আর ক’রে দিচ্ছেন।”

বাহিরে যাঠিতে যাঠিতে দুতীল সুখোপাখ্যার বলিল, “ছোঁড়াটার চাউনিটা ভাল নয়। কতদিন এখানে আছে?” রামেশ্বর বলিল, “থাকে না। মাঝে মাঝে যায় আসে।” দুতীল একরকম আপন মনেই বলিয়া উঠিল, “আঙনের কাছে যি। চাপকাপ্তিত ব’লে গেছেন—যাই হ’ক, এখন একবার মন্তরটা প’ড়ে নিই!”

৭

কয়দিন পরিয়া আকাশটা মেঘে ভরিয়া আছে; কেহ সূর্য্যবেদের মুখ দেখিতে পার নাই। অবিপ্রান্ত বর্ষণে ভাঙাখাট অলম্ব, ব্যাধির ব্যধিরে পা বাড়াইবার উপায় নাই। এমনই রূপোপের স্রাভিতে সূর্য্যপুত্রের বিভাবের সেই গুহে একটা শোকাক্ত নাটকের অভিনয় প্রায় শেষ হইয়া আনিতেছিল।

দুতীল সুখোপাখ্যারের কথার নকচকু হয় নাই। পর দিনই যিনি যির কথিয়া কিছু মিটার ও একলোড়া সোনার

বাণ্য বিধা দেশেরিক পাঠ্যবিভাগ। বিতার তি-মা সমস্ত  
যাচিতা অনিয় চিত্তাণ কটাতাণ্ড ঐশ্য্য কত্বা বিব  
কতিতে শায়েন নাই। ঐশ্য্য মনোর-এই মাঙ্গর অবস্থা  
বৈশ্ব রামেশ্বরের সঙ্গে ত্র্যবাচিকা আশিয়া উপস্থিত হইল,  
তখন তাহাকে দিয়াইতে পারিলেন না। অনুরোধে মা  
পত্নীত পতিবৈশ্বাশ্য্য আশ্রয় হইয়া গেল, বাবুন-মা  
এ কতিতেছেন কি? পত্নীত বৃদ্ধবোধে সঙ্গে বিভার বিবাহের  
কাথাতা শকাপাতিক বিব হইয়া গেল হটে, কিন্তু ইকাণ্ড হির  
হইল যে, বিবাহ অগ্রগতায় মাগের পূর্বে কিত্বইতে হইতে  
পারে না। রামেশ্বর অনেক কুলশাহিন, বৃদ্ধাশাখার নিজে  
হই তিন তিন আশ্রয়, অনেক অগ্রবোধে করিল,—কিন্তু মল  
কিত্বই হইল না। বাবুন মা অটল বহিরা বলিলেন, “ভত  
দিন বাতীত তিন কত্বাশান কতিতে পারিলেন না।”

সেই ৬৬মিন আশ্রয়ার আশ্রয় কিত্ব বড় একটা গুহটনা  
পতিয়া গেল। কতিমিনের অবস্থায় বর্ণে কতিতে মল  
কতিয়া গিয়া চাষ আশ্রয়ার কতি হইতেছিল, নকরাপিত  
মানগাঙ্গুলি চাতিয়া পতিয়া বাইবার সন্তাননা হইয়াছিল,  
সুতরাং বাতীতে গুহিটা দরিদ্রা বার তাহার কত্ব লকলেট  
আগ্রাহিত হইয়া পতিয়াছিল। তাহার উপর সেহিন ছিল  
মাগলগাঙ্গার বার্ষিক কাশান। কত আশ্রয়জন হইয়াছে, বলির  
পাঠা কেনা হইয়াছে, মাগ-সিহিরের কত্বা লাড় পাড়ি  
এবং তাহারের বণ কত্বাশের ভূয়ে কাপড় কেনা হইয়াছে,  
গামাশ্বর হইতে আগত কুট্টর বন্ধুতে মাগলগাঙ্গা ভরিয়া  
পিয়াছে, কিত্ব বৃষ্টি বা মল পত্ব হইয়া যায়। কাশানের  
আশ্রয় রামিতে একটি কমিটি বহিরাছিল। আকাশ পরিবার  
কোন লক্ষ্য নাট দেখিয়া একত্বকম হত্যাণ হইয়া কমিটি হির  
কতিতে গতিতেছিল যে শুণ্ড মনগাঙ্গুলাটি কোন রকমে  
দাখিয়া ফেলিয়া মনগাঙ্গর যে মল উৎসব আশ্রয়ের  
আশ্রয়জন হইয়াছিল তাহা এভাবে বড় রাধা ছাড়া আর  
উপায়ান্তর নাই। কমিটি এই লিখ্যে মাগলগাঙ্গার ছেলে  
মেরগুণিত সন্তানবতই নিরানক হইয়া পড়িল, কিত্ব তাহারের  
মাতা তদনি প্রকৃতি বহুতা স্নোকেহোও কম মনঃকুর হইল  
না। তাহারের একটা লক্ষ্য-লতা বহিল, এবং তাহা হইতে  
নবীর সন্দেহের দ্বীপ উপর তাহ বেগুয়া হইল যে, সে যেন

সুখবদের সন্দেহীতা বের যে আশ্রয়জন হইতে যে বার্ষিক  
লগ চলিয়া আশ্রিতেছে তাহার কোন অগ্রগতের সন্নি করিয়া  
ছেলেপুলের অনিষ্ট করিবার তাহারের কোন অধিকার  
নাই। আর বৃষ্টি বাতীতে বামিয়া বাণ তাহার কত্ব বাবুন  
মার নিকটে গিয়া বাটি খোড়াইবার তারও মাগ-সিহির  
উপর পতিয়াছিল। আর লকলে বাবুন-মা বাটি পতিয়া  
আশ্রয়ার সময় পা পিছলাইয়া পতিয়া বাতীতে তাহার  
দী তাতে কতিত কাছটা একবারে পতিয়া যায়

সময়মিন ডাকা তাহারের বহুতা দুগিয়া লকলে পর হইতে  
বাবুন-মা একত্বকম হোতাগত হইয়া পতিয়াছিলেন। মাত্রে  
মাত্রে জান কিহিয়া আশ্রিতেছিল হটে, কিত্ব অধিকাংশ  
সময়ই বিকারপ্রাণ অবস্থায় দুগ পতিতেছিলেন। গোমের  
কৈলাশ লর্দার কি একটা লতা বামিয়া অনেক ভাগ্য  
ছোড়া লাতাগা বিধাছে বলিয়া পাতিলাভ করিয়াছিল।  
এ ক্ষেত্রেও তাহাকে ডাকা হইয়াছিল; কিত্ব তাহার  
পতিয়া কোন মল লাড় হই নাই। বাবুন-মার তাহারের  
বহুতা কমণ্ড; বাড়িতে পাশিল এবং লকলে পর  
একবারে অগ্রগতের হইয়া উঠিল। গোমে বা নিকট কোন  
গামাশ্বর চিকিৎসা শাস্ত্র অভিজ্ঞ তেমন কোন বাড়ি  
ছিলেন না। তবে সেটামিন লকলে সময় মেডিকেল  
কলেজের একজন লক্ষ্য বৈদ্য ছাত্র—বিভার লটএর  
বয়—সুতাপুরে বহুতালয়ে আশ্রয়ছিল। সে ডাকা হইতে  
দেখিয়া বলিল, “এটা একবারে কেটে ফেলতে হবে।”  
কিত্ব কাটে কে? লক্ষ্যমার আশ্রয় বলিল, “অনেক দেবি  
হইবে দেখে, আরও দেবি হইবে ভাবেন কোনর আশ্রয়  
পাবে না।” অশ্রিতশর বহুতের ভিত্তি বিধবার ভাবেন  
কত দীটার ভাবন লইয়া কত্বা তিনি কখনই পতিতে হই  
না। তাহার আশ্রয় লকলের মধ্যেও হইত অনেক হই না।  
সে বাতী হইক, প্রাচীনার একমাত্র আশ্রয় বাসিকাটি  
তাহার অতি পুরাতন প্রাণ-পাণীটি বাতীতে সেই গুণ-বর  
ফেল-শিকিট চাতিয়া চলিয়া না যায়, তাহার কত্ব মাগ  
লর্দার লাড় করিতে উত্তর হইয়া উঠিল। কিত্ব প্রাণ  
জনকে বহিরা রাখিবার আগ্রহ অগ্রগতের মানবের অশ্রয়  
প্রচুর পরিমাণে দিলেও তাহাকে দরিদ্রা আশ্রয়ার শাস্ত্র



একবারেই ঘেন্না না। সুতরাং বিচার এটো অগ্রাহ্য যে  
নিফল চেষ্টে পাঠে, তাছাড়া বিজ্ঞানের বিষয় কিছুই ছিল না।  
তথাপি প্রিয়জনকে বাচাইবার সুসঙ্গতকার্যে চেষ্টা করার যে  
এতদূর তপ্তি এবং ভবিষ্যৎ প্রবোধ আছে, তাহা লাভ  
কিনবার চক্রে অর্পণের অত্যাধিক একান্ত অবগত করিয়া  
সেনিতেছিল।

এই বিশেষ প্রতিবেদী অনেক অল্প এবং সাধারণ লোক  
সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই বনিয়াদী জ্ঞান পরিবারের  
অভ্যন্তরীণ কীর্ষি এবং বাস্তু-মায়ার স্বর্গীয় শ্রেণ্যকায়িতা  
এবং অসামান্যতা তাঁহাকে সে গ্রামে সজলনপ্রিয় করিয়া  
গোঁড়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতিবেদীপনের  
মধ্যে পুরুষ এমন কেহ ছিল না যে কখনও না কখনও  
বাস্তু-মায়ার নিষ্ঠা কথায় অস্বাভাবিক না চেষ্টা করে, এমন  
জননী কেহ ছিল না। তাঁহার যোগ্যত্ব স্থান কখনও  
না কখনও তাঁহার নিপুল পুত্রবাহ এবং অস্বাভাবিক 'কলশঙ্কার'  
উপস্থিত না চেষ্টা করে, এমন পশুটি কেহ ছিল না। তাঁহার  
পদব্যাধি তাঁহার উপস্থিতিতে তাঁহার স্নিগ্ধ প্রবোধে  
উপশান্ত না চেষ্টা করে। সেই বীজসীমার কাণ্ডের এবং  
কথার ছাপ সেই সুত প্রায় শব্দীয় কবিতার ভাবনের চিত্রবৃত্ত  
অবশিষ্ট লোক কর্তৃক তাঁহাদের উপর যে কতকাল পরিত্যা  
শীতল আনিতেছিল, তাহা তাঁহাদের মধ্যে সঙ্গোপসংগে

বহুভাষ্যে ব্যক্তিগত ঠিক করিয়া বলিবার সাধ্য ছিল না।  
কত মনস্তাত্ত্বিক কলম যে তিনি স্নিগ্ধ হাসিতে উড়াইয়া  
দিয়াছেন, কত দাত্তবিশেষ, কত মনোজন-বাস্তবের স্বাভা-  
বিক যে তাঁহার স্নিগ্ধ অলঙ্কারে মিটিয়া গিয়াছে, কত  
সামাজিক কুৎসা যে তাঁহার স্নিগ্ধের দৃঢ়তার প্রান্তরে  
পাতিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কেউই করিতে  
পারিত না। সে গ্রামের অনেকের সঙ্গে তাঁহাদের  
মতামতের পীড়ন ও গ্রামাধিপত্যের মতামতের প্রবৃত্ত-বৃত্তির  
সংলগ্ন চক্রে যেমন অস্বাভাবিক চেষ্টা, বাস্তু-মায়ার  
ভিত্তিগত প্রায় দেউড়ি। শিথিল বৃত্তিতে পারিতেছিল  
না যে তাঁহাদের উপস্থিতি উৎসাহিত জগতিয়া আনিতে, কে  
নব বস্তু ভাবিতে পারিতেছিল না যে তাঁহাদের শিথিল  
বাঁহীর স্পর্শের করিবার স্নিগ্ধ অলঙ্কারে অস্বাভাবিক চিত্র-  
বিদ্যার উপস্থিতি করিতেছেন, বাস্তু-বিদ্যার বিদ্যার কবি  
চেষ্টিতেছিল না যে তাঁহাদের মনোজন প্রায় উপস্থিতির,  
মতামত-সামান্যের, পুণ্যবাহির শক্তিধার। বস্তুবাহির  
শক্তির পশ্চিমা বিকল চক্রে আনিতে। কথ  
সেখানে এমন লোকও ছিল নাহা। তাঁহার অস্বাভাবিক  
পদবাহির শক্তিধার স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিয়া এক একবার  
মনে করিতেছিল কত বা তাঁহার অতিরিক্ত নিবন্ধিত বাস্তুনা।

( ক্রমশঃ )



# সমস্যা-সাহিত্য

## আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

শ্রীঅশীলচন্দ্র মিত্র

৪

### রোমান্টিক মেঘ তপাল্প

সত্যের সূচিত কার্যাবলি করে মাগবে যে মন, যেটা সূচি  
তাড়কে ওটি বিক দিগা দেখা সূচিতে পারে। একটিকে  
দে মন চিত্রের একটা প্রচণ্ড ভাগিবে বিভাচিত্র চরিত্র  
সত্যের অতুলনানে বাপুত চরিত্র—অন্ত তাকার কলনা ও  
আবেগ; অতুলনিক দে মন প্রদত্ত বা উপলব্ধ তপাল্পের  
নিচায় করিতে বলে, অস্ত তাকার পূর্ব ঋতুর সূচি। মনের  
এই প্রথম প্রগতি নাম দেওয়া বাচিতে পারে রোমান্টিক,  
দ্বিতীয়টির ক্লাসিক। এই ওটি প্রগতির একটা পরস্পর  
সম্পর্কের জন্য কি সাহিত্যের, কি বিজ্ঞানের ক্ষম-বিবর্তনের  
মধ্যে ঘেঁষে পড়িয়া যায়। কোনো মনে সাহিত্যেই,—  
এই ওটি প্রগতির মধ্যে একটির একবারে বিন্যাস করনা।  
দশমট আমরা বলি কোনো বিশেষ মণের সাহিত্যে  
রোমান্টিক মেঘ অবদান চাইল, বা ক্লাসিক মেঘের অবদান  
চাইল, তখন আমরা এ কথা বলিতে চাই না, যে রোমান্টিক  
প্রগতির বিন্যাস চাইল,—বা ক্লাসিক প্রগতির বিন্যাস চাইল,  
তখন আমরা বলিতে চাই শুধু এই যে সেই সত্যের মন  
মাগ-গকনের ক্ষম অবলম্বন করিয়াছিল যে প্রবাহী,—তাকা  
রোমান্টিক-প্রগতি চাইল, বা ক্লাসিক-প্রগতি চাইল, সেই  
প্রবাহী পথিভাগ করিল।

উল্লেখ্য পড়ানার করণী রোমান্টিক সাহিত্যের উপর  
দিগা যে বৈজ্ঞানিক অতুলনায় বলা বহিয়া গেল, তাড়কে  
রোমান্টিক মেঘ বিন্যাস চর নাট। সেই বর্জ্য একটা কথা  
সমস্যা চাইল যে, বিশ্বকাক্ষের যে বিন্যাস দিয়া—তাকার

বৈজ্ঞানিক মেঘ অবদান,—তাকার সূচিও তেমনি মনব।  
মাগবে মন চাই, সেই মনব মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত  
করিতে, তাকার উপর আপনাব শাসনময় কাঁচির কথিতে,  
তাকাকে আপনাব সত্যের সত্যের নিষেধ করিতে। কি  
চরিত্রাবলম্বন: এই উল্লেখ বর্জ্যতার বিচিত্র বিন্যাস উপর  
মাগবে চাপাইয়া দিতে চাই যে একটা নিশ্চিন্ত মনব  
plenty of the material প্রচণ্ড অবদান সূচি উপর  
কাঁচির কথিতে চাই যে কতকগুলি সত্য মনবাবলম্বন  
দেখা নিষেধ—তাকার কলনা চরিত্র সেই সত্যের অতুলন,  
মাগবে শার শুধু তাকার একটা সাববর্জ্য চরিত্র মাগ।  
তাই এমনকি বৈজ্ঞানিক মন লেখকও,—তাকার বিজ্ঞানের  
উপর বিশ্বাস ছিল অসম,—দিনি মাগবন করণী লেখক তখন  
মতলকে শিক্ষা দিয়া 'আগিয়াছিলে,—এমন কিছু বিশ্বাস  
করিত না,—বাচিতে তোমার অতুলন সূচি প্রত্যেক মনব  
দশর উপর নিচর করিয়া মাগ না দিবে,—সেই বৈজ্ঞানিক মন  
লেখকও লক্ষ্যে নিষেধে প্রমাণ করিয়া দিবে,—এমন  
সামর্থ্য মাগবে নাট। তবে চরিত্র এ অতুলনো কিছু অসম  
দিয়া না। কেননা, কে জানে যে সত্য চরিত্রের না? কে  
করিতা কে বলিতে পারে যে আমরা যে যে দিগি, আমরা  
যে কলম্বার,—তাকারেরও একটি সূচিও নাট? এ  
দশর,—সবট প্রমাণ। যদি কোনো কিছু সত্য থাকে,—এ  
চরিত্র যে সত্য দশর বহিয়াছে সেই সত্য পড়িয়া,—তাকার  
মনে লক্ষ্যের কোনো দান নাট,—অতুলন জানে  
দাকার উপরবলম্বন দেওয়া এই সাধনানি সত্য করিয়াছে,



স্বপ্নম পরিচালিত যাত্রা। এই স্বপ্নের প্রতিরোধে বড়  
আবামের অবসৃত্তি বাধা বরণ করিয়া লইয়াছে। সব  
চেয়ে ভাল যোগের কোনওকম সূচি হক না করিয়া শুধু  
ভালবাসিয়া যাওয়া। সাধের গোপন মত,—সে ত বিজ্ঞান  
নয়, ভালবাসা।

এমন করিয়া বোমাউজ্জ্বের স্বপ্ন পুনরায় দীর্ঘে দীর্ঘে  
সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দারিত্র্য-মহালাচনার যে সমস্ত  
নিয়ম টিকিযো পতিব্রত চটাইছিল,—ভাণ্ডার বিক্রেতে জুল  
ল'মেত্ব খাড়া করিলেন,—একটি হার নিয়ম,—ভাণ্ডা  
লোকের ভালোলাগা, মঙ্গলগা। ইহা বাস্তব সমালোচনার  
মত কোনো নিয়ম নাই বাধ্যকিতে পারে না। যে  
কোনো নিয়মট প্রতিক্রিয়া কর না কেন, ভাণ্ডার প্রমাণের  
কর চাই আর নিয়ম, আবার সেগুলি প্রমাণের মত চাই  
অন্ততঃ নিয়ম,—এমন করিয়াই নিয়মের উপর নিয়ম  
বাস্তবত করিয়া যাবার চেয়ে আশ-প্রবন্ধনা আর কিছুই  
হইতে পারে না। এই বাস্তবত নিয়মগুলিও আবার  
পদবন্দ্যের সমস্তরক পদ বিনষ্ট করিতে থাকে, ইহার শেষ  
কোথায়? তার দীর্ঘে প্রাণের ভালো লাগা মন লাগা,—এই ত  
চরম নিয়ম,—ইহা আর কোনো প্রমাণের অলঙ্কার রাখ না।  
ফাঁদে বাগলেন,—বস্ত্র আকৃতি-বিকৃতি কর না কেন,—  
পুরুষ সত্যকথা এই যে আমরা আমাদের অস্ত্রের পতীর  
পাতিবে আসিতে পারি না। এ প্রবে বস বড়ই হটক না  
কেন,—ইহা আমাদের আবার পরিত্যাগ লইতে হইবে।  
কোথাও এমন কোনো নিষ্ঠুরতা নাই, যাহা মাতৃবের অস্ত্রের  
সীমানা ভাঙাইয়া দাঁততে পারে। এমন জ্ঞান-সমৃদ্ধ অশ্রু  
সমস্ত-সম্পূর্ণ অবিবাহিত যাব গোপন মত কোথাও কখনো  
যেখা যায় নাই। এমন-কি প্রচুর মানসিক স্বাধীন-সম্পদে  
সমৃদ্ধিলাগী যে মন, আনন্দ-ভিষ্মোলে তরবারিত হইয়া অবাধ-  
কীলার জ্ঞান-সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখার বিস্তরণ করিয়াছে,—  
সে-মনেরও এই অবিবাহিত-বাস হইতে মুক্তি ছিল না। 'হুসি  
ম' ভরম যে জ্ঞান-স্বত্ব প্রচার করিয়াছিলেন—ভাণ্ডার  
মধ্যেও ছিল এই অবিবাহিতের স্বর। আনন্দ চাই,—ওইই  
বলিয়াছিলেন,—কোনো আনন্দ চাই। আনন্দ লুপ্তা লগা  
পেত্যাক মাতৃবেরও আশনার প্রতি একটা অবশ্য কর্তব্য।

কপরের কোনো চিন্তাধর্মই প্রতি আদর্শ হইয়া থাকে। চলিবে  
না,—সুখের ক্রিমিসেই উপরে উঠিতে হইবে,—এবং সেই  
উচ্চাঙ্গ হইতে,—স্বর্গবাণী অবজার ভিতর হইতেও সুখলেন  
উপর উচ্চাঙ্গ হইতে হইবে গেম। কীদনটা বহুই হটক না  
কেন,—একটা চক্কর তার মতে, বেশ বহন করিবার যোগ্য।  
আশেপাশের সমস্ত জিনিস মানিবার ও ব্রতবার প্রাণের মধ্যে  
বসতি বিরাট ব্যর্থতা পাকুক না কেন,—সে ব্যর্থতার মধ্যেও  
একটা মতিমা আছে,—এবং সেই মতিমা আমাদের সমস্ত  
অব্যবহার উপরে তুলিয়া ধবে।

এই ত আবার সেই বোমাউজ্জ্বের আশ প্রতিভা ও  
আশ্বিনিতরতা! কিন্তু এখন আর ইহার মধ্যে ছিল না ভিত্তি  
ভগ্নের আমলের সেই আশার প্রতীক ধারণা,—এখন ইহার  
মধ্যে ছিল অবিবাহিতের অধিকার। এমন-কি, প্রথম আনন্দ-  
স্ত্রের মধ্যেও যে সেই অবিবাহিত,—ইহার বেদনা নাইবে  
কোথা? এই অবিবাহিতের বেদনা বুকে বহন করিয়া পুনঃ-  
সম্মুখিত বোমাউজ্জ্ব এখন মাতৃবের চিত্র-সত্যের অধিকার  
পথে পথে পুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ বেশ গৃহ-ভাড়া  
বোমাউজ্জ্ব; তাই ইহার চারিদিক উজ্জ্বল; ইহার মধ্যে  
ছিল নানা প্রতিক্রিয়া-শক্তি—ছিল শান্তবতার শব্দ, অস্ত্রের  
মধ্যে সত্যলক্ষ্যানে ব্যর্থতা? মনবেদনা, মৈত্র্যের সহিত  
যব এবং সর্বোপরি একটা সুকণ্ঠ মানবতা (humanism)।  
এই বস্ত্রের একজন বিশেষ উদ্দেশ্যোপা লেখক ছিলেন  
পিয়ের লোটি। তিনি বর্ণনা করিতেন যাহা বহুকে সত্যক  
করিয়াছিলেন,—ভাণ্ডার; যাহা বস্ত্রে কল্পনা করিতেন,—  
গাফা নয়। কিন্তু ব্যস্তবতার এই সংঘের মধ্যেও ভাণ্ডার  
কল্পনা মতাজির মতের নাগাল পাইবার প্রচলন পরিত্যাগ  
করে নাই। এবং এই প্রচলনের ফলে তিনি পাটখাছিলেন  
কেবল একটা নিরাশ-ক্লান্ত আশ্রয়-বোধের নিরাশ্রয়  
অবলম্ব নির্জনতা। তিনি বলিতেন,—কিছুই প্রতি আমাদের  
আহা নাই,—কোনো মাতৃবের প্রতিও না,—কোনো বস্ত্র  
প্রতিও না। কামাঙ্কেও আমি ভালবাসি না,—আমার না  
আছে আশা, না আছে বিশ্বাস। ভাণ্ডার আর সমস্ত লেখার  
মধ্যেই ছিল,—অস্ত্রের উপর এমন একটা মনোভাৱী কল্পনা।  
—কিন্তু তবুও তাঁর লেখার মধ্যে মধ্যে এমন একটা মানবতার

আত্মসংযম, নাহা এই নিরাশা-রিত্তি আমিসংযমের  
বেদনারও অনেক উপরে। তিনি বিশ্বাস করিতেন,—  
অন্ততঃ মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিতেন—যে,  
এই বিশ্বাসভেদে মধ্যে নিহিত আছে,—একটা বিরাট  
অনন্ত অশ্রুতলক্ষ্য,—যাহা মানুষের প্রতি,—এমন-কি লক্ষ-  
্যভেদে প্রতি মানুষের দগা ও সমবেদনার ভিতর  
দিয়া নিহত আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে  
থাকে।

বিজ্ঞানের অসামর্থ্য-অস্থিরে অস্তরে উপলব্ধি করিবার  
দলে লজ্জা মানুষের এই যে রোমাটিক আমিসংযমের  
আলিয়াছিল,—ইহার মধ্যে নিহিত ছিল এমন একটা বেদনা।  
—যে, রোমাটিক সাহিত্যে তাহার হারাণো সিংহাসনটি  
পুনরুদ্ধার করিতে আর পারিল না। এমন-কি নিটুকের  
যে অতিমানবতাবাদ তখন করাসী অজ্ঞান-সাহিত্যে প্রচুর  
প্রচলন লাভ করিয়াছিল,—তাৎপাতিও এই বেদনার অবদান  
হইল না। যদিও মানুষের এই আমিসংযমের যে বিরোধ করিলেন,  
তাহার ফলে নিটুকের অতিমানবকত্ব লাগিয়া গেল না,—  
লাগিয়া গেল এমন একটা-প্রকল, বেদনা-হত সন্দেহ-বিক্ষিপ্ত  
'আমি,'—যাহার একমাত্র আলংকরণ বিধের সেই অস্বাভাবিক  
অনন্ত অশ্রুতলক্ষ্য,—যে অশ্রুতলক্ষ্য মানুষের অশ্রুতলক্ষ্যের  
কল্পনের মধ্যে নিহত আত্ম-প্রকাশ করে। এইখানেই  
মানব। এই অনন্ত অশ্রুতলক্ষ্যের মানুষের চরম-তত্ত্বোক্তে  
বহুত হইয়া উঠে এমন একটা মহান আদর্শের স্রব যে,  
সেই স্রবের এই আমিসংযমের সংশ্লেষে আমাদের সমস্ত চরম-তত্ত্ব-  
মতের আশ্রয় একটা মহান আদর্শের স্পষ্ট অস্তিত্ব  
করি। এইখানেই আমাদের বেদনার,—আমাদের সেই  
মহাশয়ী অগৌরবের পার্থক্যতা, কারণ এই অগৌরবই  
আমাদের 'আমিসংযম' বাহিরে, সমস্ত সন্দেহের বাহিরে  
ঠেলিয়া দেয় একটা আদর্শের দিকে। এমন কিরিয়াই  
আমাদের আমিসংযম আমরা হারাণো সিংহাসনটি  
বহুত, একটা অশ্রুতলক্ষ্যের মধ্যে,—আমাদের সমস্তের  
মধ্যে,—বিশ্বমানবের বহা-মিলনের মধ্যে,—অর্থাৎ এমন  
একটা চিরস্থায়ী দশায় মধ্যে,—আমাদের এই আমিসংযম  
• যাহার একমাত্রানি কণিকার বিকাশ হইত।

এমন কিরিয়। মানুষের এই আমিসংযমের ফলে  
রোমাটিকের পুনঃপুনঃ অশ্রুতলক্ষ্যের উপর  
আবার একটা আঘাত লাগিল,—বৈজ্ঞানিক বস্তুত্বের  
দিক দিয়া নয়,—সাহিত্য সাধারণত্বের দিক দিয়া।  
নিটুকের অতিমানবতাবাদেরও পূর্ণ চেষ্টা-ইতিহাসিক  
এক-দার্শনিকদের চিন্তা এই সাধারণত্বের দিকে অগ্রসর  
হইতেছিল। তাহার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন  
মনোবা সঙ্গের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সমাজ  
সংগঠিত, সংরক্ষিত ও পরিচালিত হয়,—একদা মনে করা  
হল। সমাজ-সংগঠনের যে শক্তি,—তাঁহা সমাজের  
অস্বাভাবিক,—তাঁহার উৎস সৃষ্টিত মানবের সেই সব  
জীবন-ধারণের সঙ্গ-সাধারণ প্রকৃতি,—যাহা জীবনের সমাজের  
সহিত মানসিহা চলিতে চলিতে সামাজিক প্রসাধনক  
করিতে থাকে। যত বড় সমাজগোষ্ঠী হউনা না কেন,—  
কোনো ব্যক্তি-বিশেষেরই সাধ্য নাই,—ইচ্ছামত এই সমাজ  
প্রথা উৎপাদিত বা পরিবর্তিত করেন। এই সব প্রথা  
সমাজের অস্বাভাবিক প্রয়োজন-অনুযায়ী আপনাদের সংরক্ষণ  
করিয়া চলে। বস্তু এই সমাজকে বান্ধা দিয়া ব্যক্তি-  
বিশেষের কোনো অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তি-বিশেষের যে সত্তা,  
তাঁহা উপলব্ধ-সত্তা বা অস্বাভাবিকের একটা সুবিধা-জনক  
এক প্রয়োজনীয় করণ হইত। তাই প্রমাণ এই যে সমাজ  
হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া গিয়া আপনাকে সমাজ  
আপনাকে পার্থক্যতার সত্তা-কেন্দ্রে লাইতে পারেন না। প্রকৃত-  
পক্ষে মানুষ ব্যক্তিত্বের মোহাবিজ্ঞানের নিরম-অনুযায়ী চিন্তা  
বা চুক্তি করে কতক? সমস্তকই তা সে সম্প্রদায়ের  
সমস্তের অশ্রুতলক্ষ্যের মধ্যে সমাজ-পাতিত ব্যক্তিগণের প্রাথমিক  
স্রোতে তাগিয়া চলে,—এমন মানুষের পৃথক অস্তিত্ব  
কোথায়?

এই ধরনের স্রোতের তাৎপাতি বহন লোকের মনে  
শিকড় গাঁথিয়া বসি-উঠিল, ব্যক্তিগততার মূল্য বহন লোকের  
মনে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমিয়া আসি-উঠিল,—তখন বিজ্ঞানের  
সত্তা-উৎপাদনের বিপুল প্রাধান্যের ব্যর্থতার প্রতিপাত্যে মানুষ  
যে আমিসংযমের মধ্যে পুনর্নিষ্কৃত হইল, সেই আমিসং-  
যমের মধ্যে সে বৈদিক টাঁকিয়া ব্যক্তিগত পারিল না।





দুই দ'মেত্বে যে বাস্তবিক ভাবে বাস্তব মনোবাস্যের মধ্যে সমালোচনার আশ্রয়ী খাড়া করিয়াছিলেন,—এই দুই মতোই তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। বহিঃকল্যাণ-প্রবর্তিত যে রোমান্টিক চিত্রের ভগ্নের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল,—তাঁহা আর পুনঃ সজীবিত হয় নাই।—তৎপরে তাহারই বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রবল আকোশল উদ্ভূত হইল। সে রোমান্টিক মনো-একটা সামাজিক আশ্রয়,—মনোবাস্যের বাকি বিশেষকে নাতি সে রোমান্টিক মনোবাস্যের দেহ,—সমাজ-নীতি এবং সামাজিক প্রথা বিচার,—এমনকি 'বক্তব্য'ও কবিতা, ইত্যাদি। এ আকোশল শুধুই যে সমালোচনা ও বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁহা নয়,—উপস্ফারণ ও নটকের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জোনা তাঁহার শেষ উপস্ফারণের আর মানব ভাবনের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার প্রকাশ করেন নাই। করিয়াছিলেন 'কটা সামাজিক সমস্তা সমাধানের চেষ্টা।

এক বক্তব্য,—এ আকোশলের কোন প্রয়োজন ছিল না,—কেননা রোমান্টিকের সেই নিছক করণ-প্রবল, আকোশবাহিত, আশ্রয়-উদ্ভাবন, উদ্ভাবন-প্রবর্তিত তপ আর নিরীক্ষা আসে নাই। হায়েলের যে আমির-বোধ—তাঁহা রকাতের চরম সত্যের অঙ্কেত অঙ্গ,—এমনকি কেন্দ্র-বক্তব্য,—দেইখানই দার্শনিকের উৎস,—অতএব সেই আমির-বোধের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিন্যাস অদ্বন্দ্ব। একটা

দৃষ্টান্ত সত্যের মধ্যে এই সত্য বস্তুই বিনোদিত,—তৎপরে সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস একটা গভীরতর বিশেষ সত্যের সৃষ্টি হয় আর নতুন নতুন দার্শনিকের ভিতর দিয়া সেই সত্য নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করে। রোমান্টিকের আশ্রয়-প্রবণ এই আমির-বোধের মধ্যে হায়েলের সত্যের আশ্রয়-প্রবর্তিত। দার্শনিকের ক্রমবিকাশের নিরন্তর এই অগ্রগতির নানা রূপের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কখনো বা ইহা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে পাইতে চাচিয়াছে,—এবং সেই পাওয়ার মধ্যেই সমস্ত জগৎকে দেখিতে ও পাইতে চেষ্টা করিয়াছে,—কখনো বা ইহা আপনাকে অস্ত্রের মধ্যে হারাইতে চাচিয়াছে,—এবং সেই হারানোর মধ্যেই আপনাকে পূর্ণতর সত্যের অগ্রগতির দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক বস্তুই দার্শনিক এই অগ্রগতির যে প্রথম রূপ চিত্রিত ভগ্নের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল,—তাঁহাকেই প্রতিবাদ-লেখকেরা বলিয়াছেন—রোমান্টিক। পরবর্তীতে এ অগ্রগতির যে সব নব নব রূপ আশ্রয় করিয়াছিল,—তাঁহাদের অস্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে নামই দেওয়া হউক না কেন,—মূল অগ্রগতির সেই একট,—এই কথাটি সর্বত্র রাখিলে,—আমরা বেশ পরিষ্কার বুদ্ধিতে পারিব কেন্দ্র করিয়া করণের উজ্জীর্ণ মানস ও বুদ্ধির সংঘর্ষের ছন্দের মধ্যে দার্শনিকের বিভিন্ন ধারা নব নব রূপে প্রবাহিত হইয়াছে।



# বিবিধ সংগ্রহ

## টলষ্টয় ও তাঁহার স্ত্রী আঁদ্রিনা

এক ল' বছর আগে ১৮৮৮ গুঃ অব্দে দশই মেম্বের টলষ্টয় পুথিবীতে প্রথম পা দিয়েছিলেন,—সেই তারিখটি হুতিরক্ষণের চ'য়ে আছে। টলষ্টয়ের জীবনযাত্রাভিত্তিতে তাঁর যা ছিলেন বিধ ইচ্ছা দেখা।

টলষ্টয়ের স্ত্রী স্বামীকে চোক্ষি সম্মান উপহার দিয়েছিলেন; তপু যে তিনি সম্মানপালনকরণ। ও গৃহকর্মনিপুণা ছিলেন তাঁর নহ, তিনি ছিলেন স্বামীর লিপিকাথিষ্টা, বহু, উৎসাহ-উৎসাহ! তপু আদর্শ মা ও স্ত্রী নহ,—স্বামীর দার্শনিক দম্পী, স্বামীর আধ্যাতিক আত্মীয়া ছিলেন। আঁদ্রিনার নাম এই হিসেবে উদ্ভূত হ'য়ে আছে।

স্বাক্ষরিকত্বগত আঁদ্র হের্-এব মেয়ে এই আঁদ্রিনা। হের্ অত্যন্ত দক্ষতাপন্ন ছিলেন এবং তাঁর পরিবারের দ্বাই শিক্ষার বিশেষ পারদর্শী ও কণাক্ষণী ছিল। তাঁর বাড়িতে মহোদয় দার্শনিক ও চিকিৎসাদেহের আড্ডা পসত। আইভান টুর্গেনিভ, এ বাড়ির নিয়মিত অতিথি ছিলেন। এ বাড়িতেই একদিন পুঙ্খ টলষ্টয় এসে অভিযানন জানালেন এবং হের্-এব মেয়ে মেয়ে আঁদ্রিনার সঙ্গে তাঁর দেখা চ'য়ে গেল।

টলষ্টয়ের জীবনে তখন কড় ল'য়ে থাকে। তাঁর সময়ে বড়লোকের ছেলে যেমন ক'রে জীবনকে উড়িয়ে দেয়, টলষ্টয়ের বোনাগ ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চৌজিগ বছর বয়সে তিনি মিথেরই স্বাক্ষর করেছেন যে তিনি স্বাধায ও মানিকে একেবারে দক্ষিণ, দেউলে চ'য়ে গেছেন,—তাঁর জন্মে দায়দাশিকিত গুণনোড় নেই, গেরদীর উৎকর্ষ বের-নেই নেই,—তিনি কড়দক্ষিণ কড়কিত পনের একাকী

পনিক! এই সময়ে আঁদ্রিনার বড় বোন লিলার সঙ্গে টলষ্টয়ের সম্বন্ধাব সূচনা চ'ল—একটি অর্ধবিকশিত গেম-পুল পাশ্চিৎ মেলবার কড় বিচরিত চড়িল,—কিছু দেই গেমপুলটি মকলেনে আঁদ্রিনার জনগুণে এলে কবলে। আঁদ্রিনা তখন ছোট, সতেরো বছরের চ'য়ে—টলষ্টয় প্রস্তাব করতই বোকা মেয়ে একেবারে রাতি চ'য়ে গেল। এই ব্যাপারটিই Anna Karenina গুণত লেখা আছে। Levin আর Kittyর ব্যাপান-পদমটি উক্ত ঘটনারই অত্ববাদ ভাড়া \* আর কিছু নহে।

বিয়ের পরেই টলষ্টয় স্বাক্ষর তাঁর নেলের বাড়িতে নিয়ে এসেন,—মহোদয় হ'ল মাইল দক্ষিণে Yasnaya Polyana। সে ১৮৮৮ সাল, তখনো দেখানে বেশ অসুখি, মোড়ার গাড়ি চড়ে নবলক্ষী হ'ল মাইল পথ ভাঙল। দেখানে তারা এক মূলে মাটিচলিগ বড়র কাটিয়েছে।

শে-ভাগ্য। থেকে টলষ্টয় তাঁর কবি বহু চ'লকে লিখেছেন —“এই দিন সপ্তাহ হোটে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি এত সুখী হয়েছি তাই, যে, মনে আছে আমি ম'নে গেলেও আমার এই আনন্দের অবধান হবে না।”

এই কথাই এই হ'ল তা' মানে যে, টলষ্টয় বিবাদ করে-ছিলেন তাঁর এত নবলক্ষ স্ত্রী-দাচরণ থেকে এমন আনন্দ-অসুত-সুটি চ'বে যা টলষ্টয়ের নবর দেহের মত ক্ষীণায় নহ, —মনর কালের জন্ত তিনি দেই আনন্দ পরিবেষণ ক'লে দ্যাবেন।



আত্মোৎসর্গে নিৰ্জন আশ্রমে বাসী-সেবার  
আত্মোৎসর্গ করলে। সমাজ-নির্বাসে তার সমস্ত ক্রটির  
কতিপুৰুষই আছে এই শক্তি-অহুতায়। বহুসন্তানভাবিত  
জননী সমস্ত গৃহ ত্যাগবান করে, ছেলেকিশোরের লেখাপড়া  
পেগায়, ডাঙের সমস্ত কামা-কাপড় নিজ ভাতে সেলাই করে  
দেয়। তবু তার সমস্ত অজ্ঞান নেই, বাজিনি বামীর  
সে পার্শ্বভী,—সমস্ত বাত ভোগে তার দিন সে বামীর লেখা  
মকল করে দিয়েছে।



কবি টলষ্টয় ও তাঁহার স্ত্রী অ্যান্ড্রিভনা

অস্বাভাব্য তার জীবন-বল, অটুট তার বাস্তব,—অস্বা-  
ভবিত্ব দেখিবার তাকে সমগ্রাণী হ'য়ে থাকতে হয়নি।  
এক প্রারম্ভ সময়ে বাসীই কোন-না-কোনো অস্বাভাব্য  
আছে,—অ্যান্ড্রিভনা অস্ত্র সেবিকা, যোগোৎসাহবানী নবী!  
অ্যান্ড্রিভনা দস্তাকাবেব মগধবী। সে বামীর তপস্কার

বাধা ত' ছিলই না  
ছিল।

বামীর বাসভাগ চ'লেই গায় খেতে অ্যান্ড্রিভনা তাকে  
তল্লাস করত। তাকে 'সামান্য' প্রান্তরে বায়ু-পরিবর্তনের  
কর্ত্তে নিয়ে আসত। এই পুত্র প্রান্তরে এসে জীবন-  
যাপনে উদারত্ব কল্পনাযুক্ত ছিল, তবু বামীর বাধা ও  
কল্যাণ কামনা করে সে নিজেও সন্তানদের সমস্ত কষ্ট  
ও অসুবিধাকে কল্পনা মনে করত। বামীর মতে কোন

তাপই তার কাছে বড়ো মনে হ'ত না।  
যোগা লোকের ছোটখাটো আবদার  
বোধে, বামীর প্রতিটি মনোভাবের  
তারতম্য বুঝে তার সঙ্গে লুপ্ত যিগিয়ে  
চ'লে অ্যান্ড্রিভনা তার বামীকে নিরাময়  
ক'রে আনত। মেধা-আমিত আকাংক্ষার  
মত তার প্রেমে বামীকে সঙ্গসা পেটন  
ক'রে থাকত,—তার দেবার অবদান  
ছিল না, সত্যজুষ্টিতে একটি নিকষের  
সন্মোহিতা ছিল।

কিন্তু বিবাহিত জীবনের যোগে  
বহু বাদে স্ত্রী যেন শুধু তক্তি ও ভালবাসা  
দিয়ে বামীর নাপাল আর পেল না,  
—অ্যান্ড্রিভনা পড়ল পিছিয়ে। টলষ্টয়  
তখন War and Peace ও Anna  
Karenina লিখে যশস্বী হয়েছেন।  
এই সময়ে তাঁর মধ্যজীবনের সফট-কাল  
উপরিত হ'ল। প্রকৃত বয়স, প্রকৃত  
অর্থ, প্রকাণ্ড পরিবার—তিনি সম্মুখ  
দিকে শিঁক ক'রে গাড়ালেন; মাটির ঢেগা  
তিনি আর কুড়িয়ে নেন। তখন তিনি

মধ্যজীবনের মধ্যমণ্ডলভাগে মত শোভা চ'রে উঠেছেন।  
তিনি তখন সন্তোষ ভিখারী, তাই সাহিত্যিকের আদর্শ,  
ছোট প্রত্যক্ষের বৈধিত্যে গিয়ে বসলেন। অ্যান্ড্রিভনা  
তখন বৃহৎ পরিবারের তারে ক্রটি, পরিপ্রাণ,—সামান্য-  
জীবনের পুঁটিনটি তিনিশটি পদমাত্র তার মধ্যমণ্ডলের

ভর ভেঙে থাকে; তাই সে আর স্বামীর পায়ে  
স্বপ্ন পা খেলাতে পারবে না। স্বামীর আধ্যাত্মিক অগ্রগমনের  
পথ থেকে আঁহ্রিত্ত্বকে দূরত্বতই দূরে দাঁড়াতে হ'ল।  
আঁহ্রিত্ত্বনার ছেলে কানে, ঢাকবেশ অগ্রগ করেচে, বি  
আসেনি,—আঁহ্রিত্ত্বনা সংসারকে অসার মনে ক'রে স্বামীর  
হাত ধরতে পারবে না। চ'রনের মধ্যে যেমনার কৃপাসা  
নেমে এলো।

টলষ্টয় তখন চাষাবের সঙ্গে মাঠে গিয়ে লাগল চালায়, পড়  
নিয়ে গোলাঘরে আশ্রিত্ত্ব করে, জুতো সেলাই করতে চেষ্টা  
করে। William Jennings Bryan একদিন টলষ্টয়কে  
এলকিগেন, “আপনার বই আমি পড়তে পারি, কিন্তু  
আপনার জুতো পায়ে দিতে পারব না।”

লোকটা আঁহ্রিত্ত্বনা অবগ্র স্বামীর এই সব আত্মবাহি  
পত্ন কত না, বহু টুঙ্গিনিতেতো আপত্তি ছিল। তবু  
যা তিনি লটার করেন তার সঙ্গে সফতি আত্মবার ভর  
টলষ্টয় চেষ্টার ক্রটি করেন নি,— তবু তাঁর মতোই আত্মবের  
পায়ে এসেও দাঁড়াতে পারছেন না, তবু তাঁর চেষ্টার  
অবধি ছিল না। আঁহ্রিত্ত্বনা বর্ষাধবেশ স্বামীর সচরা  
চ'তে না পারলেও তাঁর বর্ষগুণ্ডকগুলির রসবোধ করতে  
কুণ্ঠিত ভগ্নি। টলষ্টয় যখন তাঁর বর্ণনগ্রন্থ On Life লেখ  
করলেন, আঁহ্রিত্ত্বনা তখন যে তার রসগ্রন্থ ক'রেই কাগ  
চ'ল না, না, নিজে আত্মপুণিক সমগ্র গ্রন্থটি কবণী ডায়া  
মুদ্রিত করল।

হেলেনা তখন বড়ো চ'রে উঠেচে, কেউ কেউ  
মধ্যে বিবাহিচালয়ে পড়ছে। টলষ্টয় হঠাৎ সংসার থেকে  
অপসৃত চাঙ্কলেন, যেহিচায়াকুলা আঁহ্রিত্ত্বনা ততই  
চ'রতে সংসারকে আঁকড়ে ধরছিল। এর মধ্যেই সে তার  
স্বামীর বহু বইই নতুন সংস্করণ প্রকাশিত করেছে—  
প্রায় কুড়িটি তদুপা,—নিজে এতটি লেখের প্রসঙ্গ দেখে  
দিয়েছে। এই স্বামীর কল্পনিক গ্রন্থও ছিল,—দ্যগ্রন্থভূতিও  
ছিল তেমন অনবদ্য। কিন্তু কত সে পড়েচে, এটি  
মতো পিচ্চো বাড়িয়ে কত সে দূরত্বকে আঘোদ  
দিয়েছে। সে ছিল গৃহিণী, সচিব, লেখক, অধ্যববাসী  
বহু।

আত্মবের পিছরে উঠতে পারছেন না ব'লে টলষ্টয়ের  
মনে এক স্থতীর অবগ্রি ছিল, তাই তিনি মাঝে মাঝে  
সংসার ত্যাগ ক'রে প্রত্নপ্রজাতি হয়ে পালিয়ে যাবার  
মতলোব করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি বহু দূর  
দেশ লগাটন করেন, গ্রামী দরিদ্র চাষাভূষাবের সঙ্গে,  
লজাশীল মত, বোদ্ধ তিসুর মত। একদিন এই মতলোব  
ক'রে তিনি তাঁর পরিবারকে ইচ্ছে ক'রে এক মায়াুলি  
বিদায়-লগাট লিখেছিলেন। অবগ্র সেই প'রের কল্পনা  
কারো পরিণত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই চিঠি  
পাওয়া গেছে।

তাঁর মৃত্যু আত্মসংসারও দেখে মীথোগ ছিলো না।  
বহুবার ভয়ে একবার তাঁকে সামান্যর মাঠে এসে নিখাল  
নিত হয়েছিল। পরে জোগ স্থানপরিবর্তন ক'বে  
পাকবলীতে গিয়ে আশ্রয় নিলে। দ্বিগাশি বছর বয়সে  
মানে ১৯১০ সালে তাঁর স্বতিনকিত্ত্ব হাল হয়েছিল,—  
তিনি পরিবাহ-পরিভ্রমণে চিন্তে পারছেন না।

এই লম্বাই কিছু আগে তিনি লুকিচে-লুকিয়ে একটু  
উইল করেন,—তাঁর লেখার সমগ্র বহুত অর্শুলা তিনি  
জনসাধারণকে জোগ কহবার ভর অদিকার দিয়ে যান।  
সমগ্র সাহিত্যদাম্পতি টলষ্টয়ের ভোট যেরে আলেক্সান্দার  
হাতে থাকে, এবং সেই তা জনসাধারণের হাতে বণ্টন  
ক'রে দেবে—এই ছিল উক্তি। জীবনের তবু এই ঘটনাটি  
তিনি আঁহ্রিত্ত্বনাব থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এই ব্যাং টলষ্টয়ের ভেলে লিখের কয়েকটি কথা  
তুলে দিচ্ছি—

“১৯১০ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে  
আমাকে প্যারি কিংডে হ'ল। সেখানে এক লকবর  
কাগজে লুকলাম বাবা বাড়ি থেকে পালিয়েছেন।

হা যখন জেগে দেখলেন বাবা বাড়ি নেই, তিনি  
তখন হতাশা ও উৎসাহে এত দিগন্তিত চ'রে পড়লেন যে  
আত্মহত্যা করবার ভর তিনি একটা হৃদে ধাঁপ দিলেন।



তাকে অবশ্যই বাচান হ'ল, কিন্তু বেঁচে তিনি কখনে কি,  
—কোথায় গেলে বাবাকে পাওয়া যাবে ?

একটি ছোট ছোট্ট ঘরের মধ্যে বাবা শুয়ে আছেন।  
বাড়ি থেকে পাশের ঘরের সমস্ত ঘরোয়া জিনিসপত্র  
অস্থায়ী হইয়াছে। তাই সেই বিকৃত ভাবে বাবাকে দেখে  
হয়েছে। বাড়িতে খবর এসে সে। মা যখন গিয়ে  
পৌঁছলেন, ডাক্তার ও নার্স তখন ভিক্টর ক'রে এসেছে।  
মাকে জানানো হ'ল যে, তাঁকে দেখলে বাবা খুব বেশি  
চলল হ'লে উঠতে পারেন, এবং—তাই মাকে তাঁর  
ব্যোগ্যপাশে যেতে দেওয়া হ'ল না। বাবা যখন দেখে  
নিবাল নিচ্ছেন তখনই মা বলেন,—মা'র বাস-উপাধানে  
মাপা রেখে বাবা চোখে বুজলেন। ডাক্তাররা যখন মাকে  
আলোচনা দিচ্ছিল না, তখন বাবা বাত-বাতের জিজ্ঞাসা

করেছেন,—“উনি কোথায় ? তোমরা এই সামান্য কথাটা  
কেন বোঝ না,—আমার মনুষ্য যে একান্ত ভীত হই।”

বিধবা আত্মহীন সন্তানদ্বয় নিয়ে শোকাবুলনে  
প্রায়শ্চেষ্টে কিংবা এল,—একা, সন্তান, বৈদ্যনিবাল।  
এর মন বহুত বাবেই পটভূমির বহুত বসে আত্মহীন।  
অস্থায়ীমণি হই।

একটা কথা এখানে বলে রাখি। আত্মহীন  
সন্তানদ্বয় বৈদ্যনিবাল ডাক্তারি দেখে গেছে। সে-ডাক্তারি  
পত্রিকাভিত্তিক চাপা হইছে। তাতে আত্মহীনের সঙ্গে  
উল্টেবের সুস্থিত ও সুস্থিত বহুত পরিচয় পেরে আমরা  
সুখ হই,—এবং আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এমন  
সন্তানদ্বয়সম্পন্ন সন্তানদ্বয় বৈদ্যনিবাল পাশে বলে রাখা করি।

ঐতিহাসিকময় সেনাপতি

## সেন্ট জর্জ গির্জায় কাঠের কাজ

কাঠের উপর কোমারের কাঠ, আমাদের দেশের  
প্রাচীন সহস্রাব্দে যে ভাগ্যপথে আসিত তাহার নিবন্ধন  
আমরা বহু প্রাচীন কাঠের গির্জায়, মন্দিরে, মন্দিরে—  
কামায়া, পশ্চিমবঙ্গের বনবিদ্যা গুরুত্বের কোমারকাঠের  
পাঠ্য, আত্মহীন, পালক, কুয়া, পাঠ্য হই। তাহাদের  
এক একটির নমুনা দেখিলে অনেক সহস্রাব্দে বিস্তৃত হইতে  
হই যে পূর্ণকালে, যখন উন্নত সভ্যতার প্রভাবিত আবিষ্কৃত  
হই নাই, পত্রিকাভিত্তিকের মন্দির কোনো পিতৃবিদ্যালয়ের  
সংযোগে বহুবিদ্যালয়ের সহিত সংযোগিত। কতিপয় মাকারদের  
উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হই নাই, তখন এই অসামান্য  
পত্রিকাভিত্তিকের কি ভাবেই না আসি এই সব সুস্থিত পিতৃবিদ্যালয়  
কতিপয় সমর্থ হইত।

বিলাতের মাকারদের যে-কিছু নমুনাচিত্র আমি লংগ্রে  
কতিপয়টি তাহা অল্প অল্পের প্রাচীন সহস্রাব্দের  
নিবন্ধনমূল্যবোধ। অনেক বৈদ্য হইল ও হইল; কিন্তু  
ইহার কারণও আছে। এই কাঠের কাজগুলি পূর্ব বৈদ্য

পূর্বতন নয় আর ইংলণ্ডের পূর্বতন এমনই সুস্থিত যে এ  
সকল তাহার সাহায্যে অতি সুচারুপে সুস্থিত হইয়াছে।  
আমাদের দেশের পূর্বতনের মত এগুলি হাতে করিয়া  
কেই তৈয়ারী করে নাই। ১৯০৮ সালের বৈদ্যবিদ্যালয়ের  
বিদ্যায় আমায় “মহাত্মা ও এলোয়ার ভাষা ভাষা” ইংল  
প্রাচীন, ১৭৪ পৃষ্ঠার পূর্বতন চিত্রটি, দাঁড়ান নীচে সমস্ত  
ছাপা হইয়াছে “এলোয়ার পাঠ্য কতিপয় পূর্ব” এবং বাহা  
হইয়া উচিত হইল—সুস্থিত। ‘বাগ’ বা ‘সুস্থিতের  
কতিপয়’ তাহাই অতীত প্রাচীন ভাষায় মাকারদের  
একটি সমস্তকার নিবন্ধন। উহা এমনই সুস্থিত ও এমনই  
সুস্থিত যে তুল করিয়া ‘পাঠ্য কতিপয় নির্বৃত্ত পূর্ব’  
বিলম্বে কেহ চিত্র দেখিয়া সে তুল করিতে পারিবেন না।  
এই কারণেই ঐ ছাপার তুল আর সংযোগ না করিয়াই  
চলিয়া গিয়াছে। সংযোগ না করিবার অন্য কারণ  
একটা কারণ এই যে, দেখা যায় যে কতিপয় পত্রিকাভিত্তিক  
সংযোগ ছাপাও একটা সম। কারণ তাহাতে সেই কতিপয়

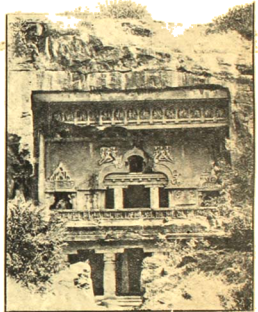
বিজ্ঞাপন দিয়া আরও প্রসিদ্ধ করিয়া তোলা হয়। বাকী  
চট্টক এখন কিন্তু দ্বারে তৈজিয়া ভ্রম সংশোধন করিতে  
হইল, কারণ উহা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ভাস্কর্য্য  
দাক্ষিণ্যের কোন নমুনা আর নাই। পাঠকেরা মনে  
রাখিবেন যে উক্ত গৃহটি যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত

হইয়াছিল তাহা চণ্ডেশ্বর ভাগ্যবান আধুনিক  
যন্ত্রপাতির উন্নত প্রণালীর বহুশক্তির নিকট কিছুই  
নহে, এবং উহা এই সংখ্যাত প্রকাণ্ডকৃত বিদ্যুতী  
কাঠের কাঠের নমুনা-চিত্র সঙ্গ অপেক্ষা বহু  
প্রাচীন। তথাপি বিদ্যুতী কাঠের, কাঠের  
চিত্রগুলির পাশে উৎসকে কতটা কেমানান  
দেখাটাবে তাহার বিচার-ভার পাঠকদের উপর তুলিল।  
আমরা এখানে সেটিকে পুনর্দ্রষ্ট করিলাম।  
যে নমুনাগুলির পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল,  
সেগুলি সমগ্রই সেউজার্জ গির্জার অন্তর্গত।

প্রথম চিত্রটি, চতুর্থ এডওয়ার্ডের সমাধি ও  
পঞ্চদশশতাব্দীর আগমনের সমাবর্তী পর্বা—ইহা  
দাক্ষিণ্যিত। এটির কারুকাৰ্য্য কি সুন্দর!  
বিশেষ করিয়া ত্রাফালটার অঙ্কিত কোম্বাইগুলি  
ভারী চমৎকার।

সেই বর্জ গির্জার কোন কোন ঘরো পর্বতী  
সময়ে নির্মিত হইলেও উহার শিল্পতরী ও আদর্শ  
একই রকমের। পরজাত উপর্য্যকার পেরেকগুলির?  
মাথার যে পরিকল্পনা বিদ্যমান তাহা উহাদের  
অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের দাক্ষিণ্য প্রদান করিতেছে।  
দ্বিতীয় গির্জার অন্তর্গত সমস্ত কাঠের কাজ একই  
শ্রেণীর ও একই অঙ্গন-পদ্ধতি, তথাপি অপেক্ষা-  
কৃত প্রাচীন কাজগুলির মধ্যে একটি কাঠের কাজ আছে  
যাহা পর্দার (প্রথম চিত্র দেখুন) সমসাময়িক হইলেও  
সম্পূর্ণ অঙ্গ কারিগরের তৈয়ারী বলিয়াই লগ্নি মনে হয়।  
কারণ তাহার সমস্ত পরিকল্পনাটি অত্যন্ত বেশী স্থল ও  
নিপুণ। ইহা বর্তমান চ্যান্সার ক্লাবের ঘরের ছাদের  
তিতরকার অংশ। ইহাকে এক সময়ে লাইব্রেরী ঘরের  
ছাদের সহিত একযোগে পলস্তারা মণ্ডিত করিয়া দেওয়া

হইয়াছিল (উহা সম্ভবতঃ অষ্টাবল পতাকাগেত হইয়া  
থাকিবে); পরে স্তর গিল্‌বার্ট হুই উহার আবিষ্কার ও  
উদ্ধারসাধন করেন। পঞ্চদশ পতাকার দাক্ষিণ্যের শ্রেষ্ঠ  
নিদর্শন, চ্যান্সার ক্লাবের অক্ষিপদ্যের ভিত্তিকার্য্য স্থায়।



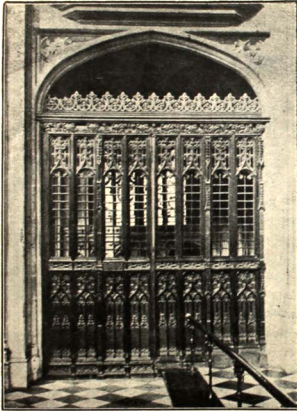
‘কাঠ নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ’

এই কারুকাৰ্য্যটির প্রকৃত সময় নির্দেশ করা যেতে পারে  
নয়, কারণ ইহার একটি কোম্বাই-চিত্রের মধ্যে পতাকার  
বুড়োপের নাম-সহি অন্তর্ভুক্ত আছে। এই চ্যান্সার ক্লাবের  
ঘরের ভিত্তিকার ছাদের অনেকগুলি কোম্বাই কাঠের চিত্র  
সংগ্রহ করিয়াছি, এখানে কেবলটির নমুনা বিদ্যায় উদাহর।  
এই প্রবন্ধগত বিতীত, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র।

যে প্রাণী অবলম্বন করিয়া কাঠের উপর এই কোম্বাই  
করা হইয়াছে, বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, তাহা অতীত  
অনুত, নতন, ও যে কোনো কিনিয়ের প্রতিষ্ঠিত বংশদ্ভূত  
হুটাইয়া কুপিলার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী। হুটাইয়া কুপিলার



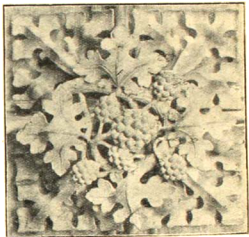
ভাবে কোন কোন অংশ প্রথমে তৈয়ারী করিয়া পরে 'কু' পরিষ্কার চটঘাটে, দে বিয়ের আর সংকেত নাট। চতুর্থ  
দেখা আঁড়িয়া দেখিয়া চাইয়াছে। আদিত কোমারগুলি  
মধ্যে এই 'কু' একটা কাঠের চাকতীর আবরণে ঢাকি ছিল: দাঁড়িয়ে।



কাঠের পয়লা

এখন কিন্তু এই 'কু' গুলিকে উদ্ধৃত করিয়া রাখা চাইয়াছে। চ্যাপ্টার ব্রাকের ছাদের ভিতরকার কোমাই-চিরের  
ইচ্ছাতে চক্কর দেখিতে এ গুলিকে একটু ব্যাপন দেখার কিন্তু মধ্যে কতকগুলিতে মূল লতা পাতা আঁকিয়া বাহির  
-কাঠের কাঠগুলি নির্মাণ-রহিত ইহার গন্ত যে অপেক্ষাকৃত করিয়া আনা চাইয়াছে, কোনটিতে বা জীবন্ত, কোনটিতে

বা হুগোব্রায়ের, আখার কতকগুলিতে নরমুণ্ডের  
চিত্র ও কোলাই করা হইয়াছে। আশংকা এখনে  
ভট্টটি নরমুণ্ডের চিত্র বিশেষ। চিত্র দুইটি দেখিলেই  
বেশ মনে পড়ে যে মাথার মুণ্ড-বিশিষ্ট রাকমুণ্ডটি  
(খিতোর চিত্র) যে চিত্র কোলাই করিয়াছে,  
শিবোত্তমল মনে খিতোর মুণ্ডটি (পক্ষম চিত্র) সে  
হস্তের নহে। অথচ চোখে এমনি দেখিলে এই  
খিতোর মুণ্ডটির কাঠের সমতুল্যতা চিত্রটি বোকা বার  
না, কিন্তু আলোকচিত্রে কে জানে কেন সেগুলি  
যেন একই বৈশিষ্ট্য রকমই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।  
এই মুণ্ডগুলির সম্বন্ধে জনবান এইরূপ—রাক  
মুণ্ডটি ‘এড্‌ওয়ার্ড দি কনফেসার’ এর বসিয়াই অঙ্কিত  
হয়, কারণ পাঠানিগকে এই পিতৃপিতৃ উৎসর্গ করা  
হইয়াছিল, ইনি ঈশ্বরের অঙ্গন; আর শিবোত্তমল  
মনে অপর মুণ্ডটি নাকি সেট পৃথক শিল্পীর,  
যিনি শুধু কাঠের বৃক্ক এমন সমস্ত চিত্রগুলি হুটুয়া  
তুলিয়াছেন। কে জানে এই লক্ষণ কিংবদন্তীর মধ্যে কোন  
লক্ষণ আছে কি না। দাঙা চিত্র, যেটি হুগোব্রায়ের মুণ্ড



পুণ্ডিত কাঠের কোলাই

বসিয়া উক্ত চিত্র জানা এখনই প্রকৃত, যখন ও চিত্রের মধ্য  
মস্তকের মত যে, উক্ত শিল্পককে ও নিপুণতার নিকট  
এই ধরনের অন্য লক্ষণ চিত্রটি ‘ইদাম হইয়া যায়।’ তাই  
বসাই মনে পড়ে যে, যে চিত্র উক্তকে নিশ্চয়  
করিয়াছে তাহা অপরই অপর চিত্রের জনক  
নহে। এই চিত্রের সমস্ত কোলাই কাঠটি  
বিভিন্ন প্রকারের। ও একটি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর  
নানা মাত্র বেগুনা হইল।



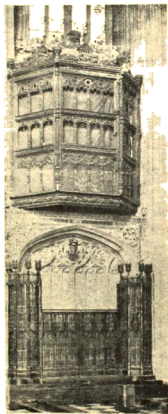
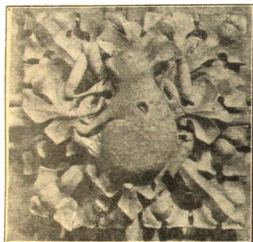
যদি চিত্রটিতে বহুতর মত বহুভাষিত একটি  
জানালা দেখা যায়তোহে, উক্তকে টাংগাং  
how-window বলে, এবং উক্ত সেট চিত্র  
শিল্পককে অঙ্গন। অষ্টম শতাব্দী, এড্‌ওয়ার্ডের  
কবরের উপস্থিতি পীতমখিরের একটি পাথরের  
জানালা দ্বারা, যদি কাগেরিন্ অব এগোগানের  
মত এই দক্ষিণ অঙ্গনতাকার বাতায়নটি নির্মাণ  
করাইয়া দেন। এই জানালা চিত্রেই মধ্যযুগ  
ভিত্তিকরিয়া, প্রিয় অব গুণেরূপের দৃষ্টি জেনমাক





বাকস্ম'বী আলোককঃ বিবাহঃ বেখিয়াভিয়েন । দিগ্কার অম্বাভ ইহার পরবর্তী প্রস্তর নির্মিত  
সাক বাতায়নের কারকাৰী যেমন হস্ত বাতায়নের অলুকৰণে প্রস্তর-বর্ণেট অলুকিত  
অন্য এক সময়ে এই বাতায়নটি এই হইয়াছিল । কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'ইইলিমন্ট'

কর্তৃক বাতায়ন গায়েই এই রত্ন অলুকিত হয় ও  
তৎপরিবর্তে দেখানে কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত হয় ।



কাথেরাইন অক্সফোর্ডের বাতায়ন



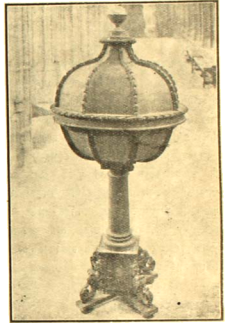
কারিগরের প্রতিমূর্তি

এই ভাষ্কর্যের কারক ও চিত্রশিল্পের মধ্যে  
'রেনাসেন্স' যুগের ছাপ স্পষ্টভাবে আঁতরমান ।

এই দিগ্কার মধ্যে সর্বশ্রেণে যে সমস্ত কাঠের  
কাৰ করানো হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় চালানের

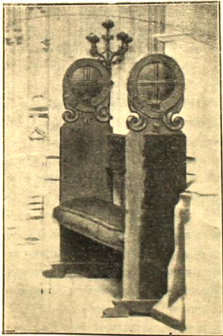
## বিবিধ-সংগ্রহ ঐতিহাসিক দ্রব্য

সময়কার : 'কমনওয়েলথের' সময়ের এই দিল্লীর উপর বহু অত্যাচার চাইয়া গিয়াছে। অবি ও ইংলণ্ডের অস্ত্রাস্ত্র বহু পর্য্যাপ্তি-  
হানের তুলনায় এই দিল্লী অনেক কম কতিয়ত্ত্ব চাইয়াছিল  
তথাপি দ্বিতীয় চার্লসের সময় অনেক মেরামতীর কাজ  
করিতে হইয়াছিল। সে সময় লংবার প্রচেষ্টা দেখিলে স্পষ্টই  
বোঝা যায় যে, স্বর্ণোপসূক্ত অর্ধের অভাবে 'হের্ন' (Horn)  
পাতের যে সময় লংবার প্রস্তাব দাখিল করিয়াছিলেন তাঁহার  
অনেকগুলিই আর কারো পরিণত করা সম্ভব হইয়া উঠে  
নাই। কিন্তু বর্ত্তী সম্ভব সুন্দর কাঠের কাজ দিয়া এট  
দিল্লীর লংবার দাখিল চাইয়াছিল। কিন্তু এই শেষের  
শিল্পকাৰী পুস্তকের কারিগরদের হাতের কাজ অপেক্ষা  
অনেক চীন ও অপরূপতার পরিচায়ক। এই পরবর্ত্তী দাক



কাঠের অতিথিক কল্যাণ

দিল্লীর একটা নিদর্শন স্বরূপ আমরা উচ্চপাণ্ডিত্যবিশিষ্ট একটা  
বেকের চিত্র বিদ্যায়। ছবি হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া  
যায় যে, ইহার শিল্পকাৰী তত দক্ষ ও সুদক্ষ নহে। এরকম  
বেক এই দিল্লীর মধ্যে আরো অনেকগুলি আছে। এট  
ধরনের বেক অল্প কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।



উচ্চ পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট বেক

আমরা কাঠনিষ্ঠিত একটা 'অভিষেক কল্যাণের'  
(Font) ছবি বিদ্যায়। এট অভিষেক কল্যাণের, গুইদোনে  
বীকিত চাইবার সময় ব্যবহৃত চাইর থাকে এবং এ গুলি  
সাধারণতঃ প্রস্তর নির্মিতই হয়। কিন্তু এট ঐতিহাসিক  
কল্যাণটি এমন সুগঠিত ও সুশরিত্বের যে দেখিলে ইত্যাক  
প্রস্তর নির্মিত বলিয়াই ভ্রম হয়। ঐতিহাসিক দ্রব্য

# বাংলা সাহিত্যের পথঘাট

## ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ

সাহিত্য একটা সত্তা। তার সত্তা রক্ষাও আছে গলি-খুঁচিও আছে। কেবল সত্তা রক্ষা জানলেই সত্তা জানা যায় না। অনেক দেশের জিনিষ, জানবার জিনিষ, তাববার জিনিষ গলি-খুঁচির উপায়েও থাকে। নতুন সত্তার ন্যায় গলি-খুঁচির উপায়েও থাকে। তা ছাড়া বড় বড় সত্তার বড় বড় দোকানঘরে যে সব জিনিষ বসে বসে করে তার খেঁচি তাগাই তৈরী করে—গলি-খুঁচির ছোট ছোট কারখানা। কত অখ্যাত অজ্ঞাত সত্তা সেসকল দোকান ঘরের আলোর গতির মাধ্যমেতে কোণে ব'লে দিন রাত্তির নীরবে কাজ করছে। কাজেই সত্তার সত্তার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যকে দ্রিকভাবে বুঝতে হ'লে গলি-খুঁচিতেও চোখ চাই।

বাংলা সাহিত্য এখনও নতুন সত্তা। সে একটু একটু ক'রে গড়ে উঠেছে। তাতে এখন পর্যন্ত চারটে মোটা মোটা সত্তাকীর্ণ পত্তন হয়েছে। গদ্য, কবিতা, নাটক বা এক কথার কবিতা সত্তার সত্তাই তার একমাত্র চলাফেরার পথ। কিন্তু অল্প পথ হ'লে এখার পাড়তে হবে, বোধহয় পাড়বার সময়ও এসেছে। তা না পাড়লে বাংলা সাহিত্য নিতান্ত ছোটই থেকে যাবে—তার সীমানাও বাড়বে না, মোক-বস্ত্রও নয়। কাজেই এখন চরিত্রের চলাফেরার দোকান ছুঁল খাড়ে নিয়ে যেতেই হবে—তার মাঠঘাট চাঙা, তার বনজঙ্গল কাটতে। এ কাজ কোনো এলিমেন্টারের নজর হ'লে হবে না—কেন না সাহিত্য ক্ষমতাসী জিনিষ নয়। আর তা নকল নকল নয় ব'লে, না চলেই ইংরেজী স্টাইল-তার ছব্ব নকল, না চলেই লাতিন সাহিত্যের ইত্যাদিক অল্পসল্প। তবে ঐ তই সাহিত্যকে আদর্শ বা 'মডেল' হিসেবে দেখলে পথ পাড়ার সময় যে খানিকটা সোজা হ'লে যাবে তা নিশ্চিত।

সত্তা ও পত্তনের উপর ছেঁড়ে দিয়ে এবার সোজা কণার নাখা বাক। আমরা সকলেই চাই বাংলা ভাষা ও

বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠুক। এ চাওয়ার মূলে যে কেবল আমাদের দেশজীবিত বা বাস্তবিক আছে তা নয়। ঐশ্বর্য্য প্রথম চৌহুরী ভাষার বসতে গেলে—'বাস্তবিকভাবে সত্যি' করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সত্তার করতে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে 'সত্তা' অর্থবোধ 'স্বপ্ন' আর 'সত্তা' পরবোধ 'স্বপ্ন'। তাছাড়া ঐ লেখকই আর এক জাতির বলেছেন, 'মনের স্বপ্নের একমাত্র সত্যতার প্রমাণেই লাভ করা যায়। সত্তার সাহিত্যের একমাত্র সত্যতার প্রমাণেই একটা সত্তা নয়, সত্তার জীবনমত্তার সত্তার উপর—কেন না এ ক্ষেত্রে বা কিছু গড়ে উঠবে তার মূলে থাকবে জাতীয় আদর্শ এবং জাতীয় চরিত্র।'

এ সত্তা ঐশ্বর্য্য রবীন্দ্রনাথও বহুদিন আগে উপলব্ধি ক'রে বলেছিলেন, "মানবিক শিক্ষা তারার বাহন পাঠ নাই। তার সত্তা প্রধান বাধা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী বাণী জাহাজে করিয়া সহরের ঘাটে পর্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাকে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানী করিয়া কয়লাঘর চড়াইয়া দিয়া। যদি বিদেশী জাহাজটাকেই কারখানায় ফাটাইয়া দিতে চাই তবে অবশ্য সত্তারই 'মাটিকা' পড়িয়া থাকিবে।

দেশের মনকে সত্তা করা কোনমতেই পত্তনের ভাষার সত্তার নয়। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিত্রা করিব কিন্তু সে চিত্রার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন থাকিবে চলেবে কিন্তু সে লক্ষ আমাদের ভাষা থাকিবে থাকিবে না,—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে?

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ ক্ষেত্র শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ ক্ষেত্র চিত্রা আমরা করি না। কারণ চিত্রার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিভাগের বাহিরে

আসিয়া শোষণকৌ ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া বেশি, সেই লক্ষ্যে তার লক্ষ্যের সন্ধি আলনার মতোলো থাকে। যেমন এমন গোলি দেখা যায় যে পাখি প্রচুর অর্থাৎ তার হাড় বাহির হয়। পড়িয়াছে, তেমনি বেশি আমরা বহুটা লিখা করিতেছি তার সমস্ত আমাদের সাহিত্যের দলীল পোষণ লক্ষ্য করিতেছে না। বাংলার লক্ষ্য আমাদের প্রাণের লক্ষ্য সম্পূর্ণ পোষণ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার বদলা দিয়া খাই ন। আমাদের কল খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভরি করে, সেও পূর্ণি করে না।”

আমিও আমার এক প্রবন্ধে ঠিক এই কথাটি বলেছিলাম।—‘বর্তমান পর্যন্ত যা মাতৃভাষা জ্ঞান ও সত্যের বাহন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তু ও মনের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ বাধ্যতামূলক থাকে। আমরা বহুই বিভাষাভাজ জ্ঞানকে মনে মনে ভুলিয়া ক’রে নিই না কেন তবু সে জ্ঞান আলোকে মত বুঝে বুঝেই সত্যে বোঝাবে। পর ভাষায় লক্ষ্যটা কাচের মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানের আলো মনের মধ্য প্রতিকলিত হয়, তা সে জ্ঞানের স্বরূপ নয়, ছিন্ন বিছিন্ন বর্ণিত। তার মধ্য দিয়ে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করাও না আর কাঁটা চামচে দিয়ে ভাত খাওয়া কি শরীরে আঁচাল থেকে মূল দেখাও ঠিক তাই।’

বাংলা-সাহিত্য যে গড়ে উঠতে হবে তা অনেকেরই বোঝেন, কিন্তু এটা কত ঠিক বোঝেন না—সাহিত্য বলতে কি বোঝায়। কাব্য ও সাহিত্য যে সম-পরিমিত নয়, অর্থাৎ সাহিত্য যে কাব্যের চেয়ে একটু বেশী ব্যাপক এই কথাটাই যোক্তা আলমকাল বেশী দরকার হ’লে লক্ষ্যে। আলমকাল মানিকগঞ্জের পাটা ওড়ালেই দেখি গল্প আর কবিতা, যেন ও ছাড়া আর সাহিত্যের কোন দিক নেই। ঐশ্বর্য্যক প্রথম চৌমুদ্রীর আর একটা লেখা এখানে না উদ্ধৃত ক’রে পারবু না। তিনি লিখেছেন, ‘যদি সাহিত্য বসতিন কেবল-মাত্র গল্প ও গানের পত্তীর ভিতর আটক থাকবে ততদিন শিকিত সমানে বসতাবা বর্ষা প্রতিষ্ঠানান্ত করতে পারবে না। কেন না, শ্রেষ্ঠকাব্য সাহিত্যের মুক্তি যদি হ’লেও সমস্ত কথা ও গাথা নিত্যই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিরুৎ

কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ যদি প্রত্যয়ে কোন সাহিত্যেরই গৌরব গুণি হয় না। এবং অল্পম হস্তের অল্পম প্রত্যয় গান ও গল্প প্রাচীর উৎকৃষ্ট হয় না। কেননা বর্ষা কাব্যসাহিত্যের ভঙ্গ চাই স্রোত প্রাক্তন সংস্কার এবং অলমাক্ত প্রতিষ্ঠা। এবং সকলেই অল্পম অল্পম যে প্রতিষ্ঠানালী লেখক এলো প্রবেশা করে বাজারে মেলেন।’

দুই পদ্য কথা। কবিই যদি না চলিত হয় তবে ত চলি কালিদাস পদ্য ভরে ভরে লিখতেন না—

‘মক: কবিত্বপ্রাণী গমিত্যাদ্যুপাভাস্য

প্রাণ্ড লভ্য কলে পোভাভাভাভি বাননা।’

কিন্তু আলমকালকার বাননা পাছের জল পাড়া ল’রে থাকে চাঁদ পাড়বাব কল্প মাতৃভাষা—উপাভাসের ভাষা। যখন না—এবং অল্পমের পরিচয় দিয়েও মূল বললে চ’লে আসেন হ’ল। উদ্দেশ্য যোক্তা উচিত যে কবি প্রের সাহিত্যিক হ’লেও—সাহিত্যিক মাত্রই কবি ন’ন—অর্থাৎ কবি না হ’লেও মাত্রই সাহিত্যিক হ’তে পারে।

কাব্য ভবনের ভিতরে আস্ত ক’র বিশেষ তাৎপর্য্য আমাদের সৌন্দর্য্য বুদ্ধি ক আঘাত করে। এ প্রথম প্রের ভাষায় ‘চিত্তবৃত্তির বেগে সঘৃণিত বর্ণনা যাত্রা সৌন্দর্য্যের সজ্ঞান ক’রে উদ্ভব।’ প্রত্যয়: চাল, কল্প, পূর্ণার প্রভৃতি তাৎপর্য্য ভবন ভাষার ভঙ্গি, ছন্দ, অলমকাল, চিত্রে, কল্পনার লক্ষ্য হ’লে কাব্যের অলমকৃত হয় তখন তার নাম হয় প্রাণ। প্রাণ মানেই কবি, কবি মানেই সৌন্দর্য্য। কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য্যের পারতন্ত্র কোন মূল হয় এখনো আবিষ্কৃত হয়নি; সে এখনো সংজ্ঞার সজ্ঞান। সে যে বুদ্ধি ক স্পর্শ করেনা তা নয় কিন্তু তার মুখা উদ্ভব জ্ঞান নয়, সৌন্দর্য্য, যেমন কাব্য ভিতর অলমকাল সাহিত্যের মুখা উদ্ভব সৌন্দর্য্য নয়, জ্ঞান। এই অলমকাল সাহিত্যের বিবরণ হচ্ছে বিভাজন, সম্পদ, বর্ণনা, ব্যবহারসাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত বিবরণের মধ্যে তখনই সাহিত্যসম্পদা হয়, যখন তা মুখাবে না হ’লেও সৌন্দর্য্যে আমাদের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিকে আঘাত করে। এমন বিভাজনের বই আছে যে আমরা প্রের মতই আগ্রহের লক্ষ্য পড়ি—। কল্পা



দায়নিক বাগদৌর দলনসহ শুধু সাহিত্য নয় উৎকর্ষ কাব্য।

তা হ'লে বাংলা বাঙালি সাহিত্যকে যে চিত্ররঞ্জন করতেই হবে তার কোন মানে নেই কিন্তু জ্ঞান সাহিত্যকে করতেই হবে। এই জ্ঞানকাব্যে যতটা স্পন্দরতাবে, নিশ্পন্দভাবে, সুকৌশলে (artistically) কথা যায় ততই ভাল। ততই সাহিত্যের কলিষাখরে তার দর বাড়বে। অলঙ্কার নাহে যা সাহিত্যমাত্রই শুধু ব'লে উঠা যাচ্ছে—যাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় রচনাশৈলীর উৎকর্ষ (qualities of style) স্বচ্ছতা (clearness) প্রাঞ্জলতা (perspicuity) সরলতা (directness) চিত্রবহুলতা (picturesqueness)—তা বিজ্ঞান লেখককেও মানতে হবে ইতিমধ্যে লেখককেও মানতে হবে। এই ক্ষুদ্র সাহিত্যচর্চনাও যার তার কাজ নয়। “ই যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চা করা হয় না।” হেনা ফেলার পুণ্যপ্রাপ্তিতে ‘অজ্ঞে যে দেবতারই চোক, দরহস্তীর পূজা হয় না।’ কেননা এটা স্পষ্টে চলবেনা—“মজুয়ে সাহিত্যে যে ভাবের দর আছে তা ফেলার ছত্র নয় মনের বাসগৃহ।”

সাহিত্যকে তা হ'লে আমরা কতদূর ভাগ করতে পারি— একভাগে পড়ে দলসাহিত্য বা কাব্য, অপর ভাগে পড়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহিত্য বা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কারবার প্রধানত সত্য নিয়ে—কাব্যে সত্য ও সূক্ষ্মের অনিচ্ছবা মূল্য। কাব্য যে সাহিত্যের নির্ধন্য অবিহার করে, তার কলিষ একমাত্র কাব্যই ‘জ্ঞানের ভাষা, কণ্ঠের ভাষা ও তক্তির ভাষা এই ত্রিধারার ত্রিবেণী-সম্মিলন।’ কিন্তু ঐ ত্রিবেণী-সম্মিলনের ঘূর্ণিগাকে পাড়ি দিতে বাগ্জা মানেই যে অগাধ নৌকাছুড়ি, তা কাঁচা মাছিমের অস্ত্রত বাংলা উচিত।

কিন্তু মিনিটটা বড়ই মধুর। তার প্রান্ত গোল শতকরা নিরসকষ্ট জন গোড়েরই আছে। কিন্তু সারকে ঊলকা ক'রে শুধু রসের চর্চা করা একটা ভুলপ্রতি। এ ভুলপ্রতি গাছের নৈই। তার শরীরে বসে আছে দারুণ আছে। আমরা নিহক রচনাবিজ্ঞানের দলে যদি একটু সারবান সাহিত্যেরও চর্চা করি, তা হ'লে বোধ হয় সাহিত্য-মেহের সন্ধ্যা পরিপূর্ণি হয়। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের দিকে

চাটলেই একটা অসমতা এবং অসামঞ্জস্য আমাদের নয়ন মনকে বাণিত করে এবং লজ্জা লুকেই মনে পড়ে ট একটা বিজ্ঞাপনের বাজ চিত্র যাতে মাথার অঙ্গুষ্ঠেতে দেহটা ঠেকে দ্রিক বাহার অঙ্গুষ্ঠেতে খড়কেকাটি।

অন্তবেশের ভাষার কারশানার যেমন কাব্যে গড়া ঠেকে তেমনি বিজ্ঞান সাহিত্যে গড়া ঠেকে—কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞান সাহিত্যে একজন অক্ষম লোকের লেখা স্পষ্ট-লুকেই পর্ণাধিত। কাকেই আমাদের ভাষার আধারের ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া সূরে লাক্ নিয়মিকা দেওয়াও ওঠে। বিবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা যদি আজ বলেন বাংলা-ভাষাতেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হবে—সাতা পুস্তক নির্ণয় কর, তাহলে আমাদের দুখ চাওয়া চাওরি ক'রে সাক্ষ্য চুককানো ছাড়া উপায় নেই।

বাগ্জা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে তারা জ্ঞানের কোন বিষয়ের অসাদবস্তের ঠেকে দেখেনা। তাদের কাছে কোন বিষয়ই তুচ্ছ নয়। তারা নিত্য নূতন বিষয়কে সাহিত্যের গভীর মধ্যে টেনে নেয়। ইংরাজী ভাষার দাবোখেরও literature আছে, শিবচাঁদেরও literature আছে, মোকানবারিরও literature আছে। সাহিত্যের যজ্ঞোপবীত গলায় চলিয়ে চুরিবিজ্ঞান একদিন তার শূদ্র চারিহে ‘গৌরী পাশ’ নামে আপাত হুয়েছিল এবং সে আমাদেরই এই কাব্যবাস্তবিকতার দেশের কোনো-এক প্রাচীন দূরে। সাহিত্যিকের দেখনী স্পন্দমণি, তা ইতর বাস্তবকেও বর্ণের আভিজাত্য দিতে পারে। কিন্তু অতাব যে সাহিত্যিকেরই।

কিন্তু কেন এ অতাব? বাংলা দেশে কি চিত্রাঙ্গিল একমিষ্ট সাহিত্যসাধক নেই? আছে—তবে যে সারবান বিজ্ঞান সাহিত্যে বাংলা ভাষা এখনো পরিষ্ক, তার হস্ত এমন কতকগুলি গুহবস্ত প্রতিক্ষক আছে যা অঙ্গুষ্ঠান ক'রে দূর করতে হবে।

একটা কারণ আমরা পুণ্যেই ধরেছি। বাঙালী ভাষাটা বড়ই তাত্বিক, তলিক, কবিত্বপ্রিয়। তার দলে সে দর নিহ উচ্চ কাব্যের সমাজভাষ্য হতে পারে, এত শীঘ্র বোধ হয় আর কোন ভাষাই পারে না। কিন্তু সূক্ষ্মের তক্ত হ'লেই

যে শিক্ষকের মন্দির গুরুত্ব পাতবে এমন কি কথা আছে ? তার কল্প যে শক্তির টাকার সবকার তা 'বই' লোকের কপালে উপস্থান ক'রেন না। কিন্তু ঐ মন্দির গুরুত্বের 'কৌশল' আমাদের অধিকাংশকেই এমন পেয়ে ধ্বংসে—ঐ বার্ষিক নেশার বিকল্পনায় আমরা এতই মত্ত যে, আমাদের খেলায় নেই যে আমাদের শিশুশ্রমিকের জ্ঞানের চাপটুকুও তাঁর পাঠ্যের অতীতে জেগে পড়বে—বা ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য মাথা গোঁজার লবণ। আমাদের এ রোগের সংকট নাম হচ্ছে চর্কুছি ও চুপকাচ্কা—এক পানী বাঁশায় একটু ধলে 'হলে ধরতে পারি না, কেউতে ধরার লায়'।

আর একটা কারণের টিকিত দিয়েছেন বহুমুখ্য ও বহুপ্রকার তত্ত্বনেই। সে কারণ হচ্ছে এই। আমরা লাল্পরা। যে জ্ঞান আমরা কিনা তাই তাহার প্রাণে বিক-বিভাগের মারক-প্রাণ চুটি তা আমাদের চ'ত-কনের মাথা'র মাথা'র খুঁতে বেড়াচ্ছে, ঘেঁষের গায়ে বসতে পারতে না। আমাদের বাংলা নবীন্দ্রা থেকে বাক্সে যে তিসিরে সে তিসিরে। রবীন্দ্রনাথের ভাবায়—শিক্ষার ভোজ আমরা নিজেরা ব'লে থাকি, পাঠের প্রসাদটুকু পল্লভ আর কোনো কৃষিত পার কি না পাথ সেদিকে আমাদের খেলায় নেই।

বহুমুখ্যের ভাষা মারো স্পষ্ট, আরো তীর। কয়েক ছত্র ছবল তুলে দিচ্ছি : 'কেন যে ইংরেজি শিক্ষা লুপ্ত সেলে শোক শিক্ষার উপায় হ্রাস বাতীত বৃদ্ধি পড়িতেছে না তাঁহার মূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিত সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের দ্বন্দ্ব বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের গতি গুণিপাত করে না। মরুক রামা লাল্প চলে, আমরা ফাউলকারি বৃদ্ধি হইলেই হইল।'

ঘেঁষের সর্গশ্রেষ্ঠ চন্দ্রন মনীরী যে অল্পবয়সের অবতারণা করেছেন, তাকে ফার্মনিক ব'লে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমার নেই। আমি সাধারণ ভাবে বোকার ক'রে নিচ্ছি তাঁর মততা, কিন্তু এ কথা বোকার করতে পারছি না যে একজন শিক্ষিতেরও সমবেদনা নেই অশিক্ষিতের জন্য।

৫. তবে প্রাণের বিষয় এই যে যেখানে সমবেদনা আছে সেখানেও

তু ফলপ্রসূ হ'তে পারবে না। তথাকথিত শিক্ষিতেরা এতট মাছুতাবার কোল হ'তে বিচ্ছিন্ন যে মাছুতাবার ভাষা মাছু-প্রকাশ করতে অক্ষম। তাদের বিনাশিত বিভ্রা মনের মোটবুকেই টোকা থাকে, বুকের কথা'র কুটুংগে সাঁটল করে না। তা ছাড়া সেই আড়ো-গোলা বিভ্রা এতট কম তাঁর হয় যে, তাঁর কথিকানান্তর বক্তে পরিণত হয় না। আর নীরন্তক্কে inflection এর সাহায্য দিও চলে নিতর বক্ত-সেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তিন নম্ব কারণটি গুরুত্ব পুরুত্বে বহুপ্রকার প্রবন্ধ হ'তেই পেয়ে গেলাম—“বাংলা ভাষার উচ্চনের শিক্ষাগ্রহ কই ? নাই—সে কথা মানি কিছু শিক্ষা না চললে শিক্ষাগ্রহ হয় কি উপায় ? শিক্ষাগ্রহ পাঠ্যের পাত নহ যে, পৌখীন শোক লব কিস্তা তাঁর কেছারি করিব—কিনা সে আগাছাও নহ যে মাটে বাটে নিজে লুলকে নিজেই কটকটিত হইয়া উঠিব।” বাংলা ভাষার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রহ ব্যতির চ'তেছে না এটা যদি মাৎসেব বিষয় হয় তবে তাঁর প্রতিবাদের একমাত্র উপায় বিবর্তনগণে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন কর। ঘেঁষে টাকা চলিবে না অথচ টাকপাল চলিতে থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লক্ষ্যের ?”

অস্তায় আবদারের মত লক্ষ্যের হিনিব খুব কমট আছে মতা, কিন্তু আমি ছিদ্দান্ত শিখের স্তায় বারবার নাই লবনবে রবীন্দ্রনাথকে গর কটি যে, টাকপাল না চললেই বই টাকা চলার লক্ষ্যবনা কোথায় ? মাতার শিবে কবে নাক এখ: ঘলে নেবে মাতার লেখা এ চুটো সমস্তার কেন্টিটার মোমাগো অগিম ? আর টউনিভার্সিটি'র কুংব দায়া না মাগা মোড়াবে তরাত যে আধুনিক মরণ-চিত্রাব মূর, তাদের কানে যে উচ্চ শিক্ষার মত চলবে না (আমি রবীন্দ্রনাথের ভাবাই বাবতার করছি) প্রত্যা তাদের জন্য শিক্ষাগ্রহ তৈরি করা যে পৌখীন শোকের লব ক'রে বাগান তৈরি করবার মতই বৎসরকো কাজ, তাঁর বা কি ক'রে বলি ?

আমার মনে এর বহুপ্রকার আলগ যে কথাটি বলতে গিবেও স্রষ্টিকটুইবে জর বৃথ কুটে বসন্ত পাবেননি সে





২৪

সেদিন রাতে বিদায়-কালে ছবি শেষ করবার সময়ের বিষয়ে বিনয় কমলকে যে আশ্বাস দিয়েছিল কার্যকালে তা যিকোনু হ'য়ে গেল। গতরা ঘড়ী তই ক'রে নিয়মের পরিশ্রমে ঘাবড় আটদিনের মধ্যে ছবি শেষ হ'ল না। আট দিনের দিন ছবি আঁকার পর তুলি যা প্রতীতি ক্ষুদ্রাভে প্রচোতে বিনয় বললে, "ছবি আঁকা দেখেই হয়েছে—তুমি কাল এক-গাব অলক্ষ্যেই ভয়ে এসে মিলিয়ে দেখেছ। নিত্যন্ত দরকার বৃদ্ধে ত একটা মাত্র টান দেখো—না দিতেও পারি। আজ অম সময়ের মধ্যে এত বেশি কাজ হয়েছে যে, আজ বেগে দিক ত্যাগ করতে পারব না।" তারপর কমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মুড় হেসে বললে, "এবার আপনার অব্যাহতি মিষ্টি হইত,—কিন্তু অনেক কঠোরোগের পর।"

উত্তরে কমলা কিছু বললে না। তবু দুহুঁতের ভয় ওঠা-দরে, অপরাজিত-দিশস্তের নিঃশব্দ বিভাংপ্রসার মত, আঁব-চামির দেখা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

অন্যে একটা ইমি-চোরায়ে অর্ধপ্রাণিত হ'য়ে বিকলাগ ছবি আঁকা দেখছিলেন, বিনয়ের কথাই সোচ্চা হ'য়ে উঠে ব'লে বললেন, "কঠোরোগের পর কিনা তা জানি নে, কিন্তু অনেক কষ্ট দিয়ে তা নিশ্চয়। একদিন তুমি যেভাবে ছবি এঁকেছ তা দেখে মাকে মাকে সত্যিই আমার কষ্ট হ'ত বিনয়,—মনে হ'ত, মনকে অত বেশি একত্র করতে গিয়ে মনকে তুমি অতি মাত্রার পীড়ন করছ।"

একটু ভেলে দুহুঁতের বিনয় বললে, "কিন্তু আমি বেশি, একাগ্র না হ'তে পারলেই মন দেন বেশি পীড়া লাগে।"

বিনয়ের কথাই মনোযোগ না দিয়ে আসল ভাষা ক'রে উঠে এসে কমলার ছবির সমুদ্রে গাড়ির গলগলুয়ে বিকলাগ বলতে লাগলেন, "কিন্তু কষ্ট যেমন তুমি কঠোরোগে পড়েছ তেমনি। এ কি মতক ছবি হ'য়েছে? ছবি

কি দেখানে দেখানে দেখতে লাগে। তবু কমলার মুক্তি নয়,—এ কমলকে আশ্রয় ক'রে তুমি কমলাগমনার মুক্তিখানি এঁকেছ বিনয়।" তারপর সন্ধ্যার বিকে চেরে বললেন, "তুমি সেদিন যে কথা বলছিলেন সন্ধ্যায়, তা'তে কোনো তুল নেই,—এ ছবিতে কমলকে অসুখের কথা চলে নি—সুখী কথা হয়েছে।"

বাথানার প্রান্তে একটা টোয়ারে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যায় পক্ষির একখানা উপগ্রাস শুঁছিলেন। যিকলাগের কপালে উঠে এসে ছবির সামনে গাড়ির ক্ষণকাল নিশেপে ছবিখানায় বিকে চাকিরে বইল; তারপর দীর্ঘে ঘাংে বললেন, "আপনি কিন্তু এক কয়েকদিনে ছবিটা অনেক বদলে দিয়েছেন বিনয় বাবু। আমি এসে যে উচ্ছল প্রকুর মুক্তি দেখেছিলাম একটা ঘিষানের ছায়াপাতে আপনি তা টেকে রেছেন।"

যিকলাগ বললেন, "কিন্তু তা'রে বোধ হয় ছবিটা আবার ভালই হয়েছে। প্রকুরতা যত উচ্ছল হ'ক না কেন, বিধাৎক কমলোহতা তাকে স্পন্দ না ক'রে থাকলে যে চর চরঃ তুমি ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখো প্রত্যেক প্রকুর চাকিরে





কমনীয় করে চোখের কোণের জলছলোতাধ,—কিবা তাঁটের  
পাশের বিবাদের টান,—তার রক্তাবে চাপি হয় একবারে  
নারদ উগ্র—যেমন মাকে মাকে দেখা যায় সিগারেটের  
টিকিটের ছবিতে কিবা বিগতি কৃত্যের ময়ের মাগাজিমে।”

বিনয় কিছু না বলে বিজনাপের দিকে একবার দৃষ্টিপাত  
ক’রে একটু হাসলে, তারপর আর সকলের সঙ্গে গাড়ির  
ছবিখানা দেখতে লাগল। ছবির অপরপ্রান্তে বিবাস-মেঘের  
প্রমিষ্ট হাত, মেঘেরে হতল গভীর দৃষ্টি, মুখমণ্ডলে অনিষ্ক-  
ল্লেখ্য বেদনার জ্বলিত মাধুরী,—সমস্ত ভক্তিটি আলো-হারা-  
বচিত বহা-বিনাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুদৃষ্টিতে  
সকলে মগন, জগৎজিত চিত্রখানি দেখতে লাগল—  
এমন কি বিনয়-কমলাও।

হাবার সময় বিনয় বললে, “কাল আমি সকালে না এসে  
বিকেলের দিকে আসব। সকালে আমি দেওঘরে থাকব  
না।”

বিজনাপ জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় যাবে?”

বিনয় বললে, “মধুপুর। আমার একটি বন্ধু পীড়িত  
হ’য়ে গেছে আস্তে।” একবার বেঁকে-কেনে আসব।”

“কটার গাড়িতে যাবে?”

“সমস্ত আজ রাতি গাড়ি মগটার গাড়িতে। আমার  
বন্ধু পীড়িত হ’য়ে একটির সময়, আমি তার কিছু আগে  
মধুপুরে পৌঁছব। আমার অধিকার সজ-সরঞ্জাম শুধো  
আজ এখানেই রইল—কাল পাঁচটার গাড়িতে ফিরে টেনশন  
থেকে একবারে এখানে আসব।”

বিজনাপ বললেন, “তা হ’লে তুমি ও-বেলা সড়কার  
সময় এখানে এসে; এখান থেকে রাতে গেতে-গেয়ে  
গাড়িতে গিয়ে উঠবে।”

সুতরাং বিনয় বলল, “আজ্ঞে, না,—তার আর কাল  
নেই। আমি রাতি গাড়ি মগটার গাড়িতেও যেতে পারি,  
সকাল উঠার গাড়িতেও যেতে পারি, এখনো একবারে ছিঁর  
করতে পারিনি।” তারপর নিমন্ত্রণ অস্বীকার করায়  
বিজনাপ স্তব্ধ হয়েছেন বুঝতে পেরে সাধনার উৎসাহে  
বললে, “কাল মধুপুর থেকে ফিরে এখানে এসে চা খাওয়া  
যাবে।”

বিনয়ের কথা শুনে বিনোদ হাসতে লাগলেন; বললেন,  
“আজ রাতি খেয়ে গেলেই কি কাল চা-টা বাদ পড়ত?  
আজ্ঞা, জোয়ার যেমন সুবিধা হয় কোরো।”

বিনয় প্রস্থান করলে বিজনাপ বললেন, “এমন অদ্ভুত  
মাত্রায় যদি উঠি আছে, কিছুতে যদি ধরা বাধা দেবে!  
হেলেনো! থেকে জীবনটা অনাবশ্যিকের মধ্যে কেটেছে ব’লে  
আত্মীয়তাটা বোপ হ’র বরদাত হয় না। নিজে কোনো-  
মতে ধরা দেবে না, অথচ—”

কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে সে কথা সত্য  
বন্ধ ক’রে বিজনাপ একটা চুপুট ধরতে উদ্ভত হলেন।

দোকানদার সন্তোষ জিজ্ঞাসা করলে, “অনাবশ্যিকের মধ্যে  
কেন? ওঁর বাপ-মা নেই না কি?”

বিজনাপ বললেন, “সে কি আজ কাল নেই? শিকড়াল  
থেকে নেই। তাছাড়া শুধু কি বাপ-মাই নেই? তিন  
কুলের মধ্যে এক কুল ত’ এখনো জ্বলি—যাকি চকুলে কে  
আত্মীয় কোথায় আছে তা ও কিছুই জানে না।”

সবিসময়ে সন্তোষ বললে, “কেন?”

তখন বিজনাপ বিনয়ের মুখে তার জীবনের যে কাহিনী  
শুনছিলেন সবিসময়ে বিস্ময়ে নিমগ্ন করলেন।

কৌতুকী সন্তোষ বিজনাপকে প্রেরণের পর প্রেরণ করতে  
লাগল, কিন্তু কখনো একটি কথাও বলল না,—বিনয়ের  
জীবনের কলন কাহিনী তার মনে যে বেদনার তরল জাপিরে  
কুলেছিল তার আবেশে সে বন্ধ হ’য়ে ব’লে রইল। গরতীন  
মজলদীন বিনয়ের কথা মনে ক’রে কতবার আর সারাহুত্বিতে  
তার সমস্ত অন্তর আঁঠি হ’য়ে উঠল;—কিন্তু পরকণ্ঠেই মনে  
হ’ল কার জন্তে এ আবেশ করছি? হার জন্তে, সে ত নিশ্চল  
নিষ্কিয়ার! প্রস্তুতি নেই, অথচ মুখে সর্বদা লগম আর লগম!  
না কেউ তাকে বুঝতে পারে, না সে কাউকে বোঝে। বাবা  
ঠিক বলেছেন, নিজে ধরা ছোঁষা হবে না অথচ—

সুধা মনে পড়ল পোতার কথা—সে দেখিনি বলছিল,  
শৈলবা তাকে বলেছে বিনয় কমলাকে ভালবাসে। মনে  
মনে মাথা নেড়ে কমলা বললে, কুল, কুল, ও সময় কুল!  
নিজের মনের মধ্যে যে মস্ত বড় ত্রেকা ক’রে ব’লে আছে  
মনকে সে আঁগা দেবে কেনন ক’রে?

"বাবা ?"

"কি মা !"

"বেলা অনেক হ'ল। এবার নাওয়া-খাওয়ার ভাঙে উঠলে চলিছে।"

ভাঙের কলিভে-বাধা যদি দেখে বিজ্ঞান বললেন, "তাই ত', এগারটা বাজে। চল সন্তোষ, মাঝে মাঝে ক'রে কাজ নেই। কিন্তু তুমি যে কথা বলছ,—আমার ঠিক তা মনে হয় না। সন্তোষ ব'লে কোনো জিনিষের ধারণা নেই ব'লে নিজের একটু উদ্ভৃতা হ'তে পারে, কিন্তু সে সামাজিক নয়। সন্তোষ তার নেই হুটে, কিন্তু সমাজ-ছাড়া সে কখনো নয়। বরক, সাধারণত লোকের যেমন হয়, তার চেয়ে বেশি সমাজের গুরু পরিচয় ঘটবার তার প্রয়োগ হচ্ছে।"

মুহু হেসে সন্তোষ বললে, "আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না বলতে পারিনি—গত আটদিনে ছবি আঁকবার সময় বিনয় বাবু সবুজ আঁটার কথা বলেছেন কি না সন্তোষ। কোনো কোনো দিন ত' একেবারেই বলেন নি—এমন কি আমাদের কথার প্রলোভনও নয়।"

বিজ্ঞান বললেন, "ও-টা ওর খোয়ালী প্রকৃতির ভাঙে; যখন যেমন মুহু-এ থাকে তখন তেমন। দেখলে ত' সে দিন রাতে ও-ই চর্যাংক প্রদান করল—যুগে যেন কথার ভাবটি হুটছিল।"

সন্তোষ বললে, "কিন্তু সে দিনই কি কমলার সঙ্গে ওরকম তীব্র ভাবে তর্ক করা উচিত হ'য়েছিল? বলতে পারিনি আপনারাওর সঙ্গে বিনয় বাবুর কি রকম ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যাহ ছবি আঁকতে আসাই যদি একমাত্র পরিচয় হয় তা হ'লে সেদিন তিনি ঠিক সঙ্গত সীমার মধ্যে ছিলেন না।"

বিজ্ঞানকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে কমলা বললে, "বাবা, ঠিক সময়ে তোমার বাগান না হ'লে, ও-বেলা মাথা ধরবে।" যুগে তার একটু অসন্তোষের রক্তমা, যা সন্তোষের অথবা দৃষ্টি অতিক্রম করলে না।

পদ্মসুখী কাজ থেকে ইজিত গাভীর পর্কায় যে লগ্নের সন্তোষের মনে প্রবেশ করেছিল গত কয়েক দিনে তার আয়ত্তন ক্রমশই বর্ধিত হয়েছে। কমলা অথবা

বিনয়ের আচরণে অন্য এমন কিছু যাঃ নি বা সাধারণত লগ্নের উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু লগ্নের এমন বস্তু যা ম'নের মধ্যে একবার আশ্রয় নিলে মৌন-ও অর্থহীন হ'য়ে ওঠে এবং উপেক্ষাকেও আগ্রহের ভাষায় ব'লে মনে হয়। তাই তার কথার বাধ্যতাপূর্ণ কমলার সম্মত কথা পাড়া এবং কমলার যুগে বিরক্তির চিহ্ন উভয়ের মধ্যে কোনোটিই সন্তোষের লক্ষ্য অতিক্রম করল না। স্নিহ্ন উত্তর ব'লে সে বললে, "আচ্ছা, এ সব কথা তা হ'লে থাক।"

বিজ্ঞান বললেন, "তা সেই ভাল, চল, নেয়ে নেওয়া থাক।"

২১

পদ্মসুখী সকালে নিজের কাজে ব'লে কমলা একখানা কলোরে বই ওঠাচ্ছিল, এমন সময় একজন চাকর এসে খবর দিলে বিনয় এসেছে।

কমলা ভাড়াভাড়ি বাইরে এসে দেখলে বিনয় দ্বিঃ খাচ্ছে। ভ্রতগণে বিনয়কে খানিকটা অহুসরণ ক'রে একটু কাছাকাছি এসে ডাকলে, "বিনয় বাবু।"

বিনয় তখন গ্রাম গেটের কাছে পৌঁছেছিল, কমলাও আছায়ে কিংবে নিকটে এসে বললে, "এ, আপনি আবার কষ্ট করলেন কেন? আমি ত' আর একজন চাকরকে ব'লে দিইছিলাম আপনাকে জানাতে, ও কোথায় আসবে।"

সে কথার কোনো কথা না ব'লে কমলা দ্বিঃলাস করলে, "কাল তাহ'লে আপনার মধুপুর বাগান হয় নি?"

বিনয় বললে, "না, কাল বাগান হয় নি; আজ বেলা সাড়ে বশটার পাকিতে যাচ্ছি। মনে কম্বলিগাম আপনার ছবিটা দেবে দিইয়েই বাই; বেশিকম ত' লাগবে না—ওরত একেবারেই কিছু করতে হয়না। কিন্তু গেরাজে গাড়ি নেই দেখে খবর নিয়ে মানলাম দ্বিঃতার মিত্র ব'য়েইয়েম।"

কমলা বললে, "হ্যাঁ, বাবা আর সন্তোষ বাবু রিক্সায় গেছেন, বেলা এগারটার মধ্যে গীরা ক্রিঃবেন। দ্বিঃকিঃব সন্তোষ বাবুর একজন আছীর আছেন, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কিন্তু আপনি কিংবে যাচ্ছিলেন কেন? এসেছেন যখন, তখন ছবিঃব বাগানটা দেখে ক'রেই দিন না।"



একটু ইতস্ততঃ ক'রে বিনয় বললে, “থাক্. এমনই কি ভাড়াভাড়া আছে, ত-বেলাই হবে এখন। মিষ্টার মিত্র উপস্থিত থাক্বেন, হুঁবিধে হবে।”

কমলার মনেও কোন নিরুত্তর কোনে একটুখানি অভিমান আছেও চরে উঠে: বললে, “বাবা উপস্থিত না থাকলে যদি ভবিষ্যৎকালের বিষয়ে আপনাদের অস্থবিধে হয় তা হ'লে থাক্—কিন্তু আপনি এখন থাক্বেন কোথায়? গাড়ি ত' আপনাদের গাড়ি দাঁড়ায়, আর এখন গাড়ি মাটিটাও হয় নি,—এত ঘটনা আপনি কোথায় কটাবেন?”

মুহুরিত মুখে বিনয় বললে, “কটা কোনেও এমিক্. ওদিক্. একটু ঘুরে, বাকি এক ঘটনা টেপেনে। দু'ঘণ্টা ত' অল্প সময়—সময় নষ্ট করবার এমন কোনও আশঙ্কা আমার জানা আছে যে, দু'ঘণ্টার পরিবর্তে চার ঘটনা হ'লেও আমার ভাবনা হ'ত না।”

কমলা বললে, “তুমি সময় নষ্ট কর, পরীক্ষা নষ্টের বিষয়েও আপনাদের ভাবনা হয় না। কিন্তু সকলেই ত আপনাদের স্বত্ব ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না।—চলুন, ছবি আপনার আঁকতে হবে না, এ সময়টা আমাদের বাড়িতে ব'লে কাটাওয়েন, যদি না বাবা উপস্থিত নেই ব'লে সে বিষয়েও অস্থবিধে বোধ করেন। এই তাস আপনাদের আসনের চৌক্রে খালি রাখার এক ঘটনা ঘুরে বেড়াবার লক্ষ্য পরিচালনা করুন।”

নারায়ণ একটু কি চিন্তা ক'রে বিনয় বললে, “এতখানি সময় আপনাদের আঁকতে রাখব?”

“হ্যাঁববেন।”

খিচ-বিচ্ছুক হয়ে বিনয় বললে, “তা হ'লে তাই চলুন।” পূর্বদিন যিগুনখের মুখে বিনয়ের দীর্ঘ কান্ডিনী শুনে কমলার মনে যে বেদনা সঞ্চারিত হয়েছিল আজ তা তার অন্তরকে একেবারে উত্তেজিত ক'রে তুলে;—মনে হল, আঁতা! মা নেই বাপ নেই, তাই নেই যোন নেই, গৃহ নেই সংসার নেই—তাই এমন! তাই খালি মাথার যৌনে শীত্রে এক ঘটনা ঘুরে বেড়াতেও কষ্ট হয় না, তারপর আবার আর এক ঘটনা চুপ ক'রে টেপেনে ব'লে সময় কাটাতেও চেষ্টা বোধ করেন না! গৃহ দার নেই, টেপেনই তার পক্ষে কম আশ্রয় কি! আশ্রয় বহন করে নেই, টেপেনের লোক-

জনরাই তার পক্ষে অন্যায়ের কেনন করে? একটা অনিশ্চয়তার সমস্তই কমলার চিত্ত সঞ্চিত হ'তে লাগল। মনে হ'ল, এই পগনবিহারী স্নাতক-পক্ষ পাখী পাখার নীচ বাধুক, বহনহীন বহন গাড়ি ককক, বৈরাগী সংসারী হ'ক। বাস্তবিক উঠে বিনয় বললে, “এলামই বহন, তখন ছবিটা আঁকতে বলুন—একবার দেখি কেনন হ'ল।”

কমলা বললে, “আজ্ঞা, আপনি বহন, সে না এর পরে দেখবেন। আমাকে বলুন ত' আপনি যে যাচ্ছেন, গীতা কি জানেন,—আজ্ঞা আপনি যাবেন?”

বিনয় বললে, “না, তা গ্রিক জানেন না।”

“তা হ'লে, আপনি ত' পৌছবেন বেলা একটা-দেড়টার সময়—তখন গীতার নিকটই যাওয়া যাওয়া হ'য়ে যাবে—আপনাদের যাওয়ার কি বাধা হবে?”

এ সব কথা শুনে উত্তেজিত পাখনের মত উঠে তা বুকতে গেরে বিনয় বললে, “পৌছতে একটা-দেড়টা না হ'লেও, আমি তাদের গোলমালের বাড়িতে যাওয়ার গোলযোগ করব না তা দ্বিধা ক'রেই থাক্বি। আমি মধুপুর টেপেনে ফেলনারের হোটেলের পাওয়া গেরে তারপর তাদের বাড়ি যাব;—তাতে কোনো অস্থবিধে হবে না।”

কমলা বললে, “তার চেয়ে কম অস্থবিধে হবে আপনি যদি ঘটনাবলির পরে এখানে চারটি কোল ভাত খেয়ে নেন তা হ'লে। তা'তে পরীক্ষা বাঁচবে—সময়ও বাঁচবে।”

বাড়ি হ'য়ে উঠে বিনয় বললে, “না, না, দেখুন মিস্. মিত্র, ও-সব হাঙ্গামা আপনি করবেন না।”

কমলার গলাধরে মুহূর্তে রেখা দেখা দিলে; বললে, “মিস্. মিত্র ব'লে আমাকে না ডেকে যদি মিস্. কালো ব'লে ডাকেন তা হ'লেও করব। আজ্ঞা, আপনার এ কি অস্ত্রের কথা দেখি, এত অন্যায়ের মত ভয়ভয় রেখে চলতে চান কেন আপনি? মনে পড়বে? বেলা দাঁড়ায় মধ্যে আমাদের সময় রাত্রি হয়ে যায়, একই তংপর হ'য়ে গাড়ি নটার সময়ে আপনাকে বাইরে দেওয়া কি এতই হাঙ্গামা হবে? না, সে আমি কিছুতেই শুনব না খেয়ে খেতেই হবে আপনাকে। তা ছাড়া, এ বিষয়ে বাবা উপস্থিত নেই, সে আপনাকে খাটবে না। তিনি থাকলে আপনি যদি গীতাকে রাজী করতে

## ঐতিহাসিক গল্পাংশাংশ

পারতেন তা' হ'তে পারত। আমি কিছু কিছুতেই তন্দ্ব না।"

বাড়-কণ্ঠে বিনয় বললে, "না, না, সে আশঙ্কি আমি একবারও করছি—আমি আপনাকেই অগ্রাহ্য করছি।"

কমলা বললে, "অগ্রাহ্য কেন, আশঙ্কি করলেও আমি আপনার কথা তন্দ্ব না।" অধুনা একজন চাকর কান্না করছিল, তাকে ডেকে কমলা বাবুটিকে ডাকতে বললে। বিনয় অনেক গল্প আপত্তি করলে, কিন্তু সে তা'তে একবারেই কর্পাস্ত করলে না।

বাবুটি এলে কমলা বললে, "সাদে দশটার গাড়িতে বিনয়বাবু মধ্যপূর গিয়েছেন—কতক্ষণ পরে তাঁকে বানা দিতে পারবে?"

একটু ভেবে বাবুটি বললে দশটা খানেকের মধ্যে দিতে পারবে।

"আজ্ঞা, ঠিক সাদে দশটার সময়ে উনি যেতে বসবেন।"

বাবুটি সেলাম করে প্রস্থান করল।

বিনয় বললে, "এবার তা হ'লে ছবিখানা আনান—আমার আপত্তি অগ্রহণ্য প্রত্যাহার করছি।"

মুহুরে কমলা বললে, "আজ্ঞা, আনছি।"

ছবি আনা হ'লে কমলাকে একখানা চোরায়ে বসিয়ে বিনয় অনেকক্ষণ ধরে কমলাকে এবং তার ছবিকে ঘিরে দেখলে—তারপর তুলি নিয়ে ছবিটারে টান-টান দিয়ে বললে, "দেখ হ'ল। আর কিছু কতবার নেই।" তারপর তুলি ভাঙা তুলিতে তুলিতে বললে, "এবার খাড়া গিনিস—হাতে থাকলে হাত নিশ্চিন্দ করে—তার কণ্ঠ অনেক ছবি ভাল করতে পারে খাড়া করে কেলেছি। বসানময়ে একে নিশ্চিন্দ না করতে পারলে বিপদ।"

কমলা হাসতে হাসতে বললে, "বসন ভয়ঙ্কর তিনিস তা'লে একেবারে তুলে ফেলুন।"

বিনয় তুলি তুলে ফেললে, কিন্তু ছবিটিকে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগল। কাছে থেকে মূর্খ থেকে, সন্ধ্য থেকে পাশে থেকে, নানিভাবে দেখে দেখে কিছুতেই বেন তার আপ মেটে না। একবার শুরু হয়ে বসে থেকে দেখলে, একবার চকল হ'লে মূর্খ করে দেখলে, বানিকজন

দুই দিকে চেয়ে কি ভাবলে—তারপর দিষ্ট-গাঠ দেখে ব'লে উঠল, "নটা বেঁকে পনের মিনিট। এবার ছবিটা তুলে ফেলতে বসুন। ও বা হবার তা হয়েচে।"

চাকর এসে ছবি তুলে রাখলে। কমলা বললে, "এবার আপনার খাওয়ার উৎসব করি।"

বড়ির দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করে বিনয় বললে, "এখনো বোধ হয় কিছু সময় আছে। লাইন ধ'রে ছোট্ট গেলো টেনে পৌছতে ক মিনিট লাগবে?"

কমলা বললে, "মিনিট ধপেতেই বেশি নয়।"

"ও, তা হ'লে অনেক সময় আছে। আজ্ঞা, আপনাকে একটা কথা বিজ্ঞাপন করি। অপরে যে-যাই বসুক, আপনার নিজের ছবিটা কেমন লাগল? এ প্রশ্ন আমি যার ছবি আঁকি তাকেই করি।"

মুহুরে কমলা বললে, "আমার পুণ্ডাল দেখেছে। যদিও ছবিটার যেমন আমি আঁছি তা না একে যেমন আমি হ'লে ভাল হ'ত তাই আপনি একেছেন—তবু কি জানি কেন ছবিটা আমার ভারি ভাল লাগে। মনে হয়—এই রকম আমি যদি হ'তাম।"

কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করে বিনয় বললে, "প্রতি রকমই আপনি—সন্তোষবানুর কথা বিশ্বাস করবেন না।" তারপর কতকটা বেন নিজের মনেই বলতে লাগল, "শুভ্রাট ছবিটা ভাল হয়েচে—এত ভাল ছবি এর আগে কখনো আমি আঁকিনি—পরেও কখনো আঁকতে পারব হ'লে মনে হয় না।" তারপর গোমাহারি কমলাকে সন্ধান করে বললে, "দেখুন, আপনার বাবা যদি টাকা কোরব নিয়েই ছবিটা আমাকে নিতে দেন তা হ'লে আমি পুঁসি হয়ে ছবিখানা নিয়া যাই।"

বিনয়ের কথা শুনে কমলার মুখ মহলা আরক্ত হয়ে উঠল; বললে, "বাবা আজি চ'ন কিনা বলতে পারিলে, কিন্তু তিনি যদি টাকা ফেরত না নিয়েই আপনাকে ছবিখানা দিতে রাজি হন তা হলেও আমি রাজি চাইনে।"

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করে দাঁড়িয়ে বিনয় বললে, "কেন?"

একটু উজ্জ্বলতার সহিত কমলা বললে, "কি আশ্চর্য্য বিনয় বাবু, এই সত্য কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না?"



আগনি আপনাদের কাছে আমার ছবি রাখবেন কেন?—তার  
ত' একটা কাগজ থাকে। চাই—গাফা ১৪ একটা কিছু অধি-  
কণে পুঁকা চাই। কটা বাবা তোলে তারা অনেক সময়  
মেগেটিক্‌ পদার্থ মিতেনের কাছে রাখে না—পতিভিত্ত  
কথা ত দুই কণা। আপনাদের প্রেক্ষণের নীতি  
আগনি তুলে যাচ্ছেন।”

কমলার কথা শুনে বিনয়ের মুখখানা একেবারে মেঘ-  
ভরা প্রকল আকাশের মত কালো হয়ে উঠল; শুধু চ'রে  
কণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, “আত্মীয়তার অধিকার  
আমার কিছু নেই তা জানি, কিন্তু তাই ব'লে কি আমি  
একেবারে প্রেক্ষণনা? একেবারে নামগদ্য?”

কমলা কিছু না ব'লে শুধু চ'রে দূরবর্তী তিকুট পাঠাড়ে  
দিকে চেয়ে ব'সে রইল।

সন্ধ্যা একটা কথা মনে পড়ায় বিনয় সজোরে ব'লে  
উঠল, “এমনই যদি আমাকে পেশবার ব'লে মনে করেন  
তবে আমাকে খাটো বেগুনার সঙ্গে এত শেকানিড়ি করলেন  
কেন? আমি অন্যায়ের মত বাবচর করি ব'লে মত  
অপযোগ্য করতিলেন কেন? বলুন?”

কমলা মনে চুপে তলোয়িত হ'য়ে উঠল; অস্তিত্ব-ধরে  
বললে, “দাদা, আমি আপনাদের খাওয়ায় কথা একেবারে  
তুলে গেছি—বোধ হয় মেটী হ'য়েই গেল। এ সব ব্যক্তি  
কথা খালু—আমি চললাম আপনাদের খাবার আনতে।”  
ব'লে দ্রুতগতিে প্রস্থান করলে।

ভিতরে গিয়ে কমলা দেখলে পদ্মবতী তখনো পুজায়  
থরে পুজা করছেন। বায়ুটিক কাছে উপস্থিত হ'য়ে দেখলে

আহাদা প্রস্তুত—বললে, “কিন্তু তাত থেকে কেন, আমি ভাঁড়ার  
ঘর থেকে ছি নিয়ে আসছি।” চাকরকে বললে,  
“বাবুর দারুন টেবিল মে আর তল তোগলেলা দাবান  
নিয়ে দা।”

অনুষ্ঠানে কমলার দ্বন্দ্ব বিদীর্ণ হয়ে দাঁড়িল।  
মেনে মেনে বললে, ছি ছি, কি করলাম,—কোর ক'রে  
মানুষকে খেতে বসিয়ে রেখে কটুজি করলাম! নিকের  
অস্ত্রের আচরণের মত কমলা মনে মনে পতবার আপনাকে  
অভিযাপন দিতে লাগল।

ভাত বাড়ি হ'লে উত্তীর্ণতার উপর অনেক খানি গাওয়া  
যী ঢেলে দিলে। নিজ হাতে লেবু কেটে গুন দিয়ে ভাতের-  
খালোখানা নিজে তুলে নিয়ে বায়ুটিক মাছ মাংস নিয়ে  
আসতে ব'লে কমলা প্রস্থান করলে। বায়ান্দার উপস্থিত  
হ'য়ে দেখলে চেয়ার পুজ—বিনয় নেই। বুকের ভিতরটা  
ছাঁই ক'রে উঠল। জীবন ব্যাপনে কাজ করছিল কমলা  
উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞালা করলে—“জীবন, বাবু কোথায়  
গেলেন?”

জীবন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “বাবু চ'লে গেলেন যিনিগনি,  
—আপনাকে বলতে ব'লে গেলেন খাবার ইচ্ছে নেই—  
খাবেন না।”

স্তম্ভিত চ'য়ে নিজস্ব নিঃশ্বাসে কমলা একমুহুর্ত  
হাড়িয়ে বইল, তারপর বায়ুটি হাতে হাতে ভাতের খালোখানা  
দিয়ে হাত বুয়ে ঘরে গিয়ে লম্বা গ্রহণ করলে।



## পুস্তক পরিচয়

**হেজাজ ভ্রমণ**—গানবাগড়র আল-আব্বাস হাজ্জান  
উমা এম. এ. এম. আর. এ. এস. জাহে, ই. এস. প্রবীত;  
মুলা এক টাকা মাত্র। প্রকাশক, মনসুরী হাটব্রেরী, ১৪  
কলেজ রোড, কলিকাতা।

চন্দ্রকান্ত উদ্ভাষন কর। মূল্যমানবের মূল্য

১. **বুর্খবিধি**। মক্কা হইতে মদিনার পূর্বার্ধ গানভূমি নন্দন  
উদ্ভেদে আরব দেশে যেতে হয়। আমাদের আলোচ্যগ্রন্থে  
এই ভ্রমণকাণ্ডিনী গিপবন্ধ রয়েছে। দেশক চিত্রাশিল্প ও  
নিকিত, এই মত তাঁর ভ্রমণকাণ্ডিনী সরল ও সহজ হ'বে  
উঠেছে, তাঁর তাঁর পূর্বাবস্থার ও আর্থিক বান্ধবা  
এতের প্রতি করে করা পড়েছে। আমরা এই গ্রন্থানি  
পাঠ করে মূল্যমান আভির্ জনক বহুবিধ, তাঁর অন্তর্নিহিত  
মৌল্য ও অনেকগুলি পথের তাঁর হাবেরী সঙ্গে গুলু পরিচয়  
পাঠে লক্ষ্য হয়েছি। তন্মধ্যে একতরকে আর্থিক বহুবাদ  
জানছি।

আরব মক্কা দেশ। ভারতে তাঁর ভ্রমণ হ'তে এসেছে তাঁর  
ভ্রমণ অর্থাৎ বইটপন্থ ও বর্ণনামক। আর তাছাড়া আরব  
ও ভারতের ভাষাভাষ ও শাসন-প্রথা আরব পার্শ্বকা  
রয়েছে। কেউনদের মনুষ্যের উপরই তাঁর কাণ্ডিনী বহু  
প্রতিমা এমন কি জীবন পূর্ণতা নিয়ে করে। কিন্তু কেউনরা  
যেমন বিভীষিকা আরব ভেমন নিষ্ঠুর ও ভীষণপূর্ণ, জীবন  
বে কোন মুহুর্তে বিপরীত হতে পারে।

২. আমরা এই গ্রন্থানি একোই বর্ণনামক গ্রন্থানি বহু  
পাঠ্য কামনা করি। গ্রন্থানি তিরেই বাগ্গের কর্তৃক  
মূল কলেজ হাটব্রেরী প্রকাশিত।

চন্দ্রকান্ত উদ্ভাষন

**ফজলাত**—মিনতিতুমার মালবার মিত্তি; ইতিহাস  
শ্রেণী-এলোবাব হইতে প্রকাশিত।

এই ক্ষুদ্র নাটিকাণ্ডিনী 'বিচিত্রা'র প্রথম প্রকাশিত  
হইয়াছিল। একতর এমন ভাষা পুস্তকাকারে মিত্তি,  
করিয়া মল-পিনাস পুস্তককর্মে, বিশেষ করিয়া মলবহুপদের,  
বহুই উপকার করিয়াছেন। এ পুস্তকখানিতে আরববাহের  
আবেদন বহু মূল্য এবং অতি সহজ ভাবে অর্জিত করা  
হইয়াছে। নাটিকাণ্ডিনী ভাষা, ভাষা, প্রথম-মত মনসুর  
শ্রেণীর। নাটিকাণ্ডিনী হলে যেহেতু বহু অর্জন  
হইতে পারে। গানভূমির অধিকাংশ বর্ণনামখের। আমরা  
অনবরতমেও মনে এই পুস্তকের বহু প্রকার কামনা করি।

**শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংহের বাণী**—মিনতিতুমার  
বহুপাঠ্যের মিত্তি, মুলা দুই আনা। একতর কর্তৃক  
বহুই হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকখানি গুরুগোবিন্দ সিংহের বাণীর মূল গ্রন্থানি  
হইতে বাংলা অনুবাদ। একতর এট অনুবাদে বহুই  
কৃতিত্ব দেখিয়াছেন। অনুবাদ যে অতি হইয়াছে, ভাষার  
শ্রেণী, কলিকাতার বহু শিখ মত এই পুস্তকখানি  
আমাদের তার গহন। পুস্তকখানির মূল্য মিত্তি  
গুরুগোবিন্দ সিংহের বাণী আলোচিত হইয়াছে। একতর  
হাতে বহুই মিত্তি এবং এই মনোবাচনা-মিত্তি পরিচয়  
দিতাছেন। এইরূপ পুস্তকের মূল্য পাঠ্য বাচনী।  
একর অনুবাদেই বহু প্রকার ভবিষ্যৎ মিত্তি  
জ্ঞান হবে।

## নানা কথা

### রবীন্দ্রনাথের বিশেষজ্ঞতা

চামুণ্ডাচরণ বিশ্বনাথ বিদ্যাবিশ্ববীরের বিশেষজ্ঞতা নিয়ে  
ভারতে কানেক্টার National Conference of Educa-  
tional বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি  
বোম্বাই ট্রাঙ্কে পড়েন। ব্রাহ্ম চামুণ্ডাচার্য হতভাক্ত হইলেন।  
বিশ্বনাথের বক্তৃতার নামই ট্রাঙ্কের এই বীরের জয়ধ্বজ হুয়া  
হুজের। তিনি কলকাতা স্টেটসমানে আসিয়াছেন তাঁহার  
অনুভবতা নাই। তাঁহার পদ প্রবলতার ভিত্তি ও ক্ষমতিতে  
তিনি ঐক্যে ঘেঁষে ফিরাইয়া আসিয়াছেন। অসহ্য প্রাণের  
কঠিন অসহন্যের গতিশক্তি তাঁহার বিশেষজ্ঞতা  
বিশ্বনাথের আশ্রয় প্রার্থনায় বিভাবী। রবীন্দ্রনাথ  
তাহার পদে পদে ও পদে পদে করে কয়েকটি বক্তৃতা  
দিলেন।—কলিকাতা স্টেটসমানে প্রথম বক্তৃতা  
করিলেন—তিনি উপস্থিত কিং মাডে।

### সচনা-প্রতিযোগিতা

দাদার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অসহন্যের পুনরাবৃত্তি  
সচিনা প্রতিযোগিতা বিজয় প্রাপ্তি অসহন্য  
অসহন্যের পদে পদে ও পদে পদে করে কয়েকটি বক্তৃতা  
দিলেন।—কলিকাতা স্টেটসমানে প্রথম বক্তৃতা  
করিলেন—তিনি উপস্থিত কিং মাডে।

ঐক্যবাক্ত সত্যকার, সভাপতি কর্তৃক, সচিনা-প্রতিযোগিতা,  
সচিনা-প্রতিযোগিতা।

### নিম্নাতি হিন্দু-শিক্ষণ

সৌভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণের উপলক্ষে দাদার ২. ৩  
৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০.  
২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০.  
৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০.  
৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০.  
৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০.  
৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০.  
৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০.  
৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০.  
৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

### নিম্নাতি ভারতের মহিলা শিক্ষা সচিনা

সচিনা-প্রতিযোগিতা বিজয় প্রাপ্তি অসহন্য  
অসহন্যের পদে পদে ও পদে পদে করে কয়েকটি বক্তৃতা  
দিলেন।—কলিকাতা স্টেটসমানে প্রথম বক্তৃতা  
করিলেন—তিনি উপস্থিত কিং মাডে।

### সচিনা-প্রতিযোগিতা

সচিনা-প্রতিযোগিতা বিজয় প্রাপ্তি অসহন্য  
অসহন্যের পদে পদে ও পদে পদে করে কয়েকটি বক্তৃতা  
দিলেন।—কলিকাতা স্টেটসমানে প্রথম বক্তৃতা  
করিলেন—তিনি উপস্থিত কিং মাডে।



ગેવ્. ના. વિન

નિર્મો—કૃષ્ણ કિ. મહ



૧૯૨૪, ૧૦૦૪



५.५:



চাতিপুষ্টি চলেচে। এক এক দেশে এক এক দল লোক আত্মীয়তার বন্ধনে পৃষ্ঠ হয়ে মিলচে। এই মিলন বিভিন্ন প্রাপনক্ষিত জাতিতে তুলচে। এই মিলনের ভিতর থেকে ক'ট বিশেষ চিন্তা, বিশেষ শিল্প, বিশেষ সাহিত্য,—সবস্বত্ব একটি বিশেষ ইতিহাস উৎপাদিত হয়ে উঠে।

মানবের ইতিহাসে দেখতে পাই যখন আন্তর এই বন্ধন বেঁচে তখন মানুষ নিজেদের মিলনের কেন্দ্রবিন্দু একটি দেবতাকে অগ্রতর করেচে—সে দেবতা অকল্পিত নয়, ইচ্ছা-শক্তি। ঐক্যের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ উপলক্ষি বা মানুষের আছে সে দিকে নিজের আঁখার। মানুষের নিজের ভিতরকার সেট ঐক্য ব্যতিরিক্ত নিরন্তর চৈতন্যকে প্রকাশ করে চলেচে। এই ঐক্যকে সে পুত্রোপ সজনে ইচ্ছাময় বলে জানে। এই জন্তই আপন দেশের মননমাত্রের মধ্যে যে-শক্তিমান ঐক্যকে সে জানে তাকেও মানুষ ইচ্ছাশক্তি বলেই চেনে। সেই ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সঙ্গত করাকেই সে সব চেয়ে বড় কষ্টের বলে বোধ করে।

সেই আদিম মানুষের দেবতা নিজ নিজ সম্বন্ধে মতোই বিশেষভাবে বড় ছিল। তার কারণ, মানবের ঐক্যের মনুষ্যত্ব সেট গভীরে বসে ছিল। তখন এক দেশের লোকের সঙ্গে অন্যদেশের বিরোধ ছিল, এক দেশের কল্যাণ অন্য দেশের কল্যাণের সঙ্গে বাধা ছিল না। এই মতে বিশেষ ভাতি নিজের বিশেষ দেবতাকে নিজেদেরই অগ্রতর ও অগ্রদের প্রতিফল বলে জানিত। এইজন্যই বহু বিপদ দেবতাকে কল্পনা করতে হয়েছিল—এমন কি, অগ্রেব পতিমান দেবতাকে মস্তুর খায়া নিজের আন্তর করবার চেষ্টাও তখন দেখা গিয়েছে।

খাই চেনে, নিজেদের মিলনের মাকলানে এট দেবতাকে সচিবিত করায় ভিতরে মানুষের একটি গভীর মনের কথা আছে। এট পুত্রোপ খায়া মানুষ এই কথাই বলতে যে, আমাদের মিলনে নানা প্রয়োজন, সাহিত্য হতে ক'ট কিছু সেট প্রয়োজনট এর মূল নয়, এর মূল চক্ষুণে দেবতা, একটি মহান পুরুষ। এই দেবতার ইচ্ছার মধ্যে নিজেদের মস্তুর সঙ্গে বিশ্বত জেনে তবে মানুষ পতি লাভ করেছে, গৌরব লাভ করেছে, মানস লাভ করেছে। মানুষের নিজের

ইচ্ছা আছে অথচ দেবতার ইচ্ছার মধ্যে সে চাপিত হতে দেখানে ইচ্ছাশক্তি নেই কেবল আছে অগ্রতর শক্তি। সমস্তের সঙ্গে নিজের এমন ভরতর অগ্রতর মানুষ তাৎপর্য পায় নি। নিজের ভিতরকার একটি প্রাণময় ইচ্ছাময় ঐক্যের অব্যাহিত বোধ থেকেই মানুষ একটি বিরাট ইচ্ছাকে সত্ত্বাই আবিষ্কার করেছে।

কিন্তু একদিন যা সত্ত্বাই আবিষ্কার হয়েছিল তাকে আবার আবার ভিতর দিয়ে না গেলে সম্পূর্ণ করে পাওয়া হবে না। সম্প্রতি দার্শনিক য'রে মানুষ সেট সম্বন্ধে ভিতর দিয়ে চলেচে। সম্বন্ধে জ্ঞানাত্মিক ক'রে পুত্রোপ জ্ঞান জগৎকে বিপ্রেদ্য করতে দিয়ে মস্তুর শক্তিকে ধরতে পারে, কিন্তু মহান পুরুষ তাকে এড়িয়ে যায়। যেখানে সেট পুরুষ নেই শক্তি আছে সেখানে পেশক্তি বহুমান; সেট বহু কোণল আছে সফলতা আছে, অথচ ইচ্ছা নেই আনন্দ নেই।

এমনি ক'রে ইচ্ছার দেবতাম্বরে বহু আপন তারখানা-বহু গভীর হুক ক'রে মিলে, সেট পেশক্তিকে আন্তর করবার যে সফলতা তাও মানুষ অগ্রতর পরিমাণে পেতে পারল। এতে ক'রে একদিকে মানুষের বনও যেমন বাড়তে অগ্র-দিকে তার পীড়াও তেমনি বেড়ে উঠে। কলের মাপস করতে করতে মানুষের দলব দলিত হয়ে থাকে। মানুষের দ্বিবেদন সফল বড় বড় বিভাগেই কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্পর্ক, কেবলমাত্র ফলপাতের সম্পর্ক সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেচে,—এইটে স্পষ্ট মিলন নয়, আন্তরিকতার মিলন নয়, এর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অটকটুকু পরম সত্ত্বাই নেই। এর মধ্যে ছিদ্র মানুষের স্থান নেই, এর মধ্যে চরম মানুষের প্রকাশ নেই। পুত্রোপে মানুষ অনেক ক্রুর দেবতার কল্পনা করেছে, কিন্তু একালের ফলপোষ বহুদেবতার মত ভরতর দেবতা কোনো কালে ছিল না—এই দেবতা ব্যতিরিক্ত পুত্রোপকে কল্পিত করতে আর মানবতাবোধের স্বাভাবিক সৌম্যরূপেই মতে করতে।

পুত্রোপে সচিবিতো ব্যাণ্ণব্যাপ্যারে এই বহুদেবতা সচিবিত হয়েচে।<sup>১</sup> এট বহুদেবতা এক ওলা-বাসো, এ কেবল অর্থকেই জানে, পরমার্থকে জানে না। কিন্তু এই

দেবতা কাল্যাপটে বসে পড়েন।  
 একটি বড় মতা আছে, সেট মতাটি ছা-  
 এ মতা কখনো নিফল হতে পারে না।  
 মার্কিও তা যদি বা না দেখে মজলতা দেয়।

কিন্তু আমাদের সমাজের দিকে চেয়ে দেখ,  
 ক'জনো নারী। যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ করেন এ দে দেবতা  
 নর, তার দে-নিগম বিশ্বব্যাপ্যকে চালনা করে এ দে  
 নিগমও নয়। এ চাকি আচারে, অর্থাৎ নিগম বটে কিন্তু  
 প্রতিদে নিগম। অর্থাৎ একে ঘর, প্রভেদে নিফল মল।  
 যুগোলে দে ঘরের পুত্র ওর ভাঙে মাহুনের পুত্র  
 উত্তম লাগে, প্রভেদে গভীরে ক্ষেত্রে মাহুনের নতুন নতুন পথ  
 উদ্ভাটন করছে। কিন্তু আমাদের সমাজ দে-দেব নিগমে  
 চলছে তাতে পুত্রকে লবেল করছে বিলেট বিলম্ব, তার  
 জলে কেবল পুত্র আটকি করতে হয়। যুগোলে মফলতা-  
 লোভের লোভে বহুসংখ্যক লোককে কঠোর বন্ধন পৌঁকার

দে সমাজে  
 'দে-দে'





—উপভাস—

—প্রারব্জনাথ চাকুর

৪১

তঁদিন পরেই নবীন মোতির মা চাবলুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। চাবলু তেইইয়ার কোলে চড়ে তার বুকে মাথা বেধে কেঁদে নিলে। কাগজটা কিসের কত্রে পড়ে ক'রে বলা শব্দ,—অভ্যন্তর গল্পে অন্তর্ধান, না বহির্মানের গল্পে আবদ্ধতা, না ভাবগতের কত্রে ভাবনা?

কুমু চাবলুকে তড়িয়ে হ'রে বললে, “কতদিন সংসার, যোগাযোগ, কাগজর মন্ত নেই। কি আছে আমায়, কি দিতে পারা যাতে মস্ত্রবের ছেলের কাগজ কমে। কাগজ দিয়ে কাগজ মেটাতে চাও, তার বেশি শক্তি নেই। যে-ভালোবাসা আপনাকে দেহ তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিল; তুমি তাহম্মা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এত কথাটা মনে রাখিস, মনে রাখিস, মনে রাখিস।” ব'লে তার গালে চুমো দিলে।

নবীন বললে, “বোঁরাবি, এবার রক্তবপুকে লৈকিক খরে চলেচ; এবানকার শালা মাকে চোপো।”

কুমু ব্যাকুল হ'রে বললে, “আমি চতুর্ভাগিনী এসে তোমাদের এই বিশপ খটলুম।”

নবীন বললে, “ঠিক তার উল্টো। অনেক দিন থেকে মনটা ঘাঁট ঘাঁট করছিল। বেধে সেবে তৈরি হ'রে কিছুম, এমন সময় তুমি এসে আমাদের খরে। খরের আশ খুব ক'রেই মিটেছিল, কিন্তু বিবাহটার সইল না।”

সেদিন মমুহুসন কিরে গিরে কুমল একটা গিন্নব বাধিয়েছিল তা' বোকা মেল।

নবীন ঘাঁট বলুক, কুমুই যে গিন্নব সংসারের সময় গুলট শালট ক'বে দিচ্ছেত মোতির মার ভাঙে মলেক নেই, মার সেই অপরায় সে মলকে কমা করতে চায় না। তার মত এই যে, এখনো কুমুর দেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট ক'রে, তার পরে বত লাগনাই লোক সেটা মেনে নেওয়া চাই। মলা বেশ একটু কতদিন ক'রেই জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কি বস্তুরবাড়ি একেবারেই ঘাবে না ঠিক করেছে?”

কুমু তার উত্তরে শব্দ ক'রেই বললে, “না, ঘাব না।” মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, “তা হ'লে তোমার পতি কোথায়?”

কুমু বললে, “মত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আমারো একটুখানি তাঁই চ'তে পারবে। জীবনে অনেক ঘর ব'সে, তবুও কিছু বাকি পাকে।”

কুমু বুঝতে পারছিল মোতির মার মন এর কাছ থেকে অনেক দূর হ'রে এসেছে। নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, “ঠাকুরপো, তা হ'লে কি করবে এখন?”

“নদীর খারে কিছু কাম আছে তার থেকে মোটা ভাতও ঘুটবে, কিন্তু হাওয়া খাওয়াও চলবে।”

মোতির মা উত্তরার লগেই বললে, “গরো মশায় না, দেহকে তোমাকে তাবতে হবে না। ঐ মিষ্টিপুয়ের অন্নমলে দাবী রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর ভাড়া দিলেই অমনি বিবাহী হ'রে চ'লে যাব। তিনিই

আবার আরও বলে কান ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসবে, হিঁচমখে পুপুর মটবে, এই বলে রাখলুম।”

নবীন একটু ভ্রূর হ’য়ে বললে, “সে কথা জানি খেঁচ বটে, কিন্তু তা’ নিয়ে বড়াই করিনে। পুনঃকর যদি থাকে তবে সম্মানি হ’য়েই যেন চমখাই, তা’তে অরুচনের যদি টানটানি খটে দেও শীকার।”

বসন্ত নবীন অনেকবারই হামার আশ্রয় ছেড়ে গিয়ে চাষাবাসের সন্ধান করেছে। মোতির মা মুখে উজ্জ্বল পঙ্কজ করেছে, কানের বেলায় কিছুতেই লম্বে নড়তে চায়নি, নবীনকে বার বার মাটিকে রেখেচে। সে জানে ভাগ্নের উপর তার সম্পূর্ণ দারী আছে। ভাগ্নের তো বক্তরের স্থানীয়। তার মতে ভাগ্নের অগ্রাধ করতে পারে কিন্তু তাকে অপমান বলা চলে না। কুমুর প্রতি কুমুর হামার বংবার যেমন থেকে তাই বলে কুমু হামার ধর অস্বীকার করতে পারে, একথা মোতির মার কাছে নিতান্ত স্থগিচ্ছাড়া।

ধরও এলা ভাকার এসেচে। কুমু বললে, “একটু অস্কেকা করে, জেনে আসি ভাকার কি বলে।”

ভাকার কুমুকে বলে গেল, নড়া আসো খারাপ, গাওরে পুখ কমেচে, বোধহয় রোগ ত্রিক বিশ্রাম পাচ্ছে না।

আত্মপদের কাছে কুমু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় কান এসে বললে, “একটা কথা না বলে থাকতে পারাচেন, কান বড়ো তটিল হ’য়ে এসেচে, তুমি যদি এই সময়ে বক্তরবাড়ি ফিরে না যাও, বিশদ আরো ঘনিষে ধরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছিনে।”

কুমু ভ্রূর ক’রে বাড়িয়ে ধরিল। কানু বললে, “তোমার হামার ওখান থেকে ভাসিম এসেচে, সেটা অগ্রাধ করবার নক্তি কি আমাদের আছে? হামরা যে একবারে তার মুঠোর মধ্যে।”

কুমু গাফানায় বেগিও, চেপে হ’রে বললে, “আমি কিছুই বুঝতে পারাচেন, কানুদা। গ্রীষ্ম হাঁপরে ওঠে, মনে হয় বস্ত্র ছাড়া কোনো স্বাস্থ্যই আমার খোলা নেই।” এই বলে কুমু ক্ষতপথে চ’লে গেল।

হামার ধরে যখন কুমু ছিল, সেও অথকালে কোমল গিমির সঙ্গে মোতির মার কিছু কথাবাদি হ’য়ে গেছে। নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে ওজনবের মনে লক্ষ্যে হ’য়েচে কুমু পার্ভি। মোতির মা খুসি হ’য়ে উঠল, মনে মনে বললে, মা কালী কতম তাই যেন ওঠ। এতবার ওঠ! মানিলে বক্তরবাড়িকে অবজ্ঞা করতে চান, কিন্তু এ যে নড়ীতে গ্রাধি লাগলে, তুমি তো আচলে আচলে নয়, পালাবে কেমন ক’রে!

কুমুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়া মোতির মা তার লক্ষ্যেচর কপটি বললে। কুমুর মুখ বিবর্ণ হ’য়ে গেল। সে হাত মুঠো ক’রে বললে, “না, না, এ কপনের চ’তে পারে না, কিছুতেই না।”

মোতির মা বিরক্ত হ’য়েই বললে, “কেন চ’তে পারবে না তাই? তুমি যেতো বড়ো বক্তরই ঘেয়ে ওঠ না কেন, তোমার বেলাভেই তো হাসাতের নিয়ম উলটে যাবে না। তুমি যোথালদের ঘরের বউ তো, যোথাল কপের গতি দেবতা কি প্রোমাকে মচকে ছুটি দেবেন? পালাবার লখ আসলে বাড়িতে আছেই তিনি।”

হামার সঙ্গে কুমুর তিন মাসের পরিচয় দিনে দিনে তিতরে তিতরে কি রকম যে বিকৃত মুষ্টি ধরতে গড়ের আশতায় ওর মনে সেটা পুংস্ট হ’য়ে উঠল। মাগবে মাগবে সে তেখটা ধরতেই ত্রুগিতক্রমবের, তার উপাদানজলা অনেক সময়ে পুং হুয়া। ভাবার, ভরোতে, বাবচারে ছোট ছোট হসারায় যখন কিছুই করবে না, তখনকার অমভিভাক চিন্তে, গলায় হুরে, কচিতে, রাঁচিতে, চৌবনযাত্রার আদর্শে, ভেবের লক্ষনজাল আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মজুতনের মধ্যে এখন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল সে আশ্বাস করতে তা নয়, ত্রেক মতীর লক্ষা দিতে। ওর মনে হ’য়েচে সেটা যেন অস্রীল। মধুহৃদন তার ভাবনের আকৃত্ত একদিন হুসেচতাবেই পঠীবি ছিল, সেওজ্রে ‘পদমা’র মাফাতা লম্বে সে কবার কবার যে মত ব্যক্ত করত সেই লক্ষ্যাকির মধ্যে তার বক্তপত দারিত্রোর একটা হীনতা ছিল। এই পদমা-পুজার কথা মধুহৃদন বারবার তুলত কুমুর শিকুলকে খোঁচা দেবার জন্তেই। ওর সেট



স্বাভাবিক ইচ্ছা, তাহার ককণ্ডাক, দার্শনিক অসৌভাগ্য, সব হৃদয় মধুসূদনের দেহ ছনেন, ওর সংসারের আত্মিক অশোভনতার প্রত্যক্ষই কুসুর সমস্ত পত্রীর ঘনকে লক্ষিত ক'রে তুলেচে। যতই এক্সপোজিট লুটি থেকে, চিন্তা থেকে সঠিকের ফলাফল চোঁক করেচে, ততই এরা বিপুল আবেগনার মধ্যে চারিদিকে জ'মে উঠেচে। আপন মনের উপর তাবের সঙ্গে কুসু আপনটি প্রাপণে লড়াই ক'রে এসেচে। স্বামীপুত্রের কর্তব্যতার লম্বে সংসারটাকে বিভক্ত রাখবার জন্তে ওর চেষ্টার অস্ত ছিল না, কিন্তু কত বড়ো তার চেষ্টে তা এর আগে এমন ক'রে বেয়ে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর প্রকৃৎ মাসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল, তার বীজসূতা প্রকৃৎ বিষম পীড়া মিলে। কুসু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে মোতির মতক জিজ্ঞাসা করলে, "কি ক'রে তুমি নিশ্চর জানলে?"

মোতির মার ভাবি রামা ফোঁসে, লামলে নিয়ে বললে, "ছেলের মা আমি, আমি জানব না তো কে জানবে? তবু একেবারে নিশ্চর ক'রে বলবার সময় জমি। জালো ঘাই কাউকে ডেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখা ভালো।"

নবীন, মোতির মা, তাবপুর মাঝার সময় হ'ল। কিন্তু বৈয়ের এই চরম অস্ত্রাঘের কথা ছাড়া কুসু আর কোনো কিছুতে মন দিতে পারছিল না। তাই পূর্ব সাধারণ ভাবেই বস্তুভাড়া বন্ধনের কাছ থেকে ওর বিদায় নেওয়া হ'ল। নবীন তারার সময় বললে, "বৌদাশী, সংসারে সব তিনিবেরই অবদান আছে। কিন্তু তোমাকে সেবা করবার যে অবিকার চঠান একদিনে শেষেছি সে যে এমন শাপছাড়া ভাবে চঠান ছাড়েকদিন দেখে চ'তে পারে, সে কথা ভাবতেও পারিনি। আমার দেখা হবে।" অশ্বিন প্রণাম করলে, তাবলু নিশ্চয়ে কীমতে লামল, মোতির মা সুখ লক্ষ ক'রে হটল, একটু কথাও কইনে না।

৭৭

যদরটা বিশ্রামের কানে খেল। ঘাই এল, লম্বেই রইল না যে কুসুর পর্জীবতা। মধুসূদনের কানেক সংসার পৌছেচে। মধুসূদন ধন চেয়েছিল, ধন পুরো পরিমাণেই ওয়েচে, ধনের উপলুক খেজাবও মিলেছে, এখন নিজের

মতিমাকে ভাবী বাণের মধ্যে প্রতীকিত করতে পারলেই এ সংসারে তার কর্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌছেবে। মনটা যতই লুগি হ'ল ততই অশ্রুধারের সময় দারিদ্র কুসুর উপর থেকে সঠিক বেগাটী করলে বিলম্বের উপর। যিহীরা একখানা চিঠি তাকে লিখলে, লুক করলে wheream কিয়ে, শেষ করলে your obedient servant মধুসূদন ঘোষণা লই ক'রে। মাকখানটাকে ছিল। I shall the painful necessity উত্থাপি। এরকম ভয় দেখানো চিঠিতে চাটুজো বাণের উপর উন্টো ফল ফলে, বিশেষতঃ কঠির মশকা থাকলে। বিশ্রাম চিঠিটা মেঝালে কালুকে। তার দুখ লাল হ'য়ে উঠলো। সে বললে, "এ রকম চিঠিতে ভাষারি মতো লামার লোকের থেকে একেবারে খানখানী মাসাধ রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। মল্লু কোতোয়াল বেটাকে হাট দিয়ে তেকে বলতে টেকে করে, শির লেগ উঠলো।"

দিনের বেলা নানা প্রকার লেখা লুগির কাছ ছিল, সে সময় শেষ ক'রে লক্ষ্যবোনা বিশ্রামে লুককে তেকে পাঠালে। কুসু আজ সারাদিন দারিদ্র কাছে আসেই নি। নিজে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিশ্রাম বিশ্রামা ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। রোশির মতো শুয়ে থাকলে মনটা ওলল থাকে। লামনের দিকে কুসুর জন্তে একটা ছোট চৌকি দিক ক'রে রেখেচে। আলোটা লম্বেই কোণে একটু আড়াল ক'রে রাখা। লামার উপর বড়ো একটা টানা পাখা ছল ছল ক'রে চলচে। বৈশাখ শেষের আকাশে তখনো পরম জ'মে আছে, লক্ষ্যে হাওয়া এক একবার ছল একটু নিবাল ছেড়েই শেষে থাকে, পাছের শাভাগুলো ধেন একান্ত কান-শাভা মনো-মোহের মত নিভল। লম্বেইর মোচনার লক্ষ্য দেখানো লীল ললকে কিয়ে ক'রে দিয়েছে, আত্মত্যাগী ধেন দেই রকম। লীল বিলম্বিত গোপনিত শেষ আলোটা তখনো তার কানিয়ার ভিতরে ভিতরে ঘিলিত। বাধানের লুকুরটা ছায়ায় অদৃষ্ট হ'য়ে লীলুত, কিন্তু পূর্ব একটা ললললে ডাঙার দ্বির প্রতিবিম্ব আকাশের লল্লি লম্বেইর মতো তাকে নির্দেশ ক'রে দিচ্ছে। লাক্তলার লীচে দিয়ে ঢাকল

কণে কণে লঠন হাতে করে প্রাণত্যাগ করচে, আর পেঁচা উঠে জেঁকে।

কুহু বোঝ হুঃ একটু ইতস্তত করে একটু দেরি করেই এল। বিপ্রদাসের কাছে চৌকিতে বসেই বসলে, “দাদা আমার একটুও ভালো লাগচে না। আমার ঘেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করচে।”

বিপ্রদাস বললে, “কল বগলি কুহু, তোরা ভালো লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোরা মন উঠবে ভাবে।”

“কিন্তু তা’ হ’লে—ব’লে কুহু খেসে গেল।

“তা’জানি—এখন তোরা বন্ধন কাটিবে কে?”

“তবে কি যেতে হবে দাদা?”

“তোকে নিষেধ করতে পারি এমন আশিকার আর আমার নেই। তোরা সম্মানকে তার নিজের পরজাড়া করব কোন্ সন্দ্বিগ্ন?”

কুহু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বিপ্রদাসও কিছু বলল না।

সবশেষে গুণ্ডুবরের কুহু জিজ্ঞাসা করলে, “তা’ হ’লে কবে যেতে হবে?”

“কালই, আর ঘেরি দইবে না।”

“দাদা, একটা কথা বোঝ চর দুকতে শরচ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আগতে দেবে না।”

“তা’ আমি বুঝি জানি।”

“আজ্ঞা, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব’লে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার ক্ষেত্রে আমার গ্রাম হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু তাদের ওখানে ঘেন কখনো তোমাকে না দেখতে চর। সে আমি মইতে পারব না।”

“না, কুহু, সেজঙ্গে তোমাকে তাহতে হবে না।”

“ওরা কিন্তু তোমাকে বিশেষ ফেলবার চেষ্টা করবে।”

“ওরা না’ করতে পারে তা’ করা শেষ হ’লেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখন আমি চর দাশন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?”

“দাদা, সেদিন তুমিও আমাকে দাবানল করে নিয়ে।

ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে বিয়ে দাব। এমন কিছু আছে, যা ছেলের ক্ষেত্রে খোঁজানো যায় না।”

“আজ্ঞা,—আপসে হোক ফেল, তার পরে বলি।”

“তুমি বিবাহ করচ না, কিন্তু তার কথা মনে আছে তো? তার তো হ’লেছিল ইচ্ছা-মুত। সেদিন মাসারে গ্রামি তার দায়ব্যাগি পাচ্ছিলেন না। তাই তার ছেলেকে মেরে দেবতকে সমাধাসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মাতৃব দশন মুক্তি চার, তখন কিছুকত তাকে ত্রেকাতে পারে না। আমি তোমারি বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন ঠাখন কাটবে, যা সেদিন আমাকে আশিগাধ করবেন, এট আমি তোমাকে ব’লে রাখলুম।”

আবার অনেকক্ষণ চুপে চুপ করে রইল। চাইত হ হ করে বাতাস উঠে, টিপাইয়ের উপর বিপ্রদাসের পড়বার বইটার পাতাগুলো নব নব করে উলটে খেঁচ লাগল। বাগানে থেকে বেলগুলোর গন্ধের ঘর ফেল ভাবে।

কুহু বললে, “আমাকে ওরা ইচ্ছে করে ওখ দিচ্ছে তা’ মনে কোতো না। আমাকে সব ওরা বিতে পারে না আমি এমন করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না মুখী করতে। দাদা মতের ওদের মুখী করতে শবে তাদের কারো ক্ষেত্রে কেবল একটা না একটা মুক্তি দাখবে। তা হ’লে কেন এ বিতখন? মদ্যধের কাছ থেকে অপর্যায়ের সমস্ত লাকনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ের কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; হ’লে আমায় এ তুমি দেবে নিয়ে। মিথো করে মিথোব মথো লাক্তে পারব না। আমি ওদের বড়ো বো, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুহু না হই? দাদা, তুমি ঠাকুর বিবাহ ক’না, আমি বিবাহ করি। তিন মাস আগে যে রকম ক’বে কইতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারিদিকে এতো এলো-মেলো, এত উল্টো-পালটা, সব এটী কল্যাণ একবারে ঢেকে ফেলনি কল্যাণটাকে। এ সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও



৩য় পক্ষকে নিয়ে সংসারের কাজ চলেচে, সেই সেখানে ভাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেনামান ঠাকুর। তোমার কাছে এসব কথা বলতে লজ্জা করে, - কিয় আমার তো কখনো বলা হবে না, যাচ বলে যায়। নইলে আমার কাছে--মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত পিতৃপুত্র তবু বাচি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অকথ্য, সেই আমার ঠাকুর এ যদি না শুভ্রতম 'জা' হ'লে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গানয়ে ঢুকতুম না। বাবা, এ সংসারে তুমি আমার আঁচ বলেই তবে একথা বুঝতে পেরেছি।" এই বলেই কনু চৌকি থেকে নেবে মাদার পাখের উপর মাথা রেখে পড়ে বসল। রাত বেড়ে চলে, নিপ্রদাদ জানালার বাইরে চমনিমেঘ বৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগল।

৫৮

পরদিন ভোরে বিপ্রদাদ কনুকে ডেকে পাঠালে। কনু এসে দেখে বিপ্রদাদ বিছানার ব'লে, একটি এগরাক আছে কোণের উপর, আরেকটি পাশে কোঠায়না। কনুকে বলল, "নে এগরী, আমরা দুজনে মিলে বাকাই।" তখনো অম্ম অম্ম মরকাত, সমস্ত হাতির পরে বাতাস একটি রাঙা চ'রে মন্থ পাতার মধ্যে কিস কিস করচে, কাকগুলো ডাকতে শুরু করেছে। চমকনে চৈতন্য হারিয়ে গেলেন মালাপ প্রক করলে, গরুরা, বাত, মকরল; নতীবিরত বনন অচলন চ'রে এসেছে, মগাবেরে সেই দিনকার প্রতাপের গানের মত। বাজতে বাজতে পুণিত কুঙ্কড়ার তালের ভিতর দিয়ে অকথ-মাতা উজ্জলতর চ'রে উঠল, লুণা দেখা দিল বাগানের পাড়িলের উপরে। চাকররা ঘরদার কাছে এসে গাড়িয়ে থেক দিয়ে গেল। ঘর দাক করা ছোল না। বোদ্ধর ভরতর মধ্যে এলো, ঘরোয়ান মাত্রে মাত্রে এসে পবরতর কাগল উপাইয়ের উপর রেখে দিয়ে নিশেখ পথে চ'লে গেলো।

অংশেবে বাহন বন্ধ ক'রে বিপ্রদাদ বলল, "কনু তুই মনে করিস আমার কোন দর নেই। আমার দরকে কথার বন্ধে খেলে তুরিয়ে যায় তাই বলিবে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর গুণ, গভীর মানস এক

চ'রে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারিনে। তুই আমার চ'লে খিচিল, কনু, আর চরতা দেখা হবে না, মাক সকালে তোকে সেই সকল বেজুরের সকল অমিলের পরপাশে এগিয়ে দিতে এসুম। লক্ষ্মণা পড়েছিল, - চমকিত বনে যখন লক্ষ্মণা বাত ক'রে বেরিয়েছিল, কব কিছুদূর পদাশ তাকে নৌছিরে মিলেন। যে লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি বেরিয়েছিলেন, তার মাকখানে ছিল গুণ অপমান। কিয় সেই বানেই বাহন না, তাও পেরিয়ে লক্ষ্মণা পৌঁছেছিল মচকল হামিতে। মাক সকালের চৈতন্যের মধ্যে সেই পাণ্ডুর সুর, আমার সমস্ত মস্তকবনের আশিলাপ তোকে সেই নির্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিল; সেই পরিপূর্ণতা তোর মস্তকে তোর বাহনে, তোর সব গুণে তোর সব অপমানকে প্রাণিত করুক।"

কনু কোনো কথা বললে না। বিপ্রদাদের পাশে মাথা রেখে গগন করলে। বাণিকমণ জানদার বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে গাড়িয়ে রইল। তার পরে বললে, "বাবা, তোমার চারটি আমি তাঁর ক'রে নিয়ে আসিগে।"

মধুসূদন আজ দেবজকে তাকিয়ে শুভমাত্রার গরু ঠিক ক'রে বেগেছিল। সকালে ঘনটার কিছু পরে। ঠিক দমরে গরুর কাছকরা লাগ বনাতের বেগাটোপ-গ্রালা পাড়ী এল ঘরদার, আসাফোটে নিয়ে শোকজন এল, মমাতোহ ক'বে কনুকে নিয়ে গেল মির্জাপুরের পাদায়ে। আজ সেখানে নবকং বাজছে, আর চলেছে লাক্ষণ ভোজন। ভ্রাম্বল বিদায়ের আয়োজন।

আগিক এল বাতির পেছালা হাতে বিপ্রদাদের ঘরে। আজ বিপ্রদাদ বিছানার নেই, জানালার দামনে চৌকি টেনে নিয়ে স্থির ব'লে আছে। বালি পদন এলো কোনো পবরই নিলে না। চাকর দিয়ে গেল। তখন ক্ষেমা পিদি এলেন পথ্য নিয়ে, বিপ্রদাদের কাছে হাত দিয়ে সললেন, —"কিস, কোলা হ'রে গেছে বাবা।"

বিপ্রদাদ চৌকি থেকে ধীরে ধীরে উঠে বিছানার সুরে পড়ল। ক্ষেমা পিদির ইচ্ছা ছিল কেমন মুম্বাম ক'রে দায়র ক'রে ওরা কনুকে নিয়ে গেল তার বিত্যাচিত বর্ণনা ক'রে গর করেন। কিন্তু বিপ্রদাদের পড়ার নিম্নদ্যতা



যোগাযোগ  
ঔষধীশ্রুনাথ ঠাকুর

দেখে কোন কথাই বলতে পারলেন না, মনে হ'ল বিপ্র-  
দাসের চোখের সামনে একটা অতলশর্পা পুজুতা।

বিপ্রদাস যখন বাঁলে উঠল, 'শিশি, কাণ্ডকে পাঠিয়ে  
নাও' তখন এই সামান্য কথাটাও অলসের একটা প্রকাশ  
মিশ্রিত ছায়ায় ভিত্তি দিয়ে স্পষ্ট হ'ল। শিশির যা ছদ্ম-  
চমক'রে উঠল।

কাণ্ড যখন এলো, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি  
দিলে। বিলেতের চিঠি, হুগোদের লেখা। হুগোবাব  
লিখেছে, বাবের ডিনার শেষ না ক'রেই যদি মেসেজে আসে  
এ' হ'লে আবার তাকে কিংবা যেতে হবে। তার চেয়ে শেষ  
ডিনার ছেলে মাঘ ফাঙ্কন নাগাত দেশে ফিরে এলে তার  
সুবিধে হয়, অনর্থক গরুরে আপড়াক বেঁচে যায়। তার  
বিব্রাদাস বিবর কক্ষে প্রবেশ করত মনঃকণ্টক করে পড়ে।

আতঙ্কবশিনে বিবর কক্ষের সড়ক নিয়ে বিপ্রদাসকে  
পেঁচা: কাণ্ডের একটুকু তাকে ছিল না। কাণ্ড বললে,  
"দাদা, এখনো তো টাকা চলে নেবার কোনো কথা গুটানি,  
আর কিছুদিন যদি সাবধানে চলি, কাউকে না খাটাই, এ'  
হ'লে দৈব কোনো উৎসাহ ঘটবে না। ঘাট ছোক, ভূমি  
কোনো ভাবনা কোরো না।"

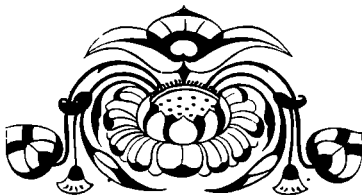
বিপ্রদাস বললে, "আমার কোনো ভাবনা নেই কাণ্ড।  
শেষ মার না।"

বিপ্রদাসের ভাবনা কাণ্ডের ভালো  
অভ্যন্তরীণ ভাবনা: তার আবেগ প্রকাশ লাগে।

বিপ্রদাস দ্বারের কাণ্ডকে চলে নিয়ে লড়াই লাগে,  
একলে এ সময়ে কোনো অগোচর: কথা  
একটুকু হজ্জা নেই। অতঃপর কাণ্ডের কথা  
কাণ্ড চলে যায়, আত্ম-চল ক'রে বাঁলে বইল, উচ্চা ক'রে  
লাগল অতঃপর কিছু কথা বলে যা-কিছু কোনো একটা  
লগে যায়। বিজ্ঞান: কখনো "বাবরের দিকে ঈ কানোনাতি"  
এক ক'রে বের'ক বোঝুর হাসতে।

বিপ্রদাস লেড়ে কানোলে  
নেই।

কাণ্ড তবু বইল বাঁলে। শাখার খবর আত্ম-কণ্ড  
এ পুত্রতা তার থেকে চেয়ে বইল। হঠাৎ ভূমি:  
বিছানার নীচে টম কুকুরটা ভূমির ভূমির কোঁদে উঠল  
কুকুরে মে চলে যতে দেখে, কি একটা  
ক'রে বোঝাতে পারবে না।



## বসন্ত-বিদায়

শ্রীমোহিতলাল মহুমদার

সকল কামনা কোটেনি এখনো, কোটেনি গানের পাথে,  
চৈতন্য-নিষ্ঠে বসন্ত কাঁদে, ঘায়ে হেঁচি' বৈরাগ্যে ।  
সিঁথীটি লাজে অপেক্ষের দুঃখে,  
চাঁপায় নুকুল চড়িয়া ওকুলে,  
কাঁদে কাম-বণ্য বিদায়-বিদুর, নুপুর পুণিয়া রাখে ।

গোলাপের বৃকে বেঁধেছিহু ঢেকে কস্তুরী-কপূর,  
আফিম-ফুলের কোঁটার ছিন্ন লগাটের দিল্লীর,—  
নয়ন-নিমেষে গেল তাস্তা করি' !  
লয়ে কাপূরের চূতমঞ্জরী  
অলকে পরিহু, অলিগুঞ্জে অলৌক ভাবনাভূমি ।

লাল হ'য়ে ওঠে বন-বনাস্ত পলাশে ও কিংককে,  
দিকে দিকে পিক ফুল ফুহরিগ, মতহার মধু-ধূপে ;  
ভরপাশে-পাশে লতা-হিম্মোল,  
পাতায় পাতায় ফুল-হিম্মোল,  
কাপে সাজিল কাটার রক্ত চীনাতকে !

এখনি হবে কি রঙের ঝালত, ফুলের দীপালি শেষ ?  
নিশায় নেণা দে এখনো লাগেনি—নয়নে ঘুমের লেশ !  
কাজল-অঁকা এ অঁকির কোণায়  
এখনি অকল আসাটি ঘনায়, \*  
বিনি-বিনি করে সকল পিত্তর রক্তনীর বসারণ !

কবিতা এখনো রহিল শিথিল—নিখানে পড়িলি পুণে,  
 সুক্রে যে-খানি দেখেছি অধরে, সে হাসি ঘাইনি ভুলে।  
 পুণের বোঝার বিহি মিলাইয়া  
 দেহের দহনে জ্বলি এ দিগা—  
 প্রাণের গগনে জ্বলি গে বীণ বেহনার বোঝলে!

মধুঘাসিনীর কোমল-কামিনী এখনো যে কানে-কানে  
 হুসাইছে মোরে হৃদয় কাহিনী—সে কথা সেও না কানে!  
 হৃদয়ের হৃদয়ে হুসু হুসু বাণী  
 কেন কেপে রয়—সেই রূপকথা  
 তনবীরে চাই, কেবলি তাকার আমারি সুখের পানে!

মরণেরে, তার নীলতরু ঘেরি' জীবনের শীতবাস  
 পড়ায়ে, লাবণ্য লবন-রাগেরে—কত না করেছি আগ!  
 হাঙ্গিরা উঠিবে গোরাচনা-গোরা—  
 আবারের পুঁজি দুটা-দুটা তরি',  
 প্রাণ-মুখ তার মাঝারে রচিবে মরণের মধুঘাস!

সে কামনা মোর জলে' নিবে' গেল শিশুদের পাখে-পাখে,—  
 চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, ঘরে ঘেরি' বৈশাখে।  
 দি'বীট সাঝারে অশোকের ফুলে,  
 চাঁপার সুকল ডরিয়া গুলে,  
 কান্দে কাম-বধু বিদায়-বধু, নুপুর গুলিয়া রাখে।





বিচিত্রা-

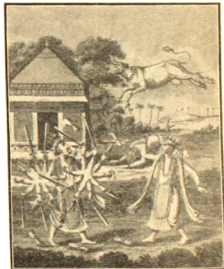
শ্রীমৎ হরিশ্চন্দ্র শেঠ মহাশয়  
কর্তৃক প্রেরিত ।



কালিদাস

# চিত্রশালা

প্ৰাচীন চিত্ৰকলাৰ কৰ্তৃক আঁত  
হিঁদু দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি



পৰশুৰাম দেৱতা



নাগ-নাথ



ঐগাম্ভ:প্রঃ বাণালোণ



কামেশ্বরী



কামেশ্বরী

কামা



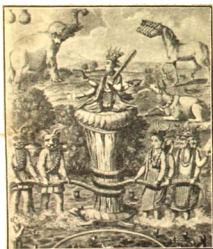
୧୫୫ ଭବତୀ



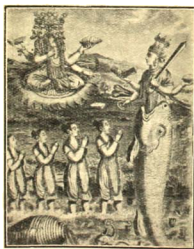
୧୫୬ ଭବତୀ



୧୫୭ ଭବତୀ



ହୁଏ ଅବତାର



ସଂକ୍ତ ଅବତାର





—ঐচ্ছামদাশঙ্কর রায়

পর্যটকের “ঐচ্ছামদা” আছে, আন্দাটা এট বাংলাদেশ, এখানে ঘরে ঘরে মা বোন ( ঐচ্ছাম কপালগুলি মনে নেই )। একটা বোন তার সব দেশের লব্ধি বলা যায়। অস্তিত্ব টান্ডের লব্ধি নিশ্চয়ই। আন্দাটা এট মাস্তুরের পুখুরী, এখানে লব্ধি আশনার লোক। লব্ধি বাস্তব না হ’লে কি এদের পরিচয় মেলে! সেই জগ্রেই তো মাস্তুর ঘর ভেঙে দিয়ে লব্ধি লব্ধি করলে। কত দেশে কত আশনার লোক, লব্ধির পরিচয় না নিয়ে কি তৃপ্তি আছে!

মাস্তুরে মাস্তুরে কত না তফাৎ—বর্ণের, বক্তার, ভাষার, সংস্কৃতির, প্রেয়ার, আশ্রয়ের। এত তফাৎ আছে বলেই কি এমন মিলনকামনা? এক নিম্নলিখিত লব্ধি তফাৎক উপরে রেখে লব্ধির অস্তিত্ব তুলিয়ে দিয়ার প্রেরণা? সে অস্তিত্ব কেউ পর নয়, লব্ধি আশনা; এত আন্দাটা লব্ধি আশনা যে, মনও সে লব্ধি বাধে না। মন তো মনো ভাষিক, লব্ধিকে মায়া বলে কুটি কুটি করাই তার স্বভাব। মাস্তুরের বসি কেবল মনই থাকতো তবে মাস্তুর হ’তো একটা অভিব্যক্তি (বিভাবিকা)। Niobur মতো বহুসংস্কৃতিবাহী হ’লেও বহু।

আমরা অস্তিত্ব বোধী নিজেকে লাবা বা কালো, টংকো বা ভাবতীর, বনী বা দরিদ্র ভাবি—এটা আমাদের মনের কারসাজি, এটা মায়া। এখন মাস্তুরের সামনে মাস্তুর গাড়ার

তখন কোথায় ঘর এই মায়া? তখন আসে উপলব্ধি মাস্তুরকণ—তখন অকস্মাত উপলব্ধি কাঁচ, আমাদেব লব্ধি হয় না। আমরা যে কী তা বুঝিয়ে বলবার উপায় নেই বলে চ’লকের স্থিতির করে বলতে হয়, “লাবা” বা “কালো”, “টংকো” বা “ভাবতীর”, “বনী” বা “দরিদ্র” কিন্তু এগুলো আমাদের লব্ধি নয়, symbol। আমরা: আমরা—আমরা personalitie-। আমাদেব পরিচয় লব্ধি নেই তৃপ্তিতে নেই বসিভাষানে নেই, আছে আমাদেব লব্ধি। আমরা যে ক’লে উচ্চি, এই আমাদেব প্রথম ও শেষ পরিচয়। এর মতো বিশ্বের আর নেই, এরই লব্ধি বলা হ’তে পারলিককে বৈজ্ঞানিককে কসুর বলদের মতো ঘোড়াবো, তবু সে হাতভাগোতা এর লব্ধি নাস্তাবাদী থেকে পারে।

যারা লব্ধির কাছ পড়ে মাস্তুরের লব্ধি রাখে গ্রাভি কি কোনোমতে বিবাদ করবে কত বড় একটা কিংবদন্তি লব্ধির অলঙ্কারে কুলে কুলে উঠে “লব্ধিবাদ” সেট লব্ধিপ্রাপ্তের মতো? মাস্তুরের মনের বিরুদ্ধে মাস্তুরের লব্ধির এ কিংবদন্তি—এর কানায় কানায় অস্তিত্ব। লব্ধিকামান মনের বিরুদ্ধে কোমল অল লব্ধিলাবাসা লব্ধির পুষ্টিভূত অস্তিত্ব। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের লব্ধির কবির লব্ধি কব্ধি বোবার মতো অস্তিত্ব টংকো বসতে চাট্টে, আমাদের পরিচয় লব্ধি, আমাকে তোমার



objective চরমমাননিম্ন শব্দে মাথা ঠাট্টায়ে না, আমাকে তোমার efficiencyর ব্যতিরিক্ত বিধ থেকে বাধ দিবে না।

এই বিরাট জগৎরাজ্য এক একটা কেনা চাঞ্চল্যবীর বিকড়ে দবিশের বিজ্ঞান, সাম্রাজ্যবালীর বিকড়ে পরাধীনতার বিজ্ঞান, সাধারণ বিকড়ে কালের বিজ্ঞান। কিন্তু কেনা মাত্র, তার বর্ণনা না। বীর ভাঙ্কুরের ক্ষমতা এদের নেই, রক্ত এদের মধ্যে বহা। বীর কেবলমাত্র ভাঙবে না, বীর হলে চলবে যেটদিন, যেদিন “রক্তখারার” রাক্ষসুমার ভার আশ্ববানের আমল চাপে ক’রে আসবে, প্রেমের অংশে আঘাত চাবুবে। মনেও বিকড়ে বিজ্ঞান মনকে ধ্বংস করবার নয়, মনকে রসিয়ে তুলবার। সেই হিসাবে এটা প্রণয় নয়, সৃষ্টি। লজ্জাতক জগৎরাজ্যের হলে ওস্তাদশ্রী না ক’বে রাক্ষসে সে যে ভক্তির শব্দ ক’রে উঠবে। এতদিন সে রক্তপেশপত্র হয় নি শুধু রক্তের মতো ঠেংমিকের কলাপে। টিউংগাণীর মাছের মন তাকে এতদিনে একটা মর্যাদা দে পরিণত ক’রে থাকতো যদি না সে রক্তের জগৎরাজ্যকে Eucharist ক’রে নিতো। তারতীর মাছের মনকেও পত্ররাজ্যের দৌরাত্ম থেকে রান্নাভুক্ত উদ্ধার করেছিলেন, সাক্ষ্যভোমের উৎসাহ থেকে উজ্জিত।

আধুনিক কালের এই বিজ্ঞান-বৃষ্টি, কল্যা-কুর্জ, বাক্য-দগ্ধ, নাস্তিক লজ্জাতক প্রোগ্রামারিগানও ভ্রান্তে পড়বে না, ভাণ্ডারনাশিতও না। কেন না বুজোয়ার মতো প্রোগ্রামারিগানও এর দ্বারা সম্বোধিত, ফরাসী-ইংরেজের মতো। চীনা-ভারতীয়ও একে আদর্শ করেছে। ইংলণ্ডে বৈবর্তি সোভালিটি চার ক্যাপিটালিস্ট্রিট একটু সস্তাগোড়ের নকল লাঞ্জে, সেও একটা সেকেন্ডার্ড, শোভাকপরা সেকেন্ডার্ড, মতামতগুণা Snob। সে যেমন উন্নতি করছে আশা করা যায় সে অবিশেষে বুজোয়া হ’লে উঠবে, অর্থাৎ উপরের লোকদের পরিবেশে দিয়ে নীচের লোকদের দাবির বাধ্যবে। লোক ভারতের অধুনাতন কংগ্রেস কল্যাণেলের বিরতনী পাঠ ক’রে বহুত বোকা যায়, ভারতবর্ষও একটা “Great Power” না হ’লে ছাড়বে না। ইংলণ্ড ও রাশিয়া মিলে তার ডট কানে একই ময় বিচ্ছে—“Power,” “Efficiency,” “Progress”। এদের মর্যাদা যে এদের

প্রকৃতির চেয়ে ক’রে উঠবে ও এদের ভাড়া কল্যাণলান উত্তরাধিকার দাবী করবে, এমন মনে করবার কারণ আছে। বহুত গুণকের কামা এক না হ’লে বৃদ্ধ বাধে না। প্রোগ্রামারিগান ও বুজোয়া, ইম্প্রিভালিটি ও ভাণ্ডারনাশিত কিছু একটা ভিন্ন চার—“Success” “Power,” “Efficiency,” “Civilisation,” “Progress” প্রথমে কামের ভিত্তিটা থাকে নীচে, যেমন একখানা কটিবর। কমে কমে গঠে ওপরে, যেমন একজন মিলিটারী শোভাক। তারপরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—মাজিনীর ইটানো হ’লে গাড়ার সুনামিনীর ইটানো, সেই গাড়ার নীচের লোক হ’লে গাড়ার টিপোনার উপরেও লোক।

অন্তএব মানবজগতের বিজ্ঞানী দ্বারাও মুক্তি দেবার সৌভাগ্য কোনো শ্রেণীবিশেষেরও হবে না, কোনো বৈশিষ্ট্যেরও না। নিজে প্রকৃতি ভাঙিও নিজেদেরকে নিরতিশর জ্ঞানী মনে করছে মনের বিকড়ে মন খাটাতে না পারে। মাছের একমাত্র আশা মাছ নিজে—বৃদ্ধ হুগোয় বনবিজ্ঞানের মাছ না, সাম্রাজ্য অতীত personality, সৃষ্টির বিবর্ত, জানী বৃদ্ধির রক্ত, “রক্তখারার” সেই রাক্ষসুমার দ্বার ভয় করছিল পথে, বাইবেলের সেই King of Kings দ্বার দ্বান করছিল কুপে। নিজের এতবড় সৌভাগ্যকে যেদিন দৃশ্য দিতে শিখবে সেদিন আমাদের লজ্জাতা আরেক স্তরে উঠবে, সেদিন সম্পত্তিক লোককে বর্জ্য মনে হবে পক্ষিকের জগৎরাজ্য, গুণ্য নয়। সেদিন জগৎরাজ্যের তাবনার আমরা একখানা গাড়ির কোবল কর্বে না, জগৎরাজ্যের উপর থেকে ছোব তুলে নিতে ছোট দেবে আমাদের পক্ষিকের উপরে। তখন বৈবর্ত্যের জগৎ আমরা কুছ না হ’লে তাকেই ক’বে তুলেবা বৈবর্ত্য। পরামর্শ ম’লে উঠবে জগৎরাজ্যের মতো। জগৎকে সৃষ্টিতে অপারিত ক’রে প্রচার দৌরব অল্পতব করবে।

জগৎরাজ্যে বৃদ্ধা ইংলণ্ডকে কতটা দীক্ষিত করেছে বুঝে থেকে আমরা কেন, কাছে থেকে ইংলণ্ডের সকলে কিছু তা চাষ করছে পারে না। প্রত্যেকের এত বৈবর্ত্য freedom of speech যে কেউ কাকের সঙ্গে কথা বলতে সাহস করে না, কথা বললেও সেই “It n’t it cold?” উত্তাপ দিতে

কথা। সকলের সঙ্গে মেলামেশা কর্তৃত্ব নিয়ে কাকুর সঙ্গে  
অন্তর্ভুক্ততা হবার উপায় নেই, সবাই সবাইকে বাইরের দ্বার  
খোলাতে দিয়ে ভিতরের দ্বার খোলাবার অদলবদল বা ভরসা  
পার না। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, যেহেতু সমতার চরিতার্থতা  
উপলব্ধ পাচ্ছে না। কেবল একটা কীচা আত্মপ্রকাশ  
যাচ্ছে—আমি স্বতন্ত্র, আমি স্বৈরাচারি, আমি বাদীন  
জীবী। অনেকটা কুলীনের কাকুর অনুভূতি-বের তাঁকে  
মতো এই আত্মপ্রকাশ। কাজে কাজেই কাকুর দ্বারা  
পেয়ালার ভরে না, বাতের পেয়ালার নাচ নাচ নাচ ঢেলেও  
সেই পুস্ততা। যেন জীবন পেয়ালার উপরই বসে, আপা-  
গোড়া কীচা। নিত্য নতুন প্রকারের সর্বব্যাপক ক'রেও লোক  
লোক। নটনটা পোষাকভাষা আদর্শবাগ্যাদা চমকে  
চমকে মেটতে পারে না। কীচা মত যেটুকু আঁচ: ধরিয়েছিল  
সেটুকুর বোনাও পত মধ্যস্থে কেটে গেছে, আদর্শিক কল্যাণ-  
কল্প কতকটা হোক দেয় বটে। কিন্তু সে কি মুক্তি দিতে  
পারে! ইংলণ্ডে কেবল একটা অনেক আছে, ছুটিছুটির  
আনন্দ, তাই ইংলণ্ড আছে, নইলে কি নিয়ে সে নিজে  
ভোগতো? একে একে তার সব গুপ্তই যে ছাড়া হয়ে  
গেছে, মারা গিয়ে গেছে। Democracy ও Sex Equality  
কতক গুপ্ত চুর ক'রে দিয়েছে, বিজ্ঞান ব্যতী গুপ্তগুলোকে  
দূর ক'রে দিয়েছে। মত্ত একটা আদর্শবাদের মতাব ইংলণ্ডকে  
বড় দরিদ্র করেছে। এই ব্যারিয়ার লক্ষণ আধুনিক ইংরেজী  
সাধারণের দৃষ্টিতে। এ সাধারণের কোনো লোক কোনো  
পাঠকে কঠিন বলে চায় না, পাঠে যোগ্যতার বৈ কটা গুপ্ত  
ব্যতী আছে সেও যায়। লোক এখন বিশ্বক লোক পাঠক  
রাগিয়ে পরল। কুফো, কিংবা খুব সারসংক্ষেপ উপবেশ দিয়ে  
উপকার করে।

ইংলণ্ডের মনের জোর তার ব্যর্থতার জোরেরই মতো  
অদলবদল। এখনো বহুদল তার মধ্যস্থত তার তাকে  
"Great power" ক'রে রাখবে। জোর মারেই moral

force, ইংলণ্ড আমাদের চেয়ে moral, অস্তিত্ব অনেক  
নেপথ্যের চেয়ে moral। বস্তু সত্যতা: ভিত্তিটাই মাতৃবের  
moral কীচি, এবং সত্যতার ইংলণ্ডের মাতৃব দ্বা মাতৃবের  
প্রথম দার্শনিক। এই দার্শনিকের উপনীত হবার কামনা  
আছে যুবক ভারতের, যুবক ভারত ইংলণ্ড দার্শনিক প্রতিনিধি  
moral স্বাক্ষরতা চায়। কিন্তু সত্যি যে করে সে moral  
মাতৃব নয়, সে spiritual মাতৃব, ইংলণ্ড এ মাতৃব আর  
সেবা পাচ্ছে না। সত্যি যে করে সে মাতৃবের বের  
মন নয়, সে মাতৃবের দলব: দলব ইংলণ্ডের ক্রমেই গুপ্ত  
ভাষাচ্ছে কিংবা প্রত্যেক উদ্দেশ্যে চালাচ্ছে। কাজে কাজে  
কাজ ও নাচ নাচ নাচ নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে দলব  
দলবস্তিত্বগুলোকে মুক্তি দিতে যদি বা কেউ ইচ্ছুক হয়  
তবু সে মুক্তি উপলব্ধি করতে না, অর্থাৎ মুক্তত্বা মন  
থাকলেও মৌখিক মনে না। দলব চায় নিয়ে গুপ্ত হ'তে,  
কিন্তু দলব নেবার ভিত্তিটাই যে নেই, ভিত্তিটাই হ'তে দলবের  
আত্মপ্রকাশ বাবে, লকলে চায় মুক্ত দলব, প্রাণ: পাঠনা,  
ব্যবীনা, দলবদলিকার, প্রাণ:—এক কণার ভগ্নদল। তাই  
নিয়ে ছুটিছুটি ও কাড়াকাড়ি ব'লে, মাতৃবের সত্য  
পরিচয়টা কোথায় চাওয়া গেছে। মাতৃব চলে গেছে  
তার লক্ষ হয়েছিল লোক; কিন্তু লোক ক'রে তাকে  
মানা; সে বা শাং বা ত'মতে ছড়তে ছড়তে গিয়ে,  
সে স্বভাবত সত্য; এবং অপরকে মানের উপলব্ধি দলব  
ক'রে চলেই সে প্রতীতি।

আদর্শ: এই মাতৃবের গুপ্তি, এর পথে অগ্রসরে আপ-  
নার লোক, কিন্তু কেউ কাকুর আত্মীয়তার কামনা  
মেটাবার দলব পাইনে, দলব রাখিনে। তাই মাতৃবের  
সঙ্গে মাতৃবের মিলন বিফল হচ্ছে, চরিতার্থতা পাচ্ছে না।  
কেবল চীৎকার ক'রে উঠে—বৈষম্য দূর করো, চমকে  
যুগান্ত। চলে যাচ্ছে যে বৈষম্যকে বাকুর ক'রেই সত্য,  
চমকে দলব ক'রেই আনন্দ।



অতঃপর একটু আভাষ পাঠ নি, তা নয়,—কিন্তু সে তার উৎস্রা আগ্রহের কাছে এতই দামান্ত যে, ততটুকুতেই লম্বাই হ'য়ে থাকতে না পেরে সমস্তটা স্পষ্টতরভাবে জানবার আগ্রহে সে বিনয়ের সঙ্গে একটা সম্মানের সৃষ্টি করেছিল। নিস্তব্ধ জলের মধ্যে আলোকের উপস্থিত ক'রে সে তার সুতীক্ষ্ণতা নির্ণয় করতে গিড়েছিল। তাই বলেছিল, 'আপনি আপনাকে কাছে আবার ছাঁচ রাখবেন কেন? তার 'ত' একটা কারণ থাকে চাই, যা হয় একটা অধিকার থাকে চাই।' ফলে কিছু বিপরীত হ'ল।

অতঃপর আর অতিমান সম্ভাষণ বসে না হ'লেও উত্তম ক্রমলার চৈতন্যে দুগুণ অধিকার ক'রে পীড়ন ওজতে লাগল। 'নলে, রাগ হ'ল নিজেই প্রতিবেদন, যিনিদেরও প্রতিবেদন। টাকার ফেরৎ দিয়ে বিনয় কমলার চনি অধিকার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কমলার বাক্যে যে বড়টা প্রকাশ পেয়েছিল বাইরে থেকে লক্ষ্য পৃষ্টিতে তার কারণ একমাত্র জোষ তির 'অন্ত কিছু হ'লে মনে হয় নি; কিন্তু সামান্য জোষকে উপলব্ধ ক'রে পুঙ্খানুপুঙ্খ যে সং-  
 ৮ 'অতিমান উত্তম হ'য়ে উঠেছিল তার সম্মান পেলে হয় ত' বিনয় কিছু হ'য়ে চ'লে যেত না। নিম্নাদ শুনে সে যেহেতু বজলভ মনে ক'রেই চ'লে গেল, সে যে বাসিকিম্বুও আলস্যবল সে কথা ভেবে দেখে না। এ কথাও সে ভেবে দেখে না যে, মাহুৎ বখন তার প্রিয়জনের সঙ্গে দৌড়ানি বিনিময়ের সুযোগ পুঁজে পাও না তখন সে তার সঙ্গে কলহ করে।' কারণ, জোষ হ'লেও কলহ একটা যোগ, যা সুদূরতর ব্যাঘ্রা সম্বন্ধ স্বীকার ক'রেই চলে, নীরবতার ব্যাঘ্রা ওদামীল বাক্য করে না। কমলার ছবির প্রতি বিনয়ের লোভাতুরতা কমলা যে তার নিজেরও প্রতি বিনয়ের

বাইরে পরিত্যক্ত হর্ষের লক্ষ্য তখন কমলা বুঝতে পারলে বিজ্ঞান এলেনে। তাকিয়ে দেখলে ঘড়িতে তখন দশটা থেকে দুটি মিনিট। পাড়ি ছাড়তে তখনো দশ মিনিট বাকি। একবার মনে করলে বিজ্ঞান থেকে লক্ষ্য নিয়ে ঘোড়ার ক'রে গেলেনে এখনো দশত হ'রে জানা যায়; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল বিনয় 'ত' ফিরে আসবেই না, অধিকন্তু বিজ্ঞানের নিকট সমস্ত ব্যাঘ্রাট্টা প্রকাশ হ'লে শুকতর লজ্জার কারণ ঘটবে। বিজ্ঞান হ'লে এলেনে





করে নি। এমন এখন যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।”

বিজনাথ বললেন, “আজ্ঞা, তা’লে কিমে চ’লে যোয়ো।”

বেলা চুটোর সময় বিজনাথ তাঁর বিজ্ঞান-কক্ষে পদ্মসুখকে কেকে পাঠালেন। পদ্মসুখী এলে বললেন, “তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে শিদিয়া। ঐ চেয়ারটার একটু যোয়ো।”

আলসগ্রহণ কবে পদ্মসুখী স্কোভুতলে ভিজালা করলেন, “কি পরামর্শ বাবা?”

বিজনাথ বললেন, “কমলের বিয়ের সবচেয়ে তুমি বিষয়কে লোপানো যোগ্য কিছুর লিখেছিলে? আজ সকালে বিমলের চিঠি পেয়েছি—তাব চিঠি থেকে সেই রকম মনে হয়।”

পদ্মসুখী বললেন, “হ্যাঁ, আমি লিখেছিলাম সন্তোষের সঙ্গে কমলার বিয়ের যে কথাটা রয়েছে সেটা আবারাধি না যেরে একবারে পাকা ক’রে ফেলা ভাল। সন্তোষ এমন চাঁদের মত ছেলে, ওর সঙ্গে কমলের বিয়ে হ’লে ত’ আদ্যদের মোতাসোর কথা। রূপে ভুলে, মনে মানে, স্বভাবে চরিত্রে, এমন আর একটা কাণ্ডার শাবে বল?”

বিজনাথ বললেন, “বিমলও সেই কথা বলে; আদ্যেরও মত পাত্র হিসেবে সন্তোষ কমলের অযোগ্য নয়; তোমার মত ত’ জানতেই পারলাম। কিন্তু কমলের মনের কথা কিছু বুঝতে পার শিদিয়া? তার ইচ্ছে আছে ত?”

পদ্মসুখী বললেন, যে বিয়ের বৈলম্বা এবং তিনি সাক্ষ্য করতে পারেন করেন তদ্বিষয়ে মত মতোগ উপস্থিত; প্রত্যেককে অবলম্ব্য কতলে পরে অসুস্থতা করতে হ’তে পারে। তা ছাড়া পদ্মসুখীর মত,—সুদেহের সিদ্ধ করবার প্রকল্পে উপস্থিত অবলম্বন করায় কোনো অজ্ঞান নেই; বিব বাওরালে রোগীর যদি প্রাণরক্ষা হয় রোগীকে বিব বাওরালে চিকিৎসকেরা বিধা যোগ করে না। উচ্ছিন্নিত হ’রে বললেন, “ওমা! টেকে আবার নেই? বুঝ ইচ্ছে! সন্তোষের কথা বললেই কমলার হৃৎখনি কেমন ঢাঙ্গি ঢাঙ্গি

হ’রে লাগ হ’রে ওঠে—কান চুটি খাড়া হয়ে থাকে।” এমন একবারে পাকা ক’রে ফেলবার উদ্দেশ্যে বললেন, “সন্তোষের বাবুর পরিবার বৈলম্বা সেদিন বলছিল শোভার কাছে কমলা বলছে সন্তোষের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে। আরও কত কি সব কথা পালনার মত বলছে—সে আর তোমাকে কি বল?” বলে মুচুক একটু হাসলেন।

বিজনাথ বললেন, “বেশ তা হ’লে আজ সন্তোষের পর সন্তোষের সঙ্গে কথাটা শেষ ক’রেই ফেল। ও-ও যোগ্য চাইছে এবিষয়ে একটা পাকা কথা হয়ে যায়।”

অভিনয় উপস্থিত হ’রে পদ্মসুখী বললেন, “এ পূর্ব ভাল কথা বিম, আজই তুমি সমস্ত কথাবার্তা শেষ ক’রে ফেল। বিয়ে থাকার কথা ত কিছু বলা যায় না বাবা, কোন দিক দিয়ে কোন কি বিষয় এসে জোটে।”

মনে মনে একটা কি কথা চিন্তা ক’রে বিজনাথ বললেন, “কোনো বিষয় এসে জুটেছে বলে কি তোমার মনে হয় শিদিয়া?”

উত্তরের মন্তব্য পদ্মসুখীর সতর্কতার দিকটা আলগা হ’রে গিয়েছিল, বললেন, “জোটে নি তাই বা বল কি ক’রে? তোমার এই ছবি আঁকিগেটিকে আমার কেমন ভাল লাগে না বিম। ওই ত’ আজ সকালে এসে কি সব ছালামা বাঁধিবে মিরে গেল তাই না যেহেঁটা এখন পণ্ডিত উপোল ক’রে প’ড়ে রয়েছে।” কথাটা ব’লেই কিছু নিঃশব্দই কানে কি রকম ব্যাপার পোনাল; মনে হ’ল পাকা বয়েমটা যেন একটু কাঁচিরে বাবার দিকে গেল। বাস্তব হ’রে বললেন, “সে অবিদিত একজন কোনো কথাই নয়—তবে কি জান? সাবধানের বিন্যাস নেই।”

বিজনাথ কিছু কথাটাকে সামান্য ব’লে একেবারেই উপেক্ষা করলেন না; বাস্তব কণ্ঠে বললেন, “কমল এখনো যায় নি?”

“না, কৈ আর কেহুচে।”

“সকাল বেলা বিনয় এসেছিল?”

“এসেছিল বই কি। খানিকক্ষণ ছুটিটির একে চ’লে গেল।” আদ্যের নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল সে কথাটা



# নামের পরিচয়

## ঐশ্বর্যমিচন্দ্র চক্রবর্তী

যেব নাম লিখে দিচ্ছে বাই  
চেঁষেছে ব্যাক্য পথে, ভগ্নো বন্ধ, শুভক্ষণে তাঁর  
চিহ্ন যোগে পেয়ে এট গ্রাধি  
প্রেমের 'স্বপ্নবর্ণে আঁকি' ।  
যে-আমি সতলা এনে আশোকিত এ কুব্জ-গোকে  
ছেয়ে দেখেছিল যুদ্ধ চোখে,  
পরিচয়হীন পথে যেতে  
চিরলসী এল বার সমসীর্থ যুক্তির লঙ্ঘনে,  
যুদ্ধে চৈতন্যের স্পর্শ লভি' চকিত মিলনে  
শত বার্তায়ের ভেদি' বেগেতে পথ উন্মোচনে,  
ভারি এট নাম  
তোমারে দিলাম ।  
পণিকৃত সংসারের ক্ষয়  
ক'রু তার নয়,  
অশ্রুধারী কারা সে তো মিলায় আপন পরিচয় ।  
মর্ত্যের বন্ধন দিল তা'রে  
অনন্ত সন্ধানদীপ্ত যুক্তাহীন বিপ্লবের পারে ;  
অকৃতের সাথে অবিদ্যায়  
বেদনার বজ্রকূলে গ্রাস দিয়ে যোদিন সংগ্রাম ।  
ভারি ব্যাকুলতা কেনো, প্রণমিত কৃতার্ণ অস্তর  
বাণিল হস্তে পড়ে লেবক্ষে আপন বাক্যর ।





# ফরাসি—ইংরেজ

## শ্রীভাবনী ভট্টাচার্য্য

এক

মাতৃদেব কৈতব সব শিবা, সব ধমনী সংশ্লিষ্ট এসে  
মেখে। ফরাসি কৈতব বেতের সব শিবা, সব ধমনী যে  
সংশ্লিষ্ট এসে মিথেনে তার নাম পদ্মশ্রী। পারিস্ বা  
ভাবে, ত'দিন পরে সমগ্র ফ্রান্স্ তাই ভাবে। তেরি লঙন  
বা ভাবে, ত'মাস পরে সমগ্র ইংল্যান্ড্ তাই ভাবে।

পারিস্ সবচেয়ে আমার প্রথম কথা এই যে, পারিসের  
তপ নেই। তার একটা প্রতিভা আছে, আর সে প্রতিভার  
প্রকাশ নিতা নবনবোদয়ে। আজকের পারিস্ কালকের  
নব, এবং কালকের পারিস্ পরন্তু আর এক চেতনার  
ছিন্ন। পরিবর্তন আর পরিবর্তন এ দুটো আসলে একই  
কথা। পারিস্দের লক্ষ ধমনী ঘিরে কত গ্রান ব'রে  
চলেছে যাতে তার বৃদ্ধি না হ'য়ে যায় না, এবং এ বৃদ্ধি  
আমাদের বৃত্তিস্তির চোখে পড়ে পরিবর্তনের আকারে।  
লতনের কিছু তপ আছে; এ সময় বহুতলী; তাই ব্যর্থতার  
দেখলে ত'মাসে পুরোনো হ'য়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, দার  
তপ নেই মাতৃদেব তাকে ললনাই নিছক মনের মতন ক'রে  
প'ড়ে নিতে থাকে, এবং এ পড়ন কালে কালে পুনঃ পুনঃ  
বলানো চলে। স্ত্রীরা যে চিরনৃতন থেকে যায়।

পারিস্দের আত্মস্বাক্ষর মনে হয়, লতনের সঙ্গে এর  
আপাদমস্তক তুল্য। বাস্তবজ্ঞা যেমন লতন বাহু মেলে  
ডাকতে থাকে; তদে পদে চোখে চমক লাগে। বৈজ্ঞানিক  
শেষ নেই,—যেমন পথে তেমনি পথিকে। ইংরেজের মৈত্রিক  
পটন প্রকৃতি অভ্যন্তর কুপনতা করেছে; অর্থাৎ ও-কালে সে  
আর বিন চারটির বেশী ছাঁচ-বাঁধার করেনি। তার কণে  
একজন ইংরেজের চেতনা ঠিক্ মাত্র মন মনের মতন।  
পোষাকও টুং ডিক্ জারি সবাই এক। তুফান থাকলেই  
এক অশ্রুতর দিকে দলবদ্ধে চোখে চাইবে। করতো ভাব্যে  
সদ্য সাধা-প্রভাষিত। ইংরেজের যাতে বৈচিত্র্য হয় না।

সমগ্র জাতিটার মস্তক-বাহির এক ঢলক বাত বাত তাই  
কত এরা নিরন্তর বাত। অপর পক্ষে ফরাসি বৈজ্ঞানিক  
অভাবে থাকতে পারে না। জীবনে মৃতন চাওয়া এবং  
মানবেই। লতনের পথে গান করলে পুলিশের চোখে  
পড়ার সম্ভাবনা; পারিসের পথে ঢাক্ ঢোল বাজালেও  
কেউ কিংবা চাইবে না।

ইংরেজ নিঃশব্দ-প্রকৃতি; ফরাসি প্রচুর কথা বলে।  
ইংরেজ হাস্যরস আগে ভাবে কতটুকু হাস্য কেতাববস্ত  
হবে; তালের অভ্যাস দেখি, ফরাসি এত কোরে চলে  
দেখাচ্ছে কোন ইংরেজ থাকলে ভাবতে পারে, তার মাস,  
সব সেল, পশ্চিমের দিক, লুডাটা, লন্ডান!

ফরাসি স্ত্রীর স্ত্রীল বর্ণ বলবালে,—ইংরেজের মতন  
কালোর তক্ত নয়। পারিসের মেহিক পুষ্টি বাহ, খানিকটা  
নীল বর্ণ দেখে মনে প্রীত হ'য়ে ওঠে। নীলবর্ণের এক  
ফরাসি তরুণীকে প্রব কতনয়, তোমরা নীল বস্ত্র, 'এত'  
পছন্দ কর কেন? উত্তর তবল, ও-বস্ত্র, আমরা ভারি  
ভালবাসি, তাই; আর তা ছাড়া, যোগ হয় আমাদের চুলের  
বস্ত্রের সঙ্গে নীল বেশ মানস।

ইংরেজ মেয়ে প্রাপণ্য পরিপ্রমে তালের পড়া তৈরি  
করে, তত্ত্বাদিক পরিপ্রমে টেমিস্ খেলতে দেখে; পুরুষের  
সমান হওয়াই তার জীবনের আদর্শ। সেজন্য সে মাঝার  
চুল কাটে; টাই, ব্রেকার পরে; -kirtএন কুল্ হাটুর নীচে  
আলিতে বেষ না। জানে, বিবাহ ভাগ্যে নেই, কেননা ও  
দেশে বিবাহযোগ্য মেয়ের সংখ্যা সেই বয়সের পুরুষের  
চেয়ে তিনগুণ বেশী। (এর কলে কুড়ি, বাইশ বছরের  
যেহেতু মনে চল্লিশো পুরুষের বিবাহ লেগেই আছে।)  
পারিস্দের মেয়েবাও বিবাহ সম্বন্ধে ইংরেজ মেয়েদের দ্বিগুণ  
চাখিনী। গত দুই এদের অনেককে তিরকুমারী ক'রে  
কোথেকে। তবু পারিসের মেয়েরা মনে মনে পূব কোন্



মেরেলি; কতকটা ভবিষ্যৎ মেরেলের মতন। অথচ  
মোটাই লক্ষ্যনিষ্ঠ। নব। চট্টপটু কথার জবাব দেয়, চমৎকার  
গালে, হাবে তা'বে মিলে বাবুজীর দুইটে মাল্লখকে দুই  
ক'রে তোলে। বিজ্ঞানের ছবির মত শক্তিতে এরা তান্নে :  
দরাদি মেরে মাহেট জুবো। ছোটখাট গড়ন, মুণে

ইয়ের মাহেই মনে মনে একটি ব্যাকেন্বেটু।  
কগাদি সামা, মৈম্বী, মাহেয়েহ চূড়ান্ত পুণ্যার্থি। লঙনে  
সামাজিক স্থান আমার চেয়ে বাবের নীচু তারা আমাকে  
বলে, তান্ন। প্যারিসে বাড়ীর main আমাকে বলে,  
মাদিউ, আমি তাকে বলি মাদমোয়াসেলে। আর একটু



Sacre Coeur অতঃপর কগাদি চিত্রকর

মহুতী, চোখে বিচ্যৎ। এষ্টে সমাই লগি লেগে আছে,  
বুকে বঠই বাগা পাক্, মুণে তার প্রকাশ নেই, চরণের  
গতি চলেকল। মনটু সামা,—নিজা দুতান্নি। চুপেদ  
রঙ কালো আর পোনালির বিশাল।

বর্ষাঙ্গী হ'লে বলতে হত, মাদাম্। পোয়েকরের লগে  
যদি আমি কথা বলি, আমি তাঁকে বলব মাদিউ, তিনিও  
আমায় বলবেন, মাদিউ। প্যারিসে কেউ কারো ডোট  
নয়; সামা, কালো, কল্বেয় তফাৎ নেই। সকলোই

একমাত্র পরিচয় দেবার আছে; সে পরিচয়, লগর্গে বলা  
—আমি মাতৃদেব।

করাসী ভাষাটী প্রাণময়,—ওদের ভাষার থাকে বলে  
(vivant) ভিত্তি। তার পরিচয় লগর্গেসের পথে পথে।  
সারা লগর্গেটায় নিত্য বহোৎসব লেগে আছে, যেন প্রকাণ্ড

থেকে হরের বড় ছোট্টে। “যাও কিছু, পেচালা চলে  
ছল গেলো দিনটি যায়”—এমন লোক পাড়িয়ে বিস্তর।

ইংরেজেরও প্রাণশক্তি প্রচুর, তবে সে প্রাণ পশুপ্রাণ।  
পশুপ্রাণ কথাটা শুনেতে মন চ’লেও আসলে পুণ্য বাসপ  
নয়; অস্বস্ত নিশ্চাপ হওয়ার চেয়ে পশুপ্রাণ পাওয়া ভাল।



“Saere Coeur”

একটা অকস্মিক যেনা বসেছে। আমাদের দেশে বাক্যে মানে  
ভেতরা পার্কণ; পাড়িয়ে বাক্যে মানে ৩৬৫ পার্কণ। ছোট্ট  
জিনিষ এরা অত্যন্ত ভালবাসে,—স্বপ্ন আর হুতা। এ ছই  
বস্তু এদের কাছে এক। গলা ভিঙলে তবেই সে গলা

পশু একদিন মাতৃদেব হ’তে পারে, কিন্তু পাখর চিরদিন  
পাখরই থাকে। পশুর মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে  
যা আর কারো নেই। সিংহের শক্তির কথা আমরা সবাই  
জানি। তা ছাড়া পশু মাতৃদেবই মনে বাটবার একটা অদম্য



প্রেরণা থাকে ; যখন নিতান্ত হাতে কাজ থাকে না, তখন তার ঐক্যাক্ষরে পরস্পরে যুক্ত করে । শক্তি আর উদ্ভব ছাড়া পঞ্চমেন আর এক তিনিও থাকে ; তার নাম বো (instinct) । বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, বোধ দিয়ে তা অনেক সময়ে পরা পর : প্রতিভার বা অসামান্য, common sense এর তা সূচনা । কোন ঐতিহাসিক ইংরেজের John Bull নামকরণ করেছেন জানি না, কিন্তু তার অকৃত্রিমতার তাহিল্ করি । পুঙ্খানুপুঙ্খ লাত ফ'রে ইংরেজ ভগ্ন করছে, —অবশ্য শুধু ভগ্নের কেটাই, কারণ ভগ্নের মন বহুদিন থেকে বড় আছে ফরাসি কালভাগের কাটাগারে । বোধ অনেক বকমের হয়, তার মধ্যে একটার নাম দুঃবোধ । একজন ইংরেজের মত অসত্যের জীব পূর্ব বেশী নেই ; কিন্তু মঙ্গল ইংরেজ একত্র এসে দুঃবোধের দৌলতে তাদের পরাক্রমের শেষ থাকে ।

ইউরোপে দুই দুই যে সব মঙ্গল সংঘটিত হয়েছে তাব চিত্রায়ণ প' : দেখলে কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে । নেশোনিয়ন্ কন্সারভাশ্য, আর ইংলণ্ডে কন্সারভেগিওন্ । কন্সারভে মফাবীর মাশাল্ কোশল্ আর ইংলণ্ডের মফাবীর ডপ্লাল্ (চ'ল্) । একজনকে আভ্যন্তরীণ প্রতিভা ; মনে, কিন্তু একদিন নেভেও । অপরের প্রতিভা নেই, কিন্তু শক্তি (talent) আছে : তার অমিত তেজ—বা গলেও না, নেভেও না । নেশোনিয়ন্ শুধু বলে, মনের শাখন ; তার অভিমানে বার্থতা পক্ষ নেই । গ্রেগিওনিয়ন্ বলে, মনের শাখন কিন্তু পরী পতন ।

হুই

আমাদের দেশে চিত্র বস্তু একাধারে নেতিমূলক এবং নাতিমূলক । নেতিমূলক, কেন না আমাদের বিখ্যাত, চিত্র পক্ষা বার নিবেদ দিয়ে ; নাতিমূলক, কেননা আমাদের ব্যাখ্যা, চিত্র পক্ষা বার বিদ্য দিয়ে । নিবেদ বলা, 'মিথ্যা কথা কহিও না' । বিদ্য—যেমন, 'সব পুত্রা কথা কহিবে' । অর্থাৎ চিত্র জিনিষটা বিদ্য এবং নিবেদ—নীতি এবং নেতি —এ দুইয়েরই বাইরে । নেতিমূলক আর চিত্রিত এ দুইয়ের মানে এক নয় । নীতি বস্তুটা সমাজগত, আর চিত্রিত ব্যক্তিগত । নীতি বাইরের জিনিষ, চিত্রিত চিত্রের ।

চিত্রের পতন হয় না—বিকাশ হয় । তার গোড়ার কথা, 'আম্যান্ বিদ্য', 'Know thyself', আর শেষ কথা 'Be thyself' অর্থাৎ নিবেদে জেনে, এবং নিবেদে মানে । ঘোর নাস্তিক হও ক্রিষ্ট নেই, কিন্তু সেই নাস্তিকের যদি তোমার মনে বিনা ক্রোশে, বিনা মার্গেলে স্বপ্ন হ'য়ে ওঠে তা হ'লে নিঃসন্দেহ তোমার চিত্রিতবান্ বলবে ।

নীতি আছে অথচ চিত্রিত নেই ( অপ্রতিপত্তি পিত্তচিত্রিত আমার কাছে চিত্রিতই নয় ) এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ—বাঙালি এবং মাদ্রাসি । কথাটা অত্যন্ত কটু, কিন্তু ইউরোপে এসে পূর্ব থেকে দেশের দিকে চেয়ে এ পুত্রা আমার কাছে আলোর মত স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে ; পুত্রা হুইই অগ্রিম লোক, তাকে গোপন করার লাভের চেয়ে লোকমান বেশী । ইংরেজের হুই চিত্রিত আছে ; বাঙালির রাবণের মতন । যে বস্তু চিত্রিতের ভিত্তি তার নাম দ্বিতি । ইংরেজ পৃথিবীর বোঝানেই থাক মোহে শুধু ইংরেজই থাকে । মনের দিক থেকে পূর্ব থাক, বাইরের বস্তুও এতটুকু আসে না । যেমন ঘর তবু গোমান্ হয় না । ভারতে গিরে পরমেশ্বর হয় শুধু ধৃতির মত আরামের বহির্ভাব ব্যবহার করে না । এখানে বলা সরকার যে, ব্যক্তির চিত্রিত ক্রমশঃ জাতির চিত্রিত হ'য়ে ওঠে, কেননা জাতি বলতে বোঝায় বহু ব্যক্তির সমবায় এবং মানসিক আত্মীয়তা ।

হুইই, চিত্রিতবান্ জাতি, অথচ উভয়ের চারিত্রিক বৈষম্য বিস্তর । তার মধ্যে মূল কথা এই যে ইংরেজ-চিত্রিত সাময়িক আর ফরাসি-চিত্রিত artistic । পণ্ডন আর প্যারিস্ পাশাপাশি দেখলে কথাটা সোজা হ'য়ে ওঠে । পণ্ডন পথের নাম রাখে 'Financier Square', প্যারিস রাখে 'Rue Anatole France' । পণ্ডনের পথে বাসের পাথরের স্তম্ভ আছে তাদের অনেকই ভাবনে হুইয়ের চেয়ে বড় কিছু করেনি । প্যারিসের রাস্তার ঘোড়ার প্রতিমূর্তি দেখেছি হ'লে মনে পড়ে না । যে সব অমর স্তম্ভ আছে, শিল্পের দিক থেকে তারা মহা পৌরুষের জিনিষ । আইডিয়ায় তারা এক একটা শিল্পাংশি । ( ১ ) বুঝে ব্যাখ্যা মরছে

( ১ ) । মনের চাকচিক্যে ব্যাখ্যা ছবি দ্বারা ; নতনের চাক-চিক্যে দ্বারা চিত্রিতবান্ ; ফরাসি—পাথরের ।

তাদের ক্ষুদ্র লগুন আছে এক সম্ভাব্যতা প্রতিপত্তি : পার্সিস্ সে দ্বিভাষিকের রেখেছে একান্ত সামান্যতা একটা চিত্রা রচনা করে। ইতিহাসের মর্যাদা এরা থেকে, তাই এ চিত্রা রচিত হয়েছে নেপোলিয়ানের সুবিখ্যাত আর্ক ডি'ইক্সের তলায়। অপরক আত্মন অলঙ্কার, অপর বৈজ্ঞানিক আত্মন। রাত বাবেটার থেকেছি, একটা শিশুর হাত ধরে একজন নারী নীরবে সে চিত্রিত পাশে এসে বসেছে। বুঝে কথা না থাক, হ'চোখের দৃষ্টি কথায় চরা। অপ্রতিপা একল বাতালে কাপছে, প্রতি দুরন্তে মনে হয় যেন নিজে থাকে। নতুনকে বহুদল সেমিকে চেয়ে থেকে মনে মনে কত কি ভাবে কে জানে! তারপর বীরলম্বকোশে দূর, অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

অন্য ফরাসি রচয়িতা এখন ইউরোপে লম্বা চেয়ে বসে। বহুদিন থেকে জার্মান শোষণের শোষণ দৃষ্টি তলায় বাস করে ওদের আর দেখে থেকে শূন্য-নাড় শোষণের উপায় নেই। (ফ্রান্সের দৈনিক সংখ্যা ৪১৭,০০০। গ্রেট ব্রিটেন—২২৪,৭২০। জার্মানি—১০০,০০০। ব্রিটেনের—২২৪,৭২০—এর মধ্যে ১০,২২০ দৈনিককে প্রতিশালন করে, দরিদ্র ভাষিত—Daily Mail Year Book, 192২. ওদের প্রত্যেক তরল রচয়িতা শিক্ষা করতে বাধ্য। কিন্তু ইংরেজ সেবার ডায়েরী মত চেয়েও ওরা পারেনি। ফরাসি দৈনিককে দেখে একাল্‌ দে'জার্ছ (অস্ট্রেলিয়া) এর ছাত্র বলে দুল করা চলে।

ইংরেজ চরিত্র মূলত শুধু সামরিক নয়, সঙ্গে সঙ্গে সামরিক। এ গুণ এরা ওদের ড্যানিশ, পূর্ণপূর্ণবলব কাছ থেকে পেয়েছে। নেপোলিয়ন্‌ বলেছিলেন, ইংরেজ নোবানিয়ারের জাত। কথাটা পরিহাস নয়,—সত্য। এবং এতে পৌরব না থাক লক্ষ্যের কিছু নেই। লক্ষ্যের কিছু নেই, কেন না পূর্বেই বলেছি চরিত্র বিনিময়। বহুদল চরিত্র। ব্যবসায়-বুদ্ধি এদের অস্বাভাবিক গাথা। এই কারণে সমগ্র ইউরোপ ইংরেজকে মাজোরি ভাবে; অন্য মাজোরিয়ার আকর্ষণ-বলব বাস-পুণ্যের সঙ্গে লগুনের তুলনা করা পুর বোধী অসম্ভব নয়।

ইংরেজের ৩টি কথা আছে,—discipline এবং efficiency। 'ডিসিপলিন' বাংলায় চর না, কারণ বাস্তব জীবনে ও 'ডিসিপলিন' নেই। এর প্রথমটা সামরিক বস্তু, দ্বিতীয়টা সামরিক। জার্মান চরিত্র বাস্তবে ইউরোপের আর কোনো জাতির চরিত্রে এখনও এত প্রবল নয়। ফরাসিদের মধ্যে তো নয়ই। লগুন লগুনা কলের মতন চলে; এতটুকু ছাড়া নেই। পার্সিস্ চলে নিজেদের পেছালে। লগুনে এগিয়ে এখন দ্বিভাষিক দ্বিভাষিক বা দ্বিভাষিক সমগ্র না। পার্সিস্ এমন দ্বিভাষিক অসম্ভব দ্বিভাষিক বা দ্বিভাষিক সমগ্র রাখে। লগুনে এখন কোনো লগুন নেই বা কোনো পুলিশম্যানের অসম্ভব; পার্সিস্‌ পুলিশম্যানের কাছে লগুন লগুন লগুন বস্তু একটা লগুন। এখন প্রশ্ন এই, কলের মালিক হ'লে ইংরেজ কতদিন লগুনের প্রশাসন কুড়াবে? হেনরি সোভিয়ার লগুন প্রকাশিত Philosophy of Industry গ্রন্থে বলেছেন, দ্বিভাষিকের মালিক শুধু তাইবে; বাকি সব কাজ করে বসে। সোভিয়ার কল্পিত এই মালিক লগুনই বসে, ইংরেজের পক্ষে সে মালিক ভাবনার কারণ নেই, কেন না এরা ভাবে দূর, দূরত্ব মত কাজ করে তার চেয়ে বেশি। অপর প্রত্যেক নিঃসঙ্গের বাস্তবিক আছে, চিত্রাশিল্প ইংরেজের মতো মালিক দেখতে পাই; তবে আমি এখানে হ'ল নাগের কথা বলছি, হ'ল নাগের নয়। মালিক-মালিক আর মালিক হয়ে বিরোধ বাস্তবে জন্ম হয়ে মালিক। হুতরাং তখন ইংরেজকে হুতরাং কাজ ফেলে মালিক কাজ করতে হবে, আর তার চেয়ে কষ্টকর কাজ ইংরেজের কাছে দিচ্চেন নেই।

মুখ এবং বাস্তবের বস্তু সুবিধিত বহুদিন দাব্য চলে আসছে। এদের একটিকে পেতে হ'লে অপরকে ছাড়তে হয়। ইংরেজ বাস্তবের শায়ে মুখকে বলি দিচ্ছে। তাই সৌন্দর্যের চেয়ে ব্যবসায়িক তার চেয়ে বড়। তাই বাস্তব তার ছিঁড়ে দে টেলিগ্রাফের তার বানান। টেলিগ্রাফের বাস্তব কানে পৌঁছায়, বাস্তব বাস্তব মনে। হুতরাং ইংরেজের কান বস্তু জীবা, মন তত তাক হতে পার না। এক কথায় জীবনের সব ক্ষীণত্বের তুলিত করতে গিয়ে ইংরেজ নিজেদেরই চিত্রিত ক'কি দিয়ে এসেছে।



তিন

পুকেট বেলছি, ফরাসি-চরিত্রের প্রধান প্রকাশ আটের ভিতর দিয়ে। তার একটা বড় প্রমাণ—প্যারিসের জাতীয় অপেরা। এ অপেরার খরচ চলার ফরাসি গবর্নমেন্ট। ফরাসির চোখে সমর কিংবা শিক্ষার চেয়ে শিল্পের স্থান নীচ নয়; তাই ফরাসি ক্যাবিনেটে সমরলিচিব বা শিক্ষালিচিবের মত শিরদণ্ডিও থাকে। লণ্ডনে অপেরা নেই, থিয়েটার আছে বিস্তর, কিন্তু তাদের গুণগত বাক্যে বাকি সবাই হইননের বাবার ছুগিরে থাকে। অর্থাৎ তারা অর্থের জন্য আদর্শ চায়। প্যারিসের অপেরায় এমন গুণে পারে না, কেন না অর্থ সবচেয়ে প্যারিস সর্নকস্থাপনকে। নয়। তবুই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ Moscow Art Theatres কতকটা এই উপায়ে তার আদর্শ বাচিরে রেখেছে।

নৃত্য, গীত, বাজ—এই ত্রিবিধ বাজ ফরাসির জনকে প্ররোচন ক'রে রেখেছে। তাই গ-রন সাহিত্যে এত সজ্জী করতে পারে। ফরাসির সাহিত্যে এত বড় হ'তে পারল তার আর এক কারণ ফরাসি ভাষার প্রকাশশক্তি। ও ভাষার সৌন্দর্যে ফরাসি তার মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টত লিখতে পারে। ফরাসি ভাষা বলতে ভাল লাগে, শুনেও ভাল লাগে, ও ভাষার স্বর দেখতে ভাল লাগে! এমন সুমিষ্ট ভাষা পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে ব'লে আমার জানা নেই। ছোট ছোটের সুখে ফরাসী ভাষা শোনা দীর্ঘবে একটা মনে রাখবার মত ঘটনা।

পারিসেই চিত্র ও ভাস্কর্যের কথা বলব। পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল চিত্র ও ভাস্কর্য সংগ্রহ আছে প্যারিসের Louvre-এ। কিন্তু পুরাতনের পুরা এরা বতই করুক, তার চেয়ে বেশী করে নৃত্যের সৃষ্টি। প্যারিসে চিত্রকরের সংখ্যা গ্রীক হ'লার। ছবি ঝিকি হব বখেই, তবু এদের অনেককেই দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে বহুদিন কাটাতে হয়। মোমারের (Montmartre) এক আর্টিষ্টের ঘরে গিয়ে দেখছি, হ'লিতে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে সৃষ্টি ক'রে চলেছে। সমস্ত ঘর কর্দমাক—অতি অত্যাশ্রমিকের ঘরের মতন। চারদিকে অপব্যব ছবির সুরঞ্জাম

ছড়ানো, একটা শুষ্ক ভাল চেয়ার। বোঝ করি দেটাতে তার 'মডেল' বলে। ৫০ ফুট (৫ টাক) দামের এক ছবি দেখাল,—তার দাম ৫০০ ফুট চাইলে আমি বিখিত হইতাম না। এ শুষ্ক একটা টাইল,—আছে এমন বিস্তর।

বহুদিন হতে চিত্রচর্চা ক'রে ও সবচেয়ে দরাসিদেয় একটা অন্তর্দৃষ্টি জ'মে গেছে। অবশ্য এ বিষয়ে ইউরোপে ফরাসির ছিড়ার আছে,—বস্তুর কাছেই, হলান্তে। দাঁড়ান আঁশরের দেশে চিত্র বত সমাধর গেরেছে, হস্তাত্ত, তাম্র দাইকের দেশে চিত্র তার চেয়ে কম আদর পায়নি। অস্ট্রেলিয়া-প্রতাপগত একটা ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে প্যারিসে পরিচয় হ'ল; অস্ট্রেলিয়ার কলেজে তিন বছর সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে প্যারিসে কিংবা জিরেনার কোনো বড় গুণীদের কাছে শিক্ষালভার্থে ইউরোপে এসেছে। ছিড়ার পর বঁটা কথা ব'লে দেখছি, বেশ বুদ্ধি আছে, ভাবতেও পারে, অস্তি হৃদয় তারালিন বাজায়। কিন্তু এত বড় লুভ্ চিত্রশালা তাকে দেখাবার সময়ে 'কি সুন্দর!' 'কত চমৎকার!' এমি কথা ছাড়া তার মুখে উঠেখোঁপা আর কিছু শুনিনি। অথচ হলান্তের একটা ফুলে-শড়া মেয়ে উক চিত্ররতন দেখে এগে বলে, যোনা দিলার চোখ জারি মিঠুর; আমি ওকে দেখতে পারি না।...কেন মিঠুর? সে শুষ্ক মেয়েদ্বীই বাওকে।

ফুলস, মিঠুর—তা মানি। কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হাশি মত? রহস্যময়?

—তা হোক; যোনা দিলার সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে বলতুম,—বলতুম—

—কি বলতে? যে, বামো, হোনা না?

—বলতুম যে, তোমার হাশি কি তহানক বিজী!

ছোট মেয়ের মুখে যোনা দিলার লম্বচে এত গভীর কথা শোনবার আশা করিনি। আসলে মনে হয়, বহুদিন হ'তে চিত্রচর্চা ক'রে হলান্তে একা ব্রাশের সহনায়ী ও লম্বচে একটা লম্বক হলবোথ (art insinuel) জ'মে গেছে; ওরা ছবি দেখে একটা ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে পারে,—যে মত 'কি সুন্দর' ব্যাধ মতন নির্দিষ্ট নয়, বার একটা ধরবার ভাব্য মত অর্থ হয়।

মোনা লিয়ার হালি আমার চোখেও মতান্তর নিন্দুর  
লেগেছে। ও যেন শুধু নিতে চায়, দিতে চায় না, বিজয়  
চায়, বিজিত হ'তে চায় না। সুখপানা লুণ্ঠার তরা, ছ'চোখ  
চির-অন্ধুত। এর পরিকল্পনা কীটুপ্‌এর কাব্যে পেয়েছি;  
"La belle dame sans merci"। (১) রবীন্দ্রনাথে  
পেয়েছি; মোনা লিয়ার লক্ষ্যপের নারী-লক্ষ্যতপ।

মোনা লিয়ার ছবি আমার চোখে বড় ভালই লাগুক,  
তার চেয়ে ভাল লেগেছে তিনাসু ত মিলোর পাথরের  
প্রতিমা। ও-সুখে তাবের বিশিষ্টতা আমি পাই নি; অথচ  
ওর প্রতি অন্ধ যেন কথা বলছে। পাথর ব'লে মনে হয়  
না। তিল তিল সৌন্দর্য্য বিধিয়ে তিলে-তিলে অস্ট্রী  
হয়েছিল; সে পুণের তিলোত্তমা এ পুণের তিনাসু। শুধু  
এক দেশবার জন্ত গাত লম্বুর পার হ'রে আলো সার্বিক হয়।

শব্দকে আমি ত্রুড় ব'লে মানি, তাই একখানি বন্দেব  
মালা বন্দন লজীর হ'য়ে ওঠে তাতে আমি বিস্থিত হই না।  
ছবির দেখে গ্রাণলকারও খুব কষ্টিন নয়। কিন্তু জড় পাথর  
হ'তে পরম লুণ্ঠার মানবমেহ অস্ট্রী করা আমার কাছে ভারি  
আকর্ষণ লাগে। যে ডগলস সাধনা আর অপরিদ্রাঘ বৈধা  
নিরে সুদীর্ঘ কাল হ'রে ভক্তর পাথর দিয়ে কাব্য লেখে,  
আরীর কাছে সৃষ্টিরাহো তার জুড়ি নেই। ভক্তর্গ্য এখন

(১) বালো পত্রিকার ছোট-বড় লেখকরা অনেক সময়ে  
বোনালিয়ার আলো ছবি না দেখে, কিংবা তার প্রতিচ্ছবি দেখে,  
নাগের-মোহে তার হালি কলা লিখে থাকেন। এতে তাদের বন্ধন  
এক পাও এগিয়ে না, তা হাড়া মোনা লিয়ার হালিকের ছোট করা  
হয়। যা বস্ত্র পরমাশ্রিত্য তাকে এত লাবণ্যময় করে দেখা ভাল নয়।  
উত্তরোত্তর এসে কত লক্ষ্য যুগে কত লক্ষ্য জলী হালি দেখুব, ভিন্ন  
কোণের সে হালি, আর কোণের বোনালিয়ার হালি। L'Innocence  
এর ছবি দেখে কত লক্ষ্য যুগে কত লক্ষ্য, Three Graces-এর ছবি  
দেখেছি বহুসংখ্যক দেখে, কিন্তু বোনালিয়ার নব্বু এতটা অলৌকিক  
নয়।

পুলিয়ার লক্ষ্য মনবার যুগে,—এক ক্রপে, ছাড়া।  
লেকলের গ্রীক-রোমান প্রতিভার পরিচয় পেতে হ'লে লুডরে  
পেতে হয়, কিন্তু একালের করাসি ভাবের মানসমুগতি  
মর্মানর্থে যেতে হয় বোধ। মিউজিয়মে। লেকলের পাশে  
একালের—মিকেল এঞ্জেলোর পাশে রোগীর হাড়াবার  
অধিকার আছে কি না সে বিচার করবে অন্যত্র কাল।  
কিন্তু এত বড় একটা শিল্পে, অসম্ভব একমাত্র করাসি দেখে  
অন্য হ'লে আছে লেক্স ওদেরের তাত্ত্বিক না ক'রে থাকে  
যায় না। ইংলেণ্ডে ভক্তর্গ্য এখনো মরেনি তার কারণ  
ইংলেণ্ডে ভক্তর্গ্য এখনো জগাধারি।

করাসি ছবি এবং ভক্তর্গ্য লব্ধে আমার পেশ কথা এই  
সে, ও ছবি দেখবার অধিকার শুধু সেই ব্যক্তির আছে, যার  
উচ্চাখের পিছনে আছে একটা মন। সে যার নেই, তার  
কাছে উচ্চাখিত এবং ভক্তর্গ্য অস্ত্র অস্ত্রল বোধ হবে।  
আটে নব্বুতা আমি এক মতা বোধ ব'লে মনে করি; কিন্তু  
সে মতাদোষ যে দিল্লীর পত্রিকালে মহাভাগে পরিণত হ'তে  
পারে—তার বহু চাক্ষুশ পরিচয় আমি পেয়েছি। শুধু এট  
ছবি জিনিষে নয়,—সমস্ত প্যারিসটাকেই দেখবার জন্ত লুডন  
মন, লুডন জোণ দরকার হয়। প্যারিসের জীবনে একটা  
আট আছে—এ যেন বীভোকেনের একটা সিম্বল। মাঝে  
মাঝে তার ছলোপাতন হয়, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ  
সুহৃৎক কখনো হয় না। তাই প্যারিসে অন্ধকার বস্তট  
পাক্, সে অন্ধকারে তারা মলে, কাগা বইই পাক্, সে  
কাগার জুল কেটে। নিজেই জানবার সুযোগ প্যারিসে  
যত, উত্তরোত্তর অন্ধ কোথাও তত নেই,—নিম্নের পত্রিক  
নিজের কটি, নিজের মন।—

"He who has stood the test of Paris  
has stood the test of  
humanity"—  
কাইজারলিহু।

হাঃ হাঃ, পার্শ্বে না ! পার্শ্বেই ত না । আমিও পারিনি ।  
ক'র কি ? ঘাই কোথাও ? বাড়ী ? না, না, বাড়ী আসব  
নয় । সেট গিরীষ বকতাক্তা নিবাস, সেই মেয়েটার ছলছলে



চোপা! আচ্ছা! মা আমার-আজকাল লাসনেও আসে না,  
শানিরে শানিরে যেড়ান, পাড়ে ওজনেই কেঁদে ফেলি।

যাতি কোণার? ক্রমের বাকী। আমার মত চতুর্ভাগ্যের ঐ  
ঐ ভুড়োবাহি আশ্রয়। না দেখতে হবে গিটার নাক কুণিরে  
কাঁথা, না দেখতে হবে লোকের দাঁত ঘের ক'রে হাস।

তাই। একটা গাছের ডালে না চাপরটাকে বেঁধে, যাদু।  
এই যে একটা ডাল। কেউ নেই তো? না, এ বেঙালার  
বন। এর কাছে বাজিতপুরও লুচর। (গলার চাকর পূলে  
গাছের ডালে রাখলেন) একটা ক'স পেয়ে চাই। (ক'স  
তৈরী করতে করতে) হার রে আমার চাদর—আমার কস্তা-  
মাকের কাচা! আর তোমাকে কাচোনা না। এ লাল  
মাগটা কিপের? আলা, গিটার লাল লুতার আমার নাম  
লিপেছেন। কি বাবা চোপের জল, চেব তো বেরিয়েছ—  
এখন আর বেরিও না, শুভ ব্যাকার অমঙ্গল হবে। (গলার ক'স  
পাবের) এই বাব কূলে পড়ি। গিটার, গিটার, গল্প, গল্প।

বেশপো

মহেন্দ্র

(চমকে উঠে) কে নাম ধ'রে ডাকে। (দূরে গলার  
দড়ির আবছায়া সুরি দেখা গেল) ওঃ কুমি—যাকি, যাকি।  
(কূলে পড়তে গেলেন) একজন তৈরবীর বেগে পবেশ,  
তৈরবীর পত্রে চক্কো লাল পেতে দেখা লাড়ী, কপালে  
গিদুব ও বকু চন্দন। গলার কস্তাকের মালা, তাকে একটি  
কুণিসংলগ্ন সিপুল।)

তৈরবী

(মহেন্দ্রের দাঁত চেপে ধ'রে) মহেন্দ্র, কি করছিস?

মহেন্দ্র

কে কুমি? কোণার ছিলে? আমার চিন্তে কি  
ক'বে?

তৈরবী

(অশৌচিক ভীত দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে)  
মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র

ওঃ তৈরবী, তাই।

তৈরবী

মহেন্দ্র

কেমন মা, কেমন বাবা দিলো?

তৈরবী

খোস বসুটি।

(বহুল বহুগলিতের মত বলাব ক'স পূঃ)

ছিঃ বাবা—কোনো আশ্রয়তায় মত পাশ নেই?

মহেন্দ্র

ওই তো মা, তোমাদের মাদুলি কথা। গাব আটাব  
গছের মেঝে ধবে কিরোনো গাব বেঁচে থাকার কাছে লব  
চেয়ে পাশ।

তৈরবী

(প্রচণ্ড স্ববে) ডিকে ক'বে বৃষ্টি

তৈরবী

মানবেশ কাছে ও দিক!

মহেন্দ্র

আই ও মা লুল করলে। মানবেশ কাছেই ডিক।  
স্কয়েছি। কলকাতার বাবা সোনা মাদুল।

তৈরবী

তার মানে বড মাদুল তো? আমি মানবের কথা  
বলছি।

বুঝতে পারছেন।

তৈরবী

পারছেন? (কুমির ভিতর তে একটি চন্দ্রমা বেব  
ক'রে মহেন্দ্রের দাঁতে ধরে) আচ্ছা এই চন্দ্রমা নিয়ে বাড়,  
এই প'রে থাকে মাদুল বেশবে, গোট মাদুল মাদুল।

মহেন্দ্র

গছটিকে মাদুল বেখোনা না?



## ভৈরবী

মাঝর মেখে ডিঙ্কা চেঁচো ।

মচেঁজ

## ২য় দৃষ্ট

কুঁড়ে কবের সবুধর আঁচিন্য সবু, একটি লাউমাচোর সিকে চেয়ে  
ধাতিয়ে আছেন ।

সরসু

এই লাউগাছ তিনি নিজেই হাতে মাচোর তুলে গিয়েছেন।  
এখন লাউ কলচে—কে খাবে ? তিনি না এলে কি পাড়তে  
পারি ? আচ্ছা ! কখনো বিশেষে যান্ না । কি ক'রেই  
ডিকে ক'বে বেড়াছেন, কি ক'রেই যোতানে থাকেন ? তার  
উপর যে গাড়ী ঘোঁড়ার রাহা, আর তিনি যে ভাল মাছ—  
ভালোর ভালোর বাকী কিরলে বাচি । কেনই ঐ আবারিক  
পেটে বেরেছিসুম ?—ওর ভেতরই সাতা হ'তে গেলেন । আগে  
দুখে মাসি পেগেট থাকতো, আর তিনি বন্ধুর আর মাসি  
কেনিনি ।

মচেঁজ

আচ্ছা, বেশি মাচোরার কেনন কথা : কেনন দয়া ।  
এতটুকু আশার তোলা : বিরে যখন স্ত্রাসমুদ্র থেকে টেনে  
চুল্গে, তখন ভৈরবীর পারের দুলা নিরে) আনিকান কতো  
দেন এট চন্দ্রার তোলা : বিরে কজানারেরও সমুদ্র পার হ'তে  
পারি ।



মচেঁজ

আব একবার পারের দুলা বাও ।

(ভৈরবীকে সপ্রাথ ক'বে সঙ্গন )

## ভৈরবী

ওগ শিব নমু । বাবা, কত ভগেট এলে হাও পাতে ।  
তোমার ঘন তোমাকে দিই ।

মলিনা

মা, আর কি হাঁদেবা ?

সরসু

আমার মাথা ! এত বড় নেমে চলি, বিরে দিলে ছেলের  
মা কতিস, এখনো শিবিরে দিতে কবে । বা—মা পুদী রাধ পে  
যা ।

মলিনা

আমি—আমি—

সরসু

তুমি—তুমি—কি কাগড় প'রে বেড়াতে—বেন কাঠ.  
কুড়লীর মেখে ? ঐ ভেতর গেলে প্রজাপতি  
বলে না ।

( মলিনা তোলে মাচোর বিরে কোঁপাতে ব্যাপো )

শেন্, শেন্, কীবাশনি ( মলিনাকে বুকে টেনে নিয়ে)  
করসা কাগড় নেই বুঝি ? তা আমাকে বলিগুনি কেন ?  
এই খানাই আর খোল দে কেতে দিহুম । চল আমার এক-  
খানা আছে । গরিরে চল বেঁধে দিই পে । তবু কোঁপায় !  
কি বলেছি আমি ? আমার ঘেমন নেই মাথার ঝিক লম্বা  
মা আমার, কীদিগুনি । চল, আর আর কোকে হৈসেলে  
থতে হবে না । আর আমিই ওটি হাঁদেবা'খন ।

তোমার বিকটি-কিনকা বা মোরে

দিকড় কলসা কবিতা,

দিয়ে দিরে এসো ছাফিতে ভাঙটি

কত জীবজন্তু বদিতা ;

এক জন লীলা যে কলশায়,

আমারে কহিতে বল,

তোমারে দেখার মণিরাত্ত ভত

বহিও আমি বদিতা ।

আমার বদীতে তোমার মণিদী

যাকাকলপত ভবিতা,

কুণ্ডলা মের তোমার রেহেব

পদেলে লও গো ভবিতা ।

মলিনা.

সরস্ব

এস বে একেবারে উৎসে উঠে । কলকাতার গিরে

সরস্ব

কার কাছ থেকে—

আচ্ছা কুটাই র'বিম্—চন্দ্র ।

মহেন্দ্র

মলিনা

মত্না গায়ে বান ডাকিয়ে এগুম ?

চুমি—চুমি—

সরস্ব

সরস্ব

হ্যা গো হ্যা—মুখের কথা মুকুৎ থেকে নিজে বে ।

কি মা মল্—কি ?

মহেন্দ্র

মনের কথা কাড়বার সাধা নেই—

সরস্ব

বেগ মন ব'লে ? ঐ বাঃ, প্রণাম কর

( শাওর পুষা নিলেন )

কিরে আসতে ।

মহেন্দ্র

সরস্ব

এ যে অতি-তকির মতন তেড়ে !

ঐ মতে তোর কান্না—তব্ব কি মা ?

সরস্ব

আরে বাপুয়ে—পতি-দেবতা ! আচমকা এসে পড়লে  
তাই, নৈলে স্থল বিধিপত্রের জোগাড় ক'রে রাত্তির । এখন  
ধড়াড়ো ছেড়ে একটু শাখার বাতাস খায়ে চল ।

( চাবের পূলে দিখে হাত ব'রে টানেন, )

ঐ বাবা আসছেন—

মহেন্দ্র

সবাবোম্বুত ।

সরস্ব

( কান পেতে ) ঠিক ধরেচে ! দাঁড়া না—পালাচ্ছিস্ কেন ?

আবার শাখার বাতাস ! আমি ভেবেছিলাম কুলোর  
বাতাস দেবে । নাঃ, এই লাঠি শাতার বাতাসই ঘেঁটে ।

মলিনা

সরস্ব

ভীর ভাত চকতে হবে না ?

আচ্ছা, এইবার একটা কথা কিয়েলস করবো ?

( মলিনার প্রস্থান : অপর দিক দিয়ে মহেন্দ্রের প্রবেশ )

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র

ওগো, আমি এসেছি ।

ওরে, কে কোথায় আছিচ্ছ দেগে বা—পতিভ্রতা কাকে  
বলে ! কপাটি বল্বে তাত্ত অহুমতি নিয়ে ।

সরস্ব

সরস্ব

( চাত ভেড় ক'রে : কান অনিচ্ছিত দেবতাকে সন্ধ্যা  
ক'রে ) আমার চোপ আছে । আমি কান্য নই ।

যখন এত হালি পুঁদী এত কুঁড়ি, তখন নিশ্চয় টাকার  
জোগাড় হয়েছে ?

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র

তাই নাকি ? আমি আরো ভাবছিলাম, চাপিতোন ক'রে  
পনের দিকে চেয়ে চেয়ে পতিই কান্য হ'য়ে গেছে ।

না, টাকার জোগাড় হয়নি ; কিন্তু এমন কিছুই জোগাড়  
হয়তে বা দিখে টাকার জোগাড় হবে ।



মহেন্দ্র

কেপেই উঠেছিলাম—

( প্রবেশ একজন বোয়াল ও একজন বোয়ালী । বোয়াল  
এক হাতা চাউ, বোয়ালী হাতে বস্তা )

বোয়াল

মহেন্দ্র

ও রাখে তাক আমন সবাই বলে—পড়তে কল্যাণেরে ত  
বুকেতে ।

সরল

আঃ, ওর সঙ্গে ও—দাঁড়াও ভিকে এনে দিচ্ছি ।

( প্রহরানোয়ত )

সরল

কিসের আবার, তাঁচের ।

মহেন্দ্র

কাঁচের ! এ দিছে কি দেখা বাঘ ? মাহুত, মাহুত ।  
বুকে না ? বলি, মাহুত কখনো দেখেছ ? সব জন্তু ।  
এটোটে চোখে দিছে দেখো, দেখবে আমিও কততো একটা  
গুণ্ডার ।

সরল

ও মা ! সে আবার কি ?

মহেন্দ্র

জঁ জঁ, বলি চোখে সবাই মাহুত—মাহুত পাবে লাগে  
একটা । গুঁজতে হবে তুমি এই দিছে ।

সরল

মহেন্দ্র

ঠায়ে—ঐ মস্তেই তোমাদের—বলি, আমার দরকার  
কি ? টাকা তো । মানবের কাছে চাইলেই পাবে ।

সরল

ওঃ বুকেছি । এ চল্মা কে বলে ?

মহেন্দ্র

কে বলে ! আচ্ছা শোন । তুকুর ক্যাপে মাথার  
বাঘে, মাহুত ক্যাপে কিলে ? কল্যাণেরে । আমি কেপে  
উঠেছিলাম ।

সরল

কেপে উঠেছিলে !

যেহেতু বাঘের পলায়ন-বিড়ি বিড়ি ছেলের মাগ,  
জিত বেঁচেও বাচ্ছা তুঁ ছাড়তেমকো চাপ ।  
যেহেতু বাঘের মাহুত কাতে নেই বেপেরে ভাই,  
কাঁচা গেলেই চোকার ছুরি সব েব কসাই ;  
পিরমাকটা ছুট গেলে বেই বরা মাহুর বলে ।  
কলশী-কাঁচা চাউর মতো মাঘেরে মেছে নগ্না ।  
সার করতে বাঁধতে হবে মাঝার টাকার বস্তা ।  
যেহেতু মাহুত হর কেপে কলমে কটাই লাগ ।

## ঐন্দ্রজিৎসহ সটক

মহেন্দ্র

তুণ্ডে তো ? কেপে উঠেছিলাম কি সাথে ? এদের  
আবার তুমি চাপ এনে দিচ্ছিলে । ( ব্যাগ থেকে টাকা বের  
ক'রে বোইম বোইমার হাতে দিলেন । )

( বোইম বোইমী সবাক হ'ল পরস্পরকে দিঃ )

বোইম

গৌর নিতাই বাবাকে লুণ্ঠে ছাড়ুন ।

বোইমী

বাবার মেছেতি যেন রাজার যথৈ পড়ে—রাখে তুফ !

সকলোজঃ

মহেন্দ্র

শোন, রাখে তুফ, শোন । এ গান যেন ঐ দালাল-  
আলা বাড়াতে গেছোনা—সে যে-সে নিবারণ নয়—টাকা  
কেড়ে নিয়ে যেরে ভাড়াবে ।

বোইম

বোইমী

আ মর বোরেন—এ ও বুঝি না ? দে কড়ে ছেদের  
বাপ ।—(মহেন্দ্রের প্রতি ) না বাবা, দেখানে—এর পান্টা  
শিটটি গাইবো । রাখে তুফ !

মহেন্দ্র

ছাই গেছেছি । নৈলে আর কেপে উঠেছিলাম ।—  
বাব, বা বলাচলুম—কেপে না উঠে—নাঃ সে আর তুমি  
না ই তুণ্ডে—মোদ্দা ক'রে যেন এক ভৈরবীর সঙ্গে দেখা—  
তিনিই ছিলেন এই চন্দ্রমা ।

সকল

তা ও প'রে মাহুয খোঁজনি ?

মহেন্দ্র

পুঁজনি আবার ? পথের দুপাশাছি পুঁজোছি । দিগারেটের  
দোঁদা উড়িয়ে কলকের ছেলে বাছে—বামর, ফোঁটা টিকি

চাড়িয়ে ভুটোয়া বাচ্ছেন—কুসুর, হুড়া হাকিয়ে বাণু বাচ্ছেন  
—শাটো । অত কি আদালতে গিয়ে দেখি হাকিম ব'লে  
আছেন লম্বকর্ণ, উকীল হাকিয়ে আছেন চোকা লম্বা, মকল  
পাড়িয়ে আছেন চিত্তর অখাত । কেউ কেউ আবার  
জাতিতে জানোয়ার বেশানো । গাণ দীক্ষিতে একজন  
বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁর মূখটা কয়েক সিন্ধের, দুকটা  
দরগামেসের, শিষ্টটা কচ্ছপের আর পা ভাটা বেঙ্গল  
খোঁড়ার ।

সকল

একটি মাহুয শেনে না ?

মহেন্দ্র

গেছেচলুম মাছি একটি—চাঁদে বাড়ীর তেলের সামনে ।  
চোটে হাতকাড়, তালিহালকা ।

সকল

সকল

আমি কি তোমার সঙ্গে চলুম নাচ ?

মহেন্দ্র

বলে 'তাই তো তাঁর আমি যে এখন করোনা—আজ্ঞা  
এই চিঠি নিয়ে যাও আমার প্রার কাছে ।' চেয়ে নিলে একটি  
কাগজ পেনসিল, দিলে ও লাইন লিখে । মেলুম তাই নিয়ে  
তার বাড়িতে—আহা ! আর একটি মাহুয দেখলুম,  
মাহুয ত নয়—দেবী । কিছু নেই তিন খানি গরনা ছাড়া—  
তিন খানিই খুলে দিলে । বলে 'তোবোচলুম এই দিবে  
আশ্বিন করবো—তা তিনি যখন বলেটেন, বিন্ ।'

সকল



মহেন্দ্র

কিভাবে দিয়ে দে দৌড় ।

সহৃদু

তা চলে আর একজন সাধু খোঁজ ।

মহেন্দ্র

কাজেই ।— একটু চিন্তার পর ) আচ্ছা কেন ? চলেচে—

আমি এমনই ঘেঘের ঘিবে দেব ।

সহৃদু

না, না—একটা ভেজপকের ঘাটের মড়াব

মহেন্দ্র

না গিটী, না । নিবারণের ছেলের লজ্জাট ।

সহৃদু

দে কখনো খালি চোখে নেয় ?

মহেন্দ্র

তাই বাবা নেবে । এর নাম মংলব । বুধলে না ?  
গায়ে ঢুকতেই তো নিবারণের বাড়ী—বেশি নিবারণ আর  
তাব বউ উঠেনে গাভিড়ে । নিলুম চন্দ্রমা চোখে—বা  
ভেবেছি, নিবারণ বাঘ, বউ সাপ ।

সহৃদু

বলো কি—নিবারণ বাবু বাঘ !

মহেন্দ্র

নিশ্চয় । নৈলে আর কল্কি

ভাঙ্গে ?

মহেন্দ্র \*

নৈলে অমন বিধে ভরা ?

সহৃদু

আর লাগেও গেলে ।

মহেন্দ্র

এটি—এটি—এখন বুধলে তো ? খালি ক্যাল ক'রে  
চাইলে কি ? আরে, আদকে থাকে আমি নিবারণের কাছে,  
কালকে থাকে তুমি মোক্ষদার কাছে । এবার বুধ্জো ?

একটু একটু ।

মহেন্দ্র

চার দিক চেয়ে ) মলিনা নেই তো ?—আচ্ছা ঘরেই  
চলো, পুরো পুঁথি বুঝিয়ে দিচ্ছি ।

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণ

বাবা, চালাকি নহ । গী ছুট এই দুটোর মধ্যে—এম  
পাখনা, নয় কল্কি, নয় দানব (খাতা মুড়ে) এক মহেন্দ্র ? তা  
মেয়েটি নিলে দেও কেঁজো ।

মোক্ষদা

খালি শুভা, মহেন্দ্র দে গায়ে কি'বে এসেচে ।

নিবারণ

মোক্ষদা

কে বলে ! আমি তোমার মত নাকে তেল দিয়ে খুঁতোই  
কিনা । কি'বেগেছি কি সুখ ঘরের কারের ভজ্ঞে ?

নিবারণ

তা ভালই তো ।

মোক্ষদা

ভালই তো ! ভাল মন্দ সব

টাকার জোপাড় ক'রে এসেচে ।

নিবারণ

দেই ত চাই ।

মোক্ষদা

ওমা ! তুমি তার ঘেঘের লজ্জাট বিদ্ধর বিত্ত মেবে  
নাকি ?

নিবারণ

\* টাকা শেলেরই মোব ।



**চন্দ্রমা**  
**ঐদীপ্যন্ত শটক**

মোকদ্দা

আমরা—যেন কত টাকাই পায়েন। হাজার বৈ ত সহ।  
আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে হাজার টাকার ছাড়বে?

নিবারণ

দাখে ছাড়িচি—তোমার সোনার চাঁদ যে তপোহ চাঁদের  
মর্থ্য হোবেন না। কলকাতার ব'লে আমার টাকার শকুনে  
—আর আমাকেই লিখচেন পদ না নেওয়া হয়। এ দা  
নির্দিষ্ট ঠাকৈ লুটিয়ে।

মোকদ্দা

তা লুটিয়েই আর কিছু নাও না।

নিবারণ

বেশী নিলে কি আর লুকোনো থাকবে?

মোকদ্দা

থাকবে, থাকবে—তুমি মনোহরকেই আর একটু চাপ  
দাও।

নিবারণ

দেব? নাঃ, আর চাপ নিলে ভেঙেও খেত পাবে।

মোকদ্দা

কেন ভেঙে যাবে? যে হাজার দিতে পারে সে দেও  
হাজার দিতে পারে না?

নিবারণ

কথা পাশটাই কি ক'বে?

মোকদ্দা

আস, যেন খবরদার সুখিতির!

নিবারণ

দেখো, সুখিতির সুখিতির আমার বোল না। আমি ভীম।  
আমি হাল্লে লোক কাঁপে। আমি দম্ভাঘোষার দার দারি না।

মোকদ্দা

আবার ভাগ! দা পুনী তাই করো। আমার কথা না  
শুনলে কানে—যোত্তার শাক ম'বে আগুবে।

নিবারণ

তুমি দ্বী চ'লে পাশাপাশি দিচ্ছে?

মোকদ্দা

কোথায় পাশাপাশি দিলুম? বুড়ির চৌকি!

নিবারণ

এই তো পাশাপাশি দিচ্ছে! আমার বুড়ি নেই তো  
আজ্ঞে কার?

মোকদ্দা

আমার। আমার বুড়ি নিলে এই একতলায় উপর  
একদিন তেতলা উঠতো।

নিবারণ

ও তেতলা একতলা সমান।  
পাঁচের মধ্যে কেউ কেউ বিধেও?

মোকদ্দা

পাঁচের মধ্যে না দিক—পাণ্ডের পাঁচের দিচ্ছে। সে  
তোমারি গোমস্তা ছিল। সেদিন থাকে নাটকে পিরে দেবি ছাফ  
পিটুচে—মনে ক'ল ছাফ তো পিটুচে না, আমার খুক পিটুচে।

(চাপ খাঁচল যেনে)

নিবারণ

আজ্ঞে আরে কাঁধো কেন? কেনও তো? তাকে আমি  
দেখে নিচি। গিঠা, ও গিঠা!—কি বুঝিল! তাই ই বাড়া  
দবি না জোক ক'রে নিলাম করিয়ে ছাড়ি—

মোকদ্দা

পাক থাক, পদ দেখেছি। নিলেম কতাবেনু! কেন?  
আমার কথার দাম কি? আমার কথার যদি দাম থাকতো,  
মনোহরকে আর একটু চাপ দিতো। দেবে কেন? আমি বে মব।

(চাপ খাঁচল যেনে)

নিবারণ

আরে আরে—ও গিঠা!—তাঁই হবে—দোব আর  
একটু চাপ—



(মালতীর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

নিবারণ

ভাবনায়, বাণ্যে কি তোমার প'লেট ব'লে পেলে টাকার  
কোথাও কুসি, আর একমাত্রে মতো দেখা নেই? কথো  
কোথাও?

১—তা এককম—

নিবারণ

এককম কি ককম? কানো, তোমার সবসার আমি  
অনেক ভালো দখল নাওড়া কথো

মহেন্দ্র

জানি আর কৈ? জানলুম, কি—

নিবারণ

তোমার কিয় প'রে কথো, আগে আমার কিয় পোন।  
৭ টাকার টাকার ক'না, আরো প'লেটো চাই—কেননা যে  
শাঠী মেয়ে, লোকে নিষ্ঠা করচে। বোব, পাকো? আর  
না পাকো ত আমি যত ক'রার—

মহেন্দ্র

তুমি দান। 'অর ক'রার'তই দেখো।

নিবারণ

কেন? কি হলো? একের উপর আর বৈ ত নব। এব  
চেহে দগা আর কোথাও পাবে?

মহেন্দ্র

না, সে ক'রার নব—এক ও না আরও চাই—ককম  
এবার দে এক ককম প'রকম, কি—

নিবারণ

মহেন্দ্র

আজ একটু কিয়, যদি আরও বেক তো বলি।

নিবারণ

কি ছেলেমানুষী—কথো।

মহেন্দ্র

লোকে বাগদা দেবেই মেয়ে দেব—তা তিনটি  
বখন—

নিবারণ

তুমি এত বক কথো কথো?

মহেন্দ্র

আমি কেন বলো? আমি কি জানি? আমার  
ককমের কলচেন।

নিবারণ

তোমার ককমেরই আমি কক চটে খাই।

মহেন্দ্র

কি হি দান, ওকথো বোল না। তিনি মণাপুত্র, দিও।

নিবারণ

দিও! কাক ডাকো।

মহেন্দ্র

নিবারণ

বাগবো না? ককককক আর কাকগা গাওনি?

মহেন্দ্র

কি বনে দান, কককক? এই কথটি তাঁর মুখ দিয়েও  
বেরিওনি। বলেন—“কি রে বাটা, কককক ডাকিস?  
আজা দিয়ে না। এই চন্দ্রা—এই কিসে দেখেই বুঝি”।

নিবারণ

কিলের চন্দ্রা?—দেখি।

(মহেন্দ্র চন্দ্রা বের করে নিবারণের হাতে দিলেন।)

নিবারণ

হ্যাঁ, একখানা লোহার গাঁটের চন্দ্রা, আর কল কিনা  
আমার দাঁ পাপ। এ চন্দ্রা যদি না গুড়ো করি—

(বাগদা বের ক'রা ক'রা ককক কলচেন।)

মহেন্দ্র

কথো কি কথো কি দান!—ক'ড়া কলচেন যে আর  
দেখতে পাবে না।



নিবারণ

বটে ? আচ্ছা দেখিছি । ওগো একবার এইদিকে এসো ।  
তাঁহঁদের এক তো ভাঁড়ো করগেই—তোমার গুরুকে হৃদ—  
মহেশ্বর

আমি তা হ'লে একটু বাইরে বাই ।

নিবারণ

না, না, তোমার লামনেই আশ্রয়—তুমিও দেখো ।  
দাশ ! ও গো! আসিও ? এখানে শুধু মহেশ্বর আছে ।

( লম্বা খোঁচা দিয়ে বোম্বার প্রবেশ । নিবারণ চোখে চন্দ্রমা সিন্ধেট  
জ্বালি মূণ্ডলীর সঙ্গে দিড়াবে হোলে পড়লেন । তাড়াতাড়ি  
চন্দ্রমা খুলে কলিষ্ঠ করে )

( বোম্বার প্রস্থান )

মহেশ্বর

( নিবারণের হাত থেকে চন্দ্রমা নিয়ে ) কি দেখলে ?  
আমি দেখলুম না যে ।

নিবারণ

আর দেখতে হবে না । ওরে বাণ্ণবে ।

মহেশ্বর

নিবারণ

নরতো কি মাহু ? আত্ম কেউটে—এই কথা তুলে  
চলচে—ওরে বাণ্ণবে ।

মহেশ্বর

এঃ কেনই দেখলুম ? না জানিতে দে ছিল ভাল ।

নিবারণ

ওরে বাণ্ণবে, সে কি কথা ? এখন তবু সাবধান হ'তে  
পারো । চোখে না দেখলে বুঝতুম কিণে ?

মহেশ্বর

আচ্ছা দাদা, এখন আসি—

নিবারণ

আপলো ? তাইতো মহেশ্বর, এখন উপায় ?

মহেশ্বর

দেখতে পারি গুরুদেবকে ব'লে, যদি কোন ক্রিয় ঠিক  
ক'রে মাহু ক'রে দিতে পারেন ।

নিবারণ

( মহেশ্বরের হাত ধরে ) দেখো তাই দেখো, দিচ্ছ পুরুষ  
তো । একটু হাতে পায়ে ধ'রে, বুঝলে কিনা—

মহেশ্বর

দে আমার বলতে হবে না, আসি ।

( মহেশ্বরের প্রস্থান )

নিবারণ

একটি ছোবল মারলেই তো দেখি । কি ভাগি, এতদিন  
ছেড়ে কথা কইচে । জানতে দেওয়া হবে না । যদি  
বুঝতে পারে আমি টের পেয়েছি—সেই রাঙেই—( আনন্দ )  
দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ) ঐ একটা লাগুড়ে মাপী থাকে  
না ? এই মাল-বো—এই !

( হাতছানি দিয়ে ডাকলেন )

ওহা ত মাপ নিয়ে ধব করে । এখন এট সব চোঁটট  
করতে হবে ।

( বামাব তিন চারটে ক'ণ্ঠে নিয়ে লাগুড়লীর প্রবেশ )

লাগুড়লী

বেলা দেখবে বাণু ? তাহা মাপ আছি ।

নিবারণ

আব তাহা—দে তাহা দেখেছি !

লাগুড়লী

কি দেখেচো বাণু—এমন কখনো দেখেনি—

ওমা—দাখো !

কেউটা খোপুড়

কোঁপায়ে সাবাবিন,

একটি টোকা দিলে পরেই

ছোবল বায়ে তিন ।

ওমা—দাখো ।

ক'ই হ'লে রস কণ্ঠে মেজের

হাওয়ার লোমে থা,

চাকনি খুলেই মুখে পড়ে

বেলাই দবাটা

ওমা—দাখো ।



প্রাণের মতো লম্বকী সাপের

হুই হুপে যে নিশ,

মাঝখানে বের থেকে থেকে

বড়ই মিঠে নিশ।

ওমা—মাথো!

শুধু এক লাউতলা সাপ

কেন্দ্র তোলে মোক,

যে ত-অঁচিটা লম্বিকের পাতে

পুথলে যে যায় চোখ।

ওমা—মাথো!

চোখের সাপের চোকে থেকে ক

অহরহী ঘর ঘর,

আবাক্যাকার বীকুনিতে

বা বাপে ঘর ঘর।

ওমা—মাথো!

এ পড়িতে নাহু

চিত্তি আর ঘোড়া,

কিন চাখিতে কেন্দ্র কলে

বোঝে চোঁড়া।

ওমা—মাথো!

এটবার বের করি ক

(সঁপিলি দুলাতে গেল)

নিবারণ

গাফ্‌গাফ্—আর বের করতে হবে না—তুই সাপের

ওম্বু জাণিল?

সাপুড়েনী

জানি বৈকি বাবু—নৈলে সাপ বেলাতে পাখি ক—কি

সাপের ওম্বু?

নিবারণ

কেউটে সাপ—

সাপুড়েনী

কত বড় কেউটে?

নিবারণ

পূব বড়—ঐ সাপ—ঐ হুয়ে বেড়াচ্ছে।

সাপুড়েনী

ও ত মগ্রহ বাবু।

নিবারণ

চুপ—চুপ—ঐ সাপ।

সাপুড়েনী

ওই সাপ! ও সাপ নয় বাবু, মাগিনী—ওয়ে বাপু

ওর ওম্বু নেই।

(তাড়াচাড়া খঁপিল নিবে অত্যান)

নিবারণ

ওম্বু নেই—কি ভয়বর!

(মোক্ষলাব্র প্রবেশ)

মহেন্দ্র চ'লে গেছে?

নিবারণ

(পিছিয়ে গিয়ে) আত্মিকত মূনম'তা—

মোক্ষলা

(এগিয়ে গিয়ে) আমি আরো তাবছি শেরেতে—

নৈলে সাপুড়ের গান শুনে আসি না?

নিবারণ

ও বাবো! (পিছিয়ে গিয়ে) তরি বাসুকেশবো।

মোক্ষলা

(এগিয়ে গিয়ে) তা তার সামনে আমাকে ডেকেছিলে

কেন?

নিবারণ

(পিছিয়ে গিয়ে) ভয়বাক মূনম'পটী।

মোক্ষলা

(এগিয়ে গিয়ে) কি বিড় বিড় করছো?—পুলে

বলো না।

নিবারণ

(পিছিয়ে গিয়ে) মনলা বেবী নমোহন্ততে।

মোক্ষলা

বা রে, কেবলই যে পিছিয়ে যাচ্ছি!

নিবারণ

গিঠী, মোছাই তোমারে—কত সময় কত বকেছি—

আমার উপর কেন তাগ টাগ রেখোনা।

মোকক্ষদা

এ আবার কি চঃ! বলি মহেন্দ্র কি বলে?

নিবারণ

মহেন্দ্র? কি বলে?

মোকক্ষদা

হ্যাঁ, হ্যাঁ—যেবে দেড় হাজার?

নিবারণ

বলে... চোটা ক'রে দেখবো।

মোকক্ষদা

আর কবে দেখবে?—একটা ছেত নেত্র ক'রে নিতে হয়।

নিবারণ

ছেত নেত্র! হ্যাঁ, একটা করতেই হবে।

মোকক্ষদা

না, তুমি মোটেই কান বিছোনা। কি ভাবছো?—

আচ্ছা, এখন চল যাবে এসো।

নিবারণ

চল যাবো! চলই যাবো।

মোটাই।

মোকক্ষদা

এ কথা আগে বলনি কেন, পুঁচি ভাজবার আগে?

নিবারণ

তখন তো কিদে ছিল।

মোকক্ষদা

তখন ছিল আচ্ছা এখন নেই! আমার রাগিনা বলছি—এসো।

নিবারণ

না, না, রাগাবো কেন? যাচ্ছি।

চর্য পুস্ত

(গানবীজের কথা পুস্তক। পুস্তকের নিষ্কৃত কণ্ঠস্বর ধ্বনি  
উপবিষ্ট)

মলিনা

যখন যা হুতে আসি তখনই একটু ছুঁড়াই। তবে

খাল্লে দম বন্ধ হ'রে আসে। উঃ, বাপ মাকে কষ্ট দেবার  
জন্তেই আমি জন্মেছিলুম।কেন? নাই বা হলো আমার বিয়ে। ঐ যে গানগুলো  
শুণবার ছুটে—কেনন সুখী ওরা—মা'র কোলে বড় হচ্ছে,  
লকণের লকণ লকণের জড়াঝড়ি! কেউ তো এক কাড়ের  
একটাকে তুলে নিয়ে আর এক কাড় পোতে না—আর  
ঐ যে হললে পাখীটা ডালে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে ওই বা  
কতই সুখী—ওদের মধ্যেও বিয়ে নেই, ওরাও বাপমাকে  
কাদায় না।

গান

চাও নদু মন

একোলা কবির আসি লগার কানন

যাচালে কালিষ মা'মি কীশোর পাখার

করি তার হাথ,

কম বরখার

শখিলে অ'খিকল করিব মোচন

কিরিষ সুখ হ'রে কোনে তুলে তুলে

ঝাকালের তুলে,

আর প্রাণ তুলে

ছড়াবে চাক-চাক অ'তুল কেনন।

লকণের কাটা কেড়ে নিয়ে নিজে কাঁধতে পারতুম!  
আর নম, লকণে হাঙ্ক, আমিও হাসি—যেমন দিন হাললে  
তুল হালে, খোকা হাসিলে মা হালে। সে কি ক'রে হয়?  
কে আমার মা বাপকে হাসতে পারে? বামী, বামী, তুমি  
আমার আচ্ছা? যদি থাকে—তবেই তোমার চেয়ে কেউ  
ভালবাসতে পারে না—এসো, ঈগণির এসে আমার নাও—  
আমার মা বাপের মুখে হাসি ছুঁছুঁ—আর যদি দেখী করো,  
নিশ্চয় আমার পাবেনা—এই খাঁখির কালো জলই—

(চোখে আঁচল বিলে)

ওম দৃষ্ট

দম-পুস্তকের বীজাংশ।: বীজাংশের মধ্যে পুস্তকের দম-পুস্তক

মোকক্ষদার প্রবেশ

মোকক্ষদা

সকাল থেকে মাগির দেখাই নেই—সগড়ী বাসন উঠোনে  
সড়াগড়ি দিচ্ছে—কাকে ডগড়া জোর করচে—ছড়া-কাঁট



পৰ্বণ্ড পড়লো না—কতভানী

মুক্তো ?

হাই সো মা, হাই—

কিমলতলার যাও !

( মুক্তকেশব প্রবেশ )

বল চ্যারে মুক্তো, টেচিয়ে পলা কাটাছি, কুই কোন্  
চুলোর ছিগি ?

মুক্তকেশব

( হেসে ) ও বাকীর পরাশকে দিয়ে কানের

হেঁখানি-মুখ—

মোকদ্দা

খেল দেখাচ্ছিলেন !—ঘরের কথা

মুক্তকেশব

“ ( হেসে ) এই তো করতে হাই ।

মোকদ্দা

আর টা লা, কাল কর্তার বিছানা নিয়ে সমর ঘরে  
পেড়েছিগি কেন ?

মুক্তকেশব

( হেসে ) আমি কি করবো ? বাবু যে বলেছিলেন ।

মোকদ্দা

বলেছিলেন ! আমাকে জানাল নি কেন লা ?

( মুক্তকেশবের সামি ও একতড়া কথা নিয়ে নিবারণের প্রবেশ )

নিবারণ

( খমকে ব্যক্তি ) কে, গিঠী ! আমি এই পূজোর  
ঘরে থাকি ।

মোকদ্দা

কেন, পূজোর ঘরে আবার কি ? সাতকন্ডে ত ও  
পাঠ নেই ।

নিবারণ

এ্যা—না, আমি নয় । তটুচাণি এলে একটা পূজা  
করবেন ।

মোকদ্দা

কতাব আবার কিসের পূজা ? আর পূজা ত করাফো,  
কাল বাইরের ঘরে শোওয়া হয়েছিল কেন ?

নিবারণ

কাল ওর নাম কি—তোমার ঘরে যে ছারপোকা—

মোকদ্দা

চৌকি বের ক’রে দিয়ে মোকেশ

বা মুক্তো, বিছানান্তলো ঘরে

ছি, ছি—খেয়ে খেয়ে ঘরে ঢুক দেখি মাছধও নেই  
বিছানাও নেই, আর আমি যে সমর ঘরে বাবো তার পথটি  
রাখোনি—চারিদিক এঁটে পোঁটে বন্ধ করেছে । কি করতে  
তোমার । নরদামা পৰ্বাত কাদা দিয়ে বুজিয়েছিলে ?

নিবারণ

( বদন্ত ) ও বাবা ! তা হ’লে নরদামাও পুঁজোছিল ।  
তবে ত কাল ঠিক দফা সারতো ।

মোকদ্দা

কি সো, চুপ ক’রে রইলে যে ? বল মুখ দিয়ে কথা  
বেরোয় না কেন ?

পূজোঘরের প্রবেশ

পূরোহিত

এই যে কবুতা গিঠী কখনই আসেন । তারপর কি  
পূজার সংকল্প করবেন ?

নিবারণ

কুহন না এই বিকে—

পূরোহিত

খলন, ধলন, আমার বখিরতা সন্ধ্যািত কম ।

নিবারণ

( বদন্ত ) ইয়ারাও বোকে না—

মোক্ষদা -

বণ না গো, কিসের পুজো করাবে।

নিবারণ

কিসের ? এই গুর নাম কি—সেদিন বস্র দেখেছিলাম  
কিনা—যেন বিবাহের অর্থাৎ কিনা মনসা দেবীর পুজো  
করচি—তাই—জুই—

মোক্ষদা

মনসার পুজো ! তা মনসা একটা ফেলনা দেবী নাকি ?  
যা তা ক'রে পুজো করলেই হল ?

নিবারণ

( বস্র ) ও বাবা ! কোঁস ক'রে উঠেচে । মনসার  
চেণা না হ'রে যায় না ।

মোক্ষদা

দাও, দাও—পুজোর জো আমিই ক'রে দিচ্ছি।

( নিবারণ হাত থেকে সাদি ও কলা নিতে গেলেন )

নিবারণ

মন্ডরে স'রে গাড়ির ) ভূমি আর কেন ছোঁয়াচ্ছাতি—  
ভূমি আর কেন কষ্ট করবে ?

পুরোহিত

হান্ হান্, আমিই কইয়া লছি।

( নিবারণ কপিত হাতে সাদি ও কলা পুরোহিতের

হাতে দিয়ে সহানোড়ত )

ই

মোক্ষদা

( নিবারণের প্রতি ) পোন, একটা কথা আছে।

নিবারণ

মোক্ষদা

এইদিকে এগো না, কানে কানে বলি।

নিবারণ

( বস্র ) আতিকত সুবেশাতি।

মোক্ষদা

আমি কি সাপ, যে ছোঁবল মারব ?

নিবারণ

( বস্র ) ও বাবা । ভরী বাহুরেস্তা—

মোক্ষদা

তবে দাও—আর শুনে কাজ নেই। কি যে তোমার  
হঠাৎ জানি নে !

পুরোহিত

এই নি পুজার দর ?

মোক্ষদা

ইয়া ইয়া, ভিতরে যান্।

পুরোহিত

একটু পা ঢইবার চল—

মোক্ষদা

ওই যে খটক্রেই আছে—কি, দাড়াই আমি দিচ্ছি।

( পুরোহিতের কাছে দিয়ে ঘটন রস পায়ে ঢেলে দিলেন—পরে

পুরোহিতের পিছনে পিছনে যাবার দর দৃষ্টিগত )

নিবারণ

কাছে গেতেও পা কাঁপে, আবার কাছে না  
গেটে। কি যে করি !

( মোক্ষদা হঠাৎ দর হ'তে বোঁকতে এসল )

মোক্ষদা

নিজে আসন পেতেছে। নিজে চন্দন ব্যবচে। নিজে  
নৈবেদ্য সাজিয়েছে। আমাকে বলেও নি—পাছে আমার  
কষ্ট হয়। তাই ভাগো, কেবল হঠাৎ যেন একটু কেমন  
কেমন হয়ে উঠেছে।

( দরদর প্রবেশ )

কি গো সন্তুষ্ট যে, কি মনে ক'রে ? বড়পোক ব'লে তো  
পরীবার বাড়ী দাড়াও না।

সরল

একটা কথা বলতে এলুম—

মোক্ষদা



মোক্ষদা

বলো, বলো, আর ভণিতের কার নেই।

সরস্ব

বড়ই ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে বেয়ান পাতাই—তা  
ভগবান হ'তে দিলেন না।

( বাউ হাতে মুক্তকেশীর প্রবেশ )

মুক্তকেশী

মোক্ষদা

মুক্তকেশী

খরো খরো, বড় তপ—

( মোক্ষদার হাতে বাউ দিলে )

মোক্ষদা

যা ঐ ঘরে দিবে আর।

মুক্তকেশী

ঘরে মোব কেন? আপনি খাবে যে।

মোক্ষদা

আমি খাবো!

( সরস্ব বস কিরির হাশতে লাগলেন )

মুক্তকেশী

হা গো হা—বাবু বলতে।

মোক্ষদা

বাবু কি কপেচে নাকি?

( নিঃসঙ্গের প্রবেশ। সরস্ব খোমটা টেনে ঠাকুরপরের চুচ পড়লেন )

নিঃসঙ্গ

বাও, বাও, ওতে তোমার উপকার হবে।

মোক্ষদা

কেন, আমার হয়েচে কি?

নিঃসঙ্গ

হয়নি কিছু, তবে খেতে ভালবালো কিনা,—

ভালবাসি!

নিঃসঙ্গ

অর্থাৎ কিনা—ওর নাম কি—যেহে মোক্ষদা তাঁও  
থাকবে।

মোক্ষদা

বাও, বাও—আসিখোতো। একটা কথা বলতে গেলাম,  
শোনো মলনা—মোক্ষদা তাঁও থাকবে!

( সন্ধ্যায় ঘরের বাউ নিঃসঙ্গের বিকেল দিবার ফিলেন )

নিঃসঙ্গ

মোক্ষদা গিন্নী রেখোনা—এখন না বাও, একটু পুরে  
থেরো—মোক্ষদা একটা কথা বলছি কি—

মোক্ষদা

আঃ, বলোনা কি বলবে—কেউ দেখা করতে এলেই  
বত কথা।

নিঃসঙ্গ

বলছি কি, তুমি মাঝে মাঝে নব কামড়াও না?

মোক্ষদা

কামড়াই তো!—কি হয়েছে?

নিঃসঙ্গ

কামড়াতে ইচ্ছে করে বুঝি?

মোক্ষদা

করে—করে। নব তো ভাল, তোমার ব্যাভারে পা  
কামড়াতে ইচ্ছে করে।

নিঃসঙ্গ

( স্বপ্নত ) ও বাক্স! কর পা? ( প্রকৃত্তে ) দেখো,  
ভাক্সারী বইতে লিখুচে ও একটা ছোপ।

মোক্ষদা

ছোপ না আরো কিছু—ও আমার বতাব।

নিঃসঙ্গ

( স্বপ্নত ) বতাব!—ঠিক বসেচে ( প্রকৃত্তে ) তা ও  
বতাব সেরে যায় যদি একটা কলি করতে দাও। ( পকেট  
থেকে সঁড়ানী বের ক'রে ) তুমি চোখ বুজেই ক'রে থাকো,

আনি চট্ট ক'রে তোমার বিবাহ। অর্থাৎ কিনা কুসুমেরীত  
জুটা টেনে-তুলি—অর্থাৎ কিনা কুসুমেরীত বিয়ে টেনে  
ভেলনাই।

মোকদ্দা

ওমা! সে কি কথা! কীটো ওপড়াবে কি?

নিবারণ

তুমি টেরও পাবে না

মোকদ্দা

বাও, বাও, আর রত করত হবে না। এত উত্তর রাখে  
দেবে।

নিবারণ

মোকদ্দা

এল গো সরল, এসো।

(সরল ঠাকুরকে শেকে বেহিয়ে মোকদ্দার কাছে এসে  
বললেন) কী বলছিলে? দেড় হাজার দিতে পারবে না?

সরল

না, না, তা বলবে কেন? শুকর কুপায় তা এক রকম  
পারতুম, কিন্তু মেনে শুনে বাছ-বজ্ঞের পরে মেয়ে দিই  
কি ক'রে?

মোকদ্দা

বাবু-সরল, কখন সাহুবে তো বাখই হবে।

সরল

সে বাছ নয় যদি, সে বাছ নয়, সত্যিকারের বাছ।

মোকদ্দা

আ মর মুখপুড়ী, ঠিক ছোটলোকের ছেলে—বাড়ী বয়ে  
এলেনে বা মর তাই পোনাতো।

সরল

পোনাতো আসবে কেন এখানতেই এগেজি। দেখে  
উলানা এই চন্দ্রমা পরে। ভাল উনি এসে দেখে গেছেন।

(মোকদ্দাকে চন্দ্রমা দেখালেন)

মোকদ্দা

এ। এ কিসের চন্দ্রমা?

সরল

কিসের কি মানি, শুকবেব বিয়েছেন—শিষ্ট লোক তো।  
বলেন কার ঘরে মেয়ে দিচ্ছিল? একদিন গল্প ক'রে মেয়ে-  
টাকে দিলে।

মোকদ্দা

ওমা, কি অনাস্থার কথা!

সরল

অনাস্থার কেন? এ তো সবাই জানে। হুঁসরবনের  
হুঁসরটে বাছ সাহুবে ক'রে নেই? কেউ কি ভিন্চে পারে?

মোকদ্দা

ওমা শুনেও গা কাঁপে—জাখ, এ সব জাকর।  
করিস বাড়িতে গিরে। স'রে গড় বর্গিচ।

সরল

বটে। আচ্ছ। তা হ'লে বাঘের লেহেই ঘর করো।

মোকদ্দা

খোঁকা লাগিয়ে দিলে। কোঁক মিলে, একবারি দেখে  
দেখ কি? ওলো ও সরল!

সরল

মোকদ্দা

সে, চন্দ্রমাখনি—দেখেই আনি।

সরল

হ্যাঁ দেখতে গিরে একটা কাণ্ড বাবাও আর কি—যদি  
টের পান যে লক্ষ করেছ—

মোকদ্দা

সরল

তা হ'লে মমনি নিজমুস্তি—

মোকদ্দা

দুই—দুই, কথার ছিরি দেখনা—দেন সত্যিই বাছ—দে,  
না মর মুখিয়েই দেখটি।



সরস্ব

মোক্ষদা

(মোক্ষদার হাতে চন্দ্রমা দিবে) তাই দেখো—ঐ  
আসছেন।

(সরস্বতীর হাতে দিবে) ও ধোনুতোর পায়ে পড়ি—  
দেখিস্ জাই—তাই দেখিলু—

সরস্ব

দে আর বলতো দিচ্ছি এত শুকু ভোমার বিপদ নয়,  
গায়েব বিপদ—আদি।

(সরস্বতী প্রস্থান)

নিবারণ

পুষোহিত

মোক্ষদা

ও, পাইচি—ভিল, ওমা, আতপ চাইল।

সরস্ব

দেখো—দেখো—এই বেলা দেখো।

মোক্ষদা

(চোখে চন্দ্রমা দিবে)—ও—মা—গো!—(তাকাতাকি  
চন্দ্রমা পূলে সরস্বতী হাতে দিবে বিদ্যারিতনেত্র চাঁপাতে  
লাগলেন)

পুষোহিত

ওহ, কদলা, মনলাপজ—আর কিছুত বরকার নাট।  
আগনি প্রকর্ষে ঘাইবার পারেন।

নিবারণ

দূর তালেকু ক'কেপুতো করুন।

(নিবারণের প্রস্থান)

মোক্ষদা

কি করি?—ও সরস্ব—সত্যিই যে—

সরস্ব

এখন অগ্রেই বিদ্যাপ?

মোক্ষদা

হবেনা আগার? মাথাতো নয় যেন বামাটা—চোখতো  
নয় যেন আগলের ভাঁটা—গা-বর একজাত ক'রে ভোঁরা—  
তাইতো কি করি?

সরস্ব

কি আর করবে? দেখবে গুরুদেবকে ব'লে যদি পাতি  
প্রস্তান ক'রে মাংস ক'রে দিতে পারেন—

(সরস্বতীর প্রবেশ)

কি গো মা, কি?

মোক্ষদা

কাল মাংস এসেছিল কোথেকে?

দুর্ভিক্ষ

কেন, ওপাড়া থেকে। ওপাড়ার হেলেবাবুয়া যোগ  
একটা ক'রে খাসী বলি ডার কিনা।

মোক্ষদা

চেরে এনেছিলি বুঝি?

দুর্ভিক্ষ

ওমা চেরে আনবো কেন? বাবু যে কিনতে পারিয়েছিল।

মোক্ষদা

(দ্বন্দ্ব) কিনতে পারিয়েছিল? মাংসটান—মাংসের  
নাড়া—(প্রকট) ছাঁনা, আরও আনতে পারবি?

দুর্ভিক্ষ

পারবেনি কেন? ভাগ্য দিবে বেচে কেন একটা  
খাসীর কি কক'মাংস পা। কত নিমেরা দাবে? বলতো  
বোঝু আনতে পারিবি?

মোক্ষদা

নোকেই আনিব—আমিপিলা দোব।

দুর্ভিক্ষ

তা এগুনি দাও না—আমি বেলা না পড়েছেই—





କରା କୁଳ



ଟେକ, ୧୦୨୫

ନିର୍ମା—ହିତେଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଗ  
ଦକ୍ଷିଣାତ

মোকদা

মোকদা

দেব এখন । আগে এক কাজ কর । কতীর বিচানা  
দেব মদন ঘরে দিয়ে আর—

(বগত) কাল রাতে ঘুমতে পারিনি—পাতলে রেখেছি  
সেই আঁকড়াটা কালই বানিকটা দিয়ে রাখি গে ।

দুঃস্বপ্ন

পুরোহিত

তা হইলে কল্যাণ হইতনাই যিবেন । বাজোহিত ।  
এক পুণ্যর মন্তর । তা ও মনসার ও ব্যামক জানি,  
ব্যামসেবের ও ভায়ন ।

(দুঃস্বপ্নীর প্রস্থান)

(নিবারণের প্রবেশ)

ও পুরুতটাকর, পুরোহিত কখনে না কি ?

নিবারণ

পুরোহিত

কখনে পুরোহিত ?

পুরোহিত

মোকদা

আ কতী ! হ, করছি তো—‘মনসা দেবী নমোনিভঃ  
মর্পদেবী নমো নমঃ গোমুতাতাং তঃ নাতি গচ্ছো  
কল্যাণিতঃ’—মকিয়া জানেন, মকিয়াস্তের বিলম্ব নাই ।

(পুরোহিতের কাছে গিয়ে) দেবুন, মনসাপুরোহিত আর  
করতে হবে না ।

নিবারণ

পুরোহিত

হাঁ আনুচি ।

মোকদা

(নিবারণ ক্রতবেগে যেহিবে ব্যাখ্যাসেব—এমন মন্তর মোকদার  
ভ্রতবেগে প্রবেশ ।) কল্যেনের মাথার খেঁকটুকি ছাড়া গেল

না, আশনি মকিন্দারের পুরোহিত জানেন ?

মোকদা

পুরোহিত

‘মকিন্দার ! সে করে ক’ন ?

(হঠাৎ পা পিছিয়ে, বগত) মায়া, হৃৎকর বনের মায়া !

মোকদা

নিবারণ

সে যে বাঘের দেহতা—

(হঠাৎ হাত পিছিয়ে, বগত) ব্যতিক্রম কুনেমাতা—

পুরোহিত

মোকদা

স—ব্যামসেব—দুঃস্বপ্ন ।

কতবেগে গেল, তাগ করে না ।

মোকদা

নিবারণ

জানেন তাঁর পুরোহিত ?

তুমি তাগ করে না ।

পুরোহিত

মোকদা

(হেসে) জানুননা কান ? মোগার সব জানতি হই

(বগত) গাঘের যেমো গচ্ছ মায়া পা’ল গচ্ছের মত  
ঠেকো ।

মোকদা

নিবারণ

তবে মকিন্দারের পুরোহিত করুন—আমি আনুচি—আর

(বগত) পাত বগেনি তো ? মাথার ছোকাগে আর  
কলো মাছে ? (দূর দিয়ে লাগ কাটিয়ে) আমি আনুচি ।

কতী যদি আগের ত কল্যেন মনসাপুরোহিত করতেন ।

পুরোহিত

(হেসে) এই নি কথা ? বুঝি ।

(নিবারণের প্রস্থান)



মোকদ্দা

( পুরোহিতের কাছে গিয়ে ) শুনুন যখন বিহিত পুণ্যে করুন,  
শুধু তাগো কর'রে ।

পুরোহিত

অ, পিত্রীমা ! হ, করটি তো ।—বাখর নমঃ শ্রুত-  
বনাগ নমঃ—ও তদ্ব্যক্তপূন্ব কট—ও মনুষ্যের কক্ষভায়া  
লখনোজাও নমঃ ।—এইবার দক্ষিণা আনেন—দক্ষিণাশেষ  
লম্বাও চাইতে ।

মোকদ্দা

এটো নিম্ন দক্ষিণা ।

পুরোহিত

কতটা নাটক ? জান—দক্ষিণা বাজে হস্তকোঁ দিগ্ধাট  
মাটি—এখন প্রণাম করুন—

পুরোহিতের কথনঃ বিকটভবিত্তঃ

দ্বাপরযুগেস্তঃ বহুভক্ট মনসাঃ

বক্তাভ্যাসে চমস্তঃ পর্জ্যাস কবিত্বঃ

কৌশল কৌশল বর্জনার লজলজজিহ্বাত নমঃ

—ওহেন, পলায় লগা যান ।

নিযাত্রণ

( গোলায় মুখে দিয়ে ) কাগ ও আনবেন—কাগ ও পুণ্য  
কহতে হবে ।

পুরোহিত

আগামী কলা ? উত্তম । এখন বহুচেন, পতাতাই  
করেন ।

( নিযাত্রণের প্রত্যয় : প্রসঙ্গ অপর দিক দিয়ে মোকদ্দা )

মোকদ্দা

দক্ষিণা এনেছি ।

পুরোহিত

জান—দক্ষিণাবাখা সাইকা মাটি—প্রণাম করুন—

“বাখরেন মহাশয় বেশ বেশ নসোহরতে,

বহু বহু দূরঃ বহু, বহু বহু দূরঃ বহু ।

ওঁ মনুষ্যা ইতিশাখিতাখিতাখিতঃ

মিন্দুগোলায়ুখঃ বহু

শ্রুতবহুভক্টঃ বনপতিঃ জীতিগতঃ বাখরঃ”

প্রণাম বক্ষণ করেন ।

মোকদ্দা

( গোলায় মুখে দিয়ে ) কাগ আনাব আনবেন ।

পুরোহিত

উত্তম, উত্তম । ( টাংকে টাকা শুধিতে শুধিতে )

বাখরেন সকল দেবের উপর ।

মোকদ্দা

( ঠাকুরদেব থেকে বোঝে ) বাই, মাংগটুকু পাঠিয়ে

দিয়ে—মাংগ পেলে মুক্তোয় চাতেও পাবেন ।

( মোকদ্দার প্রত্যয় )

পুরোহিত

বড়ই বুদ্ধি কইয়া সায়াতি । বাগা বে চইলন একজ

সাইনা চারান্ নাই । কাগ যদি দারান্ ? মিস্ত্র

বানাইবার চইতে । এমন ময় বা এ্যাতেও লাগে, অতেও

লাগে ।

( পুরোহিতের প্রত্যয় : অপর দিক দিয়ে মুক্তকেশু  
বসি হতে লগে )

মোকদ্দা

( বাটী থেকে একগানঃ মাংগ তুলে ) বেশ লাগে—

বেশি আর একখান্ চেখে । ( মাংগ মুখে দিয়ে )—আঃ—

( মাংগ মুখে ) ওমা গিঠী কি আকেল গো—কখান্ মাংগ

দিবেছিল ? চাকতেই হুজিরে গেল বে—আর তোঁ লম্বই

কোঁড়া—এই হাড় নিয়ে গিয়ে দিয়ে আলগো ? ওমা

তাও কি চর ?—আর চেখে এই জান্না গলিয়ে কেলে নিই ।

( কেলে দিয়ে ) কিহু গিঠী যদি কর্তাকে জিজ্ঞাস করে

কেনন খেলে ? নাঃ, তা আর জিজ্ঞাস করবেনা—গে জিজ্ঞাস

করে ছোটলোকতা । আর কতা বে গিঠীর সঙ্গে চখকনা

দিবেছিল—তাও ত চাকতেই হুজিরে গেছে—তা কি

করবে ? নিজে সাধলে খেলেনা, আবার আমাকে বলে, "গা  
খাইয়ে আর"। ( হাত চেটে ) আঃ গান খাইতে উচ্ছ  
করচে ।

মাংস খেলে মাংস বাড়ি পাড়ে রাখে বলে,  
কলা খেলে কলা বাড়ি খুঁচে সুরে চল ।  
আবার, রুম খেলে বাট  
হুহু হু হু খেলানি  
গর চাঁটতে চমকা উজান এসবার ওপার তল ।

( নিবারণের প্রবেশ )

নিবারণ

ঠায়ে মুক্তো—খিটোকে খাইয়েছিলি ?

মুক্তকেশী

নিবারণ

বেশী মাখতে হয়নি—নায়ে ?

মুক্তকেশী

না মাখতে হবে কেন ? খিটেই তুলে নিয়ে চৌ —

নিবারণ

বলিস কি, এক নিমেষে—?

মুক্তকেশী

হ্যা, শেষ ক'রে তবে নিমেষ ফেললে—কোঁস ।

নিবারণ

কোঁস !—( স্বগত ) ঠিক মিলছে ।

( নিবারণের ক্রোধে প্রস্থান, প্রবেশ অনুরক্ত দ্বয়ে দোহরা )

মোকদা

হ্যা না, কর্তাকে খাইয়েছিলি ?

মুক্তকেশী

মোকদা

আমি কি বলে রূপ করেনি ত ?

মুক্তকেশী

রূপ করবে কেন ! খিটা কচমড় ক'রে চাঁকবে—

মোকদা

বলিস কি—হাড়তল নাকি ?

মুক্তকেশী

এঁা হাড় !—হ্যা, তাও কড়মড় ক'রে—

মোকদা

কড়মড় করে !—( স্বগত )—ঠিক মিলছে । ( প্রকাশ্যে )

এই নে আঙ বেণী ক'রে মাংস আনিব ।

মুক্তকেশী

( টাক : নিমেষ হেলে স্বগত ) টাকার আট আনা  
খাকবেই ।

মোকদা

আমি খেটা খাইয়ে তাল করিনি । ঐ রে, ঐ আসচে—  
মাংসের রুম পেয়ে—কি যেন কি করে—ও বাবা ! নীচু হয়ে  
না টিপে টিপে খালে কেন ? আঙই দেহেচে—পালাবো ?  
কোথার পালাবো ? এক লাফে বরবে—চোখে চোখে  
চেয়ে থাকি—তুনেছি বাঘেরও চার চোখে লক্ষ্য ।

( কচমড় ক'রে চেয়ে বসিলেন । নীচু হয়ে না টিপে টিপে নিবারণের  
প্রবেশ, হাতে একমুঠা মুগা )

নিবারণ

( স্বগত ) ঐ ত গাড়িয়ে । কোন রকমে এই মুগা  
মুঠো চোখে দিতে পারলে হয় । মাংস কাহিল ঐতেই—ও  
বাবা ! চোখের পলক পড়ুচেনা—জন্মের ত পলক নেই—  
নিজদৃষ্টি ধরে বুঝি । আর একই এগিরে ছুড়ি ( পা  
টিপে টিপে এসোতে লাগলেন )

মোকদা

তবু যে এসেয়—তুনেছি আন্তর দেখলে পালায়—  
আঁচলে ত দেখলাইটে আছে—( আঁচল থেকে বেশলাট খুলে  
কাটি আঁচলে লাগলেন )—তবু পালায় না যে—ছুড়ে মারি—

এঁ কলর কাটি খাট্টে ছুড়ে মাংস লাগলেন )



নিবারণ

মার কাছে নয় (মোকদ্দার চোখের দিকে খুলে  
ছুঁড়ি মাবলেন) —কসকে গেল যে—এইবার ও তাক  
করবে—একে বৈকে ছুটি—

( একে বৈকে এবার ওখার ছুটিতে লাগলো )

মোকদ্দার

আঙুলের কাছে জালাকি ! ( বেশলাইএর কাগি আলতে  
হাশতে নিবারণের শিছনে শিছনে ছুটিতে লাগলেন )

নিবারণ

ও বাবা !—কে বলে এঁকুতে বৈকতে পারে না—টোচ  
দৌড় দিই ।

মোকদ্দার

আসে । চারপাশে লাশ

— — —

ওষ্ঠ দৃষ্ট

একদিন বড় শোড়ী খরর হাতিয়ার মারর পেয়ে মরেছে বলে

মাঝে মাঝে ডাখা হ'তো ।

মহেশ

( ভ'কোর টান দিয়ে ) কি মজাই এডকন বেঁধে গেছে ।

চকনে চকনকে বেধে আঁকছে।—ছুটে আমাদের কাছে  
মালতেই হবে ।

( শিখনের বরজা বেগে লগ্নর জম্প )

লগ্ন

ওগো, মোকদ্দার এসেচে ।

মহেশ

এসেচে নাকি ?—কোথায় বসিয়েছ ?

লগ্ন

এই ওখরের দাওয়ায়—এই বেঁধে গুতে পাচ্ছেলো ।

মহেশ

চাঁ—হ্যা বেশ করেছো । কি বলচে ?

লগ্ন

বলচে—আমার গারে মাথা খুঁড়ে মরবে  
শুধুমতকে দিয়ে মাগ্নর ক'রে দিই ।

মহেশ

হুম কি বলে ?

লগ্ন

বলম—এইমাত্র তাঁর কাছে থেকে আসছি । তিনি  
খবরোনে বসেছেন । বকি হবার ঠর নাহুই হবেই ।

মহেশ

আঃ, এই সময় নিবারণ এসে পড়তো ।

লগ্ন

মহেশ

আসে নাকি ? বাও, চন্দমা নিয়ে যাও ।

( লগ্নর হাতে চন্দমা ধরেন )

লগ্ন

বাঃ, বেশ কিনেছ । ঠিক সেই ডকম ।

মহেশ

হ্যা, হ্যা—শোনো । সে এসে বললেই মোকদ্দারকে  
চোখে দিয়ে দেখাবে । তারপর এসে দাঁড়াবে এই বরজার  
মাফালে । আমি চেয়ে নিয়ে নিবারণকেও দেখিয়ে দেবো ।  
যাও যাও, এসে পড়লো ।

( লগ্নর প্রস্থান )

শুধুমত, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এক গারে  
বাড়ী—তাকে আমি হাদা ব'লে ডাকি । তোমার শু অলীম  
কমতা এতু । তোমার কিয়া ত কখনো বার্ষ হয় না ।  
তব্বি তাঁর শাপর কি এখনো ঘুঘ হয় নি ? না হ'লে যে তাঁর  
নিজার নেই এতু, সে যে মশখাতে মরবে । ( সহসা যেন  
নিবারণকে দেখে ) ও কে, নিবারণ বা ! কতকণ এসেছো ?  
উঠানে দাঁড়িয়ে কেন ? এসো, এসো বলবে এসো—  
তামাক খাও ।

(নিবারণ দাওয়ার উপর তরু বসলেন, মংগু তার হাত ধরে)

নিবারণ

!—তাই—আমি সব শুনেছি।

মংগু

করো না দাদা—তুমি তো শুধু দাদা নয়, বোহর  
পণাও ছাড়া।

নিবারণ

তুমিও কেন মংগু, এবাই—কেবল যদি আমার স্ত্রী  
মাহুই হয়।

মংগু

আমি ক'রি হয়েছি, এখন তোমার অটাই। ওকে ওট  
দাওয়ার বলে! ঐ না বেঁটান! দেখে: না দাদা।

নিবারণ

মংগু

তা হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—আজ বড়  
ভাব হলেন। ভেবেছিলেন শুকনে বেগান করেন।

নিবারণ

তা হবেনই, কেবল যদি—

মংগু

মাহুই হ'ল? আচ্ছা, হয়েছেন কিনা তা তো দেখলেই  
হয়। ওগো শুভো? তুমি কি এই ঘরে আছো? তোমার  
বিবির সঙ্গে পান লাভো? আচ্ছা দুটো পান এখানেও দিগো—  
আর সেই শুকদেবের চন্দমাখানা বাস থেকে বের ক'রে  
দাও তো।

নিবারণ

(বসন্ত) বুকটা বড়ো বড়ো করতে লাগলো যে।

(বহরী গল্প ক'র সময় পানের চিৎ ও চন্দমা ছুঁড়ে দিলেন)

মংগু

(ভিবে খুলে) খাও দাদা, পান খাও।

নিবারণ

(চন্দমা তুলে নিয়ে) আগে দেখে নিই (কম্পিত হাতে  
চন্দমা প'রে) আ: বাঁচলুম। মাহুই—মংগু—মাহুই!  
তুমি আমার বাঁচালে!

নিবারণ

মেরেটিক! মংগু, তুমি আমার বা করলে—এখন  
মেরেটিক যদি ভিক্ষে দাও—

মংগু

সে তো আমার দোভাগ্য দাদা—তাঁর ভিক্ষের সঙ্গে কত  
ঘনিষ্ঠা দিতে হবে—কেবল আমার বুকি?

ঐন্দ্রোপত্র

আর লজ্জা দিওনা মংগু—একটি পচোড় চাটুক—  
মা লজ্জাকে এটখানে নিয়ে এসো, আমি এখনই ছাটাকা  
ক'রে দাও।

মংগু

বেঁটানু কি ত'র রাঙা করেন?

নিবারণ

তার বাবা হবে। তুমি জানে: মংগু, আমি তোড়া নয়।

মোকদ্দা

মানি বৈকি তুমি বাব।

নিবারণ

এাই এাই—ভালো লাগিয়ে দাও এইখানে—আব ম'—  
লজ্জাকে নিয়ে এসো।

নিবারণ

কি হবে? গিন্না সাক কাববেন? কাবলু—আজ  
আর শুভি না।

মোকদ্দা

ওগো, আমার একটি কথা রাখতে হবে।

নিবারণ

না, সে আমি পাকো না।

মোকদ্দা

দেখো, আজ আমার বড় ছাড়াবের দিন—আজ আমার  
কথাটি ক'রো—



নিবারণ

মোকদ্দা

ইন্—তোমাকে রাখেতেই হবে। আমি বলেছি আমি  
গানি চাতে সবগর মেয়েটিকে নোব।

নিবারণ

তা তাই হয়েই ত হতো।

মোকদ্দা

কিছু নিতে পার্কে না।

নিবারণ

ভালোয়ে ভালো—আমি বুঝি মিছি? আমি আরো  
জাবছি তুমি ছাড়লে হয়।—খাচ্ছ ভালোই হয়েছে—তা  
আজ্ঞাদের দিন বলছিলে কেন?

মোকদ্দা

সে আমি বলবে না—

নিবারণ

আমিও বলবোনা—আমিও আজ বসে আজ্ঞাদের  
দিন। আমার আদ মনে হচ্ছে—সে কলা যায় না।

মোকদ্দা

আমার আদ মনে হচ্ছে কেন কি ছাত্রানো কন ফিরে পেলুম।

নিবারণ

ঐ—ঐ—আমারো ঐ মনে হচ্ছে।

(প্রবেশ আগে আসে মহেশ্বর দ্বারা বান হুকো নিয়ে, গিফনে  
শিখনে সবুজ সলিমার হাত ধরে—সবুজ হাতে শীষ)

মোকদ্দা

এলাই কহো মা, এলাই কহো—তোমার বক্তার শ্রুতী।

(মলিনা নিবারণ ও মোকদ্দাকে এলাই কহে, তাঁদের  
নামে কলেন)

নিবারণ

কিছু তো নিয়ে আসিনি মহেশ্বর—এই বা সঙ্গে আছে  
এই দ্বিগত আশ্রয় করি (পকেট থেকে একটি ছোঁয়ের

আংটি বের করে) গিন্নী কিছু মনে কোর না—তোমার  
জন্তে গড়িয়েছিলাম—

(মলিনার আঙুলে আংটি পরিয়ে নিয়ে মাথার বান হুকো  
কলেন—সবুজ শীষ বাজালেন)

মোকদ্দা

তুমি জিতে যাবে তা বড়ো?

৯ (মলিনার মাথার বান হুকো দিয়ে নিজের পল্লব হাব পূর্ণ  
মলিনার পল্লব পরিয়ে কলেন—সবুজ শীষ বাজালেন)

নিবারণ

(উঠে দাঁড়িয়ে মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করে) বেয়াই  
—বেয়াই!

(মোকদ্দার উঠে দাঁড়িয়ে সবুজ আলিঙ্গন করবেন)

উদ্ভল দৃশ্য

রানিগঙ্গা

দান

আনন্দের মাগুন আমরা মাগুন নবাই বলিতো।

কিন্তু মাগুন সেইবো বোদী

তাঁই সেবিমও এক বিশেষ

দানট হাতে মাগুন খুঁজে পথট চলিত।

মাগুন বলে লোক বেবার সেই বটে করণ,

অঁচড়ে তুলে বেগ্না বোলস বৃষ্টিটা পতন,

চক্কে হাত, বধবারে নখ হতনি খলিত।

লাগে টেটেয়ে লোম টেটেয়ে লজ্জা-কাচি,

তাঁই তো মোচা হাত করি হাত ধরে নাচি;

কিন্তু মাঝে কীকট পেলেই হাত তেড়ে গাচি,

(মিছে) কশ্মিরীসন নামট করি সাজিয়ে হালিত।

মাগুন যদি বনবি তবে খাৰ্চ কিছু তোলা,

পরের মাথা বুকতে গিলে গরকে বে রে কেল;

প্রাণের তায় তোলা তে জোলের গুহ হালিত।

অবশ্যিক

# বাঙলার পল্লী-গানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম

আবদুল কাদের

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলার পাল-বংশীয় নৃপতিবংশের পতন এবং পেন-বংশীয়দের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রকৃত পতন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। বাঙলায় সামাজিক অবস্থা তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ইতিপূর্বেই (পূর্বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে) কুমারিল ভট্ট এই বহিরা বৌদ্ধ দিগ্গজে সমূলে হত্যা করিবার আদেশ বা উৎদেশ দিয়া বিধাছিলেন যে, বৌদ্ধবধু যে না করিবে সে বধা। কুমারিলের গুরু ব্রাহ্মণ-শিষ্য কান্তকূট ঈশতে বাঙলার আনীত হইয়া তখন পুনরুজ্জিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহল প্রচারে তালিকাভুক্ত আরম্ভ করিয়াছে। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উত্তরদ্বারাতে বোটেই দ্বিধা থাকিতে পারিতেছে না। বৌদ্ধ-পুণ্ডর তখন অস্বস্তি অনুভব; বহু শাখা প্রশাখা ও মাগধী তখন বাঙলা দেশে পলাইয়াছে। সেই “সকল যত ও সম্ভার্য বৌদ্ধ-নাশাঙ্কিত হইলেও...বৌদ্ধ ধর্ম হইতে...দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল।” (১) কলানন্দ পূর্ণানন্দ প্রভৃৎ বাঙলার তারিকেরা ও তাহাদের শিষ্য প্রশিক্ষিতরা তখন বৌদ্ধ গুরুবিশিষ্টকে তারিতার দিকে টানিতেছিল; পূর্ণানন্দ প্রচার করিয়াই বৌদ্ধ-দেব-দেবীর পূজার বিধি-বিধানাদি রচনা করিতেছিল। ধর্ম পূজার বা মানতের পূজার আদিত্তক ৮ রামাই পণ্ডিত চতুর্দিকের এবংবিধ বিশৃঙ্খলার কোনরকমে নিজেদের সন্ত্রিস্ত রাখিয়াই। তাহিবার ক্ষমতা তখন বাস্তব-সমস্ত হইয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমবয়স সাধনের প্রায়স করিয়া পশ্চিম বঙ্গে সঙ্কল্পের প্রচলন-প্রচেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাকে বাদ দিয়া এক ধর্ম অর্থাৎ সাক্যবুদ্ধকে রাখিলেন; হিন্দু দেব-দেবীকে তিনি অব্যাকার করিলেন না, বলিলেন :

“তন্মহা বিষ্ণু যস্যেন্দ্র আদি বৈবসনং ।  
এক মনে ত্রয় কবে তেষা বিরজনেত্”

শিব বিষ্ণু প্ৰভৃতিকে তিনি বলিলেন—আবরণ-দেবতা; তিনি নিজেদেরও আবরণ-দেবতার আশ্রয়ে বসাইলেন। নিজের গুরুসমূহকে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :

“কালমুখে পতিত যমাকি ।  
কলি মূখের ভাই জন হে উপাধি”

এই সব করিয়া পরোক্ষ ভাবে রামাই পণ্ডিত কুমারিল-শিষ্যদের কার্যে সাহায্য করিলেন; তিনি ধর্ম ঠাকুরের কেতাব লিখিলেন; তাঁহার রচিত ছড়া সমুহযোগে ধর্ম ঠাকুরের পূজাশাঠি চলিতে লাগিল। ক্রমে ধর্ম ঠাকুরের পূজাব্যাহত্যা লুপ্ত করিবার মানসে ধর্মকে হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল, এইরূপে বুদ্ধের বিলোপ সাধন করিয়া ধর্মকে হিন্দুধর্মীতে নিমজ্জিত করিয়া দিবার প্রচেষ্টা চলিল। যে বৌদ্ধধর্ম প্রাচ্যে বীতাব্যর্থ করিয়া লইয়াছিল :

ব্রাহ্মণ্যকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এ ধর্ম প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধ ধর্মের নামেই রামাই বিধা রামাই ব্রাহ্মণের দাব্যই পাইলেন; তিনি ধর্মকে নির্দা বসাইলেন :

“আনার হুয়ারে বিধ ব্রাহ্মণের মানা মাণ  
ব্রাহ্মণ সময়ে আরে, কিছু নাই আসে ।  
হুত বসেরে নাথি নৃপি বাখাতি বসনে ।

(১) বহু পূজা বিধান পৃ: ২২৬

(২) The Heart of Buddhism—Saunders.

(৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা চতুর্থ অধ্যায় উত্তরভাগ, পৃ: ৬২





এক মন নিবন্ধি বকরলে আরো ।

হুগো মাঝেতে আসি মাঝি তান কাঁচো ।” ( ১ )

ব্রাহ্মণ-কুটুম্ব কত ত্রিদি তত্ব এত বর্ণিতই আশ্চর্য্য ঘটিলেন না, উপবস বর্ণিলেন :

“মান (বাক্য) নাম করি বস বস মতে ।

শিষ্ট মাতৃ বন্দ্য তব যার মঞ্চ পাথর ।”

অনার্য্য দেশে আসিবা বৌদ্ধধর্মের চরম অধোপতি  
ঠেঁকাছিল। বৌদ্ধধর্ম মেকলও তখন অত্যন্ত দুর্বল ;  
ব্যক্তিগত ও বিলাসনময়তার প্রোত তখন তাহার অধায়ে  
ভাঙিতোছিল। দেশে তখন তাত্ত্বিক বামাচারের প্রভাব  
অন্তে উত্তীর্ণতার উপলক্ষে উৎসব ; বৌদ্ধ সাধনার নামে  
তখন সেই উৎসব কাড়। যে বৌদ্ধধর্ম এক কালে সংসমকে  
অত্যন্ত উচ্চ স্থান সান করিয়াছিল, গলিয়াছিল—“If  
man and wife wish to be together in the next

this, let them be peers in faith,  
peers in morality and peers in liberality and win-  
dness, then shall they dwell in bliss and health.”

( ২ ) সেই বৌদ্ধ ধর্মই তৎকালে পরাক্রান্তী, কুমারী-  
ভক্ত, ত্রিগুণ-চর্চিতার্থিতা ইত্যাদিকে সমর্থন ও সাধনার প্রের  
দাতা বলিয়া প্রচার করিতেছিল। এবিধ মানসিক চক্কলতার  
ফলই হয় বৌদ্ধের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্তরস্তরগে লামলাহিতে  
পারিতোছিল না ; কেবল অকুল পাশাপে ভাঙিতোছিল।

বাল্লভার এমনি সামাজিক ও বর্ষ-বিশৃঙ্খলার মুগে, বৌদ্ধ  
মিগের দারুণ গুরুবন্ধার মিনে বশতিগার খিলতী ঐযোবন  
অন্ত্যকীর গগন ভাগে বাহুল্যের সৈন্তে পদ্যপর্ণ করিলেন।  
গৌড় গৌড়ার করতলগত হইল। সন্তুষ্ট অধাতোত্তর স্তম্ভ-  
তার বাহুল্য-বিষয় অপর বাহুল্যের অধিবাসীর লক্ষ হইতে,  
ইহার কোনো প্রকার প্রতিবাদ পর্বাৎ হইল না। ইহার  
কারণ হয়ত এই যে, তখন বাহুল্যের অধিবাসী বৌদ্ধের  
শিশুর অত্যাচারে অলস দেখি। মুসলমানদের এত আগমনকে  
মানকে ও সাগরে বরণই করিয়া লইয়াছিল। হয়ত মানদের  
অতিশয়োক্তি সামাজিক পণ্ডিত গৌড়েশ্বরকে বিপদ-বারণ  
“দর্শ মদ্যরাজ” ভাবিলেন :

“টিউ মুসলমান তোমা একজনে করিয়া ।

অপন্য ভাবনা শুভু আশার ভাবনা ।

চোত মিলি হির কাষা পাথ কিতা মতা ।

মোড়ের বাকের শিখা দর্শ-মদ্যরাজ ।” ( ৩ )

কুমারিগ-শিশুগণ বৌদ্ধ ধর্মের যে আয়োজনে জাতি  
বিভাজিলেন, মুসলমানের দল আসিয়া তাহাতে যে লাগাৎ  
করিল না, এমন নয়। মুসলমানের তত্ত্বাতিতে নামক  
বিক্রমশীল জনদল প্রুতি বিচারের বৌদ্ধ বতি ও গুণোদ্ভিত-  
গণ নিহত হইলেন। মুসলমানদের এই হত্যা কাণা দেখিয়াও  
কেন যে তখনকার বৌদ্ধের মুসলমানদেরই আশ-কর্ত্ত  
ভাবিল,—ভাবিল, শুভু বর্ষ কেন, কিন্তু সময় দেব-দেবী  
মুসলমান হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, এবং “শুভ-পূরণ”কারই  
বা কেন পারিলেন :

“বহু হৈলা জঘন জনি মাঝেতে কালটনি  
হাতে পাতে দিক কাশান ।

চাপোতা উত্তম হত হিহুধনে লগে তত  
খোকাং বলিভা এক নাম ।

নিবন্ধন বিভাকর হৈলা-সম যবতর  
মুগেতে বাকের বন্ধনর ।

দাতক দেবতালগ পতে হুয়া একজন  
আলক্ষেতে পরিল উত্তর ।

দেখা হৈলা মহারস বিহু হৈল পেতাকত  
আলক্ষ হৈলা শূলপাতি ।

বগেন হুইয়া পাড়া কর্ত্তিক হুইল কাণি  
কবির হুইল বত মূনি ।

চৌকিা আপন ভেক মাজে হুইল শেক  
পুতলর হুইল মৌলনা ।

চল গুণা শাসি সেবে গমাতিক বহা লবে  
সবে মেলি বাজার বাজান ।

মাগুনি চকিতা দেবী তির হৈল হাওতা বিনি  
পদ্যার্থিত হৈলা লিবি হুর ।

বভেক দেবতালগ হুয়া লবে একজন  
এবেল করিল ভাঙপুর ।

দেউল বোরাণী ভাঙে কাড়া কাঁচা পাথর  
পাথক পাথক বলে বোলা ।”

( ১ ) কুত পূর্ণা বিখ্যাত।

২. The Heart of Buddhism P. 88.

( ৩ ) বর্ণপুত্রা বিখ্যাত, ২১৪ পৃঃ।





স্বপ্নের; এবং লভ্যতঃ ইহারই মত তৎকালীন হিন্দু বৌদ্ধ প্রতীতিরা তাহার বা তাহারই আদর্শবাদী প্রচারকগণের বিকস্মিতরূপ না করিয়া পক্ষান্তরে স্ফার্য্যতাই করিয়াছিল।

সুফী-ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় হস্তীর অনেক মূলে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তাহার কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি। (ক) কেহ কেহ বলেন, ভারতের ব্রহ্মবাদই সুফীধর্মের মূলে। (খ) সুফীদের পীর-ভক্তি আর ভারতীয় গুরু-ভক্তিতে আত্মপূর্ণ তফাৎ অধিক নাই। মিশরের গ'ল গ'ল যিনি একত সুফীদের সর্গপ্রথম, এবং গ্রীক-বিদ্যার অস্তর পাদেশী ছিলেন, তিনি বলিতেন—“The true disciple should be more obedient to his master than to God himself.” হিন্দু ধর্মের গুরুকে ভগবান ও তকের দেহ-বন্ধন স্বরূপ জ্ঞান করা হয়। (১) বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গুরুকে পরমাত্মার বস্তুক বলিত; জীৱনে গুরু একান্ত প্রয়োজনীয়তার সমর্থনের মত তাহার। এমনও বলিত যে—“the flute of Krishna was the Guru of the Gopis.” (২) সমস্ত তত্ত্বের বৌদ্ধদের কাছেই গুরু সর্বসম্মত। (গ) হিন্দু অবতারবাদী, মহাশিৱ ও নান্দ-পন্থী “পাদ্বী” বীকার করে। সুফী-প্রধান মনুস্বর হাজাজও (incarnation) অবতার এবং পাদ্বী সমর্থন করিতেন, তিনি তাহার শিষ্যদিগের কাহাকেও হুচ, কাগকে বাদা, কাহাকেও মাহমুদ বলিতেন; বলিতেন—তাঁদের spirit বা পাদ্বীকে তিনি যোগ-বলে শিষ্যদের মধ্যে আনিয়াছেন। এই হাজাজ ভারতবর্ষে ব্রহ্মণ করিয়া-ছিলেন। (ঘ) Hindu Pantheist এবং বৌদ্ধ মহাশিৱা উভয়েই রূপের পূজারী। মহাশিৱায়া বলে—ভগ-সামান্য স্বরূপ সৃষ্টি, রূপের সাধনাতেই মুক্তি। তান্ত্রিকেরাও এই

পন্থের। সুফীরা ইসলামের বাধ্যতায় আত্মাহব করনাকে কাটাৱা হুঁটিয়া মুসলিম ও খ্রিস্টের আত্মাহব করন। করিয়াছে, সুফীর আত্মাহ এবং উগনিধর্মের ভগবানে পার্থক্য অধিক নাই। প্রেম ও বস-বিস্মৃতিতে যে বিরটি পুণ্য, তিনি ভারতের এবং পারস্যের দুইয়েরই। (৩) লবক-পাথে বলে—“যদি তোমার বোধি-শাস্ত্রের বাসনা থাকে, তবে গুরু উপদেশ গ্রহণ কর এবং পক্ষকামের উপভোগ করিতে থাক, কেবলি মানব কর।” মাহু সাধনা করিয়া বুদ্ধের প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা বৌদ্ধের বিশ্বাস করে। ধ্যান ও দমাদি দ্বারা দিগন্ত পুরুষে শৌন ওজয়া বাহ, হিন্দুও ইহা বিশ্বাস করে। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে সুফী ধর্ম যিনি Pantheistic element ঢুকান, সেই বায়হিদ বলেন—“Whatever attains to true being is absorbed into God and becomes God.” (৪) সুফী-ধর্ম যে মিসিরের প্রদলন আছে, তাহার সঙ্গে মিসিরের ধর্মের সাধনার সামঞ্জস্য ছিল; পীরের আদেশ বা নির্দেশ মত নিরুতি, নির্জনতা, নীরবতা, ইচ্ছিতের বিচ্ছেদ সংগ্রাম, ইত্যাদি শিষ্যের সাধন-অন্তর্গত বিষয় ছিল। প্রথম যুগে মিসির বুজাশিত-বাহাদি সহযোগে সম্পাদিত হইত; এবং তাহারই কলসরূপ বৌদ্ধমহা-বাসনের মতন তাহাতেও অসংখ্য-চিত্রতা প্রবেশ লাভ করে। নকশ, কল্ব, আবেল, জেহাদ, দুয়া কাবাধ, কেসামত, কানাকিলাহ ইত্যাদির সঙ্গে তান্ত্রিক-বৌদ্ধের সাধন-প্রাণালীর কিছু-কিছুর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পীর সাধার বদন এদেশে প্রচুর চালাইতেছিলেন, তখন পারস্য দেশে proper Sufism-এর মাত্র ভাঙ হইতেছিল, এবং এই সুফী ধর্মের রূপ পরিগ্রহ বাধ্যারে “The influence of Christianity, Neo-Platonism and Buddhism is an undeniable fact. It was in the air and inevitably made itself felt.” (১) Von Kremer বলেন—“In later days considerable influence was exerted by Indian ideas on the development of Sufism.” সুফী-ধর্মের উত্তরের কারণ “particularly the bitter sectarianism and barren

(১) “The Guru renders spiritual revelation possible, for he acts as a medium between God and his disciple. Throughout the life of the latter, the Guru is the spiritual guide, and receives almost divine veneration.” Census Report, O'Malley, 1911.

(২) The Pūrī-Chaitanya Shāhājī Cult by Munindra Mohan Bose.

(৩) Reynold A. Nicholson.





পরিণতি লাভ করে, এ ব্যাপ্য নির্ভুল নয়। ১ম, ১০ম, ও ১১শ পত্রাঙ্কে বাক্য বেশে যে বর্ণনাকোশন আত্মপ্রকাশ করে, তাতে নাথদ্বিগের গুরু অনার্য্য বর্ণনাকোশের হাত ছিল। নাথ মার্গ পরবর্তী কালের বিকৃত বৌদ্ধমত এবং তাত্ত্বিক হিন্দু-ধর্মের সম্মিলনে উক্ত রূপ পরিগ্রহ করে। নাথেরা নিজেদের অলৌকিক শক্তি আছে বলিয়া বলা করিত, তাহাদের বহু শিষ্য ছিল, তাহারা সকলেই বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। নাথদের শিষ্যেরা সাধারণতঃ নিরস্ত্রশস্ত্রী লোক ছিল, বধা—চাতি, ডোম, চতাল। হিমাচলের পাশবর্তী বাক্য ডোটার প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে মূল বৌদ্ধমত, মত্যান বিজ্ঞান বজ্রযান কালচক্রবান লামাইজম (Lamaism) বৈতালপুত্র ইত্যাদির সহিত বিমিশ্র হইয়া মতান্তর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল।—বৌদ্ধ-ধর্মে আদিবুদ্ধের কথা আছে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধের প্রাণ বলিয়া এক নারী-শক্তি এবং বুদ্ধ ও সেই প্রাণের যোগ ধ্রুমে উৎপত্তি বোধিদেবের সৃষ্টি করিয়া করিল। মধ্যযুগের লোকোক্তবোধী মহাশাস্ত্রকার্য মনে প্রাণে ভাবিত যে, বোধিদেব বসুমত নাই, সব মহাবসু। এই করিয়াই “অবলোকিত” ও “তারা” বৌদ্ধমতে গুরুপাত করিল; এবং উত্তর দেশীর বৌদ্ধ-মতে বহু বুদ্ধমূর্তি ও বৈতাল-দেবতা প্রবেশ লাভ করিল; বৌদ্ধবংশে যে বজ্রযান দস্তাব্য অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়া বর্তমান ছিল, তাহা বজ্রযান নামক বর্ণনামা বুদ্ধ ও বজ্রযাত্রী নামে তাহার শক্তি করিয়া করিয়াছিল। এই সকল মূর্তি করনার যোগ-সাধনার Pantheistic মতাবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তাত্ত্বিকের বহু-তথ্য-সাধনা প্রবেশ লাভ করিল। তাত্ত্বিক-হিন্দু-ধর্মের মতন বৌদ্ধ-ধর্মও এই করিয়া বুদ্ধের নারী-শক্তি প্রধান স্থান অধিকার করিল; ইহাতে দেশে যে বৈতালতার প্রবাহ বহিল, তাহা বলাই বাজল। তিস্রতে এই আদর্শের বৌদ্ধ মতই প্রাধান্য লাভ করিল। বলা বাহিত্যে পারে, নাথ-মার্গ এক দিকে তিস্রতের সেই লামাইজম (Lamaism) এবং অপরদিকে হিন্দু গুরুবাহী আধ্যাত্মিকতা, এই দুইয়ের সেতু-বন্ধন। ইহা মাহু-পুত্রকে চরম মনে করিত; এবং মাহু-পুত্রই নাথ-মার্গের সার কথা। নাথ-পত্নী দ্বিগিয়া। সকলেরই লক্ষ্য ছিল মাহু, জগদান। বিনিকীর এখানে আগমন-

দমের নাথেরা পূর্ব বাক্যের অত্যন্ত প্রতিপত্তিলাভ। মৌননাথ, কৌননাথ, গোরকনাথ, হাড়িকা, কাহুশা। প্রভৃতি নাথ-বংশের প্রচারক। তামাকি পণ্ডিত বংশের পুত্র দমদ “আদিমাতের পুত্র” “গোরকনাথের পুত্র” ইত্যাদি বলিয়া আদিমাত, কৌননাথ, গোরকনাথ প্রভৃতির নামের উদ্ভেদে মূল দ্বিগার বিধান বিচাঙ্কিলেন। তামাকি এই সকল নাথকেও আবরণ-ধেবতার আদর্শ বিচাঙ্কিলেন। বাক্যের গানের আলোচনার স্পষ্ট পরিণতি হইল, কি তাহা বক্ত দিক দিয়া এই নাথদ্বিগের প্রভাব বাক্যের মূলগমনের জীবনে অস্পষ্টভাবে আভিও বর্তমান প্রতীয়মান। শুধু মেলার ভক্তমতে নয়, বলা শেষে ব্যক্তি ভিত্তিবার সময় আভিও পানী-মূলগমন গাহিয়া গাহিয়া বার—

“মাহু-বৈতাল,”

নিম্নে প্রকাশিত নাথের নাম লিখিত।

নারা বিন কৈর বৈতালি সঃসাবেব কঃ

মহাঃ বৈতালি লিখিত নাথের নাম।

মূলগমন দ্বিগীরের হাতেই নাথ-পত্নী যে দেশে দেশে নিঃসঙ্কেতে সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং গুরুবক্তাই তাহাদের জীবনে শরিয়তী ইসলামের কোন ছাপই পড়িল না। বলাবাহুল্য, বাক্যের বিরাট বাড়নের দল এই নাথ-পত্নীরাই সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিস্তারিত বিনিকীর সময় বা পরে বহু লক্ষ্য সাধক যে, দৌলতুল্লাহের পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারা প্রমাণ বিরল নহে। পাহ পত্নী উদ্দিন নামক একজন মূলগমন দ্বিগীরের দরগাহ বিহারে বর্তমান আছে। ইনি পুষ্টি ১৩৭৩ অব্দে বা বিসম্বী ৭৮১ অব্দে পত্রলোক গমন করেন। (১) বাক্যের বিহারের কোথাও মূলগমন রাজস্বাক্ষর অস্বীকৃত প্রচার দ্বারা ইসলাম তখন প্রচারিত হয় নাই; হইয়াছে লক্ষ্যের দ্বারা। তাহা প্রদেশের পুত্র বজ্রযাত্রী বা জিহ্মদ ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে সিংহা-লনারোকেবের পর জৈনক মূলগমন দ্বিগীরের দ্বারা লীলা-লাভ করিয়া মূলগমন ধর্ম পত্নীর তাহা আদ্যাবান হইয়া

পড়িয়াছিলেন। (১) বসন্ত: মূলমামন ককোরাই তখন ইসলাম প্রচার করিতেছিল, এবং মলে মলে বহু বৌদ্ধ এবং মত দীক্ষিত বৌদ্ধ-বিশ্ব মূলমামন ধর্ম দীক্ষা নিতেছিল। মূলমামন শাহাবের অলৌকিক শক্তি, সৎস, ধর্মবল চতাদি বাঙালীকে বহুই আকর্ষণ করিয়াছিল। একটা বিবরণ কলা এই যে, ভারতীয় মন কোনো কালেই Formalism বা dogmatism সামনে মানিয়া নিতে সক্ষম নয়, তাহা হিন্দুরই হোক বা মূলমামনেরই হোক। তাই আরবের ইসলাম বা ব্রাহ্মণ ধর্ম কোনোটাই ভারতবাসীর পক্ষেই নয়। ব্রাহ্মণ ধর্মের উপাসনের অব্যবহিত পরে পরেই দেখা গিয়াছে, প্রেম ও তন্ত্রের বাস্তবীকরণ মাধুর্যের বহু-মহাপুরুষপণ আবির্ভূত হইয়াছেন। বুদ্ধদেব সামান্য সামান্য ঐতিহ্যের ইহাদের প্রত্যেকেরই আবির্ভাব ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতিষ্ঠা বস্তু।

বিলিঙ্গা ও ঐতিহ্যের মাঝামাঝি ধর্ম বাঙলার আর কোনো ধর্ম-বিশ্বই হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বলে না। বৌদ্ধ ধর্ম ও গান বিলিঙ্গারও পূর্বে, তাহার চর্চাপন সমুদ্রে রাবাকুরের উল্লেখ আছে। এই “বৌদ্ধ ধর্ম ও গান—তার পরে পুত্র পুত্র, তার পরে...চতুর্দশ।” (২) সঙ্গমবাদের মাধন-প্রবাহী ভগবৎ ধর্ম মনোপাত করিয়া রাবাকুরের নীলাকে সঙ্গম-মাধনার গ্রহণ করে। সঙ্গম-ভবনে প্রেম ও ভক্তির যে গান, তাহারই চর্চা করিতে গিয়া সঙ্গম-সম্প্রদায় হুত নরনারীগণ কেহ কৃষ্ণ হইয়া, কেহ রাধা হইয়া, কেহ বা তাহাদের মধ্য মধ্য হইয়া কৃষ্ণান-নীলার মতন নানা প্রকার রাস-লীলার অঙ্কন করিত। চতুর্দশ সঙ্গম-ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বাতলি স্ত্রীর সূত্রা করিতেন; বাতলি বৌদ্ধ স্ত্রী। “সঙ্গম-বানের ধর্ম মতের প্রভাব চতুর্দশের ধর্মমতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং চতুর্দশের পদাবলী সহজ সাহিত্যের ভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।” (৩) এই কারণেই “চতুর্দশের অনেক ধর্ম সঙ্গম-আচারের

গুরু বিজ্ঞানিত হইয়াছে।” (৪) ঐতিহ্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলার নীরবে নীরবে এই সহজ সাধনাই চলিয়াছিল। যে সকল বৌদ্ধ, মূলমামন বা হিন্দু হইয়াছিল, তাহারাও সহজ সাধন পতিভাগ করে নাই। অবশ্য এই বিরাট সহজ সাধনাবলী জন-সমাজের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ ও নরীকর্তা মূলমামন আশ্রমের গোড়ামী নিম্ন বিবাক করিতেছিল। তাহারা যে অঙ্গদিশকে গোড়ামির দিকে টানিতে ছিল না, এমন নয়। বাঙলা দেশে মূলমামন তরবারী মাথায়ে ইসলাম প্রচার করিয়াছে তাহার প্রমাণ বহুল; রাক্ষস মনোবল পুত্র মূলমামন হইয়া চৈতন্য স্তম্ভান জালালউদ্দীন নাম দ্বারা পূর্বে সমস্ত রাক্ষস মনো তরবারী মাথায়ে ইসলাম প্রচারের সজ্জাভাবে প্রচেষ্টা করিতেছিলেন; (৫) বলা বাহির্ষে পাত, এদেশের পরিহৃত-মূলমামনের পুত্র গোড়া সম্প্রদায় এমন আদর্শের মাহাত্ম্যের সজ্জাভাবে পড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই দীক্ষিত পরিহৃত-মূলমামনেরও যে প্রকৃত মূলমামন হয় নাই, তাহা সহজ অসুমেয়। ব্রাহ্মণের প্রভাব তখন উল্লেখযোগ্য, অবশ্য সেই ব্রাহ্মণের ভাবনে সহজ-প্রভাব তখন পর্যন্ত সামান্য ছিল কিনা, বলা যায় না। বাঙলার সামাজিক অবস্থা এখন এমন, সেই দিনে, ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এক সপ্তাহে ঐতিহ্যের মধ্যস্থত নবোপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যৌবনে ভগবৎপাত ও ভগবৎ পুরাণে গভীর শ্রিত্যের অধিকারী হইলেন। চৈতন্য বঙ্গের বঙ্গম কালে, ভগবৎপাত ও ভগবৎ পুরাণ অতিরিক্ত পাঠের ফলে ঐতিহ্যের প্রেম উগ্রাম হইয়া ঐতিহ্যের মধ্যস্থত হইয়া গুরুত্বীয় হইলেন। হলেন শাহ তখন বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাহার মন্ত্রী ঐতিহ্য ও মনোভব চৈতন্যের শিষ্য গ্রহণ করিল। বাঙলায় নতুন করিয়া আবার ধর্মোপাসন দেখা দিল; চৈতন্য-প্রভাবে ব্রাহ্মণ-ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সিংহাসন চলিল।

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, চৈতন্যের জন্ম দিনে বৌদ্ধ-গণ তাহাদের জ্ঞান-কর্তা পুনঃ আবির্ভূত হইতেছেন জানিয়া মহা ধুমধাম করিয়াছিল। বাঙালিকই চৈতন্যদেবের

(১) বিজ্ঞান উপলব্ধি।

(২) ঐতিহ্যের ধর্ম ত্রিভুজ। (৩) ঐতিহ্যের ধর্ম ত্রিভুজ।

(৪) ঐতিহ্যের ধর্ম ত্রিভুজ।

(৫) ইহাটের বাঙলার ইতিহাস।



অবিভাগে খাবার নতুন করিয়া বৌদ্ধাদর্শের বজা বেধে প্রবর্তিত হইল; নিখিত বৌদ্ধেরা গ্রাম পাঁচিয়া বাঁচিয়া উঠিল, মলে মলে মূল্যমান্য বা হিন্দুয় ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের প্রেম-পতাকাতলে আশ্রিত সমবেত হইতে লাগিল। সহ-বিভার্য্য বাধাত্মককে তাহাদের সাধনার অস্বীকৃত করিয়া দেশে প্রেম আর ভক্তির বজা বহাইয়া দিল। মহাবিদ্যা চন্দ্রীদাস বলিয়াছিলেন—“পরাহ উপরে মাতৃব সত্য, তাহার উপরে নাই।” চৈতন্যও বলিলেন—“ভগবনের মূল এই নয় বলুদেহ।” (১) মহাবিদ্যার স্বকীয়া হইতে পরকীয়া যে প্রেষ্ঠ, এবং পরকীয়া হইতে স্বকীয়াতে পরিমর্ষিত হইলে প্রেম যে চরম হইয়া পড়ে, তাহা রামপুর ও রামকর্তার প্রেম-কাহিনী ব্যপদেশে “রত্ন-সারে” ব্যাখ্য্য বলিয়াছে, তাহাই **ঐচৈতন্য** সমর্থন করিয়া বলিলেন—

“সকীয়া ভগবন নাহি বিদ্যুদেবের ভয়।

ভকতের ভাব রূপেই নারিক উদয়।

উপদেশে ভাব অমুখ্য প্রকাশ।

ভকতের প্রকাশের রসের বিলাস।” (২)

“দেউ ভাব ভগবন যোগী করে ব্যক্তির।”

এক মহাবিদ্যা ভক্তনার গুরুই সর্বোদকী; বৈকুণ্ঠেরও গুরুদেবের রূপে উঠিল। “When Hari is angry, Gurn is our protector, but when Gurn is angry, we have none to protect us.” (৪) এই গুরুশাসনরূপ ভাবে বৈকুণ্ঠের সাধনা ভাষ্যাকৃত হইয়া উঠিল। **ঐচৈতন্য**সেব গ্রাথকৃত প্রেম, গুরুবাদ, পরকীয়া-চর্চা, বৈকুণ্ঠ-সাধন-প্রণালী সমস্ত কিছুই বৌদ্ধদের হইতে লইয়াছিলেন। A. S. Geden বলেন—“His subsequent teachings also proved that he owes not a little to the example and practice of Buddhism.”...“Chaitanya's teachings apparently owed some of its characteristic features both of doctrine and practice to a Bud-

dism which, though decadent, still exercised a considerable influence in Bengal and the neighbouring districts.” কোহ কোহ হুদাধন করিয়া বলেন যে, ইন্দুপাদ হইতে চৈতন্যসেব বৈকুণ্ঠ সাধনার যোগ্যক ভোগ্যব্যা- ছিলেন, এবং তিনি নিজেও ইন্দুপাদ ব্যাগই অঙ্গপ্রাণিত হইয়াছিলেন; তাহারা এ কথার অশুকে চৈতন্যের মানব- প্রেমকে ধাক্কা করান; কিন্তু এ নিদ্ধান্ত মোটেই সত্য নহে। Sir R. G. Bhandarkar বলেন, “A Spirit of Sympathy for the lower castes and classes of Hindu society has, from the beginning, been a distinguishing feature of Vaishnavism.” (৫) A. S. Geden বলেন—“Partly with the view, it is believed, of winning over those who have been attracted by the teachings of Buddhism, as well as those to whom the grosser forms of the popular Hinduism were repellent, Chaitanya laid stress upon the doctrine of Ahimsa,” এই অহিংসা নীতি বৌদ্ধেরা উপনিষদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিল; এবং একদা বুঝই সত্য যে, ভাগবদ্বর্ণন নানা ভাবে বৌদ্ধদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—যে ভগবদ্বর্ণনের পরবর্তী কালের নাম বৈকুণ্ঠ বর্ণন। **ঐহেমন্তে** রায়চৌধুরী এম-এ মহাপণ্ডর বলেন—“The Ahimsa doctrine foreshadowed in the Chhandagya Upanishad was afterwards taken up by the Buddhists as well as the Jains.” (৬) এই সমস্ত দৃষ্টান্তের পরীক্ষা বাহিরে পাড়িয়া চৈতন্যের মানব-প্রেমের দিকে তাকাইলে মনে মনে হয়—এ তাঁহার নিমিত্ত। কোহ কোহ নাম উচ্চারণ করিলেই, সে পুত্র হোক মূল্যমান হোক আশ্রণ হোক তাহাকে তিনি উদ্ভাবের মতন মাথায় তুলিয়া নাচিতেন। এ প্রেম কাহারও নিকট হইতেই খার করা নহে; এই প্রেমের উদ্ভাবিতা দেখিবারে হস্ত একজন ইউরোপীয়ান তাঁহাকে

(১) Early History of the Vaishnava Sect P. 72.

(২) Vaishnavism, Saivism and Minor religious sects.

(১) অরুণাচলী—ঐউপেন্দ্রবাব দ্বব্যাসবাব সম্পাদিত বৈকুণ্ঠ প্রবন্ধ, ৩৭ পৃ:। (২) রূপ ভগবত, ২২০ পৃ:। (৩) হিন্দু-মত, ২২০ পৃ:। (৪) Sketch of the Religious Sects of Hindup, P. 106.

ভিঙ্গিয়া বোণী মাথা নিয়াছেন। আর, মুসলমানদের তিনি পূব হুনমারে খেঁচিয়েছেন না। এখানে হুত কের কাজীর কথা পাড়িয়েন। অস্ত্র একথা দতা, পরে মুসলমান শাসন-কর্ত্তারা তাঁহার এতাদের পথকে অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ইসলামের অগ্রগ্রেণী তাঁহার ভাবনে বিতে পাবেন নাই। এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ দ্বারা এই বক্তব্যটা সম্পষ্ট করিতেছি। ঐতিহ্যবাহী বলিতেছেন :

“হরিদাস, কলিকালে যখন অশ্বার ;  
গো ত্রাঙ্কন হিন্দা করে যাহা দুহাচান ।  
ইহা সবেম কোদুস্ত হইবে বিদ্যাত ?  
তাঁহার যেহু না দেখিবে এ হুপ অশ্বার ।”  
হরিদাস কহে—“গ্রন্থ, তিহা না কতিও,  
নবমের লগাধ বেশি হুপ না জাবিও ।  
যখন দকলের মুক্তিহবে অন্যাসে ;  
হা বাব । হা বাব ! বলি করে নামাচানে ।  
মহাগোবে ভক্ত কহে হাধাম ! হা বাব ।  
যবনের তাহা বেশি দর সেই নাম ।  
দুস্তপি অস্ত্র সফেত তাহ হুপ নামাচান ;  
তপালি বাঘের তেজ না হুপ বিলাপ ।”  
তবাহি বুঝিহ পুরাণ :-

স্রাষ্ট্র হুইহাও গোম্ব হাগামেতি পুঃপুঃ ।

উকৃৎপি হুই-গোম্বি কিং পুঃ সদ্ভা দুবলুঃ—(১)

অর্থাৎ মুসলমান যে পুনঃপুনঃ চারাম (অসিদ্ধ) পথ উদ্ধারণ করে, তাগাতেই তাঁহার অস্ত্র উদ্ধার হইবে।—  
চৈতন্য মুসলমানকে “মহাভ্রাতার” বলিয়াছেন, আশ্চর্যকরও “পাবক” বলিয়াছেন। বাহারি কৃষ্ণ ভজনা করে না, বাহারই “ভোগ্য”—ইহা ই ছিল তাঁহার মত।

“শিষ্টক...সেই ভরে সেই সেই হয় ।

যে না ভরে সে ভোগ্য সর্বগোত্রের” (২)

মাধুঘের শ্রেষ্ঠ এই কৃষ্ণ-জ্ঞান দ্বারাই অব্যাহিত হয়, এনি বলিতেন। আত্মজ্ঞান ত্রাঙ্কন পৌরহিত্য, দকল বৈষম্যের মূল তিনি উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন :

(১) ঐতিহ্যবাহী (১৩৩-১৩৪ পৃঃ) (২) পান্ডুলিপি—১০১ পৃঃ

“এই কৃষ্ণ-জ্ঞান...সেই কৃষ্ণ হয়” (৩)

তাঁহার এই মনোভূক্তি তাঁহার ভক্তগণের জীবনেও সার্থক হইয়াছিল; এবং তাঁহার উদারবদনগুণ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং পরে যখন “হরিবাসের পাদোদক ভক্তগণ” (৪) সাগ্রহে পান করিতেছেন।

মহাভারতের মতে কণ্ঠ মিলাইয়া ঐতিহ্যবাহী বলিলেন—

“পানে বক্তি হৈতে কহ হুইব উদর

হুইত দার সৈল তাহ গেল নাম হুপ ;

জেম গুছি সনে তাহ তেজ নাম গেল ;

হাণ অশ্বার তাহ নতাতান হুপ” (৫)

এবং ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া দকল-সাধনা দেখে অবশ্যে চলিতে লাগিল। অশ্বাধা পানে বাঙালার পদ্মী তথিয়া উঠিল। বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি লক্ষগ্রাণ করিলেন। বহু পানের মলের সৃষ্টি হইল। শেষের তখন এমনি অবস্থা হইল যে, মুসলমান বৌদ্ধ ভিক্ষু চিনিবার ভো প্রচলি না ; একজন বৌদ্ধ বাউল-পট্টার বহু মুসলমান পিতা, অথবা একজন মুসলমান পীরের বহু হিন্দু শিষ্য। তখন বাঙালী দেশে সংকীর্তনের বজ্রও বহিঃহেতু :

“হুপ হুপ ঐক্য হুইত নিঃশব্দ

জগতের ভক্ত হুপ পৌর ভক্তগণ”

ইত্যাদি বলিয়া কৃষ্ণ-গেম ও কৃষ্ণভক্তগণের ভগবান পাতিয়া খেল করতাল বাজাইয়া মেড়া মেড়ৌর দল তখন বাঙালার জোশুদ হুলা দিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঐতিহ্যবাহী এই কীর্তন গানের দ্বারা বৌদ্ধদের হুইতে নিয়াছিলেন; কারণ, কাকুপানের চণ্ডীপদগুলিকেও নাকি, কীর্তনের হুয়ে পাওয়া যায়। দ্বারা হুইক, চৈতন্যের এই কীর্তন আর গ্রেমের বক্তার বক্তৃতা-সার্থ, অর্থসার্থ, দর্শনগান সবই তাহিয়া গেল, একাকার হইয়া কৃষ্ণ-গোমে দ্বাতিয়া উঠিল। এই প্রাকনে একমাত্র নাথ-সার্থ আপনার স্বাধীন দত্তা লইয়া টিকিয়া বহিল। নাথ-সার্থী-মুসলমান মিলাইয়া যে সব

(৩) হরিভক্তি বিদ্যাস। (৪) ঐতিহ্যবাহী (১৩৩-১৩৪ পৃঃ) (৫) ঐতিহ্যবাহী (১৩৩-১৩৪ পৃঃ) (৬) ভক্তি-গান হুইক।





বাউলের মল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের গানে সেই স্নগদ পর্বাঙ্ক ইসলামের কোনো প্রকাশিত হইল না। যে সময় বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্ম-বাদিগণের প্রচার গাথিরা বেড়াইত, মুসলমান শীতলপুত্রের নেতৃত্বে তাহাদের দ্বারা ইতিপূর্বেই মার্কস-গানের মতের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু সেই গানেও প্রকৃত ইসলাম আসন লাভ করিতে পারে নাই।

এ গানও বাক্তিগার যে সময় সম্রাটগণের বিদেশী মুসলমান আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা ইসলামের শরীয়তকে কড়াকড়ি তাবে গালন করিতেন। এই বিবেচনাগতের সংযোগে নিতান্ত কম ছিল না। (১) কিন্তু প্রাচ্যের বিধি, তাঁহাদের জীবনধারণ দাঁকিভদের জীবনের উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; দাঁকিভদের আচরণের উন্নয়নে এবং তাবনের ঐচ্ছিকিত তাঁহাদের আকর্ষণ সামান্যই উন্নতযোগে। তখনকার এই সৈয়দ পাঠান কাজী প্রভৃতিরা তথাকথিত মুসলমান নামধারীদের অবশেষে সৃষ্টি করিত।

“বোকা নবাব না করিয়া কৈল চটল খোলা।” (২)

যাহারা তেঁতা নামাধ করিত না, তাহারা তাঁহাদের কাছে অনিশ্চিত ও মোট বলিয়া ভূমিত হইত। কিন্তু কাজী বা সৈয়দদের শব্দ হইতে তথাকথিত সহজিগ মুসলমানদের নামাধ রোজা পরিগালনের ভিত্তি কোন প্রকার গঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। এই নীচপ্রাচীর মুসলমানেরা, শরীয়তের মত, তৎস্বের সাধনা করিত। তাহাদের শব্দ মণ্ডল্যের: যে, ইসলামের বিধি-বাস্তব মণ্ডল্যে ওয়াকিফ-হাল ছিলেন না, এমন নয়। কিন্তু তাহারা সেই সময় বিধি-বিসানের এমন সব বাধ্য বিদ্যাছিলেন যে, তাহার পরিণাম Puritan Islam এর আদর্শের পরিপন্থীই ছিল। সুকীরা যেমন চক্ষে বাগ্গার অর্প করিত “to journey away from him,” হুজুর শোবাক (ইরাক) পরিণামের অর্প করিত “to eat off with one's everyday clothed all

sexual thoughts and feeling,” তেমন করিয়াই এ দেশের মুসলমান সাধকতা মতা। যদিও আলা নবী রোজা নামাধের এক একটা আধ্যাতিক বাধ্যা বিত এবং তৎস্বারা শরীয়তের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করিত। ‘শরীয়ত’ এবং ‘মারফত’ একটা স্বাভাবিক antagonism আছে, ভারতের দাঁকিভ-সাধারণেরা মারফতকেই গ্রহণ করিয়াছিল। আর ইরাকই মতা বাধ্য তৎস্বের দীনা-কথা আজ পর্বাঙ্ক মুসলমানদের জীবনে বহুমূল হইয়া আছে; ‘মতা মতা তৎস্ব রাণা হরিব চরণে’ বলিয়া কান্দি ফকীরের মতন বহু মুসলমান ফকীর আবির্ভূত হইয়াছিল এবং আজিও হইতেছে।

কার ফকীর বা আলী হাফা মরহুম বেড়শত কংসরেরও আশেকার লোক।

“নানা তেল কবি শুভ সাধ খোঁজি নহে।

বহুদী হাল বিদা কবিব শুভ সাধে।”

এই উক্তি তিনি করিয়াছেন মতা, কিন্তু এই বহুদী ঠিক আরবের বহুদী নয়। এই বহুদীকে তিনি এক তবিল-প্রভা তাহিকের বেশে ত্বিষ্ট করিয়াছেন।—বহুদী বলিতেছেন:

“মণ্ডল্য কবর মন আলী তুমি;  
মস্তু গোপন মত তব সে কাহিলী।  
এই সব কথা মনে জান শুভ সাধ;  
মোর গারে গলমণ বা কবিব আর।  
মোর গারে হইবেক কবি কবিব।  
মস্তু গোপন মত থাকিবেক মন।  
পার সব তাগ কবি জানে কবিব।  
মস্তু প্রেম প্রেম করি মনিয়ে জড়িবা।” (৩)

এই আদর্শের সাধকেরা বলিলেন—মারফতের মতা সাধের কোনো প্রকার আবশ্যকতা নাই, তাহারা নিজেদের শক্তি-সাধনার আলাহর উপলব্ধি করিবে। সেই উপলব্ধির ভিত্তি পদমণ্ডল্যেরও প্রয়োজন হইবে না, মতএব হুজুরের পর আর পরমপর কথ্যাবে না।—তাঁহারা; মতাধারার আদর্শ প্রেমকে স্পষ্টাভিমান ছিলেন; বলিলেন, একমাত্র মতাধকে প্রেম-দান বাগাই আলাহর সাধিলাভ ঘটবে।

(১) সুকীরাবের প্রেরণা-নিবিত “The Origin of the Muhammadism of Bengal” পুস্তক চর্চা। (২) কবিবক মতা। মস্তুদখান ১৬ম পর্বাঙ্কর শেষ ভাগের লোক।

“বোহাফুলে ছিল মরী মৈক লক্ষ্যাব্যাহার ।  
তক হৈল বেগমার হাকের অধিক তাহার ॥  
হাল-ওয়ারী বৃত ছিল মোবারক গুহর ।  
তক হৈল সেই রূপে সু-আলী কালন্দর ॥  
পথবা পুন্ডরী ছিল বৈকুণ্ঠ সুহারী ।  
মরী ভোলেমান তক পাই সেই মরী ॥  
এই মত বহু তলনী তক হইয়া ।  
মরী কণ তলনী হইল বক্রিমা ॥  
কণ বিহু প্রেম বাহি, তাহ বিহু বক্রি ।  
এব বিহু লক্ষ্য বাই, সিংহ বিহু মুক্তি ॥ (১)

এই সমস্ত উক্তিও তিনি মাহুদ-ভক্তনাটকেই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। বৈকুণ্ঠ সার্বভৌম প্রেমাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁহার এই প্রেমের স্থানিক দৃষ্টান্ত।—স্বকী-পরিচো আনন্দেতে আপনার ছবি দেখিয়া আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ হইয়া প্রেমের নীড়নে আহার ওকত-সুগন্ধের কাচিনী আছে। আলী বাতায় এই একই কথা বলিলেন:—

“প্রমদে হইল প্রু এক নিরন্তর ।  
প্রেরসে ছবি কৈল তুলন স্তবর ।  
প্রেরসে তুলি প্রু যাহাকে সজিল ।  
যেহাঙ্ক ভবি নাম গোহর বাহিল ॥ (২)

পল্লীর নিরন্তর আরতী-পথীও এই কথাটিই তাহার গানে পাঠিল:—

“নিমাকারে আহার নামে আলোনে ছিল ঘোষা ।  
সেই আলোনে হৈতে আরজব আপনে কবিল গুহরা ।  
সিগুণ উম্মেতে নহি বাতকে ঘোষা—  
বীদে ধানে কর ঘোষা ।  
মরীজি গুহরা হৈতে কবীম নামটী ধবানে করিল লগা ।  
ঘোষা সেই নামেতে মর হৈতে নাম বাহিলের ঘোষাঙ্কা ॥”

পেশ পতাপ নামক জনৈক বাড়িল কবি বহু পূর্বে এই কণারই প্রতিধ্বনি করিয়া পাঠিয়া গিয়াছেন:

“হাফিল গোপনে সে সৈলঙ্গ আকর ।  
নিজ রূপে নিরন্তর হইল প্রচার ॥

(১) আদ্যপাশর ।

(২) জাব লগার ।

সুন্দরীর নিরন্তর বেশি একাকার ।

নিজ রূপে প্রচারিল গুণ মন্যতাব ॥”

আলী ভাষা “বৈকুণ্ঠ মন্দের বহু” বলিয়া বৈকুণ্ঠের মাধন প্রণালীকেই প্রায় করিবার ইচ্ছিত করিয়াছিলেন। বহুভা, তাঁহার দম্যাময়িক বাঙালার বিপুলভাবে প্রত্যেকে বা পরোক্ষে বৈকুণ্ঠ-মনের চর্চ্চা চলিতেছিল। নাথ-পদ্যার পাতাবও তখন অল্প নহে, এবং নাথ-মনের চর্চ্চায় ফলেই গ্রাম-বেবতার পূজা, শ্রীর-ভক্তি, দরগাহ-পূজা, মনিসের পূজা, নামের মজলিশ ইত্যাদি ক্রমশঃ বেশি বাড়িয়া চলিয়াছিল, কিন্তু ওঠাৎ ওঠারী-আমোলন আদিগা এ সবের প্রতি-পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া পাকাইল।

ওঠারী-মেনতা দৈয়দ আহমদ ঘোষণা করিলেন—হুজুরতের বিধান মূলতঃ দুইটি ভিনবের ওপর ক্ষত, প্রথমতঃ কোনো প্রাণীতেই আল্লাহর গুণাবলী কল্পনা করিবে না, দ্বিতীয়তঃ তেমন সব আদর্শ বা জিজ্ঞাসাক্ত অবিচ্ছিন্ন করিবে না যাঁহা হুজুরতের বা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও খলিফাদিগের আদেশে প্রচলিত ছিল না। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মক্কাশরীফে গমন করেন ও আবদুল ওতাযের শিষ্য হন। ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি শীখদিগের এবং ‘কাকের’দিগের বিরুদ্ধে ‘পবিত্র’ জেহাদ ঘোষণা করেন। পাটনা এই আমোলনের কেন্দ্র হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দৈয়দ আহমদ ঘোষণা করিলেন যে, শিখদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার সময় আসিয়াছে। দৃঢ় ও আরস্ত হইল; বাঙালী বিহার হইতে মাহুদ ও মর্কের সাহায্য প্রচুর ভাবে আসিতে লাগিল; ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ওঠারীরা পেশোয়ার অধিকার করিল। এই সময়ে বাঙালার ওঠারীরা তিত্ত মিঞার নেতৃত্বাধানে বিস্তার করিল; ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাহারী মরীয়া, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে লুটপাট ও ‘কা-হের’ ধ্বংস করিতে লাগিল।

তিত্ত মিঞা ও দৈয়দ আহমদ নিহত হইলে পর, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই আমোলন পুনরায় আত্মগতাপ করে। পাটনাবাসী ছইছন প্রচারক—ওলিয়াৎ আলী ও এনা-য়েৎ আলী বাঙালার পদ্যার্পণ করেন। এনা-য়েৎ আলী



উঁচাচর সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া বিশেষ ভাবে মালদহ, বগুড়া, রাজশাহী, শাবনা, নলদী ও করিমপুরে প্রচার কার্য চালান। জোনপুরের মৌলানা কেরামত আলী এই আন্দোলন পূর্বদিকে করিমপুর হইতে ঢাকা মহম্মদসিঃ মোহাম্মাদী এবং বরিশালে নিয়ন্ত্রিত করেন। হাফিজাবাদের জরনাল আবুবকীর—যিনি গুলিয়ার আলী কর্তৃক দক্ষিণ-ভাৰত ভ্রমণ কালে গুলাবী মল্লভূক্ত হন, হিমুয়া, ঐকট প্রমুখ জেলায় প্রচার-কার্যে নিযুক্ত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ছোট ছোট প্রচারক ছিলেন। পুন্ড্রাবাদের আন্দোলনের পর ইঁহার পতনশেষের মতিনের ভ্রম গুলাবী নাম বঙ্গাট্টা নিকটস্থ এক মাঠে হাঙ্গল বা গায়েব মোকাম্মেদ নাম দিলেন। ইঁহার উমামহম্মদের নির্দেশ মগ্রাহ্য করিলেন; বিবাহে বাধ্য রাজানো, মলকীসে গিরি দেওয়া, সমস্তকেই অগ্নি দিলেন।

এই আন্দোলন-কার্যে বাঙালার জনসাধারণ মূলসমান্যক ইসলামের শরীয়ত পালনে বাধ্য করিতে লাগিল। শান্তির ভাৱে সম্মত বাস্তবমতই তাহার্য বহু করিয়া দিতে উত্থত হইল। এককাল যে কাকীরা গানের দল তৎকথার বৈশাভিকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছিল, তাহারা এ অত্যাচারে বাস্তব সম্মত হইয়া মূৰ একটু বঙ্গাট্টা তখন গাছিল--

“শরীয়ত না চিনিলে যারকং কোথাও না গিলে।”

এককাল যে গানের দল চক্করতের সাধন-আবশ্যের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাই করিয়াছিল, তাহার্য চম্ভবৎক নুখে বৃশীৰ নীকার করিয়া তখন গাছিল—

“আবে আর কোলো বন চাইন,

বৃশীৰ ও মাহানবী কার জোরে ঘরি।

যখন আসবে মন্দ, হাতে বলার বিধে তখন;

বদল ছিল কে কীভাবে উদ্ধার ত,

তখন আমি আর কার আশা করি।”

“নক্শের উলটে নাও খাইও, রে মনুবা।

নক্শের মূখে কাটা কিন্তু দিবা গোড়ার কোড়মান খবে।

আগে মাঝে খবে ভাবে, বিশে বাতে খইত।

নক্শে কাকের দিল আরা অগ্নিরেব কাগজে।

নক্শেব রে মানাইতে পারে, তাহে নষ্টব কোলোহ”

এই গুলাবী-আন্দোলনের বেগ কিন্তু অত্যন্তকালপর মধ্যেঃ এদেশের উত্তরাংশকে একেবারে মলীকার করায় ফলে বাস্তবিক ভাবে মলীভূত হইয়া গেল। বাঙাল্য এই আন্দোলনের নেতৃত্বানীত ছিলেন, তাঁহারাও অল্পকালে আর শীঘ্র-পরিণয়ী না হইয়া পীত-পথ্য হইলেন। মৌলানা কেরামত আলী পরে মক্কাভাৰত শ্রীরহামকে সমর্থন করিয়াই কথা কহিলেন, নিজেও পীতানি আরম্ভ করিলেন। তিনি হঠাৎ এদেশের চিন্তের পরিচয় পাইয়া পরে ইহার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পীতানি অল্প আদর্শের; ইঁহাখায়া লক্ষ-প্রচারের সমস্ত পথ্য অবলম্বিত ছিল। কিন্তু তাহাতে লাভ হইলেন। যেনে বহু পরিষদী পীতের আবির্ভাব হইল, তাহার্য অল্পত অল্পত তৎকর বৈশাভি কল্পিত লাগিল। তৎপরি তরিক্ব-পন্থী বলিয়া একমগ পীতের আবির্ভাব হইল; ইঁহার্য নমাজ রোজা অবলো করিল না, কিন্তু দলক সঙ্গে গীতি বাস্তব চালাইল। ইঁহার্য মাহুদের চারি অবস্থা বিবৃত করিল—(১) মাহুদ বদন শবতানীতে গিল্ল থাকে, তখন তাহার অবস্থা—গুগোয়াস; (২) মাহুদ বদন শাৰ্বের সংসারের কাজে এক শাৰ্বের বা বেহেস্ত-প্রাপ্তির মানসে নামাজ রোজাও গিল্ল থাকে তখন সে নক্শের অধীন; (৩) মাহুদ বদন আলাহুতায়ালার ভরে নাবালকের মতন অল্পভাবে শরীয়তের সমস্ত বিধি বিধানকে হুৰ্ব্ব পালন করে, তখন সে এল্হামের অধীন, সে তখন কেতেরতার দরজার, সদাশরফ্য তাহার অন্তরে তখন ঐকির চমিতে থাকে; (৪) এশ্বক, অর্থাৎ মাহুদ তখন স্বেপ্সে আলাহুতায়ালতে নিমজ্জিত হইয়া শব্দ আলাহ। আলাহ হুৰ্ব্বৎক প্রেম দ্বারা সৃজন করিয়াছিলেন, এবং প্রেম করেন, দূরীষকেও শ্রিতকে প্রেম করিতে হয়, অতএব পীত দূরীষের নিকট মোহাম্মদ

পত্রকীণা-চর্চা আর তাত্ত্বিক বামাচারের স্রোতে তখন বগাশব্দভ ভাটা গড়িল। সঙ্গ-সিদ্ধি মূলমান গাছিল—

## আবদুল কাদের

বরপ চইল; পিছেরা পীরকে উৎসেণ করিয়া গান  
পাহিল—

“নাহিকো, আদিবা নি আমার আদরে।

খালু বাজারে আউল ফাৎ, মাত করিহা খেল তাহা,

শেখ বাজারে এসে আমি বিকি কিনিব বর পাইলাম না।

শেখ গারে যবুতার বাজার, পার হইতা যার সব খোকান বার,

আমি জাকি তর তর—

তকগো তোবার খাসের কলর যে রয়না।”

বাঙলার পন্নীতে এই তরীফ-পন্নী নামধারী বহু পীরের  
সাফাৎ পাওয়া যায়; শরীফতের বিধি-বিধান ইহারা  
অবস্ত্র অনেকটাই পালন করে, কিন্তু ইহাদের মন চির-  
বৈকল্য। ইসলামী শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী পীরেরাও  
যৌদ্ধ বা বৈষ্ণব কল্পী ছাড়াইতা উত্তীতে পারে নাই। চট-  
গ্রাম বিভাগ হুড়িরা মাইকতা-গুহের ককাবের যে বিরাট  
মল আছে, তাহাদের গানে স্তুতবাণ, সাধাবাদ, শুকবাণ,  
পালাবাণ, সমস্ত কিছুই পর্ণাশ্র তাহে বিস্তারিত; ইসলামের  
শাফাৎ প্রভাব সেই গানে আছে কি না আবিষ্কার করা  
দুষ্কর। আর তাহাদের সাধন-প্রণালীও অনেকটা নাক-  
পন্থাদের সাধন-প্রণালীর অনুরূপ। তবে তাহারা তাহাদের  
গানে ইসলামী শকাবলোই ঘাড়া কিছু ঢুকাইয়াছে।  
এতকাল বাউল ককাররা পাহিরাছে, মাহুদের দেহের  
মধ্যেই গঙ্গা যমুনা কানী কুশাবন, ওহাবী আন্দোলনের  
পরের ককাররা গানের ভাবাবর্ণকে অবিকল অকুর  
রাখিয়া শুধু মাত্র কানী কুশাবনের স্থানে মক্কা মদীনা  
বদাইয়াছে; কক স্থানে মহাম্মদ (স) বদাইয়া তেমন  
হুয়ে গাহিয়াছে—

“না বাসিত পর, তরে বহু, না বাসিত পর।

কম কম জানি আমি তুমি বহু যের,

করে বহু, না বাসিত পর।”

খবর মোবাহ্‌দার আমি, মাই রে আখার বুল।

মহলে পড়িহা জাকি মোহাম্মদ বতল।

তরে বহু, না বাসিত পর।”

তাহারা হকংক—“ও আমার প্রামিত্যারে—” সন্ধান  
করিয়াছে; ককের বাশির স্থানে কালামের বাশি,  
কুশাবন-বিহারী স্থানে মদীনা-বিহারী, এমন করিয়া মূল  
উক্ত-আদর্শকে অবিকৃত রাখিয়া শুধু মাত্র শকাবলীর  
পারদর্শন করিয়াছে। ইহা করিয়া ইসলামের বিকৃত  
বান্ধাই ইহারা জন-সমাজে প্রচার করিয়াছে এবং করিতেছে।

ওহাবী আন্দোলনের প্যাত্রা আন্দোলনকে শেখ  
আর পরিচালনা না করিলেও যেনের কাঠমোয়া মোলতারা  
শরীফকে চালাইবার ক্ষমতা জনসাধারণের উপর অত্যন্ত  
দোহায়া করিতে থাকে। তাহাদের ঘারা পন্নীবা-শকাব  
অভিনয় নির্মমভাবে যেনের নামে অত্যাচারিত হইতে  
লাগিল। তাহাতে মাহুদের বাচিহা থাকবার সময়-সম্পদ  
—মস্তক আনন্দ ইহার সমস্তই পন্নী হইতে বিহার নিল,  
কিন্তু পন্নী আনন্দের কোনো উৎকর্ষই সাধিত হইল না।  
পন্নী-ধীন হইল শুধু নিরানন্দ, দেখানে শরীফ ও  
কলগ্রন্থ বা গ্রন্থের হইল না, হইতে পারে না। এই সমস্ত  
মোয়া মোলবীর প্রধান যোগ ছিল এই যে, ইহারা এ যেনের  
পরিবেষ্টন, এ যেনের মাহুদের চিত্ত, এ যেনের অতীত, কোনো  
কিছুর নিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন না; তির পরিবেষ্টনে পুটে  
মেমিক-মনের স্টই ইসলামকে আঁরা যেনে, আরব হইতে  
অন্ত হরণের পরিবেষ্টনে বহু চালাইতে নিচুর অচোটা  
করিতেন—যাহার অবস্ত্রাথা পরিহার পাড়াইল মোচনীর  
বার্জতা।

বাঙালী যেনের অপব্যবৃষ্টি এ যেনের মাহুদের চিত্তকে  
চির-কোমল করিয়া রাখিয়াছে, তাই আদিকাল হইতে বত  
নতুন নতুন ধর্মবত এদেশে গঙ্গা ও গ্রায়েন লাভ করিয়াছে,  
dogmaticই হোক আর ভক্তিরই হোক, তার কিছুই  
প্রত্যাখ্যাত না হইলেও এ যেনের মাহুদ নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে  
সুদ করিয়া কোনো কিছুকে গ্রহণ করে নাই। এ  
ঘারা শুধু বাঙালী যেন লম্বাইই খাটে না, সমস্ত যেনের

(১) এই ককারদের অনেকটাই বিদ্যাল করিয়া থাকে যে কক  
ও মহাম্মদ আউল ফাৎ।



ইতিহাসেরই এই কথা। তাই ব্রাহ্মণ আন্দোলন, ওজাবী আন্দোলন এই মেশে মাদিলেও এই মেশের সহজিয়া মন তাহার মূল আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই, নিকৃষ্ট গোপনে সে তাহারই সাধনা করিয়াছে। ওজাবী আন্দোলনের আগে যেমন অসংখ্য শীর সুশীল যৈশ ও উজ্জ্বল গান পাঠিয়া গিয়াছে, তেমনি পরেও অসংখ্য শব্দক কবীর আকিতুত এইরা তাগাদের প্রেমের তরুণ প্রচার করিয়া গিয়াছে এবং বাইতেছে। বৈকুণ্ঠ বা মণ্ডলিয়ার তেজস্ব ও আশ্রিতবই তাগাদের গানে গানে রূপ লাভ করিয়া উঠিয়াছে। এখানে পাণ্ডলা কানাইর কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে। টনি গোস্বামীর জেলার জিনাইলকে প্রসঙ্গ গ্রহণ করেন।

"হাব হাব কি মজার বোকান পেতেছে বিড়টি  
তোরা কেউ বেশ তে গাবি আর।"

পাঠিয়া পাঠিয়া তিনি যশোরের ঠাট্টে মরমনিগত পদ্যস্থ সাংকীর্ষন বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। দেহতত্ত্ব বিষয়ক তাহার অনেক গান আছে। নিয়ে একটী গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"গোবো ডাই, আমি যবের কথা বলে যাই।

এক কামিনিকর উত্তম বাজি হৌন বহু গাই।

যিহে তিন ল ঘটে কোচা

এব করে খাড়া হই টাকার পর;

এমন বল কহু বেশি নাই।

নাহে কৃষ্ণ চন্দ্র আর বল ইন্দ্র, যবে দিয়ার করে

চৌকি টি পৌঁসা কিং (১)...

বাল্লভার ককিটামলের শোকেরা যে সময় তবের গান পরিচাল্যে, নাথ-মার্গের শোকেরের স্রাব তরুণে সর্বাঙ্গেন্দ্র আধিক।

"জক মৌন বাধ বে উকী উকী বা।

সুহৃদ যবে ধাম ওকীয়া, উপার তলে খাড়া।

তলহে, আম পায়ে পৈলোহ পোনা, কবার বরি বার।

তা যেমিরা খুঁচি শিশুটা গলা লইয়া যায়।... (২)

শরী-বাল্লভ এই ধরণের অদ্বুত কথার গান স্ত্রীর কুচি পাওয়া যায়। নিয়ে একটী সাধারণে বিখ্যাত গানের উল্লেখ করিতেছি:—

"জক আমার আমের মণি ও।

ও সুশীল ও; বাজারেতে নাই মালুম, ঘর ঢালে ঢালে

সুশীল, ও ঢালে ঢালে।

অতলে যে বিচে বোকান, বরিব করে কালে ও।

ও সুশীল ও; শাহর বরীয়ার মাতে তাইতা কিহে পান।

সুশীল, তাইতা কিহে পান।

তিন ককীরে পদ্য মবাজ, তিন ককীরে মালি ও।

ও সুশীল ও; সন্ধ্যাবের তলে পাখর, পাখর খাইল খুনে

সুশীল, পাখর খাইল খুনে।

মার বিহার দিন পিতার মনব হইল কেমনে ও।"

গৌরকনাথের যুগে যে-সমস্ত তত্ত্ব-গ্রন্থ তৎকালীন অহুদকিংহু মাহুদের চিত্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, আদিকার যুগের খাউল ককারও সেই সব গ্রন্থ বার বার উৎখাপন করিতেছে। গৌরকনাথের জন্মস্থান পাঞ্জাবের জলন্ধরে— অহুমান কথা বাইতে পারে; তিনি জক মৌননাথের উচ্চারার্থে "কদলীনগরে" আসেন। আমাথের বেণে আক পর্বাত্ত ও গৌরকনাথকে গৌরকাকারী ভাবিয়া মানত দিবার প্রথা প্রচলিত আছে; (৩) তাহারই উক্ত "আদমন-কামিনী বাপসেনে বিবচিত "গৌরকবিজয়ে" যে কয়েকটী তত্ত্ব-গ্রন্থ হানি পাইয়াছে, কথা—

"জক খুঁচি কোন্ মন (গহা হও কার।

এল খুঁচি আর আকাশ মাজে কোন্ কোরে।

হানি নিতাইলে কোটি কোথা থিরা হ।

কোথা কামিলা হুন্ কোথা হোলা হিরা।"

তত্ত্বগ্রন্থ তত্ত্ব-গ্রন্থ আদিকার যিনের পরীগানেও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কথা—

সুশীল, ও মতা-বাণী।

মহাকার মহাকার কোন্ বৈরাগার

(১) খাটালীর গান— ১৩৫ পৃ: উইয়া।

(২) বেণে কবজুরা মাহেব কৃত "গৌরক-বিজয়ে" কুচিকা  
উইয়া।

(৩) "On the Cult of Gurkshanath in Eastern Bengal"  
by Sarat Chandra Mitra M. A. - Journal of the Dept of  
Letters, C. U. Vol. XIV. 1927 উইয়া।



আবদুল কাদের

যো দুর্গ, যোহা টৈবাকার ।  
 কোন্ বেলো কোন্ কারে ফিলান, তার না পাটলাম ঠার,  
 যো দুর্গ, তার না পাটলাম ঠার ।  
 পক্ষমাসের পক্ষ আরা, তম মাসের ঐধ  
 যো দুর্গ, যম মাসের ঐধ ।  
 মণ মাসের মণ মিন, আনি পাটফিলান কা গাঁহ,  
 যো দুর্গ, পাটফিলান কি গাঁহ ।  
 পানির তলে মড়া মাস, সেও শুঠি মিনে,  
 যো দুর্গ, সেও শুঠি মিনে ।  
 যো দুর্গ, দুখ মারিল কিলে ।  
 যানের মকে দুহা আর সনের মকে চেল,  
 যো দুর্গ, সনের মকে চেল ।  
 পাণ্ডার মারে বাহা: হেল, গ্রাণ কেমানে সেল,  
 যো দুর্গ, গ্রাণ কেমানে সেল ।

শাহজাদান ফকীরের নাম এখন আর শিকিত বাঙালীর  
 কাছেও অশ্রুচিত নহে । তিনিও তাঁর গানে বৈকুণ্ঠ আর  
 বৌদ্ধের তত্ত্ব কথায় পাঙ্কিা গিরাছেন :—

“হাং নাম আলেক মগুং আলেক রহ ।  
 ওঙ্ক জেয় বদিক মিনে কে তারে পায় ।  
 রম রতি অমূল্যের  
 নিমুৎ তেহ জ্ঞানতে পাবে,  
 দিত্তে দিত্ত করে  
 বুল পও হহ ।  
 গৌণায় নিরঞ্জন আহার  
 আশলীয়া করেন প্রচার,  
 জানিলে শাপন জন্মের বিচার  
 লম জানা যাহ ।  
 অশ্বাসার জন্ম-লতা  
 জন্ম পে তার বুল কোথা,  
 লালন কর হয়ে দেখা  
 নাই পরিচর ।”

একদশ শতাব্দীতে এবং তাহারও পরে বৈকুণ্ঠ প্রচারক-  
 মণ ভক্তি ও জৈন-বর্ণ দ্বারা বিশেষ ভাবে সন্ন্যাসবাদকে  
 উদ্ভেদ করিবার প্রয়াস শাইয়াছিল । বৌদ্ধেরা সন্ন্যাসবাদকে  
 বীকার করে ; বাঙালী বুদ্ধদামনের ভীকনেও এই সন্ন্যাসবাদ  
 আন্দর্বা ভাবে অধিকার গ্রহণ করিয়া আছে ; তাহার

“ত মৌল্য, মাসের কুমারী কানো ক,  
 দুর্গীয়া মাসের মারি ওহ”

স্বাধিরা দামারের অনিন্দ্যাতা আর অনিন্দ্যতাকেই প্রচার  
 করিতেছে । বৌদ্ধদের গুরুধর্মকে মূর্খনি করিয়া তাহাকেই  
 তাহারো অন্তভাবে বুঝাইয়া বলিতেছে—

“বে-তলুনিয়া বে-দুর্গীয়া বেবা মাল্য মরে,  
 পরচানে করিব দুর্গীয়া কবনের ভিতরে ;  
 সেওহা হাত কাপড় দিবা চান্দ্রা চারাইত,  
 তত্ত্ব জাবে করবো দুর্গীয়া কবনে ফসাইত ।  
 দুর্গবার কবনে দিবা মোলা ঘাটব বর,  
 কুমু হোচাটার ফিরিয়া মিলিব কবর ;  
 কবনের আঁতাবে বাশ্চর ঐধন না দিহ,  
 —যেন কালে কোণার বটনা মাল্য ইগার পাব ।”

এই সমস্ত সাধকরা সাধারণ কথাকে এমনি তত্ত্ব-সমুদ্র  
 করিয়া পাঠে যে, তাহার রহস্ত-ভেদ কতা কুমোহা ব্যাপার  
 হইয়া গিয়ায় । বাহারা তাহারো তত্ত্ব-সাধনাকে মগুর চক্রে  
 দেখে, নমোকে ও রহস্ত বর্জমান—এই উদ্ভেদ করিয়া তাহারো  
 সেই সমস্ত গোড়াসের লক্ষ্য করিয়া যায়—

“মোবার মদান তুনি খিলুকা দিবা মাত ।  
 কোন্ দুখ মাখো দিক, কোন্ দুখ বাত ।  
 কোন্ মদার পানি দিবা মদে ওঙ্ক করে ।  
 নমাজ পড়িবা দিবা মাল্য জাবাও কাও ।”

আলী রাজা কয়েক বৎসর পুকে তাঁর জাধার বালিয়া  
 গিয়াছিলেন—

“সল পাত্র তাম কবি ভাবে দুখ দিবা ।  
 অল্প জেয়ে জেয়ে কবি মংহবে মড়িমা ।

এত বড় দাক্ষিণ নিগ্রহ-বাহী ওহাও আশোলনও সেই  
 ভাবের বিশপার ঘটাইতে পারিল না । বাউল কবি হাছন  
 রাজা ওহাও আশোলনের কো ধামিতে না ধামিতেই  
 গাহিলেন—

“খোলা মিলে জৈমিক হুটলে  
 গাবেনা পাবেনা মোরা নমাজ মোহা কবিলে ।”

হাছন রাজার বাউল ও দুর্গাধি গান শুণিতে হিন্দু  
 উপনিষদের দ্বারা আন্দর্বাভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । তিনি  
 তথু

“আদি বাইদুরে বাইদুরে আগার মতে”



বলিষ্ঠাই কার্য হইল নাই; প্রকৃত হিণ্ডু pantheist এর  
মতেন অকৃতোক্তের বলিষ্ঠাছেন :—

“বিজ্ঞান করিয়া বেশি সকলকে আঁধার।

সোনা মামী সোনা মামী পো,  
আমাদের করিলে কে মন্বানো।

আমি হইতে আঁধার বহল, আমি হইতে বহল,  
আমি হইতেই আসুমান জ্বলি, আমি হইতেই সব  
মদ্য মদ্য সেবার সোজ, মোর কথা হইল না,  
আপন চিনিলে সেখ খোঁজা চিনা যায়।”

এই বাউল-কবি একজন নীরব মনুষ্য রাজ্য; তাঁহার  
ভিতরে এই অধঃ-জ্ঞান কত প্রাণধান আর আবেগময়।  
তাঁহার এই আবেগ মুক্তি-চিন্তের।

“হাওন চাকা অনুবে কর হাওন মনো ঘরি—  
চাকার আঁধার এমন বন্ধন ছাড়িয়ে না পারি।”

আলোকের প্রতি তাঁহার যে এই প্রেম, মুক্তির অগ্নি যেন  
তাঁহা হইতে বিক্ষুব্ধিত হইয়া পড়িতেছে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে,  
ইসলাম এমনই বাউল চিন্তার মূলত প্রেমে এক আলোময়  
স্বাদের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। হাছন রাজা, গালন  
নকীর, তিরু ককীর, শাহুল কানাই, তাহু ককীর, ইত্যাদের  
সকলের গানেই সীইয়েত আরাধনা আর বৈকল্প-প্রেম  
থাকিলেও ইহাদের গানের গোপন অন্তরে এমন একটা  
কিছু বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় পাওয়া যায়, যাহা কিন্তু সাধক বা  
পদাবলী লেখকদের মধ্যে আদৌ পাওয়া যায় না।  
মুশীবি গান বলিয়া ইসলামের সম্বন্ধে যে গানের সৃষ্টি  
বাঙালার সম্ভব হইয়াছে, তাহার আত্মলতা আর মূঢ়-চিত্ততার  
মিকে পৃষ্টিপাত করিলে মুক্তির আশ্রয়-উদ্ধাসের কথাই  
বার বার স্মরণ আসে। নিম্নে একটা মুশীবি গান উদ্ধৃত  
করিয়া দেখাইতেছি :—

“ইলা যে ইলা যে মোরে দো—

কি করিছ বাচ্চের পাইলে।

গোপনে অনুভব করি দো বইতা নিরালে;  
দুরুর না তাঁপিত আর, আক পরশিলে, পরশিলে দো।  
বন্য কাতে গুলুয়ে অল দো, বিল না কল দিলে,  
আবার দল কল বর বড়ি, বাল হই কি দিলে, কি দিলে দো।

দীন হীনে বলে বকুত, তোর রাশিখু কোন দল;  
দুড়ুর না তাঁপিত মল, কল বেরাশিলে, বেরাশিলে দো।”

পদাবলী সাহিত্য বাঙালার অমূল্য সম্পদ। সেখানে রাখার  
যে তপ করিত হইয়াছে, তাহাতে যেন চর রাখা অস্বাভাবিক  
দুর্দশ প্রকৃতির, কৃষ্ণ-প্রেম যেন এগারিত্য পড়িয়া  
লুটোপুটি খাইতেছেন। বাঙালার নিরক্ষর গণ-মুগ্ধমানবের  
হারা যে আঁট-গানের শালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে দেখা  
যায় তাহা কত মনোহর, তাঁহার প্রেম আধ্যাত্মিক পদ্ধিতে  
কত পল্লিমানে আর মূঢ়। সেখানকার তাহা অপেক্ষাকৃত  
কালের মাছ, কিন্তু পদাবলীর তাহা কালের মতো  
চিকিৎসা থাকিবে সোজা হইবার মতন নহে।

ইসলাম এ দেশের গানের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা  
বৈশিষ্ট্য দিদি আনিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহা শুধু এই দুইই  
মাত্র; এবং এই ইসলাম আরবের ইসলাম নহে, পারস্যের  
ইসলাম। গানের মনের মাছের জীবনে ইসলামের অমর  
দান এই যে—তাঁহা তাহানের জীবনে আত্মকীর্ত্ত দোলাই-  
বোধ মন্বলতা ও ইতিহাস-বশীকরণ শক্তি আনিয়া দিয়াছে, এবং  
ইসলামের স্তম্ভ বর্তমান কালের বাঙালার মাছের জীবনে  
এত মন্বল রূপে নিহত; তাহা হইতে পুরাকালের সেই  
খেজুরারী তিরোহিত হইয়াছে।

নিছক ইসলামী কাহিনী নিরাও এ দেশে অনেক গান  
রচিত হইয়াছে, যেমন গাধীর গান, জারীগান। কিন্তু  
শুদ্ধ ইসলামের বাণীবক্তা এই সমস্ত গানের কোনোটোটেই  
নাই। গাধীর গানের গাধকও বৌদ্ধদের মতন তাঁহার  
নাথকের অম-পূর্বের ইতিহাস কহিতে দিয়া গুলুয়েত করিবার  
আসর মুহুর্তে নাথককে দিয়া বলার :

“মন তোলা মন থাকো না মন  
দিকা মন্বার পরে।”

তথু মায়াবাদই নহ, বৈকল্পের মৌল্যবাদ ও বর তপকথার  
কালিনীতে ভড়িত হইয়া এই গান গীত হয়।

“গোরক-বিজয়” নাকি নাথ গুলুয়ের গুলে বর্তমান  
কালের “জারী গানের” মতন করিয়া পাওয়া হইত। নাথ-  
দের গানের অশ্রুগোপাতেই জারী গানের উত্তর হইয়াছে  
কিনা নির্দোষ করা দ্বন্দ্ব। শাখারপত, মলেনের কাহালা

পর্যন্ত উপলব্ধ করিয়া মোহমূর্খে যে সমস্ত "মাতঙ্গ" গাওয়া হয়, মনে হয়, তাহারই অশুকরণ করিয়া এই ভাষা গানের আলী বংশধরদের কাহিনীই অধিক গাওয়া হয়। পরোক্ষের বিধি-বিধান পর্যবেক্ষণের উপদেশ দিবারও ইংগিত গান রচিত হইয়া থাকে। এই গানের মূল অতি চমৎকার; গভীর স্নেহে মনে হয় যেন দুই হৃদয়ে শুধু একটি মাত্র হৃৎ স্তব্ধ তুলিয়া মাথার তুলাইয়া বাতাসে ডালিয়া আদিতেছে। ইহা প্রাপ্ত ভবিষ্য উপভোগের বস্তু।

উপলব্ধিতে শুধু এই নিবেদন করিয়া বিদায় নিতেছি যে, বাংলা দেশে পরোক্ষতা ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা বাঙলার মাটির মাছবেব গ্রহণীয় হয় নাই, হৃদয়ে পারে না। অস্তিত্ত দেশের মতন এদেশের ভাষা শোভনীয় ভাবে বার্ষ হইয়া আছে, কোনো প্রকার আবস্ত সৃষ্টি তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। সমস্ত ঘোষ ত্রুটি সবেও এ দেশের মারফতী-পদী ইসলামের কিছু সৃষ্টি প্রচেষ্টার মাটিতে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কারণ যে এ দেশের পরিবেষ্টন, এ দেশের মানুষ, এ দেশের অস্তিত্ত, উচার মতলকে গ্রাপ দিয়া ভালবাসিয়াছে। আর আলোচ-নের শুধু অক্ষর-প-পুস্তি; তাহার শুধু অনাবাসিত শাস্ত্রের বারক, তাই এ দেশের জীবন-পুস্তিতে তাহার কেবল অভিপায় আর প্রতিবন্ধক হইয়াই রহিল, নিজেই কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিল না; তাগানের দ্বারা কোনো কালে কিছু সৃষ্টি সম্ভবপরও নহে, কারণ এ দেশের মাটির বিকে তাহাদের সৃষ্টি নাই। যদি বাঙালী জীবনে ইসলামের হৃৎ মূল ও মূল প্রকাশ আমাদের কথ্য হয়, তবে আমাদের চল পথে মারফতী-পদী হইতেই আলোক সংগ্রহ করিতে হইবে, বাঙলার ধর্ম-মুখো মানুষকে বুদ্ধতার জগতের সুখামুখি করিয়া দাঁড় করাইবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে; আদর্শের মঙ্গ প্রয়োগই আমাদের লক্ষ্য হইবে না, লক্ষ্য হইবে মানব-জীবনের সুস্বতম বিকাশ।

মূলমানে-শ্রীর বৈকুণ্ঠ-বাউল, দ্বারাই দ্বারা অশৌচিক (miraculous) কিছু দেখান সম্ভব, তাহারই চরণে আমাদের

বাঙলা জীবন এ দাপৎ মূর্ত্তের মতন পুঙ্খলিখ্য প্রবাহে গিয়া অক্ষতাবে সমস্ত বিকাইয়া দিয়াছে; আভিকার এই বিজ্ঞানের সুপে তাহার অবদান হউক, মূল মঙ্গলোচিত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা জীবনের অবলম্বনকে গ্রহণ করি। এই গ্রন্থ আমাদের মন্ত কি হইবে, তাহা অব্যাহত হইবে আমাদের চাঞ্চল্যের ইকান্তিকতার দ্বারা। যে সৃষ্টি-কাম্য অগত অহুগ বাঙালীর এ দেশের সমস্ত ধর্ম্ম-আলোচনের অগো-পন্যতে বার সার দেখা দিয়াছে, অগত সমস্ত ভাবে তাহারই অক্ষতুল্য আধাদের পক্ষে দ্বাত্তিক। তবে আভিকার সুপে হয়ত এই কথাটি চাঞ্চল্যের আছে যে, আমাদের পুঙ্খলিখ্য ভৌগলিক পরিবেষ্টন এখন পরিবর্তিত হইয়াছে, সমস্ত জগতের ভাবনা আর ত্রুটি আমাদের এত-কালের সৌম্যমুখ অস্তিত্তের আবগাওয়া-পুট জীবনের উপর নুতন রঙ ফলাইবার অয়োজন করিতেছে, এই অস্তিত্ত অয়োজনকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, তাহাকে সার্বক করিয়া তুলিতে হইবে;—জগত-বিকাশের অব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পক্ষে বিকশিত আর অগ্রগাম্য হইতে হইবে, নতুবা বৃহৎ জগতে উপভাতির, পরিবর্তে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকাংশ আমাদের থাকিবে না। বাঙালীর চিত্ত-বৈশিষ্ট্যকে বুজাইয়া ওজাবী-আলোচনের মতন কোনো-কিছুতে ভাব করিয়া দায় দিবার বা দেওয়াইবার প্রচেষ্টা আমাদের জীবনে যেখানে হইয়াছে, আমাদের জীবন সেখানে উন্নত, উৎসাহন-অক্ষম এবং নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে, জানি; কিন্তু বর্ণ্য সমাপ চিত্তে নিজেদের কুন্মের প্রকৃত তাত্ত্বিক বৃহৎ জগতের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা হইলে তাহাতে বাঙালীর স্ত্রিময় হইবে না, তাহারই একটা অস্তিত্ত ভজী মাত্র আমাদের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিবে। আর তাহা হইলেই, শুধু মূলমানে-শ্রীর কেন, বাঙলার সমস্ত অধিবাসীর জীবন-রক্ষ ফলে ফলে পড়ার পাতার সুশোভিত হইয়া উঠিবে, বাঙলায় পরোক্ষন বহু ভাবে ও দ্বারা বিকাশিত ও গবাহিত হইবার অবদান পাইবে।



# শিমূলফুলের বাথা

শ্রীকৃষ্ণদেব

সমাজ বাহন নাট দে আমার, কেউ তোলে না পৌষতে,

বুক আমি করে বাসি ভালো,

তবু পাখার এক ভরি' বন্ধু, তোমার গৌরবে

দীর্ঘ বুকের রক্তে জালি আলো !

দৈশান তোনের আঁধাবহানি ভয় যে দেখাও তাই,

কালবোশেখীর বড়াশালন নিষ্ঠা কুকে পাট !

মাথার উপর বহু ভাকে, কদ্র নাচে তাণ্ডবে,

বন্ধু, আমার এই ত মতোবলব !

চাই যে বিরাট বাড়ক-পিখার, চাই যে জলৎ পাণ্ডবে,

অগ্নি-বাহুর চাই যে আর্জব !

একল বেলা পিউলি হুঁপার মলম পুয়ের পান,

কুহু আমার চিৎকার তলে শায় না কোন গান !

ওরা আমার রিক্ত তরুর নিবিড়-বেদন-পঙ্কজে,

লক্ষীছাড়ার বাথার চাপি আমি !

নিকাসিতের ডাং বাজে রক্ত গোপন অস্থরে,

দলী কা'বেও পাট না দিবাঘাসী !

পথের পথিক চাও না মোরে, সবাই যবে' যায় ;

বন্ধ-পদীপু আগিবে একা গ্রাসি কাটাই চায় !

ওই যে হোবার দেখালকাটা: বাবলাবনের বকে গো

হুল ফুটেছে কুহু অভিমানে,

কাটার বাথার জন্তে ওরা আগুন ভরা ঢেকে গো,

কাটায় মরণ ধর বলি' মানে !

ওদের বুকেই বরার বাণ্য রক্ত দিয়ে আঁকা,

ওদের মুখেই অবাসুতের দরদটুকু মাথা !

বন্ধু, তুমি ফুলেই যেও কালবোশেখীর দাতাকে,

জুর্দেনেরি ক্রান্ত পথিকটিরে ;

সামবা ডির বরণ করি নিবিড় অসারারিকে

মলম বাতাস তোমার পাকুক মিহে !

বহুদ-বেলা-গোলাপ-টাণা ফুটুক তোমার পথে,

উষ-রাগের বিজয়-নিশান উড়ুক তোমার রূপে !



## অবগা

—গল্প—

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

মেয়ে আছি।—একটা চাকরি জোটাতে পারি কি না সেই কিসের।

চোটা-চোটা করবার মতো চরিত্রে আর বল পাই না। ছেঁড়া তোষকের ওপর একটা চুই-চুটা রাশার বুড়ি বিয়ে উপড় হ'য়ে গুপ্তচরী কাটিয়ে বিয়ে, ফিকলে এ দিক ও-দিক একটু হেঁটে আসি মাত্র,—প্রধানমন্ত্রী পার্ক, নরসিং পেনের মোড়ে চা-এর বোতল,—বড় ভোর ওয়াই এন্ড পি এ। লোকে বলে, কুড়ি কয়ে' কত'ই আমি বুড়ির বাব,—আমার বাবা কিছু ধর নি, ছবও না।

আমি মেয়ের তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখি।—হাতে কোনোই ত' আর কাজ নেই, গিলিঙ্গ পর্যন্ত লম্বা একটা পেন্সিল পেলে বিদ্যার চিহ্ন হ'য়ে তাকে চোটাচুট-এর মতো গিলিঙে ভবিষ্যৎকাম! ইম, বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখি, তেকরী ভারতের! চাকরি-চাকরি না জুটলে শেষ পর্যন্ত বেগুড় মঠে গিয়ে মাথা ছাড়া করব; চাকরি পেলেই বিয়েটা করে' বেশ তৈলমিত্তি নিরীহ দঃপাওী মনে' বাই,—কতটুকুই বা আমাদের চাচিমা!

এর মধ্যে এক দিন আমসিঁদেব মেসের কি মেসের সব বাসন-কামন নিয়ে গুরে' পড়ল। সবাই বলল,—আপনি ত' চুপচাপ বসে' আছেন, আমাদের বাস প্রাণ ক'বাবো মরবে নেই, বান একটা কিকি কোপাড় করে' মারুন দে!—

কি পুঁজুতে বেললাম। ঐ-গলি সে-গলি,—মনে হ'ল মিথো কথা; সেই কবে থেকে বীর তপসীর বেগে ভারত-বর্ষের মুক্তি পুঁজুতে বেরিয়েছি,—প্রমিকের মুক্তি, কেরাণীর মুক্তি, মুকের মুক্তি! মনে হ'ল একটা প্রায়াকার চাপা পটা গলিতে একটা নোয়া এঁদের বক্তৃত্ত ভারতবর্ষের প্রতিমা। কি-গিরি ক'ছে,—চারবালা, রান-মাগি—যেন প্রতিমতা কাকুতি,—অক্ষমতা!

পুঁজুতে পুঁজুতে এসে সেলাম শাবুরিগা-বাটা বাইলেন। মোড়ের ওপর তেতলা বাড়ি,—সবর দরবার কাছে ~~একটা~~ মহিলা একটা হিম্মতানি মেয়ের কাছে থেকে বুঁটে তপিয়ে রাখছেন। গুপ্ত তখনো প্রায় পুরোপুষ্টি।

মাসীমারা যে এখানে আছেন এবং এলাড়ারই,—এরকম একটা অন্তর্জাত আমার কান এঁড়ায় নি। কিন্তু তখন বলসেই বলশেতিকদের মন নিয়ে মন,—অভিভ্যাস কীকনের ওপর আমার বক্তাব্যক্ত একটা বিতৃষ্ণা ছিল,—তাই মাসীমার মাসীমাত্তেও আমি আসিনি। আলামান থেকে মাকুতুমিতে ফিরে এসে যখন মাকে ফিরে সেলাম না, তখন মাসীর দিকে একবার ফিরে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, থাক' দে; মোগাওঁবে মোগোমণারের মনোভাব আলাভ করবার মতো বুড়ি আমি আলামানে রেখে আসিনি।

কিন্তু আশ্চর্য, এই চোদ্দ বছর পরেও মাগুমা আমাকে চিনে ফেলেন। একেবারে দুই উৎসুক বাত মেলে পথের কাছে নেমে এসেন,—মা যেন তাঁর দীর্ঘ প্রতীকার ককলা-দিক অধীরতাটুকু মাসীমার মুখে রেখে গেছে! রইল পড়ে' বুঁটে গোলা,—মাসীমা আমাকে একবারে বাততে ভড়িয়ে বাবামা বিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এসেন,—নিংবে এসেই গলা ছেঁড়ে ডাক—ও ব্রহ্মর, ও হেনা,—জাখ্, এগে তোদের কিতনা এসেছে!

কিতনা! যেন তেতলা বাড়ির তেজিগটা ঘর থেকে একসঙ্গে তিসারগটা ছাপুয়াত বেলল। আমার নামটা যেন বোমা নিয়ে তৈরি।

বুহুঁরের মধ্যে তিন বিকের তিনটা মিঁজি দিয়ে একসঙ্গে ছোট-বড়ো কতগুলি প্রাণী যে নেমে এসে আমাকে ধরে দাঁড়ালো তার ইয়তা নেই। মনে হ'ল, এরা যেন এই ঘটনার আগে, নিখাস নেওয়ার আগে পলাতন কিতনাও গুল আলামা বিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। যখন আলামান থেকে



পশম কলকাতার এসে পা দিই, তখন কোথায় ছিল এতগুলি  
দ্রুপ, সেজে স্নেহময়, কল্যাণকামনা লাবণ্যময় !  
দৈনিন্দিগের ভাগ্যকে নিভুর বনে' তিরস্কার করেছিলাম,—  
কোথায় ছিল মনোমার বাগ-উপাধান ! আমার চোপ  
চিরে' উঠলো ।

মানীমা কাগজমাথা হুগ্রে করেন—বহরের কাগজে কত  
দিন আগে— লাব হ'বছর হ'ল—কেনেছি তুই ছাড়া পেতে-  
ছিস, কত চোকে খোঁজ,—কোথায় তোর চমিদ নেই ।  
আচ্ছিস কোথায় ?

চেনে বয়াম—মেলে । এখন একেবারে মেঘ হ'য়ে  
গেছি কি না ।

মানীমা বলেন—কেন, তোর মানীমা কি বাদি হ'য়ে  
দেখে ? আমার ভালোবাসা দিবে কি তোর বাসা বেঁধে  
দিয়ে পারি না ?

বল' মানীমা আবার করে' গালে একটি ছোট চড়  
দিলেন ।

বয়াম—মেনের ভক্ত শি'পু'ক্তে বেরিয়েছিলাম, কি'র  
বদলে মাদো শেলাম ।

আমাকে খিরে দত্তগুলি প্রাপ্তি পাড়িয়েছিল, সবাই  
আমাকে প্রণাম করবার ভক্ত ভিক করে' এসিরে আসতে  
লাগলো । আমি খেন দুত্বার মতোই ভরজব ও মগিমায়,  
অগত দুত্বার মতোই বয়াম'কবর অব্ব-আখীর । ৯টে'  
বেগাম, বয়াম,—প্রণাম করে' মজকে গ্রন্থেরে সর্বাণা  
দেবে,—আমি এট দোঙ্গলা লহ করিনে । একটু জুদ্বীত  
৯৩, তর্জব হও !

একটি ছোট ছেলে, তার ত' লবে পাঁচে পৌছেছে কিবা  
চবে—চই চোপে পুরি ডেট লুচ্ছে—আমার হাত ধরে'  
বলে—তুমি আমার কিতনা ?

বুলাম কিতনা'ব ব্যাতি এই বিত্তটির কাছেও  
পৌছেছে । ছেলেটির নাম আগে ছিল কলো—এখন  
হয়েছে কব্ ; ওর মেজদি কেনা ওর নাম রেখেছে ।

কব্ আমার আবার না নিয়ে করে—আমি তোমার  
মতন হব, কিতনা !

আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বয়াম—আমার মতন  
কি । আমি ত' একটুখানি,—আমার চেয়েও তের বড়  
হবে ।

কব্ বলে—তবে আমাকে তোমার কাঁধে চড়িয়ে দাও,  
তোমার থেকে একুনি বড়ো হ'য়ে যাই ।

ভ্রমর হেনে বলে—নাম গুটী ছেলে !

কব্ বলে—মার কিতনা বৃষ্টি গুটী নয় ! গুটী বলে'ট  
ত' গুটীক এতদিন আটকে রেখেছিল,—গুটীমি কবলে  
আমাকে যেমন তুমি তোমার স্বপ্ন বন্ধ করে' রাখ ।

মেসোমশাইরা তিন ডাই,—বাড়িও তিন-তলা । মেসো-  
মশায় মেসো—আলিপুরের ভক্ত,—বড় বিনি, তিনি  
গোটা পাঁচেক কলার পনির মালিক, ছোটটও  
বাবলাবার ।

একদমবত্তী পরিবার,—সেইটাই আন্দর্বা,—প্রতি বেলায়  
পাত-ও পড়ে একবার । বড়ো'র লাতে বারোটি লজ্জান, মেসো-  
মশায়ের দশটি, ছোটটি বিভেতে ঘেরি তুলেও দোড়ে  
পাড়িয়ে পড়েন নি । তা ছাড়া চাকর-বাকর বহু-খানসানা  
মালি-মেফো ত' কতোই আছে । সব চেয়ে আন্দর্বা, সব  
কটিই বেঁচে আছে,—আবু আর বিত্ত এসের চালুক । এবং  
ওমেগা !

ভ্রমর আমার মেসোমশায়ের বড়ো মেয়ে ।

লজ্জানকিতে মেসোমশায়ের ঘরে তলব পড়ল । হেনে  
বলেন—নিং ভোঁতা কবে' এসেছ ত', চরকা নিয়ে ? তা  
বেশ ! আমাদের চরকার তেল দিতে চাটবে না-আশা  
করি ।

আমিও হেনে বয়াম—চরকার চেয়ে চরুই আমার বেশ  
পছন্দ । বদিও ইদানী চরু—

মানীমা বলেন—কব্ হ'য়ে গেছে ।

—বাও, একে বী-দুব খাইবে বেশ একটি নখর তাকিলা  
বানিয়ে ফেল,—সাপকে বদি বানানোটা কম কুতিবের  
কথা নয় ।

বলায়—দড়িটা কি কাপনি মারাম্বক মনে করেন না নাকি ? দড়ি কাপনাঘের হাতে দৃঢ় করে' বসি আছে বলেই ত' এত ভয় ।

মেঘেশ্বরীয়ে হেসে বলেন—যাও, ক'দিন বেশ ক্রিয়ের নাও এখানে, ভ্রমেরের একান্ত শোনা, ভ্রাট'র গান—মনটাকে ধুয়ে একবারে মাক করে' ফেল । দিনেমা ভাপ, হুপি কাট', বুঝাও,—বেশ নিস্তর হ'বে যাও ।

বলায়—তাই চ'রে গেছি । তাবনা নেই আপনায় । এখানে থেকে আপনাকে অভিব্যক্তি থেকে ভিন্নত্ব করব না ।

কোথা থেকে কোথায় এসে যিনে' খেলায় । ছিলাম যাবদান নির্বস্ত্রের তেলতুল গুনিবার পর প্রান্ত—এখন হ'রে আছি পুত্রবিত্ত,—দীমান্ব, নিশ্রাণ, অঙ্গভীত ! পেলির তাইলার্ক ওয়ার্ডবর্কের হ'রে গেছি কিবা হাড়ির । যৌবন হারিয়ে বুড়ো প্যাতি হাট তুলছেন ।

প্রত্যেকের চক্ক—মানে ঘাঝা বহর—এক একটা আলাদা ঘর,—এক প্রত্যেক ঘরেই আমার নিমন্ত্রণ । তার কারণ এই নয় যে যোলা বহর আগে পুঁপু আমার পকেটে পিণ্ডল পেয়েছিল, আমি চোখ বহর বহর কালাপানি পেরিয়েছিলাম,—তার কারণ, আমি সবাইর চোখে একান্ত করে' আলাদা, সবাইর কাছে তাই একান্ত করে' আপন । আমাকে নিয়ে সবাই বাস্তব,—আমি ভাতের প্রথম গাঙ্গ বুধে তুলবার আগে লাটটা কপালে ঠেকাই পাই তাই উৎস্রু হ'রে দেখে,—আমি আমার বা হাতের কড়' কাণ্ডলের নোখটা অনেক বড়ো রেখেছি, এবং সেই নোখ দিয়ে অঙ্ককারে একজনের চোখ কাণা করে' দিয়েছিলাম—

সকল থেকে রাত একটা পর্যন্ত এ বাড়িকে মনে কর একটা ভাবনা,—যেন অনবরত কল পুড়ে ;—পাঁচ বছরের ছেলে কব'ই হচ্ছে একবলের কলিজা । আমি কয়েকো বহু বনে' গেছি । কব' মেয়ে-পুত্র সবাইকে মাটিয়ে রেখেছে ;—হ'লনা বহু হোঁফে, বিচ্ছেদিয়ে বোকাই চড়ে, মোটরে ভাইভাতের কোলে বসে' ভুইল না ধরলে ওর কোথায় যাওয়াই হয় না,—যদি কেও ফেলে

তার কলকল দেখে, কাঠ মাঝ পেরেক দিয়ে এলিন হানায়, ঘোরের পাশে লুকিয়ে থেক সমস্ত বাড়িকে তোলাশু করে' ভাঙে,—পরে গুটী-মুটি বেরিয়ে এসে বোহালু প্রস করে—কাকে খুঁজছে, যেহুপি ?—কব' সেন বাংলায় পলি মাটি দিয়ে তৈরি নয়,—রাস্তার বরক দিয়ে, কঠিন, ছিন্ন গুর্নহনীর,—ওর গুই চোখে যেন বনা দহুতা আছে,—ভীক কুপার ! ও যেন তথিবা ভারতের বরপুত্র,—কপালপানি !

ইলসারে আমিই নিঃশুঃ,—তাই সবায় কাছেই শূন্যীয় । আমাকে পেয়ে ওরা সবাই যেন হাঁপ ছেড়েছে,—ওদের আলার হুবাও পানীর সুইতল হ'রে উঠেছে,—ওদের ঘরের বাতালে হুবাও এসেছে, কে-কথা বলবারো নয় তুলবারো নয়—সেই কথা যেন হুঁক খুঁজছে । বকী ভাষা, হুবেথ তার রক্ত !

ভে-ভলা এক-তলা আমি টানা-পোড়েন করছি । মেটামিটি সত্যোক্তি বোপ'রি,—হুতরা চোখে আমার লাভকোণ থাকেনা । আমাকে ওরা বলে—তুমি যিনে খুঁমিযো, ক্রিতি-বা,—তুমি তো যানি খুঁমিযেছ যিনেই,—রাতের খোরাও এবার ।

ভ্রমেরের ঘর খোলাই ছিল । গিয়ে বলি—এপ্রাক শোনাও, ভ্রমর !

ভ্রমর তার খাটের ওপর কব' একটা গুটীকেন্স উলুড়, উলুড় করে' কি সব জিনিসপত্র নিয়ে একবারে বিভোর হ'রে আছে । আমাকে দেখে খাট থেকে লাফিয়ে সোলা গাড়িয়ে পড়ল । যেন বেশ একটু বিস্তর রয়েছে । বয়ে—আজ আর এসাজ নয়, ক্রিতি-বা,—এসাজের চেহেও মিষ্টি বাতনা আছে, কব'বে ? বোম তা'লে ।

ভ্রমর মাথার চুলটা ঠিক করত-করত কের বয়ে—চা বাবে ?

—এই ভাত খেয়ে এলাম । তোমাকেও নেয়ে-খেয়ে নিতে বজেন মাদীমা । তুমি এমন যাও । তোমার এসব জিনিসপত্র আমি পাহারা দিচ্ছি । তুমি খেয়ে এসে পর মিষ্টি বাতনা শোনা বাবে'খন ।



হুম্বর আলমারি থেকে পাড়িয়ে দিক বার করলে,—

তেন নিজে পিঠের ওপর মেঝের মাথের মতো কৌশল দিয়ে একটু এদিক ওদিক ছোট্ট, দোলনার ঘুমর ছেলেকে একটু আদর করে' বেতে-বেতে বলে—  
তোমার ওপর এই সবের ভার রইল সুঁকি শোবার,  
সুঁকি দেখার নয়।

বলে' একবার ছেলে ও আরেকবার বাটের ওপর  
বিশৃঙ্খল চিনিসক্তির দিকে করল দৃষ্টিপাত করে' চলে' গেল।

হুমর যেন পরত-মেঘের বিভাৎ বিয়ে তৈরি,—ওর মধ্যে  
এমন সেই নিখল নিয়ানক উজ্জলতা,—হুমর যেন মলুকুর  
ওক নিভরল ছিন্নভিন্নে—সেই উদাত্ত ওর ললাটে।  
এসাতের মাঝে ওর অলম্বিত নেই, পানে নেই প্রাণ,—  
কোনো উৎসবে নেই উৎসাহ! ও ভ্রমে হুমর নাম  
নিষেধে।

আহবতী বলে হুমর এসে হাজির,—হাতে এক বাট  
চা। পরে পা দিয়েই কলকর্তে বলে' উঠলো—তুমি এ  
চোরাগিটে বসেছ, কিত্তি-না! বাট! চাটা হাতে করে'  
এইটুকু খায়ে' আমার কী ভালো বে লাগছিল—

—তুমি কি পাগল হয়েছ হুমর, এই চুপ্ত চুটোর  
চা—ভাত খেয়েই?

—চায়ে তোমার অর্কি আছে তা'লে। থাক্,  
বেধে যাও!

হুমর হুম্বর করে' সীমন্তে দিম্বর পড়লে,—বুধে  
শোণ্ডিলেবার নিখল আভা, চুই চৌতের কোলে যেন  
বাণিত অকতা ঘুমিয়ে আছে,—ও'টি হাতে যেন ক্লাস্তির  
পাতলতা। সেই ক্লাস্তিই যেন ওকে কমলীর  
করেছে!

ছেদের দোলনার চোট ছুঁটি ঠেলা দিয়ে বলে—  
গিলে আদছি। একম বলে'।

হুমর এগো খেয়ে। চুপ্ত আর ছুঁয়ে এলো।

বলার—তোমার মিষ্টি বাজনা শোনাবে না?

কাগজের জুপ থেকে কি-একটা বের করে' হুমর  
বলে—ওনুবে এল। এল এগিয়ে।

এগোলাম। হুমর আমার চোখের কাছে একখানি  
ফটা এনে ধরল। মই হ'য়ে গেছে,—বহুদিনকার  
নিশ্চয়ই,—কিছুট ভালো চেনা যায় না। তবু আশা  
করে' বলার—নীরেনবাবু? এ বাজনা ত' খালি  
তোমারই কাছে মিষ্টি!

হুমর বলে—তোমারো কাছে লাগবে, তবু মিষ্টি নয়,  
মিস্টিক! ন ভিগিট করে' হস্তা ন বলাও।

অধাক হ'য়ে বলার—তার মান?

—বাক্য হ'য়ে আশ্বাসনে থেকে এটুকুরো মানে তুমি  
করতে পারবে না কিত্তি-না? সোজা-হুদি মানে, নীরেন  
আমার বন্ধ ছিল।

কেসে বলার—তোমার টেন্ড্যান আমার টেন্ড্যান  
কমিয়ে দিয়েছে, হুমর। 'ছিল',—এখন আর সেই  
তা'লে? বাটা গেল।

হুমর ফটাটা চোখের কাছে তেমনি ধরে'ই আছে।  
অ'টুকুরে বলে—না, এখন আর নেই। সেইটেই  
বেদনার।

—কেন নেই?

—রেপুটেশন্ কিত্তি-না, রেপুটেশন্। তুমি ওগেলো  
পড়েছ? কাপিয়েছে মনে পড়ে?

কেসে বলার—যদি দস্তা ন ভালো ন হ'য়ে কবে ওঠে,  
সেই ভয়ে দরজা ভালো দিয়ে তাকে বাতিল করে' দিলে।  
এই তোমার মিষ্টি বাজনা, হুমর?—থাক্, এ বিষে  
চেষ্টাও তেতো।

হুমর জালীর মতো বলে—এ বিব নিগামিধ, কিত্তি-না!  
সেইটেই বাজো। আজো, তুমি এ বাপায়ে প্রত্নি এত  
নিকংসার কেন? তুমি ত' কোনোদিন ভালোবাসার বোঝা  
করনি, বোঝাতও করনি। তুমি কি একে অস্তায় মনে  
কর?

সুকিরগানা করে' বলার—অস্তায় নয়, বৃথতা।

—হ্যাঁ, বৃথতা! নইলে তুমি একটা যেরের লজ্জ কেউ  
কল্মসায়না করে,—দীর্ঘকাল নিয়ে ছুঁয়ে খেলতে বসে!  
ওল্লাম বুড়ো মাকে কেলে মাঝেমাঝে খালি হ'য়ে সাউথ  
আফ্রিকা যাবে।

## ঐতিহাসিক কথার সেন গুপ্ত

—তুমি আবার হাসিলে, ভ্রমর। এখনো খাবনি তা'লে ?  
...বাটা পেল।...আচ্ছা, আচ্ছা, গিড়গিড়, গিড়গিড় ভ্রমর,—  
তোমার বন্ধুর নাম কি নীরেন ক্রুশকর্তী ?

—হাঁ, হ্যাঁ,—ভ্রমর লাফিয়ে উঠল—তুমি কেন তাকে ?  
হৃদয়ের দোহাটা চোখের, পাখারি চোখের কোমলবিন কোট  
পায়ে দেয় না, মোজা পরে না,—খালি কেভেন্‌এ খায়,  
ডান দিক দিয়ে মাথার অর্ধেক অবধি টেড়ি কাটে। তার  
সঙ্গে তোমার হবে দেখা হ'ল ? বিয়ে করেনি এখনো ?

—মেসে 'দেখা হয়েছিল,—খোদ হয় দিন কয়েকের  
কল্প। পরে কোন্ দিকে যে পাল খুলে' দিল কেউ  
জানে না—

—কেউ জানে না ? আমার তারি ইচ্ছা করে, মাথার  
মে আত্মক—এমনি নির্জন গুপ্তে—টিক ঐ চোখেরটিতে  
এসে বসুক, তাত খেয়ে এসেই চা চাক'। কেন তা হয়  
না, কিত-না ? জীবনের একটা চোখাখার মোড়ে এলগ  
মে ট্রান্সিক পূর্ণনের মতো আমার গাড়ির দাঁত বন্ধ করে'  
দেবে না,—এ তার কি অমাত্মিক অভিমান !

—তুগাও ত' হ'তে পারে, ভ্রমর ?

—হ'তে পারে। কিন্তু কেনই বা সে যথা করবে ?

—আমাকে ত' সে কোমলবিন চার নি। আমি তাকে  
বুকেই পারলাম না, কিত-না। আমার আঙুলটির সঙ্গে  
তার আঙুলটিয়ে আত্মীয়তা চর নি,—

—তবু, ভ্রমর যে প্রতিবেশী ছিল সেটা' আক বেশি  
করেই বুঝে।

—হ্যাঁ খুব বেশি করে'। বাড়ির সবাইর কাছে ছিল  
সে এন্‌দ্রাইফ্রোপিতিকা, আমার কাছে সে ছিল শুধু  
সাইফ্রোন্—আমি তার মে-চোখের আঙো মনে কর্তে  
পাড়ি, কিত-না। কিন্তু দাতাই হয় ত' পারি না।

ভ্রমর ছেলেকে ঘোলা দিয়ে এসে ঘের খাটের ওপর  
বসল।

বরাস—এও ত' হতে পারে, ভ্রমর,—যে সে মোটেই  
তোমাকে পাথর মত করে' ভালবাসেনি,—এমনিই তোমার  
পথের সাকে খুলির মত উড়' এসেছিল, এমনিই আবার  
খুলে' গেছে।

—হৃদয়ের মত ;—কোন হ'লে এসেছে শুধু। আমি  
ত' তাকে তাই চাই। সে অস্ত্রের খাটোয়েন্‌টেন্‌স,—  
তার সঙ্গে ফের চা খেতে ইচ্ছা হয়, এক সঙ্গে বসে হাব  
পড়ি, এক দিন এক সঙ্গে 'টিকান' ক্রেনে আসি। সে সব  
চোরে আমাকে বেশি খোকে, সে সময় পূর্ণবীর আত্মিক  
গতির সঙ্গে পা ফেলে চলে, তার সাকে আমি নিকট  
বেশি করে' আত্মক তারি বখেই ত সে আমার বন্ধ।  
আমাদের গুই পানীয় এক পানক। সে নাই বা এল  
সম্প্রদায়ের মত, সে মোটামুটি প্রদীপ নিয়ে আত্মক,—আমি  
তার বন্ধ, এও আমার একটা পরিচয় চোকে। তা কেন  
সম্ভব নয়, কিত-না ?

—তার উত্তর ত' তুমি আগেই দিয়েছ। এর আরো  
একটা উত্তর হ'তে পারে, পুরুষের চাওখাটা তারি পুৎ,  
মেয়েদের মিহি।—তোমার খাটোয়েন্‌টেন্‌সে তার  
প্রয়োজন নেই।

—তুমি আমাকে 'ক' ভাবছ জানি না,—কিন্তু তার  
সঙ্গে আমার দেখা করার সামাজিক দরকার আছে।—  
হয় ত' শুধু আত্মকের ভগ্নই। তার কথা আমার গাধট  
মনে পড়ে না,—শুধু আত্মক চোখে, একেবারে চোখে মনে  
হ'ল কিত-না, তাকে আমি ভুলিনি। আরেকদিন হয়েছিল,  
—বেধিন চোখে তুমি এলে। সেই চোখে আঙাটাই সেদিন  
তারি রোমাটিক লেগেছিল।

খানিক বেমে চোখে ভ্রমর বলে—আমি আমার খানাকে  
খুব ভালোবাসি, সে-কথা বলাই বাহুল্য,—আমি ফোরসাইট  
শাণ্ড পড়লও বুঝিনি, আমি Ireneও নই, Fleurও নই,—  
কিন্তু জান কি কিত-না, আমার খানী খানী বটেন, বন্ধ  
নন্—বন্ধ তপস্তার খানী ; খিনা মূল্যের বন্ধ নন্। কিবা  
টিক তার উল্টো। আমি ডাক্তার চাই বটে, হাট-পেশালিট,  
—কিন্তু সঙ্গে একটা হাট বন্ধ লেগেই বেশ হয়।

ভ্রমরের ছেলে তখন কান্ডে হুক করেছে।

তাকে শাস্ত করে।

উঠছি, ভ্রমর বলে—তুমি মনে ভেবে না, তার সঙ্গে  
দেখা হয় না বলে' আমার খুব হয় না,—তা হয়। শুধু সে  
যেন বিয়ে করে, যেন তত্ত্বলোক যেন' থাক,—এইটুকু।



হেসে বসাম—মেঘা ঝুলে ভ্রমতঃ  
কাছে পাঠিয়ে দেব'খন ।

পড়ে আঁখি তার চাকর চেঁচায়ে তলে বসে' পায়ের শাউয়  
স্বক'স্বর্জি দেয় ।

হঠাৎ সুখাত্ত বলে—আমাকে একটা চাকরি ছুটিয়ে  
দিতো পার, কিত-না ?

খেন শাহাড় থেকে পড়লাম । দার শালের এক ঘরের  
পাড় বেচে' একটা লোকের এক মাসের ভাত ছোটো মে  
চার চাকরি ? ঠাট্টা আর ক'কে বলে ?

কিন্তু ঠাট্টা নয় । সুখাত্তর মুখে মালিন এসেছে ।  
বলে—আমার দ্বারা পত্রীকার সিংহবার উত্তীর্ণ হওয়া চলবে  
না, কিত-না । তিনবার ঘায়েল হয়েছি, —আমি  
আর বৌয়ের কাছে অপমান সহিতে পারি না । একটা  
ছোটবাটা চাকরি নিয়ে কোথার ভেঙ্গে পড়তে ইচ্ছা করে ।

—বল কি সুখাত্ত ?

—সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পেকবার লুঙ্গি পরে' আমি  
বেরিয়ে পড়তে চাই । বৌকে ছেড়েছিলেন বলেই ত'  
তুচ্ছাভেনের ছেলে সিদ্ধাপ হ'তে পেরেছিলেন, কিত-না ।  
আমিও আমার বিলাদের-বস্ত্রটিকে কেনে একান্ত সস্তা হ'য়ে  
বিকিয়ে খেতে গাই,—কেউ নেই আমার,—তবু আমি আর  
আমার অতুল ভবিষ্যৎ । কোনো মতে কাজ করে' ভেলে  
দিয়ে পড়তেও চাই, কিত-না, কিন্তু এরকম জগো হ'য়ে  
বেতে গঠি না ।

বসাম—মাসে তোমার তামাকেই এক প' টাকা  
পাশে—

—আর, ছুতার কানিতে পলাশ । তাইতেই ত' সব  
তেতো লাগে, কিত-না । আমার একবারে আলাদা হ'য়ে  
বেতে ইচ্ছা করে,—ছোটো সংসারে ছোটো গভীর মতো একান্ত  
স্বার্থপর, একান্ত একেলা । একটা ছোটবাটা চাকরি তোমার  
হাতে নেই ?

—আছে ।

টাকা মাইনে ।

সুখাত্ত খেন মরীয়া হ'য়ে উঠল—দাও কাড়,  
আমি নরদা পরিচার'কসু,—

—তোমার শালের কোণঠা মাটিতে পড়ে' পেছে, কুলে'  
নাগ ।

কে এই নীরেন চক্রবর্তী ? সে একদিন ভ্রমরের নিকট-  
বর্তী হয় ত' হয়েছিল, কিন্তু আমি ত' তাকে জানি না,—  
আমি ভ্রমরকে ভাঁওতা দিয়েছি ।

তবু মনে হয় মনে-মনে হয় ত' এই নীরেন চক্রবর্তীকে  
চিনি । আমার মনে এক চীরবাদা কুখশাহুর পরদীক্ষিত  
প্রাণমা আছে,—সে আমার ভায়তবর্ষ ; তার পাশে একটি  
শ্রোতাল মুখ ভেসে উঠল,—দুটকার, পক্ষীরূপ তার আকৃতি,  
—মাথার তার ঘনিমা-দুকুট ! প্রেমের জন্তে সে ত্যাগের  
তপস্বী হয়েছিল ।

তুচ্ছ মেয়েই ত' বটে ! ভ্রমর তার ভায়তবর্ষ !

নীনেরের সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখা হবে না জানি ।  
সে হয় ত' এখন কোরাই, হয় ত' বা ন্যাই ! তবু সে আমার  
বন্ধ । সে মাথাগাতীতের ধস্ত সাধনা করেছিল—মন্দিরে  
পাখানের বেলীকে সে দেখী বানায় !

সুখাত্তর করে আসি । সুখাত্ত মেলামশারের দাখার  
ছেলে ।

—কি করছ, সুখাত্ত ?

—এসো এসো কিত-না । কি আর করব বল ? সেই  
ল'দরুর পাড়ি দেবার জন্ত পাত্রে থেকে লগি ঠেলছি ।  
ইজুটিটেবলু পেট-অফ্, দুখত কর্তে-কর্তেই অত  
দাখ ।

বসি এক পাশে । ভ্রমরের ঘরে একটি বিঘর দায়িত্ব  
আছে,—এর ঘরে একবারে রৌদ্রের প্রবর্ততা । হঠাৎ ঘনে  
হয় বেন মিউজিকের এসেছি । হাত থেকে মেখে পর্যন্ত  
কক'ক' করছে,—কান্দার থেকে বর্ষা ত' আছেই, হুহু  
আচন্দ্রল্যাও তার কিতুরিমা পাঠাতে তোলে নি । সুখাত্ত

অখ্যাত বাসু। কোলের ওপর কুণ্ডে নিয়ে গাছবয়ে  
বলে—বাসু! তার হাত ত' শক্ত নয়, কিন্তু ছোটখাটো একটা  
ইকুলমুগারির যোগ্যতা হয় ত' আমার আছে। এবারেই  
আমার শেষ চান্দ। এবারে লাফাতে না পাবলে আমি  
চৈতন্য হ'য়ে যাব।

—মালকৌণ্ডা বাদ্যের সময় সেই চৈতন্যটুকু পাক্লেই  
ত' মাঠা চুকে যায়।

—তুমি ঠাট্টা করছ, কিত্তি-লা, কিন্তু তুমি জান না,  
আমি কি অসহীষ! বাবু-বো, তিনটে রোগা ডেলে,—  
এত দূর তবু চেহারাটা ঠাণ্ডা নেই। মাসের বরাদ্দ টাকার  
আমার চোদ পুঙ্খের প্রাচুর্য হয় বটে, তবু সত্যি আমার  
মনে দুঃখ নেই। আমার গরীব হ'য়ে যেতে ইচ্ছা  
করে।

বরাদ্দ—এবারে কোলতু গুয়েতু এসেছে,—টেন্সারের চার  
একদ্ব। ভালো করে' বাসু! বুক ভড়িয়ে নাও। ওরু  
দি কিঞ্চৎ—এর মত সুললিত হল অন্যে পাবে।

অখ্যাত বোকার মত আবার বটের ওপর কুঁকে'  
পড়ে।

হেনার সঙ্গে কার' তুলনা দেব? গৃহস্থের গৃহকালে  
প্রতিমিত বীণনিবায়, না মেঘমান বিদ্যাবিত চন্দ্রানেকের?  
কি বলে' যাকানো যায় ওকে? অসিদ্ধ রজনীগন্ধা, না  
গুপ্তীশিকিত কুব্জগা? ওকে যাকানো যায় না,—বসন্ত ও  
ধরা বিতে পেলেন। ও একটা আইডিয়া!

অমরের সৌন্দর্য্য তার সুখের মৃগাকতার, হেনার মাধুর্য্য  
তার কদমলে!

কিন্তু তই চোখে ওর প্রতিভা ও প্রতিজ্ঞার দাপ্তি!  
ওকে ভাড়া যায়, যাকানো যায় না।

ওর ঘরে এলে মনে হয় বেন জুয়ার এসেছি। সমস্ত  
ঘরে বেন টোরাইনাটু,—সব সময়। ওর ঘরের সব গুপ্ত  
জিকা,—ওর চেহারা একটা স্নানাত নির্মলতা আছে।  
ওকে দেখলে চুই করে' মনে ওর বেন প্রতিমিত সন্ধ্যাবেশে

একটি নীলধারা নদী দেখছি ও বেন নীল আকাশের  
একটি স্ফেট!

যত নয়,—মন্দির। কোণাও এতটুকু আড়ম্বর নেই,—  
দুর্লভস্বভাৱা ওকেও অনির্গতনীর করে' ফুলেছে। শুধু  
হুটি চোয়ার, পক্ষিমের দেয়ালের দ্বারে একটি ছোট গোল  
টোকা, গ'দানি বই,—উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে একখানি  
নীচু খাট,—খাট থেকে ওর ত' শুধু বায়ো ইকি উঁচু,—  
তোষকের ওপর সবদের চাবব পাতা ছাব তার ওপর  
কতগুলি ফুল!—হেনা গরব ছাড়া পরে না,—গরবে ওর  
পাকু নেই।

—কি করছ, হেনা?

—আরে, এলো কিত্তি-লা! কি আর করব?  
পড়ছি।

—আজকে এমন একটা শুভসংবাদ পেয়ে  
পড়ানি যে?

হেনা অল্প একটু হেসে বলে—সেই শুভসংবাদে কোনো  
উদ্ভেদনার আশ্বাস ত' পাচ্ছি না, কিত্তি-লা,—বরং একটি  
পক্ষিমতা পাচ্ছি। আমার এই ছোট ছুটি ঘর আকাশের  
মতো বেন পরমবিস্তার লাভ করেছে। একটা ভাবি  
হুম্বর বই পড়ছি। মেয়েটি বলছে—তুমি ভগ্ন কোরো  
না,—আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে তোমার নিঃসঙ্গতার বিপর্য্য,—  
তোমার লাঞ্ছনার সঙ্গে আমার লাঞ্ছনার!

উল্লসি কেটে বলায়—শেষ পর্য্যন্ত মেয়েমিয়ার মত  
নিগেন তা'লে? যদি মত না দিতেন?

—মত না দিলে আমিও তেমন, সেই মেয়েটির মতো  
তার হাত ধরে' বলতাম,—আমরা পরস্পরের স্পর্শ থেকে  
বঞ্চিত হলাম বটে, কিন্তু এই বিচ্ছেদই আমাদের মনুষ্যের  
স্পর্শময়ি হোক!—নাহীর সত্যীথকে লগাই সম্মান করে,  
লম্বব বলে' বিদ্বাসও করে, কিন্তু নাহীর প্রেমের প্রতি-ই  
যত বিদ্রূপ। তাঁরা বলেন, নাহী বের করতে যান বটে,  
কিন্তু ভালবাসতে জানে না,—সে তার গঠনগত অসম্পূর্ণতা।  
আমি সেই নিঃসঙ্গতার ব্যাক্তরূপ হতাম,—আমি প্রাণ  
কহতাম কিত্তি-লা, যেমন অতিচারের চেয়ে সত্যই বড়,  
তেমনি সত্যীথের চেয়ে কড় প্রেম—যে প্রেম ডগদগ





আছে, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! তুমি জান না, এই গুণ সহ  
করবার সাধের অত্যাশ্চর্য্য লম্বা স্বস্তি শীর্ণ, বিকৃত হ'য়ে  
যাচ্ছে। শত্ৰুতলা যেখানে উপবনশাসিনী, তার চেয়ে  
উজ্জল,—শত্ৰুতলা যেখানে উপলব্ধিবিধি! পাকতীর চেয়ে  
অপূর্ণ!

—কিন্তু আট সি এম-এর চেয়ে শেষকালে আই এল  
দিকে বরষীর মনে ক'লে?

—তুমি আমাকে আর চানিয়ে না, কিত্তি-না!  
আমি পরীক্ষকের পার্যাদটির দল একটা এম্ এ  
হয়েছি বলেই ত' আর জানা গজাইনি, বাবার আপত্তি  
ছিল ত' সেইখানেই। তিনি বলেন—প্রেম পেট ভরে  
না।—কিন্তু যেখানে ত' ভরে,—সেই উত্তরটা সেদিন  
বলে তারি যেখানে গোনায়ে, বলিও নি। যিনি এই  
পেট ভরাবার ভেঙেট পায়ুটায় উজ্জ্বল জাকবের ঘরে  
বসে গিলে। ভাতার অখণ্ড গুণ হার্ট-ডিজিঙ্ক্ গারিয়ে  
নিচ্ছেন। কিন্তু জান কিত্তি-না, আমার জীবনের চাহিদা  
তারি দানাদিহী,—এখন মনে হচ্ছে কিছুই হয় ত' আর  
চাই না,—নিখাসের অস্ত্র পরিমিত বাণ, দেহব্যয়নের অস্ত্র হয়  
আতার! প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় না আমি, পরমাত্ম নহ—  
মানে প্রেমের প্রগাঢ়তা যোগে ঢেকে না,—  
মানে, যেখানে পরম্পর পরম্পরকে পেয়ে ফেলে, পেতে  
থাকে না।—একটি ছোট নীচ, হু'টি কোটা অ্যাবিনীর,—  
মার ধরীর খুলি! তোমার স্বাধীনতা পড়া আছে,  
কিত্তি-না?

সোমা বসায়—না। লম্বা হয় নি।

—আমার আত্ম কবির সঙ্গে গুর মেলাতে ইচ্ছে  
করছে—

বহন মনে হিনো আপা

বহন এক কয়েক

বহন আপন মনে:

বন নহ, বান নহ, একটু বান

ক'রেতু আপা।

বাহন মনে হিনো আপা

বন-আনো গোপনিত মনোহর আপা

চাহিলে বহন আপা হিনো আপা

হোমের প্রথম আপা হিনো আপা

ভাবের বহন আপা

ভাবের বহন আপা

বন নহ, বান নহ, একটু বান

ক'রেতু আপা।

বসায়—স্বাধীনতার বান একটু নহ,—লম্বা  
পুণিহিতে। তোমার বান দেখলে তে-উলা, না দেখলে  
পুণিহিরে লম্বা!

হেনা হেনা বসে—ও হচ্ছে কবির ideal existence।  
আমি, কিত্তি-না, আমিও একদিন কবিতা লিখেছিলাম,  
ক'লে?—

বহন মনে হিনো আপা—

চাহিলে বহন আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

বহন মনে হিনো আপা

এ কবিতাটি বহু দিন আগে লিখেছিলাম। কত দিন  
আগে বল ত'?

সম্মুখে বসায়—পুণিহিরে বহন তোমার পুণিহিরে  
ওঠেনি।

হেনা মনে হিনো আপা, হ'য়ে উঠল। গুর চাই হেনা কবিতার  
বাতি জ্বলছে।

বসায়—কিন্তু লম্বা জীবন হয় ত' তোমাকে বারিহোর  
দেবে পাড়া কলতে হবে।

—আমি তার পুত্র পঠাচ্ছি কব্ধ ।—কেনার উত্তরে একটা প্রাণী আছে—আমি অর্থাপাচ্চেন ত' অথবা নই, এবং যিনি আমার অপেক্ষা নন তিনিও নিশ্চয়ই অনর্থক চরেন না ।

• —সিদ্ধ-বাসুর লক্ষ আমার কবে দেখা হবে ?

—বাণ চক্ষে আকৃষ্টের মিনতি ছাড়া । বেধ হর আম শে অমায়িক মতো অথবা হ'রে আছে ।...ব-পূরে চাকুরি করতে পার কিত্তি-না ।

—দশে সাধাবোটি আছে ?

—হাসিমো না বলছি । তোমার উপমাগুলি ভাবি ফাটোটা ।

অথক হ'রে বাই । কঠিন মাটিতে বসে' চেনা ফাহু গড়াচ্ছে । ওদের নিয়ে ত'তে একমাসো ঘেরি নেই ।

মিড়ি দিয়ে নান্ধি,—জ্বলের লক্ষ দেখা । জ্বল মেগেমালায়ের ছোট ভাইব চতুর্ধ ছেলে । বাণের পড়েছে । ও সব সমর উপস্থ করছে । সম্ভার মতো সব সময়েই ও খোঁজেরে ভাপুটা দিয়ে চলছে ।

আমাকে দেখেই বলে' উঠল—জান কিত্তি, বাপার ? আমণ্ড, বাট্টিকের বেকর্ড ভাঙল ?

কথাটা মাঝর একবারে ধ' ক'রে লাগল । মনে হ'ল গাঢ় তুচ্ছ ।

—হী হ'রে আছ কি ? কোনো খবর রাখ না তা'লে ? টেই-মাচ-গো কোথ টেই-মাচ—ইংলণ্ডে মট্টেলিয়ার । ফুটি বছরের ছেলে অ্যাক্সন্ প্রীয়েন প্রথম নেমে পাঁচ খন্টার ওপর বাট্ট চালিয়ে এক শ' চৌব্বি কক্লে,—ভাবতে পার ? বাবে ঘাড়িলেজ ?

জ্বল আমার হাত-ব'রে টেনে বসে—এদ আমং যতে ।

জ্বলের ঘরটি ছোট,—বলতে গেলে হক-ষ্টক্‌ আর ঘাটে বোকাই । কলকাতার বদন এম্‌ সি এম্‌ছিল তখন একখানা বাটের ওপর ও তাদের এগাধো ঘন

বেলোয়ারের লই নিরোকে,—সেটা বহুবার সামনে কুলিয়ে রেখেছে ।—পড়ার বই পুগার পড়াখড়ি মাছে, টেবিলে ও খাটের ওপর খালি কতগুলি শিকড়ার-গো আর দৃষ্টিয়ার পথিকা ।

জ্বল কোনো মাঠে এদেনো

না—এই ওর আপুণোয় ।

বয়স—পড়াশুনা কি তোমার বদাওলে গেছে ?

—রল পার না ব'লে তাদের দেখানোট পাঠিয়েছি ।

ম্যাট্রিক পাশ করতে না পারলে বাবা ডিপটন্টেরিটু করতে বলগেছেন । তারি নিশ্চয় হ'রে আছি । ভালো লাগে না পড়াশুনা ।

—কি ভালো লাগে ?

—মতি বলব ?—দিনারি আর মেনিয়ারি ! দিনারি-ব মতো কি ভালো লেগেছিল তুর্বে ?—একটি তামিল ভিক্কু-মেয়ে তার বুড়ো বাম্বী চক্ক ভিক্কা চাইতে, আর একবার বেখেছিলাম ইটের কাটলে ছোট কাঠ একটি বট-পাতা । বেখবে সেই তামিল-আয়ের ছবি ?

ব'লে জ্বল এক বাগ ফটো বা'র করলে । প্রবলেণ ক্যামেরার লান্বে কে গে না হাঁকিয়েছে তার ষ্টিক নেট । বুড়ো মজু, ভাঙা বাড়ি, পড়া ভোগা—সবট ভেমন লাগছাড়া ।

—আর মেনিয়ারি-ব মতো কি আমাকে সব চেয়ে সুফ করেছিল, জান ? পদা এক্সপেণ্ড-এর চৌতিব এন্ট্রি-টা,

—যেন দেখায়েছ কঠি । আমি ছিলাম সেট প্যাকিভে,

—খালি এই পাটটা গেছে । জান কিত্তি, আমি একটা গর আধিকার করছি ?

—কি ?

—তাতে ক'রে যাগুনের astral body এক সেকেন্ডে যে-কোনো জগৎপার চলে' যেতে পারবে ।

—সে ত' আছেই । উড়ে যেতে মনের এক সেকেন্ডও লাগে না ।

—ভেমন বাওয়া নয় । এ মতি দিয়ে বদবে, তুর্বে, বেখবে, কথা কইবে—খালি ছোঁয়া হবে না তাকে হিমালয় তার বাবা হবে না, না—আটলাটিক্‌ । এ-বিষয়ে



কোনান্ ডয়েলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবে ভালো মত ।

ভৌতলা

তোমার ?

—তিনটি বিষয়কর আবির্ভাব,—একটি আকাশে, একটি ভাবনে, আরেকটি স্ট্রেজে । মঙ্গল একদিন খুব ভোরে ভোগে উঠে সমস্ত গ্রাহির কড়ের পর পূর্ণোদয় দেখেছিলাম,—তা আর ভাবলেও আমার আনন্দে দ্বন্দ্বকম্প হয় । বিটীকটি,—ভোরবেলায় রান ক'রে কৌমবাগে রবীন্দ্রনাথ গদন ঠার কোড়ানিকোর বাড়ির মোতলাব বৈষ্ণবানাটিতে এসে গাড়ান,—তুমি তা বাবলা করতে পারবে না, কিতাবা,—যেন একটি স্বব মাত্রের মূর্তি নিরেখে । আরেকটি দেখেছি—খলময়ীরে কুমিকার শিবির ভাঙি নখন তখনকে এসে প্রথম দেখা দেন,—কাছাকাছি একদিন আলমশীর দিলে দেখে এসে । ও ! তুমি ত' আবার খিচোটাবে ওপর চো । দিনেমার ওপরো ?

—নিশ্চয় ।

—কেন নিশ্চয় ? বাও, বাও একদিন ঢালি মংরে আর ভর্ত দিজনিকে দেখে এস, ছেদে-ছেদে হুং হুং,—দেশের সব গুণমিটা যাও কব দিন কতক । চলিউড, টুভিরোর ছবি দেখবে একটা ? ভগ্নল্যদ আর শিক্কাউ । বল ত, কতজন মুখে আছে ওরা !

হঠাৎ হুংল গলাটা নাম্বরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—তুমি নাচ ভালোবাসো ?

—তালুক-নাচ ?

—না না, আনা পাত্গোভার নাচ । এম্মাথারে দেখতে গেছলাম সেদিন । হুংবা ! কিছ বাই বল কিতাবা, নটীর পুজার কাছে লাসে না । তুমি যেবনি ত' ? তুমি কেন আজ তা'লে,—বাগি হুঙর তাঁকে ?—পাত্গোভা মনকে অভ্যস্ত করে বটে, কিন্তু ঐত করে না, ঠিক হুঙটমান্-এর কবিতার মত,—যেন একটি বিখ্যাতী আনে না । আজ্ঞা, তুমি ত্রেস্ ভালোবাস ? আমার কাছে থেকে টিপ্স নেবে ? এই যা, তোমাকে একটা জিনিসই দেখানো হয় নি,—এই দেখ, এই ~~কিছ~~ ওপর পাত্গোভা তার নাম

লিখে দিয়েছে । আমি গেছলাম দেখা করতে জগত্ হোটেলে ।

বয়াম—আজ ত' পনিবার, বাবে না ব্যবকোশ ?

হঠাৎ হুংলব হুংল রান ক'রে গেল । বলে—সেই ত' ভংগ, কিতাবা,—বাবা আর পরশা দেন না । আজ Ilo who does happenটা ছিল, তুমিছ খালা দিলুম,—আঁজিহু—এই ছায়া, পড়েছে নিশ্চয়ই ; দেখেছ লন্ টানিকে ? —সহগ্রনিন !—কিছ টাংকে আখলাও নেই একটা । সেদিনকার রানিঃ ট্রাণ্ একবারে কতুর ক'রে দিয়েছে । জানই ত' চার আনা কাট আনাঃ আমার পোষা না । আমাকে দেখে তিনটে টাকা ধার ? ব'লে চাত পাতলে ।

থমক দিয়ে উঠলাম । হুংল নিল্ নিল্ ক'রে হেসে উঠল ।

খানিক বাবে দুগ গভীর ক'রে বলে—আজ যদি nammind করতে বেরিরে কোনো মজুরের ভংগ দেখ, তা'লে নিশ্চয়ই তাকে তিনটে টাকা দিয়ে কলে তার ভংগকে প্রসন্ন দেখে । কিন্তু, আমি আজ ব্যবকোশ দেখতে পাচ্ছি না সেটা তোমার কাছে একটা ভংগই নয় । তুমি জারি সেটিয়েটাল, কিতাবা । আজ উপোস ক'রে থেকে সমস্ত রাতি তোমার মজুর-hero থেকে পাবে আমি তার চেংচেং বেশিট কষ্ট পাচ্ছি । ঘোটে তিনটে টাকা,—দেবে ? আরো যদি ওটো টাকা বেশি বাও, একবার মোড, কাউটেনে চ' দেবে আমি । ব'লেই আবার হাসি ।

উইহি, হুংল বলে—সেজবার সঙ্গে বাছ ? নিশ্চয়ই কবিতা লিখে এখন । ঠেকে দেখেছ ত' ?

হুংল আবার হাসলে । বলে—তুমি কাউটি কলেইর কবিতা পড়নি ?

Yet do I marvel at this curious thing

To make a poet black, and bid him sing !

বাও বাও, দেখাবকে একবার দেখে এল—বাংলা কবাবা-মন্দিরের কাশাশাখাদ !

চুই ক'রে প্রের কল্পনাম—ওঁর কি ভংগ ?

—বাংলা দেখে ওঁর নাম হচ্ছে না,—প্রপংগা-কাঙাল দেহদার এই ছেবেই কবিতা মশাটা চ'রে উঠেছে । বাংলা

ঐতিহাসিকদের সেন গুপ্ত

যেনে এতগুলো যে বিভিন্ন কাগজ আছে : তার একটাও ঠিক পাণ্যপাল নিয়ে পত্রাঙ্কে ওর অধাবসারের তারিখ কল্পে না—এ ওর অদ্ভুত। তুমি বাও দেখা করতে, তোমাকে একুনি ওর কবিতার সমালোচনা লিখে দিতে বলবেন। যদি বল আমি রোবো, বার্ডেরই কবিতা, তবে একমাত্র হেগেই ওর passion দেখাবেন। এ রকম দাঁড়াই একটা কাণ্ড খঁটে গেছে।

বসম—কবিতা শোনার মত আমার অবস্থা নেই।

—Fitz-zactly! বল না ঠিক সেকথা, বাস্চে যেনে।...উনি নিজেই এক কাগজ বেব ক'রে নিজের কবিতার কুখ্যতি কীতন করছেন ঠিক করেছেন—যদি তাতে অস্বস্ত লোকের চোপ পড়ে। সেজন্যের জন্য আমার তারি কল্পে হু, কিত-না! ঠিক শিল্পাঙ্গোলে কেন পুরে রাখে না? আমার যদি ব্যারোপ দেখতে কিছুটা কা যেন, আমি ওর কবিতার জন্য গোপাণাণ্ডা করি,—কপটি ক্রক্, ক্রিক্-ওয়াটার গিক্-সুয়া যেমন করেছিল—

বেজি, হুগল টেডির বয়ে—সেজন্যের আরেক কাঁঠি শুনে বাও, কিত-না।

কিহ্যাম।

—সেমনা কবিতার কুখতি ত করেনই, এসমিত করেন। এগিয়ে না ওর কাছে। ঠিক তৎকাল্যে স্যাটিককেট লিখে দিতে হবে। এখানেই আরেকটু বোম। আমার অটোগ্রাফের খাতটা দেখে বাও।

ব'লে এক খাতা বের করলে।

বাগ্মিকেরা দস্তখত দেখতে পাব।

কিছুই সমাধা নয়।

হুগল বয়ে—এ সব খুব নিরীহ নমণা লোকদের সহ—আমাদের উড়ে মাগির, ঝাড়ুদারের, বরোয়ানের—

এলাম—ওরা লিখতে জানে নাকি?

—উড়ে মাগিটাকে হাত খ'রে খ'রে লিখিয়েছি, ঝাড়ুদারটা আঁকি-খুঁকি দিয়েছে কতগুলি। এই দেখ, বই-পালানো বগুরির, কোটো ফ্রমারের, বাগ্ম-দরকারের, বোতল-বিক্রিওনার,—কার নেই মই? এই একটা তিখিরির। এ একটা দানী ছিনিস বলতে হবে। আর

এই সেপ সেজন্যের, একজন বার্মা বোকা কবি।

হেগে উঠলাম। হুগল বয়ে—জাঁকন দারা পতিত, বাবিত, পরামিত—এই ক'টি আখেরে আঁড়ে তামের দীর্ঘকাল লম্বা ক'রে বেগেছি। তুমিও ত কত গুণাদি করলে, তবু তারই বর্ণকে মুক্ত করতে পারলে না।—দেবে তোমার মই?

চুপ ক'রে রইলাম।

হুগল বয়ে—একটা কথা চুপ বলেছি। সেজন্যে-বিভিন্ন কাগজ বার করেছেন, তাতে তোমাকেও পাল দিতে পারেন তুমি ওর কবিতার স্যাটিককেট মাগনি বলে,—যদি তোমাকে পাল যেন তবে তুমিও কোনো কাগজে ঠিক পাল দিয়ে ঠিক একটু বর্ণনা লিখো, কিত-না। এত কই ওর ওর মত!

কবির জন্য আগাধা বর নেই,—কিছু একটা বাস আছে।

সেই বাস নিয়ে ওর বোকানদারি আর মূরোর না,—সেট বাসই ওর সম্পত্তি, ওর শৈশবকবিতা!

কব্ বলে—আমি কবে বড় হব, কিত-না?

হাত দুটা উচুতে ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠে কব বলে—আমি বড় হ'রে কবে আকাশ থেকে পূর্ণা পেড়ে আনব? ঐ মেঘটাকে কেড়ে আনবার জন্য মই'র মত লম্বা হব কবে?

এ ছাড়া কবির মুখে আর কোনো কথা নেই।

কব্ সমস্ত বাঁকি মাটির রেখেছে,—কব্ ছাড়া কারো খাবার রোচে না। সময় কব্কে কাপড় পরিবে দেব, হেলী কানে দেব কুল গুঁজে, তাই বেশ চুল ছোঁতে, হুগল তার সটোগ্রাফের বইয়ে ওর আঁকিখুঁকি মই নেব, মোটা সেজন্যে ঠিক নিয়ে কবিতা লেবে।

কব্ ছোট সাইকেল চাপস, ছোট খাণার ভাত খায়—আর বড় কবার বস্ত্র বেখে।

আমি থাকি নীচে এক ওয়ার, ঠিক সদর বরকার পাশে।



দলের লোক ঘুরে-ঘুরে আলোশ ক'রে তত-তত রাত চুটো  
বাঁকে ।

এরা সবাই যখন এক সঙ্গে থাকে, তখন মনে হয় এদের  
বিভিন্ন পুষ্টিত কোমরটা চলেছে—বিলাসেব প্রাচুর্য ও  
আড়ম্বরের ক্রিমি প্রার মাগে এদের হৃৎকেন্দ্র ছোঁয়াই থাকে না,  
মনে হয় হৃৎকেন্দ্র এদের ভাবগঠনা ছাড়া আর কিছুই নয় ।  
মনে হয় না নীরেন চক্রবর্তীর অঙ্গ স্রমের মন একধিনো  
উঠাটন হয়েছিল, মনে হয় না শ্রীমুখক লাগে না কেনে  
হেনা কোনোদিন হৃৎকেন্দ্র তপস্বীর প্রতিক্রিয়া করেছে ।  
এক সঙ্গে থাকলে যেটা লোকশাক্তিও মনে হয় না সে  
কবিবর্ণভিষাগী, মনে হয় বড় বড় হা ক'রে তাত খাওয়াই  
ওঁর কাজ ।

কিন্তু যখন এরা একা থাকে, তখন বাও এদের কাছে ।  
দমব অভ্যন্তর একটি স্বাধীনতা মনের কোলে এখনো  
যু.মা.হ. তেনার ভই চোখে এখনো মনিস্তরতার অঙ্ককার,  
স্বাভাবিক স্বাধীনতা মনিস্তরতার হ'রে বেতে চায়, যেটা সেখানে  
কবিতা প্রাণো নিবৃত্ত পাচ্ছে না ব'লে কপাল কোটে ।  
যদি যোগেশ্বরকে গিরে জিজ্ঞেস করি, তখন হয় ত' তিনি  
ইন্দ্রপুত্রের, তাঁর ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জবাব  
পাওয়া যাবে—আমো লাখ মাতক কাপটিয়াস্ চাই হে ।  
এমন কি, আকাক্ষার কবেরো জবাব চলেছে—হয় ত'  
চিরজীবন এই আকাক্ষারই মানবমন নিরন্তরকল । যেখানে  
আকাক্ষা, অপছাও সেইখানে ।

কিন্তু কি ছোট ছোট হৃৎকেন্দ্রের! আচ্ছা, হৃৎকেন্দ্র কি কখনো  
ছোট হ'তে পারে? নিশ্চয়ই পারে । তারতবর্ষের মুক্তির  
বক্তা কারো মনে এতটুকু তপস্বীর বন্ধি নেই, দৃষ্টি কবিতার  
নৌবা নেই, বাহুতা নেই । মন বিপ্লবী হ'লে উঠে—বস  
মাথুনি বক্তৃতা আবার আনুল আনুলি করি । মহিমাময়ী  
গোকলশ্রীর কেউ বস বেবে না, সবাই অঙ্ক, নিশ্চয়ন ।  
নির্ভেদ একান্ত অগতির মনে হয়, নির্ভেদ আলোককে দিকার  
দ্বিহ ।

রাত তখন ফটা হবে?—তিনটা প্রায় । দমব দরজার  
কে খাড়া দিচ্ছে । উঠে দরজা খুললাম । বিনি চুপ্তে

পার্বহিলেন না তিনি মেসোমশাইয়ের দাবার 'চুটো' পুজি,—  
নাম ললিত ।

ছি ছি, দার্য্য না বিনিব্বি ক'ছে । ললিতচন্দ্র দত্তরমতো  
চলছেন ।

দুপার পুরে বসাম—এ কি ললিত, ছিঃ! এততেও  
তোমার লজ্জা নেই?

ললিত আমার পা চুটো জড়িয়ে হ'রে বলে—আমার  
পিঠে করেকটা লাখি মেয়েও যদি তার আঁচের আঁচের  
টাকা দাও, তা হ'লে আমি আরো পানিকটা খেয়ে বেই'স  
হ'রে যেতে পারি । দেবে না? সন্তা কিত্তি-না, আমি  
বেই'স হ'রে যেতে চাই, খেমে যেতে চাই,—

আমার বিছানার ওকে গুইয়ে বিলাম । ললিত জড়িয়ে  
জড়িয়ে বলতে লাগল—

I have been faithful to the Cynars!  
fashion.

বসাম—তোমার এই হৃৎকেন্দ্র কেন, ললিত?

—হৃৎকেন্দ্রের ওই হৃৎকেন্দ্র, কিত্তি-না । শিশুশ্রমের ওই  
জল বেতে গিরে মেঘলায় গলার কেলসী বেঁধে বিছোভে ।  
—আর কোনোদিন খেলে না ।

—কে? তুমি বলছ কিত্তি-না? সে এসে বললেও  
খেতাম, পেছ-পা হতাম না ।

—কে সে?

—যাং Cynars ।

ওই চুলে হাত বুলতে বুলতে বসাম—কাকে ভালো-  
বেসেছিলে?

—যেটে না । কোথায় যোগ্য ভালোবাসার?  
ভালোবাসা ত' একটা air বই কিছু নয় । আমার উচ্চের  
দাবার কোনো ইন্টেলেকুয়েন্স বাধ্য নেই,—আমি এখন  
ভুললাম ।

বসাম—তবে কে এই Cynars?

—চেন না তাঁকে? থাকে শুধু in fashionই পাওয়া  
যায় ।

বসাম—মিথো কথা ।

—একটা সভা কথা না শুনে বুঝি তোমার মন গুঁটে না, —Cynara আমার ভাবী স্ত্রী, মন ছাড়বার চক্রে ভালো হয়ে থাকার জন্য যাকে আমার ঘিরে কর্তৃত্ব হবে, যাকে কোনোদিন আমি হারাতে লিপ্ত না। দেই,—আমার অনাগত প্রেমসাজী। তার মতো বড় ব্যক্তি হ'লে উঠেছিল কি না—

—কত উড়োলে ?

—বহু ;—কেবেই বা কি হ'ত ? দারিত্র্য আর স্বাধীনতা উঠেই আমার কাছে সমান। আচ্ছা, তোমার মনে হয় না কিত্তি-না, সমস্ত সৃষ্টিটাই একটা নিরর্থক আর্ট ? মনে হয় না, আমাদের সমস্তটা একটা নিরর্থক পাশ,—সমস্ত জীবনটা আমাদের অন্তর্দীপ-বাস, মুক্তি আমাদের সূত্র। মনে হয় না ? তুমি ত' ভারতের মুক্তিকামী,—তুমি তা'লে মন খাও না কেন কিত্তি-না ?

এলাম—তোমাদের মত মেধমণ্ড আমায় কৌমল্য নয়, ললিত।

ললিত ধরে—কিত্তি-না, তুমি একটা ঠিকিঠিকি।

খানিকবাদে ললিত ধরে—পুঃমাছ ? তুলে না Cynara কে ? জীবনব্যাপারে তোমার কৌতূহল এত কম, কিত্তি-না ? দুমোবার ভাষ করে' রইলাম।

ললিত বলতে লাগল—Cynara ত বলেন, রূপ আর বেশের বর্ণনা নাই বা ক'লাম, রসীকানাথের 'শেষের কবিতা' পড়েছ ?—দেখান থেকে কিত্তিকে বেছে নিয়ে। এসে বা বলবার বলেন।

—মানে ?

—বলেন, ভালোবাসি। আমি কি বলার, জান ?

—না।

—বয়াম, ঠাণ্ডাও, কাগজ ক'ম হোল্যান্ড জালি,—কন্ট্রি-ফর্ম স্ট করতে হবে। ছ'ম'কের কড়ি ভালো বামের কন্ট্রি-ফর্ম, কিত্তি-না।

—চ'মাস ত' ছিল।

—ছ'মাসের ছ'দিন কম। Cynara ম'রে গেছে।

এ বাড়িতে আমার আর থাকি চলবে না। এদের নিষ্কীর্ণতা এদের অব্যাহতকার ভাবাকুলতা আমাকে অশক্ত সীতা করেছে। আমাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে বড়ো চাওবার মত,—আমি পাখার কোঠারে করণ থাকব না। ভ্রমের মত দেখা। ছেলেকে নিয়ে পুত্র আদর করছে।  
এলাম—আমি খাচ্ছি, ভ্রমর।

—কোথায় বাচ্ছ ?

—আপাতত পবে, পরে হয় ত' ফের জেলখানায়।

—বা রে, আমায় খেতে দিলে ত' ?

এলাম—ক-উকেই হ'লে রাগ্নেতে পারিনি, চক্রে-কেন্দ্র নয়। কিন্তু খাবার আগে তোমাকে একটা প্রদঃবোধ দিতে হবে। তোমার মনস্তাননা পূর্ণ হয়েছে, ভ্রমর।

—আমার আবার মনস্তাননা কি ?

—তোমার ইচ্ছা ছিল নীরেন যেন ভক্ত ব'লে যায়।

সে তাই হচ্ছে,—আমাকে দগ্ধতার তার বিয়ে।

যেন উল্লাসে ভ্রমর বলে—এল কি ? সতি ?

কিন্তু কখন হুবে একটা কাতরতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

এলাম—তোমাকে নেমস্তর করতে ব'লে দিয়েছে।

ভ্রমর লজ্জা উবাগীনা হ'লে গেছে। 'বলো—ভাল ত',

কিন্তু কে না কে,—তার বিচ্ছেদে আমি বাব কিংবদন্তি তজ্জ ? সে আমার কাছে একটা পথের লোক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কিত্তি-না, তোমরা ত মেয়েদের পুত্র ঠাট্টা কর, কিন্তু তোমাদেরই বা সেই খাদ্য-আরাধনা কই, তার চক্রে কতোর কইভোগ কই ? নীরেনের এই অখোপতি আমাকে যে কী অশ্রুমান করছে বলতে পারি না।

এলাম—এ মজা মন্দ নয়, তুমি যে তারি স্বার্থপরের মত কথা কইছ, ভ্রমর।

—কিন্তু নীরেনকে আমি এত ছোট কোনাধিন মনে করিনি, কিত্তি-না। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে স্নেহের তার মিটার প্রতি আমার আপত্তি ছিল। ছি ছি।

—ঠিক এমনি তোমাকে সেও ছি-ছি করেছে !

—তবু, তবু কিত্তি-না, নীরেনকে আমি সতি সতি কত বড় মনে করতাম, দুমলেশচীনা বালিশখার মত। আমার সংসারজীবনের সমস্ত মাধুর্য যেন নিঃশেষে ছুরিয়ে



গেল আত । ঐতেনেও বৃত্তি আমার কাছে আমার সম্মানে

মতনই স্বেচ্ছাসিদ্ধ ছিল ! তুমি আমাকে এ কী শোনালে ?

ব্রহ্মের হৃদে চোখ ঝল্‌ঝল্‌ করে উঠেছে। কল্ল ক'রে বলে—আমার জীবনে কবিতার একটি কণাও আর গ্রহণ না, কিত্তি না। নীরেনের বেদনা আমার জীবনে পরম-মধুর একটি লাগনা বিস্তার করেছিল, আমি আর একেবারে বিরস, বিগতসৌরভ, বিকল হ'য়ে গেছি। কেউ আমার কণ্ঠে মাসির করেছে,—এ ভাষায় মনো বেদনা ও মেহের সঙ্গে কী প্রকাণ্ড গৌরব ছিল,—আমি যে সত্যি সত্যিই তার কাছে তোমার স্বান্তরবে ছিলাম।

যনে যনে বসায়—ছাই ছিলে ! কে নাড়েন—তাই  
(দিননা) ।

ভ্রমর উদ্যোগীদের মতো চূপ ক'রে এ'লে আছে খাটের  
বাঁহুতে কপূই বেছে। ভ্রমরের চোখে মল ঘেঁষে মনটা ঘেম  
নিজে উঠলো। বেচারা নীয়েন।

কেনার ধরে 'নেভে-বেথে' কলমার সুধাংশ আর তার  
বউর বাকুসু চলেছে। সুধাংশ কেন এখানে পাশ করতে  
শারণনা,—বউর আগুণি পেটখানো; বউ কেন বাইরের  
গ্রাম উপদেশ বসন্তে বসন্তে শালন করছে—সুধাংশের  
আগুণি অমরাগ্রিক।

চেনার বস্ত্রে এসে ঘেঁষি চেনা' ভারি বাস্তব হ'য়ে জিনিষ-  
 পত্র গুছোচ্ছে। 'ওর চট উৎসুক কবুলে সেই বিংশা,  
 সেই চঞ্চল হেঁচাফেঁতা।

ବିନାୟ—ଏତେ ଡାହାଣଢ଼ୋ କିମ୍ଭେ, ହେନା ?

৫৯৯ নং—আমি যে রংপুরে থাকি কিশোরী, এক  
 চণ্ডীর মধ্যেই। আমাকে সেই মাসটারিটা নিতেই হ'ল।

—কেন ? তোমার বিয়ে ?

—সে আর হচ্ছে না। কুঁচি কুঁচি শোননি কিছু?  
 পীতাম্বর টি বি

হেনা হেন বলতে বলতে নিজেই নিউরে উঠছে।

ବାହାଃ—ଏକ କି ?

—তুমি তার চেহারা দেখলে তপে হেঁচকির উঠবে, কিত-না,—একবারে কাকাসে হ'বে; গেছে। কি ঘিরে যে কি হ'বে গেল বুজতে পারছি না। আমাদের মিলনের মাঝে মৃত্যুকে বেৎলায়,—বিকৃত, ভিত্তিকপীড়িত, রক্ত-পিণ্ডাচ্ছ। মৃত্যুর নিম্নে গ্রেম বসি পুড়ে যায়,—আমি বসি আবার কোরবিন শীতুবকে বুনে বাই,—সে কাঁ সারাসক টাংজেডি।

—তব্বি তাকে ফেলে মাল্টিটারি কব্রতে বাবে ?

—সেই ত' আমারকে কেণে যাচ্ছে। নৃত্যটার ও' তত গোচরীয় নয় কি-তি-বা, নৃত্যর পরে বিহঙিতা যেমন। আর তাকে মনে রাখ'না,—তাকে ভুলে যাব. অবিরাম যেমন সমস্তে ঢাকা পড়িয়ে চলে—আমার জীবনের সেই দৃষ্টিনের চেহারা ভেবে আমি তারি ভাব পেয়ে গেছি। আমারকে সারা জীবন হৃদ করেতে হবে, অপর পাত্রের কবার পৌরবটুকু আমার এই নয়।

হেনা লগাটের ঘাম বৃষ্টিবার ছলে চোখের ঝল মুছে  
 ফের বয়ে—আমি ও আমার বর্তমান শক্তির জোলে  
 তবিস্মৃতির জরার পরিচালন করতে পারছি না, 'তাই  
 হয় ত' কোনেমিনি অগ্ন্যস্ত্রাঘাতী কটনীর কাছে আমার বস্ত্র  
 বীকার করতে হবে,—এটুকু দূরধর্মী হ'তে পেলেই আমার  
 দম্ভ অস্তিত্ব সফুটিত হ'বে বলে। আমার সত্যতাকাল  
 প্রানবশে প্রার্থীর রক্ত চেয়ে থাকে। সত্যতের প্রতি  
 সেই অবমাননা কি নিরাশ্রয়, ক্রিতি-না।

কল্যাণ—আপায় একবারে হেঁটলে হ'য়ে গিয়ে পড়  
নেই, হেনা। জান, চোখ বন্ধ রাখাখান বল ক'রে  
এলেগ আমি ভারতের দাবীদার বিপাক হারাইনি,  
আমার পণের দাবীও ফিরিয়ে নিই নি কোনদিন।  
আপা কর।

—আশা কর, না ? তা হ'লে রংপুরের পোশট্টো  
 রিজাইন্স দি, কি বন ? পুরী-ই বাই তা হ'লে । নীচ  
 সেখানে আছে,—একবার প্রাপণ দেখি না চেষ্টা ক'রে  
 সে বাঁচে কি না । দাঁড়া কিস্তি, আশা করতে পারলেই  
 মনে আশার গুরু নাকি আছে, বিধান আছে, তাহাৎ  
 উদারভাবে কথা করতে পারি । তবে হুইল রংপুর ।

বলে' হেনা সব জিনিষ পত্র ওলোট পালোট  
করতে লাগলো।

চ্যং বনে—প্রবেশের মতে সুস্থায় আবির্ভাব,—  
একটা এপিক্ লিপ্যাব বিধ, না কিতাবা? যদি লিপে  
উঠে না পারি নিজেয় জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করব।  
আশা,—আশা!

সুখের ধরে এসে দেখি দরজার একটা পিন্‌বোর্ড  
টান্ডানো,—তাতে লেখা To Let।

কি ব্যাপার? বাণেশ লগ্নে কগুড়া ক'রে সুখ  
নাকি বাড়ি ছেড়েছে, ও জাহাজের খালাসি হবে, এজিন-  
ড্রাইভার হবে, কলের কুলি হবে—তাও স্বাক্ষর, ওর  
পরমা চাই। ব'লে ব'লে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবার  
মত আলজকে ও বরদাস্ত করে না,—ও খেতে পরমা  
কামাবে, মাশার খাম পায়ে ফেলে।

ওকে ঘন কেউ না দোঁলে, --দৈনিক কাগজে ঘন  
বিজ্ঞাপন না দেয়।

তার পর একদিন—সেই দিনের ঘটনাটা ব'লেই  
পাপুরিয়া-খাটা বাই-লেগের তেতলা বাড়ির ওপর  
বনিকা টানব।

তার পর এক দিন—তেতলার ছাতের ওপর দিয়ে  
একটা চলন্ত বুকি উড়ে বাজিল, কব্‌ গেল চাত  
বাড়িরে বরতে।

কব্‌ গলকের মধ্যে তেতলার ছাত থেকে ল'ড়ে গেল  
বাড়ির দিমেন্ট-করা উঠানের ওপর। মাকের দাঁকাটা  
কব্‌কে ব'রে রাখতে পারেনি, অমমা কবের গতি,—  
উঠানই কব্‌কে আশ্রয় দিলে। ওহু কব্‌, ওহু কব্‌!

সমস্ত অরণ্যে আশ্রয় পেয়েছে; প্রকৃত ভাঙা  
হাড়ির বজাবির্দর্শ অন্ধকারে সমস্তের তলার দুবুড়ে  
একটা মায়েগরিগি ঘন দুহুর্ন্তমণ্ডে বরাধা হ'য়ে উঠল।

চিরকালের জন্য কব্‌ খেমে গেছে,—এব চেয়ে স্পষ্ট,  
এর চেয়ে বোধগম্য। এর চেয়ে অগতিরগায়া আর কি  
আছে পৃথিবীতে?

নীরেন্‌ বিরে করছে ব'লে সমস্তের আর তিলাঙ্ক  
ওবে নেই, পীপ্বের অসির তিরোধানের অন্ধকার হেনার  
চক্ষু থেকে বৃছে গেছে। Chama ব'লে বে কেউ ছিল  
লগিত তা আজ মনে করতে পারছে না, মোটা সেজমা  
পর্যন্ত ভাবছে,—শিত্তর সুস্থির অন্ধকার সমস্তের মতই  
বিশালবিশুত,—কবিতার স্তূর্ণি আকতনে তার স্থান  
নেই। সুখ হই তা ভাবছে কবের ঘাড়া কত শুধু-  
অভিমুখে, এভারেট ছাড়িয়ে, কামবুটকা ছাড়িয়ে!  
সুখান্ত ভাবছে—হোক সে দুঃখাই, কিন্তু তার সব ক'টি  
মস্তানই ঘন বেঁচে থাকে।

সমস্ত আকির তিরি ঘন ন'ড়ে উঠেছে,—গছে  
সমস্ত দেশ ঘন উজার হ'য়ে গেল। নির্জন গ্রামের  
কজনাসমিতি ছোট খাটো সমস্ত ওবে শোকবজ্রা তেলে  
গেছে—মাগুয়ের ঘেবৎখন কত ভুখ, মাগুয়ের আশা  
কত কীপার, মাগুয়ের প্রতীকা কি বিবাদঘাতক!

ওযু আমিই বিচলিত হইনি। ওযু আমিই বলতে  
পারলাম—মানীমা, কব্‌কে এবার ছাড়নি, ওকে এবার  
নিরে যেতে হবে।





৪

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। পাছুলি পাড়ার পৌরষণ, দিবা কান্তি, সন্ধানক বৃদ্ধ দামান্তি পড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভাল বলেন না, প্রায়ই নির্ধনে থাকেন, লঙ্কার পর মাঝে মাঝে পাছুলিদের চৌমকুণে দিয়া বলেন। অপুর বাণ্যাকাল হইতেই ছবিটর ছেলেকে লুকে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া ঘাইত—সেই হইতেই চকনের মতো খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপুর দিয়া লুকের নিকট কাজির হয়, ডাক দেয়,—মাঠ আছে? বৃদ্ধ ডাড়াডাকি দর হইতে বাতির হইয়া ভালপাতার চটাইবান। দাওয়ার পাতিয়া দিয়া বলেন—এগো দাবাডাই এগো, বসা বসো—

অন্তরানে অপুর দুখচোরা, দুখ দিয়া তাহার কোনো কথা বাতির চর না—কিন্তু এই লরল, শান্তবর্ষন লুকের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিলিয়া থাকে, লুকের সঙ্গে তাহার আলাপ খেলার লম্বীর সঙ্গে আলাপের মত অনিশ্চ, বাধ্যতীন ও উজাল-ভরা। নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক বলাতীর বৈকলের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল গরিয়া অপুর বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও

বয়সে অনেক বড়, অল্পদা হাথের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়সকালের অল্পই অপুর; কখন বেন মনে হয় বৃদ্ধ তার দীর্ঘ, এখানে আসিলে তাহার লকল লুকেট, লকল লঙ্কা আপনা হইতেই খুঁচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপুর মন পুলিয়া ফলে, এমন সব কথা বলে যাঁহা অন্তরানে সে তার বলিতে পারে না পাছে প্রবণ লোকেরা কেও ধমক দিয়া ‘জাঠা ছেলে’ বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাঁড়, তুমি আমার গোর,—তেগমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাঁড়, আমার গোর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই লুকা, মুখী, নিশাপ ছিলেন—ওই বকম ডাব-মাধানো চোপ ছিল তাঁর—

অন্তরানে এ কথার অপুর হয়তো লঙ্কা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাঁড় ত্য হোলে এখান তুমি আমার সেই বই খানার ছবি দেখাও?

বৃদ্ধ ঘর হইতে ‘গ্রেস তক্তি চক্রিকা’ বানা বাতির করিয়া আনেন। তাহার মতান্ত প্রায় ঐশ, নির্ধনে পড়িতে পড়িতে তিনি বৃদ্ধ বিস্তার হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দুখানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মতবার লম্বের বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাঁড়, তোমার হাতে বইয়ের অংশমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্ট মাঝে মাঝে গল্প বচনা করিয়া উতাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিবক হইয়া বলিতেন,

পথ বেঁধেচো বেশ ক'রোটা, ও সব আমার ভনিও না বাপু,  
পনকড়া ছিলেন বিচাণিচি চণ্ডীদাস—তারপর পর ও সব  
আমার কানে বাজে—ও সব গিবে অস্ত্র আরণ্যক পোনাও।

সুতরাং, সামান্য, ঘনাক্ষর্য মাংসের পতি-পথ বাড়িয়া  
এখানে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক মুক্তি লাগা বহিঃ  
পাশে, যমুণ্ড মন সেটুকু কেমন করিয়া বহিঃ করলে। তারপর  
কাছে তারা অজা মাটি, পাখী, গাছপাশের মাংসের মত  
অস্বস্ত ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিগাই দাতার কাছে আনিবার  
সাক্ষর্য তার এত প্রবল।

কিবিবার সময় অল্প নয়তোই মনের উত্তানের পাছ  
তলাটা চাইতে একরাশি মুক্ত-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে।  
বিজ্ঞানীর সেতলি সে রাখিয়া দেয়। তারপর পথেই সন্ধ্যার  
আলো জ্বলনই বাবার আদর্শে পড়িতে বসিতে হয়।  
যতী বামেরকের বেশী কোনো দিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু  
অমর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি  
পাইয়া সে চাইতে যায়, বিজ্ঞানীর হইয়া পড়ে,—আর  
সময়ি আকর্ষণ মনের সকল বেলা-ধূনা, অনেকধূরের  
কামার পাড়ার পলটা, তারপর বড় ছাগল-ছানাটা বহিঃবার  
মত কত ছুটাই—সারাদিনের সকল আনন্দের পড়িতে  
ভরপুর হইয়া বিজ্ঞানীর গাণ্ড মুক্ত-চাঁপার গড় তারপর রাত  
দেও মনকে বেলা ধূনার মতোই অস্বস্তিগত মত বিরহিত  
বালক-পালকে অভিবৃত্ত করিয়া বহিঃতে থাকে! বিজ্ঞানীর  
উপুড় চইয়া ফুলের গাণির মধ্যে মুখ চুকাইয়া সে অনেককাল  
স্বপ্ন লয়।

পরদিন সকালে নীলমণি তারের লক্ষ্যকর্ণ ভিতর  
ওপরের পানিকটা বন চুপা নিম্নের চোটে বা দিয়া কাটিয়া  
পরিহার করিল। তাইকে বলিল—বাড়িবে ছাপু, তেঁতুল-  
তলায় মা আসে কিনা,—মাঝি চাঁল বেলাক'রে নিজে আসি  
দিগ্গির ক'রে—

একটা ভাল নারিকেলের মাগের চই পলা তেল চুপি  
চুপি তেলের ভাঁড়টা চইতে ও বাড়ির করিয়া লইল। অগতঃ

সামান্য বাড়িরে আনিয়া ভাইদের বিদ্যা করিয়া বলিল—  
দীর্ঘগির মিরে বা, দৌড়ো অণু—সেইগেলের রেখে মাং,  
বেশিই যেন গরু টকতে খেবে কেনে না—

এমন সময় মাতার মা তারার ছোট ছেলেকে পিছুনে  
লইয়া কিছুকি বোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। চণ্ডী বলিল—  
এদিকে কোথেকে তব্বেরকের বো?

মাতার মায়ের বহনও পূর্ব বেশী না, বেশিও মন্দ ভল  
না, কিন্তু হার্মীর মুক্তার পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও  
দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুটির মতো পিড়েচলিয়া  
কাঠি কুড়ি—বুঁইচের মাগা নেবা?

চুপা তো বন বাগনে পুঁচিয়া নিজেই কত বৈচিত্র্য প্রাপ্ত  
তুলিয়া আনে, বাড়ি নাড়াইয়া বলিল—গে কিনিবে  
না।

মাতার মা বলিল—নেও না মিনি ঠাকুরোণ, বেশ মিষ্টি  
বুঁইচে, মধুখালির বলির শাণের খে তুলেগাম,—কোচ  
চইতে এক পাড়া মাগা বাড়ি করিয়া দেখাষ্টা বলিল—  
ভাখো কত বড় বড় কাঠি নিয়ে বাজারে ঘোঁড়ি, বিকী কতি,  
পতলা পোতি বজ্র বেলা চ'বে বাবে, মাতার ৩ততল এক  
পরমার মুক্তি কিনে দেতাম। নেও, পরমার ও গাড  
দেবনি—

চুপা রাজি হইল না, বলিল—অণু, খটতে একগাণ  
খানিক চাঁল তলায় ছাড়ে, মিরে এসে মাতার চোটে দে তে!  
উত্তরা কিছুকি বোর বিহার পুনরায় বাড়ির চইয়া গেলে  
দুতনে ভিনিষপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিকে বনে ঘেরা। বাড়ির হইতে দেখা যায় না।  
খেলাঘরের মাটির ছোবল মত ছোট একটা হাঁড়িতে চুপা  
ভাতে চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই ছাপু, অণু, কত বড় বড়  
মেটে আলু কণ মিরে এসিতি এক জাখা থেকে। পুঁচুপের  
ভালতলায় একটা কোণের মাগার অনেক চ'বে মাড়ে, ভাতে  
দেবো—

অণু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে।  
এই জাখার প্রথম বন-ভোজন। অমর এখনও বিশাল  
হইতেছিল না, সে এখন পতিভারের ভাত-ভরকারী বাজা  
হইবে, না খেলা ঘরের বন-ভোজন বা কতবার চইয়াছে দে-



রকম হইবে,—দুগার ভাত, পাণ্ডার আলু ভাতা, কাটাণ পাণ্ডার গুটি ?

কিছু বড় সুন্দর বেগাটি।—বড় সুন্দর হান বন-চোমনের! চারিধারে বন কোণ, গ্রনিকে তেলাকুড়া লতার চুল্লি, বেল-গাছের তলে জগলে সেগুড়া গাছে ফুলের আড়, আধশোকা কটা চপাচাপের উপর পল্লব পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন কোণ কাপের মাড়ালে নিবৃত্ত নিরাশা হানটি। প্রথম বসন্তের দিনে কোণে কোণে নতুন, কচি পাখা, শেঁটুফুলের আড় শোকা ভিটাটা আলো করিয়া ছুটিয়া আছে। বাতাবি লেহু পাছটার কর্ণবনের জ্বালায় ফুল অনেক করিয়া গেলেও খোপা খোপা লাগা লাগা ফুল উপরের ভাগে চোপ পড়ে—তুফুর হুমিষ্ট আবকতামর হাবনে সকলের চাওয়া ভরাইয়া রাখিয়াছে! এই সিঁদু গাওয়া, এই হালুকা-আনন্দ ভরা বিনপুলি এক অপ্রত্যাশিত, অকল্পিত সুস্বাদু ব্যস্তি মনে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রথম বসন্তের এ ভ্রূপ-ভরা বিনপুলি এখনও তাহারে কাছে অতানার মোহে যেতা—গুধু তাহায়া মনে এখন লবনে-ফুল তথা বিছাইয়া পড়ে, শেঁটুফুল কোটে,—তখনই কি আমি কেন গাছদের বড় ভাল লাগে।

গুণা আছকাল বেন এই পাছপালা, পথঘাট, এই অতি-পরিত্রাণের প্রতি আচ্ছাদিত অত্যন্ত বেনী করিয়া আঁকড়ািয়া করিতেছে। আসর বিবাহের কোন্ বিধানে এই কত গিরি পানভাগার পথটি, ভই তাহাদের বাড়ার শিঙ্কনের বঁপন, চায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপর—তাহার মোনার খোকা ভাইটি—হাছাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন ছুড় করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর চলিয়া বাইবে!

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিতম শিশির মত হয় ? এই ভিটাতেই নিতম শিশি ছিল, বিবাহ চট্টা কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে কিরিয়া আসে নাই। অনেক কাল আগের কথা—ছেলেবেলা চট্টে পল্ল তুলিয়া আনিতেছে। লকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল সুবিশদাবাদি বোলায়,—সে কতদূর কোথায় ? কেহ আর তাহার পৌঁছ খবর করে না; আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম শিশি আর বেগে নাই, মাকে আর

বেগে নাই, তাই বোনকেও না। সব একে একে মরিয়া গিয়াছে। মাগো,মাগুবে কেমন করিয়া এমন নিতম হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে করে নাই! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম শিশির কথা ভাবিয়া চোখের বল ফেলিয়াছে। আজ যদি চট্টা সে কিরিয়া মাগে—এই খোর মল্ল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবে ?

তাছারও যদি ঐ বকম হয় ? ঐ তাহার বাবা, মাকে, অপরকে ছাড়িয়া—আর কখনো দেখা হইবে না—কখনো না—কখনো না—এই তাহাদের বাড়ী, পানভাগা, ঘাটের পথ ?

ভাবিলে গা শিররিয়া ওঠে,—দরকার নাই। চট্টাই-ভাতির মাঝামাঝি মপুনের বাড়ার উঠানে ফাফব ডাক শোনা গেল। গুণা বলিল—বিনির মলা মেন—নিযে আর তো ডেকে অপর ? একটু পরে অপর শিঙ্কনে শিঙ্কনে গুণার মদবরণী একটা কাগো মেরে অগিয়া—একটু মদিয়া মেন কতকটা মরমের মেরে বলিল—কি হজ্ঞে চপ্পা গদি ?

গুণা বলিল—আর কি বিনি, চট্টাই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেরেই ওপাড়ার কানীনাগ চকতির মেরে—পরবে মাঘ মল্লা পাড়ো, চাতে মক মক কাঁচের চুড়ি, একটু মদা পড়ন, ফুল নিতান্ত নাগানিয়া। তাহার বাপ গুণীর বাবুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাক্কা তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গুণা-পাড়ারই এক পাশে নিতান্ত লক্ষ্যিত ভাবে বাস করে। অপরও ভাল নয়। বিনি গুণার করমাইল পাটিতে নাগিল পুর। বেড়াইতে আসিয়া চট্টা সে মেন একটা লাতজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া গড়িয়াছে, এখন ইচ্ছা তাহাকে সে উৎসবের অঙ্গীকার স্বীকার করিবে কি না করিবে—একপ একটা বিখ্যামিত্রিত উল্লাসের তাণ তাহার কথাস্বার্থে ভাবজন্মিত প্রকাশ পাইতেছিল। গুণা বলিল—বিনি, আর চট্টা শুক্কো কাঠ ঘাণ্ তো—আন্তনটা মপুতে না ভাণ—

বিনি তখন কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোকা বন্দনা বেগের ভাগ আসিয়া গাধা করিয়া বলিল—

এতে হ'বে ভগ্না দিদি—না—মার আনবে। ৭—৩গা বখন  
বলিল—বিনি এসেচে—ও ও তো এবাংনে যাবে—মার ভূটো  
চাপ নিয়ে আর অশু—বিনির মূখ খানো পুসিতে উজ্জ্বল হইয়া  
উঠিল। বানিকটা পরে বিনি চল আনিয়া দিল। মাগ্নেহের  
হেরে ছিলামা করিল—কি কি তরকারী ভগ্না দিদি ?

অশু বলে—শুগুনির উঠে এসে ছাপ দিদি ? তাত  
হইয়া গিয়াছে, নামাইয়া ভগ্না তেলটুকু দিয়া বেতন  
তাগাতে ফেলিয়া দিয়া আছে। বানিকটা পরে সে অবাঙ্  
হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অশুকে ভাঙিয়া বলে—  
টিক একবারে সত্যাকারের বেতন-তাগার মত হঃ  
হঃ হেঁচিচ্ছ অশু ! টিক যেন মার গালা বেতন-তাগা,  
না ?

অশুও ব্যাপারটা আন্দাজা বাধ হয়। তাহারও এখনও  
যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহারে বন-ভোজনে সত্যাকার  
তাত, সত্যাকার বেতন-তাগা সস্তবধর হইবে ! তাহার পর  
প্রভনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে তখু তাত  
আর বেতন-তাগা, আর কিছু না। অশু গ্রাম যুখে  
হুলিবার সময় ভগ্না সেদিকে চাহিয়াছিল, মাগ্নেহের সঙ্গে  
ছিলামা করে,—কেনন হইতে রে বেতন-তাগা ?

অশু বলে,—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু হুন্ হুনি  
যেন—

লগ্নকে বন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহায়া  
কত একবারেই বাস দিয়াছে, লগ্নের বাগাই রাগে নাই।  
কিন্তু মধ্যস্থদিতে হুজনে কেবো আগুর কল-ভাতে ও  
পান্নে আশ-পোড়া বেতন-তাগা দিয়া ভুইয়াতির তাত  
খাওতে বলিল। হুগার এই প্রথম গালা, সে বিষয়মিশ্রনো  
আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ  
করিতেছিল। এই বন-কোণের মধ্যে, এই চুক্কা আতা  
পাতার রানের মধ্যে, খেজুর তলায় বরিয়া-পড়া খেজুর  
পাতার পাশে বসিয়া সত্যাকারের তাত তরকারী  
খাওয়া !

খাইতে খাইতে ভগ্না অশুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া  
পুসির হাসি হাসিল। পুসিতে ভাতের গলা তাহার গলায়  
মথো আটকাইয়া খাইতেছিল যেন ! বিনি খাইতে খাইতে

ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে ভগ্নাদি, মেটে  
আগুর কল ভাতে মেখে নিতাম। ভগ্না বলিল—অশু, ছুটে  
নিয়ে আর একটু তেল—

যে জীবন কত লত পুণ্যের ভাটার, কত আনন্দ-  
মুহুর্তের আলো-কোণার অবদানে মজিত, ইহাদের সে  
মাধুরীময় জীবনযাত্রার ল'বে তো আরম্ভ ! অনন্ত যে জীবন-  
পন্থর হইতে বহুদূরে দূরীর দূর কোন্ ওশারে বিদগ্ধিত,  
সে পথের ইহারা নিত্যর পুর পলিকদল, পথের বাক  
ফুলফুলে হুঃহুঃ, ইহাদের অত্যাশ্রিত একবারে নতুন।

আনন্দ ! আনন্দ ! প্রদারের আনন্দ, জীবনের মাঝে  
মাঝে যে আভাষ আছে, বিনাশ কুহারমোহিনী  
গিরিসঙ্কটের বদিকের লবটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ,  
অজানার আনন্দ ! লামাত্র সামাত্র, ছোট পাটো চুক্ক  
ঘনিষের আনন্দ !

অশু বলিল—মাকে কি বলাব দিদি ? আবার ওবেলা  
ভাত খাবি ?

—হু, মাকে কখনো বলি !

পাশে এখন—

দুগীর বাহুন বলিয়া পাড়ায় গেল খাইতে চাউনে  
লোকে ঘটিতে করিয়া গেল পাঠতে দেখ, তাহার আবার  
মাঝিয়া দিতে হয়। বিনি প্রত্যেকবার ইতস্তত করিয়া অশুর  
গালটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু গল চেপে দেও  
তো অশু ? গল ততো পেয়েচে ! অশু বলিল—নাও না  
বিনি-কি, চুমি নিয়ে যাও না, চুক্ক দিয়ে বাও না !

তখু যেন বিনির দাফল হয় না। হুয়া বলিল—নে না  
বিনি, পেলাসতা নিয়ে যা না ?

বাগয়া হইয়া যেনে ভগ্না বলিল—চাঁড়িটা ফেলা হ'বে  
না কিন্তু, মাঝার আর একদিন বন-ভোজন কর'বে—কেমন  
তো ? ওই ফুলগাছটার গুণের টাকির রেখে দেবো ?

অশু বলিল—হ্যা, ওখানে থাক'বে কিনা ? মাতোর মা  
কাঠ ফুড়োতে আসে, দেখতে গেলে নিয়ে যাবে দিদি—  
জাতী চোর—

একটা ভাঙ্গা পাটলের খুলখুলির মধ্যে ছোবাতা ভগ্না  
মাঝিয়া বলি।



অপূর বুক ডিপ্ ডিপ্ করিতেছিল। ঐ বুলবুলিটার  
ওপিনে আর একটা ছোট বুলবুলি আছে। তাহার মধ্যে অণু  
লুকাইয়া চুকুটের বাস গ্রহিয়া দিয়াছে। দাঁদি দেখিকে যদি  
হাইরা পড়ে।

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি  
ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। তাহার পুত্র বাবু, পুত্র  
চুকটু যায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে।  
অপূর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুকটু  
খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে একটি পরমা বাড়ী  
হইতে যোগাড় করিয়া লইয়া নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া  
গায়েমের হরিণ বস্ত্রের বোতান হইতে ভিন পরমা (বাঁকী চুই  
পরমা নেড়া নেড়) চাক্তা ভাগল মোড়া দশটি চুকটু কিনিয়া  
আনে। অপূর হাইবার লাক্ষ্য হয় নাই, নেড়া গিয়া তাহার  
'ভগ্নীপতির' 'চুকটু'তে কিনিয়া আনে। পরে অণু সেমিন  
এই বন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা দিগারেট  
ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই, ভেতলা, ভেতলা, কেমন  
একটা বাঁক—তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়া বৃকের মধ্যে কেমন  
করিয়া উঠিয়াছিল। চটান খাইয়া সে আর খাইতে পারে  
নাহ, কিন্তু তাহার ভাগের বাঁকী চারিটি চুকটু সে ফেলিয়াও  
দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট লগ্ন্যহীত একটা  
খালি চুকটুের ব্যাগে সে করটি সে অই পোড়োজিটের জঙ্গলে  
ভগ্নীপতি পাঠিলের বুলবুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে।  
অণম চুকটু খাইবার দিন চুকটু টানা শেষ হইয়া গেলে  
ভগ্নীপতির বৃকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল পাছে  
দুবেও গন্ধ হয় টেড যায়। পাকাভুল অনেক করিয়া  
খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ঘুরিয়া অনেকবার  
পত্রাঙ্ক করিয়া ভবে সে দেখিন গুনকার মগ্নমগ্নমাকে  
এবেণ করিয়াছিল। তার বুক আজ বায়ালগুচ্ছ বহা  
পাড়িয়া!

কিন্তু বিবিধ পাঠলের ওপিনে হাইবার বরকার হয় না।  
এপিনেট কাক লগ্ন্য হইয়া যায়।

কথাটা। সন্ধ্যায় ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনি।  
আজ কয়েকদিন ভইতে নীরেনের সঙ্গে অরণ্য রাইয়ের,  
বিশেষ করিয়া তাঁহার ছেলে গোবিন্দের মনোভাব চলিতেছিল।  
কাল দুপুর বেলা নাকি পুত্র বন্ধু ও চৌচামেটি বাধে।  
কলে কাল রাইয়েই নীরেন কিনিমণ্ডর হইয়া এখান হইতে  
চলিয়া গিয়াছে। অরণ্য রাইয়ের প্রতিবেদী বাক্ষর দাঁড়াইয়া  
দ্রী ধরিমতী বলিতেছিলেন—সত্যি মিথো জানিনে, ক'দিন  
থেকে তো নানা রকম কথা শুনেতে পাচ্ছি—জামি বাপু  
বিশেষ করিনে, যেটা শুধন নহ। আবার নাকি শুন্গাম  
নীরেন লুকিয়ে টাকা বিয়েছে, যে নাকি টাকা কোথায়  
পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতে লেখা রসিদ কিবে এসে  
গোবিন্দের হাতে পড়েছে এই সব। সবী ঠাকুরল আবার দুপ  
টিপে টিপে বলে—বাপু বাপু, সে সব পরের কাজ শুনে কি  
হবে? নীরেন শুন্গাম বলচে—আপনারা সকলে মিলে এক  
জনের ওপর অত্যাচার কর্তে পারেন, তাতে যোগ হয় না?—  
আপনারা যা ভাববেন তাবন, যে ঠাকুরল একবার হুন্ম  
কখন আমি রকে এই সঙ্গে আমার হারানো যাগের মত  
মাথার ক'রে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার  
করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ বানিকল্প হোণ—সবের  
আগেই সে গরলাপাড়া থেকে একদানা পাড়া ডেকে জাম্বু  
জিনিষ পত্র নিয়ে চলে যেন।

সন্ধ্যায় কথা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। সে হইতমধ্যে  
স্বামীকে দিয়া অরণ্য রাইকে নীরেনের পিতার নিকট এ  
বিবাহ লক্ষ্যে পত্র লিখিতে অগ্রহণ করিয়াছে। নীরেনকে  
আরও গ্রহণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—ছেলেটিকে  
তাঁহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিষের তাহাকে অনেকবার  
দুখাইয়াছে নীরেনের পিতা বড় লোক—তাঁহাদের ঘরে তিনি  
কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সন্ধ্যায় কিন্তু আপা ছাড়ে  
নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সে লাক্ষ্য পাইয়াছে—  
এ বিবাহের যোগাযোগ যেন নিত্যই চরাচর নহ, ইহা ঘটবে।  
হরিষের মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও হার অগ্রহণে অরণ্য  
রাইকে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে  
কড় বিশদ ঘটিল!

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে সোফলের হটরের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরবে কেন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস। বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া কর কর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম কাঁটা লাগি খেয়েই দিন বাবে—কউ নেই হুগুণা—তাই কি তাইটা মাহুণ ? কোথাও যে তদিন জুজুবা সে আশা নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক তরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পুড়ীমার কলহের বিক্রেত তীর প্রতিবাদ ও তাহার গবে মাহুণাতক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে ছোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা শুধাইয়া বলিতে না পারিয়া শুষ্ক বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক ? বসুক সে না, সে কহবে কি ? কেবো না পুড়ীমা লজ্জাটি, আমি বোক বাবো তোমার কাছে—

সজ্জয়া তুলিয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, বোমা কি বলে টেরে যে হুগুণা?...তা—নীরবেনের কথা কিছু হোল না কি ?

দুর্গা লজ্জিত সুরে বলিল—তুমি ভাল জিনিস কওো না যাতে ? আমি জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল—পুড়ীমার কাছে কি তুলি ? মাটার মণার আর আসবেন না ?

দুর্গা বহক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—না আসকে গে—

তাহার পর সে তখন যুগ্মবার বাড়ী গেল। রাত্রির দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কুটুং কুটুংনিয়া সকলে ঘান নাই। ছেলে মেয়েরও অনেক। একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তার নাম টুনি। তাহার বাপও অসিরাডেন, আর দুপুরের পর ঐ ও কজ্জাক কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কখনো লিগাছেন। বস্তুি বানেক পরে, সেজ ঠাকুরণ এখরে কি কাজ করিতেছিলে, টুনির মাথের পলা তাহার কানে পেল। সেজ ঠাকুরণ দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে হালি কি ? টুনির মা উত্তেজিত ভাবে ও ব্যস্ত ভাবে বিছানা পত্র, বাসিলের তলা হাতকাইতেছে, উকি আরিতেছে,

ভোষক উন্টাইয়া ফেলিয়াছে ; বলিল—এই মাত্রর আমার সেই শোনার দিহুর কোটোটা এই বিছানার পাশে এট খানটার বেবেছি, বোকা বোণার টেভিরে উঠল উনি বাড়ী থেকে এলেন—আর তুমতে মনে নেই—কোথার গেল আর তো পাছি নে ?—

সেজ ঠাকুরণ বলিলেন—ওমা সে কি ? তাতে ক'নে নিয়ে আসনি তো ?

—না বিবিমা, এট খানে বেবে আছে, ঠিক এই খানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কোটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাকুরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন দালানে প্রথমটা এ বাড়ীর ছেলে-মেয়ে ছিল, তারপর ধাবার পাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলে-মেয়েরা সব দাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাকুরণের ছোট মেয়ে টেপি চুপি চুপি বলিল—আমরা খেই দাবার খেতে সেলাম হুগুণাখি তখন দেখি যে খিড়কী ঘোর দিগে, বরিতে যাতে, এট মাত্রর আবার এসেচে—

সেজ ঠাকুরণ চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে কক্ষতরে দুর্গাকে বলিলেন—কোটা দিগে যে ডাগুয়া, কোথার য়েবেচিস বসু—বার কর এখুনি বসিচি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাকুরণের ভাব ভাবিতে তাহার জিব যেন যুগ্মের মধ্যে জড়াইয়া গেল। সে অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভাল বোকা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভগ্নবরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরতে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, বিশেষত দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে বেধিতেছে, বেধিতে বেশ চেষ্টায়া বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সন্দেহ ? সে বলিল—ও নেব নি বোঝ রহ সেজদি—ও কেন—

সেজঠাকুরণ বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না ? তুমি ওর কি জানো ? নিজেচে কি না নিজেচে আমি জানি ভাল ক'রে—



একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস্ বের ক'রে দে.  
নরোতা কোথায় আছে বল,—আশপ চুকে গেল। দিয়ে দে  
লম্বাটি, কেন মিথো—

হুর্গা! যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তার পা ঠক্ ঠক্  
করিয়া কাপিতেছিল—সে দেওয়ালে হৈম্ দিয়া পাড়াইয়া  
বলিল—আমি তো জানিনে কারো—আমি তো—

সেই ঠাকুর বলিলেন—বলোই আমি শুকো? ঠিক  
ও নিশ্চয়—ওর ভাব দেখে আমি বুকেত পেরেছি। আচ্ছ,  
তল কথার বন্ডি কোথায় রেখেচিস্ দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে  
হাত কিছু বোঝো না—আমার জিনিস পেলেই  
না—

কুঁকুড়ানো কুঁকুড়ানো বলিলেন—তব্বর লোকের মেয়ে চুঁচু  
করে কোথায় গুনিমি তো কখনো। এই পাড়াতেই বাড়ী  
নাকি?

সেই ঠাকুর বলিলেন, তুমি তল কথার কেউ নও?  
দেবে ক'ম মজাটা একবার? তুমি আমার বাড়ীর জিনিস  
নিয়ে হজম কর্তে গিয়েচো—একি বা তা পেতে বুঝি?  
তোমার আমি আচ্ছ—

পরে তিনি হুর্গার হাত পানো ধরিয়া হিড়্, চিড়্, কচিরা  
টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন,  
এল এখনও কোথায় রেখেচিস্?...বলুবি নে?...না তুমি  
জানো না তুমি বুঝি—তুমি কিছু জানো না—ঈগুপির  
এল, নৈলে হাতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো ক'রে  
ফেঁসে গেল। বুলু! বুলু! বুলু! বুলু!—

হুর্গার মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিলেই একজন  
কুঁকুড়ানো বলিলেন, রোসো না, বেগুড়ো না আই ঠিক  
নিচ্ছে। চোখের মাঝে গুঁড়ো—দিয়ে হাত এগুনি দিতে  
দেল,—কেন মিথো—

হুর্গার মাঝার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহ্য  
ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুকনো জিবে লড়াইয়া  
উদ্ধার করিচ্ছ—আমি তো জানিনে কারো, আমি  
নিই নি। ওরা সব চ'লে গেল আমিও তো—কথা বলবার  
সময় সে ভরে আড়ত হইয়া সেই ঠাকুরের দিকে চোপ  
রাখিয়া দেওয়ালের দিকে বেশী দূরিতে গেল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও বানিকরণ তাহাকে  
বুঝাইল। তারই সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চেঁচি—

টোঁপ বলিল—বাথানের আমন্তলা তলায় পড়বার  
যে নেই কারো—

বেশত কথাতেই বেগ হইলে সেই ঠাকুরের কোন  
বাণী বা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজবার প্রহেলার আগ্রহ  
ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবেই পাঁজি, নজর, চোখের  
কাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখ তুমি যেও কি না  
দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি হুর্গার উপর বাঁশায়া  
পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে চুকিতে  
লাগিলেন। বুলু কোথায় রেখেচিস্—বুলু! এগুনি—বুলু  
ঈগুপির—

হুর্গার মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেই ঠাকুরকে  
হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেদিন—  
বাৎসে আমার চোটে; ওরকম ক'রে মারেন কেন?  
ছেড়ে দেন—বাৎস হেঁচো—জাফ্রান ছিঃ! হুর্গার মা দেখিয়া  
কাঁদিয়া উঠিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ কুঁকুড়ানো বলিলেন—এ, রক্ত  
পড়তে যে—

ক'র করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ্য করে নাই।  
বুলুর কাপড়ের বানিকটা রক্ত পড়িয়া যাত্রা হইয়া  
উঠিয়াছে।

হুর্গার মা বলিলেন, ঈগুপির একটু গল নিয়ে আর  
টোঁপ—রাগের বাসন্তে আছে আচ্ছ—

চোখেটি ও হৈ চৈ তানিয়া গানের বাড়ার কামাধার  
কি-বোরা-হুগার কি দেখিতে আসিল। হুগার মা  
এতক্ষণ ছিলেন না—চপরে বাগা মাগার পরে কামার  
বাড়ী বদলা গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে হুর্গার মাঝার মধ্যে ক' ক' করিতেছিল,  
সে দিশায়া তাই তিড়ের মতো একবার চাহিয়া দেখিল  
অপু তাহার মধ্যে আছে কিনা এক নাই দেখিয়া আশ্রয়  
হইল। অপু তাহার মাঝ দেখিতেছে সে বড় লজ্জার  
কথা হইল!... ৫

## ঐতিহাসিক বঙ্গদেশ

এল মাগিলে রাহুর মা তাঁহার চোখে বুঝে এল বিয়া  
তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে কেমন কিম্ব  
কিম্ব করিতেছিল, সে বিশাখারা তাহে বসিয়া পড়িল। রাহুর  
মা বলিল—অমন কবে কি মাঝে সেকদি ? ...তোগা  
মেঘটা—

সেইকাল বসিলেন—তোমরা গুণে চেনে নি  
এমনো। চোখের মস্তাঝাড় অম্ব নেই এই বলে দিলুম—  
মাঝের এখনও রয়েছে কি—

রাহুর মা বলিলেন—রয়েছে, এখন একটু দাম্পত্যে বেগ  
জন্মি—যে জন্ম করেচো—

তিনি মা বলিল, ও মা এত হবে জানলে কে কোঁটোর  
কথা বলতো ? কে জানে যে এত হবে—চাইনে আমার  
কোঁটা—ওকে ঘেঁড়ে বাও সেকদি—

সেইকাল এত লজ্জা ছাড়িয়েনি কিনা জানা যায় না,  
কিন্তু অমনতর তাঁহার বিরুদ্ধে তার দিতে লাগিল। কাজেই  
তিনি মাগামিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাহুর মা তাঁহাকে ধরিয়া গবিকের দরজা খুলিয়া বিড়কীর  
উঠানে বাহির করিয়া দিলেন; বলিলেন—পূব ক্ষেপে আক  
বাড়ী থেকে ঘেরিঘেছিলা যা হোক ! যা আছে আছে যা—  
টোঁপি বিড়কীটা ভাল করে পুণ দে—

দুর্গা বিশাখারা তাহা হইয়া বিড়কী দিয়া বাহির হইয়া  
গেল, সমস্ত মেয়েছেলে ও বাগার উপস্থিত ছিল—সকলে  
চোখা দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বাকার করে না—কি রকম  
সেমেটো একবার ? ...চোপ বিধে কিম্ব এক কোঁটা এল  
পড়লো না—

রাহুর মা বলিলেন—এল পড়েছে কি, অম্বই তকিরে  
গিয়েছে। চোখে কি আস এল আছে ? ওই রকম কবে  
মাঝে ?

গ্রামে বারোঘাণী চক্কপুবার সময় লাগিল। গ্রামেব  
সৈয়দুল মঈনুল চাঁদার-বাডা চাড়ে গাড়ী বাড়া টানা

আমার করিতে আনিলেন। চরির বলিল—না পুড়ো,  
এবার আমার এক টাকা চাঁদা বরাটা অজ্ঞার হয়েচে—এক  
টাকা দেবার কি আমার অবস্থা ? বৈজ্ঞান্য বলিলেন—না  
হে না, এবার নীলমণি স্বাক্ষর কর। এ রকম বলটি এ  
অফলে কেউ চক্কও দেখেনি। এবার পাল পাড়ার বাজারে  
মধেব সেকুর বলক কেউনের মল পাইবে, তার সঙ্গে  
পায়। দেওয়া চাই-ই—

বৈজ্ঞান্য এমন তাহা দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দু-  
বাদীপনের জীবন মরণ এটি প্রতিযোগিতা বাক্যের উপর  
নির্ভর করিতেছে।

অম্বুর মাঝারি বন্ধ হওয়াও উপক্রম হইল। বারোঘাণী  
তলায় বাস চাউয়া লক্কও বেগের মেয়াল দাঁদিয়া দামিয়ার  
টাকানো হইয়াছে। দাঁদাবল আসে আসে—এখনও পৌঁছে  
নাই। লক্ষ্য উত্তীর্ণ হইয়া গেলে লোক বলে কাল সকালের  
পাড়তে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈজ্ঞান্যের আশাও  
পাকে। তবে অম্বুর গুম হয় না, বাঁধাভাড়া বজার প্রান্তের  
মত কোঁহল ও পুরি বে কা গবল, অমনা উচ্চাঙ্গ।  
বিজ্ঞান্য ছুটুকুট এপাল ওপাল করে। যাডা চাবে! যাডা  
চাবে! যাডা হবে!

মাঝের বারগ আছে মত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও  
না যায়, দুর্গা চুপি চুপি দিয়া সেদিয়া মাগিয়া স্বাক্ষর  
কাছে আলক-সক্ক ও বাণের গারে স্কালো লাল, নীল  
কাপড়ের মাগার অভিনব লবঙ্গের গল্প করে। অম্বুর মনে  
হয় যে-পকানন তলায় সে ছুবেলা কড়িগলা করে—সেই বুদ্ধ  
মহাশয় ছুটি লামার হানটাতে আক বা কাল নীলমণি  
স্বাক্ষরলের বাজার মত একটা অতুলপুল মবাক্তব ঘটনা  
ঘটিবে, এও কিম্বদন্তি ? কপাটা যেন তাহার বিবাসই হয় না।

হঠাৎ তিনিতে পাওয়া যায় আক বিকালেই বল আসিবে।  
এক বগল বুদ্ধ যেন বুদ্ধ হইতে নাচিয়া চলেইয়া একবারে  
মাঝার উত্তীর্ণ পড়ে। ...অপটে এক বগলের লোক আছে যাত্রা  
বড় মিনমিন। কি হুগে কটাকি হুগে ভাঙলো মনই তাঁহারা  
ভোগ্য করে ওপর ওপর, পান্দে পান্দে চান; কিছূ-ত  
সামান্যক তেমন থাকে দিয়া যায় না—চৈতন্যপ্তিচান।  
অম্বু মে বগলেব ছেলে নয়; সে দেই বগলের দারা ভাবনেন





চোটে বড় সকল অবস্থানকে চরিতে প্রাণপণে নিঃসারি।  
চুপিয়া আঁটগার করিয়া বাঁওগার ক্ষমতা রাখে—স্ববৎ যেমন  
বেশী পাক, চঃখৎ কিছু তেমনি। গগন বসন্তের দোরেল  
কাকিলের ডাক ওদেরট তরল পদযাত্রারল দেখে প্রথম  
আসে, কালৈবশ্যমীর প্রথম অঙ্ক ওদেরই মঙ্গলকে বজার  
লগ্নে প্রাণপণে সূচিত্তে হয়, বোধ হয় বা ভক্ত-বৃত্ত থেকে  
ভাঙিয়াও পড়ে।

সুখ-পাড়ার ফোড়ে গুপ্তের পর হইতেই সকল ছেলের  
মুখে পাঁচটিয়া থাকিবার পর দুই একখানা গরুর পাড়ী  
তাগার চোখে পড়িল। সাতের বাস বোকাই পাড়ী এক,  
চুই, তিন, চার, পাঁচ খানা। পট্ট একে একে বাড়ল বিজা  
গুণিয়া বুদির হুই বসিল—অপূনা, চলো আমরা ওদের  
পেছনে পেছনে এদের বাগার গিরে ঘেঁষে আসি, যাবে?  
সাতের পাড়ীভার পিছনে ঘরের লোকেরা বাইতেছে,  
সকলের মাথার টেরকাটা, অনেকের ভূত: জাতে। পট্ট  
একজন দাঁড়ি-ওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বাঘ হয়  
গ্রাভা থাকে, না অপূনা?—আকাশ বাতাসের হা একবারে  
বন্দাটিয়া খেল—কাল দশাগেই বাহা। অপূ মঃ উম্মাকে  
গাড়া ফিরাই দেখে তাহার বাবা বাওগার বাসিয়া কি  
নিষিদ্ধে ও শুভবৃত্ত করিয়া পান করিতেছে। সে ভাবে  
নারাদলের আদিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে,  
তাই এত সূচি। সে উম্মাকে হাত নাড়িয়া বলে—সকল  
একবারে পাঁচ পাড়ী বাহা। এ রকম বল। হরিহর শিশু  
বাড়ী বসি তাঁর বস্ত্র বাগির কাপড়ে কণ্ঠ নিষিদ্ধবিল,  
বুধ ভুলিয়া বিস্ময়ের হুই বলে—কিলের কী?—আপা?  
অপূ আকর্ষণ হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানি নাই!  
বাগাকে সে নিস্তাক ভুগার পাজ বিবেচনা করে।

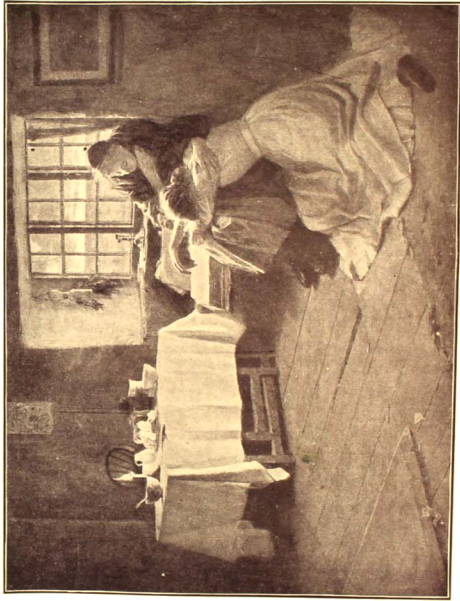
সকলে উঠিয়া অপূকে পড়িতে বসিতে হয়। বাসিক  
পরে সে কাঁধে কাঁধে ভাবে বলে—আমি ব্যাভাষারী তলার  
বাগে বাবা, সকলে বাড়ি আর আমি এখন বৃষ্টি ব'লে ব'লে  
পড়বো? এতগুলি যদি বাত্মা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো এখন ব'লে পড়ো, বাত্মা  
আরম্ভ হ'লে তোল বাজ'বার শব্দ তো শুভে পাতলা যাবে?  
তখন না হয় যেও এখন। গোট বয়সের ছেলে, সব সময়ে

আমকাল বিবেচনা থাকে, আরম্ভের বস্ত্র বাড়ী আসিয়া  
ছেলেবেলা চোখ ছাড়া করিতে মন চায় না। থাকনা—তবু  
যতক্ষণ চোখের সামনে বসিয়া থাকে। অপূর মস্তিষ্কে যোগ  
চোপ দিয়া বস পড়িতে থাকে। সে ভাঙা-ভরা গলার  
আবার শুভবৃত্তী লুক্কিবে—মাঘ মারিনা আর বস্ত্র দিন তার  
পড়ে কত?—

কিন্তু সকলে রাজা বলে নী, ববর আসে প্রবল  
বসিবে। ওবেলা অপূ চর্যার কাছে গিয়া কীধে: কীধে:  
ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আত্মপূর্ণিক বর্ণনা করে।  
মা আসিয়া বলে—যাও না গো ছেলেটাকে পুড়ে?—কল্লীর  
কারের দিনটা। অপূ দুপুরে দুটি পায়। সারা দুপুর বসে—  
হাতী তলার কাটা হাতার। মা বলে—কল্লী এখন আরম্ভ  
হবে তখন বাড়ী এসে কিছু খেয়ে খেও। বৈকালে খাইতে  
অপূ বাড়ী আসে। বাবা সোফাকে বসিয়া কবিতা লিখিতেছে।  
অল্প দিন এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া  
পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চিটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা  
তাহাকে বুদি রাখিবার জন্য নানাবকম কৌতুকের আয়োজন  
করে। বলে—খোকা, চুট'ক'রে বেলেটে গিয়ে আনো দিকি  
ঐ: ভূত বাগে!—অপূ সব অসুত ধরনের কথা শুনিয়া  
হাসিয়া পুনঃ হয়, তাকাতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে—  
বাবা এইটে হ'লে বেলে আমি কিছু চ'লে যাবো?—তাহার  
বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন, খোকা—আজ চুট'ক'রে  
গিয়ে আনো দিকি—আর একটা অসুত কথা বলে। অপূ  
আবার হাসিয়া উঠে।

আম কিছু অপূর মনে হইল, বাতির হইতে কি একটা  
প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে  
মগাহিয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়া-ভরা বৈকালে  
বাণবন-বেগা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু  
এমন শক্তি নাই যে তাহাকে বগাহিয়া জাখে। এখন যদি  
বলে—খোকা, এস পড়তে বসো—অবনি চারিদিক চাইতে  
একটা ঘন ভরানর প্রতিবাসের হইগেল উঠবে। সকলে  
যেন বলিবে—না, না, না, এ হয় না, এ হয় না। বাত্মা যে  
বলে বলে!—কেন? উম্মার প্রবল শক্তি তাহার বাগাকে  
যেন নিস্তাক অবগাধ, নিবীঃ হরল করিয়া দিয়াছে।



माइना

मिर्ची-झाड़, बापल







যেহ বাতাসন তলে খুলে খেল যায়,—

মুখ মম চিত্তটরে করি একাকার

সমস্ত হারাবে

গগন মুকুল-পঙ্কে রহিল দীভাতে ।

পাউ বনে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস প'ড়ে

মহাক্ষ বাখারে মোহি তোলে দ্বিষ্ট ক'রে ।

আমি পারি যেহি' চেয়ে শুধু মনে হব

এ বিপুল হৃদয় যে মহাপ্রাণময় !

আজি কোনো অবদান, শেষ নাই, তেরি,—

কণে ক্ষণ ইষ্ট চক্ষে পূরোণেরে যেহি' ।

নামি রাখে দ্বিধা,

সকল নৃতন করে দক্ষিণ দরীর ।

সে নৃতন ল্পর্শ লাগে কুন্তবোধি তলে,

কলিঙ্গ-কুলে কুলে কুলে উজলে,

নবীন অঙ্গুর রাগে আকুল বিহবল,

তব হাটে কেঁপে ওঠে প্রায় লম্বল ।

কলিঙ্গ-কুলে

অঙ্গুর হৃদয়ের শানে সিঁদু অঁখি তুলে,

রক্তকরবীর শাখা ত'রে যায় মুখ অহুসানে,

মর্মে ছোঁরা লাগে,

চাট্টা ছা উলসিত, করে লক্ষ্যামণি

আঁপনারে হৃদ্যালোকে বস মনে গণি' ।

শাল-ছিন্ন আবে গনি,

উপ-হ্রেষ্ট মাঝে

মোহ-মুক্ত বাতাসের অন্তিমনি বাজে ।

নামহীন কুল পানী, তব কুল দরি'

প্রোজ্জ্বল পরব'ভাবে নৌক তোলে গড়ি',

তারো ক্ষুর চিত্র মাঝে এ আনন্দ রাপি

মহাক্ষ মুকুন্দা জরে উঠে উদ্ভাসি ।

চারিদিকে এ আনন্দ মহা'রে মিল,

সমস্ত স্থানবী তাতে নব অঙ্গ মিল ।

যেহ মন হল আশ্বহারা

এ উত্তাল আনন্দের লতি মৃত নাড়া ।

তৃণ হতে আকাশের অনন্ত গবয়ে

এ অপূর্ণ জনমের বার্তা গেল ব'য়ে ।

আজ মনে হব

যারে পের মনে করি সে ত শেষ নহ ;—

সে ত শুধু জনমের নানা মুখ ছল

আপন প্রকাশ লাগি নতুন কোশল ।

চারিদিক হ'তে এলে নানা স্মৃতিধারা

এ মঙ্গল-গণি মাঝে হ'ল আশ্বহারা ।

বিপুল গাগর হৃদয়ে মহাবক্তা ব'য়ে

বৃক্কর উত্তপ্ত মল গেল দিক হ'য়ে ।

ভিমাণ সমস্ত বায়ু এ সমুদ্র কূলে

নির্ধল উজল দ্বিধা কি তরল তুলে ।

সে মতান তীর্থে তবে

বলহের গরম পশিম

যেহ প্রজ্বল গবয়েরে

নতুন আলোতে দিল

নতুন জনম

## প্রেমের খেলা

আর্থার বিহ্‌য়ার

অনুবাদক—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক

( ক্রিস্টিনের ঘর, সাধারণ তৃৎস্বর ঘর )

ক্রিস্টিনে

( বাহিরে ঘাইবার জন্য সালামোদ্য করিয়া ) : কাথারিনা! দরজার  
টোকা খাটাইয়া দাও করিয়া এখন করিয়।

কাথারিনা

তত সূচ্য্য ফ্রান্সাইন ক্রিস্টিনে।

( ক্রিস্টিনে আসবার সময়ে ষ্টাডাইমারিক, বিগরা সেবল )

ক্রিস্টিনে

কাথারিনা

আপনি কোথাও কেহোজেনে যেখাছি ?

ক্রিস্টিনে

এমন কিছু তাকাতাছি নেই।

কাথারিনা

আমি এলুম, আমার বামী পাঠিরে দিগেন জাননাংকে  
নিমন্ত্রণ করত। আপনি যদি আমাংদের সঙ্গে আসে রাতে  
গেবার সাউগেনে আসেন,—আর ওখানে সন্নিহিত আছে।

ক্রিস্টিনে

অপেক্ষা করিয়া, ফ্রাই বিগার...কিন্তু আমি আসি যেতে  
পারছি না...আর একদিন, কেমন ?—আপনি স্বাগ  
করবেন, না ?

কাথারিনা

না, মোটেই না...কিন্তু কেমন ? হী, আমাংদের সঙ্গে  
গিয়ে আর কি এমন আমাংদের হবে, তার চেয়ে আর  
কোথাও নিশ্চয় আপনি বেশী আমাংদের উপভোগ করিতে  
পারবেন।

ক্রিস্টিনে

কাথারিনা

যদি এখনও বিয়েটার থেকে আসেন নি ?

ক্রিস্টিনে

না, তিনি বিয়েটার দ্বারা আসে একবার বাড়ীতে  
আসবেন। এখন মাঝে সাতটার আশঙ্ক হয় কি না।

কাথারিনা

ঠিক, আমি প্রত্যাশা করি। যদি আমি আসি, তার  
জন্তে আমি অপেক্ষা করবো। এই যে সন্ধ্যা সেরে-টা বিয়েছে  
না, তার জন্তে যদি ক্রি পাণ পাই...এখন যোধ হয় পাওয়া  
যেতে পারে ?...

ক্রিস্টিনে

কিন্তু আর এমন সূচ্য্যাকণ্টা এত হ্রস্ব,  
কোনো এক বিয়েটারে যায় না।

কাথারিনা

কিন্তু আমাংদের মত সৌন্দর্য্য বিয়েটারে যাওয়াই ভাল,  
যদি বিয়েটারের কোন জানা পোনা পোক থাকে, ক্রি  
পাণ পাওয়া যায়।...কিন্তু ফ্রান্সাইন ক্রিস্টিনে, আমাংদের জন্তে  
আপনি গাফোলে না, আপনাং যদি বাইরে কোথাও যাবার  
দরকার থাকে। আমাংর বামী সত্যাই বড় পুণ্ডিত হবেন  
...আর, আর একজনও...

ক্রিস্টিনে

কাথারিনা

বিভারের পুঙ্কুতো ভাই আমাংদের সঙ্গে আসছে।  
জানেন কি ফ্রান্সাইন ক্রিস্টিনে, ও এখন একটা বেল ভাল  
কাজ পেয়েছে ?



ক্রিস্টিনে

(৩৩২৩-কিছু-খাল-খাল-না ১৯৫৩) ৩।—

কাথারিনা

আর বেশ মোটা মাইনে। কি চমৎকার লোক।  
আপনার প্রতি ভারী প্রভা আর অত্যাশা—

ক্রিস্টিনে

আচ্ছা—এখন আসি ফ্রাউ বিগ্গার।

কাথারিনা

আপনার নামে লোকে যাই বলুক না কেন, একটি  
কথাও বিশ্বাস করে না... ন

ক্রিস্টিনে

(৩৩২৩-কিছু-খাল-খাল-না ১৯৫৩)

কাথারিনা

সচি, একমুখ লোকও আছে...

ক্রিস্টিনে

১, ফ্রাউ বিগ্গার, আসি।

কাথারিনা

হ্যাঁ (বিস্ময়ভর স্বরে) যেহেতু যখন মিলন-বাসনে (সঁদে  
যত) যেহেতু গিয়ে না পৌছান, ফ্রাউবাইন ক্রিস্টিনে।

ক্রিস্টিনে

আপনার সচি কি চাই বলুন ত?—

কাথারিনা

আমনিই ঠিক! পৌরন শুচিবর্জক পাকে না।

ক্রিস্টিনে

আসি।

কাথারিনা

কিন্তু ফ্রাউবাইন ক্রিস্টিনে, একটি কথা আমার বলতে  
চাচ্ছে, আপনার একটা পাবলান হওয়া উচিত!

ক্রিস্টিনে

অর্থাৎ?

কাথারিনা

দেখুন—চিয়েনা ত একটা বড় নগর...কিন্তু কৃপণ?  
আপনারা যখন মিলন-বাসনি বাসি...না না...  
করবার কি মতকার?

ক্রিস্টিনে

কাথারিনা

বিগ্গার আমার বখন এসে বসে আমি বিশ্বাস করতে  
চাইনি। সে আপনাকে দেখেছে—আমি তাকে বলুম,  
তুমি ভুল দেখেছ; ফ্রাউবাইন ক্রিস্টিনে সে রকম মেয়ে  
নয় যে, সন্তোষের কাগালেবল স্বকদের সঙ্গে বেড়াবে।  
আর যদিই বা বেড়াই, তার এটুকু বৃদ্ধি আছে, সে আমাদের  
গলিতে বেড়াবে না। সে বলে, আচ্ছা, তুমি তাকে জিজ্ঞাস  
ক'রে দেখো। তারপর সে বলে, তা আর আশ্চর্য্য কি,  
আমাদের দিকে আর ত সে মাড়ায়ই না, এখন সব সময়ই  
ওই সুগায় মিচুসির পেছনে ছোটে;—কোন সন্ধ্যার মেয়ের  
পক্ষে ওর সঙ্গে যেনা কি ভাল?—জানেন ত ফ্রাউবাইন  
ক্রিস্টিনে, পুরুষমানুষদের মূখ কত মনাই বলতে পারে!—  
হ্যাঁ, ফ্রাউবাইন ও মন কথা বলেছে। সে বিগ্গারের  
ওপর কেপেই বাবে,—আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা সে  
মইতে পারে না, আপনার মুখে কেউ কিছু বারান বলে  
সে ত হাতাভাতি বাপার করবে। কিন্তু বখন আপনার  
পিদি বেড়ে ছিলেন—ঈশ্বর তাকে চিরশান্তি দিন—তখন  
আপনি বার-বুঝে ছিলেন না, কি নয় ছিলেন...(কিছুক্ষণ  
বিরাম) আমাদের সঙ্গে বাজনা শুনে আসবেন?

ক্রিস্টিনে

না...

(আইবি: প্রবেশ করিল, তারার হাতে মিলন-বাসনে লোভা)।

আইবি: -

আর মেয়েটি?—আপনার বাবা?

কাথারিনা

হ্যাঁ ঈশ্বরকে বরবাদ, সবাই বেশ ভাল আছে।

তাইরি:

বেশ,—( ক্রিস্টিনের প্রতি ) এমন সুন্দর সঙ্গ্য আর তুই  
বাড়িতে ব'লে—?

ক্রিস্টিনে

আমি এই বাইরে বেড়াতে বাজিগুম।

তাইরি:

বেশ!—আজ বাইরে এমন সুন্দর চাওয়া বইছে, তানেন  
ফ্রাউ বিস্তার, চমৎকার! আমি এই বাগানের মধ্যে  
দিয়ে এসেছি—কি লিলাক ফুল ফুটেছে—চমৎকার!  
কিছু ফুল চুরি ক'রে নিয়ে এগুম। ( ক্রিস্টিনকে ফুলের ভাঙ  
দিল )

ক্রিস্টিনে

কাথারিনা

মালি যে দেখতে পার নি, এই ভাগ্য।

তাইরি:

একটা ছোট ভাল তেজে এনেছি বই ত নয়,—ফুলে ফুলে  
একবারে ভরা।

কাথারিনা

সবাই যদি তাই ভেবে ভাল ভাবে ?

তাইরি:

তা হ'লে অবশ্য অগ্রসর হয়।

ক্রিস্টিনে

ক্রিস্টিনে

আমি... আমি মিত্রকে বলছি, তার কাছে যাও...

তাইরি:

ও, তা বেশ বেশ। হ্যাঁ, যোগেনের সঙ্গে যোগেন।

আজ্ঞা, এসো ক্রিস্টিনে...

ক্রিস্টিনে

( শিগগৈ চুপা বাসল, তারপর বলিল ) বিদায় ফ্রাউ

বিক্রির!—( ক্রিস্টিন চলিত )

এবে চাখিরা বলিল )

কাথারিনা

ফ্রাউনাইন মিত্রের সঙ্গে বড় গভীর বন্ধুত্ব।

তাইরি:

হ্যাঁ, তিনিই এই বন্ধুটি আছে ব'লে তাকে সাধারণ  
বাড়িতে একা ব'লে থাকতে হয় না, সেজন্য আমি গুলি।  
আমার এই মেয়েটি ভাবেন কি আর উপভোগ করছে!...

কাথারিনা

তাইরি:

তানেন ফ্রাউ বিস্তার, যখন রিটার্নেল থেকে ফিরে  
আমি আর বেশি ও এক: কোথায় ব'লে সেলাই  
করছে,—আমার যে কি কই হয় আপনাকে আর কি  
বলব! আর বিকেল বেলা খাবার পরেই আমার ও টেবিলে  
বসিয়েছি টুকতে কসে...

কাথারিনা

সেই বটেই, যারা জলপিত্ত তারা ও আমাদের চেয়ে অনেক  
গবেষে জ্ঞানকে থাকে। তা ওর যান সেখা কৈমন হ'লে ?

তাইরি:

কিণেব কিছু নয়। যেরে সাইবার সঙ্গে ওর পলা বেশ  
বটে, আর তার বাবার সঙ্গে ওই খেলাই পুর ভাণে—  
কিন্তু ও খেলার পরেই হোজনার হবে না।

কাথারিনা

এ বড় ছুঁপের কথা।

তাইরি:

ও যে তা বোকে তাতে আমি গুলি। অল্পত  
কোন রকম বেদনা পাবে না। আমাদের খিঁচটোরের  
কোণে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তবে—

কাথারিনা

নিশ্চয়, এমন সুন্দর দেখতে।

তাইরি:

কিন্তু আজ্ঞে উন্নতির, পরে বেশি লজ্জা হোজনারের,  
কোন আশা নেই।



কাথারিনা

হাঁ, যেহে থাকলে অনেক ভাবনা ! আমি এখন-ভাষি  
আমার দিনারল্ পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে একটি বছর-দু  
যেহে ক'রে উঠবে—

তাইরি:

ফ্রাউ বিত্তার, ঠিকিঃ কেন এতক্ষণ, এখন !

কাথারিনা

দুঃখবান, আমার বামী শিগগিরই আমার নিতে  
আসবেন ; আমি ক্রিস্টিনেকে নেমন্তর করতে এসেছিলাম—

তাইরি:

নেমন্তর করতে ?

কাথারিনা

হাঁ, আজ পেনারবার্টের পানবাড়না পেনাবার জন্তে ।  
ভাবনাম, আমারের সঙ্গে গিয়ে থাকনা তুলে মনটা বেশ  
প্রফুল্ল হবে । ওকে প্রফুল্ল করা দরকার ।

তাইরি:

নিশ্চয়, ওর সঙ্গে বুঝ ভালই—বিশেষতঃ এই নিরানন্দ  
শীতের পর । তা আপনাদের সঙ্গে গুলি দেল না কেন ?

কাথারিনা

কি ক'রে জানবো.....বোধ হয় বিত্তারের তাই  
আমাদের সঙ্গে আছে ব'লে ।

তাইরি:

তাকে শু বোটেই দেখতে পারে না,

কাথারিনা

কিন্তু, কেন ? ফ্রান্স অতি ক্ষু, ভালোমানুষ লোক,  
—আর এখন তার একটা ভাল চাকরি হয়েছে, আজ-  
কালকার দিনে এ সৌভাগ্যের কথা.....

তাইরি:

হাঁ, পদার্থ যেহে সঙ্গে বটে—

কাথারিনা

সব যেহে সঙ্গেই ।

তাইরি:

আজ্ঞা, এখন ত ফ্রাউ বিত্তার, এরকম একটি প্রস্তুতি

যেহে সঙ্গে এক ভাগ্যক্রমে-চাকরি-পাওয়া সহ ভালমানুষ  
লোককে পাওয়াই কি কীকনের সহ ?

কাথারিনা

আবার কি চাই ! কোন জমিদারের ছেলে আসবে  
ব'লে ত কেউ ব'লে থাকতে পারে না । তারপর তিনি  
বলি বা কখনও আসেন, সাধারণত, বিয়ে না ক'রে এমন  
ভাবে চ'লে যান যে কেউ জানতেও পারে না.....তাইরি:  
জানবার নিচট দিবা ঠাটাইল । (বোধহয়) না, আমি বলি কি  
দুবতী যেহেদের সঙ্গে সব সাবধান হওয়া দরকার—  
বিশেষত এই দেখানো—

তাইরি:

প্রথম যৌবনের দিনগুলি এটি ক'রে বুঝা যেতে দেওয়া  
কি ঠিক ? তারপরে এই খেচরী এত ভালো যেহেদ  
কপালে কি হল—এত বছর অপেক্ষা ক'রে তে এল  
—এল এক তাঁতি, সে যেহেদের মোজা তৈরী  
করে ।

কাথারিনা

ফ্রাউ তাইরিঃ, আমার বামী তাঁতি বটে, কিন্তু  
সে ধর্ম-ভীক লম্বাক্তি, তার জন্তে আমি কোনদিন  
ছাঃখিত নই ।

তাইরি:

(নাচ করবার বক্ত, ফ্রাউ বিত্তার, আমি আপনাকে  
মনে ক'রে কিছু বলিনি ।...আপনি আপনার যৌবন  
অবস্তা বুঝা ব'লে মাটি করেননি ।

কাথারিনা

সে সব কথা আমার কিছু মনে নেই ।

তাইরি:

তা বলবেন না—আপনি এখন বাই বপুন—আপনার  
কীকনের মধ্যে যৌবনের তাই পুতিগুলি সব চেয়ে  
প্রস্তুত ।

কাথারিনা

আমার কোন পুতি নেই ।

তাইরি:



কাথারিনা

আর আপনি যে রকম বলছেন, ওরকম স্বভাবের পর  
কি থাকে?...অহুতাশ!

তাইরি:

হঁ, তার কি থাকে—যখন তার—তার কোন ভণ-  
মুষ্টিও নেই?...যখন সমস্ত জীবন এটি তাবে কেটে যায়  
(যদি সহ্য হয়ে, কল্য হয়ে নয়) একটা দিন আর একটা  
দিনেরই মত, কোন স্বপ্ন নেই, গ্রেস নেই—এর চেয়ে  
যেখান দূর ভাল হ'ত!

কাথারিনা

আচ্ছা হেথার তাইরিং, আপনি আপনার বোনের  
কথা তানুন। কিন্তু তার কথা বলে আপনার মনে কষ্ট  
হবে, হেথার তাইরিং—

তাইরি:

হাঁ, তার কথা জানলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়...

কাথারিনা

তা ত হবেই...তাই-বোনের মধ্যে কি টানই ছিল...  
আমি সব সময় বলতুম, এমন তাই বড় পুণ্ডে পাওয়া  
যায় না।

তাইরি:

কাথারিনা

এ ত সত্য কথা। আপনি দেই বুঝাবেনই তাঁর  
বাপ-মায়ের স্থান পূরণ করেছিলেন।

তাইরি:

হঁ, হঁ—

কাথারিনা

এ ত আপনার জীবনের একটা বড় সাফল্যের কথা  
যে আপনি একটি মেয়ের সারা জীবনের শুভাকাঙ্ক্ষা  
রক্ষা করেছেন—

তাইরি:

হাঁ, আমিও আগে তাই মনে করেছিলাম। যখন সে  
জন্মেরী শুকনো ছিল,—তখন কেবেছিলাম, পুত্র একটা  
মহৎ কাণ্ড করছি। কিন্তু তার পর যখন বীরে বীরে

তার চুল পুতুর চ'রে এল, তার মুখ বহুসের রেখার ত'রে  
গেল, দিনের পর দিন একইভাবে কেটে যেতে লাগল  
—তার সমস্ত যৌবন কেটে গেল—লোকে বুকেও  
পারলেন না কেমন ক'রে বীরে বীরে সেই জন্মেরী শুকনো  
অবিবাহিতা জোড়া হ'বে গেল—তখন আমার পশম  
মনে হ'ল, ছি, ছি, আমি এ কি করলাম।

কাথারিনা

কিন্তু হেথার তাইরিং—

তাইরি:

আমি তাকে যেন আমার সামনে দেখছি। মরুর  
ওইখানে মস্তকেলের ল্যাম্পের পাশে আমার সামনে  
যেমন বসত, শান্তাভিভায়া হিরণ্যকুশ:মাধ্যা মুখে সে  
আমার দিকে যেমন চাইত, তার সেই মুষ্টি দেখছি। সে  
যেন আমাকে তার ধন্যবাদ জানাত,—আর আমি,—আমার  
ইচ্ছে হ'ত তার সামনে নতকান হ'রে তার কমাগ্রাণনা  
করি,—তাকে আমি জীবনের সূতল বিপদ হ'তে রক্ষা  
করেছি—আর জীবনের সূতল আনন্দ হ'তে! (নীরবতা)

কাথারিনা

আপনার মত তাই পাওয়া ভাবের কথা,  
পরিতাপের কিছু নেই।

(বিত্তির প্রবেশ)

মিঃ

শুভ লক্ষ্য!...এখানে বড় মজার...কিছু দেখা যায়  
না—ও ফ্রাউ বিত্তার? আপনার স্বামী তলার রয়েছে  
ফ্রাউ বিত্তার, আপনার মতে অপেক্ষা করেছে...কিন্তু  
বাড়ী নেই?

তাইরি:

মিনিট পনেরো হল সে বেরিয়ে গেছে।

কাথারিনা

তার সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?

দেখা করার কথা ছিল।

মিঃ

না,...দেখা হয় নি...আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে  
বাড়ীতে গিয়েছেন, আপনার স্বামী বসেন।



কাথারিনা

হী, এ বিষয় ঐব পূব উৎসাহ । ক্রমগতেন মিহ্মি,  
আপনার ডেটি ছাউটি প্রদ্বর ত ; নতুন ?

মিত্ৰ

নতুন কাথা— এর চেগরা আপনার মনে লড়ছেন ? এ  
ত পত বদ্বর ; আমি একটু বদ্বশে নতুন ক'বে মিহ্মি ।

কাথারিনা

আপনি মিহ্মি করেছেন ?

মিত্ৰ

ডাইরি:

পূব কয়েক মেরে ত !

কাথারিনা

ডাইরি, আমি পূব লমবে তুলে বাই, আপনি বে এক  
বদ্বর টুপিষে কোকোনে কাক করেছেন ।

মিত্ৰ

আমি যোগে চর অংবার সে কাকো গাবো—মা'র বড়  
হেঁকে—

কাথারিনা

আপনার মা কেমন আছেন ?

মিত্ৰ

ডাইরি.—তবে, একটু হাতের বাধা আছে,—ডাকার  
বলেন ও শুধু হাতের দস্ত ।

ডাইরি:

আজ্ঞা, এখন আমার বেতে হেঁকে

কাথারিনা

আমিও একদিকে নামছি চলুন, কোথায় ডাইরি...

মিত্ৰ

আমিও বাই...কোথায় ডাইরি, আপনার ওডারকোট  
নিম্ন, আসবার সময় ঠিকি পড়বে ।

ডাইরি:

কাথারিনা

নিশ্চয়...

( ক্রিস্টিনের প্রবেশ )

মিত্ৰ

এই যে, এসেছিলাম...

কাথারিনা

বোধ হয় এই বাতাল লেগে—

ডাইরি:

না, কি হ'ল ক্রিস্টিন !...ক্রমগতেন মিহ্মি, অল্পট  
ক'রে যদি আলোটা আলেন ।

মিত্ৰ

( আলো আধিক উজ্জ্বল হইল )

ক্রিস্টিনে

ও, আমি নিশ্চয়ই আছি ।

ডাইরি:

ক্রিস্টিন, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই !...

ক্রিস্টিনে

ও কিছু নয় । হী বাইরের বাতাল লেগেই

কাথারিনা

হী, অনেক এই বদ্বশের বাতাল একেবারে সফ্র করত  
পাবে না ।

ডাইরি:

ক্রমগতেন মিহ্মি, আপনি তা হ'লে ক্রিস্টিনের কাছে  
পাচ্ছেন ?

মিত্ৰ

নিশ্চয়, আমি আছি ।

ক্রিস্টিনে

বাবা, কিছু চর নি আসার ।

মিঃসি

আমার এখন মাথা ধবে, আমার মা ত এত বৈ বৈ  
কবেন না ।

ডাইরিং

( সিন্টিয়েব প্রতি ) কি, বড় ক্রান্ত মনে হা

ক্রিস্টিনে

জেনার হাতে হট্টবা ধড়োইয়া ) না, দেবের গেছে । ( ঘাণিল )

ডাইরিং

বেশ,—হী, এখন বুকের ডাব বহলে গেছে—( কাপারিনার  
গতি ) এখন ও ভাসে একেবারে অজ্ঞানকম দেখায়, মর ?  
আজ্ঞা, আমি এখন আসি, ক্রিস্টিনে, ( তারকে চুম্বন করিল )  
আর আমি এখন বাড়ী ফিরব ততক্ষণে যেন এট ছোট  
মাথাটি থেকে সব 'ধরা' চলে যায়... ( বহুবার কাঁদে গেল )

কাপারিনা

( বহুবার সিন্টিয়েব প্রতি ) কি, কপজা হয়েছে বুঝি ?

( সিন্টিয়েব ক্রুদ্ধভাবে বিচলিত হট্টবা উঠিল )

ডাইরিং

( বহুবার হট্টবে ) ক্রাউ বিগার... !

মিঃসি

( ডাইরিং ও কাপারিনা চলিয়া গেল )

মিঃসি

জানিস কেন তোমার মাথা ধবেছে ? কালকের ওই মিষ্টি  
মদ গেছে । আমারও যে কিছু ভরলি, আশ্চর্য্য !... কাল বেশ  
হয়েছিল, না ?

ক্রিস্টিনে

( মাথা নাড়িয়া সবতি জানাইল )

মিঃসি

ওহা কি সুন্দর ড'অনোই—না ?—আর ক্রিস্টিনের ঘর কি  
সুন্দর সাজানো । সস্তা, চমৎকার ! আর জোড়ির ঘর...  
( ঘাণিয়া ) এখনও মাথা ধরা আছে ? ঐকি, কিছু বলদিম  
না কেন ? কি চোলে ?

ক্রিস্টিনে

১. মনে কব দেখি—সে বাগানে আগেনি !

মিঃসি

কি, তোকে একা অলংকা করিয়েছে ত ?  
তার !

ক্রিস্টিনে

কি, কিন্তু এব মনে কি ? আমি তাই কি করেছি ?—

মিঃসি

তুই তাকে আদর দিয়ে নষ্ট করেছিল, মাগো  
দিয়েছিল । পুরুষ মানুষের কাছে কড়া হ'তে চর ।

ক্রিস্টিনে

কি দেখা তা বলছিল ।

মিঃসি

আমি ঠিকই বলছি—আমি দিচ্ছি তোমার ওপর চ'টে  
গেছি । সে দেখা করবার জায়গার দেওয়া ক'রে আসে, সে  
তোকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছে দেয় না, খিয়েটায়ের বলে অতানা  
অন্ত লোকদের সঙ্গে গিয়ে বলে, তোকে একা অলংকা  
করায়, আসে না,—আর তুই, তুই কিছু বলদিম না, তুই বব'  
( হাসিল ) এরি গেমগরগব চ'রে তার দিকে চাপ,—

ক্রিস্টিনে

ব, চুপ কর, নিজেই মত পাগল ক'রে দেখাস কেন ?  
তোমার ও ত পিওডরকে খুব ভাল লাগে ।

মিঃসি

ভাল লাগে—নিজের খুব ভাল লাগে । কিন্তু ডোবি  
তাই সত্যি কথা কখনও দেখতে পাবে না, কোন মানুষট  
দেখতে পাবে না যে, আমি তাই বিরহবাবার ম'রে থাকি । ও  
সমস্ত মানুষগুলোর দর আমায় এক কেঁটা চোখের মলম  
নয় ।

ক্রিস্টিনে

না, বাপু, কখনও তোকে এরকম বলতে চলিনি ।

মিঃসি

হু, টিনেবু,—তোমার সঙ্গে কোনদিন এত খেলাপুলি  
কথা বলিনি বটে,—সাতল চফনি—জানিস, তোমার গাও  
আমায় একটা লজ্জা ছিল ।... বেশ, আমি বরাবর ভেবেছি,  
তুই এখন প্রথম প্রেমের পড়বি, একেবারে সৌভাগ্য পেয়ে  
পড়বি । প্রথম প্রেম সবাইকে দিশভার ক'রে দেয়,—কিন্তু



তোম বিশেষ ভাষা যে তোম এই প্রথম প্রথমে পড়ার বেলায়  
তোম শাশে এখন একটু বন্ধু সাহায্য করতে আছে ।

ক্রিস্টিনে

মিত্রি

তুই কি বিশেষ খবর দা, আমি তোম সত্যিকার বন্ধু.  
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী? আমি যদি এখন তোকে না বলি  
বাণ, ও মাগুটি আর সব মাগুদেরই মত, আর  
সমস্ত পুরুষসাহসিকতার দাম আমাদের একশতটা মন  
খারাপ ক'রে থাকার উপদ্রুত নয়, তা হ'লে তোম মাঝার  
যে কি সব চুকবে তা ভাবনা জানেন । আমি সব সময়ে  
বলি—পুরুষ সাহসিকের মোটের ওপর একটা কথাও বিবাল  
করতে নেই ।

ক্রিস্টিনে

কি অনবদ্য বনছিল—পুরুষ সাহসিক, পুরুষ সাহস—  
তাদের সঙ্গে আমার কি ! আমি মজ্ব কোন সাহসিকের কথা  
তাবছি না :—আমার সমস্ত জীবনে ও ছাড়া আর কারো  
কথা তাববে না !

মিত্রি

ও, তাই নাকি...ও কি তোকে বলছে ? জানি, জানি,  
এই বন্ধুই সবাই বলে । ওর তা যদি সত্যি তাবিল,  
তাহলে বাশারটা মজ্ব বকমে চাপাতে হয় ।

ক্রিস্টিনে

মিত্রি

না, কি ভাল আমার কাছ থেকে ?—আমি এর মজ্ব  
দায়ী নই,—একথা আগে ভাবা উচিত ছিল, তা হ'লে প্রেমের  
লীলা কেন ? তা হ'লে ব'লে থাকো বতরিন না সত্যি বিয়ে  
করবার মজ্ব কেউ না আসে ।

ক্রিস্টিনে

মিত্রি, তোম ওসব কথা আর আমি লইতে পারছি না  
—তুই আমার বাণা দিচ্ছিন—

মিত্রি

( ভাল ভাবে ) সত্যি ?

ক্রিস্টিনে

আচ্ছা, তুই এখন যা—রাগ করিল নি—একটু একা  
থাকতে দে !

মিত্রি

না, রাগ করব কেন ? আমি থাকি । ক্রিস্টিন, দেখ,  
এর মজ্ব একটা অল্প ক'রে ফেলিল নি । ( বাইবার মজ্ব  
টপিল ) এই যে, হেয়ার ফ্রিট্‌স্ ।

( ফ্রিট্‌স্‌স্‌স্‌স্‌স্‌ )

ফ্রিট্‌স্‌

মজ্ব আসবেও ।

ক্রিস্টিনে

( হোশবন্ধুর ) ফ্রিট্‌স্‌ ! ফ্রিট্‌স্‌ ! ( তাহার দিকে ছুটয়া পেল,  
তাহার বাকের উপর )

মিত্রি

( অলক্ষিতে দৌরে বাহির হইয়া পেল, সে যে এখানে বেহাষ অবস্থাকারী  
তাহার তাহার মূলের তাহে চলিয়া যাওয়ায় তরীতে বোকা পেল ।

ফ্রিট্‌স্‌

( ক্রিস্টিনের বাহ্যপাশ চাটাইয়া ) কি—

ক্রিস্টিনে

সবাই বলছে, তুমি আমার ছেড়ে গেছ ! না, তুমি  
আমার ছেড়ে চ'লে যাওনি—এখন পর্যন্ত নয়, এখনও পর্যন্ত  
নয়...

ফ্রিট্‌স্‌

কে বলছে ? ...কি করেছে তোমার ? ( তাহাকে হাত দিয়া  
স্বাধ করিয়া ) কি ক্রিস্টিন ! ...আমি তাবছিলুম, কতই এ বন্ধন  
ভাবে এলে তুমি ভয় পাবে—

ক্রিস্টিনে

ও,—তুমি যে এসেছ. এসেছ !

ফ্রিট্‌স্‌

যাও কও !—তুমি অনেকক্ষণ আমার মজ্ব দাঁড়িয়ে  
ছিলে ?

ক্রিস্টিনে

কেন তুমি আসিল ? কেন ?

ফ্রিট্‌স্

একটা কাজে আঁটকা প'ড়ে দেলুম, দেবী হ'য়ে পেল।  
তারপর আমি বাগানে দেখলুম, দেখলুম, তুমি নেই—  
তাবলুম বাড়ী ফিরে বাই। কিন্তু সহসা তোমার দেখবার  
এমন ইচ্ছে হ'ল, এই ছোট মিষ্টি মুখটি দেখবার জন্যে এত  
ইচ্ছে হল...

ফ্রিস্টিনে

( আদর্শিতা ) সত্যি ?

ফ্রিট্‌স্

হা, তারপর, তুমি যে ঘরটিতে থাকো সে ঘরটি দেখবার  
জন্যে এমন একটা অবর্ণনীয় বাগান আমার অভ্যস্ত করল—  
সত্যি—মনে হ'ল সে ঘরটি আমার একবার দেখা চাই-ই—  
আমি থাকতে পারলুম না, চলে এলুম এখানে। তুমি বোধ  
হয় বিরক্ত হও নি ?

ফ্রিস্টিনে

ও গল্প !

ফ্রিট্‌স্

আমার কেউ দেখতে পারনি ; আর হোমার বাবা  
বিরেটোর, আমি জানতুম।

ফ্রিস্টিনে

ও, কেউ দেখল, তার জন্যে আমি কেবাব করি না !

ফ্রিট্‌স্

আজ্ঞা, বেশ ! ( ঘরের পরিচিকে দেখিয়া ) এই তোমার  
ঘর ? তারি সুন্দর...

ফ্রিস্টিনে

তুমি কিছু দেখতে পাছ না। ( ল্যান্সের ওপর হঠাৎ ঢাক্য  
হিসাবি বসে চাইল )

ফ্রিট্‌স্

না, না, থাক, ওতে আমার চোখ ঝলসে যায়, এই বেশ...  
ওখানে কি ? ও, এই জানলা ? ওই জানলার কথা আমার  
কানেছিল, ওইখানে ব'লে তুমি সব সময়ে কাজ করো,  
কি ?—জানলা থেকে বেশ সুন্দর দৃষ্ট দেখা যায় ? ( হাসিয়া )  
ও, কত বাড়ীর ছাদ,...ওখানে কি...হী, ওটা কি যনকালো  
মুঠি ঘুরে ?

ফ্রিস্টিনে

ওটা হচ্ছে কালেনবোরগ শাওড়।

ফ্রিট্‌স্

তাই ত ! আমার ঘরের চেয়ে তোমার ঘর অনেক ভাল।

ফ্রিস্টিনে

ফ্রিট্‌স্

আমার ভারি ইচ্ছে করে এরি পুর উঁচুতে বাগ কাঠ,  
লব ছায়েব ওপর দেখা যাবে। এ তারি সুন্দর। আর  
তোমাদের পলিটাও নিচের পুর নীরব ?

ফ্রিস্টিনে

ও, দিনের বেলায় যথেষ্ট শব্দ।

ফ্রিট্‌স্

পূর্ব পাড়ী বার নাকি ?

ফ্রিস্টিনে

যাবে মাকে বাড়, তবে ওই সামনের বাড়ীটি হচ্ছে ভাল-  
চাবির কারখানা।

ফ্রিট্‌স্

এ ত বড় বিস্মি ! ( ওখানে বসিল )

ফ্রিস্টিনে

ও অভ্যাস হ'য়ে যায় ! কিছুদিন থাকলে ও বন্দ কানে  
লাগে না।

ফ্রিট্‌স্

( তাড়াতাড়ি ঘরটা দেখিয়া ) আমি এখানে সত্যি সত্যি  
এই প্রথমবার—? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এ সব আমার  
কতদিনের জানা !...দেখ আমি মনে মনে কত করুনা ঠিক-  
ভাবে করেছিলুম। ( তাহার ঘরের তরীতে বসে হঠাৎ ঘণ্টা-  
ঘন আওয়াজে বিকট করিয়া নিশ্চুত করিয়া দেখিতে দেহ )

ফ্রিস্টিনে

না, এদিকে কিছু দেখোনা।—

ফ্রিট্‌স্

কি, কিসের ছবি ?...

ফ্রিস্টিনে



ক্রিস্টিনে

(চীৎস। অতি অসহ্যের স্বরে) কি?

ফ্রিট্‌স্

আমি কাল তোমার ডাকাত মূল পাঠাবো,  
বলতে বাচ্ছিমুম—

ক্রিস্টিনে

ভেবেছি, তার হস্তে পরিভ্রম হচ্ছে?—নিশ্চয় কাল তুমি  
আর আমার কথা ভাববে না।

ফ্রিট্‌স্

ক্রিস্টিনে

সে ত বটেই, আমার যখন দেখতে পাত না তখন আমার  
কথা চলে যাও।

ফ্রিট্‌স্

ক্রিস্টিনে

ও, আমি জানি, জানি, আমি বুঝতে পারি।

ফ্রিট্‌স্

কেমন করে তুমি এই সব করনা করো।

ক্রিস্টিনে

তার কণ্ঠে তুমিই দাগী। কারণ, তুমি সব সময়েই আমার  
কাছে তোমার সব কথা মুকোড়! তুমি আমার তোমার কোন  
কথা বল না।—আজ্ঞা, আজ সাহায্য কি করলে?

ফ্রিট্‌স্

কিণেব কিছুই নয় ক্রিস্টি। সকালে লেকচার শুনে  
পেলাম—বিভূষণ কাটল—তারপর কাকি হুডিসে পেলাম...  
তারপর বিভূষণ পড়লাম...খানিকখন একটু পিয়নে  
বাজলাম—তারপর এর মধ্যে ওর মধ্যে আজ্ঞা—তারপর  
বন্ধুদের মধ্যে দেখা করতে বেরোলুম...এটি বিনটা  
কেটে গেল।—হঁ, এখন আমার যেতে হবে ক্রিস্টি...

ক্রিস্টিনে

এগুলি, এত শিগগির—

ফ্রিট্‌স্

তোমার বাবা ত অসহ্য একটু শরই এসে পড়বেন।

ক্রিস্টিনে

সে অনেক দেরী আজ, ফ্রিট্‌স্—পাকা—আর  
খানিকখন পাকা—

ফ্রিট্‌স্

কিন্তু...পিওডর আমার হস্তে অপেক্ষা  
সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

ক্রিস্টিনে

ক্রিস্টিনে

তার সঙ্গে কাল দেখা করতে পারো।

ফ্রিট্‌স্

কাল বোধ হয় আমি ভিয়েনাত্তেই থাকবো না।

ক্রিস্টিনে

কি, ভিয়েনাত্তে থাকবে না?

ফ্রিট্‌স্

(তাহার উত্থাপা দেখিল, বাৎসরিক লাভ করিয়া গাধিও, 'আ,  
ক্রিস্টিনে, আমি একদিনের হস্তে অথবা' ত'দিনের হস্তে  
বাইরে যেতে পারি—এটা ওর পরে?)

ক্রিস্টিনে

ফ্রিট্‌স্

কোথায়?...এই কোথায়...আ গড্, ওরকম মূল  
কোরোনা...আমি আমারের গায়ে যাবো বাবা-মা'র  
কাছে...না...তার পরকার নেই?

ক্রিস্টিনে

কোথো, তুমি গুডের কথা আমার কিছু বলো না!

ফ্রিট্‌স্

কি ছেলেমানুষ!—আজ্ঞা, তুমি বুঝতে পারো না,  
আমরা দুজনে মিলে একাকী পরিপূর্ণ, বাটেরের কোন  
সম্বন্ধ নেই। এক ত হৃদয়, তুমি অহুতব করো না?

ক্রিস্টিনে

তুমি আমার তোমার কথা কিছুই বল না, এ



মোটাই হুন্সর নব্বা... দেখো, তোমার সবকিছু আমি সব  
কথা জানতে চাই, সব, সব—তোমার কাছ থেকে আমি  
কোনো সত্যের এক ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশী চাই।  
কখনও কোন সত্যের আমার একটু মিসলুস, তারপর  
তুমি চলে যাও, আমি কিছুই জানি না, কিছুই জানতে  
পারি না—তার পর সমস্ত আমি যাও, সমস্ত যিনের সমস্ত  
ঘটনাগুলো কেটে যাও—আর আমি কিছু জানি না।  
তাই ভেবে আমার মন খারাপ হয়।

ক্রিস্টিন

কেন মন খারাপ হবে?

ক্রিস্টিনে

সত্যি, তোমার সঙ্গে আমার এমন মন কেমন করে,  
যেন তুমি এই সত্রে নেই, যেন তুমি আর কোথাও চলে  
গেছ, যেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে দূরে গেছ,  
দূরে, কোথায় হুন্সর পথে...

ক্রিস্টিন

( চকমকি ) ক্রিস্টিন!

ক্রিস্টিনে

না, দেখো, এ সত্যি তোমার বলছি!...

ক্রিস্টিন

ক্রিস্টিন, আমার কাছে এসো...( সে তাহার অতি  
নিম্নে ) দেখো, তুমি জানো, আমিও জানি, আমি  
এই নিম্নে এই মুহুর্তে তুমি আমার ভালোবাসে...  
( ক্রিস্টিনে যেন কোম কথা বলিতে চাহিল ) না, অনন্তকালের  
কথা বলো না। জীবনে এমন মুহুর্ত আসে যে মুহুর্তে  
অনন্তকালের স্পন্দ বহুভব করা যায়। সেই অনীমতার  
গহ্বতরা মুহুর্তে অন্তর কলমল করে—আমরা এই কথাই  
বুঝতে পারি, হ্যাঁ, এই মুহুর্ত আমার...( ক্রিস্টিনকে চুম্বন  
করিল—দীর্ঘশ্বাস )—ক্রিস্টিন উঠিয়া পাড়ান—যাও উজ্জলিত ভাবে  
বিশিষ্টা উঠিল ) আ, কি হুন্সর তোমার এ ব্যক্তিগতি, কি  
হুন্সর!...( বাল্যায় বিদ্যা ইন্সটিটিউট ) ও, পৃথিবী হ'তে যেন  
কত দূরে, এই রূপ রূপ বাড়ীর ওপরে...কি নিষ্ঠুর মনে  
হচ্ছে! তুমি আর আমি মিলে একলা...( বহুক্ষণ ) পারিও  
আমরা...

ক্রিস্টিনে

তুমি যদি সব সময়ে এই রকম ভাবে বলা...আমি  
হয়ত সত্যি বলেই বিখ্যাত করবো...

ক্রিস্টিন

কি ক্রিস্টিন?

ক্রিস্টিনে

যে, আমি যে রকম নিজের মনের স্বপ্ন বুলি, সেইরকম  
তুমি আমার ভালবাসো। যেদিন তুমি আমার প্রথম চুমু  
দিয়েছিলেন...মনে আছে?

ক্রিস্টিন

( প্রেমাবেশের সহিত ) তোমার আমি সত্যি ভালবাসি,  
ভালবাসি! ( ক্রিস্টিনকে একটু হাতে জড়াইয়া বকে চালিয়া  
যায়; আলিসনবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল ) এখন যেতে হবে—

ক্রিস্টিনে

কি, আমার যা বলে, তা বলেই অহুতাশ হচ্ছে?  
তোমাকে আমি ধাক্কাবোনা, বেধে ধাক্কাবো না, তুমি মুক্ত—  
যখন তোমার খুশি তুমি আমার কাছে চলে যেও,...তুমি  
আমার কাছে কিছু প্রতিজ্ঞা করোনি—আর আমিও  
তোমার কাছে কিছু চাই না...তারপর আমার কি হবে—  
তাতে কিছু আসে যায় না।—আমি ত জীবনে একবার  
হুন্সী হয়েছি, তার চেয়ে বেশ আমি জীবন থেকে কিছু  
চাই না। আমি শুধু চাই যে, তুমি আমার প্রাণের  
এই কথাটি জানো আর তুমি সত্যি বিখ্যাত করো যে,  
তোমার আগে আমি কাউকে ভালবাসিনি, আর তোমার  
পরেও আমি কাউকে ভালবাসব না, তুমি আমার জীবনের  
একমাত্র ভালবাসা—আর আমাকে যখন আর তোমার  
ভাল লাগবে না—

ক্রিস্টিন

( যেন নিজের প্রতি ) আর বলো না, বলো না—কে  
দরজার ঘণ্টা বাজালো—এর মধ্যে...

( দরজার কথাবার্তা )

ক্রিস্টিন

( কাঁপিয়া উঠিয়া ) বিগড়ের খোঁজ হয়...



ক্রিস্টিনে

( চমকিত ভাবে ) সে ক'নে, তুমি এখানে ?

( বিগত স্বপ্নে কহিল )

বিগত

স্বপ্নদ্বারা—বড় বিবর্ত করলুম ?

ক্রিস্টিনে

ভাণনার কি পুইই পরকারী কথা আছে ?

বিগত

হী,—ওক আমি লম্বা আঁধার ঘুঁরে বেড়াচ্ছি।

ফ্রিট্‌ল্

( ১৩৭৭ ) নীচে অগ্নিকা করলে না কেন ?

ক্রিস্টিনে

কি ভিস্‌কাস হচ্ছে ?

বিগত

( ইচ্ছা করে উঠবে ) নীচে অগ্নিকা করলুম না কেন ?...

হী, যদি আমি ঠিক জানতুম যে তুমি এখানে আছো...  
কিন্তু নীচে ত আর চ'লকী খ'রে পাড়চা'রি করতে পারি না...

ফ্রিট্‌ল্

( অর্ধচক্রে গবে ) হী...কাল তা চ'লে আমার সঙ্গে  
আসে ?

বিগত

( হঠাৎ ) হী, নিশ্চয়

ফ্রিট্‌ল্

বিগত

বড় ছুটে এগেছি, তোমাদের অসুস্থতি নিয়ে আমি  
একটু বগছি।

ক্রিস্টিনে

অসুস্থ ক'বে—( ভাষাভাষ্য করে কি একটা ভাঙ্গ কথিত

ফ্রিট্‌ল্

( গহ্বরে ) নতুন কিছু খবর আছে ?—কিছু শুনেছো ?

বিগত

( ক্রিস্টিনে প্রতি বহুদেবে ) না। কিন্তু তুমি ও রকম ক'বে  
বেড়াছো কেন, কেন এই সব অবস্থা মানসিক উত্তেজনা ?  
এখন তোমার খুঁসোতে যাওয়া উচিত, তোমার বিশ্রাম  
সরকার !

( ফ্রিট্‌ল্‌র ভাষাভাষ্য নিকট আসিল )

ফ্রিট্‌ল্

আজ্ঞা বল ত, ক্রিস্টিনে বরটা কি চমৎকার আশ্রমে !

বিগত

হী, বেশ বরটি—( ক্রিস্টিনে প্রতি ) সারাদিন তুমি  
বাড়িতে থাকো ?—সত্যি, তোমার এখানেই বেশ আশ্রমে  
আরণ্যক, তবে আমার মতে একটু বেশী উচু।

ফ্রিট্‌ল্

তাই ত আমার পুর ভাল পেয়েছে।

বিগত

কিন্তু এখন আমাকে ফ্রিট্‌ল্‌র কোর্সে নিয়ে যেতে হবে ;  
ওকে ভাল লকাল লকাল উঠতে হবে।

ক্রিস্টিনে

তা ক'লে সত্যি তুমি চ'লে যাচ্ছে ?

বিগত

ক'লেইন ক্রিস্টিনে, ও আমার আসবে।

ক্রিস্টিনে

চিঠি লিখবে ত ?

বিগত

কিন্তু, কালই যে কিংবদন্তি আসবে—

ক্রিস্টিনে

না, আমি জানি, ও বহুদূর থাকে...

ফ্রিট্‌ল্

( একটু কাশিয়া শুভ কোলাহল )

বিগত

( তাহা নক্সা কহিল ) তা ক'লে চিঠি লিখতেই হবে ? আমি  
তোমাকে এত লেটিনেস্‌টোল্‌ তাবিনি... আমি বলছি কি —



আমরা...আচ্ছা, তা চ'লে বিদায়দুশমন...তবে কেইকণ দেন  
না চর... (খানিখা খেল) বর, আমি এখানে নেই।

( ক্রিষ্টল ও ক্রিস্টিনে পরস্পরকে চুম্বন করিল )

পিওডর

( সিগারেট খাওয়া করিয়া একটি সিগারেট মুখে পুরিল,  
বেশলাইক বাঁধিয়া এক ওভার-কোটের পকেট পুজিতে লাগিল।  
সেখানে বেশলাইনা পাওডর বসিল ) প্রায় ক্রিস্টিনে, বেশলাই  
বিল্ডে পাওয়া ক?

ক্রিস্টিনে

( কুখার চোখে একটি বেশলাইক খাওয়া

পিওডর

এতে কোন কাউ নেই—

ক্রিস্টিনে

আচ্ছা, এনে বিজি। ( পালের ঘরে ডাডাডাডি ছুটয়া খেল )

ক্রিষ্টল

( ক্রিস্টিনেকে খোঁজ খোঁজ ) ও পদ্, কীকনের এখন  
সময়ে মিথো কথা বলা!

ক্রিষ্টল

এখন আমি বুঝতে পারছি, এখানে আমার জীবনের  
প্রশ্ন ছিল, এই চমৎকার মেয়েটি—(বলিতে বলিতে খানিখা খেল),  
কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীকে কি তারপর সিগারেট চ'য়ে কুড়ি...

পিওডর

কি যাকে বন্ধ ক...পরে তুমি এ সব কথা ভেবে  
চাপবে—

ক্রিষ্টল

ক্রিস্টিনে

( বেশলাই খাওয়া লটখা খাশিল ) এই নাও!

পিওডর

বক্তব্য—আচ্ছা, তা চ'লে আমি। ( ক্রিস্টিনে গতি ) কি,  
আরও দেখা করবে ক?

ক্রিষ্টল

( বক্সের চারিদিক তুখিত চোকে দেখিতে লাগিল, যেন সব ঘণ্টা  
খাপনায় অবশেষে তাইকা লটতে চায় ) এ কাছাকাছি ভেঙে ভেঙে  
করে না।

ক্রিস্টিনে

বার, ঠাট্টা কোরো না।

পিওডর

এলা—বহাও, ক্রিস্টিনে।

ক্রিষ্টল

ক্রিস্টিনে

( পিওডর ও ক্রিষ্টল চলিয়া খেল )

ক্রিস্টিনে

( অভিজ্ঞতের মত ঠাট্টাট্টা করিল, তাৎপর্য খোলা বক্সের কাছে  
খিচা কাটা খসার বসিল ) ক্রিষ্টল...

ক্রিষ্টল

( সিঁড়ি হইতে আগের ইটকা খানিখা, তাহাকে মনে হইয়াছিল খাওয়া  
জুখে পোকো !

বহনিকা পাতন

ভূতীয় আত্ম

( ক্রিস্টিনে খেঁচ খেঁচ ) হুগু খেঁচা )

ক্রিস্টিনে

( একা জানামার খাশে বসিয়া বেশলাই করিতেছিল; বেশলাইক  
কাউ খানিখা খিল )।

( কাখাবিমান বসন্তের মতো লিনা খেলত করিল )।

লিনা

গুণতিন, কুণলাইন ক্রিস্টিন!

জার্মানে গালাফ বক্তব্যের জাতি-সম্প্রদায় আছে। একটি হচ্ছে  
Loh' nobl ঘনিষ্ঠ কালো থাকে; আর একটি হচ্ছে Auf Wider-  
schin। খানিখা খেলা বক্তব্যের। Adlen বা বিহার।

ক্রিস্টিনে

(আনমনা) কি খুকি, কি চাই ?

লিনা

মা পাঠিয়ে দিলেন, খিয়েটাতে সাবান টিকিট যদি এসে থাকে নিয়ে আসতে ।

ক্রিস্টিনে

যাও এখনও ত বাঁকী আসেন নি ; অপেক্ষা করবি ?

লিনা

না, ফ্রান্সাইন ক্রিস্টিন, আমি আবার আবার পরে আসবো ।

ক্রিস্টিনে

লিনা

(ঘাইতে ঘাইতে আবার দ্বিবিদ্যাবলি) মা ফ্রান্সাইন ক্রিস্টিনকে তাঁর নমস্কার জামিয়েছেন, আর জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁর মাথাপরা এখনও আছে কি ?

ক্রিস্টিনে

না, খুকি ।

হ

বদমায়ে !

(লিনা বাড়ির ঘাইতেছে মিড্‌সি ঘরে জেবেল কলি)

লিনা

তত দিবস ফ্রান্সাইন মিড্‌সি ।

মিড্‌সি

(লিনা চলিয়া যেন)

ক্রিস্টিনে

(উঠিয়া পাড়াইল, মিড্‌সি জেবেল করিলে তাহার সুশোভন পাড়াইল) —কি, তারা কিরে এসেছে ?

মিড্‌সি

ওরে জানবো ?

ক্রিস্টিনে

কোন চিঠি পাসনি ?

ক্রিস্টিনে

তুইও কোন চিঠি পাসনি ?

মিড্‌সি

ক্রিস্টিনে

পরতদিন তারা গেছে !

মিড্‌সি

এ এসম কি দীর্ঘ সময় যে তার কোনো খবর তাঁর ক'রে সব সময় ন'দে থাকতে হবে । আমি বাপু, তোরা কাজে বুকি না...বেশ খেদি যুগের কি ঐ হবেছে, খুব কেঁদেছিলি বুকি ? তোরা বাবা এখন বাড়ী আসবেন, তিনিও বুকতে পারবেন ।

ক্রিস্টিনে

(সবলভাবে) বাবা সব জানেন ।—

মিড্‌সি

(দীর্ঘভাবে) কি ?

ক্রিস্টিনে

আমি তাঁকে সব বলেছি ।

মিড্‌সি

তা বেশ ক'রেছিল । লোকের ত সব তোরা যুগ দেখেই বুঝতে পারিছে ।—পের পণ্ডিত সব জানেন ?

ক্রিস্টিনে

মিড্‌সি

তোকে ব'লেছেন কিছু ?

ক্রিস্টিনে

মিড্‌সি

তা হ'লে কি বলেন ?



ক্রিস্টিনে

কিছু না।—তিনি চুপ করে চ'লে গেলেন, যেমন তিনি যান।

মিতুসি

তাকে এই সব বলে কি বোকাми করলি বলু ত।— জানিস, কেন তার বাবা এ বিষয়ে কিছু কথা বলেন না—? তিনি চেবোভেন, ফ্রিটস্ তোকে বিয়ে করবে।

ক্রিস্টিনে

তুই তা চ'লে ওগর কথা বলছিল কেন?

মিতুসি

আমি কি ভাবি জানিস?

ক্রিস্টিনে

মিতুসি

ওই বাইবে, বেকাডে বাওগাব গরটা এসেবারে মিখে।

ক্রিস্টিনে

মিতুসি

তারা যোগ কর কোণাও রাখনি।

ক্রিস্টিনে

তারা বাইরে গেছে, গরুর নেই—তা আমি বেশ জানি। কাপ লড়েবো তার বাড়ির কাছে পেছলুম, পর্দা সব নাথানো, সে এখানে নেই।—

মিতুসি

তা আমি খিলাস করি। তারা চ'লে গেছে—তবে তারা আর কিরে আসবে না—অন্তত আমাদের কাছে কিরে আসবে না।

ক্রিস্টিনে

( নরায়ন গতি ) কী—

মিতুসি

ঠ, খুব সস্তা তাই!

ক্রিস্টিনে

আর তুই তা অত শান্তভাবে বলছিল—

মিতুসি

হুঁ—হয় আচ্ছা অথবা কাল—অথবা কামান্দ পাবে, তাতে কি এসে যাবে?

ক্রিস্টিনে

তুই যে কি বলছিল নিজে বুঝলি না...না, তুই ফ্রিটস্কে জানিল না—তুই তাকে যা তাহিন সে দেবকম নয়—আমার ঘরে এইখানে সে এসেছিল, আমি তাকে সেদিন গিটা বুকেছিলাম। মাতে মাতে সে দেবিরেছে বাট সে যেন আমার অন্তে কোয়ার করে না কিছু সে আমার ভালবাসে... ( যেন মিতুসির উত্তর অনুমান করিয়া ) হ্যা—হ্যা—চিরদিনের জন্য নয়, আমি তা জানি কিছু চঠাৎ এরকম ক'রেও শেষ হয় না!

মিতুসি

আমি অবশ্য ফ্রিটস্কে অত ক'রে জানি না।

ক্রিস্টিনে

সে কিরে আসবে, গিওভরও আসবে—নিশ্চয়ই!

মিতুসি

( এখন ভক্তি করিল যে তাহাতে যোগ্য যার শিওরও যাত্রক যা না যাত্রক তাহাতে তার কিছু আসে যাবে না )

ক্রিস্টিনে

মিতুসি...আমার একটা কথা রাখবি?

মিতুসি

অত উত্তরা হলনি—কি বলছিল?

ক্রিস্টিনে

যেথ. একবার শিওরের বাড়ী যা,তার বাড়ী ত কাছেই। একবার উঁকি দেবে দেখে আর...হ্যাঁ, তার বাড়ীতে নিজেস কর্তে পারিল, ও বাড়ী আছে কিনা, আর যদি না থাকে নিশ্চয়ই বাড়ীর লোকেরা জানবে ও কখন কিরে আসবে।

মিতুসি

যেথ, আমি কখনও কোন পুরুষমানুষের পেছন পেছন ছুটবো না।

ক্রিস্টিনে

আচ্ছা, জানতে যোগ্য কি, হয়ত তার সঙ্গে দেখাই হবে। এখন গ্রার একটা,—এখন সে নিশ্চয় যেতে আসে।

মিতৃদি

তুই কেন ক্রিষ্টপের বাড়ীতে যা না তার খবর নিতে ?

ক্রিস্টিনে

আমার সাহস হচ্ছে না—সে হঠাৎ তা মোটেই পছন্দ করবে না...আর সে নিশ্চয়ই বাড়ীতে ফিরে আসেনি। কিন্তু গিওর হঠাৎ ফিরে এসেছে, সে হঠাৎ জানে কবে ক্রিষ্টপ আসবে। মিতৃদি, আমি তোকে করবোড়ে অস্বস্তি রাখছি !

মিতৃদি

না, তুই ছেলেমানুষী আচরণ করনি—

ক্রিস্টিনে

আজ্ঞা, আমার জেতে তুই একটু কষ্ট কর! যা, যা !  
তাতে কিছু ব্যাপার হবে না।—

মিতৃদি

আজ্ঞা, তোর মন যদি তাতে শান্ত হয়, আমি যাচ্ছি।  
কিন্তু কিছু লাভ হবে না। তারা নিশ্চয়ই ফিরে আসেনি।

ক্রিস্টিনে

ওগান থেকেই আমার কাছে আসবি...কেমন ?

মিতৃদি

আজ্ঞা, তা আমার জেতে হাফে বেতে বসতে একটু  
দেরী করতে হবে।

ক্রিস্টিনে

অপেক্ষ বজ্রবান, মিতৃদি, কি লম্বী ঘেরে ছুট...

মিতৃদি

নিশ্চয়, আমি খুব লম্বী ঘেরে;—আজ্ঞা, এখন একটু  
শান্ত হ'...আমি যাই তা হ'লে !

ক্রিস্টিনে

( মিতৃদি চলিয়া গেল )

( একটু পরে তাইরি: প্রবেশ করিল )

ক্রিস্টিনে

( একদা ঘর ঘোরাইতে লাগিল। সেলাইএর মিনিবস্ত্রণি জড়  
করিয়া রাখিল, তাবশর মাথায় দিরা বাহিরের দিকে চাহিয়া

বীড়াইল। কয়েকমিনিট পরে তাইরি: ঘরন মনেন করিল, সে বাহ্যকে  
বেশিতে পাইল না। তাইরি: পক্ষীঘরোবে বিচলিত, বহিরভার সঠিত  
তরাসর মেজের দিকে চাহিল, কিন্তুইনে তখনও বাহিরের দিকে চাহিয়া  
জানালার বীড়াইল। )

তাইরি:

ও এখনও জানেনা, ও এখনও জানেনা—  
( তাইরি: দরজার বীড়াইল ) বহিল, যেন ঘরের দিওর না বাড়াইতে  
সাহস হইতেক না। )

ক্রিস্টিনে

( জানলা হইতে দূরীয়া বীড়াইল, বাহ্যকে বেশিল, জাননা করে  
কানিয়া উঠিল )

তাইরি:

( হাসিবার চেষ্টা করিল। ঘরের দোর প্রবেশ করিল ) কি  
ক্রিস্টিন্ ? ( যেন সে নিজের প্রাণটী বলিল )

ক্রিস্টিনে

( তাহার দিকে মননর হইয়া গেল, যেন তাহার সামনে মাটিতে  
গুটাইয়া পড়িল )

তাইরি:

কি...কি ভাবছিল, ক্রিস্টিন ? আমার  
সহিত। আমার কুলে বেতে শান্তবো কি ? \*

ক্রিস্টিনে

তাউরি:

আমি—আর তুই ?

ক্রিস্টিনে

বাবা, লকালবেগার আমি যা বলুম তা কি তুমি বোঝ নি ?

তাইরি:

কিন্তু কি চাপ তুই ক্রিস্টিন ?...আমি যা ভাবছি তা  
তো তোকে বলতে হবে ! নব কি ?

ক্রিস্টিনে

বাবা, কি বলছ তুমি ?

তাইরি:

আমি আমার কাছে, মা...আমার কথা শান্ত হ'রে  
পাইনি। দেখ, এখন তুই আমার সব বর্ণেছিলি, আমি তোরা  
কথা শান্ত হ'রে শুনেছিলাম—আমরা—



ক্রিস্টিনে

বাবা, তোমার অঙ্গুরোধ করছি, আমার ও রকম ক'রে  
বোলো না...তুমি যদি সব দিক থেকে বুকে থাকো যে,  
তুমি আমার ক্ষমা করতে পারবে না, বেশ, আমার বাড়ী  
থেকে তাড়িয়ে দাও—কিন্তু ও সব কথা বোলো না...

তাইরি:

আমার কথাগুলো একটু শান্ত হ'য়ে পোনু মা! তারপর  
তোমার যা ইচ্ছে তুই কর...বেশ ক্রিস্টিনে, তোমার এখন কত  
অল্প বয়স—তুই কি কখনও ভাবিন নি...যেহাওয়া ইচ্ছা তোমার  
যে সমস্ত ব্যাপারটা একটা ভুল হতে পারে।

ক্রিস্টিনে

বাবা, তুমি কেন আমার গুণা বলছ?—আমি বেশ  
জানি আমি কি করেছি,—আর এ যদি একটা ভুল হ'য়ে  
যাকে, বেশ, তা হ'লে—আমি কিছু চাইনা—তোমার কাছ  
থেকে বা পৃথিবীর আর কারো কাছ থেকে...আমি শু বগেছি,  
তাড়িয়ে দাও, বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে পারো, কিন্তু...

তাইরি:

( তাৎক্ষণিক বাধা দিয়া ) তুই কি বলছিস...যদি তুলাই হ'য়ে  
যাকে তার ভেতর তোমার মত অল্প বয়সের মেয়ের সমস্ত জীবন  
বার ভাবতে হবে?—ভাব মা, একবার ভেবে দেখ,  
কি চমৎকার, কি অপূরণ এই জীবন! ভেবে দেখ, যেদি,  
আমাদের অনেকের কত জিনিষ রয়েছে, তোমার শাশুনে  
সৌভাগ্যের কত দিন, কত সুখ, কত সৌভাগ্য রয়েছে—বেশ,  
আমাদের দিকে, আমার মার পৃথিবীতে সম্পদ বেনী কিছু  
নেই,—কিন্তু তা হ'লেও কতকাল কতভাবে আমি আনন্দ  
পেতে পারছি। তুই আর আমি কেমন একসঙ্গে থাকবো—  
আমরা আমাদের জীবন ইচ্ছামত আবার গুছিয়ে নিতে  
পারবো—তুই আর আমি!—আবার কেমন তুই—হাঁ,  
বহন আবার সুসময় আসবে, তুই আবার আদ্যকার মত  
গান গাইবি। তারপর আমার ছুটির দিনে কেমন আমরা  
দু'জনে সন্ধ্যা ছেড়ে বেড়াতে যাব, গাঁয়েতে, সবুজ মাঠে  
সমস্ত দিন কাটাবে—পৃথিবীতে কত সুন্দর জিনিষ রয়েছে—  
কত, কত—তার জীবনের প্রথম সুখদগ্ধ পূর্ণ হ'ল না, শূন্য  
মিলিয়ে খেল ব'লে, সমস্ত জীবনের সব সুখ সৌভাগ্য কি

বিসর্জন দিতে হবে? এ যে নেহাৎ শাদাশামি—

ক্রিস্টিনে

( ভীত ভাবে ) কেন?...কেন পূর্ণ হবে না...?

তাইরি:

হায়, মতাই যদি এ তোমার সুখ সৌভাগ্য হ'ত! তুই কি  
সত্যি ভাবিস ক্রিস্টিনে যে আজ তোমার বাবাকে এসব কথা  
ধরকার ছিল? আমি অনেকদিন থেকেই জানতুম!—আর  
তুই যে আমার একদিন বলবি তাও জানতুম। না, না, এ  
তোমার পক্ষে সুখ নয়!—আমি কি তোমার চোখ জামি না?  
তুই থাকে ভালবেসেছিস সে যদি সত্যি সে ভালবাসার খোঁশা  
হ'ত, শাহুল ও চোখ দু'টি দিয়ে এত অঙ্গ করত না, ও পাল  
চ'ট এমন রক্তহীন হ'ত না...

ক্রিস্টিনে

তুমি কেমন ক'রে জানলে...কি জানো তুমি...তুমি  
কি শুনেছো?

তাইরি:

কিছু না, কিছু না...তুই নিজেই ত আমার বলেছিস সে  
কে...সে একটা ছোকা—সে কি জানে বল, কি বোঝে?  
—সে যদি একটু মূঢ় হঠাৎ তাৎক্ষণিক সে কি রক্তপেচাছিল  
—নকল আর আসলের মধ্যে এতদূর কি সে জানে—আর  
তোমার এই বিলাসিতা ভালবাসা—সে কি তোমার কিছু বুঝে?

ক্রিস্টিনে

( উত্তর ভাবে ) তুমি কি ভাও...—তুমি তার কাছে গেছলে?

তাইরি:

তুই কি ভাবিস! সে ত বাইরে চ'লে গেছে। বেশ,  
ক্রিস্টিনে, এখনও আমার সুখি খোশ হই নি, আমার এখনও  
ছোট চোখ আছে। পোনু মা, ভুলে যা! এ ব্যাপার সব  
ভুলে যা! তোমার উচিত অন্তর্দৃষ্টি অস্তমিত! এ তুই  
জানিস, যে সুখ তোমার প্রাণে সে সুখে তুই আবার সুখী হবি।  
তুই জীবনে এমন কাউকে পাবি, যে তোমার সত্যি পূণ্য বুঝবে—

ক্রিস্টিনে

( তাৎক্ষণিক গলাতে হঠাৎ )

তাইরি:

কি চাপ? কি?—

ক্রিস্টিনে

হেঁচে দাঁও, আমার বেতে দাঁও.

তাইরিঃ

ক্রিস্টিনে

তার কাছে...তার কাছে...

তাইরিঃ

কি তাৎক্ষিৎ, তুই, কি তাৎক্ষিৎ ?

ক্রিস্টিনে

তুমি সব দু'কোন্ডো, আমার বেতে দাঁও—

তাইরিঃ

( তাহার গন আঁক করিয়া ) মা, পাগল হইলুম । যে দাঁতা

তার বাড়ীতে নেই ।...সে স্বরত বহু দূরে চ'লে গেছে ।...

এখন এখানে আমার কাছে থাক্, সেখানে গিয়ে কি করবি

...কাল অথবা সন্ধ্যাবেলা আমি তোঁর সঙ্গে যাব'খন । তুই

শ্রুতকমভাবে সত্যার বেতে পারবি না...জানিল কি

তোকে কি-রকম দেখাচ্ছে ?...

ক্রিস্টিনে

তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

তাইরিঃ

আমি তোকে কথা দিচ্ছি,—তুমি এখন তুই, কোথাও

যাও না, ওখানে বস্, শান্ত হ' ।

তাইরিঃ

( অনুরোধ করে ) আমি কি জানবো...আমি তুমি জানি,

তোকে আমি ভালবাসি, তুই আমার একমাত্র মেয়ে, তুই

আমার কাছে থাকবি—আমার কাছে তোকে সত্যাজীবন

ধাকতে হবে—

ক্রিস্টিনে

যথেষ্ট—যেতে দাঁও—( সে তাহার পিতাকে এড়াইয়া স্বরকার

দিকে চলিল, ঠিক সেই সবক মিঃ/মি স্বরকার পোড়ার আনিয়া উপস্থিত

হইল )

মিঃ/মি

( ক্রিস্টিনে আর তার বাড়ি দিয়া পড়তে, বৃহৎ চৌকর করিয়া

ঠাট ) বা হর সাইয়ে দিয়েছিলি—

ক্রিস্টিনে

( মিঃ/মি তার পোড়ার পিতৃভক্ত দেখিয়া যখন হেঁচক শোভন দিবিয়া  
আসিল )

পিওডর

( স্বরকার পোড়ার বাড়ীয়া বহিল, তাহার কানো পরিচ্ছদ )

ক্রিস্টিনে

কি...কি স্বরকার... ( শেষ তাহার প্রাণের উত্তর দিল না, )

পিতৃভক্তের মূলের দিকে চাহিল, পিতৃভক্ত তাহার তুই অস্তিত্বে সন্দেহ

নাই ) কোথায় সে, সে কোথায় ? ( অত্যন্ত উদ্ভ্র, শেষ তাহার

কণা দিল না, সে পিতৃভক্ত ও মিঃ/মি স্বরকার ও বিবল মূলের দিকে

চাহিল ) কোথায় সে ? ( পিতৃভক্তের প্রতি ) পিতৃভক্ত, বলুন :

পিওডর

( কথা বলিতে চেষ্টা করিল )

ক্রিস্টিনে

( পিতৃভক্তের আশ্রয়স্থল দেখিতে আসিল, তাহার চারিদিক

দেখিতে লাগিল ) তারপর, কিসের মূলের ভরত শব্দকল্যে যোগ

সেল, মতি কি বলপরি ঘটনায় তাহা সে বুঝিতে পারিচ্ছিল,

তখন চৌকর করিয়া উঠিল—) পিতৃভক্ত !...সে কি...

পিওডর

( মাথা বাড়িয়া 'হ' হ' হ' হ' হ' )

ক্রিস্টিনে

( নিজের কপালে হাত দিয়া চাপিয়া বহিল, যেন কিছু বুঝিতে পারি-

তেক না, পিতৃভক্তের মিষ্ট খেল, তাহার হাত বহিল—যেন পারসিত )

সে...সে...মায়া দেখে... ( যেন সে আর কিছুকি করিতে )

তাইরিঃ

মা আমার—

ক্রিস্টিনে

( পিতাকে ডাকিয়া বাড়ী ) পিতৃভক্ত, বলুন, বলুন,...

পিওডর

আশ্রয় সব জানেন ।

ক্রিস্টিনে

আমি কিছু জানি না...আমি কিছু জানি না, কি

হেঁচে...বা...পিওডর... ( মিঃ/মি প্রতি ) তুইও জানিস...

পিওডর

একটা ছুঁটনা—



ক্রিস্টিনে

কি, কি ?

বিগড়

সে আর নেই।

বিগড়

তুয়েলতে (Tina) সে মরেছে।

ক্রিস্টিনে

(ভীৎকায়) উঃ! (সে টিফিমা মেঝেতে পড়িয়া বাইত, কিছু দাঁড়াইয়া তারাকে খবর : হঠাৎ বিগড়েরের প্রতি এমন লজ্জিত করিয়া গেলি, যে বিগড়ের দৃষ্টি সে এমন বাইতে পড়ে)

ক্রিস্টিনে

(সি তার সাজেতক (এক খেলনা, বিগড়েরের খবর) না, জাবেন না... আমি সব জানতে চাই। জাবেন এখন আমার কান্না থেকে কিছু লুকোতে পারবেন না...

বিগড়

আর কি জানতে চাও ?

ক্রিস্টিনে

কেন ?—কেন সে তুলত লড়েছিল ?

বিগড়

আমি তার কারণ জানি না।

ক্রিস্টিনে

করি সঙ্গে, তার সঙ্গে—? কে তাকে হত্যা করেছে তা আপনি নিশ্চয় জানেন ?

বিগড়

তাকে আপনি জানেন না...

ক্রিস্টিনে

ক্রিস্টিনে !

ক্রিস্টিনে

কে ? এখন আমার (মিস্ত্রির প্রতি) বাবা ! (কেন তবু নাই। সে বাবিরে চলিয়া বাইতে গেলি, তাইনি তাহাকে বাবা

দিল) কে তাকে মেরেছে, কেন মেরেছে, এ কথা আমি নিশ্চয় শুনি—

বিগড়

তার... কখনো...

ক্রিস্টিনে

কেন, আপনি গতি বলছেন না...

বিগড়

ক্রিস্টিনে

(যে বিগড়ের কথা বাবা নিজের মনে তাহা দিকে আঘাটই গেল, তখন কিছু বলিল না—তাহার দিকে ততক্ষণে গেলি, তাহাও লক্ষ্য হোইয়া উঠিল)—ও, কোন মেরেমাছুয়ের ভয়ে ?

বিগড়

ক্রিস্টিনে

হী—কোন মেরেমাছুয়ের ভয়ে... (মিস্ত্রির প্রতি দৃষ্টি) ওই মেরেমাছুয়ের ভয়ে—হী সেই মেরেমাছুয়ের, তাকে ও ভালবেসেছিলো—আর তার বাবী—হী, হী তার বাবীই ওকে মেরেছে—আর আমি... আমি কি ? আমি তার কি মিশ্র ? ...বিগড়... আমার ভয়ে কিছু কি নেই... কিছু সে লিখে যায় নি, এক লাইন. ? আমার ভয়ে একটা কথাও বলে যায় নি... ? কিছু নেই, কিছু নেই... একখানা চিঠি একই ক্যামেরা টুকরো—

বিগড়

(যা নাছিল)

ক্রিস্টিনে

আর সেই লক্ষ্য বেশির যে লক্ষ্যের সে আমার এখানে এসেছিলো আপনি এখান থেকে নিয়ে গেলেন... তখন সে জানিত, তখনই সে জানিত যে, স্বরত আমার সঙ্গে আর... আর এখান থেকে সে চলে গেল, আর একজনকে ভয়ে নিজের প্রাণ দিতে—না, না—এ সম্ভব নয়... তখন কি সে বোকেনি, সে আমার কি ছিল... সে কি...

বিগড়

সে লুকেছিল—সেই একজনে আমি তা গণন বাজিন্দু... আপনার কথাও সে অনেক বলেছিলো।



ক্রিস্টিনে

হ্যাঁ, আমার কথাও বলেছিলো সে! আমার কথা! আরো সব কাদের কথা? যেমন অপর সব লোকের কথা বলেছিলো, অল্প অনেক জিনিষের কথা বলেছিলো, তেমি, আর সব লোকের মত, আর সব জিনিষের মতই আমার স্থান তার জীবনে?—ও, আমারও কথা! ও গুহু!...আর তার বাবার কথা, আর তার মায়ের কথা, আর তার সব বান্ধবীদের কথা, আর তার খয়ের কথা, আর বন্য জন্তুর কথা, আর এই মহরের কথা, আর, কত লোকের কথা, কত জিনিষের কথা—বা কিছু সব সে তার জীবনে পেয়েছিল, মাঝ ছেড়ে চ'লে যেতে হয়েছে, আমাকে যেমন ছেড়ে চ'লে গেছে...সকলের কথা সে বলেছিলো...আর তার সঙ্গে আমারও একটু কথা...

খিওডর

( আবেগে বিচলিত ) আপনাকে সে সত্যি ভালবেসেছিলো ।

ক্রিস্টিনে

ভালোবেসেছিলো! সে?—আমি, আমি তার অবসরের নীলখেলা ছিদ্রমাত্র—আর একজনের ক্ষেত্রে সে গ্রীষ্ম দিয়েছে—! আর আমি—তাকে পুঁথো করেছি!—সে কি তা জানেনি?—যে তাকে আমি সব দিয়েছিলাম, আমার যা দেবার আছে সব দিয়েছিলাম, আমি তার ক্ষেত্রে মরতে পারতুম—সে আমার ঈশ্বর, সে আমার লক্ষ্যস্থল—সে কি তা কিছুই বোঝেনি?—আমার কাছ থেকে হামিযুথে সে চ'লে যেতে পারলো, এই মর থেকে চ'লে গেলো, আর একজনের ক্ষেত্রে গুলিতে মরতে...বাবা, বাবা, ...তুমি কিছু বুঝতে পারছো কি?

ডায়রিং

ক্রিস্টিনে! ( তাবাব নিকট আসিয়া )

খিওডর

( মিতমির প্রতি ) দেখ, এ বাপার হ'তে তুমি আমার বাচাতে পারতে ।

মিতমি

( তাবাব দিকে হৃৎসাবে চাহিল )

খিওডর

এই পথের ক'দিন...আমার উদ্বেগনার পর উদ্বেগনা যথেষ্ট হয়েছে--

ক্রিস্টিনে

( লম্বা বৃক্ষশ্রেণীর সহিত ) খিওডর, তার কাছে আমার নিরে চলুন...আমি তাকে দেখতে চাই—তাকে আর একবার দেখবো, শেষ দেখা—সেই মুখখানি...খিওডর, চলুন আমাকে তার কাছে নিয়ে ।

খিওডর

( এড়া ইবার তলী, ইতরত : ) না, না,—

ক্রিস্টিনে

কেন না?—এতে বাধা কেন? আর একবার তাকে আমি দেখতে পারিনে?

খিওডর

( ঘেঁরা হ'য়ে গেছে )

ক্রিস্টিনে

দেখো?—তার দেহ দেখবো—তারও জো নেই, দেহ! ? হ্যাঁ...ঠ্যাঁ—( সে কিছু দৃষ্টিতে পারিতেছে না, কেন দেখিবার সম্ভাবনা নাই )

খিওডর

আজ সকালে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে ।

ক্রিস্টিনে

( ভরপুর ভাব-তলী সহিত বেনামূর্ণ মূর্তিতে ) কবর...আমি কিছু জানতুম না? গুলিতে সে মরণ...তারপর ককিনেতে তাকে পোহান হ'ল, তারপর গোরবানে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তারপর মাটির মধ্যে তাকে ঢাণা দেওয়া হ'ল—আর আমি কিছু, কিছুই দেখতে পেলুম না?—ত'দিন হ'ল সে মরেছে—আর আপনি আমার কাছে আসেন নি, একটু কথাও জানাশেন না? —

খিওডর

( আবেগজন ) ও, এ ত'দিন...আপনি বুঝতে পারবেন, এ ত'দিন আমার ওপর বিধে কি গেছে...দেখুন, অনেক কর্তব্যভার ছিল, তার পিতামাতাকে জানানো—আরও কত কি কাজ—তার ওপর আমার মনের অবস্থা

ক্রিস্টিনে



খিওডর

হাঁ...সব পূর্ব পাঠ্যভাবে করতে হ'ল...কেবল নিকটতম  
আত্মীয় ও বন্ধুরা...

ক্রিস্টিনে

কেবল নিকটতম—? আর আমি—?—আমি কে ?  
মিত্‌সি

তুমি যেনে ওঠে কণাই আর লবাই বলত।

ক্রিস্টিনে

উঃ, আমি তার কে—? তার সবাইএর চেয়েও তুচ্ছ ?

হাঁ, তার সব আত্মীয়দের চেয়ে সামান্য, তুচ্ছ ?

তাইরিঃ

ক্রিস্টিনে, না, আর আমার কাছে, আমার কাছে...

( ক্রিস্টিনেকে বুকে টানিয়া লইল। খিওডরের প্রতি ) আপনি  
যান, আমাদের একটি একা থাকতে দিন।

খিওডর

আমি বড়ই... ( তার শব্দার শব্দ গোপন রূপে ঢাকি দৃষ্ট্য  
খাটকাইয়া যেন ) আমি তাবিনি, তাবিনি...

ক্রিস্টিনে

কি ভাবেন মি ?—যে আমি তাকে ভালোবেসেছি ?

( তাইরিঃ ক্রিস্টিনেকে নিজের ঘিকে টানিয়া লইল, খিওডর ও  
মিত্‌সি ক্রিস্টিনের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল )

ক্রিস্টিনে

( তাইরিঃএর প্রেরণকন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ) তার  
কন্যেতে আমাকে নিজে চলুন !

তাইরিঃ

মিত্‌সি

হাল না, ক্রিস্টিনে—

খিওডর

ক্রিস্টিনে...পরে, পবে—কাল...আগে একই পাথ  
চোন—

ক্রিস্টিনে

কাল ?—যখন আমি পাথ ছব ? !—হুঁ, তারপর এক  
মাস পরে ধীরে ধীরে তুলে যাবো, কেমন ?—তারপর চ'মাস

পরে আবার আমি হাসবো—? ( হাসিয়া উঠিল ) তারপর,  
আবার বহুদূর গেমিকটি করুন আগুচে ? কখন

তাইরিঃ

ক্রিস্টিনে !...

ক্রিস্টিনে

বেশ, থাকুন আপনি—আমি একাই পথ দেখে যেতে  
পারবো...

তাইরিঃ

মিত্‌সি

ক্রিস্টিনে

সেই ভাল...আমি যখন...যেতে লাগ...আমার ছেড়ে  
লাগ।

তাইরিঃ

ক্রিস্টিনে, থাক...

মিত্‌সি

হাল না ওখানে !—কত দিনে দেখা দিবে ওখানে আর  
একজন—আর একজন প্রার্থনা করছে।

ক্রিস্টিনে

( যেন নিজের প্রতি, দ্বিধা তীর দৃষ্ট্য ) আমি দেখানে প্রার্থনা  
করতে থাকি না...না... ( যে সবাইএর পাল কটাটাইয়া চলিয়া  
যেন...অপরে সকলে নির্ভীক বিদায় )

তাইরিঃ

পিপসির, পিপসির হাল ওর দেখানে।

( খিওডর, মিত্‌সি ক্রিস্টিনের সন্ধান দেখে )

তাইরিঃ

আমি আর পারি না, আর পারি না... ( যেমনার সহিত  
বহুদূর ঘিকে অগ্রসর হইল, জাননা পথার পিতা খামিয়া বসিয়াছিল )  
দে কি চাহ, কি করতে চাহ... ( জাননা দিয়া বাহিরের পুত্রতার  
ঘিকে জাহিয়া বসিয়াছিল ) ও আর কিরে আনবে না—  
না—পে আর কিরে আনবে না ! ( ক'বিত্তে ক'বিত্তে তাইরিঃ  
করা যেরেব ওপর লুটাইয়া পড়িল )



## কাফি—কাওয়ালী

কেন, কেন মারিছ শিওকারী !  
 নাশ বশন করিলে লাগে নাড়ি ।  
 আবার কুম্ভুমে অছ করিলে ত,  
 ভগালে ভগালে দিলে ভরি',  
 ভিঙিল কটিন মন, ভিঙিল কটোর লগ,  
 ভিঙিল চুনরী আর ভিঙিল কবরী ।  
 মাথায়ে মাথায়ে কাগ প্রাণে লাগাইছ আথ,  
 বাড়াইছ পুন তাহে দিকিরা বারি ।  
 কি খেলা খেলিছ চরি, লাগে তরাসে মবি ;  
 হোল হোল হোলে মন অসহায়া নারী ।  
 লগ জন-সমুল চকিত কানন-তল,  
 গুপ্তজন লিছে পিছে হিমিছে প্রতরা ।  
 বল কি বল কি করি নিবধ নিতুর চরি,  
 অক বধির ভূমি, কেমনে নিধাবি !

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

II[ পদ্য রূপা

কে

পা

II[ পা পা রা

বা •

। রা রা রা

ক ধ ক

গা



I সী সী সী  
বি লে তে

I সী সর্গী সী  
ও লী লে

-I সর্গী ধপা । পধা নর্গী র্গী ধর্গী

I সর্গী  
বি

-I -I (নধপা) I  
... ..

ধা ধা ধা ধা  
তি ন ম ন

সী  
ক

ধা পা I  
ক

I পা না না না  
তি তি ল ত

সী সী সী -I  
ন রী আ র

I পা না না সী । নর্গী র্গী সর্গী ধপা II  
তি তি ল ক ব . . রী .

রা রা রা  
ধা রে মা

রা রা রা গা  
ধা রে কা ঘ

গা  
ন

গা মা  
তি গা

ধা ধা ধা ধা  
লি ছ ত বি

গা র্গী সী  
কে ত

I পা রা রা রা  
প ধ ত ন

র্গী -I র্গী র্গী  
চ ন চ ল

I রা র্গী রা রা সী সী সী সী I  
চ কি ত কা ন ন ত ল

I সী সর্গী সী গা । ধা মা পা ধা  
ও ক . ত ন লি ছে লি ছে

না না নর্গী । ধনা সর্গী সী (পা) I  
ন বি ছে গ্র .  
কী .

ধা ধা ধা  
ল কি ব

ধা ধা ধা ধা  
ল কি ক তি

I ধা গা র্গী সী  
লি ঘ . ধ নি

গা ধা পা পা I  
হু র ত বি

সী সী সী সী  
ধি র হু ঘি

I পা না না সী । নর্গী র্গী সর্গী ধপা II  
কে ম নে নি বা . বি . . .

## বসন্তে বিজ্ঞাপতি

### শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

যজ্ঞতি-বর্ণনাই সমগ্র বৈকব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। রাবাক্ষের প্রেমময় লীলাকে কেন্দ্র করিয়া বৈকব কবিত্ব যে প্রকৃতি-বর্ণনার অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই তাঁহারই এই গীতি-রচনাকে চিত্রস্থান করিয়া রাখিয়াছে। হুজলা হুজলা পদা-প্রামাণ্যের নিবিড় সিন্ধু অকলঙ্কীয় এই সভ্য-কবিত্বের চকুর সমুখে বড়লতুর যে অনবদ্য বাস্তব কাস্তি পর্বাণে পর্বাণে স্ফুটয়া উঠিয়াছে তাহাই তাঁহার ভাষার তুলিতে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইজন্যই এই ছবি এমন জীবন্ত ও নূতন বলিয়া মনে হয়।

অজ্ঞাত বৈকব কবিত্বের জ্ঞান বিজ্ঞাপতিরও প্রধান বর্ণনাধন বৃন্দাবন। ইহাকে একদিন অসুস্থ প্রাকৃতিক দৌল্যের আধাররূপে কল্পনা করিয়া এই বৈকব কবিত্ব ইহাতে আজিও চির-বসন্তের ছাপ লাগাইয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্যই বৃন্দাবনের বসন্ত চিরস্থান।

একমাত্র বিজ্ঞাপতির পদ-রচনার ঐশ্বর্য্যই বৃন্দাবনের চিরবসন্তের কল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। বিজ্ঞাপতি মিশিলার কবি, জুজীয়া মৈথিলী ভাষার তাঁহার সমগ্র পদাবলী রচিত; তপালি সারা বাংলার বুক জুড়িয়া আজিও ভাষা ভাঙা মৈথিলী ভাষার বিজ্ঞাপতির পদাবলী নিরঙ্কশের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। তাগলতার সুনিতে লেগা বিজ্ঞাপতির বিকৃত ও অবিকৃত মৈথিলীসঙ্গীত আজিও বাংলার পরীতে পরীতে গুট্ট হয়। ইহা হইতেই অত্রটিত হয় যে, বিজ্ঞাপতি প্রথম হইতেই এই বন্দনকে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এককালে এই বৈকবের ভক্তিসঙ্গীত সীতামবাকিনীর এক প্রবল বক্তা এই দেশকে গভীর করিয়া রাখিয়াছিল। সেই জন্য

আজিও বিজ্ঞাপতি বিদেশী ও ভিন্ন ভাষাভাষী ভাষাও বাংলার সচিত্র এমন নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ।

বর্ষার প্রাকৃতিক বর্ণনা বিজ্ঞাপতিক অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পদাবলী সমস্তভাবে পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বসন্তও একদিন অতুল দৌল্যের ঐশ্বর্য্য লইয়া বাস্তব সৃষ্টিতে তাঁহার কল্পনা চকুর সমুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আর তাঁহার তুলিতে তাহাই অজিত করিয়া মস্তার জীব আজিও অমর হইয়া রহিয়াছেন। এবং এই রচনাই ভক্তের বৃন্দাবনের চির-বসন্ত কল্পনাকে জীবন্ত সৃষ্টিতে চিরপরিমাণে দান করিয়া দিয়াছে।

মাঘ মাসের জীর্ণকমৌ তিথিতে শুভকণে শুভকণে ধাত্তৌ বনশ্চতির গন্তে বদন্তের গম্য হইল। কবি এত সুন্দর উৎস্রেকা ভাষার সুখে আত্মা সুস্থ হইয়া স্ফুটিয়াছে।

মাঘ মাসে দিগ পক্ষ্মে খজাইল  
এক মাস পক্ষ্মে কখাই  
কিৎ বন স্ত্রীঃ পাকল।  
বনশ্চিৎ তেলি বটী হে।  
শুভকণে বদন্তের গম্য হইল।  
দিকবর উঠিও সমাই।  
মোগর ল'গুবে বহিৎ মদমে  
জান মেল বিসুপাই হে।

শিশু-বসন্তের অস্বাভাব্য উপলক্ষে সুবর্তীণ উপলিত হইয়া মঙ্গলমীত পাঁচিল, আর প্রকৃতি তাঁহার সঞ্চর্চন করিল।

মাঘ এ সুবর্তীণে চমকিত  
এক মেল মেল মনাই হে।



মধুর মনোহর মঙ্গল খান ।  
 ছা'নিমি মাঝে উপাধি ৩ ।  
 এর মনোহরিত ভক্ত উচিত ৩  
 মন হইত তুমি করিয়া ।  
 মাঝে তুমি তুমি মনোহর ৩  
 ৩ মন হইত মনোহর ৩

আর গণিতশাস্ত্রাভিষ্ট কোকিল এই নবজাত শিশুকে  
 'কৃত্তবসন্ত' বলিয়া নামকরণ করিল ।

কিন্তু কেন্দ্রমা তুমি পাম লিখিও ৩  
 বাণি মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কোকিল গণিত ভণিত তাল জানে  
 রিত বসন্ত নাম খোলা ৩

কবি নবাস্তর এলত্বেক এখানে গিতমুদ্রিতে করনা  
 কবিরেণ, তাতার নামকরণ হইল, ও বিখ্যাত্তি তাহার  
 প্রসাধনের তার ওজন করিল ।

কবির পদময় মন উপাধি  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা

চিত্র-অনন্দময় কৃষ্ণাবন-প্রকৃতির বিরায় বিরায় এক  
 অনিন্দনীয় জানন্দের অঙ্গুষ্ঠিত চকল হইয়া উঠিল ।  
 দক্ষিণ পর্বে চুতাবনত লক্ষ্যেরে পাখা আনোপিত  
 হইতেছে, আর মননের পূত কোকিল তাহার বসন্তা মনোত্তর  
 তাহার বলিয়া হাইতেছে ।

মল্লমালিনে লাহন চার কোল ।  
 কল-কাকিল রবে মন ৩ ৩ লোনা

অন্তএব আকি তরুণী দুবতী শ্রোতা কৃষ্ণা বদন্তের এই  
 উৎসবানন্দে যোগ বিদ্যাছে ।

মাগের যে তরুণী তেজস্বী লাহন ।  
 হাইল বদন্ত-বিত্ত বাকি লাহন ।  
 হাইল চিত্রমি শ্রুতিনি লাহন ।  
 হাইল লাহন এক বৃদ্ধি লাহন ।

কবে কৃষ্ণাবন-পত্নী পাতার বদন্ত-লোকলোচন অনবন্ত-  
 লুপ্তা যেন উল্কাহীরা শক্তিতে লালিল ।

কিন্তু কবির মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা ।  
 কবির মন ৩ ৩ লোনা ।

এই রচনা করণে করনার কল-হইতে পারে না, ইহা  
 কবির চকুর মনুধক বাস্তব হইবে বাস্তব বিকাশ মাত্র ।  
 বিভাগিতর করনার চক্রে কৃষ্ণাবন চিরনুতন ।

মন কৃষ্ণাবন মন ৩ ৩ লোনা  
 মন ৩ ৩ লোনা  
 মন ৩ ৩ লোনা  
 মন ৩ ৩ লোনা

বৈকুণ্ঠের তন্ত্রির অঙ্গুষ্ঠিতে কৃষ্ণাবন চিরমধুর ; কবির  
 সার্বক-লেন্থনীতে এই মধুর চিত্র মধুরতর হইয়া দৃষ্টিগা  
 উঠিয়াছে,—

মধুর মধুর পাতা ।  
 মধুর মধুর মধুর পাতা ।  
 মধুর মধুর মধুর পাতা ।  
 মধুর মধুর মধুর পাতা ।

প্রতিভাবান লেন্থকের মন যেমন কবে বাস্তবতার  
 মনো পত্নী তরে তরে অতিক্রম করিয়া অকপেবে অনন্ত  
 করনার রাত্রে প্রবেশ করে, বিভাগিতর পদ্যলোচন মনো  
 পদ্যলোচনগা ইহা এই প্রত্যক্ষ করিয়া দেব যে, অল্পদিনেই  
 কীভাবে বাস্তবতার মোহ কাটিয়া গিয়াছিল । কাহন,  
 যদিও বিভাগিতর রচনাতে idealism ভিন্নিষ্টার একান্ত

অথবা বলিয়া অনেকেরই কবির ধোঁবা খুঁটিনাটি করিয়া বাহির করিতেছেন, তথাপি অঙ্গুলিগোলা ক্ষুদ্র ত্রায় গীহারো বস্তুতাত্ত্বিক রচনার অন্তরালে যে একটি হৃদয় ভাবজগতের চিত্রের খাড়া প্রচ্ছন্নপ্রসারের বস্তুমান তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সাহিত্যের তখন যে সুগম সেই বৃগে idealism-এর কতদূর অনাবরণ হইত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আর সেই বৃগে এই মূল উচ্চাঙ্গের ভাববিবেচনের ক্ষমতা কবিরের থাকিলেও হইত লোকের অগ্রসরতার আশঙ্কায় তাহারাই এই প্রকার রচনা হইতে বিরত হইতেন। অতএব বিজ্ঞাপতিতে বসন্ত-প্রকৃতির সম্বন্ধে idealistic উক্তি একেবারে পাওয়া যায় না এমন বলিলে নিতান্তই ভ্রম করা হইবে, যদিও realism-এই বিজ্ঞাপতির চরম বিকাশ।

ঐরাধার পুনরাগের সূত্র করিতে কবি বসন্তের মধাহ্নতা স্বীকার করিয়া কহিলেন, ‘হে কোলদমরী রাধিকে, তুমি কাহ্নকে অর্ধলোচনে (কটাক্ষে) জ্ঞান করিলে অত্র মদন-বলন্তকে তাহার সাক্ষী রাখিলে।—

‘বড় কোল তুমি রাখে।  
কিনল কহাই লোচন আশে।  
কতপতি হইল এ বহি পরমাতী।  
বনমগ্ন যখন উড়িত হুলবাতী।  
বিজ্ঞপিক লোক যদি মকরমা।  
কান তরঙ্গের সাঁখী ঢল। ১

ঐরাধার মানভঞ্জনের প্রচেষ্টার মাধ্যমের মূখ্য বিদ্যা কবি যে কয়টি কথা কহিয়াছেন তাহাতে যে বস্তুতাত্ত্বিকতার অন্তরালে এক প্রচ্ছন্ন ভাবজগতের করুণা-প্রবণতার হৃদয়

অভ্যন্তর পাওয়া যায় তাহা বৈকল্য-সাহিত্যের এক অতুল সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।—

মানিনি বৃগুমে রঙিল লোভা মান মনঃপ্রভ  
কৌবন জীবন ধন।  
মাতৃকি বহনি যদি বিফলে মাতৃকি  
পুত্র কালি তলে কে জান ক’খন।

মানিনি, মান তাগ কর, ভঁাবনে যৌবনই ধন।  
মানিকার রাহি যদি নিষবৎ দায় কাল কৌবন কি হইবে কে  
জানে।  
চাচিগা দেহ বসন্তের রক্তনী প্রভাত হইতে  
চলিল,—

বিফল যখন বনমগ্ন হাম।  
সে’ যদি কোবিল মনে উই হাম।  
এরে মানিনি পাল্টা মিটার।  
মকল শিবঃ লামল মকরমা।

কিন্তু আধিকার মধুধামিনী বর্ষ হইতে চলিল ভাবিয়া  
মাথব আতুল হইলেন।

করে করে তমরা চোকে হিত হমরা  
বইসি মানব গজদামিহেরে।  
যাহু কি কলি কালি মকো বইসি  
তীতি হোতিত যু মামিহেরে।

কৌবন-অবধের এই হৃদয় আশ্রুটুকু লইয়াই গমতখৈরামের সমগ্র পূর্ণন। কিন্তু বিজ্ঞাপতি এক কপার প্রাকৃতিক বর্ণনার সাহায্যে সেই দার্শনিক সত্যটি কত সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিলেন।

বিবহ বা বাবুয়ের বর্ণনার কবির শতদুখী প্রতিভার পরিচয়ের লক্ষে লক্ষে প্রকৃতির চিত্র-চিত্রনের যে অদ্বুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশ্বের সাহিত্যেও অমিতব্য। বিরহীরাধার মনের উপর বসন্ত কল্লুর প্রভাবের ছাপ কবি রাবার মনোবিবেচনের লক্ষে লক্ষে সুস্পষ্টভাবে আঁকিয়াছেন। বিজ্ঞাপতির বসন্তবর্ণনা এই ধানেই idealistic কবি বাস্তবরাজ্য হইতে এইখানে অনেক উচ্চে পারদ্য আনিয়াছেন।

- ১. রতাকর রতাতাধ্যায় বসন্ত কল্লুর রাধিকে।
- লোচনাচ্ছেন স কৌতরতা তে কোলদমরী।
- চটাইলো বসন্তমা লোচনপ্রসারী চিত্রকণ।
- যোগেশ্বরগণধাকৌচ মাতো বসন্তাবধিগত।
- অবহন্ত লগা কপো। লোকঃ কোবিলঃ বিহঃ।
- অদ্বুত কল্লুর রাধে পদী পাজে যদা যু।

বিজ্ঞাপতির বসন্তচিত্র উল্লেখ্যত অনুরণ বসন্ত।



বিরহিনীর অন্তরের অন্তরস্থ ভেদ করিয়া ঘোঁষ নিখালের  
মত এই কথা করটির গভীরতা কতদূর তাহা খিচাঁর করিলে  
বিস্মিত হইতে হয়।—

মে ওচল পলক                      মলতপসক  
দেখিলে গুণি লম্বায়ে  
কত যুগ যাপ                      বিলাসে গম্বায়ে  
অবশ্যে কইটো লাগে।  
মণিন শবন                      লইয়াত য়গতাপন  
শিউল অমিত রস সারে।  
কোকিল কলসর                      উপধর পূরণ  
তঁকি কত কলং দিকারে।

বলন্ত তাহার সমগ্র সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যভাঙার গুলিয়া  
দিয়াছে, ইহা দেখিয়া বিরহিনী কেমনে গ্রাণে ধারণ করিয়া  
থাকিবে?

চাঁদিগ জনর জন                      কুতল কুতল রম  
দীর্ঘসি মাঝরি শিখট।  
মল পশ্চম দূর                      শিক কুত কুত কত  
দনি বিরহিনী কইলো জীবট।

তাই,

কুতলিত কানন  
দুনি' ওচল কুতলান।  
কোকিল কলসর                      অকুতর বনি দনি'  
কর সেট বঁগিল কনি।

কিন্তু কৃষ্ণাবনেত লভায় পাতায় বসন্তের সৌন্দর্য্যভাঙ্গি  
হেন স্বপ্নিয়া পড়িতেছে এই মূর্ত অঙ্গন; আতএব নবীকল,  
ভোমরা মাথথকে কৃষ্ণাবনে আনন্দনের উপার কর।

সবির মলর                      রমর মলর  
কোকিল পলর মাঝ।  
মণিন শবন বিরহ বেকর  
নিরু কপন মাঝ।  
মল্লিক রত্ন দেখে উপায়ে।  
মধুমাগ বকো মাঝর মাঝ এ  
বিরহ বেগর মাঝ এ।

কিন্তু সবুয়ার লম্ব চাতিয়া চাতিয়া এগারেরও নিম্নল বসন্ত  
কাটিয়া সেল,—

তবে নিশ্চয়ই আমার প্রিয় সেই দেশে গিয়াছে যেখানে  
হৃৎকটুর ভেদ জানে না; শিক নাই কিম্বা কাননে কুন্দস  
প্রসুত হইয়াছে।

ঘর্ষে ঘর্ষে বসন্তের পর বলন্ত বিরহিনীর অন্তরগারে  
নিম্নলে যা বিরা চাপিয়া বাইতেছে কিন্ত নিম্নর মনহইল  
মাঝর আর কৃষ্ণাবনের কথা স্মরণও করিতেছে না।  
বিরহিনীর এই কাতর বিলাপ কবির সার্থক লেখনীতে কি  
প্রসঙ্গভাবেই না ছুটিয়া উঠিয়াছে,—

কুটল কুতল বন                      কুতলকুটল বন  
কোকিল পলর পাওটো।  
মলতাপন রিম-                      বিধির সিংহল  
শিখা নিল বেগ না মাওটো।  
চাপ রমল তরু                      অমিত ভাঙার  
উপধর আলি উতরোলে রে।  
সমর বসন্ত                      কায় রত হু বন  
জানল বিহি স্তিকুল রে।

তবে এই কৃষ্ণাবনে নব-বসন্তের আগমন-সংবাদ যদি  
মাথথের কানে যায় তবে নিশ্চর ভিনি না আশ্রিয়া থাকিতে  
পারিবেন না।

অব যদি ঘাই লম্বায় কান।  
আওব টোলে হরর বন কান।



তারপর এক বসন্ত-আমিলীর তত দুহুঁতে দীর্ঘ  
বিরহ-দয়নার উপনয়ন ছইবার আশা ছইল। অথি  
বনে তাহাকে আশ্বাস দিলেন।

সবর বসন্ত সময় তল গাওলি  
হঠিন পথর বর বীরে।  
বগনহু' কণ বচন এক তাধির  
দুখ দৌ খরি কক তাঁরে।

ঐশ্বর্য অতীতের ভগ্নে বিরহ-বসন্ত  
বেদনাময় স্মৃতি একমাত্র গিরের মুখ  
তুলিলেন—

বাক্য বিতৃপতি যত দুখ গেল।  
হরি দুখ তেবীতে সখি বুঝে গেল।

বিরহিণীর মনে আশার সন্ধান ছইল। অশ্রুতার পথ  
চাটিয়া গিরের আশার আশার উদ্বু ছইয়া কুজ-ভায়ে  
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্ত আবার বাম ছইল।

প্রতি সবার তল চল মল আনিল  
সারর লটরত সার লো।  
কাচক বিপদ কাচক সন্দেহ  
মানাখতি সারার লো।

এই বসন্ত সময় 'কর্তা-জ্যোতি' প্রাণিনী জনের' সম্পদের দিন  
আর বিরহিণীর বিবদ বিপদের কাল।

তারপর বসন্তেরই এক ততদুহুঁতে রাধার এই দীর্ঘ বিরহ-  
জ্বালার অবসান ছইল। প্রেমিকা গিরের সুখাবিষ্ক  
দেখিয়া খুশ ছইল।

আমু রজনী হাম তাগে পয়াওল  
পেবলু গিরা মুখ চলা।  
জীবন যৌবন মকল করি মানল  
বগনির বেল নিবদলা।

সেই গোফিল আর লাম চাকট  
লাম উচর কর চলা।  
পাঁচবাণ অম লাম বাণ ছউ  
মলর লবর মর মক্কা।

বসন্ত তাহার সমগ্র ঐশ্বর্যের সজ্ঞাও পুলিয়া দিক।  
তাঁহা আক তৃপ্তির চরিতার্থতার পার্থক্য ছইয়াছে।

ততবৈকলের কল্পনা চকুর সম্মুখে সন্ধ্যাবনের যে চিত্র-  
সুন্দর ভিত্তি একদিন সূটিকা উঠিয়াছিল তাহাই ভাষার রূপে  
অমর লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির এমন বাস্তব চিত্রাঙ্কন  
যদি কোনও রূপে কোনও শিল্পীর হাতে পার্থক্য অর্জন  
করিয়া থাকে তবে এই স্বভাব-কবিগণের তুলিতেই তাহার  
বিকাশ ছইয়াছে। প্রকৃতির সচিৎ অস্বাভাবিক জড়িত  
থাকার এই স্বভাব-কবিগণের লেখনীতে যাহাই  
সূটিকা ছে তাহাই সুন্দর ছইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য  
প্রাকৃতিক চিত্র-বর্ণনে তাঁহাদের এমন শিল্পকলা। পূর্বাবধি  
শৌর্যের বিভাপতি প্রাণ ভবিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, তাই  
তাহা স্মৃতিগান গাতিয়াছেন।

কৃষ্ণ পরিমল সন্ত তুমি নহা পলয় পুজিত  
কাঁঠোবত রথনিহিত কোকিলকল দুজিত  
বেছি নবীন-কেশ বৈব সমীরে বিম্বিত বোবা চ বৈবাম।  
আবরী লহা লহা পবিত্রতাঁর বনজীবন।  
মাবন মাল মধু মদ্যে। অধিত বাবা বরলমণে।  
বিবহি চির বিজয় লক্ষন চুতমুখ তবহরে।  
গাটনা মধু-মুখ মধুকর নিকর নান মনোহরে।  
চক্ৰ চন্দন কুতুম্ব। গুণগণ কুতল-বিত্তি।  
হাথ কাথ বিলাস কোশল কোশল মিহুর কল পতিতা।

বিভাপতির জগদুন্মি মিথিলা একদিন প্রাকৃতিক  
শৌর্যের লীলাভূমি ছিল। মাতৃভূমির এই শরীর স্নেহ  
ছবিকে চিত্র-বসন্তের সন্ধ্যাবনরূপে কল্পনা করিয়া তাহা  
ছইতে কবির রস-পিপাসার তৃপ্তি ছউত। কবি জগদুন্মি  
মিথিলার অক্লান্ত শৌর্যের বসন্তের পর্যায়ে পর্যায়ে যাত্রা  
নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পবনবী জীবনের  
কাব্যরচনার স্মৃতি লাভ করিয়াছে।



# দর্শনের দৃষ্টি

## শ্রীভরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমরা চোখে দেখি এবং মনে ভাবি, এ সবকিছু কাছাকাছি  
 হয়ত স্থান্য না উঠতে পারে। কিন্তু যেখান থেকে আমরা  
 মাছের জিন্দা ও কণা ভিজাসা করলেই একটা কুটুংকালে  
 কথা উঠে পড়ে। লাল, নীল, সবুজ কত রকম রঙ, আমরা  
 চোখে দেখি, কিন্তু লাল রঙটাকে দেখা আর লাল রঙটাকে  
 লাল ব'লে চেনা এ দুটোর মধ্যে যে একটা তফাৎ আছে সে  
 কথা সত্যই মনে আসে না, লালের বোধ এক রকমের বোধ  
 নীলের বোধ এক রকমের বোধ, এ বোধ তখনই কেটে  
 যখন আমাদের চোখের ভিতরের রূপটি বাহিরের রূপ তার  
 রঙের চেয়ে লালার আর সেট চোখের সাড়া পড়তটাই  
 আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহিরের রূপ কেমন  
 ক'রে রঙ, তা আর সেট রঙ কেমন ক'রে রঙের বোধ,  
 ওয়ার তার বসন্ত আরও আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।  
 বাহিরের রূপ যে কি জিনিষ তা জানবার তখনই সুযোগ হয়  
 যখন আমাদের চোখের ও মস্তিষ্কের ভিতরের বস্তুগুলির জৈব  
 ব্যাপারে সেট রূপ রঙে পরিবর্তিত হয়; কোনও বৈজ্ঞানিককে  
 খান ভিজাসা করা যায় যে রূপ কি, এবং রূপে রূপে ভেদ  
 কি, তবে তিনি ভয়ত বলবেন যে আলোকের স্পন্দনের বেগী  
 কমেব নামট রূপ। সে রূপ কিন্তু রঙ, নহ; সে রূপ আমরা  
 চোখে দেখি না বৈজ্ঞানিক অনুমানে বুঝি আছে। চোখের  
 ভিতরের কোনও বিশেষ বস্তুর মধ্যে যখন এই আলোকের  
 রূপ এসে পড়ে তখন তারারই জৈব ব্যাপারের ব্যবহার  
 আলোক পরিমাপ তার স্পন্দনের বেগী কমেব নিশ্চিতে নিয়মে  
 বিভিন্ন রকমের রঙ, ক'রে গাড়ায়; কিন্তু এই জৈব ব্যাপারের  
 ফলে যে রঙ হয় সেট রঙটি যে কেমন ক'রে রঙ-বোধ হয়  
 সে রঙের অভিন্ন কোনও মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু রঙ,  
 বোধ এবং কোনও রঙকে লাল বা নীল ব'লে জানা এ  
 উভয় এক কথা নহ। মধ্যস্থিত শ্রুতিরও রঙ আছে এবং  
 ওয়ার একটুও বাহিরের রূপ পড়ে এবং রঙের বোধ ওয়ার

কিন্তু সে শ্রুতি কোনও রঙকে লাল বা নীল ব'লে জানে ও  
 কথা বলা চলে না। কোনও রঙ, বোধকে লাল ব'লে  
 জানা শুধু একটা জানা নহ, সেটা একটা পরিচয়। দুটোকে  
 এক না কবতে পারলে পরিচয় হয় না। কোনও একটা  
 রঙ-বোধকে যদি ঘ'রে রাখতে পারি এবং পুনরায় সেট  
 বোধটি উৎপন্ন হলে এই দুটোর ঠিক এবং অশব্দ অশব্দ  
 বোধ হতে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারি তবেই সেট দুটো  
 বোধের ঠিকের পরিচয় ঘটে এবং এই ঠিকের পরিচয়  
 চলেই, সেট রঙ-বোধকে লাল বা নীল ব'লে বুঝতে  
 পারি। যদি আমাদের মধ্যে প্রতিক্ষেপে বিভিন্ন  
 রকমের রঙের বোধ উৎপন্ন হ'ত এবং প্রতিক্ষেপে তারা স্বাভাবিক  
 হ'ত যেহেতু, তবে কোনও রঙের বোধের দৃষ্টি কোনও  
 রঙের বোধের পরিচয় চলেই। সত্যই হ'ত না, এবং কোনও  
 রঙকে লাল বা নীল ব'লেও চেনা যেত না। কোনও  
 একটা বোধ একবার বা একাধিকবার ঘটলে যে সেটি পক্ষ  
 তাই থেকে যায় এবং পুনরায় তৎসমূহ বোধ উৎপন্ন হ'লে  
 সেটি পুনরুদ্ধ হয় এবং কালের ব্যবধান এড়িয়ে যে ওট  
 কালের দুটো বোধ পাশাপাশি বা তার এবং ঠিকো লক্ষ্য স্থাপন  
 করে, এট নাম প্রতি; এট যদি না দৃষ্ট হ'ত লালকে  
 লাল বলিয়া নালকে নীল বলিয়া; চেনা বা জানা সম্ভব হ'ত  
 না।

যেহেতু মধ্যে প্রতিক্ষেপে আমরা স্পন্দনক্রিয় যে নব নব  
 বিকীর্ণ দেখতে পাই তাতে প্রতিষ্ঠিত যে আমাদের পদান  
 দেখতে পাই তাতে কোনও ব্যাপারের সত্য বা সত্যতার  
 চিন্তামাত্রও দেখতে পাই না। কিন্তু যেট আমরা উৎপন্ন  
 যের মধ্যে প্রবেশ করি সেট দেখি যে জৈব ব্যাপারের একটা  
 প্রধান লক্ষণই হচ্ছে জৈব ব্যবহারের বা মূর্ত জৈব প্রত্যয়ের  
 দৃষ্টি বা প্রতি এবং সেট অনুমানে বস্তুবোধের নিয়ম। ক্ষুদ্র-  
 হাওয়া বায়ু সত্যিকার-নিয়মে সত্যপাতন প্রতিপালন



তম কীটেরও যৌনপ্রজাতি পর্যাপ্তোচ্চনা করলে দেখা যায় যে সেট কীটটি তার আচরণীয় বস্তুকে অবশ্যে বের করে সেটিকে ধরে এবং চুষত সেটি তাকে ছাড়িয়ে দ'বে যায়, এবং সে তার পিছু পিছু গিয়ে আবার সেটিকে ধরে। কুহকম পান্থের বাপাশ্রয় মতোও এই যে একটি মৃত স্ত্রীতির পথের পাশে যায় এটা শুভ উপস্থিতের বাপাশ্রয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষের যেমন বোধ আছে কুহকম পান্থেরও যে সেট বস্তু বোধ আছে এ কথা অবশ্য স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বোধভূগা ভাগ্যবেরও যে সমস্ত একটা বোধভাগ আছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। এটা বোধভাগের ধারা ভাগ্যবের প্রাবল্যতা যেভাবে নিশার হয়, তাতে বস্তুট মনে হয় যে বিভিন্ন কালের এবং চরম কুলক্রমগত পিতৃসুত্বের বোধভাগগুলি ভাগ্যবের মধ্যে সজিত থেকে তাদের বৈধ বাপাশ্রয়গতিক তাদের প্রাবল্যের অন্তর্য ক'রে তোলে। একজন বিখ্যাত পান্থবিদ বুলেছেন—The effectiveness which characterises the behaviour of organisms (i.e. of those that show behaviour enough to be studied) seems to depend on profiting by experience in the individual lifetime or on the results of successful ancestral experiments, or, usually on both. It appears to us to be one of the insignia of life that the organism registers its experiments or true results of its experiences.

আর একজনও এট কথার অন্যভাবে বলেছেন, "It is the peculiarity of living things not merely that they change under the influence of surrounding circumstances, but that any change which takes place in them is not lost, but retained, and as it were built into the organism to serve as the foundation of future actions". অনুপরিবর্তী কালের বিজ্ঞ পদ্যপত্রর যে বাপাশ্রয়গত সম্পূর্ণ পূর্বক চ'রে সংঘটিত, বৈধ বোধভাগের দৃকগত্বিত্তে তারা যে কি কোনও এমন করিয়া বিদ্য

চ'রে পাকে তার জটিল রূপা মাঝারের নিকট এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জটিলগতের মধ্যে যে নিরন্তর শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত চলেতে তার প্রত্যেকটি শক্তি তার নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট দিকে প্রতিনিরত কার্য করছে। এট যে স্থবীর চারিদিকে গ্রন্থগুলি নিরন্তর যুক্ত, এতদিন পূর্বেও যে তাদের ঘোরার একটা অভ্যাস হয়েছে তা বলা যায় না। পৃথিবী যে তার বৈকল্পিক গতিতে ছুটে বেগিরে যেতে চার এবং স্থা যে তাকে নিজের দিকে টানছে, এট মোটামোট সাময়িক বস্তুগতকারে ঘোরার সূচী। কিন্তু এতদিনের ঘোরাতেরও পৃথিবীর কোনও ঘোরার অভ্যাস আছে নাই, এবং আজ যদি কোনও কারণে স্থবীরের আকর্ষণ একটু হ্রাস চ'রে যায় তবে পৃথিবী স্থা থেকে দূরদূরত্বে আকারের কোন ক্ষতি পাবে যে ছুটে যেতে থাকবে, কি কোথায় কার পরে থাকে সেগে চূর্ব চ'রে যাবে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। জড়ের মধ্যে আকর্ষণ, আকর্ষণ, আকর্ষণ বা আকর্ষণেরই ক্ষমতা কোনও ছোটা বা বাপাশ্রয় দেখা যায় না; জড়ের মৃদুশক্তির কারণে প্রবলে এমন কোনও ছিল নেই যাতে একথা বলা যায় যে আকর্ষণগতকারের ছোটা জড় তার কোনও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের ছোটা করছে। জড়ের মধ্যে যদি কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় সে উদ্দেশ্য জড়ের নিজের উপকারের জন্য নয়, সে উদ্দেশ্য জড়ের উপকারের জন্য জড়ের ভোগের জন্য জড়ের ব্যবহারের জন্য। সাধারণতকার জড়ের এট তথ্যই ভাল ক'রে বুঝেছিলেন তাই তিনি প্রকৃতিক পর্যায়ে এবং পূর্বকর ভোগ্যবর্ণগতভাবে বাপাশ্রয় ব'লে বর্ণন করেছেন। সামান্য একটা পরমাণুসংগঠনের মধ্যেও জড়ের প্রচণ্ড আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির খেলা দেখতে পাই; কিন্তু তার পরিমাণ, অস্তিত্বের সারিমা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে তার ব্যবহার এ সমস্তট একান্তভাবে নির্দিষ্ট এবং গতিশক্তির আন্তরিক মধ্যে বস্তু নির্মিত। জড়ের কোনও প্রয়োজনগতির অভাব নেই, তাই নানা অবস্থার তার ব্যবহারের বৈচিত্র্য নেই। পূজাপর ব্যবহারের সত্য নেই, সত্য নেই, অবস্থার বৈচিত্র্যে পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই।





running down and wound up : but unlike a clock, it can wind itself up, if it gets food and rest. The chemical processes are so correlated that up-building makes further down-breaking possible, the pluses balance the minuses ; and the creature lives on, এদ্বি ক'রে একটি জীবকোষের মধ্যে ক্ষর ও উপচয়ের মধ্য দিয়ে প্রাণ জীবনস্রোত বইতে থাকে। জ্বাৰা বৃত্তের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন ছাড়া, জীবকোষগুলির পরস্পরের সামঞ্জস্যে ছার একটি জীবনস্রোত প্রত্যেকটি জীবকোষের সহিত একটা সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্যে সমগ্র প্রাণীটির জীবনযাত্রা নির্ধারণ করতে থাকে। একদিক দমন প্রত্যেকটি জীবকোষের একটি স্বতন্ত্র প্রাণ সত্তায় আছে অপরদিকে জ্বাৰা প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন সমগ্র প্রাণীটির সমগ্র জীবকোষের সহিত মর্মান্বিতভাবে সংযুক্ত ; এই সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র প্রাণসত্তার রক্ষা পায় না। অনেকগুলি জীবকোষ নিয়ে একটি স্রোতের কৈবর্তিতা চলেছে, তার প্রত্যেকটি কোষের স্বতন্ত্র জীবন স্বতন্ত্রভাবে কাঁচ করছে। কিন্তু যেই স্রোতখানি স্রোত থেকে ছিঁড় করা যায় সেই দেখা যায় যে স্রোতের জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাণবল্কলের ভাষ্যমতে যেটুকু জমা থাকে সেই পাক্তির বলে একটি জীবকোষ দমন আপন পাক্তিকে আপনার মধ্যে সংরক্ষণ করতে পারে না, তখন সে আপনা থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ক্রমে ক্রমে বড় জীবকোষের সৃষ্টি করে তারের সঙ্গে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য পারিবারিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে যে তদন্তৃত্বক প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন সেই সমগ্রের জীবনের উপর নির্ভর করে। এবং এদ্বি ক'রে প্রত্যেকের স্বাভাবিক রক্ষা ক'রেও সমগ্রের জীবন ও জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবনের উপর নির্ভর করে। জ্বাৰা জীবকোষগুলির শুধু সমগ্রীতেই জীবদেহ নির্মাণ হয় না। একটি বিশিষ্ট সমগ্র বিশিষ্টতর পরস্পরায় বিশিষ্টতর আদানপ্রদানের কৌশলে, এই সমগ্রদেহের

উৎপত্তি অবস্থান ও গুণি। সেহ সেহ বিশেষ সত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি জীবকোষ পরস্পরের উপর সে প্রভাব বিস্তার করে, সেই প্রভাবের মধ্যেই একদিকে যেমন সমগ্র জীবদেহের প্রাণসত্তার সৃষ্টি হয় অপরদিকে তেমনি সেই প্রত্যেকটি জীবদেহ ক'রেই প্রত্যেকটি জীবকোষ বেঁচে রয়েছে। বহুকে গুণে কেলে এখানে এক গাড়ার নি, এককে মুছেও বহু গাড়ার নাই। এক দিক দিয়ে দেখলে যাকে দেখি এক, অপরদিক দিয়ে দেখলে সেই এককেই দেখি বহু। আমাদের সাধারণতঃ জানি যে কোনও কিছু যদি এক হয় তবে সে বহু নয়, যদি বহু হয় তবে সে এক নয় ; তার দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যাঁরা বহুত্ব মারায় পড়েছেন তাঁরা এককে অগাধত্ব দিয়েছেন, আর তারা একের মারায় পড়েছেন তাঁরা বহুকে মিথ্যা বলেছেন, কেউ বা বলেছেন, বহুসংকে নিয়ে এক। কিন্তু প্রাণসত্তাতে এসে আমরা যে লীলা দেখি তাতে দেখি এটা একটা এমন রাসা যেখানে কোনও একটা সত্তা বা সত্ত্বই অপর সত্তা বা সত্ত্বকে ছাড়া তার আপন স্বতন্ত্রকেই লাভ করতে পারে না। এখানে ক্ষর ছাড়া গুণিকে লাগা যায় না ; গুণির মধ্যেই ক্ষর, ক্ষরের মধ্যেই গুণি। গুণির পর ক্ষর আসে এ আমরা জানি, বা ক্ষরের পর গুণি আসে এ আমরা জানি। কিন্তু এ যে গুণি-ক্ষরের যৌগসত্তা এবং এমন যৌগসত্তা যেখানে ক্ষরের মধ্যেই গুণি এবং গুণির মধ্যেই ক্ষর। একের সমষ্টিতত্ত্ব বহু নয়, বহুর সমষ্টিতত্ত্ব এক নয়, কিন্তু যাকে এক বলি তাই বহু এবং যাকে বহু বলি তাই এক। সাধারণতঃ দুর্যোগী দর্শনশাস্ত্রে যেটুকু schematic view বা মৌলিকত্ব বলে সেটাকে একের জীবদেহ মধ্যে বহু এসে যেমন ওড়প্রোতভাবে মিলেছে এই কথাটি বিবেচনা করে জোর দিয়ে দেখান হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই মৌলিকত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একের সোচ্চার দেখাবার জন্য এবং একের সঙ্গে যে বহুর বিরোধ নেই, বহুকে নিয়েই যে এক আশ্রয়কে পার্থক্য করছেন এই কথাটি জোর ক'রে দেখাবার জন্য। সকল সময়েই আমরা এই কথা শুনে থাকি যে মৌলিকত্বেই গুণ, গিচ্ছেদ, ধ্বংস, এবং

প্রাকৃতিকতম মঙ্গল ও দুষ্টি। কিন্তু এমনমত মতবাদের মধ্যে জৈবদৃষ্টির ধারণা শিক্ষাটি যে প্রকাশ পেয়েছে আমার তা মনে হয় না। জৈবদৃষ্টির ধারণা তবু এইখানেই প্রকাশ পায় বলে আমার মনে হয় যে এই পৃষ্টিতে এক ও বহুর চিরসন্নিহিত তির্য্যাক্তি তির্য্যাক্তি হয়েছে। যেমন এককে না বোকা গেলে বস্তুকে বোকা যায় না, তেমনি বস্তুকে না বোকা গেলেও এককে বোকা যায় না। বস্তুকে বোকাও যেমন একপেনে বোকা, এককে বোকাও তেমনি একপেনে বোকা। একের বস্তুত্ব তার যে বহুর উৎপত্তি এবং একের বস্তুত্ব তা যে বহুর বস্তুত্ব ছাড়া হয় না। এই যে কার্য্যকারণবিরোধী সত্তা এতে এক এবং বহুর পার্থক্যটি বহু বলাও পার্থক্যটি। চিহ্নের মধ্যে কথ ও কথের মধ্যে চিহ্ন এতে যে ক্রিয়াবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে চিহ্নও পার্থক্যটি কথও পার্থক্যটি। এ পার্থক্যটির নামকরণ কোথায় সে প্রশ্নের এখানে এখন অবতারণা করা সহজ নয়। হুজুরা'ব পদ্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণ বুদ্ধিতে যে সমস্ত সত্ত্বকে আমরা এতকাল গির মনে করে এসেছি সে সমস্ত সত্ত্বগুলির একটিও স্থির নয়, একটিও আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ নয়। বাগ্যান্ধন থেকে Bradley পর্য্যন্ত অনেকেই সত্ত্বগুলির আপেক্ষিকতা বীকার করেছেন এবং সত্ত্বগুলি সমস্তই আপেক্ষিক বলে মনোমাজ্ঞন বলেছেন যে সমস্ত বস্তুই নিঃসত্ত্বাব, ঐকল বলেছেন অস্বাভাব সমস্তই অনিবার্য্য, Bradley বলেছেন যে শব্দ নঃ সৌন্দর্য্য ব'লে সত্ত্বগুলি আপেক্ষিক এবং পরস্পরবিরোধী, কিন্তু মঙ্গল সত্ত্বকে যদি এক করে ফেলি তবে সেই এক করার মধ্যে তারের সমস্ত আপেক্ষিকতা নিঃপেনে পেনে চ'লে যাবে; জ্ঞান কথ,ইচ্ছা সমস্ত একত্র মিলে গিয়ে এই সমগ্রটি দেখি তা বলা যায় না, তা অনিবার্য্য কিন্তু তাই পরমার্থ সৎ। কিন্তু সত্ত্বের আপেক্ষিকতার যে সত্ত্বগুলি মিথ্যা ব'লে মনে হয় তার প্রধান কারণ এই যে একটি সত্ত্ব বৃত্তেও গেলে আর একটি বৃত্তেও হয় এবং সেটিকে বৃত্তেও গেলে আর একটিকে বৃত্তেও হয়, এমনি করে আমরা অনবরত বৃত্তই চলি ততই চলি এবং অনবরত চলিও কোনও সত্ত্বের নির্ণয় হয় না।

একে সাংক্ষেপে বলে আমরা নির্ণয়ী অনবৃত্তা, টংকোতে বলে vicious infinite। আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে একটি সত্ত্বকে বা সত্ত্বকে এক মিক দিয়ে চিহ্নিত বেশ বোকা যায় কিন্তু আর এক মিক দিয়ে বেশেও গেলে সত্ত্বের বোকাও সত্ত্ব বোলা উশ্রিত হয়, বিরোধ হয়। এবং যেহেতু আত্মবিরোধই মিথ্যা সেট কারণ এই সত্ত্বনির্ণয়ও মিথ্যা। ক্রিয়া ব্যাপীরের মধ্যে আত্মবিরোধ বস্তুত্ব চ'লে যায় সেদে Hegel ক্রিয়াব্যাপীরের মধ্যেই সত্ত্বের ধর্ম্মবিশিষ্ট সত্ত্বকে করেছেন বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু ক্রিয়াব্যাপীরতা যে নিজে ক'রে সত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা তিনি কোথাও জ্ঞানই করে বুঝিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। সত্ত্বগুলিকে পৃথক করে দেখি ব'লেই ক্রিয়াব্যাপীরের মধ্যে তারের একন বেবে তারের বিরোধ সমাধান করতে চেষ্টা করি, কিন্তু জৈব দৃষ্টির মধ্যে এই কথাটি যেন আমাদের চোখে বেশ পরিষ্কার চ'লে আসে যে যে সত্ত্বগুলিকে আমরা বুঝি বায়ার পৃথক ব'লে মনে করি সেগুলি পৃথক নয়, তারের প্রত্যেকের সত্ত্বা কপরের মধ্যে নিহিত চ'লে রয়েছে, তাই এক ও নয় বস্তুও নয়। প্রাপণবীরের মধ্যে এই হলুদ, সত্ত্বসম্মানেতে চরম সত্ত্বটি পরিষ্কৃত চ'লে গঠে। শুধু কথ চিহ্নের মধ্যে নয়, শুধু এক বহুর পরস্পরের সংযোগে নয়, চিহ্ন, উৎপাদন ও ক্রমবিকাশের লীলায়, পৃথকতমক ও ভবিষ্যৎকে বস্তুমানের মধ্যে সফারণ কথবার বাবাকার সত্ত্বই আমরা দেখতে পাই তাতে শুধু এই পুরানো কথাটি বৃদ্ধি না যে সত্ত্বগুলি পরস্পরসংলগ্ন, তাতে তার চেয়ে আরও একটা বড় কথা বৃদ্ধি পেতে চলেছে এই যে, সত্ত্বগুলি পরস্পরের মধ্যে হলুদ সত্ত্বসম্মানেতে সম্মিলিত। যেটা বৃদ্ধি চোলে অদৃষ্টব জৈবজীবেনে যেটা মূর চ'লে দেখা দিচ্ছে। এট কারণ চিহ্নের জালে বা জড়জগতের শক্তির স্রোতস্রাভাতে জৈবপর্য্যায়ের বিশেষত্বটুকু ধরা পড়ে না। এট কারণ জড়জগতের নিচের জড়জগতের সংজ্ঞায় জড়জগতের দাবদায় আবাকোর ব্যাপার বা তথা মরা পড়ে না। জীববাক্য একটি মূলত্ব রাজ্য। জড়জগতের থেকে জীবজগৎ কেন্দ্র করে উন্নয়ন পে রহত এখনও নিম্নীত হয় নি, এবং চ'লে কি না তাও সম্ভব। কেউ মনে করেন যে বস্তুপ্রবাহী প্রাপণবীর



মধ্যে চতুর্ভাঙ্গির বিরোধের চরিত্রতা অগ্রসারে বিভিন্ন রকমের জীবনপন্থারের উৎপন্ন হয়েছিল, কেউ বা বলত মনে করেন যে জড়পন্থির একটা নতুন পন্থারের আরাঙ্কেই প্রাণপন্থারের আরাঙ্ক। কিন্তু একজন অতি বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, তত্ত্ব যে জড়ের প্রকার থেকে জীবপন্থারের প্রকার হয়ে পড়ে না তা নয়, কিন্তু জীবপন্থারের মধ্যে যে সমস্ত জড়ের প্রকার প্রকার তেজ রহিত তার কোনও প্রকার থেকে কোনও প্রকার হয়ে পড়ে না। কখনো কোনও পন্থারের দ্বারাও কোন পন্থারের প্রকার বা স্বভাব নির্ণয় করা যায় না। "There is no possibility of deducing or predicting true nature of the new from that of the old. No amount of reflection on the inorganic world leads to the idea of the organic. As no emergent can be predicted from, explained by, or accounted for by what goes before it in the course of evolution, each emergent has simply to be accepted as a fact and accorded its position in the scheme. A mind cannot be explained by life neither can life be explained by mind."

এমনি ক'রে নতুন স্বয়ং নতুন প্রকার নতুন নিয়ম নতুন ব্যবহার নিয়ে জড়পন্থারের বৃদ্ধির মধ্যে থেকে জড়পন্থারের মধ্যে লক্ষ্যমানে যে প্রাণপন্থার উৎপন্ন হোল সেটা লক্ষ্যমানে একটা নতুন স্রাজ। জড়ের নিয়মে এর ব্যাখ্যা করা চলে না। জড়কে আমরা যে চোখে দেখি সে চোখে প্রাণকে দেখতে দেলেই দেখি যে সে চোখে এক দেখা যায় না। জড়ের ভাষা প্রাণের ভাষা নয়। জড়পন্থারের নতিচক্রের স্বাভাবিকতারের যে নিয়ম সে নিয়ম প্রাণপন্থারের বাটে না। Thomson এই কথাটি তাঁর রকমে বোঝাতে দিয়ে গিয়েছেন, "Making no pronouncement whatsoever in regard to the essence of the difference between organisms and things in general, we hold to what we believe to be a fact, that mechanical formulae do not begin to answer the distinctively biological questions.

Bio-chemistry and Bio-physics added together do not biological answer. We need new concepts, such as that of the organism as an historic being, a genuine agent, a concrete individuality, which has traded with time and has enregistered within itself past experiences and experiments and which has its conative bow ever bent towards the future. We need new concepts, because there are new facts to describe which we cannot analyse away into simple processes." Thomson এই যে বলেছেন যে জীবনপন্থারের ব্যাখ্যা ও প্রকার জড়পন্থারের ব্যাখ্যা ও প্রকার থেকে এতই বিভিন্ন যে জীবকে বুঝতে গেলে তৈরিক সংজ্ঞা ছাড়তে চলে না। জড়ের সংজ্ঞা দিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যকে আমরা বুঝতে পারি না। আমি এইখানে তত্ত্ব এটুকু বোঝ দিতে চাই যে জড়পন্থারের সমস্ত নতিচক্র যদি একপাকি বলে কল্পনা করি তা হ'লে জড়পন্থার যে বিভিন্ন প্রশ্ন তাকে কিছুতেই আমরা পাই না। সমস্ত নতিচক্র যদি নতিচক্রের একপাকি বসি তাহে চিত্তের ভাঙনা থেকে আমাদের চিত্ত আশান্তিপ্রাপ্তি পায় বটে, কিন্তু জড়পন্থার বিভিন্ন নীতির ব্যাখ্যা তাতে চলে না। জড়ের রসো একটা স্বতন্ত্র রসো, যে রসো নানাপাকি তার নির্দিষ্ট স্বাভাবিকতারের নীতির বোঝা কঠুচে; জড়কে নিতে গেলে তাকে তার এই বিভিন্ন নতিচক্রের মধ্যেই নিতে হবে। জড়কে একপাকি বলে সন্ধান করা চলে না কারণ সে হচ্ছে নানা নতিচক্রের পরস্পর লক্ষ্য নীতিরাজ্য।

কেন কেন মনে করেন যে জীবপন্থারের যে নতিচক্র বোঝা দেখি দাবারন জড়পন্থার মতন সেও একটা ঋণিত জড়পন্থার (Force)। জড়পন্থার যেমন অবস্থাজেদে বৈজ্ঞানিক, চৌম্বক, মাধ্যাকর্ষণিক প্রভৃতি নানাবিধের বোঝা যায়, তেমনি জীবপন্থারের মধ্যেও যে নতিচক্র ব্যাখ্যা বোঝা যায় সেও সেই রকমেরই একটি জড়পন্থার। যেমন বৈজ্ঞানিক এবং মাধ্যাকর্ষণিক এই উভয় নতিচক্র জড়পন্থারেরই সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের জড়পন্থার, তেমনি জৈব ব্যবহার মধ্যে



[illegible]

শিরে একপ্রকার একটু স্বভাব জীবনজিক্ত মান্বেলট য়ে  
 জীবনপরিচয়ের বসন্ত দ্বারা প'ড়ে গেলে তা জনে ক'রা  
 না। জীবনপরিচয়ের য়ে লীলাভূত দেখতে  
 পাই তাকে এক বিষ্ণু দ্বিধে দেখতে গেলে শক্তি বলা  
 যায়, অথবা বিষ্ণু দ্বিধে দেখতে গেলে বুদ্ধি বলা যায়,  
 অথবা বিষ্ণু দ্বিধে দেখতে গেলে শক্তি ও বুদ্ধিই মিলনে  
 উজ্জ্বল ব'লে বলা চলে। একটু পরীক্ষার মধ্যে য়ে অলপখ  
 লপটপরিচয় লীলাভূত পরমজ্ঞানের সামন্তত্রে প্রোভিত ম'ত  
 ব'য়ে উলগে, কোথাও নিরখা জানি না অথচ নিঃস্বের  
 থাকনে, য়ের ষ্টিক কেনে জনে প্রত্যেকটি পরীক্ষার তার  
 কাছ ক'বে থাকে। পৃথক (kidney) পরীক্ষার বসন্ত থেকে  
 যেটুকু যেটুকু মলভাগ পরীক্ষার অলপখা চ'বে ষ্টিক ষ্টিক  
 দেখেটুকুকে কি কোথানে বসন্ত থেকে বেচে নিয়ে ম'ত  
 লস্কৃত করে পরীক্ষার বসন্তে শোষন ক'বে তা ভাবলে  
 বিস্মিত চ'তে চ'বে। ত'ম্ব একটু ম'ত অলৌকিক জীবনজিক্তকে  
 মান্বেল তার দ্বারা বসন্তাবিভে ভেবে ব্যাপারকে উপলব্ধ  
 করা যায় না। জৈবব্যাপারকে ব্যাখ্যা ক'রে চ'লে  
 তাই বিভিন্ন আন্তঃলস্কৃতক ব্যাখ্যা ক'রে চ'বে, ত'ম্ব  
 জীবনজিক্ত অস্তিত্ব একটু স্বভাব জীবনজিক্ত মান্বেল তা  
 চলে না। একজন বিখ্যাত জীববসন্ত এক ম'ত  
 প্রতিবাদ ক'রে দিবে ব'লেছেন—“In order to guide  
 effectually the excessively complex physical  
 and chemical phenomena occurring in living  
 material, and at many different parts of a  
 complex organism, the vital principle would  
 apparently require to possess a superhuman  
 knowledge of these processes. Yet the vital  
 principle is assumed to act unconsciously. The  
 nature of this vitalistic assumption  
 thus totally unintelligible.” জামাইবে বেশে প্রাণ  
 বসন্তে য়ে অলগেনো চ'বে, তা মোটামুটি ভিন ল'কা।  
 চবক ল'গকে জীবজিক্ত ব'লেই ব্যাখ্যা ক'রেছেন।  
 বোদ্য ল'গকে জীবজিক্ত একটু স্বভাব বিকার তা পরিণাম  
 ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। সাখা ল'গকে ম'তম'ত থেকে



দৃষ্টত ব'লে ম'রে নিয়ে বুদ্ধিবাণীয়েবই অধিকার  
বাণীয়া ব'লে মনে করেছেন। এদের মস্তকোষট  
পাশ দখলে আলোচনা বসমান কালের দুরোপীয়েব  
আলোচনার ভুলনার মতি মর একা অদৃষ্ট। ফলে দেখা  
দায় যে ঠেব বাণীয়েব বসন্ত কিছুতেই বাণীয়া  
করা যায় না। এ বসন্ত যখন বাণীয়া করা যায় না তখন  
শু শু একটি জীবন্তিত্ব যাতে একে চাপিয়ে দেওয়া চলে  
না। সেইজন্যই আবার বিবেচনাও শু শু একটি জীবন্তিত্ব  
খোঁজার না ক'রে জীবলোক ব'লে একটি স্বতন্ত্র লোক  
বসন্ত শক্ত থাকার করা উচিত। এ রকমের নিয়মপদ্ধতি  
বাণীর সমস্তই এই বাণীয়েই বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র নিয়ম।  
কতলোক মানাবিধ পাকিব স্বাভাবিকভাবে আপনাকে  
চাপিত ক'রে চলেছে। এই সমস্ত পাকিবলি মতো  
পরাঙ্গনের সাদৃশ্য থাকলেও এক জড়পাকিব বিভিন্ন  
আত্মপ্রকাশে থাকার যায় না। অগত জড়পাকিব এই  
বিচিত্রতা না বুঝলে জড়পাকিবকে বোঝা যেন না।  
বিভিন্ন জড়পাকিব পরস্পর স্বাভাবিকভাবে, পরস্পরের  
বিচিত্র সমাবেশ পরস্পরের বিভিন্ন রূপ, জড়পাকিবকে বুঝতে  
যেলে এ সমস্তই বোঝা চাই এবং জড়বিজ্ঞানের সাধকগণ  
মতোবার জড়পাকিব বহুবিধবিচিত্র প্রকাশকে বিভিন্নরূপে  
উপলব্ধি করতে ব্যাপৃত হয়েছেন। জীবলোকও তেমনি  
একটি পাকিব বা একটি মতা নয়, একটি নূতন জ'রের  
জীবনবিষয়, জীববাক্তি, জীববাব্যব, জীবপদ্ধতি, পরস্পরের  
সমাবেশে এবং জড়লোকের পাকিবের সমাবেশে রচিত  
একটি নূতন লোক। একে পাকিব বলা চলে না কারণ  
তা; স্বেচ্ছাচক্ৰ নয় অগত জড়পাকিবের নিয়মক; এর  
কার্যকরতা দেখে যখন একে পাকিব বলতে যাঁট,  
তখন বুদ্ধির সাধন। দেখে একে বুদ্ধিমর বলতে উচ্চ  
হয়। শু শু যে আবারেবোলে সামান্যদর্শন প্রাণকর্ষাকে বুদ্ধিকর্ষা  
বলেছেন তা নয়, যুরোপেরও অনেক মনীষীরা প্রাণবাণীয়েক  
একটা objective mind এর ব্যাপার ব'লে বর্ণনা করেছেন।  
কিন্তু একে শু শু বুদ্ধিমর বলা চলে না, কারণ বুদ্ধি অহংসাবে  
এর প্রসূতি হয়েছে, সেই ভিনাবে একে উচ্চমির বলতে উচ্চ  
হয় এবং অনেক দুরোপীয়েবা একে blind will ব'লে

বাখা করেছেন, অনেক বা একে উগ্রবের উচ্চাব গৌণ  
বিকল্প ব'লে মনে করেছেন। এর বুদ্ধিম সৃষ্টিব দিক্  
থেকে দেখলে একে স্বমনী পাকিব ব'লে মনে হয় এবং  
সেই ভিনাবে একে Idealism স্বক্ৰমাত্মক স্বক্ৰমপাকিব ব'লে  
(creative mind) ব'লে বর্ণনা করেছেন। মানাবিক থেকে  
এই জীবনলীলাকে মানাক্রমে মতা ব'লে মনে হয়, কিন্তু  
এর কোনও একটিকেই জীবনলীলার পর্যায় মতা কণ  
ব'লে নির্দেশ করা যায় না, অগত এর প্রত্যেকটিই  
জীবনলীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রত্যেকটি জীব-  
কোষের স্বপত্তবিক্রমে ও পরস্পরের পরিবর্তনে পরস্পরের  
আত্মবিক্রমে প্রচলন বন্ধন লজ্জাবলের সৃষ্টিক্রম সামগ্রিক,  
আপনা থেকে আপনাকে নয় নয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, নিজের  
লক্ষণ ও বিকল্প সৃষ্টিতে যে বিভিন্ন সম্ভবপরস্বা  
ও সম্ভাব্যপরস্বার পরস্পর সমাবেশ দেখতে পাওঁ তেই জীব-  
পর্যায়ের মধ্যে একটি নূতন রক্তা একটি নূতন লোকের  
পরিচয় পাই। এই লোকটি একমিকে যেমন নিজের বিভিন্নতাই  
মতো নিজের লীলাকোণে প্রথমমহ'রে রয়েছে, আত্মবিক  
তেমনি জড়পত্তের বিভিন্ন নিয়মপরস্বার দলে আপনাকে  
বোঝে যেথেকে এবং জড়পাকিব আপন জৈব উপলব্ধি  
বাণীর ক'রে আপনায় ক'রে তুলেছে। জড়বাব্যের  
মুখে জীববাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, আদান প্রদান চলছে,  
তথাপি জীববাক্তি তার নিয়ম পত্তলিয়া নিয়ে একেবারে  
স্বতন্ত্র হ'রে রয়েছে। পরস্পরের আদান প্রদান রয়েছে ব'লে  
পরস্পরের সাদৃশ্যও রয়েছে তথাপি তাদের বৈশাদৃশ্য এত  
বেদী যে পরস্পর বৃত্ত থেকেও দূরিতে একেবারে দূরী বিভিন্ন  
লোক রচনা ক'রে বিয়াক করছে।

জীবলোকের সচিৎ দৃষ্টি এই রকমেরই সামান্যবোমো  
মনোলোক বা বুদ্ধিলোকের সৃষ্টি। অগত এই বুদ্ধিলোকের  
নিয়ম, প্রকাণ্ড, সংগত সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। জড়-  
লোকে যেখেনি রূপের খেলা, জীবলোকে যেখেনি  
অভিব্যক্তির খেলা, প্রচলন বন্ধনের মধ্যে আত্মলজ্জাবলের  
লীলা। সে লীলার কোথাও জৈব নেই, যেটুকু বা বৈশাদ  
মাছে যেটুকু কেবল চাকল্যের সামগ্রিক মাত্র। কিন্তু  
বুদ্ধিলোকে প্রবেশ ক'রে সত্যসময় দেখতে পাওঁ জানেন

বস্তুগত ও পরপ্রকাশতা। জান কি, জ্ঞানের উপবি-  
পাক্ষিক কি, এ নিয়ে আমাদের বেশে ও বুঝে বিস্তারিত  
আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনার মধ্যে যে সমস্তটি  
সব চেয়ে কঠিন, সেটি হচ্ছে এই যে, জ্ঞান পদার্থটি মত  
সমস্ত পদার্থের চেয়ে এত বেশি বিভিন্ন যে, কোনও জড়বস্তুর  
সহিত যে এর কি মত। সখ্য থাকতে পারে তা কল্পনা  
করা যায় না। যেহেতু এবং সাধারণ্যে এ উভয়ই  
জ্ঞানবস্তু বা চিন্ত্যবস্তু পরমার্থ সত্যবস্তু সূত্রই নিত।  
রক্ত ও পুরুষ এই পদার্থটিকে সমস্ত জড়পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ  
পৃথক বলে মনে নিয়েছেন। তাঁদের মতে জড়ের  
বিবিধ অবস্থা, এক অবস্থার বাহ্যিক জড়গত, অপর  
অবস্থার অন্তরগত (বৈশিষ্ট্য) বা বুদ্ধি (সাধারণ্য)।  
যেহেতু মতে অবস্থা অনিচ্ছাশীল তাই পদার্থ; ইহার  
একরকম বিকারে বা বিক্ষেপে বাহিরের জড়গত, অন্তরগত  
বিকারে বা বিক্ষেপে অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ প্রকৃতি অবস্থা-  
পদার্থ জড়পদার্থ হলেও এটি এমন হচ্ছে যে এর উপর মূল  
চিন্ত্যপদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে অন্তঃকরণের যে কোনও  
আকারকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। অন্তঃকরণ  
পদার্থটি যখন দর্শনভাষায় কোনও বাহ্যবস্তুর উপর পড়ে,  
তখন অন্তঃকরণটি সত্যাকারে সেই বস্তুর উপর পড়ে  
সেই আকার গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়গত সেই  
বস্তুর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং প্রতিধ্বারা সংস্পর্শ বলে  
অন্তঃকরণেও অন্তঃকরণবাহির চৈতন্য বা জীবের সেই  
বস্তুর প্রমাণতা বা জ্ঞাতাকারে জ্ঞান হয়ে, এবং প্রতিচৈতন্য  
বা প্রমাণচৈতন্য, জ্ঞানবাস্তব বা cognitive operation  
রূপে প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ বিধের সহিত সংস্পর্শ হলে  
সেই বাহ্যবস্তুর যে রূপ বা পরিমাণ, অন্তঃকরণও ঠিক সেইরূপ  
আকার গ্রাহ্য করে এবং চিন্ত্যসম্পর্কে সেই আকারটি যে  
উদ্ভাসিত হয় তাইই নাম সেই বস্তুর জ্ঞান রূপ।  
সাধারণ্যে মতেও ঠিক এইরূপ ভাবেই বুদ্ধি বিধের সংস্পর্শ  
হয়, এবং বিধাকারে আকারিত বুদ্ধি পুরুষের দ্বারা সংস্পর্শ  
হয়ে চিত্তরূপে প্রতিভাত হয়। এ মতে বাহ্যগত  
বিশেষটি প্রকাশিত হয় না কিন্তু বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট  
পদার্থই হয় এবং এটি বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট পদার্থ

রূপের সেটি জানা হলে এই বোধ চলে। সাধারণ্যে  
বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রথম রূপে অগুটি বা নিগুটির থাকে এবং  
পরকালে গুটি হয়। বাচস্পতি বলেন যে, মনের মস্ত  
বিকার এই দুই প্রতিধ্বারা অগুটি জ্ঞান গুটিরূপে প্রতিভাত  
হয়; কিন্তু ভিক্টর মনের এই ব্যাপার অস্বীকার করেন  
এবং বুদ্ধি ইঞ্জিরপ্রণালী দ্বারা বস্তুতে পতিত হয় বলে  
বুদ্ধির আনুপ্রাণনের প্রথম ও দ্বিতীয়রূপে নিগুটি ও  
সবিকার বোধ হয়ে এই রূপ বলেন। বুদ্ধি যে ইঞ্জির-  
প্রণালী দ্বারা বস্তুতে সংক্রান্ত হয় এ বিষয়ে বাচস্পতি ও  
ভিক্টর একমত। আছে কিন্তু বস্তুগতকে মনের যে মস্ত  
(synthesis) বিকার (abstraction) রূপের রূপ বাচস্পতি  
উল্লেখ করেছেন, ভিক্টর তা অস্বীকার করেন। যদি  
বুদ্ধি নিজেই ইঞ্জিরপ্রণালী দ্বারা বস্তুতে সংক্রান্ত হয় বলে  
মানা যায়, তবে মনের বস্তুই ব্যাপার মানবীর কোনও  
আবশ্যকতা আছে বলে মনে করা যায় না। এমন কি  
কখনও ভেবে নিগুটির সবিকার ভেদেরও প্রয়োজন দেখা  
যায় না।

এই দুই মতেই বাহ্যগতের রূপ অবিকৃতভাবে বুদ্ধিতে  
গৃহীত হয় এবং চিত্তের সম্পর্কে, চিত্তের বাহিরে উভয় চিত্ত  
প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি দুই মত মধ্যেই একটা প্রবল  
আগন্তি এই যে, এটি দুই মতেই জ্ঞান ভিন্ধটাকে শুধু  
যেন বস্তুর ছবি তোলা মতন করে দেখান হয়েছে।  
জ্ঞান ভিন্ধটা যদি শুধু ছবি তোলা মতনই একটা পার্থক্য  
ব্যাপার হোত তবে মতোমতো শিশুর বস্তুজ্ঞান ও পরিণত  
বয়স পণ্ডিতের বস্তুজ্ঞান দুই এক হোত। কিন্তু তা ত  
নয়। এই প্রশ্নে পুরো পোড়ার যে আলোচনার অবতারণা  
করা গিয়েছিল সেই কপার দ্বারা যাওয়া যেতে পারে।  
বাহ্যগতের রূপ যে অন্তঃকরণে বর্ণরূপে সূটে ওঠে, সেটি  
অগুটি সূটে ওঠা থেকে জ্ঞানাত্মক আরম্ভ। বাহ্যগতের  
আলোক কল্পন চৈতন্যগতের নাক্ষত্রিক। এতে নাক্ষত্রিক  
বিশেষ কল্পন এবং বিভিন্ন চৈতন্যবিশেষ ও চৈতন্যবিশেষ  
পরিণত হয়। সে পরিণত: জড়বস্তুর আলোককল্পনের  
থেকে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তা বস্তুই বস্তুই হোক তা  
কোনওরূপ জ্ঞানগত নয়। আলোককল্পনের অবস্থা



তৈবৎগাণততি যখন কোনও অব্যক্ত বর্ণবোধ রূপে হুটে ওঠে, তখন সেই কোটাটি বতই অব্যক্ত হোক সেটা একটা বতই রাকোব হুঁই বা প্রকাশ। কিন্তু যেমন মৈবৎগতের প্রথম প্রাক্রিয়া অশুট অক্ষর ক্রমঃ উচ্চতর প্রাদিপবারে সেই প্রাক্রিয়ার বতবা বিচিত্র ৩টিলা নীলাপ্রকাশ দেখা যায়, তেমনি মত্বাকাত পিত্তর অব্যক্ত অশুট বক ম্পল রূপ প্রাদিপ বোধ বিচিত্র জ্ঞানব্যাগারের পরিণত হয়। বাতিরের অলোককম্পনের রূপটি যখন অশুট বর্ণবোধ রূপে পরিণত হয় তখন সে রূপটিকে লাল ও বলা বাহ না, নীল ও বলা বাহ না। এ সবকে বৌদ্ধ, জ্ঞানবৈশেষিক ও মীমাংসার মনেওটা অর বিস্তর ঐকমত্য দেখা যায়। বসুকীতির পাতাক লক্ষণের বাধ্যাপদরে শুধু টিঞ্জিহারা যেটুকুকে পাওয়া যায় সেইটুকুকে বোধাত্তর বলকল ব'লে বর্ণনা করেছেন। বলকল কথাটি সোজা কথাই বলতে গেলে এট বোঝার যে, সেটা একটা বিন্দু বটে, কিন্তু সে বিন্দুটা কি বলা যায় না। কারণ তার কোনও পরিচয় নাই। পরিচয় হ'লে বেলেই পূল পুটের সতিত এক কথা চাই। এক কথা বাধ্যপরিচয় টিঞ্জিহারা হয় না, কারণ পূলপুটের বর্তমানে চোখের লাক্শন উপস্থিত নাই। পূলপুটাপকটঃ চার্মমেকীকুল্ল বিজানন্ অসন্নিত্তিবহন্। পূলপুটত অমানিত্তিবহন্। অসন্নিত্তিবহন্ চার্ম নিরপেক্ষন্... টিঞ্জিহাবজানঃ তু সন্নিত্তিমাত্রায়াবিদ্যাদর্শনা- লেকন্। টিঞ্জিহারা যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু একটা কিছু বটে, কিন্তু কি তা বলবার উপায় নাই। এই কিছু না টিঞ্জিহারা পাওয়া যেন তাকে যে পূলপুটের সঙ্গে পরিচয় ক'লে দেওয়া ও তার যে একটা লাল বা নীল নাম দেওয়া এটা প্রত্যাক দুই নয়, এটা কল্পনার খেলা। এট কল্পনাটা যে কোথা থেকে আসে, কেমন ক'রে কখন তাকে বধ্যাযোগ্যভাবে নিবেশ করে, সে বিষয়ে ধর্ম্মাত্তর একরূপ নিরুত্তর। জ্ঞানবৈশেষিকও নিরিকল্প, সবিকল্প এই বিবিধ জ্ঞান মানা হয়েছে। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, পস্তর প্রত্যাকের সঙ্গে সঙ্গে তার জাতি ও গুণ প্রভৃতিরও প্রত্যাক হয়, কিন্তু সবিকল্প দর্শার নাম সংযুক্ত হয় ব'লে নিরিকল্প দর্শার ঐ বোধটিই নামমঃগোষে শূটতর হয়।

যাযি যখন একটি বস্তুলা দেখি আমার চক্ষু ইঞ্জির এবং স্পর্শজির যে তখন তেবৎগত্রে কমলাটির রূপ ও সেই বিশিষ্ট কাঠিকের সতিত সংযুক্ত থাকে তা নয়, কিন্তু সেই সেই রূপ ও কাঠিক যে রূপ ও কাঠিকজাতির সতিত সমবার লম্বকে সংযুক্ত এবং যে বস্তুটিতে ঐ রূপ ও কাঠিক গুণগত মাত্রায় করিয়া আছে তারাদের সতিতও সংযুক্ত হয়। প্রথম অবস্থার এট ইঞ্জিরঃস্পর্শে একটা খুট আলোচন জানে হয়, এবং তারার ফলে পূলাহুতৃত বাদও তারার হুৎসাযনবের হুৎস হয় এবং তারার ফলে ঐ ল্পটিকে হুৎসর ব'লে বোধ হচ্ছে। কিন্তু এট ননের বাধ্যপ্র থাকি সযেও এই বাধ্যপরিচয় এট কারণে প্রত্যাক বলা যায় যে, যদিও বহুবকে এ দুনে মতকারী বলা যায় তথাপি যেহেতু এ বাধ্যপরিচয় টিঞ্জিহারা থেকে উৎপন্ন এবং যেহেতু ইঞ্জিঃস্পর্শকে অবলম্বন ক'রে এটি খুঁড়ে উঠেছে, সেট মন্ত এ'কে প্রত্যাকই বলা উচিত। “প্রবাদি মনসা বুধ্য কপিবাখি চ চক্ষুবা। উক্ত কারণতঃ তত্র মনসৈবাবগম্যতঃ” (জায়মজ্জা, পৃষ্ঠা ১২)। বাচঃশাতি তাৎপর্থাভিকার জায়মত বাধ্যাপদরে বলেন যে, প্রাথমিক নিরিকল্পদর্শন রূপ, পরিমাপ, জাত্যাদি সমস্তই পাতকা যায় কিন্তু তথাপি তখন নাম সংযুক্ত হয় না বলিয়া “এইটি একটি কমলা” এরকম বোধ হয় না।

এই সবিকল্প অবস্থার সেই সেই রূপাদি ব্যক্তি ও তৎসমবেত জাতি এই উভয়েরই জ্ঞান হ'লেও সেই সেই রূপাদির সতিত জাত্যাদির সতিত সেই সেই বিশিষ্ট লম্বকে জ্ঞান হয় না। আলোচিত পদার্থটির মধ্যে স্যাবাক্ত, বিশেষ সতিত বা কিছু আছে সমস্তই পিত্তাকারে গৃহীত হ'লেও সেই সেই বিশিষ্ট লম্বকে লেঙলিকে জানা যায় না। (জাত্যাদিবহুগপথা ন তু জাত্যাদানাম্ মিনো বিশেষণবিশেষ্যাবগমীতি যাবৎ তাৎপর্থাভিকা পৃষ্ঠা ১২) জায়কম্মণোতঃ ঐবরও বৈশেষিক যতের প্রত্যাক বিচার প্রসঙ্গে এই যতেরই পোষকতার বলেছেন যে, নিরিকল্পদর্শার সমষ্টি (universal) এবং বিশেষ (particular) বা স্বতন্ত্রতরতা এ উভয়ই পরিণকিত হ'লেও তৎকালে মন্ত বস্তর স্বতন্ত্র হয় না ব'লে অগেক্সমূলক ভুলনার যে ভেদ

এক প্রকার প্রকাশ পাও যেইজন্যেই সামান্যবিশেষের জ্ঞান হয় না। সামান্য বিশেষ উত্তরমণি গুণটি যদি পরমিৎ সামান্য অর্থাৎ বিশেষ ইতোবাং বিবিধ না প্রত্যুতি বস্তুস্বাভাবিকবিশেষ পিত্তাভ্যাসবৃত্তিগ্ৰাণি সামান্য বিশেষে বাস্তুগ্ৰহণাদি বিশেষায়মিত্তি বিশেষঃ—প্রায়-কল্পণী পৃষ্ঠা ১৮২)। এই বিষয়ে বাচস্পতি ও ঐশ্বরের মতের প্রধান ভেদ এই যে, ঐশ্বর যে তুলনার কথা তুলে বলেছিলেন যে অজ্ঞবস্তুর কথা অরণ হ'লে তবে জাহার সচিত্র সমতা সামান্য বোধ এবং পৃথকতার ভেদ বুদ্ধি ক'রে, বাচস্পতি তা না তুলে সামান্যবোধের কল্পেই অবিকল্পনায় বিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থে এই কথাটি মাত্র বলেছেন। পরোক্ষবৃত্তি নবোন্মোদিতেরা বলেন যে, নির্বিকল্প দশায় কেবলমাত্র বিশেষের বা গুণামিত্তি জ্ঞান অর্থাৎ, কিন্তু যে অবস্থায় যে বিশেষকে অংশের ক'রে ঐ গুণগুলি রয়েছে তার জ্ঞান হয় না। যদিও এই নির্বিকল্প জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না তথাপি আমাদের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কারণবস্তু এইরূপ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ না মানলে চলে না। বিশিষ্টবিশিষ্টজ্ঞান প্রত্যক্ষ হি বিশেষপ্রত্যক্ষের প্রকারম্ জ্ঞানম্ কারণম্—তত্ত্বচিত্তামণি পৃষ্ঠা ৮১২)। এই জ্ঞানবিশেষজ্ঞানবৃত্তি বৈশিষ্ট্যবাহিনী নিম্নকারক জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়বাহিনীর প্রত্যক্ষ না হ'লেও, এই নির্বিকল্প জ্ঞানকে আমাদের সর্বিকল্প জ্ঞানের কারণ বলে মানতে হয়। কুমারিল ও প্রত্যক্ষের বলেন যে, নির্বিকল্প দশায় সামান্য ও বিশেষ লক্ষিত হ'লেও ঐ অবস্থায় অল্প বস্তু অরণ হয় না বলে ঐ সামান্যবিশেষের বোধ “এটি একটি কমলা দেবু” এই বিশিষ্ট বোধরূপে প্রকাশ পাও না। এসম্বন্ধে দ্বৈতবাহিনী দার্শনিকদের মতের বিস্তৃত উল্লেখ এই ক্ষুদ্র বস্তুতায় করা সম্ভব নয়। তবে এসম্বন্ধে কেবলমাত্র কান্টের উল্লেখ ক'রে বলতে পারি যে, বোডেরা যে নির্বিকল্প দশায় কোনও একটা বস্তুকে কিছু দেখা যায় বলে মেনেছিলেন, কান্ট তাও মানেন না। কান্ট বলেন যে, ইন্দ্রিয়পথে বর্ধিতমত থেকে কিছু একটা আসে কিন্তু সেটা যে কি তা আমরা জানি না। সেই অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়সামগ্রীকে অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রিয়বিকল্প তার উপর

বিকল্পনের সৃষ্টি ক'রে তাকে বিকল্পে বিশেষিত ক'রে তোলে, এবং তৎপরে মনোবিকল্পে সামান্যতমাদি মানা বিকল্পে বিকল্পিত ক'রে “এটি লাল” “এটি এই বস” ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ করে ও সেগুলিকে সঙ্কল্পের বাস্তুকার্যনির্ধি বোধে (judgments) পরিণত করে।

এ বিষয়ে আর বড় মত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ বলা হয়েছে তা'তে এটুকু দেখা যায় যে, আমাদের বোধের মধ্যেও জাহার অংশ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অসুচি বর্ণবোধটি লাল বা নীল বলে পরিচিত হওয়ার পূর্বে তার মধ্যে অনেকখানি পরিমাণে মনোভাঙের কাজ চলছে। বোডেরা এই মনোভাঙের বস্তু বাস্তুকে বিকল্প বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বিকল্প যে কত কালের এবং তাহের পরাম্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহা কেমন ক'রে ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুকে সামগ্রীকে পরিবর্তিত করে, সে সম্বন্ধে তারা কিছুই বলেন নাই। কান্ট এ বিকল্পের নানাবিধ স্তরের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এ বিকল্পত'নে মনোভাঙ ও মূলমত ইত্যাদির সন্ধান দিতে পারেন নাই। মনের মধ্যে সকলেরই যদি এই বিকল্পবৃত্তিগুলি সমানভাবে কাজ করতে থাকে তবে সমাজোক্ত ও হচ্ছে, মূল ও সত্যের জ্ঞানইবহু কালও এ প্রসঙ্গের তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেন নি। এজন্য হ'তে উপলব্ধি অজ্ঞাত ও উল্লিখ সামগ্রীর উপর কি উপরে এই বিকল্পবৃত্তিগুলি প্রত্যয় বিস্তার করতে পারেন সে সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন নি। যদি সমস্ত সম্বন্ধই এই বিকল্পের অসুচি হয় তবে পরিমার্জ ইন্দ্রিয় সামগ্রীর কোনও ভেদ থাকে না, এবং সেগুলি বিকল্পে প্রত্যুতি কোনও উপাধি বা বিশেষণে বিশেষিত না হ'লে বিভিন্ন বিকল্প-প্ৰতিধারা কি উপাধে নানাভাবে বিচিত্রিত হ'তে পারে সে প্রসঙ্গের কোনও সমাধান হয় না। আর একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, কি ভাবটাবৈশিষ্ট্য, কি বোধ, কি মৌলিক, কি কান্ট সকলকেই স্তিমিত্তিক মেনেই নিতে হয়েছে; কিন্তু স্মৃতিটা যে কি বাস্তুকে কেহই সে প্রশ্ন পর্যন্ত করেন নাই। অথচ মনোভাঙের অধিকাংশ গুণ বাস্তুই এই অজ্ঞাত স্তিমিত্তি সচিত্র বস্তু-



মানের আস্ত জানানামার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের উপর নির্ভর করছে। ভ্রান্তবিশেষিক বলেন যে, সামান্য ও বিশেষ এ উভয়ই চকুপ্রতিব্র বাহ্য বস্তুসংগতই দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সেগুলির বোঝের ক্ষমতা বিভিন্ন এমন আবশ্যকতা কেন মানি, সেগুলির যদি বোঝই না হয় তবে সেগুলিকে অবগতন ক'রে প্রতিপত্তিযারা পূর্ণ-দৃষ্ট বস্তুগুলিকে মানদণ্ডে উপস্থাপিত করিয়া ভুলনা প্রতিষ্ঠা কি ক'রে সম্ভব। যেগুলি জানা আছে সেইগুলির মধ্যেই ভুলনা সম্ভব। কিন্তু কতকগুলি জানা কতক-গুলি না জানা, এদের মধ্যে কি ক'রে ভুলনা হ'তে পারে। তা ছাড়া: কি ভ্রান্ততাই কি যুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র এ'র কোনও বিভাগেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান বিভিন্ন থাকিয়াও যেমন ক'রে সংশ্লিষ্ট হয়, কেমন ক'রে পূর্ণাঙ্গিত জ্ঞানদক্ষ্য পরকালের ক্ষান্ত জ্ঞানের প্রকার ও তাৎপর্যকে বিশেষিত ও পরিবর্তিত করতে পারে তার কোনও কথাই বলেন নি। ভ্রান্তবিশেষিক বলেন যে, কতকগুলি জ্ঞানসামগ্রীর সমাবেশ ও সংঘটনে মাঝার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এইরূপে নূতন নূতন সামগ্রীর সমাবেশে মাঝার নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কথা যদি সত্য হয় তবে এই যে একটি জ্ঞান বিশেষ হয় এবং অপর আর একটি উৎপন্ন হয় এদের মধ্যে কি ক'রে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, প্রশ্নই থাকি ক'রে সম্ভব হয়। এর উত্তরে হয়ত এ কথা বলা যায় যে, নূতন জ্ঞান এখন উৎপন্ন তখন পূর্ণজ্ঞানটি সংযোজন-রূপে মাঝার থাকে এবং পুনরায় দৃষ্ট্য থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু জানটি সংযোজের পরিণত হয় এবং সংযোজ থেকে পুনরায় জ্ঞান হয় এ কথাও মর্থ্য কি, কোনও দার্শনিকই এ প্রশ্নের বিচার করেন নি। সংযোজবাহ্য বিহীন অসুস্থ জ্ঞানের সহিত বিবিকল্প মত জ্ঞানসামগ্রীরই বা কিরূপে দৃষ্ট্য বোধ হয় এবং সেই দৃষ্ট্যবোধই বা কার হয় এবং কিরূপেই বা এই দৃষ্ট্যবোধ থেকে স্বপ্ন হয়, এসময় প্রশ্নেরই মাত্র পর্যন্ত কোনও তথ্য নির্ধারণ করা হয় নাই। এই সময়ে আমাদের দেশে বা কিছু আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে বোধগম্যের আলোচনাটিই অপেক্ষাকৃত পটীর। বোধগম্যের মতে জ্ঞানের প্রকারটি বুদ্ধিরই একটি প্রকারভেদ

মাত্র। চিন্তাভাবের দ্বারা এই বুদ্ধির প্রকার ভেদটি জানা-কারে প্রতিষ্ঠাত হয় এবং বুদ্ধির মাত্র আর একটি প্রকার উপস্থাপিত হ'লে বুদ্ধির পূর্ণ প্রকারটি তা'র নিচেই মতো তিরোহিত হয়। এই তিরোহিত প্রকারটির নাম সংযোজ। বুদ্ধির মধ্যে যে এই সংযোজের সক্ষম হয় এই দৃষ্ট্য বিধে দেখতে গেলে বুদ্ধিকে চিত্ত বলে। অন্যটি জ্ঞানপরম্পরা-সম্বন্ধিত সংযোজ তুলি এই ভাবে চিন্তের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। বুদ্ধির কোনও তিরোহিত প্রকার বা সংযোজিত এখন উদ্ভূত হ'লে বুদ্ধিতে প্রকট হ'লে উঠে তখনই তাকে স্মৃতি বলে। এই ভাবে জ্ঞান থেকে সংযোজ এবং সংযোজ থেকে স্মৃতি এবং স্মৃতি থেকে পুনরায় সংযোজ এইরূপ পরম্পরা সলসলই চলেছে। এবং এই ভিত্তি বুদ্ধিতে বা কিছু প্রকাশ পেতে পারে তা সংযোজ দ্বারা অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অপর দিকে বুদ্ধিরূপে বা প্রকাশ পায় তা নূতন সংযোজকে উৎপন্ন ক'রে পূর্ণ সংযোজকে পরিবর্তিত করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার একটা প্রধান দোষ এই যে, এই মতটিতে বুদ্ধিকে একেবারে জড়বস্তুর দ্বারা বাধ্যতার কথা হয়েছে এবং সেইজন্য এই মতের ব্যাখ্যাটি অনেক পরিমাণে বর্তমান কালের মানসিক ব্যাখ্যারের যে সমস্ত physiological এবং mechanical explanation ঘোষণাতে পাওয়া যায় এগুলিও অনেকটা সেই রকমের। এ মতে সমস্ত মানসিক ব্যাখ্যাগুটিই একটা জড়বাস্য, কেবলমাত্র বুদ্ধির কোনও একটি বিশেষরূপ এখন পূর্ণবোধ চিন্তাভাবসূক্ত হয় তখন সেই ভগটি চেতন হ'লে গড়ে। কিন্তু মানুষের চিত্ত যদি অন্যনি জ্ঞানপরম্পরা-সম্বন্ধিত সংযোজ পূর্ণ হয়েই থাকে তবে শিত ও পরিণতবোধের মধ্যে পার্থক্য কেন দেখা যায়? Physiological ব্যাখ্যার মধ্যে না দিয়েও আরম্ভাল ক্রমেই শিথিল sub-conscious mind এর নাম layer এ পূর্ণাঙ্গিত বিব্র অভিসার স্রীতি অস্রীতি প্রকৃতি সংযোজরূপে সন্নিবিষ্ট হয় এ কথা কোঁর পলার বলতে আরম্ভ করতেছেন, কিন্তু mind মিনিমি কি একবার তার দিবেও তাঁরা মানি না, অথচ তাঁরা mind কে জড় বলেও স্বীকার করেন না। Mind যদি জড়ই না হয় তবে তার layer বা পর্দা থাকি কিরূপে সম্ভব হয় এবং

## ঐহিকজ্ঞান বা ধর্মতত্ত্ব

পর্দায় পর্দায় পূর্ণাহুত্ব বিষয় দর্শিতাই বা কিস্তিই নয়। যদি যোগের মত অবলম্বন করে বুঝিবে একান্তই স্পষ্ট বলে থাকার কঠিন হবে হস্ত বুঝির পর্দায় পর্দায় সংসার দর্শিত হয় একথা বেশ চলতে পারে; কিন্তু তা হলে বিভিন্ন সংসারভঙ্গি ও বুঝির চিত্তাভাবনায় জ্ঞানভঙ্গি ইচ্ছার প্রত্যেক পদার্থের দৈনিক বিচ্ছেদে বিভক্ত। এই ভাবে দৈনিক বিচ্ছেদ মানে গোলে কোনও জ্ঞানের মধ্যেই কোনও সংসারকে পাওয়ার উপায় নেই এবং সেই জন্য কোনও জ্ঞানের মধ্যেই পূর্ণাহুত্ব বিষয়ের প্রভাব থাকে। উচিত নয়; অথচ আমরা প্রতি পদেই দেখতে পাই যে, আমাদের ব্যয়বিভিন্ন সঙ্গে সঙ্গে এবং অহুত্ব বিষয়ের বৈচিত্র্য অস্থায়ী আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞানের যে শুধু একটি প্রকারের বৈশিষ্ট্য। সচ্যে তা নয়, প্রত্যেকটি জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার নানান্যুপাত্য। (যাকে ইংরেজী পরিভাষায় meaning বলা যায়) দীর্ঘকালের প্রভাব তার চারিদিকে প্রত্যেকটি ভাবে গড়িত রয়েছে; এই তাৎপর্য ছাড়া শুধু জ্ঞান মুক্ত; এই তাৎপর্যের বিশেষ এই যে, এতে আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞান সমস্ত পূর্ণাহুত্ব বোধ পর্যায়ের মধ্যে ঠিক কি ভাবে প্রাপ্ত হচ্ছে সেইটি ইচ্ছিত করে ঘটনা করে। একজন উদাহরণ একটা গাছকে, কি একজন চিত্রী একটি চিত্রকে যে ভাবে দেখে সে দেখা একজন সাধারণ লোকের দেখা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। উদ্বিগ্ন বা চিত্রীর যে উদ্বিগ্ন বা চিত্র ঘেঁষে নানাকথা মনে পড়ে সেই জন্য যে তার দেখার সঙ্গে অন্তর দেখার তফাত তা নয়, কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা স্পষ্ট ভাবে অর্থ না হ'লেও তাদের যে কোনও দেখাটির তার সমস্ত জীবনব্যাপী দেখা ও জানার ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে গড়িত এবং সেই জড়নের জন্য এমন একটি বিশিষ্টভাবে বিশেষিত ও এমন কঠকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র, ইচ্ছিত বা তাৎপর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত যে, সেই দেখাটির মধ্যে সমস্ত জীবনের দেখা জানার ইতিহাসের একটি বিশেষ রকমের ছোপ স্পর্শ থাকে। এই যে প্রত্যেক দেখার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের দেখা-জানার ইতিহাসের একটা মনি-বিজ্ঞান, একটা তাৎপর্য-

ইচ্ছিত সমস্তকে থাকে এটাকে অর্থ বলা চলে না, সংসার বলা চলে না, অর্থ এটিটির দ্বারা সেই দেখাটির দ্বারা বিশিষ্টতা-টুকু প্রকাশ পায়। মনোরাজ্যের ব্যাপার এত ভঙ্গি এত বস্তুত যে, তার একটা মোটামুটি বকমের বিশ্লেষণ করতে গেলেও একটা বিরাট প্রাণ লেখবার আবশ্যক, এতটুকু খুব প্রবন্ধ কখনও সে কাগজ করা চলে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, মনোরাজ্যের ব্যাপারের চেয়েও মনোরাজ্যের ব্যাপার আরও ভঙ্গি, আরও অনেক বিচিত্র, আরও গূঢ় ও জটিল। Psychology ও Epistemology এই দুই বিদ্যায় মনোরাজ্যের ব্যাপারগুলি বুঝার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত Mind জিনিসটা যে কি তা আমরা একরকম কিছুই জানি না এবং মনোরাজ্যের ব্যাপারগুলির গুরুত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়েছে তার অনেক বেশী গুণ জিনিস আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। একটুখানি অসুবিধাগ্রস্তমাত্রী থেকে একটু অসুবিধা বর্ণনায় স্পষ্টবোধ বা স্পষ্টবোধ; এবং সেই থেকেও মনোরাজ্যের ব্যাপারের আরও আরও তাৎপর্য বর্ণনায় এর নিগূঢ় প্রস্তরবিচিত্র লীলাসম ব্যাপার। মানসিক ব্যাপারগুলি পর্যায় ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেই আমরা অহুত্ব করি এবং এই স্বাভাব্য ও পৃথক্ এত বড় পরিমাণে পরচলন-বীজিত ও মনোবিজ্ঞান দ্বারা Psychology প্রস্তুত যে, কোনও মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে গেলে পারার প্রক্রিয়া দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রত্যেক প্রত্যেক মানস ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত আমাদের মস্তিষ্কের মস্তিষ্কের মধ্যে তদনুযায়ী নান্দীপদার্থের মধ্যে নানান্দ্রিয় আশ্রয় বিশেষের কাজ চলছে, কিন্তু তাই বলে আমাদের কোনও মানসিক চিন্তা বা অস্তিত্ব তবু চিন্তা ব্যাখ্যা করতে পারে যদি কেউ বলে যে ঐ চিন্তাটির মূল আর কিছুই নয়, এ কেবলমাত্র মস্তিষ্কের কোনও অংশের মস্তিষ্ক পদার্থের মস্তিষ্ক আউপের ইক্স-জান পদার্থ বা আশ্রয় বিশেষের মস্তিষ্ক, তবে সে ব্যাখ্যাটি কি নিতান্তই বাতুলের মত হবে না। প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মস্তিষ্ক পদার্থের কোনও না কোনও পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু সে পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপেই জৈব পরিবর্তন; সে পরিবর্তনে শুধু এইটুকুমাত্র বুঝা যায় যে জৈব

[illegible]

হয়, কিন্তু মনোব্যাপারের অনেকগুলিই এমন যে সেগুলিকে কিছুতেই পশুবাধ্যতার সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা যায় না। এবং Russell প্রকৃতিগত অনেক চেষ্টা করিয়াও যে সমস্ত সাপেক্ষ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, সেটুকু মনোব্যাপারের অতি অল্প স্থানই অধিকার করে। এই বাধ্যতাবিশিষ্ট (Behaviourist) মতে যেটুকু সত্যতা আছে তাতে শুধু এটুকু প্রমাণ হবে যে যেমন রক্তব্যাপারের বানিকতা অংশ বৈষবাশ্যের মতো অল্পপ্রতিষ্ঠা হয়ে রয়েছে তেমনই বৈষবাশ্যের বানিকতা অংশ মনোব্যাপারের মতো অল্পপ্রতিষ্ঠা হয়ে রয়েছে। উচ্চ উচ্চ বাণের প্রাণিবর্গের মতো যেমন দেখা যায় যে তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে অল্পসুস্থভাবে জীবনযাত্রা অল্পসুস্থ করে। উৎসাহের দেখা এবং প্রতিফল কাগি থেকে নিত্যত, মাল্যের মতো তা অনেক পরিমাণে দেখা যায়, কারণ মাল্যের একটি প্রাণিবর্গ; কিন্তু মাল্যের মতো বৈষবাধ্যের বা জীবনযাত্রাকারীর সচিত্র সম্পূর্ণ অঙ্গভিগ্ন অনেক এমন ব্যাপার দেখা যায় থাকে কিছুতেই বৈষ বাপারের অন্তর্গত বলে মনে করা যেতে পারে না। এটিই হচ্ছে স্বাধীনভাবে মনোব্যাপারের অধিকার। Russell বলেছেন, "Man has developed out of the animals, and there gap between him and the amoeba. Something closely analogous to knowledge and desire as regards its effects on behaviour exists among animals even where what we call 'consciousness' hard to believe in; something equally analogous exists ourselves in cases where no trace of 'consciousness' can be found. It is therefore natural to suppose that, whatever may be the correct definitions of consciousness, consciousness is not the essence of life or mind. কিন্তু এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে Russell তার Analysis of Mind-এ যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে মাল্যের জীবনের সেই দিকটা নিয়ে যে দিকটারে সে বৈষবাধ্য প্রয়োজনের সচিত্র



স্বভাব বা দৈবিকতার মাধ্যম জড়প্রকৃতির সৃষ্টি স্বভাব। কিন্তু আদ্যের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে এবং গোটা মনোব্যাপারের আদ্যপট আধুনিক আদ্যপ্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ নতুনরাজ্যের নতুন নতুন নিয়মপদ্ধতি দেখতে পাই বৈজ্ঞানিক কিছুতেই মৈবব্যাপারের কোঠার দেলা যায় না। কেমন ক'রে একটা অশুট বর্ণবোধ ক্রমশঃ দৃষ্টিত হ'য়ে শূন্য লাল বা নীল বোধে পরিণত হয়, কেমন ক'রে বোধের মধ্যে বোধ দৃষ্টিত থেকে প্রতিরূপে প্রকাশ পায় এবং সংস্কাররূপে থেকে জ্ঞানের প্রকারকে তাৎপর্যপূর্ণমণ্ডিত করে, কেমন ক'রে বৈশেষ বা concrete থেকে সামান্য বা universal-এর নানা সম্পর্ক বিচার ক'রে সেই প্রণালিতে বিবেচন নানা তথ্যকে জ্ঞানের দ্বারের মধ্যে দ'রে রাখে, কেমন ক'রে নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারা, ইচ্ছাধারা, স্বপ্ন রূপ, স্মৃতি অস্মৃতি, কৃপণা-কৃপণের বিভিন্ন বিভ্রমধারার মধ্যে দিগ্ধ মনোজীবনের ঐক্যটি নিরূপিত হয়, তা কোনও ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না বা তার কারণ নির্দেশও করা সম্ভবপর নয়।

তাহা হইলে মূল কথা ঠিকিভাবে এট যে জড়বাক্য, জীববাক্য ও মনোবাক্য এই তিনটি বাক্য পরস্পরস্বভাব হ'য়ে রয়েছে—জড়বাক্য জীববাক্যে অমুগ্রপতি এবং জীববাক্য মনোবাক্যের মধ্যে অমুগ্রপতি, অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাক্যের স্বভাব ব্যাপারেই তার নিজের বিশিষ্ট নিয়মে চালিত হয় এবং কোনও বাক্যের নিয়মের দ্বারা কোনও বাক্যের ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রত্যেকটি বাক্যের নানা ব্যাপারের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সে ঐক্যটির অর্থ সামান্যতঃ অর্থঃ তাহার কোনও ব্যাপারেই অপর ব্যাপারগুলিকে অতিবর্তন বা অতিক্রম করে না এবং পরস্পর পরস্পরের সহযোগে চলে এবং পরস্পরের সৃষ্টি পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যে ইতিহাস বচনা করে সেই ইতিহাসের আশ্রয়তা প্রত্যেকটি ব্যাপারের পদ্ধতি ও প্রণালী নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ ক'রে প্রত্যেকটির নিজ নিজ স্বকর্মের স্বাভাব্য থেকেও সমগ্রের নিজস্বের দ্বারা প্রত্যেকটি সমগ্রের অগ্রহূণ বাহ্যারে নিরন্তরিত থাকে। কিন্তু তিনটি বাক্যের মধ্যে পরস্পরের যে ঐক্য সে ঐক্য এ জাতীয় ঐক্য নয়। যে ঐক্যের অর্থ ভাববোধগিতা, অর্থঃ একটি যে অপরটির কাছে লাগতে পারে, এ সেই জাতীয় ঐক্য। এ

ঐক্যের নিয়ম জড়বোধ জীববোধগোণী কারণে ব্যবহৃত হ'য়ে জীবের স্বভাবিক হয়, আবার জৈব ব্যাপারগুলি মনোব্যাপারের সাহায্যে লেগে মনোব্যাপারের কাছে লাগে। এই ঐক্যের তিনটি বাক্যের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চ'লে প্রত্যেকটি বাক্যকে গোণমুখ্যভাবে অপর দুইটি বাক্যের স্বভাবতঃ নিযুক্ত করে। বিপর্যয় আদান এই তিনটি বাক্যের আদান প্রদানের পাণীর নতুন নতুন সৃষ্টিপরম্পরা দেখতে পাই। এক দিকে দেখতে পাই যে জৈব দৃষ্টি চক্রের সৃষ্টি জড়দৃষ্টি চক্রের পরস্পরের মত্তযোগিতার ও সম্বন্ধে ও এই মত্তযোগিতা ও সম্বন্ধের বিবিসংকীর্ণতা নানা জীব পরম্পরা দ'ড়ে উঠেছে। Struggle for existence or law of natural selection এ দুইটিই এই জীবজড় সম্বন্ধের সামগ্রিকবাক্য, আবার law of accidental variation, law of mutation প্রকৃতি নানাবিধ বৈশেষ্য ম'ধ্য জড়ের যে জীবপ্রযোগিতা আছে ও জৈবদৃষ্টিচক্রের যে জড়-জনন হইতে আদান করিবার ক্ষমতা আছে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে বিপর্যয় ব্যাখ্যা—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। আবার অপরদিকে জৈববাক্যের ঠিক কোন স্থান থেকে মনো-বাক্যের বিচ্ছিন্ন আরম্ভ হয়েছে তা বলা কঠিন। মগ্র্য পর্বত পৌষবার পূর্বে অনেকদূর পর্যন্ত উচ্চতর প্রাণিকভাবে দেখতে পাই যে মনোবাক্যের আদ্যপ্রকাশ অনেকখানি পরিমাণে জৈববাক্যের সম্বন্ধে সৃষ্টি হ'য়ে জৈব ব্যাপারের দ্বারা কবলিত হয়ে instinctive habit বা behaviour রূপে প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যে এসে দেখি যে, জৈববাক্যের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে মনোবাক্যের দৃষ্টিও শূন্যতর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তথাপি একই অগ্রহাবন কবলেই দেখা যায় যে, মনোব্যাপারের স্বতন্ত্রানিক আদান নিযুক্ত ব্যাপারেই অগ্রহূণ ব'লে মনে করি ঠিক স্বতন্ত্রানিক পাঁচি মনোবাক্যের ব্যাপার তা নয়। জৈবদৃষ্টি স্বনেকখানি পরিমাণে মনোব্যাপারের মধ্যে অগ্রহাবন হ'য়ে মনোবাক্যরূপে প্রকাশ পায়, আবার মনোবাক্যের স্বনেকখানি জৈবদৃষ্টি দ্বারা অতিক্রান্ত হ'য়ে আদ্যপ্রকাশ কর্তৃক পাবে না। শুধু তার নহ, স্বপ্ন রূপে প্রাণী বিবাহ প্রকৃতি যে ভুলকে আদান খাটি মনোবাক্য হ'লে মনে করি সেগুলিও অগ্রহাবন অন্তর্গত।



পরিমাণে জৈবকৃষ্ণ বা জৈব আকর্ষণ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব মাত্র। আর এত জৈবপ্রয়োজন সিদ্ধির দাবী জৈব মর্ম অধির দাবী মনোবাণীরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি মনোবাণীরের মান্য প্রকার কৃষ্টিরও নিরামক হ'য়ে ওঠে। একে প্রকারান্তরে এক রকমের voluntarism বল যায়। বৌদ্ধ প্রযোগমতের বাসনা-বাসে শব্দরাচ্যারণের মর্ম অধির দাবী স্বীকারের মতো প্রবোধের মর্মক্রিয়াকাবিরহনের মতো এই শ্রেণীর voluntarism এর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান কালের pragmatism বা behaviourism এর মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত মতবাদের অনেকগুলির মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে, কিন্তু এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এইখানে যে এঁরা একপেশে চাবি কেবল তাদের দিক থেকেই সমস্ত জিনিষটা দেখতে চেষ্টা করেন। সত্য মননশীল তাকেই বলা যাবে যেটতে সব দিক থেকে সত্য নির্ধারণ করবার চেষ্টা থাকবে। কোনও একদিকে প্রবল ক'রে ঘেঁষে বাঁরা অসমীকগুলিকে ঘাট ক'রে দিত চান বা উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের দৃষ্টি একঘেনী এবং তাঁদের মর্মনও একঘেনী। কিন্তু শুধু যে জৈব ও মনো-বাণীরের মধ্যে মান্য প্রতিমান উপযোগিতা ও বিরোধিতা চলছে তা নয়, প্রতি একপেশে প্রতি মানুষ যে মনোবাণীর চলছে, তাহার মধ্য দিয়ে দুখ চক্কু অসম্প্রভাষের উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে অনবরত তাদের পরস্পরের যে বিনিময় চলছে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মনোবাহক প্রক্টর তার পান বড় কম নয়। বসন্ত জৈববাহকের কবল থেকে মানুষের মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র মনোবাহক পড়ে উঠতে পেরেছে তার সঙ্গপ্রধান কারণট হচ্ছে মনে মনে আদান প্রদান। জৈব লক্ষ্যে যেমন দেখা যায় সে, বিভিন্ন জীবকোষের সান্নিধ্য ও সাধারণত উচ্চতর প্রাণীর জীবনে প্রত্যেক জীবকোষের জীবনে একটি অতুত্পন্ন বৈশিষ্ট্য এনে দেয়, আবার সেট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জীবকোষ সমষ্টির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য করে এবং জীবকোষসমষ্টির বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যেক জীবকোষেই আবার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মে, এখানেও তেজ্জ্বিন নানা মনের সান্নিধ্য ও সাধারণত প্রত্যেকটি মন তার নিজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং প্রত্যেক মনের এই বিশিষ্ট স্বতন্ত্র্য দ্বারা মনঃসমষ্টি ব'লে একটি স্বতন্ত্র মনোবাহকের সূত্র

উদ্ঘাটিত হ'য়ে ওঠে, এবং এই মনোবাহকের বিশিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা আবার প্রত্যেকটি মন অতুত্পাতিত হ'য়ে ওঠে। মানুষ যদি মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে বেড়ে না উঠত তবে মানুষের মন তার জৈবপ্রকৃতি থেকে কখনই নিজে থেকে উপরে তার নিজের দ্বার্থ ভ্রাম্যের মধ্যে ভাসিবে তুলতে পারত না। Trans-subjective ও intra-subjective intercourse এর যদি অবশ্য মানুষ না পেত তবে মানুষের মন কখনই তার চিন্তার ও চিন্তাময়রূপে বেড়ে উঠতে পারত না।

এতকণ দ্য কিছু বলা গেল তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মন ব'লে কোন একটি স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নেই, কতকগুলি বিশিষ্ট বাণীয়াবলম্পর্ক ও নিরমলম্পর্ককে সংশ্লিষ্টভাবে বোঝাবার জন্য মন শব্দটি ব্যবহার করছি। যেমন চতুঃপাশ জৈববাহক, তেজ্জ্বিন মন বলতেও একটি স্বতন্ত্র বাহক বোঝা যায়। এই বাহকের বাণীয়াবলম্পর্ক ও নিরমলম্পর্ককে কোথায় সামগ্রিক, কোথায় তাদের বিপেক্ষ, ব্যক্তিগত, কি তাদের প্রকারবলম্পর্ক এ আশোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। এখন শুধু এই কথা বলতে চাই যে জৈব বাহকে আশ্রয় ক'রে স্থবির স্বতন্ত্র অশুভ থেকে শূন্যতরভাবে এই মনোবাহক তার বিভিন্ন বাণীয়াবলম্পর্ক ও নিরমলম্পর্ককে মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ ক'রে তুলেছে। জৈববাহকের প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ও স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই, সে ব্যক্তিগত মূর্ত, সে ব্যক্তিগত মূল হচ্ছে জৈববাহকের নিরমলম্পর্ক, সামগ্রিকম্পর্ক; তার প্রত্যেকটি বাণীয়াবলম্পর্ক তার অন্তর বাণীয়াবলম্পর্ককে আপনাকে ক'রে চলে, এবং প্রত্যেকটি বাণীয়াবলম্পর্ক যে মন বাণীয়াবলম্পর্ককে আশ্রয় করে না থেকে মনঃসমষ্টিগুলির সঞ্চিত স্বতন্ত্র আকর্ষণ হ'তে থাকে, এইখানেই জীবকোষের ব্যক্তিগত মূল। কিন্তু মনোবাহকের ব্যক্তিগতিকে আমরা ন্যায্য ব'লে আছা ব'লে মনঃসমষ্টি ক'রে থাকি। কিন্তু আমি এতকণ দ্য বলেছি তাতে আছা ব'লে কোনও দ্বারী স্বতন্ত্র কথা বলিনি। এখনও বলিতে চাই নে। যা চাই সে হচ্ছে, এই আশ্রয়প্রাপ্ত একটি বাণীয়াবলম্পর্ক। আছা কাকে বলে এ কথা নিয়ে আমাদের মর্মন-

পায়ে পূর্ব বিচার করে; বোধে বা বলেছেন যে আত্মা ব'লে কোনও বস্তু বস নেই; বস, বেদনা, সংজ্ঞা, সংজ্ঞার, বৈজ্ঞান এই পক্ষ বস বা বিবিদ psychological entities এর সমষ্টি ছাড়া কোনও বস্তু আত্মা নেই। বেদনা বলেছেন যে, বিশুদ্ধ চিন্তাপ্রকাশের নামই আত্মা, কিন্তু আমি বলতে আসসা বা নৃশি সেটা হচ্ছে এই অসীম চিন্তাপ্রকাশের একটা অংশ-করণাবলির মিশ্রণ। জ্ঞান বলেছেন যে, আত্মা হচ্ছে জড়বস্তু একটি বস্তু, সে বস্তুকে আমাদের এই মন বলতে হয় যে তা না চ'লে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুণের ত কোনও একটা থাকার আগ্রহ চাই, কারণ গুণমাত্রকেই কোনও বস্তুকে আগ্রহ ক'রে থাকতে হবে, অতঃপর আমাদের জানা এমন আত্ম কোনও বস্তু নেই যাকে জ্ঞানের আগ্রহ বলা যায়। এর কোনও মতের সত্যতাই আমি মাথ দিতে পারি নে। চিন্তাপ্রকাশ ব'লে বস্তু একটি পরার্থকেন্দ্র মানি নে সে কথা সংক্ষেপে পূর্বেই বলেছি। জ্ঞানের আত্মা প্রত্যক্ষাত্ম-ভূতর উপর স্থাপিত নয় ব'লে তারও কোন বিচার করা প্রয়োজন মনে করি নে। বোধমতের বিরুদ্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, প্রতিবুদ্ধির স্বপক্ষাধী বুদ্ধিমত্তি ছাড়া তাই কোনও জ্ঞান আত্মা স্বীকার করেন না। অতঃপর আত্মা আত্মা বা স'লি বলতে বা নৃশি সেটা শুধু চিন্তাপ্রকাশ নয় বা মুমুক্তির চিন্তা তার প্রভৃতির সমষ্টিও নয়। আত্মা বা স'লি বলতে বা নৃশি সেটা হচ্ছে একটা জীবনের সমগ্র অমুভূতির সমগ্র experience-এর একটা সক্রিয় ইতিহাসের অভিব্যক্তি। জৈবজ্যোতির সঙ্গে মনোজ্যোতির পরস্পরের সম্বন্ধ ও আদান প্রদানে, বৈচিত্র্য মনের পরস্পরের আদান প্রদানে, জৈব-মনোজ্যোতির মধ্যে দিয়ে জড়জ্যোতির সহিত আদান প্রদানে, জৈবজ্যোতির অর্থাধীর ব্যবহারে, মনোজ্যোতির নানা ব্যাপারের সংঘটন নিয়মনে বা কিছু মনে ভেঙ্গে উঠছে এবং ছুঁতে থাকে, তার সবগুলিই একটা বিশিষ্ট নিয়মে পরস্পর অন্তর্নিহিত ক'রে গ্রথিত হচ্ছে, এবং এই লক্ষ্য ও গ্রন্থনের প্রাকৃতিক ও বৈশিষ্ট্যের ইতিহাসের মধ্যে আত্মা আমাদের আত্মবোধ বা অমুভূতিবোধে সত্যাক করতে পারি। এই ভোদ্যে দেখতে পেলে আত্মা ব'লে বা নৃশি সেটি একটি concrete entity. অতঃপর entity-টি একটি স্থির পদার্থ

নয়; অতঃপর কমপক্ষে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় না; আমাদের বা কিছু অমুভূতি বা কিছু experience হয়েছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ক'রে ক'রে একটি অগুণ সত্যের পরিণত হয়েছে; সে সত্যের মধ্যে অমুভূতির স্রবণ নাই, অতঃপর পূর্ণাঙ্গের স্রবণও অগুণ সত্য। বস্তুতঃ স্রবণ অমুভূতি, স্রবণ, ইচ্ছা, গুণগুণাধী নানা ভাবসম্বন্ধ স্রবণ স্রবণ সক্রিয় ক'রে থাকে সেগুলি সেটি পূর্ণাঙ্গের মধ্যে অমুভূতি ক'রে সেটি অগুণ সত্যটিকে স্রবণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্রবণ স্রবণ ক'রে অভিব্যক্তি ক'রে স্রবণে থাকে। আমার ফেলোবো আমাকে আমি বলতে বা বুদ্ধতাম্ভাস তার অধিকাংশই বৈশিষ্ট্য ডেবোনেল্লা প্রভৃতির মধ্যেই আত্মা থাকে ব'লে একটা বৈশিষ্ট্য বোধের মধ্যেই অধিকাংশই আত্মা। কমপক্ষে স্রবণ অনেক বেশি স্রবণ, অনেক চিন্তা কবি, অনেক স্রবণ কালে পদত্ব চাই, অনেক বস্তুমের স্রবণের আত্মা পাই, তখন সেটা স্রবণ স্রবণই আত্মা আত্মবোধে থাকতে থাকে। সত্য বটে আমাকে আমি ব'লে বস্তু আমি বলি, তখন কোনও একটা বিশেষ নির্দিষ্ট অমুভূতি আমাদের কাছে আসে না, আসে সেটা সেটা হচ্ছে একটা অগুণ অমুভূতি, অতঃপর সে অগুণ অমুভূতিই এমন একটি বিশিষ্টতা আছে, যে বিশিষ্টতাই স্রবণ-একটা অমুভূতি, একটা অমুভূতি স্রবণ এমন আছে বা বস্তু স্রবণ স্রবণের নয়। এমনকি আমি যে কি তা আমি ব'লে যোগ্যেতে পারি না, কিন্তু মন বস্তুর পূর্বে আমি বলতে আমার মধ্যে যে স্রবণ সেটা তার চেয়ে যে এটি অনেকাংশে ত্রি-একটা আমি বৈশিষ্ট্য বস্তুতে পারি। এর কারণই হচ্ছে এই যে আমি বলতে আমি বা নৃশি সেটি হচ্ছে আমার অমুভূতিবোধের সমগ্র অমুভূতির একটি অগুণ দ্বারা ইতিহাস, অগুণ ব'লেই সেই ইতিহাসটি স্রবণ সময়েই আমার সামনে আগতক, সেটি একটি ইতিহাস ব'লেই তাই কোনও দ্বারা চোঁকা যায় এমন বস্তু নেই; এবং কমপক্ষে অগুণ ইতিহাস ব'লেই মনোজ্যোতির সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে স্রবণ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, এই আমার মধ্যে এমন একটি ঠিক আছে যে ঠিকটি তার সমগ্র ইতিহাসকে একটি অগুণ পদার্থের জায় ব্যবহার করতে পারে; এবং তাই মধ্যে যে প্রতিটি বস্তু ক'রে রয়েছে তাকে নিশ্চিত করতে পারে।



প্রায়গ কহতে পারে। কোনও আমিই তার ইতিহাসের পিতৃভূত প্রত্যয়সকলকে অস্বীকার করতে পারে না। আমি প্রত্যয়ের মধ্যে সমস্ত প্রত্যয়সকল এমন করে পিতৃ-ভূত হয় যে তার ভিতর থেকে কোনও একটি প্রত্যয়কে ছাড়ত সব সময়ে পৃথক করে গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু পৃথক করতে পারে না বলেই এই ইতিহাসের সমগ্রতা এত ঘন এবং ঘনও। অর্থাৎ এই আমিরবোধের মধ্যে সমস্ত মনোবাস্যটি বৃত্ত চ'রে রয়েছে বলে এই অখণ্ড বোধটির মধ্যে মনের সমস্ত ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন চ'রে রয়েছে। ঘন এই আমি কোনও পরস্পর বিচ্ছেদ গাড়ায়, তার মানে হচ্ছে যে সমস্ত মনটি তার অখণ্ড অস্তিত্ব ইতিহাস নিয়ে তার জমাট নক্ষি নিয়ে তার বিচ্ছেদ গাড়ায়। সমস্ত মনের ইতিহাস আমিই মধ্যে আছে বলে আমি একটা বিচ্ছিন্নতাময় complex unity বা entity এবং সেটি জগৎ এর মধ্যে শক্তির অস্থূলতার অংশ কিংবা অস্থূলতার অংশগুলির পূর্ণ মাত্রার বিচ্ছিন্নতাময়। এই আমিটি কিংবা না চ'রেও তির, দ্বিধা চ'রেও লগ্নবাহী বহুদলীল পরিবর্তনশীল। তা হ'লে চল কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে মাত্রণ বলতে আমরা যা বুঝি সেটি জড় জীব ও ঘন এই তিন রাজ্যের সংঘাতে উৎপন্ন এবং এই তিন রাজ্যের সংঘাতে যে উপাদান প্রস্তুত চ'তে পাকে তারই উপাদানসকলের ক্রমবর্ধনশীল। চক্রাঙ্কা, জীবরাজ্য ও মনো-রাজ্য এ তিনটি যেমন সত্তা, এই তিনটির পরস্পর সংঘাতে বা পরস্পরের উপযোগিতার বা উৎপন্ন হয় তাও তেমনি সত্তা; সেইজন্য মানুষও মিশ্রা নয়, তার আমিরও মিশ্রা নয়, তার। উচ্চরেই সত্তা। এ সংসার আমান প্রদানের সংসার, প্রকণ বজ্রনের সংসার, পরস্পরোপযোগিতার সংসার; এবং এই দৃষ্টিই হচ্ছে এর-তত্ত্ববৃত্তি। এই চক্রলোকের মধ্যে না দেখে যদি অস্তিত্বটিতে একে দেখতে বাওয়া যায় তবে একে দেখা যাবে না। সব জিনিসই সত্তা যদি যে দিক থেকে তাকে দেখতে হবে সেই দিক থেকে তাকে দেখা যায়, আবার সব জিনিসই কিছু মিথ্যা। যদি যে দিক থেকে তাকে দেখতে হবে সে দিক থেকে তাকে না দেখা যায়।

কিন্তু শুধু জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোবাস্য নিয়ে আলোচনা করলেই গোটা মানুষটি আমাদের কাছে ঘর

পড়ে না। যেমন জীবরাজ্যকে আমরা ক'রে মনোবাস্য আচ্ছন্নপ্রাণ করে, তেমনি মনোবাস্যকে অবলম্বন ক'রে একটি বৃত্তর বিজ্ঞানরাজ্য বা আনন্দরাজ্য প্রকাশ পায়। এই রাজ্যের প্রকাশের উপরই মানুষের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করে। মানুষ যে শুধু বাঁচে, কি চিন্তা করে তা নয়, মানুষের মধ্যে একটা সত্যালিঙ্গা, অলঙ্কার, সৌন্দর্যালিঙ্গা, একটা তত্ত্বালিঙ্গাও কাজ করে। মনোবাস্যটি অনেকখানি পরিমাণে জৈবতাবের দ্বারা অস্থূলপ্রাণি এবং প্রয়োজন সৃষ্টিত লবিত দৃক, কিন্তু এই বিজ্ঞানসম্মত রাজ্যটি একেবারে প্রয়োজন-সম্পর্কহীন। টার পৃথিবী তিনটি রাজ্যের মধ্যে যেমন নানাবিধ জটিলতা দেখতে পাওয়া যায় এতে তা নেই, এ যেন একটি ছায়ালোক; এ ছায়ালোকের দীপ্তিতে মানুষের মনোজীবন বদন উদ্ভাসিত হয়, তখন যেন সে এক নবীন জীবন লাভ করে। আমরা বস বসমত কাজ করি আর বস বসমত কাজ করি না, এর মধ্যে নিহতর একটা তুলনা উঠতে থাকে, এই কাজটা ভাল কি ঠিক কাজটা ভাল, এটা উচিত কি টুটা উচিত; এই যে উচিতা অনৌচিততার তুলনা, ভাল মন্দের তুলনা, এটা ঠিক হুবিধা অস্থূলবিধার তুলনা নয়। হুবিধা অস্থূলবিধার তুলনা প্রয়োজন-সিদ্ধির তারতম্যের তুলনা, জৈববাস্যপাণের বৃত্ত:প্রস্তুতির দ্বারা বিরোধী সেটা হুস্পর্শ চ'তে পারে। কিন্তু এই ভাল মন্দের তুলনা হুবিধা অস্থূলবিধার তুলনা নয়, হয়ত যেটা আপাতত নিত্য অস্থূলবিধার সেইটাকেই ভাল এবং উচিত বলে প্রতিষ্ঠাত হয়। এই যে উচিতের দ্বারা নির্ধারণ, ভালর দ্বারা নির্ধারণ, এটা আমাদের সমস্ত জৈবপ্রস্তুতির উপরে গাঁড়ির জৈবপ্রস্তুতিক দমন করতে চায়, অর্থাৎ আপাতস্বল্পিতে অনেক সময়ের জৈবপ্রস্তুতির প্রতিবৃদ্ধ প্রয়োজনসিদ্ধির প্রতিবৃদ্ধে আমাদের প্রয়োজনিত করে। জৈবপ্রস্তুতির অস্থূলকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির অস্থূলকূলে যেটা সেইটাকেই ভাল বলে দ্ব্যবধান বলে কল্পিত বলে গ্রহণ করা সর্বপ্রাণিগুণধারণের গতি, এবং এই গতি অস্থূলকূল ক'রেই জীবগণতে নতুন নতুন প্রকারে প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যারা এই গতিটিকে বস দেখে ক'রে পালন করতে পেরেছে তারা এবং তাদের লগ্নানসত্তাটাই জীবন-

মুখে প্রকাশিত ক'রে আশ্চর্য্যকর ক'রে বেঁচে রয়েছে। তাই  
জৈন ও মনোবাণীরের সমস্ত কাঠামোর মধ্যে এই অর্ধ-  
অর্ধের সমস্ত ও এই প্রয়োজনসিদ্ধির দাবীই আপনাকে বাধ্য  
ক'রে রেখেছে। অতিমুখ অবস্থা থেকে অতিমুখ অবস্থা থেকে  
কোন এই প্রয়োজনসিদ্ধির অঙ্গসম্বন্ধ ক'রে নিজেকে জীবন  
মুখে কলী ক'রে রাখতে পেরেছে। তাই এই বেগটা তার  
পর্যায়ের প্রত্যেক জীবনকালের মধ্যে এবং তার চিন্তাধারার  
পতনস্থল মধ্যে তাকে বাধ্য ক'রে রেখেছে। এর  
অভিভাবকতা স্বীকার না করলে জীবনকে চলে না।  
অথচ উন্নত মানুষের জীবন যে একটা এমন গতি তথ্যে  
যার দ্বারা সমস্ত জীবনগতের নিয়ম উল্লঙ্ঘন ক'রে একটা  
নতুন মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা অধিকার ক'রে প্রয়োজনসিদ্ধির  
চেয়ে প্রয়োজন বিসর্জনের দাবীকে বড় ক'রে তোলে।  
সমস্ত জীবনগতের ইতিহাসে এটি একটা অভিনব বাণী।  
এই যে প্রয়োজনসিদ্ধির বাহিরে প্রয়োজনসিদ্ধির একটা বস্তুর  
দাবী মানুষের মধ্যে কাজ করে, একথা উপনিষদের যুগ  
থেকেই আমাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।  
কত উপনিষদ বলেছেন, অজ্ঞান্যুপাধিততৈব প্রোক্তে উভে  
নানার্থে পুঙ্খা দিলীতাঃ। অর্থাৎ প্রের এক প্রেরের বাধন  
তাই দিক থেকে মানুষকে বাধে। বাসত্য্য এই কথাই  
অন্ত ভাব্য বলেছেন, চিত্তনদী খলু উত্তরভোবাহিনী বহতি  
পানায় বহতি কল্যাণায়। সাম্মাযোগ মতে সমস্ত প্রকৃতি  
মানুষকে চাই দিক দিয়ে আকর্ষণ করে, একবিভে ভোগের  
দিকে প্রয়োজনসিদ্ধির দিকে, অপরদিকে প্রয়োজনবন্ধনের  
দিকে অপরদিক দিকে। সুতরাং কান্ট, প্রক বলেছেন  
rational will এর বাণী, তাঁর মতে এ বাণী নিত্যবাণী, এটি  
নিত্যবাণী মানুষকে যেদিকে টানে তার মধ্যে প্রয়োজনের  
দাবীর গন্ধমাত্রাও নেই। লোকের মধ্যে সমানভাবে এটি  
অন্যর অমর অক্ষর বাণী প্রস্রবিত হ'লে প্রয়োজনসিদ্ধির পাত্রী  
থেকে বড় উর্ধ্বে মানুষকে টেনে তুলতে চায়। কান্টের সঙ্গে  
আমার মতের পার্থক্য এটি যে, আমি এ বাণীকে নিত্য বাণী  
মনে করি না; প্রয়োজনসিদ্ধির পাত্রীর মধ্যে থেকে দীর্ঘ  
দীর্ঘে এই বাণী উর্ধ্বে দৃষ্টিত হ'লে গঠিত, এবং উন্নতির  
বিভিন্ন স্তরে ক্রমশঃ দৃষ্টিতর তাতে আপনাকে প্রকাশ

করে। মনোবাণীটি যে ভাবে জীবনকে থেকে মণি-  
বিক্রান্তের দ্বারা বিকৃত হ'লে, পুণ্যব্রহ্মের দৃষ্টিমণ্ডলের  
দ্বারা পুণিত হ'লে, এ দাবীটিও ঠিক তেমনি ক'রে  
মনোবাণীরের স্বরূপ থেকে পুণিত হ'লে উঠে। মনো-  
বাণীটি দারুণমাত্র দীর্ঘমাত্রের দ্বারা দীর্ঘ দীর্ঘে প্রেম  
জীবনকালের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়, এবং এই উদ্ভবের  
অনেকদূর পরগত জীবনকালের অভিব্যক্তিতে অভিব্যক্ত থাকে,  
এই বিজ্ঞানানন্দবাণীও ঠিক তেমনি ক'রে মনোবাণীরের  
মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয় এবং সেটুকু নিত্য নয় কিন্তু  
উদ্ভবশীল, এক নয় কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত।  
এই প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যে প্রতিভেদে শিক্ষাভেদে মানুষভেদে  
এই বিন্যাসপ্রকৃতির প্রয়োজনবন্ধনের আশ্রয়ভাগের  
বাণীটি নানা আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। এদিক  
ক'রে নতুন রকমের মধ্যে মনোভূমির প্রান্তভাগে যুগে যুগে  
যেখানে যেখানে কালে কালে মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে  
তার নতুন নতুন মূল্য-স্বপ্ন চলেছে এবং এই অলৌকিক  
মূল্য-স্বপ্নের প্রভাবে আমাদের সমস্ত কাজে তালমূল্য  
নির্ধারণিত হ'লে এবং এরই অলৌকিক নিয়ন্ত্রণের ফলে  
মানুষ ভোগের আকর্ষণ থেকে ভোগের বস্তুতে বসিয়ে পায়  
অপত্তের কল্যাণে সত্য হ'তে পারছে। তত্ত্বজ্ঞানাত  
এই লোকেরই বাণী। কত উপনিষদের নৈতিকতার  
উপস্থানে পাই যে নৈতিকতা সমস্ত প্রয়োজন প্রত্যাখ্যান  
ক'রে বলেছিলেন যে তিনি কিছুই চান না কেবল জানতে  
চান মৃত্যুর পর কি হয়। উপনিষদের দ্বারা এই তত্ত্ব-  
লোকের একই স্পষ্টপেয়ে রক্ষানকে অধীর হ'লে উত্তর  
—এ যে আনন্দময় লোক, মনোবাণীরের সমস্ত বন্ধন এখানে  
ছিঁচ হ'লে পেছো—যদি প্রিয় প্রিয় দৃষ্টিমণ্ডল না থাকে  
কিচেন বেদ নাস্ত্যঃ এবং যথাঃ পুঙ্খাঃ প্রাণোহন্যন্য  
সংস্রিযক্তো ন বাঙ্ক কিচেন বেদ নাস্ত্যঃ তথা অত  
এতদাপ্রকামম্ আদ্যকামম্ তপঃ শোকস্তমম্। অত পিতা  
মপিতা তবিত মাতামাতা লোকঃ অলোকা দেবা অদেবা বেদা  
অবেদা অহা ত্বেনোহন্তেনো ভবতি ভবতা অভবতা চাত্রাণো  
অচাত্রাণঃ গোষলোহগোষদঃ প্রমণোহম্রমণ্যাপমোহতাপদঃ  
অনবাগতঃ পুণোহ অনবাগতঃ পাপেন তীর্থোহ তথা



সদ্যোজ্যোত্স্বান্ সদৃশস্ত ভবতি । যাতুয় বধনং ত্বার কামিনার  
রাজা যথেক প্রয়োজিনের রাজা যথেক উচ্ছেদ আপনাকে  
কৃপ্তে পারেন তখনই এই ত্র্যম্বকোক্তের স্পর্শ লাভ করতে  
পারেন—যদ্যাদ্যে প্রমুখোক্তে কামা যেন্ত জমি প্রিতাঃ । অথ  
মহোজ্যোত্স্বো ভবত্যত্র ত্র্যম্বকমুখতে ।

এই লোকের উপলব্ধির জটাই পুটপ্রতিজ্ঞা হ'য়ে বৃদ্ধ  
বলেছিলেন, "ইতিমানে তথাক্ত যে শরীরঃ । হৃদয়মাংসঃ  
বিলম্বঃ চ বাতঃ । অপ্রাপ্য বোমিঃ বহুকল্পকালঃ । নৈবা-  
সনাংকায়মতশ্চলিযুক্তে ॥ সমস্ত মর্শন পাশ্বের কিজাসার মূলে  
এই আনন্দলোকের এই বিজ্ঞানলোকের একটি স্পর্শ  
বয়েছে । যদি যিনি যোগী যিনি ত্র্যম্বক যিনি তিনি এই  
লোকের স্পর্শে ভুবে যেতে চান । "সি বখা সৈক্বেখনো-  
নরোহেবাহি কংহাঃ হৃদয়নঃ এইবো বা অবোহমায়া অনন্তরোহ-  
বাহঃ কংহাঃ প্রজ্ঞানবনঃ এব" । বিভিন্নদেশের বিভিন্ন কালের  
বিভিন্ন সাধকের নিকটএর স্পর্শের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে,  
কিন্তু সকল দেশের সকল সাধকই এর একটা প্রমাণাব-  
শেইছেন । সাধু ব্রহ্ম এই উপলব্ধিকেই লক্ষ্য করে  
বলেছেন :—

কান দীর্ঘ জগা বৈ' উয়ে যাবত্যা পরকান্  
অনন্ত জগা' বৈ উপলব্ধে সময়ে কিতা নিবান  
হো' পর লগা বিচার কা' ভহ' নিরঞ্জন বাস  
তগা' তু' গাছ' যোগিস সো' ত্র্যম্বকোপায় ।  
জগা' তন্ম মনকা দ্বায়ে উপলব্ধে শু'কার  
অনন্ত দেগা লক্ষ্য কা' আত্ম কঠৈ বিচার  
সাবপ্রসাদ বৈ উপলব্ধে হো' হৃদয় নিম্ন সাহ  
তগা' গাছ' নিব' পাটকে নির'ভর নিব' ।

জগদ্বিন্দিত কসি এই ত্র্যম্বকেই লাভ করে বলেছিলেন,—

I have put duality away, I have seen that the  
two worlds are one ;  
One I seek, one I know, one I see, one I call,  
I am intoxicated with love's cup, the two  
worlds have passed out of my ken ,

অথবা

In my heart thou dwellest else with bliss I'll drench it ;  
In mine eye thou gloucest else with tears I'll quench it.

Only to be one with thee my soul desireth—

Else from out of my body, look or crook, I'll wrench it.

অথবা

O my soul, I searched from end to end I saw in  
this naught save the Beloved—call me not inleel, O my  
soul, if I say that thou thyself art He.

সামান্য সার বধন খ্রীষ্টেত্তের মনোভাব স্পর্শ করে  
পরতত্ত্ববিন্দিত প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

ন সো রমণ ন হয়ে রমণ

হুই মনোভব কোণে জানি ।

তখনও তিনি এই তত্ত্বেরই আশ্রয় বর্শন করতে চেষ্টা  
করেছিলেন । এদনি ক'রে নানাধর্মের নানাভাবের  
সাধকেরা এই তত্ত্বের নানা আশ্রয়-ভাবের বাস্তবিত্তে  
করতে চেষ্টা করেন । এই সমস্ত আশ্রয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত  
নানা বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু এই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও  
একটি কথা দৃষ্টে উঠছে যে এই লোকের স্পর্শ তাকে  
মনোভাবের চিত্তার বলে দ্বারা ধারণা না, একে কথায় বোঝা  
যায় না, একে বালি অলৌকিক স্পর্শে পাওয়া যায় ।

এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শ যে তত্ত্ব কণ্ঠসাধক বা  
ব্রহ্মসাধকের জীবনেই যদ্য পড়ে তা নয়, যিনি দৌন্দর্ভের  
সাধক তাঁরও অহুপ্রাপন এই লোক থেকেই আসে ; এই  
লোকেরই একটু স্পর্শ তিনি কর্তব্য ছন্দে কিবা কথায় ছন্দে  
ধবতে চেষ্টা করেন ; এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শই যে  
আত্মার জীবন দৌন্দর্ভায় প্রাপন হ'য়ে গঠে সে কথা  
Shelley তাঁর একটি কবিতায় বোঝাতে চেষ্টা করে  
বলেছেন :—

The awful shadow of some unseen power  
Flows though unseen among us—visiting  
This various world with an inconstant wing  
As summer winds that weep from flower to flower,—  
Like moon beams that behind some  
piny mountain shower,  
It visits with inconstant glances  
Each human heart and countenance ;

Of stardusts' zeal or love's delight  
Outwatched with me the envious night  
They know that never joy illumined my brow  
I linked with hope that thou wouldst free  
This world from its dark slavery.  
That thou—O awful loveliness  
Wouldst give what'er these words cannot express.

রবীন্দ্রনাথ এই স্পন্দকেই তাঁর কাব্যের উৎস ব'লে

বর্ণনা ক'রে লিখেছেন :—

এক কৌতুক বিভ্রান্ত  
কথা কোঁচকমতী !  
আমি যাহা কিছু চাই বলিবারে  
বলিতে দিতেছি কষ্ট !

অপরধানে বসি অহরহ  
মুগ্ধ হ'তে তুমি ভাবা কেঁচে লহ,  
যেব কথা ল'রে তুমি কথা কহ  
সিগারে আপন হারে ।

কি বলিতে চাই সব ভুলে থাই,  
তুমি বা বলাও আমি বলি চাই,  
সম্বাদিত স্রোতে কুল নাই পাই  
কোথা ভেসে বাই হবে ।

বাঁহতেজস্বী বলি একবারে  
আপনার কথা আপন জনারে,  
প্রতিভেহি লগি যেরে মূগারে  
যেরে কাহিনী যত ;

তুমি যে ভাবেরে বহিয়া অকলে  
দুখনি ভাবিতে নবেরে বলে

বদান প্রতিমা সব কোণে  
খড়িয়ে মনের মত ;  
যে মায়াসুখাত কি করিতে ভাল  
কোথাকার তার কোথা নিলে টানি,  
আমি তেহে লাগি বিশ্বয় মানি  
এতকৈ নিমগ্নন ;  
এ যে সম্ভ্রান্ত কোথা হ'তে উঠে,  
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ছুটে,  
এ যে ভ্রমর কোথা হ'তে টুটে  
অপর-বিচারণ ।

মুগ্ধ ভুল খকের প্রাণ  
জরা আমলে ছুটে হ'লে বাত,  
মুগ্ধ বৈদ্যনা বেগে উঠে গর  
মুগ্ধ বাঁধিলে হারে ।  
যে কথা ভাবিলি বলি সেই কথা,  
যে কথা বুঝি না জাপে সেই কথা,  
প্রাণিনা এসেছে কাহার গবতা  
কারে পদাবধি তরে ।

কে কেমন বোলে ঘর গাহার,  
কেহ এক বলে কেহ বলে দ্বার,  
আমারে শুভাচ্ছ বৃণা দ্বারদ্বার,—  
হবে তুমি হাম প্রাণ  
কোথা তুমি কোথা গহেছ মোগনে  
আমি মরিচকি খুঁজি

এমনি ক'রে এই অলৌকিক একটি রাজ্য আমাদের  
মনোরাজ্যের উঁকে থেকে কখনও বা মনোরাজ্যের মধ্যে তার  
আলোক রশ্মি ফেলে তাকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে, কখনও  
বা তার অলৌকিক শক্তির দাবীতে মনোরাজ্যের এবং বৈব-  
রণের সমস্ত দাবীকে ক্ষুদ্রতার ছাঁদ ক'রে দিয়ে আপনার  
অসীম সৌন্দর্য ও বৈভবকে প্রকাশ করে । মনোরাজ্যের  
মধ্যে এ রাজ্যের শক্তির আভাস মাত্র শাই, কিন্তু এ রাজ্যের  
সম্পদকে মনোরাজ্যের নিরমের দ্বারা ঘরবার কোনও  
উপায় নেই । যে সমস্ত দাবীকে এ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ  
করতে চেয়েছেন তাঁরা বলেছেন যে মনোরাজ্যের বিধ্বংস  
না হ'লে এ রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না । কিন্তু যদি  
মনোরাজ্যের জন্য ঘটে তবে এ রাজ্যে প্রবেশ হ'লে তার



অন্তর্ভুক্ত যে কি হবে সে কথা মনোরাজ্যের ভাষায় বলা যায় না। এইখানেই mysticদের রহস্য। যে দার্শনিক তাঁর দর্শনবিচারে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিক তাঁর প্রথা-বিচারের মধ্যে গ্রহণ করেন নি সে দর্শনশাস্ত্র অতি দীন। কাজে এই রাজ্যের স্পর্শেই মানুষের অমুখ্যত্ব। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের বিচারের মধ্যে সমস্ত অন্তর্ভুক্তি সমস্ত তথ্য, স্থান, পাণ্ডা উচিত, সেইজন্য যে দর্শনশাস্ত্র শুধু এই পর-তরকেই স্বীকার করে পরিত্যক্তমান আর সমস্তকেই মিথ্যা মানা বলে একশাশে সরিয়ে রাখতে চান, দর্শনশাস্ত্র হিসাবে সে দর্শন অতি দলীল। বিভিন্ন একমের বিশেষ্য নিজে আত্মবোধে চোখের সামনে এই অমুখ্যত্ব, প্রাণময়, মনোময় ও মানসময় চারটি রাজ্য পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রকাশ করে তুলছে। এই চারটি রাজ্যই সমান ভাবে সত্য এবং চারটি রাজ্যের পরস্পরের আদান-প্রদানে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তাও ঠিক সেইভাবেই সমান সত্য। এ সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে বসে এডোটা রহস্যে তাঁর কোনোটাতে চারটি রাজ্যের কোনওটিও তথ্য অঙ্গের কোনোটির নিয়মের দ্বারা বা বাধ্যতার দ্বারা বাধ্য করা সম্ভব হয় নি। যদি কোনো একটি এমন সত্য পাওয়া যেত যার দ্বারা এই চারটিরই বাধ্যতাব্য ব্যাখ্যা করা চলত তাদের বৈচিত্র্যের

উপশ্রি করা সম্ভব হতো তবে সেসকল অস্বৈতবাদ স্বীকার করা যেতে পারত। এই চারটি রাজ্যের যে পরস্পরসংগত বৈচিত্র্য এই নিয়মেই রহস্যে অগতের ও মানুষের জীবন; এ বৈচিত্র্যকে না মানলে জীবনকেই মানা হয় না। ঐক্য আমরা খুঁজি বটে, কিন্তু বিচিত্রকে না মানলে ঐক্যকেই মানা হয় না।—সমস্তকে ছাড়িয়ে সমস্তকে মিথ্যা বলে সরিয়ে দিয়ে যে ঐক্য পাওয়া যায় সে ঐক্য বিস্তারিত ঐক্য, মুক্তি ঐক্য নয়।

“গরিবেরা পরস্পরকে খালে ছিদ্র তরি,  
আপনাকে পূজা করে মুক্ত মনে বরি।  
এমন মনে হয়  
আপনাকে বিক্রি করা মুক্ত করা নয়।”

চারটি বিভিন্ন ভগ্নতের ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের দৃশ্যটি যে মানুষের মধ্যে পরস্পরকে এবং এই চারটি রাজ্যে যে মানুষের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করে তুলছে এবং তাদের চরম সার্বজনীনতাকে মানুষকে সৃষ্টি করে তুলছে, তাদের বিভিন্ন অসঙ্গততা যে মিলিত হয়ে অসঙ্গত একটি মানুষের হয়ে নিরঙ্কর প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছে এই দুটিই দর্শনের দুটি, এই দুটিই মুক্তি দুটি।

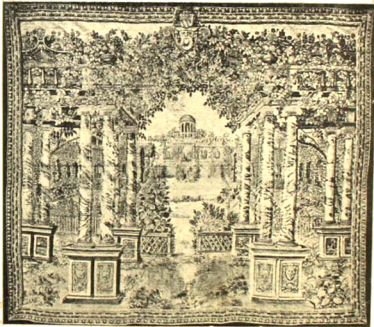
এই গ্রন্থটি বহুমান বাস যাত্রা দ্বারা প্রাপ্য দলীল সাহিত্য। দলীলমূলক দর্শন বিচারের সমাপতি হিসেবে চলে যাবেদশাখ বাসন্ত্য মাসের প্রথমার্ধে



# বিবিধ সংগ্রহ

কাউন্সিল্ গ্রাণ্ডেলার উদ্যান

অষ্ট্রিয়া-ভার্ভেনার বারখানা 'ভিহেনা' নগর বারখানা  
নিয়ন্ত্রক-ভার্ভেনার কতকগুলি প্রথম 'অস্ট্রিয়া'রই আলব  
খাউস। পের্গলিওরট্ট এট অর্ডার নামে অভিহিত করা  
হয়। বোডল পতাকার, বোডল কেন, বোডল স্কল



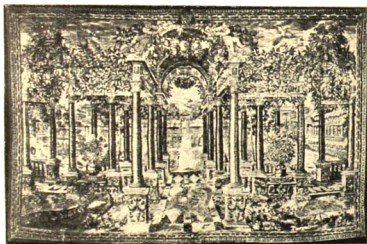
চাষাণ্ডেল কৃষ্ণবাপি

পত্রাবলি প্রেরণ বহন-শিল্পী, 'উচ্চলিহম ল্যানেমেকাব' নিয়ন্ত্রক গ্রাম এবং উচ্চ  
এজলি বহন করিয়াছেন। গ্রামটিনিও ল্যানেমেকাব, ভিহেনার খাউস।



এই কালকল্লিগ সংখ্যার সপ্তমস্কে ছয়টি। মন্বন্তর, ১মংকার বাবান্দা-সংশয় ছাড়া, পৌত্তবসম্পন্ন খিলান, সাবিত্রী স্তম্ভ-প্রতি এই সব পটভূমি পুণ্ড্রমি। পুরোভাগে মন্বন্তরমুদ্রিত পরিণত পতঙ্গলাবর ধাত্রাবমান ও বরান মুদ্রিত চইয়াছে :—১বিণ, কৃষ্ণ, মন্বন্তর, বক, বিদ্যাভা কৃষ্ণ, টিগা, চিত্রাব্যাস প্রভৃতি আছে। বইট পরিভাগেব বিষয় এই সব প্রকল্প মুদ্রিতাবন মধ্যে কোনো কোনোটির প্রভা বাতিব বইটা পড়িয়াছে, কোনো কোনোটি এই অংশট বইটা গিয়াছে যে কোনো যায় না।

বৈদ্য করিবার বিবিধ চক্রা, গ্রন্থাবের বাড়িবার, ছড়াইয়া পড়িবার এবং ছড়াইয়া ছড়াইয়া উপরে উঠিবার দৃশ্যটি, এমন বাতাবিক চইয়াছে যে, ছবি দেখিতেছি বলিয়া মনেই হয়না। অনেকজন সেই বিকে চাতিয়া চাতিয়া মনে হয় বুঝি বা কোন এক মন্বন্তর-কৃষ্ণ-মন্তরী ও পত-পুত্র-পরিণোভিত কৃষ্ণ-কাননেই মাতিথাকি! বিশেষ পুষ্কাকৃষ্ণ রূপে দেখিলে তবে বরা যায় যে, চিত্রকর উভার শিল্পকে কেবলই দৃষ্টাবতা ও বাতাবিক্য-মণ্ডিত করেন নাট, কোনো কোনো স্থলে উভার মন্বন্তর মুদ্রিতাবনও নিপুণতাব



কৃষ্ণচন্দন

খালকল্লিগ উপরকার মুদ্রিতমুদ্র এইরূপ। কিন্তু প্যানেমেকার মাণসংখ্যে এই চিত্রবাচিত কালকল্লিগ বিশেষর চইতেছে তদন্তগত লভা-পাতার পরিষ্করণ। ১বিণ্ডলি বেশিলেই মনে হয় বুঝি কোন উভান-রচনা লব্ধে প্রবন্ধ শিল্পী বহনকারীকে পরিষ্করণে যোগাইয়াছেন। উভারই নিবেশমত প্যানেমেকার সমস্ত লভা-পাতা, ফুল ফল, ও তদন্তলকে একটা এমন জীবন্ত ও বর্জিতমুদ্রিত দিয়াছেন যে, এ ভাভার শিল্প-কার্যের মধ্যে উভার চিত্রকলিকে উভাই একটা মন্বন্তরব বান করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে, পুণ্ড্রিত মন্বন্তর-পতঙ্গাবের দৃষ্টাবতা, মন্বন্তর-স্তম্ভ ও খিলানকে

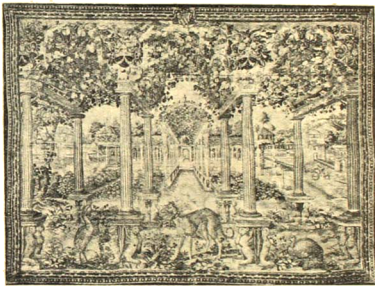
যারা কোথাও মেক্কাবার দেহুরাকাক, কোথাও এক-কলক লোণার খালোর উচ্ছলতা, কোথাও ভাভাবের দীর্ঘায়িত তরীতে ছড়াইয়া পড়িবার চৌকা, কোথাও বা মন্বন্তর নবমুদ্র মত গুটাইয়া পড়িবার তরীটুকু দৃষ্টাইয়া ভুলিয়াছেন! এই কালকল্লিগ লাড় মুদ্র-কাককাপি-বিশিষ্ট ছইলো পুঝি মন্বন্তর। তাহার লাল ও লব্ধে ব-গুহ, ক্রসেলসের তৈয়ারী ক্রমে বাবাই, প্রত্যেকের উপর কাকিনেদ্ প্রাপ্তলোর লব্ধ-মন্তর ও চিত্রকর প্যানেমেকারের দাক্ত-চিত্র বর্তমান।

কাক-পিলের দিক দিয়া উভার যে মূল্য অল্প নয় সে

ঐরাবৎ পত্র

কথা ত অগ্নি-বাদিনী, আবার উভয়ের একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। মহা-বুরেন্সের রাজত্ব ও রাজপরিষদ-বর্ণকে সেট সম্বন্ধে একটা প্রাচীন উদ্ভাবন প্রীতিতে গাইয়া বসিয়াছিল। এই চিত্রগুলির প্রেরণা দেখালে নিশ্চয়ই উটালি হইতে আদিয়া থাকিবে। ইটালিতে যে সমস্ত প্রতিকৃতি প্রাক্ষরাত্মক 'গণিক' চূর্ণ ও প্রাসাদসমূহের পরিবর্তে নগর-প্রাচীরের বাহিরে স্থাপিত 'রেনাসেন্স'-সৌধমালা নির্মিত হইতেছিল। মহাবুরেন্সের চূর্ণ-মধ্যে যে সমস্ত প্রাক্ষর-

কৃত্রিম প্রাপত্য-শোভা হইতে বহুতর মনোরম।" তবে পাছ-পাশে পাটাইয়া যোগ্য কবির উৎকর্ষ, অল্প যে কোনো নিমক-বোঝাট মত, রূপবর্ণের প্রতিভার তাৎক্ষণিক উপর নির্ভর করিত। লক্ষণ লক্ষ্যার্থে এই বিষয়টা নিঃসন্দেহরূপে ইটালিতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। এবং সে যুগে তলতি ও উদ্ভাবন-শিল্পী যথার্থে বহু ও দৃষ্টান্তসমূহকে আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইয়া অটালিকান্তিক উদ্ভাবন, ও উদ্ভাবনগণকে অটালিকার



কৃত্তবনের প্রবন্ধ

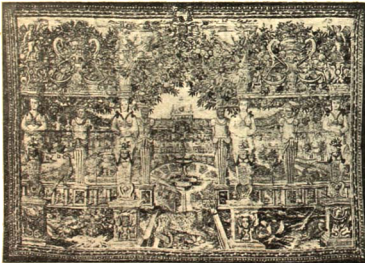
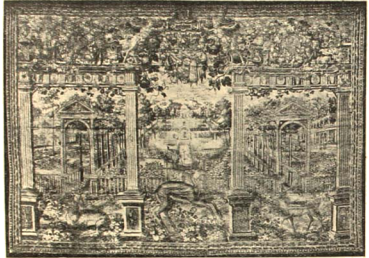
টুকু উদ্ভাবনগণের একমাত্র স্থান ছিল, তাহার পরিবর্তে পরবর্তী যুগে আদিগ,—বৃক্ষা অটালিকার চতুর্দশক স্থাবর্তী প্রাক্ষর। বৃক্ষ উদ্ভাবন-নিদ্রার সেট কুটির বৈদ্যকাব্য, কৃষিকৃৎকে রমা হইতে রমাতর উদ্ভাবন পরিণত করিবার জন্য পরম্পরের সন্ধিত প্রতিযোগিতা করিতেন। তৎকালীন নিদ্রার স্বভাবসিদ্ধেই মত প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন যে, "উত্তর তরুণতার নিদর্শন শোভা,

যোগ্য করিয়া তুলিতেন। ইচ্ছাকৃত একটা নদীনা পাঠকেরা দেখেই ছোট্টে দেখিতে পাঠবেন।

পুঙ্খোক্ত কারুণগুলির ভিত্তি এই কালসমূহ এমন মনোহারা। উদ্ভাবনের পরিচয়না, কারুণকতা, শিল্প-দৃষ্টিতা, দৌলদা-বিজ্ঞান, দৃষ্ট চমৎকার উদ্ভাবনের প্রাচলিগণিত দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে রেনাসেন্সের যুগে ইটালির ধনী ব্যক্তিগণ উদ্ভাবন উদ্ভুক্ত বা ডায়নের দ্বিত



ନିକ୍ଷାୟେ ଉଦ୍ଧାନ-ମୋଡ଼ା ବିରୀକ୍ଷଣ କରିତେନ, କାଞ୍ଚିନେନ ଶାମ୍ବୁତଳା ବାଲିକ-ମାତୃହ ସମ୍ପ୍ର-ସୁସନ୍ଧା-ସାପ୍ତିତ ଉଦ୍ଧାନ-ଝେଡ଼ୁଲି  
ତାହାଏ ମାତୃତ୍ବେ ବାଲିକା ମାନେସେକାରେତ ତିହାରୀ ଏହି ନକଲ ମାଟିତେନ ।



ହୃଦୟବନ୍ଧେ ମନମୋହନ ବୃକ୍ଷ

## অল্প চিকিৎসা সঞ্চরীয় প্রাচীনতম নিপি

মানবিক চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্যভ্রম উন্নতির দূশে আত্মবোধ মনে তখনও কি এই প্রশ্ন উদয় হয় যে কোন্ দূশে, কাহারও চিকিৎসাশাস্ত্রে সঙ্গী প্রথম সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল? এই জাতীয় সংবাদ অন্বেষণার্থে সময় অতিবাহিত করাকে আমরা নিত্যস্তুই সময়ের অপব্যবহার বলিয়া মনে করি। এই বিবেচনা শুধু অসংসর্গ হইলে আমরা যে অনেক লক্ষ্যের কোতূহলোদ্ভীক তথা আবিষ্কার করিতে পারিতাম তাহার লক্ষ্য নাই। প্রকৃত বিজ্ঞানসাতী য অঙ্গসঙ্কীর্ণতায় লিপ্ত হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকার ভ্রমণের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া বাইতেছে। ভ্রমণেরই প্রাপ্যতা পরিভ্রমের ফলে জানা গিয়াছে যে, প্রায় পাঁচ ভাগের কংসর পুঙ্গু প্রাচীন মিসরবাসীরা অল্পচিকিৎসা শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যলোকের যুগলপদ অনেক শিক্ষাভিমানে চিকিৎসকেরা তর্কের বাস্তবে পাশ্চাত্য ডেবল-শাস্ত্রের বহু পুঙ্গুই আনুপঙ্গু শাস্ত্রের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন হটে, কিন্তু অল্প-চিকিৎসা যে অতি-আধুনিকতম বিজ্ঞা এবং ইউরোপের আমদানি, ইহার বাস্তবে কোন কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এই কারণে যে একান্তই সমাচ্ছক তাহা প্রাচীন মিসরের অল্প চিকিৎসা সঞ্চরীয় বে নিপি আবিষ্কার হইয়াছে তাহার পাঠোচ্চার হইতে বৃকিতে পারা যায়।

যে সময় পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, শিক্ষা দীকার নাম মাত্র ছিল না, এমন কি লম্বা গঠন পর্ণাঙ্গ হয় নাই এবং একেধাচিত ভাবে কামাতি-পাত করিত, তাহার বহু যুগ পুঙ্গুই মিসরবাসীরা জ্ঞানে, পরিমার্গ ও সঙ্গী প্রকার বিজ্ঞার অঙ্গীলনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার জুরি জুরি প্রমাণ ক্রমশঃ যুগের লক্ষ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। জোশিথ ও অফ্রান্সের 'ইউজিড', হুগলি-বিজ্ঞার 'ইন্সট্রাক্ট' যে লক্ষ্য-প্রদর্শক তাহা লক্ষ্যবোধসম্মত; অধুনা অঙ্গলজ্ঞানের ফলে জানা গিয়াছে যে 'ইন্সট্রাক্ট' হুগলি বিজ্ঞা বাস্তবিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গী ও বিশেষ যুগলপদ ছিলেন।

পৃ: পৃ: ২৮০০ বঙ্গের পুঙ্গু জোশিথ 'মেমোরিওর' মনে একদিন মেমোরিওর লক্ষ্যবোধ সমাধিগুণের লক্ষ্যবোধ করিতেছিলেন সেট সময় ভ্রমণের প্রায় অতঃপ ওরেশ্বকীত হইয়া বিশেষ অঙ্গল হইয়া পড়েন এবং লক্ষ্যে যুগলপদে পড়িত হন। সেট সময় জোশিথ চিকিৎসাশাস্ত্র সঞ্চরীয় পাঠোচ্চার আনোটা তাহা হইতে রোগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, এ বিবেচনা করা ওরেশ্বকীতের কংসর নির্ণয় আচ্ছন্ন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেট সময় চিকিৎসাশাস্ত্র সঞ্চরীয় প্রকাশিত হইয়াছিল, যদিও সেট পুঙ্গুই আনুপঙ্গু কোমোটি লক্ষ্যে পড়িয়া পাঠোচ্চার দায় নাই। পিরামিড যুগে



পৃ: পৃ: ৩০০০ হইতে ৩৪০০ বঙ্গের) ভেরি বিজ্ঞার ও অল্পচিকিৎসা যে অনেক উন্নতি লাভ হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। সেই সময়ের একটি ভ্রমণের চ্যত পাঠোচ্চার, তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক পাঠোচ্চার দায় যে, ওরেশ্ব-কীতের নিম্নে যা ওরেশ্ব চিকিৎসক সেট ভ্রমণের ভ্রমণের চ্যত হইয়া কংসর পুঙ্গু বাস্তব করিয়া গিয়াছিলেন। জোশিথের রোগত্বকালে চিকিৎসকের চিকিৎসাশাস্ত্র সঞ্চরীয় বিশেষ বিশেষ অঙ্গলপদ করিবার বহু লক্ষ্যে দেখা হইত। ওরেশ্বকীতের বহু এইরূপ নানা বিজ্ঞা চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন, ওরেশ্ব ভ্রমণের পাঠোচ্চার



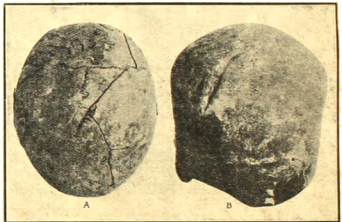
সৈতা মানবের কৌশলি বলিয়া  
না।

লিপিতে উহা কোন স্থানে লেখা হইয়াছিল এবং উহার  
কিছুর কোন উল্লেখ নাই। পূঃ পুঃ  
ত্রিংশ শতাব্দীর প্ৰগতি বিচার ও চিকিৎসাশাস্ত্রে দলপ্ৰথম  
অভিজ্ঞ ইম্ব্রোটেক্টাই যে উহার চরিত্র। তাহাও সঠিক বলা  
যায় না, যদিও রচনা হইতে উহা বেশ বৃদ্ধা বয়সে তিনি  
তৎকালীন ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অভ্যাসিক মনোযোগী  
ছিলেন এবং তাহাকে প্রকৃতপক্ষে এই সব ব্যাধির নামকরণ

পরীক্ষিত, অস্থিত ও নিদানশাস্ত্রের  
বহুবিধ লক্ষের দলপ্ৰথম পক্ষকাণ্ড  
উহার করিতে হইয়াছিল। এই  
কল্প চিকিৎসাশাস্ত্রের জটিল ব্যাপার-  
গুলিকে সোজাশুষ্ক বৃদ্ধাইতে গিয়া  
তাঁহাকে সাধারণ পারিশাস্যিক  
অনিষ্টের সহিত তুলনা করিতে  
হইয়াছে : বলা মাথার ঘিলুর  
কুণ্ডলিতাবস্থার সহিত শতুমণের  
উপরিস্থিত সমকৃত্তিক কোটকগুলির  
সহিত তুলনা করিয়াছেন। চোখের  
হাড়ের দুই পার্শ্বস্থিত বিন্যাসবিশিষ্ট  
উচ্চাংশটি বাহা পশ্চাদ্বির নিয়কোটরে  
গিয়া পশ্চাদ্বির সহিত মৃত্তকর উচ্চাংশে  
দুইটি নথবিশিষ্ট শাবী গদি পশ্চাদ্বিকে  
ধরিয়া থাকে তাহা হইলে যেমন দেগাথ তাহার সহিত  
তুলনা করিয়াছেন। কোনও জলজ কোষপুকে জমাট  
কোষের আঁশের মত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মাথার  
ঘিলুর উপরিভাগে কোন ছিদ্র হইলে উচ্চাংশে মাটির  
কলসের ছিদ্রের অনুরূপ বলিয়াছেন। এই প্রকারের  
তুলনামূলক কথা গিয়া এই সব জটিল ব্যাপারকে বৃৎ  
মহলভায়েই ব্রূকন হইয়াছে, ইহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার  
পরিচায়ক।

কবর খনন করিয়া এক স্থানে প্রায় পাঁচ হাজার  
মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে শতকরা প্রায় তিন

চারিভনের কোন না কোন গাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার যে  
হাতার চিকিৎসা করা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বর্তমান  
করিয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসা লব্ধীর প্রায় তেত্রিশ প্রকারের  
বিষয়ের বর্ণনাময়। এই প্রাচীনতম লিপিতে দেখিতে  
পাই। মাসেলপেল ও মাসেলত লব্ধীর জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য  
লিপিবদ্ধ আছে। পুত্র নিদানন ও কন্ত সাগাইবাব কল্প  
আজমিক অস্ত্রতত্ত্ব ও শরীর বিজ্ঞানের মধ্যে আলোচনা  
করিতে গইত। মাসেলপেল ও মাসেলত লব্ধীর জ্ঞানের  
বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিয়া উহাও বেশ বৃদ্ধা বয়সে যে সেট



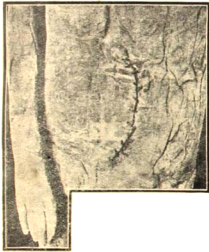
A.—কন্ত আরোগ্য ৪৪ নাই

B.—কন্ত আরোগ্য হইয়াছে

চিকিৎসক লব্ধবাক্যেরও ব্যবস্থা করিতেন। মস্তিষ্কই যে  
বৈদিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কার্যের পরিচালক ও কেন্দ্র-  
বিশেষ তাহার বিষয়ও আমরা দলপ্ৰথম এই লিপিতে উল্লেখ  
দেখিতে পাই। মস্তিষ্কের আঘাতের সহিত নিরাসের  
পক্ষাঘাতের যে অনিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং প্রাণিগত কেন্দ্র  
কত্রিয়া যে একটি তদনুসঙ্গী মস্তিষ্ক আছে ও জংশিও  
স্বাভাবিক অবস্থার না থাকিলে তাহার ফলাফল যে তাহা  
হইতে পূরে অবস্থিত যে কোন পরীক্ষার উপর প্রতিফলিত  
হয়, এই সফল তথ্যের উল্লেখও লিপিতে পাওয়া যায়। বান-  
চুত অস্থিক বহুদানে পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত তাহাকে চন্দ্র-

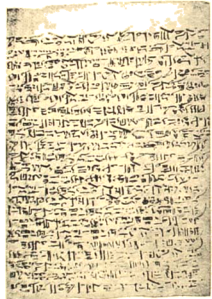


কৌশলের সাহায্যও লইতে হইয়াছে। এই বিষয়ের একটি প্রাচীন চিত্র পরবর্তী পৃষ্ঠে গ্রাসে পাওয়া গিয়াছে। চিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, চিকিৎসক অতি বিবেকপূরক সজ্জিত স্থানিক্রান্ত রোগালের চাককে বহুদানে পুনঃস্থাপন করিতেছেন। কতকান দেগাট করিয়া মিলে যে তাহা নীর অরোগ্য হই এ মন ও তাঁহার জানা ছিল, এবং যেখানে দেগাট অদৃষ্ট সে স্থানটী অধুনা-বাবলত 'O. O. Adhesive Plaster' দ্বারা প্রায় কাশকের উপর চটচটে পলতরা লাগাইয়া কতক উপর লাগাইয়া দিতেন।



লিপিবান্ধির প্রত্যেক অংশে অতি বস্তুর সজ্জিত একটির পর একটি যোগেৎ বিধর বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। রোগের নাম লক্ষ্যপ্রকার উপরে লিখিয়া তারের রোগকে পত্রাকার কলে যে সব বাহ লক্ষণাবি পাওয়া গিয়াছে তাহার

বর্ণনা কেওয়া আছে এবং লক্ষণেরে রোগ নির্ণয় করা হইয়াছে। কাকেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পাট হাওয়াৎ বৎসর পূর্বের মিলত্বাধীরা সমাজবহুতাবে বাস করিতেন এবং প্রায় লক্ষ্যপ্রকার বিধা ও বিজ্ঞানে শাসনশী ছিলেন। পরবর্তী পৃষ্ঠে পুঃ পুঃ প্রায় ৩০০ পত্রাকার সমর গ্রীসবাসীরা আলেকজেন্দ্রিয়া দ্বারা এতটী বিখ্যাত



অন্তর্ভুক্তিৎসা লক্ষণীয় প্রাচীনতম লিপি

আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় বুলিয়াছিলেন এবং প্রাচীন মিসর-বাসীভের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর অনেক কিছু উক্ত লিখন করিয়াছিলেন।

ঐশ্বরিয়াতকুমার বসু



## বনভোজন

জীঅক্ষয়কুমার সরকার

৮

চক্কিনের গায়ে শীত কটে না।

রাতি তখন ঘোটে নয়টা। কিছু ভাঙা ভাতের কল-  
পুষ্টির আধারে তাহাকেই বৈদ্য মনে করিয়া সপ্ৰাণতৃপ্তিশীল  
আগন্তুকতা গ্রাহ লক্ষ্যেই চলিয়া গেল। তখন ঘরের  
ভিতরে প্রদীপের মিউসিকে আলোকে বিভা ও অতুলের  
মা ঘোড়ার গুপ্তবা করিতেছিল, বাহিরে নব চাঁদাল  
অন্ধকারে বসিয়া তারার দলি ছ'কাটিত তামাক খাইতেছিল,  
এবং চেষ্টা একটু দূরে বসিয়া কি ভাবিতেছিল।

চাঁদ একবার বায়ুমহাশয় লক্ষ অকস্মাৎ কিরিয়া আনিলে  
তিনি বিভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মা, একবার আমার  
বুকে আঁহ!” তারার পর তাড়াতাড়ি ডান হাত দিয়া  
বুকে চাপিয়া ধরিয়া যেন তারার স্পর্শের সিন্ধু প্রাণে  
আগ্নার সর্বাঙ্গের তীব্র বহুলা শক্তি করিয়া রাখিতে  
চাহিলেন। তিনি কি যেন একটা উপদেশের কথা বলিতে  
খাইতেছিলেন, কিন্তু তার উচ্চারিত হইবার আগেই  
অসহনীয় বহুলায় পুনরাব্রমণে “কখন যেন হবে মা?”  
বলিয়া একটা আর্ন্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার জ্ঞানহারা  
হইয়া পড়িলেন। বিভার মাথাটি তখনও উঠার বুকের  
উপর ছিল, এবং বেধ হুগ, সমস্ত দিনের মধ্যে এই প্রথম  
তারার চক্ষু কাটিয়া গল বাহির হইয়া তারার আকর্ষণ আশ্রয়  
হল সেই পুরাতন ঘেরপূর্ণ বুকেই তালাইয়া দিল। বিভা  
তারার বিমার বহুলায় তীব্রতা সমস্ত দিন ধরিয়া অতুল  
করিতেছিল, কিন্তু এখন তারার দেহ সেই বেক-  
সরীর বুকের দগ্ধিত সংলগ্ন ছিল বলিয়াই তারার এই  
মুহুর্তের আর্ন্তনাদ বিভার শব্দে একটা তড়িৎ-শল-  
লপে সেই বাতনায় তীব্রতার পরিমাপ তারার  
মর্মেই ভিতর লম্বাকরণে অঙ্কিত করিয়া দিল।  
একবার মাত্র কাণ্ডর টাংকার করিয়া উঠিয়া

বিভা অকস্মাৎ তরু হইয়া গেল। বাহিরে নব  
চাঁদাল আগন্তুক ঘরে বলিয়া উঠিল, “কি হ'ল দিদিমনি!”  
এবং বেধের তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া  
পড়িল।

মুহুর্তের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া “কিছু  
না” বলিয়া হেমন্তের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিভা শব্দে  
দৃঢ়তার ঘরে তাড়াতাড়ি বলিল, “আমার সঙ্গে একবার  
বাইরে এল ত, তোমাকে একটা কথা বলব।”

বাহিরে গিয়া সে বলিল “যেন আমায় বড় নিঃশব্দ।  
কোন উপায় নেই ব'লেই তোমাকে একটা অস্বাভাবিক ক'ব্বি।”  
“কি ক'ব্বতে হবে বল?”

“তোমাকে একবার হরিপুরের ম্যানেজারের কাছে যত  
হবে। আর লেশমানে ম্যানেজারকে আমার নাম ক'রে  
বলতে হবে যে, আমাদের এই বিশেষে তিনি যদি চেষ্টা ক'রে  
জেলার বড় ডাক্তারকে আনিবে যেন—তা হ'লে” একটু  
শাখিয়া বলিল, “তিনি যা চান তাই হবে।”

“হাছ!” বলিয়া হেমন্ত তারার বুকের উপর দৃষ্টিপাত  
করিতেই দেখানে এমন একটা কিছু দেখিতে পাইল যাহাতে  
সেই চিরকণে ডানপিটে ছেলেটিকেও কয়েক মুহুর্ত  
তরুভাবে পাড়াইয়া থাকিতে হইল। তারার পর সে  
বাহিরে আসনার খুশান তারার কোটটি পরে বিভা,  
একটা বাঁপের ছোট গাতি হাতে লইয়া যখন তারার  
দখলা পথে যাত্রা করিতেছিল, তখন বিভা হারিয়ে  
লটনটা ঘর হইতে বাহির করিয়া নব চাঁদালকে  
বলিল, “তুমি এই আলোটা নিবে এর সঙ্গে বাও ত নব।”

“কোথায় দিদিমনি?”

“হরিপুরের কাছারিতে—”

অতিমাত্রায় বিদগ্ধ হইয়া নব বলিয়া উঠিল, “হরিপুর  
এই রাতিতে!”



বিভা একটিনাত্র কথার উত্তর দিল, “হ্যাঁ।”

“কিন্তু নবী যে তিন গো দিদি। বৌকা নেই, পর হ’বার উপায়—”

হেমন্ত তাহার কথার বাক্য নিঃ। বলিল, “এম, তাঁতার ভান ত।”

বিভা একবার শিরিষা উল্লিখিত হেমন্তের মুখের উপর চাহিয়া বলিল, “কাজ নেই তবে।”

নব বলিল “মাথার মাথা নই। আমি বানের জোরে বড় পড়লে কুটি কুটি হ’বে যাচ্ছে।”

হেমন্ত গলনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, “আমি চললুম। কিন্তু রাগাতি: ত জানি না। একটু ব’লে দিতে হবে, নব।”

পরের ভিতর হঠাৎ বাসুনমার কণ্ঠে স্পষ্ট স্বরের আওয়াজ শািল, “বিভা, মা আমার, কোথায় গেলি মা?”

অতুলের মা ভাড়াভাড়া ভাঙকে ভাঙিতে আসিতেছিল। কিন্তু তাহার আগেই বিভা একহকম ছুটিমাই ধরে ঢুকিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “হেমন্ত কোথায় মা?” তাহার পর অতুলের মাকে ভাঙিয়া বলিলেন, “ভাঙে একবার ভাঙ ত অতুলের মা, আর তুমিও শোন আমি যা বলি।”

হেমন্ত আসিয়া কাছে ঝড়োঠেই তিনি ইকিতে তাহাকে পাশে বসিতে বলিয়া তাহার হাতটা টানিয়া আনিয়া আপনায় বুকের উপর রাখিলেন। তাহার পর অপর পাশে উপসিত। বিভার হাতখানি লইয়া হেমন্তের গাঠের উপর রাখিয়া বলিলেন, “অনেক কথা বুঝিবে বলতে হয়, কিন্তু তার সময় নেই আমার সামর্থ্যও নেই, এবং হয় ত বা তোমরা সব বুঝতেও পারবে না। তবু যা পারি তা বলছি। তুমি আমাকে ক’টি দিতে পারি, যথা। তোমার কাছিনী তুমিই আমি তোমাকে ধরে ফেলছি। তুমি ওহকম ক’রে পুছোনে। কথার কোঁকুশী না হ’লেও, তোমার চেহারা, তোমার ঐ মুখের, বিশেষত নাকের পড়ন দেখালে যারা দেখেছিল তাদের মনে ক’রে দিতই দিত যে রাগগোষ্ঠি, বহুদায়ের, পরায়ের ছাপ তোমার দেহের উপর আছে। বুড়া নন্দীমুখা লম্বা—যাক সে কথা। এতদিন পরে তুমি

যে কি মনে ক’রে এট গায়ে তোমাদের পড়ো ভিটার এলে অশ্রুটান ছাড়িয়ে তা তুমিই জান। আমার কিন্তু কেবলই মনে এছিল এতদিন পরে ঐস্বর এ অদ্ভুত সংঘটন ঘটলেন কোন উদ্দেশ্যে। একটা বড় আশা এছিল, আমার তাঁর পরে অনেক যোগ্যবিধও দেখছিলাম। বিভা হয়ত তোমার চেয়ে বয়সে একটু বড়—তা তুলীনের ধরে মমম অনেক হয়—আমি নিজে দেখেছি। তারপর তোমার হয়ত চালচলো নেই—হয়ত বা বিয়ে সাধিও নেই। কিন্তু তোমার যে বুদ্ধি আছে তোমার যে জবর আছে, তোমার ভিতর যে অনেক মিষ্টি জিনিষ ভাল জিনিষ আছে, তা তোমার মূখ দেখে আর এই চার দিন একগুণে বেশে যে না চিন্তে পারবে সে অক্ষ। লোকে বলে পার্বতী বাসনি মূখ দেখে মাংসের মস্তুরের কথা বলে দিতে পারে। তোমার সম্বন্ধে অল্পট: আমি যে ভুল করিনি—যাক সে কথা। সব চেয়ে বড় বাণা ছিল যদি তুমি থাকার না কর, আরও একটা বড় বাণা, বিজার।” হঠাৎ বাসুনমা একটু ধামিকা গেলেন। ভরত বা বরণার একটা নতুন তাঁরতা তাহার মস্তিষ্কে দাঙ্গল আঘাত করিল। আমার বলিতে লাগিলেন, “তারপর বুড়ো মস্তাশ নুপায়ের কথা। যা সম্ভব নয় তাও। বিভার বিরের কথা বহু’ল ধরে ভেবে ভেবে, বহু’রানে হতাশ হ’রে আমার মস্তিষ্ক হ’বার উপক্রম হয়েছিল। তা’ না হ’লে আমার অমন যোগী-প্রতিমা মাকে বিশুদ্ধন দেবার—” অল্পের ভিতর চইজন আগন্তকের ছায়া পড়িতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “করা তোমরা?”

অতুলের মা চাঞ্চিা দেখিয়া বলিল, “বিজার সেই আর তার বর।”

আনন্দের স্তম্ভেত বাসুনমার চক্ষু ছইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি যে হাতটি দিয়া বিভা ও হেমন্তের মলের কম্পান বেরদিত হাত ছইটি আপনায় বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হাতটি তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া মুহুর্তের মধ্যে আঘাত পূর্ণের তাবে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, “তপবানের বরা! মাঃ মা, এম বাবা। তোমরাও পাশী—” একটু জ্ঞান হাি হািিয়া তাগাদের

দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, “বিভাগ বিধে—এই  
গতিভাগ বিধে—মনের বিধে—বাইরের বিধেটা—”

বিভাগ দৃষ্টি অক্ষম্য একবার হেমন্তের মুখের উপর  
পড়িল, এবং তাহার পরেই তাহার কণ্ঠ হইতে দৃঢ় শব্দে  
উচ্চারিত হইল “কি মা!”

“হাঁ মা! মনকে কঁাকি দিও না। আর তুমি ত সে  
মেয়েও নও মা! যা সত্য যা উচিত তাতে লক্ষ্যও  
নেই—দোষও নেই—তা তুমি ত আমার চেয়ে কম  
জান না মা—”

“তোমার পায়ে পড়ি কি মা—এমন কাত তুমি ক’রে  
ওও না—এমন ক’রে তুমি আমাকে বেঁধে ফেলে—”

কি মার চক্ষুর আনন্দের তুলি অস্তিত্ব হইয়া সেখানে  
একটা নিরাপার ছায়া আদিয়া পড়িল। কিন্তু বিভাগ  
মুখের দিকে আর একবার চাহিবামাত্রই তাহার চক্ষুর  
দাপি পুনর্বার কিরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তত  
ঘরবার মধ্যেও বদনমণ্ডলে দৃঢ় অঙ্গভঙ্গ্য উপর হইল।  
অঙ্গভঙ্গ্যে বলিষ্ঠ উদ্ভিলেন, “যা ভয় হইছিল, তা ত নয়।

অনিচ্ছা নয়; লজ্জা, লজ্জা, তাও নয়। তবে—  
হাঁ হোক—ভাববার ত আর সময় নেই।” একটু খামিয়া  
কি ভাবিয়া লইয়া আবার বলিলেন, “হেমন্ত, তোমা-  
কে আমি বিভাগে দিবে সেলাম। পুঙ্কট এখন মস্ত  
লড়লে না খেটে, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি মস্ত  
ল’ড়ে তোমাদের এই বন্ধন অচ্ছেদ্য ক’রে বাছি। বিভা  
যে কারণেই বাই বলুক, তোমার দাবি তুমি ছেড়ে না।  
তাতে তোমার পাপ হবে, পৌকষের দানি হবে। বিভাগে  
তুমি পতিতা হ’তে,—বিচারিণী হ’তে—”

মুখের কঠোর এই উত্তেজনার মস্তার বাণীতে সেই  
গৃহের কণ্ঠটি শ্রাণিষ্ট তখন বোমাকিত হইয়া  
উদ্ভিগাছিল। বাবু মা হৃৎস্তের গভ্র মস্তমস্ত হইয়া  
আবার বলিতে লাগিলেন, “তোমরা স্ত্রী হ’বে, আমি  
মামুলিগাম কর্তি। অনেক আপত্তা হয়েছিল। এত  
ঘরবার মধ্যে কেবলমাত্র একটি চিঠি আমার সমস্ত  
মনকে ধবল ক’রে ব’লে ছিল। কি যে কর্তব্য তা’  
ষ্টিক ক’রে উঠতে পারছিলাম না। তারপর অক্ষর আসে

যেন তত্তার মত এগেলি আর তারই মধ্যে  
আমার মস্তের দেহতা যেন আমাকে বলেছিলেন—  
সত্য বলগো! এমন মহাপাপ তুমি করিস্ নে—যেন তুমি  
যেটোকে আশ্রয় মল্লত আশ্রয় বলগো—  
তারপর আর আমার একটু খামিয়া, বোধ হয় তবুই পাত  
ঘরবার তাঁরতাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, “অতুলের  
মা, তুমি আমার পেটের মেয়ে নও কিন্তু তার চেয়ে  
কমও নও। তুমি এদের বিপদে আপদে দেখো, আর  
যাতে মস্তরাটা পড়া হয়, সামাজিক ক্রিয়াটা—” দেউ লম্বা  
বিভাগ সেইদিক দৃষ্টি পড়তে তাগকে বলিলেন  
“সুতরাং, মা, তুমি আর বিভা কি-এক নও জানি—  
তোমাকেও বলি তোমার বরকেও বলি, তোমরা  
আমার এই সম্মতানের সাক্ষ্য রটলে, দেখো যেন পাগলতা  
বামনীর এট দান অক্ষর থাকে। সার্বিক হয়।” আবার  
অতুলের মাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন “গরি তেমন  
বাবাযি কিছু দেখ, কাগাঘাটে আমার শিখাঝড়—”

বোধ হয় হঠাৎ ঘরগাটা একবারে অন্ধ হওয়া  
একটা আশ্চর্য্য করিয়া বাবু মা আবার অচেতন হইয়া  
পেলেন। তবুই যে হাতটি একান্ত আশ্রয়ে বিভা এবং  
হেমন্তের সংলগ্ন হাত দুইটি এতক্ষণ পরম প্রিয় সামগ্রীর  
মত ভবনের উপর চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহা শিথিল  
হইয়া পড়িল। বিভা তাহার হাতটি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া  
গাড়ীল এবং হেমন্তকে চক্ষুর ইঙ্গিতে তাহার সহিত  
বাহিরে আনিতে বলিল। হেমন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ  
বাহিরে আনিতে আনিতে গুনিতে পাইল, “নয় মায়া,  
তুমি কি এর সঙ্গে হরিপুরে—”

“দরকার নেই। রাত্তির কথাটা বলে দিলে আমি  
একাই যেতে পারব” বলিয়াই হেমন্ত উঠানে কিছুক্ষণ অ’গে  
পরিভ্রমণ আলোটা এক হাতে আর লাঠিটা অপর  
হাতে তুলিয়া লইয়া বাইবার উপক্রম করিল; তারপর  
হঠাৎ একবার কি ভাবিয়া বিভাগ চক্ষুর উপর দৃষ্টিপাত  
করিয়া নিজস্বা করিল, “সত্য বলগোকে কি বলবু?”  
সেই সময়ে বিভাগ চক্ষুর অবাচ্যাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার  
নয়নে পতিত হওয়াতে তাহার দৃষ্টি লজ্জাতে নত হইয়া গেল,



অতুলের মা আশিষা বলিল, “বিভাদিনি তোমাকে ডাকছে।” হেমন্ত ঘেঁষে ওই দিগন্ত সার্কেলের গণনামান দৃষ্টি হঠাৎ অন্যত্র পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল।

রাগাচরের ঘরে বিভা গাড়াইয়াছিল। একটা গাফুর উপর গামছা এবং পুরম সরিষার তেলের একটা মাটি ভাণ্ডার পারের কাছে রাখিয়া মুচবরে বলিল, “আমারও সময় নেই, তুমি পাটা ধুয়ে একটু পাহরে—” অতুলের মা একখানা শুকনো কাপড় হাতে করিয়া আশিষা গাড়াইতেই তাহার কথা মাটুকাইয়া গেল। কিন্তু তাহার পূর্ণেই হেমন্ত সেই তরুণীর চক্ষুর উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখানে এমন একটা অতুলনূতপুর্ণ নারোঃসের সিদ্ধ যশুঃতার আশ্রয় পাইল যে, তাহার প্রকৃতি সে ঠিক ধারণা করিতে না পারিলেও, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা পুণঃস্বপ্নের যশুঃস্মৃতি পরিতৃপ্তিতে একান্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বিভার চক্ষুর উপর সলজ্ঞ হৃদয়মাধুরী রাখিয়া বলিল, “তেন কি হবে? তুমি কি মার কাছে বাস? আমিও পাটা ধুয়েই থাকি।”

অতুলের মাকে দিয়া রমণকে ডাকাইয়া বিভা জিজ্ঞাসা করিল, “ডাকার সাহেব কি বলছেন?” রমণ সব কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় হেমন্ত আসিয়া সেইখানে গাড়াইলে বিভা তাহার দিকে একান্ত নির্ভরে চাহিয়া বলিল, “তুমি একবার ডাকার সাহেবকে বল আমার ভিমাকে ভাল করে দিতে।”

তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া হেমন্ত রমণের সঙ্গে রোগীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে কিছুকাল পরামর্শের পর ডাকার বলিলেন, “কোন আশাও নেই। তবে এখন এসেছি যেহেতু কেটে দিয়ে একবার দেখতেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তা হ’লে আর তারও রক্ত থানিকটা শরীরে—”

সাহেব হেমন্ত বলিল, “তা’রলে বন্ধ পাবেন?” ডাকার বলিলেন, “তা’র বিশেষ পদ্ধতিও নেই। তবে আমার ঘরে পাঠে এরকম ক্ষেত্রে চিকিৎসা এইরূপ—”

হেমন্ত বলিল, “তাহলে শীঘ্র বাতলা কখন?”  
“রক্ত কে দেবে?”

যেহেতু সত্য যশুঃস্মৃতির ত্রিধির বা মর্ষের জোরেই শরদিন স্রাভকালেও অক্ষয় পরেই মেঘের স্বাক্ষরা ‘দিগন্ত সাক্ষর এবং তাহার সহকারী আশিষা পৌঁছিলেন। তাইও তখন প্রায় শেষ অবস্থা। হেমন্তের হৃদয়ে বিভাকে সেই সম্মুখানের পর তিনি যে জ্ঞানভারা হইয়া পড়িয়াছিলেন সমস্ত হারির অর বিকার এবং প্রাণের মধ্যে তাহার জ্ঞান আর কিরিয়ছিল কি না কেহ ঠিক বুঝিতে পারে তবে মনেকেই লক্ষ্য করিয়াছিল যে মাকে মাকে তাহার চক্ষু পার্শ্বে উপবিষ্টা বিভার মুখের উপর সলজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়াই বেন আর কাহাকে বুঝিতেছিল কিং তাহার মুখ হইতে কোন জ্ঞানের কথা উচ্চারিত হয় নাই।

দিল্লি দীর্ঘন রোগীক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “এত একমাত্র হ’লে গেছে যে, এখন বাঁচান এক বকস অসম্ভব; সময়ে যদি ঝাটটা কেটে ফেলা হ’ত—” এই সময়ে তাহার দৃষ্টি হেমন্তের উপর পড়াতেই বলিয়া উঠিলেন, “তুমিই কাল রাত্রে আমার কুঠিতে গিয়েছিলে না? বাহাভর ছোঁকরা খেট! রোগী কি তোমার মা?”

হৃদাধিকার স্বামী দেখানে গাড়াইয়াছিল। সে কি বলিতে বাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া হেমন্ত যেন একটা উত্তেজনায় লক্ষ্য বলিয়া উঠিল, “না, মা নন, কেউ নন।”

স্বচ্ছ ডাকার হঠাৎ উঠিয়া গাড়াইয়া হেমন্তের কাছে সরিয়া আশিষা তাহার মুখের উপর কিহৎকালের মত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, “শরের মত মানুষ এতটা কয়েত পারে!” তাহার পর তাহার দৃষ্টি হেমন্তের কতবিস্তৃত পায়েটির উপর পড়িতেই তিনি হৃদাধিকার স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “এরও যে ওস্তাদার দরকার। এ মহাপ্রাণ কাল সমস্ত রাত ধরে—”

হেমন্ত একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, “তা হ’বে এখন—”

ডাক্তার তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি ? তা তোমার দেরি বলিষ্ঠ। তখন কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখিছি না। কিন্তু রক্তও অনেকটা লাগবে, আর কাল সমস্ত রাত হ’বে তুমি যে পরিশ্রম করবে তা’র ফলে ৩৭ ত বা ৩৮মাত্রেক কিছু দিন অবসাদ থাকতে হবে। হোমিওপ্যাথি কেউ নন তুমি—”

হেমন্ত মুচ হাসিয়া বলিল, “আগনি বন্দোবস্ত করুন।”

বিভা দেখানে পাড়াইয়াছিল বলিয়া ইংরেজীতে কথা চইতেছিল।

হেমন্তের বামহাতের একটা হানে কি একটা ঔষধ লাগাইয়া ডাক্তার তখন তাহাকে হোমিওপ্যাথি পাশে তুলিতে বলিলেন তখন বিভা আন্দর্পা চইয়া রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

রমেশের কথার কারণ অবগত হইলামাত্র বিভার পরেরটা হেন তাহার অজ্ঞাত সারেই কাঁপিয়া উঠিল, এবং সেই ভাবেই তাহার মূৰ দিয়া বাহির হইয়া গেল, “রক্ত বিতে হবে!”

মুহূর্ত্ত মনোই কিন্তু সে বেশ বীরত্বের সজ্জিত বলিল “কিছু এর রক্ত কেন ? আমি ত রক্তচিহ্ন।”

হেমন্ত অতুলের মাকে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গাইতে বলিল। সে কিন্তু হেমন্তের দিকে চাহিয়া বলিল, “তুমিও একটবার আমার সঙ্গে এস।”

তাহার বাহির হইলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “যেহেটি ছেলেটিতে কি সম্পর্ক ?”

রমেশ একটু দ্বন্দ্বভরে হাসি হাসিয়া বলিল “কি বল ? ইংরেজ হ’লে বলুতুম Pioncee ( বাগ্‌ম্যান )”

ডাক্তারও একটু হাসিয়া বলিলেন “ও, বুকেচি, কিন্তু বয়স ত প্রায় সমান। তুমি ? না, পইতে রক্তেচি যে—”

বিভা বাহিরে হেমন্তকে বলিল, “রক্ত আঁমি দেব” এবং হেমন্তের মূখে একটা প্রতিবাদের আভাস মাত্র পাইয়া অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তুমি কোথাকার ? পর ! তাহার রক্ত আমার কিমা’র পবিত্র দেহে—”

“আমি ত আর এখন পর নই, বিভা, ত্রি, মা ত কাল রাহিতে আত্মীরেই অধিকার—”

কথা শেষ চটবার আগেই অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘরে ঢুকিত হইয়া হেমন্ত তাহার সম্মুখস্থিত তরুণীর মূখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাউল যে, তাহার সে মস্তক হেন একটা বিশিষ্ট ভাবে—তপাল, তাজীলো বা বিবস্ত্রিত অবস্থা ই হিন্দুগণই সংমিশ্রণে ভরিয়া উঠিয়াছে, — এবং তাহার নৈত্র গুটিই কোথায় ক্ষীণ এবং উজ্জ্বল চইয়া উঠিতেছে। স্তম্ভিত হেমন্তের কর্ণে প্রবেশ করিল, “তুমি এত ছীন, এত নিলক্ষ যে, আমার এই মহাবিশ্বনের কাণে, আর মূর্খু কিমা’র কথা আমি না-কহুত পারবনা কোন, তা’র বিচারের ফাঁকের একটা অর্ধহীন উজ্জারবের বলে আমাকে বাধুত আসচে।”

কথাগুলি বলিতে বলিতে কেন যে তাহার চক্ষু গুটিই জলে ভরিয়া আসিল তাহা বলা শক্ত। কিন্তু তাহার পরেই হেমন্তের মূখের উপর তাহার স্তম্ভিত পড়িলামাত্র সে যে কাণ্ডটা করিয়া বলিল তাহা মানক-বুদ্ধির একবারেই অযোগ্য। বিভা চোখে ছাঁটু পড়িয়া বলিয়া পড়িয়া হেমন্তের পা ত’য়ানির উপর তাহার মূখটি রাখিয়া চক্ষুর জলে তাহা ভালাইয়া কিবা কৃত-প্রস্তর মত বলিয়া উঠিল, “আমাকে মাপ কর, মাপ কর—” কিন্তু তাহার সে মনের ভাব মূহুর্ত্তর মধ্যেই আবার অস্বস্তিত হইয়া গেল, এবং যখন হেমন্ত তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইল, তখন সে পুকের মতই স্পষ্ট এবং বর্ণ-পূর্ণ মূখে বলিল, “আমার কিমার দেও আমারই রক্ত দাবে, আর কারণও নহা।” হেমন্ত কি বলিয়া প্রতিবাদ করিবে তাহা স্থির চটবার আগেই বিভা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া ডাক্তারকে বলিল, “রক্ত আমার দেহ থেকে নিন্।”

সেখানকার লক্ষণের আত্মরিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহার পদ অক্ষুর হইল। তাহার মূৰে সবল বেগ চটতে রক্ত লইলে তাহার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাট জানিয়া ডাক্তার তাহাতে মত দিলেন।

## পুস্তক সমালোচনা

**শ্রীঅরবিন্দের গীতা**—১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ; শ্রীঅনিলবরণ দ্বারা অনুবৃত্ত। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ দ্বারা, গুইর, কৈমর শোং, বর্ডমান। ১৮ পৃষ্ঠা। ডা. ক্রো: ১৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১১০ টাকা।

শ্রীঅরবিন্দের গীতা আমাদের দেশের পৌরব শ্রীহুক্ত অরবিন্দ দ্বারা কর্তৃত্ব লিখিত Essays on the Gita নামক ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। শ্রীহুক্ত অনিলবরণ দ্বারা পুনরী প্রাচল্য তাহার এই অনুবাদ করিয়াছেন, যদিও ইহা অবিদল অনুবাদ তথাপি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একখানি উপদেশের মৌলিক গ্রন্থ পঠন করিতেছি। ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অনিলবরণ সত্যের ও সত্য লক্ষ্যে লিখিয়া থাকেন, তাঁহার লেখা বখাযোগা অল্প ভিত্তির পরিশূর উক্ত সাহিত্যিক শক্তি ও উদার ভাবের পরিচায়ক।

গীতা তিনখণ্ডের দ্বারা। গীতাকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ মনে করিলে ভুল করা হইবে, গীতার ভাব সংস্কৃতমীম। সংক্ষেপে সকল ধর্মের দ্বারা সাধারণ সভাগুলি গীতাকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, যদিও গীতার রচনা-ভঙ্গি সরল ও মনোরম তথাপি যে সব উক্ত অধ্যাত্মসম্পন্ন হইতে গুঢ়ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যিক। এইরূপ দ্বাভাষা গ্রন্থীত পঠকের পক্ষে গীতার বঙ্গানুবাদ পিকা দ্বারা করা সম্ভব নহে। বর্তমান ক্ষেত্রে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন আধুনিক বঙ্গের অধ্যাত্মসাধনায় ভবি, বিখ্যাত শ্রীঅরবিন্দ। তিনি এই মহান গ্রন্থের রহস্যগায় হইতে গুপ্ত অর্থসকল উদ্ধার করিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা পাঠ করিলে গ্রন্থকার অধ্যাত্মবিষয়ের বিশ্লেষণে যে মৌলিকতা ও গভীর অন্তর্ভুক্তির পটভূমি দিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিশ্বস্ত হইতে হয়। আমার কাছে জিনিষগুলি এক নতুন আলাপকে উদ্ভাসিত হইয়াছে; পূর্বে গীতা পাঠ করিবার সময় বাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই এমন

অনেক কথা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে গীতা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে, কোন বিশেষ দত্তবাদের অধীকৃত মতে। কোন কোন বিষয়ে গীতা বেদ, উপনিষদ ও বহুধর্মকে চড়াইয়া গিয়াছে, কেবল তাহাধর্মের শিকার দ্বারাটুকুই নিছের শিকার অধীকৃত করিয়া গিয়াছে। বিস্তারী ধর্মের সকলের গীতা মহান সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছে এবং যে উক্ত স্তর হইতে গীতা সকল বিষয়কে দেখিয়াছে এমনটি আর জগতের কোন ধর্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

জগতের বিভিন্ন ধর্মে যে সব মহান সমস্যা আছে, গীতা অকুচিত ভাবে সে সবের সমুদ্রীন চাইয়াছে এবং গুঢ় ও অগুঢ়ের যে কল চিরকাল দার্শনিকগণকে বিষম সমস্যার কেনিয়াছে, বাহার জন্ত জীর্মান ধর্মকে জগতের উপরে তদ্বান ও সত্যতান এই দুই বিরোধী শক্তির প্রকৃষ শীকার করিতে হইয়াছে, গীতা সে সমস্তার অত্যন্ত সমাধান করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীহুক্ত অনিলবরণ দ্বারা অনুবাদে মৌলিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সরলতা বিস্তারিত আছে। যদিও বিধবস্তুটি পুণ্ড্রী ও আধ্যাত্মিক, তথাপি অনুবাদে গুণে উহা সরল ও সরলবোধ্য হইয়াছে। তাঁহার লেখার ভঙ্গি একই সঙ্গে জগতকে স্পর্শ করে এবং বুঝিতেও আকৃষ্ট করে।

গীতা পাঠ করিতে হইলে এই সারসংগ্রহ হইখানিও পাঠ করা কর্তব্য ইহাই আমার অভিমত। মূল গ্রন্থের সহিত এই অনুবাদটিও যদি পাঠ করা না যায় তাহা হইলে অনেক কথা অস্পষ্ট থাকিয়া বাইবে, আমের গ্রন্থোক্তনীর অনেক প্রকৃত অর্থ হারিতে পাতা বাইবে না। আমার প্রক্ষে আমি দর্শনাত্মকরণের সহিতই বলিতে পারি যে, এই ক্ষুদ্র বাংলা বইখানি পাঠ করিয়া আমার অনেক লাভ হইয়াছে। অনিলবাসু যে কেবল বাংলা

সত্যাতাই সিদ্ধান্ত তাহাই নহে, তিনি একজন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি, তিনি মনোবীর অন্তর্ভুক্তি লইয়াই আমাদের সমাজের ক্রমিক বিকাশ পরীক্ষণ করিয়াছেন। এই বইটিতে তাঁহার সুপরচিত তনোপ্রণালীর মনোজ্ঞতা আছে। আমি আশা করি শ্রীতার প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক যখন অধ্যায় দ্বয় ও নীতি লম্বকে চপড়ের এই প্রের দল্পভটি পাঠ করিবেন, তখন এই মূল্যবান বাণ্যাত্তিও পাঠ করিতে চুনিবেন না।

ঐকীর্ষ্যচন্দ্র সেন

চুই চিঠি—ঐসত্যচন্দ্র বটক এম, এ, বি, এল,

ঐকীর্ষ্য। মূল্য পাঁচ টাকা। প্রকাশক—ঐকীর্ষ্যচন্দ্র চন্দ্রবর্তী বি, এল, ; চন্দ্রবর্তী সারিচা-ভবন বঙ্গবট, পোঃ, ২৪ পল্লবগা।

একখানি গল্প পুস্তক—মুদ্রিত গল্পের সমষ্টি। কথা-সাহিত্যে সত্যপন্থ্য একজন কর্মজীবন লেখক। এ পুস্তকের প্রত্যেক গল্পে তাঁর সুসজ্জিত শির-ব্যবহার পরিচয় বিদ্যমান। গল্পগুলি বিভিন্ন রসপ্রসিদ্ধ বলিয়া পুস্তকটি পড়িতে পড়িতে পাঠক-চৈত্র ধর্ম-বিষাদ-বিশ্ময়-কৌতুক-এ পথে অনন্দময় উৎসবের সহিত অগ্রসর হয়।

পুস্তকটির বাঁধাই ও ছাপা উৎকৃষ্ট; প্রায়শঃ উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

জাপানে বঙ্গমাসী—মোগল-নগিনী দত্ত, এম,

বি, ই, ঐকীর্ষ্য। মূল্য একটাকা। প্রকাশক—ঐকীর্ষ্যচন্দ্র চন্দ্রবর্তী, ২০১২এ, হারিসন রোড, কলিকাতা।

জাপান ভ্রমণ কালে গ্রন্থকারী বৈশ্বাচারী জীবনের যে দিন-নিশি ভুলি গিয়াছিলেন তাহাই একত্র করিয়া এ পুস্তকখানি বিয়চিত। শুধু জাপানেই নয়, জাপান-পথে সিঙ্গাপুর চাফন প্রভৃতি স্থানেরও বহু কৌতুকপূর্ণ জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, গতিশীল,—ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিবিশেষ করিবার শব্দে উপযোগী। এ পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য, বিদেশ বেবিবার সময় সেবিলা তাঁর বদশে কুদিত্য স্থান নাই। মনের মধ্যে বদশে কুদিত্য করিয়া

চক্ষে তিনি বিদেশকে দেখিয়াছেন—তাই যখনই প্রত্যেকজন হইয়াছে তিনি জাপানের রীতি, নীতি, পদ্ধতির কথা বলিতে গিয়া বদশের রীতি, নীতি, পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন। সত্যতঃ বইখানি শুধু উপভোগ্যই নহে, উপকারীও।

বইখানির বাঁধাই সুদৃষ্ট—আয়তন ১৩ পৃ: উ: কা: : ৩১ পৃষ্ঠা, এবং পাঁচখানি চিত্রন এবং ১০ খানি একরঙা ছবি বিরা মুদ্রিত। সে হিসাবে পুস্তকখানির মূল্য খণ্ডেই কম। চিত্রের দ্বিতীয় লঙ্ঘন এবং “সংবাদ নগিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির” তরফে অর্পিত হইতেছে। গ্রন্থকার আশা করি অবিলম্বে এ পুস্তকখানির শ্রবণী সংস্করণ আমাদের হস্তগত হইবে।

গিরিশ-প্রতিভা—ঐকীর্ষ্যচন্দ্রবর্তী দাসগুপ্ত প্রণীত।

উমাই ৮ পৃ: ১৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা। প্রকাশক—গ্রন্থকার, ৩১, চন্দ্রবর্তী সারিচা-ভাড়া, কলিকাতা।

বর্তমান পুস্তকের গ্রন্থকার “দেবদ্যু স্মৃতি” নামে পরলোকগত চিত্ররঞ্জন দাস মহাপুত্রের জীবনী লিখিয়া লিপ্সা হইয়াছিলেন। সন্দেহাতঃ নাট্যকার এবং অভিনেতা গিরিশচন্দ্র বোম্ব মহাপুত্রের ভ্রাতৃদ্বয় জীবনী লিখিয়া তিনি লুকনের ধর্মবোধ-ভাজন হইয়াছেন। সাধারণতঃ যে লেখক “জীবনী” লিখেন প্রায়শঃ চর, সে লেখক এ পুস্তকখানিকে জীবনী বলিলে বোধহয় একটু ভুল করা হইবে। গিরিশচন্দ্রের জীবনসংগ্রহ তাঁর পিতৃ গ্রন্থকারের পরিচয় ছিল না, সত্যতঃ গিরিশচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী যাহা কিছু এ পুস্তকে সন্নিবেশিত তদ্ব্যতীত সে বিষয় তাঁর হস্তেই জ্ঞান নাই, যদিও গিরিশচন্দ্রের আচার সাহিত্যিক ঐকীর্ষ্য লেখকসংগ্রহ বহু মহাপুত্রের নিকট হইতে তিনি সে বিষয়ে অনেক লক্ষ্যন এবং সাহায্য পাইয়াছেন। যে প্রতিভা বলে গিরিশচন্দ্র বাঙালী নাট্যসাহিত্য এবং নাট্য-লেখকের জনক বলিয়া সম্মানিত, এ পুস্তকখানি প্রমাণিত সেই প্রতিভারই আলোচনা—সত্যতঃ সাধারণ জীবনী পুস্তক অপেক্ষা একজন জীবনী পুস্তকের মূল্য অনেক বেশি। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা বিশেষভাবে ধর্মবোধবান্ধু লেখক

ব্র. পরিভ্রম এবং লক্ষ্যভার পরিচয় বিস্তারিত। এ  
পুস্তকখানি বঙ্গ-সাধিতা ভাণ্ডারে একটি বিনষ্ট স্থান  
অধিকার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

**স্বল্পধনী—**ঐহ্মযোচন কর জীবিত। প্রকাশক  
—ঐহ্মলোক চট্টোপাধ্যায়, প্রাবাসী কার্যালয়, ২১, বাশার  
লালুয়ার রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

এখানি একটি ঐতিহ্যবাহী পুস্তক—লক্ষ্যপটী ঐতি-  
কবিতার গ্রন্থিত। কবিতাগুলি মিষ্ট, সুগঠিত—ভাষা  
এবং ছন্দের পাণ্ডিত্যে প্রশংসার্য—তবে বর্ধমানযুগের  
প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। সাধনার পথে অসুখপূর্ণ যোড়ার  
দ্বিত্যে একটা প্রক্রিয়া বটে—কিন্তু অনতিবিলম্বে তাহা  
হইতে নিজেই মুক্ত করিতে না পারিলে স্বকীচতা  
গীতাইবার সম্পূর্ণ অসম্ভব থাকে। আশা করি স্বল্পধনীর  
কবি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

**রানিগণের সমাজ—**কোনারনাথ মজুমদার  
প্রণীত। প্রাণিহীন—ওকফাল চট্টোপাধ্যায় এ লক্ষ্য—  
কলিকাতা। মূল্য ৪. পৃঃ ৫০ + ১/০ + ৪২০। গ্রন্থকার  
মহানর স্বদীর্ঘ পটিনে বঙ্গের সাধনার কল বাহালার পাঠক-  
সমাজের হৃদে অর্পণ করিয়াছেন। চাষের বিষয় তিনি এই  
পুস্তক সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া খটতে পারেন  
নাই। কত কঠোর পরিশ্রমের সূচিত স্তম্ভকে এই স্বদীর্ঘ  
সমগ্র পুস্তকখানির রূপান্তর উত্তরিত জল বার করিতে  
হইয়াছে, সাংগঠিক চেষ্টা ও অধ্যয়ন কিছুই তাঁহার সাহিত্য-  
সাধনার পথের অন্তরায় হইতে পারে নাই, তাহা একজনকে  
বৃত্তিকার উক্ত হইয়াছে। লক্ষ্যতা বহন আসিয়া পৌছিল,  
স্বদীর্ঘ পথ-ভ্রমার তার সমগ্রায়ান পৌছিতে আর বাকী নাই,  
তখন কাল আসিয়া স্তম্ভকে লইয়া গেল। গ্রন্থকারের লক্ষ্য  
হইতে নহে, বাস্তবায়ন স্বদীর্ঘ পথের সমাজের পক্ষে ইহা নিত্য  
পরিভ্রমণের বিষয়। কবি তাঁহার কাল করিয়া গিয়াছেন,  
বঙ্গের পাঠক-সমাজ তাঁহার স্বদীর্ঘ স্মৃতির প্রতি প্রজ্ঞাগুলি  
অর্পণ করিয়া দণ্ড হউন।

রামায়ণ কোন সময়ের রচিত তাহা আজও স্বার্থ ঐতি-  
হাসিক ভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই,—রামায়ণের কতগুলি  
লোক গ্রন্থিগত আর কতগুলি লোক মূল কবির রচনা

তাহা লইয়া বালাবাহারের শেষ চরিত্র না হইতে পারে,  
কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই—ইহা তৎকালীন  
অর্থা সমাজের চিত্র মন্ডন করিয়াছে; কবির রচনাভাণ্ডে  
বা উচ্ছাসভরে চরিত্র ইহা স্থানে স্থানে আদৃত বা চট্টল  
হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালি বলেন সমগ্র রামায়ণই কবির  
রচনাগ্রন্থত, ইহাতে বাস্তবতার ছায়াছায়া নাই, তাহা বিদ্যাক-  
কবির কথার আদার বলি “কথা রচনার সৃষ্টি হইলেও  
রচনা যে প্রকৃত সৃষ্টিকে বা মনোবল পক্ষে অতিক্রম  
করে না, ইহা অস্বীকার করা হইতে পারে না। যত  
যেমন উত্তর চিত্রার বাহিরের কোন অ-সুদৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক  
পন্থার রচনা করিতে অসমর্থ, কবির সেইরূপ তাঁহার  
রচনাকে অসমর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না।”  
—উপক্রমিকা পৃ ৩।

বাংলায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ কমই লিখিত হইতেছে, অত-  
কাল অনেক ভারতের প্রাচীন ইতিহাস—কোন কোন  
বিশেষ অধ্যায় বহিরা লিখিত আরম্ভ করিয়াছেন—অনেক  
ক্ষেত্রে লক্ষ্যকামও হইয়াছেন। পণ্ডিত ভ্রাম শাস্ত্রী কর্তৃক  
ভৌটিলার অর্ধশতাব্দি আবিষ্কারের পরে এ বিষয়ে কাল ক্রম  
গতিতে অগ্রগতি হইতেছে—কিন্তু চাষের বিষয় সমগ্রই ইংল্যান্ড  
ভাষায় লিখিত হইতেছে। বাংলা ভাষায় ইহা একখানি  
অভিনব পুস্তক হইল,—বিষয়নির্মাণে যখন যখনো এবং  
লিঙ্গাশ্রয় এবং ইতিহাস-লক্ষ্যলেনের পক্ষে মূল্যবান, তেমনি  
রচনা পাঠিত্যাপূর্ণ ও লক্ষ্যতা। তিনি রামায়ণ বঙ্গের আধ্যাত্মিক  
সমাজ, স্বর্গ, ত্রিভুবন, দেবতা, আরাধ্য ও অসুর, সামা-  
নিক নিয়ম ও নৈতিক আচরণ ও শাস্ত্রানুশাসন ইত্যাদি  
বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং এইসবের সূচিত  
পূর্ণবস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পরবর্তী মহাত্ম্যবস্তুর বঙ্গের তুলনা-  
মূলক সমালোচনা করার পুস্তকখানির মূল্য লক্ষ্যত্ব বৃদ্ধি পাই-  
য়াছে। বিষয়ভাণ্ডারের সর্বোচ্চ পরীক্ষার বাহ্যিক প্রাচীন  
ভারতের ইতিহাস ও লক্ষ্যতা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা  
এই বই বানি পড়িতে বিশেষ উপকৃত হইবেন আশা করা যায়।

**গল্পে উপনিষৎ—**ঐহ্মযোচনার দ্বারা এম. এ.  
মূল্য ২. পৃঃ ২০০। ছবখানি একরঙা চিত্র আছে।  
প্রাণিহীন—ওকফাল চট্টোপাধ্যায়।



বাংলার এই ধরনের বই এই বেশি হয় প্রথম। উপনিষদের রক্ষাব্যবস্থা তৎকালীন ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র পৃথিবীর পোহবহুল, অশুভ এই দেশে উপনিষদের অস্তিত্বের চর্চায় তখন আলোচনা নাই—তাঁহার নানা কারণ। সে বিষয়ের আলোচনা আমরা এখানে করিব না। বিচার্য্য এই দেশে এই সুদীর্ঘ অমূল্য জ্ঞানগর্ভ বিবরণটিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহার্য্য ধন্য। যে যুগে লক্ষ্যপ্রকৃতির জাতীয় প্রাচীন গৌরব হালাত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে—সেই যুগে এই প্রচেষ্টা কি আবাস্যিকতার বিচ্ছিন্ন হইতে—কি মানুষ গড়ার বিচ্ছিন্ন হইতে কত যে সুগাভান ও আকাঙ্ক্ষিত তাতা বলা যায় না।

প্রত্যয়ের দাখ চর্য্যে—[এই বাঙ্গালী সাধারণকে, বিশেষভাবে বাঙ্গালার চার ও গুরুত্বপূর্ণ নূতন করিয়া উপনিষদ গুনাইবেন। আমরা বলি তাঁহার এম সার্থক হইয়াছে, তিনি নূতন ভকীতে, অশুভ ভক্তিরেব দহিত উপনিষদের ব্যক্তি বাংলার তরুণমণ্ডকে গুনাইয়াছেন, দেশ একত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ বহিল। তাঁহার নিম্ন রচনা-ভকী, মনোহর কল্পনাশক্তি, আখ্যানভাগমালা এবং সত্য-গুলিকে সর্বাধ এবং প্রাণশালী করিয়া তুলিয়াছে।

উপনিষদের এই বাঙ্গালী জটিল বিষয়গুলিকে একত্র মনোহর করা হইতে পারে তাহা আমাদের দাবী ছিল না।

আমরা আশা করি বাংলার বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষগণ এই বইখানি ছাত্র ও ছাত্রীপণের শিক্ষণার্থ্য্যবাহু করিয়া দিবেন।

ছাত্র ও গাভী ৮মৎকার। সব দিক চরিত্রে উপহার দিবার মত একখানি বই।

গ্রন্থদেব প্রার্থনা—ঐতরীকৃত্যার ধাম এম, এ। পৃ: ১৪ পৃষ্ঠা ৮০ আনি প্রাপ্তিমান:—বুকে কোম্পানি, কলকাতা; কলিকাতা।

এরকার উপনিষদ সন্দের সন্দের পাঠ্যপাঠ ও সন্দের প্রার্থনা মন্ত্রগুলির এবং বেদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রার্থনা মন্ত্রে বাংলা পড়ে ও পড়ে অল্পবাল করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রগুলির 'সহসা' নামে সংস্কৃত ভাষাও সাহচর্য্যে করিয়াছেন। কয়েকটি অত্যন্ত চমক এবং প্রমোদ্য; আনন্দের বিষয় তিনি বিশেষ ভক্তিরেব দহিত ইহা সম্পাদন করিয়াছেন। বাংলা পড়ল পড়ে মন্ত্রগুলি অনুদিত ও গাভী ৮০৪৭ বাংলা দাহিত্যের একটি অভাব ঘোচন করিল। তাঁহার্য্য ছোট ছোট ছেলে মেরেকে সংস্কৃত মহাদেব আশ্রিত পিঠা: ৮০৮৮ তাঁহার্য্য ইহার যুগে বহিতে পারবেন। আশা করি বইখানির বহুল প্রচার চরিত্রে।

## নান্দিকা

### মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সং ২০শে কাছন অধিব্যায় সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল বহুতে বহু সাহিত্য্য বিশেষ-ভাবে কতিয়ত হইয়াছে। বহু-সাহিত্য্যকে যদি আকাংক্ষার দহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মণিলাল তদ্যথা একটি উচ্ছল আন্তরিক ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিমাণ ওজন করিয়া বহু-সাহিত্য্যে মণিলালের দান নির্ণয় করিতে গেলে তুল করা হইবে, কারণ বেশি পরিমাণে তিনি লিখিতেন না বলিয়া বেশি দেখা তিনি

লিখিয়া দান নাই। কিন্তু রচনার উৎকৃষ্টতা যদি মণিলালের রচনার মাণ-কান্তি করা যায় তাহা হইলেই মণিলালের সাহিত্য্য-সুখের বার্থ্য্য মূলানির্ঘর সত্য চরিত্রে। মণিলাল সাহিত্য্য-ক্ষেত্রে চালা ছিলেন না,—তিনি ছিলেন সাহিত্য্য-কাননের উজান-শাল। সেই জন্ত তিনি দাখা উপহার করিতেন তাহাতে পেট ভরিত না, কিন্তু মন ভরিত। তাঁহার্য্য 'মনে মনে' গল্প এবং ঐ প্রবন্ধের 'আরো' কয়েকটি গল্প অনেক সাহিত্য্যসেবীরাই মনে মনে আছে। তাঁহার্য্য রচিত গাঁও-নাটা "হুকার মুক্তি" উজ্জ্বল সাহিত্য্য-সৌভাগ্য সম্পন্ন রচনা।



অর বংগে মণিলালের মৃত্যু ঘটিল। সুশ্রী নৃত্তি, শাস্ত্র  
বিশ্বাব, লুহিত আনন্দ এবং সুবর ভণ্ডারের আকর্ষণে তিনি  
বহুতরকৈ দ্বিহিত্যাব বহুতর বাধিরাহিলেন—তাঁহার  
তিঃস্বাধানে সেই জন্ত বহুতরকৈ বাধিত হইয়াছে। কিন্তু  
কাল পূর্ণে মণিলালের হাঁ-বিয়োগ হইয়াছিল। এই  
সুখভীত পোক্তর বেননা তাঁহার মনে অনেকটা নিঃশব্দ  
এবং বৈরাগ্য আনিয়া নিয়াছিল; সেই হেতু স্মৃতি সাহিত্য-  
সাধনার অনেকটা বৈশিষ্ট্য আনিয়া পড়িয়াছিল। মণিলাল  
ছিলেন শিলাচোষ। শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের  
প্রাথমিক, এবং শিল্প-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত মোক্ষলাল ও  
শ্যামলালের শিষ্য।

### বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

আমরা ১৯১৬ ও ১৯১৭ চৈত্র হাওড়া জেলার মাছু গ্রামে  
বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশন হইবে। মাছুগ্রাম  
একবার অত্যন্ত সমর কবি ডায়মন্ডের রায় ভণ্ডারের  
পূর্ণা জন্মভূমি। ১৯০০ সালে সাহিত্য-সম্মিলন বঙ্গীয়  
জন্মভূমি কটীয়াপাড়াও ১৯০২ সালে সাহিত্য-সম্মিলন  
মোক্ষলালের জন্মভূমি বাগানপুরে এই সম্মিলনের অধিবেশন  
হয়। এই বাস্তবের আকর্ষণে বিরাট মাগোজন হইয়াছে।  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের  
শ্রীকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রগতিও এই সম্মিলনের

### বার্নার্ড শ

বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীকৃত বার্নার্ড শ-কে আয়োজনাঙ্কের  
কাতোয়-বিবর্তনাগে হইতে অনায়াসে চিত্রিত প্রদান করিবার

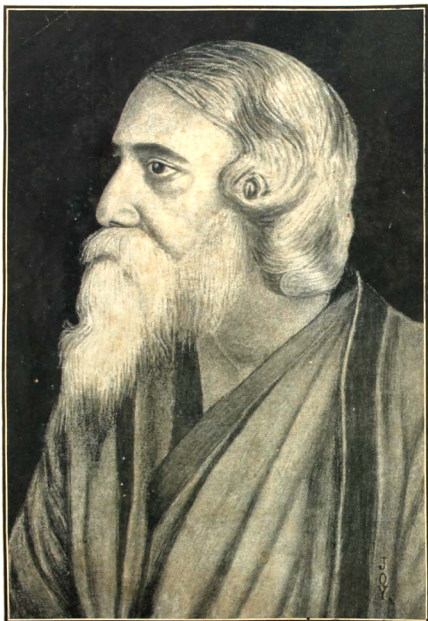
প্রয়াস হইয়াছিল। সমস্তপনের দ্বারা ভোটের দ্বারা ২৫  
৮ দ্বিগুণে তাক না-মুদ্র হইয়া দিয়াছে। বিধান সমস্ত  
পূজতে কণার সত্যতার প্রতি ক্রমশঃ আস্থা হারাইতে  
হইতেছে।

### বিলাতে ভারতীয় চিত্রশিল্প প্রদর্শনী

আমরা কলকাতা মালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের  
উত্তরে পূর্বে একটি ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী অগ্রস্ত  
হইবে। এই প্রদর্শনাতে অগ্রগতির পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া  
বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রশিল্পে তাহা বিবর্তনা  
লাভ করিয়াছে তাহাই দেখানো হইবে। এ প্রদর্শনী  
শিল্প, চিত্র, ইত্যাদি শ্রীকৃত পূর্ণে বিনিয়নের সহযোগিতায় সরকারী  
এবং বঙ্গীয় সংগ্রহ হইতে বিভিন্ন পূর্ণের চিত্রাদি প্রদর্শন  
লাভ করিতেছেন। কিন্তু আমদের মনে হয়, শুধু ইংলণ্ড  
অথবা ইরোপে হইতে লক্ষ্যীত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য-  
সাধনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে  
যে সকল শিল্পী-সম্মিলন আছে সেগুলির সহায়তা লাভ করিতে  
পারিলে ভাল হইত।

### দুইশত জীবিত পণ্ডিত

বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে জীবিত অনেক অধ-  
পায়ের অধ্যাপক সমস্ত পণ্ডিতের মধ্যে পণ্ডিতা দ্বারা  
করিয়াছেন। ইনি লক্ষ্যীত দুইশত ভাষার জ্ঞান অধি-  
কার করিয়াছেন; লক্ষ্যীত ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া  
যেদের চিত্র লিখন, মিশর য়েদের প্রাচীন চিত্রাঙ্কন, ইত্যাদি  
ভাষার মধ্যে বার পড়ে নাই। যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও  
ইনি এখনো নিয়মিত নৃতন নৃতন ভাষার অধ্যয়ন করি-  
তেছেন। বিভিন্ন ভাষা বিবিধাঙ্গ অবশ্যে তাহার সমস্ত  
বিভিন্ন ভাষার পনের ভাষার বই লক্ষ্যীত হইয়াছে। তাহার  
অন্ত যে দুইশত ভাষা তিনি শিখিয়াছেন তন্মধ্যে কিনিদিয়ার  
ভাষাই প্রথম।



ବ୍ରହ୍ମସାମାଜ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୦୮ ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୦୮ ମାସ



ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୦୮

ମିତ୍ର-ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ



# বিচিত্রা

|                         |             |              |
|-------------------------|-------------|--------------|
| দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩৬ | পঞ্চম সংখ্যা |
|-------------------------|-------------|--------------|



ঠাকুর

মনে মনে ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চারণ ধ্যানের ভাষে সেই ধ্যানের শব্দ  
ওঙ্কারের ধ্বনিবেগের দ্বারা চিত্তকে বঞ্চেব মনো সম্পূর্ণ নিবিল্ট ক'বয়' দিতে পারে,  
নুগুণ উনিমেষের শ্লোকটির এই তাৎপৰ্য্য আমি বুঝিয়াছি 'কিন্তু ওঙ্কার কারবা কিছু  
বলিবার অধিকার আমার নাই' ব্রহ্মের যে-সকল ওঙ্কারাচক নাম আছে তা'রা বিশেষ  
অর্পের প্রতি মনকে বিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু ঐ শব্দ ধ্বনি মাত্র, তাহা একটি পরিপূর্ণতার  
ভাবকে কেবল মাত্র স্বরের ব্যক্ত করে, এই জন্ত তা'র অদর্শ  
চিত্তকে গতিবান করিতে পারে। ৩রা বৈশাখ, ১৩৩৫

## স্মরণ-ফল

### শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছু ঠোঁলে আলোত হ'ল সন্ধ্যার ধারে । কিছু আমবাও  
ত ভিড়ের মাঝে, এম বাটেরে ধাব কোথায় ? পাখি হ'লে ব'লে  
শেনা যাক্ এই কোলাহলের কেন্দ্র হ'তে যে বানী  
উৎসাহিত হচ্ছে ।

আমাদের মেলায় কত লোক মাঠে মাঠে কতদিকে  
ছড়িয়ে রয়েছে,—কেউ এ বাজারে কেউ ও বাজারে, কেউ  
আলো দেখতে কেউ ছাড়া তখন—তাদের প্রত্যেকের  
ডাক-ঠাক কথাবার্তা সমস্ত বতর । এই ভিড়ের  
মধ্যে আমরা পৃথিবীর লোকালয়ে সংহত ক'রে দেখছি ।  
একবার তাকে কল্পনা ক'রে দেখ । সমস্ত পৃথিবী ছুঁতে  
মাত্র এই মুহূর্তে কত ঘাট কত বাজার, কত ঘন কত পথ,  
কত কান কত কথা, কত আশ্রয় কত কাছা, তার সমস্ত  
নেই । তালি কণা পরিমাণ একটুখানিক এই মাঠে  
একটি মেলায় আমরা যেমনি সংহত করেছি অমনি অগাধ  
নক্ষত্রলোকের নীরবতা লুপ্ত হ'লে পেল ।

এই পরমাণু কোলাহলটাই কি লোকালয়ের সত্যকার  
চিনিব ? এরই সঙ্গে সঙ্গে আকাশের যে বিপুল শান্তি আছে  
তাকে কি বাস দিয়েই দেখতে হবে ? মাত্র তাকে বাস  
দিয়ে মাড়ের মধ্যে যে অবিস্মিত কোলাহলটাকে পাকি  
সেইটাই যদি সমস্ত পৃথিবীর জিনিষ হ'ত তা হ'লে আমাদের  
কান ফেটে যেত, আমাদের মন উড়াত হ'লে যেত । কিন্তু  
আসলে, যেন ও কালের ভিতরকার উদার শান্তি মানুষের  
সংসার-কোলাহলের চেয়ে তের বড় বলেই আমরা বেঁচে  
আছি, নইলে আমরা নিজেদের সম্মিলিত তাগে দগ্ধ হ'লে  
সম্মিলিত বেগে লিটে হ'লে পালল হ'লে যায় যেতুম ।

বৈজ্ঞানিকেরা জীবের জীবনসংগ্রামকে মনে মনে অনেক  
সময়ে এই রকম সংহত ক'রে কল্পনা করেন । তখন তাঁরা

কেবল একান্ত ক'রে এই তেথতে পান যে, প্রাণীরা টিকে  
পাড়াব হচ্ছে তাঁর উচ্চের ঠেলাঠেলি চানচানি করতে ।  
এই রকম ক'রে দেখারমাত্রই তাঁরা এই মেলায় কোলাহলের  
মতই একটা জিনিষ মনে মনে তৈরি ক'রে তোলেন যে  
জিনিষটা ক্রিমিক, কেন না এর সঙ্গে সঙ্গে এর উপরকার বড়  
জিনিষটা নেই । জীবজন্তুর চানচানি যে মেদের সঙ্গে  
সংযোগিতার সঙ্গে শান্তির সঙ্গে মিশিয়ে আছে, সে এই  
চানচানির চেয়ে অনেক বড় ।

বুদ্ধকেই বুদ্ধ চলে, সে বুদ্ধ হুগেব । কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে  
এই বুদ্ধ কতক নামে বাপ্ত হ'লে রয়েছে,—প্রতিযোগিতা,  
হিংসা ও বৃত্তার সমগ্র পরিমাণ বুদ্ধকেই পরিমাপের চেয়ে  
অনেক গুণ বেশী, কিন্তু তবু ত এই বুদ্ধের নিদারুণতা  
আমরা প্রত্যাহ এবং লজ্জিত দেখতে পাইনে । কল্পনার সংহত  
ক'রে দেখলে যে জিনিষটা জীবনসংগ্রামের ধারণ করে,  
সেইটাকেই স্বভাবে বহন দেখি তখন সে হয় জীবনযাত্রা ।  
এই জীবনযাত্রার মধ্যে সংগ্রাম আছে, কিন্তু তার চেয়ে  
অনেক বড় ক'রে আছে শান্তি, নইলে মানুষ বাচতেই  
পারত না ।

অনেক সময়ে নীতিপ্রচারকেরা অজ্ঞেয় ক'রে ব'লে  
যাকেন বৃত্তা অচর্য এবং চারিধেকেই ঘটেছে অচর্য মানুষ  
বৃত্তাকে কিছুতেই মানতে চাকে না । কিন্তু কেন চাকে না ?  
কেন না মানুষ বৃত্তার মধ্য দিয়ে জীবনের বিকারকেই স্পষ্ট  
দেখতে পাকে, সুতরাং নীতিপ্রচারকেরা বৃত্তাকে যে  
একান্ত ক'রে জানুনে সেটা তাঁদের কল্পনা মাত্র । আমরা  
যখন চলি তখন হুই পায়ে লাগিয়ে চলি। আমরা  
একটা পা যখন টেলে তখন আর একটা পা ধামে । এই  
ধামাটাকেই মনে মনে যোগ ক'রে যদি সমস্ত বড় একটা

অতঃ ক'বে তুলি তা হ'লে চোটা আর সম্ভাষণ হয় না। কিন্তু আমরা যামা চোণা গুইকে নিজে লমঙ্গ গতিটাকেই ল্পষ্ট উপলব্ধি করছি, এই বস্তুর চোণকে আমরা চোণ বলছি।

মাহুকে যদি আমরা ছোট ক'রে দেখি তা হ'লে দেখতে পাই, সে খাচ্ছে বেড়াচ্ছে কাক করচে ঘুমোচ্ছে। তখন লমঙ্গ মাহুকের ইতিহাসের সঙ্গে তার যে যোগের সূত্র আছে সে সূত্র আমরা দেখতে পাইনে। তখন ব্যক্তিগত আত্মিক জীবনের তুচ্ছতাই হ'লে ক'রে চোখে পড়ে। সেই তুচ্ছতাকেই যদি মনে মনে বেশে ও কালে পূজোক্ত ক'রে দেখি তা হ'লে যে লমঙ্গ পাই সেইটেকে কি মাহুকের ইতিহাস? এই লমঙ্গ তুচ্ছতার এই লমঙ্গ বিকল্প কালের অন্তরে অন্তরে অন্তর্গত হ'বে একটি তপস্বী রম্ভে, সেই তপস্বী বিপুল তুচ্ছতার ভিতর থেকে জানে কণ্ঠে ধ্বংস নানা আকারের মনুষ্যকে বিকশিত ক'রে তুলে। প্রকৃত ইতিহাস সেট মনুষ্যকেই ইতিহাস, তুচ্ছতার ইতিহাস নয়।

মাহুকের এই ভিড়ের মাঝখানেই তুমি আছেন, তাই এ ভিড় তার লমঙ্গ ত্রোণাঙ্গের ভিতরেও এট বাঁকে বলতে পারবে—

এখান পরমাপতিঃ এখান পরমা ল্পাং

এখান পরমোলোক এখান পরমানন্দঃ —

ইনিই পরম গতি, ইনিই পরম লাভ, ইনিই পরম আশ্রয়, ইনিই পরম আনন্দ। অর্থাৎ চোখে দেখছি বটে নানাধিকে লবাই ছড়িয়ে পড়চে, নানা ইচ্ছা, নানা কাম, নানা ভাষা, নানা রুচি; এই লমঙ্গকে যোগ ক'রে দেখলে রাশিকৃত মল্লিকা এবং অস্ত্রেরা কোলাহল মাত্র পাওয়া যায়। তবুও এই অতি-প্রকৃত বিকল্পতাই এর আসল সত্য নয়—এই অন্তরে অন্তরে সেই এক আছেন যিনি এর সকল গতিকে সকল আধিক্যে আপনার মধ্যে আচ্ছাদন করছেন; যিনি আশ্রয়কর্মে সঙ্গে সঙ্গে আছেন ব'লেই এত চোণা গংঘাত আকারে সত্যের করচে না, এবং সত্যের বিপুল আবক্ষনাও সৃষ্টির নিয়মে রূপ ধারণ করচে।

পুণ্ডিত বলিচি, মাহুকের চোণ যেনো একটা পাত্রে পামা এবং একটা পাত্রে এগোনো আছে। অর্থাৎ চোণ যেনো একটা ভাগ আছে যেটা হচ্ছে "না" আর একটা ভাগ আছে যেটা হচ্ছে "হী"। গতির এই হী-কেই ল্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই ব'লে চোণকে দেখি। কিন্তু একটা ভাগগাছের চোণার দিকে চেয়ে দেখ—সেও যেতে উঠতে, কিন্তু তার দেট যেতে ওঠার "না"-টাকেই বড় ক'রে দেখছি, তাই আমাদের মনে হচ্ছে পাছটা যেমত আছে। দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে একে যেনে দেখলে তবেই এর চোণা যে "হী" সে প্রকাশ পায়।

তেননি, আমাদের নিম্নের জীবনের এবং লমঙ্গ মাহুকের ভিড়ের চকলতা ও তুচ্ছতার ভিতর দিয়েই সেই পরম গতি পরম ল্পাং পরম আশ্রয় পরম আনন্দের প্রকাশ আছে এইটাই হচ্ছে সত্য, এইটাই হচ্ছে হী। একে জানলে ঠিক দেখা হ'ল, এর উপেক্ষা জানলে দেখাই চল না। লমঙ্গট কেবল উদ্ভাস হচ্ছে, এর মাহুকে কোন ঠিক নেই, এর লমঙ্গে কোন লক্ষ্য নেই, এমনস্তর নিম্নলিখ মতের যে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তা বলিনে, কিন্তু সে লমঙ্গ প্রমাণই সত্যের সেই "না" বিভাগ হ'তেই আরম্ভিত। মোটের উপর, লমঙ্গ প্রমাণলব্ধেও মাহুয় এই না-কে তিচ্ছতাই বীকার করে না। যদি করত, তা হ'লে কোন দিকেই মাহুয় কিছু আর উন্নতির চোটা করত না; কেন না হী-কেই সত্য ব'লে মানা সকল উন্নতির আশা। জীবনের যে মনে এই হী-কে সত্য ব'লে বীকার না করি, সেই অংগেই আমাদের গুণটি ঝটে।

অতএব এই ভিড়ের ভিতর থেকে এই ভিড়ের ভিতরকার সত্যকে দেখতে হবে, তা হ'লেই জীবন সার্থক হবে। কেবল মাত্র ভিড়ের চোণা বেগে চালিত হওয়া মাহুকের স্বপ্ন নয়। কেন না মাহুয় পাছপাশা পত্রপক্ষীর মত অভিযানের পথে প্রগতির রূপে প্রকৃতির নিয়মকে মনোভাবে বহন করবার জীবন, মাহুকের নিজের মধ্যেও কল্পবশীক আছে। সেই ভেদে কেবলমাত্র সৃষ্টি হওয়া তার ধারণা পরিণাম হ'তে পারে না, সৃষ্টি করাই তার আত্ম-বিকাশের পক্ষে আত্ম-উপলব্ধির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই রক্ত মাহুকের



ভিড়ের মধ্যে কেবল মাত্র অন্ধ উত্তমকে দ্বাকার তবলে  
মাতৃমুখে অশ্রুমান করা হই, মাতৃবের আত্মাকে দ্বাকার  
করিতে হবে।

অন্ধ উত্তমকেই যখন দেখি তখন প্রকৃতিতে ভ্রাণপত্রিক  
দেখি, তখন মাতৃমুখ প্রকৃতির বাহ্য-ক্ষেত্রে দেখা চর,  
অর্থাৎ জীববিজ্ঞান যে ক্ষেত্র তুচ্ছ পশুপক্ষীকে দেখে  
সেই ক্ষেত্রে মাতৃমুখের পরম গতি পরম আশ্রয় করনা কবি।  
কিন্তু মাতৃবের আত্মাকে যখন জানি অর্থাৎ যখন তার  
কর্তৃত্ব দেখি, যখন তার ইচ্ছাময় সৃষ্টি-শক্তিকে জানি  
তখন তার পরমগতি পরম-আশ্রয়কে সেই জীববিজ্ঞানের  
ক্ষেত্রে খুঁজে পাইনে যেখানে প্রাকৃতিক নিরঞ্জন নামক  
একটা কল্পপ্রণালীই কলের মত কার্য করে থাকে।  
যখন মাতৃমুখকে অধ্যাক্ষ্য ক্ষেত্রে দেখি, তখন পরম ইচ্ছার  
মধ্যে মাতৃবের ইচ্ছাকে জানি, পরম পুরুষের মধ্যে মাতৃবের  
আত্মপুরুষকে উপলব্ধি করি। তখন বুঝতে পারি,  
মাতৃমুখে চলতে হবে, কিন্তু পশুর মত নয়; তাকে চলতে  
হবে জানের সঙ্গে, আত্ম-চালনার আনন্দের সঙ্গে; তাকে  
বুঝতে হবে যে সেও কষ্টী, অতএব তাকেও সৃষ্টি করতে  
হবে।

আমাদের মাতৃবের চলটিকে তার হাঁ এবং না-এর  
দিকে বিচার করি। এমন কথা বলা যেতে পারে যে  
মাতৃমুখ নিম্নের দিকে চালিত হচ্ছে, কার্যকারণের  
শাসনধারা তার একমাত্র বিধাতা। কিন্তু এটা হল “না”-  
এর দিক, এই দিক থেকে মাতৃমুখ বিচার করাও যা অসি  
পট্টের দিকটাই মাতৃবের আসল চেষ্টা বলাও তা।  
মাতৃবের আত্মকর্তৃত্ব আছে মাতৃবের সংসারমাত্রাও এইটাই  
হল তার “হাঁ”-এর দিক। তার সমস্ত কল্যাণ সমস্ত উন্নতি  
এই উপলব্ধিতে।

কিন্তু তার এই উপলব্ধিই যে সত্য, এটা যে মায়ামাত্র  
নয় এ যদি চর, তবে এটা তাকে বুঝতেই হবে যে একটি  
অনন্ত সত্য তাই তার এই আত্মোপলব্ধির প্রতিজ্ঞা আছে, সেই  
সত্যই পরমসত্য। এখানে যত্নের দ্বারা বর চালিত, বা  
অন্ধের দ্বারা অন্ধ নীরবান হচ্ছে না। এখানে ইচ্ছার সঙ্গে  
ইচ্ছার যোগ, অর্থাৎ এখানকার পূর্ণ যোগ প্রেম।

তাই ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন চলছি, তখন যদি কেবল  
সংসারের বাধা পথ এবং প্রতিক্রিয়া অন্ধ যোগকেই একান্ত  
করে মানি তা হ’লে পরম সত্যকে যেতে পাইনে।  
কেন না, পরম সত্য শুধু সত্য নয়, তিনি চঞ্চল সত্য  
জানি অনন্ত্য ত্রুটি। নিত্যের জ্ঞানকে অসমিকার আবরণ  
থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করলেই সেই জ্ঞান-  
সত্তাকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। নিজে যখন কর্তৃব  
হারা হই যখন কেবল অস্তবের দ্বারা বাহিরের শাসনে কিংবা  
কর্তব্য আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হ’লে চলি তখন নিজের মধ্যে  
সেই যোগশক্তি কর্তব্য ও নিত্যের হ’লে থাকে বার দ্বারা  
আত্মা আপনার পরম লোককে উপলব্ধি করতে পারে।  
সেই ভক্ত আত্মার প্রতি উপদেশ আছে আত্মানং বিদ্ধি  
আত্মাকে জান, অর্থাৎ আপনাকে আত্মা বলেই জান।

অতএব এই ভিড়ের মধ্যে থেকে ভিড়ের উচ্চ সন্ন্যাস  
জাগিয়ে রাখতে হবে। এই ভিড়কে অতিক্রম করে যখন  
দৃষ্টি চলবে তখনই এই ভিড়কে সত্য করে জানতে পারব।  
তা যখন জানব তখন সকল কোলাহলের মধ্যে শান্তিকে  
জানব। তা হ’লে তবে তবে মরব না, ধুলো মাটিকে কেবলি  
মাঁচড়ে মাঁচড়ে দূরব না, তা হ’লে আমাদের কর্তব্য বিশুদ্ধ  
হবে, এবং যা কিছু লাভ করব তা কাঙালী-বিদ্যার  
অভিক্রিয়ের কাড়াকাড়ির কড়ি হবে না। তার মধ্যে  
আত্মার স্বাধিকারের জোরের দাবী থাকবে।

আমাদের এই ভিড়ের দ্বারা কেবলমাত্রই একটা চল,  
এই মধ্যে সত্য নেই, চলার দৃষ্টেই এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই  
কোন শ্রান্তি নেই, একথা যদি মনের সঙ্গে বলতে পারতুম  
তা হ’লে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারতুম না। সমস্ত জীবন  
বিষয়ে এই সত্যকে প্রণাম করি,—কেন না ভালকেসেচি  
ভালকে, বিবাস করি, বা-কিন্তু আছে তাকেই চরম বলে  
স্বীকার করিনি।

এই ভিড়ের মধ্যে কান দিয়ে শোন, কেবলি কি  
কোলাহল? একটি মূর কি নেই? সেই মূর কি এই  
কোলাহলের অন্তর থেকে এই কোলাহলকে অতিক্রম করে  
উচ্চ উপলব্ধি হচ্ছে না? তাই যদি না হবে, তা হ’লে মাতৃব  
আপনার সত্যকে পেলে কোথা থেকে? কোলাহলই

যেখানে একবার লড়া সেখানে মানুষ কি অকথ্যে আপনার  
সদাচকে দৃষ্টি করতে পারে? মানুষের সজীভ কোন্ লব  
সত্যকে প্রকাশ করতে? না, সমস্ত ছড়াছড়ির মধ্যে একটি  
পতীর মিল আছে, একটি অনিচ্ছাচরীর আনন্দের মিল।  
সেই মিলের কপাটি ভাষার বলা বাহ্য না, কেবল মনে হুঁতেই  
বলা যায়, এটী ভেঙেই মানুষকে পান গাইতে হয়েছে।  
মানুষের এই পান বিশ্বের ভিত্তিকার গানের রসটিকেই,  
তার অন্তরতম অনিচ্ছাচরীকে প্রকাশ করতে এগেই  
জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যে, প্রতিদিনের সমস্ত  
দৌনতার মধ্যে, পান এমন ক'রে আমাদের চরণের কাছে  
অবাবিহিতভাবে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করতে অনুভূতগোচর  
রপকালের কথা। আমাদের সমস্ত সজীভ ভাববাগাও তাই

করে। ফুল বল, তারা বল, প্রভাত ও সন্ধ্যাকালের শান্তি  
বল সকলেরই এই বাণী। এই বাণী কোনো বিকল্প  
প্রমাণের প্রতিবাদ করে না, কোন বশকের প্রমাণকে  
সংশয় ক'রে দেখায় না,—কিন্তু আলোক যেমন সজীভ  
আলোকিত করে তেমনি সজীভ বলতে থাকে, রংগা বৈ  
ল: রংগা হি লছানন্দী ভবতি। ভিত্তির মধ্যে দিয়ে বঠতে  
বঠতে আমাদের জীবন একটি সজীভযাত্রার সমস্ত সজীভ  
অনিচ্ছা হ'লে উঠবে—সজীভই অনিচ্ছাচরীকে সমস্ত লুপ্তত্ব  
বিশদলম্পর্কে মধ্যে প্রকাশ করতে থাকবে—এই আমাদের  
পরম সার্বিকতা। কেবল তর্ক নয়, প্রমাণের প্রত্যক্ষ নয়,  
আমাদের সমস্ত জীবনই একটি অশ্রু হুঁতে এই বাণীকে  
বহন করবে—শান্ত: শিবমুখিতঃ—এই আমাদের প্রার্থনা।



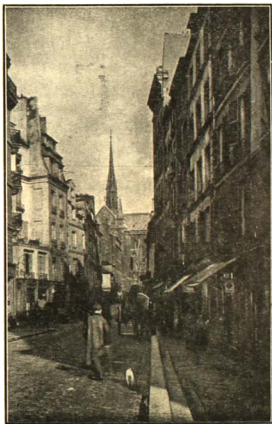




ফুল-ওয়ালার বোকান

# চিত্রশালা

দ্বিতীয় প্যারি





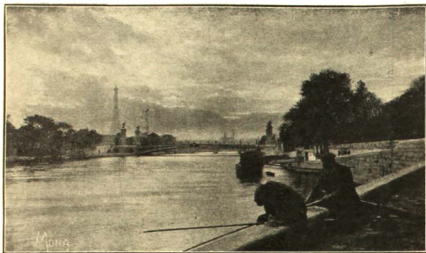
କୋଷିନ ଗଲ୍ ଆର୍ଚ୍ଚିତ୍ତ ଗୁରି



ମେନ୍ ମନୋର ଧାବେ ଖଣ୍ଡ, ବୁକ୍ ଏମ୍.



ସାହି ଘରା



## বিবাহ-বিচ্ছেদ

শ্রীমতী অমরুপা দেবী

৭৬ রোমান্সে ১৯২৪ পুট্রাঙ্কে ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের সভার বলিয়াছিলেন,—

“আমি যদি ভারতবাসী হইতাম, তাহা হইলে আমি হিন্দুর মূলমূল্যবোধবোধী সামাজিক ব্যবস্থার অধিকারী হইয়াছি বলিয়া গণ্যহুত্ব করিতাম। চরিত্রাভিত্যর সহিত এই ব্যবস্থা ভাঙিয়া ফেলিতে দিতাম না। যে সামাজিক ব্যবস্থা এবাং ভারতবাসীর কল্যাণসাধন করিয়া আসিতেছে, লক্ষ্যেতে ভারতবাসী তাহার পরিবর্তন ও বিলম্বসাধন করিবার পক্ষে যেন বিপরীত বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া যেনে।”

ঠিক এই কথাটাই আমারও মনে হয়। আমাদের দেশেও পৃথিবীর বহুতর দেশের মতই সংস্কারের একটা কোর হাওয়া লাগিয়াছে, এটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। যুগে যুগেই চিরদিন এমন হইয়াছে ও হইতেছে এবং পরেও আবার হইবে তাগতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর হইতেই মানবসমাজের গঠন ও সংস্কার চিরদিন ধরিয়াই চলিয়া না আসিলে আমরা বর্তমানকালে যে সমাজকে দেখিতে পাইতেছি, তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম না। যেমন মাহুদের জীবনকে থাকিলে তাহাতে রোম শোক ভোগ এবং উঠা হইতে আমেরিকায় চোরা অনিবার্ণ, তেমনিই সমাজ থাকিলেই তাহাতে দোষ রুচি থাকে এবং তাহার প্রতিকারচেষ্টাও অনিবার্ণ। তা' সে সমাজ হইই কেন না বিচ্ছেদভার সহিত গঠিত হইত, কলক্রেমে সকল জিনিষই কিছু না কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কঠিন হুলে ছিন্ন হইতেও থাকে থাকে না; সেই মত মনোবীষমদগ দ্বারা গঠিত সমাজেরও কঠিন জীর্ণ হুলে ছিন্ন প্রবেশ করিয়া থাকে।

মাতৃনিকের মতে এই পুরাতন নমুনার চূর্ণাঙ্কিত সম্পূর্ণরূপেই ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থলে নতুন করিয়া স্থাপত্যসাধনের একটি ফোঁট গঠিত হওয়া উচিত এবং

প্রাচীনরা বলিতেছেন, পুণো জিনিস যেমন খাট ত্রোমক নতুন তৈরি কর, তেমনিই হইবে না; অতএব ও'তে হাত দিতে বেগুন ও যেমন আছে তেমনি থাক।

ওই বলে এই পট্টা তর্কাতর্কি মনোমালিন্য চলিতেছে, এবং চলিতেই থাকিবে কারণ নৃতনের লুপ্ত নিত্যকাল পরিয়াই চলিবে, আর পুরাতনেরও প্রাথমিক চরিত্র নয়, নতুন ভবিষ্যৎ পুরাতন মতীত, অতঃপর নতুন, কাল তাগাই পুরাতন, এ খেলা নিত্যকালের। এখন কথা এই, জিনিষ পুরান হয়, পুরাতনের সংস্কারের প্রয়োজন ঘটে, এ কথাটা ঠিকই, তবে সেই সংস্কারটা সম্পূর্ণরূপে পুরাতনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়া করা আবশ্যিক কি না, সেইখানেই মতভেদ।

মনে কখন রাজমল্লিক পুরাতন চাইয়াছে, উঠাকে সংস্কার করিতে হইবে, কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া ঐ মল্লিকের আত্মতনটিকে কি ভাঙিয়া ফেলিয়া তা'র চূর্ণকবা কনক্রিট দিয়া নতুন মোমের রাস্তা তৈরি করিতে হইবে? না, উঠারই পায়ে যেখানে যেটুকু মোহাং মোহাং হইয়াছে তাহাকেই যথাসাধ্য লাফ করিয়া বা বহলাইয়া দিতে হইবে? বড় জিনিষ, ভাল জিনিষ বড় সহজে ভাঙে না, বড় সহজে ভাঙাও যায় না এবং ভাঙিবার প্রয়োজনও ঠিক ঘটে না। ধরকার হয় তার জীর্ণ সংস্কার। ভগ্নপ্রাণের মন্দির ভাঙিয়া সংস্কার করা হয় না; নবকলের তৈরি হয় ভগ্নপ্রাণের।

ইহানীং সকল বেশেই সমাজ ভাঙার আশ্রয়টা কিছু বেশি মাত্রার ঘোর করিয়া উঠিয়াছে, সেটা পূর্বে স্বাভাবিক বোধ হয় না এবং তার ফলও সেইজন্য খুব সুফলপ্রসূ নাও হইতে পারে। যেমন কাল্পনের রাজমহিষী রাণী দৌর্যোদে মতান্তর ক্ষতবস্তুর সমাজসংস্কার তাঁর স্বামীর পুত্রের, দেশের এবং সমাজের পক্ষে শুভকারী হয় নাই।

সংস্কার খুব বিলম্বপত্রার সহিত মূলমূল্যের সহিত সংস্কারের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা এবং বাহ্যদেয় ভক্ত সংস্কার



হাদিসের প্রচলিত পত্রিকা কথিত। যৌবন যৌবন হওয়াই সম্ভব। সমাজসংস্কার এবং রাষ্ট্রবিপ্লব গ্রিক একই পন্থায় চলেতে পারে না,—চট্টোপাধ্যায় ভাষায় ভর না, বলাৎশবিক বাণিজ্যেও তাইবা উপক্রম দেখা দিতেছে। সেখানে বিবাহসংস্কারের বিচ্ছেদ উচিত বলে মনে উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের নারীসমাজে অনেক কিছু লজ্জার কথার আছে, সে সব দিকে মন না দিয়া জনকতক ব্যক্তি বিশেষ একটা বিশাতি বাগদারী লগ্নার আগ্রহে তাঁদের যোগ্যতার বহির্ভূত কতকগুলি ক্ষত্রের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বসিয়াছেন এবং আমাদের দেশের কতকগুলি সম্পূর্ণ বিশাতি-অংশে গঠিত, শালিত নরনারী তাঁদের এই খেয়াল (whim)-কে উপহার দান করিয়া প্রবর্তিত করিতেছেন। আগুনকে জ্বলিত কর: যে সকলক্ষেত্রে নিরাপদ নয় সে কথা বুঝিবার শক্তি শিশুর থাকে না এবং অনেক যাত্রা নৈশবাবস্থা পার হইয়াও শিশুপ্রকৃতি ভাগ্য করিতে পারেন

চিন্তা-বিচার-বিচ্ছেদ-বিলম্বই হইয়া থাকে। হিন্দুনারীর শিক্ষাকৌশল এবং জীবনের আদর্শের গঠিত বিবাহকিঙ্করের কিছুমাত্রও টোকা নাই। আমার বহুব্র জ্ঞান আছে, কোন দেশেরই লড়া সাক্ষী নারী ডিভোর্সের স্বপক্ষ মছেন। কলিকাতা নিখিল ভারতমহিলা সঙ্ঘলীতে যখন 'অধৈর্যভাবে এই প্রত্যাবর্তিকে গৃহীত করানর চেষ্টা হয়, তখন এবং তাহার পরেও সেখানে উপস্থিত বহুতর গণ্যমান্য সকল সাম্প্রদায়িক আর্মিগণিগণ ইত্যর প্রতিবাদ করিয়া এই প্রত্যাবর্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

"Divorce for a Hindu lady should not be thought of."

কোন একটা নব্যশিক্ষাপ্রাণী কিশোরী আমার এই কথাটির প্রতিবাদস্বরূপে এইরূপ লিখেন।

"Regarding her remark that 'divorce for a Hindu lady should not be thought of' I would only beseech her not to take charge of the thoughts of the Hindu ladies but leave them alone to think for themselves and no one is

denying the right of firm faith that she may choose to have for herself in the matter."

আজ্ঞা জাই যদি হয়, আমিও কি তাঁকে গ্রিক এই কথাটাই বলিতে পারি না? তাহের মত যদি আমার মাথা-বাখার বহুব্র না থাকে, তবে এই সব অশ্রুপিতব্যক্তা নব্যশিক্ষিতা অবিবাহিতা বা লজ্জাবাহিতা মেয়েদেরই বা সমস্ত হিন্দুসমাজের মেয়েদের ভালমন্দ চিন্তার কিসের অধিকার আছে? এবং আমার চেয়ে কোন্‌ বড় অধিকারের দাবীতে তাঁরা হিন্দুসমাজের উপর বৈধিক লজ্জার ঢালাইতে চান? এই কথা ভিজাগা করিলে কুঠতা প্রকাশ পাইবে কি?

ডিভোর্স বাণ্যারটার বর্ণার্থজন্য অসম্মিততা সাধারণ মেয়েরা চমক দবাই ভাল করিয়া জানেনও না, ইহাভীতে আগাগোড়া বক্তৃতা দিয়া এক কথার তার অর্থটুকু বুঝাইয়াই হাত তুলিতে বলিলে তাও মাজ জনকতকের কানে মারে সেই বাখাটুকু ঢুকিল কি না ঢুকিল, জনকতক হিন্দু মেয়ে যদি স্বপক্ষেই আরও অনেকগুলি ইউরেশিয়ান অবিবাহিতা মেয়ে ও ব্রাহ্ম বা হিন্দু নিত্যন্ত কমবয়সী নবা মেয়েদের সঙ্গে হিন্দু মেয়েও ভুল বুঝিয়া বা না বুঝিয়া হাত তুলিয়া বলে, তাকে হঠকারিতার সহিত হিন্দু সমাজের এই মত বলিয়া ধরা কত বড় কুঠতা তা' জনসাধারণেরই বিবেচ্য।

হিন্দু মেয়েদের মঙ্গলচিন্তার অধিকার ও চেষ্টার দাবী হিন্দু সমাজের চিন্তাফাল্গুনী বা ফিতাফাল্গুনী মাঝেরই আছে, তিনি যে সাম্প্রদায়িক হিন্দুই হোন, অথবা হিন্দু নাই হোন। এমন কি তথাকথিত অজ্ঞান বহুশ্রুতি কিশোরীদের চেয়ে পরিণতবুদ্ধি লর্ড রোনাল্ডসেরও আছে, ইহা সুনিশ্চিত।

কোন সমাজেরই সম্বল নয় বা নারী মুক্তি বা সাক্ষী অথবা উন্নতচিন্তা হইতে পারে না। যে সমাজের লোকসংখ্যা বহু বেশি হয় তাহাতে গণ্য বালা তত বেশি অন্ততঃ সম্ভব হইলেও সে হিসাবে হিন্দু সমাজ অত্যন্ত অনেক সমাজেরই অনেক উপরে; তথাপি হিন্দু নারীর হাতে পত্নী-নির্ব্যাতনের নিশ্চয়ই অস্ত্র নাই, এ সব কেহে লজ্জানারী পতিবিরুদ্ধ। ব্যাকিরা জীবনধারণে হস্ত বাধা হইতে

পারেন, এর ভিন্ন 'মেন্টেডাণ' বা জুডিসিয়াল সেপারেশন গণ্যতে আইনের ভাঙে নাহে পান এবং ঐ অত্যাচারী পতি থাকতে পুনঃ বিবাহ করিতে না পারেন, সে চোটা ওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদপূর্বক হিন্দুনারী পত্যভার গ্রহণের অধিকারিণী হইবেন, এর চেয়ে কিছু সমাধের অধঃপতন আর কিছু কল্পনা করিবার নাই।

হিন্দুনারীর বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারে না, কিন্তু বিবাহ কনট্রাক্ট বা চুক্তি যায় না, হিন্দুবিবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হিন্দুপুরোহিতের উপস্থিতিতে লিখিত নথিপত্র :— এইটুকু যাতয়া বন্ধা করিয়া না চলিলে ভারতমহিলার আধীন্যতীর, হিন্দুনারীর নিজস্ব পূর্ণ স্বাধীনতা উীর সমস্ত মহিমা পরিমা, চিরদিনের জন্যই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ভারতের সত্যীতসৌভব পুত্রাভিন পক্ষপাত্য পরিণত হইবে। অগতঃ ইতিপূর্বে ভারতের পক্ষে এত বড় কতি বোধ করি ভার এই পত পতবর্ণ্যাপী পরাধীনতাতত্ত্ব লিখিত হয় নাই।

আমাদের দেশে যিশেষতঃ বিচার অক্ষমে কাকার কৃষ্ণি প্রভৃতি জনগণে জাতির ভিতরে প্রচুরভাবেই এই বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে, 'সাগাই' স্বর্গকে সেখানে যেহে পুরুষের equal right। জন-অনারেরই বহুতর জাতির মধ্যেও ঐ ব্যবহার। Law of Evolution theoryর অগ্রক্ৰমে ঐব ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চতরে আরোহণ করিতে থাকে, নিরপামী হয় না ; যে তর হইতে আমরা বহু পূর্বে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি, আর আবার কোন প্রতিকূলণ কিরিয়া তাহাতেই পুনরাবর্তন করিতে বাইব ? "অনেক জন্ম সংগর্ভ" শব্দে উক্ত পতি লাভ কাহা থাকে, উচ্চবর্ণের হিন্দুর মেয়ের নিরপামী ওয়ার প্রয়োজন আছে মনে করি না।

সমাজে তার অস্ত্রায় লক্ষ্যই আছে, তার প্রতিকার অস্ত্র তাহেই বাহনীয়। ইহার প্রতিকারেই নরনারীর উত্তমতঃ বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা নীতিশিক্ষা উচ্চশিক্ষা মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে পুত্রাভিন জাতিবর্ণ্যীর সত্যীতবর্ণের নারীবাণীর উচ্চবর্ণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চোরাই হৃদয়তঃ সঙ্গত দেশবাসী ইউরোপীয় মহিলা পণ্ডনের কোন প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি না এবং ইউরোপীয়-ভাবাপত্তা হইয়া না

উঠিলেই এ দেশে মেয়েদের মেয়েদের লক্ষ্যনাশ উপস্থিত হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি না, বরং প্রথম লক্ষ্য বিষয়ে বিধি বিনির্দেশ যে এসেদের লক্ষ্যনাশ অনিবার্য তাহারই উপক্রম দেখা যাইতেছে।

মেয়েদের জিভার্গের অধিকার না পাওয়া বরং পুরুষ থাকতে কল্যাণ কল্যাণ স্ত্রী ভাগ্য করিতে না পারে, এক স্ত্রী বস্ত্রমানে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে না পারে, সে চোটা করাই সম্ভব। বঙ্গের একজন দূরদর্শী মহাপুরুষ মহাশয়া কৃষ্ণেব যুগোপাধায় মহাশয় তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধে বিশদীক পুরুষের শব্দে দ্বিতীয়বার বিবাহের বিরুদ্ধে (যেদিনে পুরুষের বহু বিবাহও বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ ছিল না, স্থলীন সম্ভাব্যে বরং সংখ্যাধিকাই ব্যাপ্তজনক ছিল সেই দিনে) লিখিত গিরঞ্জিন :—

"তমস্ ভলবাসা চুটবার হয় না, চুটবারে উপস্থিত হয় না, যে ভালবেসেছে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই বেসে থাকটী বুঝিযাকে।—যে সরাসরি চুটযাকে, সে কি তার গুটি হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত অশ্রমব্রতী। সামান্য দৃষ্টিপুর্বেই দেখ, যে গিরাজে তাহাকে মনে করিতেই হইবে যদি তাহাকে নৃগিতে পার তবে না পার কি? আবার তাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই তো আর কাহাকেও মনে করিতে নাহ। তবে চুটবার বিবাহ করিলে সমাজভট বাধিল। এক লক্ষ মনে করিতেই হইবে, লক্ষ্যভরে মনে করিতেও নাহ। ঐ চুটবার যে লক্ষ অবলম্বন করিবে, কল্যাণের ক্রটি হইবে, ধার্মের বাধ্যত জাগ্রিবে, পাকড়া নষ্ট হইবে।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে কোম্প্রভের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই একাধিক বার বিবাহ করিবে না। আমাদের পাশ্চাত্য বলে, প্রথম বিবাহই সমাজের তাহার পর তার সম্ভার হয় না।"

এর চেয়ে বড় আদম আর কোমার আছে বোধ হয় না। বহুবিবাহ অর্থাৎ এক স্ত্রী বস্ত্রমানে অপর স্ত্রী গ্রহণ স্বর্গকে উীর পারিবারিক প্রবন্ধের লিখিত হইয়াছে—

"যখন এক পত্নী গতান্ত হইলেও অপর দায়পরিত্রা অবৈধ গুণন একপত্নী বিচ্ছিন্ন থাকিতে অপর স্ত্রীর পার্শ্ব-





এরূপের কথা উল্লেখ করিতেই পারা যায় না। বাস্তবিক 'তাহাই বটে—'

অধিক উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনা। আধুনিক এবং বারো প্রবীণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর নিজেদের একান্ত আধুনিক বোধ করিয়া থাকেন, তাঁদের কাছে এ সব দৃষ্টি বিচার কিছুই গ্রাহ্য নহে। পুরাতন ছবি হইতে আরম্ভ করিয়া ৮তম শতাব্দীর মূখোপাধায় পর্যন্ত যে সব পথিক চিত্রিত মহাশয়রা নিত্যস্মরণের উপদেশ মান করিয়াছেন সবটাই তাঁদের কাছে মহান উপেক্ষার। তাঁরা নারী পুরুষের সমান ভাবে প্রগতিশ্রোতে ভাসমান হওবারই পক্ষপাতী। আধুনিক নারী পুরুষের উজ্জ্বলতা সজিতে অনিচ্ছক থাক, ভূমিত প্রগতিমার্গ গ্রহণ কর, বাড়ি তোমার অন্ত তা বাঁচনা নিত্যস্মরণের পথিক হইতে পারিব না, আদম এরা ইউরোপ! মেসলে লিখিয়াছিলেন,—

"We must do our best to form a class of persons Indian in blood and colour but English in taste in opinions and intellect."

এক্স এবং পাকবর্ণে ভারতীয় কিন্তু কৃতি মত এবং বুদ্ধিতে ইংরাজ এইরূপ একদল লোক গড়িয়া তুলিতে আমরা যোগাযোগ চেষ্টা করিব।"

Educated in the same way.

same objects, engaged in the same pursuits with ourselves they will become more English than Hindu,—just as the Roman Provincials became more Romans than Gauls.

Trevelligan's Despatch. 1858.

আমাদের দৃষ্টিতে একই পদ্ধতিতে শিক্ষিত একট বিঘ্নে আগ্রহাবিত একট উৎক্রে কার্যনিবৃত্ত ভাঙার চন্দ্র অপেক্ষা বেশি টংরা হইয়া পড়িবে, রোমান সম্রাজ্ঞের বিভিন্ন প্রদেশবাদীগণ যেমন 'গলেস' অপেক্ষা অধিকতর রোমানে হইয়া পড়িয়াছিল।—ট্রাভেলগানের প্রেরিত লিপি, ১৮৫৩।

আমরা কি সত্যই এঁদের এই স্পষ্টিত্ত ভবিষ্যৎ বাণীকে লক্ষ্য করিতে বাটতেছি?



# মুরোপ

## ঐক্যবাক্য

১

কাউন্ট হারম্যান কাউনারলিঙ্ক্‌ এবং তার সঙ্গীত।  
‘দার্শনিকের সমন্বয়বাদ’ লিখে এর প্রকাশিত হয়।  
সঙ্গীত টি “মুরোপের সঙ্গীতবৃত্ত বিশ্লেষণ” (The  
Spectrum European নামক একটা বই লিখেছেন। উক্ত  
বইএই ইংরেজী অনূবাদ—‘মুরোপ’।

‘মুরোপ’ টি মূল কৃষ্ণের পাইড ব্লক্‌ নয়। এতে দেশ-  
বিশেষের সামাজিক বর্ণনা কিংবা স্টোপেল বৈজ্ঞানিক সংবাদ  
নেই। মানুষ নিয়েই কাউনারলিঙ্কের কারবার ‘মুরোপ’  
ডির ডির মুরোপীক জাতির আলোচনা।

একটা সমগ্র জাতি কিংবা অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতির  
উপর অতিমাত্র প্রকাশ কববার অধিকার একজন ব্যক্তির  
আছে কিনা, এমতাবাদী কাউনারলিঙ্ক্‌ স্বয়ং তাঁর চূড়ি-  
কার করেছেন। তিনি বলেন যে এ রকম অধিকার  
ব্যক্তিমানেরই আছে। কোন ব্যক্তিকে জানা দুল,  
যোতা দুল। জানবার ক্ষমতা অনেক কিছু পড়তে হয়,  
দেখতে হয়, ভিগেন ক’রে একটা ধারণার আলোতে হয়।  
যোতাবার ক্ষমতা অস্বত্বভিত্তি বৈজ্ঞানিক। এমন অস্বত্বভিত্তি বৈজ্ঞানিক।  
আলোচকের মতামতের মূল্য নিউন করে এহুই উপর।  
কাউনারলিঙ্কের অস্বত্বভিত্তিক গবেষণা; স্তম্ভের এই চিন্তা  
মূল্যবান।

প্রথমই ব’লে রাখা উচিত যে মুরোপ মরে নি; নিকট  
তথ্যে মরবেও না। আমাদের দেশে এমন লোকও  
আছেন যারা ভাবেন যে মুরোপ আলম পেতে ভারতবর্ষের  
কাছ থেকে অধ্যাত্ম দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্য ব’লে আছে।  
এটা আমাদের ভুল। মুরোপ যদি কোনোদিন নিজে  
আত্ম সত্যের ত সে ভারতবর্ষ থেকে অধ্যাত্মিক স্পেশালিট  
Europe by Count Hermann Keyserling (Jonathan  
price 21 shillings.

জাতিবে না—যদি নিজেই আত্মা খুঁজে দেয় করবে।  
আমরা যখন ভাবি, মুরোপ আর নেই, আরে আরে রবীন্দ্র-  
নাথ এম একটু ভাবিয়ে তোলে, গান্ধী এমই মৃত  
মুরোপ উঠে বসবে—তখন মুরোপীক চিন্তাশীল ব্যক্তির  
চোখের। কাউনারলিঙ্ক্‌ স্পষ্ট ভাষায় আমাদের বলেছেন,  
“তোমরা আগে কর্তব্যের মূল্য দিয়ে বেঁচে এসে, তারপর  
অন্ত কণা।” যারা নিকট পাড়তে গেলে নি তাই যদি  
আর কাউকে বাঁচাবার উপদেশ দেয় তা হ’লে তাই  
সত্যসন্দেহ। তার উপদেশ অনবিকার্য—মৃত্যু।

আমরা এট বো (ভিত্তিতে) কাউনারলিঙ্ক্‌ নিজেই  
একম মৃত্যুর পরিসরে লিখেছেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত-  
দেহের মূল শীতলি যোয় কর্তব্যে চূড়ি যাবে; মানবের দেহ  
মোহনিনার তপস্বীর উচ্চারণ লক্ষ্য করবে মুরোপ। এটা  
কাউনারলিঙ্কের কল্পনা।

পত মতামতের পর মুরোপের ডির ডির দেশ মুরোপ  
লক্ষ্যে ভাবতে শিখেছে। কারণ, মুরোপের সময় আমেরিকার  
লক্ষ্যে এত বেশী হ’ল যে মুরোপ এখন আমেরিকার  
চুলনার অনেক পেছনে। মুরোপ আমেরিকার বিকল্প  
বা মানসিক বৃদ্ধির চক্ষে তার কারণ মুরোপের মৌলিক  
ভাব (inferiority complex)। উক্ত ভাবের পর্বপ্রায়  
গান্ধী মুরোপীক মৃত্যুমেট। এটই বর্তমান মুরোপের মূল্য  
চিন্তাধারা। কাউনারলিঙ্ক্‌ এবং উল্লেখ্য করেন  
নি।

গান্ধী মুরোপীক মৃত্যুমেট ছাড়া মুরোপে অন্য একটি  
ভাবের প্রাধান্য পাওয়া যায়, তার নাম সত্যসত্যবাদ। মুরোপ  
যখন আমেরিকার দিকে তাকায় তখন সে মৌলিক ভাবে  
‘অভিভূত’ হয়। কিন্তু এদিকে অতিক্রম দিকে তাকালে  
তার সৌন্দর্য্যবোধের শেখ নেই; তখন সে পৃথিবীর অন্যান্য  
নেচে পড়ে।



সম্মতি এ ছাড়া তাই হুগো আত্মকোনা ভাব নেই। স্বপ্ন রাখা উচিত যে আমি যুরোপের ভিত্তি ভিত্তি দেশের কথা বলছি না—যুরোপ-সমগ্রের কথা বলছি। কাইসারগিট, যদি বলতেন যে সমস্ত সংসারের মুক্তির তার রয়েছে ইংল্যান্ড কিংবা ফ্রান্স, কিংবা বাল্কান পেনিনসুলার উপর তা হ'লে আমি তার মুক্তির আলোচনা করতুম। কিন্তু কাইসারগিট বলেন যুরোপ *as a whole* মানুষের উদ্ধার সাধন করবে; আমার মতে যুরোপের এমন কোনও অঙ্গিকার কিংবা ক্ষমতা নেই।

কাইসারগিটেরই কথাগুলোতে, নব-ইতালীর স্বপ্ন হ'লে দিন; বাস্তব পক্ষে শ্মশন আফ্রিকার আগ্নেয়; অসীম সুতাপ্রায়; ষাঁটুকাংলায় পড়ার দেশ; রাসিয়ার এলগার বিকাশ; হাভিসেভিরা প্রভৃতিবিধি—একাকী; চণ্ডাণ্ড, বেলজিয়ম ফ্রান্সের সাহায্য-লাগে। সুতরাং, কাইসারগিটের যুরোপের স্বপ্ন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর জর্জিবি। চণ্ডাণ্ডে রাজনীতিক বিকাশ ঘাটত কাইসারগিট, কিছুই পান নি; জর্জিবিই বিশেষ বাস্তবের আধার। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে রাজনীতি নিজেই সংসারের উদ্ধার সাধন হবে না; বাস্তবের আধার কিংবা সাধন ভারতবর্ষ কিংবা যে কোনো দেশে হ'তে পারে। সুতরাং ইংল্যান্ড কিংবা জর্জিবি প্রণয়ের সময়ের নোয়ার আর্ক হ'তে পারে না। থেকে গেল ফ্রান্স।

ফ্রান্স সবচেয়ে কাইসারগিটের সন্তোষ প্রবী উক্ত, আহারও। কিন্তু ফ্রান্স ত যুরোপ নয়, যুরোপের একটা দেশ। এর মহত্ব বর্তমানে হ'ক না কেন, কেবল ফ্রান্সের স্বপ্ন যুরোপ নয়। কাইসারগিট, যখন বলেছেন যে দরাসী ফ্রান্স ছাড়া কিছুই থাকে না। এইটা যদি সত্য হয়, তবে ফ্রান্সই বা জগতের কল্যাণসাধন করবে কি করে? আর এক জায়গায়, তার বিবেচনার পরিধি সঙ্কুচিত করে, কাইসারগিট বলেছেন যে যুরোপের ভবিষ্যৎ অনেকটা ফ্রান্সের উপর নির্ভর করে এবং ফ্রান্স যুরোপের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হ'তে পারে অনেকটা ভাগ্য করে। কি ভাগ্য করে—তা কাইসারগিট, বলেন নি। ঠিক মতে—“Should France make its decision in favour of the Poincaré attitude, it

signs its own deathwarrant as a factor of significance in the Europe of the future.”

Poincaré—আধুনিক ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী। সাম্প্রতিক অর্থোগতি থেকে ফ্রান্সকে বিচারাধার বাতায়নী এই। ইনিই এ দেশের বাস্তবিক প্রতিনিধি। এই বঙ্গের তাহ-বারী মাসে একজন করাসী লেখক “আমার জগদ্বৃতি যুরোপ” নামক এক বই লিখে উক্ত করাসী ঘটাপুস্তকে তুমিতা লিখতে অনুরোধ করেন। তুমিতা তিনি লিখলেন। তাঁর একটা বাক্য এই; “বাস্তবপক্ষে, আমি আগনার বইএর নাম মানি না। আমার জগদ্বৃতি যুরোপ? না। সেত ফ্রান্স—স্বাধীন এবং এক।” (“Je ne vois, à vrai dire, souscrire à votre titre ‘Europe, ma Patrie’ Ma Patrie, c’est la France, indépendante et intégrale.”)

এই মত ফ্রান্সেরই মত। সুতরাং, কাইসারগিটের বাক্যগুলোতে ফ্রান্সের বাহা যুরোপের কল্যাণ সাধন হবে কি না লক্ষ্যে, জগতের ত কথাই নেই।

যুরোপে আর ঘাই হ'ক, এর মধ্যে সংসারের গুরু হ'বার ক্ষমতা নেই। যে যুরোপের স্বপ্ন কাইসারগিট, দেখেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই। কাইসারগিট, স্বপ্ন দেখেন কেননা তিনি কবি, দার্শনিক, রাজনীতিক, সাংবাদিক। তাঁর নিজের বাক্য এই; “আমি লখনত আমিই, দ্বিতীয়ত একজন বহুলোক, তৃতীয়ত কাইসারগিট, তারপর ক্রমশ পশ্চিমা, যুরোপীয়, বাল্কান, আফ্রান, রশিয়ান আর ফ্রেন্স।” (P. 341)

সমস্ত বইএর মধ্যে যে কথাটি আমার সব চেয়ে বেশী মহত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সে এটি; “পূর্ব দিকই এমন সময় আসবে যখন ফ্রান্সছাড়া সংসারের সব দেশ থেকে শ্রেয় লুপ্ত হ'বে থাকে।” এই বিপদের সন্ধান সন্সারের কম লোকই পান; কিন্তু বিশদ অবতারণা এবং নিদানক।

গ্রেম এগনের সময়, ফ্রান্স কিংবা ভারতবর্ষ কিংবা আফ্রিকা কিংবা কোনো একটা দেশ—কি কারণে বৈধে থাকবে তার সীমাংসা আমি এই স্থলে করব না। কাই-

পারলিঙ্ক বলেন যে ক্যাশীরা মেমের পদ্ধতি জানে। সুতরাং প্রেম ভাবের বেশে থেকে যাবে। আমি বলি, আমরা প্রেমের দীক্ষা নতুনভাবে গ্রহণ করছি, সুতরাং ভারতবর্ষই তবিতম প্রেমভূমি। যাঁরা পুরাতন দার্শনিক ঠাণ্ডা দ্যাভা-বিকতার মোহাই দিয়ে বলেন, আত্মিকার মক্কুমিত্তেই মেমের একমাত্র নিবাস এবং বিকাশ। চরম সকলেরই মত ভ্রান্ত; চরম সকলেরই মত সত্য। আমি জানি এই যে, মুরোপের কয়েকটি মেন থেকে প্রেম লুপ্ত হ'তে গেছে। মেনদের অজ্ঞাত মেন থেকে কোন্ ভারিদের কোন্ দুহুর্ভে যে এ মহাপ্রলাপ উঠে যাবে—কাইনারলিঙ্ক বলতে পারেন।

নারীর নিকের কোনো বিবেক নেই। তার নীতি-জ্ঞান নিয়মশালন ছাড়া আর কিছু নয়। দশ বছর আগে সতী হওয়া ছিল বর্ষ, এখন সেটা 'মাদ্বুনিক নহ' (unmodern)। ফলে লকলে অদভী হওয়াতেই মানস গোব করছে। এমন কি সতী লকের উল্লেখ ভীষণ মেকেনে (unmodern)।

যতাবতঃ, নারীর লক্ষ্যজ্ঞানও নেই। নিয়মশালনেই নারীর পক্ষ। দশ বছর আগে যে সত্যা ব'বু করানো অচিহ্নিত মনে করত সে আজ লিঙ্ক করে ঘুরে বেড়ায়। এটা অর্থ নহ, খাবাপও নহ। এতে প্রমাণ হয় শুধু এট যে, নারীর লক্ষ্যজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দশকনের মতামতের উপর। এমন মতামতের কর্তা (অন্ততঃ মুরোপে) ক্যাননের প্রবর্তকগণ। এঁদেরই চোখে প্রেম পুরাতন ভ্রান্তি—মাদ্বুনিক নহ। কাইনারলিঙ্ক বলেন, এরা যদি ঠিক ক'রে বের যে বছরের অদুক দিনে লকল নারীদের অদভী হওয়া উচিত, নারীদের আপত্তি ব্যক্তবে না। আমি মরণ করিতে দিই, কথা হচ্ছে মুরোপের।

এই প্রবের বিবেচনা কাইনারলিঙ্ক অজ্ঞ ভাবেও করেছেন, যাতে এঁর প্রবের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, নারীর সৌরব তার মাক্তব। এইটি তার সব রকমের চিন্তার কষ্টপাথর এবং নীতিজ্ঞানের মূল। এখন মুরোপের নারীরা এই সম্পদ্বিক অধিকার-রূপে পরিপত ক'রে তুলছে। জোট দেওয়া অধিকার, তর্ক করা অধিকার, পারজামা পরা অধিকার, পুঙ্খবদেব

পারের তলায় রাখাও অধিকার। এ সকল অধিকারের মতনই হচ্ছে এখন মা চব্বার অধিকার। ফলে, নারীরা বলে, 'বামা'দের (আর মুরোপের বেচারী পুঙ্খবদেব 'বামা' বলা চলে কি?) শিত্তপ্রজন্মের কমতা না থাকে কামরা অজ্ঞ পুঙ্খবদেব দিকে তাকাবা। গত বৎসর একজন লেখিকা বিয়ে না ক'রে অজানা পুঙ্খবদেব কাছে প্রজন্ম তিকা নিয়ে মা চ'লেন—এট প্রতীতি যুব পাঠ্যই গাথারন হ'রে যাবে। ঠিক এই কথা লর্ড বেকেন্স্চড মজ্ঞ ভাবে Nash শক্তিকার বলেছেন।

ব্যয়বপক্ষে, যদি নারীর চিন্তাশক্তি যুব মরণ হয়, যদি তার মাক্তবচাবের দাবা এতট বেনী যে সে নীতি-জ্ঞানের উপরে উঠেও পারে—(নীতিজ্ঞান চারানে: অজ্ঞ)—তবে আমি প্রজন্মনীতিকাকের অজ্ঞার মনে করি না। কিন্তু এককম দাবীর প্রমাণ পাওয়া যাবে কি ক'রে? যুবোলের সব জাণসার নারীরা শিত্তকে মত ভালবাসেন তার চেয়ে বেনী ভালবাসেন মেটরকে।

নারীর কাছ থেকে পুঙ্খ কি চায়? এবে উত্তর কাউসাপ-লিঙ্ক যেন নি, আমি বিলাম।

পুঙ্খবদেব আচ্ছা একাকী। সে যেন কি শ্বৃতিতে গলত পাচ্ছে না। তার লুপ্ত মাদনার মধ্য দিয়ে এই মা-পাওয়ারই তাব হুটে উঠছে। দশকের অন্তরতম প্রবেশে সে যখন এক মস্ত অবোধ শিত্তর মতন কায়ে, তখন সে নারীর পানে তাকায়, শুধু তাকায়। সেট দুহুর্ভে সে নিকের সব অজ্ঞার কুলে যায়। মানবের চিন্তামন শিত্ত-আচ্ছা নারীর পায়ে দাখিত। নারী এ কথা চলে পাচ্ছে। সে তার অধিকার; পাথে। কিন্তু যে দিন পুঙ্খ নারীর মধ্যো পকির মাক্তমুষ্টির আচ্ছাভালা গমন পাথে না, সে দিন একাই সে ক্ষিরে যাবে; সে দিন নারীর লুপ্ত বেনী পূর্ণ হবে না। এমন দিন লুপ্তই আসবে।

## পারিশিষ্ট

[ নিম্নোক্তচিত্রিত অধিকারের লিখিত আদায় হিসেবে কোনো সম্পদ নেই  
কষ্টপাথরিতের নীতিকতার উপর আদায় এতট সত্যা সে আদি

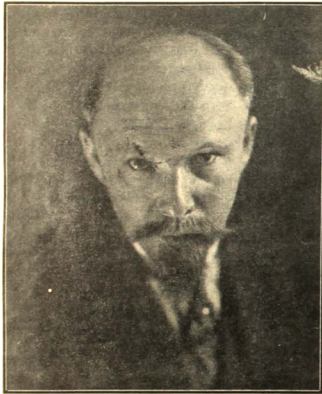


## On the Englishman

"Yet the same Englishman, whose distaste

for intellectual problems borders on disgust, is often capable of uttering surer judgments in the intellectual field than any but the most gifted continentals; but on one condition the problem

question must be of inmost concern to him. If, on the other hand, he is not thus concerned, he passes no judgment at all. Again we perceive the advantage of this animal psyche animal instinct unerring, but it only comes into play where the life of the animal makes it proper and necessary; whatever does affect it just does not exist. Young people 'do' something together; they hardly speak, or, if they do, it is to utter either an obvious triviality or a piece of nonsense; the rising to emergencies typical for all of them when the moment comes



Hermann Keyserling

ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଚାରମାନ, ସେଇଆ ଆମି ପାହେଇ କାହା କହଇ ।  
କାହିଁକିକିଲିକି କାହାକିଲିକି କାହିଁ କହିଲିକି ଆମି ଅନ୍ୟତ୍ର କାହା  
କହିଲିକି ]

for a practical decision, for effective action, the decision comes and the action follows; and all of them see more sense

in putting after a ball than in the perusal of good books. It further becomes clear, at this point, to what extent the strong-willed Englishman, with whom self-control is a national ideal, is no man of will at all." ( P. 20-21. )

### On the French

"The Frenchman believes in 'definition' as natural peoples believe in the fetish. But we can clearly define in the French sense, only that which we already know. In order to understand something which is new in essence we must yield ourselves to it until the new, necessary organs of cognition evolve. Submission of this sort is beyond the capacity of the Frenchman. This renders him incapable of adding to his knowledge ; he is incapable of inner transformation. Hence the unequalled stupidity of French criticism in regard to those matters which can be understood only from the premise of the new world in the making. It is for this very reason that the French often see depth in the shallowest things, if only they lift whatever seems to them misty and undefined on to the plane of the 'already known.' The blazing of new paths is not for this race." ( P. 64. )

### On the German

"It was an Englishman who made this quip : 'If there were two gates, on the first of which was inscribed *To Heaven*, and on the other *To*

*Lectures about Heaven*, all Germans make for the second.' This man saw deep."

( P. 39. )

### On Europe

The material prosperity of Europe of course at an end. Its power in the East will end before long. It may be that the industrial centre of this planet will shift over to Asia. Invention is difficult, but even the ape can imitate. Before long all our technical ability will be common human property. Before long, if we continue to plume ourselves on our achievements, we Europeans will be stared at just as Cornelius Nepos would be if he suddenly appeared in our midst with a general claim to the world's worship ; we have become our own classics. *These circumstances the mere self-pro-*  
*compels it to adjust itself to what it*  
*to what no one can take away from*  
*is its intellectuality".* ( *গীর্জা ভাষ্যঃ- Geistigkeit.* P. 359. )

### On Himself

"Indeed, when I analyse my own self-consciousness, what do I find myself to be ? First and foremost, I am myself ; second, an aristocrat ; third, a Keyserling ; fourth, a Westerner ; fifth, a European ; sixth, a Balt ; seventh, a German ; eighth, a Russian ; ninth, a Frenchman." ( P. 341. )

## মিলিন্দপাশ্বে নাগসেন

### শ্রীকৃপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

চন্দ্র সূর্য্যোঃ উদয়ান্তের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের অশ্রু-  
রূপক অনন্তকাল ধরিয়া লেখা হইয়া চলিয়াছে, চন্দ্র জাগিতেছে  
সূর্য্য চুড়িতেছে একের আলোতে অন্ধ দীপ্তি পাঠিতেছে।  
মাহুঘের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে আবার জন্মান্তর  
জাগিতেছে;—এ জন্মের কর্ণশক্তি জন্মান্তরকে জাগাইতেছে।

মৃত্যুঃ জীবন-সূর্য্য জন্মান্তরের জীবন-পন্থিকে উদ্বোধনী  
কনাইতেছে। বৌদ্ধ-মনোবী নাগসেন, কাবুল পতি মিলিন্দকে  
যে ভাবে এট জীবন-লক্ষ্যের আলোপ কনাইয়াছিলেন  
সেভাবে যথেষ্ট বিচিত্রতা ও ঐতিহাসিকতা দেখা যায়। এই  
সত্যের বসন্ত এট বার্তা কাবুল-বের মত গুপ্ত করিয়া,  
বহুমানের চিত্তচাপ-মগ্নে শৌচাটিক দিতে পারিয়াছে।

কাবুলরাজ প্রশ্ন করিলেন, “আপনাকে কি নামে মাঙ্ঘান  
করিব?” নাগসেন বলিলেন, “মহারাজ! নাগসেন নামেই  
আমার পরিচয়!...নাগসেন প্রভাত একটা ডাক ডাড়া  
আর কিছু নয়, ইহা নিছক কঁাকা, ইহার ভিতরে আর্মিবাতি-  
মানী কোম নাট, কোন পুরুষ নাই!”

এট প্রকার অসামান্য প্রশ্ন! মিলিন্দ অবাক! “বেশ  
কথা যদি আপনাকে আশা না থাকে তবে বৈরাগ্য, অগ্নে  
দূষণে লব্ধাক্রী শ্রমণপন্থের বিধি-নির্ধারণে কেমন করিয়া  
আম্র প্রকাশ করিতেছে, তবে আপনাকে বুদ্ধ-বাণীর মর্ম-  
জ্ঞানকে কে? কে আপনার ভিতরে সন্তোষের বুদ্ধ-নির্ভারিত  
নিরুপলভে তপস্জপ-বোধ? মাহুঘের যদি আশ্রয় আসেন  
বাণি থাকে তবে এই মহা কব-কেন? পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের  
গুণগুণ কেন চলিতেছে? লক্ষণের বৈধন্য বুঝিয়া কোলাই  
তবে উচিত? শ্রমণের ইত্যাকারী যেমন কোন পাপের  
বালাই নাই, তেমনই শ্রমণেরও গুরু-অধেষণে কোন  
কল নাই!”

চৈলেনিক কাবুলরাজ, নাগসেনের প্রতি বেশ চোখা  
পর হানিলেন। রাজা চান, মাহুঘের ভিতরে চিরন্তন

অভিন্নকায়ীকে ধরিতে, আর নাগসেন চান তাকে কর্পুরের  
মত উড়িয়া দিতে। কিছু ইহার পরে মিলিন্দ যেন কেমন  
বাধা পং আগড়াইতে লাগিলেন অর্থাৎ বৌদ্ধ তর্কের খোলসে  
মাথা ঢুকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা! আপনার মাথার চুল  
কি নাগসেন?...”

এইরূপে লম্বা অন্ধ প্রশ্নাক ধরিয়া; মেডিকেল কলেজের  
anatomyটা নাড়িয়া চাড়িয়া অতিপরিমরবাণী প্রশ্ন  
লক্ষ করিলেন—ইহাদের মধ্যে কোনটি নাগসেন? আর  
নাগসেন এক খালে কহিয়া বাইতে লাগিলেন, “না! মহারাজ!  
এটা নয়, এটা নয়...নয়...নয়...” সবই ‘মেতি নেতি’—  
অর্থাৎ নাগসেনকে বুঝিয়া পাইলেন না। তখন রাজা  
কহিলেন, “হোঃ হোঃ—নাগসেন তবে একবারে কঁাকা—এত  
বড় মিথ্যা কথাটা কেন বলিলেন, যে আপনার নাম  
নাগসেন? আমি ত রাণি রাণি প্রশ্ন করিয়াও নাগসেন  
বুঝিয়া পাইলাম না।”

নাগসেন অসহি বলিলেন, “আচ্ছা মহারাজ, আপন  
সত্যমগ্নে যানবাহিত হইয়া বা পদতলে আদিয়াছেন?”  
রাজা যখন জানাইলেন তিনি যথেষ্ট আদিয়াছেন, তখন  
দার্শনিক প্রশ্ন তুলিলেন, “তব কহ্যার নাম? তব-চক্র কি  
তব?”—এইভাবে পূর্ব্ববারের ভাষা রপের anatomy গুহ  
হইল—আর রাজা ‘না’ ‘না’ হাঁকিতে লাগিলেন। অবশেষে  
নাগসেনের ঘূষে সেই কথা বাহির হইল, “হোঃ হোঃ  
মহারাজ, কোথার রথ? এত বড় মিথ্যা কথাটা কেন  
বলিলেন যে আপন রথাক্রম হইয়া আদিয়াছেন—আমি ত  
রাণি রাণি প্রশ্ন করিয়াও রথ বুঝিয়া পাইলাম না।”

তখন রাজা বলিলেন, “আমি মিথ্যা বলি নাই, রথ একটি  
নাম মাত্র, লক্ষ্যকরের সমীকৃত অবস্থার নামই ‘রথ’।”  
অসহি নাগসেন-কহিয়া উঠিলেন, “ঠিক ঠিক; মহারাজ,  
‘রথ’ যেমন চিনিয়াছেন, ‘নাগসেন’ও তেমনি। যখন তিনি

ভিন্ন অংশসমূহ একত্রিত হয়, সম্ভাব্যতবে মিলন ঘটে, তখনই 'নাগসেন' নামের উৎপত্তি। কিন্তু ইচ্ছাতে কোন একটি অবিচ্ছিন্নতার পূর্বক নাই।"

এই ভাবে অনাচ্ছাদিত হয় চক্রকার লাভ করিল। প্রসঙ্গটিকে দুই ভাগে বিভাগ করা অনায়াসেই চলে। প্রথম ভাগটি শেষ করিয়া আমরা যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিয়াছি, ইহার উত্তর কৃত্যাদি নাই—এরূপকার যেন কোপলে ইচ্ছাকে চাপিয়া দিয়াছেন মনে হয় এবং মিলনকে দিয়া এমন সব প্রশ্ন করান হইয়াছে, যেগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নাগসেনের 'রথ'-সম্পর্কিত প্রস্তাবের মিল হইতে পারে। অপ্রকৃত মাপ্তের (false analogy) ভুল দ্বারা হয় এক্ষেত্রে ভ্রান্তির ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। রথের সঙ্গে মাপ্তের উপমা কখন খাটিতে পারে না। অ-প্রাণের সহিত জীবনের উপমা খাটিতে হইলে মাপ্ত প্রাণীরা একথা অবশ্যই বলিতে হইবে। নাগসেনও তত্ত্ব অনুসরণের সহিত আশ্চর্য-মাপ্তের উপমা খাটিতে দিয়া আশ্চর্যকর বস্তু সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তত্বে সন্নিবেশিত মিলনকল্পিত প্রথম ভাগের উত্তরে অনাচ্ছাদিত করিতে পারিতেন না।

ইহাই ঐতিহাসিক Rhys-Davids-এর theory of putting together। যে পুণ্ডল (পুঙ্খ) নাগসেনের মধ্যে নাহি সেই পুঙ্খ দৃষ্টে সাংখ্য বলিতেছেন,—সংসারাদি ব্যতিরিক্ত: পুমান—পুঙ্খ পরীর হইতে অন্তর্গত। (1.139.) নাগসেন যে অনাচ্ছাদিত দৃষ্টে কহিয়াছেন, সাংখ্য ইহার বস্তু করিতেছেন, পাত্র ভৌতিকো যোগ: (3.17.); জীবের যোগোপাদান ক্রিতি মপ্ তেন ইত্যাদি। ন সাংখ্যিক: চৈতন্য প্রত্যেকাত্ম: (3.20.). জীবের যে চৈতন্য উহা পক্ষান্তরে সমধারণ্য নহে কারণ পুঙ্খ পুঙ্খ রূপে ইহার মধ্যে চৈতন্য থাকিতে দেখা যায় না।

প্রথমতঃ প্রত্যেক (3.21.) চৈতন্য যদি পক্ষান্তরে থাকিত হইত তবে মরণাদি চৈতন্যের অবস্থা কখনো বর্তিত না। ভৌতিকোপাদান ভোগ্যতননীয়মসত্ত্বা পুষ্টিভাব প্রাপ্তবৎ। (5.114.) যেরূপ পরীক্ষা করিলে ইহা যে কাহারও ভোগের বস্তু তাহাই প্রকৃত হইবে, ভোগ্য না

থাকিলে যেরূপ পরিচয় যায়। হাই সাংখ্যকার শেষ উক্তির দৃষ্টে—অজ্ঞান্যো নান্তিঃ সাধনাত্যাবৎ। (6.1.)

নাগসেন যে রথ-প্রদত্ত তুলিয়া আশ্রয় আশ্রয় বিলোপ করিলেন, সে রথ উপনিষদের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গ হইয়াছে—সেখানে বিচার কি হইত? সেখানেও বলিতেছেন, "আত্মানং রবিন: বিদ্ধি, পরীর রথমেব তু, বৃদ্ধিঃ পারিণি: বিদ্ধি কৃত্য মন: প্রসঙ্গমেব চ।" ইচ্ছাকেই দৃষ্টান্ত অনুসরণের পুনর্কতি করা হইয়াছে। রাক্ষস মিলনকে রথের উপর চাপিয়া, যদি নাগসেন যেরূপ 'রথের কবিতেন' ভাবে দাঁড়ি বোঝা মিলিত—কৃষ্ণকোষের রথাক্ষেপে যেমন ঐক্যকল্পনাকে রথের রথী করিয়া যথ্য সাংখ্য দ্বীকার করিয়া জীবন-রথের মহা সমীচীত অনুসরণ করিলেন। এট ভাবে নাগসেন জীবন-রথের সাংখ্যিক অনুসরণ করিলেন, এমন দেখা যায় তিনি জ্ঞানান্তরে জীবন-পন্থাকে কোন প্রকারে ব্যাক্তিতে চাহিয়াছেন।

আবার দৃষ্টা বসিয়াছে। কাল্পনিক মিলন প্রদত্ত করিতেছেন, "জ্ঞান্যো অচ্যাবৎ, কাল্পন্য কি?—এ কালের কোন কিছু কি পরজন্মে প্রবর্তি হইত? উহার দৃষ্টান্ত করে না?" নাগসেন কহিয়া উঠিলেন, "না মরণোহি।" তখন রাক্ষস বলিলেন, "দৃষ্টান্ত দিয়া বসাইয়া দি।" নাগসেন পুঙ্খান্তরে তাহা আবার উপমা করিলেন—"জ্ঞান্যো যদি পুঙ্খান্তরে তাহা আবার উপমা করিলেন—"জ্ঞান্যো যদি কোন লোক একটি দীপ হইতে আর একটি দীপ জ্বালে, তবে কি প্রথমোক্ত দীপটির দ্বিতীয়টিতে উৎসাহিত করে?" মিলন করিলেন, "না"। অর্থাৎ বাস্তবিক প্রাপ্তির করিলেন, "ত্বিৎ তেমনি এ কাল হইতে জ্ঞানান্তরে কোন কিছুই উৎসাহিত নাই।" এইরূপে আশ্রয়-বাস নিরস্ত হইল। রাক্ষস মিলন প্রদীপের নীচের অর্ধেকের দ্বিভাগে দাঁড়িলেন না, সেখানেই নাগসেনের দৃষ্টান্ত চাপলতা লুকাইয়াছিল। এট উপমা খাটিতে পারে না, রথের ভাষা ইচ্ছাও বোধহয়।

দ্বিতীয় দীপ,—এক ক্ষণ হইতে জ্বলি হইয়া পিতাপুত্রের সমকালীন অবস্থতির সহিত উপমা হইতে পারে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে একটির দীপকে উজ্জ্বল দাঁড়ি না হইয়া অপরটির অন্ধকার ঘটে না—সে ক্ষেত্রে ত ইহার প্রয়োজন বৃদ্ধি-বহির্ভূত। একই সময়ে দুই চক্র আকারে কিরণ-করীট





## স্মরণে

### শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

জীবনে জাদিত মনে বিরহের ভয়  
মরণে সে জীতি মোর পিছাছে টুটিয়া,  
গুচিয়াছে তবে সেই উদ্বেগ সংশয়  
হঠাৎ কেমনে আমি তোমারে কুলিয়া ।  
তুমি মোর মূর্তি চিত্র করি অধিকার,  
চে বহু, অজ্ঞাতে হেঁচি এদেশে কখন,  
পত পুতিবিকৃত্তি জখর আমার  
তোমার মিলন-গ্রন্থ হুঁজে অচঞ্চল ।  
মনে পড়ে তোমার যে স্মৃতি মধুর,  
বিগলিত করুণার জালবীর মত,  
রূপবতং প্রেমে চিত্ত ছিল ভরপুর,  
চরিতামৃতগানে কীটনে মতত ।  
সরল উদার প্রাণ, নিষ্কার অটল,  
দীন প্রবোধি 'হরি' তোমা হুঁজে আঁখিজল ।

• বঙ্কিম অভিমতান মিত্রের বিরোধে

## সর্ব-হার

### শ্রীকল্পনা দেবী

বনশী তো কোলাহলে ভরা—

সুখে চলে গড়া এ সংসার,

সব বাখা সব ছুপে      ব'কে নিতে পারি বৃকে  
তুমি যদি আসি সুখে চাও একবার ।

নগনের অলিঙ্গ চাহনি

অথেরেই সেই দুহু হাসি,

শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞপের আলা      মনে হয় কুলমাল —  
যেন সে অমির-চালা কাছে বাজে 'আগি' ।

সকলের মাঝখানে থেকে—

আজ তুমি দবার উপরে ;

আজ এ বৃকের মাঠে,      আজ তুমি সব কাজে  
পল্লবর রাঙে থা— তারকা-মাঝাবে ।

কাছে গেতে চাহিনি কখনো

চাতি শুধু করুণার কলা ;

সুখে আজ তাই ভাল,      দবারে মিত্তক আলো,  
এতটুকু রম্মিতলা— তা ত্রিকি লাব না ?



ଏତୁଟୁ କାମନା ବାହାର—

ତାର କେନ କରେ ଆବିଷୟ ?

ଜ୍ଵଳାନ୍ତେ ବାସିତ ଚିତେ ଏତୁଟୁ ନା ଦିତେ ?

ଯଦି ସେ ନାହନା ମାତ—ବୁକେ ବାଧେ ବଳ ।

ଏକଦିନ—ଦିନ ଏକଦିନ—

ଯଦି ଓ ସେ ହୁଏନ ଆସାର,

ତବୁ ଆଜି ମଢ଼େ ମନେ ମଜିଆଛି ଏ ଜୀବନେ

ଦେବତାର ଆକାଞ୍ଚିତ ଦେବ-ପ୍ରେମଧାର ।

ଆଜି ଆମି ବାହାର ଚିନ୍ତାର—

ସେଦିନ ତା' ଆବିଷୟ ବାହାର

କରେଇ ଆମାର ବୁକେ, ବରଷିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଵପ୍ନେ

ଦେ କହୁ ଚାହେଇ ହୁଏ,— ଜ୍ଵଳାନ୍ତେ କି ମାରେ ?

ସେ ବରଷିବ ଥେମନିଟି ଆଜି—

ସେ ଆକାଞ୍ଚେ ସେଟି ନିମ୍ନ ଛାଡ଼ି,

ସେଟି ନିମ୍ନ ତାରା ଗାନ୍ଧେ, କୋହନା ଆଶୋକେ ଗାନ୍ଧେ

ନିମ୍ନିମ୍ନେ ସେଟି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଗାନ୍ଧେ ।

ସେଟି ବରଷାମାଳା କିରେ ଆମେ—

ସେଟି ଛାଡ଼ି ଆମେ ମାତ ମାତ,

ଥେମନିଟି ସ୍ଵପ୍ନ ଛୋଟେ ବାହାର ଥେମନି ଛୋଟେ

ସୋବତ ଚରିତା ନ'ହେ ଦିନରେ ବିକାଶ ।

ସେଟି ତୁମି—ସେଟି ଆମି ଆଜି

ଆମରା ତୋ ଗିର କେତ ନହି.

ତବେ ସେ ବିକାଶ କହି ? ସେଟି ନିର୍ଜରତା କହି ?

ମନେବ କାହିଁକି ତରା—ସେ ନହନ କହି ?

ଯାକଥାନ୍ତେ ଏ କି ବାସନା !

ଆମି ଆମି—ତୁମି ଚାଲେ ମାତ,

କି କଥା ବାସନେ ଗାନ୍ଧେ— ତବେ ତବେ କିରେ ମାତ—

ମନେ କାନ୍ଦି କି କଥା—ମାତ ନା ସେ ଗାନ୍ଧେ !

ଜୀବନେର କାଳିକ ମହା—

କଥନ କରିବା ବାସନା ସ୍ଵପ୍ନ.

ସେ ନୁହେ ଏ ଅଭିମାନେ ବେଶେ ମେତେଇ ମାତେ

ହାତେ ଗନ୍ଧେ ଆମି ଗାନ୍ଧେବନା ଗାନ୍ଧେ !

ଏକଦିନ ମଜିଆଛି ସାମି—

ଆଜି ଓ ତବେ ମଜିବ ମଜଳ,

ତୁମି କୋରା ନାକେ ଗାନ୍ଧେ, ନିଗୋ ନା ନିଗୋ ନା ଗାନ୍ଧେ,

ଯଦି କହୁ ନୁହେ ନୁହେ ଗାନ୍ଧେ ଆମେ ଗାନ୍ଧେ ।

ମୁହାବୋ ସେ ଅତୀତେର କଥା;

ଏକଦିନ ତବୋ ମନେ ମନେ,

ଆମି ବା ବାହାର ଗାନ୍ଧେ, ତବେ ବେଶେ ଏ ବାହାର—

କେ ମେତେଇ ଏକ କାନ୍ଦି ମଜିବେ ଜୀବନେ ?

ମେତେ ଆଶା—ମିତେଇ ଗାନ୍ଧେ—

ଆଜି ଗୁଣୁ ଗାନ୍ଧେବନା ତାର,

ତାଟି ମିତେ ବେତେ ଆଜି ଆଜି ଗାନ୍ଧେ କରେ ଗାନ୍ଧେ,

ନିଗୋ ନାକ ନିଗୋ ନାକ ମେତେ ଆମାର !

# জীবন ও আর্ট

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আমাদের দেশে আত্মকাল পরচিত্রা এমনই চমৎকার চরিত্রা উদ্ভিগ্নাছে যে, এ অবস্থায় আর্টের চর্চা, আর্টের অধ্যয়ন অনেকের কাছেই নিত্যকাল বিস্ময় বলিয়া মনে হয়। মানুষকে আগে বাইরা বাচিতে হইবে, যেহেতু গ্রাণ মনের স্বাধীন বিকাশের সুযোগ লাভ করিতে হইবে, তবে ত সে আর্টের রূপ উপভোগ করিতে পারিবে। যেমন বর্ষ শেষে, তেমনিই আর্ট শেষেও বলা বাইতে পারে, পরীক্ষামাত্র। পরীক্ষা 'ও' গ্রাণ রক্ষা যে আসেই চাই, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু আমাদের বর্তমান দৈন্তের অস্ত্র জীবনের এই প্রয়োজনটাকেই এত বড় করিয়া দেখা চাইতেছে যে এইটি শুধু আদি নচে, এইটিই আদি মধ্য অস্ত্র শেষ, গোচর মনে এইরূপ একটা ধারণা বহুদূর চরিত্রা বাইতেছে। পরীক্ষাপালন, গ্রাণের ভোগ, আমাদের ভারতীয় ভাবায় আহার নিদ্রা মৈথুন, ইহাই মানবজীবনের মাত্র মাত্রা, ইহাই মনুষ্যের চরম। আর তাহা কিছু, বর্ষ নীতি বিজ্ঞান আর্ট, সে-সব মানুষের আহার নিদ্রা মৈথুন ব্যাপারেই সম্বন্ধিত করিবে, তাহা ছাড়া তাহাদের নিজস্ব কোন মূল্যই নাই। মানুষ তাহার সকল চেষ্টা ঐ শেষ মূল ও আদিম ব্যাপারে নিয়োজিত করিবে, অপর সময়ে একটু চিত্তবিনোদনের জন্য বা সাহসার জন্য বা শোভা ও সলভারের জন্য বর্ষ, দর্শন বা আর্টের চর্চা করিবে।

মানবজীবনের আদর্শ শেষে এই ধারণা যে শুধু ভারতেরই প্রচলিত তাহা নহে, বর্তমান সভ্যজগতে সর্বত্রই ইহা প্রচলিত। ইহা বর্তমান সভ্যতারই মূলবস্তু, ভারতে তাহারই হাওয়া লাগিয়াছে, ভারতের বর্তমান দায়িত্ব ও অধ্যাপিত অবস্থা এইরূপ আদর্শ অমূল্যবস্তুকেই একান্ত অহুসুপ ইয়া গড়িয়াছে। আধুনিক শাস্ত্র Psycho-analysis বা মনোবিকলন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, মানুষ

দর্শ, বিজ্ঞান, আর্ট লইয়া যে সভ্যতার পন্থা করে সে-সবের সূত্র রক্ষিয়াছে আহারাদির সন্তুষ্টি, বিশেষতঃ দোষপ্রসূতি sexual instinct। এই জগ্গই বর্তমান সভ্যতাকে জড়বাদী বা materialistic বলা হয়।

কিন্তু প্রাচীন কালে সভ্যমানুষের আদর্শ ছিল বস্তুর। আহারাদিকে প্রাচীনরা অস্বপ্নেও করিতেন না, কিন্তু এত-গুলিকেই তাঁহারা জীবনের প্রধান ব্যাপার করিয়া ভোগেন নাই। পরোব ও গ্রাণ মানুষের সকল ব্যাপারের চিহ্ন ও আহার তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, পরোব ও গ্রাণ লইয়াই মানুষের মনুষ্য নহে। দুই পরোবের মাগব জড়পদার্থের সহিত এক, আহার নিদ্রা প্রভৃতি গ্রাণের ব্যাপারে মানুষ পশুর সহিত এক, কিন্তু মন-বুদ্ধি লইয়াই মানুষের মনুষ্য। দেহ ও গ্রাণের মাগবে মন-বুদ্ধির বিকাশ করিব মনুষ্যের বিকাশ করিতে হইবে। দর্শ, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট এই গুলি হইতেছে মনের ও বুদ্ধির নিজস্ব ব্যাপার, এই গুলিকে লইয়াই মানুষের মনুষ্য। দেহ ও গ্রাণকে কেবল এই সকলের সহায় ও বস্তু বলিয়া দেখিতে হইবে, দেহ ও গ্রাণের জীবনে আমরা মনের অস্ত্রপালন করিবার সুযোগ পাটাইয়া, শুধু এই জগ্গই মানুষের কাছে দেহ ও গ্রাণের আদর্শ। বস্তুর ও সত্য মানুষের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বস্তুরের দেহের ব্যাপারকেই জীবনের প্রধান বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে, সত্য মানব মন-বুদ্ধির অহুসুপনকে সত্যের উপরে স্থান দেয়। এই দুই গুণের বিচার করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানে আমরা ব্যাপকে সভ্যতা বলি তাহা বস্তুরেরই নামান্তর। বস্তুতঃ বর্তমান জগতে দেহ ও গ্রাণের জগৎকে এক তাহার সহায় অর্থকে যেহেতু উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, গোড়ের বস্তু মানুষের মাগবে, প্রেরণের প্রেরণে, আর্টিতে আর্টিতে যে বস্তু প্রতিপাদিত



মামামারি কাটাকাটি চলিতেছে, তাহাতে বর্তমান যুগের মানুষকে বন্সর বলিলে খুব বেশী মূল কথা হয় না। তবে প্রাচীনকালে যাদুবিদ্যাকে বন্সর বলা হইত, বর্তমান যুগের লড়া মানুষেরের প্রতি তাহাদের একটা বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। প্রাচীন বন্সরের মনের পরিচালনা বিশেষ করিত না, যাহা করিবার লোভোত্তীর্ণ গায়ের জোরেই করিত। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের যুগ, মানুষ বুদ্ধির অগ্রসর করিয়া অগ্রসরপন লব্ধ বহুজ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে, জনসাধারণের মধ্যেও মন-বুদ্ধির অগ্রসরপন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন গাভাতে ঘেঁষের প্রত্যেক দ্বী ও পুঙ্খ লিখিত ও পড়িত পাঠ লক্ষ্য দেখেই সে চোটা চলিতেছে এবং এ চোটা অনেক স্থানেই খুব অগ্রসর হইয়াছে। অতএব বর্তমান যুগের মানুষকে সেই প্রাচীন বন্সরের প্রতি আর সম্মানগায়ে দেখা যায় না। বর্তমানের লোক বেই বুদ্ধিমান ও চালাক হইয়াছে, গায়ের বল অপেক্ষা ভুল ও ভোলসেই কার্য উদ্ধার করিতে যায়। কিন্তু এট যে মন-বুদ্ধির চালাক, মানুষ ইচ্ছাকেও সেই ঘেঁষ ও প্রাণের ভোগেই লাগাইতেছে। বিজ্ঞানের চর্চা করিয়া অগ্রসরতার উপর মানুষ যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, গনগুচি করিয়া ভোগের সুবিধা করিতে, শত্রুকে পরাস্ত করিয়া গ্রহিবাসিতা নিবাসন করিতে, সর্ববিধ উপায়ে নিজেদের ভোগের পথ নিশ্চিন্ত করিতে তাহা প্রাণের করিতেছে। বিজ্ঞানের যে সজ্ঞত উদ্বেগ, বুদ্ধির চর্চায় লগ্ন লব্ধ জ্ঞান লাভ করা এবং এই চর্চাতেই গরম তৃপ্তি লাভ করা, সে উদ্বেগ চুই চারিজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে থাকিলেও সাধারণ বিজ্ঞানকে এভাবে ঘেঁষে না। জনস্বপ্নচর উদ্ভিদের জীবন-প্রণালী আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই জন্মনা করনা আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে কৃষিকার্যের কি সুবিধা হইবে, চিকিৎসাপ্রণালীর কি উন্নতি হইবে।

যেমন বিজ্ঞান লব্ধ, তেমনিই ধর্ম, নীতি, আট লক্ষ বিবাহের। লোক লগ্নায়ে একদিন লগ্নাশোচনা করে, সেটা বিপ্রাশের মধ্যেই। তাহা ছাড়া দিন, আর ধর্ম একদিন! ধর্মকে বাপ দিলেও জীবনের বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, অনেক

অনেকে ছাড়িয়াও দিতেছে। আমার ভোগের সামগ্রী বাহ্যতে অশেষ রূপ করিয়া না লভ, আমি যেন নিশ্চিন্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত উপভোগ করিতে পারি, তাহার প্রতিবিধান করাই নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য! আটও ঠিক ভাই; বাহ্যের পরমা আছে, লব আছে, তাহারের অগ্রই আট, জীবনে ইহার কোন মূল প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা নাই, আটের নিম্ন কোন মূল নাই। যিহেটার বাহ্যোগ দেখা, কাহা উপভোগ পঠি করা, চিত্রকলা স্থাপত্য ভাবনা লগ্নীত চর্চা করা এ সব যে শুধু বাহ্যে কাজ, বাহ্যে খরচ কেবল তাহাই নহে, অনেকই এ লক্ষ্যকে সমাজের শব্দে বিশেষ অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। আমাদের দেশে আজকাল অনেক দেশহিতৈষী এ লক্ষ্য আটকোর লক্ষ্য বিহোদী, তাহাদের মতে তৎক্ষণ বসিয়া চব্বার হুতা কাটিলে হুঁপসা আব হইবে।

অতএব History repeats itself, সেই প্রাচীন বর্গসভাই আবার দিগ্বিদ্যা আসিয়াছে, তবে মানবজাতির ক্রমবিকাশের ফলে তাহার বহুগুণ একটু বদলাইয়া গিয়াছে। আগেকার বন্সরের মন-বুদ্ধির অগ্রসরপন না করিয়া দেক প্রাণের বাসনার লইয়াই থাকিত, আজকালকার লড়া বন্সরের মন-বুদ্ধির অগ্রসরপন করিয়া ঐ দেক প্রাণের ভোগের সামগ্রীই সংগ্রহ করে, কিন্তু মন-বুদ্ধির অগ্রসরপনের যে নিম্ন মূল আছে এবং তাহাই যে মানুষের সজ্ঞত অগ্রসর তাহা তাহারা বীকার করে না।

ভারতীয় অসাম্প্রদায়িকের ভাবার বলা দাইতে পারে, প্রাচীন বর্গসভা ছিল সাময়িক, এবং আধুনিক সভ্যতা সাময়িক। প্রাচীন বর্গসভার রৌক ছিল ঘেঁষের উপর; মনের খেলা ভোগের পুঙ্খ কম ছিল। আধুনিক সভা মানুষের জীবনের কেন্দ্র গ্রাণ, তাহাদের মধ্যে মনের খেলা অপেক্ষাকৃত বেশী। সাময়িকতায় প্রেরণার মানুষ কর্মের লজ, ভোগের লজ, আশ্রয়প্রতিষ্ঠার লজ ছুটিয়া বেড়ায়, ইহাই প্রাণের খেলা। প্রাণের নীতি হইতেছে, বাঁজা থাক, আশ্রয়প্রতিষ্ঠা করা, ঘন মন এভাবে প্রতিপত্তি অর্জন করা, ধন লক্ষ্য অর্জন করা, বাস্তুচি করা, ভোগ করা। তিন প্রকার অগ্রসরপনের দ্বারা মানুষ এই লক্ষ্য বাসনার তৃপ্তি

করে। প্রথম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ইত্যাদি; দ্বিতীয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধন উৎপাদন ও ভোগ করিয়া; তৃতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া। বর্তমান সভ্যতার আদর্শ চরিত্রে, এষ্ট তিনটি অঙ্গুষ্ঠানকেই যথুভাবে পক্ষিরা তোলা; ইহা ছাড়া মানবজীবনের, মানবসমাজের মূলতঃ আর কোন লক্ষ্য, কোন প্রয়োজন নাই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি, আর্ট, এ সব কেবল ঐ মূল লক্ষ্যসাধনে সাহায্যকি বাণীর বলিয়া পণ্য।

কিন্তু প্রাচীন সভ্য জগতে সাহায্যের আদর্শ একপ ছিল না। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এ সকলের মূলা ভাষার কাছে কেবল এইটুকুই ছিল যে, এই সকলকে ভিত্তি করিয়া সাহায্য জ্ঞানবিজ্ঞানের, নীতির, আর্টের ও ধর্মের অঙ্গুষ্ঠান করিতে পারে। প্রাচীন গ্রীস ও রোম প্রথম তিনটির উপরেই বৌদ্ধ দিরাছিল, এলিয়া আরও অগ্রসর হইয়া ঐ তিনটির উপরেও বস্তুকে স্থান দিরাছিল এবং ঐ তিনটিকেই অধ্যাত্মজীবনেরই সহচরুপে গণ্য করিয়াছিল। প্রাচীন সভ্য ইউরোপ মনকেই সাহায্যের শ্রেয় সম্পন্ন বলিয়া দেখিয়াছিল। প্রাচীন ভারত মন-বুদ্ধির উপরেও আত্মকে দেখিয়াছিল, যঃ বুদ্ধে পরজাত পঃ এবং দেহ প্রাণ, মনকে সেই আত্মারই আত্মপ্রকাশের আধার ও বস্তু বলিয়া জানিয়াছিল। প্রাচীন সভ্য ইউরোপ মনের চক্ষুকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিরাছিল, অতএব সেই সভ্যতাকে বলা হইতে পারে সাধিক; এবং ভারত আত্মার আলোক, আত্মার নিকৃষ্ট দেহ প্রাণ মনকে অধ্যাত্মভাবে পক্ষিরা তুলিতে চাহিয়াছে, তাই বলা হয় যে, ভারতের সভ্যতা আধ্যাত্মিক।

মনের পূর্ণতম উজ্জতম বিকাশই মঙ্গল্য। কিন্তু এই বিকাশের ক্ষমতা যেমন নীচের দেহ ও প্রাণকেও পূর্ণভাবে বিকাশিত করা প্রয়োজন, তেমনিই মনকেও ছাড়াইয়া উঠিয়া সাহায্যের স্রষ্টা মূল সভ্য আত্মকে ধরা প্রয়োজন; আত্মার দৃষ্টি সাক্ষ্যৎ যোগে, আত্মার আলোক ও শক্তিতেই দেহ প্রাণ মনের পূর্ণতম বিকাশ হইতে পারে, সাহায্য অতিমানবম লাভ করিতে পারে, সাহায্যের দেহ প্রাণ মনের আধারেই দেবজীবনের বিকাশ করিতে পারে। ইহাই ভারতীয় সভ্যতার চরম লক্ষ্য ও আদর্শ।

সাহায্য সভ্যতার লক্ষ্যন করে, কিন্তু বস্তুই অগ্রসর হয়, ততই সভ্যতার নতুন নতুন রূপের প্রকাশ হয়। সভ্য অনন্ত, মন তাৎক্ষণিক ধরিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই পূর্ণভাবে ধরিতে পারিতেছে না। অনন্ত সভ্য মনের বস্তু উপরে। তাই সাহায্য শুধু মন-বুদ্ধি দিরাই সভ্যকে ধরিতে চেষ্টা করে তাহাবিপক্ষে যেন কেবলট বলিতে হয়, --

ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি

কেন ধরে ধরিতে না পারি ?

সাহায্য ওদের লক্ষ্যন করে, তাই অস্ত্রাণ, তাল মন্দির বিচার করে, কিন্তু দেখিতে পারে শুধু মনের দ্বারা ইহার চরম সমাধান হয় না, কতকদূর গিয়া বুদ্ধিতে আর তুলান না, সাহায্য নিজেও যথো য়ে পূর্ণ কল্যাণের আদর্শ উপলব্ধি করে, মনবুদ্ধির দ্বারা সৌন্দর্য্য ধরিতে পারে না, জীবনে তাৎক্ষণিক একট করিতে পারে না। সাহায্য জীবনের লক্ষ্যন করে, কিন্তু কোন্ পিঠা সৌন্দর্য্যকে পূর্ণরূপে ধরিতে পারিয়াছে ? তাহার অন্তরের আদর্শকে বাহিরে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে ? বস্তুই যে অগ্রসর হয় ততই দেখে, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, অস্ত্র নাই, —সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, সাহায্যের মন তাহা ধারণা করিতেও পারে না। এই সকল আদর্শের অগ্রসরণ করিয়া সাহায্যের মন যে অনন্ত সভ্য, অনন্ত ভিত্ত, অনন্ত প্রসঙ্গের আভার পাথ, তাহাই আত্মা, তাহাট ভগবান, সভ্যতা শিবঃ হুঙ্কারঃ। জীবনে এই অনন্তের অঙ্গুষ্ঠান করিতে হইবে, দেহ, প্রাণ, মনের ক্ষুদ্রতা, অসুপূর্ণতা দূর করিয়া দিরা তাৎক্ষণিক ভগবানের সাধন করিয়াই তাৎক্ষণিক যথো সেই অনন্ত সভ্য, শিব, প্রসঙ্গকে একট করিতে হইবে, তাহাই ভগবানের পার্থিব মানবলীলা সার্থক হইবে, ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের সভ্যতার শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, ইহাই ভারতের আধ্যাত্মিকতা।

তাই ভারতে বস্তুকে জীবন হইতে পৃথক করা হয় নাই, বাহ্যে জীবনের পূর্ণবিকাশ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি হইতে পারে ভারতে তাহাই ধর্ম নামে অভিহিত। যখন বলা যায় যে, ভারতে জীবনের সঠিক ধর্মের সংজ্ঞা অজ্ঞেয়, সমস্ত জীবনকেই ধর্ম পরিণত করা ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তখন বুঝার



না। পথে কালে মনুষ্যচিন্তার বিধান এবং অসংখ্য প্রকারের বিধিনিষেধের বন্ধন মানিয়া জীবনের পথে চলিতে চাইবে।—ইহা ভারতের মহান আদর্শ নহে, পরন্তু সেই আদর্শেরই বিকৃতি, জ্ঞানি। চিত্তাঙ্ক, জায়ে, কর্ণে, দেহে, প্রাণে, মনে জীবনের অস্তিত্ব খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রতি মুহূর্তে লড়াই। শুভ, সুখের আদর্শ অমূল্যগণ করিলা ক্রমশঃ ভগবানের দিকে, দ্বিবা অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর চাইতে চাইবে। ইহাই ভারতের সনাতন আদর্শ। ভারতের ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতি, আট মাহুদকে জীবনে এই আদর্শের অমূল্যগণ করিতেই ধরাবর লুপ্তাব্য করিয়াছে। লড়াই, শুভ, সুখের এই তিনটির যে কোনটিরই অমূল্যগণ যদি ঐকান্তিকতার সহিত করা যায় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত ভগবানেই পৌছান যায় এবং ভগবানকে ধরিতে পারিলে আর পাইতে কিছুই বাকী থাকে না। কিন্তু মাহুদের লক্ষে লড়াই ও শুভের অমূল্যগণ করা অপেক্ষা সুখের অমূল্যগণ করা সাধারণতঃ অনেক সহজ। সৌন্দর্যের উপাসনা করিয়া ভগবানকে যেমন সহজে লাভ করা যায় এমন আর কিছুতেই সম্ভব নহে। তাই ভারতের নিকা দাক্ষ্য সৌন্দর্য উপাসনা এতখানি স্থান লাভিকর করিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম ইহাও সুন্দর বৈষ্ণব। সেই কালিন্দী-পুলিন, বংশীট, কলে কলে গলবে সুশোভিত নিবৃত্তবন, পূর্ণ ভোঃসামরা রজনীতে তেলিকমলমূলে গাঁড়াইয়া ত্রিতলিমঠাম মদনমোহন প্রামল্যবস্ত্রের বংশীঝনি, ঘনীর গল উজানে বহেতেছে, গোপীয়া অভিলারে আগিয়া সেই চিরসুখের চরণে জীবন যৌবন ডালি দিতেছে। বহির্ভাগে সকল সৌন্দর্যের অশ্রুতপ দমাবেশ, অন্তর্ভাগে গোপীঘের পূর্ণ সমর্পণের অশ্রুৎ মাহুরা, ভগবতের আর কোথায় কোন্ দিল্লী একাধারে এত সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারিয়াছেন? চক্রীদাস ঐরাবার তাই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

ইং. তুমি যে আমার প্রাণ।

সেই মন আদি, তোমার ঈশতি,  
কমলী জাতি মন।  
অসিলের নাথ তুমি যে কালিন্দী,  
দোস্তির আরাধা মন।

শোশা শোফালিনা,

না জাগি তখন পূজন।  
দিল্লীতে রয়েছে,  
দ্বিরাহি তোমার দার।  
তুমি যেহে দারি,  
মন বাহি আদ্য তার।  
কলকী বনিতা  
তাড়াতে বাহিক হুঃ।  
তোমার দারি  
দলার দরিতে প্রাণ।  
নতী বা কলকী  
জান মন বাহি জাগি।  
কে চক্রীদাস,

তোমার চরণদানি।

ঐক্যের উত্তর,—

তলিতে তোমার নাম, বাঁধারী অতুল্যম,  
তোমার ধরণের দারি দাস।  
তুমি যেহে দারি গোবিন্দ, মাইল দোকলপুত্রী,  
বহু মতলে লবকাল।  
দ্বিরা, তোমার দ্বিরা জানে কে?

সে কল জল,  
দলারি তাবনা, মন।  
কবি অনুমান,

আমার তখন,  
তুমি রসময়ী বিন।

ভগবানকে যে যেমনভাবে ভজন্য করে, ভগবান তাহাকে ঠিক সেই ভাবে ভজন্য করেন; যে কথা যাঁ প্রেমভক্তে তাঁ তথৈব ভজন্যমাহু। ভগবানের সহিত জীবের এই যে নিত্য সন্মত এমন জীবিতভাবে কে কোথায় পদ্বিফুট ভক্তিতে পারিয়াছে? ভগবানকে পাইতে হইলে বাগ যজ্ঞ ভজন পূজনের কিছুই প্রয়োজন হয় না, যদি কেহ ঐরাবার ভাৱ "দিল্লীভিক্রমকে ঢালি তরুদন" ভগবানের চরণে দিতে পাতে ভগবান নিজে আসিয়া দ্বিরা দ্বিরা দ্বিরা তাহার সেই

গ্রন্থ গ্রহণ করেন এবং প্রতিদানে নিজেকে সমর্পণ করেন। এই কৃপাবলীলা জাতির প্রাণে যে কি অক্লান্ত রসের লগ্ন করিয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত স্তম্ভন স্বাভাবিক ভাবে কত নর নারীকে অধ্যাত্মসাধনার অত্যন্তমিচ্ছা প্রদান করিয়াছে তাহার ইঙ্গিত কে করিলে ?

একান্তভাবে সৌন্দর্যের অগ্রদূত করিয়া বৈষ্ণব কবিরূপ মধনের শ্রেষ্ঠ বাগ বর্ণনা করিতেও বিপুল্য কৃতিত্ব হইল নাই। মধনের “রতিমুখ সারে গভমতিসারে” পাঠ করিয়া যিনি নানিকা কৃত্তিক করিবেন, তিনি ‘আর বাহাই হউন, মনস্ত-স্বন্দরক পূজা করিবার শক্তি তাঁহার মধ্যে নাই।’ ভক্ত-চুড়ামণি পরম পবিত্রতার আধার ঐগৌরাধ এই সকল গান শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎপ্রেমে হিতের হইয়া পড়িতেন। ভগবৎপ্রেরণার বহুকে সূতা করিতে করিতে ভগ্ন হইয়া তাঁহার সেই গান,—

সেই ত পরমনাথ পাটুর,

যার লাগি মন সহান হৃদি বের।

হোম যখন যিনি বুঝিবেন, তিনি কৃপাবলীলার অসীমতা দেখিয়া আর বুজিত হইবেন না।

সাধারণ জীবনে সত্য, শুভ ও দুঃখের যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করা হয় তাহাতে তিনটিকেই বলা ও কুর করিয়া একটা কামচলা বাবু করা হয়। তাহাতে লৌকিক জীবনের প্রয়োজন হইত সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দিবা অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণতা নাই, তাহাতে ভগবানকে প্রকাশ করা হয় না, আড়াল করিয়াই রাখা হয়। তবে এই যে সত্যের সত্যিত্ত্ব, শুভের সত্যিত্ত্ব দুঃখের বিরোধ, আটের সত্যিত্ত্ব জীবনের ও মীতির বিরোধ, ইহা আছে শুধু মনের হাতো ; কারণ মন কোন জিনিষকেই পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, কাটিয়া কাটিয়া ভাগ করিয়া আংশিকভাবে দেখে, তাই সত্যের অগ্রদূত করিতে শুভকে বর্জন করিতে হয়, শুভের অগ্রদূত করিতে দুঃখকে বর্জন করিতে হয়। কিন্তু ইচ্ছায়া মনের হাতা ছাড়াইয়া অধ্যাত্মজীবন প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার অন্তরের মধ্যে এই তিনেরই পূর্ণ সামঞ্জস্য পাইয়াছেন।

সৌন্দর্যের উপাসনা অধ্যাত্মিক সত্যে ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দেহ এবং ভগবানের সত্যিত্ত্ব লাভের যোগেই মানুষ দিবা অধ্যাত্মজীবন লাভ করিয়া মানবত্ব সার্বিক করিতে পারে। ভারত ইহা পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল, তাই ভারতের সভ্যতার আটের গান এত উজ্জ্বল। এ বিষয়ে সমস্ত বৈষ্ণবের সত্যিত্ত্ব ভারতের তথ্য এত যে, অগ্রের দেখে মানুষ মনের দ্বারা সৌন্দর্যের যে কল্পনা করে সেইটিকে প্রকাশ করাই আটের উদ্দেশ্য, আর ভারতে আটের লক্ষ্য হইতেছে মনের অতীত অধ্যাত্মজীবনের সৌন্দর্যকে বাহ্যমুখি দেওয়া। সমস্ত দেশ জীবন ও প্রকৃতি হইতেই সৌন্দর্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, ভারত অধ্যাত্ম উপলব্ধি হইতে সৌন্দর্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহাকেই বাহ্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে ; তাহাতে যদি বাহ্য সূত্রের সত্যিত্ত্ব, সত্যের সত্যের সত্যিত্ত্ব বা নীতিবাদের সত্যিত্ত্ব বিপর্যয় না হইতাহে, তাহাতে তাহাও কৃতিত্ব হয় নাই। এইরূপ ভারতে যে অসংখ্য শিল্প ও সাহিত্য পড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবাসীর অধ্যাত্মজীবনগঠনে তাহা বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। যখন বলা হয় ভারত আধ্যাত্মিক, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, ভারতের অধিকাংশ লোক বা অনেক লোক কাম, ক্রোধ, মোহকে বর্জন করিয়াছে, উচ্চ অধ্যাত্মজীবন লাভ করিয়াছে, ভগবতের কোন দেশ, কোন সভ্যতা লক্ষ্যেই ইহা এমনও বলা চলে না। কিন্তু ভারতের লক্ষ্য সত্য বসন্তবাসী বিশিষ্ট শিল্পীলোকের দ্বারা ভারতবাসীর মন দাপ এমন ভাবে উজ্জ্বল হইয়াছে এবং এখানে এমন একটা atmosphere হইয়াছে যে, ভারতবাসী লক্ষ্যেই অধ্যাত্মজীবনের দিকে দৃষ্টিতে পারে। ভোগস্বপ্নের মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও হঠাৎ হইত এক কথাকেই মন ভাগ করিয়া পরীক্ষা হওয়া এই ভারতেই সম্ভব। ভারতের জনসাধারণ যেমন উচ্চ অধ্যাত্ম বিষয় বুঝিতে পারে ও অর ভেটোতেই অধ্যাত্মসাধনার পথে চলিতে পারে, এবং এই পূর্ণাভূমি ভারতবর্ষের আবহাওয়ার বসিমা অধ্যাত্মসাধনার সিদ্ধিলাভ করা বড় সহজ, এমনটী আর ভগবতের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতকে এই অধ্যাত্মভাব দিতে বিশেষ দায়িত্ব করিয়াছে ভারতের আট, ভারতের সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য,





চিত্রকলা। আজ আমরা সেই আটের গৌরব, আটের মূল্য তুলিয়া গিয়াছি, আর মজা দেশের লোক আমাদের প্রাচীন শিল্পকলার অবশিষ্ট নিদর্শনসকল দেখিয়া মোহিত হইয়া দাড়াইতেছে। ভারতবাসী এককালে কত বড় সৌন্দর্য-উপালব্ধ ছিল এখনও তাহার সমস্ত প্রমাণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। মন্দিরে মঠে লাহাড়ের গায়ে খোদিত হইয়া প্রাচীন ভারতের অতীত আটের নিদর্শন এখনও বর্তমান রহিয়াছে। ভারতের প্রাচীন মাটিয়া ভারতবাসীর সৌন্দর্য-উপাসনার বর্ণনায় পত্রিগুণ। এখনও আমাদের দেশে ধর্ম্মে কষ্টে সামাজিক গ্রামে লোক আচার অপ্রচলিত প্রচলিত প্রথা হইতে ভারতবাসীর পুত্র সৌন্দর্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও ভারতীয় রমণীদের হাবভাব চলেচলনে যে অপরূপ লালিত্য ও সুবাসা দেখা যায় তাহা দেখিয়া বিব-বিধমতা শাস্তা নবকৌশল ও নৃত্যকণ্ঠে গ্রন্থিত করিতেছেন। ভারত বার্ষিকের জীবনে সকল গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সুগুণাবহের মাথনা গ্রাম্যদের অন্তর হইতে আজিও মুছিয়া যায় নাই। সেই সুপ্র শিকারীকে ভাঙে ও আচ্ছন্ন করিতে পারিলে ভারত আবার এমন নতুন জীবন লাভ করিবে যাহা জানে নিকিতে সৌন্দর্যে প্রাচীন মহান গৌরবের সুপেক্ষ ছাড়াইয়া উঠিবে।

দেশের চমক দায়িত্ব ও অভাব দূর করিতে, লক্ষ্যভোগ্যে চোরা কদা হউক, তাহাতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু ভারতের যে-সব শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য আমরা পোয়াইতে বসিয়াছি, এখনও চোরা করিলে হারা নক্স। কদা বাহ, হারা চরাইলে ভারতের ভারতীয়তাই নষ্ট হইবে, সেইজন্যে কদা কদা বাহবা এই লক্ষ্যেই প্রয়োজন। তাই দেশে যে আবার নতুন

করিয়া আটের চর্কা আরম্ভ হইতেছে, ইহা পুণ্যই আশার কথা। শিল্পীরা লাহুতা ও শিল্পে সৌন্দর্যের আদর্শ স্থাপ্ত করিবেন, সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া লোক তাহাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবে, জীবনে ইহাই আটের উপযোগিতা ও পার্থক্য। সমস্ত জীবনকে করিতে হইবে একটা আট, সৌন্দর্যের দীপা। বৈকুণ্ঠ কীর্তিনগরা পোরাগুরুত্বের বর্ণনা করেন,

যখন নববীণা  
বসন সঙ্গীতকলা,  
চলে যেতে যেতে যায়,  
সঙ্গীতে কথা কয়!

আমাদের চণ্ডা ফেরা, আমাদের কথা, আমাদের কথার সব যেন ঠাট্টা দিয়া সৌন্দর্যের অভিযাত্রী হইয়া ভারতের সনাতন আদর্শ। সেই ভারতে আজ যদি কোন স্রষ্টাশ্রম একটু সুন্দর বেশ তুষা করিয়া বাচির হয়, জমনিই গোকে মনে করে advertisement, বিজ্ঞাপন! দেশের কি অধঃপতনই ঘটিয়াছে! কিন্তু, হিন্দুর সংসারে যে খেঁচাটী লক্ষ্য-লক্ষ্য প্রিয়, গুণগায় নাম জী। কেহ কোন ব্যাপার কাজ করিলে কিন্তু সেটাকে বলে, বিজী। গাফা করিবে সুন্দর ভাবে তর,—হেতু, প্রাণ, মনে সৌন্দর্যের পূর্ণতম বিকাশ কর, ইহা অপেক্ষা জীবনের বড় আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ সৌন্দর্যের বিকাশ করিয়া আমাদের অন্তর্গত ভগবানকেই আমরা জীবনের মধ্যে প্রকাশ করি। শীতল ভগবান বলিয়াছেন,

দয় বহুবিকৃতমং দয়ঃ স্রীমদুক্তিতমেব বা।  
তত্তমেবাবিসম্ভবং মম তেজোজিহব সন্তবম্



## বন্ সখি

ঐশৈলেন্দ্রনাথ রায়

বন্ সখি ! চোখে তোমার ফুটে কি ভাষা ;  
 চলে চলে ওঠে বুকে কোন্ তির্য্যাক !  
 পলক-বিলীন গুটি নয়ন-কাণে,  
 কি বাণী ঘুমায়ে পড়ে আগুন মনে !  
 তোমাই এ দিগ্গিরি মিষ্টি পুষ্প-ধারা  
 কার পথে ক'রে পড়ে উত্তল-পাড়া !  
 শিরসায় কোন্ সুর গোপন বুকে ;  
 কি অমৃতাগের মায়া চোখে ও বুখে !  
 ব্যাধাক্ষ লক্কণ কি বাণী কাণে —  
 জনাহুত মুক্লিত চাদির রাগে !  
 এলাহিত বুক এ অলক মাঝে  
 কাগল-পরাণি বল কি মায়া বাজে ।  
 চকল অকল বাতালে মোলে,—  
 সরস-সারবে সখি ! কি ঢেউ তোলে !  
 অধিতে ঘনায় কোন্ মায়াব চায়া,—  
 নুপন কি গুরি মাখে লাভিল কায়া !  
 নগর অগর কুল-পল্ল শিররে  
 অস্তর কি লুটাইল ঘুমের খোরে !  
 কপোলে কি ভুল ক'রে স্বপ্ন চ'তে  
 গুটি পারিজাত টুটে এল মরতে !  
 শান্তিত কারি বুকে তির্য্যাক-চরা—  
 অমরাবি অবা হুটি কুঙ্ক-ভরা !

বন্ সখি ! কান্তনয় আকুল-জালায়  
 বুকে গুরু গুরু কোন্ বেদন দনাথ !—  
 মখিন নাভাস দেখে লুটিয়া ময়ে ;  
 ছাঁটল কেন লো বন্ বসিরা পড়ে !  
 বলিতে দরমে বাবে সে কোন্ কথা ;  
 নখনে শনাল দার উচ্ছলতা !  
 কোন্ বাধা ওঠে দেথা মাঝরিয়া  
 বেদন-বেদাগ হুয়ে শুষ্করিয়া !  
 কমনীয় ভূম-শতা জড়ায়ে কি লো,  
 শরপের শত শাখিকা ত নুটিল !  
 ও গুটি বাতর পাশে নাধিবি কাকে ;  
 উগ্রর মিনতির কঠিন পাকে !  
 লঃগাহিত লজ্জিত গতির বেগে  
 কি বা মুজ্জনা সখি ! উটিল বেগে !  
 চলিতে চরণে বাজে কোন্ মিনতি,\*  
 চাকতে টুটিল কেন গতিব বতি !  
 চপল চরণ কেন থমকে লাভে ;  
 লরমে মরমে বল কি স্রব বাজে !  
 বিবের জলধের বশন-কায়া  
 মনের মাধুরী-পটে রচিল মায়া !  
 মানসী রশমী হ'বে ফুটিলি মরি !  
 অগতের প্রেমদীপ সুরতি ধরি !

## মাসীর দেওর-ঝি

—গল্প—

—ব্রিউমা দেবী

সুপ্রকাশ সকালে উঠেই তার মাসীকে ডাক দিয়ে বললে, “মাসি, আজই তোমার বেওর-ঝি আসছেন নাকি?”

মাসী তখন তাঁড়ারের কাছে বসে ছিলেন—ঘর থেকে এগিয়ে এসে বলেন—“কাল সকালে তো পেই বকমই তার পেলুম বাবা। তুই আর নেই খেয়ে কোথাও বেগমনি প্রকাশ—তাকে পেয়েলম। থেকে নিয়ে আসবি, বাপের কোন্ বন্ধুর সঙ্গে আসতে তিনি ত পেয়েলম। অবধ এসেই খালস, আমাদের বাড়ী তো জেনেন না।”—

“মাসি, তুমি আমাকে এত বিশেষ ভেল কেন বল ত? আমার first-period এসে—আমায় মেল তো মনে ১১টার পর, প্রকাশের নিকটে যদি ফাঁকি খোঁজে, তবে আর ছাত্রদের কি দেখে বল? যাও না তোমার কাজা দিকে পাঠিয়ে—তোমার বেওর-ঝি তার কাছেও যেমন—আমার কাছেও ভেমনি ঘনিষ্ঠ।”

“সেটা কি ভাল হবে প্রকাশ? চাষার হোক খোঁজা এই প্রথম বাড়ী ছেড়ে কোলকাতা আসতে। ঠাকুরপোর ত চিরটা কাল আসা-যাওয়া করেই কাটলো, নিজে কখনো ছুটি পার না—বছর চারেক আগে একবার এগেছিল—তখন তুই বলেতে—মা-মরা মেয়ে আমার কাছে এবার পাঠিয়ে দিচ্ছে—যদি একটি ভাল পাত্রের পুঁজে দিতে পারি। তা’ আমার ঘরে কি আর ভাল পাত্রের অবধ,—তা’ সে যদি বিধু হয় তা’ আমি কি করব—থাকবে, তুই নিয়ে চিরকাল আইবুড়ো কান্ডিক ঘোরে ফিস কাটাবি ব’লে তো আর বক্তালী ব’রের মেয়ে তা’ পারবেনা। তাই ঠাকুরপো নিত্যকই ঘ’রে পড়েছে তার মা-মরা মেয়েটিকে মার মত—”

সুপ্রকাশ বাধা দিয়ে বললে, “মা-মরা কি করব? এই না তাঁর কোলের ছেলেটি ছোট ব’লে থাকে পঠিতে পারবেন না লিখেছেন?”

“সে কি আর ওর নিজের মা প্রকাশ? মাগা ওট একবার্তি তিন বছরের মেয়ে অমিতাকে নিয়ে ঠৈম যে আশামে চ’লে গেল—আর তো তার সঙ্গে দেখা কোলম—সেখানেই তার কাল কোল—সে আজ উনিশ বছরের কথা।

“তবে তোমার দেওর-ঝি নিত্য ভাল কথা বল দেখি! মাঝা, আমার চা-টা আজ মেয়ে মাসি, না তোমার বেওর-ঝির জন্ম-নক্সা শুনেই আমার পেট ভরেবে?”

“তা বলই ওর চা বাসনি? ও খেয়র মা, দাদাবাবু চা-টা এই তাঁড়ারের দালানেই কিংবে বেতে বল—এখানে তোর চা খাওয়াও কোন্ আমার কাম লাগাও হোক। এত বেলা অবধি কি ক’রে যে খুঁয়ো তার ঠিক নেই। তার পরে ত কলেজের বেলা হোতে তাত যাও, একটু হেরা লব না।”—

সুপ্রকাশের চা খাওয়ার পাশা দাখ হোতেই উঠে গাড়িরে বসে, “মাঝা, বাব এখন তোমার বেওর-ঝিকে আন্তে—কি নাম বল? অমিতা না? জাতী তো গ্রাম সম্পর্কে দেওর, তার খুঁড়ো মেয়ে—তার মতে তোমার সতি আমার মিত্রা তাগ হোয়েতে দেখছি। তা দেখ মাসি, সে এসে বাবু, আমার আমত্রে কম পড়েনা বেন—আমিও তোমার মা-বাপ-মরা বোন্দো।”

মাসী তাকাতাকি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, “বাট বাট, কি যে তুই বলি প্রকাশ, নিজে হাতে মাহু করলুম—তাকে কি অন্যায় করতে পারি।”

“তাই বল, মাসি, আমারও ভাবনা যায়—বেশ আছি আমার মা ছেলে, এর মধ্যে আর কেউ এসে পড়লেই—”

“কিন্তু এমনি থাকা থাক। তো চলেনা প্রকাশ—বিরে তোমার করতাই হবে। ঠাকুরপো তো এই এক বছর

## জিউমা দেবী

দ'রে পড়েছে তোর লুপ্তই ঘাটে অমিতার বিয়েটি হয়।  
 যারি ব'লে বেখেছি আমার বেগের বিধেত মত নেই,  
 তার ওপরে ও আকালকার শিকিডা হুমকী মেঘের  
 ওপর ভারী চট্টা—ওর যে কেরন সেকলে ধবন—*up-to-  
 date* মেঘে দেখলেই নাক দিটকাই। তোমার মেয়েটিকে  
 কেরন ক'রে মাহুর করেছ তা তো জানিনে—তা এখানে  
 পাঠিয়ে দাও—‘আমি চেষ্টা ক'রে দেখব।’”

“কি মরনাল মাসি, মাঝকে আগে বলনি কেন? তোমার শিকিডা হুমকী মেঘের জঘ্ন জঘ্ন হুগাজ হুটুক, আমাকে রেছাই দিও! আমার গলার বদলি ও ক'লি ওড়াও—তবে আমি সতি মরব।”

প্রকাশ উছরালে পালালো, যেন এগুলি কেউ তাকে বিধে করতে বলছে।

ভাগ্যক্রমে বিচার ঘন্টার ক্রাস ছিলনা। প্রকাশ গলদঘর্ষ ক'রে টেনে এসে দেখে, গাড়ী মাগেই এসে গেছে। সে এদিক ওদিক কোকুল-পুষ্টিপাত ক'বে মাসীর দেওর-কিকে গুলে নেড়িতে লাগল। তার ধারণামত চাইছিল জুতো, সুইচলৈস্‌ জামা, হাতে কোলা বাগ, হাঁটুর নীচে কাপড়—বহু-চোর অথবা জুজুগী-পাকানো কানের দুলানে চই খোঁপা-মলা মেয়ে একটিও গুলে পেলনা। হাক্‌ গাটা খেল, মালেনি,—এই কথা মনে করবামাত্র এক-ভল্লোক বাতভাওে ছুটে এসে বলেন, “আপনি কি হুগকাল রাখ?”

সচকিত হোয়ে হুগকাল দেখল, তার পেছনে একটি গজাউলা নারী, মাথার খোমটার মত ক'রে বেগুণী রংএর খোলা আলোধান ঢাকা, ফুল-হাতা জাকেটের কালো লেপ ক'লি ছাড়িয়ে ফুলচে, পারে একটা বুট-জাড়ার শুকবে জুতো, চোখে মগ্ন একটা কানো চশমা, পজের খোদ মীল রংএর আলপাকার শাড়ীটা এত কুঁচুকানো যে ট্রেনের টুটিরাহিবাগ তার ওপর দিয়েই গেছে বেশ বোকা যাচ্ছে। মাসীর দেওর-কির এ চেন লক্ষ্য দেখে প্রকাশ এংকবারেই তড়কে পেল। তাড়াহুড়ি করে, “হ্যাঁ আমিই বটে, আপনি কি আগতোষ বাব?”

ভল্লোকটি অমিতাকে দেখিবে বললে, “হ্যাঁ, আমি আগতোষ চন্দ্রবতী, এই আমার বন্ধু কল্যা মমিতা, রাজেন বাবু মেয়ে; এই নিম্ন বৃত্তে নিম্ন মশাই, আমার আখার সাত্‌ক বায়েটার এক এপকটমেন্ট—আর গাভাবাও সময় নেই। রাহু, বাও মা, এনার সঙ্গে বাও, আমি একদিন দেখা ক'বে আসব'খন। আচ্ছা তবে মাসি, মমতাব।”

ভল্লোক উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দৌড়লেন। হুগকাল দেই অর্দ্ধাবগতিতা প্রকাণ্ড-চন্দ্রমা-পরা মেয়েটিকে লক্ষ্যেণন ক'রে বললে, “আমুন তবে। এই আপনার সব ঘিনিব তো?”

মেয়েটি কাল কাল ক'রে চাতিদিকে চাইতে লাগল, উত্তর দিল না; তারপরে অনভ্যন্ত চরণে হুগকালের পেছন পেছন চলতে লাগল।

তাকে ঘাড়িতে বসিয়ে নিজ ডাইভারের আসনে ব'সে drive করতে করতে পেরলরা গেকে বলিপত্ত মরবি সমস্ত পথটা ও ডাবল—বারা। এই নাক মাসীর দেওরের মেয়ে—এ যে একবারে লং কল্যা কটতেও জানেনা দেখছি।

বাড়ি পৌছে মাসীর চোখে অমিতাকে ল'লে দিবে বলে, “চল্ল ম এখন কলেজ।” বিকেল চারটের আগে যে বাড়ি আসতে হবে না—তাতে পথম নিশ্চিত ও আশাম বেধে করল।

বিকলে বাড়ি এলে মাসীকে চিরভাঙে ওলদাবারের খালা নিয়ে ব'লে থাকতে না দেখে ওর সমস্ত মনটা ছ'লে উঠল—এই মাসি হুক করেছেন আসরের ডাগ বটুয়া, আমি আজই মেলে পালাচ্ছি। তাঁড়ারে গিবে মাসীকে ওল ছাড়তে দেখে বললে, “হাক্, হাক্, মাসি, মত কট করতে হবে না—আমি নয়েরের ওখন থেকে এক বাটী চা খেয়ে আসছি।”

“কি ছেলোমাহুবি করিস্‌ প্রকাশ, একদিন মেরা হোয়ে গেছে একটু বোস, আমি এগুলি মাঝিয়ে দিচ্ছি। আমি কেবল ঠাকুরপোর ওপর রাগ করছি, তিনি কি ব'লে এই



দাড়ক মেহেটাকে সম্পূর্ণ অজানা জাগরণে কৃষ্ণ ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে নাওঘাতে বাওঘাতে দুখ থেকে কথা বের করতে যে কি নাকাল হোয়েছি বাবা—সে বলতে পারি না। ছোট ছোট মেয়েমেয়েরা রেসে পুলে বেড়াবে, তা না এ একেবারে গোমগামুগা! কোলকাতার এর বর ছুটবে কেবেছিলি?”

“চুপ চুপ মাগি, বর্ণনাটা বড় বেশী গোবে থাকে, পোনে যদি—”

“না, তা চম্বেনা; এই তো কত ক'রে গা বুতে পাঠালুম—এসে অবধি গা থেকে দেই আলোয়ানখানা পুবেনা—চিম্পে গরু কোরোকে—কি জানি বাবু কেমন দায়া মেয়ে ও!”

মুদ্রকাল চলবাগ সেয়ে বাটার বেহোবার উদ্ভোগে উঠে পড়ল। মানচিত্র যে এট মেহেট মনে ধরেন এটা একটা সঙ্গাবাদ হটে! সে চিরকালটী লরল সাগাসিনে গ্রামের মেয়ে পছন্দ করে—কিন্তু এ যে একেবারে কানার ভাল!

চেনস্তের লক্ষ্য ঘনিরে এসেছিল। তারি ফেরে সামনে যে মম একটু খোশা ছাত—চোখ পড়ল—অমিতা দেখানে পা চড়িয়ে গোল চম্বা প'রে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বট পড়চে। কৌণ আলোকেও বৃকৃত পারল বটট বটগা অথবা কমলিনী দাচিত্যমন্দির দিগন্ত। পায়েব লম্ব ত্রণ ও আলোয়ানটা আরো মাথা অবধি ঢেকে দিল।

মুদ্রকাল লামনে এসে বললে, “শীত বোশ চর তো প'রে এসে বহন না।”

অমিতা ঘাড় ভাঁজে ব'লে রইল, জবাব দিল না। ওর দাড়ী মক্কা লাগল এত বড় বাইল বছরের মেয়ে না হর লেখা পড়াই বেশে—তাই ব'লে কথার উত্তরও কি দিতে জানে না?

আবার বলে, “সালীকে না চর তেকে দিই—চিম পড়চে এখানে থাকলেই ছর হবে।”

মাটির পুতুল আরো আরো উঠে দাঁড়াল, কোনো জবাব না দিবে বাকীর ভেতর চ'লে গেল।

পরদিন সকালে উঠেই মুদ্রকাল কাকের ছুতোয় বেড়িয়ে গেল। ব'লে গেল এক ছাতের ওখানে নেমস্তর, সাতাধিন আসবে না। সালী বুল্লেন এটা অতিমান; হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত করেছে—এই মেহেটাকে পছন্দ করতে না তাই দুয়ে থাকতে চায়। তা বাবু, ভালই হোল, মাল লম্বা দিন ওকে একটু গ'ড়ে শিটে তুলতে হবে, নইলে বর পাব কেমন ক'রে? আদা ও হৈমবতীর ভিনিয়—না নেই, কেই বা শেখাব—সংমা খোখর গল্পনা দেয়!

রবারের ক্যাশিন জুতো প'রে, সন্ধ্যাে আলোয়ান ঢেকে ও কাগো বড় চপ্চা প'রে বেগরকিক আসতে ঘেখেই উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

“ছি: মা, এত লাঙ্ক হোলে কি চলে? তিনবার দ্বি পাঠিয়ে তা'ব বর থেকে বে'বোলে। এখনকার মেয়েরা বেশ চটপটে হাদি খুদী হবে। এই দেখ না, আমার বকুল ফুলের মেই লবে ধোলগ পড়চে—এমন ছেকেই সে পুকুরের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলতে পারে—কেউ তাকে চার মানিতে পারে না। অর্ধশ্রি আমার প্রকাশ শুদব মেয়ে পছন্দ করে না, তবু জাজকালকর লম্বা তো ঐ চার মা। কাল দ'কা বোলা থেকে তুমি প্রকাশের কাছে একটু শড়াওনা কর। ইংরিজ কি কিছু জান না মা?”

অমিতা একটু ঘাড় নাড়ল, তা হাম কি গম্বা বোঝবার মো নেই। সালী গলার হুর আরো কেমন ক'রে বলেন, “কেমন ক'রেই বা শিখবে—বাপ তো থাকে কাছে, মায়ের এতভাল ছেলেপুলে। তা আমি তোমার সব শেখাব মা। আদা তুমি আমার হৈমব মেয়ে—সে আমার কত ভালবাসতে।”

তারপর একটু চোখের মল দুছে নির্দিক্যরক্তি অমিতার দিকে চেয়ে বললেন, “তোমার চোখে যে কাগো চপ্চা, এ তো ঘোড়ুরে পরে মা। তুমি তো দায়াস্বপ্নই প'রে রোয়েচে—”

অমিতা লম্বত পরীক্ষাটাকে নাড়া দিয়ে বুখটাকে বিকৃত ক'রে বললে, “আমার চোখে বামনো আছে যে—”

“আহা নাট বাট, এখানে চিকিৎসা করলেই পেরে উঠবে। পাশ বুকি কিছুই দেখতে না? আর দেখ অমিতা, এই আলোগায়ানটা এমন ক'রে মাথায়ে গিয়ে জড়িত না। আমি বুড়োমাসির আমিও তো একটু হুজুরি ক'রে পায়ে দিই। চুলটাকে পেটে পেড়ে পেছনে চাক্তি ক'রে রেখে দাও; আকফালকার মেথেরা কত চাইই চুল বাঁধে, সব বেবে দেখে কিনে নেবে। আমি কাল তোমার বকুলফুলের বাড়ি নিয়ে যাব। তোমার বুজোও দেখছি ভাল না—সকালে বিকেলে চটি পায়ে দেবে—বেরোতে চোলে নাগুতা পরবে। সকালে উঠাই এই মক্কেল গোলাপি রংএর শাড়ী পরবে, প্রকাশ দেখলে ভগ্নিত হোত। নেয়ে ঘুরে একখানি নীলগায়ো পের। তুমি মনে মনে হাসছে মা—তাবু এই লোকেরে বুঝি কি জানে? কিন্তু আমি সব জানি। ভগ্নবান কোলে সন্ধান দেখনি—প্রকাশ হেলের মত—ও বাইয়ে বাইয়ে যোরে; তোমাকে কবিন নেড়ে চোড়ে মেয়ের সাথ মেটাই—”

গ্রাম্যবতের বাসী-বাঘনের লগুড়ার লগ তলে তিনি তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটলেন। অমিতা উপবেশের চাত থেকে বন্ধা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাচলো।

অনেক রাতে হুগ্রকাশ বাড়ী এসে তল্ল, অমিতার ঘর থেকে অত্যন্ত নাকি হয়ে গান ভেসে আসছে, “তুমি কাদের ফুলের বউ?” তার লম্বত মনটা বিধিরে উঠল! হা কপাল, ও কি একটা ভাল গানও জানেনা?—

ভরের বাজীর পেছন দিকে একটু গোড়ো ঘমিতে হুগ্রকাশ নিজের হাতে বাগান করেছিল। রবিবার দিন শেষ রাতে ঠাণ্ডা একটা হুগ্রকাশ বেবে ঘুম ভেঙে গিয়ে প্রকাশ ভারী অস্বস্তি বোধ করল, তাবলৈ বাগানে একটু বোড়ের মাশাটা ঠাণ্ডা ক'রে আসি। তখনো ভাল ক'রে আলো হয়নি, বাড়ীর দলী ঢাকর কেউ ওঠেনি—কিন্তু

বাগানে এসেই দেখলে শিউলি পাছের তলার ব'লে কে ফুল ফুটোতে বাস! মেয়েটি যে তাহেরই অমিতা একথা বিশ্বাস করতে তার ভাল লাগল না। অথচ সে ছাড়া কেই বা হবে। ইতিমধ্যে তার হান দারা চোখে গিয়েছিল বোধ কর, শিউরে ওপর একতাপ কালো চুল ফড়ানো, তল হুগ্রকাশ হুগ্রকাশ হাতটি অনাবৃত—অককারে ঘুম ভাল ক'রে না দেখা গেলেও তার প্রত্যাকটি বোমা অতি সুখী ও কোমলতাময় মনে হচ্ছিল। হুগ্রকাশ অতিকৃত মেয়ে পাড়িয়ে রইল। পাছে আলোর সঙ্গে সঙ্গে ও চ'লে যায়—আবার সেই কালো চন্দ্রা, সেই বেত্তনী আলোগায়ান, সেই প্রবালের বুজোও নিজের পরীক্ষাটাকে সম্পূর্ণ সুখী ক'রে লাম্বন এসে দেখা দিবে বস ভেঙে দেয়, এই মনে ক'রে সে বজকণ পায়ে গুকে বেবে নিতে লাগল। অমিতা পাছের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে ফুল ফুটোকে, চলায় লগে লগে ঘুরে ওই পাশের চুলগুলো গুলে গুলে উঠছে আর গুল গুল ক'রে অত্যন্ত নিষ্ঠে পলার গান গাইছে, “ওগো শেকালি বনের মনের কামনা—”

হুগ্রকাশের মনে হোল আর সত্য: বনগঙ্গা তার নিজের হাতের রচিত বাগানটিতে নেমে এসেছেন। সে তখন চোরে একটা হালনাঝানার ঘোলের আড়ালে পাড়িয়ে রইল।

হঠাৎ “উঃ মা” তলেই চম্কে উঠল, দেখল অমিতা ফুল ফুটানো বজ রথে পাছের তলার ব'লে পড়তে। সে আর নিজেকে গোপন রাখতে পারলে না—দৌড়ে এসে তার সামনে পাড়িয়ে বসে, “কি হোয়েছে?”

অমিতা তাকে দেখে এলনি চম্কে উঠল যে, পাবলে সে ওকুনি ছুটে পালানো। কিন্তু সে নাকি বোধ কর তার ছিল না—তার পা দিয়ে দর দর ক'রে বজ পড়ছিল।

হুগ্রকাশ ভয় পেয়ে বললে, “একি কেমন ক'রে কাটলেন?”—ও একটা বোতল ভাঙা মোটা কাচ দেখিতে বিল। আঘাতের গানটা পরীক্ষা করবার জন্য প্রকাশ দেখানে ব'লে প'ড়ে বসে, “ঘুম deep হোয়েছে দেখছি! নিন্ নিন্ ছাড়ুন, আমাকে দয়া করে দরঃত দিন; টিপে না ধরলে রক্ত বহু হবে না। এলুনি পরিষ্কার বলে ঘুরে আইডিন দিতে হবে—কাজের কাটা সাংঘাতিক।”



অমিতা বাড় নেড়ে বলে, “কাজ নেই।—”

“কাজ নেই বইকি? কেন আপনার সেই রবারের ছতো কেখা খেল? খালি পায়ে কেউ এসব জায়গায় আসে? আপন আমার কাঁধে ডুই দিয়ে একটু ঠাণ্ডাবার চেষ্টা করুন। এই গাণেই আমার দেখবার ঘর দেখানে সব আছে।”

অমিতাকে প্রকাশ একরকম হোঁচর করে টেনে এনে তার ঘরের বড় চোয়ালটার ওপর বসালো।

লজ্জাক্রান্ত হুঁরে অমিতা বলে, “ছি, ছি, আপনাকে কি কষ্ট হিমুম?”

হুগকাশ কেলে বলে, “এই যে কথা ফুটেছে বোম্বি—সাথে কি কথা বলার, বাখার চোটে কথা বলার।” সে অতি ধরে তার লম্বাটাক্রমের মত ফুলমকামল পা-পানি ধরে মুখে গম্বু লাগিয়ে দিল। বয়সার বখন তার বড় বড় চোখ ফেটে চল আসছিল, আর লজ্জার বখন তার সমস্ত মূখটা রাঙা হয়ে উঠছিল, প্রকাশ মনে মনে ভাবছিল, মাসীর বেগর-কির চোখ ছুটো এখন চমৎকার জানলে কোন্‌কালে চন্দ্রমটি! টেনে ফেলে হিমুম!

বাগ্গেল হোরে যেতেই অমিতা বলে, “আমি বই,—এগনি লবাই উঠে পড়বে। আপনার মাসী যদি দেখেন?”

“না না সে তর নেই, মাসীর খুজো আচ্ছিক সারা হোতে চের দেবী। আপনি তাক্যাত্তি করবেন না, আমি আপনাকে ঘ’রে ঘ’রে ঘর অবধি পৌছে দিয়ে আসি চন্দ্র।

অমিতা বাধা দিল না—কারণ নিজে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা এখন তার সাধ্যাতীত।

ঘর অবধি এসে হুগকাশ তার কানের কাছে দুখ এনে বললে, “সোজাই আপনার! সেই কাণো চন্দ্রা আর আলোগানটা আজ পরবেন না।”

অমিতার সমস্ত মূখটা হাল্কা হোরে উঠল।

এমন একটি ভোরবেলা যেন হুগকাশের বীকন প্রথম এল। তার সমস্ত মনটা বুপী হোরে উঠল, কেবলি মনে

হোতে লাগল—আজ কি ঘটন ঘটবে, আজ সে নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারবে না। আজ যেন তার জীবনের অনেকগুলো পাতা বাহ দিয়ে এক নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হোল। মনে মনে বললে, “আজকের সকালের প্রথম আলোটির সঙ্গে সঙ্গে গুকে যে আমি ওর বর্ষাধ রূপে দেখলুম—তখনই গুকে আমার পাওয়া শুরু হয়েছে; আর কোনো বাধাকেই বাধা ব’লে মানব না।

নিজের মনে মানিরকম কল্পনা করতে তার ভাল লাগল। অমিতার মূল ফুড়োবার সময় সেই হাতের বিশেষ ডকীটি, সফল বাধাকাতর চাকনি ও লজ্জা ক্রান্ত হুঁরে হাসিটি যেন তাকে এক স্বপ্নলোকে ভাগিয়ে নিয়ে চলল।

কো হোল। চাকরের কাছে মানের তাগাদা পেরে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখলে মাসী অমিতার মূলগুলো নিয়ে নাড়া চাড়া করছেন, সামনে ডেলের বাটি। যেচোরা বোধ করি লজ্জার বলতে পারেন তার মান পুকেই সারা হোরে গেছে।

অমিতার সর্বাঙ্গে সেই বেগুনী রং এর খোসা আলোগানটি নেই বটে, কিন্তু সেই প্রকাশ কাণো চন্দ্রমটি তার হৃদয় হৃদয়নাকে কুঞ্জী করে রেখেছে।

হুগকাশকে যেবেই ওর সমস্ত মূখমানা লাগ হোরে উঠল—কিন্তু আলোগানটি না থাকায় মূখ কুণোতে পারল না। মাসী বলেন, “হাতের প্রকাশ, হোঁর কি হোয়েছে? চাকরকে দিয়ে নিজের ঘরে চা নিয়ে খেলি, সকাল থেকে একবারটি এগিনে? রাগ করেছি দুই ব’কি?”

হুগকাশ অগ্রস্ত হোরে বলে, “আম কেন করব? তোমার ছেলে যদি একটু কাজে মন দেয় তাও সহিতে পার না—বেশা অবধি বুঝতেও হা ওনা। আজ সকালে উঠে এত এত ব্যস্তা দেখলুম। বেলা হোয়েছে তা টেরই পাইনি। আপনি কেনমন আছেন?” সে দ্বিগুণি ভরা চোখে অমিতার দিকে চাইল।

অমিতা জবাব দিল না; মাসী বলেন, “ভাল আর কই, আজ আবার বাখার ঘরে প’কে দিয়ে ভাবল পা কেটেছেন! ভেবেছিলাম আজি হোঁর সঙ্গে গুকে চোখের ভাস্করের কাছে পাঠাব, এখন এই বোঁকা পা নিয়ে যাবেই বা কি করে?”

অগ্রকাশ বলে, "চোখে আবার কি বল?"

"চোখে নাকি দোষ আছে, ওট কালো চশমাটা তাই প'রে থাকতে হয়।"

"তা বেশ তো, এর পরে নিজে যাওয়া হবে'লন। আমি না হয় তোমার দেওর-কির সঙ্গে আর একদিন কলেক কামাচ্ছি করব।"

মাসী প্রকাশকে অমিতার সম্বন্ধে এত ভাল মেজাজে কথা কহিতে দেখে অবাক হোয়ে বলেন, "তা করিল, এখন যা চানটা সেয়ে আর, আমি দেখি রাস্তার কতদূর"—ছুটির দিনে তিনি বোনগোকে নিয়ে ছুটা তরকারী রেখে যাওয়ার।

মাসী চ'লে যেতেই প্রকাশ বলে, "আপনার পা কেমন আছে?"

"ভালই।"

"বাধা করে

"একটু একটু করছে।"

"বেশী ছাঁটাছাঁটি না করাই ভাল।"

"করছি না তা।"

"মাসী যে চোখের অস্থি বলছিলেন, গতি কবা? চোখ দেখলে তো মনে হয় না কোনো দোষ আছে।"

"দোষ নেই।"

"সে তো আমি বুঝতেই পেরেছি, কিন্তু একটি জিনিষ বৃত্তে পারছি না। এই চশমা, এই বেগুনী" আলোয়ান,

---

ইতিহাস গল্পের ব্যাখ্যামূলক

এই রবারের জুতা, এট পুট—এই গোয়ালুত পানি, এই নিজে'কে শত রকমে কুঁচি করবার চেষ্টার মানে কি?"—

অমিতা কিছুক্ষণ কথা বলেনা—তারপরে পুণ লজ্জাজড়িত নম্র মুখে বলে, "আপনি আমার কথা করবেন, আমার অপরাধ হোয়েচে।"

অগ্রকাশ অবাক হোয়ে তার দিকে চাইল। অমিতা বললে, "আমি একবারো ভাবিনি আমার ছুটুমিটা এতখানি হোয়ে উঠবে। বাবার কাছে জোঠিমার একটা চিঠিতে দেখেছিলাম আপনি গ্রন্থী শিক্তা ও Up-to-date মেয়ে পছন্দ করেন না। আমার ভর্তী রাস হোল—আজকালকার মেয়েদের কি সবট দোষ? আমি মনে মনে ঠিক করলাম কোণকাতার গিথে ভগ্নী কুঁচি অশিক্ত মেয়ে আপনাকে পুণ চম্ব করব। কিন্তু আরজ ক'রে আর শেষ করতে পারছিলাম না। ভালই ভাল আজ আপনা থেকে আমার সব ছুটুমি দখা প'ড়ে গেল। এখন আমার একটি মাত্র ভর আপনাকে মাসী আমার কক্ষণের কথা করবেন না।"

প্রকাশ উৎফুল্ল হোয়ে বলে, "নিশ্চয় করবেন, একশে: বার করবেন। সব বলবার তার আমার লাগে। তিনি নিশ্চয় তাঁর ছেলের ছুঁ, বউটিকে কথা না ক'রে পারবেন না।" লজ্জার আড়তে হোয়ে অমিতা বলে, "না, না, ছিঃ কি বলছেন।"

অগ্রকাশ জোর ক'রে ওর চশমাটা পুণ দিখে মাসীকে বলে, "মাসি, এবার তোমার বউ'এর রূপট: একবার দেখে যাও।"





## রসের নিত্যতা

শ্রী প্রমোদরত্ন দাশগুপ্ত

পর্যটকের ত্রিচকারণ অপ্রতিপত্ত কলিকাতা ইনিস্তানিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁর দর্শনীয় সভার পরবর্ত্তক যে অভিভাষণটি পাঠ করেন তার একস্থানে তিনি বলেছেন,—

"একথা সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে কোন দেশের কোন, সাহিত্যই কখনো নিত্য তালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু মত এরও মত আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া ও সাহিত্যের পড়াবার ভাষা নেই, মানবচিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য বিকশিত হ'য়ে গুঠে। সেই মানবচিত্তই যে এক স্থানে নিষ্কল হ'য়ে থাকতে পারে না। তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে,—তার রসধোণ ও সৌন্দর্যবিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক। তাই এক সূত্রে যে সূলা মানুষে গুলি হ'য়ে দেয়, আর এক সূত্রে তার অর্ধেক দান দিতেও তার সূত্রীয় অবধি থাকে না।

\* \* \*

সমগ্র মানব জীবনের কোন, ব্যক্তিগতবিশেষ জীবনের সেবা এর নিয়ম বিহীন। ছেলেবেলার আমার ভবানী পাত্র ও হরিদাসের গুপ্ত কথাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। তখন কত বস, কত আনন্দই যে এই দু'বানি বই থেকে উপভোগ করেছি তার সীমা নেই। অথচ আজ যে আশ্রয় কাছে দীর্ঘ। কিন্তু এ পনের অশ্রদ্ধা, কি আমার গৃহের অপরায়ণ বলা কঠিন। "

পর্যটকের বা বলেছেন গোটা কথাই আমার ভেতর তা বলতে গেলে এই গাড়ার যে, সাহিত্যের বা কিছু সূলা তা মানুষের ভাল লাগে ব'লেই। বতকখন কোন সাহিত্য মানুষের ভাল লাগে ততক্ষণই তার একটা সূলা থাকে। বখনই তা মানুষের অপরায়ণ হয় তখনই তার সূলা চ'লে যায়, তার সূত্রা খটে। মানুষের এই ভাল লাগা জিনিষটা নিত্য পরিবর্তনশীল, আর বা ভাল লাগে বস বসের পরে আর

তা ভাল লাগে না। হুতরায় মানুষের এই ভাল লাগার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও পরিবর্তন ঘটে। কোন সাহিত্যই অমর নয়, সবই কণকাদী, পাঠকের ভাল লাগার উপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। সেই ভাল লাগা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারও জীবনের শেষ হয়।

সাহিত্যলব্ধকে পর্যটকের এই মন্তব্য অনেকের পূর্ব একটা বড় সত্য ব'লে মনে নিচ্ছেন। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, সাহিত্যের বর্ণের এমন স্পষ্ট পরিষ্কার আর কারও কাছে থেকেই পাওয়া যায় নি।

আপাততঃ পর্যটকের এ কথাটা পূর্ব সত্য ব'লে মনে হয়। সত্যি ত ব'লে সূত্রে সূত্রে মানুষের রসধোণের পরিবর্তন হচ্ছে। এ সূত্রে যিনি সর্বজনসমাপ্ত লেখক, শেষের সূত্রে সাহিত্যের আলরে তাঁর স্থান খুঁজে পাওয়াই চরম শূন্য হ'য়ে গুঠে। সাহিত্যের ইতিহাসে একগু পুটোরের ত অভাব নেই। এক সময় ইংরাজি সাহিত্যে পোশ ছিলেন অপ্রতি-  
ষষ্ঠী কবিদম্ভাট। আর সে সাহিত্যে পোশের স্থান কোণায়, কত নিম্নে! সাহিত্যের ইতিহাসের এ সমস্ত ঘটনা পর্যটকের উক্তির সত্যতাই লক্ষ্যমান করে ব'লে মনে হয়।

কিন্তু আর একটু দূর ভাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, সাহিত্যলব্ধকে পর্যটকের এ উক্তি কোন মতেই মনে নেওয়া চলে না। তাঁর এ উক্তি যদি সত্য হয় ত সাহিত্য সমালোচনার কোন স্থান থাকে না। বেশি বড় কবি, কি জাভিনি বড় কবি,—বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবি-  
সাহিত্যিক কে, নাট্যকার হিসাবে সেক্সপিয়ার ও ইংল্যান্ড-  
এর মধ্যে কার স্থান উর্ধ্বে, এ সমস্ত তর্ক আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। এক এক সূত্রে এক এক সাহিত্য ভাল লাগে, তাতে ক'রে মানুষের রসধোণের পরিবর্তনশীলতা বাধে আর কিছুই প্রমাণ হয় না। এক কালে দাঁত রায়ের কবিতা বাঙালীর পূর্ব প্রিয় ছিল, আর কেউ তাঁর নামও



# শিলঙে দুর্গোৎসব

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র নাহিড়া

দুর্গাপূজাকে দুর্গোৎসব নাম না দিয়া শারদোৎসব নাম দিলে দেখা যায় যে, তাহা তিমালর হঠতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা পনাত্ত তিপুতাবতের সর্ব্বহট কোনও না কোনও নামে প্রচলিত আছে,—তাচা বঙ্গলার দুর্গাপূজাই হউক, দক্ষলদেশের ও শাক্তবৈব রামলীলাই হউক, আর দাক্ষিণাত্যের মনসা অথবা বোম্বাই ও গুজরাটের নবগাজিই হউক; কিন্তু তদ্যাব্দ 'শান্তবাহিনী, হস্তিবাহিনী, মনদুজা' প্রভিয়ার পূজা বঙ্গলায় একান্ত নিম্নস্থ। আন বঙ্গলার বাহিরে এই পূজার পচাবে এবং প্রচলন, বঙ্গলায় বাহিরে বাঙ্গালীর 'কল্যাণবৈব' চরখাক্সর টুটিত।

বাঙ্গালী শাক্তবৈব হঠতে বেতুন লগ্নায় বঙ্গলার বাহিরে দেখানের পিছাচে, দেখানের তাহার এই প্রাণ উৎসবটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু মঙ্গল ইহার প্রচার করিতে পারে নাই। বঙ্গলার বাহিরে তিনটি প্রদেশে কিন্তু বাঙ্গালীর এই লগ্নাত্ত নিম্নস্থ উৎসবটি তাহার নিম্নস্থ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—এই তিনটি প্রদেশ, বঙ্গলার উত্তরে নেপাল, পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা।

পদমে বাঙ্গালী, আসামী ও নেপালীদের দুর্গোৎসব পাশাপাশি দেখা গেল। সব কয়টি উৎসব মূলতঃ এক হইলেও তাহার মধ্যে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন লগ্না, লগ্নাত্তা, পারিশার্খিক ও সামাজিক জীতি নীতির ব্যাঘা কৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর পূজার মধ্যে বঙ্গালীর সেই চিরন্তন বৈবদ্যহু,—অন্যদেশে বিব'হিত্য কল্যাকে বগুতবাড়ী-প্রোজনের ব্যাঘা, উমার ভক্ত গিরিজাক্সের তুং বাণ মারের মেলস্ত সনদের করণ রসে অভিযুক্ত হইয়া দেখা দেয়। আসামীদের পূজা জীবনদায়ী পূজা; লক্ষ্যবৈবের লক্ষ্যবৈব ও প্রচারকের আসাম বঙ্গলার এই অস্থলানতিক বৈবদ্য জক্তির উৎসে দান করাঁইরা আশনার নিম্নস্থ লগ্না ও চিন্তাশারার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

নেপালীদের দুর্গাপূজা এই উৎসব পূজা হঠতেই পৃথক। শিলামর পাগলতা দেখে দুঃপ্রতিমা প্রস্তুত করা কঠিন। মেজল নেপালীদের পূজার তুচ্ছ দুঃপ্রতিমা প্রস্তুত করা হয় না, তাহার বানে কুস বর্ণপ্রতিমার পূজা করা হয়। কিন্তু নেপালীদের পূজার সঙ্গে আসামী ও বাঙ্গালীদের পূজার পার্থক্য। শুধু বাহিরের পার্থক্য নয়; তাহা অন্তরেও পার্থক্যও বটে। এখানে বাঙ্গালীর দেওবিদ্যালিত জন্মের করণ রসের প্রবাহ নাই, আসামী বৈবদ্য জক্তির মদুর ধারা নাই; আছে লক্ষ্যপ্রাণ পাগলতা জাতিব লক্ষ্যপ্রাণনাথ অভিযুক্ত।

কিন্তু শুধু পার্থক্যই চোখে পড়ে না, সাদৃশ্যও চোখে না পড়িয়া যায় না। সব প্রদেশের পূজাতেই সেই একই মূল মীপ, পক্ষপ্রদীপ, আবার, বৈবদ্য মিথ্য। হোভুশোপচারে লগ্নতের তুচ্ছ লগ্নমী, অষ্টমী ও নবমী হিথিতে দেবার আশাখনা আর লগ্নতই দেবার লগ্নত ও চৌপাঠ। এই দক্ষল অস্থলানিত বৈ মূলতঃ এক, একই স্থান হঠতে উদ্ভূত, একই লগ্ন হঠতে প্রচারিত তাহাতে লগ্নপ্রাণ ও লগ্নের পক্ষে না। একফালে বাঙ্গলার কালচার, বঙ্গলার বৈবদ্য ধর্ম ও লক্ষ্য-উপাদনা কেনন করিয়া বঙ্গলার বাহিরে প্রচারিত হইয়া এক লক্ষ্যের লগ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও তাহা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইজেছে, তাহা লগ্নমি গিরিপল্লত, লগ্নদল্লগ্ন অন্তরে ব্যাঘা ও বাবধান মানে নাই, লগ্নাত্তার লগ্নতের, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন লগ্নদান ও লগ্নদানপ্রাণলী তাহার গজিগোষ করিতে পারে নাই,—একথা তাহা আনন্দ ও গৌরব ব্যাঘ না করিয়া থাক্য যায় না।

শিলঙে লগ্নে মোট আটখানা পূজা হয়। ইহার মধ্যে একখানা গুণ্যবৈব, একখানা পানার বাঙ্গালী আসামী ও নেপালী লগ্নপ্রাণলী মিথিয়া করিয়া থাকেন; আর ব্যক্তি লগ্ন দানার মধ্যে তিনখানা বাঙ্গালী লগ্নপ্রাণলীর এবং

তিনখানা আগামী অবিশ্বাস্যে। মোটামুটি, সহরের প্রত্যেক অংশের অবিশ্বাস্যেই একই চীৎকার তুলিয়া বংশাশ্রমে এই উৎসবটির অগ্রদূত করিয়া থাকেন।

শিল্প সহরে নেপালীর সংখ্যা প্রায় আট দশ লাখের চাইবে। তটীর্ণ ভূমি বাটালিয়ার এখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। তাহাদের পরিবার পরিজন লইয়া সহরের এক অংশে একটি নেপালী পাড়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাকে ‘পন্টন’ বলে। তুর্গোৎসব তুর্গোৎসব এই পন্টনের দৈত্যের ব্যতিক্রম পক্ষে তুর্গা দৈত্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রদূত হয়। বাঙ্গালী চন্দ্রের

সজ্জিত করা হয় এবং ইলেকট্রিক লাইটে আলোকিত হয়। পূজার কথ্যদিন প্রতি রাতে এখানে নেপালীরা নিজেদের ভাষায় তাহাদের নাটক অভিনয় করে।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিনই তুর্গোৎসব পূজা অগ্রস্তিত চাইলেও, নবমীর পূজাই উল্লেখযোগ্য। সপ্তমীর দিন দিবাভাগে ঘণ্টাভিত্তি পূজা ও বলি হয়। অষ্টমীর দিন দিনে পূজা নাই—সাহায্যের বহিষ্কৃত নেপালী পূর্বোক্তভাগে গৌরী ও দেবী ভাগবত পাঠ করেন; রাতে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধ্যাকালে পূজা ও বলি হয়।



### তুর্গোৎসব মহিষ-বলি

মত তুর্গোৎসব ও তুর্গাপূজা প্রধান জাতীয় উৎসব। লোকের পূজার কথ্যদিন সমস্ত তুর্গাপরী উৎসবসম্বন্ধে সজ্জিত হইয়া উঠে। পাড়ার মধ্যে ঘানে ঘানে পাথরের উপর চারখানা করিয়া দাঁধ পুঁতিয়া তাহার সবে সজ্জিত হুলাইয়া ধোলা প্রস্তুত হয় এবং তুর্গারা ব্রী-পুরুষ বালক-বালিকা নির্জিনে এই ধোলায় ধোল খাটতে থাকে, সাহায্যকারের মধ্যে ধোলাগুলিতে লোক-সমাগমের বিস্তার নাই। পন্টনের মধ্যে একটি অগ্রজ পাথরের উপর তুর্গোৎসবের রক্ষক নির্ধারিত হয়। রক্ষকটি আধুনিক দিন ও সন্ধ্যার

নেপালীরা নবমীর পূজা ও বলি শিল্প সহরের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বস্ত্র পূজাসম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তরে পূজার পুঁতিয়া তাহার পাশে নিম্নস্থিত লোকদিগের বলিবার ভক্ত প্রকাণ্ড মক প্রস্তুত হয়। শিল্প সহরের ইংরাজ, বাঙ্গালী, আগামী লোক প্রেমের লোক নিম্নস্থিত চীৎকার বলি দেখিবার ভক্ত উপস্থিত হন। স্থানীয় আবাসগৃহ বনিতা বলি দেখিবার ভক্ত সমবেত হয়। দৈত্য বিভাগের সমস্ত ইংরাজ কর্মচারীরা এই উৎসবে যোগদান করেন।



নেপালীদের নৃপকান্ত বাঙ্গলার নৃপকান্ত চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নেপালীদের নৃপকান্তকে মৌল্য বলে। মৌল্য একখানি চতুষ্কোণ সরল কাঠ; উচুতে প্রায় ছয় হাত হইবে। কাঠখানার গায়ে বশুক, কুকুরি এবং অন্যান্য অস্ত্র খোদাই করিয়া অঙ্কিত। কাঠখানা খাড়া করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়। কাঠখানার নীচে প্রায় তুমিঙ্গলের স্থানে একটি ছিদ্র। বলির পশ্চটিকে কাঠের সামনে আনিয়া তাহার গলার দড়ি মাথার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া পড় করিয়া খরিলেই পশুর মাথা ছেঁট হইয়া কাঠখানার গোড়ায় লগ্ন হইয়া যায়। পিছন চাইতে কয়েকজন লোক পশুর পা ধরিয়া থাকে। এইভাবে বলি সমাধা হয়।

নবমীর দিন বাইশটি মহিষ ও অগণ্য ছাগলি বলি দেওয়া হয়। বলির কল্ল প্রায় তুমিঙ্গলের গায়ে একদল গুর্গায়েদর বশুকল্লত পড়াইয়া যায়। তাহাদের গায়ে গুর্গায়েদের সামগ্রিক গোড় বাস্ত্র ব্যক্তিতে থাকে। চারিদিকে মেনিঙ্গান ও কামান স্থাপিত হয়। চাই তিন জন গুর্গা মিলিয়া একটি মহিষকে বলির তুমিঙ্গে লইয়া আসে। তাহাকে নৃপকান্তে লাগান হয়। তীত পশুভণ্ডিকে নৃপকান্তের নিকট লইয়া যাইতে অনেক সময়ই খুব বেগ পাইতে হয়। পশুভণ্ডিকে নৃপকান্তের সঙ্গে লাগান হইলে খাতক ঘোঁরার নিকট উৎসর্গীকৃত প্রকাণ্ড একখানি কুকুরি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়; পুরোহিত আসিয়া পশুর মস্তকে জল ও নীলসোয়ার সুগন্ধি ছিটাইয়া দেন। এই সময় প্রায় পক্ষাশ্রিত বশুক একসঙ্গে গজিয়া উঠে এবং সামগ্রিক বাজনা বাজিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গেই খাতকের বহুল পশুর মস্তককে দেহ চাইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

গুর্গায়েদের পূজার সঙ্গে তাহাদের সামগ্রিক জীবনের কতগুলি কথা মিলিয়া এক অমৃত মহত্বানের সৃষ্টি হইয়াছে। গুর্গায়েদের পূজা দেখিতে গিয়া এই কথাটাই সব চেয়ে বেশী করিয়া চোখে পড়ে।

পানার পুণ্ডিন কর্ণচোরীদের পূজাটিকে এখনকার শাপকলীন পূজা বলিলে অসত্যিকি হয় না। পানার উচ্ছতন কর্ণচোরীরা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী অথবা আসামী।

কেনেইবলেনা হয় যিম্মুহানী নয় নেপালী। বিশেষতঃ হিভার্ড পুণ্ডিন প্রায় সবই নেপালী। পানার পূজাটি এই সকল শ্রেণীর কর্ণচোরীর উদ্দেশ্যে নিৰ্ম্মাণিত হয়। বাঙ্গালী পুরোহিত, হিন্দুস্থানী তত্ত্বকার, অভিনব পুত্র। পূজামণ্ডপের সামনে বৃহৎ ঘরের মধ্যে গুর্গায়েদের নাচ গান ও গং চলিতেছে। গুর্গায়েদকরা তাহাদের ছোট ছোট ঢোল বাজাইতেছে। সেখানে গুর্গা নরনারী ও শিশু আসিয়া তিড় করিতেছে। পূজামণ্ডপের সামনে গুর্গায়েদের 'মৌল্য' স্থাপিত হইয়াছে। আসামী ও বাঙ্গালী কর্ণচোরীরা সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং সমাপ্ত হোকবিশেষে অভ্যর্থনা করিতেছেন। হিন্দুস্থানীরা পূজার উদ্দেশ্য আয়োজনে ব্যস্ত আছে।

বাঙ্গালীদের পূজার মধ্যে মেলরোডের পূজাই সব চেয়ে প্রাচীন। ওই পূজা প্রায় কুড়ি বৎসর হইল চলিয়া আসিতেছে। শিলং নগরের এই অংশের অধিবাসীরা একটি গারী ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ করাইয়াছেন। এই ঠাকুরবাড়ীতে গুর্গাপূজা ও বারোমাগের তেরো পার্শ্ব অস্থাপিত হইয়া থাকে। মেলরোডের ঠাকুরবাড়ী ব্যতীত, শিলংএর বৃহৎ বাঙ্গালী গমী লাগানেও একটি হরিদভাগুর আছে। এখানে লাগানের বাঙ্গালী অধিবাসীরা একটি পূজা অস্থাপন করিয়া থাকেন। এতদ্বিধ পুণ্ডিনবাগাতের নিকটবর্তী অপরোহাউল নামক গ্রহেও বাঙ্গালীরা একটি পূজা করিয়া থাকেন।

আসামীদের পূজার মধ্যে লাগানের পূজাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসামীদের পূজার বেশি নাই। এতদ্ব্যতীত মাগে মজ্জার ত্রিধাকর্ষণে অস্থাপনে বাঙ্গালী-পূজার সঙ্গে কোথাও পার্থক্য নাই। আসামীদের পূজার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য আসামীদের ঢাক। বাঙ্গলার ঢাকবাগকরা ঢাকটিকে একপাশে প্রায় পিঠার উপর লইয়া বাহার। আসামী ঢাকবাগকরা ষ্টিক অথ বড় ঢাকটিকে ঢোলকের মত শরীরের সমুখে স্থাপনই বাহার। এইমত, ও হাত দিয়া বাজানের সঙ্গে আসামী ঢাকের বাজ বাঙ্গলার ঢাকের মত স্মৃত পত্তীর ও উচ্চ হয় না।

বিভিন্ন দশমীর দিন শিল্পে সহরের সমস্ত প্রতিমা পুণিপ্রবাহেরের মধ্যে আসাম কাউন্সিল হাউসের সম্মুখে চৌরাস্থ্যের উপর শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া আসা হয়। সহরের সমস্ত লোক, বাঙ্গালী, আশামী, আসিয়া নরনারী এইখানে আসিয়া সমবেত হয়। বাঙ্গালীদের ও আশামীদের প্রতিমার সঙ্গে সর্দার্কন এবং পুণিপ্রবাহের পুজার সঙ্গে তিন্দুহানীদের তরুণ ও গুণীদের নাচগান চলিতে থাকে। ক্রমে সমস্ত প্রতিমা একত্র জড় হইলে প্রতিমাগুলি লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সহরের নিম্নে উমউথরা নামক 'কুঞ্জ'টির (ছোট পার্বত্য পাহাড়) ভীম উপস্থিত হয়। সেখানে একটি উচ্চ পাহাড়ের নীচে আটখান। প্রতিমা এক দারিতে বসানো হয়। নির্জন পাহাড়, নীরব বনহনী, ব্যাঙ বাহ, চাকের শব্দ 'ওগামাটিক জং' তবে সুগন্ধিত হইয়া উঠে। পাহাড়ে অকস্মাতে বনানী লইয়া পাহাড়টি গাড়াইয়া আছে, সম্মুখে আলোকমালাসজ্জিত আটখান। প্রতিমা এক

দারিতে স্থাপিত  
স্থায়।

প্রতিমা-বিসর্জনের পর আলোক ও শ্রীতি-সম্মান। এ দৃষ্ট বাঙ্গালারই মত, তবে যথেষ্ট শিল্পে বাঙ্গালীর পক্ষে প্রবাসস্থান বলিয়া অগ্রহানটি একটু বেশী করণ ও আকর্ষণিক। কেহ হয়ত পুজার ছুটিতে বাড়ী ছাড়িয়া কিম্বে বেড়াইতে আসিয়াছে—আজকার দিনে গৃহের কথা মনে পড়িয়া যায়; কেহ হয়ত চাকরী অথবা বাবলা উপলক্ষে এদেশে বাস করিতেছে—পুজার ছুটিতে গৃহে বাটিতে পারে নাই; আজকার দিনে এই শত সহস্র লোকের মধ্যেও নিজেকে বিশেষ করিয়া একাকী ও নিমস্র বোধহয়। কাহারও বিগত শোক উছলিত হইবে; কাহারও অতীত গৃহের স্মৃতি বর্তমানের আনন্দকে বিধাদ করিয়া যাবে। এমন করিয়া শিল্পে দুর্গোৎসবের অবস্থান হয়, বাঙ্গালীর এই জাতীয় উৎসবের উপর একবৎসরের জন্ত যমিনকার পতন হয়।

## কবীর

### ঐক্যগুণের বোম

আমর রস দেখা করিছে চারিধার  
আকাশ ভেদি উঠে শব্দ অনিবার,  
সাগরে বৃক্ষে টেনে উঠিলে কূল ছাড়—  
সে-লোক কথা কিগো বাণনি বলা যায়!  
সুহৃৎ নাহি চাপ তারকা-ভাতি নাহি  
রাস্তা না আগি রহে প্রভাত সুখ চাহি;  
বাশরী ধানি সনে বীণার সুহৃৎ স্মর—  
অনাদি বাণী কার বাজে সে সুহৃৎ-স্মর!  
অমৃত প্রভা দেখা জগিছে বলদল  
বরষা বিনা ঘাসা করিছে অবিরল;  
কবীর কহে আমি গোপন কথা তার—  
বিরল কেহ বুঝে—বুঝিবে কেবা আর—  
জানে সে পেছে যেই উৎস পহুপার  
অনন্ড-মরণের—সে নাহি দিগে আর!



যাত্রা আরম্ভ হয়। ভয়ংকর নাই, কেউ নাই— শুধু অশু  
 জাতি, আর নীলমণি চাক্কার যাত্রার দল আছে সামনে।  
 বাকী সব শূন্য। লোকের আগে বেলাগায় ইমন্ড আলোপ  
 করে। ভাল বেলাগায়ের, পাড়ারগায়ের ছেলে কখন সে  
 ভাল ভিনিল শোনে না,—উপাল কল্ল হুয়ে হঠাৎ মন  
 কেমন করিয়া উঠে—মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বসিয়া  
 বাড়িতে দেই কি লিখিতেছে—বিদ্যা আসিতে চাহিয়াও  
 আসিতে পারে নাই। প্রথম বধন জিরির লাজ শোখাক  
 পরিয়া টাঙ্কানো কাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত  
 আলের রাজ্য ময়ূর দল আসিতে আরম্ভ করে, অশু  
 মনে তাহে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না।...  
 সবাই তো আগের আনিবাছে, প্রবেশের, তাহারদের পাড়ার  
 কোনও লোক তো বাকী নাই। বাগ কেন আসিল না ?  
 পালা জুত অগ্রসর হইতে থাকে সে বার সে বাসক  
 কীর্তনের গলের থাড়া গুলিয়াছিল—সে কি, আর এ কি !...  
 কি সব লাজ ! কি সব চেহারা !... হঠাৎ শিঙন হইতে  
 কে বলে—যাক! বেগ দেখতে লাড় তো ?... তাহার বাবা  
 আনিবাছে !... কখন আসিয়া আগের বসিয়াছে—অশু  
 বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা দিদি ?... তাহার বাবা  
 বাড় নাড়িয়া জানায় আনিবাছে।

ময়ূর গুপ্ত বসন্তের বধন রাজা রাজ্যভূক্ত হইয়া

দ্রীপুত্র গইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁপনে হুয়ে  
 বেলাগায়ের লজ্জা হয়। তাত্রপর রাজা ককণ রস বসন্ত  
 ভয়ংকর রাখিবার ভক্ত দ্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা  
 করিয়া গায়েন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন,  
 সত্যিকার ভগতে কোনো বনবাল গমনোন্নত রাজা নিভাত  
 অগ্রসৃত্তিহ না হইলে এক দল লোকের গম্বুখে সেক্ষণ  
 করে না। বিবস্ত রাজসেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে,  
 বৃন্দীতোপগ্রস্ত রোসীর লক্ষণে তাহা হিংসার বিবস্ত হইবার  
 কথা। অশু অশলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে,  
 হুয়ে, বিবস্ত হইয়া যায়। এমন তো সে কখনো লেখে  
 নাই !

তাত্রপর কোথাও চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথাও  
 গিয়াছেন রাজী !... বন বিকৃত বনে শুধু রাজপুত্র অজর  
 ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা তাইবোনে গুরিয়া বেড়ায়।  
 কেউ নাই যে তাহাদের দুয়ের দিকে চায়, কেউ নাই যে  
 নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া গইয়া চলে। ছোট  
 তাইয়ের ভক্ত কল আনিতে একটু দূরে চলিয়া গাইয়া  
 ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজর বনের মধ্যে বোনকে  
 গুলিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ গুলিয়া  
 গায় ইন্দুলেখার মুক্তবেহ—সুখার তাকনার বিবস্তল খাইয়া  
 সে মরিয়া গিয়াছে। অজরের ককণ গান—“কোথা

## শ্রীবদ্বীতবৃন্দ বন্দোপাখ্যান

ডেকে গেলি এখন কাছারে গ্রাম গির গ্রাম সানী রে” —  
 তুমিরা অশু এতক্ষণ মুখে চোখে চাটিয়াছিল—আর থাকিতে  
 পারে না, ক্লিগা ক্লিগা কানে। ইন্দ্রলেখা বেন ঠিক  
 তার দিদি। বিদিকে ও অবস্থার কল্পনা করিয়া অশুর  
 মুখে মধো হুহু করিয়া উঠে।... কলিঙ্গরাজের সহিত  
 বিচিত্রকেশুর মুখে তলোয়ার খেলা কী!... আর, বুকি  
 বাড়গা বাড়গা হুহু, নয় তা কোনো হস্ততাপা দর্শকের চোপ  
 ছুটি বা বাহ! সব গুটে—ঝাড় সামলে—ঝাড় সামলে!...  
 কিন্তু অদ্বৈত মুক্তকোশল—সব বাচাইয়া চলে—যত  
 বিচিত্রকেশু!

মধো অনেকক্ষণ ধরিয়া জুঁড়ির দাঁড়পান ও বেহাগার  
 কলরবের সময় অশুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—  
 মুম পাছে—বাড়ী গাবে খোকা?... মুম! সন্দান!...  
 সে বাড়ী বাইবে না, বাবা বাইতে পারে। বাহিবে ডাকিয়া  
 গিয়া তাহার বাবা তাহাকে দুইটি পয়সা দেয়। অশুর  
 ইচ্ছা হয় সে একশরনার পান কিনিয়া খাইবে, পানের  
 খোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিক্তি বেবিয়া অগ্নির  
 চইয়া বেবে অবাক! সেনাপতি বিচিত্রকেশু ভাতিয়ারবন্দ  
 অবস্থার বিড়ি কিনিয়া খাইতেছেন—তাহাকে খিগা  
 রথস্বার ভিক্তি। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য!... রাজকুমার  
 অমর কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেশুর কহুইয়া হাত  
 দিয়া বলিল—একশরনার পান খাওয়াও না কিশোরী-  
 দা!... রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার কোনো  
 নিদর্শন দেখা গেল না—হাত বাড়িয়া দিয়া বলিল—যা,  
 অত পয়সা সেই—ওবেলা সাবান খানো যে হুজনে মাখলে—  
 আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—  
 খাওয়াও না কিশোরী দা! আমি বুকি কখনো—  
 বিচিত্রকেশু হাত ভাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অমর অশুরই সমবয়সী হইবে। টুকটুক, বেশ  
 বেশিতে, পানের গলা বড় হুজর। অশু মুখে হইয়া তাহার  
 দিকে চাটিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় খাণাণ করিতে। চমৎ  
 সে কিসের টানে সাধনী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার  
 দলক বলে—পান খাবে?... অমর একটু অবাক হয়, বলে—  
 তুমি খাওয়াবে? নিরে এল না। তুমি ভাব হইয়া যায়।

ভাব বলিলে তুল হয়। অশু মুখে, অচিন্তিত চইয়া যায়!  
 ইহােকই সে এতদিন মনে মনে চাটিয়া আনিয়াছে—এই  
 রাজপুত্র অমরকে!... তাহার মায়ের শত রত্নকম্বার কাচিনার  
 মধা দিয়া, শৈশবে শত স্তম্ভবরী মুখে কল্পনার যোবে তাহার  
 গ্রাম ইহােকই চাটিয়াছে, এই চোপ, এই মুখ, এই গলা  
 বর। ঠিক সে গাথা চাহ, তাহাই। অমর কিজানো  
 করে—তোমাদের বাড়ী কোথায় তাই!... আমাকে এক  
 জনের বাড়ী যেতে দিগেতে, বড় বেলায় যেতে দেয়।  
 তোমাদের বাড়ীতে যার কে?

মুদিত অশুর দারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাব,  
 আমাদের বাড়ীতে একজন যেতে যায়, সে আজ দেখলাম  
 চোলাক বাজাচ্ছে—তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে  
 ডেকে নিরে যাবো—চোলাক ওলা না হয় তুমি যে বাড়ীতে  
 আসে যেতে, সেখানে খাবে?—

ধানিকক্ষণ হুজনে এদিক ওদিক বেড়াইবার পর অমর  
 বলে—আমি বাই তাই, শেষ দিনে আমার পান আছে—  
 আমার শাট কেমন লাগছে তোমার?

শেষ রায়ে বাড়ী ভাঙিলে অশু বাড়ী আসে। পলে  
 আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে  
 হয় বাড়ীর একটো হইতেছে। বাড়ীতে তাহার দিদি বলে—  
 ও অশু কেমন বাড়ী তুলি?... অশুর মনে হয়, গভীর  
 জনপুত্র বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দ্রলেখা কি বলিয়া  
 উঠিল। কিসের যে যোব তাহাকে শাটটা বলিয়াছে!  
 মধা মূদিত সহিত সে বলে—তাল থেকে অমর যে  
 সেজেছিল না—সে আমাদের বাড়ী যেতে আসবে—

তাঁহার মা বলে—হুজনে খাবে?—হুজনে কোথেকে—  
 অশু বলে, তা না, একজন তো চলে যাবে, তুমি অমর খাবে—

হুগী বলে—কেমন বাড়ী রে অশু?... এমন কখনো  
 দেখিনি—কেমন পান করে খান সেই রাজকুমারী মত্রে গেল?  
 অশুর তো রাতে ঘুমের খোরে চাটিয়াছে বেন বেহাগা  
 সস্ত হয়। তার হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—





শেষ প্রান্তে ঘুমাইয়াছে, কৃষ্ণিণ মধ্যে বৃষ্ণ ভয় নাই, কপাল  
ভাঙ অগ্নির চোখে যেন সূঁচ বিশেষ। চোখে জল দিলে  
জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেগুনা জোল  
মন্দিরায় ঐকান্তিনে বাজনা তখনও যেন ঘাটতেছে—তখনও  
যেন সে বাহার আমরেই বসিয়া আছে। ঘাটের পথে ঘাইতে  
লাড়ার ঘেরেও কথা বলিতে বলিতে ঘাইতেছে, অপুর মনে  
হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গবংশের মহারাণি, কেহ  
গজপুত্র অরণের মা বহুমতী। কিরির স্রোত কণার, চাত  
পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাঙকজা ইন্দুলেখা যেন মাথানো!  
অরণের দুখ মনে পড়িয়া অপূর বুকের মধ্যে কেমন করে!  
গাহার আর একটা কথা মনে হয়—কাল যে ইন্দুলেখা  
শক্তিরাজিণি তাঁকে মানাইয়াছিল মন মর বটে, কিন্তু  
তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা পড়িয়া  
উঠিয়াছে, তাহা তাহার বিধিকে লইয়া, ঐ রকম পায়ের হ্রা  
অমান বড় বড় চোখ, অমন সুন্দর দুখ, অমনি সুন্দর চুল!  
ইন্দুলেখা তাহার সকল কল্যাণ, মেধ, মাদুড়ী লইয়া কোন্  
সে কালের বেশের অতীত জীবনের পারে আবার তাহার  
মিথি হইয়া যেন কিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার  
কণার ভিকিতে, স্রোতি পদক্ষেপে ঘিঘিই যেন সূঁচিয়া সূঁচিয়া  
বাধির হইতেছিল। যখন মতীর বনে সে শতযেহে ছোট  
তটিকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাকে বাগাইবার ফল আহরণ  
করিতে গিয়া একা নির্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—  
সেই একদিনের অকাল কনের ঘটনাটাই অপূর ক্রমাগত  
মনে হইতেছিল।

কাল তো বাহার আলগতী তাহার কাছে বাপের বেয়াল্প  
বাধা বাতোয়ারীতলা ছিল না। ...বাগকের কলনামন্তে তাহা  
অতীত কালের যে অজ্ঞাত রক্তপ্রাণদের পাখান-মণিবে, শুণ্ড  
মরণকক্ষ, মতীর বনে, নির্জন নদীর ধারে, হ্রস্ব বুকের  
মেনে, বীরের মেনে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—তমু পেশব  
কালেই তাহাদের বেধা মেলে।

দুপুর বেলা বাইবার ক্ষত অপূ পিয়া অরণকে ডাকিয়া

আনিল। তাহার মা ওমনকে এক তাহবার ঘাইতে দিয়া  
অরণের পড়িত লইতে বলিল। সে আশ্রয়ের ছেলে, তাহার  
কেহ নাই, এক মানী তাহাকে মাহুৎ করিয়াছিল,  
সেও মরিয়া দিয়াছে। আজ বড়র খামেক বাজার দলে  
কাছ করিতেছে। লগজহার ছেলেটির উপর খুব হেফ  
হইল—বার বার ভিজাশা করিয়া তাহাকে বাগাইল।  
বাগাইবার উপকরণ যেনী কিছু নাই, তমু ছেলেটি খুব  
গুলির লগে বাইল। তাহারপর হুর্না মাঝে চুপি চুপি বলিল—  
মা, ওকে সেই কাগকের গানটা পাইতে বলনা—সেই “কোথা  
ছেড়ে গেলি এ বন কাহারে প্রাণশ্রির প্রাণ মান্যরে”—

অরণ গলা ছাড়িয়া পানটি গাধিল—অপু মুড় চইয়া  
গেল, লগজহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আঁহা এমন  
ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও পান গাধিল। সর্জ-  
জয়া বলিল—বিকলে মুড়ি ভাজখো তখন এলে অধিক্ত করে  
মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা কতো না যেন—যখন খুলি আসবে,  
আপনার বাড়ীর মত—বুকে!

অপু তাহাকে লগে করিয়া নদীর ধারের বিকে বেড়াইতে  
গেল। সেখানে অরণ বলিল, তাই তোমার তো গলা বড়  
মিষ্ট—একটা পান গাও না? ...অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার  
কাছে পান গাতিয়া সে বাগাইতী লইবে। কিন্তু বড় ভয়  
করে—এ একজন রাজ্যবংশের ছেলে—এর কাছে তার পান  
গাওয়া? নদীর ধারে বড় শিশুপাছটার তলার ঢো-ঢলতির  
পথ থেকে কিছুদূরে গিয়া বোপের আড়ালে চুকিলে বসে।  
অপু অনেক কণ্টে লজ্জা কাটাঁইয়া একটা পান ধরে  
“শ্রীচরণে তার একবার পা জোল যে মনস্ত”—মাত রাহের  
পাঁচালি পান, বাবার মুখে তুলিয়া সে শিখিয়া লইয়াছে।  
অমর অবাক হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা তাই?  
তা তুমি পান গাও না কেন? ...আর একটা গাও। অপু  
উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—“বেদার আশে বসে রে  
মন সুবর্ণ বেণা খোরার ধারে।” তাহার মিসি কোথা হইতে  
শিখিয়া আসিয়া গাতিত, স্রুটী বড় ভাল লাগায় অপু তাহার  
কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে  
মাঝে পানটা তাহায়া হুগনে গাধিয়া থাকে।

পান শেষহইলে অমর প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বলিল—এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুকলে শোনোতো টাকা করে মাইনে লেগে দেবে বলি তোমার—  
এর ওপর একটু গমি শেখো !—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে  
বিদ্রিগ শ্যামল গাছের অশ্রু কতদিন দ্বিধিতে জিজ্ঞাসা  
করিয়াছে—হ্যাঁ দ্বিধি, আমার গলা আছে ? গান তবে ?...  
দ্বিধি তাহাকে বজ্রবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে । কিন্তু দ্বিধি  
আশ্বাস বতই আশ্বাসন হোক, আজ একজন নন্দীন্দ্রবল্লভ  
বজ্রবর মল্লের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মূলে এ প্রশংসার  
কথা শুনিয়া আনন্দে অশ্রুচ্ছিন্ন বদন উত্তর করিবে ঠাণ্ডা করিতে  
পারিল না । বলিল—তোমার ঐ গানটা আমার শেখাও  
না ?... তাহারপর হইলেন গলা মিশাইয়া সে গানটা গায়িল ।  
অনেকক্ষণ হইয়া গেল । নন্দী বহিরা ছপ, ছপ, করিয়া  
নোকা চলিতেছে, নন্দীর গাড়ের নোচে জলের ধারে একজন  
কি শূঁষিয়া বেড়াইতেছে, অজ্ঞান বলিল—কি শূঁষিতে ভাই ?  
অশ্রু বলিল—ও বাঙালি শূঁষিতে, ছিপে মাছ ধরবে—তাহার-  
পর বলিল—আজ্ঞা ভাই তুমি আমাদের এখানে পাকো না  
কেন ?... যেও না কোথাও, থাকবে ?...

সে বছর বোম্বাইয়ের রাস্তে তাহার সেই বহুটি তাহার  
মনে যে বোম্বাই দ্বিধাছিল আবার আজ সেই ঠিক খোর খোর,  
আজ্ঞার ভাব ! সে যেন কোথায় আছে ... অশ্রু মূলের মোকে  
আবার তাকে শাইয়া বলিয়াছে ! এমন চোপ, এমন দ্বিধি  
গলায় হুত ! তাহার উপর অশ্রু কানে আছে সে সেই বাজপুত্র  
অজ্ঞান ! কোন্ কবে দ্বিধিতে দ্বিধিতে অশ্রুগায়ক ছাড়িয়া  
তলবানু গায়কের ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া  
পিয়াছে—তির্যকস্বের বহু ! আর তাহাকে কি করিয়া  
ছাড়া যায় !

অজ্ঞানও খুব সুস্থ হইয়াছে । অনেক মনের কথা বলিয়া  
কেনিল । এমন সান্নিধ্য তাহার আর জুটে নাই । সে গ্রাম  
চলিল টাকা জমাইয়াছে । আর একটু বড় হইলে সে  
একল ছাড়িয়া দিবে । অধিকারী বড় মারে । সে আশ্রিত্য  
পালের বলে বাইবে—সেখানে বড় হুত, বোম্বাই তাকে লুচি ।  
না খাটিলে তিন আনা পরলা খোরাবী দেয় । এ দল  
ছাড়িলে সে আবার অশ্রুদের বাড়ী আসিবে ও সে দয়  
কিছুদিন থাকিবে । বৈকালের কিছু আগে অজ্ঞান বলিল—

চল ভাই, আজ আবার মল্লের মন মল্লের হবে, সকলে  
সকলে কিরি । যদি “পরশুরামের দর্শন-সংগ্রহ” হয়, তবে  
আমি নিশ্চয় পাঠবো সেখা কেনন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন বাড়ী চইল । গ্রামেও লোকমুখে  
বাড়া ছাড়া আর কথা নাই । শেষ ঘাটে ঘাটে গায়ের মাগি  
নোকা বাজিতে বাজিতে, তাখাল দরু চরাইতে চরাইতে  
বজ্রবর পালার নতুন শেখা গান গায় । গ্রামের মেয়ের  
মল্লের ছেলেরের বাড়ী তাকাইয়া বাটার যে গান ভাল  
লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান করমাটল করিয়া শুনিতে  
পারিলেন । অশ্রু আরও তিন চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল ।  
একদিন সে বজ্রবর মল্লের বাসাঘর অজ্ঞানের সঙ্গে গিয়াছে,  
সেখানে তাহাকে মল্লের লকলে গিয়াছিল বলিল তাহাকে  
একটা গান গাইতে হইবে । সেখানে সকলে অজ্ঞানের মুখে  
শুনিয়াছে যে পূর্ব ভাল গান গাইতে পারে । অশ্রু পট  
সাধাসাধনার পর নিজেই বিজ্ঞা ভাল করিয়া জাতির  
করিবার খাতিরে একটা গাঠিয়া ফেলিল । সকলে তাহাকে  
গরিয়া অধিকারীর নিকটে শাইয়া গেল । সেখানেও তাহাকে  
একটা গাইতে হইল । অধিকারী কালো হাংর হুঁড়িওয়ালা  
লোক, আশ্রিত্য হুঁড়ি গাঠিয়া গান করে । গান শুনিয়া  
বলিল, এল না খোকা, মলে আদবে ? অশ্রু বুকখানা আনন্দে  
ও গলো মনহাট হইল । আরও লকলে গিয়াছিল তাহাকে  
দয়ে—এল, চল তোমাকে আমাদের মলে নিয়ে যাই । অশ্রু  
তো ইচ্ছা সে এখন যায় । খাড়া মলে কাক করা যে মতপ্রা-  
জ্ঞানের চরম উচ্ছেদ, দেখা এতদিন সে কেন জানিত না,  
ইহাই তো আশ্রিত্যের বিষয় । সে যোগদানে অজ্ঞানকে বলিল,  
আজ্ঞা ভাই, এখন যদি আমি মলে যাই, আমাকে কি  
সাধতে দেবে ? অজ্ঞান বলিল, এখন এই নন্দী টম্বো, কি  
বালকের পাট এইরকম, তাহদের ভাল করে শিখলে—  
অশ্রু নন্দী গাঠিতে চার না—গরিব মুহুট সাধায সে  
সেনাপতি দাকিরা তলোয়ার কুলাটেবে, বড় করিবে । বড়



হঠাৎ সে ঘাড়ের দশে বাঁকিয়ে উঠাই তাহার জীবনের  
কণ লক্ষ্য। অক্ষয় তাহাকে চুপি চুপি কপিলপত্রের রং  
একটা ছোঁয়ায় দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখচো, এর  
নাম বিটু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে কয়েক না, আমি নিজের  
পরমায় দেখলাই কিনে বাণিশের উল্লাস তেবে শুই। বেশলাই  
উঠিয়ে নেই চুটকি খেতে, আর খেয় না। আমি বলি আমার  
সঙ্গে তব করে, বেশলাইটা দাও। অক্ষয়ের মন ছন্দ ছন্দ  
করে, তাই সেদিন চোখেছিলাম বলে এমন পাশড়া একটা  
যেতেচে! নাচে ভালো। বলে অধিকারী বড় বাতির করে,  
কিছু বলবারও যো নেই—

দিন পাঁচেক পরে দাড়া মল্লের গাওনা শেষ হইয়া  
গেলে তাহার রক্তনা হইল। অক্ষয় বাড়ীর ছেলেসম মত  
গমন তখন আশিত হাইত, এই কর দিনে সে যেন  
অপুইই আর এক তাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুইই  
পরমা ছোট ছেলে, সংসারে কেউ নাই শুনিয়া লক্ষ্যতা  
তাঁহাকে এক কয়দিন অপুই মত বহু করিয়াছে, একটু বেশা  
হঠলে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে,—কখন দাড়া হবে, সে আমার  
সকলে খার কাপ রাতে তো খেয়ে তার পেটই তরেনি ?  
অনু বাধা দাড়া খাইতে ভালবাসে,—মুড়ি ও ডোলাজাধা,  
ভুজ দিগা নারিকেল কোরা, চুনা মাছ দিগা কচুর পাকের  
বন্দে, জ্বার পাতা দিগা তেলশিটিলি তাধা,—এ কয়দিনে  
ইহায়া করিয়া খাওয়াইয়াছে, বদিও গরীবের ঘরে ছুটানো  
কটে, তবুও ছাড়ে নাই। পূর্বাণ্ড তাহাকে আপন ভাইয়ের  
চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে,  
কত গর চুনাইয়াছে, তাহার শিশিমার কথা বলিয়াছে,  
তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় বর আঁকিয়া গলাবধুনা

বেশিয়াছে, বাইবার সময় কোর করিয়া বেশি খাইতে বাধা  
করিয়াছে। দাড়া মলে থাকে, কে কোপার জাখে, কোপার  
শোর, কি খার, আধা বলিবার কেউ নাই; গর সংসারের সে  
সেহস্পর্শ খোবর জমাঝনিই তাহার জাগো খাটে নাই,  
অগ্রভাগিত তাহে আর তাহার স্বাম লাভ করিয়া মোকাবে  
মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া গাইতে চাহিতেছিল  
না।

বাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটিলি শুলিয়া কটে লক্ষিত  
পাটটি টাকা বাহির করিয়া লক্ষ্যতার হাতে দিতে গেল।  
একটু লক্ষ্যতার হুরে বলিল—এই পাটটা টাকা দিয় দিদির  
বিরহ সময় একখানা ভাল কাপড়—

লক্ষ্যতা বলিল—না বাবা, না—তুমি যুগে বললে এটি  
শুব জোগ, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত  
পরকার—বিরে খাওয়া ক'রে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তাহে  
তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চাইল।

তাহার পর লক্ষলে উল্লাহের বাড়ীর বরজান সায়নে  
বানিকটা লগ পর্যন্ত তাহাকে আগাষ্টা দিতে আসিল।  
বাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিরহ সময়  
সবুজ করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়। পাবতলায়  
ছায়ার কাণার তাহার সুসুয়ার বালকমুষ্টি ভাঁটি পেত্রড়া  
খোপের আড়ালে অঙ্গুর হইয়া গেলে হঠাৎ লক্ষ্যতার মনে  
হইল, বড় ছেলে মাগুর, আধা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজেও  
ঝোঁকগার নিজে কর্তে। অপুই আমার যদি ঐরকম হোত—  
যাঙ্গো!...তাহার পর তাহার ও দুর্গাব ওল্লহেরই চোখের  
পাতা ভিকিয়া উঠিল। (রুমণঃ)





ନବସୂତା

ଦ୍ଵିତୀୟାବସ୍ଥାରେ ଶ୍ୟାମାଳୀନାଥ



ମୁଦ୍ରାଣ କରା

## নারীর মূল্য

### শ্রীভবানী ভট্টাচার্য

শ্রীমতী ইলা দেবীকে স্তম্ভস্ততা জানাচ্ছি দু'টি কারণে।  
 প্রথমটি স্বাৰ্গগত; দ্বিতীয় আমার নারীর মূল্য গ্রহণ এ  
 পৰ্য্যন্ত পড়েননি, প্রতিবাদ বেল্লার পর যোগ করি তাঁর  
 মনোভেদ ও লেখা পড়ে দেখবেন। দ্বিতীয় কারণটি  
 পরাৰ্গগত: আমার পূৰ্ব্বোক্ত লেখায় আমি এমন অনেক  
 কঠিন কথা বলেছিলাম, যেহেতু তব, গেক যার  
 প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এ প্রতিবাদে আমাকে নারীর শক্তি মনে করা  
 বরংকার চ'ল কেন? আমি আমার পূৰ্ব্বোক্ত গ্রন্থের  
 গোড়োতেই বলেছিলাম, সব জিনিষের দু'টা শিষ্ট থাকে,  
 এবং সব জিনিষের ওটা শিষ্ট যে কোনো একটার  
 সমর্থনে চ'লে কথা বলা যেতে পারে। নারীর মূল্য  
 সম্বন্ধে ভালো এবং মন্দ দুই বলা যায়। ভালোটি বলি  
 আর মন্দটি বলি, তার মধ্যে থাকবে বানিক্‌টা শুধু 'বাক্যের  
 বচ, তর্কের দুনি'—intellectual gymnastic। কারণ  
 কথাটা শুধু তর্ক কথারই মত; তর্ক ক'রে মন আরাম  
 পায়, তাতে সৌখণ্য কিছু চোক্ষ বা না চোক্ষ। আমি  
 নারীর মূল্যের একটি বিশেষ দিক নিয়ে তর্ক করেছিলাম—  
 লুডোভিচের তাই করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায়  
 পাঠকদের সঙ্গে লুডোভিচের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও  
 আমার উদ্দেশ্য ছিল; ইউরোপে ত্রিশাব্দী লেখক বলে  
 লুডোভিচের নাম আছে, প্রত্যয় তাঁর কথাগুলো নিয়ে  
 নাড়াচাড়া করার অপমান নেই। লুডোভিচের দৃষ্টির  
 আমিও প্রতিবাদ করতে পারতুম এবং লুডোভিচের সঙ্গে  
 সে প্রতিবাদের যথাযথ বেওয়াও শুরু হ'ত না। এ সব  
 কথাই আমি আমার গ্রন্থেও গোড়ায় দু'কথাই বলেছিলাম—  
 'তর্কের শেষ নেই; ও বস টান্লে বাড়'।

কিন্তু শ্রীমতী ইলা দেবী তর্কের উত্তরে তর্ক করেননি।  
 দৃষ্টব্য উত্তরে তিনি কোথাও বিবেচন উক্তি (proverb),

কোথাও 'dogma', কোথাও শুধু 'ধারণা' বাতল্য। অবশ্য  
 factsও তিনি দিয়েছেন, কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই সে facts  
 ভুল। তাঁর লেখার স্তম্ভস্ততা ভুল তথ্যবাদের আমার  
 প্রয়োজন নেই, কেননা যে কোনো সমাজতত্ত্ববিদ সত্যের  
 কাছে ওকলো থকা পড়বে। তবে একটা কথা বলা  
 দরকার। কোনো বৈজ্ঞানিক যখন জাতীয় পরিভ্রম  
 ক'রে কতকগুলো facts আবিষ্কার করেন, তখন সাধারণ  
 কথা শ্রীমতী ইলা দেবীর লেখলো যেন চলাই ভালো। তাঁর  
 কারণ আমি এবং ইলা দেবী এমন কোনো facts  
 ব্য'ত করিনি যেগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে উক্ত বৈজ্ঞানিক  
 facts এর প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রতিবাদ করতে পারে।  
 লুডোভিচ কথা Schmitze কথা Keith যদি বলেন,  
 পৃথিবীর তৈরিক পটন এমন বার কত সে ব'তাই নারীর  
 চেয়ে বলি, ০ কথা পৃথিবী an a species ব্য'ত  
 an a species এবং চেয়ে ল'ব। বৈদ্য ০০, কথাগুলো  
 (বাগেলিভিচের বা facts ব্য'ত গুণীত হলেও) আমাদেব  
 নীরবে স্বীকার ক'রে নিতেই চ'বে, সে স্বীকৃতি প্রীতিকর  
 চোক্ষ বা অপ্রীতিকর চোক্ষ। এগুলো জীবতত্ত্বের এত  
 গোড়ার কথা যে, এগুলো জানা না থাকলে সমাজতত্ত্ব  
 নিয়ে (জীবতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্বন্ধ বলি) আলোচনা  
 করা উচিত কিনা সন্দেহ। আর এ কারণে আলোচনার  
 'দেবাবিবেচন মতামতের' পৌকব ছিল কিনা—কিনা  
 পৌরাসিক পরিত্যজন কোথায় কি করেছিলেন—এ সব  
 কথার কোনো দৃষ্টিগত সম্পর্ক নেই।

• শরীফালা দ্বারা দেওয়া পলীমসকেব সমান হতে পারে,  
 তার কাল বাসক এবং বাসিকার muscle fibre বৈদ্য তথ্য  
 নেই। ও তথ্য আসে পৌরাসিক—যখন উত্তরে muscles তির  
 ভাবে পরিণত হয়ে পড়ে। এই তির পরিণতির ক্ষতি তপনে বেহেব  
 চেয়ে তর্কের শেষ বৈদ্য কোমল। পৃথিবী তারতম্য নিজের ক'রে  
 muscle fibre এর বিশেষ পরিণতির উপর।



That  
and  
do it."

What's Wrong with the World, P. 133.

যাওনৈতিক অধিকার কিছু এত সম্বন্ধ আপেনি; ও

মত প্ৰত্যাহার শেষের দিকে মারি-উলষ্টেম্‌কাকট্রের  
গোণা ইউরোপকে এক নতুন ব্যক্তি পোনা। মারি  
লিখলেন, পুরুষের চেয়ে নারীর স্থান নীচু নয়; পুরুষ  
বা পাত্রে নারীও তা পারে; সুতরাং সমাজের চোখে  
এ প্রকার অধিকার সমান হওয়া উচিত। অধিকার বলতে  
ব্যাকার স্ৰাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার।

দেখতে দেখতে মারির নাম ইউরোপের ঘেঁষে ঘেঁষে  
চড়িয়ে পড়ল। পুরুষরা তার লেখা পড়ে মনে মনে ভাবল;  
কিন্তু মেয়েরা চাঁৎকার করে বলল, মারি নারী নামের  
কলঙ্ক, নারীসমাজে ওই স্থান নেই। শুধু একমুখ মেয়ে  
বলল, না, হয়তো মারির কথা মিথ্যা নয়; আমাদেরও  
মাঝে—সুতরাং পুরুষের অধিকারে হাত দেবার অধিকার  
আমাদের আছে। তারপর মাঝবুড়ি এল; ইউরোপের  
আধুনিক সমাজ মধ্যবৃদ্ধের হাতে পড়া। ও বৃদ্ধের কল  
বেশে বেশে পুরুষের ধারণা অতীব দৃঢ় হল; তাইবের স্থান  
এখন করল নারী। অর্থনীতির দিক থেকে বিনা চেষ্টার  
নারী আর পুরুষ চ'ল এক। বেদ্যা গেল পুরুষের চেয়ে  
নারী ভের ভাল করতে পারে—শুধু ভেতরাণি, দোকানী,  
টার্মিশ্টে, সেক্রেটারির কাজ। -এর কোনোটাতেই  
বুদ্ধির বা মৌলিকতার দরকার করে না। দরকার করে  
একাগ্রতার; দরকার করে হাতের কাছে সমস্ত মন  
চলে দেবার শক্তি। যে মেয়ে টাইগটে, সে টাইগটে,  
ছাড়া আর কিছু নয়; তার কাছে ঐ বস্টাইই একটা গুপ্ত।  
মারিসের কর্তৃত্ব দেখলেন, মহা হুঁহু! এর ট্রায়েডি  
ঘরা পড়ল শুধু চ'টার জন চিন্তাশীল লেখকের চোখে।  
চেষ্টারট্‌ লিখলেন, "Modern women defend their  
office with all the fierceness of domesticity,  
...and develop sort of wolfish wifehood  
on behalf of the invisible head of the firm."

অধিকারের আইডিয়া শুধু চ'পশ জন সফ্রজিটের মনে  
এসেছে, বাকি সবাই ও সম্বন্ধে বেশরোজ। Pankhurst-  
এর মতো মেয়ে ইউরোপেও চলত; তাঁর মতন চ'পশ  
জনের অন্তরকণে চ'এক ছাকার মেয়ে সফ্রজিট চল।  
তাও শুধু ইংলণ্ডে। ফ্রান্সেও সফ্রজিট-অ্যাকালন  
চলেছিল, কিন্তু তার নেত্রীদের তিন জন ছিলেন  
ইংরেজ। ও অ্যাকালন বেশী দিন ইংরেজি। ফ্রান্সের  
মেয়েরা 'অধিকার' সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। চাক্ষুসি  
অবস্থা কতকটা ইংলণ্ডেবই মতো; ইটালির সম্পূর্ণ ভিন্ন,  
জুসেমে মেয়েদের অধিকার বলে কোনো আইডিয়া আজ  
পর্দায় অস্তায়নি। (পরিণতি—ক)

আগলে, ইউরোপের মেয়ের পরে ভারতীয় মেয়ের পূর্ব  
বেশী তর্কাতর্ক নেই; চাইয়ের পিছনেই একই মন কাট করছে  
এবং সে মন সম্পূর্ণ 'মেয়েণি'। যে মেয়ে সীতারের সমস্ত পার  
চর এরা তাকে প্রণয়্য করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। জাকে  
দেখতে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ ছোট, আবার তাকে ঠাড়া  
ক'রে তারা the-man বা tom-boy বলতেও ছাড়ে না।  
মনের দিক থেকে ইউরোপের মেয়ে ভারতীয় মেয়ের মতোই  
'সম্ভাতিয়ি পরাবিনী।' বতই সে আলোকস্রাব জোড়, সে  
চার পুরুষের আশ্রয়, গুর এবং সম্মান।

কয়েকক আমি ন্যাসিঁল বলি না, কারণ তার জুগোপ  
নেই। আমাদের দেশের মেয়েরা সবাই কয়েদি; কতক  
দেখে, কতক মনে; গরি পর্দায় আড়ালে থাকেন তাঁরা  
প্রলুভ হ'তে পারেন না, প্রসোদনের অভাবে। জীবনে  
কখনো তাঁদের পরীক্ষা হয়নি। সীতাকে লতী বলতে পারি  
তবনি বখন বেধি কট্টন অমিশরীকার তাঁর গারে আঁচ

লাগল না। যাদের পক্ষের যখন নেই তাদের আছে মানসিক বন্দী। সুস্বাদুতার সংজ্ঞার তীব্রের নীতির কড়া পালত্রার নিষ্পত্তি। সংস্কার, সংস্কার এবং সমাজ এই তিনের গতি এড়ানো ভারতীয় নারীর পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং ও তিনের স্বকৃৎ মেনে চলা ছাড়া উত্তর অসম্ভব। তা ছাড়া নারীমনের একটি বিশেষ দর্প এই যে, ও-মনকে একবার কিছু ধরিয়ে দিলেই হ'ল—ভারতের সে প্রাণপণে সেটা আঁকড়ে ধ'রে থাকবে। তাই নারীর সংস্কার, আচার, নিষ্ঠা এ সবের প্রতি টানও পূর্ব বৈধী। তক্ষী ব্রহ্মচারী-দেব এই তরুণ বন্দীও তেজ আছেই তা ছাড়া পরলোকে কিংবা পরজন্মে স্বপ্নলোভের আশাও তীব্রের ব্রহ্মচর্যা-আচরণের পিছনে রয়েছে। (১) সুতরাং ভারতীয় নারীর নীতি এবং কর্মের নীতি—এ তই এক।

ইউরোপের মেয়েদের মনোভাব এরকম নয়। মেয়ে মনে এরা অনেকটা স্বাধীন; পর্দা, মহু-পরাধার, পরজন্ম এসব উৎপাত থেকে এ দেশের মেয়ে মুক্ত; তার প্রলোভনও প্রচুর। সুতরাং নারীর নীতি আছে কি না এ প্রশ্নের উত্তর কীতে পারে শুধু ইউরোপ। ইউরোপ বলতে আমি ইউরোপের মধ্যবর্তী অস্রান্ত দেশকেও বোঝি—যেমন আমেরিকা।

জার্মানি, রাশিয়া এবং আমেরিকার sex-act শুধু একটি biological function বলে আত্মকাল গণ্য হচ্ছে; আরার নিষ্ঠা, নিব্বাণ-প্রথাগ এ সবের থেকে ওর কোনো-বৃত্তিমূলক তফাৎ আছে, এ নিব্বাণ জার্মানি এবং রাশিয়ার মৃত্যু, এবং আমেরিকার মৃত্যুপ্রায়। পোড়োষট্টি রাশিয়ার মেয়েরা আত্মকাল সত্যি হওয়ায় বুর্জোয়া (bourgeois) মনোভাব বলে বিদ্রূপ করছে। নব প্রকাশিত রাশিয়ান নাটক *Rus Hine* এ একবার সবচেয়ে আধুনিক প্রমাণ পেলাম। জার্মান মেয়ের sex act লক্ষ্যে যে মনোভাবের আমি উল্লেখ করছি

(১) চিরন্তন সত্য বলে মনেতে কিছু নেই। কাল বা সত্য ছিল আজ তা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যে কেহে সত্যের সত্য সত্য পত্তীর প্রতি জালদারী বৃত্তি হয়, সে কেউ উচ্চ জালদারী হতে পারে না।

—লেখক

তার একটি প্রমাণ জার্মান film—"Sex in letters"। আমেরিকান মেয়ে লব্ধকে Judge Lindsay "Revolt of Youth" প্রত্যা।

করাগি মেয়ে একিধের তের ভাল। করাগি এক মহা ভণ এই যে, তার মধ্যে পাশবিক instinct বাধ করি একবারেই নেই। মগত করাগি মহা। এমন সংস্কার ও সমাজ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত জাতি ইউরোপে খিটার নেই। পুণিযীতে একমাত্র করাগি মেয়েই নিশ্চয় ক'রে নীলকণ্ঠ হ'তে পেরেছে। করাগি মেয়েকে আমি বিধমানবীর টাইপ বলে মনেতে পারি না, তার কারণ এরা বিশ্বের বাইরে। ভারতীয় মেয়ের মহা। এরা দেহ লব্ধকে তচিবাইগ্রন্থ নয়,—চুবন, আশিসন এগুলো জাপে সবকালের চেয়ে সামাজ্য একটু বৈধী। ওএ ডিলেববে জাপে যে কোনো পুরুষ যবে বাইরে লক্ষ্য যে কোনো মহা। মেয়েকে চুবন করতে পারে, এবং যে কোনো মেয়ে যে কোনো পুরুষকে চুবন করতে পারে। এ মহা বাগ ক'রেও করাগি মেয়ে এখনো নিকেকে হারানি; কোন মহা বলে ওরা নিকেকে গড়িরে রাখতে পেরেছে সে আমি জানি না।

প্রথম দৃষ্টিতে ইংরেজ মেয়েকে দেখে নীতিবদ মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এদের নীতি নেতিমূলক (negative morality)। সমাজের নিষেধ এরা প্রাণপণে মেনে চলে, আর এমন নিষেধ আছেও বিস্তর। ইংরেজের মহা সাবধানী এবং তচিবাইগ্রন্থ জাতি বোধহয় শুধু ভারত ছাড়া অস্ত্র নেই। এদের প্রতি কথার prudery অর্থাৎ সত্যগোপনের চেষ্টা; সুতরাং এদেশের মেয়েদের কতকটা কর্মের মহা—সংস্কার না লোক সমাজের। তাই এরা জার্মানি যা করে তার সবই করে, কিন্তু গোপনে। সমাজের পালত্রা বদ হইছিল কবেক বড়ের ভণ্ড—গত যুগের সময়ে। যে বিধ ভিতরে ভিতরে কাক করছিল সে বিধ প্রয়োগ পেয়ে সত্য সমস্ত দেশটার পারে ছড়িয়ে পড়ল। সে সময়ে ইংলেণ্ডের মহা কত অশ্লীল এবং কত বিকৃত (perverse) ইয়ে পড়েছিল—তার পরিচয় পেলাম একজন ইংরেজ মহিলার মুখে, গার বেশবীর প্রয়োগ ছিল বিস্তর।



'cyslering' এবং মত উদ্ধৃত  
( পরিশিষ্ট খ )

বিচার করতে চলেতে পারে তুমি ইউরোপে ;  
নিঃসংশয়ে বলতে পারি বিষয়মানবীর নীতি নেই ।

নীতি বস্তুটা আসলে ইউরোপে থেকেলে ব'লে পণ্য  
চ'তে হুক রয়েছে । এতদিন মেয়েরা কানন নীতিশীল  
চওখাটী fashion ; এখন কাননে নীতি না থাকায়  
fashion । হুতরাঃ ও বস্তু এখন এদের কাছে জাঁপ বস্ত্রের  
মতঃ পরিত্যক্ত । ( পরিশিষ্ট গ )

নারীর দৌলখাপটী কতদূর তা দেখা যাক ।

ইউরোপে মেয়েদের কাছে লোকের চেয়ে উপলব্ধি বড়  
হ'য়ে উঠেছে—মেয়ের চেয়ে মেহনতজ্ঞ । নতুন ফ্যাশনের  
skirt পড়তে পাওয়া এদের কাছে জীবনের এক মহা  
আনন্দ । বাবেব কেনবার সামর্থ্য নেই তাইবের অনেক  
একবার ক'রে ডিজেস্ট টেবের দোকানগুলো ঘুরে আসে ;  
পাওয়ার তৃষ্ণা দেখে মিটায় । কত বার কত মেয়েকে  
কাচের আড়ালে লাদানো কুকুকে শোবাকগুলো দিকে  
দীর্ঘবে, কখন নখনে চেয়ে থাকতে দেখেছি । মজার কথা  
এই যে, এ সব শোবাকের ফ্যাশন নির্দেশ করে নারী নয়—  
পুরুষ ; কতলা পের ( প্যারিসের একটা রাস্তার নাম )  
জনকতক পুরুষ স্রেফেবকার । ইউরোপ আমেরিকার সব  
ঘেয়ে এদের ইঙ্গিত অহুলায়ে নিঃশব্দের সাধার । নারী তুমি  
অহুকরণ করতে পারে—নতুন কিছু একটা স্ট্রী ( এমন কি  
ফ্যাশনও ) করবার মত ক্ষমতা তাঁর নেই ।

ইংলেণ্ডে আজকাল sex novel লেখা ফাগুন হয়েছে ।  
হুতরাঃ মেয়েরা যে ও কাজীয় নতুন চূড়ান্তভাবে লিখবে—তা  
এলাই বাস্তব । গত চার পাঁচ মাসের মধ্যে ইংলেণ্ডে যে তিন-  
চালা উপস্থাপন গবর্ণমেন্টের হাতে অসীলতা গোয়ে বাজেয়াপ্ত  
করেছে, যে তিনখানাই মেয়েদের লেখা । কোন বই  
বাজেয়াপ্ত করা আমি উচিত মনে করি না, কিন্তু এ বই-  
গুলোর অসীলভার মধ্যে একই মত প্রকাশ । Sir Joynson  
Hick শেষের এইখানি বাজেয়াপ্ত করবার সময়ে বলেন,  
মেয়েরা এখন sex নিয়ে নতুন লিখতে বলে তখন কাছটা  
বড় ভয়প্রদ চর, কারণ তারা যে কোথায় গিয়ে থাকবে বলা  
যায় না । কথাটা সত্য ।

এই যে ক'কে ক'কে মেয়ে আজকাল মাথার চুল কেটে  
বন্ধিবা শিল্প করছে, এরও মূলে আছে প্যারিসের এক-  
জন পুরুষ । চুলকাটার নতুন কার্যবাণ্ডো তারই আবিষ্কার ।  
ইউরোপের মেয়েমহলে ডিজেস্টের মতো তার সম্মান । তুমি  
তাই নয় ।—মেয়েরা সচরাচর সেই সব coiffure পছন্দ করে  
যেখানে চুল কাটে পুরুষ । লগুনে এসে ভারতীয় মেয়েদেরও  
অনেকে বন্ধি করছেন দেখছি ।

যেদিন ডিনার টেবিলে এক ফরাশ মহিলা তাঁর স্বামীর  
সমক্ষে ব'লে বলেন, “আমার স্বামী যদি impotent  
হতেন, আমি অল্প কোনো পুরুষের কাছে সহানুভূতি  
করতুম ।” সহানুভূতির পিছনে আছে অধিকারের  
সাবী, এবং স্বামীর আনন্দলাভের গোত্র । হুতরাঃ উক্ত  
মহিলাকে কাছে নীতির চেয়ে স্বামীর অধিকার বড় । ইনি  
ফরাশ হ'লেও বোধ করি বহুদিন লগুনে বাস করার ফলে  
এমন একটা typical ইউরোপীয় মনোভাব লাভ করতে  
পেরেছেন ।

পুস্কৌক চুটি বৃত্ত থেকে বলতে পারি, নারীর নিজস্ব  
কোনো দৌলখাপটী নেই । পুরুষ বা চর, নারী করে তাই ।  
নিজেকে সে বিভিন্ন ক'রে সাধার, কিন্তু সে বৈচিত্র্যও স্বায়-  
করা । পুরুষ করে নির্দেশ, নারী করে অহুকরণ । পুরুষ  
শোখায়, নারী শেখে ।

এ সব কথাই প্রমাণ করেছে ইউরোপীয় মেয়ের নীতি  
নেই । পুস্কৌই দেখেছিছি নারীর নীতি আছে কি না এবং

( + ) ‘Love institution’ ব'লে ইংরেজিতে কোনো কথা নেই ।  
আমি সিংহবিশ্ব ‘love institution’—স্বামীর চুলে বিচিত্রতা বোঝার  
institution । —লেখক



ভাড়াবি মোকারি মোকানদারি এগুলো যেমন পুরুষের কাছে এক একটা পেশা (career), বিবাহ তেরি নারীর কাছে একটা পেশা; ভারতবর্ষে ইউরোপে—সর্বত্র। এদেশে 'art of husband-hunting' লক্ষ্যে দেখা দেবার, আজকের Sunday Express-এ দেখলুম, একটি মেয়ে Home Page-এর সম্পাদিকাকে লিখেছে, "রোজ দিন কাটে বাবার ব্যবসার-কর্মে লতাঘড়া করে। চকুরাবের তাঁর আর মায়ের সঙ্গে খিয়েটোরে বেতে গাট, —পনিবারে দিনেমাং। রবিবারে আমরা লবাই মোটরে বেড়িয়ে আসি। তারপর আবার সোমবার—মাংবার কাজ। দিন বার, দিন আসে। লপ্তাও বার, লপ্তাও আসে। কেউ আবার কাছে আসে না; বন্দাই যায়। There must be something the matter with me. I can see other girls having such good times with their men friends. Perhaps I lack some subtle qualities that attract, but I'm willing to learn if you can tell me what sort of girls men do like," (১)

এত যে coquetry, তার মূলট এইখানে। মেয়েদের ইচ্ছা মিছেদের বেশ দেখাবার উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যবসার রূপ নেই তারা। আরো daring জাট'ল' পরে। টোনে বসে রেজোঁর'র যখন তখন মেয়েরা লবার লারে লাফ-নার লুপ দেখতে দেখতে জোঁটে lip-tick বলে, মুখে

(১) ইউরোপে chivalry লক্ষ্যে এ খাবার তুল। এক সময়ে ছিল—সম্পূর্ণ। বরদিন হল ইউরোপ এর থেকে মুক্ত হইতে। কোনো একটা আউটলা ইউরোপে বাসি হ'লে বেলে তবে স্টো জারভ-বাব পৌঁছায়। তারভববে পাশাপাশি ছোটো লুপ ছাফ করছে, এ-লুপ এবং সবলুপ; হুতরা ইউরোপের পথভাক chivalry জারভববে এখন একটা মৃত্তম জিনিষ।

তা ছড়া chivalry'র লক্ষ্য হইছিল নারীর প্রতি স্রষ্টা থেকে নয়। দেবদেবের knights-errant'দের লক্ষ্যে যাও কারি এবং ছিল; chivalry ছিল উচ্চ epoch'র পাত্ত লুপাবার একটা উপায়।

এ দেশে কোনো পুরুষ টোনে বা থাকে মেয়েদের লক্ষ্য জাবনা ছেড়ে দেয় না। বেরোয়া গাড়ির লাক—পুরুষদের সেবিছে জরফদ নেই। তার কারণ পুরুষ নারীকে আদরে তেরে জন্ম্য করছে—weakness was কথ্যটা উঠে থাকে।

—লেখক

পাউডার মাং। বিবেচ করে কোনো পুরুষ যদি বারকরেক তার বিকে চেয়ে মেয়ে তারল তার প্রশংসার আশ্রয় বিতরণ বেড়ে যায়। ইউরোপীয় মেয়ে যিনে তপোবার পাউডার মাংবে কল্লে অত্যাধিক হয় না। মাংবা কথ্যই এর নাম coquetry। এর মস্ত মিছেদের বক্তিতর কি এরা কম করে? এ দেশের মেয়েরা অনেক লক্ষ্যনকে স্তম্ভমান করে না যেও সঠিক খাবার চ'য়ে লাবার তরে।

মারিভো এ পর্যন্ত নারী বড় কিছু দিতে পারেনি—তার কারণ নারী লু প্রশান্তিত সৃষ্টিতে কিছু দেখতে পেরেনি। (২) ইংরেজী সাহিত্যে নারীর কোনো জানই নেই; লক্ষ্য টলি-টের কিছু শক্তি ছিল; আমি তাকে তৃতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলি। মার'২ ব্রিটের লান মারিভো নয়—মারিভোর ইতিহাসে। মারি কথলিকের আমাবের বেশে ঔপন্যাসিক বলা হ'য়ে থাকে! তার কারণ যোথ করি তারভীয়েই ইংরেজি লক্ষ্যে মারি কথলির ইংরাজি বেশ মেলে। মারি কথলি ইংরেজি লিখতেই পেরেননি—সৃষ্টি করবেন কোথা থেকে! ইংলণ্ডের গীতা আধুনিক লেখিকা, যেমন এথেল মাডিন, মার্শেরি লরেল, উরল্লা লুথ—এদের ভাবের মারিভা দেখলে হুংব হুং। সেদিন এক অংটিবিল, ঔপন্যাসিকের লুখে ওনলুম, "The modern women writers have no greater rights to call themselves novelists than a street-sweeper has." কথ্যটা: জানি। জাভি'নিয়া উল্লেখ এবং তাত্ত্বিক লক্ষ্যে বাব'দিয়ে—এরা তৃতীয় শ্রেণীর।

কতিনেটের জনকরেক লেখিকার শক্তি আছে, যেমন—লেসলা লেগারলফ বা লিগ'ফ্রিড উ'গুসে। কিন্তু সে-সংশীপের পাশে এঁদের গাড় করানো হাজকর হ'বে। সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে আমি একজনও লেখিকা লুঁজে পাইনি যাকে খাটি শিল্পী ব'লে লক্ষ্যকর করবে স্রষ্টা করতে পারি।

(২) মস্ত কোনো ক্ষেত্রেও নারীর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজিয়া হাথ'লেন, তিন্ত রাত্তা কথ্য তাঁর ভাবনা খটনি। এলিগরভাবের প্রতিভা ছিল না; তার লাকলেন করবে তার লাকলেন-কথা, double-dealing. ("greatest liar in Christendom" বলে এলিগরভাবের নাম ছিল) এবং Burghley লক্ষ্যভাগ্য। (জিহা'নিয়া) যিনে লাকলেন দেখে; আমাবের মেদের যে কোনো হইল। যিনল। কমলাও হইল।

লেখক



নারী শিল্পী হ'তে পারেন তার ভক্ত বেশ তার নয়—তার বসাবের। বাথোগলি বলে, নারী monogamic এবং পুরুষ polygamic। নারী এককে নিয়েই ভূপ, পুরুষ একাধিক পেয়েও সন্তুষ্ট। খেবোজ অতপ্তির মধ্যে আছে স্বাধীনতার বীজ। আর কিঙ্ক এই কারপেট, (ছোটখাট কাপড়ের কথা বলাই না—পুং একটা বস্তু আছে) নারী পুরুষকে প্রেরণা দিতে পারে না। নারী সাধারণ পুরুষের গৃহিণী হ'তে পারে, দলিলী হ'তে পারে, সব কিছু হতে পারে—কিন্তু প্রতিভাবান পুরুষের নারীর কাছে বিশেষ কিছু আশা করার নেই। (১) মনের দিক থেকে নারী সত্যের সত্যী এবং নিঃস্ব-ভাষে (sense of possession) সত্য,—তা সে স্বামীর প্রতিই হোক বা পুরুষজ্ঞার প্রতিই হোক। নারী একটি মানুষ বা একটি আইডিয়া নিয়ে আরম্ভ করে নিতে পারে। অপর পক্ষে পুরুষ দ্বিতীশীল নয়—সে চলছে, মিথ্যা হতে মতো, সত্য হতে সত্যান্তরে। তার ব্যাকার বেশ নেই, তার প্রতিভা অগ্ন্যশ্রী। এ ব্যাকরণে নারী তার সবার হ'তে পারে না—পুরুষের মনের এই বিশেষ ধরণটি নারীর কাছে অবাধ্য। দুটি মনের বিবাহবন্ধনের এইখানে শেষ, আর পুরুষের নিদারুণ নিঃস্ব-ভাষে শুরু। এই ভগ্নময় নিঃস্ব-ভাষের মধ্যে পুরুষ নিজেকে নিয়ে ব্যর্থতার প্রশ্ন করে, ক'বে সেবার ভবিষ্যৎ কিংবা? তার পূজার হবি দিতে চায় সে নারীকে। কিন্তু সেবার উপযুক্ত নারী কোথায়? নারীকে পাশে না পেয়ে সে স্বামী নারীর দৃষ্টি করতে থাকে, তার দৃষ্টি পুরুষজ্ঞের আপদমস্তক তাকায়। এটি দৃষ্টি করেছিলেন হাতে; হাতে স্বামী বিয়াক্রিতে এক:

(১) বিশেষত শিল্পীর পক্ষে এই দৃষ্টি বিঘাতী ভীষণ দুরূহ আশা না করাটী ভাল। সে দীপেতে পারে—এমন দীপার জেন আছে, সত্যস্বত্ব আছে, বর্ণিত আছে। কিন্তু স্বামী পায়ের আশা করলে তাকে ঈর্ষতে হবে। তবে স্বামী এই, পারে পারে মতোই সঙ্গে compromise করে বাসন পূরণ করে। তা না করলে না-পারবার দূর অদূর হ'তে ওঠে। দরজা দিলে, হয় স্বামীর আতঙ্ক। ফুলের চোরা করে, বহুতো লোকের কাঠামোয় আইডিয়া পড়ি করে নিজে নিজেই ফুলে।

—লেখক

তার বৈশ্ববদ্বিশী স্বামী বিয়াক্রিতে দুটি সম্পূর্ণ আশাও আছে।

মতন—১:১৫ মতন

## পরিচিতি

ক "The working objection to the Suffragette philosophy is simply that over-mastering millions of women do not agree with it"

WHAT'S WRONG WITH THE WORLD,

P. 110.

"Many voteless women regard a vote as unwomanly. Nobody says that any voteless men regarded it as unmanly". Ibid. P. 258.

ব (In Sweden) "It is no uncommon thing for a girl to say over the telephone to a young man whom she has seen only once, 'I long for you'—meaning just about everything that one can mean; and if she happens to be out picnicking with some acquaintance—not necessarily a very intimate one—the same thing is considered part of the dessert."

EUROPE (Keyserling) P. 262.

গ "Except as a mother the woman, by her nature, has no instinct for morality, but only for rules of conduct. It was a practice Babylon, on certain holidays, for the noblest damsels in the land to give themselves as a muller of course to strange men. Of course only on those occasions otherwise they would have considered it an abomination.... Shame 'as such' is unknown to women for her the decisive factor is the rule of conduct."

Ibid. P. 70.

# আধুনিক আফগান

জরীদ কলম

ও

শিরীন কলম

বহু বয়সের পুত্র পুত্রিণী জগতে আবার আগমনের  
সাড়া পড়ে গিয়েছে। নিম্নোক্ত জাতি আবার জগতের  
মধ্যে তাদের কর্তব্যপথে হার লাগেগ ক'রে গিয়েছে।  
চুকী এই সব জাগরণের অগ্রদূত, মুক্তি-যোদ্ধা। তারপর  
মিশর, তিফ, পারস্য এই মুক্তি-যোদ্ধা যোগ দিয়েছে।  
মকল দেশের চেয়ে বৈদ্য প্রকণশিল ও অশিক্ষিত আফগান  
জাতির কাছেও এই মুক্তি-  
বাদি যাত্রা ক'রে যায়  
নাই। অসাধারণ প্রতিভা-  
বানী যুগলনী আমা-  
গুলাও এই কৃষ্ণকর্ণজাতির  
যুগ ভাঙতে চেষ্টা করত  
ক'রেন নাই। আমাগুলাও  
ও কামালগাণা উত্তর  
মনোবীর্ষ জাতির সীতে যা  
দিয়ে সংতার প্রবর্তন  
প্রচেষ্টা করেছেন  
প্রাচীর ঘন এত মোহ-  
গ্রস্ত ও অবলাবগ্রস্ত ক'রে  
রওছে যে তার মর্ম্মস্থলে  
আঘাত না হানলে, সেই  
পড়া ভিৎ উৎখাত ক'রে  
না ফেললে, সত্যিকার

পথে বাতা হুক করেছিলেন। তাঁর প্রভাবে বহু যুগপুণ্য-  
মকিত রানি ও কৃষ্ণাচার ফ্রতগতিতে কণা পাঠার মত ক'রে  
পড়ছিল।

বিখ্যাত বোম্ব ৪৪ আমাগুলাও এই অদম্যাত্মিকতা  
দেখে কাঁদছিলেন। ৪৪২ সেদিন বহুটাের মস্তকতে আমা-  
গুলাও মিঃতাদন ডাঃগাবাদ সমস্ত কংকে ভেঙে ও



মুক্ত-রত আফগান জাতি

ভাবে দুতন পঠন সন্তবণর নয়। কামালগাণার সঙ্গে যেমন  
একমল উৎসাহী ও অকোম্পকর্ষী দুবক তাঁর ত্রুতে হীকা  
গ্রহণ করেছিল, আমাগুলাও হুর্জিয়া, তাঁর তেমন কোন  
মকামল হুটে নাই। তবুও তিনি একলা চলার পান গেরে

বিস্মিত ক'রে গিয়েছিল। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত এট  
সংবাদে সমগ্র পুত্রিণী জগত বহাধতের ভাব তন্ত্রিত ক'রে  
পড়েছিল। কি ক'রে যে এই অদম্যব সন্তবে পরিণত  
হয়েছিল তা এখনও মকলের করনা-করনার বিব্রাহুত



চ'লে রয়েছে। সংবাদপত্রে এবং লোকমুখে যেটুকু খবর পাওয়া  
যেছে, সত্য নির্ণয়ের শকে তা বখেটে নয়। তথ্যশি কেন যে  
এই সময়টায় সংশ্লিষ্ট চ'ল তার কারণ বহুদূর সম্ভব খুঁজে  
সেবা থাকে।

এইখানে একটা কথা ব'লে রাখা ভাল যে আমাভ্রমার  
ঠান্ডা পড়াবিশেষতঃ বিপদ ভোগেছিলেন, ইসলামের  
ইসলামের স্থানান্তর খলিফাদের ভাগ্যেও এই



আমাভ্রমার ও হুতায়ী

নির্গাভন ঘটেছিল। তারা ইসলামের উত্তীর্ণ ভাবেন  
তাঁরা অবশ্যই আছেন যে, চরমত ওসমান ঠিক এমন  
এক ভয়ঙ্কর প্রত্যাশিত্রোদের সমুখীন চ'লে মারা গান।  
চরমত ওসমান ছিলেন চরমত মুহম্মদের অন্ততম  
পিতৃতম পার্শ্ব। অগতঃ তাঁর এই চরমতা ও লাকনা।  
চরমত ওসমানের জাতি আমাভ্রমার আমাভ্রমার  
সুস্থানিতল স্পর্শ পান নাই এই বখেটে। শুধু চরমত ওসমান

ননু, চরমত আলীকেও এই ভাবে নাকাল করেছিল  
প্রত্যাশিত্রোদের। হুতায়ী ইসলামের উত্তীর্ণ নাকাল  
মিলে যে এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা হচ্ছে, চরমত  
আলী বা চরমত ওসমানের বিরুদ্ধে উপায়ের যেসকল  
মূল্যবান কারণ, তার সঙ্গে আমাভ্রমার বিরুদ্ধে উত্তীর্ণিত  
বলের কোন সামঞ্জস্য আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে  
ইসলামিক ইতিহাসের অতি আনন্ডীও উত্তর দিবে যে,  
আমাভ্রমার সঙ্গে ওহ কোনই সোসাদৃশ্য নেই।

ইসলাম ধর্মের ইতিহাস খুঁজলে দেখতে পাওয়া  
যাবে গোড়া দল চিরদিনই গোড়া, তাঁদের পরিবর্তন  
কোন দিনই হয় নাই, অথচ ইসলামের চিত্তাশ্রমণীতে  
অদ্বৈত বক্রম প্রশস্ততা ও উদারতা দেখা দিচ্ছে।  
সুন্নিমতবাদ, যোতাহেদা মতবাদ, ইসলামী মতবাদ, এ  
সকলের উপস্থিত নাকাল। ইসলামকে নতুন ক'রে  
রূপ দেবার চেষ্টা চিরদিন থেকে চ'লে আসছে। আরবা  
যদি আলোকনামাত্র পণ্ডিত ও হুঁকাধার আল-খাফালীর  
দার্শনিক বাবা: ও মতবাদ আলোচনা করি তা হ'লে  
দেখতে পাব ইসলামকে তিনি নতুন ক'রে প'ড়ে তুলেছেন।  
অথচ এই পণ্ডিত পাফালীর বইগুলো কর্ডোভার আশ্রয়  
দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; শুধু তাই নয়, তিনি  
ককের মাথাতে তুঘিত হয়েছিলেন। সাধারণ লোকের  
কাছেও তাঁকে বখেটে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল।

হুতায়ী দেখা থাকে যে, গরাই ইসলামের মূল পাথর  
চেষ্টা করেছেন, নতুন ভাবে চিত্তা করেছেন তাঁরাই বখেটে  
অসমান লক্ষ করেছেন। আমাভ্রমার তামিলপাণ্য প্রকৃতি  
পুরাতন ইসলামকে নতুন দিনের আলোতে দেখতে চেষ্টা  
করেছেন, যেখানে তার বৈত, তার মানি, তার কন্যা: যরা  
পড়েছে তাঁরা তা গ্রাণ-পণ চেষ্টা ক'রে খুঁজে মুছে ফেলতে  
চেষ্টাছেন। বহুদিনকার ভাব ও মন আচারগুলিকে তাঁরা  
খুঁজে খুঁজে ফেলতে চেষ্টাছেন। মাফুদের মন চিরদিন  
পুণ্ডিতকে অ'কুড়ে খ'রে রাখতে চায়, পণ্ডিত সংস্কার-  
গুলিকে কবীর মত বোম্বাস্ত্র হস্তে করতে চায়, অমতায়  
সেগুলিকে বুকের কাছে তুলে ধরে। যে বা বন্ধু, তাতে মন  
না দিয়ে সেগুলিকে নিরুদ্বাধে মাথাতে করবার চেষ্টাগুলি গার।

রাধেন তাঁরা চাপ ভোগ করবেন তাতে আশঙ্কা কিছুই নেই।

আমাতুল্লাহ যে নিঃশব্দন ভাষা করেছেন তাতে প্রথম পূর্ব আশঙ্কা লাগলেও সত্যিভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এটা বিচিত্র নয়। বিশ্রোভী প্রকার বল যে সকল দর্শন দিয়েছে তাতে বেশ বৃদ্ধা বাব আমাতুল্লাহ কোন পথের যাত্রী এবং কোনখানে প্রজাদের কলংকারে আঘাত লেগেছে। নীচে



সর্দার আলি আহম্মদ খান

সর্বজন্য তুলে দিচ্ছি, তা হ'লে যথোপযুক্ত হুজিবে হ'বে।

(১) রাবা ৫০ জন সভাকে লইয়া একটি পরিষদ গঠন করবেন। এই পরিষদের অধিকাংশ সভাই মোল্লাশ্রেণীর যথা হ'তে প্রেরণ করতে হবে এবং বাকি সমস্তসংগে আফগানীত্বাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের 'মধ্য হতে হবে। পরিষদ সামরিক, রাজীক এবং বর্ষ প্রতি সর্ববিষয়ে পূর্ণ কর্তব্য পাল্টাবেন।

(২) রাবা যে নিজে একজন খাতি মুলহান তা' তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ মুলহান বংশের বিধান অনুযায়ী সমস্ত প্রকার সীতি-নীতি তাঁকে মেনে চলতে হবে।

(৩) দৌলদারা এবং দেওয়ানী সমস্ত প্রকার মামলা-তেই বিবরণমান বল য'ব সঙ্গে উকীল মোস্তাফার নিযুক্ত করতে পারবেন। (পূর্ব নিয়ম ছিল, কোন দাক্কো বা প্রতিনিধি কোন মামলার খাড়া করান চলবে না। একজন ওক দিটার করতেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন ছুরি থাকত না।)

(৪) যে ৫০টি খালিকাকে চিকিৎসা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের ক্রিয়াদে আনতে হবে।

(৫) বর্তমান বাদশাহ্ ডারতের দেওয়ান্ মাদরালাব মোল্লাদের আফগানিস্তান-প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিতে হবে।

(৬) যে সমস্ত সর্বস্বমত অফিসার যুব লবে এবং খাড়া তাদের যুব মেয়ে তাদের সকলকেই অতি কড়াকড়ি ভাবে পাতি দেওয়া হবে।

(৭) রমসীল যত্নের ব্যাধিবে এলে সমস্তগঠন পরতে হবে এবং কড়াকড়ি ভাবে শর্দা রাখতে হবে।

(৮) মোল্লা ও মৌলবীকে কোনও গুপ্তচরিত মর্যাদাপালী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সার্টফিকেট ও ডিমোমা গ্রহণ করতে হবে না।

(৯) বাখাতুল্লক সামরিক শিক্ষার আটন পরিচালক হবে।

(১০) যে কোন আঙ্গগান প্রকা মত পান করবে তাতেই অতি শুকতরুপে পাতি দেওয়া হবে।

(১১) মোল্লারা যে কোন ব্যক্তিকে রাস্তার ধামিহে তাতে মোসল্লেম আইন বিধে জিজ্ঞাসা করবার অধিকার পুনরায় পাবেন। ইসলামীর বিধান সম্পর্কে যাব অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, তাতেই কঠোর পাতি দেওয়া যাবে।

(১২) শুক্রবারই পূজাতন সীতি অহুগরে ছুটির দিন ছিল, এই সীতি পুনরায় চালাতে হবে।

(১৩) সৌলোকদিগকে যোরকা পরতে হলে। রাবি

দ্বাষ্টতা এবং অল্প কোন সময়েই কোন প্রকার ইউরোপীয়  
পরিচ্ছদ পরতে পারবেন না।

(১৪) বাগদাদে আবার লোকসমূহকে প্রত্যেক জেলার  
সম্মানিত দক্ষিত প্রতিনিধি নিকট যেতে অগ্রহণি দেবেন।



হোসেন নাসির খান

লোকের এই সমস্ত দাখ্য ব্যক্তির পছন্দন করতে এবং  
তাদের পছন্দমতে সুস্থিত হতে পারবে। এই সব  
দাখ্য ব্যক্তি যে সমস্ত উপদেশ দেবেন তাই দেশের আইনের  
মত পালিত হবে এবং প্রত্যেকেই কিংবা অল্প কেহই তাতে  
কোন প্রকার বাধা দিতে পারবে না।

(১৫) বাগদাদে গুলে পছন্দন সমস্ত বিবাহ করতে  
পারবে।

(১৬) জামিন প্রকৃতি না হইলেও লোকে টাকা ধার  
নিয়ে বা ব্যয় দিতে পারবে এবং এই পুরাতন বিশৃঙ্খল  
নীতিই বন্ধ রাখতে হবে।

(১৭) বাগদাদের স্থল সবুজ অধিকার বন্ধ করে  
দিতে হবে।

(১৮) যে কোন ব্যক্তি মুসলিম আইনসমূহ যে কোন  
পোষাক পরতে পারবে।"

এই সতের কতকগুলি এমন ছেলেরি ও যোদ্ধারি যে,  
বর্তমান যুগে লেগে লা আশ্চর্য্যচাঞ্চ নামান্তর মাত্র। সতের  
নব্বয়ের প্রস্তাবটির কথা বরা থাকে। বাগদাদিদের ইচ্ছা  
অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। আমাঙ্গল্যকে সিংহাসন  
থেকে তাড়ানোর যদি এই সব কারণ হয়, তা হ'লে বলতে হবে  
আকস্মিক জাতি কত শিষ্ট ও নাজুলে পড়ে আছে। আজ  
সমস্ত বিশ্বজগৎ জুড়ে মানব-জাতির ভাঙা-টোকা গান হুপ  
হচ্ছে, এখনও যদি তাকে বিকল, স্থির করে রাখতে চায়,  
মহাদুগের সিলবাদের ব্যতীত বুড়ার মত কুশলার-  
গুলি পছন্দ মিলিকারিতে ও ভগ্নাবনাদান হ'লে  
চলে, তা হলে ও জাতির উন্নতিত আশা সুদূরপরাঞ্চল।



ইনায়েতুজ্জামান খান

জগৎ চলেছে তবিত্তের দিকে। শিষ্টনবিকে কেন্দ্রীয়  
অবলম্ব ভার নেই। এখন তারা শিষ্টন পানে টানতে চায়  
তারা বিশ্ববাহী। স্বর্গীয় আদিস প্রভাত হ'তে নব  
নব রূপে জগত সৌরভের তবিত্তের আদর্শের  
লক্ষ্যে বের হয়েছে। স্তব্রা আমাঙ্গল্য, জগতের সঙ্গে

সময়ে তালে শা ফেলে চলবার ক্ষমতা করেছিলেন এবং সেট ছত্রই ওঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছে। তথাপি বলতে হবে আমাছুয়াই শতা শতাই বীর। তিনি প্রকৃত যোদ্ধারই কীর কাজ করেছেন।

আমাছুয়াহু সিংহাসন ত্যাগ করার পরে ইনারেতুমায়ে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট করান। আমাছুয়াহু, যোধ হু



বাকো-ই-শাহো ।

কাণ্ডজানহীন অগাঠান মোরাদলের ক্ষুদ্র হ'তে আফগানকে বাচানোর ক্ষমতা, অথবা রক্ষণাত হ'তে বেশক বাচানোর ক্ষমতা আপন রাজা হুদা-প্রকৃতির ইনারেতুমায়ে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু যে আশ্রয় একবার তফ কাঠে লেগে

আলে ওঠে, সে আশ্রয় কাঠা কাঠও পুড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'লনা। ইনারেতুমা সে মোরাদ-বিভাগের আশ্রয় নিভাতে পাঠলেন না। তাঁকে শেরেও তারা হুদা হ'লনা। মাহুদের মধ্যে যে বিংশতা আছে, যে রক্তলোলুপতা হুদা আছে তা একবার জেপে উঠলে আর দূরত্ব মিটেও চার না। বিদ্রোহী বল ধ্বংসের তাড়নায় যেতে উঠল। তারা শত দহন নিরীহ মাহুদের রক্তে আফগান স্নানিত ক'রে দিল। তারা রক্তের হোহী খেলা আরম্ভ করল। তারা সামান্যই মাহুদ ইনারেতুমায়েও সিংহাসন থেকে তাড়ানোর ক্ষমতা দৃঢ়বদ্ধ হ'ল।

এই বিদ্রোহী দলের সর্দার বাকো-ই-শাহো শেখকালে আশ্রয়কে রাজা হ'লে ঘোষণা করার মতলবে যেতে উঠল। নকির একটা মততা আছে। ভিত্তীহুদেলে বাকো-ই-শাহো এই নকির মেশাব বিস্তারিত হ'রে গেল। তার ব্যক্তিগত চরিত্রাফাফার পরিপূরণের ক্ষমতা বিদ্রোহী আশ্রয় বৈধ ক'রে ছড়িয়ে দিল।

ইনারেতুমা সিংহাসনে বলতে না বলতেই চারিদিক থেকে বিদ্রোহী আরো তুমুল বেগে কড়ের মত বইতে শুরু করল। বাকো-ই-শাহো সৈন্যদল জালালাবাদের মনোমত প্রাপ্তি প্রস্তুত ক'রে দিল। ইয়েবোগ হ'তে লড়াইতে যে সকল চাক শিরের নিয়ম ছিল তা পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বাকো-ই-শাহো কান্দাহার দখল ক'রে ফেললে। বাকো-ই-শাহো নিজেকে কান্দাহার রাজা হ'লে ঘোষণা করল।

আমাছুয়া মনে করেছিলেন ইনারেতুমা, বীরশাহ হ'লে যোধ হু বিদ্রোহ নিতে বাবে কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয় নি। প্রকৃত আফগানে অস্বাস্থি চারিদিক থেকে প্রধূমিত হ'রে উঠছিল। বাকো-ই-শাহো সিংহাসন অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদ খানও সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আফগানিহান অস্বাস্থ্য হ'রে উঠল। এখনও এই অস্বাস্থ্যতা পূর্ণমাত্রায় চলেছে। বিভিন্ন যুগমান নকির সিংহাসনের ক্ষমতা উদ্ভাবিত হ'রে রয়েছে।

## গৃহলক্ষ্মী

—গল্প—

—শ্রীবাহুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্রামাঃ বাইবার পর চাইতে আমিহর বাড়ীতে যোচ্ছাচ্ছা  
বসিত। বিশেষ কারণ না বলিলে আচ্ছা বলা বড় চাইত না।

চা এবং জলযোগের পর সেই যে গল্প চলিত, বাড়ি  
ঘরটার আগে শেষ হইত না।

নিভাঃকারের মত আঁচও মজলিস্ জমিয়া আসিত্তেছিল,  
এমন সময়ে গৃহকর্তার একটা অন্তর্ক কথাই গল্পের ধারাটা  
দম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল।

পাশেই একটা বাড়ী আছে, এতদিন খালি ছিল, আজ  
দিন চুই চুইল ভাড়া আসিয়াছে। বাগান্ধার লাগ-পেড়ে  
একটা বাড়ি তৈরী হইতেছিল, সেটা আর তোলা হয় নাই।  
পাশের বাড়িয়ার পাড়টা বেশ উজ্জল দেখাইতেছিল।  
আমিহর সেই দিকে চাহিয়া এক সময়ে বলিল: উঠিলেন,  
যেহেমাধ্যব না থাকলে ঘরে লক্ষী থাকে না। ঘরের  
দোআলগার চর না।

সকলে একটু বিম্বিত হইয়া আমিহর দিকে চাহিল।  
আমিহ পুনরাবৃত্তি করিলেন, ওই যে বাড়ীটা এতদিন খালি  
পড়েছিল, তখনও যেমন মনে হ'ত, এখন একশাণ কেহাণ্ডি  
এলে যেম খুললে, তখনও ঠিক তেমনিই মনে হ'ত। আজ  
একটা বাড়ি তৈরীতে দেখে মনে হইছে, ইদা, এতদিনে ঘরটা  
ভরলো বাটে!

একজন বলিল, তা তোমার ঘরটা এমন ক'রে খালি  
রোকেছো কেন, আমিহর দা'?

আমিহ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আমার ত'  
শেষকালে এসে ঠেকেছে, এখন আমার পক্ষে তরা ঘরও  
না, লুজ ঘরও তাই।

• লোকটি বলিল, সে কেমন ক'রে হয়, আমিহ দা' ?  
জ্ঞে শেষকালেই ত' তরা-ঘরের চরকার, মইলে কিলের  
তরে চলবেন ?

আমিহ প্রসঙ্গটা চাশা দিবার কল্প বলিলেন, আচ্ছা,  
আচ্ছা, থাক্—

কিন্তু এত বড় একটা কৌতুকের সন্ধান পাইয়া বন্ধুরা চুপ  
করিয়া থাকিতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা নানাভাবে  
এই কথাটাই বলার চাখিলেন।

একজন আমিহর সেদিন লক্ষা ও কোণের শেষ  
রখিল না।

অবশেষে এটী ছিন্ন হইল, আমিহ'র এখন ভোগ করিবার  
মত দম্পত্তি আছে, অথচ ভাগিবার কেহ নাই, এবং এখন  
তাঁহারা বহন একেবারে উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই, অথচ বাংলা  
দেশে পৰ্বাণ্ড পরিমাণে ঘেরা আছে, তখন তত্তত ইয়দ্—  
পাত্রী বেঁধেতে ঘেন কোনরূপ বিপদ বা কষ্ট না হয়।

সেদিনকার সত্যই ইহাই ছিন্ন হইয়া সভা-ভঙ্গ হইল,  
এবং বাইবার সময়ে সকলে বলিয়া গেলেন, তাঁহারা কথাগাথা  
চোঁটা করিবেন। আমিহ অতিশয় লজ্জিত হইয়া বন্ধুদের  
তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

হস্তিাকুর আচকের আলোচনার বড় একটা খোপ ঘেন  
নাই। বাইবার সময় আমিহকে বলিলেন, তরা ও-কাছটি  
ক'রো না। একবারে মরবে।

আমিহ তাড়াতাড়ি তাঁহার হাতটা চাপিরা ধরিয়া  
বলিলেন, তুমিও কি পাগল হ'লে নাহি, বাবা ?

হস্তিাকুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ও সব কথা কোন  
কালের নয়, তাই! শেষ পৰ্বান্ত হয় ত' পাগল হবে তুমিই।  
একটু বুকে কাজ ক'রো। একটু বামিয়া বলিলেন, বেশ  
আচ্ছো, কেন কড়াই বাড়াবে ? আমার হালটা দেখছো  
ত' ? এখন মৃত্ত হবে হাওরাটা পাছো, তখন তরা-ঘরে  
নিখাল পৰ্বান্ত বড় হ'বে আসবে। এ একেবারে বাঁচি কথা,  
তাই।



অমিষ কি বে বলিবে তাহিরা শাইল না। শেষ পর্যন্ত আনন্দ-সামন্তা করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না,— তাকাতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

ইহার পরের কয়দিনের মজলিলে এইটাই আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল। কে কতদূর অগ্রগত হইল, কোন শাস্ত্রীটি বেশিতে তেমন, কাকার জাই-কি এখনও অনুভূত রহিয়াছে,—সমস্তকল ধরিয়া ইহারই হিসাব-নিকাশ চলিত। দ্ব্যর্থম ক্রিয়ণ হইবে, বাওরার আয়োজনই বা তেমন হইবে, এ সকল কোন ব্যাপারটাই বাদ পড়িত না। অমিষ কোনমতে ইহারের চূপ করাইতে না পারিয়া অবশেষে তর দেখাইলেন এ সকল কথা চাইলে তিনি বৈঠক বন্ধ করিয়া দিবেন। কিন্তু কথাও বন্ধ হইল না, বৈঠকও চলিতে লাগিল। অগত্যা অমিষকে নীরব হইয়া থাকিতে হইত।

একদিন বন্ধুরা আসিয়া শুনিলেন, অমিষ কোথায় গিয়াছেন, আসিতে চার-পাঁচ দিন দেয়ী হইবে। বৃতিতে কাহারও বাকী রহিল না। বন্ধুরা বলিতে লাগিলেন, অমিষকে এত শীঘ্র ভীষ্যত ধরিবে, তাকা তাঁহারা আগে করিতে পারেন নাই। আর দু'টো দিন সযু সযিল না, ইত্যাদি।

চরিত্রাকুর বলিলেন, তোমরাই ত' ওকে নাচিয়েছে। এখন সব হাততালি দিচ্ছে।

আর সকলে কথিয়া উঠিয়া বলিলেন, কি' রকম? আমরা নাচাসুখ, না উনি আগে থেকেই নাচেতে শুরু করেছিলেন! নইলে এত শিগগির—

অমিষের চার-পাঁচ দিনের জাহগাথ বার দিন কাটিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া অমিষ বন্ধুদের খবর পাঠাইলেন, তাঁহারা যেন সকাল সকালই সভা আলোকিত করিতে আসেন।

সকলে প্রায় এক সঙ্গেই আসিলেন। কথাবার্তা ক্রিয়ণ হইবে, শূন্য হইতেই দ্বিতীকৃত ছিল। বিলাস বেশ একটু গভীর চালে বলিল, তারপর ঘাবা, এতদিন কোন মধ্যস্থতীরা আলো করতে পিছলে?

এই কথাতেই অমিষের মূগুদান। বিলাতী বেতনের মত লাল চইয়া উঠিলে, সকলে এইজন্যই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু অমিষের মুখে সেজন্য কোন ব্যতিক্রমই দেখা গেল না। বরং একমুখ ভাসিয়া বলিলেন, আমি আর কোন মধ্যস্থতীরা আলো করবো বল? এই মধ্যস্থতীর মস্তই একটা আলো আনতে গেছে লুম। পরে পাশের বাড়ীর বেলাইএর দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা লক্ষ্মীকে বলবো যেন ওদের বেশিবে বেশিবে কাপড় শুকতে দেয়। আর তোমরাও দেখলে, ঘর আলো হয় কিনা! বলিয়া লমম পরিত্যক্ত হইলেন সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

সকলে অবাক হইয়া গেল। বিংশন কিছুই বোঝা গেল না। অবশেষে চরিত্রাকুর অঙ্ককারে শেষ অঙ্গ ছুঁড়িলেন। বলিলেন, নিম্নের বৌমাটিকে একবার দেখতেও ত' পারো।

অমিষ তাকাতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই, ত্রাত্রে আর কোন সন্দেহ আছে? তবে ভাগ্য সর্ব্বের মেঘও কণে। হনের পাখী, এখনও গুচ্ছকৃত করছে, এখনই টেনে আনটা কি ভালো? তা'র চেয়ে আর মা-লক্ষ্মীর ত্রাত্রে এক কাপ ক'রে চা হ'ক। কি বল? রোজ রোজ চাকরের হাতে— বলিতে বলিতে অমিষ উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ব্যাপারটা তেমনই অঙ্ককারে গহিল। এই বিষয় লইয়াই বন্ধুরা অহঙ্ক বরে কথা করিতে লাগিলেন।

মিনিট তিনেক পরে অমিষ ফিরিয়া আসিয়া একটু অগ্রস্বতের হাঙ্গি হাসিয়া বলিলেন, না চাই, আর আর লক্ষ্মীর কৃপা হ'ল না। চাকর ব্যাটার হাতেই আর খেতে হবে। একটু খাওয়া বলিলেন, মজুৎ এসেছে, ভারী লক্ষ্য! বলে, আমি কি ও-সব জানি? সব জানে, এ শুধু লক্ষ্য বৈ কিছু না। হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ ত'!

এইবার পাখি ল্পষ্ট করিয়া বলিল, একটু খুলেই বল না, ঘাবা! কোন্ লক্ষ্যটি এলেন, তাঁর পরিচয় ত' কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।

অমিষ চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, সে কি, তোমরা কিছু জান না?



অর্থাৎ লক্ষ্যটির পরিচয় পূর্ণ হইতেই লক্ষণের জানিয়া রাখা উচিত ছিল।

অমির লক্ষ্যের পরিচয় মিলেন। গ্রামে তাঁহার সম্পর্কীয় এক কোন ছিলেন, এটি তাঁহারই পূরুষ। তাঁহার হঠাৎ অপ্রত্যাশিত্য কারণ এই, এই ভগিনীটির শেষ অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি গ্রামে গান। ভগিনীর অস্তিম-কার্য শেষ করিয়া অনেক বুঢ়াইয়া যোনের পুত্র ও পুত্রবধূকে আনিয়া-ছেন। সে কল্যাণে দেখে তাহার কথিতই বা কি? কল্যাণ নাই, অত্যন্ত-অনটনও আছে,—একজনে তাহাদের এখানে অনাটো তাঁহার এক কস্তাবিবেশ। তা ছাড়া তিনি নিজেও লক্ষ্যী বিনা লক্ষ্যীচাড়া হইয়া আছেন। তাঁহারও 'ত' দরকার ছিল।

লক্ষ্য উভয়গণের বিনিয়োগ তিনি প্রচ্ছন্ন-পরিভূষিত নীরব করিয়া রাখিলেন।

ভূতা চা এবং পান আনিল।

চায়ে কয়েক চুমুক দিয়া বিলাস বলিল, তা হ'লে লক্ষ্যী-গায়ের লক্ষ্যের ভায়ে এসেছেন। ভায়ে-বধূর হান অবশ্য অস্বাভাবিক, ভায়েটি কি এক-অস্বাভাবিক বাইরে আসবেন না? পরিচয়টা ক'রে রাখা ভাল।

প্রত্যবে লক্ষ্যেই স্মরণ মিলেন।

অমির বলিলেন, সে ও' বাড়ী নেই। বোধ হয় এগুনিই আসবে।

বিলাস অতিশয় উৎকর্ষা প্রকাশ করিয়া বলিল, গ্রামের লোক, এসেই বাস্তব বেরিয়েছেন, ভায়েতে না গান।

তাঁহার কথার দরুন অমির একটু আহত হইল, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিল না।

সবাই যখন উঠি উঠি করিতেছেন, একজন লোক প্রবেশ করিল। ঘোষিত কল্যাণ, মাথা বেড়া, মুখেরি বিজী, কিন্তু পরীক্ষা কিনা। আসিয়াই ঘরে এতগুলো লোক দেখিয়া প্রথমটা সে কেমন লক্ষ্যিত হইয়া গেল, পরে তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলিল। কিন্তু সে অতিক্রম করিবার পূর্বেই অমির তাহাকে ডাকিয়া লক্ষণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন! বলিলেন, এইটো আমার ভায়ে। বিশিন, এ'রা

কল্যাণ আমার অস্তিত্ব বহু।

হবে তোমার।

বিশিন হাত তুলিয়া লক্ষণের উৎকর্ষে নমস্কার জানাইল, ও মিনিট খানেক নীরবে গাড়ীয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অমির ভায়েকে ইচ্ছিত করিয়া বলিল, কি রকম পরীক্ষা দেখলে ত' ? ও এক ঘূষিতে একবার একটা লাক্ষ্যের মাথা কাটিয়ে দিয়েছিলো!

বিলাস কখনো কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, ভ্রমলোককে কোথায় খেলেছি ব'লে মনে হচ্ছে! আচ্ছা দাদা, ওর বাড়ীটা কোন গ্রামে?

অমির বলিলেন, গোবিন্দপুর।

বিলাস তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তাই বল, গোবিন্দপুর! আমার এক মালী প্রথমে থাকেন। তোমাদের বাড়ীটা বামুন-পাড়ার ত' ? ওইখানেই বোধ হয় ভ্রমলোককে দেখেছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা উঠি, বাদা!

বাহিরে আসিয়া হঠাৎকুর বলিলেন, ভায়েটিকে বেশ ওস্তাদ লোক ব'লেই বোধ হ'ল।

বিলাস প্রতিপ্রশ্ন করিয়া বলিল, আমার সম্পর্কিত মাঝবার মতলব আর কি!

অমির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিশিন প্রায় সহিত কথা কহিতেছে। তাঁহারকে দেখিয়া ভূতা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল।

অমির দিকটে গিয়া সহাত্তে বলিলেন, অত ঘোমটা টানলে চলবে না, মা। ঘোমটাই যদি টানলে, তবে ছেলের দিকে দেখাবে কি করে?

ভূতা হুশ করিয়া বলিল।

অমির পুনরাবৃত্তি করিলেন, দেখ ত' মা, আচ্ছা তুমি চা'টা: ক'রে দিলে না, এতগুলো ছেলেকে আশা থেকে বঞ্চিত করলে। সে যাক, কাল খেতেআর যেন ওখাটা চাকরের হাতে চা খেতে না হয়। কি বল?

কুত্বী লক্ষ্য কোম উত্তর করিল না। পরে ঘরে ঘরে  
কহিল, শুধু চাটাই ক'রে বেথো। খাবার আমি করতে  
আনি না।

অমির মুহু হাসিয়া বলিলেন, এখন তাই হ'লেই চলেবে।  
পরে ঘরে হুহে দরই কাঁপ শেতে নিতে চবে;—মায় এট  
খুচো ছেলেটিকে পৰ্য্যন্ত। বলিয়া তিনি স্রেষ্ঠর আনন্দে অস্ত্র  
চলিয়া গেলেন।

দেবিন আচায়ে বলিয়া অমির বাহ্যের গদ্য জুড়িয়া  
দিলেন। কুত্বী দাববে তাঁরকে পাখা করিতেছিল, সে  
ভেমনি দাববেই রছিল। কচিৎ হ' একটা কথা কহিল।

এক সময়ে অমির বলিলেন, বেশ ত' মা, তুমি আসতে  
না আসতে বাবায়ের চোখরা বধলে গেছে। এ সব কি আর  
ঐ পাড়টার কার! তুমি নিশ্চয়ই দেখিরে-তুমিরে বিয়েছ!  
বাতবিশপকে কুত্বী রাজার বাপায়ে কোন হাত দেয়  
নাই। কিন্তু কিছু বলা নিতাসই বাহুণা; তাই কুত্বী চুপ  
করিয়া রহিল।

অমির আত যেন খোড়া হেঁপিয়া খোড়া হইল। বলিল,  
ডয়ের বাটিটা একটু এগিয়ে দাও ত', মা!

কুত্বী যেন একটু গুরুত্বিত হইয়া পড়িল।

অমির তাড়া লক্ষ্য করিয়া বলিল, দাও না, মা, দাও।

কুত্বী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আমি তিনি আনছি। বলিয়া  
সে চলিয়া গেল।

একটু পরে তাঁর তিনি দিয়া গেল। আরও' অপকাল  
গেল, কুত্বী আসিল না। মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়া  
অমির অবশেষে নিজেই দুয়ের বাটি তানিয়া লইলেন।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে কাটিতে অমিরের ভিতরের  
অকৰ্ণণে বাহিরের বন্ধনটা কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে  
এমনি পাকাইল, বন্ধন আসিয়া ভাঙিয়া না' পাঠাইলে তিনি  
বাহিরে গাইতেন না। বন্ধন ও গা' আসিয়া দিলেন। এত  
দিনের লড়াই এমনি করিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

লড়া বন্ধন একবারেই বন্ধ হইয়া গেল, তখন লক্ষ্য  
একদিন অমিরের মনে বন্ধনের প্রতি আসিয়া উঠিল, এবং  
গভীরের প্রতি বাহ্য ক্রটি করিয়াছেন, তাহা পরিশোধনার্থে  
একদিন বন্ধনকে নিমগ্ন করিয়া পাঠাইলেন।

রাখিল কুত্বী। কিন্তু পূর্বের একটু ইতিহাস আছে।

সব কালেই যেমন হইয়া আসিয়াছে,—কুত্বী যেরূপ  
প্রতিবাদ করিয়া জানাইল, সে রূপিতে পারিবে না,—  
বিশেষত নিম্নবর্ণের ভাষা। অমির বলিলেন, বাবার নাম  
কুত্বী, বেশ-আঁকে সে পক্ষী চাইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে,  
সে কিনা রূপিতে জানে না?

অবশেষে অমিরই জিত হইল।

দেবিন অমিরের এক উৎসব দিন। বন্ধন আচায়ে  
যত প্রয়াস করিলেন, তাহান চারতল তাঁহার এক কুনিয়া  
উঠিল।

তবে নাকি রূপিতে জানে না? সব লক্ষ্য,—কবল  
লক্ষ্যেই নিহত অবনত হইয়া আছে।

বন্ধনের বিদায় দিয়া অমির সোমাসে মধ্যপূরে ঢুকিলেন,  
এবং কিছুদূর গাইতেই বিশিনের ঘর চাইতে কর্তব্যে ত্রুণা  
খামিয়া পড়িলেন। বিশিনের উক্ত কর্তব্যের তাঁর মনে কেমন  
একটা সন্দেহ হইল। কিছুক্ষণ গাড়াইয়া থাকিবার পর  
তিনি দ্বির দৃষ্টলেন, বিশিন তাঁর সচিত বিবাদ করিতেছে।  
ছেলেমাগধী কাজ ভামিয়া চলি' গাইতেছিলেন,  
চাঁৎ কুত্বীর কথা অতি স্পষ্টভাবে তাঁহার কানে  
আসিল।

কুত্বী বলিল, তোমার কেমন মন জানি না, আমি  
পারছি না। এমন ক'রে ঠেকাতে পারবো না।

উত্তরে বিশিন বমক দিয়া একটা বিজ্ঞী ইঙ্গিত করিয়া  
কহিল, কেউটে লাপ বতই পার্শ্বিক হ'ক, হুবিবে  
গেলেই ছোবলাবে।

অমিরের কানে কে যেন পদম শিশা চলিয়া দিল।  
তিনি আর গাড়াইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চলিয়া  
গেলেন।

অচকার সমস্ত আনন্দ তাঁহার মন চাইতে নিঃশেষে  
হুড়িয়া গেল।



এক সময়ে কুতীর তাঁহাকে আহার করিতে আহ্বান করিল। তিনি মাথা নীচু করিয়া আহারে বসিলেন, এবং সমস্ত ক্ষণ একটি কথাও করিলেন না। যেন সমস্ত অগরাধ তাঁহর।

ইহার পর তাঁহার মনে আর তিলমাত্র পাত্র রহিল না। কেবলই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল, তাঁহারই এই আচ্ছাদনতলে একটি নারী অপরিচীত লাহন ও পল্লনা দৃষ্টি করিয়া ঘাইতেছে। একটি প্রতিবাদও দে করে না। প্রতিকারেই কোন উপায়ও নাই।

বিপিন ও কুতীর দুখ দুটো কেবলই তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, এবং নিজ মনেই বার বার বলিতে লাগিলেন, গায়ের গরুর দুজাধার—

এতদিন পরে একটি সমাধানও পুঁজিয়া পাইলেন। কুতীর কেন প্রাণলেশ একটি কুস্তিও স্ফুটিত হইয়া চলিত, তাহার ব্যবহারে কেন এমন একটি দুরূহের ব্যবধান থাকিয়া গাইত, —তাঁহার কারণ অতি স্পষ্টরূপে তিনি দেখিতে পাইলেন।

সুখের মূলে ঐ বিপিন।

দেখি হইতে অমির কুতীর সহিত আর ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। দুখ ভুলিয়া কুতীর দিকে চাহিলেই মনে হইত, তাহার সমস্ত সুখখানি বিবাদ ও মানিমার পূর্ণ হইয়া আছে।

এই ভাবে বেদীদিন থাকিতে পারিলেন না। একদিন বিপিনকে ডাকিয়া সন্দি বিজ্ঞাসা করিলেন, সে বৌকে পিড়া দেয় কিনা।

বিপিন বিম্বিত হইয়া বলিল, কৈ, না।

অমির তাহাকে সহজে ছাড়িলেন না। বেশ করিয়া তর দেখাইয়া দিলেন।

কিন্তু সেই রাতে গুইয়া থাকিতে থাকিতে অমির মনে বিপরীত ভাবনা চুকিল। তাহিলেন বিপিনকে বকাটা ভাল কাজ হয় নাই। সে হয় ত' স্ত্রীকে এমনকি অধিক পল্লনা দ্বিবে। চাই কি প্রহারও করিতে পারে।

তিনি আর গুইয়া থাকিতে পারিলেন না,—রাত্রের এই ভূতর স্মৃতি কোঁটার কাগড়টা পারে লড়াইয়া। বিপিনের পড়ের দোরে আসিয়া গড়াইলেন।

যত্নে কোন দৃষ্টি নাই। পতীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কে দীর্ঘকাল ভাগ্য করিল, শুধু সেইটুকুই বা শোনা গেল।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া অমির ঘরে ফিরাইয়া আসিলেন। কিন্তু আর সুদ আসিল না। পাথের দিকের জানালাটা একটু খুলিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলেন। পাতুর ঘোৎঘা যেন তত্রে তত্রে নিশ্চল হইয়া জমিয়া আছে; তাঁর জানাবার অন্তরালে কোণার আছে, দেখা যায় না; আকাশে শুধু একটি তারা দেখা গাইতেছে। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অমির মনে অনন্ত কালের এক স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল।

টিক এমনিই সুখের একজনর রং ছিল। তাঁহার মস্তক বাহির এমনিই নিস্তব্ধ, এমনিই মমতাময় ছিল। আশ কতদিনের কথা, কিন্তু এখনও কত স্মৃতি মনে আছে।

তাঁহার চোখ হইতে কখন চ'কোটা জল পড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, আমাকে যে ত্রৈণ বগতো, মিছে নয়। এখনও কি না, এই বগে—বলিয়া নিজ মনেই একটু হাসিয়া পুনরুত করিলেন, আর ক'দিনই বা! আমিও বাচ্চি বড় বো, বেখবো কতটুকু থাকতে পারো!

পরদিন সকালে কুতীরকে ডাকিয়া করিলেন, মা আমা শরীরটা তেরন ভাল লাগছে না, ভাবছি কিছু খাবো না।

কুতীর তাঁহার আগরন-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আর হয় নি ত' ? বলিয়া সহসা তাঁহার কপালে হাত তৈকাইয়া বলিল, একটু যেন গরম বোধ হচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগে নি ত' ?

অমির কান্না বয়ে করিলেন, কাল রাতে জানুলাটা একবার খুলেছিলুম, তাহাণর বহু করতে ভুলে গেছি। বোধ হয় ঠাণ্ডাই লাগেছে।

সন্ধ্যায় সহর অমিরের জায়টা বাড়িয়া উঠিল।

কুতীর অনেক রাত্রি অধি তাঁহার শিখরে বসিয়া রহিল।

## গৃহলক্ষ্মী ঐবাহুবলেন বন্দোপাখ্যায়

অমির বলিলেন, আর বলতে হবে না, মা, এইবার যাও ।  
বুড়ো মাতুল, অমন একটু আখড়ি আর ভোগ করবেট  
ওর ।

কুত্তা কোন উত্তর করিল না । অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,  
উত্তীয়ারও কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না ।

অমির এইবার আগল কণাটা পাড়িলেন । বলিলেন,  
বিশি কি খেলো না-বেলো দেখ'গে যাও,—দশম দিন  
ত' এটাবনেট ব'সে আছে; এইবার যাও, নৈলে রাগ  
করবে যে !

কুত্তা শুধু বলিল, না, রাগ করবেন কেন ?

অমির একটু হাসিয়া বলিল, কার কাছে লুকুবে, মা,  
মানি সব জানি । বিশিণ যে তোমার কত ভিতরকার করে  
আমার মজানা নেই, সব জানি,—কিন্তু কি করি বল ?  
বলিতে বলিতে হুচ্চ সহসা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, সত্যি  
এল ত' মা, বিশিণ কি তোমার গারে কোন দিন  
চাত তুলেছে ?

কুত্তা কোন উত্তর করিল না, দুখটা বতবুর লম্বব  
হেট করিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল । হুচ্চ উত্তরের  
অপেক্ষায় লক্ষণার্থে বিশিণ থাকিয়া পুনরাহু হইয়া পাড়িয়া  
অবগত-কণ্ঠে কহিলেন, চোখের ওপর এ' কেমন ক'রে  
দেখি, মা ?

কুত্তা এবারেও কোন উত্তর করিল না, দুখও তুলিল  
না । উচ্ছ্বসিত অক্ষ কোন মতে দমন করিতে না পারিয়া  
তাকাতাড়ি বর হইতে বাহির হইয়া গেল । এই কণাটা  
সে কোনমতেই বলিয়া আসিতে পারিল না যে, বিশিণ  
তাহাকে বতাই ভিতরকার কলক, আত্ম পরীক্ষা কোনদিন  
তাহার গারে লাগ তুলে নাই ।

অমির আর বিশেষ বাড়িলও না, কমিলও না ।  
এমনি ভাবেই তিনদিন কাটিয়া গেল ।

আজ বিকালে গাঁহার বন্ধুরা একসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন । অমির উঠিয়া বাহিরে বসিতেছিলেন, কুত্তা  
বাঘা বিগা বলিল, ওরাই বরং-এবং আসল ।

তাহাই ঠিক হইল । বিশিণ অত্যাশঙ্কনের ভিতর  
জাতিয়া আনিতে গেল, কিন্তু মিনিট-দুয়ের মধ্যে ফেরে

আসিল না । বাহিরে কিলের তুলা তর্কের কোলাহল  
শোনা গেল, তারপর সব একসঙ্গে ভিতরে আসিয়া  
পড়িল ।

শুধু বিশিণ কোথায় সরিয়া পড়িল ।

বিলম্ব প্রথমে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, তোমার এই  
অবের ওপর বিরক্ত কর্তে এগেছি, কিছু মনে ক'রো না,  
‘অমিরনা’—

অমির বলিলেন, না না, মনে কি করবে ? পরে  
এক মূহন দুখ বেখিয়া বলিলেন, এ'র পরিচয় ত'  
জানি না ?

বিলম্ব বলিল, শুভ নাম হরি ভট্টাচার্য । আপনাদের  
ওই পোষিকপুত্রেরই এ'র বাড়ী ।

অমির হাসিয়া বলিলেন

এখানেই থাকেন ?

আশঙ্কককে আর সে কথার উত্তর দিতে হইল না ।  
হরিটাকুহ বলিলেন, ইনি তোমাকে একটা কথা বলতে  
এসেছেন ।

অমির চরি ভট্টাচার্যের দিকে চাতিয়া বলিলেন,  
বলুন ।

হরি ভট্টাচার্য বলিলেন,

আমি বিশেষ ক'রে তিনি ।

অমির বলিয়া উঠিলেন,

একবারগাই বাড়ী ।

বিরক্ত হইয়া বিলাস বলিল,

গেয়ে না ।

আশঙ্কক পুনশ্চ কহিলেন, আপনাদের ভায়ে থাকে হুঁ  
ব'গে আপনাদের বাড়ীতে এনে রেখেছে, সে তার হুঁ নর,  
একটা বেজার মেয়ে ।

অমির দুখ এবং চোখ বতবুর লম্বব বিস্ফারিত করিয়া  
বলিলেন, তার হুঁ,—কি বলছেন ?

বিলম্ব আরও ভাল করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়া  
বলিল, রাফেলটা ত' বাইরে থেকেই পাশিতছে । ঘরে  
যিনি আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানুন । প্রত্যক্ষণ  
ক'রে আপনাদের হুঁ হুঁলোকটার হাতে যাওয়ান'র হতে



রাসেলটার নামে মোকদ্দমা আনতুম, শুধু তোমার সঙ্গে কিছু কথি না। বেশ ত' কি লজ্জার কথা—ছি, ছি।

অমির কিছুক্ষণের চমক শুক হইয়া গেলেন। তারপর তাঁহার অর, ওকলতা,—সব কুসিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া বাতির আদিত্তেই দেখিলেন, কুত্ৰী মাটির সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া এক কোণে বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্রোধে অমির ত্রস্তবৎ, অবধি অগিয়া উঠিল। যাহা বুঝে আসিল তাহাই বলিয়া বাতিতে লাগিলেন।

যেন পাথরের স্তম্ভকে বলা হইতেছে—কুত্ৰীর নিকট হইতে একটা ল্পক্ষনও আসিল না।

অমির বিশিষ্টের কথা মনে পড়িল। কুত্ৰীকে আশ্রিত এটমানেই চলিয়া যাবেন। তিনি বিশিষ্টকে দূরায় ফাড়া তর তর করিয়া খুঁজতে লাগিলেন।

বিশিষ্টকে কোণার পাওয়া গেল না। পুনরায় কুত্ৰীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, শিশুটির বাকী থেকে রেহিয়ার ছাড়া পাঁচ মিনিট সময় বিলম্ব, তারপরেও যদি ফের দেখতে পাই, তবে পুলিশ ডাকবো।

সারফ প্রমে তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। কোনরূপে লম্বার দিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

বহুটা ততক্ষণ ব্যস্তির করে দিয়া বসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর অমির মনে পড়িল, এট লম্বার উপরেই ওট মেয়েটা যে কতবার বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনে হইল এ সমস্তই সচচি হইয়া গিয়াছে। এতদিনের পুত্রীকৃত অপবিত্রতার মধ্যে বাপ কহিতে কহিতে তাঁহার দেহের প্রতি রক্তকণাটা পর্দায় বেল কলুহিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৃহত্তর চমকও তিনি আর এই লম্বার উপর থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গবে কুত্ৰীকে দেখিলেন। তাহার সর্পসর্পীর কমন নজিয়া উঠিতেছে,—খোঁষ হয় কাঁপিতেছে। পাঁচ মিনিট সময়,—ইহার পরে তিনি নিশ্চয়ই পুলিশ ডাকিবেন।

অমির অবস্থা দেখিয়া বহুটা বিশেষ কিছু আর কেও বলিলেন না। অল্পক্ষণ পরে এই অন্তত-বটনার ভক্ত ওৎপ্রকাশ করিয়া দুলে চলিয়া গেলেন।

অমির একা চিন্তাতারাত্তাৎ নব্বিক লটয়া শুইয়া রহিল।

বাকীটা যেন নীরবতার ভূমিমা গেল।

একটু একটু করিয়া লম্বা নামিল। কোণ চাইতে একটা চামটিকা নামিয়া দার হই অমির মাথার উপর দিয়া গুরিয়া জানালা বন্ধ বাহির হইয়া গেল। শাশের বাকী হইতে তিনবার লক্ষ্মন উঠিয়া অশ্লষ্ট কোলাহলে মিলাইয়া গেল।

অমির মনে লক্ষ্যচিন্তা ছুড়িয়া রহিল, কিন্তু বাতির হইবার একটা লম্বা পাইল না। শুধু গুরিয়া গুরিয়া জনহের মধ্যে এক বিরাট পূর্ণবর্ষের সৃষ্টি করিল। তুতা আলো আদিত্তে আসিলে তিনি বুঝ না কিরাইয়াই তাহাকে নিবেশ করিলেন।

ছোট অন্ধকারে ভবিয়া গেল। এট অন্ধকারের মধ্যে শুইয়া থাকিতে থাকিতে একসময়ে অমির লক্ষ্যমার এক অন্ততপূর্ণ লক্ষ্মন যাব বার কাঁপিয়া উঠিল। যে চিন্তা-কলো এতক্ষণ তাঁহার মাথার ছোট পাখাইছিল, হঠাৎ পেড়লো অতি শব্দ হইয়া অন্ধ-আকারে তাঁহার হুট-চোখ দিয়া করিয়া পড়িতে লাগিল।

তুতা জানিতে আসিল, রাগে তিনি কি আহার করিবেন। কোনরূপে আশ্বাসদায়ক করিয়া বলিলেন, কিছু না।

তুতা আর বিতীরা কথা কহিতে সাহস করিল না।

এমনি করিয়া কখন কোনদান দিয়া বটোখানেক কাটিয়া গেল। এক সময়ে অমির উঠিয়া বলিলেন। কুত্ৰী নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছে, তবু তাঁহার দেহাঙ্কুর মন বার বার বলিতে লাগিল, সে চাইতে পারে না,—এতবড় অপবাদ থাকে করিয়া সে নিঃশব্দে চলিয়া বাইবে, এ মেটেই বিবাহ নহে। কলসীর মধ্যে লম্বা বাস করিতে পারে না। কুত্ৰী কখনই অমন নহে। হয় ত' বিশিষ্টই দেখা, কুত্ৰীকে অকারণ জড়ানো হইয়াছে।

সহসা তাঁহার মন অসুতাপে ভরিয়া উঠিল। কিনা ব্যাপারটা জানিয়া লটকাছিল। বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি।  
 বিচারে এমন করিয়া কঠোর দণ্ড দিয়াছেন! সত্য নির্ণয়  
 করিবার জন্য তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। ভিতরে ভিতরে  
 গিয়া দেখিলেন, চাকরটা তাঁহার ঘরের সম্মুখে কুসিয়া  
 আছে। নিকটে গিয়া শুককণ্ঠে বলিলেন, চ'লে গেছে?  
 তুতা সবই শুনিয়াছিল। বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।  
 পুনরায় তিনি স্রগ করিলেন, অথন গেল?  
 তুতা বলিল, সন্ধ্যা বেলা। বাফা-বাবু পাড়ী এনে  
 বিড়কির ঘোর দিহে—  
 চতুর্থাৎ অমিত্রের মুখ দিয়া বাহির হইয়া  
 কি সত্যি?  
 তুতা বিলাস এবং হরি চট্টোপাধ্যায়ের নিওট আসল  
 ব্যাপারটা জানিয়া লটকাছিল। বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি।  
 কিন্তু বিদ্যাবির দোষ নেই, তেনার জন্মের পরে  
 তেনার মা—  
 সমস্ত কথা শুনিবার কত মর্ম্মের পাড়াইতে পারিলেন না।  
 অন্ততপক্ষে বাহিরের ঘরের করিয়া আশ্রিতা সত্যের উপর  
 হইয়া পড়িলেন। চিন্তা তাবনা কোনটাই তাঁহার মনে  
 আসিল না। হৃৎ-তবেত তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। কেবল  
 এক বিরাট শূন্যতা তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে ঘেরিয়া রাখিল।  
 সহসা তাঁহার দৃষ্টি শানের বাড়িতে পড়িল।  
 দেখিলেন, তেলি-এর উপর একটা লাল-পেড়ে সাদি  
 তথাহিঁতেছে, এবং গায়েলের অল্প আঁলে গিয়া তাঁহার উপর  
 পড়িয়াছে।

## মোনভঙ্গ

### ঐনবেন্দু বসু

যত কথা ছিল দু'কি আঁকে তুলে বার,  
 যা' কহু তোমারে প্রিয়া হই নি কো' বলা  
 এ ভাবন চ'ল শুধু দিনে পশ চলা,  
 প্রাণি এসেছিল কত, লয় আসে নাট।  
 বিধন বাসরে শুধু প'ড়ে আছে তাই  
 না-পর্যন্ত স্মৃতিভার ছিন্ন পূল ধলা,  
 উৎসব-মুখর প্রাতি গুরুদীপ-অলা,  
 বজ্রীর শেষে তার স্মৃতিটুকু পাই।  
 কথা নাই আছে বাফা, তারি রঙে আঁকা  
 অন্তরধারিনী মোর নবরূপে সাজে।  
 সেটুকু জানিলে তাই আঁকে তো বাঁজিল  
 মিলন পূলকঙ্কণ চরণে তোমার,  
 মৌন মাঝে না বলায় উপহাস ছিল,  
 \* জেগে সেল পরিস্রবে মুখের হিয়ার।

## তুর্ক সাধারণ-তত্ত্বে নারীর মুক্তি

আমিনোমোহন ঘোষ

এক প্রাচীনতম, তাহার উপর ইঙ্গল্যান্ডের কতক প্রভাবশালী। এই উদ্ভব কারণে তুর্ক-নারীর বন্ধনের অস্ত ছিল না। এই বন্ধনের ফলে যে ভগ্নাতি ঘটয়াছিল, তাহা যে একা নারীকেই ভোগ করিতে হইত তাহা নহে; পরন্তু সমস্ত নারী-সমাজেরে সমস্ত সমগ্র জাতিতেই তাহার ভাবন-প্রভাবের লবণ লবণ দাবা পাইতে হইতেছিল। উন্নতিকামী নব্য তুর্কী সম্ভার (Young Turk) এই সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়া নারী জাতির মুক্তিবাদনও তাহাদের কাগ্যতালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু তৎকালীন তুর্ক জনসাধারণের অন্ধতা ও স্বল্পবুদ্ধিতার নিকট নব্য তুর্কীর মৌলীবাদকে চার মানিতে হয়। মুলতান বিত্তীয় আকুল হামিদের বৈষম্যরূপে বাণে মানাইতে পারিলেও জন-সাধারণের কুসংস্কারকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষেই কল্যাণ নাই। এই কারণে সমস্ত কামাল পাশার মত একেত্র অসীমায়ণ ব্যক্তিব্যয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বীর-পুরুষের লোকতত্ত্বের ধ্যানসামুদ্র তুর্কী যে কেবল গ্রীক অন্ধতায় চইতে আবদ্ধকরা করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু সজীবিত্ব নব্যতার চইতে তাহার জাতীয় মন ও কর্মশক্তিকে মুক্তি দান করিয়াছে। এই মুক্তিবাদের উপায় হিসাবে নারী-জাতির মুক্তি সম্বন্ধে কথা উল্লেখযোগ্য।

### পরদা বা অবরোধ

তুর্ক নারীর সর্ববিধ চর্চণার মূলে ছিল পরদা বা অবরোধপ্রথা। এই কুপ্রথা সমস্ত বাহিরের লোকের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল না বলিলেই হয়।

অবস্থা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার তুর্ক নারীর একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। অসম্প্রীতি হোজা বা মোল্লার কথা সে অস্ত্রাক বলিয়া বিশ্বাস করিত; বোগব্যাধি

চইতে মুক্তি পাইবার সমস্ত মন্ত্র তন্ত্র ও মাদলী-তাবিখের পরম লইত, এবং জিন্দ, পরী, ডাইনী, পরতান ও অন্যান্য উপদেবতার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। বলা বাহুল্য এখন মাত্ৰ সত্যান হইয়া তুর্ক জাতির পক্ষে পুরোণের নিক্তমান জাতিদের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতার টিকিরা থাকা বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। কারণ এই সকল জাতি আদর্শ গণতন্ত্র পদ্ধতির প্রচাৰ করিয়াই তাহাদের নিক্তগৃহীত করিয়াছে এবং গণতন্ত্র পদ্ধতির মূলে রহিয়াছে সাহসিকতা ও মুক্তিবাদ। তুর্ক শিক্তরা যে এতদিন তাহাদের ন হইত নারী নিকট ইহার বিশদীকৃত শিক্ষাই পাইত। কাজেই তুর্কী-গণতন্ত্র পদ্ধতি উত্তার প্রচাৰ বাধা ছিল অত্যন্ত। এই সমস্ত কামাল পাশা একদা বলিয়াছিলেন “নারী যেখানে দাসের বহু এবং সমস্ত সমাজের নষ্টী যেখানে চারের মত কার্যকালীন ভাষা পছন্দ প্রাপ্ত, সেখানে গণতন্ত্র স্থাপন করা যায় কিভাবে?” মত্রে সৎকেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, “এই লবণ দিয়ে জিনিষ বাদ দিতেই হইবে। তুর্কী এক নিশ্চিন্ত গণতন্ত্র গড়িতে বাইতেছে। যেখানের অর্ধেক লোককে দাসেরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত গণতন্ত্র স্থাপন কিভাবে সম্ভবপর হইতে পারে? আচ্ছা হইতে চই বহুতের মধ্যে এতোক পুরুষ ‘ফেজের’ বসলে ‘ছাই’ পরিবে এবং এতোক নারী তাহার মুখ অনার্যত রাখিবে। নারীর লাবা বা একান্ত প্রয়োজন। যেখানের জাতি অংশ বহন করিতে হইলে নারীর পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন।” কামালের এই প্রতিজ্ঞা বাধ্য হইয়াছে। কামালকে বাদ দিলে তুর্ক নারী আচ্ছা এগিয়া অস্ত্র সস্ত্র দেশের নারী অপেক্ষা অধিক ও পাকাতা নারীর দমন স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুর্ক-নারীর অতীতের সহিত বর্তমানের তুলনা করিলেই এই স্বাধীনতার গুরুত্ব ভাল করিয়া বোঝা যাইবে।



## শৈশব ও শিক্ষা

জীবনের প্রথম এগার বার বছরই তুর্কী-নারীর পক্ষে একমাত্র আনন্দের সময় ছিল। এই সময়ই তাহাকে ঘোমটা পরিতে হইত না এবং অস্ত্রপুত্রের বাহিরে বেড়ান বা গিভা দ্বারা বাতীত অস্ত্র পুরুষের সঙ্গে কথা বলা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বিদ্যালিকার মত সে মল্লিন-দলগের ছেলেদের পাঠশালায় প্রেরিত হইত; ছেলেদের হইতে পৃথক ভাবে বসিলেও এক ঘরে এক

একজন বাটি তুর্কের বসিধিত গিয়াছে। \*

মল্লিনদের পাঠশালায় ছেলে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল লিখিতে ও পড়িতে শেখা, এবং অর্থ না বুঝিয়া কোম্পানের কতিপয় বচন হ্রস্বস্বকারে আবৃত্তি করা। 'কিন্দু উচারা' যে প্রাথমিক পুস্তক পড়িত তাহার মধ্যে তাহার চেয়ে নীতি উপদেশই বেশি থাকিত, যথা "আল্লাকে জানিয়া ওলা উচিত কারণ তিনি ভাল ছেলেকে ভাল বাসেন এবং মন্দ ছেলেকে ক্রমা করেন। আলি একটি সুবোধ ছেলে, সে এক গুচ্ছ



তুর্ক বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদের একত্র-শিক্ষা—একটি তুরিঃ ভ্রাম

শিক্ষকের নিকট শিক্ষাগ্রস্ত করিত, ছেলেদের মত চুটাইটি করিয়া খেলাধুলা করিত, এমন কি অশ্রাব্যের মত ছেলেদের মত কেবলপুও লাভ করিত। তবে এই কেবলপুওর একটু বিবেচনাই ছিল; ছেলেদের মত মেয়েদের পায়ে তাগুতে বেত মাথা হইত না। তাহাদিগকে বেত মাথা হইত না। তুর্ক বালক-বালিকার এক পাঠশালায় পড়িবার কথায় অনেকে আশ্চর্যগাভিত হইতে পারেন, কিম্ব এই তথ্য

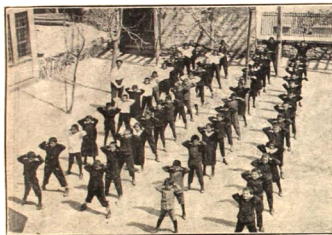
তসলোকেব লাতি কুড়ইয়া বিখ্য। একটি লক্ষণ পুরস্কার পাইয়াছিল। সেলমা একটি ভাল মেয়ে, সে ভাল খাবার পাইলে তাহার ছোট ভাইকে অর্ধেক দিয়া তবে খায়। গুহুখান হইত ছেলে, সে গুহুখানের (শিক্ষক) প্রতি মতন খাবার করিয়াছিল তাই গুহুখান তাকে ভাল বাসেন নাই।" ইত্যাদি।

\* The Diary of a Turk



প্রাথমিক পুস্তক সমাপ্ত হইলে কেবল মেয়েদের পড়ার কল্প পুস্তক পাঠ্য পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল। নিজ মাতার প্রতি কিম্বদন্তি ব্যবহার করিবে, স্বামীর প্রতি কিম্বদন্তি ব্যবহার করিবে এবং স্বপ্নের প্রতি কিম্বদন্তি ব্যবহার করিবে এই সকল সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে পবিত্রতার উপদেশ থাকিত। শান্তী অথবা ভাবী বশুদের পক্ষে একজন পুত্র মহামাত্র বাক্তি, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে স্বামীর উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত। নানাভাবে দেখান হইত যে স্বামী নামক পদার্থটিকে মানাইয়া চলা কেমন শক্ত। জানা গিয়াছে, এমন পুস্তক মেয়েদের পুত্র

নামক মেয়েদের পক্ষে লিখিতে দেখা নিবিষ্ট ছিল। সম্ভবত ইহা সত্য, যেহেতু দেবালয়ের ভূত্বক লিখিতে জামিনেতন না এমন অনেক প্রাকৃতিক জ্ঞানব্রহ্মণ করিয়া গিয়াছেন। অল্পে তাহাদের মন হইতে ভ্রমিতা লিখিতা বাইত। মেয়েদের পক্ষে লেখা নিষেধের এই কারণ দেওয়া হইত যে, নানাবিধ মন তর লিখিতা তাহারা তাবিজ, তুমার তৈরী করিবে ও ডাইনী চাইবে। আসল কারণ কিন্তু ছিল অন্য প্রকার; সমাজপন্থীদের ভয় ছিল যে লিখিতে লিখিলে পদ্যের ভিত্তিতে বহু ব্যক্তিগণ তাহারা অনাচারী পুস্তকের সঙ্গে



তুর্কী বালকবালিকাগণ একত্রে ছিল করিতেছে

আগ্রহের সাধিত পড়িত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি মেয়েদের পাঠ্যগ্রন্থে নির্দিষ্ট ভাষা উদ্ভূত যৌন-প্রসঙ্গের মতাপ্রসঙ্গ "গল্পী" নামক পুস্তকখানিতেও এই প্রেমের উপদেশ বহিষ্কার। • কাজেই তুর্কী এ বিষয়ে আমাদের মতই অজ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয়। সে পাঠ্যই হোক, অর্থাৎ তুর্কীর প্রাথমিক শিক্ষা ছিল পুস্তকোক্ত মতমত। কিন্তু ইহা যে বেশী জটিল সময়ের ইতিহাস তাহা মনে হয় না, কারণ শোনা যায় পূর্বে আগে

নাহ। তবে তাহাতে খিঁচবে তাহা বিলম্ব হইয়াছে। বাহা পাঠ বছরে চাইতে পারিত, তাহাতে লক্ষ্য বছর লাগিয়াছে। কামাল শাশুর দেশগ্রামে কিন্তু এমন দেবী মঞ্চ করিতে নারাজ, তাই তিনি নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সামান্য মাত্র আন্দোলনকেও কঠোর ভাবে বাধা বান করেন। একবার কোন কাগজের বাস্তবিক দেখান হইয়াছিল যে, নারী-স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ এক বেদুন আকাশে উড়িবার চেষ্টায় তারমোহনের কল্প 'নারী-বর্ষ' (Women's virtues) নামক পদার্থটিকে নীচে ফেলিয়া দিতেছে। এই বিচ্ছিন্নের ভক্ত কাগজের সম্পাদককে অভিযুক্ত করা হইলে আশ্চর্য

দমবনের মত সম্পাদক বলিলেন যে, তাবটি তিনি অপর কাগজ হইতে গঠিয়াছেন এবং উগাতে শুধু তুর্ক নারীকে নয় পরম্ভ সমস্ত নারীকে দক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সম্পাদক মহাপুরুষ কারাগারে হাটতে হইল। সংবাদপত্রের সম্বন্ধেই প্রতি একদল কট্টরতা অধিক গণতন্ত্রের অগ্রদূত নহে, তবে এখন তুর্ক নারীর অস্তিত্ব গণ ও ভারী মঙ্গলের কথা মনে করা বার তখন এই বাতীকমকে কমা না করিয়া পরা দার না।

বর্তমান তুর্কীতে নারীকে

শুধু যে শিক্ষার অবাধ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়, পরম্ভ শিক্ষার পদ্ধতিও অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। তুর্কীয়া আর মসজিদ-লংকুই মোসাব উপর তেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার দিতে রাজী নহে। উপসকলপাক মেয়ে-শিক্ষক হৈতী করিবার মত স্থানে মেয়েদের নর্শাল স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে বহু নবীন তুর্ক-নারী জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রস্তুত হইতেছেন। বর্তমান ছেলে মেয়েদের যে সকল

বিভাগের আছে তাহাতে শিক্ষার বিষয়েও উন্নতিবিধান হইয়াছে। ইতিহাস শিক্ষার উপর মোব দেওয়া হইতেছে। এই ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়াই নবা তুর্কীর বালক বালিকা-পদকে একদিকে জাতীয়তাবাদ (nationalist) অপর দিকে বিশ্বাত্মবাদ (internationalist) বা উদার করিবার চেষ্টা হইতেছে। আরবী ও পারস্যী পড়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎপরিবর্তে ছেলেমেয়েদের অল্পকাল 'ও পর্ষদেবালের ক্ষমতাসুচি'র চেষ্টা হইতেছে। অপরীক্ষণীয় বয়স বাবদারের অভ্যাস করিয়া তাহার অগতঃ নতুন ভাবে দেখিতে পাঠিতেছে। অঙ্কন (Drawing)

অভ্যাস করিবে। তাহার প্রয়োজনীয় চর্চার এক নতুন আনন্দলাভ করিতেছে।

যে প্রাণীতে আগে শিক্ষাদান হইত তাহারও পরিবর্তন হইয়াছে। মোসাব-শিক্ষকের নীতি ছিল, 'Spare-the-rod-Spoil-the-child'। দেশের স্বকমিতার লোকেরাও অবশ্য ইগাতে বিকাশ করিতেন। তুর্কী প্রবাদ বাক্য আছে 'বেত্র বর্গের বান' অর্থাৎ বেত্রাঘাতের ফলে উজ্জ্বল লোক দিষ্ট হয়। পুণেই উল্লেখ করা



এই প্রাথমিক বিভাগের পরেই অগ্রগণ্য আহার করিতেছে

হইয়াছে যে, এই নিষ্ঠা অবলম্বন করাটোবার মত মোসাব-শিক্ষক মেয়েদেরও বেত্রাঘাত করিত কষ্ট করিতেন না। কিন্তু তুর্কীর রাষ্ট্রনাযক কামাল শাহ এত বকরোচিত শিক্ষা-প্রাণীতে বিরোধী। তাহার আদেশে পাহারিত লগ শিক্ষাবিতাপ হইতে নিস্কাসিত হইয়াছে। শিক্ষকেরা বর্তমানের ছেলেমেয়েদের মনের ক্ষমতা বুঝিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে শিক্ষাবীরা শিক্ষকের প্রতি অধিকতর অগ্রদূত হইতেছে। ইগা ছাড়া মেয়েদের শিক্ষায় বিনোদ বাবদ। এই যে, জাতীয়-শিক্ষার পট ও কক্ষম করিবার দিকেও মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। মেয়ে-



শিক্ষক তৈরী করার জন্য নর্থাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে সুইডিস্ স্কুল শিখাইবার বাল্যাবস্থা আছে। একজন সুইডিস্ মহিলা প্রথম দল স্কুল নারীকে (সংখ্যার ত্রিশ) নরমানেদের মধ্যে সুইডিস্ স্কুলের সমস্ত কোর্স শিখাইয়া দিয়াছেন। এই বাল্যাবস্থা হইতেই বোকা বার যে, স্কুল-নারী ক্রিপল মাদ্রাসসমূহকারে পরীক্ষার্তব্য মনোযোগ দিয়াছে। উক্ত ক্রিপট নারী স্কুলীকৃত বস্তুর স্থানের ফুলে ছোট ফেলে-মোড়ানের ব্যায়াম-শিক্ষারীকরণে কাব্য করিবেন। বলা বাহুল্য ছোটমোড়কা ছোটমোড়কের সঙ্গে বলিয়া যেমন পরীক্ষাভাগ করে তেমন তাহাদের সঙ্গে একত্রে গীতাইয়া স্কুল বাগ্মানাদি রচনা করে। কে না বলিবে বর্তমানের তুর্ক-বালিকা প্রায়ের সন্ধ্যালের দিবিমারদের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবন্ত নয়?

### যৌবনকাল ও পরম্ভা

দশ এগার বছর শেষ হইতে না চইতেই তুর্ক-নারীর জীবনে এক মধ্য পরিবর্তন আসিত। যা তাহার দিকে প্রত্যাহা চাষিতেন মেয়ে যে বহু-সুখ হইয়া উঠিল ইহাকে 'সারশক' পরাইতে হইবে। এই চিত্রা কিয়ৎপক্ষে আশাব্যবস্থার সন্ধানের বিবাহের চিন্তার সঙ্গে তুলনা। 'সারশক' একটি প্রথম শতাব্দী জামার নাম; উহা পরিধান করিলে মাথার চুল হইতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সমস্ত ঢাকা পড়িত। বলা বাহুল্য এই অসুখ পোষাকের খোলেতে নারীর বাতাবিক ভাবে চলারক্ষার ব্যাঘাত ঘটিত; কিন্তু কেবল ইহাতেও রক্ষা ছিল না। মাথার উপর হইতে পৃথক উপর একখণ্ড বস্ত্র বুলাইয়া অবলম্বন রচনা করা হইত। এই অবলম্বন পত্রায় সঙ্গে সঙ্গে তুর্ক-নারীর সঙ্গে সমস্ত রসম মনোভাবের হইয়া থাকিত। তখন হইতে বৈদ্যর ভাগ সমস্ত তাহাকে হারবের মধ্যেই কাটাইতে হইত, অথচ তাহার চেয়ে দুই এক বছরের ছোট তসিনীয়া তখন আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বাহিরে বেড়াইতেন। তাহাদের সমস্তে তাহার কি ঈর্ষাই না হইত! কিন্তু অতীতের তুর্ক-নারী এতদমতই সুখ বুলিয়া লভ করিয়াছে। বর্তমান কালে এ

বিষয় দিরা তুর্ক-নারীর মনে বিশেষ গতিপ্রাপ্তি; শুধু তুর্ক-নারী নয়, পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশের মূল্যমান নারীর মনেই আত্ম-এবিক বিরাগ মধ্য বিশেষ গতিপ্রাপ্তি পাইয়াছে। সে আর তাহার পুরুষের জায় বহু থাকিতে চাহিত। (১) আশা করা যায় আচিরে এসকল দেশের নারী তাহার স্বার্থ স্ববিচার প্রাপ্ত হইবে। যে আব্রাহামের মধ্যে পরমা স্থায়ী হইতে পারিত, নারীর মনোভাবও নানা ঐতিহাসিক কাহিনী আত্ম সেই আব্রাহাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় পরম্ভা-প্রথার উদ্দেশ্য নাকি কোরানের কোথাও নাই। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের সময়ে বর্তমান কালের মূল্যমানদের চেয়ে বেশী নারী-স্বাধীনতা ছিল। এবং তাহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত মহম্মদের সময়ে আরব-নারীরা সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিত এবং পানি গাছিয়া সৈনিকদের উৎসাহিত করিত ও আহতদের সেবা তত্ত্বা করিত। (২) অবলম্বন-প্রথা আদিত আরবদের মধ্যে ছিল না। তবে আরবদের চরিত্রের বুদ্ধিগত ভ্রম মহম্মদ উপদেশ দিয়াছিলেন (আইন করেন নাই) যে, বিবাহিতা নারীর সঙ্গে মূল ও বেশ মাত্রত করা উচিত। কারণ স্তন্য ও স্তন্যের স্বেচ্ছামতই নাকি বিশেষভাবে আরবদের মনোভাবের কল্পিত। ইহা যদি সত্য হয় তবে বর্তমান দিনের ববু (bobbed) ও শিংলড (shingled) চুল দেখিয়া মহম্মদ খুশী হইতেন নিশ্চয়। সে যাহাই হোক, মহম্মদ সকল নারীকেই অবলম্বন ব্যবহার করিতে বলেন নাই; কেবল বিবাহিতা নারীকেই তিনি সুখ মাত্রত করিতে বলিয়াছিলেন। পোনা বাঘ, তিনি যখন ধোপেধোপ দিতেন, তখন পুরুষ ও নারী একত্রে বসিত। তাহার উপদেশ শ্রবণ করিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে অবলম্বন-প্রথা তুর্কীতে বহুদূর পর্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল তাহার কারণ বাইজান্টিয়ান প্রভাব। (৩)

(১) Grace Kilian—Turkey Today

p. 169.

(২) The Diary of a Turk, p. 51.

(৩) Turkey Today p. 130.

বাহুবল বাইকান্দিরান্ গ্রীকগণকে পরাজিত করিলেও ঐতিহাসিক নিয়মে সভ্যতাসম্পদে চৌনতর তুর্কী হুমত গ্রীকদের অগ্রকরণ করিয়া আত্মপ্রদান লাভ করিয়াছিল। এইরূপ অগ্রকরণ প্রার্থী অন্ধ অন্ধকরণে পর্যাবসিত হয়; তাহার ফলে আত্মবিক্ত ওপভূমি আরস্ত না চাইয়া বাক দেশগুলিই সহজে অভ্যস্ত চাইয়া আসে। গ্রীকদের শিল্প সাহিত্য দর্শন আরস্ত না করিয়া তুর্কী আগে কাকেই তাৎপরের ফেজ (Fazl) ও অবজুঠন (অবজুঠন); হারেম ইত্যাদি পুর আশ্রয়ের সচিৎ গ্রহণ করিল। (১) পাক্কাভা শিক্ষা এখানে প্রথম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক যে ছাউকেস্টে পরিণত ও দেশ-ভাষাকে চূড়ান্ত করিতে মুক্ করিয়াছিল তাহারও কারণ—সব্ব অন্ধকরণের চেষ্টা।

পরদা-প্রথার মতই অগণকণে তুর্কীনারকে মসজিদের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত করিতে হইত। কেবল অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উদার মতাবলম্বী পরিবারের মেয়েরা অল্পপুত্র থাকিয়াও ইংরেজ, জার্মান বা ফরাসী গবর্নর বা শিক্ষাবিদ্রায় নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তের সুযোগ পাইতেন। বর্তমান তুর্কীতে দ্বাদশিকার আর অতিসুদৃঢ় সম্ভাব্যবিশেষের একচেটিয়া নহে। কনষ্টান্টিনোপলে মেয়ে-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে ও অনেক নবীন নারী উচ্চাভিলাষে শিক্ষাপ্রাপ্ত করিতেছেন।

### বিবাহিত জীবন

‘সারলক্ষ’ পরিধানের সময় হইতেই তুর্ক-কস্তাকে বিবাহ-যোগ্য মনে করা হইত। বর্তমানে সে পাঠশালার পড়িত তরুণী বিবাহ দৃষ্টে তাহার কোন ভাবনা ছিল না, তবে তাহার পিতামাতা যে এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন তাহা নয়; তাহারা ধোম করিতেন কোন উপযুক্ত বয়স পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু মেয়ে পাঠশালা ছাড়িলে এবং ‘সারলক্ষ’ পরিধান করিলে

তাঁহাদের ‘কস্তানার’ রীতিমত আরস্ত হইত। অল্প কোন ভাল কালের অভাবে এবং আগে পানের যে সকল কপা-বাঁটা চলিত তাহার প্রভাবে মেয়েও নিজ কস্তানার বিবাহ ও প্রেমের কথা ভাবিতে মুক্ করিত এবং বাধ্যভাবে অপেক্ষা করিত তবে তাহার প্রণয়ের বস্তু লক্ষ্য হইত। অপেক্ষাকৃত অপরিত বয়সে এরূপ ভাবপ্রবণতার অহুসীন করিতে শিষ্টই তাহার মধ্যেই এক অকালপকতা আসিয়া উপস্থিত হইত। এরূপ অস্বাভাবিক পকতা যে স্বাভাবিক নয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমাদের দেশেও অনেক স্থানে এরূপ শোভনীয় অবস্থা লক্ষিত হয়। বালিকারা যৌবনপ্রাপ্ত না হইতেই মনের দিকে তাতাবিগত প্রবীণা করিয়া দেওয়া হয়। যে বয়সে তাহাদের পুতুল খেলা করিবার কণা, সে বয়সে তাহারা লগ্নের পাতাইবার পদ্য দেখিতে আরস্ত করে।

বিবাহের আগে তুর্ক-নারীর গায়ে ডাবা স্বামীকে দেয়া সম্ভবপর ছিল না। মাভালিভা ও ঘটকের দ্বারা উপবর্ত তাহাকে নির্ভর করিতে হইত। তাহার ফলে স্বর্গ বা পর-মর্যাদাপ্রাপ্ত লোকদের কস্তানগণকে প্রায়ই চূড় স্বামীর চক্ষে পড়িতে হইত। বর ও কস্তার বয়সের প্রভেদ কোন কোন স্থলে ছিল চলিত এমন কি পক্ষাণ বয়সেরও প্রিয় প্রোক্ত। অল্প পাক্কাভা দেশেও অল্পবয়সী নারীর সচিৎ বৃদ্ধের বিবাহ হয় না এমন নহে, কিন্তু তাহার সহিত তুর্কীর এই জাতীয় বিবাহের প্রভেদ ছিল। এ প্রসঙ্গে কোন ইংরেজ-মহিলা লিখিতেছেন, “আমাদের দেশে কোন শিশু বৃদ্ধের মেয়ে বধন পটাস্তর বৃদ্ধের বৃদ্ধকে বিবাহ করে, তখন আমরা সেই মেয়েকে হিসাবী সোলের দলে ফেলি; কারণ পঞ্চমবর্ষীয়া বা অর্ধের লোভেই সে ইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু তুর্কীতে বধন বাট বৃদ্ধের বৃদ্ধকে একটি তের কি চৌদ্দ বৃদ্ধের মেয়ে বিবাহ করিতে দেখি তখন ঐ হতভাগিনী মেয়েটির জন্য দুঃখ হয় এবং ইচ্ছা হয় তাহার দেহ ও মনটি কলুষিত করার আগে ঐ বৃদ্ধটিকে গলা চাপিয়া মারিয়া ফেলি।” (২) সৌভাগ্য বশতঃ তুর্ক-সমাজ-মণ্ডলীয়তার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ভয়ঙ্কর বিবাহ সম্ভাবনার উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মেয়েরা এখন নিজ নিজ পছন্দমত স্বামী-

(১) Turkey Today P. 132, and H. Halid Diary of a Turk London 1903, P. 51.

(২) Turkey Today Pp. 147-148.



জিলাভূমি করে এবং এই বাণিজ্যে তাহার যে গুচ্ছের প্রতি কোন লক্ষ্যভেদ দেখান না, তাহা বোধ করি বাণিজ্যেও তুলে।

### সম্পত্তী-কটক

গুচ্ছ নামীকে বিবাহ করা ছাড়াও তুর্ক-নারীর মাঝে আর এক বিশেষের সম্ভাবনা ছিল। উহা স্বামীর একাধিক বিবাহ। এই বহুবিবাহের প্রথা আরব দেশ ও ইসলামধর্ম হইতে তুর্কদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মে কোন বহুবিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের মধ্যে বাড়তি মেয়েদের (surplus girls) সংখ্যা কমারবার জন্য সম্মান্য/অধিকাংশ শিল্পকৃত্যকে মাটিতে পুড়িয়া ফেলিত। বহুবিবাহ প্রবর্তনের ফলে এই বলের প্রচার লোপ হইয়া যায়। ইসলাম-প্রতিষ্ঠার পরে বিধবাদের প্রতিও সুখে বসন বহু আরব নিরস্ত হইয়াছিল তখনও একবার আরব-প্রদেশের সাংখ্যিক-খটয়াছিল। মহম্মদের পরেও বর্তমান যুরোপ নারীর সংখ্যা বেশী থাকিয়াছে। মহম্মদ এইরূপ সাংখ্যগুচ্ছ সমস্যার সমাধানের জন্য বহুবিবাহকে আইন সঙ্গত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণেই লোকের এই ঐতিহাসিক কারণ ভুলিয়া ইহাকে একটি অর্থবিশ্বস্তার নিয়মের মত চাওয়া তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিল। কিন্তু অর্থ-নৈতিক কারণে ধর্ম-লোকেরাই এই সুবিধা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিত। যেহেতু কোরাণের বিধান অনুসারে চারিটি স্ত্রী গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক পুরুষের আছে, কেই, কিন্তু তৎপক্ষে লব্ধ এই বাড়তিও প্রতিবাদে যে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতিটি সমান ব্যবহার করিতে হইবে; এক জনকে কোন উপহার দিলে অন্য জনকেও গ্রীক তার অনুসরণ উপহার দিতে হইবে। লোকের চাঁদনবাহার অধিক বসন খাটো ছিল, বসন স্ত্রীলোকদের প্রসাধনের ও অজ্ঞাত প্রয়োজনের মধ্যে উপকরণ-বাড়িয়া উপস্থিত হয় নাই, তখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা পুরুষের পক্ষে তত কষ্টকর বাণিজ্য ছিল না, কিন্তু বর্তমান

সভ্যতার দিনে অর্থনৈতিক কারণেও বহুবিবাহ আর সম্ভবসাধ্য নহে। (১) অবশ্য সমাজের ভ্রমকল্পেই লোকের পক্ষে বহুবিবাহের এই বাধ্য নাই। বরং একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের নিত চাষবাসের কাজে সাহায্য হয়। এই কারণে তুর্ক-চাষাবাসদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল। সম্মানিত লক্ষ্যবাহের আর লক্ষ্যেই একপত্রীক। তাহার উপরেও প্রেরিত এই বহুবিবাহের পাশে যেই একমে পাশ। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বাহারা ধর্মী ও সম্মানিত বহুর কল্পা বিবাহ করিত, তাহাদের প্রত্যাপনাদী আত্মীয়দের জুয়ে বিস্তার আর বিবাহ করা সম্ভবপর হইত না।

এই বহুবিবাহ মধ্য হইলেও উভয় যে কোন ভাল বিক-কেবাবেই নাই তাহা নহে। এমনই তুর্ক-পুরুষদের কেত কেত বহুবিবাহের শাস্কাতা সমালোচকদের আক্রমণের উত্তরে বলিয়াছেন, “যুরোপে কি এমন অনেক ব্যক্তি নাই বাহাদের গুণে বিবাহিত পত্নী থাকে সন্তোষ অস্ত্র একাধিক উপপত্নী রাখিয়াছে? উহা মুসলমান-প্রাচীর বহুবিবাহ অগণক: প্রচাপ; কারণ এক ক্ষেত্রে একাধিক জীবনসংক্রিয় লক্ষ্যেরই আইনসঙ্গত অধিকার আছে; বিবাহের সম্মান সম্মতি বৈধভাবে ভাত পুত্র-কল্পা বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যুরোপের স্বাধীন-সংযোগ (Union libre) ভাত সম্মানো উত্তরাধিকার-বিকৃত সম্মান প্রেরী বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাদের মাতৃগণ যে কোন সময়ে পণিকারিত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে পারে।” (২) এত কথাই কিছু লভা থাকিলেও বহুবিবাহকে সমর্থন করা যায় না। বহুবিবাহ দ্বারা যে মানিতা ও পাপ প্রসঙ্গ পাঠ, তাহা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৈবত্ব গুণে। গুণের পাঠি উহাতে কখনো অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। জটনক হুজুগেই তুর্ক-বহিলা (বাহার পিতার একাধিক পত্নী ছিল) পুরোঁক বৃত্তি বসন করিয়া গেলিতেছেন, “নারী তাহার স্বামীর গুণ প্রেমের জন্য যে মানসিক কষ্ট ভোগ করে তাহা কল্পের হইতে পারে, কিন্তু দপ্তর বসন আনিয়া

(১) এ দেশের কিছু সমাজে যে বহুবিবাহ ছিল অর্থনৈতিক কারণে ভাত আর লোপ পাইয়াছে।

(২) The Diary of a Turk I, 46.

পরে প্রবেশ করে এবং নারীকে তাহার অর্ধেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তখন সেই নারী প্রকৃত্ত ভাবে 'নারী' প্রকৃতিভূক্ত হয়, কারণ তখন চাইতে সে অন্য লোকদের কোতূহল ও অতৃপ্ত্যের পাত্র।...খিপট্রকের স্ত্রী ও উপপছিতে আসক নারীর স্ত্রী এই উভয়ের ভাবী ও বর্তমান ক্রমের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রদীপ্ত ও পরিমাণগত। পুঙ্খবীরা ক্রম বহুব্রব্যাপক, কারণ তাহার স্থান লক্ষিত, তত্যানি ও বহুবর্ণ পর্যন্ত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্ভাবনার সহিত বাতাবিক বিস্তারণ শোষণ করে। তাহার ফলে গুচ এক বীর্ষকালস্বারা অপাঙ্কির আগার হইয়া উঠে।" (১)

বর্তমান তুর্কীতে এই অনিষ্টকর বহুবিবাহের প্রথা আইনের সাহায্যে সুদৃঢ় হইয়াছে। বহুপত্নী ও উপপত্নী-পরিভূত মূলতানকে অশেষ প্রাধিকার এই বহুবিবাহ ও তন্ত্রপ সম্ভ্রান্ত সামাজিক ক্রীতি দ্বারা দান করা হয় না বলিয়া তুর্কী তাহার বলিকা-পনের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। যে সকল দেশের স্ত্রীজাতি এখনো বহু অধিকার কিরিয়া পায় নাই, তুর্কীর এই বিপ্লব সেই সকল দেশের নেতৃগণের প্রাধিকারের বিষয় হওয়া উচিত।

### বিবাহচ্ছেদ

তুর্ক-বিবাহে দয়াক্ষেপ্য মারাত্মক যোগ এই ছিল যে, চোতে স্ত্রী ও পুরুষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৃত্তিতে দেখা চর্চিত। অর্থাৎ কেবল পুরুষকেই মাতৃব আদ্য নারীকে কোন ব্যবহাণা বস্ত্র দানিল মনে করা হইত। এই ব্যবহার বলবতী চর্চাই বিবাহের সময় তুর্কীতে নববিবাহিতা বধূকে তন্ত্র লোভের ভায়ের দ্বারা চিলিত (branded) করা হইত। (২) বিবাহচ্ছেদ লক্ষ্যে যে আইন প্রচলিত ছিল তাহাও এই চৌন দয়াক্ষেপের ফল। "আমি তোমাকে তালুক দিলাম" এই কথাটি কেবল তিনি ব্যাধ বলিলেই তুর্ক-পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাহ লক্ষ্য ছেদ করিতে পারিত। অবশ্য

পারিতোক্তা দ্বায়ে কিছু অর্থ দান করিতে হইত, কিন্তু সে অর্থ সামান্য। প্রায় ১০০। এরূপ ভাণ্ডাচোরা মনো নিবেদন করত কারণ এই যে, তালুকি বৃত্তিতে যে সময় সময়কারে সময়কটীর মধ্যে সে যেন পুনর্বিবেচনার সময় পায় ও নিজ কথা কিরাইরা নিতে পারে। অবশ্য পরিভাগ্য, নিদ্রাবাবতার ও ভরণপোষণের অভাব ইত্যাদি ক্ষতের কারণে নারীও তাহার স্বামীকে ভাগ করিতে পারিত, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এবং নারীর সম্ভ্রান্ত অধিকারের বেলায় নারীর অধিকার প্রায় পুঙ্খপতই ছিল। তুর্ক-আইন অনুসারে নারীর নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে স্বাধিকার ছিল; এই সম্পত্তির ফল সে নিজ স্বামী বা অন্য কাহারও বিচ্ছেদে মাফল্য আনিতে পারিত। অবশ্য তাহার স্বামীকে না তড়াইয়া লোকে তাহার বিচ্ছেদে মাফল্য আনিতে পারিত। কিন্তু সম্ভ্রান্তেও গুরুত্বপূর্ণ মাতার অধিকার ছিল। মাতার অস্ত্র নিকটতম মাতৃবৃদ্ধ দিদিমা, মাদী অথবা 'জো' ভগিনী এই ত্রয়্য বেৎনের অধিকার পাইতেন। কিন্তু কালাকালে এই সকল অধিকার আইনের পুঙ্খকট পাকিয়া বর্জিত, প্রায় অত্যাচার করিতে উচ্ছ্বাস করিলে, পুরুষতন্ত্রমে পুরুষের দ্বায়েও গুরুতর নারী তাহার উচ্ছ্বার বিচ্ছেদে গড়াইবার কোন চেষ্টা করিতে পারিত না। বহু জাতি বিবাহচ্ছেদ ছিল তাহার ভরণ। আইনমতে উপপত্ন কারণে বিবাহ ছিন্ন করা বিশেষ শক্ত ছিল না, কিন্তু বিবাহ ছিন্ন করিয়া গড়াইবার কাঙ্ক্ষা না থাকিলে কোন নারীই তাপে অঙ্গার হইত না। কারণ অল্পস্ব স্বাধীনতার শিক্ষা না শওগাতে তুর্ক-নারী একাকী বাল করিতে একান্ত অনভ্যস্ত ছিল; কাজেই যদি শিক্তবৃত্তে অঙ্গার প্রাণের সুবিধা, অথবা কোন ঘিড়ীর ব্যক্তি তাহাকে পত্নীকিরাণে গ্রহণ করবে এই ভয় তাহার না থাকিত, তবে বিবাহচ্ছেদ ছিন্ন করিলে তাহার বিশেষ ব্যক্তিগত বহিঃ। এই সকল কারণে তুর্ক-নারী সুখ সুবিধা স্বামীর দখল অত্যাচারে মগ্ন করিতে লক্ষ্য চর্চিত। কিন্তু তুর্কী বর্তমানে হুইম গিডিল কোড গ্রহণ করিয়া সিলিল-বিবাহ শব্দকর্তন দ্বারা যে কেবল পুরুষের পত্নবিবাহ রহিত করিয়াছে তাহা নক, পরন্তু বিবাহচ্ছেদব্যাপারে

(১) Turkey Today P. 163

(২) Behind Turkish Customs P. 50.



শুক্ল ও মার্কটকে সমান অধিকার দিবার্থে। বিবাহজন্মে প্রজ্ঞা কবিলে উভ্যেই ত্রিমাস অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রায় পর উপদ্রুত আলোতে বিবাহজন্মের মায়াসা হইবে। শিশু ও শাখিনতার প্রদার বটীবাহুে বলিয়া মাগেদার দিনের আইনসমূহ অধিকারের ভার এ সব অধিকার লোভে পুঁথিত নহে। তুর্কী সাধারণতঃ পুরুষের নিকট যে নারীর স্ববাণী বাড়িয়াছে তাহা এলাই বাকুল।

### নারীর কর্মক্ষেত্র—অতীতে

পরাগত কলে গারমের চতুঃপীঠের মধ্যে আবহ তুর্ক-নারীর কর্মক্ষেত্র অতীতে খুবই সীমিত ছিল। স্বরাজ্যের কাক বা চাষাবান, গদাধন, বামীর মনোরঞ্জন, সপ্তাচারিণী তঃঃর সহিত কলহ বিবাহ ইত্যাদি করিয়াই তাহার সময়ের বেশির ভাগ কাটিত। তাহার পরও খেটুই সময় উদ্ভূত থাকিত তাহা সূত্রে কাম করিয়া মলমলভাবে বলিয়া বা দুশশনি করিয়াই যার করিত। তুর্ক-মেয়েদের মধ্যে দুশশনি খুব প্রচলিত; তাহাদের প্রায় সকলেই ব্রহ্মবাদিনী-দের মত সিগারেট পাকাইতে পারে। সিগারেট আলোহিতেও তাহার বেশ নিম্নতম। অস্ত্রপুংর অস্ত্রাগত নারীসমাজে হইলে কাকি শানের অস্ত্র তাহাকে সিগারেট দেওয়া হয়। ঐ দুশশানের ব্যাপারে তুর্ক-নারী সূত্রোপীঠ নারীর প্রায় সমকক্ষ। বহু কোন বিশেষ কাজ ন: পাকার তুর্ক-নারী অনেক পেশী সিগারেটই ধর করে।

তুর্ক-নারী যে কখনো কখনো তাহার আপাদমস্তক বস্ত্রভূত ঘেতে বাহিরে বেড়াইতে বাহিত না তাহা নয়। তুর্কবার দিন ছিল তুর্কীর সাম্প্রদায়িক বিদ্ভাষের দিন। ঐ দিনে বড় বড় সমুদ্রের মেয়েদের অনেকে শাখীর সহিত বেড়াইতে বাহিত হইতেন। অনেক বা স্ত্রী সন্ধ্যা পট্টাও বাহিরে আসিতেন। এ বিষয়ে যে তুর্কী আমাদের দেশের লোকদের চেয়ে অগ্রসর ছিল তাহা বেশ হয় না বলিলেও চলে। কিন্তু তুর্কীপোর বিধর পুক খোদাটা চোখের উপর পাকার তুর্ক-মেয়েরা কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে

পারিতেন না। তাহাতে বাহির দেওয়া প্রধান উদ্দেশ্যই বার্ষ হইত।

পরিচিত ব্যক্তির অস্ত্রপুংর বাগা আদা করাও তুর্ক-নারীর একটি কাজ ছিল। ঐ সময়ে কপিযান, সিগারেট বাগা ও কথাবারীর অনেক সময় কাটিত, কিন্তু তুর্ক-নারীর সব চেয়ে অনেক উপভোগের ব্যাপার ছিল বিবাহ-উৎসব। তুর্ক-নারীর অস্ত্র এক বিশেষ আনন্দ ছিল জান-পালায় গমন। টাকিশ বাথ (Turkish Bath) কথটির সহিত আমরা অনেকই পরিচিত, কিন্তু উহার মূল অর্থ বোধ হয় বেশী লোকের জানা নাই। কনষ্টান্টিনোপলে অনেক-গুলি বাথ- (Bath) বা জানপালা আছে। হলুদ চুড়া (dome) দেখিলেই সেগুলিকে চেনা যায়। গুলি প্রায়ই পাথরে তৈরী। ভাতের দিকে ছাড়া উঠানে কোন জানপালা থাকে না। তাহাতেই বেশ আলো হয়। চার পাঁচটি চুড়াযুক্ত কক্ষ একত্র মিলিত। লক্ষ্যবোধ করতইতে সন্ধ্যাপেক্ষা উজ্জ্বল ও তাহার পরে অলপকালত অল্প উজ্জ্বল ও সব চেয়ে বাহিরের প্রকোষ্ঠে স্ত্রীও মল রাখা হইয়া থাকে। এখানে আসে শালের মেয়েরা একত্র হয়, মান করে, গদা মার্কন করে, কেশসংস্কার করে। কাকি বাগা, দুশশনি, গদাওব পরচর্চা ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় না।

### নারীর কর্মক্ষেত্র—বর্তমানে

তুর্ক-নারী আজ গদা-বহন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। অতীতে কোন তুর্ক-নারী বিদেশ যাত্রা করিলে একটা মহা সোর গোল পড়িয়া বাহিত। কারণ পরদার আবহ থাকিয়া যখনে গমন করিলে গদা পদেই প্রায় জড়িত-নাগের ভর ছিল। তাই কোন তুর্ক-নারীকেই বিদেশে বাহিতে উৎসাহ দেওয়া হইত না। কিন্তু বর্তমান সাধারণতঃের অধীনে তুর্ক-নারী এই বিষয়ে এক মহা পরিবর্তন আনিয়াছে। গদায়া গদীর কর্মে—অর্থাৎ রাষ্ট্রপুং, কনসুল ঐতিহ্য ইত্যাদি বাহিতেছেন তাঁহারা নিম্ন নিম্ন গ্রীকে গদা লইয়া বাহিতেছেন। ইহাদের মধ্যে মাদাম ফেরিৎ বে ও মাদাম ফেরিৎ বে'র নাম বিশেষ



ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি মহিলাই নাম তুর্কীর অধিকাংশ নারীভাষ্যের অস্তিত্বের সাহচর্য। উপস্থিত মালাম ফেরিড তাঁহার বামীর সচিত লণ্ডনে, আর মালাম ফেরিড তাঁহার বামীর সচিত প্যারিসে আছেন। বলা বাহুল্য উভয়েই তুর্কনারী লক্ষ্যে পাশ্চাত্য জগতের দায়পাক বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল বিদেশে নহে, দেশে থাকিয়াও আধুনিক তুর্ক-নারী বিবিধ কথ্যে লিপ্ত হইয়া দেশের উন্নতিসাধন করিতেছেন। এই সকলের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কর্মই নব্বোত্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বহু তুর্ক-নারী শিক্ষিতা কার্যে অগ্রণীকৃত করিতেছেন। অনেক বিদ্যালয় পরিদর্শনের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেবল মেয়ে-বিদ্যালয় নয়, ছেলেদের বিদ্যালয়ও তাঁহারা পরিদর্শন করেন।

কেবল শিক্ষার নহে, জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও নারীর সহযোগিতা বিশেষভাবে দেখা যাউতেছে। বলা বাহুল্য এই কারণে নারীর স্বাধীনতার উন্নতি অসম্ভব হইয়াছে। তুর্কীতে যে ভাল জাকারের সংখ্যা কম ছিল তাহা নয়। কিন্তু প্রাচীন কায়দা-কায়দা অনুসারে মেয়ে-রোষীকে পুরুষ ডাকারেই দেখা নিষিদ্ধ ছিল। মেয়ে-ডাকারের সংখ্যা অবশ্য পূর্ব বেশী ছিল না। আজ কাল অনেক মেয়ে-চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। নবীন তুর্কীতে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের 'মাতা' বিশেষভাবে প্রয়োজন, কারণ পরমা ইত্যাদি প্রকার বিচ্ছেদসাধন ঘটিলেও প্রাচীনতরী মেয়েরা এখন পুরুষ-ডাকার দেখাইতে পারেন। তুর্কীতে এখন একজন বিশেষ অভিজ্ঞ মেয়েডাকার আছেন; তাঁহার নাম ডাঃ আতাউমা। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি (M. D.)। ইনি এখন একজন জর্মন মল্লিকা-ডাকার যিনি তুর্ক বামী গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ নারীরা মেয়ে-রোগীদের চিকিৎসা করেন। তাঁহাদের এই-করিত পরিপ্রসার কারণ এই যে, তাঁহারা বহু রোগী দেখিতে পারেন তাহা অপেক্ষা বেশী দেখিতে ওঁহাদিগকে ডাকতে পারে।

কেবল শিক্ষালাভ ও চিকিৎসা-বিদ্যা নহে, সাহিত্য ও লিখিতকলাতেও তুর্ক-নারী প্রবেশ করিয়াছেন। মালাম ফেরিড যে (মুখ্যে চাহুয়) বর্তমান তুর্কীর একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক। অতীতে হারবিলে চাহুয় একজন স্থবিধাত লেখিকা। বহুদে নবীনা হইলেও এইটি মহিলা; তুর্কীতে পূর্ব স্থপরিচিত। তিনি যাহা লেখেন তাহাষ্ট তুর্ক ভাষায় অনুদিত হয় (১)

সাহিত্যের পরে লিখিতকলা। তুর্কীতে চলিত বহুদেবও আগে কলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠার আগে তাহাতে নারীর প্রবেশবিধি ছিল না। সম্মতি সে সকল বাধা দূর হইয়াছে। কতিপয় ছাত্রী তাহাতে মূর্তি-গঠনকার্যে শিক্ষা করিতেছে। এই মূর্তি-গঠনও একদিন অবশ্য ইসলামের অনুশাসনে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বীরপুরুষ কামাল পাশা বহুকাল সচিত বন্দনবন্দেই একজন অনেক কুল-স্বার্থকেও নিসাদিত করিয়াছেন বলিয়া আজ আর ওজন কোন বাধা নাই নৃত্যবিদ্যা লিপিতকলার এক প্রধান অঙ্গ। নব তুর্ক-রমণী এইক্ষেত্রে অসাধারণ উৎসাহ দেখাইয়াছে। সেলিম সিরি যে নামক তুর্ক প্রেক্ষাগৃহের কল্যাণে নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ন্যূনতম গিয়াছেন। সুতরাং কামাল পাশা ইচ্ছা ইচ্ছা দেখে ফিরিয়া আসিয়া প্রচলিত কোন কোন নৃত্যকে বর্তমান কালামগোষ্ঠী করিয়া লন (২)

### মনগড়নে তুর্ক-নারী

মলবিধের নিক নিম্ন স্থাধা অধিকার শাস্ত্রাও তুর্কনারী পাশ্চাত্য নারীর মত পুরুষের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠে নাই। তাহার ফলে তুর্কীতে অল্প বেশের মত "নারী আন্দোলন" নামক কোন ভিন্নবিধ গড়িয়া উঠে নাই। মেয়েদের যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের উদ্দেশ্য পুরুষদের পরিচালিত উন্নতিকর কার্যসমূহে বহুসাধা সাধায়া করা।



এই কারণে পৃথক নারী-আন্দোলন সম্বন্ধে ৩৪ নাই। শুধু মেয়েদের মত যে সকল ক্রাণ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোনটাই ভাল চলে নাই। কমন্ট্রিউনিয়নে "Union des Femmes Turques" নামক তুর্ক-নারী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারও এই মন্য। এত সমিতির কাজের সত্য মেয়েদের হাতে লাঠীর ব্যবস্থাপনায় নিরক্ষিত হইতে পারে তাহার আন্দোলন চানাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু নেতৃস্থানীয় মহিলায় কেহই উহাতে সহায়ত্ব দিখান নাই। বাস্তবিক তুর্ক-নারীরা এ বিষয়ে সংগ্রাম করার কোন কারণ নাই। বেছেতু গংগ্রাম না করিয়াও তুর্ক-নারী কামাল পাশার উপরতায় ভয়ে অনেক অধিকার পাইয়াছে। তাহার আদেশ, গ্রিক পুরুষের সমান যোগ্যতা যেখাটিল নারীও অব্যাসক, ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী ও সামাজিক বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি বলেন, "নারী

শিল্পী," "নারী নাট্যকার" এমন কথার কোন অর্থ নাই। কেন এককল কথার আগে নারী শব্দটি বোঝ করা? এর দ্বারা কি অর্থকল্পা ভিত্তি হইতেছে? না, কপেকাকৃত অর্থবিগত উৎসাহিত করা হইতেছে? প্রতিভার কোন ক্ষতিতে নাই। কাজেই বেশক পুরুষ ও নারী এই ভাবে ভাগ করা একান্তই বিড়ম্বনা।" তুর্কীতে তাই প্রাপ্তবয়স্ক মহাযোগ্যতার পথে জাতীয় উন্নতি করিতে চলিয়াছে। তুর্ক জাতীয় ক্রাণে প্রাপ্তবয়স্ক গ্রিক সমান ভাবে সমস্ত হইতে পারেন। কর্তৃ-কর্তা ও সভাপতি নিরক্ষিত হইতে উত্তরেই সমান অধিকার। 'মাকিএ জাভম' নামক মনসিবী মহিলা সম্মতি তুর্কীর পুঙ্খক জাতীয় ক্রাণের সভাপতি। পুরুষ-নারীর এই নিষ্পন্ন মহাযোগ্যতার তুর্কী যে অচিরে তাহার নই পৌর উদ্বার করবে তাহাতে দ্বন্দ্ব নাই।

## করা পাতার গান

### শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

চলিতে পথে পড়িলে করি' কেবের 'পরে মোর  
মলিন করা পাতা গো, করা পাতা,  
টুটিল-বাগড়া ঘানের বীণা, আলিলে মোহ-বোঝা —  
দুলাহ হ'ল আলমখানি পাতা!  
বদন্তেরি তবু দুলি, পনের দুলি গো,  
মনের দ্বার তোমারি লাগি' নীরবে দুলি গো,  
গানের বাতি জালাবে খ'রি রাতি যে করি তোমার; —  
এগানখানি হ'বে কি মনে গীতা?  
দুলিয়া এসে মাটির রাবী, কাটিকা এসে ডোর  
মলিন করা পাতা গো, করা পাতা!

প্রভাতীহরে কাশন লাগে অলপ-পাখা 'পরে—  
প্রামল পাতা মাটির ভুলে কি সে! —  
মাটির রক্ত, মাটির হুহ পাতার ধরে কর  
মাটিয়ে তুলি' মরে না বাহ-বিধে!  
মাটি গো মাটি, পথের মাটি, প্রাণের মাটিয়ে,  
মেহের ক্ষুধা মিটাও তুমি, পাখ' গো পা'টিয়ে;  
তাইত মোর বশনগুলি উড়াই বাতু-ভরে,  
করিয়া 'কবু দুলাহ তই মিশে;  
প্রভাতীহরে কাশন লাগে অলপ-পাখা 'পরে,  
প্রামল পাতা মাটির ভুলে কি সে!

ভুলিরা-বাগ্‌রা বাউল-কবি জাঙ্গিল গ্রাণে ছাঙ্গি  
 পাতার সুরে মনের সুর দে রে !  
 গ্রামের পথে মাঠের শেষে যে সুর উঠে বাজি'  
 করা সে সুরে পরাণ গর কেড়ে !  
 হাফের গান, মাঠের গান, বটের গান গো,  
 দোলাও কটা, পাতার খটা—যাতাও গ্রাণ গো !  
 দিনের শেষে ভুগা'লে দাও, কি লাঞ্জে রও মাঝি'  
 রাতের বায়ু পাতার বেগ নেড়ে,  
 অমন করে শুকানো কুঁড়ি, পুকানো ছলছল  
 কচো কি দোরে, 'মনের সুর দে রে !'

মনের সুর শুল্লিগা ফিরি বনের পথে তাই  
 পথের শেষে এলো না আছো মনে !  
 পাতারই মত করিছ ; বুকে অগৌম নিরাশা-ই—  
 মনের পাখী মরে কি বলে বলে !  
 কোথারে পাখী, বনের পাখী, মনের পাখীটি,  
 তোমায়ে গেলে তোমারি পারে বাঁধি বসীটি ;  
 উড়িবে তুমি অশার মীলে ;—এমনি গান গাই ;  
 তাসে কি সুর পরাণে অকারণে !  
 মনের সুর শুল্লিগা ফিরি বনের পথে তাই  
 পথের শেষে এলো না আছো মনে !

মাঝিকে শুধু করিতে চাই শূল-ছাঙ্গন 'পরে  
 একটি হুরে রণিবে গ্রাণখানি ;  
 একটি তার মাটিরবে শুধু গানেরি মর্করে,  
 নয়নে-নুখে খেলিবে মড়াবাণি !  
 সেই সে দেশে শুল্লির 'পরে চাঠি যে মিশা'তে  
 জলধখানি ভাগ্যে তুলি' অখার নিশাতে !  
 তামারি সাথে চলিবে খোলা নদীংগান তরে ;  
 অখার পথে কে রহ যোরে টানি' !  
 মাঝিকে শুধু করিতে চাই শূল-ছাঙ্গন 'পরে,  
 একটি হুরে রণিবে গ্রাণখানি ।

জানি গো জানি অরিয়া এহু একটি মন হ'তে,  
 অরিয়া এহু মনেরি শিলা-তলে !  
 জানি গো জানি উড়িয়া বা'ব অগৌম বায়ু-গোতে  
 সে শিলা হ'তে কাহার মাথা-বলে !  
 চাফের মাথা, গ্রাণের মাথা, মোকন মাথা গো,  
 অখার পথে মন্যের মিলে নিবিড় ছায়া  
 মাটির ভোরে বাধিলে মোরে শূল-উড়ানে পথে  
 কাকন-তরা কোমল করতলে ! \*  
 জানি গো জানি অরিয়া এহু একটি মন হ'তে,  
 অরিতে চাই মনেরি শিলা-তলে !

সে মনখানি কোথায় ছাঙ্গি বলিবে মোরে তুমি  
 বাকুল করা পাতা গো, পাতা,  
 কালো কবচী একলা কবে বক মোর তুমি'  
 গ্রাণ-পরতে ছিল গো সে কি পাঁখা !  
 ছিল গো পাঁখা, তাইত গাথা, তাইত গান গো,  
 তাইত আলো নতনে তব হাতায় গ্রাণ গো ;  
 বিরহীনা আজি সে বীণা দুটা'র বৃষ্টি তুমি—  
 টাঙ্গিনীরাতে পুত পেক-পাতা !  
 সে মনখানি কোথায় আজি বলিবে মোরে তুমি  
 বাকুল করা পাতা গো, সখা পাতা !

## সনেট-পঞ্চাশৎ

### ইংরেজসনারায়ণ চক্রবর্তী

একখানা ফরাসী উপরাসের ইংরাজী অনুবাদে এই ন'শে কৃত্রিমতা সূচনা করা হয়েছে যে, ক্লাসিক অর্থাৎ কৃদান কি না, এ বিভাব পত্রিতকের সঙ্গে মূলতঃ বিবেকে, আত্ম-মেধে যে বই পড়তে ভাল লাগে সেই বই পড়ব। উক্ত বসনের অঙ্গুলরূপ ক'রে সপ্তকের তার সমালোচকের চোখে দেবে, যে বইতে নিঃসংশয় কিছু নৃত্যের আছে তৎসময়ে পত্রিক চিত্রাবে বা মনে চরেছে লিখ'ব।

স্বাকার করছি কে-বই জনে-কর নিকট পুরোনো চ'রে গিয়েছে, সেই বই আমি সম্প্রতি পড়েছি। বিস্তীর্ণে প্রবাসী বঙ্গশাসিত-সম্মেলনে চৌধুরী মহাশয় নিজের স্বাকার করেছেন অপরোধী বীরবল লবণীর প্রথম চৌধুরী চোটে দ্যাত। তপ' যে দেখকে অতিক্রম করবে এ আর বিচিত্র কি! আর সেই খ্যাতির আগুতার, বীরবল নয়, প্রথম চৌধুরী-নিষিদ্ধ চৌধু পঞ্জির কবিতা যদি কোন পাঠকের নিকট অগত্যের "চ'রে গুঠে, তা' হ'লেও আশ্চর্যজনক কিছু হয় না, নাম-আশাষ্যের একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাওয়া। ভাঙসিঙের লবণলী নিজের পায়ে পাকিয়ে সিংহবিক্রম প্রকাশ করে কি।

কিন্তু অগম্যবলের দীর্ঘকার বার্ষ অঙ্গুরণের পূর্বে খাঁটসিঙী বাবা কৃত্রিম কবিতা পড়াই অগত্যের কি না, এই ভুলে এ প্রবন্ধের বিচার।

সনেটের কল্প অল্প বাঙালীর নয়। কুণের ছেলেরা কুণগো পড়বার সময় ইউরোপের যে যোনের সঙ্গে ভাস্কর্যের অর্থনয় কুননা করে, সেই ইতালীতে। ইতালীর সাহিত্য চ'তেই ইংরাজী কাব্যে সনেটের আয়তান। Shakespeare-এর সনেটে ইতালীর সনেটের ছন্দরূপ হয় নি, সেই সঙ্গে তা'কে ও কুল বাচিয়ে ওলায় English Sonnet, তা'ও বোধ হয় পৌত্তবে; আসলে ও হচ্ছে quatorzain, নিছক চতুর্দশপদ। যেমন আশাষ্যের মাইলের চতুর্দশপদী

কবিন্ধানে সনেট নয়। ভাল কথা, বাঙালীর সনেটের প্রবর্তক কে? প্রাকৃত প্রবণতৌদুগী ম'ন কি? সনেট চৌধু লাইনের মিত্রাকর কবিতা, এবং তা' আধার চুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ৮ লাইন ও শেষ ৬ লাইন। প্রথম ৮ লাইনের মিল-পঞ্জিবেশ এইরূপে: ১,৩,৫,৮ লাইনের পরস্পর মিল থাকবে, ও ২,৪,৬, ৭ পরস্পর মূলমিল হবে। শেষ ৬ লাইনের কোন বাধাবস্থা নিম্ন সনেট, ওখানে কবির অনেকটা স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রথম ৮ পঞ্জিতে নাক্ত: পদ্য: এবং অষ্টম পঞ্জির অন্তে অবশ্র অবশ্র চেদ প'ড়ে প্রথম ভাগ শেষ হবে। তা' না হ'লে, অষ্টম পঞ্জি নবমের সহিত একটানা হ'লে যদি নবম পঞ্জির মারে গিয়ে পামে, তা'হ'লে ছন্দশাস্ত্রমত সনেট হয় না।—যেমন, Milton-এর "Massacre Piedmont," "To Cyriack Skinner upon his blindness," Wordsworth-এর "Scorn not the Sunnet," "I thought of thee," Keats-এর "The Human Season" প্রকৃতি। ইংরাজী উদাহরণ নিয়ে মাথা ঘামাবার বেশি প্রয়োজন নেই, পার্থক্যও নেই; তবে এটুকু পার্থক্য: আছে যে উদাহরণ থেকে বুঝা যায় কবিনিয়োমনিদের পক্ষেও সনেটের একটা প্রধান নিয়ম বজায় রাখা ভাবের মোটে সব সময় সঙ্গত হয় নি। সে বা গোড়, বাঙালীর চৌধু লাইনের কবিতা অনেক থাকলেও, সনেট পঞ্চাশতের পূর্বে কেহ বর্ষা সনেট রচনা করেন নি; অত্র বঙ্গা সনেট লিখেছেন এবং লিখেছেন তাঁরা সকলেই সনেট পঞ্চাশতের পরে কলম ধরেছেন বললে বোধ হয় ভুল হয় না।

এখন, চৌধুরী মহাশয়ের সনেট আকারে ও প্রকারে ভিন্ন পদ্য থাকুক। ইংরাজী চিত্রাবে নিতুল সনেটেও বাঙালীর ভাগ এবং বাঙালীর ছোপ না থাকতে পারে;

## ঐক্যের প্রাণারাম চক্রবর্তী

তার লোভা কারণ, ছই এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিলেও, সত্য অমুখ্যবাক্যেই, এমন কি ছন্দে অমুখ্যবাক্যেও, মূল ব'লে লম্বা হয় না। আর বাঙালার ব্যাকরণ সঠিক বোলে না থাকলে বিশেষী ছন্দ বিশুদ্ধ হ'লে উঠতে পারে। আমাদের আলোচ্য কবি সনেট-রচনার বাঙালার সমাজে চন্দ্রসূর পরায়ের প্রাচীণ একটু পুরিয়ে বেঁধেছেন, অথচ প্রথম আট পংক্তিতে খাটি সনেটের স্তবক রচিত হয়েছে; এবং শেষ ছয় লাইনকে চুই ভাগ ক'রে পরায়ের ঘন ঘন মিলকে আরও স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। তাপে তাপে মলমলি আর মাঝে মাঝে Paella যে আমাদের খাটি দেশী জিনিষ এ কথা অস্বীকার ক'রবার উপায় কই!

যতট, যে প্রাচীন চৌদ্দ অক্ষরের মাত্রির উপর অমিত্যাক্রমভাবে মেঘনাদবধের সূচ সৌধ ও চিত্রাঙ্গদার যন্ত্রণার কৃত্রিম বিবচিত হয়েছে, সেই চৌদ্দ অক্ষরের একটানা পংক্তিই "সনেট পঞ্চাশৎ" এর বিশেষী সনেট ছন্দকে বেশী ব্যাকরণ সঠিক মূল রেখেছে। শুধু তাই নয়; নবম ও দশম পংক্তি পরস্পর সুকমিল হওয়াতে এবং শেষ চার পংক্তিতে ছয় পিঠ-পিঠ মিল, নয় একাত্তর অর্থাৎ একপংক্তিপর মিল থাকতে, পরায়ের কছার-রেন সঙ্গতই কম-বেশী বেলে উঠেছে। সেই কারণে চোখে বিশেষণ ক'রে না দেখলে কানের কাছে এই বাদ্যের মতলা ধরা পড়ে না, এবং এই না-পড়াইই ঐশ্বর্য প্রমথ চৌধুরীর সনেটের প্রণয়নীর বিশেষত্ব। নবম দশম পংক্তির পৃথক্বিজ্ঞান বাঙালার আরও বিভিন্ন সনেটে দেখা যায়। কিন্তু সনেট পঞ্চাশতের একটু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ছন্দবাক্যীত ভাবের বিচ্ছিন্নেও ঐ দুই পংক্তি যেন পক্ষাট নাটকের কৃতীর অঙ্কের মতো, ভূমিকার মূল ও উপলব্ধারের মূল।

এর তো প্রথম বন্দন সনেট লিখতে আরম্ভ করেন তখন চৌধুরীমহাশয়ের নির্দেশই সবেম ছিল যে, বাঙালী সনেটে বিশেষী গদ্য থাকবে, সেইমতে "সনেট পঞ্চাশৎ" এর প্রথম সনেটেই "পরবর্তী-দেখা দিবে পরিত্যক্ত বনেট" ভূমিকা ক'রে পাঠকের মন বদ্ব করেছেন। কিন্তু আমরা শুদ্ধ এ দুগের পাঠক; কৃত্রিমালের আমলে যে ভূমিকার পাঠকের

কিছুমাত্র বুধবদ্ধ হ'ত না, সে কথা এখন আমাদের কাছে কবির বিনয় ও বীরবাহুর রক্ত ব'লে মনে হয়। পরায়ের বৃত্তির উপর সনেটের কোট আমাদের এ দুগের আটের চোখে যেমানান লাগে না। কিন্তু সুগন্ধেরও একটা সীমা আছে। তাই, যে কোট যদি হয় সুখখোলা আর পারে থাকে দুট, তা' হ'লে আবার বরদাস্ত করা কঠিন হয়। পঞ্চাশতের কোন সনেটের কোন পংক্তি মাঝখানে পার্থক্যের দ্বারা বিভক্ত হয় নি, এবং শেষ ছয় পংক্তি চুইভাগে পৃথক্ব থাকার কিতাবিধা; আটপুত্র বন্ধ দুটুভাগে ভাগধারণ করে নি।

উপরের সকল কথা চার পাঁচটি সনেট সম্বন্ধে সম্বোধ্য-ভাবে প্রযুক্ত না হ'তে পারে, কিন্তু অল্পখ্যাতি যে রূপের ইতিবৃত্তি ব'লে থাকে, অবিকালে সম্বন্ধে প্রযুক্ত হ'লে তাই হয় সাধারণ নিয়ম। আর সেই সাধারণভাবে দেখলে "সনেটপঞ্চাশৎ" এর অবিকালে সনেট আকারের দাপ্তর ছাড়া একটা ভাব-সামুদ্র্য আছে।

বর্তমান কবি প্রায়ঃক্ষেই উইলিয়াম শুল্ফার্ডের বন্দনা করেছেন। প্রথমে শেক্সপীয়ার (১ নং সনেট) দ্বয় করেছেন সনেটকার হিসাবে, পরে ভাসেল (২ নং) বন্দনা করেছেন উক্ত মহাকবিভূক্ত কাব্যের হৃদয়কার জন্ত। জন্মের, তত্ত্ববিদ, চোরকবি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কয়টি সনেট আছে তা'র কোনটিই বন্দনা নয়; এবং গুণগির সঙ্গে ভাসেলের সনেটটির ভাব্য ভুলনা করলেই বুঝা যায় ভাসেল, ভাব্য না হোক, ভাবের উপর লেখকের লোভ অতি বেশী। আর,—লোভে পাপ, পাপে বৃত্তা—পাপের বন্দন। লুভ হ'লে তিনি যে বৈদিত্যের প্রণয়্য করেছেন, তাঁর নিজের লেখার তা'ইই ছাড়া পড়েছে। কিন্তু ভাসেল "পারিষদ ছিল মহাপ্রাণ আর্থা" (২). আর বর্তমান কবির পাঠক ক্ষীণপ্রাণ বাঙালী; তাই, গীর "শৌর্যের পরিচর আনন্দে চুবে" (৩) নয়, গীর "বাক্যলার যদুনা" (১) "বিলসে চলিয়া উমান" যদে না, যিনি পঞ্চাশটি সনেটের একটিতেও "বন্দ্যবন্দী প্রণয়ের গদ্যম ভাব" (২) আভ্যন্তরে পাতেন না, অপরপক্ষে "আদিবনে যেন ভাসে ললর জোয়ার" (৩) লিখেই পরবর্তী পংক্তিতে লিখে



বদনে "বলভূমি পথে ধলে চুইক সোহাগ" (৩), এরকম  
যেখানিক কবির কবিতা; যদি এতদিন পনির পৃষ্ঠিতে  
ভয় না হ'বে সিনে থাকে তা' হ'লে উপরে উক্ত শব্দের  
বচন মিথ্যা হয়! ইংরাজী ১৯১৩ সনে বইখানা প্রথম  
প্রকাশিত হয়েছে; এই বোল বছরের মধ্যে সংস্করণের  
নমুনা দেখে মনে হচ্ছে শেখকের কাব্য-সংস্করণীতে না  
হোক তাঁর প্রকাশকের কবিতা-সম্বন্ধে পনির দৃষ্টি ঘটেছে :  
কালেই পাশের গচন মিথ্যা নয় !

পক্ষাণটি সনেটের সবগুলিতে না হোক, অধিকাংশে  
মোটামুটি ভাব-সানীশ আছে, এবং সে বাক্য এই :  
প্রাণের চাহানুস্তার উপর বৃদ্ধির আলো পড়ুক ।

কবিতার তত্ত্ব আলোচনা করতে হ'লে অতুলমান ছাড়া  
যিটার গতি নেই, তার কারণ কবিতা প্রবন্ধ নয়।  
যিনি, "সনেট পঞ্চাশং" এর কবি নিজেই কবিতার  
কঃত্বেন ভাষার নীচে "দস্তা মুখ ঢেকে চাপে" (২৮),  
আর ভাষার তান কবিতার যে কতখানি তা' ধারা কবিতা  
শেখেন শুধু তাঁরা নন, ধারা চোখ কান বুজে কবিতা  
পাঠ করেন তাঁরাও জানেন ।

সনেট পঞ্চাশং পড়ে মনে হচ্ছেত শেষ সনেট  
"মাদ্ধক্য" সভাই কবির নিজের কথা :

"নাহি তানি অনন্তরী মনের স্পন্দন,—  
আমার দম্বর ঘাটে বাহুর বচন এ" ৪০

কল্পনা ও বাস্তব দৃষ্টিতে মিলিয়ে মিশিয়েই এ কাব্য এবং  
মাহুদের জীবন ।

"কবিতার বস্ত নব লাল মাল ফুল,  
মনের আকাশে আমি লগ্নে ফোটাট,  
তাদের দবারি বন্ধ পৃথিবীতে মূল,—" ৪১

সনেট পঞ্চাশতের কবিতাগুলি আকাশের বিকে উজ্জ্বল  
মাটির পাছের মূল, নিরুদ্ধ আকাশ-কুহব নয় । কল্পনার  
"কবির সৃজন" পত্রলেখাকে অছে মাহান করা অনেকে  
(৭), যাদের "সুবর্ণ-পালক" কভাবতীর সহিত মিলন  
রূপের (৪৯), তথাপি বাক্য মাঝে জেরে উঠে "নবভঙ্গা"  
(৪৮) না দেখলে, শুধু "স্নেহে বা' দেখা বাবে সে হচ্ছে—

"গ্রাম্যের রাশিগন অবিভা সুন্দরী" (৪) ; এবং এই  
"নবভঙ্গা" ও "সুবর্ণ-পালক" কোনটাই একা পূর্ণ সভা নয়,  
"সভা শুধু মানবের অন্তঃপাশিশা" (৪) আর পেটের  
মাহুদের ধর্ম "স্বাধারাতো বহুধরনী সাজা" (৪) "চির  
দিবাস্ত্রে বরা আছে মণ্ডল" তাদের নেপাও চাই,  
(২২) আবার "ভজ্যামুখে আছে বাতা সুবিধা নয়নে"  
তা'দেকও জাগতে হবে (১৮),—জাগতে হবে, কেননা  
জেনে শুনে আলোচ্য পিছে ছুটা কিছু নয়, (৩৫) বিশেষত  
ভজ্যামুখ হারী ৪৪ না, "পালা চোখে মধু দেখি নেপা গেলে  
ছুটে" (৩৪)—জাগতে হবে, কারণ, জীবন প্রাণের চেয়ে  
অধিক : (১৪) সে জীবনের পরিচর "স্বকীর্তী প্রণয়ন"  
(২) "আলোকে" (৩) নয়, ধরপাকে চূর্ণ-করা "জানের  
বটিকা" হেঁচ নয় (৩০) :—"উভয়ের মধ্যে বেলে জীবনের  
ছন্দ" (৩২) সেইখানে জীবনের "গতি চিত্র-আবরণ" (২৮),  
জীবনের গান হচ্ছে "গতির লীলা" (২), আর "জীবনের  
মর্ম" (১০) সেই "উজ্জল, চকল, নির্মল" (১৫) "পরিধাণ"  
যা বীর ও ককণ্ঠস গমান জেনে (২) অ'ধারের মধ্যে  
অনলের মত কুটে ওঠে । (১৫)

এ যেন জীবনের বাণী ভাষার প্রকাশ করতে হ'লে সে  
বাণীর আকার চাই, কারণ,

"ধ্বজিত পাঠি না আমি নেত্র কিবা মনে  
আকার বহীন কোন বিষের বেবতা ৪" (২৮)

বর্ণের কবিতার প্রকাশ করতে হ'লে আকার ভে  
নিভান্ধই চাই, কেননা,

"বাণী বার মনলক্ষে না ধরে আকার  
কবিতা তাহার মাজে মনের বিকার ।" (১)

সেই আকারের মধ্যে ঘিরেই

"ভ্রমের মাঝারে চারি মস্তক বর্ণন,  
অঙ্গের মাঝারে মাসি অনলম্পর্শন ।" (২৫)

এই টুকুর মধ্যেই কতকগুলি সনেট গুলি পাল্ট করা  
গেল ; তালিকা বাড়ানো কিছু শক নয় । আর যেদী  
টানাপোড়েন না ক'রে বলা থাক অধিকাংশ সনেটের পঞ্চম  
ভাবসাম্বল্য আছে । আর সেই ভাব ভাবানুস্তার বোঁরাটে  
না হ'বে বিচারবুদ্ধির আলোকে শাসিত ভাবের নির্মল

শিখার ফুটে উঠেছে। এ সনেটগুলির মঙ্গলতা পুষ্পের বা কচুর পাতার মতো নয়; কৃপাশ্রে শিশিরবিশুর মতো তীক্ষ্ণভাবেই এদের মঙ্গলতা। পাঠকের মন ভাষার উপর দিয়ে শিঙলে যায় না, তাষা ও ভাবের সজ্জ্বলে লেগে থাকে।

আলপ কথা, সনেটের নিয়মিত বন্ধন বজায় রেখে চৌদ্দ লাইনে একটি সুরগ্র কবিতা সৃষ্টি করতে হ'লে প্রসাদগুণের প্রতি পদে পদে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। স্পষ্ট ক'রে ভাব্যর পঙ্ক্তি না থাকলে কলমের মুখে সে গুণ ফুটে ওঠে না, আর কাব্যে সে গুণ না থাকলে পড়া মাত্র অর্থশ্রুতিই হয় না, এবং চৌদ্দ পঙ্ক্তির কবিতা আসে বিশ্লেশণ ক'রে পরে পাঠক তাঁর সৌন্দর্যলব্ধে সজ্ঞান হবে এ হচ্ছে লেখকের পাঠকের উপর ছুসুম। Love at first sight তো কবিরাই বজনা করেন, নিজের লেখার বেলায় ভুললে চলবে কেন? কি পক্ষে কি পক্ষে বীরবল বা প্রথম চৌধুরীর প্রসাদগুণ নেই একথা সম্ভবত কোন সমালোচকই একান্তে কবুল করবেন না।

ঐশ্বর্য প্রমথ চৌধুরী যে দলপ্রথম সনেটকে বাঙালার রূপান্তরিত করেছিলেন, এ উপদ্রুতই হয়েছে। অল্প কথার বেশি বলতে তিনি বর্তমান বাঙালী সাহিত্যে অধিকারী। তাঁর প্রমাণ তাঁর গদ্য লেখার ছড়ানো আছে। পক্ষে তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ “পদচারণ” কাব্যগ্রন্থের Liriolet বা ‘তেপাটি’ কবিতা। ছাট লাইনে কবিতা হবে; কথার দিকে দুরিষে কিরিয়ে প্রথম-চতুর্থ-পঞ্চম পঙ্ক্তিতে একই ভাবের পুনরাবৃত্তি করতে হবে, এবং ষষ্ঠীয়-অষ্টম পঙ্ক্তিতে তত্পন সৌন্দর্য প্রকাশ হবে; ছকের বেলায় প্রথম-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম, এবং ষষ্ঠীয়-অষ্টম পঙ্ক্তির মিল থাকবে। এই, কথা ও ছন্দে, উভাবিধ বন্ধনের মাকে যিনি কাব্যের বিকাশ ও ভাবের প্রকাশ করতে পারেন তাঁরই সনেটপকাশতে বণা লাগে,

“ভালবাদি সনেটের কঠিন বন্ধন,

শিল্পী থাকে গড়ে মুক্তি অগণের জনন।” (১)

—তাঁর সনেট খেজার কখনো “পদচারণের” অকাণ বর্গের স্তায় “বাচিক্য,” কখনো ‘বর্গ’র মতো “মেচর”।

ছন্দ ও ভাব দুইে মিলে কবিতা। ও ফুটো সমান তালে না চলে, ভাব শিঙিয়ে থাকলে রহ পক্ষ, আর ছন্দ শিঙিয়ে থাকলে গদ্য। কবিতার ছন্দ যদি কবির মনের ছকের সজ্জিত সজ্জত হয়ে তা হ'লেই লেখকের পক্ষে তা লেখা এবং পাঠকের পক্ষে তা পড়া লক্ষ্য হয়। একদিকে সনেটের বন্ধন কঠিন। অপরদিকে ১৩০২ সনের চার লম্বা “সুতসূত্রে” ঐশ্বর্য অতুলপ্রাণ গুণ আর্দ্রমনের যে “কদম্বকটি”-গুণের পরিচয় দিয়েছেন পকাশতে তাঁর স্থাপ রয়েছে। ফলে, দুই কঠিনে মিলে দল্ল সনেটপকাশৎ দৃষ্টি উঠেছে। সনেটের পরিসর অল্প, চৌধুরী মহাপরও অল্প পরিসরে তাঁর বক্তব্য সূত্রাবলি বলতে পারেন। সনেট ছন্দবন্ধনে সংকত, সনেট পকাশতের ভাবব্যক্তিও বীণকিসাংহত।

অল্প এ সব কথার পরও অনাদি প্রবের অল্প ৪৫ না : প্রস উঠতে পাঠে, থাকে কবি বলা হচ্ছে তাঁর লেখার আনন্দে কাব্যরস আছে কিনা। ভিন্ন পুরে উক্ত আলোচনা কবির কথায় এ পুরে লাগিয়ে দিই,—রসের “ব্যাখ্যান করা জানের মূর্ততা।” (“ঐ,” “পদচারণ”)।—রসের অস্তিত্ব ও রসের উৎকর্ষ মতভেদের বহু ভিত্তকের বিষয় নয়। “উল্লেখ” ও “বলাকা” কোন্টা কাব্যরসে প্রের সে সম্বন্ধে একান্তে দীর্ঘ আলোচনা না হ'লেও অপ্রকান্তে কখনো কখনো মতভেদ তুলনা যায়। কিছু “তোমার মনিষগকে যদ্য বাহু বধে চাহিততে”, এবং “পক্ষত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিকরদেশ মেঘ,”—দুইয়ের মধ্যে কোন্টা কাব্যরসে পরোক্ষী তাঁর সৌমাংসার ‘ভিত্তক’চিহ্নি পোকে?’ প্রবচন বরদ কড়া ছাড়া অল্প কোন সমাধান আছে বলে মনে হয় না।



## বসন্ত শেষে

শ্রীঅধীরচন্দ্র কর

শেষ চ'রে ধবে বসন্তের চাঁদ মধু-পূর্ণিমা রাত,  
সবোবের মোরে কমলকলিকা সলসা উট্টল মাতি ॥  
কোথা উৎসব কোথা গেল চতুর্দশ,  
অবসানে সব স্রুতি-শিপিগ-মঙ্গ,  
মলয় বসিছে, কোকিলা মোনকর্ভ  
আকাশের কোণে স্তিমিত চন্দ্র তাত ॥

নিশাপথে ধবে পুরবে ইন্দ্ৰ প্রভাতি উট্টল স্ট্রেট,  
চেরি বিষয়ে সে কুন্তিতার গুঠন গেছে টুটে ।  
উত্তমী তার ত'বে গেছে কাগে কাগে,  
পেলব কপোল রক্তিম অমুরাগে,  
পুলকের হাসি ধরে না কো' আঁর সুখে,  
অতল বানিতে কাঁপিছে কোরকপাতি ॥

তলে তলে ততি' দৌলন ডালা বন্ধ বরিল লবে,  
তলিতা আমার মিতমাথা কোণে বুকিবা অঙ্গোরবে ॥  
পুর দৌরভ অস্তবে তার জরা,  
তবু তা ব্যক্তিরে রূপে নাতি মিল ধরা ;  
ভাবি চল তার বিদল এবার চো'লো  
কারে কে বাতায়,—না মিলে মনের সাথী ॥

অধায় দোহাগে—“ওলো কুমরা, কেন এত উত্তরালী ?”  
হেসে বলে,—“লবি, এতখণে চল ললন যে মম হোলী ॥  
হৃদ-মিলনের স্বকীর্ণ বলাবেল,  
রতি-উচ্ছ্বাসে চল না কি নিঃশেষ !  
যত জলদল অদূরে পড়িবে তরি'  
বৈশাখী দিনে বিরহ-রৌদ্র তাতি ॥

সাধনা আমার নির্দাশীন বিচ্ছেদ হোমানলে,  
জন্মের দাফ করে তা মধুর বেদনার আঁখিঝলে ॥  
আর লখীলের নুকে বে অকর্ণরাগ  
অকর্ণ ক'রে আঁকে সূতায় সাগ,  
দে-ই আঁখি সেজে দগিত-হাববী-দূত  
দিল দৌলন-জরাজীবা শিরে পাঁখি ॥





## বনভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

১০

ভাষার কি-মারি পাশে শুইয়া বিভা যেমন চিরকাল ভাষার গলা জড়াইয়া দুমাইয়া আসিয়াছে একটা চাত ভাষার গলায় দিয়া সেটুকু ভাবে চকু মুদিয়া শুইয়া রহিল। ভাষার আর একটা চাত পাশে উপবীত রমেশ ধরিয়া ভাষার নাড়ীর গতি-পরীক্ষার নিযুক্ত হইল। অদূরে পাড়াইয়া হেমন্ত নির্নিমেধ চকুতে এই প্রতিক্রিয়া অবলোকন করিতেছিল। রক্তনাশেই হউক, বা কোন অনিবার্য আশঙ্কাতেই হউক, বিভার মুখ ক্রমশঃ বেন লাখা হইয়া আসিতেছিল। হেমন্তের ঘোষণা নগনে তাহা বেন একবারে মধ্য মাছের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হওয়াতে সে বলিয়া উঠিল, “আরও চাই?”

ভাষার রমেশের দিকে চাফিয়া বলিলেন, “নাড়ীর কোন গোলাঘোণ—”

রমেশ সে কথা শুইয়া উত্তর দিবার আগেই হেমন্ত অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিল, “আর না, আর না, ভাষারবার! ম’রে যাবে যে!”

হেমন্তের এই ব্যাকুল চীৎকারে সেখানকার লোকদেরই দৃষ্টি ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইল। বিভারও ক্রান্ত মুদ্রিত দৃষ্টি অকস্মাৎ উন্মুক্ত হইয়া ভাষার চকুতে সুহৃদের লজ্জা গর হইল, এবং ভাষার পর এই অভূত রহস্য আশ্বাসনে কৃতজ্ঞতা এবং কৃপ্তি জানাইয়া এবং তাহাকে নির্ভর থাকিবার একটা আশ্বাসের বাণী দীরবে জ্ঞাপন করিয়া আবার মুদ্রিত হইয়া গেল। রমেশ ভাষারের এগ্রে উত্তর দিল, “না, তেমন কিছু নয়।”

রক্ত লগা শব্দ হইল। বিভার কতকাল বাধিতে বাধিতে ভাষার আকৃত রসহীন পতিকার মত বিবর্ণ অবসর দেখাটিকে একটু এলিয়া বৃদ্ধ চিকিৎসক বলিলেন, “কেমন আছে মা? একবার চোখু চেয়ে দেখ।”

বিভা চকু চাহিতেই হেমন্তের বেধ-ব্যাকুল দৃষ্টির উপর

ভাষার দৃষ্টি পড়িল। কি বেন একটা কথা সে উচ্চারণ করিতে বাটতেছিল, কিন্তু ভাষার ক্রান্ত অবসর দেখতেই তেমন সুব বাতির চইল না, কেবল একটা নিম্ন গাতির ভাষার মত কিছু ভাষার লাসা চোপসান চোপের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। ভাষার একটু ব্যস্ততার সহিত ভাষার যত্নত হাটটা ধরিয়া যখন ভাষার নাড়ী পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হেমন্তের লাগার হির দৃষ্টি ভাষার মুখের ভাব পরীক্ষা করিতেছিল। চিকিৎসকের মুখের উপর দিয়া একটা বিশ্বাসের ভাসের ভাব খেলিয়া গেল এবং ভাষার দৃষ্টি দৃশ্যের সহকর্মী হইলেনের উপর পড়িতেই তাহারা সঙ্কটিত হইয়া উঠিল। তিনি ভিতরকারে মরে বলিলেন, “তোমরা কি একবারেই—” কিন্তু কথাটা সমাপন না করিয়াই আবার গল্গলভাবে বলিলেন, “খাট ৮’ক, এখনও উপায় করলে চর।”

হঠাৎ রমেশ ভাড়াভাড়ি উঠিয়া হেমন্তের চাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, “একি করছোঁ, হেমন্তবার!” সকলে সেদিকে চাফিয়া দেখিল ভাষারের পত্রিতাক ছুরি-খানা লইয়া বিভার চাতের বেখানটা কাটা হইয়াছিল, হেমন্ত ভাষার নিম্নের চাতের পেখানকার একটা শিরা কাটিয়া ফেলিয়াছে। যতর লোকের আকস্মিক চীৎকারে, বিশেষত অভূতবে মার উচ্চ কোলাহলের শব্দ বিভার অবসর মুদ্রিত দৃষ্টি সুহৃদের লজ্জা পুনিয়া গিয়া হেমন্তের যে অকর্মী হইতে রক্তের খায়া কিন্নিক দিয়া ছুটিতেছিল, ভাষার উপর পড়িল। সুহৃদ মাত্র ভাষার বিলম্ব দৃষ্টি সেখানে লগ্নের হইল, ভাষার পর অশ্রুট চীৎকার এবং আকস্মিক ঘোষের সঙ্গে ভাষার আবার মুদ্রিত হইয়া গেল।

ভাষার হেমন্তের দিকে চাফিয়া বলিলেন, “টিক চলেছে। এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।”

ভাষার পর বিভার পাশে হেমন্তকে শোয়াইয়া দিয়া এয়োজনীর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করা হইল। প্রসঙ্গদ্বয়ে হেমন্ত



সেখানে লগন করিয়া রছিল। ক্রমশঃ তাহার শরীর এবং মন অদম্য হইয়া আসিতে লাগিল, এবং হেমন্তের কথাই সে চক্ষু মুগ্ধিত করিল।

প্রক্রিয়া শেষ হইলে, সকলে ঘেঁষিল বৃদ্ধির আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন হেমন্তের মুখ হাতটি বিভার হস্তের উপর পড়িয়াছে। যিহু ঘেঁষের দৃষ্টিতে সে দৃষ্ট দেখিয়া মনে মনে কি একটা কথা আবিষ্কৃত করিয়া শুদ্ধ ভাঙ্গণটি বলিলেন, “এদের এখন একান্ত বিশ্রামই করুক। যেন কোন রকম নাড়াচাড়া না হয়।”

মাসাদিক কাটিয়া গিয়াছে। তিনটি রোকেই আবার উঠিয়া বসিয়াছে। বাবুনমার বান হাতের কতকটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন অপরিস্রাব্য অকমতা তথ্যাতীত এখন আর তাহার কোন কারিক অসুবিধা নাই। বিভা এখনও একটু তৃপ্ত ও বিশ্রী। হেমন্ত বেশ সাহিত্য উন্মীষাছে। তাহার মুখ সকল পত্রার ভাবনের স্মৃতিতে আপেকার মতই তরপুর। স্মৃতিপুর প্রায়ে, কেবল মাত্র তাহার সমবঙ্গী-গণের মতোই নহে, তাহার আপেকা অনেক অধিক এক অল্প বয়সের অধিবাসীদের মতোও। তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বেশ দ্রুত পতিত বাড়িয়া চলিয়াছে। সকলেই জানিয়াছে যে, এই নব্যগত উজ্জল উচ্চারণী চাটুর্গো মহাপণ্ডিট তাৎপারের আশ্রয় প্রভার পাঠ্য বাবুনমার বক্তব্যটির দল্লভ নিকট আশ্রয়, এবং তাঁহাদের জনাবরণগ্রামে উজ্জ্বলপ্রায় বনিযাতি বাবুগো পরিবারটিকে বলায় কিস্যর জ্ঞান সমাপত। নবীতে পটু, বসন্তে সপতিত, ইত্যাদী-জানা এই মিষ্টতায়ী ও মহাসিনী নব্যগত ব্যক্তিটির দল সেই পত্রীর অনেকেরই পোতনীর হইয়া উঠিয়াছে; এবং বস্তুকাল পরে বস্তুগণাভারদের তরপ্রায় চতুঃমণ্ডলে আবার দীতিমত সাজা বৈক্য বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে আবার যত্না নবীতে কোথায়ের মত, গানগায় চলিতেছে, তবলায় চাঁটি পড়িতেছে এক হাসির লহরী ছুটিতেছে।

সেদিন বিলম্বা-দশমীর সন্ধ্যা। হেমন্ত কোথা হইতে

বাতির তিতর আদিয়া তুলনীয়বার প্রদীপ হাতে বিভাকে দেখিয়া বলিল, “আজ সিদ্ধি যেতে হয়, জানি?”

বিভা একটু চাঙ্গিয়া বলিল, “না। এই তোমার কাছে নিখলুম।”

“সিদ্ধি বলছি আজ সকলকে সিদ্ধি যাওয়াতে আর মিলিযুব করতে হবে।”

“তা সবাই জানে যো মশাই। আমায়ও জানি। যেক্ষে এখন যা শুদ্ধ লোক কিম্বা’কে প্রণাম করতে আসিবে আর মিলিযুব করে’ যাবে।”

“আজ দশমীর দিন, শুকজনকে প্রণাম করতে হয়,

তাহার এই অচ্ছত প্রায়ে সুখখানি তুলিয়া বিভা বলিল, “হ্যাঁ। জাননা না কি?”

“তা হ’লে তুমিই আমাকে আজ প্রণাম করবে?”

বৃহৎ মধুর চাঙ্গিয়া হেমন্তের মুখের দিকে চাহিয়া মনোহর কৌতুকের সন্নিহিত বিভা বলিল, “তুমি আমার শুকজন না কি?” তাহার পরেই অকস্মাৎ আলোটা গলায় জড়াইয়া দুমিষ্ট হইয়া হেমন্তের পাম্পর্ণ করিল। হেমন্ত হাতখানি খরিয়া ভাঙকে তুলিতে বাইতেছিল। সে “ছি” বলিয়া চাতটা চেঁচের ছাড়াইয়া লইয়া নিরেষের মধ্যে সন্নিয়া গড়াইল।

হেমন্ত বলিল, “কি আশ্চর্য্য কতব ব’লে যাও?”

“যেন শিশুদিগ মরণ হয়”, বলিয়া দশন বিভা চলিয়া গেল হেমন্ত আকর্ষ্য হইয়া দেখিল তাহার চক্ষু বিগা ছই কেঁটা। জন গড়াইয়া গড়িতেছে।

বাতির হইতে নবটাকাণ্ড ডাকিল, “চাটুর্গো মশায়, বাড়ি আছেন?” সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর তিতর আদিয়া হেমন্তকে দেখিয়া বলিল, “আলোটা দিন, ঠিক ক’রে জেলে রেখে আসি। আলপাটা আবার সাজতে হবে।” হেমন্ত কিস কিস করিয়া বলিল, “আলোটা আঁধি জেলে দিছি, আলপাটা সেজে রেখে তোকে এক ভাঙপায় যেতে হবে।”

“কোথায় দাঁড়াচ্ছ?”

“রাসেবতের ঘোঁকানে সিদ্ধি আনতে।”

“বিকালে ত বিবিমন্দির এসে দিবেছি।”

“কতটুকু?”

আনীত দিতির পরিমাপ ভূমিমা হেমন্ত বুঝে একটা তাকীলাবাঁকক পথ করিয়া বলিয়া উঠিল, “সে ত নতি রে! আজকে বিজয়ার দিন বহুকাল পরে—”

“অভ্যাস আছে বাবাঠাকুর?”

“পূব ছিল রে নব, ভোপেনে এখনে এসে অবধি কিছু হাণিবে হয় নি।”

স্নানিত তখন ঘাঘ ঘিগতব। বিভা তাঁহার নিম্নিত কিমা'র পাশে বসিয়া চুপিতছিল। একবার ঘাঘিবে আসিয়া পাচলা-কাপের সিঁড়োচ্ছল চক্ৰমার দিকে চাহিয়া আগনাত মনে মনে বলিল, ‘কত রাত হয়ে গেছে। পান বাজনার মাঝোবে ঘাঘার কথা মনেই নেই!’ একটু খামিয়া ঘাঘার বলিল, ‘বেল মাহুটি কিছু! থাকে নিয়ে ঘর তক্তে চ’বে—’ কপাটা অলমাস্ত রাণিয়া, একটু অকাবণ ললক হাদি হাদিয়া, বিভা রহুই ঘরে গিয়া চুপিল। সেখানে তাঁতের হাঁড়িটার ভিতর হাত দিয়া বলিল, ‘তাড়ন্তলি যে এদিকে জল চ’বে পেল, পাতে দেবকি ক’রে, ঘোষ উঠনটীর আগুন আছে কি না!’ তাঁতার পর উঠুনে একটা নারিকেল হোবালা ভাঁজিয়া দিয়া পাখার বাতাসে আগুন জালিয়া এক কড়া জল গরম করিয়া তাঁতার উপর তাঁতের হাঁড়িটা বসাইয়া দিল।

স্নাতা তাঁত ঘাঘার গরম হইয়া আসিল, কিন্তু তখনও ভোক্তার দেখা নাই। বিভা কি একটু তাবিয়া বৈঠকখানার দিয়া উঠিল। সেখানে হেমন্ত কোণের জেঁকিটার চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। বিভা একবার মনে করিল সে ঘুসাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁতার সে স্রম ব্রহ হইয়া পেল। হেমন্ত, ধালকে অকাবণ হাত ধলে, একবার মাত্র সেইরূপ হাদি-হাদিয়া পরক্ষণেই কাঁদিয়া উঠিবার মত আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল, “ঘর ঘর! প’ড়ে ঘাছি, প’ড়ে ঘাছি!”

সে ব্রহ ঘেখিতেছে তাবিয়া বিভা তাঁতার কাছে দিয়া গরম জেতে বলিল, “অমন কবুহ কেন? উঠে বস।”

হেমন্ত একবার চকু বুজিয়া বিভাকে দেখানে দেখিয়া একটা কিলের লক্ষ্যে বা তরৈ কাঁপিয়া উঠিয়া বিজ্ঞত হইয়া পেল। কিন্তু সে ঘুহুর্ন্তের জন্ত; তখনই ঘাঘার উজ্জ লদি হাসিয়া বলিল, “বা: বা: বো: বো! পতীর মত বো—”

পাখারদুটির মত করেক ঘুহুর্ন্ত জ্বক তাবে গাড়াইয়া থাকিয়া বিভা জ্বত পথে অন্ধরের পথে চলিয়া গেল। তখন তাঁতার ঘুপখানি গুণার এবং কোণে বিজ্ঞত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাজ্যঘরে গিয়া সে ঘরন পূর্ব তপু তাঁতের হাঁড়িটা নামাইয়া জালিল তখন কোণারই বা পেল সে গুণা আর কোণারই বা পেল সে কোণ। তাঁতারের দানে তাঁতার তকল ঘুপজীর উপর একটা জুগেত তাংখেল কাল ছায়া ছুটিয়া উঠিল, এবং চকু ভটটি হইতে ভটটি ঘাঘা বহিয়া তাঁতার এক ভাগাটীা দিল।

এই জ্বত বিজয়ার দিন একি কাত্তে! আর সমস্ত দিন সে যে কত ঘরে তাঁতার জুস্ত লামবোণ মধ্যে বাগা কিছু লম্বত তাঁতার আয়োজন করিয়া, সেট গরম আয়োজনে তাঁতার তকল প্রাণের ভালবাসার দ্বিত্ত আত্মে মাখাইয়া, তাঁতারের এট অতিপির অতিপির সংকরের জন্ত ব্যস্ত হইয়া বসিয়া আছে। মানসিক কাল বহিয়া এই যে খেখানী লোকটি, তাঁতার ভালকোচিত লাভলোর, ঘোর শৌকবের শু নির্মল আনন্দের অবিরাম বর্ণনে তাঁতারের নিম্নলব ঘাঘালে অনেক কালের পর অসুহর আনন্দের প্রসঙ্গ ছুটাইয়াছে। এবং বিভাব নিম্নল কুমারী জীবনে ঘোবন লসলতার উদ্ভক ও তাঁতার তকল মনের গুপু কোণে বিবিধ গুহমর কল্পনার উৎস বুগিয়া দিয়াছে, তাঁতার মনোহর দুটির ভিতরটা কি কলসে! সে যে একজন ইতর লোকের মত নেপার বণ হইয়া এমন বীতমন: দ্বিষ্ট: তপাস্ত্রিত হইতে পারে, তাহা ত কখনও গুণাকরেও বিভার মনে উদয় হয় নাই। এই অঘটনটা বত ঘোবের তাহা অপেক্ষাও বহুগুণ অতিবজিত হইয়া সেই কুমারীর চিরপবিত্র মনটিকে বহুগতি করিয়া চুপিল। প্রথমই তাঁতার মনে হইল যে, এ জগে কখনও সে সেই নেপার কদম্বা শূন্তটী ঘুপটার উপর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিবে না। তাঁতার পর সে দিন সেই বিপদের স্মারিতে কিমা তাঁতারের ঘোবা যে বাঁকটা: মিতে চাহিয়াছিলেন তাঁতা মনে করিয়া সে বিহরিয়া উঠিল। কিন্তু মাশ্কাণ এই যে, সেই বাঁকমর এখন যে নিম্নিত দুক্তির স্মারবনা হইল সে কথা মনে হওয়াতেও তাঁতার লমর উয়াসে লণু না হইয়া চতপার অকাক বেবনার ভাড়া হইয়া উঠিল।



সে দিন সে তাহার পুত্রাধারবস্ত্রিনী তিমা'কে বাচাই-  
বার আশার নচে—কেন না সে আশা তখন অসম্ভবিতও  
গ্রাহ্য ছিল না—সেই সুসুখ মরণবস্থায় লাগবের  
উদ্দেশ্যে, বহুর শুভ সত্য প্রত্যয় কবলেও আশাবশি দ্বিতে  
গ্রস্ত হইয়াছিল। সে কথা মনে পড়িল। কিং তখনও  
সেই ভীষণ দুঃখের আশনাকে সন্তোষ বন্ধনে বাঁধিবার সময়েও  
গ্রাহ্য মন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে ছাড়ি নাই যে,  
এ কষ্টটা ত বা পেণ। কিন্তু পরজন্মে যেন বাহিষ্ঠকে পার।  
তাহার পর হইতেই প্রসূতি এবং প্রতিষ্ঠিত মনে যে  
লড়াই চলিতেছিল তাহার মধ্যে। হেমন্তের সান্নিধ্যের এবং  
তাহার সেবার আনন্দ বিদ্যার সম্মান অস্তরের উপর একমাত্র  
স্বাক্ষর বা বিবরণ্যের কথা করিতেছিল। আজ যেন তাহার  
সেই আনন্দের উৎস অকস্মাৎ শুভ হইয়া বাগমতে তাহার  
অস্তরের আগ: বহুতপ বহিত হইয়া তাহাকে ভস্মময় করিতে  
লাগিল।

কিং এইরূপ চতুর্পত্যে বহুতপ বসিয়া থাকি  
অনন্তর। অবশেষে সে উদ্বিগ্ন রামায়ণটোতে শিকল বিধা  
লে তারের মত হেমন্তের ও নিজের আহারের আশা ত্যাগ  
করিয়া গুইয়ে বাইবার কথা ভাবিল, এবং হরত সেই  
উদ্দেশ্যেই শয়ন গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু অসম্ভবে  
তাহার শাওখানি যেন তাহার অজান্তসারেই তাহাকে আবার  
চোমওপের দিকে চালিত করিল, এবং সে অতিদ্রুতপণে  
ঘোরে ঘোরে অনিচ্ছায় পদাধিক্ষেপে হেমন্তের নিকটে গিয়া  
পাড়াইল। সেখানে বিতা এখন যে দৃশ্য দেখিল তাহা  
তাহার সম্পূর্ণ অপরচিত বলিয়াই হউক, অথবা সেজন্য উগ্র  
নেপাথ পণিগায় লগছে কোন কল্পিত ভীষণতা মনে করিয়াই  
হউক, দুইজনের মধ্যে তাহার মন হইতে পুরাতন-কোষ  
ও দুগা অধবিত হইয়া গেল, এবং তাহা কল্যাণ ও আশঙ্কার  
ভাষা উল্লিখ। সে কবে শুনিয়াছিল দিগির নেপাথ ষেধ  
ঠেতুল গোলা। তাই তাকাতাকি কিরিয়া গিয়া একবাটি  
ঠেতুল গোলা আনিয়া উম্মতপ্রায় হেমন্তকে তাহা বাগাইয়া  
দিয়া বলপূর্বক তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া মাঝার  
কপালে অগনিক হাত বৃণাইয়া তাহার গুত্রয় করিতে  
লাগিল। হেমন্ত দিগির কোঁকে কখনও বলিতে লাগিল,

"বো, বো, বো! বক্কে না, রাগ কব্বে না! বল ভাগ কব্বে  
না!" কখনও বা কিসের একটা মাত্রিক আনন্দে হাসিয়া  
উদ্বিগ্ন বিভার নাম অতি সেহে আনন্দে অশ্রুমাণায় মত উজ্জ্বল  
করিতে লাগিল। সেখানে বিরক্তিকর মনে হইলেও পরে  
তাহা বিভার মনে লাগিতে লাগিল, এবং সেই সত্যের হামির  
নির্জনতার মধ্যে তাহাণের দুইজনের অতি সান্নিধ্যের  
ক্রমবর্ধনশীল উপলব্ধি ক্রমশ: তাহার তরলারিত মনকে চক্কর  
আকর্ষণে চাপিয়া বহিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল এট  
লোকটির প্রতি তাহার যে টান, তাহা ইহার ব্যবহারেও  
ইতরতাহ বা অস্ত কোন কারণেই ত্রাণ হইবার নহে! সে  
ভাবিল সেদিন স্নানিতে বাহা বহিরা গিয়াছিল তাহার মধ্যে  
বহি কণামাত্রও সত্য থাকে বাহা তাহার পূর্ণাঙ্গীল সত্যগ্রহণ  
বিমা'র নিকটে অশুভ সত্য—তাহা হইলে, হেমন্তের  
লগ বিভার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সত্যার্থের  
অপরিহার্য নিয়মে তাহাকে ত গ্রহণ করিতেই হইবে।  
এ হতই মন হউক, বিভাকে ভাবেন মরণে ইহার সন্ধীভূতপে  
থাকিতেই হইবে! তন্মাত্র মনের উপর বিধা এই লগল  
চিত্তা বহন জাগিয়া গাইতেছিল তাহারই মধ্যে বিভার  
কবরের আলোক ও অহুয়াগ কর্তব্যের দোয়াই দিয়া  
তাহার কায় এবং মন দুইটিকেই তাহার পরম-  
প্রীতিভাষনের সন্ধীভূতপে সেই নির্দিষ্ট নির্জন গৃহে আবদ্ধ  
করিয়া রাখিল।

বিতা কখন যে হেমন্তের গাশে চুলিয়া বুমায়া পড়িয়াছিল  
তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। অতুলের মা ভোয়ের দিকে  
সেই বাড়িতে বান দিচ্ছ না কি একটা কয়ে  
আসিতেছিল, চৌমন্তপের এই দৃশ্যট তাহার নজরে  
পড়তে সে মর্মান্বিত হইয়া গেল। বিভাকে সে হাতে করিয়া  
মাতুল করিয়াছিল, এবং তাহার যে পাচ বৎসরের মেয়েটি  
পেটমোড়ী দীর্ঘা লইয়া এবং বোকাগৌর অরে কুণিয়া  
মাগেলিয়া রাকগৌর পর্বত হইয়াছিল, সে বহি  
আর বাসো ভোয়া কদর বাচিয়া থাকিত, তদা হইলে  
তাহার উপর এট পল্লী-মাতাটির যে দেহ সজ্জিত  
হইত, তাহার প্রতিপালিতা এই ব্রাহ্মণ-কুমারীটির উপরও  
সেইরূপ যেকই সম্মান ছিল। আশ্রয় পাছ এক নিই

তাহার প্রতি পাত্রাটির এই অধ্যয়নে অতুলের মা'র মন যে কতটা তিক্ত বিরক্ত ও কাতর হইয়া উঠিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু তাহার মনে তখন লক্ষ্যপেমা বলবতী হইয়াছিল যে, এই অসদৃশ পুত্র স্বাভাৱে মার কাণ্ডের চক্ষে না পড়ে তাহারই বাহা কড়া, এবং সেই ভয়েই সে লক্ষ্যপ্রকার বিধা পরিত্যাগ করিয়া বিভাকে ডাক দিয়া ভগ্নগায়ী তুলিল। হঠাৎ আশ্রিত বিতা উঠিয়া বলিয়া অতুলের মা'র স্থান এবং ক্রোধে পড়ার মুখ দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য হইল, কিন্তু পরক্ষণেই পার্শ্ব অকাতরে নিদ্রিত যেমতক দেখিয়া রাত্রির সমস্ত ঘটনা মনে পড়ায় চৌকির উপর হইতে বহিঃ পতিতে মানিয়া পড়িয়া অন্ধরের দিকে ছুটিল। তখন তাহার মনটা নিজের উপর বিচারে এবং হেমসের উপর বৈরাগ্যা একবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

১১

সেদিন কি একটা উপলক্ষে বিভাবের গৃহে অতুলের মা'র নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। অতুলের মা, বিভা ও তাহার কিম্বা একত্রে বলিয়া বাইতেছিলেন। খাওয়া এখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে বিভার পাতের দিকে চাহিয়া বাসুন মা বলিলেন, “পাতের ভাত যে পাতেরই হইল মা ! কি খেলি ?”

বিভা একটু ঝঁপ হাসি হাসিয়া বলিল, “পুত্র ত বেয়েছি তিমা, আর কত খাব ?”

বিভাকে বাসুন মা'র উজ্জ্বল পানরথানা লইবার জন্য হাত বাড়াইতে দেখিয়া অতুলের মা বলিল, “ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আঁচাতে যাও।” সে চলিয়া গেল বাসুন মাকে লক্ষ্য করিয়া অতুলের মা বলিল, “মেরে যেন কি ভেবে ভেবে দিনকের দিন কাটি হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাকেও বলি বাসুন মা, তুমি যে তখন রোগের কোঁকে কি একটা কাড় ক'রে বসলে ! এখন এগোবার যো নেই পোকোবারও যো নেই—”

একজন ভয়বাহিকা সেখানে আসিয়া ঝাঁকাইল। তাহার হাতে তথের গামতী দেখিয়া বাসুন মা কিশোর চোটা দবেও তাহার আত্মরিক বিরক্তির সম্বন্ধ গোপন করিতে পারিলেন না। শুধু তাই বলিলেন, “আবার তবু কেন ?”

শ্রোণোক্তি উত্তর করিল, “ম্যানেজার বাবু মলংবল

থেকে এলেই পাঠানো। বললেন বিয়েটা এখনও হয়নি বটে, কিন্তু আনিস পারিবার মা, নৃতন গিভিটিক পুজোর কাশড় গোপড় না পাঠালে হয় ত রাগ ক'রে বসবেন। তা তুই একবার যা, আমার হ'য়ে তু একটা ভাল কথা বলে আর। বুড়োর আর—” হঠাৎ পানরতীর মা ধামিয়া দিত কাটিয়া বলিল, “তা মা বলস আর কতট বা !”

অতুলের মা কি বলিতে বাইতেছিল, রামেশ্বর চক্রবর্তীকে আসিতে দেখিয়া ধামিয়া গেল।

“কি কে, পারিবার মা বে” বলিতে বলিতে আসিয়া আনিত ব্রহ্মপলির উপর লক্ষ্য করিয়া রামেশ্বর পরম প্রশস্ততার সহিত বলিল, “এলব বিভার জন্যে বুকি, দেখি দেখি !” সে এতলের শিশিভাগ উদ্ভেদিয়া পাদুগা দেখিয়া ঢাকাই পাটখানি হাতে তুলিয়া ধরিয়া “বাঃ, বেশ দামী ভিনিল ত—” বলিয়া আনক একাশ করিতেছিল, এমন সময় বিভা আঁচাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতে কাশড় দেখিয়া ভিজাসা করিল, “কার কাশড় বাবু দা ?”

উত্তরে রামেশ্বর তাহার দত্ত পাকি বিকশিত করিয়া জবাব দিল, “তোমারই দিলি, আর কার ? আমাই বাবু ম্যানেজার বাবু পাঠিয়েছেন।”

ভিনিকা বিভাসেখান হইতে দরিয়া ধরের ভিতরে দিরা ঢুকিল। এই সময়ে হেমন্ত কি একটা কাজে সেখানে আসিতে রামেশ্বর তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, “দেখ তে চাটুংগা, আমাই বাবু কেমন তব পাঠিয়েছেন !”

“আমাই বাবু ?”

“হ্যাঁ হে, ম্যানেজার বাবু। আর কতকি মালের এই কটা দিন গেলেই তোমাদের লকলকেই ত ঐ কথা বলতে হবে। আমি না হয় দুদিন আসে থেকেই—” হঠাৎ হেমসের মুখের উপর দৃষ্টিটা পড়িতে যেন একটু চিহ্নিয়া কথাটা শেন করিয়া দিল, “তোমার উপর কিন্তু পুণ শতাবে। বলছিলেন, ছোঁকরা বড় পরোপকারী। সম্পকটা হ'য়ে গেলেই বড়বাবুকে ব'লে ওকে একটা নকলনবিশি ক'রে দিতে হবে।”

ধরের ভিতর হইতে বিভার তাকোজ্ঞান চক্ষু দুইটি এবং বাহির চাইতে বাসুন মা এবং অতুলের মা'র দৃষ্টি এক শঙ্কে



হেমন্তের অলঙ্কার তাকার মুখের উপর স্থাপিত হইল। সে তখন বামেশ্বরকে স্নেহের স্বরে ক্রিয়াদাঃ করিতেছিল, “আর আপনায় হু?”

সমস্তিত বামেশ্বর হাস্য করিয়া চান্দ্রিয়া বলিল, “যারে ভাই, তুমি হুতে চলে আপনায় লোক—বড় কুটুম—আর আমিই হু।”

তখন দৃঢ়া মস্তান্ত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রামণ্ডলের চৌকিবানিত উপর বসিয়া হেমন্ত কি ভাবিতেছিল। একটি ছেলে চান্দ্রিয়া বলিল, “চাটুংঘো মশায়, আপনি একলা মজকারে হু?”

হেমন্ত অস্ত্রমনস্কভাবে বলিল, “টল, এখনও আলো নিশে যাব নি।”

“আমি আমি গে” বলিয়া ছেলেটি বাটিন ভিতর হইতে একটি আলো আনিয়া দিলে হেমন্ত তাৎকঃ ক্রিয়াদাঃ করিল, “ভিতরে সব কি করছে যে হামু?”

“বিভা নিমি মলুতে পাখাচ্ছে। বাসুন মা অতুলদের বাড়িতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।”

হেমন্ত কি একটু ভাবিয়া বলিল, “হাম, এখনও যে কেউ আপুছে না।। আরও কালেকর মত আজ্ঞাটা কাক বাবে না কি হু?”

“না, চাটুংঘো মশায়, আজ্ঞা কি কাক যাব। তবে এখন বড় সবজাদি হচ্ছে, আর পুংঘোতে ক্রামপুংঘুর গীতুংঘোনের বাড়ি খিয়েটার এসেছে। কাল গা শুভ লোক তাই দেখতে গেছল বলে—”

“তা বাট হু ক ভাই, কাল তোমরা কেউ এলে না, আমার বড় একা ব’লে মনে হচ্ছিল—”

“তা হবেই ত। আপনি হলেন মমলিনি মাহু।”

“আজ্ঞা, আজ একটু ভাল ক’রে মমলিসু করা থাকু। কামারদের বানীকে আর পালেদের হংসকে ডেকে নিয়ে এস।”

“চাকুতে হবে না চাটুংঘো মশায় তাহা—আপনিই এসে প’ড়ে এট—”

“না হে। তুমি তবলাটাও আনা চাই কিনা। তোমাকে একবার যেতেই হবে।”

“আজ্ঞা আজি—” বলিয়া হামচন্দ্র চলিয়া গাইবামাস হেমন্ত উদ্ভিগা গাঁড়াইয়া একটু ইচ্ছান্তত করিয়া নিঃশব্দ পদ-সকলের অন্ধরের গর্বে চলিল।

বিভা যেখানে নির্ধনে বসিয়া গলিতা পাখাইতেছিল, হেমন্ত সেখানে আসিয়া পাখাইতেই সে একবার মুখ তুলিয়া চাতিয়া দেখিল, কিন্তু তখনই বিরক্তি ভরে মুখ নত করিল। হেমন্ত একবার পিছনের উঠানের দিকে চাতিয়া গিয়া বলিল, “বিভা, তুমি কি আর আমার সঙ্গে কথা ক’বে না হু?” কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার বলিতে লাগিল, “দোষ আমার পূর্ব হুওছিল হানি। রাগও তোমার পূর্ব হু’তে পারে সত্যি। কিন্তু আজ তোমাকে যে কথাটা বলতে এসেছি, তার শেষ মায়ালা এত দরকারী—”

বিভা তাহার বিরক্ত-মলিন মুখবানি তুলিয়া হেমন্তের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিতেই সে বলিয়া উঠিল, “আজ আবার হরিপুর থেকে তব এসেছে—”

বিভা তাহার কথা শেষ হইবার আগেই তক্তার দিয়া বলিয়া উঠিল, “হা, তাতে তোমার কি হু?”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হেমন্ত আবার বীরে বীরে বলিল, “আমার নিষেধকিছু কি না। সে কথা তোমাকে আমি জানাতে চাই না, আর আনিরেও রহত কোন কল নেই। কিন্তু সে বিনকার হাত্রে কি-মা আমাকে যে সত্যে আবদ্ধ—”

বিভা অস্বাভাবিক ভীতভার গহিত বলিয়া উঠিল, “তোমাকে এখন বার বলেছি কি-মা বিকারের বোঁকে কি বলেছেন তা’ নিয়ে তুমি আমাকে ব্যর্থতার অপমান করো না, কিন্তু তুমি এত ইত্তর, নিগর্জ, মিটুর—”

“আমাকে এই শেষবার স্থাপ কর বিভা। আমি সত্যই তোমাকে নানা রকমে আগাঠন করেছি—কিন্তু আজ থেকে—”

বাধিরে বাসুন হার সত্য পাইয়া হেমন্ত সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। (আগামী সংখ্যার সমাপ্তা)

## কোরিয়া ও জাপানে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুগ্মগা দেবী

বৌদ্ধধর্ম প্রাকৃত হইয়া চীন দেশে নিজেই বৌদ্ধধর্ম গঠনের প্রসঙ্গ হইল। পুণ্ডরীকচূর্ণপতাকাতে কোরিয়া ভাষায় নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্ত করে। ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে Twin রাজত্বকালে Sinto নামক এক চীনা প্রথম কতকগুলি মূর্তি ও ধর্মগ্রন্থ লইয়া Kokuryoতে আসেন। কোরিয়া তখন তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল—Kokuryo, Paikhe এবং Silla। চীন ও কোরিয়া উভয় স্থানেই এই কিম্বদন্তী কোরিয়ার আদিম উপনিবেশ স্থাপন করে। বস্তুত কোরিয়ার আদিম অধিবাসীদের ইতিহাস সঠিক জানা নাই; তবে তাহারা মঙ্গোলীয় ছিল ইহা নিশ্চিত এবং তাহাদের ভাষা ছিল তুরানীয় (Turanian Group) বর্গের। বাগা চউক, চতুর্ভুজপতাকাতে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করিবার পর অতি অল্পসময়ের মধ্যে কোরিয়ার সমস্ত বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে বৌদ্ধ প্রথমধর্মের কথতা, উদ্ভূতবহু রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক ছিল। মাঝে মাঝে এই কথতার উপলব্ধির ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মকে উৎপাদিতও ভোগ করিতে হইত। \* অতঃপরেও বৌদ্ধধর্ম তথা হইতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। চীনে যখন সাম্রাজ্যিক অগ্রবিক্রম ও অশান্তির ফলে বৌদ্ধধর্মের Tientai শাখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন কোরিয়ার একজন প্রথম সেই শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। চীনা খ্রীষ্টীয়ের যে প্রাচীনতম স্মৃতিস্মৃতি এখন পাওয়া যায়, তাহা কোরিয়াতেই ছিল; সেখানে হইতে সেটি জাপানে লইয়া যাওয়া হয়। ইংলি: পরিভাষিকদের দ্বারাও কতিপয় কোরিয়াবাদী পরিভাষিকদের উদ্দেশ্যে করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

কোরিয়ার বর্ণমালা সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর অনেক বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাহা ভারতীয়। ঐক কোরিয়া হইতে কেমন করিয়া ভারতীয় বর্ণমালা তথায় যাইল সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত বলা না যাইলেও Leonde Rosny তাঁহার 'Les Coreans' নামক গ্রন্থে বলেন যে, কোরিয়ায় বর্ণমালা দ্রুত যে ভারতীয় সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহার পর আরও বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন। কোরিয়ার বর্ণমালা: দ্রুত ২৫টি; তাহার মধ্যে ১৪টি বাস্তব, ১১টি ব্রহ্ম। জয়েনসানের বিবরণে দেখা যায় তিনি নিবিশ্বাস করেন ভূবার্ষ্যে, কৃষ্ণায় যে অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহা সাধারণ ২৫টি; এবং বামদিক হইতে দক্ষিণে লেখা হয়। ইহা সুবই সম্ভব যে, কোরিয়াবাদী পরিভাষিকদগ্ন ঐদিকল স্থান হইতে তথাকথিত বর্ণমালা: নিজেদের দেখে লইয়া যান।

কোরিয়া আবার জাপানকে বৌদ্ধধর্মের বাণী ওনাইল। শুনা যায় যে, ৪২২ খ্রীষ্টাব্দে Shibu Tachito নামক এক চীনা প্রথম তথায় যাইয়া এক বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের এক মূর্তি তথায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টার তেমন ফল হয় নাই। ইহার তেরদশ বৎসর পরে ৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা সাম্রাজ্যিক সূত্র স্থাপনের নিমিত্ত বুদ্ধের একটি প্রতিমূর্তি সঙ্গে লিয়া Yamatoয় রাজসভার দূত প্রেরণ করেন। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে আবার কতকগুলি বুদ্ধের মূর্তি এবং বৌদ্ধগ্রন্থ লইয়া কোরিয়া হইতে দূত আসে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম বাহ্যিকভাবে প্রভাব বিস্তার করিবার পক্ষে নানাকল্প প্রতিদ্বন্দ্ব অথবা তিস্ত দিয়া তাকাকে বাইতে হয়।

কোরিয়া হইতে বৌদ্ধ প্রথমগণ জমাগত জাপানে যাইতে লাগিলেন; ধীরে ধীরে জাপানেও একটি দল তাহাদিগকে



উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে এক  
 িক্ষুী আসেন জাপানে। আবার ৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিনয়  
 অধ্যয়ন করিবার জন্য কয়েকজন জাপানী শ্রমণ যান  
 কোরিয়ায়। উহার পর চীনে পড়াচা খীর দ্বারা জাপানের  
 উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। খ্রীষ্টীয় বর্তমানতাব্দী  
 পঞ্চম জাপানে কোনও বর্ষমালা ছিল না। ক্রমশ  
 শিক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে চীনা শিখিবার প্রচলন হইল;  
 এবং বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষাই জাপানকে উন্নতির  
 পথে আগাইয়া দিল। প্রথম শতাব্দীর প্রথম দিকে  
 Shotoku Taishi নামক জনৈক জাপানী রাজকুমার  
 জাপানের শিক্ষানীকার আমল সংস্কার-কাজে জাপানকে  
 উৎসর্গ করিয়া গেলেন। তখন হইতে চীন হইল  
 জাপানের শিক্ষাগুরু। কি সাহিত্যে, কি শিল্পে  
 সমগ্রতঃ বৌদ্ধপ্রভাব আদিয়া পড়িল। কুমার শতক্ বে  
 বিদগ্ধি নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই সেই যুগের  
 শিল্পের নমুনা পাওয়া যায়। শতক্ বৌদ্ধ চিত্র ও পতাকা-  
 শিল্প চিত্রিত করিবার জন্য বুদ্ধবিগ্রহের সন্ধান করিলেন।  
 এই যুগে নৃত্য শীল নৃত্যদ্বয়ই বৌদ্ধপ্রভাব অনুপ্রাণিত হইয়া  
 নৃত্যন আকারে গ্রহণ করিল। শতক্-নির্মিত বিহারটি  
 বৌদ্ধমত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহাতে একাধারে  
 বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।  
 বিজ্ঞান 'শিল্প ও বৌদ্ধধর্ম' শিখিবার জন্য শতক্ যেন যেন  
 চীনে প্রেরণ করিতেন। ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি  
 বহু: শতাব্দীর লক্ষ্যে তিনটি বৌদ্ধ যুগে স্বাধীনভাবে  
 বক্তৃতা করেন। তখন জাপানের সম্রাজ্ঞী ছিলেন সুই  
 Suiko; শতক্ ছিলেন ইহারই ভাগিনেয়। তিনটি যুগের  
 একটি হইল শ্রীমাল্লাদেবীসিংহনাদ, দ্বিতীয়টি  
 বিনয়কীর্ত্তিমন্দির, তৃতীয় হইল সঙ্ঘর্মপুণ্ডরীক।  
 প্রথমটিতে বৌদ্ধধর্মের কৰ্ত্তব্য নির্দেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি  
 স্বাধীন আমরা পূর্বে চীনা সাহিত্যগ্রন্থকে বলিয়াছি।  
 ইহাতে একজন আদর্শ পুত্রের চিত্র দেওয়া হইয়াছে।  
 সঙ্ঘর্মপুণ্ডরীক স্বাধীন আমরা পূর্বে বলিয়াছি।  
 চীনে যে Tientai শাখা ছিল, সঙ্ঘর্মপুণ্ডরীক তাহার একটি  
 প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই Tientai মত জাপানেও বিশেষ

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সঙ্ঘর্মপুণ্ডরীকে বলা হইয়াছে  
 যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধতাব নিহিত রহিয়াছে।  
 অজ্ঞানতা ও বাসনা দ্বারা তাহা এই বুদ্ধত-উপলব্ধিই হইতেছে  
 একমাত্র লক্ষ্য; বুদ্ধতাবই একমাত্র সত্য পথ। সমগ্র  
 বিশ্ব এটি একই সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

গ্রন্থে জাপানে এখন বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিল  
 তখন বিশেষ কোনও শাখার কথা কিংবা তাহা বার  
 নাই। ক্রমশ মধ্যমিক শাখার শক্ততাবাদ, যোগাচারবাদ,  
 অবতঃস্বত্ববাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ  
 করিতে লাগিল। বিনয়ের বহুগ্রন্থও জাপানের প্রাচীন  
 মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। এইই শতাব্দীতে Tientai  
 মত জাপানে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে। সঙ্ঘর্মপুণ্ডরীক  
 এই শাখার প্রামাণ্য গ্রন্থ যটে, কিন্তু চীন ও জাপান  
 উভয়দেশেই এই মত কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত  
 হইয়া বিভিন্ন আকারে গ্রহণ করে।

তদ্ব্যবধান চীন হইতে জাপানে লইয়াযান Kobo Daishi।  
 Kobo Daishi চীনে ভারতীয় শ্রমণ প্রচারক মিত্র মত  
 শিক্ষা করেন। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম ও বিশেষভাবে জ্ঞান  
 শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরেন। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা  
 করেন Shingon মতের।

বর্তমানে জাপানে প্রধানত তিনটি বৌদ্ধশাখা রহিয়াছে।  
 প্রথম হইল Jodo বা সুখাবর্তী শাখা। ১১৭৪ খ্রীস্টাব্দে  
 জাপানে এই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২২৪ খ্রীস্টাব্দে Shin  
 শাখা গড়িয়া উঠে। Jodoই সংস্কৃত শাখা হইল Shin,  
 Shinএর অর্থ হইল সংস্কৃত (Reformed)।

১১৯১ খ্রীস্টাব্দে যান বা Zen শাখার উৎপত্তি হয়।  
 পূর্বে ইহা Tientai শাখারই অন্তর্গত ছিল, এখন হইতে  
 বিভিন্ন একটি শাখার পরিণত হয়। জাপানে ইহার প্রভাব  
 যুব বেন্দী। ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে Nichiren নামক আর  
 একটি শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার প্রভাবও কম  
 ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম তির অজ্ঞাত বিশ্বদর্শনও জাপানীশন  
 প্রচার পতিত আলোচনা করিতেন। সাময়িক জ্ঞান  
 ছয়নগাও, বৈশেষিকের একটি গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করিয়া-



ছিলেন। ইতার কোনও জিন্দাচীনগণ লিখেন নাই। কিন্তু পরে জাপানে এট প্রথমে বর্ণিত জিন্দাচীনগণ লিখিত হয়। বৈজ্ঞানিক দিক্‌নাগের এত যেমন চীনে সম্ভবপর লাভ করিয়াছিল, তেমনি করিয়াছিল জাপানে। জাপানী প্রমণপত্র প্রকাশ্যের বহুগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

আজকাল জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কেবল বণিকের দিক্‌ দিয়া। কিন্তু এক সময় ভাগানের মধ্যে পত্নীভক্ত একটি সম্বন্ধ যে ছিল, অল্প চটপটে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাপানী পণ্ডিত তাকাকাসু বলেন, "চতুর্দশবৎসরই আমাদের ইতিহাস সেই ভারতীয় ত্রিকুণ্ডের ও ভারত-পর্বাটক জাপানী ত্রিকুণ্ডের কাহিনী লিখিত করে নাই। ভারতের সঠিত সাক্ষাৎ লব্ধের যে সম্ভাব্য ঠ'একটি নিদর্শন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিও ক্রমশ বিহ্বলিত অতঃপর্বে ভূবিদ্য বাইবল বর্ণিত হয়।" ইংলিঃএর কাহিনীতে যে ১৪ জন ভারত-পর্বাটক প্রমণের উল্লেখ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কোরিয়াবাসী। নস্তুতি Tun-huanএর গুংগর কল্পনা পণ্ডিত Pelliot একটি গ্রন্থ পাইয়াছেন। এটি Huichiao নামক কোরিয়াবাসী এক প্রমণকর্তৃক লিখিত একটি প্রমণ কাহিনী। তাহাতে দেখা যায় যে, জাপানী প্রমণও কেহ কেহ ভারত পর্বাটকে আসিয়াছিলেন।

একটি প্রসিদ্ধ চীনা গ্রন্থে দেখা যায় যে, ৮১৮ খৃষ্টাব্দে Kongo Sammai বা বজ্রসমাধি নামক এক জাপানী লমণ ভারতে আসেন। তিনি 'মহাশয়' পর্বাট গিয়াছিলেন। সেখানকার কতকগুলি মন্দিরে তিনি বিভিন্ন বর্ণের মেয়ের চিত্র আঁকিয়া আসিয়াছিলেন। বহুদিন পর্বাট কোনও উৎসবের দিনে ভারতবাসীগণ সেই সকল মন্দিরে আসিয়া জাপানী চিত্রের সেট সকল চিত্রের নিকট প্রত্যক্ষ অবনত করিতেন।

৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Takaoan নামক এক জাপানী রাজকুমার ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহার জ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা মন চীন ও জাপানের বিজ্ঞানদ্বারা পূর্ণ হইতে পারে নাই। সেই কারণে ভারতে আসিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রপথে বাইতে বাইতে

Laot নামক স্থানে আসিয়া অল্পকাল বসে ও সেখানে মারা যান। কিংবদন্তীর একেলগে Shinnua অনুমান করেন যে এট Laot স্থানটি নিম্নাপুত্রের নিকটবর্তী কোরো স্থান হইবে। নিম্নাপুত্র কুমার Takakura একটি স্বতন্ত্রত্ব নিদর্শন করিয়া বর্ণিত জাপানীগণ মনত্ব করিতেছেন।

ভারতীয় প্রমণবিদের পক্ষে সন্দেহ বৈধ জাপানে যাত্রা তখনকার দিনে তেমন সহজ ছিল না। সুতরাং মহাশয় দিয়া তাঁহার প্রায়ই চীনে বাইতেন। সমুদ্রপথ দিয়া যাওয়ার বাইতেন তাঁহারও ক্যান্টনে আসিয়া চীনে চলিয়া বাইতেন। তাহাকে করিয়া জাপানে বাইবার তেমন সুবিধা ছিল না। এই সকল অনুবিদ্যাসূত্রেও অল্প কয়েকজন ভারতীয় প্রমণ জাপানে আসিয়াছিলেন।

কুমার নতকুর সময় Yamato এক গ্রামে ভারতীয় এক ত্রিকু ছিলেন। ত্রিকু করিয়া তিনি জীবিকানির্বাহ করিতেন। নতকু তাঁহার সঠিত একবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতির পর মহাপ্রয়াগে তাঁহার মস্তষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কেহ কেহ মনে করেন, এই ত্রিকু হইলেন বোধিসত্ত্ব। চীনে বহুকাল থাকিয়া জাপানে চলিয়া যান। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও প্রমাণ নাই। তবে নতকু যাহাকে দেখিয়াছিলেন তিনি যে একজন ভারতীয় যোদী, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কুমার নতকু তাঁহার নামে এক পত্র রচনা করিয়াছিলেন, সেই করিয়া এখনও জাপানে প্রচলিত আছে।

গুপ্তকর সিংহ চীন হইতে জাপানে গিয়াছিলেন বর্ণিত প্রবাদ। নস্তুতি তাকাকাসু, বর্মবোধি নামক আর একজন ভারতীয় প্রমণের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি রাজগুহের গুরুত্ব পর্বতে কবি জীবন যাপন করিতেন। চীন ও কোরিয়া হইয়া ইনি জাপানে আসেন। তাঁহার সঠিত একটি দৌরনির্মিত কামণ্ডলু ও সহস্রবস্ত্রমণ্ডিত অলংকারিতের একটি কুৎসিতলম্বী ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী জাপানে প্রচলিত আছে। একবার তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে তথাকার লম্বাটকে নোয়াগ করিয়াছিলেন। সেই সময় বিছুদিন রাজপ্রাসাদে থাকিয়া তিনি ধূম প্রচার করেন। তাঁহাকে রাজকুমারপদ প্রবী ব্রত করিতেন।



তাঁহার মতামতে পঞ্চ-বায়িক মতঃ নামক একটি ভাষ্যের আয়োজন তাঁরাই করেন। এই ভাষ্যে ধনী পরিহিত নিধিবেশে সকল প্রব্রীষ লোক আসিয়া যোগদান করে। তিনি যেখানে থাকিতেন সন্ধ্যাটি পরে সেই পর্বতের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। বর্ষাবোধির জীবন ও উপদেশের প্রভাবে বহুলোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ১৪১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষাবোধির উপদেশাবলীতে Dai-Zo-Ye নামে ত্রিপিটকের একটি উৎসব রাজপ্রমাণে সম্পন্ন হয়। এই উৎসবটি বহুকাল পরে আবার ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। তখন হইতে প্রতিবৎসর নিষ্ঠাবিধি বহুতাবির আয়োজন হয়। বর্ষাবোধি বৎ বৎসর জাপানে থাকেন, তাঁরপর সঙ্গী ভাতিতে কিরিয়া আসেন।

বুদ্ধসেন নামক চন্দ্রকুমারভাষ্যে এক আশ্রম ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে আসেন। Gyogi নামক জাপানী এক পণ্ডিত সন্ধ্যাটের আবেশান্ত্রায়ে বুদ্ধসেনকে অত্যাধীন করিয়া আনি-লেন। Gyogi সংস্কৃত ও জাপানী উভয় ভাষার সমিশ্রণে এমন এক ভাষার বুদ্ধসেনের সহিত আলাপ করিলেন যে, বুদ্ধসেন সচক্ষেই তাঁরা বুঝিলেন। আলাপ আলাপের মধ্য দিয়া উভয়েই বুঝিলেন যে, তাঁরাবের সত্যমত প্রায় সম্পূর্ণ মিলে। বুদ্ধসেন Daianji বিহারে থাকিয়া জাপানী ভ্রমণ-বিধিকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে লাগিলেন, অমিত্যভুবাধ ও বাধ্যা করিতে লাগিলেন। ত্রমশ তিনি মিছে একটি বিহার স্থাপন করেন; বিহারটির নাম Hyosenji বা গুয়কুটবিহার। ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই তিনি মারা যান।

বুদ্ধসেন সংস্কৃত শিখাটবার সময়ে জাপানী বর্মমালা সংস্কৃত ছাঁচে পঠিত হইয়া উঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সংস্কৃত না জানে কোনও ব্যক্তির পক্ষে এইরূপভাবে বর্মমালা সাজান অসম্ভব। আসিয়া জাপানী বর্মমালায় নমুনা দেখাই-লেই বুঝা যায় যে সংস্কৃত প্রভাব ইহাতে কতখানি।

### ব্যঞ্জনবর্ণ—পঞ্চলগ্ন

|                                             |   |   |    |         |
|---------------------------------------------|---|---|----|---------|
| ক                                           | খ | ক | কে | কো      |
| চ                                           | ছ | চ | চে | চো      |
| ( এই বর্ণের মত ও নতন বর্ণ লভ উচ্চারিত হয় ) |   |   |    |         |
| ট                                           | ঠ | ট | টে | টো      |
| ড                                           | ঢ | ড | ডে | ডো      |
| য ( প্রকৃতি )                               |   |   |    |         |
| ম                                           | য | র | ব  | ইত্যাদি |

এইরূপে দেবনাগরী অক্ষরের ৩৭টি বর্ণই ইহাতে অবিকল রহিয়াছে।

চীনা ও জাপানী বৌদ্ধগণ সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু চীনে সংস্কৃত গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না; কেবল চীনা ত্রিপিটকের মধ্যে যাহা যাহা সংস্কৃত অক্ষর দেখা যায়। কিন্তু জাপানে সংস্কৃত পুঁথিবন এখনও পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি চীনা হইতে আনীত; কতকগুলি মূল গ্রন্থ হইতে জাপানেই অহুগৃহিত। মাঙ্গল্লার তাঁহার Buddhist Texts from Japan গ্রন্থে এইরূপ বহু সংস্কৃত পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানে অতি পুরাতন কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারে এই সকল মূল্যবান পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। অবশিষ্টগুলি অসম্পূর্ণ; তবে কোনবৃণে সেগুলি লিখিত তাহা সেই ষিগুপুঁথিগুলি হইতেই বোঝা যায়। যে সকল সংস্কৃত পুঁথি এখন পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে এগুলিই প্রাচীনতম। পুঁথির নবম পত্রাঙ্কে তাৎক্ষণিক বিহারের একটি তিস্তুর বহুগৃহিত। তিস্তুর নাম প্রকৃত। ইনি পুঁথিটি চীনে গইয়া যান। সেখান হইতে তাঁহার এক জাপানী শিষ্য এটি জাপানে গইয়া আসেন।

৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া প্রথম জাপানী ত্রিপিটক Issikiyōর উল্লেখ দেখিতে পাই। ত্রিপিটক নকল করা জাপানে একটি পূণ্য কাব্য মনে করা হইত। একজন সন্ধ্যাট-ন্যাক একদিনে ইহা নকল করিয়া দিবার জন্য ১০০০০ অল্পলোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জাপানের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে।

কোরিয়া ও জাপানে হিন্দুসংস্কৃতি  
ঐগণভেদকমার মুদ্রাশাখার ও ঐগণদাময়ী দেবী

জাপানই প্ৰথম movable অক্ষর দিয়া হ্রস্পটক ভাষাভাষ্য

ভেট্টা করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জাপানে একটী মুদ্রা

১৯১১খানি প্রকাশ

করে। এখনও বোধহয় প্রকাশের কাল এই মত। ভেট্টা  
ভাষা আদিভেট্টা। সংস্কৃতি হ্রস্পটকের একটী আধুনিক  
তম সংস্করণ হওয়াতে জাপান ভেট্টা প্রকাশিত করিয়াছে। এত  
দূরত্বের সমস্ত বোধহয়, এমন কি মধ্য এশিয়ায়  
শাখা: শিখা: দেউলি, আছে।

এখন জাপানী পুস্তকাদি বোধ সাহিত্য ও অজ্ঞা  
ভাষাভাষ্য সাহিত্য আবেগিনার নিমিত্ত কি করিতেছেন  
মধ্যে কিছু বলা প্রয়োজন। বোধহয় চান ভেট্টা জাপানে  
দিয়াছে যে আদি জাপানী বচনের অধিক। সেখানে  
নানা পুস্তকাদির মধ্য দিয়া দিয়া এখন জাপানী বোধহয়  
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষাভাষ্য করিয়াছে—অথচ মূল হ্রস্পটক  
একটী আছে। বর্তমান জাপানে ১১টী বোধ সম্প্রদায়—  
ভাষার শাখা ভেট্টা বচন। পুস্তক সম্প্রদায়ের শিখার  
ভক্ত পুস্তক বিভাগ আছে। এমন কি টোকিও, কিওটো,  
টোহোকু, কিউশু পুস্তক বিভাগের বিখ্যাতভাষ্যের সংস্কৃত



## অমরনাথের পথে

ঐ অশ্বিনীকুমার দাশ

### উপক্রম

ঐনগর পৌষিয়ার একদিন পরে ঐনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ঐশ্বরীপ্রসাদ দাস মহাশয়ের নিকট তুলিলাম যে, মহাত্মা বাজ্রীপনকে অমরনাথের পথে বাইতে দিবে। অমরনাথ র্পনের সময় আগরপ্রার। মাত্র চারটি দিন অবশিষ্ট আছে। আরও তুলিলাম যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে অমরনাথের পথে বাজ্রীপনের ব্যতীর সুবিধার জন্য এটা কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভবপর তাহাও রাজসরকার হইতে করা হইবে। বঙ্গের প্রার সমস্ত সমস্ত অমরনাথের ভাণ্ড ও গুহার পথ নিরুদ্ধি তুবারে আবৃত থাকে। বঙ্গের এই সমস্তই অর্থাৎ প্রাণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে বঙ্গের তুবার অল্প থাকে সেই বঙ্গের কান্ড-রাজ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া বাজ্রীপনের ব্যতীরের উপযোগী অস্থায়ী পথ সজ্জিত করাইয়া দেন। শব্দে মধ্যে অগাধ ক্ষুদ্র রক্ত বহুতোতা নদী ও বঙ্গ। আছে, দেশটির উপরও অস্থায়ী সেতু নির্মিত হয় এবং রাজসরকারের কর্তৃপক্ষগণ ভগ্নম স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বাজ্রীপনের গতি নিগাহত করেন। চিন্তিতে পাই। একটি দাতব্য টিকিৎসা-বিভাগও বাজ্রীপনের গতি প্রতি বঙ্গের বাইরা থাকে। এট সফল ব্যবস্থা না হইলে বাজ্রীপনের পক্ষে তুবারজের ভগ্নম অমরনাথ ব্যতীর সম্ভব হইয়া পড়ে। যে বঙ্গের ক্রম ও ভাণ্ডার পথে অত্যধিক তুবার থাকে, সে বঙ্গের বাজ্রীপনকে বাইতে দেওয়া হয় না। কান্ডের পথে, রাউলপিন্ডিতে উপনীত হইয়া, বাঙ্গালীদিগের কালীবাড়ীতে বাঙ্গালী পুরোহিত মহাশয়ের নিকট এই বঙ্গের অমরনাথের পথ বন্ধ থাকার কথা শুনিয়া আমাদিগের সর্বলের মন নিরাশার ভরিতা পিতাছিল। যখন এত ক্রেশ দীকার করিয়া এতদূর আসিচ্ছি তখন শেষ পর্যন্ত কি হয় তাহাই দেখিবার জন্য অনুরোধ উপর নির্ভর করিয়া আমরা

দয়াক্ষোণিত চিত্তে ঐনগর অভিমুখে রওয়ানা হইরাছিলাম। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রদ্ধেয় বাগীন্দ্রবাবুর নিকট এই আশঙ্ক সংবাদ প্রদত্ত করিয়া আমাদের মনে যে কি আশঙ্ক হইল তাহা তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

বিপুল আশ্রয়ে আমরা সেই দিনই বৈকালে ঐনগরের বাজারে—আমিরা কদ্দু বাজার (Amira Kuddi)—গমন করিলাম; এবং একজন পরিচিত মোটরগাড়ার নিকট বাইরা ঐনগর হইতে ৬২ মাইল দূরবর্তী পাহলগাঁ (Pahalgam) পর্যন্ত একটি 'বাস' বাতায়নের ভাড়া এক শত টাকার ঠিক করিয়া আসিলাম।

বৃহস্পতিবার, ১৪ই আশ্বিন—মোটর

প্রভাতে দয়াক্ষোণিত করিয়া বাহিরে আসিলাম। পূর্বাভাসে অবিরাম ধারার বৃষ্টি হইয়া নিগাহে। তখনও বাস্তবধর্মের নিশ্চিতি হয় নাই। সমস্ত আকাশ একঘণ্ড কালো মেঘে আচ্ছন্ন। প্রকৃতির বিরহ বদন দেখিয়া আমরা বিম্ব হইলাম, কিন্তু আমাদের বিম্বতা কণিক। অমরনাথ র্পনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নিকট অন্তরের বিম্বতা সুদূরে থলীন হইল। অমরনাথ ব্যতীর কাছোবনে আমরা বিরত হইলাম না। বধা সময়ে আমরা ভোজন সমাপ্ত করিয়া আমাদের পাহলগাঁ পর্যন্ত বাইবার জন্য যে 'বাস' ঠিক করিয়াছিলাম সেই বাসের প্রতীক। করিতে লাগিলাম। দয়াক্ষের পর আকাশ একটি পরিষ্কার বসিয়া বোধ হইল। বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু তখনও আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা বাইতেছে।

কেন্দ্র তিনটার সময় মোটার চাল লইয়া 'হবিবুল্লা' বাগীন্দ্র বাবুর যুগায় উপস্থিত হইল এবং জানাইল যে, মোটার পাহলগাঁ পর্যন্ত বাইতে পারিবে না, যেহেতু রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার ঐনগর ও পাহলগাঁর মধ্যে পথে একস্থানে

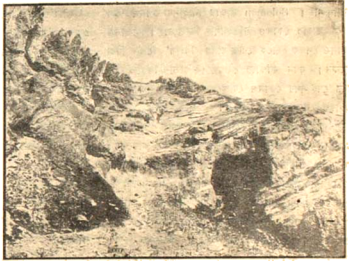
পাহাড় পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়া দিগাচ্ছ। আমাদিগকে সে 'তখন' পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল পথ মোটায় লটকা বাইবে; যদি 'তখনই' পরে পথ ইতিমধ্যে পরিভার কথা হইয়া থাকে 'ত' পাহাচলণী পর্য্যন্তই লইয়া বাইবে; নতুবা আমাদিগকে 'তখন' হইতে পাহাচলণী বাইবার স্বতন্ত্র বংশাবলি করিয়া লইতে হইবে। আমরা অষ্ট্রের উপর নির্ভর করিয়াই 'ত' রাউলপাণ্ডি হইতে রওজানা হইয়াছিলাম। সুতরাং চব্বিশুয়ার এই কুসংবাদে চুপিত হইলাম কিছু নিরাশ হইলাম না। অষ্ট্রের উপরই পুনরায় নির্ভর করিয়া আমরা চব্বিশুয়ার 'পূর্ণরূপে' আকড় হইয়া অমরনাথের পথে যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

আকাশে তখনও অন্ন অন্ন মেঘ। বর্ষণক্রান্ত মেঘরাশি দীর মক সমীরণশর্পে সগনমাগ্নে ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছে। ক্ষীণ মেঘ-জাল ভেদ করিয়া বৈকালিক সূর্যের বর্ণ কিরণ সূর্য্যবিরে পতিত হইয়া অপরূপ শোভায় প্রকৃতি হৃদয়কে সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়াছে।

পথের উত্তর পার্শ্বে সমুদ্রত পল্লার বৃক্ষ প্রৌঢ়বদ্ধভাবে দণ্ডার-মর্নি। বৃক্ষ সকলের শত্রুসমূহ তখনও দিক। পলবপ্রান্ত হইতে সজ্জিত ব্যতির্য্যাসি বিদ্যু বিদ্যু পতিত হইয়া বরষীর বৃক্ষের উপর ডুড়াইয়া গড়িতেছে। পল্লার প্রেয়ীর মধ্য দিয়া আমাদের মোটার টুটিয়া চলিয়াছে। Kashmir Gazetteer-এ দেখা যায় যে এই পল্লার বৃক্ষ কান্দীরগাত নছে; যেদিগর্য্যজর কালে অবৈক বোপল রাতপ্রতিনিধি দ্বারা অল্প বেশ হইতে (সম্ভবতঃ চীন হইতে) ইহা কান্দীরে আনীত হয়। ইহা ভারতের কুমারি নাই। দেখিতে এই বৃক্ষ অসীম সুন্দর; এত লম্বা তার কোনও বৃক্ষ হয় কিনা জানি না। কাঙ-

দেশ অত্যন্ত সরল; অনেকটা টউক্যালিষ্টাস বৃক্ষের স্তা। বৃক্ষের কাণ্ড বেশে কোনও পলব হয় না।

আমরা এগার জন আরোহী ছিলাম; চারজন মহিলা এবং সাত জন পুরুষ। এতখানাত, ঐনগর হইতে গোমগিঞ্জ বাবু একজন কান্দীরী তৃত্য সংগত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল।



অমরনাথের গুহা

### শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়

জতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রত পল্লার-বাধি পশ্চাতে ফেলিয়া, একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর সেতু দ্বারাযো আমরা ফিলাম নদীর একটি 'খাল' পার হইয়া ঐনগরের সীমানা অতিক্রম করিলাম। পথের সমুখে একটি পল্লত, যেন পথ রোধ করিয়া প্রকাণ্ড বৈতোর মত দাঁড়াইয়া বিরহাছে। পল্লতটিকে বামে রাখিয়া মোটার ত্রীর পতি-ভরে ঐনগর হইতে দক্ষিণ অভিমুখে টুটিয়া চলিল। এই পাহাড়টিকে স্থানীয় লোকেরা শঙ্করাচার্য্যের পাহাড় বলে। বিদেশী পর্য্যটকগণ ইহাকে King Solomon's Throne or



Tower নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পাহাড়ের শিখরদেশে একটি সোণাফার মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রস্তরনির্মিত। পর্বতের প্রান্তভাগ হইতে একটি পথ মন্দিরের দ্বারদেশ পর্যন্ত গিয়াছে। মন্দিরে উঠিবার ৫০০ ৫০০ ধাপ আছে। আশুপাল একটি তাঁত বৈদ্যাতিক আণোল প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরের উপর প্রদর্শিত করা হয়; তাহার রশ্মি বহুদূর হইতে দেখা যায়। তবে কাহার দ্বারা এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহার কোনও সম্ভাব্য নাই। Solomon রাজার সিংহাসন কখনও ছিল কিনা তাহার কোনও ঐতিহাসিক চিত্তি নাই। কোনও কোনও লোক ইহাকে বৌদ্ধ যুগের 'বিহার' আখ্যা দিয়া থাকেন। এখন কান্দীর বৌদ্ধগণের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে সেই সময় কোনও বৌদ্ধরাষ্ট্রদ্বারা ইহা নির্মিত হইয়া বিহারস্থাপন ব্যবহৃত হইত। পরে যখন কান্দীর পট্টনগণের অনুযায়ীনে আসে সেই সময় পট্টনরাজ হুসেমান ইহা তাঁহার Tower রূপে ব্যবহার করিতেন। কান্দীর পট্টন মুসলমান আধিপত্যী ইহাকে কান্দীর পট্টনগণের বিধ্বংসকেন্দ্র বলিয়া থাকে। হিন্দু বা ব'লন প্রভৃ পন্থাচার্য্য তাঁহার শিষ্টগণ দ্বা এইখানে আসিয়া কিছুনাগে বসবাস করিয়াছিলেন। মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পন্থাচার্য্যের পাহাড়ের উপর হইতে জীনগরের সৈন্যসিঁক দৃষ্ট অতি সুন্দর। পাহাড়ের এক পার্শ্বে ডালহুজ (Dhal Lake)—বিশদিতকমলগল বকে দ্বার্য্য করিয়া বিপুলে হাইয়া চক্রবালে মিলিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কান্দীর 'শিকার' নৌকা ইতস্ততঃ ভাগিয়া বেড়াইতেছে। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে বর্ধন-দাঁড়া, কলরমুখরিভা তিলাস নদী। পন্থাচার্য্য পাহাড়ের উত্তরে অনতিদূরে 'হরিপর্বত'। পূর্বে মহামতি আকবর এই পর্বতের উপর তাঁহার তুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন; এক্ষণে উহা কান্দীররাজের সেনানিবাস। পন্থাচার্য্য পাহাড়ের পাদদেশে একটি সুন্দর উপবন ও মন্দির এবং পাহাড়ের পাদদেশে কান্দীরের সুব্রাজ (বর্তমান মহারাজা) তার হিউসিংএর রামপ্রসাদ; শাচেদী ধরণে প্রাণাঘটি নির্মিত। অসংখ্য আশুপট ও চেনার

বৃক্ষের মধ্যে প্রাণাঘটি আশুগোপন করিয়া রহিয়াছে।

পন্থাচার্য্যের পাহাড় অথবা তথু-ই-হুসেমানি পন্থাতে রাশিয়া আমাঘের নেটার দক্ষিণ-পূর্ব অতিবৃথে ছুটিয়া চলিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কান্দীর গ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে আমাঘের নয়নপথে পতিতে লাগিল। চারিদিকে দিবন্তপ্রসারী ঘাট। প্রকৃতিদেবীর সরল গ্রামা-চিরের দ্বনিকা। যেন লগল আমাঘের সম্মুখে উন্মোচিত হইল। চারিদিকেই "অধারিত ঘাট, গগন লগল চুনে তব পদধূলি,

ছায়া হুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।" একগাড়া বাহালী আরোহী দেখিয়া গ্রামা রমণীরা ও পুঙ্খপণ কোকুগলোপ নরনে আমাঘের পথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাঘের পরিচিত বিচিত্রবর্ণের শাখরা ও আলখোলাগুলি দেখিয়া মনে হইত যেন গোপুণি সময়ে ভ্রামা দরশীর বৃকের উপর কতকগুলি বিচিত্রবর্ণের পুণ্ড প্রসুড়িত হইয়া রহিয়াছে। নয়নরজন প্রাকৃতিক দৃষ্ট দেখিতে দেখিতে আমরা বিপুল পুণ্ডকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

### পাণ্ডুখান

পন্থাচার্য্য পাহাড়ের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে, পান্ডুখান নামক গ্রাম আনানিঘের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই গ্রামটি বিলাস নদীর দক্ষিণে, জীনগর হইতে চারিমাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমান সময়ে ইহা একটি সমাধি পণ্ডগ্রাম, কিন্তু পুরাকালে এইস্থানের প্রসিদ্ধি দমপ্র কান্দীর ও পকনয় প্রদেশে ব্যাপ্ত ছিল। পণ্ডিত কল্লন (মিশ্র) তাঁহার 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে বহুবার এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালে এইস্থান 'পুত্ৰদ্বিধান' নামে খ্যাত ছিল। পুত্ৰদ্বিধান অর্থে পুত্রাতন জ্ঞানী। বর্তমান নাম 'পান্ডুখান' পুত্রাতন সঙ্কত 'পুত্ৰদ্বিধানের' মনপ্রাণ। কান্দীরের ভূতপূর্ব মেসিডেন্ট গবর্নর সাংঘে তাঁহার পুত্ৰকে বলিয়াছেন যে, 'অতি প্রাচীনকালে কান্দীরের রাজধানী এইস্থানে অবস্থিত ছিল এবং সেই পুরাকালে ধনজন পরিপূর্ণ সপ্তদ্বিধানী পুত্ৰদ্বিধানের বিহুটি গারি মাইলের দক্ষিণ ছিল। হিন্দুযাকপনের

অমরতনের পর কান্দীর ধ্বংস বৌদ্ধভাগসঙ্গের প্রত্যয়ে বিস্মৃতি লাভ করে, সেই সময় মৌর্যাব্দীয় বৌদ্ধরাষ্ট্রা অশোকের রাজবংশে এইখানে একটি সুবিশাল প্রস্তর-মন্দির নির্মিত হয় (আনুমানিক ২৪০ গৃ: পূ: )। সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য কান্দীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁহার কৌটিল্যজনিত সুবিশাল ভারতভূমির প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এখনও—তাই হাজার বৎসর পরেও—দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের একটি মস্তকসংলগ্নিত হইয়াছিল এক বহুদিন কান্দীরে বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুর ছিল ততদিন এই মন্দির বৌদ্ধগণের নিকট পূজ্য-পীঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। ‘বার্ণিয়ার’ ভ্রমণ রচনায় (Bernier's Travels) এই স্মৃতিস্থান ও তাহার মঙ্গল সম্বন্ধে বর্ণিত উল্লেখ আছে। কান্দীরে হিন্দুস্বাক্ষর পুনঃস্থাপনের পর, কান্দীরের হিন্দু রাজা বৌদ্ধবিষয়ে অতিমাত্রা রোষক সম্রাট অত্যাচারী নিয়োগের মত (Nero) এই মন্দিরটি ও তৎসংলগ্ন ভগ্নদেহের ধ্বংস সাধন করেন (৭ম শৃ: অংশ)।

তিনিতে পাওয়া যায়, বর্তমান সময়ে পান্ডুস্থান গ্রামের মধ্যে একটি বৃন্দাকার প্রস্তর-মূর্তি পতিত আছে। মূর্তি অনেকটা আকৃতিতে Indian Museumএ সংলগ্ন স্থান সম্রাট কণিষের সমরকীর্ত্তন-মূর্তির অনুরূপ। এইরূপ মূর্তির ভগ্নাংশের কোনও দারনাথের মিউসিয়ামেও সংলগ্ন আছে। পান্ডুস্থানে মূর্তিটির সমস্তটা নাই। মূর্তিটি গীর্জা-আটের উৎকৃষ্ট মন্দির এবং এই মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতেই বর্ণিত প্রমাণিত হয় কান্দীর উপত্যকার অত্যন্ত উর্বর ও গ্রীষ্ম-ভারত-বিভাগ বহুটা প্রতিকৃতি লাভ করিয়াছিল। পূর্বে মূর্তিটি মন্দিরের অত্যন্ত উর্বর হাণিত ছিল। বিদেশী পর্য্যটকেরা বলেন যে, মূর্তিটি সমস্ত বস্তু: বৌদ্ধভাগসঙ্গের অবশ্যনের অব্যবহিত পূর্বে হাণিত হয়। বার্নিয়ার বহন ভ্রমণ উপলক্ষে এইখানে উপনীত হন, তখনও মন্দিরটি ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় সম্বন্ধ ও প্রতিকৃতির সর্ববিধ অত্যাচার লক্ষ্য করিয়াও কালের সহিত প্রতিকৃতিগণিত করিয়া বর্ণনায়মান ছিল এবং মন্দিরের মধ্যে ক্ষতলে অনেকগুলি স্থল-স্থল নানীমূর্তি খোদিত ছিল; সমস্তটা দেখিলে

অন্য মূর্তি। প্রত্যেক মূর্তির মধ্যে এক একটি মালা।

### পাণ্ডুস্থ

স্মৃতিস্থানের এক মাইল দক্ষিণে পাণ্ডুস্থ। ইহাও অতি ক্ষুদ্রগ্রাম। আমায়ের পথের পার্শ্বে ও বিলাস নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। পূর্বে এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয় ছিল। প্রায় ও নিকটে ক্ষুদ্র বৃক্ষ-পল্লভ মালা। অসমতল শতক্ষেত্র সমুদ্রকূলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্শ্বভাগে বৃক্ষ-কুল-কুল-পথে কিশোরে বাটগা মিশিতেছে। তটিনী তীরে স্থানে স্থানে (willow) উইলো-বৃক্ষ। ত্বনিত পাই। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভার মুখ হইয়া যোগিল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৮ গৃ: অংশে ভগ্নাংশটি নুহাবাতনের ইচ্ছা অনুসারে এক অতি মনোরম উপবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন সে উপবনের অস্তিত্ব নাই। বাক্য একদিন প্রাকৃতিক শোভা-সম্পন্ন অতুলনীয় ছিল। সেই মাঝের উপবন এখন কলমে পরিপূর্ণ। সম্রাট জাহাঙ্গীর দ্বত একটি অতি সুন্দর প্রস্তর-সেতুর ধ্বংসাবশেষ অত্যাচার সাধকসংলগ্ন এখনও পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।

### পাম্পুর

পাণ্ডুস্থ গ্রামের প্রায় চাই মাইল দক্ষিণে চতুর্দিকে পল্লভমালাবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র আমায়ের মূর্তি আকৃষ্ট করিল। এই স্থান পাম্পুর (Pampur) নামে খ্যাত। পাম্পুর কান্দীরের একটি অত্যন্ত প্রাচীন স্থান। রাজা সম্রাটগণ গৃ: অংশ ৮৩২ এই পাম্পুরের প্রতিষ্ঠা করেন এক প্রতিষ্ঠাতা সম্রাটগণের নাম অনুসারে এই স্থান ‘সম্রাটগৃ’ বলিয়া খ্যাত ছিল। বর্তমান নাম প্রাচীনতম অবস্থায় মাত্র। পাম্পুর রাজসংলগ্ন কৌটিল্য একটি বিশাল মন্দির এখনও পাম্পুর গ্রামের প্রাচীনতম বস্তু বর্ণনায়মান আছে। পাম্পুরের বর্তমান প্রসিদ্ধি কেবল কান্দীরের পর্য্যটনিত নহে। বিখ্যাত ভাষ্যগ্ণ-চাণের ৩৩ পাম্পুর বর্ণিত প্রসিদ্ধিগণিত করিয়াছে। পাম্পুর ও তাহার ভাষ্যগ্ণ-চাণ সম্বন্ধে Kashmir Gazetteerএ এইরূপ লিখিত আছে,—“At Pampur, the saffron grows in abundance. Saffron or kesar is the



stamina of the flowers of the crocus sativus. The plants flower about the end of October. At that time, a large number of villagers of both the sexes, and of all ages, gather there to collect flowers and Sepoys are stationed there to prevent their pilferings. The flowers are of purple complexion, ইত্যাদি।

ভারতের কুহাণি জাকরাণ্, চাষ হয় না; ইহা কেবল কাস্মীরেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কাস্মীরের নিম্নস্থ বস্ত্র নগর; সম্ভবতঃ ইহা চীন হইতে প্রথমে ভারতে আনয়ানী করা হইয়াছিল। তবে এং কোন মূলে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। Times of India, March 16, 1926 সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "The cultivation of saffron is a very old industry. In ancient times the centre of the industry appears to have been the town of Corycus in Cilicia (Asia Minor), though authorities disagree as to whether the plant (crocus) was named after the town (Corycus), or the town after the plant. Presumably the cultivation of the saffron crocus spread from Asia Minor eastward into Central Asia and westward to the countries about the Mediterranean. The industry in Kashmir is of ancient standing. By the time of Akbar it had attained considerable proportions and the 'Ain-i-Akbari' mentions 10,000 to 12,000 bighas—say 4,000 acres—as the area under cultivation. At present the area is 2000 acres."

বর্তমান সময়ে জাকরাণ্ আবাদ করার রাজস্বকারের একচেটিয়া অধিকার (State monopoly)। প্রতি বৎসর জাকরাণ্ আবাদ করিবার লক্ষিকার প্রত্যেক ঠিকাদারকে রাজস্বকার হইতে বেগায়া হয়। বর্তমান সনে বাৎসরিক ৫০,০০০ টাকা বায়নার জাকরাণ্ জমি বিলি করা আছে।

ঠিকাদার আপন লোকস্বারা জমিতে চাষ করাইয়া লয়। এক একবার জমিতে প্রায় অর্ধসের চাষ জাকরাণ্ পাওয়া যায় এবং অর্ধসের জাকরাণ্য়ের নাম কাস্মীরে ৮৭৭ হইতে ১২৭৭ টাকা পর্য্যন্ত। জাকরাণ্ ক্ষেত্রগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; প্রায় ৮ ফিট দীর্ঘ ও প্রস্থ। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রের চতুর্দিকে আল আছে এবং চুইটি ক্ষেত্রের আগের সমাকুলে পথঃপ্রণালী। জাকরাণ্ চাষে মূল পেন্‌চের প্রয়োজন হয় না। এক একটি ক্ষেত্রে একাবিক্রমে ৮।১০ বৎসর জাকরাণ্ চাষ হইয়া থাকে। অষ্টোত্তর মাসের শেষভাগে কিবা স্তম্ভের মাসের প্রথমভাগে জাকরাণ্, শুক্রে যেগুলি রংএর সুন্দর পুষ্প প্রদুটিত হয়, পুষ্পের পরাগ কেন্দ্র (anthers) পিত্ত কর্তৃক ও লুপ্তা রংএর। পুষ্পচরন শেষ হইলে পুষ্পগুলিকে শুক করা হয় ও শুক পুষ্প হইতে জাকরাণ্ সংগ্রহ করা হয়।

পথের উত্তর পার্শ্বে দিবন্তপ্রসারিত জাকরাণ্ ক্ষেত্র। তবে, চারিধারে পাগড়ের প্রাচীর,—যেই ক্ষেত্রগুলির প্রস্থায় নির্মুক্ত। পূর্বে বিলাস নদী পাল্পুর গ্রামের অতি নিকটে ছিল, কিন্তু আমকাণ নদী অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে। পাল্পুর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি পাগড়ের সাহস্বেশে কাস্মীরের মহারাজ তার প্রভাগসিংএর রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটির চতুর্দিকে অশ্বাশ্বা চিনার বৃক্ষ।

পাল্পুর গ্রামের প্রায় চুই মাইল দক্ষিণে উইয়ান (Weean) গ্রাম। কতকগুলি ঐতিহাসিক উৎস দ্বারা বক্ত এই গ্রাম প্রাচীন। এই উৎসগুলি একটি ক্ষুদ্র নগরের পায়শ্বেশে বিদ্যমান করিয়া নির্গত হইতেছে এবং উৎসগুলির মধ্যে পৃথক মিশ্রিত থাকার বক্ত নানাবিধ বাবির প্রতিফলার্থে অনেকেরই উইয়ান গ্রামে আসিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা এই উৎসগুলিকে Fook Nag 'ফুক-নাগ' বলিয়া থাকে। উইয়ান গ্রাম পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিছু দূর যাত্রাবার পর, স্ত্রীনগর হইতে উনিশ মাইল দক্ষিণে, সবস্ত্রীপুর নামক স্থানে আমরা উপনীত হইলাম। স্থান সমস্তই হয় হয়।

### অবস্ত্রীপুর

বিলাস নদীর নিকটে, তাহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত, চতুর্দিকে শোভামণ্ডিত-পল্লভাঙ্গা-পরিবেষ্টিত



প্রকৃতির রম্য নিকেতন এই স্থানে কান্দীরের তথানিক্তন  
বিশুব্রাহ্মা অবতীর্ণা দুইয় নবম শতাব্দীতে এক মণ্ডিখানী  
নগরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম অম্বাধী  
নগরের নাম অবতীপুর রাখেন। অবতীপুরের প্রাকৃতিক  
দৌৰ্ভাগ্যে বৃদ্ধ হইয়া রাজা অবতীর্ণা এই স্থানে উহার  
অধিবাস রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া রাজধানী এই  
অবতীপুরেই স্থানান্তরিত করেন।

অনুগ্রহ প্রাসাদ ও ধর্ম্মা-পোষিত অবতীপুরের পুণ্ড  
স্বর্গে পুণ্ডপ্রায়। এক্ষণে উহা একটি ক্ষুদ্র জনপদ

অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ক্ষুদ্রসকল মন্দির, ও মন্দিরের  
পাশে অনুরাধা মূর্তি খোদিত দেখা যায়। মূর্তিগুলি দেখিলে  
বুদ্ধদেবের মূর্তি বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরের পাশে চুই একটি  
বিশালি ছিল, কিন্তু অধুনা মৃগ। রাজা অবতীর্ণার  
বিশাল রাজপ্রাসাদ নগরের অত্যন্ত অট্টালিকার সজিত  
চুম্বিকলে অথবা অস্ত্র কোনও কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত  
হইয়া যায়।

বহু শতাব্দী পরে, বিশপ-কটনের (Bishop Cotton-  
এর) চেষ্টা ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের তদ্ব্যবধানে পুরাকালের



পর্বাধিসিত হইয়াছে। এখনও পথের পাশে দুইটি ভগ্নদ্বার  
প্রান্তর মন্দির দেখা যায়। এই মন্দির দুইটি দেখিলে মনে  
হয় যে, ইহারা যেন কোনও মতে জগৎয়ের গ্রাম হইতে  
আমন্ত্রণ করিয়া ধোঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই মন্দির দুইটি  
অবতীপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা অবতীর্ণার কীর্তি। তিনি  
মন্দির দুইটি নির্মাণ করাইয়া তাহা বখাজ্যের বিজু ও  
কালমেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একটি মন্দিরের  
মধ্যে মূর্তি রহিয়াছে; উহা বিজু অথবা বুদ্ধ দেবের মূর্তি তাহা  
জানিবার উপায় নাই। কালমেবের মন্দিরের মধ্যে কোনও  
মূর্তি নাই। মন্দির দুইটি উচ্চ প্রায় ৪০ ফিট হইবে;  
কুন্ডনগরের মন্দিরের অসুত্বপ। প্রত্যেক মন্দিরের চতুর্দিকে

অবতীপুরে বননকাণা আরম্ভ হয়। অবতীর্ণার পুণ্ড  
রাজ-প্রাসাদের সমস্তটি পুনরুদ্ধার ঘটয়া উঠে নাই। কার্য  
আরম্ভ করিবার অসমর্থ পণ্ডিত অর্থাভাবে বননকাণা বন্ধ  
করিতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রাসাদ সংলগ্ন দুই চারিটি  
প্রকোষ্ঠের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়—এবং তাঁহাদের চৌকর  
ফলে পুরাকালের অনেক দ্রব্য ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া  
এখন পথের পার্শ্বে একটি নৃতন গৃহে রাখিত হইয়াছে।  
মন্দির দুইটির পটন ও অধুনামুগ্ন রাজপ্রাসাদের দ্রব্যাদি ও  
মূর্তিগুলি দেখিবার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্ত করেন  
যে, বনন রাজা অবতীর্ণা মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ  
করাইয়াছিলেন, তখন কান্দীরী মৌলিক শিল্পকলা গ্রীক



শির কলার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। জীক্সন ইউথ্‌লিম্‌স্‌ (Euthlymose) এর অধীনে শাওয়া ও আদগামিহান গ্রামে বহুকাল বসতি করিয়া উত্তর ভারতের নামাঙ্কনে অনেক মন্দির, প্রাঙ্গণ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছিল। তৎকালীনার প্রায়সাত্তিক আবিষ্কার হইতে ইহার বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কান্দৌগাং যে সেই কণ্যাকুশল গ্রীকদিগের নিকট ভ্রাতাদের ভ্রাতৃগণ (ব্রত) শিক্ষা করিয়া গ্রীক ভ্রাতৃগণ বিজ্ঞান অল্পকরণে ভ্রাতাদের নিজ পিতৃ-কল্য পরিবর্তিত করেন নাট, এ কথা কে বিবাহ করিবে।

অবশ্যপূর অতিক্রম করিয়া আমাদের পথের উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সন্ধ্যায় অন্ধকারে সন্ধ্যা তাহা গাম্ভীর্ণ দেখিবার সৌভাগ্য হইল না। এখানে কিলারের পরশারে বাইবার জল কান্দৌগের স্কোনিয়ার Michael Nethemole একটি সেতু নির্মাণ করেন, কিন্তু ১৮২৩ সালের প্রবল বন্যায় ই সেতুটি তাড়িয়া বাতায় ভাঙার আশঙ্ক্য পর্বত গুলু হইয়াছে। এইখানে নদীর অপর পারে কতগুলি মন্দির আছে। আগ্রয় দেখিবার সৌভাগ্য হইল না।

### বিজ্ঞ-বিহার

সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে আমাদের মোটার অবশ্যপূরের আট মাইল দক্ষিণে ঈনগর হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত বিজ্ঞবিহার গ্রামে গবেষণা করিল। আমাদের গন্তব্য পথ এই গ্রামটিকে দ্বিধা-বিস্তৃত করিয়া গিয়াছে। মোটার বামাইয়া দেখিবার সৌভাগ্য হইল না। আকাশে পুনরাগর যেন দেখা দিল। হুতরাং বখানীয় সন্ধ্যা বাহাতে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই দিন আমাদের পক্ষে আরও ৪ মাইল ঘাইয়া 'ভবন' গ্রামে পৌছিতে হইবেই। অপর-মাখ হইতে ফিরিবার সময় আমরা এই গ্রামটি ও ইসলামাবাদ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

কিলার নদীর দক্ষিণে বিজ্ঞবিহার গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নাম হইতেই অনুমিত হয় এই গ্রাম কোনও বৌদ্ধ রাজ্য

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কান্দৌগে বৌদ্ধধর্মের সময়ে এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড 'বিহার' ছিল। নানা দেশ হইতে লম্বাশত বিজ্ঞানী বৌদ্ধধর্ম এই বিহারে বাস করিতেন। গ্রামে বিহার থাকা হেতু এই স্থানকে বিজ্ঞবিহার অর্থাৎ 'বিজ্ঞা-মন্দির' বলা হইত। কান্দৌগের প্রাচীনতম হিন্দু-মন্দির এই গ্রামের দক্ষিণেই ছিল। অতীতের পুঁতি স্বল্প ধারণ করিয়া বৌদ্ধ-বিহার ও হিন্দু-মন্দির বহু পতন্য এই গ্রামের শোভা বর্ধন করিয়াছিল কিন্তু পরে হিন্দুধর্মী পাঠানরাই সিকন্ধার সাহা সেই প্রাচীন মন্দিরটি ও বিহার প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া মন্দির প্রভৃতির উপায়ান দ্বারা ঈনগরে একটি পাঠান-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। হিন্দু-মন্দির ও বিহার বিধ্বস্তের অন্তল পড়ে নীল হইয়াছে। পুঁতি উপায়ানে গঠিত, অত্যন্ত প্রাচীন মন্দির পাঠানরাই অত্যন্ত-কাজী মন্দির প্রভৃতি করিতে, সেই মন্দিরটিও পৃথিবীর বুকের উপর হইতে চির বিহার প্রাপ্ত করিয়াছে। মূলমাম-রাজ্যের অবলম্বনের পর কান্দৌগে পুনরায় হিন্দু-প্রাধিকার স্থাপিত হইলে, পরবর্তী হিন্দু-রাজা সোলাং সিং সেই মন্দিরটি বিধ্বস্ত করেন। অত্যন্তের চিহ্ন অত্যন্তের দ্বারা লুপ্ত হইল। বিজ্ঞবিহারে কান্দৌগের ভূতপূর্ব মহারাজ জার প্রতাপ সিংএর এক রাজপ্রাসাদ আছে। প্রাসাদটি ১২০০ সালে নির্মিত হইয়াছিল। প্রায় সাতশত পঞ্চ বাগিচা এক চিনার বৃক্ষবীণ অল্পকালে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। পায়বর্ণাএর পথ হইতে 'বৌদি' রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিদগ্ধিত।

বিজ্ঞবিহারের অনতিদূরে 'কানাবান'। এই স্থানের দক্ষিণে 'লিয়ার' নদী বিলাসে ঘাইয়া মিথিয়াছে। যে স্থানে 'লিয়ার' নদী আগিয়া বিলাসে মিথিতেছে এই স্থানটির নাম 'সকম'।

### ইসলামাবাদ

কানাবানের পূর্বেই ইসলামাবাদ। কান্দৌগের মধ্যে ইসলামাবাদ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কান্দৌগ-কর্ত্তে বিবিধ একাত্তের পিতৃ এই ইসলামাবাদে প্রস্তুত হয়। অনেকগুলি

কুটিল-শিলাপাথ বেবিথার সৌভাগ্য হইল। বিখ্যাত কান্দীরা শাল, ডামিয়ার, 'নাম্বা' 'গাব্বা', কার্পেটের নানা প্রকার ব্রহ্মাণি অনেক বক্স বেগনা, *maple works, willow works* ইত্যাদি এই ইসলামাবাদে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই স্থানের উপর শিলাদি ভরতঃ বাহিরের অনেক স্থানে রপ্তানি করা হয়। উইলো ওয়ার্কস (*willow works*)এর কারখানা ঈশনগরেও কয়েকটি আছে, কিন্তু ইসলামাবাদের কারখানাগুলি সংখ্যা ও আকৃতিতে ঈশনগরের তুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। বাংলা ঘেণের বের-শিল্পের মতো কান্দীয়ে উইলো শাখার দ্বারা সুন্দর সুন্দর মজবুত চেয়ার, জুটকেল, বাস, টেবিল প্রভৃতি নিৰ্মিত হয়। সে সকল দেখিতে সুন্দর ও মজবুত, দামও বেশ অপেক্ষা কম। উইলো বৃক্ষের ডালগুলিকে ধলে ডিকাইয়া রাখা হয়, পরে ঐ 'ডাল' দ্বারা বাস প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়।

'নাম্বা' শিল্প কান্দীরের একটি প্রসিদ্ধ শিল্প। শাল আলোড়নে যে সময় পল্লব ব্যবহার করা যায় না, সেই নিম্নত পল্লব কোনও কিংবো প্রক্রিয়া দ্বারা সমাইয়া নাম্বা প্রস্তুত হয়। ইহার আকার ছোট স্তরাকির স্তার; ইহার উপরে নানাবিধ লতাশাখার চিত্র, চিত্রিত থাকে। স্তরাকির স্তার ব্যবহার করিতে পারা যায়। দৌলিন্ ব্যক্তি-দের ঠেঠেখানার বেকেতে *Mattings* রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। ঈশনগর কিংবা ইসলামাবাদে এক একটি 'নাম্বা'র দাম ৭/- কিংবা ৮/-, কিন্তু কলিকাতা সহরে ঐ নাম্বা বড়দামার কিংবা হুগলীবেলের দ্বাৰা যে তিনজন দামে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইসলামাবাদে এক প্রকার মোটা কাগজের টেবিল রূপ পাওয়া যায়; বেশিতেও সুন্দর এবং দামেরও সস্তা।

সমরনাথে বাইহার সময় লক্ষ্য হইয়া যাওয়ার ইসলামাবাদ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই; কিন্তু কিরিবার পথে ইসলামাবাদ বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম। কিলাম নদী ইসলামাবাদ হইতে সামান্য দূরে। ঈশনগরের মধ্যে যেমন অনেকগুলি খাল (*Canal*) আছে, সেই বক্স ইসলামাবাদের মধ্যেও ছোট খাল আছে। খালের সহিত

কিলাম নদীর সংযোগ আছে। ঈশনগরকে ভরতঃবর্ষের তিনিম্ বসিলে অসুখাতি হয় না। ইসলামাবাদের খালে অনেক চাউন্-বোট ও শিকারা নৌকা রহিয়াছে।

এই চাউন্-বোট ও শিকারা নৌকা কান্দীরের ঈশনগরে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। বাহার্য কান্দীরে গিয়াছেন কিংবা কান্দীর সহজে কোনও বর্ণনা পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কান্দীর চাউন্-বোট নৌকার সঠিত পরিচিত। বাহার্য দৌলিন্ ভ্রমণকারী, বিশেষতঃ সারথের ভ্রমণকারী, তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে চাউন্-বোটেই বাস করিয়া থাকেন। গ্রীষ্ম চীশ হইতে তদুর্দ্ধে ভিন্নতর চারিজন টাকা পর্যন্ত এক একটি বোটেই ভাড়া। প্রত্যেক চাউন্-বোট নানা প্রকারে বিভক্ত; কোনটি বিদ্যার ঘর, কোনটি বক্স-শালা, গরম ঘর প্রভৃতি। অনেক চাউন্-বোটের উপরে টবে করিয়া ফুলগাছ লাগান আছে। যখন কোনও স্থানে চাউন্-বোট কিছুদিনের ভ্রমণ থাকে, তখন সেই স্থান হইতে চাউন্-বোটের সঠিত বৈজ্ঞানিক সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। স্থলি নিমুক্ত করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে চাউন্-বোট টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অনেক প্রকার করিয়া ঈশনগর হইতে ইসলামাবাদ পর্যন্ত চাউন্-বোট আনিয়া থাকেন।

ইসলামাবাদের অধিবাসী সংখ্যা জাহ তের হাজার। অনেক ধনী ব্যবসায়ী ইসলামাবাদে আছেন। কান্দীরবাহের ইসলামাবাদ একটা প্রসিদ্ধ মহাকুম (Subdivision)। এখানে রাজসরকারের আফিস, মাধ্যমিক প্রভৃতি সকলই আছে। একটা ছোট চিকিৎসালয়, উচ্চশ্রাশ্রমারী বিভাগও আছে। আদালতগৃহ ও পুলিশ বাহাদর ঘরেও অবস্থিত। ইসলামাবাদের এক প্রান্তে কান্দীর মহাকুমার একটি রাজপ্রাসাদ আছে। কান্দীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে সযত্নত পল্লবের সৈবী। রাজপ্রাসাদের চারিদিকে চিনার ও উইলো বৃক্ষ এবং প্রাণাবলিকি বৈদ্য করিয়া পার্শ্বভা তুল্য প্রবাহিত। ইসলামাবাদের বিকৃতি তিন মাইলের অধিক হইবে না। শুনিলাম, প্রতিবৎসর ইসলামাবাদে কল্যাণ



যোগে বহু লোকসংখ্যাই গেল। অধিবাসীগণের প্রায় অধিকাংশই ইসলাম। কানাবাল চট্টে ইসলামাবাদে গবেষণা করিতে চট্টে একটি খাল নাম চট্টে বহু : খালের উপর একটি স্থান দেখা যাইতে পারে।

Islam বর্ণিত অতিষ্ঠ করিয়াছেন। এক দূরত্বের অনেক-গুলি স্থানবহু স্থানবহু মসজিদ ও মসজিদখানা, মোক্তাব প্রভৃতি এই স্থানের শোভা বর্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সেগুলি প্রায় সবগুলি পুনঃস্থাপনা পরিণত চট্টে আছে ; মাত্র একটি



### আবদুল হারুন

পূর্বাঞ্চলে ইসলামাবাদ শহরের অনেক অধিকতর পুষ্টিগোষ্ঠী বহু ছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে ইসলামাবাদই কানাবালের রাজধানী ছিল। A. Vigna ও হজরা বিদেশী পর্বতকরণ এই স্থানকে the abode of

মুহাম্মাদকে বর্ণিত ও তৎকালের একটি মোক্তাব বক্তৃতার পৃষ্ঠা খসড়া লইয়া কালের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আজও কোনও রূপে পুষ্টিগোষ্ঠী বহু আছে ; 'ভিত্তি'টিও অনধীন।

ইসলামাবাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। আপে  
পাশে চারিদিকেই কুপ্র বৃক্ষ পর্জন্তমালা। অদূরে  
নিকরিত পর্বতগাত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া ইসলামাবাদ  
ও উৎসারিত কৃত্রিম স্থলনা-সুন্দর-পর্বত-ভ্রামণ্য করিতেছে।  
অনেকগুলি উৎসও ইসলামাবাদের নিকটেই আছে।  
'অবস্তানাগ' ও 'ভেতিনাগ' ইসলামাবাদের অনতিদূরে।

### আচিয়াবাল

ভারত বিখ্যাত 'আচিয়াবাল' উদ্যান এই ইসলামাবাদের  
দূর মাইল পূর্বে অবস্থিত। একটি স্থলর রাজপন  
ইসলামাবাদ হইতে আচিয়াবাল পর্য্যন্ত পিছাছে। এই  
পথের একদানে কার্ফলকে লিখিত রহিয়াছে To Veri  
Nag। সমস্ত না থাকে যেহেতু Veri Nag দেখবার  
মৌভাগ্য হইল না। আচিয়াবাল উদ্যান মোগল সম্রাটগণের  
এক অঙ্গুর কোঠি। কেব কেব করেন যে, এই উদ্যান  
মোগলগণ তাহারে রাজ্য করিবার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল;  
মোগল সম্রাট বাবর কেবল উদ্যানের সংস্কার সাধন  
করিয়াছিলেন। উদ্যানটি যে বহু শতাব্দীর পুরাতন সে  
বিবরে সন্দেহ থাকিতে পারে না; যেহেতু গ্রন্থিক ভ্রমণকারী  
বার্ণিও (Bernio's Travels) কান্দীর প্রবেশে ভ্রমণ  
করিবার সময় পূঃ ১৩৩০ অব্দের শেষ ভাগে ভ্রমণকাগজে  
'আচিয়াবালে' বলেন এবং এই উদ্যানের সৌন্দর্য্যে বৃদ্ধ  
হইয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকে এইরূপ লিখিতছেন।

"In returning from Sind-Nay (Bhawan)  
I turned a little out of the high way in order  
to sleep at 'Archiaval' which is a place of  
pleasure belonging to the old kings of Kashmir  
and at present to the Great Moghals. Its  
principal beauty is a fountain; of which, the  
water disperses itself on all sides around a  
building which is not devoid of elegance and  
flows through the garden by a hundred canals.  
Its water is admirably cold—so cold that to  
hold the hand within it, could scarcely be

borne. The garden is very beautiful  
account of its alleys, great quantity of fruit  
trees, of reservoirs full of fish, and a kind  
of cascade very high which in falling makes a  
great sheet of 30 or 40 paces in length.  
Throughout the garden, specially at night when  
innumerable lamps, fixed in parts of the wall  
adapted for that purpose, are lighted under  
these sheets of water.

উদ্যানের যে সৌন্দর্য্যাদি একদিন একাধিক ভ্রমণ-  
কারকে সন্তুষ্ট করিগ; এই উদ্যানটিকে ভারতের অস্কার  
শোভামণী প্রেত উদ্যান সমূহের সহিত তুলনা করিয়া  
তাৎপর্থেই অন্ততম প্রেত উদানে পরিণত করিয়াছিন।  
অত্র ও কালপ্রবাহে তাহার সে সৌন্দর্য্যাদি স্থান হরণ  
গিয়াছে। উদানে অনেকগুলি উৎস আছে লতা, ক্রি  
সে উৎস সকলের সুখ হইতে কলরপি বিকসিত হইয়া  
বিচিত ধীরকমাগার সমাবেশ করে না; প্রত্যেকপূর্ণ দীপ-  
সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাগানের শোভা বহন করে না  
যাহা হউক, উদ্যানের শোভা সমূহে বিনষ্ট হইয়াছে; অতঃ  
গৌরবের চিহ্ন অনেক স্থানেই বর্তমান আছে।

আমরা এক্ষণে ভ্রামণভ্রমণোচিত ভূমি অতিক্রম  
করিয়া একটি দূর বিরা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।  
উদ্যানের উপরিভাগ সমস্ত ভূমি হঠতে ৫১৩ হাত উচ্চ  
অবস্থিত। উদ্যানের চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। সমূহ  
চারিদিকে শত ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে স্থলবৎকোষাঙ্গী। এই  
ক্ষেত্রের মধ্যে বিরাট বহু প্রবাহিত। পর্বতশ্রাব্যের  
উপর মোগল সম্রাট সাহাধকানের ঐযবিনাথ। গ্রাম  
নিবাসের তল দিয়া ১০ ফিট প্রস্থ প্রবাহীযোগে উৎস  
বারি প্রবাহিত। উদ্যানের পাশেই একটি মানাবিধ সু-  
স্থপোমিত ছোট পাঠাঙ্ক। পাঠাঙ্কের তলদেশ বিধি  
করিয়া কলরপি ভীষণভাবে উৎসারিত হইয়া প্রবলবেগে  
প্রবাহিত হইতেছে। এই মল প্রবাহী দূর উদ্যানের মধ্যে  
সঞ্চারিত হইয়া অবশেষে উদ্যানের বাহিরে নিঃসৃত হইতেছে।  
আজকাল কান্দীর রাজ্য Trout Fishery এই উদ্যানের



মনো করিয়াছেন। তিনিলাম, ঐ মন্ত সাধারণক বিক্রম করা হয়। প্রতি সের মন্তের মূল্য ৪৭ টাকা। আমরা চল্লিশ মনো মন্তের মাটির নিক্ষেপ করিয়ামাত্র পথ পথ কুত্র বৃহৎ 'Front' মালের উপর ভাঙ্গিয়া উঠিল। আরও তিনিলাম যে কান্টারের বস্ত্রমান মচাচায়া গ্রাহ করিয়া এই মন্ত বিলাত হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। আচিয়াবাল উজান, 'ভেরিলাস' ও 'অনন্তনাগ' হেমিগ্রাহ ৩২ এক বিদেশী পলটক ও চন্দ্রকান্তি ইন্দ্রামাঝে আসমান করেন।



### মার্ভাঙ.

ইন্দ্রামাঝের ছয় মাইল উত্তর মার্ভাঙ (Mustaml)। অমরনাথের পথে মার্ভাঙ পড়ে না, সদর রাজ্য হইতে গ্রাহ হই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত; কিংবাহার পথে, মেটর-চালকের সহিত কল্যাণকর করিয়া গিয়া মার্ভাঙ ও আচিয়াবাল উজান দেখিয়া গিয়াছিলেন। আচিয়াবাল হইতে মার্ভাঙ গ্রাহ ৭ মাইল হইবে। কেহ কেহ বলেন ক্ষুদ্র 'মার্ভাঙ' পথ হইতে এই স্থানের নামোৎপত্তি

হইয়াছে। মার্ভাঙ পথের অপরপ্রান্ত মার্ভাঙ। কল্লন পণ্ডিতের রাজত্বকাল পুস্তকে 'মার্ভাঙ' উল্লেখ আছে। ইচ্ছা অতি প্রাচীন স্থান। স্থানীয় কোনও পণ্ডিতের নিকট তিনিলাম, অতি প্রাচীন স্থানে এই স্থানে একটি স্থান-মন্দির ছিল। ঐচ্ছা মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐচ্ছা স্থানেশালক ছিলেন; এবং স্থান-মন্দির থাকে হেতু এই স্থানকে মার্ভাঙ অথবা মার্ভাঙ বলা হইত। সে-স্থানবোধ অস্তিত্ব নাই। পণ্ডিত কল্লন অনুমান করেন, ৪৭ পতাকীত বাতা কালমিতা এই মন্দিরের নির্মাণ আরম্ভ করেন, তিনি ইচ্ছা শেষ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী রাজা গণিতমিতা ইচ্ছার নির্মাণ শেষ করেন মূল্য পতাকীতে।

Cunningham 'Accounts of Kashmir' পুস্তক বলিয়াছেন, মার্ভাঙের পুণ্ড নাম পাণ্ডুকোক (Pandu Kori) ছিল। ঐচ্ছার মন্ত, পাণ্ডুবাতা তামাদের অজ্ঞাতবালকালে এই স্থানে বাস করিয়াছিল। বানি না ইচ্ছার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, এবং কোন্ যদ্যের বলে স্থপণ্ডিত Cunningham ঐচ্ছার এই দিচ্ছা উপলব্ধ হইয়াছেন তাহাও জানা যায় না।

কান্টার প্রদেশের মধ্যে মার্ভাঙ যে একটি অতি প্রাচীন স্থান সে লক্ষ্যে কান্টার মন্তের নাই।

বার্ষিক্যে ১৬৯৩ খ্রঃাব্দে সম্রাট সাফাওয়ারের সময় মার্ভাঙে পূজার্পণ করিয়াছিলেন এবং ঐচ্ছার ভ্রমণকৃত্যে মার্ভাঙ লক্ষ্যে যথেষ্ট লিখিয়াছেন। ঐচ্ছার 'Travel' পাঠে জানা যায় যে, মার্ভাঙে কিছুদিনের একটি বিলাসকার প্রত্যাশনিত মন্দির ছিল; মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। মন্দিরানী নগরী যারা ঐ মন্দির পতিব্রতী ছিল। কালের ক্রম প্রসে এক্ষণে ঐ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত

বহিঃ পরিণত, তথাপি অষ্টাভ-লৌহ-সম্বন্ধিত সেই ধ্বংস-স্থল হইতেই সেই অমূল্যপুত্র মন্দিরের বিশালভার বশেষে পতিতের পাণ্ডা বার এবং মন্দিরটির প্রতি সন্দেশে মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইত। বর্তমান সময়ে যে দিকে বহুদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তবিনাম, পুরাকালে বহুসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসী এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন; সন্ন্যাসীগণের মধ্যে “হাকং” ও “মাকং” এর নামই প্রসিদ্ধ। বহন বার্ষিক্যে মাটিতে পদার্পণ করেন, তখন মন্দিরটি তত্ত্ব অবস্থার জীর্ণ কলেবরে কালের সঞ্চিত প্রতিযোগিতা করিয়া কোনও স্তরে পড়িয়াছিল, কিন্তু তারার জীর্ণ কলেবর আর যেদিন অক্ষয়কাল তবিত না পারিয়া এক্ষণে ধ্বংসের পথের পথিক হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মচারিগণ, যথা Arthur Vignes, Neve প্রভৃতি বহন এই স্থানে পদার্পণ করেন, তাহারা ধ্বংস-স্থল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই।

তবিনাম, এক কালে দিগ্ধ নদের একটি শাখা মাটিগের নিকটে প্রবাহিতা হইয়া এই স্থানকে পশ্চিম-পূর্ব-সম্প্রদায়ী করিয়াছিল। সেই নদীর শাখা এখন মাটিগের নিকটে হইতে বহুদূরে অপসৃত হইয়াছে। বানৌর শোকের জলকট নিবারণের জন্য রাজা রণবীর ঐ স্থানে ১৮০০ খ্রিঃ গভীর এক প্রকাণ্ড কূপ খনন করাইয়া দেন, কিন্তু ঐ কূপের জল ঐশ্বর্যকালে শুষ্ক হইয়া যাওয়ার বানৌর অধিবাসীগণের দুর্দিন আর দীর্ঘা ছিল না। পরে ১২০১ খ্রিঃ মালে যোগেশ্বরী তার প্রতাপ সিং ইন্দ্রাধিপতি হইতে খাল কাটিয়া মাটিতে জল সরবরাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। দারুণ জলকট থাকে হেতু মাটিগে অধিবাসী নাই বলিলেই চলে। নিম্নে স্থানীয় ভাষা এক্ষণে উহা প্রতীয়মান হয়।

পূর্বে মন্দিরের চতুর্দিকে বৃহৎ প্রাচীর ছিল, প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৪০০ গজ ও প্রস্থ ৩০০ গজ ছিল। প্রাচীরের তিন দিকে তিনটি বিশাল তোরণ ছিল। প্রত্যেক তোরণের গায়ে অগাধ-শক্তি খোদিত ছিল। বৃষ্টিভলি-স্থল, দেখিলেই গ্রীক শিল্পের নকল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীরের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র চলাই ছিল। চলাই ভূমি অত্যন্ত উচ্চ, এবং

চত্বারের বরাবরে একটি তিন ফিট উচ্চ পাটাতনের উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরটির পটন অনেকটা ভূমিরূপের মন্দিরের অনুরূপ। প্রত্যেক তোরণ হইতে মন্দিরের বরাবর পদাঙ্ক স্থাপন মন্দির স্তম্ভপ্রাচীর। স্তম্ভগুলি পাথরকাটা (Hewn)। মন্দিরের উত্তর পাশে একটি কঠোর গুহ ছিল। মন্দিরের আঁতাত প্রায় ৩০ হাত সমচতুর্ভুজ ছিল। বারিগো এই মন্দিরটিকে পৃথিবীর সত্যের প্রেরণ মন্দিরের সঞ্চিত ভুলনা করিয়াছেন; এবং তিনি বলেন, “পৃথিবী আত্মকৃত হইয়া (Palmyra) পারস্যের মন্দির কিংবা পার্সিপলিসের (Persepolis) মন্দিরের সমকক্ষ নহে, তথাপি সৌরবে এই মন্দির জগতের কোনও মন্দির অধিকারী নহে। পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রেরণ পৃথিবীর উপত্যকা-ভূমিতে ইহা স্থাপিত; যেখানেও পর যোজন ব্যাপিয়া মন্দিরটিকে বেঁধে রাখা পশ্চিম-পূর্ব উপত্যকাভূমি। মন্দিরের বহু নিরে অগ্নিবর্ষ, যাহা প্রাচীন সভ্যতার অক্ষর এবং জ্ঞান ও গৌরবে যাহা ইতিহাসবিদগণ।” সর্বসংগত কাল ভাষার নির্ধারিত হস্তে মন্দিরের সঞ্চয় সৌরবে চূর্ণ করিয়া মন্দিরটিকে প্রকাণ্ড ধ্বংসস্থল পরিণত করিয়াছে।

### ভবন

মাটিগের সঞ্চিত মাটিগের উত্তর অবস্থিত ‘ভবন’। ‘ভবন’ হিন্দুপ্রধান গ্রাম। অমরনাথের পাণ্ডুরা ভবনের অধিবাসী। ঐনগর হইতে রওজানা হইয়া ইন্দ্রাধিপতি পদাঙ্ক আমরা দক্ষিণ অভিমুখে আসিয়াছি। ইন্দ্রাধিপতি হইতে প্যাঙ্ক পা পদাঙ্ক আমাদিগকে উত্তর-পূর্ব অভিমুখে হাইতে হইবে।

আমাদের মোটর সড়কের অধিকার ভেদ করিয়া ভবন গ্রামের একপ্রান্তে আসিয়া থাকিল। আকাশে তখনও মেঘ। গুরুপঙ্কের একদমই চন্দ্র মেঘের অধরাশে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পথের অগাধ পাশে অতিক্রম চক-সঞ্চয় বসায়মান; তাহাদের গম্বুজপ্রাচীর হইতে তখনও গলকপা পৃথিবীর বৃক্কের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মোটর একটি বৃহৎকার ‘ভিনার’ বৃক্কের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই স্থানে আমাদিগকে ‘ভবন’ই অভিবাহিত



কাজে চলে। পুনেই বলিয়ারি, পুন্স রাজের অত্যধিক ট্রেনাওয়েড তখনই পরেই প্যাঙ্কলগীয়ে পথ এক স্থানে ভাঙিয়া গিয়াছিল; যদি উভয়দিক পথ যেসময় চলে থাকে তবেই মোটারে আমরা যত্নে প্যাঙ্কলগী পর্যন্ত বাইতে পারি নতুবা তখনই মোটার বিহীন পথে প্যাঙ্কলগী দাঁড়াই যত্নে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

তখন চলে প্যাঙ্কলগী ২৮ মাইল চলে। গ্রীনগর চলে তখন পথে বীতিমত মোটার সাড়ি আছে। প্রায় মোটার-বাস দাঁড়াই লইয়া গ্রীনগর ও ডবল-নর্থের মধ্যে। কিছু ডবল চলে প্যাঙ্কলগী পর্যন্ত

এক একটা বাতা এতই বৃহৎকার যে অতিক্রমে দৈর্ঘ্যে বহন করিয়া লইয়া বাইতে হয়। এই বাতাগুলিতেই পাণ্ডারা তাহাদের আপন আপন বহনবাহন নাম দাম ও পরিচয় লিখিয়া রাখে, এবং এখনই কোনও বাতা উপস্থিত হয় পাণ্ডারা আপন আপন পুস্তক হাতে আঁতর্বা তৎপরতার সহিত নবায়ন বাতীর পরিচয় বাহির করিয়া দেয়। যত্নে যেত গোলাপী পাণ্ডা, চন্দন-চন্দিত ললাট এবং আলংকার্য পরিহিত বহন-বাহন কান্ট্রী পণ্ডিতগণ আমাদের পাড়ায় চতুর্দিক বেঁধে করিয়া গাড়াইল এবং একই সঙ্গে সকলেই গল্প করিতে লাগিল, আমরা কোন্ দেশ হইতে আসিতেছি,

কান্ট্রী কান্ট্রী বাতী হইতে আসিতেছি; অমরনাথের পাণ্ডা কে ইত্যাদি। তাহারা সকলে এত গল্পগোলা আরম্ভ করিল যে, আমাদেরকে পাড়ায় যথোপযুক্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল; পাড়ী হইতে অবতরণ করিবার অবকাশ পাইলাম না। অনেক কষ্টে তাহাদের প্রেরণ একত্রকম উত্তর দিলাম। তাহাদিগকে জানাইলাম যে আমরা সকলেই বঙ্গদেশবাসী এবং কান্ট্রী



পাণ্ডাদের কোনও বীতিমত বন্দোবস্ত ন: থাকার বাতীপন 'টোকা' পাড়া, অথ, কিংবা দুনিতেই বাতীরা থাকে। অমরনাথ বাইবার সময় বাতীপন এইখানে হইতে অথ, দুনি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লয়। তিনিদাম তখন টিকাদার (contractor) আছে; সেই টিকাদারই সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেয়।

মোটর যানবাহন অমরনাথের পাণ্ডারা দলে দলে আলিয়া আমাদের পাড়ীটিকে বেঁধে করিয়া গাড়াইল। তারিফিক বন অন্বেষণ; পাণ্ডাদের অনেকের হস্তে হারিকেন লঠন এবং প্রত্যেকের নিকট একাধিক একাধিক বাতা।

বৌদ্ধবাসুর বাতী হইতে আসিতেছি। তখন অনেক পাণ্ডাই বলিতে লাগিল, 'আমিই দাম বাসুর পাণ্ডা'। বৌদ্ধবাসুর ছোট পুত্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন; তিনি প্রস্তাব করিলেন বাহার পুত্রকে অবশ্যপক দাম মন্যপরের নাম পরিচয় বাহির হইবে তিনিই 'পাণ্ডা' হইবেন। বৌদ্ধবাসুর বহুতাল কান্ট্রী আসছেন এবং তাঁহার আত্মীয় যখন ও বহুতাল ইতিপূর্বে বহুতাল অমরনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন, তখনই একাধিক কান্ট্রী বহুতাল বৌদ্ধবাসুর নাম, দাম, পরিচয় প্রভৃতি বাহির হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। একতাই একাধিক পাণ্ডা যখন অতি তৎপরতার সহিত আপন



## ঐন্দ্রবিনোদ্যুর দাশ

আপন পুত্রক হইতে যৌগীন্দ্রবাবুর নাম বাকির করিয়া  
 টীকাকার করিতে লাগিল, 'আমিই যৌগীন্দ্রবাবুর পাত্তা, আমার  
 বইতে তাঁহার নাম বহিয়াছে' ইত্যাদি, তখন আমরা  
 আরও বুজিলে পড়িলাম। চারিদিকে জনতা এতই বাড়িতে  
 লাগিল যে, জনতার কোলাহল আমাদের অগ্ৰহ বলিয়া বোধ  
 হইল। অবশেষে মোটার-চালক চবিত্তা ও আমাদের  
 চুতা হুকুম সিং মোটার হইতে কোনও উপায়ে ভূমিতে  
 অবতরণ করিয়া বলপ্রকারে সেই বিপুল জনতাকে বিদূরিত  
 করিবার চেষ্টা করিল; তাহাতে কোলাহল আরও বর্ধিত  
 হইল। তখন একজন পণ্ডিতজী প্রস্তাব করিলেন,  
 "আপনারা আমাদের মধ্যে আপনাদের ইচ্ছামত কোনও  
 পণ্ডিতকে পাত্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়া গউন, জনতা  
 আপনা হইতেই অপসৃত হইবে।" তাঁহার প্রস্তাবে  
 অমুখ্যারী আমরা ঐ ব্যক্তিরদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে  
 আমাদের পাত্তা বলিয়া মনোনীত করিয়া তাঁহার নাম  
 উচ্চারণের প্রচারণা করিলে সমবেত জনতা শান্ত-ভাবে ধারণ  
 করিল এবং সকলেই কিছুকণ বাবে নিঃশব্দ হইলেন প্রায়  
 করিল। আমরাও একে একে হুতলে অবতরণ করিলাম।  
 বিনি আমাদের পাত্তা হইলেন তাঁহার নির্দেশ অমুখ্যারী  
 আমরা বাস্তা পার হইয়া অল্পদূরে বাইরা এক আশু-কট-  
 কাননমধ্যে হুকুম সিংএর চেষ্টায় আমাদের গ্রামবাসের  
 ওস্তাদ তাঁবু ফেলিলাম। যে স্থানে তাঁবু ফেলা হইল সেই  
 স্থানের পাশ দিয়া এক বহুতোলা প্রোতবস্ত্রী-কুল কুল  
 পথে প্রবাহিত। মোটার হইতে আমাদের মালপত্র  
 হুকুম সিং তাঁহাতে আনাইল।

আহার শেষে আমরা তাঁবুর মধ্যে বসিয়া পাত্তার সহিত  
 গল্প ছড়িয়া দিলাম। সেই রাতেই রক্তশরকারের একজন  
 কর্ণাচারীর সহিত পরিচয় হইল। ইনি যাত্রীসংগের গতি  
 নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া অমরনাথ বাইতেছেন।  
 রাজকর্ণাচারী মহাশয় আমাদের দাব্যবান প্রতিনিধিত্ব করিতে  
 বলিয়া দিলেন; অমরনাথের পথে প্রায়ই যাত্রীসংগের তাঁবুর  
 মধ্যে হইতে চুরি ঘাঘ। আমরাও তাঁহার আদেশ  
 নিরোধার্থী করিয়া গাইয়া রাত্রে দরজা বাকিতে মনহ  
 করিলাম। গল্প শুনে অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইল।

বিশ্রান্তভাবে রাত্রি ধাপন করা হইল না। ভ্রান্তি আসিয়া  
 দৃষ্টিতে তাহার আশ্রিতা বিস্তার করিল। আমরা আর  
 স্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই নির্জন পথে, শান্ত  
 গভীরের কোড়ে, সেই নির্কারীর মর্মে তাহা আঁকি হইয়া  
 কখন যে অস্থিরের কোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তাহা  
 জানি না। হুকুম সিং তাহার কণ্ঠ প্রহণ করিয়া তাঁবুর  
 বাহিরে একটি প্রকাণ্ড চিনাব গুলফে আশ্রয়স্থল  
 আবৃত করিয়া শয়ন করিল।

## শুক্লাসার, ১৫ই জানুয়ারি

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও শয্যা ত্যাগ করিয়া  
 তাঁবুর বাহিরে আসিলাম। আমাদের পুঞ্জই মিঃ দত্ত  
 শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁবুর বাহিরে হইয়াছিলেন। আমরা  
 তাঁবুর নিকটবর্তী পরবার মধ্যে হস্তশুল প্রদান করিতে  
 বাইতেছিলাম, কিন্তু মিঃ দত্ত আমাদের নিকটে আসিয়া  
 বলিলেন, "ভবনের কুণ্ডের জলে গাভ-দুগ দুগা মাটিল,  
 ভবনের কুণ্ড দেখিবার মত তিনি।" তাঁহার নিকট  
 কুণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া আমরা কুণ্ডের অভিন্দে  
 রওয়ানা হইলাম এবং তাঁবু হইতে বাকির হইয়া ~~হুকুম সিং~~  
 রাস্তার উপর মোটারখানি ছিল, সেইখানে আসিয়া  
 পৌছিলাম। হারার দরজাটাই ভবনের কুণ্ডে প্রবেশ  
 করিবার পথ। রাস্তার পাশেই কুণ্ড, কিন্তু কুণ্ডের তিনদিকে  
 বেড়া। রাস্তার পাশে হইতে একটি পথ কুণ্ডের মধ্যে  
 গিয়াছে। প্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকে একটুকু কাঠ-  
 ফলক লেখা বহিয়াছে "Killing fish or any other  
 animal within the area is highly punishable."  
 কুণ্ডের পক্ষান্তে তাত্রার্থের পাশদ্বারী একটি পক্ষান্ত  
 মালা। কুণ্ডের একপাশে একটা গুহাকার  
 পত্রবল (Hill) এলম্ বৃক্ষ; তাহার পত্রজাফার সমস্ত  
 কুণ্ডটিকে আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়াছে। তাইটি কুণ্ড  
 আছে। কুণ্ড দুইটি সমতুল্য এবং একটি কুণ্ড আর  
 একটির উপর স্থাপিত। অগাধ মস্ত, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ  
 উভয় কুণ্ডের মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। কুণ্ডের



জন বন্ধ ও দীপন। এই ক্ষুণ্ণে তাইতো 'চন্দ্রমৌ' বলে।  
চন্দ্রমৌর জল পবিত্র। কাহ্নোকেও ক্ষুণ্ণের মধ্যে অব্যাহত  
করিতে দেওয়া হয় না। একজন বৃদ্ধ কান্দীয়া পণ্ডিতজীর  
নিকট চন্দ্রমৌর জগদান বিষ্ণু ঐ স্থানে দান করতকই  
দেবতা ভক্তগণের স্রোশে কাতর হইয়া পলক-কমর  
বিদার্য করিয়া একটি উৎসব স্থাপ্ত করেন। উৎসব হইতে  
অল্প দূরত্ব জলবাশি নির্গত হইয়া এই ক্ষুণ্ণের মধ্যে পড়ে,  
এবং এই ক্ষুণ্ণ হইতে অতিবিক্রম জলবাশি পঃপ্রবালী যোগে  
বহির্গত হইয়া ক্ষুণ্ণের স্রোতস্বতীর স্থাপ্ত করে। ক্ষুণ্ণের  
বন্ধ ক্ষেত্রে দাঁলে মাত-মুখ প্রকাশন করিয়া তৃপ্ত হইলাম।

উপরে পাতাখন্ডন করিয়া বেশি ইতিমধ্যেই আমাদের  
পিত্তভক্তি জালিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সবে তাঁহার  
একজন পিত্তভক্তি। আমাদের প্রয়োজন মত একটি তুলি  
ও মাতটি ২৫ ডাড়া লইলাম। তুলির মূল ১০ টাকা ও  
মতি অর্থাৎ ৩০ টিলাবে দিতে হইবে। মটিকন  
বাক তুলি বন্ধন করিবে এক প্রত্যেক ধরের মটিক  
একজন 'মটিক' মনের লাগাম ধরিয়া চলিবে। বাকী  
মুখের ভবন পরিভাগ করিতে মন করিয়া stove  
ঘরটি চা ও মালগ প্রস্তুত হইল—এবং মিনগর হইতে  
মটিক মটিকের মধ্যে চা পান করিয়া সেইদিনকার  
পাতঃপ্রাণ সম্মত করিলাম। ঠিক এমন সময় আমাদের  
মোটর-চালক আসিয়া জানাইল যে, 'পথ পরিষ্কার করা  
হইয়া গিয়াছে; মোটর পাঠলগা পর্বতই দাঁটবে।'।  
অপ্রত্যাশিত ভাবে হাবুডাবু নিকট এই সাবাদম্রপণ  
আমাদের সকলের মন উৎসাহ হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব  
না করিয়া অদিলেই সেইদিন পরিভাগ করিবার মানসে  
আমাদের চুড়া কক্ষম দিকে তাঁদ্র ভাষিতে ও মালগ  
মোটরে চাপাটিতে আবেশ দিলাম। আমারাও উভয়  
প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বাকী মটিক মালগ আমা  
মাতার মন ভবনগ্রাম পরিভাগ করিলাম। বাইবার পুণে  
প্রত্যেক তুলিওলা ও অগভীরকে ১০ একটাকা করিয়া  
অগ্রিম (পেমেন্ট) দিতে হইল এবং টিকিয়ারকে বলিয়া  
দেওয়া হইল যে, সেইদিনই বেন তুলি ও অগভীর পাল্লারগে  
পৌছায়।

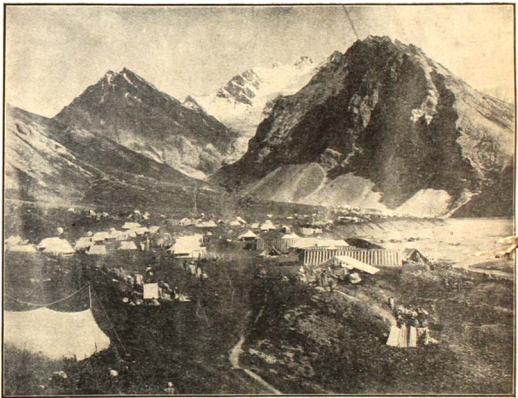
ভবন পরিভাগ করিলাম। আমাদের কোথাও  
যে মাই; সবেমাত্র স্থান পূর্ববিক্রে উঠিতেছে।  
নবীন অল্প বিবর্তানে অর্থাৎ পাঠের চুড়া ভবন  
সোনালী বর্ণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। পূর্ববিক্রে রূপী  
৫০ চারিধারে বৃক্ষকল ভবন ও দিক এবং দিক পল্লব  
জন্যে অবশিষ্ট।

### ভামু গুহা

পূর্বেই বলিয়াছি, ভবন-ক্ষুণ্ণের দিক পল্লবেরই একটি  
পাঠ্য আছে। আমাদের পথ এই পাঠ্যটিকে প্রদর্শন  
করিয়া চলিল। পথের এক পার্শ্বে পল্লবের ও পাঠ্যগ্রাম  
এবং অপর পার্শ্বে পল্লবগ্রাম। এই পাঠ্যটির মধ্যে  
অনেকগুলি গুহা আছে। কান্দীয়াগণের নিকট এই  
গুহাগুলি ভামুগুহা (Hhoomju Cave) নামে প্রসিদ্ধ।  
এই গুহাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে দেবমূর্তি আছে।  
কান্দীয়াগণ এই গুহাগুলিকে অতিপ্রাচীন প্রমাণ করিয়া থাকে।  
হট্ট গুহার নামই সম্ভব প্রসিদ্ধ; এই হট্ট নাম  
Long Cave 'লং গুহা' ও Temple Cave 'মন্দির-  
গুহা'। ভবনগ্রামের নিকটস্থ গুহাটি লং গুহা।  
পাঠ্যের পথে তুলি হইতে প্রায় চলিবে ফিট উচ্চ এই  
গুহাটি অবস্থিত। তুলি হইতে গুহার প্রবেশদ্বার অবধি  
পাঠ্য কাটিয়া পথ করা আছে। প্রবেশ-পথটি  
অপরিষ্কার। এই গুহাটিকে লং গুহা বলা হয়, তাহার  
কারণ প্রবেশপথে গুহাটির অভ্যন্তরে ২০০ ফিটেরও  
অধিকদূর অল্পসর হওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে যে  
এই পথটি অসম্ভব—কতদূর যে ইহার শেষ হইয়াছে তাহা  
কেহ জানে না। গুহার মধ্যে হঠাৎ অন্ধকার;  
প্রবেশ করিতে হইলে সবে আলোকের লাগবা দিতে  
হয়, নতুবা অগভীর পথে পাঠ্যের পথে আঘাত লাগিবার  
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বহুকাল ধাবং অসংখ্য বাদক নিষ্কলমে  
এই গুহার অভ্যন্তরে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হইয়াছে।  
বিদেশী পর্বটকগণের ভ্রমণ-স্বভাব পাঠ্য জানা যায় যে,

এই গুহাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রবেশ-পথের কিছু দূরে বাম পার্শ্বে পাথরের দ্বারে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে বস্তুসংখ্যক নরকশাল লক্ষিত আছে। উল্লেখ্য কল্পমান করেন যে, কোনও সময়ে ইহা কোনও কাশ্মিরিক সম্প্রদায়ের আড়া ছিল। দ্বারা উইল এই

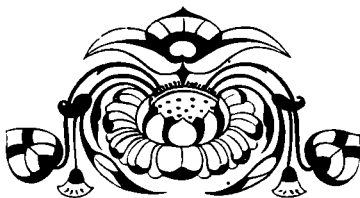
ফিট উচ্চে অবস্থিত। উহার প্রবেশ-পথ অশেষদূর প্রশস্ত। ভূমি হঠাৎ গুহার দ্বারদেশ পর্যন্ত পাঠাতেই উপর দিক্তি রহিয়াছে। আকৃতিতে একটি মন্দিরের প্রায় এলিয়া ইহাকে 'মন্দির গুহা' বলি। গুহাটি ২৭ ফিট লম্বা ও ৪০ ফিট চওড়া এবং আশ্রয় ১২ ফিট উচ্চ হইবে।



গুহাটি কালবেশের নামে উল্লেখিত। তবে কাহার দ্বারা এই গুহাটি-নিৰ্মিত হইয়াছিল, কেহ জানেনা।

অপর গুহাটির নাম মন্দিরগুহা (Temple Cave)। এই গুহাটি, লম্বাওহার অধরেই, ভূমি হঠাৎ প্রায় উইল

প্রবেশ পথের উপর তোরণাকারে ৩৫২ একশত পদমাত্র রহিয়াছে। এই প্রস্তর খণ্ডটি মন্ডপ ও তাহাতে নানাবিধ মূর্তি খোদিত। মন্দিরের প্রবেশ-পথে ও মন্দিরের ভিতরে অনেক 'লিপি' খোদিত রহিয়াছে। লক্ষ-লক্ষো কাল





कलिकाठा नगर

मिर्चो-अरुणो ल



२००५

## বিসর্জন

—গল্প—

—ঐতর্যেয়সুদামা দাশগুপ্ত

“কি বোমা, তোমার কি রকম মাফেল বল বেবি? কি আস্ত না কি ভাতের মেখে, অমনি পথের ধারে দেখলে মার কুড়িরে নিয়ে এলে? বাবুনের মেখে হ’লে তোমার এমন প্রগতি কেমন ক’রে হোল, আমবা ত বুধে উত্তে পাবি না। এ সংসারেও ত এতদিন কাটালে। সেট ব’রো বহুরের ছোটটি এনেছিলাম মাল পনয়ে বহুর এট ম’সার করু, মার তোমার এমন প্রগতি! তোমার আর কি দোষ দেব মা, কাল বে কলি।”

“তা কি করব মা, পথের ধারে ধোপের মধ্যে এতটুকু মেখে প’ড়ে কীটছিল, আর একদণ্ড থাকলে হব পেছালকুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে ভেপ্ত, নহতাতার ম’রে যেত। আমরা বনি না নিয়ে আসতুম সে পাণ কি আমাদের লাগত না?”

“আমাদের আবার পাণ লাগতে বাবে কেন? বাবের মেখে তারা ফেলে বিড়েছে, এদেব পাণ না হ’লে হবে আমাদের? মেয়ের দারা বাপ মা, তারা জন্মমাত্র টেনে ফেলে দিতে পাবুল, তাদের মায়া হলো না, মায়া হলো তোমার? কি জানি বাপ, তোমাদের ভাবগতিক বুঝতে পারি না।”

“এই দেখুন বেবি কেমন ছোট মেয়েটি? কেমন চোখ মিট মিট করছে। দেখুন মা, একবার তাকিয়ে দেখুন না মা।”

বুধ কথায় শাওড়ির মনটা একটু নরম হইল। তিনি কেতোরদিনের ল্যান্সেট হাতে করিয়া একটু আগাইয়া আঁগিয়া পানিকটা তফাৎ থেকে মাথা খাড়াইয়া তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, “আহা, কাদের বাছা গো। এমন ক’রে বনে বাগড়ে ফেলে দিয়ে বেল, একটু মাথাও হলো না। কি জানি বাবা! এমন নিষ্ঠুর ত বেবি নি। মা হ’লে কেমন ক’রে নিজের পেটের কচি বাচ্চাকে পেয়াল কুইয়ের মুখে এমন ক’রে ফেলে দেব! মায়া কি নির্দয় মা।”

শাওড়ির কথায় লাগল পাইয়া ববু বলিল—“দেখ মা কেমন সেন চালছে, কেমন সুন্দর দেখতে, দেখে মায়া কর না?”

“আহা মায়া আবার কর না! আমার গোবিন্দ বখন চোল একটুও কীদেনি; চ’রই অমনি চারিদিকে টুল টুল করে তাকাতো লাগল। তারপর বলতে নেই—কত কষ্ট ক’রে মাতৃব করলুম। কত মায়া সেলেন কত দুঃখ সঠতে হয়েছ আমায় গোবিন্দকে। ঐ গোরুরা মিলে কত পড়াপড় না করলে, তবু ত লক্ষ্মীনাথবাবুর দ্বারা এখন মন্ত্ৰেব চ’রে উঠেছে। ছেলে কি কম কঠোর বন। নিশ্চয় কিছু দোষ ছিল, নইলে কখন ক’রে ফেলে দেবে কেমন?”

“এতটুকু শিশু, ওর কি দোষ মা? দোষ পাক পাণ থাক সে ওর বাইট ছিল, ওর ত কোনও অপরাধ নই।”

“ওর মা অভাগির ত পাশের সোমাই নেট, ওরই বা অপরাধ না থাকলে এমন হবে কেন? ঐদ জন্মাতমেশ পাণ। তুমি কেন মা পরের পাণ খাড়ে ক’রে নিজেদের? নিজেদের ত এতদিনে একটা কিছুই চল না। এমন কোন জাত না কোন ভাতের মেখে কুড়িরে নিয়ে এলে, কি দর্শনাল করলে বল বেবি! লোকে বখন জানতে পারবে তখন কি আর তকা রাখবে? আর তুমি ওর নেকড়া কানি কাচবে ত আমার কাছই বা করবে কেমন ক’রে, হরে লক্ষ্মীনাথবাবু রথেনে তারই বা কাজ হবে কেমন ক’রে? বোমা, কি দর্শনালই তুমি করছ বাবুবা জানতে পারলে হরত তাঁরাও রেগে যেতে পারেন। ঐ বা—তুমি সব ত লজতে এসে আমার ঝাঁরাখের বেড়টি ছুঁয়ে দিলে, ওখান পলা খেটে রেখেছিলুম, একখটি জল ছিল, সব ত নষ্ট হ’তে গেল। কি অগ্রেই ক’রে এসেছিলুম, হুনি যে একটু শব্দেরে থাকব তার ঘো নেই। কোথাকার কোন অভাগীর পাণ এসে আমাদের খাড়ে পড়ল।” এইকথা বলিয়া ঘটির জলটা



ডালিরা দেলিরা গিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে  
পুকুরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এক কক্ষণ এতটা মনে করে নাই। চতুর্থ এতদূর  
গড়াইল দেলিরা প্রথমটা একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া  
চুপ করিয়া কিছুক্ষণ লাড়োয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘরের  
মধ্যে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য এখন একাকী কঠোর। পরিবারের  
মধ্যে মাঝা ও ছা। গোবিন্দের পিতা নান্দমণি ভট্টাচার্য্য  
গোবিন্দের পনেরো বৎসর বয়সের সময় লোকান্তরপ্রাপ্ত  
হ'ল। সেই অবধি এই সংসার গোবিন্দের হাতে পড়িয়াছে।  
গোবিন্দের বিবর সম্প্রতি কিছুই নাই, বজ্রমানি করিয়া বাজা  
কিছু পার তাড়াতাই এক রকম চলিয়া যায়। সেখানকা  
টোলে চিতোশমেশ্বরের কিছকুর ও মুক্তাবোধের কিছকুর পর্বাত  
অগ্রসর হইয়াছিল, তার পরই পিতার মৃত্যুতে টোল ছাড়িয়া  
বজ্রমানি বাবলা বহিতে ছয়। গ্রামের মধ্যে চৌধুরীরা  
বকলোক, পুত্র নিষ্ঠাবান। সমস্ত ক্রিয়াকর্মই তাঁহাদের বাড়ীতে  
হয়। তাঁহাদের আশ্রয়েই গোবিন্দ প্রতিপালিত। আর  
বৈকল্যে গোবিন্দের স্ত্রী দুর্গলক্ষ্মীও এক ভদ্রী বাড়ীতে  
নিমন্ত্রণ থাকিতে গিয়াছিল, কিরিয়া আসিতে সক্ষ্য হ'য়।

তাদের ঘরে কোণের মধ্যে একটি ছোট পিত্তর ক্রন্দন  
শুনিয়া সেই দিকে গিয়া দেখে যে একটি সন্তানমাত  
পিত্ত পড়িয়া রহিয়াছে। ঐরূপ অবস্থার পিত্তটিকে দেখিয়া  
সে কোন মতেই সেটিকে ঐ ভাবে ফেলিয়া আসিতে পারিল  
বুকে করিয়া পিত্তটিকে চাপিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

গোবিন্দের স্ত্রী কক্ষণের স্থান হয় নাই। কক্ষণ ত্রপবর্তী  
বলিয়া গ্রামে স্তম্ভন খ্যাতি নাই। তবে নাকটা আর  
একটু চোখা, চোখ দুটি আর একটু বড় ও পা ডবান। আর  
একটু ছোট হইলে তাহাকে যে বেশ সুন্দরী বলা যাউতে  
পারিত, এরকম সমালোচনা মেয়েদের মধ্যে গ্রাহ্যই শোনা  
যাইত। সুন্দরী না হইলেও তাহার মধ্যে এমন একটা  
অাকর্ষণ ছিল তাহাতে তাহার দিকে তাকাইলে লক্ষ্য কাহারও  
চোখ উঠিয়া নাইবার ইচ্ছা করিত না। যে কুল কলের  
অপেক্ষা রাখে না সে যেমন ঘরকের সমস্ত দুষ্টিভুক্তকে  
সহজেই টানিয়া লইতে পারে, এও যেন কতকটা তাই।

যদিও তার ভাটি পড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু তারপর তখনও  
তাহাকে পরিভাগ্য করিবার প্রয়োণ পার নাই। ছোট  
সুখের খালেব মধ্যে প্রবণ ছোড়াবের বেগে অতিপরিমাণ  
এল ঢুকিলে তাটার সমরও যেমন সে মল বাঁচির  
হইবার পথ না পাইয়া পাক পাইয়া স্থগিয়া স্থগিয়া গির  
হইয়া ওঠে, এই স্তম্ভনচাঁদ। কক্ষণের খেচ হইতে যৌবন  
ভেম্বনি পলাইবার পথ পাইতেছিল না।

নিম্নাশ্রিত ও আশ্রিত ছুটি বংসর কাকট সে একলা  
করিত। তার উপর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যনাশ্রয়ণ  
বিগ্রহ, তাহারও সমস্ত কাজ তাহারই উপর ছিল। পাণ্ডুর  
যেহে কতের বাতাসটি পদাশ্র লামিতে দিত না। সমস্ত  
কাজ এমনি করিয়া পরিপাটির লিখিত করিয়া বাইত যে,  
ইচ্ছা হইলেও পাণ্ডুর সেই বর্ষের জালের মধ্যে গ্রাষণ  
করিতে পারিতেন না, বুঁতও বহিতে পারিতেন না।  
অনাবস্তক গর করিতে, পরনিম্না করিতে, পাড়াপড়শী  
বউকির অপের সমালোচনা করিতে সে একটুও ভালবাসিত  
না, অথচ তাহাকে কেউ অহঙ্কারী বলিতে ল্যহল পাইতনা।  
এমনি সহজে সে লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিত ও  
এত সহজে বাহির হইয়া আসিত যে, কেহ তাহাকে  
কোনও স্থানে জড়াইতে পারিত না। সে কাহারও রাগ  
পায় করিত না, তাই তাহার উপর রাগ করিয়া পাকা  
লহল ছিল না; কাহারও নিম্না সে গ্রাহ্য করিত না বলিয়া  
তাহার দিক্কে নিম্না পাকাইয়া উল্লিখিত পারিত না; এবং  
নিম্নে কাহারও নিম্না করিত না বলিয়া দ্বিগ্রাণেবদীর্ঘদের  
কিঞ্চিৎ অকৃপ্তি হইলেও তাহাকে নিম্না করিবার কাক  
সম্বৎ হইত না। খোখালদের বাড়ী—একটি মাত্র বৌ;  
বিখবাদের চিড়; স্থগিবার সমর কক্ষণ গিয়া সেখানে  
উপস্থিত হইত। রামমোহন সরকারের মা-মতা ছেলের  
যখন মর হইত, পাশের বাড়ীর বুঁতকে দিয়া লাঙটুকু আল  
দিয়া সেখানে সমরমত পাঠাইতে তাহার কখনও ভুল হইত  
না; অথচ এ সমস্ত কোনও কাজ লইয়া সে কোনও দিন  
কোনও আবেলান করিত না, এবং ইয়া লইয়া যদি কেহ  
কোনও দিন তাহাকে প্রশংসা করিত বা পরের বাড়ীর  
কাক লইয়া অনাবস্তক ব্যস্ততার লাঙড়ি যদি তিরবার

করিতেন তাহা সে কোনেই তুলিত না। নিম্নের ছোট সঃশাবটীর মধ্যে এই কণ্ঠশিলা এক অজলি পারদেব মত সঙ্গীত। আপনাতঃ স্নিগ্ধতার উচ্চারণের চকল হইয়া কেড়াইত, অথচ কোনও গানে তাহাকে রাবিতা রাবিতার উৎসাহ ছিল না। কোনও কাজে সে নিম্নাঃ সঙ্গীতের অনুরাগিতা অপেক্ষা করিত না। তাহার নিম্নের মধ্যে এমন একটা তাল ছিল, যাহা কখনও কোনো কারণে উচ্চিতে বা কাটিতে দেখা বাইত না।

তাই এ দিন যখন সে পথের ধারে শিশুটিকে নিরাশ্রয়-ভাবে দেখিতে পাইল, তখনই সে শিশুটিকে বুক করিয়া লইয়া আসিল। এক কথা লইয়া কোনো গোলযোগ হইতে পারে কিনা সে কথা তার মনেই উঠে নাই। কিন্তু পাণ্ডুর নিকট তিরস্কৃত হইয়া সে যখন কুড়ানো শিশুটিকে লইয়া ঘরে আসিয়া বসিল, তখন এই ক্ষুদ্র চতুর্ভাষা শিশুটিকে মানিয়া তাহারের পাত্র সঃসঃসঃসঃ সে যে কত গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ঘরে ঘরে বীড়ে বৃদ্ধিতে লাগিল। শুধু তাহার নিম্নাঃ সঙ্গীত হইলে সে তাহা গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু পাণ্ডুর, বামী, সকলকে যে সে কি বিধম বিলম্বে ফেলিয়াছে তাহা বতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই সে ভীত হইতে লাগিল। শিশুটিকে কুড়াইয়া না আসিয়াই বা সে কি করিতে পারিত—তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। গঙ্গানারায়ণের ভোগের কাক, পাণ্ডুর কাক সমগ্রই ত সে একা করিত, এখন ত তাহার স্বাভাঃ কোনো কাকই হইবে না। বামীই বা ইহা লইয়া কত নির্বাপিত চন তাহারই বা ঠিক কি? যমক বাতালে ঘাটের ঘড়ি ছিঁড়িয়া নোকা-খানাকে একবার যদি মাক-মরিচার আনিয়া পাক খাওয়াইতে পায়ে তাহা হইলে আরোহীর মন যেমন একটা অশ্রয়স্থান অনিদিষ্ট পথের ক্রমশঃ আকুল হইয়া উঠে, কল্লাত মনও যেন তেমনি একটা অনির্দেশ্য উৎসেগে গড়াইয়া উঠিতে লাগিল। কোনও দিক হইতে সে একটা অশ্রয় বা আশ্রয় পাইল না।

কাণ্ডের একটা সন্তানসংস্কারের পূজা ছিল গোবিন্দ সেই উপলক্ষে সন্তানসংস্কারের পূজা হইয়া গিয়াছিল এক বাসিকটা রাত হইয়া গেল চান কলার পুটিল ও

একশটি গিরি লইয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই তার কাছে সমস্ত তুলিল।

গোবিন্দ মোকটা টোলে পড়িয়াছিল, বিশেষ কোনোও পাণ্ডে বৃদ্ধিত না, বা পূর্ণ ভবিষ্যতে কোন কাকটার কল কতক পড়াইতে পারে তাহারও কোনো ধারণা করিতে পারিত না। তথাপি কাকটা যে একবারেই ভাল হয় নাই, একথা সে বেশ বুঝিল। তা ছাড়া তার কাকেরই বা কি হয়, ঠাকুর সেবারই বা কি হয়। অতটুকু শিশুর লালন পালন করিতে হইলে কল্যাণ ত তাহার পক্ষে সম্ভবই অসম্ভব হইয়া থাকিবে। অথচ এই গোবিন্দ শিশুর অস্ত কোনও বন্দোবস্ত করায় সচল নহে।

ত্রীঃ উপর তাহার ভাবী রূপ হইল। এতদিন ধরিয়া এই ভ্রমসংসারের নিপুণ চতুরের সেবা সে পাওয়া আসিতেছিল। কতদিন সে আপনাতঃ অকস্মাতঃ কল্যাণের কাছে লক্ষিত হইয়াছে, অথচ কল্যাণ তার কোনও দিগ্ভাষ না লইয়া তাহাকে নিঃশব্দে দিগ্ভাষে। গোবিন্দ তার সমস্ত সেবা ও পথের মর্যাদা বৃদ্ধিত না, কিন্তু কল্যাণের মধ্যে যম যেমন কিছু কিছু করিয়া কল্যাণে লক্ষিত হইয়া তাহাকে রস ও মস্তক পূর্ণ করিয়া তোলে, কল্যাণের মর্যাদা ও মস্তক তেমনি করিয়া কল্যাণে একটু একটু করিয়া এতদিন ধরিয়া গোবিন্দের ভ্রমকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাই কল্যাণের ভ্রমের করিতে আজ তাহার মন উঠিল না। তাই সে ঘরে ঘরে তাহার কাছে গিয়া গড়াইয়া বসিল, "কি হয়?"

নারী-কল্যাণের সমস্ত চকলতা আসিয়া কল্যাণের কল্যাণ করিয়া বসিল। গোবিন্দের হই পা কড়াইয়া ধরিয়া সে কাদিয়া কছিল, "কি হয়? তুমি যা হয় একটা উপায় কর।"

বা হয় যে কি করিবে তাহা গোবিন্দ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কোনো কিছু উপায় না দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, আজ্য দিন কতক চুল করিয়া থাকিয়া দেখা যাক কি হয়?

দেয়ন্তের পিতা ও গোবিন্দের পিতা উভয়ে পুড়ুত দেয়ন্ত তাই ছিল। অনেকদিন এক ঘরে থাকিলেও





মৌরচন্দ্রের মা ও গোবিন্দের মার মধ্যে একটা মনোবাক্যই চলিত। হঠাৎ ঠাকুর সেবা লইয়া কি একটা তুচ্ছ কারণে একদিন দুই ভাইর মধ্যে তুলসী বসড়া হইল এবং উভয়ের পৃথক হইয়া গেল। গোবিন্দের পিতা একটু লজ্জা লোক ছিল। সে অংশের আগে বেঁটিয়া ফেলিয়া সেই গ্রামেরই অন্যত্র গিয়া বাস উঠাইল। মৌরচন্দ্রের পিতার এখন দুইটা ছেলে মৌরচন্দ্রের তখন বেশ বয়স চইরাছিল। বর্তমানে গোবিন্দের পিতা জীবিত ছিল ততদিন মৌরচন্দ্র কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এখন পনেরো কলকের গোবিন্দকে রাখিয়া গোবিন্দের পিতা পরলোক সমন করিল, তখন চৌধুরী বাড়ির ক্রিয়াকর্ম বাহ্যতে তাপ্যগ্ৰাসি না হইয়া একা মৌরচন্দ্রই বচাল থাকে, সে পক্ষে মৌরচন্দ্র বিধিসমুচিত করিয়াছিল।

মৌরচন্দ্রের লগ্নকে বলিবার ছিল এট যে, অনেক দিন বিদেশে থাকিয়া অধ্যয়নের বিরতরা হেতু বৃন্দ একটা গাড়ী ও ভিতরত উপাধি লইয়া সে এখন মেনে কিরিয়া গানিয়াছিল, তখন তারার বিভাবন্ধা সবচেয়ে প্রেমের চৌধুরী ভাইয়ের মধ্যে কিছুদিন করিয়া পথে ঘাটে একটা স্ত্রী-মত আন্দোলন চলিয়াছিল। অবশ্য দ্রুতগতির লোকের এমন অনেক কামা বুঝা শুনা ঘাইত যে, গাড়ীটা সে নিজেই আদিবার সময় কথিকাতা চলেতে কিরিয়া গানিয়াছিল। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া নাও মনে করা ঘাইতে পারে, কারণ ইহার কোনোও নির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না।

মৌরচন্দ্র চৌধুরী বাবুদের বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, গোবিন্দ একেবারে মূর্খ, তার ছাড়া কি ঠাকুর দেখা, কি নৈমিত্তিক কার্য কোনটাই সুসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চৌধুরীদের বড় কত্তা গোবিন্দের নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়াই দৌক, অথবা নিরীক বস্তাবের গুপ্তই দৌক মৌরচন্দ্রের কথা কানে তুলিলেন না, বরং তাহাকে চুই কথা শুনাইয়া বিয়া বলিলেন যে, গোবিন্দের সচিব পরুতা করা তারার পক্ষে অসম্ভব অসোজন। সেই অবধি মৌরচন্দ্র বরাবরই গোবিন্দের পবিত্র মৌখিক শিষ্টাচার রাখিবার চেষ্টা করে।

কাক চোখ বুজিয়া ঘরের চালে বাবার গুঁড়িয়া রাখিয়া মনে করে কেহ দেখিবে না, গোবিন্দও নিজে চুপ করিয়া থাকিয়া তাবিল কপাটা চাপিয়া দেল, কিন্তু কথা চাপা রাখিল না; অনেকই শুনিল এবং মৌরচন্দ্রও জানিল।

মৌরচন্দ্র গিয়া চৌধুরীদের বাড়ীতে বলিল, ঠাকুরের পুনঃসংস্কার প্রয়োজন। সমস্ত বিষয় গোবিন্দকে ডাকাইয়া এখন মিথ্যা কথা হইল, তখন গোবিন্দ কোনও অব্যবহা করিতে পারিল না। গোবিন্দের ল্পনজনিত অপকর্মতা দূর করিবার জন্য মৌরচন্দ্র ঠাকুরের সংস্কার করাইল। বড় কত্তা গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, বড় দিন সাতাহরবাড়ীতে শিঙটি থাকিবে ততদিন যেন সে কখনও ঠাকুর ঘরে প্রবেশ না করে।

ইচ্ছা থাকিলেই কাজ করা সম্ভব নহ, অধিকার থাকে আবশ্যক। কমলার ইচ্ছা ছিল, সমতা ছিল, কিন্তু মাষ্টারের অধিকারে বিধাতা তারাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন; তাই শিতটিকে নিয়া সে মহা বিরত হইয়া পড়িয়াছিল। মাষ্টারের একটা শিত ঘরে থাকিলে সমস্ত পরিবারের মজার মনোযোগ না হইলে তাহাকে বাঁচান সম্ভব নয়। কমলা নিজে কোনও দিন শিত পালন করে নাই। এ বাড়ীতে চুখের কোন স্ত্রীমত ব্যবস্থা ছিল না; গোবিন্দের মার একাদশের প্রভৃতি উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে পাড়া হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। কাজেই এখনও নিতা চুখ ছুটিবার কোনও উপায় ছিল না, যদি বা কোন দিন পাড়ার কোন ঘরোকে খরিদা এ বাড়ী ও বাড়ী হইতে একটু আদরও গুণ সংগ্রহ হইত, তবুও তার সম্ভবমত পাওয়া ঘাইত না; শটির পালো, ভাতের বাক, মহলা ইত্যাদি ছিল নিতা বসাদ। কাজেই শিতটির পেটের অল্প আদরই লাগিয়া থাকিত। কমলাকে তার লইয়া প্রায় অপরিস্রুত অবস্থায় থাকিতে হইত। কমলার পাওয়া বুঝা তাহাকে ল্পন করিতেন না। প্রথম প্রথম কমলা শিতটির জন্য এখন ছাড়া করিত তাহাতে যেন একটু-বিশেষ লজ্জিত হইত। শ্রান্তকীর করার খুব কম কাজই সে করিতে পাইত। বিশেষত যে দিন হইতে চৌধুরী বাড়ীর পুমা বড় হইল ও ঠাকুরের

পুনরতিবেক হইল সে দিন হইতে সে ঠাকুর ঘরের কোনও কাজেই হাত দিতে পারিত না। বড়টা বা গোবিন্দের মা পারিতেন করিতে, বড়টা বা গোবিন্দ নিজে একি ও দিক হইতে খুঁটিয়া আনিয়া পারিত করিত। বেল্য চইট। তিনটার আগে ঠাকুর সেবা হইত না এবং গোবিন্দের বাইতে প্রায় চাটটা পাঁচটা বাজিয়া বাইত। অধিক গোবিন্দের ভয়ে গোবিন্দ তার ঘরেই বাইত।

অন্যদিকে কর্ণের পাকের মধ্যে ছাড়া দিলে তাহাকে অনেক নিগ্রহ ও শাসনা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু চাপ খাইতে খাইতে দু এক ঘাটগার ঢোল বাজিয়া সতীয়া যায়। কিন্তু কখনও একেবারে কর্ণের বাহিরে আনিয়া ছাড়া দিলে সে এমন ভীষণ ভাবে নিরাশ্রয় ও নিরাশ্রয় হয় যে, কপৎ তাহার কাছে একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়। সে যেন একটা অতল পুত্ৰতার মধ্যে তলাইয়া বাইতে থাকে। কোনও একটা অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিত না পারিলে তাহার বাঁচা জুলাইয়া হইয়া উঠে। 'কর্ণপরাধ' কলার দখল সমস্ত কর্ণ হইতে ছুটি হইল, তখন সে এই শিশুটিকে লইয়া পড়িল। চারিদিকের উপকা ও চুপা যেন আড়কাইয়া আড়কাইয়া তাহাকে ও তাহার কুড়ানো মেয়েটিকে একত্র করিয়া একটা নিজনি ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল। সেখানে তাহার দুইজনে দুইজনের মাস্তা, তাহাদিগকে বেধিবার আর কেহ নাই। এখন তাহার আর তেমন সন্ধ্যা বা ভয় ছিল না। তবেই মধ্যে এই কুস পিতৃটি তাহাকে অস্ত্র দিল। এই অত্যাধিক বয় তাহার স্বামী ও শাক্তীর নিকট দিন দিন নিরতিয় অশ্রুতির হইয়া তাহাকে জন্ম তাহাদের নিকট হইতে ঘুরে সরিয়া নিয়া পিতৃটির সহিত তাহার বন্ধন ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিল; কিন্তু পাত্রে পক্ষে শিকড়পড়াইয়া নতক হইয়া উঠিতে গেল যেন শুধু তার গোড়ার ঘাট-টুকু ভিলা পাকিলে যেন না, আগে পাণের বানিকটা ওমিই সর ও বয় থাক। আব্রহম, শিশুর হৃদিত পক্ষেও চারিদিক হইতে একটা ঘেঁ ও বসন্তের হেম্বি তাইই আব্রহম। লম্ব হইতেই যে বুজীয়া শিশু দেখত হাত-মেরে অতুল লম্ব হইতে বসিত, আনিয়াসাই

সমাক বাচাকে কুস অভিনন্দনের আশ্রমে বস করিতে চাহ, অবলম্বের উদ্ধার মত সকলে বাহাকে পরিহার করিতেছিল, শুধু কমলাকে আগ্রহ করিয়া সে তেমন করিয়া পুই হইয়া উঠিলে। চারিদিকের বিস্তৃত ভাঙার শিশুটি শুকাইয়া যাঁতে লাগিল। কমলা নিজে বস্তুদূর সাধা করিত, কিন্তু শিশুর পক্ষে ভাঙা পদাশ হইত না।

চৌধুরী বাড়ী হইতে তাড়িত ভগ্নার দিন চইতে গোবিন্দের কষ্টের পালা আরম্ভ হইয়াছিল। চৌধুরী অনেকদিনের বিনিময় ঘর। তাহাদের প্রাথমিক পুষ্কাত্যের বিধিব্যয় দেখ প্রভুর। তা ছাড়া একটা না একটা ছোট বাট ক্রিয় কর্ণ তাইই লাগিয়া থাকিত, কাজেই সেখানে কাজ করার পর আর নানা যানে যোগা-যতির বড় প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সে দিক একে হওয়াতে প্রায়শঃ ছোট বাট পুষ্কাত্য হইয়া উঠিত। এমন কি অনেক গোমস্তা হইয়া এর প্রায়শঃ গিয়া পুষ্কাত্য আদিত হইত। তা ছাড়া, বাড়ীর অনেক কাজও এখন তাহার উপর পড়িয়াছিল। এত কষ্ট করা গোবিন্দের কোনও দিন অভ্যাস ছিল না।

কুড়ানো শিশুটির হাত কমলার এত মাঝে মাঝে গোবিন্দের পক্ষে দিন দিনই অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিতেছিল। প্রা-সরিবেশের আকর্ষণ বিকর্ষণের এমনই নিয়ম যে কোনও বিকল্প একটা আকর্ষণ যদি একটু বাড়িয়া যায় তবে সমস্ত গ্রহমণ্ডলেই একটা বিলম্ব বাধিয়া উঠে। আর কুস শিশুটির মত কমলার আকর্ষণটুকু কমল তাহাকে গোবিন্দের ঘেঁ-কক হইতে ঘুরে গিয়া বাইতেছিল। সামান্য উপলক্ষ লইয়া সে প্রায়ই শিশুটিকে ও কমলাকে ভিরঝির করিত, কিন্তু কমলার তত্ত্ব হইতে কোনও লম্বা আসিত না। গাড়া না শাইয়া গোবিন্দের সাধ বাড়িয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ই হয়ত অত্যাধিক উত্তেজনার মাত্রা ছাড়াইয়া বাইত। কিন্তু কমলা এমন নিঃশব্দে পান কাটাইয়া বাইত যে ভিরঝিরের উত্তাপটুকুও যেন তাহার গায় লাগিত না। বার্ষ কোশের আশ্রমে গোবিন্দ নিজেই অগিয়া বসিত। ইহার ফল হইল এই, সে দিনে দিনে একটা বিজ্ঞানের



বাংলান পড়িয়া উঠিয়া পরশপরের পট্টিকে আদ্য কথিতা দিতে লাগিল, কিন্তু গোবিন্দের পক্ষে ইহা যেমন মর্শ্বাত্মক ঘটন, কমলার পক্ষে তেমন নয় : তাহার প্রধান কারণ এট যে, কমলার ভাস্কর ছিল সেই ক্ষুদ্র শিশুটি, কিন্তু গোবিন্দ ছিল একেবারে নিরবলম্বন। তা ছাড়া গোবিন্দ রাগিত, বকা-ককা করিত; আশ্চর্য্যকর চকল করিত। তুলিত, কমলা থাকিত শান্ত হইত।

গোবিন্দ কত সময় বসিতা বসিতা তাহারের পুঙ্কের হুংগের সংসারের কথা ভাবিত, শিশুটির উপর একটা ত্রোদ ও বিবোধে তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিত এবং একটা দারুণ অশান্তিতে তাহার জ্বর পূর্ণ হইয়া হইত। ইহা হইতে মুক্তা যদি কমলার সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটাইত, তাহাও কৃষ্ণি পক্ষে সত্য কথা হইতে পারিত। চন্দ্রকান্ত অমাবসার অন্ধকার বাতাবিক বসিতা সত্য কথা বার : কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের রাহুগাল জ্বর বিচার করে।

এদিকে দৌরভ্রান্তের চক্রান্ত যে থাকিতা উঠিতেছিল, গোবিন্দ তাহা তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। একদিন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামের রসমর চক্রবর্তীর বাড়ীতে অশ্বত্থ-প্রায় মধ্যাহ্নে গোবিন্দ যখন কমলীপত্রশ্রেণী-পাতিত নিমন্ত্রণ-শচ্য গিয়া গ্রামেণ করিল তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা মাদন ত্রাপণ করিতা উঠিয়া হাঁড়টিগেল। জাতিজীব গোবিন্দ অশমানেব ভরা লইয়া বাড়ী করিতা আসিল। সেইদিন হইতে গোবিন্দের পৌরহিত্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

গোবিন্দ দিয়া চৌধুরী বাড়ীর বড়কর্তার পা বড়াইয়া ধরিতা কামিয়া পড়িল। বড়কর্তা বরাবরই গোবিন্দকে একটু ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, শিশুটির একটা বন্দোবস্ত করিয়া কৈলিতে পাঠিলেই তিনি সমস্ত গোলমাল চুকাইয়া দিবেন; অস্তথা কিছু করা অসম্ভব।

পল্লবকল্যাণ পরমেশ্বরী কংবন্ধের চামরগাতি কম্পিত করিতা আকাশের দীপ চন্দ্রোদয়তলে ত্রাচপটে অঙ্কিতা হইয়াছেন ; প্রাতঃকালে দৃশ্যবোধে নিম্নলিখিত বস্তু নবাবকল্যাণদিত পক-স্কন্ধের উপর হুংগের তরক তুলিয়া দিয়া পেনাকিসুহৃৎগের শিবিল চক্রের উপর বৃহ চূরন করিতা বহিয়া চলিয়াছে। বর্গার

বহুদয় বর্গদয়র ত্রাচবন্দুভোর পর এ বেন শাবি ও স্রীতিব হুংগাচার : চারিদিকের দিগন্তবিশারী সূর্য সত্যমণ্ডলের উপর পূর্বোর কিরণকল্যাণের আনন্দ-নৃত্যের লীলা চলিয়াছে। ছেলে ঘেঁষে দল বাধিয়া দেখালি সূর্য হুড়াইতেছে, কিশোরীরা আনন্দে বাড়ী বাড়ী প্রতীমা দেখিতা কিশোরী, দুবতীরা পতি-সদাশয়ের আশার উৎসুকা হইয়া উঠিয়াছে, লুবকতা উৎসবের আয়োজনে মত্ত হইয়াছে। লগে, ঘাটে, বেলে, স্রীমারে, নৌকার চারিদিকে স্রীতিবজল। মিলন-সংস্কৃত, উৎসবপরায়ণ নরনারীরা আনন্দময় প্রাণের ভরা নাচিয়া চলিয়াছে। আত্ম-বারম্বারসুখের বোধনের দিন, আত্ম-আনন্দের দিন।

এমন দিনে আত্ম-কমলা নিরানন্দ, গোবিন্দ নিরানন্দ। শাবি কি বস্তু এ কর মাস কমলা তাহা জানে নাই। তাহার জন্মের মধ্যে পূর্বোর আলো ও হুস্ত বাতাসের প্রবেশের পণ নাই। এক অন্ধকারময় গহবরের মধ্যে সে এতদিন পড়িয়াছিল। কোনও অংশলন না পাইয়া শিশুটিকেই চাপিয়া ধরিয়াছিল। চিত্তার অশমানে লাতনার অগ্নিতে অজ্ঞাননে তার দেহ কল্যাণদার হইয়া গিয়াছিল। শবীরে সে লালসা ও কান্দি আর ছিল না। চোখের পাতার নিচে হইয়া বড় বড় কালো দাগ পড়িয়াছিল। দীর্ঘদিনের অসংসারে কেনভার প্রায় জটাভারে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এত দীনতার মধ্যেও একটি মাকু-সময়ের ধ্যানসেবা তাহার সুখশ্রীক মাধুর্য্য-প্রতিভা করিতা রাখিয়াছিল। শিশুটির প্রতি ভালবাসা তাহার মধ্যে একটা নৃতন জীবন সঞ্চার করিয়াছিল। একদিকে যেমন সে এট ভালবাসার দ্বায়ে জীবনের মধ্যে একটা নৃতন মাধুর্য্য বোধ করিত, অপরদিকে তেমনই এট শিশুটিকে উপলব্ধ করিতা যে প্রবেশের অধিগণা এলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও সে ভীত ও বিপর্য্যত হইত। এই ত সেদিন এই সপ্নারবানি কি আনন্দে, কি শান্তিতে, পরিপূর্ণ ছিল। যে দিন লুবকভুগ্ন মত এই শিশুটি আসিয়া এ সংসারে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতেই এই অশান্তির আরম্ভ। এই অংশলনের বোধ ত সেই বহিরা আনিয়াছে। আত্ম-তাহার সমস্ত জীবনের সেবার সামগ্রী, তাহার নিম্নের হাতের গড়া এই সন্দারবানি

একবারে পর্য্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। নিশুণ দেবার উপহারে যে দাবীকে সে এতদিন ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহারই জন্ত তিনি ভাতিষ্ঠাত উপহার-দান। যে পরিবারে ভাঙান পরীক্ষা আদিগা কখনও কিরিয়া যায়ই না, সেই পরিবার এখন অনশনের দ্বারে উপস্থিত।

কোনও শাস্তি, তিরস্কার বা লাঞ্ছনাই তাহার পক্ষে দেখেই নাই ইহা মনে করিয়া কমলা আপনাকে পুতখিড়ার দিত। অনেক সময় এই পিতৃর উপর তাহার রাগ হইত। পিতৃর অজ্ঞাত পিতামাতার উপর অমঙ্গল পাণিবর্ষণ করিত। যেমন প্রবল ঔষ ও বহুদার হাত চরিতে মুক্তি পাইবার জন্য মাত্রম আত্মত্যাগ করত উৎসাহ হইয়া উঠে, তেমনি এই পিতৃতিক কোথাও বিদর্জন করিয়া দিবে এ চিন্তাও অনেক সময়ে তাহার মনে উঠিত। এই পিতৃই সমস্ত সন্দেহাদি স্ক্রম করিয়া আনিয়াছে, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া সে নিজে মুক্ত হইবে এবং পরিবারের সঙ্কলকে মুক্তি দিবে। আর এ বহুদা সঙ্কল কত দীর্ঘ না।

যেদিন হঠাৎ ভাতিষ্ঠাত হইয়াছিল, সেইদিন হঠাৎই যেমন করিয়া পিতৃটির এই বাক্য বোকা বুদ্ধ হইতে নামাইতে পারে তাঁহার জন্য গোবিন্দ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল, কিন্তু কাছে ঘাটাইতে পারে এমন কোন উপায়ই তাহার বুদ্ধিতে আদিতেনি না; এদিকে দিন দিনই পূজা বনাইয়া আসিতেছিল। গর্ভাপূজার মধ্যে কোন ব্যবস্থা নাই হইলে তাহার কোনও উপায় নাই। বিনা অধিকারে যে একটি সামান্য ক্ষুদ্র শিশু দুলায়ে একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে নড়ান কত কষ্টের, তাহা গোবিন্দ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিল। এমন সময় সংবাদ পাইল সেই প্রাণের বিন্দু বোটেমী এখন একটি কড়াপালন করিতে উচ্ছৃঙ্খল আছে।

বিন্দু বোটেমী এখন বয়স পড়িয়া আসিয়াছে। তাই স্তব্ধবাসের অবলম্বনের জন্য সে একটি কড়া পাইলে রাখিতে চায়। পূর্ণাবিন্দ গোবিন্দ সমস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছে, আজ বোটেমীর দিন প্রাতঃকালে তাহার কাছে পিতৃতিকে দিয়া আসিবে। পিতৃতিকে একবার বাকী হইতে বাহির করিতে পারিলেই যে সে আবার চৌধুরী বাড়ীর দূর্গাপূজার

তার পাইবে এবং অস্ত্রান্ত সমস্ত গোলমালও মিটিয়া যাইবে, সে স্বেচ্ছা বড় কঠোর তাহাকে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছিল।

অনেকদিন পর সন্দেহের বোমাটা ফেলিয়া দিতে পারিবে সেই চিন্তায় মনটা আজ উৎসাহে দাঁপ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কমলার কাছে এই সন্তোষ তরিতে কেমন যেন সে সন্তোষ পাঠ্যেছিল। নানা ব্যাপারে এ কথ মনে কমলা তাহার অনেক দূরে দিয়া পড়িয়াছিল। এত বড় ব্যবধান, এত বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিতে যে কমলা পারিয়াছিল, তাহার শক্তি যে এই পিতৃটির মনেই সঞ্চিত ছিল, টা গোবিন্দ যে একটু একটু না বুঝিত তাহা নহে। সে লাকনা বহুদা সে এই পিতৃটির জন্য এতদিন নারের সহ্য করিয়াছে এবং যে মেহপল বিস্তার করিয়া সে চারিদিকের আশ্রিত হইতে তাহাকে এতদিন লাড়িয়া আসিয়াছে, তাহাতেই সতলেব অলঙ্কার পিতৃটির উপর তাহার এমন একটি অধিকার স্থাপন করিয়াছিল যে, গোবিন্দ যখন কপাটী হইয়া কমলার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন সে প্রথম এমন বসন্ত হইয়া গেল যে, কপাটী ভাল করিয়া বলিতে পারিল না।

কিছুদিন হইতে কমলা নিজেও ভাবিতেছিল, পিতৃটা কতকগুলি দ্বিগা ফেলিতে পারিলে হয়, এ উৎসাহ ক্ষুদ্র হইয়াছে। কিন্তু সেই পরিচালনা কবির কাল যখন তাহার সমুখে আসিয়া বাড়িয়াছিল, তখন কেমন একটা বসন্ত আঘাতে তাহার জঘনতা কিরিয়া গেল। এতদিন ধরিয়া অস্ত্র সমস্ত দিকে সে কণ্ড পাইয়া আসিতেছিল, শুধু ব্যবসলারনে তাহার জঘনের মাতৃবীর দিকটী কমলাই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত, তাগে, নিষ্ঠার, সে পবের সমস্তই সমস্তবতী হইয়াছিল। বিবের মাতৃমুষ্টি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত করিয়াছিল। এক মুহূর্তের আঘাতে আজ এই সত্যটি তাহার নিকট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দেখিল সে মা।

গোবিন্দ যখন দেখিল কমলা তাহাকে কোন মতেই দিবে না, তখন সে সমুখে অস্ত্রকার দেখিল। একদিন ধরিয়া সে যে আশা পড়িয়া তুলিতেছিল বৃষ্টি আজ তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। এক মুহূর্তে তাহার মনে এ কথাসংসার সঙ্কল কত দীর্ঘ লাঞ্ছনা উদ্ভিত হইল। আজ যদি সে এই গর্ভা







করবার ভার নেবে State । সম্পত্তি কাড়তে হলে ভবিষ্যৎ  
রাখি করবে—অতএব বিচার দফা হ'ল—(Class war) । এই  
মূল মৈত্রিক নয়—অর্থনৈতিক, অতএব তৃতীয় দফা হল  
Revolutionary । তাই শোভালিঙ্গম্ প্রচার করতে  
হ'লে আমাদের চাওতে হবে যে, এই দিন দফাতেই আমরা  
রাখি কি না ।

আজ চতুর্দিকে যে ইংগা চলছে যে, জমিদারকে পিষে  
ফেল, টাকা কেড়ে নেও, বিদ্রোহের আভাস মেলে দাও  
মজুর ও গ্রাম্যের ক্ষমতা—আজ দেখতে হবে এর পিছনে  
কি আছে—তুমি কি চিন্তামনতা বা অগোষ্ঠা, না, এর  
পিছনে আছে সত্যিকারের আশ্রয় দেহতার দাবী ? একথা  
আজ মনে নিতেই হবে যে, শুভামি দ্বারা কিছু লাভ করা  
যায় না—লাভ পাচ্ছে কেইলি অগম্যস্তর হ'ল হয় না ।  
চৈতন্যবাহিনী নতুন চৈতন্য সৃষ্টি হয় না । কাকন-বটনের  
চেয়ে কাকন বাড়ানো চের প্রেরণ । ধর্মশালার তত্ত্ব  
নুষ্ঠা হয়—স্বজনগণের মঙ্গলমথ থেকে গুটে । বেদনা  
সত্যিকার পুষ্ট করে বটে, কিন্তু বেদনার তাপ সৃষ্টিকার মতে  
করে । চিত্তবেদনা আর বিজ্ঞবেদনা ত এক নয় ।

জমিদারদের ওপর জনসাধারণের এই অভিমান—এটা  
অবশ্য নতুন কথা নয় । সেটোর আমল থেকে কল্যাণী বিদ্রোহ  
পর্ষায় বহু দেখক ও তাত্ত্বিক জমিদারদের উপর অগোষ্ঠা  
প্রকাশ করেছে—কিন্তু সেটা প্রায়ের দিক দিয়ে । কল্যাণী-  
বিদ্রোহের সময় জমিদারদের উপর বশেষ আক্রমণ হয়েছিল  
এবং Class war ছিল, কিন্তু তা ছিল প্রাক-নৈতিক,—অর্থ-  
নৈতিক নয় । অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পত্তি আক্রমণ  
করার ক্ষমতা প্রথম Saint Simon । কিন্তু তিনি  
সমাজকে ঐক্য বাস্তব দিলেন Collectivism । তারপর  
এলেন Robert Owen । কিন্তু তিনি বললেন -Co-ope-  
ration । তারপর Louis Blanc । তিনি সংস্কারের ভার  
দিলেন State-এর উপর (State-socialism) । তারপর  
এলেন Proudhon । তিনি বলেন—Property is theft ;  
অতএব কর বিদ্রোহ আর বিদ্রোহই বা কি—তুমি জমিদার  
দের অস্ত্রের আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান । অতএব গণতন্ত্র  
মন্ত্র মুখ বাগাকে বুঝ করতে হবে বিদ্রোহ ক'রে ।

তারপর Marx । তিনি প্রেক্ষাপটন করলেন—  
শোভালিঙ্গম্—অর্থাৎ মজুরদের জগৎ । সম্পত্তি ধরণ কর,  
রাষ্ট্রের হাতে বটনের ভার দাও, সরকার হ'লে বিদ্রোহ  
কর, সমগ্র জনসাধারণকে এক করতে হবে । Proudhon  
আর Bentin সব নয়—প্রমের উচিত মূল্য দিতে হবে ।  
সমাজের অর্থনৈতিক বাধ্য এবং তার উপর নতুন সমাজের  
পত্তন । অতএব Karl Marx শোভালিঙ্গম্-এর পিতা না  
হ'লেও অস্ত্রতা : চতুর্থ । এবং এই শোভালিঙ্গম্-এর করণা  
থেকে বেঁচে এল কমানিষ্টম, এনার্কিস্টম, ফেডারেলিস্টম,  
সিদ্ধান্তালিঙ্গম, টেইলরিস্টম, বনসেচিকম ও সলিডা-  
রিস্টম । সত্যি কথা বলতে কি, ফেডারেলিস্টম-এর পথের  
তাই ফ্যানিস্টম এবং বৈশিষ্ট্যের তাই শোভালিঙ্গম ; কারণ  
যাকে State-socialism বলা হয় তাকে অস্ত্র চাষার State-  
capitalismও বলা যায় । Capitalism সমাজের গুণে  
পড়ে । যে মীমাংসাই করা যায় তা হয় Capitalism-এর  
করা অথবা ছাড়া । কারণের চেয়ে ছাড়াই যে মাত্রাশূন্য—  
তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না ।

অতএব শোভালিঙ্গম্ চলাতে চলে প্রথম চাই সংযত  
গুণ এবং এই সংযত হবার মালমণা হ'ল—শোভ, জ্ঞান  
হিসাব, অবিদ্যা ও অস্বাভাব । জমিদার আমল থেকে  
জমিদারকে বঞ্চিত করতে হবে—এই divorce আন্দোলনে  
পারলে অগম্যস্তর থেকে পারবে কিন্তু অগম্যস্তর এসে  
পড়বে । এই অগম্যস্তর জর গীতা দায়ী হবেন—সত্যি-  
কাতের অগম্যস্তর হ'ল তাইবোধ । যে সংযত মাত্রাশূন্য গুণ  
করতে শেখায়, মাত্রাশূন্য অবিদ্যা করতে শেখায়, সে  
অগম্যস্তর ভারে নিজেই হাসা যাবে । যে অবিদ্যার Cap-  
italist করেছে—সে অবিদ্যার প্রতিফল মজুরের জোখাফ  
অস্ত্রের অক্ষয়ন নয় । বা হাতের বাধা ভান হাতে  
মেলে পরীক্ষক ব্যাধিযুক্ত বলা যায় না । স্বাধীনতার  
তাগার কল্‌তে হয়—

“যেব অধরদরির দ্বারা পাপ যায়, যেন অক্ষয়করকে  
লাঠি মারলে সে মরে । এ কেমন, যেন খেঁচের দল  
বল্‌তে, পাতিঙলোকে শুদ্ধা লাগিয়ে গলা বাঁধা করাও—  
তাহ'লেই বন্দী নিরাপন্ন হবে । কুলে যায় যে মরা পাতিঙরি

হুত থাকে চেপে তাবের পাণ্ডিত্যের পাণ্ডিত্যের ক'রে তুলতে দেখা করে না।”

যেটা সোজা: পথ সেটা সব সময়ে স্রেষ্ঠ পথ নয়; জনসাধারণের মুক্তির পাতের স্তম্ভটি যাত্রা নির্ভরতার ক'রে দেওয়া নয়। স্তম্ভটি যে স্রেষ্ঠ নয় তার প্রমাণ—যোদ্ধা-বাক্যের বহু বাদিন্দা চাঙতে আছে তুনা দেখে—মুক্তি লাভ করেছে ব'লে জানা যায়নি। মানবজাতির ওপর প্রভা আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, এই বিরাট মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে জনসাধারণের ওপর। যিনি বসার্বই বুদ্ধ মুক্তির বাণীর প্রচার করবার অধিকারী তিনি—মণ্ডিত বা দাপিত মজুরপন নয়। এটা একটা ভীষনের ইচ্ছাভি যে, বাথার বাণী তিনি নন যিনি বাথার বোকা বইছেন; ভীষনে যাত্রা মস্তককারী, ক্রত-কার্য্য চরার পথ যদি তাঁরা দেখতে আসেন—ভীষনের ভক্ত সমবেদনা দেখাতে পারি, কিন্তু বাথার দেখার কিছু নেই। তাই Wells বলেছেন, “The path of human progress can never lie in crowd psychology.”

আজ পশ্চিমকে দেখে আমাদের তুলেও চলবে না, উল্লেখও চলবে না। যা বৃহৎ তা মরৎ নয়। পশ্চিম আজ নিজের ভারে চলতে পারছে না মস্ত অবস্থার চার পাশে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, কোথার পাশি পাবে। তাই আজ সে সোশ্যালিজম করছে, কাল ফাসিজম করছে। মনে যার পাশি নেই—বাইরের অবরমণিতে সে পাশি কি ক'রে পাবে। জ্বালের সঙ্গে পান্না দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে—খামবার তার পশি নেই। হুগের প্রবর্ততা যার ভাল লাগে, চক্রেয় নিষ্ঠতা সে ভোগ করবে কি ক'রে। পশ্চিম আজ তাই পরিত্যক্ত, কিন্তু বাবিনতা আর সে হারিয়ে বসেছে; লংঘের বেড়া ধালে আঁক।

তাই প্রর গড়াজে, সোশ্যালিজম এর সঙ্গে ব্রকা করার জ্বর্ষ হ'ল বিত্যাণ ও সন্থের সঙ্গে মিথালি করা কি না। কিন্তু ভারতের একটা নিম্ন বর্গ আছে—আমি Mission

অর্থে বস্দি না। আজকাল নাস্তিক ভগতে Mission কথাটা উপহাসের জিনিষ। আমি বস্দি Traditionএর কথা, যা বৈজ্ঞানিক যুগেও গোকে যেনে। আমাদের Traditionটা প্রথম জানতে হবে, তার পরে মানতে হবে। এতে হুৎ করবার নেই, এতে গর্গ করবারও নেই। আমাদের ইতিহাস, মর্গন, কাব্য ইত্যাদি যদি একটা বিশেষ পথে এগিয়ে থাকে তাতে লক্ষ্যার কিছু নেই—সেটাকে যেনে নেওয়ার চেয়ে যেনে নেওয়াটা দরকার বেশী। আমরা জানি মানুষ শুণ্ড food-seeking machine নয়। তার ক্ষুধাও যেনে আছে, মনও ভেমন আছে।

মানুষ যখন পূর্ণ তখন সে লুন্ড, তখন সে পরিত্যক্ত নয়। পশ্চিম প্রয়োজন আছে, অতএব সে কামা। পশ্চিম অকৃত্য আছে, অতএব পশ্চিম মনঃসমকে সাহত করতে হবে। কিন্তু ঈ, দোম্বা, পূর্ণতা মানুষ প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে।

আমরা সমাজে বিত্যাণকে কখনও পনে দিইনি, দুখগাচেই খরগ করে নিয়েছি। আমরা harmonyকে সব চেয়ে বড় হান দিয়েছি, পশ্চিমের মস্ত অবরমণি ক'রে বহুতে এক করবার প্রচেষ্টা আমরা করিনি। আমরা বৈচিত্র্যকে হান দিয়েছি, অগৎ বিত্যাণ তাতে বাঁধনি। আমাদের বর্বিভাগের ভিতরও সেট harmony রকম করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হুতিন জাতি আছে বটে, কিন্তু তাদের ভিতরও একটা যোগসূত্র আছে যাতে বিত্যাণ ও সন্থকে বাধা দিয়েছে। আজকাল সেই বর্বিভাগের বিকৃত হুতি দেখে পূর্ণপুঙ্খবদের উচ্চতর তুলে যাওয়া ঠিক নয়। অস্তত: Patrician আর Plebian এর বিত্যাণ আমাদের দেশে হানি। কারণ মানুষের স্রেষ্ঠ পরিচয় মনুষ্য পন কথা আমরা কখনো স্বীকার করিনি;—বহান করেছি পাশি আমরা তখনি পেরেছি। কত যিনেদী এসে আমাদের সমাজের হারে উপস্থিত হল—আমরা কখনো তাদের স্বাস করতে চেষ্টা করিনি; তাদের আদরে হান দিয়েছি—সমাজের পরিধি বেড়েছে, কিন্তু মুখলা নই হয় নি। কত বর্গ এসে যা দিল, কিন্তু ‘Thirty years’ আমাদের দেশে হানি।





পত্রকে যখন দিয়েছি, তবুও বিরোধ ও সংঘর্ষের সুপকাত্বে সমাজের লুপ্তা অমরা বসি দিই নি, নহুও, প্রত্যয় সৃষ্টি অমরা আমাদের জীবন কাটিয়েছি। অতঃকালে যদি আমাদের সমাজে নতুন কোন সমাজ এসে উপস্থিত হ'বে থাকে সেই সমগ্র সমাধান করতে যেন আমরা মহত্ব না হারাতি, লুপ্তাৎকে যেন নষ্ট না করি। বিরোধ যেন আমাদের পরম্পরের লক্ষ্যকে অস্পষ্ট না ক'রে দেয়, শক্তি অসংগত চেষ্টা যেন আমাদের জীবনের ত্রীক কুংগিত না করে।

বাংলা, অমরা লুপ্তাৎ যেন নষ্ট করিনি তেমন লুপ্তাৎকায় তার অমরা চেষ্টার ওপর দিইনি। আমাদের সমাজ নিজেই নিজে বন্ধ করেছে, তার পরলুপ্তাৎকী চ'রে থাকতে চানি। অমরা নিজেই বাস্তব বাস্তব নিজেদের পরবর্তী, বাট, মাত্র, বাট, মাত্র, বিজ্ঞান, গ্রাম নিজে; কত রাষ্ট্রা অসি, রাষ্ট্র পরিত, অমরা স'রে যেত; অমরা ওকুৎ পক্ষ আমাদের সমাজ পরিত পৌছাত না; রাষ্ট্রাতির কুটিল চক্র আমাদের সমাজকে বন্ধ করতে পারত না। আমাদের সমাজ ছিল পূর্ণ, তার বন্ধী সমগ্রতা মীমাংসা নে দিয়েই করতে। আজ রাষ্ট্রের হাতে গোষ্ঠীর তার কুণে বিশে প্রবিশে কি হবে করতে পারিনে। সামাজিক বা বাস্তবতা বাস্তবতা একদমভাবে সংকর্ণ ক'রে ফেললে তা কি ধনী ওভাটায়ের চেয়েও উল্লিখিত হবে না? অবশ্যবস্থাই যদি সৃষ্টি হয় তা হ'লে আর এত হালকা কেন? মোট কথা, নির্ভবিষয় কল্পেই অমরা রাষ্ট্রের হাতে সংকর্ণতার তার দিলেই millennium আগবে না। নিজেদের উন্নতি নিজেদের হাতে—নিজেদের পাতি নিজেদের মনে। এই হাত ও মন পরের কাছে ফেলে রাখলে উন্নতিও হবে না পাতিও পাব না। বা হবে বা পাওতা বাবে তার কত সোশ্যালিজম প্রচার করা অশোভন হবে। পাছে কুড়াল যেনে পাছে ওভার চেষ্টা করলে পাছে ওভা সম্বন্ধ হয় না। এর কত দ্বন্দ্বী পাছও নয়, বিধাতাও নন; সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বী নিজে—স্বাধীনতা তপ্তি কুড়াল।

তাই বুদ্ধিমান, সমাজ যদি নিজেই বাঁচাতে না

পেখে তা হ'লে সমাজ বাঁচবে না। তাই সোশ্যালিজম বল, আর যে কোন "ইজম"ই বল—সোশ নিজেদের ভিতরে—বাইরের ট্রেটই বা কি করবে, আর ট্রেটইউনিয়নিসমই বা কি করবে। তাই তবাবাবুর কথা মনে পড়ে—

"অমল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে যানে না কোন আইন তাকে বাঁচাতে পারে না; নিজেকে এই যে বাঁচানের শক্তি, তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোন একটা ধাপেই প্রযোজ্যে হয়।"

আর এক কথা। Non-industrial দেশে সোশ্যালিজম ইতিপূর্বে ঠিক হয়ে না, আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে পরকায় কৃষকের লাভ, তাদের "হেড পাট" নয়। আর কৃষকের মত industrial করবার ইচ্ছে বাংলায় যে আমাদের দেশ industrial হবে, তা মনে হয় না। শুধু উপসর্গ বাড়িয়েই বা লাভ কি। আমাদের অভাব অভিযোগ ত বোধে। গোষ্ঠার দ্বন্দ্বীরা মানুষকে অস্বাভাবিক করা যায়—কিন্তু বাধি যখন মনে—তার পরীক্ষা অস্বাভাবিক ক'রে লাভ কি।

আর আমাদের মজুর বা রাষ্ট্র—তাদের দিয়ে সোশ্যালিজম করতে হ'লে—বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে না এনে—তাদের উন্নতির বাধা করা বন্ধকার। শিকা তাদের পক্ষে বন্ধকার—দাঁকা নয়। আমাদের নেতারা বলাবল্য ক'ছেন তাদের দাঁকা দেবার ক্ষমতা—শিকা দেবার কথাটি নেই। তবু চর পাছে তারা বাস্তবপন্থে সমাজ হ'বে নেতাদেরই হুমকি অমরা করে। আমাদের নেতাদের কাগার ইতিহাস হ'ল—চাষী বাটে জমিদারের কবল থেকে তাদের কবলে এসে পড়ে—শ্রমিক বাটে শ্রম ছেড়ে তাদের অধঃপাশন করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। রাষ্ট্র ও শ্রমিকের এই ইতিহাস তাদের কিছু হুমকি হবে হ'লে ত মনে হয় না।

মোটকথা, সোশ্যালিজম আমাদের রক্তে নেই—যাতে নয় না—সম্পদে বরা পড়ে না—আর মনে রাষ্ট্রা বাঁচতে পারেনি। তাই ক'কা লাগলে শোনা যায়। তাই দেখতে পাই, যে সত্য সোশ্যালিজম পাল হ'বে বাথ—

সেই সন্ধ্যাই বালাবিবাত নিয়ে তুঙ্গল থাক্‌বিত্তা হু।  
যে দুব-পথেলনে সোণালিঙ্গন লম্বে সন্ধ্যাই একমত—  
সেই লম্বেলনই আবার অলম্বণ বিবাহে আগতি গোলো।  
তাই মনে হু—সোণালিঙ্গনকে আমরা প্রচণ্ড করতে  
প্রস্তুত নই—অথবা সোণালিঙ্গনই অর্থ আমাদের বোধগম্য  
হু নি।

আজ আমি শুধু এই কথাটিই বলতে চাই যে, আমাদের  
সমন্য দেশকে নিজ মিতার বা নিধনী করা নহু।  
গৌরীশ্রীমিতা বা সত্যিকারের কোন স্বীকৃতি হু না।  
ভারতকে মঙ্গলের পথে চালাতে হ'লে—সোড়াতাই অমঙ্গলকে

ভেঙে লাগু নহু। মাসেন্দার বিকৃত প্রকাশ পড়ির  
পড়িরে বের না। দেশোদ্ধার করতে হ'লে দেশের প্রাণিকে  
তালবাসতে হবে। তালবাসা যেমন মিতে চাষ—তেমনি  
মিতেও চাষ। এই তালবাসার পথ হ'ল—শোভ ও ক্রোধ ;  
এং যে প্রাণী শোভ ও ক্রোধকে নষ্ট করতে চাষতা  
করবে না—সেই প্রাণী সঙ্গী বা স্বামী। আমাকে  
হুল বুঝবার অধিকার পাঠকদের আছে, কিন্তু দেশকে  
হুলপথে চালাবার অধিকার কারো নহু। সেই  
অনধিকারের কথা স্মরণ করিবে যেবার ভুলটি মাতকের  
এই প্রবন্ধ।

## গান

### শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মেঘে মেঘে বেড়ে গেল অনেক বেলা।

তুলে তুলে হ'ল কাজের কাজে বেলা।

আগে দুঃখের পথের সড়ি, তবু আগে কাজের সড়ি।

কুড়িরে চলি, আছে বা'বা' কুড়িরে ফেলা।

হাত চালাতে হাতে লাগে, সারতে হবে সঁজের আগে।

শেষের খেপে হ'বে কি সে বেগার ভেলা।

দুরেও দেশের কাজের তরে যেতে কি গো হ'বে পরে ?

ক্রমে বুঝ আসছে মাঝি সাজিরে ভেলা।



অন্তর্যমিত্র হ'য়ে দোস্তগার জাননা দিয়ে সে বাস্তব লোক দেখতে লাগলো।

ময়লা ছেঁড়া একটা মাটি, চার পাঁচ দিনের দখিত বাড়ি, গোড়ালি-দ্বীন চুটি নিয়ে বোঁরেন পটাল পটাল করতে করতে এনে ছাত্রটির আগমনের প্রতীকার ব'সে ছিল। চা চাতে ক'রে যখন শেকালি ঘরে প্রবেশ করলো বোঁরেন তখন দেখতে পার নি। কাণ মেটে ছোকরুটির লগ্নে লগ্নে হ'য়ে চোর দেখলে—শেকালি দোকানঘরের মত বেহাখানি সামিবে তাবের প্রেত-প্রমাণ করতে চোরকে, অথবা তাবের অব-অজ্ঞতা।

শেকালি হেসে বললো, 'বোঁরেন বাবু, আপনায় অনেক লেখা আমি পড়েছি, আপনায় লেখা আমার পুর পছন্দ হয়।'

বোঁরেন হেসে বললে, 'আমার লেখা পছন্দ হয় এমন একজন পাঠিকার লজান পেয়ে বাস্তবিকই সুখী হলাম।—আজ্ঞা তা এখন একটু কাজ থাকে। আর ওই চাটা' আমি খাইনে, ওটা আর কাউকে দিয়ে দিন।'

'চা খান না?'

'গরু ভাত পায় না, তরা চা খাবে কোথেকে?'

শেকালির মাথাটা লজ্জায় নীচু হ'য়ে গেল। তার দত্ত প্রদান, লগ্নাখান বেলুনা যেন একটা বিড়না হ'য়ে উঠলো। এই দোকান লগ্নে অকণ্ট লোকটির সামনে এই দোকানদারি শেকালির কাছে অর্থহীন উপহাসের মতই অসহ্য হ'য়ে উঠলো।

শেকালি আবার ক'রে বললে, 'আজ্ঞা আর না হয় পড়টা নাই হ'ল, আপনায় লগ্নে একটু সাহিত্যগোচনা করা বাস্—'

'প্রথমত, পড়টা না করলে কর্তব্যের কটু পেকে থাকে; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে আমার এত জ্ঞান নেই যে তা নিয়ে আলোচনা করা চলে।'

শেকালি, একটু সামলে নিয়ে মোর' ক'রেই বললে, 'আপনায় 'ভাতি' গল্পটার বারিকার চিরকো আপনি মেয়েদের মনটাকে বড়ই ছোট ক'রে দেখিয়েছেন।'

'ওই বারিকার চিত্রেরই ত আর সমস্ত নারীভাষিকের পেরে: হয়নি। ও-একটা মেয়ে কি ও রকম পাকুতে নেই?'

শেকালি চোর চোর দেখতে লাগলো এই লোকটির বৃক্কের ভাষাট কালা বাংলায় সমস্ত পাঠক পাঠিকার এক-লগ্নে মিলেও কৌণে বুঝতে পারেনি।

তার ঐশ্বর্যের উচ্ছলতার দিকে বৃত্ত করবার চক্র এত কতক্রে তার পাথের নীচে প্রথার মজলি বিনেত লগ্না শেকালি উজ্জ্ব হ'য়ে পড়লো।

গু

শেকালি সেদিন মণ্ডিক্রবাবুর কাছে বাসনা ব'সলে, 'আপনাদের বাড়ীর মেয়েকে লগ্নে রাখিনি কেনম করে কাটার—তাদের জীবনের বৈচিত্র্য কতখানি।'

মণ্ডিক্রবাবু হেসে ব'ললেন, 'স্বাধ মা, তা তুলে মনে করবে যে তোমার এই সাতার মশাররা কুণিমজুরের মত—সে তখন কাজ নেই! তাদের জীবন বড়ই দুর্ভাগ।'

'তবু বলুন না তনি।'

মণ্ডিক্রবাবু ব'লতে লাগলেন, 'এর লগ্নাণে উঠে রাঁধের বাসন মেলে কেনে মেয়েদের ভাত রেঁধে দিয়ে তারপর গুপ্তের রাজা। গুপ্তের কাঁথা সেগাই—তারপর বান ভদ্রা...'

শেকালি তাবলো ওই টুকুর ভিতরই ওদের জীবন আবহ, তার ভিতর থেকে বামোলেবা ক'রে নিজেদের লগ্ন মনে করে।

শেকালি মনে মনে তুলনা ক'রে দেখে—ভালমক বৃত্ত পায় না। শোকড়া আয়ের মত, কোনটার ভিতর পোকা আছে বৃত্ততে পারে না—ওটাই লগ্না লাল।

শেকালি আবার পোনে মেদের জীবন। সেই ভিতরগা ভাল,—উপরে জল মাঝে একটু গার অং তলায় ছ'কা ভাল চোখ মেলে থাকে!—বিকলে কোনদিন খাওয়া ছোট, কোনো দিন ছোট না। অজ্ঞতার ঘর; মাথায় ছাদ ঠেকে ঘর।

শেকালি তাবো এদের আশা আছে কিন্তু উপায় নেই। মাথা পেছে কিন্তু বেঁজার অভ্যাগল ঘর নি।—লগ্নাখান যেটে খেটে বুঝা শক্তিশব্দ করে।



য

শেকালি কিছুতেই ছাড়বে না—রাঁধবেই। মা জিজ্ঞাসা করলো, 'তোরা তারা পেশবার কি করকার—কোন দিন ত রাঁধতে হবে না।'

শেকালি উত্তর দিল, 'জীবনের অনেক কাজে লাগবে।'

নিজে নিজে বাগতি হ'তে টানাটানি করে। দেহখানাকে মাটার মশায়েন বাড়ীর উপযোগী ক'রে নিতে চেষ্টা করে।

মাটা মিলের কাগড় প'রে থাকে।

মা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোরা কি করেছে? ও কাগড় ক'র করলো?'

শেকালি বলে, 'ও সব কাগড় তো এতদিন পরেছি, এসব কাগড় প'রে গাফা দাঁধ ফিনা দেখছি।'

শেকালির ভেলগেটের জুতো হুলায় ভিতর মাঁকড়লা বাগা করেছে। মা বলেন, 'শেকালি জুতো পাখ বেওয়া ছেড়ে দিল মা? তোরা কি করেছে?'

শেকালি হেসে বলে, 'ওগুলো যেন আমার গায়ে নই মা, বাংলার কর্তা লোক আর জুতো পরে।'

মা ভাবেন বুকেই আন্দোলনে ঘরের ঘন বিগড়ে গেছে। এত অর্থ, ভোগ করে না দেখে মাতা ক্রুদ্ধ হন।

শেকালির বাবা মাটার মশায়েন ডেকে নিয়ে বললেন, 'মণীন্দ্রবাবু, আপনারা ত দুগুণো, তরবার। বংশ?'

মণীন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হ'লে ত মণীন্দ্রবাবু, আপনাদের সঙ্গে আমাদের কাজ কর্তব্য আছে না। শেকালির সঙ্গে আপনারা তাই যৌতেনের বিয়ে দিলে—'

'আজ্ঞে আমাদের বড়ই কষ্ট, ডাইটির বিয়ে এই অষ্টমাস নাগাদ দেব বই কি?—আমার ততটা খেয়াল ছিল না।'

'আমার শেকালির সঙ্গে দিতে আপনাদের কি অমত আছে? যৌতেন একদিন পড়াতে এগেছিল, আমার মনে হয় শেকালির—বুঝলেন কি না?'

'বীক শেকালিকে অপমান করেছে, আঁই তাকে তার উচিত শিক্ষা দেব।'

'সে কি? সে কি করলো? শেকালির সঙ্গে বীকর বিয়ে দিতে আপনাদের মত নেই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করছেন কেন?'

'হ্যাঁ নই মণীন্দ্রবাবু, আপন যদি বীককে হন তা হ'লে সত্যিই শেকালির সঙ্গে বীকর বিয়ে দিতে লোকের করতিল।'

মণীন্দ্রবাবু হী ক'রে চেয়ে থেকে বললেন, 'আমরা ত গরীব। শেকালি মায়েন কি আর গ্রামের ওল চাওয়া সহ্যে?'

'আমার যা আছে আমি তাতে নিজে বড়লোক থেকেও আর এক জনকে বড়লোক ক'রে দিতে পারি। আর দেখুন, সংসারে দেহের লুপ লাভিই সব নয়, মন ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে; তার উপরেও অনেক কথা নির্ভর করে।'

মণীন্দ্রবাবু উৎফুল্ল মুখে বললেন, 'আপনাদের যেদিন পুণী বলবেন বীককে বর লাভিয়ে নিয়ে আসবো।'

'বীকর মতামতটা—'

'তার আবার মতামত কি! আমার তাই, আমি যখন বলবো তখন বিয়ে করবে। আমার কথা কোনদিন অধ্যক্ষ করেছে এমন ত মনে হয় না।'

শেকালির বাবা নিশ্চিত হ'য়ে বললেন, 'আন্তরিক বক্তব্য জানাচ্ছি।'

মণীন্দ্রবাবু উঠানে ছেঁড়া ছাতাটা লে গাড়ীতেই ফেলে চ'লে আসলেন। খসলটা বে খালি হ'য়ে র'কেছে তা দেখবার অবসর হ'ল না।

মণীন্দ্রবাবুর ভাড়া কটন ঘরা গুঁড়ের একটি ঘরের পকেটের হ'য়েছে। হুতন ক'রে বাগি কাজ, নিবেট ক'রে গরতিকে টেবিল চৌরাস আপনাদের দ্বিগে সাহেবী করেন সাজান হ'য়েছে। দালালের অপর অংশটার নোনাখটা ইটগুলো তাবের পূর্ণকার খাঁ খবরা প্রকাশ ক'রে রইল।

শেকালি প্রথম বেদিন বস্ত্রবাহী যাবার ভক্ত প্রস্তুত হ'ল, দেখিছ তায় মা চোখের কলে ভাস্তে ভাস্তে বললেন, 'মা, তুমি কি আর গ্রামে থাকতে পারবে ? স্নিকিরা দীটের বাড়ীটার ভেতর এসে থাকতে বলবো তাবুতি ।'

শেকালি সজ্ঞাতরে বললে, 'তা হ'লে ত সবই পণ্ডিত্রম হ'ল তার বরকার নেই ।'

সে উচ্ছে ক'রেই পল্লীর শান্ত আশ্রয়ের এক কোণে গান পাবার মাণার মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এসেছে । সব রোগা মিলে সন্ধ্যার সময় শিখ বাজিয়ে নৃতন বৌ বরণ ক'রে ঘরে ঢুকে নিলে ।

নিম্নক নিম্নম জামি ।

পল্লীর সকলেই মুখতস্ত্রাধ বিস্তার । মাতে মাকে নিশাচর পাখীর একই মলীষতার বাহুমণ্ডলে লাড়া পড়ছে ।

শেকালি বহুক্ষণ ভুমিরে পড়েছিল । পারের উপর যে ছোৎমা পড়েছিল এখন বীরে বীরে সুখের উপর এসে পড়েছে — তার স্মৃতির সুখশ্রী সোমের পুতুলের মত শান্ত ।

একটা কোঁস কোঁস বস গেরে শেকালি ঠাৎ বেগে তাকতে লাগলো—

বীরেন কীদেহ—

গা হাতের পিঠে চোখের কল সূচুচে, ডান হাতে কলম চপছে—

এই গভীর রাত অধি বীরেন বই লিখছিল ।

শেকালি তাবলে, 'এমনি কীদেহ কীদেহ বই-লিখেই ত সকলকে কীদেহ ।...ওগো তুমি খাম, তোমার আর কীদেহ হবে না ।'

শেকালির চোখেও দু কোঁটা জল বেধা ছিল । সে উঠে বীরেনের হাতের কলম কেড়ে নিয়ে বললে, 'তোমাকে আর লিখতে হবে না । কেঁদে কেঁদে চোখ-বে জুলিয়ে ফেলেছ—তোমার—'

শেকালির গলায় স্বর জড়িয়ে গেল । সে চোখে ঝাঁচল দিয়ে ফিরে গড়াল ।

বীরেন চোখের জল মুছে বললে, 'তুমি আমাকে এমন ক'রে বাধা দিয়ে একটু ক্ষতি করলে শেকালি । তা হোক —ও কি তুমি কীদেহ !'

বীরেন তার হাত ধ'রে পাশের চেগারে বসিয়ে বললে, 'কীদেহ কেন, তুমি নেহাৎ ছেগেদায়দ্ব ।'

শেকালি বাধন-ভাড়া চেগের মত একটি চেগে বললে, 'তুমি কীদেহিলে কেন ?'

'ও এই কথা ! আমি ত পতের কথা মনে ক'রে কেঁদেছি, আর তুমি কেঁদেছ আমার তারা দেখে --বেশ গা হ'ক ।'

শেকালি চেগে বললে,

আমাকে ব'লতে হবে ।'

'সে ত' করনাব লোক—'

'তা কি হর কখনও ?'

'তা-ও ঠিক বলতে পারিনে ।'

'তবে একটা সন্ধ্যা মাহুয়ের জরই কেঁদেছ বল ।'

'সে কলা সন্ধ্যা হ'লে তুমিই ত সবী হ'লে না শেকালি ।'

'তা হ'ক তবু তুমি বল ।'

বীরেন বলতে শুরু করলো, 'জাখ, আমি যখন মেসে থাকতাম তখন আমার কেবলট কলম শেনসি—' তারিহে যেত এখন কিন্তু বাধ না : তুমি সন্ধ্যাই বেশ শুচিয়ে রাখতে পাব । আমার বহিষ্ট পরিভাব কুতবে করতে মনে হ'ত এটা কি আর পুণ্যের কাজ, মেয়েদেরট লাখে—'

শেকালি বাধা দিয়ে বললে,

না, তুমি বল ।'

'সান্তির অনেক হ'তে গেছে, চপ ত'গ পড়ি ।'

'না, তুমি বল ।'...

বীক তখন মুক করলে, 'এই গ্রামেরট একটি মেয়েকে আমি ভালবেসেছিলাম, তখন খাড ইয়ারে পড়তাম । সে কোন বৈধে তবুবে ? এই আজ তপুকে যে খুব গম করছিল আমার সঙ্গে । ওর বিয়ে হয়েছে এই পানের গায়েই । এবার যে ট্যান্ডিভিটা লিখছি সেটা একরকম আমার কীবনের ঘটনাই । করনাব নিগের হাখে নিজেই কীদেহিলাম ।'

বীরেন হো হো ক'রে হেসে উঠলো । বললে, 'ভেবো না, এখনও ওই রকমই কানি তার ভক্তে ।'



পড়ানোর বসলে, 'তবে তুমি ছাড়া বোধ হয় আর কাউকে বিয়ে করলে ওই রকমট কাঁদতে চ'ত। সব মেয়েই যদি তোমার মত ভালবাসতে পারতো—'

শেফালি বললে, 'শাটটাকনের পুর পলাব চ'ত, না?'

মনীষ বাড়ী থেকে কলকাতা দাবার দিন সকলকে ঘনি বার করে বলে দিয়েছিলেন, 'তোমরা কেউ যদি যৌমাকে ফুটোটা ততাল করতে বলবে তা হ'লে আমার সঙ্গে বোকা পড়া আছে। বোঝা ত আর আমাদের মত চা-ঘরের মেয়ে নয়।'—আরও কঠিক।

চপরে একখানা বই পড়তে পড়তে উদ্ভনা হ'য়ে শেফালি ভাবছিলেন, সে খেন চিত্রকায়নার খাটায় শোবা একটা বিচিত্র ছবি, দার, দেবতার মূর্ত থেকে একটু চুপিচুপি বেগে চ'লে যায়, কেউই ফাড়ে আসে না। খণ্ডরবাড়ীতে এক খানী ছাড়া খেন আর কেউ নেই। বড় কা দাগী, মনন ভয়ে ভয়ে শালিয়ে বেড়ায়। মজাচীন নিয়ামক গল্পও বাড়ী।

চপরে বড় কা এসে তাত বেড়ে আসন দিয়ে বললেন, 'ছোট বো, তাঁত রেখেছি তাঁরা হ'য়ে যাবে।'

শেফালি বললে, 'এ হবে কেন, আমাকে ত ডাক নিলেই খেয়ে আসতুম।'

বড়বো ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'তাকি হর! মেটে ঘরে কি আর তুমি যেতে পারো?'

শেফালি রেগে বললে, 'ও ঘরে না দিলে আর আমি থাক না।'

বড়বো বললেন, 'কেন, তাই রাম কহু? বাড়ী-গুড় লোক উপাল করে থাকে মাহু করছি তার বো নিয়ে আমোদ-আহ্লাস করে একসঙ্গে যেতে কার না সাধ হয়।'

'তবে কেন ঘরে রেখে আমাকে এমন করে কট দিচ্ছেন।'

'তোমার ভাসুর টের গেলে হ'লে পেয়ে—বাড়ী-গুড় তোলপাড় করবেন।'

বাংলা দায়িত্বের পাঠক-পঠিকার দার বই-এর শেষের লতাপতায় থেরা 'সম্পূর্ণকথাটি প'ড়ে শেন না করা, অবধি দাবার অবদর পার না, তার একখানা বই পড়তে পড়তে রাস্তা হ'য়ে শেফালি উপর দরজার দিকে তাকাতো দেখলে বীরেনের খান শেন দাঁড়িয়ে আছে। শৈলর বিয়ে হয়নি।

শেফালি ডাকলে, 'ঠাকুরনি, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এল ঘরের ভিতর।'

শৈল দরজার চৌকাঠ না দাঁড়িয়েই বললে,

খবটা কাঁটু দিয়ে দাব?'

শেফালি তার চাত হ'য়ে ঘরে এসে বললে, 'বল আমি কাঁটু দি, তুমি দেখ।' কাঁটা ফেড়ে নিয়ে কাঁটু দিতে শুরু করলে।

শৈল কাঁদেছে।

শেফালি তার নিরর্থক কাতার অর্গ শ্রুতে না পেয়ে বললে, 'কাঁদছো কেন ঠাকুরনি?'

শৈল হু'পিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে

দিলে বড়বা ব'কুবে।'

শৈলকে বুকের উপর নিয়ে শেফালি এলো, 'এই কথা? ত্রিনি আর ভাবুন কেনন করে।...আজ্ঞা তোমার বোবির সঙ্গে কি এল একটু গরুত করতে নেই।'

'আমরা কি আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

শেফালি তাকে বুথিয়ে অনেক কথা ব'লে শেবে বললে, 'আমার কাছে আসবে বল, তা না হ'লে ছাড়ো না।'

'দাদা বকুবে।' সেই এক কথা—

শেফালি তাকে ফেড়ে দিয়ে রাগে গরুর করতে করতে খাণ্ডড়ার কাছে গিয়ে দেখলে খাণ্ডড়ী দরজার পাশে ব'সে হু'তে হু'তো গলাতে চোটা করছেন, কিছ কোনবারই সফল হ'চ্ছেন না।

'মা, আসি ত আর এমন করে থাকতে পারিনে।'

কীকর মা ব'ললেন, 'কি হ'য়েছে মা?'

'এমন একা একা ত আর থাকতে পারিনে—' শেফালি রাগে ক্ষোভে অসহ্যের মত ক্রর ক্রর করে কেঁদে ফেললে।

## ঐশ্বর্য্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মা বললেন, ‘হাবিনসকে বটে কিনে আনতে বলবো—’  
‘না, আমি বটে চাইনে—হাবিনস সঙ্গে ঠাকুরশিব সঙ্গে  
কাজকর্ম্ম কর’রে বেড়াব।’

‘তা কি হয়, হাবিনস তা হ’লে—’

দেখ পাখাঘেঁষ কাগা হতে মুক্তিও আদেপ না শেরে  
অসচায় শেকলির বড়ই রাগ হ’লো। শোনার শিকলের  
নিপীড়নে তার সমস্ত বেহ মন বিপ্রাণ হ’রে উঠল।

অ

শনিবারে মথিল বাড়ী-এল শৈল কোনো এক গ্রন্থাগারে  
বললে, ‘ছোট বোদির মোটে লক্ষ্য নেই দাদা, তোমার  
সঙ্গে কথা বলতে চাব—’

মথিল হেসে বললেন, ‘আমার তাই, থাকে  
খেরে মাহুদ করলুম, তার বো আমার সঙ্গেই যদি  
কথা না বলবে তা’ কার সঙ্গে বলবে। বোমার পূব  
লক্ষ্য আছে, জোরই বৃদ্ধি নেই।’

মথিল পুনরায় আদেপ মিলেন বোমার যা ইচ্ছে তাই  
তাকে ক’রতে দিতে হবে।

শেকলি একেবারে প্রান্তর থেকে গিয়ে উঠল, বললে, ‘দিদি  
আজ আমি রাঁধবো।’

মথিল শেকলির রাজা খেয়ে বললেন, ‘বোমা এমন  
চাঁপতে কবে শিখল—চমৎকার!’

হে হে ক’রে হেদে বলেন, ‘আমার বৌর বউ যদি এমন  
না হয় ত লগতে লাগনা দিচ্ছি ব’লে ছুটো কথা বাক্বে কেন!’  
চলুরে বৌর মা বড়জা শৈল সকলে ব’সে বই পোনে।

ভিড়ানখানার কথা মিউজিয়মের কথা বড়জা শৈল  
হা ক’রে পোনে। মা বললেন, ‘তার শর এককড়ির কি  
হ’ল?’ এককড়ি লাম্বের খোঁপা বইখানার নায়ক—

পাড়ার লোক জিজ্ঞাসা করে, ‘শৈল, জোর’ বোদি  
কেন হ’ল রে?’

শৈল হাসে। বলে, ‘পূব ভাল।’

পাড়ার মেয়েজা বই তুলে আসে। কার্পেটে স্থল  
স্থলে নিয়ে যায়।

বুট দিকের রেচের ভিতর দে নিঃসঙ্গতার প্রাচীর প’ড়ে  
উঠছিল, শেকলি আঘাতের পর আঘাত দিলে ভেঙে পড়  
এক ক’রে মিলে।

কলকাতা থেকে চিঠি আসে,

আম্বে?’

শেকলি উত্তর দেয়, ‘এমন ঘাণ্ডা পাবে না মা, একটু  
অবদর পেলেই থাক।’

অবদর আর হ’রে ওঠে না।

অ

নিউল-নিউল বৌক ব’সে বই লিখছে—নাচকের বিঃ।  
তার চোখের জলে খাতা ভিকে আঁঠি চ’রে গুঠে। নাচিকা  
কি পাখান!

লগ্নভুক্তিতে শেকলিরও চোখের জল আসে। আমা,  
এত অকলস!

জলের গ্রাস টেবিলের উপর রেখে সে বলে, ‘কি  
লিখছে ছাই। কি করকার বই লিখে, নাম ত যথেষ্ট  
হচ্ছে—’

বৌক বলে, ‘নামের জগ্নেই কি মাহুদে বউ

শেকলি? বই লিখেই লুখ, তাই—’

‘তোমাকে আর এমন ক’রে কান্ডাতে হবে না—’

‘এখন টাকিডি হচ্ছে—মিজে না কান্দলে আমার বই  
প’ড়ে অগ্নরে কান্দবে কেন।’

‘তোমাকে আর টাকিডি লিখতে হ’বে না।

কমিডি লেখো না একটা?’

‘মাজ এ বইটা শেষ হ’রে থাকে। এবার থেকে কমিডি  
লিখবো। তুমি ত আমার বৌরনের সব চেয়ে বড় কমিডি,  
না শেকলি!’

বৌক শেকলির হাত ধ’রে আকর্ষণ করে।

শেকলি আকর্ষণে চ’লে প’ড়ে বলে, ‘ঘাণ্ডা।’

কো কো ক’রে বৌরেন হাসে।

বৌরেনের টাকিডি প’ড়ে বাংলায় বিশ্বনিখুঁক সমাপোচক  
লেনেন—‘বৌরেনবাবু এ টাকিডি বাংলা সাহিত্যে স্থাপন  
আম্বে। চোখের জল সামান্যো যায় না। চমৎকার!’





একদিন মণীন্দ্রকে শেকালি বললে, আপনি আর কেন খেতে খেতে পরীর নই ক'রছেন। টাকা বা আছে তাতেই ত চ'লে যাবে।'

'বাটুরো না ?' কি ব'ল শেকালি, আমার বুড়ো জীর্ণ পরীরেও যে বোবনের দক্ষিণ চঃছে। এমন লস্যার ক'জন করেছেন ? আর একটা কথা ভাবি মা, বর্ণ ব'লে একটা ছায়া নাকি কোথায় আছে শুনেছি, সে কিম্ব আমার বিশ্বাস হয় না। গতিাই যদি কোথাও থাকে ত' আমার ভাড়া দানাবের মাঝেই সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে। তোমার কি মনে হয়—ও বীক, বীক।'

বীক এগে এগে বলে, 'লালা, ও বুড়ি আমার নামে কি লাগিয়ে দেল, না ?'

মণীন্দ্র বাবু এগে বলেন, 'শেকালি, মা ! বীক তোমার নামে আমার কাছে লাগাচ্ছে। মা—ও মা, তুমি এর বিচার ক'রে দাও।'

মা বললেন, 'আমি তা চ'লে ছোট বোনকে পিঠে তৈরি ক'রতে দাও।'

মণীন্দ্র যে হো হো ক'রে হেসে বললেন, 'তাই ঠিক প্যাকি হয়েছে। বড় বৌ, দেখি চাদরটা, বাজারে বাই।'

'বীক বাজারে যাক্ না।' মা বললেন।

'তাকি হয় মা, ও ভেলেমাহুব, ও কি বাজার করতে জানে ?' আর বোমারি বাজার আনি না করলে লক্ষ্মই হবে না।'

মণীন্দ্র চাদরটা কাঁধে বেলে বললেন, 'বীক ভাল একখানা মিলনাক্ত বই লেখতো। প'ড়ে দেখবো কিসন হয়—'

বীক ভিনমাসের মধ্যেই একখানা কমিডি লিখে প্রকাশ ক'রে ফেললে।

ধামাধা কাগজগুলো পর্যন্ত লিখলে, 'বীরেন বাবুর বই প'ড়ে আমার হতাশ হয়েছি। কোথায় গেল তাঁর ঐকান্তিকতা, তাঁর প্রাণঢালা লেখার কলি।'—কোন কাগজেই সূচ্যতি বেরন না।

শেকালির অণ্ডণ—

কলকাতা থেকে দাখের ডাক্তার নিয়ে মা বাবা দুজনেই এসেছেন।

রোগীও বিধীর্ণ শাস্ত্র মূখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সকলের চোখেই জল পড়ছে।

শৈল কেঁদে কেঁদে মেঝের ভূমিমে পড়েছে।

বড়বৌ কেবল গরম জল ক'রে এনে দিচ্ছে। ধোঁয়া আর চোখের জলে তার মুখ থানি লাল হ'য়ে গেছে।

মণীন্দ্র মা চৌকাঠি ফেলান দিয়ে কেঁদে কেঁদে তগবানের কাছে আত্মগু প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

ডাক্তারটি কেবল ব'লছেন, 'ট্টেন পাওয়া যাবে না, এখন বাই। হাতে অনেক কাল।'

আবার অসুস্থ হয়ে বিরক্ত হয়ে ব'লছেন, 'একটা রোগী নিয়ে থাকলে ত চল না।'

মণীন্দ্র বাবু ত'রে ব'ললেন, 'বীক, বীক, পাবনাম আমাদের লজ্জাকে কখনও ছেড়ে দিসনে ! কিছুতেই যেতে দিবনে, বুজলি ?'

নিশাচর বাগ্‌ডেরও শেট ত'রে পেড়ে। তারও পাছে পাছে পড়, বড়, ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে না।

শেকালি হঠাৎ চোখ মেলে চার দিক চেয়ে দেখলে।

বীক ব'ললে, 'কি ?'

শেকালি তার হাতখানা বুকের মাঝে নিয়ে বললে, 'মজ্জব ম'রে কোথায় যায় জানো ?'

বীক চোখের জল মুছে বললে,

নরকে।'

'বর্ণ, ত ছেড়েই যাক্, নরকেই যাক্ তা হ'লে।'

বীক চুপ ক'রে রইল।

'আমি একটু বড় ঠাহুরকে দেখবো।'

মণীন্দ্র এগে বললেন, 'বোমা, বোমা, আমার ডাক্‌কো ?'

শেকালি একবার চোখ মেলে দেখে উঠতে চেষ্টা করতই প'ড়ে গেল। তার চোখ চুটি চেয়েই রইল,

দেহখানা অবলম্বন করি গেল ।

মণীষ চাঁৎকার করে উঠলেন, 'বীক, ধরে রাখতে পারলিনে । করেছিস্ কি—'

কীমতে কীমতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ।

শোকক্রন্দন নৈশ প্রহরতার বৃক বিদীর্ণ করে আকাশে মিলে গেল । সম্মতেন্দ্রী হাঠাকারে প্রতিবেশীরা ঘুমের ঘোরে বিছানার উঠে বসলো ।

শেষলি চ'লে গেল ।

ছয়মাস পরে—

মণীষের মা বললেন, 'মণীষ, দুই কিছু দেখেছিস্ ন ? বীক যে রোজ কি খেয়ে এসে সারারাত্রি ঘেমে লেখে । পরার ভেঙে থাকে । বীক যে মাতাল লম্বীছাড় হ'য়ে থাকে ।'

'লম্বী সকলেরই ছোড়ে গেছে মা । বীককে ভাল করবার কসমতা আর নেই । ছাঁ মা, আমার বরেন্দ্র কত হ'ল—আমি যেন অনেক বুড়ো হ'য়ে গেছি ।'

বীক নির্দিষ্ট রাতে নিজের চোখের তলে ভিজিয়ে এক-

খানা কমিডি লিখে—

রোজ রাতেই লেখে । কমিডি যে পাঠে

উপর হ'য়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই ।

পল্লীর কোলে একখানা ভাঙ্গা টেবিলের উপর বীরেনের অমর সংকীর্ণতার নারক নারিকা ল'ড়ে থাকে । গায়ে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তারি আঁধার হ'য়ে লোকের বৃক দখল ক'রে বসে—

নারিকার কোঁকড়া চুলের মাথাটি পুকের মধ্যে ক'রে নারক যখন বলে, 'আজ্ঞাঃ বেলা, জগন্নাথ সাধা বছর চ'লে যদি আজ বসন্তের এই জ্যোৎস্নাতরা পূর্ণিমার দিনে শেষে যেত, তবে কী স্থলব চ'ত ?' তখন বীকর গাল বেয়ে জল ল'ড়তে থাকে—

কেউ বারণ করেনা, লাগ ঢেলে কেবল লেখে ।

এই প্রকাশিত হ'লে বাংলার সকল সমাপোষক একসঙ্গে লিপ্সে, 'বীরেনবাবুর কমিডি সমস্কার হয়েচে । পূর্ণিমার সাঁচিহ্নে অমর হ'য়ে থাকবে ।'

বীরেনের জঘাতিতে বাংলা ভরে উঠে



# বিবিধ সংগ্রহ

লরেন্স্‌ গ্যাট্‌কিন্সন্‌

১

তারই সঙ্কলন।

চিকুগানো গান যেমন কথাকে ছেড়ে ও চাড়িয়ে তখন  
প্রবের উচ্চারণের মত, গ্যাট্‌কিন্সন্‌য়ের শিল্পও তেমনি  
অতীন্দ্রিয়। চিকুগানো গান  
যেমন অনেকের বোঝেন  
গ্যাট্‌কিন্সন্‌য়ের শিল্পও  
তেমন বোঝা কঠিন।

অথবা কোনো চিকুগান  
পাঠ্যের মধ্যেই আছে  
আমাদের অনিশ্চিত চোখ  
বধ, কণ্ঠ বা মস্তিষ্কের  
পাঠ্যের মধ্যেই ভাঙে  
বসে ও বোঝে। যে কণ্ঠ  
আমরা বাস্তবে দেখিনা,  
সেই নিচক ভাবের  
কণ্ঠ আমাদের কাছে  
প্রথমে অর্থহীন বলে মনে  
হয়। গ্যাট্‌কিন্সন্‌ ভাব-  
লোকের শিল্পী।

শিকাগো ও তাঁর  
সচলিত কীউকিউ বা খা  
চোখে পড়ে তারই ওপর

গ্যাট্‌কিন্সন্‌য়ের শিল্পের উদ্দেশ্য চিত্রবলোক ও অতীন্দ্রিয়  
লোক বা মানস-লোকের মধ্যে স্বেচ্ছাচ্ছন্দ। চোখের  
শিল্পের মতো সে উদ্দেশ্য  
দৃঢ়তর।



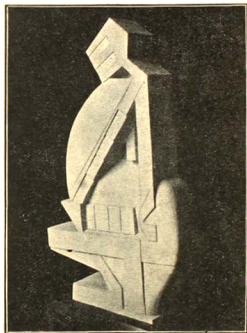
প্রথমে গ্যাট্‌কিন্সন্‌য়ের  
শিল্প ততো—ভাবাত্মক  
রংগে, ভাবদগ্ধ ছিল  
না। তখনও তিনি ভাবের  
ওপর তৌক ছিলেন  
তখন তাঁর শিল্প রঙীন  
ছিল। তখন তিনি শিল্পকে  
মোটামুটি মানতেন—  
বিশেষত প্রমাণ ও বর্ণিকা-  
ভব। অংশের মধ্যে অংশ  
ও সময়ের ছন্দ বজায়  
রাখাই তাঁর রঙের শৈলী  
গ্যাট্‌কিন্সন্‌য়ের পটুর  
আনন্দ ছিল।

রচনানিরত গ্যাট্‌কিন্সন্‌

নিত্যের সত্যমতের আভাস দিয়ে ছাে এঁকেছেন। কিছু তাঁর গভীরতাব্যক্ত মন তুলি়ে পেল না। তাই  
এটুকু গ্যাট্‌কিন্সন্‌ বসন্ত ভিতর দৃশ্য, বসন্ত-মণ্ডি আছে, তাঁর হৃদিকে চোরে এল। প্রবের রঙে সে, চোখ বাস্তব

হয়ে থাকবে, দুইদশদশ চ'রে পড়বে, অস্তর্য্যময়ী চ'বে না, মন কাগবে না। ক্রমে তাঁর ছবি রং-টোন চ'রে এল। আর ছবির তবু একটি আনুভাবিক মূল্য থাকে—হ্যাটিকিন্সন ক্রমে তাৎপর্যের দিকেই মন বিলেন।

হ্যাটিকিন্সনের শিল্প তাই গভীরতাব ভঞ্জন। তাই তিনি কোনো বিশেষ মনোব মন। পৃথিবীর উন্নয়নযোগ্য সব কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনি শুধু তথাকথিত শিল্পী নন, তিনি মানব।



বৃদ্ধির আবির্ভাব

প্রকাশবাক্যগুলি গভীরচিত হ্যাটিকিন্সন পাঠ্য পুস্তকের চিত্রশালাসমূহে পুরেছেন, বড়ো বড়ো আর্টিষ্টের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জীবনের একান্ত দুঃস্থ হ'য়ে কত নরনারীর সঙ্গে মিশেছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, দারিদ্র্যতা তাঁর পাঠ্য বিষয়। নিজেকে তিনি কবিষ্ঠাও বলেন; করেছেন। আর তাঁর জীবনব্যাপী আর একটি সাধনা আছে, সেটি হচ্ছে সঙ্গীত। হ্যাটিকিন্সনের শিল্প: ব্যাপক। তিনি শুধু সাধারণ শিল্পীর মতো ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তেই শেখেন নি।



শ্রী-উদ্ভাস

অকস্মাৎ এ চৈতন্য, সে চিন্তার ও বিশ্বের তারাক্রান্ত বিদূত হ'য়ে পড়ল। বিশ্বের সমস্ত তাকে ব্যাকুল ক'বে উল্লস।



চাট্‌কন্দন একটু স্তম্ভ নহে নর বা নারী বনের মধ্যে  
‘লুই’ ঝাঁপে বা আকাশের বিকে চেয়ে ভাবছে—এ না

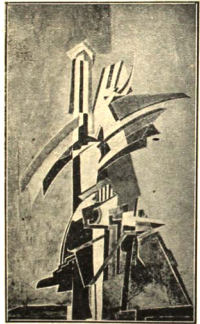
প্রখর আলোয়, শত শত বর্ণকের উৎস্রুত চোখের সাগ্রে  
অভিনেতা বা অভিনেত্রী গাড়িত,—সে ডকল, আশাবিত,  
বাগ্না এবং ঝেং জুর্জন্। তারই ভাবচিত্র এই জগতিহাটি।

তারপর ধরা থাকে ‘নৃত্য’। নৃত্যশৈলী স্রষ্টারীরা আশা  
ধারা করবেন, তাঁরা চতুর্ভাষী হবেন। এ চিত্রে শিল্পী শুধু  
বহুদলতাল যে নৃত্যের গতি, তাকেই স্রল বিবেচন—নর্তক  
বা নর্তকীকে নহে।

পালিশ্‌করা কালো কাঠের মূর্তি ‘aloof’, ঘনতায়  
মাংস পেতেও তার পেতে উচ্চতর লোকবাণীর ভাবমূর্তি



নাইম্‌ ম্যাট্টে



নৃত্য

ক’রে যে ঐ ভাবটি—সুখ ঐ ভাবটি পাথরের রূপকের ভিতর  
দিয়ে প্রকাশ করেছেন, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

তাঁর ‘গীতিউদ্ধাপন’ মূর্তিখানি,—যে গীতি অকস্মাৎ  
উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে, স্রষ্টার চেউয়ের ওঠার মতো উদ্ভাসিত  
হয়ে ওঠে, তারই ভাবমূর্তি।

‘নাইম্‌ম্যাট্টে’, ধারা পদনব্যবুর ‘নর্তকী’ প্রভৃতি  
দেখেছেন, তাঁরা অনেকটা বুঝবেন। নাট্যমকের ওপর

ব’লে ধারা দেন্তে পারে। এ রকম প্রাণবন্ত চিত্র চূর্ণিত।  
শুধু কাঠের কাঁকাবাঁকাই কি রহস্যময় প্রাণবন্ত aloofness

# কুজিহাসা-শিখরে

বিশাল কুজিহাসা পর্বত ভাণ্ডারের আশ্রয় প্রতীকস্বরূপ।  
সমুদ্র ভাণ্ডারে এই পর্বত লক্ষ্যবস্তু। শ্রেষ্ঠ ও গভীর বলে  
গণ্য। তাই সমুদ্র তীরে ১০ হাজার ফাঁটের বেশি উচ্চ  
চূড়ার সৃষ্টি বঙ্গের প্রান্তরভাগে হাজার হাজার ব্যক্তি এর



Alouf লবণ, ফাটকিন্দন

শিবপ্রবেশে তীর্থযাত্রা করে থাকে। এ পবিত্র পর্বতের  
উপশিখরে সমুদ্র ভাণ্ডারীনের মধ্যে এক অদ্ভুত পৌরাণিক  
কথা চলিত আছে। তাদের বিশ্বাস যে, একসময়ে পৃথিবীর  
পূর্বভাগ থেকে "কুজিহাসা" উপর দিকে নিক্ষেপ হয়েছিল ও  
টুক টুক সেই সময়ে ৩০০ মাইল দূরে গিয়ে প্রবেশে ক্রিয়োটোর  
নিখটে অনেকখানি স্থান হঠাৎ নেবে দিবে বিশাল ভূ-ভাগ  
সৃষ্টি করেছে। এ ভূ-ভাগ আকার একটা ভাণ্ডারী অদ্ভুত  
বাক্স-বাক্সের মত। ইহাটি Biwa Lake বলে খ্যাত।

গোটোবা কুজিহাসা-পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। পদ ক্রমঃ

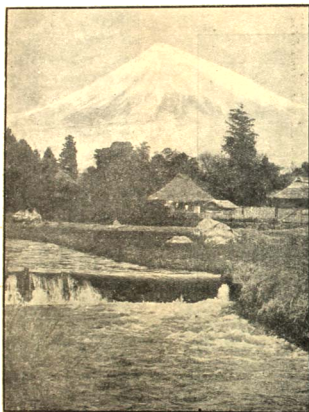
উঠে গেছে। পাড়-পাড়কা অনেকটা পরম দেশের মতো।  
কিম রক্তবর্ণ, কিছু দূর বাগার পর হৃৎকী দেবদেবী গাউর  
মীচে শৈবালকুমারীতে নানাবিধ ফুল ফোটা থাকে। উল্লুকা প্রান্তর  
ও বনকুমি থেকে কলকর্তৃ পাখীর মধুর গানের স্বর কানে  
ভেসে আসে। গোটোবা চত্রে পাড়াড়ের শিবর মন্দির ১০০  
বিশ্রামাগার আছে। ক্রমঃ অগ্নিগার (lava) ও ককর  
মারও মাগুগা ও পড়ীর চত্রে ওত্র—চল্য বেশি লক্ষ হ'য়ে  
আছে। উল্লুকা পদার্পণস্থিত মাটি (loam) ক্রমঃ শেখ  
চওয়ার দলন মাটি কম দূর হ'য়ে এসেছে। চাপু প্রবেশ  
এমন ক্রমোক্ত যে, যে-কাজ পাড়াডে ওয়ার অপটু, সেও  
মক্রেপে উঠতে পারে। কুজির শিববড়কা ভিন কোণা;—  
পানের দিক কোণাও কোণাও সাধা সাধা মাপ দেখা যায়।  
অত্রাণ পদার্পণস্থিত হৃৎকীর বেশি কাণা বোধ হয়—সিদ্ধা  
অগ্নিগারের উপর যাবের আড়াল থেকে মার মাকে রোদ  
পড়ার আবহুণ কাঠের মত চিক্চিক করে। সেখান থেকে  
নাচের দিকে কি মনোহর পাগলতা বৃদ্ধ! বোনা গের স্থায়ের  
প্রখর আলোর কুয়াশা দূর হ'য়ে যাচ্ছে। কুয়াশার ধূসর-  
বর্ণের আবরণ দূর চওয়ার নির পাড়াডে প্রেণ্ড একটার পর  
একটা চোখের সমুদ্রে ভেসে উঠে। চাপু কোণা, মাকে  
মাকে ইব চাপু লবণ ফেটে ঘের। ছোট ছোট ঘানের  
ফেটে—নানা আকারের—বিভিন্নগার ছবির অভ্যাস মনে  
এনে দেয়। কি অমূল্যবিক পরিপ্রবে বিভিন্ন পরিবারবর্গ  
এ সব ফেটে চাব করছে। ভাণ্ডার-পাড়াডা করেকটি ছোট  
খাপপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র; তারও অধিকার পাগলতা,—ভারতের  
যে কোন প্রদেশ হ'তে অনেক ছোট। "Yet here is an  
area teeming with a proud, hardy, war-sterile  
island people, increasing now at the rate of  
nearly one million a year; such a people is bound  
to knock upon the gates of the world. It must  
do that or accept the alternative of race  
suicide."

ভাণ্ডারে বিজ্ঞানগণের তেমন কোন বন্দোবস্ত নেই—  
অথবা জোঁকায়ের Imperial Hotelর বিজ্ঞানর প্রবিন্দা



আছে। কিছু সূজি শরভের বিশ্রামগারে এ দলের কিছু  
'শাউ' নেই। এ সব শব্দের দ্বারের সরাটএ মাড়ের শোবার  
ভাঙ্গা ভাঙা পাওয়া যায়—এইর ফলে হুন্সর পবিত্রত্ব হুগুজি  
দলের মাড়ের 'হাত পা' ছড়িরে বৃন্দান যায়। এই ছড়ির

টেবিলে বেড়ানর সমান। সূজি শরভে ওঠার সময় নিম্নেদেখ  
আলোবা নিয়ে যাওয়া উচিত—এসব বিশ্রাম-আগারে শুধু 'হাত'  
ও জাপানী তরকারী পাওয়া যায়—তা আবার রাত কাটতে  
গেলে বেশী পাওয়া সম্ভব হয় না। জাপানীরা কাঁচা ডিম্বেতে

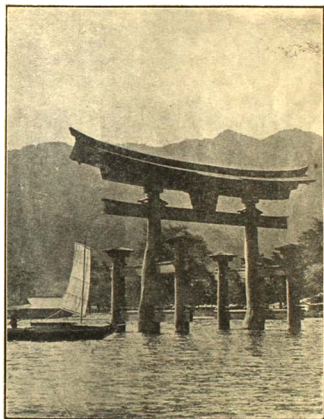


সূজি-শরভ

নাড়ি জাপান গুহে যেকো পাত, তার জন্ত বাবদুত হয়। সূজা  
তখনো গুহের ভিতর আনা হয় না—কাদামাখা সূজা শরভে  
মাড়র মাড়ান জাপানীদের কাছে বিছানার ও লাকান

মডাপ্ত—কিছু আমেরিকানদের পক্ষে শিঙ করা, দরকার হয়।  
সূজি শরভের উপর খর্বাক্ত অতি সুন্দর। ঘুরে গাহাড়  
শ্রেণীর গিহনে গোনাশী বর্ণের অর্ধরত্নাকারে খুঁটা ওঠে—যেন

গণিত সোনার উৎস বীরে বীরে অঙ্ককারময় জগতকে রক্ষিত হুজি বিশ্বব্রহ্মণ—স্বর্গের আলোর পূব উজ্জল—পথ  
বর্ণে রঞ্জিত ক’রে দেয়। জাপানী তাঁরধাতীরা এখানে ক্রমশঃ জারও পড়িয়া—অরিও অগ্রগত ; শায়ের চাপে পাতক  
স্বর্গ-উদয়ের উপাসনা ক’রে থাকে। বার্ষিক বুললমানের ও কাঁকর প্রভৃতি ভঁড়ো চ’তে থাকে। প্রতি ১০০ ফীট



মিহাশিমামা মন্দিরের প্রবেশ-পথ

কাছে মন্দির জায়—পবিত্র হুজি পক্ষে স্বর্গ-উদয় ওঠার পর নিঃশাস নিতে একটু কষ্ট বোধ হয়। মন্দির  
জাপানীদের মনে অক্ষির জাব উদ্রেক ক’রে দেয়। একটা ভূষাভ-প্রান্তর পার হ’তে হয়। চারদিকে ছেঁড়া ঘাসের





স্বতা—তীর্থ যাত্রীরা কেলে দিগে গেছে ।

শিবরাত্রিতে আয়েতগিরির বিশাল সুখ-গজর দেখলেই  
পথ-ক্লেশ সকল ব'লে মনে ভয় । এদর আয়েতগিরি কতদিন

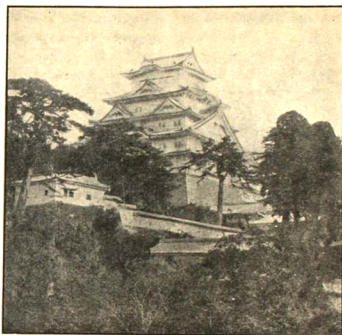
দুরশেই ভরত কত আত্মিকর তা উপলব্ধি ভয় ! এ শিবরাত্রি  
থেকে শিবামিত্তের দক চূড়ার মত ব'লে বোধ হয় । এর দার  
দিগে যেতে এখনও অগ্নিশ্রাবের গর্ভসংশে উত্তাপের অভাব



বিজয়া হ্রদ

আগে নির্ঝাঁপিত হ'য়ে গেছে—কিন্তু এদের সুখ-গজর এখনো  
বেশ বড় । এই বিশাল সুখের এক দিকে ঝটপানেক

পাওয়া যায় । অতঃ কত নতাকী হ'ল স্থিতির শেষ অট্টমার  
কবে হ'য়ে গেছে ।



হিমেরী নগর — জাপান

ঐরাশ্যে নব চৌধুরী

### আউড্‌লুর্গ্

— দক্ষিণ আফ্রিকা —

যে মহাশয় দুপ দুপ দিয়া যে কোনো অল্প মহাদেশের অঙ্গুরণ ও অধিক সৌর্য বস্তু বহিরা আনয়ন আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া বাচিয়া আছে, আমি আর তাহারই অঙ্গুরণে একটি অনতি-বিখ্যাত নগরের পরিচয় দিতে বসিয়াছি। এই নগরটির নাম অত্যন্ত উচ্চ, কারণ উহা এক ডাচ লাহেবের (Baron van Rheede van Oudtshoorn) নামোত্তমায়ে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। হাত থাকিলে

আমরা এখন উহা বল্লাইয়া জলধর, শটল গোছের এমন একটি করিয়া বিস্তার যে শটকেব শড়্‌বারও সুবিধা হইত এবং লেখকের শব্দে উহা যথেষ্ট ব্যবহারেরও কোনো অন্তর্য থাকিত না। কিন্তু বাস্তবিকের কঠিন বাস্তবিকের মধ্যে সন্তীকর্তা যেমন সুমিষ্ট জল ও সুখার ফলের ব্যবস্থা করিয়া নিজের ফৌজের পরিচয় দিয়াছেন, তেমন ফৌজের অধিকারী হইবার লোভ সামলাইতে না পারিয়াও যৌবন মাত্রই এমন একটি সুন্দর বাস্তবিকের একটা কাঠখোঁড়া নাম দিয়া তাহার দাঁত পাল্লা দিয়াছেন।



এই পথটি দক্ষিণ-আফ্রিকার 'কেপ-কোলোনি' প্রদেশের অম্পার ও টমার ঠিক দক্ষিণে, পোমোজুতিভাবে ধরিলে, সমুদ্রতীর আশ্রিত চরিস্ মাইল দূরবর্তী হইবে। ভ্রমণ

হইতে ৩২ এবং ভোবানেম্‌বুর্গ হইতে ৪০ ঘণ্টার পথ। রেল ষ্টেশনটি মূল পথ হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। সরাসরি দক্ষিণে 'মোমেলস্' হে' নামক বন্দরে জাহাজ হইতে



নাবিলে মাত্র দুই ঘণ্টার অথবা মোটের আড়াই ঘণ্টার এই পথের পৌঁছানো যায়। মানচিত্র দেখিলে সহজটিকে নিত্যক স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত বলিয়া মনে হইলেও একতৃপক্ষে সর্গদিক হইতেই এখানে আগি-বার ও এধান হইতে চতুশার্ধ্ব গ্রাম, ব্রটবা হানসমুহ ও সমুদ্র-তীরে বাইবার অংশের সুন্দর সুন্দর পথ আছে। ইহার চতুর্দিকে এত ব্রটবা হান ও মনোরম ভ্রমণ-স্থান আছে এবং তাহাদের আকর্ষণীয়তা এত বিচিত্র প্রকারের যে, প্রতি-

ক্যাপো কেভ্‌স্‌ বাটবার পথে ভ্রোবেলান্স' নর্বা

কারীমেন অত্রিক দ্রষ্টব্য হুবাতি  
সংকার 'রেল-কোম্পানি'  
সহরটিকে সম্ভাবক হইতে  
মনোরম রেলপথের দ্বারা অধি-  
গম্য করিয়া কুলিগাছে। বৈবৈ-  
শিক ভ্রমণকারী কেপটাউন্  
বন্দর হইতে অসিদ্ধ 'গার্ডেন্‌ রুট'  
(Garden Route) দ্বিরা ২৬  
ঘণ্টার এখানে পৌঁছিতে  
পারেন। এই পথটি এত  
মনোরম যে, কোন ভ্রমণ-  
কারীই ইং বেধিবার সুযোগ  
পরিত্যাগ করা উচিত নয়;



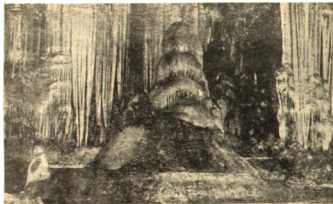
জাই সম্মুখে ইহার নাম করা  
গেল। তবে 'এলিজাবেথ্' বন্দর দ্বিরা আসিলে এই পথের মাত্র  
১৫ ঘণ্টার পথ; ভ্রমণকর্তৃক হইতে ৩০ ঘণ্টার, কিম্বাহুলী

ক্যাপো কেভ্‌স্‌ প্রবেশ-পথ

খিনই, কোম্পনিকে বাইব, কি আগে দেখিব, এই লহকা  
বাঞ্ছিত মতিফের পরিভ্রম করিতে হয়।



মিত্রি। পৃথিবীর যেমন লগ্নাকর্ষ আছে, মিশরীয় সমর একটা সাম্রাজ্য দখলিয়া লিতে চায়; সেই অর্থ চাইতে লগ্নাকর্ষ আভ্যন্তরীণ এটী আত্মত্যাগ-কর্ম-অধ্যাপিত, একজন অতিষ্ঠ লগ্নপ্রবর্তকের বাহ্য-নিবৃত্তি চেষ্টা থাকে। মাঠাণা, নাগোয়া, গিরাহিউ, নালন্দা বিনহি মধ্যদেশেও এটী ব্যক্তি লগ্ননাটী বাহ্যনিগকে প্রচার আভ্যন্তরীণ



বৈশাখা অনিবার্য ভক্ত প্রস্তুত থাকে। আউত্‌সুর্গে মিউ-নিশিয়ালিটি চেষ্টা এই প্রস্তুতিকে বৈজ্ঞানিক আলোকে আণোদিত করিবার বাধ্যতা করায় চেষ্টা চলিতেছে। বৎসরের যে কোনো দিনেই এটী প্রকাণ্ড পরিদর্শন করা চলে।

এখানে হোটেল আসিয়ার ভক্ত যে আট্টার মাইল পথ আছে, তাহার চটপালে প্রাকৃতিক শোভাবিশালী বাত্মা-গণটিকে প্রথম উপভোগ্য ও রমণীয় করিয়া রাখিতেছে।

প্রাচীনতার স্থাপত্যের পাণ্ডা-শোভা; 'গিরাহিউ' নামে অভিহিত।

হেমন্তে লগ্নাকর্ষ বর্ধমান। কাকো-কতলু-ভাণ্ডারভ্রম। আউত্‌সুর্গে পথ চাইতে এটী প্রস্তুতী ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত ও কোর্টবর্গ পক্ষিত-মাণার অন্তর্গত। এটী বহু-প্রকারী অতীতকালের গুপ্তপ্রতি-প্ৰতিষ্ঠাৎ পূর্বে 'ভান্‌-ভিল (Van Zyl) নামক একজন প্রাচীন কৃষিকর্মী কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তাহারই নামানুসারে টোকার প্রথম ও প্রধান ভবনটির নাম-করণ চেষ্টাছে। আউত্‌সুর্গে পথের মিউনিশিয়ালিটির



কর্ত্তারই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এটী প্রস্তুতগিরি তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। এই প্রকাণ্ড প্রবেশ করিবার

পথপালক ও তাহার লগ্নাতি

চেষ্টারই উদ্ভিদ-প্রাণ উৎসর্গ উপভোগ্য। হৃদয়-কৃপাক্ষর প্রোক্ত, সেই প্রাচীনমহাবলী বিচরণবিল কোকপ্রদ

উট পানীর পাল; এবার পর বিখ্যাতো তামাকের চাষ, —অপুর ছাত্রানীতল কৃষ্ণ-বীণা; শাস্ত্রময় কুটিরনিচয়; গোবেলাসু' নমোর তরলোজল বহু সলিলপ্রবাহ, ও সেই প্রবাহিনীর দুই শাৰ্ফ নরন-রক্তন তরঙ্গেরিধিগোভিত উজ্জ্বল গিরিচূড়া,—দমন্তট তাঁ মনোরম! যথো যথো এক এক দল 'বেবু' নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ কোলাহলে এই সমস্ত নীতব সৌন্দর্যকে সুন্দর করিয়া গৈরিত্যেরও সৃষ্টি করে।

প্রচুর প্রবেশপথটি চিরবৎ সুন্দর প্রাচীরমান হইলেও শুভাভ্যন্তর অপরূপ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র আভাস উহা চোখে পাত্তা যায় না। একটি প্রকাণ্ড তোরণবৎ অর্ধচন্দ্রাকার প্রবেশপথ বায়োদিককে পর্যন্তের কৃক্ষিমধ্যে পমনাটিকার দ্বান করে। উহা উচ্চ পনের ফিট গিরাছে এবং প্রস্থে দশ ফিট। প্রথম কিত্তোতে, প্রবেশ পথের চৌকির পক্ষতপারে কতকগুলি প্রাচীন চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। একটি আকাংক্ষা পথ ধরিয়া কিয়দূর বাইবার পর একটি নিরুপায়ী সোপান-শ্রেণীর পাথরপে পৌছাই; উহা খাতিয়া নীচে নামিয়া গেলেই প্রপত্ত কক্ষাবলীর প্রথমটোতে আগা যায়; এই কক্ষটির নাম

পুঙ্খই উল্লিখিত হইয়াছে—ভ্যান্ কিল-হল্ (Van-  
Zyck-Hall)। ইহা সুপ্রকাণ্ড ও চমৎকার। এই কক্ষের প্রান্তভাগে মণ্ডরতত্ত্বপ্রণী নরনখোচর হয়। উজ্জল আলোকে এগুলিকে বহুলা বিচিত্রবর্ণ মণিমালিকাখচিত বলিয়া মনে হয়। অগণিত পতাবীর অন্তরালে প্রকৃতির গোপন রহস্ত-ভাঙারে ইহাদের নির্ম্মাণেতিকাল লুপ্তারিত আছে! মানববুদ্ধি সে রহস্ত ভেদ করিতে পারে না।

এই কক্ষ পার হইয়া বস অত্যন্তর খাওয়া যায়, পথ ততই দীর্ঘ অদূর অক্ষকার হইয়া যথো যথো প্রান্তরের

বসরাহো উপস্থিত চোখে থাকে। কোথাও বিরাট মণ্ডরতত্ত্ব, কোথাও তৃপ্তাকার প্রান্তরের অপরূপ স্বাভাবিক শোভা,—আবার কোথাও বা বহুবর্ণসম্পন্ন প্রবালশোভাময় আনন্দ্য পান্য-পুষ্পের প্রচুরতা! কোথাও আবার প্রপত্ত এক দৃশ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে মনে হয় বৃষ্টি ছুঁইলেই ভাঙিয়া পড়িবে! যেন কামিনীপুষ্পের স্পর্শতোত শাবুদি!

কালোকেতু ব্যতিরেকে আউত্পূর্ণ চোখে দমণকারি-  
কণ আরও একটি প্রকাণ্ড দ্বানে বাইয়া থাকেন। উহা 'রাতে-তৌ' নামক একটি বহা ত্রয়ীদ্বীপ। এই দ্বীপের



উটপানীর আশ্রয়

২১ মাইল উত্তরপূর্বে স্থাপিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নরনরিতকর প্রাণলতা, একটি রমণীয় গুলশাণ্ড, লকল কঠে সার্বক করিয়া মনকে তৃপ্ত করিয়া ধান্যরসে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। এখানকার নানাবিধ তৃণাশ্রয় ফুল ও লতাশাণ্ডকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। 'আউত্পূর্ণের প্রান্তরে দগতর শ্রেষ্ঠ উটপানীর পালক পাওয়া যায়; এখানকার উচ্ছিন্ন উটপানীর পক্ষে সাতিনার উপযোগী। চাষবাস ও পশুপালন দ্বারা অধিবাসীরা প্রধানতঃ আঁধিকা নিরীক্ষা করিয়া থাকে। প্রকৃতি কিছুমাত্র কৃপণতা না করিয়া এই স্থানটিকে পশম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।



## গ্রামমোহন রায়

পত চৈত্রমাসের “প্রবাসী”তে প্রিন্টকৃত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমাদের জীবনে যেমন আর পরম লাভ, থাকে থাকে তাই উপলভি করবার করে আমাদের উৎসাহের দিন। সেদিন যা আমাদের প্রেত, যা আমাদের সত্য, যা আমাদের দৌলভ্য, তাইই মতে আসন প্রস্তুত হই, মজারের আলো ফুটাই করে ছালাই, যা আমাদের চিরন্তন সেদিন তাকে ভালো করে যেনে বেয়ার প্রভে আমরা যিনি।

পত্রাবলীতেও প্রায়ের উৎসাহ আছে। সে তারের প্রাপ্তিক্রমই বিশেষ বিকাশ। পানী উঠতে পারে, এ তার একটি সম্পদ। যাকে যাকে এই সম্পদকে সে উপলভি করতে চায়, যাকে যাকে সে জেত, কোন প্রয়োজনে হয়, শুধুবারই করে; সে তার পক্ষতালনা দিয়ে আকাশে এই কথা বোঝা করে যে, আমি পেয়েছি। এই তার উৎসাহ। দুইটা খোঁড়া খোঁড়া মাঠে এক এক দমক দুই করে দৌড়ে যায়,—কোন কাড়ন নেই। সে নিজেই বলে, আমার প্রতিবেশ আমার সম্পদ; আমি পেয়েছি। এই উৎসাহ বোঝা করেই তার উৎসাহ। যত্ন এক একবার আপন বলে তার পুঙ্খ বিস্তার করে, আপন পুঙ্খ-পোড়ার প্রাকৃতিক-দৌর্য সে আপনাই করে প্রকাশ করে, আপন অপ্রভেত ঐশ্বর্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সে অক্ষয় করে যে প্রীতিক্ষাও তার একটি বিশেষ সম্বান আছে। সেও বলে, আমি পেয়েছি।

কিন্তু মানুষের উৎসাহ তার প্রাপ্ত-সম্পদের চেয়ে বেশী কিছু কিছু। যা সে সহজে পেতেই পারে সে আর দৌলভ্যের লক্ষ্য লক্ষ্য, যা সে লাভ্য করে পেতেই পারে সে মানুষ। সে আপনাই ঐশ্বর্য

আপনি যখন পৃষ্ঠ করে তখনই সে আপনাকে সত্য করে যায়। তখনই সে বলে, আমি পেয়েছি। তার আনন্দ পৃষ্ঠের আনন্দ।

যা পৃষ্ঠ তাই হানিতে তোলা হানিতেই পৃষ্ঠ বলে যা। কোন বিলম্বতাকে মাত করার যোগে প্রকাশ, ও প্রকাশ করার যোগে লাভ করাকেই বলে পৃষ্ঠ। হুতরা সে কারো একলা নয়। পত-পক্ষীর সে উৎসাহের কথা পূর্ণী বলেছি সে তারের একলা, মানুষের উৎসাহ সত্যকে নিয়ে। লক্ষণটি তার দ্বন্দ্বেরে মত লাভ করতে পারে,—তা নিয়ে সে খটা করে ছোঁহ দিতেও পারে, কিন্তু সেইখানেই সেটা ফুটান, মানুষের উৎসাহকে সে ছান পোষ দ্যা। সে আপন লাভকে অতি সতর্কতা ও তৃপ্তিগত। সঙ্গে সোহাগ শিশুরেরে যথো যথী করে যাবে, তারপরে একদিন সে অতি কষ্টের পাঠ্যের ভিতর থেকেও পুঙ্খ অর্থশন করে। সে নিজে পৃষ্ঠ নয় বলেই উৎসাহ পৃষ্ঠ করতে পারে না। পৃষ্ঠ বলে উৎসাহ, যা সকল ব্যক্তিকে অতিক্রম করে মনস্তপে থেকে যায়।

চিরকালের ঐশ্বর্য যখন তার কাণে প্রকাশ পায় তখন মানুষ ফুটাই করে লুটে চায় “আমি পেয়েছি।” একথা সে বলতে চায় সত্যক বোঝে, সকল কলকে, কেন বা পাওয়া তার একলাই নয়। যদি একদিন বিলম্ব বলেছিল, পেয়েছি, কেনেছি। বোঝা: যদি সেই মধ্যেই বলেছিল, আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পুঙ্খতা—পুঙ্খ নিয়ে। এই যদিই উৎসাহের বাণী। মানুষের উৎসাহে চিরন্তন কালের দাবিদ ও আনন্দ।

যে যেমন কোনো। পুত ফটা। দট্ট, যেমন, সম্ভাবের প্রভ বা বিবাহ, সেটাকে আমাদের সেনের মানুষ সকলকে চাকে, বলে, “আমার আনন্দ তোমাদের আনন্দ করা। আনন্দ। দুইটা উৎসাহ যখন বাটার দিয়ার পৌরবে তখনই তা সম্পূর্ণ হয়ে।” যত্নত মানুষের ব্যক্তিগত প্রভ পটম, যা যখন যথেষ্ট কোনো একটি

বিশেষ অংশকে প্রকাশ করে যেমন জনসীমার সন্ধানলাভ বা নদ-নাড়ীর প্রবেশস্থান, তাম্র একান্ত ব্যক্তিগত ধর্ম, নদজাত পিতৃ বা নদসম্পত্তি শুধু মাত্র জলের বা, তারো সমস্ত সমাজের। এইভাবে দুইই উপবাক্য সর্বজননের উপদেশ দ্বন্দ্ব করি তখনই তা সার্থক হয়।

আজকের উপদেশে বাস্তি হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানবের হৃদয়ে আশঙ্ক্য একটি উত্ত লাভ করেছে, উত্তপত্তি পায়ালের এই উত্তপকে সার্থক করুন। এ আশঙ্ক্যের নিম্নবের উত্ত। একটি মহৎ জীবনের ভিতর থেকে এই উত্ত উদ্ভাবিত, একজন মহামানব এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আশঙ্ক্য যেন একে গ্রহণ করি।

মাতুল তাই যে জীবনাক সমুদ্রে গেয়েছে সেই জীবনকে পুষ্টি খরো নিশ্চিন্তা বিশেষে তখনই তাকে অর্থাৎ ক'রে পায়। তা করতে গেলেই কোনো একটি বড়ো সত্যকে আপন জীবনের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা চাই। সেই কেন্দ্রবিন্দু প্রথমে সত্যের সঙ্গে আপন চিত্তকে জড়কে আপন বিন্দুগতিকে সংযুক্ত ক'রে জীবনকে বসবাসে ইচ্ছা হিতে পায়লে তখনই তাকে বলে পুষ্টি। এই পুষ্টি কেন্দ্রটি না গেলে তার বিন্যাসিত হই বিচ্ছিন্ন, তার কল্পজগতির মধ্যে কোন নিত্যকালের তাৎপর্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে গুণাকার হ'য়ে থাকে, রূপ পাই না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিধপুষ্টির ফলে বা কিছু থাকে সম্প্রীতি, বিক্ষিপ্ত, বা কিছু রূপ না পায় তাই হই বর্জিত। একেই বলেই বিনষ্ট। বারো আশঙ্ক্যের মধ্যে পুষ্টির সার্থকতা গেয়েছেন বারোদিনের জীবনের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করে ভুলেছেন তাকে রূপ দিতে গেয়েছেন, অব্যতগে ভবতি।

অনিকাশ মানুষ বিশ্বব্যাপ্ত উদ্বেগকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ উদ্বেগ এই এক উদ্বেগের খারা নিরুদ্ভূত হয়। এতেও জীবনকে দাঁড় করে, তার কাজ এই যে মানুষ মহৎ, বটুত্ব তার নিজের পোষণের রক্ত, বটুত্ব কেবল তার স্বভাব, তাতে তার সপটটিকে বের না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করার জন্যে মানুষ চুটি মন পুষ্টি করেছে, সহঃ আর আশঙ্ক্য। অহঃ মানুষের সেই সত্য বার সমস্ত আশঙ্ক্য ও আয়োজন চিরকালের থেকে অধিকতর মধ্যে, সর্বলোকের থেকে একতর মধ্যে তাকে শূন্য করে রেখেছে। আর আশঙ্ক্য মধ্যে তার সর্বজনীন ও সর্বজনীন সত্য। সমস্ত জীবন নিয়ে যদি মানুষ অহঃকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায় না, তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেন না সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন অধীশের পক্ষে আশঙ্ক্যকে পাওয়া। মানুষের পক্ষে আশঙ্ক্যকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যাকে দান করা একই কথা। আশঙ্ক্যের পুষ্টিতে মানুষ আপনাকে পায় এবং আশঙ্ক্যকে দেয়। এই ধার করার ছাড়াই সে সর্বজনীন ও সর্বজননের মধ্যে কিছু হয়।

আশঙ্ক্যের মধ্যে বিভিন্ন অংশের ও পর্যায়-বিভক্ত কত প্রসূতি রয়েছে। একটি প্রান্তিক; যদি যেমন, শিশুর যেমন প্রান্তিক। এটা পুষ্টির উপকরণ। প্রসূতির কেন্দ্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সত্যের বসে এখন একটি সম্পূর্ণ পুষ্টি উদ্ভাবিত করে, তখনই মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অর্জন করে। আশঙ্ক্যের ব্যতিরিক্ত আর প্রান্তিক প্রসূতির অন্বেষণ আছে, তার হিংস্রতা তার জীবনব্যাপ্ত উপলব্ধি, এইজন্য তার মধ্যে ভালোমন্দের মূল্যেরে বাই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব ব্যতিরিক্তকে মানুষের সম্পূর্ণতা নয়; বহুত্বের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে পুষ্টি ক'রে ভুলতে,—সেই তার বহুত্ব। এই তার আপন পুষ্টির পক্ষে তার প্রসূতিগত যে উপাদান অল্পমূল্যে তাই ভালো, বা প্রতিমূল্যে তাই রিপু। এইজন্যে মানুষের জীবনের দ্ব্যর্থকভাবে এমন একটি মূল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত-তাকে সমস্তের খারা নিরুদ্ভূত করে ইচ্ছা হাই করতে পারে। তখনই সে আশঙ্ক্যের পরিপূর্ণ চিরত্ব সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অব্যতগে পাওয়া। না পাওয়া মহতী বিনষ্ট। অর্থাৎ যে বিন্যাস তার সৈমিক জীবনের দ্ব্যর্থকভাবে বিন্যাস সে নয়, তার চেয়েও বেশী, যা তার অমৃত থেকে বর্জিত হওয়া বিন্যাস, তাই।

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে চেহারা তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, ছিন্ন হয়, তার আশঙ্ক্যগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বজনীন ইচ্ছা হিতে পায়,—নইলে তার না থাকে পুষ্টি, যা থাকে পুষ্টি, না থাকে সৃষ্টি, সে এমন কিছুতে উদ্ভাবন করতে পারে না, যা চিরকালীন মূল্য আছে। সমস্ত মানুষের সমস্তের চেয়ে বড় পুষ্টি। সেই জন্যেই সেই ইতিহাসের দ্ব্যর্থক হ'তেই এখন থেকে মানুষ হলন হ'তে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সন্তানদের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত বটকে ছোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নিষ্ঠা। এইটাই তার সত্য, এইটাই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্ট।

বহুত্ব এই ইচ্ছার মূল মানবজাতি এমন কিছুকে অমৃত ব'লে ব্যক্তিগত তার ভক্তি আছে, ব্যক্তিগত সে গ্রাণ দেয়, থাকে সে দেওয়া ব'লে করে। মানুষ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন, অমৃত তার অমৃতের মধ্যে পরস্পর যোগের যে দৃষ্টি নিরুদ্ভূত জাঙ্ক করতে তা এখন রহস্যময়, তা অনির্জনীয়। তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অমৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেনে কালে অমৃতের অতিক্রম ক'রে গলে।

বিশেষ বিশেষ উপলব্ধি আপনাতঃ ইচ্ছাকৃতভাবে গোড়ায় যে দেহতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেহতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ইচ্ছা





সকল দেশের বাহিরে বেশ কালের আর্থিকতা গ্রামে উন্নত তার সাম্প্রদায়িক ভাষকে কঠিন করে তোলে, সেখানে এক সম্প্রদায়ের লোক সন্ত সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতন সত্তা সেখানে তখন সেই বাধা সেই। এক কথায় মনিষ্যের মধ্যেই বাধা, অজ্ঞানের বাধা, যেখানে কোন এক পথে যেন বাধকীয় মাথার উপরে পৃথিবী স্থাপিত সেখানে আর এক পথে যেন সৈন্তের কায়ের উপর পৃথিবী স্থাপিত,—এই মততন নিয়ে আমরা বহি পুনোপুনি করি তখন সেই অজ্ঞানের সড়াই বাটরের দিক থেকে কিছুতেই সিঁটুতে পারেন না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিবোধ ঘটে এইমতে যে, সেখানে বিবোধের যে আশ্রয় সে বিশ্বজনীন পুঁজি, সে প্রাথমিক বিবাস নয়, লোকসুখের কথা নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রচার মধ্যে সেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ইকাসাধিক কথিয়া সকল দেশের মূল যে চিরন্তন বর্ষ আছে, তাকেই চেতনোৎকৃষ্টিত মাস্তবের কয়ে উন্মাদিত করেছিলেন। পায় সাময়িক উত্তিহাসের; আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। পায় জের ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আছে। পায় কথির মানক প্রকৃতি মধ্যস্থের ভারতীয় মানকোয় দেশের পার্শ্বীয় বাহকদের বাধা তখন করে এক পথ মতের আধ্যাত্মিক ভাষকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিবোধের সমাপ্ত।

এই বিবোধ-মধ্যস্থের প্রাচ্যের ভারতে তখন এমন আর কোথাও নয়। এই ভারতইতিহাসে সকলের চেয়ে উচ্চল মান গাঁয়েই থায়া আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মাস্তবের বিবোধ পারি করতে চেয়েছেন। তাদের যে পৌরষ সে রাষ্ট্রীতির পুটুজির পৌরষ নয়, সে পৌরষ মহত্ত সাধনার। এখানে বড় বড় মোছা ও সড়াটের মন্ত হয়েছিল, ইতিহাসিক বহু ক্ষেত্রে কালের আর্থিকতার পুরে থা থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নথ উদ্ধার করে আসেন। কিন্তু এটিকে-নথ মারক বাহিকতার আধার দুই করে দেশের আধ্যাত্মিক সত্তাকে সর্বজ্ঞানের কয়ে একাধ করেছেন তারা একলা সর্বজ্ঞানের কয়ে বড়ই আঘাত ও প্রত্যাবাসন গোয়ে থাকুন দেশের চিত্র থেকে তাদের নাম কিছুতে লুপ্ত হতে চায় না। এঁরা অনেকেই ছিলেন অজ্ঞান অজ্ঞান জাতি, কিন্তু এঁদের লগান সর্বকালের; এঁরা ভারতের সব প্রায় বড়ো অজ্ঞান যেটাবার সাধনা করেছেন,—এই চেয়ে সেখান থেকে সেই মহত্ত সমস্ত মাস্তবের।

আধুনিক ভারতে সেই সাধনার বাধা এখন করে এনেছেন সামোয়াল হায়। তিনি যখন এসে তখন সবজা আরাই মল্লিহর, তখন এমন রাজনৈতিক স্রাত করে বৃত্তাক-বহুত এই বহুজাত-বিশিষ্ট দেশে এসে প্রবেশ করেতে। সামোয়াল হায় অসমান ও অসত্যায় বীভাক করে বর্গের সর্বজনীন সত্তার গোয়ে মাস্তবের বিচ্ছিন্ন চিত্রকে সেখানে

উৎক্রেত তার সমস্ত জ্ঞান উৎপন্ন করেছিলেন। সামবলোকে থায়া মহাজা তাদের এই সর্বজনমান লগা; মাস্তবের পরমসত্তা হতে মাস্তব এক, এই সত্তাকে প্রকৃত ও সত্যীকৃত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের কাজ। সামোয়াল হায়ের বৃত্তিতে সকল মাস্তবকে খেয়েছিলেন এবং আত্মায় গোয়ে সকল মাস্তবকে বহুপথকে বৃত্ত করতে চেয়েছিলেন।

মৌজাপ্রত্যয়ে আমাদের প্রাচীনতম সামকর্য এই ইকোর বালি চিরকালের মতো আমাদের হান করে গেছেন। তারা বলেছেন, পায় নিবনচিত: বিনি অকিত বিনি এক তার মধ্যেই মাস্তবের পারি তার মধ্যেই মাস্তবের কলাপ। এই বালি অনেক কাল ভারতে সাম্প্রদায়িক কোলাহলে মজ্জ হুয়েছিল। তিনি তাকেই তার জা; তার করে জমিত করে তুলছেন। আর তার একথো বহু হোগো তিনি এই একের মন্ত বোধবা করেছিলেন যে ইচ্ছা ভারতবর্ষের পুণ্ডন ইচ্ছা, সেই তার চিরকালের ইচ্ছার সঙ্গে আত্মকের মিলের বোল আছে। ভারতের সেই ইচ্ছাই একমন্ত মধ্যম পুণ্ডন ভারতের এক বহুপুণ্ডন জীবন আবির্ভূত হয়েছিল এবং এইবিনেই তাকে তিনি মধ্যমতার মন্ত বিতে চেয়েছিলেন। জামি সকলে উৎক পীথার করব না এবং অনেকে তাকে বিলুপ্ততার থায়া আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে থায়া অকৃত লাভ করেছেন প্রতিপত্তার সাময়িক কুলাকায় তাদের বীভিক প্রাস করতে পারেন না। এটি থাানের মন্ত মজ্জা আছে, তারা ভারতের সবাতম ইকামালির একটি উল-মুখ থায়েই আত্মকে এই বিনের পবিত্রতাকে মধ্যম হাফে এসে রাখেন এবং সামোয়ালের থায়া যে আর্থবা থিল সেই আর্থবাকে কায়মনোবাক্যে উজারিত করবেন যে, ভারতের বিচ্ছিন্নতা থেকে, মজ্জবুধ থেকে, বহিঃবর্গের হানি-বনা থেকে, মুক্তি লাভ করবে—এ এবং—ন গো বৃত্তা ওজা মাস্তব।

### মাকিনের মেয়েদের কথা

গত মাস ৩ ফাল্গুনের "বঙ্গলক্ষী"তে ঐশ্বর্য বিপিনেন্দ্র পাল মহাপ্রয় মাকিনের "মেয়েদের কথা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়েছেন নিয়ে আমরা তাহার মূল উদ্ধৃত করিলাম।

৩৩-লাত যার ত কালাপানি পার হইলি কিন্তু এ পলায় মনুয়ে নলে আমার মনিষ্যতা হয় নাই। মনুয়ে জাহাজে গড়িলেই আমার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করে। আমেরিকার পথে একবারও আমি মাথাও কামরা হাড়িরা ঘাহিরে ঘাইতে পারি নাই। একদিন প্রাতঃকালে আমার কামরার ইয়ারে থায়ালা এক ছোট বাল মাঝি আমাকে বের। একজন সংযোজী মাকিনী বঁহিলা, আমি এই জাহাজে আমি







নিখিঁরি টেবিলে সন্ধ্যায়ের দর নাট।” এই বোর্ডেটের বাবার-বর  
পত্রাতিক সোজের দ্বিবার বননা ছিল। অনেকগুলি ছোট ছোট  
টেবিল চারিধারে সাজান ছিল। কোন টেবিলে বা ছাত্র, কোনটিকে  
গা.চি.বিস.ম., আর কোনটায় হু.চি.বিস.একসঙ্গে চক্কর বা আউট  
বসিবার আসন ছিল। ছোট্টেলে বাঁহারা ছিলেন, তাহারা অধিকার  
সম্প্রদায়ের দান কবিগোত্রসেন। তাঁদের এক-একটা নিখিঁরি টেবিল  
ছিল। এ ছাড়াও মজা-মজা নিজেদের ঘরে ছোট ছোট দল বাড়িয়া  
এক-একটা নিখিঁরি টেবিলে বসিয়া বসিলেন। এই ছোট্ট ভদ্রাবলি  
একটা দর টেবিল ছিল। সেই টেবিলে গ্রামিন সোম বসিবার  
বসনা ছিল। কিন্তু টেবিলটা তাহেই হু.চি.বিস.র কক নিখিঁরি ছিল।  
আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহারা এই টেবিলে বসিয়াই ইঁহাদের সঙ্গে  
হু.বো.স। বসিয়া গা.চি.বিস. টেবিলে বসিয়া বসিলেন বসিবার  
বসিবার। এখানে তোমার কামারের সঙ্গে তেমন আলোপ-  
পত্তির এমনক ২৫ নাই। একলা বসিয়া থাকিতে তোমার বড়  
বসিবার হু.চি.বিস. আমরা উপভোগ হু.চি.বিস. তোমার সঙ্গে পত্তির  
পত্তি। এখানে আমরা টেবিলে বসিয়া বসিল। আমাদের দ্বার,  
গা.চি.বিস.র দর। এ সাংখ্যিক আমরা অভিনয় করা করি। তোমার  
দুখে তার কথা শুনিবার দর এই হু.বো.স। হু.বসিবার।

এই বন্যায়ী মহিলাটির জীবনের ইতিহাস শুধিরা গীতার প্রতি  
 মানার অজস্র সমাপ্তি ও একটা আশ্রয় হইতেই উদ্ভূত হইয়া  
 বসিয়াছিল। তিনি অন্ধ বেগিনে কিছু ভাড়া দিয়া ঘাস দা। কেবল  
 কিছুকাল বসিয়া গীতার প্রাণের সিক্ত চাষিরা থাকিলে এ সম্বন্ধে  
 ভাবিত নাহে। বিশেষি বর্ষে বসনে গীতার বিবাহ হয়। কিছু  
 বিবাহের বিবাহই তিনি বিবাহ হইয়াছিলেন। বান্ধী-গীতে নৃতন হয়  
 প্রাণে কবিরাজ অক্ষয় পরেই গীতার বান্ধী খোড়ার গুড়িয়া লক্ষ্য-  
 মানে একটু বেড়াইতে যান। গী এমিলে নৃতন হয় নৃতন গীতিন  
 লক্ষ্যগীতা বান্ধী প্রতীকার বসিয়া আসিলে। অক্ষয় পরেই  
 প্রতিবেশীরা বান্ধী নৃতনই বান্ধী বেড়াইয়া লক্ষ্যের উপর বসন করিয়া  
 লক্ষ্য আসিল। খোড়া হইতে পড়িয়া বিলা সাম্প্রতিক আঘাত পাইয়া  
 মরণপথেই গীতার প্রাণ-লীলা পড়িয়াছে হয়। নবম্ব এই আকস্মিক  
 বজ্রাঘাতে কিছুদিন পরাধ একজন বাল্লভতন্যপুত্র হইয়া ছিলেন। বান্ধী  
 গীতার কাছ করিতেছিল, স্নানোক্তা লক্ষ্য করিতে, কিছু বস বিকল  
 হইয়া যায়। কিছুদিন প্রাণে এক ফোঁটা মল পরাধ বাহির হয়  
 নাই। ক্রমে একটু একটু করিয়া খোড়ার চিত্তিরা আসিল, মনে  
 মনে প্রাণের মল অবিরামধারায় প্রবাহিত হয়। স্নান বসনে পরে  
 গীত গুড়ী একবারে অন্ধ হইয়া যায়। সম্ভবগতিতে বান্ধী এখন  
 নৃতন বাহিরা বাধ নাই, যাগাতে বিবাহের প্রাণে প্রাণ-বাসন

[illegible]

ইহার পরে হুটবাস কাটাযা যেন। ২৩। খুব আমি উল্লসে কিম্বদন্তি  
মত বাজা কবিতা গ্রীক কবিতা তাহার কাব্যতা করিলাম। (নিম্ন  
১০।:৫ পূর্বে ইংল্যান্ডের আবার যেন বিদ্যারূপিণী শাউকোম। ইহার  
উল্লসে কুমারী কল্প আবার তার কল্পনায় যে, আবার গুলিগুণে  
যদিবার কাব্যতা হুটকো।





“আমার এই সাধারণ সাহায্য গ্রহণ করুন।” তাই জারিসের সঙ্গে দেখা করিয়া কুমারী কল্ল আন্তরিকতার সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহাদের মাস আনার মনে দাঁড়।

সন্ধ্যা বন্দোবস্তের একজন ছিল। ওয়ার্মিংটনে আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা কি হইবে? কুমারী বলিয়া একটা Boarding House-এ যাইলেন। সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থাও সবাই হই, কিন্তু তাহাতে আমি ইঁহাদেরই অতিথি হইব, ওয়ার্মিংটনের অতিথি হইব না। ওয়ার্মিংটনের সমাজের শিবজানীর কোন পরিচায়ে আমার আতিথ্যসংস্থানের ব্যবস্থা না হইলে আমারও সম্ভাব্য থাকে না, ওয়ার্মিংটন-সমাজেরও সুখবল্য হই না। ইহা ভাবিয়া কুমারী কল্ল তখন ওয়ার্মিংটনের অজ্ঞাতপ্রেমীক মুমিষ্টেরিয়াম সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মহিলায় সঙ্গে যাইয়া দেখা করিলেন। ইঁহার নাম মিসেস্ ট্রাউট, ইঁহার বাড়ী কেম্ব্রিজ ট্রাউট। তিনি আমার নাম জানিতেন। আমি ওয়ার্মিংটনের হাউসেজি, একথা শুনিয়াই তাই আমার আতিথ্যসংস্থার করিতে গেলি হইলেন। কিন্তু ইঁহাদেরও কুমারী কল্লের মন উঠিল না। তিনি মিসেস্ ট্রাউটকে কহিলেন,—কেলস আতিথ্যসংস্থার করিতেই ত চলিবে না, ওয়ার্মিংটন-সমাজের বাড়ী তাঁহার সম্বন্ধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে আলোচ্য করিবার জন্য আপনাকে একটা লাক্স/এন্ডলিভের বা Evening Party-র ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিসেস্ ট্রাউট কহিলেন, তিনি আলোচ্যসংস্থার তাহা করিতেন, কিন্তু সম্মতি তাহার কল্লার বিচার হইয়া গিয়াছে, তিনি একলা পড়িয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে এই অবস্থার এত অল্প সময়ের মধ্যে একজন একটা সামাজিক জ্ঞানের আয়োজন করা সম্ভব নহে। কুমারী কল্ল তখন নিম্নলিখিত পাঠ্যবিষয়ের তার বিবেচনা গ্রহণ করিতে গেলি হইলেন, এবং মিসেস্ ট্রাউটের নিম্নলিখিতগুলির তালিকা আনিয়া মিসেস্ ট্রাউটের সাক্ষরিত কার্ডে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

তখনও বাকী রছিল মুক্তজ্ঞানের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার দেখা-

সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা। কুমারী কল্ল পরদিন দুজীকে রাষ্ট্রপতির জ্ঞানার্থে রাষ্ট্রীয় উপস্থিত হইলেন। বাণীন রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতির বহুজ্ঞা সকলের কাছেই খোলা। কুমারী কল্ল একজন বয়সী রমণী হইলেও এই অবস্থিত তার বিজ্ঞা রাষ্ট্রপতির জ্ঞানার্থে বহিরা। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলেন। মিঃ মাক্‌কিন্সলি তখন মাকিন্সের মুক্তজ্ঞানের রাষ্ট্রপতি। কখন তাঁহাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, এই কথা কহিলেন প্রাইভেট সেক্রেটারী সমস্তাভার বলিয়া এ যাবৎ একটিকে চাহিলেন। কুমারী কল্ল তখন তাঁহাকে কহিলেন, পাল মহাশয় মিসেস্ ট্রাউটের অতিথি হইবেন। মিসেস্ ট্রাউটের প্রতিমিথ্যকরণেই আমি আপনায় দিকটী আনিয়াছিলাম। যাহা হইক, আপনি বাহা বলিলেন, মিসেস্ ট্রাউটকে রাষ্ট্রা তাহা বলিব। প্রাইভেট সেক্রেটারী তখন পুনঃপ্রতি হইয়া বলিলেন,—“না, না, বেশি কোন মতে একটু সময় করিতে পারি না কি?”—এই বলিয়া যোগদান রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যাইয়া কথা কহিয়া আনিয়া একটা দিনও সময় বিলম্ব করিয়া আমাকে তখন গটীয়া আনিতে বলিলেন। কুমারী কল্ল কহিলেন,—“মিসেস্ ট্রাউট আমাকে গটীয়া আনিবেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী তখন কহিলেন, “মিসেস্ ট্রাউটকে বিবক করিবেন না, আপনিই ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন।”

এখানে আমি আমার ওয়ার্মিংটনের অতিথ্যতার কথা লিপিকৃত বলি নাই, মাকিন্সের দেহেরের কথাই বলিতে বাসিচ্ছি। আর এই কাহিনীতে বাণীন রাষ্ট্রীয় বাণীন রমণীরা কোল পদার্থেরের হাবী না করিতেও কিছুতে উচ্চতর স্ট্রেস লোকের কাছে অধায়ে উপস্থিত হইতে পারেন, এ-এ তাহাদের দ্বারা কতটা ভাঙ্গ করা হইয়া গাটে পানেন, এই প্রশ্নে তাহাদের প্রশ্ন পাটহাছিল। বাণীনতা এবং বহু। বাসুক বাণীনতা এবং করিয়া পড়িয়া গুলে। মাকিন্স মুক্ত-জ্ঞানের “সামাজিক বিবরণ্যে তাহা হইতে বেশিও পাওয়া যায়।





কমলা ভাড়াগাড়ি ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে খাঁচল ঘিরে একটু মুছে বিজনাথের সমুখে স্থাপিত করলে। বিজনাথ উপবেশন করলে নিজের পথার উপর আসন গ্রহণ করে শুভ্রকান্তের জিজ্ঞাসা করলে, “কি কথা বাবা?”

সিগার-কেস থেকে একটা চুকট বার করে মুখে দিয়ে বিজনাথ বললেন, “বলছি।” তারপর বেশলাই মেলে সিগারটা ধরিয়ে নিয়ে অলস কাঠিটা নিড়িয়ে দূরে নিক্ষেপ করে বললেন, “তার আগে আর একটা কথা বল কমল। লজ্জা, লজ্জাট প্রভৃতি জিনিষগুলোর এক দিক দিয়ে খট খট বুলি থাকে, কোনো একটা স্তব্ধতার বিষয়ের সীমানার সময়ে সেগুলোকে বিয়ত করে তুলে বিড়খিত হওয়া কখনো উচিত নয়। যে কথাটা তোমাকে অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যিক হয়েছে, সে কথা তোমার মা এখানে উপস্থিত থাকলে তোমাকে যেমন সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করতেন আমি তেমনি সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করব, আর তুমি ঠীকে যে রকম সহজ ভাবে উত্তর দিতে আমাকেও তিক তেমনি সহজ ভাবে উত্তর দিবে।” বলে কমলাকে লজ্জাট কাঠি দিয়ে প্রস্তুত করার সময় দেবার উদ্দেশ্যে বিজনাথ চুকটে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন।

ভূমিকা থেকে আলোচনা বিষয়ের ধাবণা করতে কমলার বিলম্ব হ’ল না,—বিশেষত সন্তোষ বহন জনিত উৎসাহিত রয়েছে। তা ছাড়া অপর কোনও বিষয়ে সন্দেহটাই বা কিসের, আর লজ্জাট বা কেন হবে? সন্দেহের কারণ যত হোক না হোক, লজ্জাট-কাল যে আসে, তা উপলব্ধি করে কমলা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কোনো কথা না বলে সে নীচের নত-নেয়ে ব’সে রইল।

লজ্জাট থেকে একখানা চিঠি বার করে বিজনাথ বললেন, “তোমার মা এখানে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর কথা দিয়েই কথাটা আরম্ভ হ’ক; তাঁর মুখ থেকে না শুনেও তাঁর চিঠি থেকেই কথাটা শোনো।” বলে বিমলার চিঠিখানা কমলার হাতে দিয়ে বললেন, “যে অংশটুকু লাল পেন্সিল দিয়ে যেটা আছে তুমি সেই অংশটুকু পড়লেই হবে।”

সংগত হিসাবে সন্তোষের হোগাতা সত্বে যে অংশে বিমলার উচ্ছ্বাস প্রকাশ্য ছিল, সেই অংশটুকু বিজনাথ লাল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, বাম দিয়েছিলেন যে অংশে পদ্মবুঝীর চিঠিতে অবগত বিনয় সত্বে উদ্বেগ প্রকাশ এবং সতর্ককরণ ছিল। কমলা চিহ্নিত অংশটুকু পাঠ করে চিঠিখানা বিজনাথকে ফিরিয়ে দিয়ে নীরবে ব’সে রইল।

বিজনাথ বললেন, “সন্তোষ সত্বে তোমার মায় মত ত’ অন্যতাই পারলে। তোমার পদ্ম ঠাকুমারও একান্ত আগ্রহ





সন্তোষের চোখে তোমাকে সমর্পণ করি। আমার নিজের কথা যদি ভিজ্ঞাপা কর, আমারা অমত নেই—তখন তুমি বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ, যে দিক দিয়েই দেখ না কেন, সন্তোষের মত একটা পাত্র পাওয়া কঠিন। এখন তোমার যদি সন্তোষ থাকে তা'হলেই সন্তোষের সঙ্গে কথা শেষ করি। আমার বিবাহ, এ কথাও একটা। পাশাপাশি ক'রে তেলবার করে সন্তোষ বিশেষ উৎকর্ষিত হ'বে অপেক্ষা করবো। তাঁর প্রতি মস্তার আচরণ হবে যদি না আমরা অবিলম্বে তাঁর উৎকর্ষা থেকে তাঁকে মুক্ত করি। তুমি অসন্তোষে তোমার মত জানাও কমল, কিছুমাত্র লজ্জা কোরো না।”

উত্তরেঃ এঃ উত্তেজনার কমলার কণ্ঠস্বর বিধু বিধু বায়ে ত'রে উঠিল। দুখ দিয়ে কিন্তু কোনো কথা বার হ'ল না—সে পুঞ্জের মত নিকাক হয়ে ব'লে রইল।

একটু অপেক্ষা ক'রে বিজ্ঞাপা বললেন, “তবে যদি তোমার কোনো কারণে—তা সে যে কারণই হোক না কেন, প্রকাশ করতে তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত চরো না—যদি তোমার অমত থাকে, তা হ'লে কখনই আমরা সন্তোষের কথা আর ভাবব না, তা মন্ত দিক দিয়ে সন্তোষ বতই বাছনীর হ'ল না কেন।”

এতটা আশ্বাস লাভ ক'রেও কমলার দুখ দিয়ে কোনো কথা নির্গত হ'ল না।

কমলার এই চক্কেস ঘোঁরার সঙ্গে বিজ্ঞাপা তাঁর অন্তরের কোনো নিরুত্পালিত বাসনার দ্বৈতা উপলব্ধি ক'রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলেন; বললেন, “যদি যদি কমল, এ যিহরে তোমার এমন কোনো আপত্তি থাকে যা প্রকাশ করতেও তুমি সন্তোষ বোধ করছ, সে সন্তোষে তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। যদি যদি এমন কিছু—” মাহু ধরবেন অস্বস্তি জন্ম করবেন না, সে কোণল লুকটিন দেখে বিজ্ঞাপা অঙ্গ-পাশেই নিবৃত্ত হলেন।

পিতার বিপর অস্বস্তা দেখে কমলার চোখ হ'ল। সমস্ত শক্তি সঙ্কীর্ণ ক'রে সন্তোষ কাটিয়ে সূর্যবরে সে বললে, “না কিংরে আসা পর্বাণ এ কথা বড় থাক্ না বাবা।”

বিজ্ঞাপা অস্বস্তি হ'য়ে উঠলেন; বাবা কঠে বললেন, “না, না কমল, এ কথা আর অনির্দিষ্টভাবে কোলে রাখা যায় না। আমরা কিছু না বলি, এ ব্যতীর বাবার আগে সন্তোষ এ কথা তুলবেনই। তাঁর মনে যে, সন্তোষ আর উৎকর্ষা দেখা দিয়েছে, এ আমি তাঁর কথাবার্তা আর আচরণ থেকে লম্বি বৃকতে গেরেছি। তিনি যখন কথাটা তুলবেন তখন তাঁকে তা আর বলা চলেবে না যে, তোমার না কিংরে আসা পর্বাণ কথাটা বড় থাক্। তা ছাড়া, যে কথাটা তোমার মাকে বলতে পারবে ব'লে মনে করছ, সেটা আমাকে বলতে তোমারি এত সন্তোষ কেন? বাপের চেয়ে না কি এতই বেশি আপনাব?” ব'লে বিজ্ঞাপা হাসতে লাগলেন।

আসলে কিছু বাপারটা ঠিক বিপরীত। মাতার চেয়ে পিতাকে কমলা ভালবাসতও বেশি, সন্তোষ করতও কম। এ শুধু সময় নেবার উদ্দেশ্যে সে একটা ছল করেছিল। কি ব'লে কথাটার একটা উত্তর দেবে মনে মনে কমলা ভাবছে এমন সময়ে বিজ্ঞাপা প্রশ্ন করলেন, “তুমি আমা না বেহে উপোষ ক'রে আছি কমল?”

অব হয়ে মন্ত নেত্র ঝলম্ ঝলম্ ক'রে কমলা দেখলে পিতার মুখে-চক্কে নিবিড় স্নানহুতি আর লম্বু কোঁচক এক সঙ্গে খেলা করছে,—পতীর উদার-স্বরের সঙ্গে তাঁক তারা-স্বরের অস্বস্তনের মতো। প্রথমে কমলার তৃত্ব দুখ সন্ধ্যাকালের মতো আরম্ভ হ'য়ে উঠল, তার পর তার আনন্দ-স্থির চক্কে দৃষ্টি থেকে টপ, টপ, ক'রে কড় কড় কোঁটার অঙ্গ ক'রে পড়তে লাগল; সুধের কথা মাটিকে রাখতে গিয়ে পতিত যে অঙ্গের হয়েছিল তারই গুণগুণ্য গোথের লগ নিকপার তাবে থেরিয়ে এল। যে কথা নির্ধের জন্তে বিজ্ঞাপা এতকণ নিম্মলতাকে এরের পর প্রশ্ন করছিলেন, একটা মনোভীতন এরের উত্তরে গোথের লগ তা অসংযেত নিরুপিত ক'রে বিলে।

কমলার অঙ্গ দেখে বিজ্ঞাপারও চক্কে অস্বস্ত্যাক্রান্ত হ'য়ে এল, মুখে কিন্তু তিনি হাসতে লাগলেন; বললেন, “হেলোমাত্র আর কা'কে হল! যে কথা জানবারি জন্তে কত রকম ক'রে পেছাপিড়ি করছি দুখ দুটে সে কথাটা

বলেই ত হোত। এতে লক্ষ্য করি আঁধার মা? তোমার  
ত' ভাবিত বাকি নেই কমল। বিনয়কে আমি কত  
ভালবাসি, হুতরাং বুঝতেই পারছ এ'তে আমি কত স্থলী  
হয়েছি।" তারপর চোখের ভাগ ক'রে উঠে কমলার পাশে  
ব'লে তার মাথার মক্ষি হাতটি সম্মুখে বুলোতে বুলোতে  
বলেম, "আজ লক্ষ্যেবলাই বিনয়ের সঙ্গে আমি এ কথার  
শেষ করব। আশা করি তোমার মা ফিরে আসা পর্যন্ত  
এ কথা বহু না রাখলে চলবে?" ব'লে উঠবরই তা হা  
ক'রে যেলে উঠলেন।

নিবিড় সন্ধ্যাতে ও গুপ্তে কমলা তার আরক্ত মুখ  
বিজ্ঞানবের বেতের মধ্যে লুকোলে।

বৈকাল সাড়ে চারটের গাড়িতে বিনয় মধুপুর থেকে  
ফিরছিল। তার সীড়িত বস্তুর মধুপুরে আদ্য ধর নি। যে  
গৃহ ভাড়া হ'য়ে আছে মধ্যাহ্নে তথায় উপস্থিত হ'য়ে সাবান  
পাওয়া মাত্র সেই গাড়িতেই বিনয় ঠেপেনে ফিরে আসে। সাড়ে  
চারটের আগে অল্প কোনো গাড়ি না থাকার অগত্য  
সাড়ে চারটের গাড়িতেই ফিরে আসছে।

সমস্ত দিন সে অতৃপ্ত রয়েছে। শুধু অতৃপ্তই নয়,  
সকালে প্রহ্মদায়ের বাড়ি থেকে যে চা আর খাবার খেয়ে  
বেরিগেছিল তারপর জনস্পর্শ পর্যন্ত করে নি। মধুপুরে  
খাবারের অভাব ছিল না, বিশি বিলিতি হোটেল ছিল,  
ঠেপেনে সিক্রেপমেন্ট রুম ছিল, তা ছাড়া যন্ত্রণার বোকানের ত'  
সখোই নেই;—কিন্তু বিনয়ের আহারের প্ররুতি ছিল না।  
এমন কি কুমার তৃষ্ণার বধন দেহটা কষ্ট স্তোষ করছিল তখন  
পর্যন্ত না। যেহে-বেটা প্রত্যয়ের তাকনার চাকিল, মন তাকে  
বাধেছিল অস্বাভাবিক উত্তেজনা। কিন্তু সেই উত্তেজনার  
মূল যে কোথায় নিহিত ছিল,—অতিমানে, না অপ্রশোচনার,  
না রাগে, না বৈরাগ্য,—যে বিষয়ে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা  
ছিল না;—তু মনে হচ্ছিল আহারে ত পানে আর বাধা  
নকোই, আদ্য ও হুই ব্যাপারের ঘাটা কুখ্য তৃষ্ণার পাতি  
নেই।

একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরার জানার দ্বারে ব'লে  
বিনয় বায়ের দিকে চেয়ে ছিল। ভবিষি পৌছবার বহু  
পূর্বে থেকে রেলগাড়ির দাঁ দিকে ডিগরিয়া পাড়তে দেখা  
যায়; তাই দেখতে দেখতে তার মনের মধ্যে  
ডিগরিয়ারই মতো লক্ষ্যের একটি বিশাল পাড়াত ভৈরী  
হ'য়ে উঠছিল,—ডিগরিয়ারই মতো দ্বার পিছন দিকে  
আনন্দের দূর্য্য অস্তগমনোদ্য, ডিগরিয়ারই মতো দ্বার সমুখ  
দেখ বিবাদের ছাত্রের স্তম্ভমাণ। দেখেই হ'ক কাল সকাল  
ঘনটার গাড়িতে কমলার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে হবে,  
নচেৎ নিস্তার নেই। যে গাধন মিলিত করে না  
আবদ্ধ করে, তা থেকে মুক্তি না পেলেই নয়!

কিন্তু এই লক্ষ্যের কথা মনে ক'রেই বিনয়ের মন  
বিরক্তিতে ভরে উঠল। গোড়াক জর করবার ভয়েই  
ত লক্ষ্য, রোগকে প্রশমিত করবার ভয়ে যেমন ওদুখ। কিন্তু  
এই লোভ মনের মধ্যে আসে কেন? আজ সকালে কমলার  
সামান্য কথার আচার না ক'রে চ'লে আসা, সমস্ত দিন  
অকারণ উপবাসে নিজেকে নিপীড়িত করা, লোভের প্রভাব  
থেকে দূরে পলায়নের লক্ষ্য প্ররুতি রক্তপাত পরিত্যক্ত  
আচরণ স্বরূপ ক'রে বিনয় নিজেকে মনে মনে  
স্ত্রিম্বার করতে লাগল। সেখানে লক্ষ্য হ'য়ে অবস্থান  
করবার কথা, সেখানে মন তাড়ায়তা অবলম্বন করে  
কেন?

একটা নির্জিকর ঔষাদীতে নিজের মনকে নিরাময়  
ক'রে নেবার জন্তে বিনয় চেষ্টা করতে লাগল,—যে অপরার  
আসক্তি বিরক্তি, আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছুই থাকবে না, যে  
অবস্থার কমলাকে বিজ্ঞানবের কড়া অগাধ সন্ধ্যারের বাধ্যতায়  
বহু অতিরিক্ত কিছুই মনে হবে না, হুতরাং পরদিন বেলা  
সাড়ে ঘনটার গাড়িতে বেতের পরিত্যাগ করা না করা  
প্রত্যেসূত হবে।

কিন্তু মনে করবার চেষ্টা করলেই যদি সব কথা মনে  
করা সম্ভব হ'ত তা হলে মন হ'ত হিলেবের বাতায় মত  
লতো-মিথায় নির্বিকার, জমা অথবা বরতের ঘরে মিথ্য।  
অক জেনেও হিলাব-নিকাশের সময় সত্যই মত তা  
হাস-গুড়ি খটাত।



এ কথার সমান্তরাল পরীক্ষা চ'রে খেল চতায় শোভার কথা মনে পড়ায় : কুমার যত শোভাকে ফেললে কি চর ? বিনয় মনে মনে হিন্দব ক'রে দেখলে তাকে কুড়ি কিল্লি চর না, পবন হাসে চর । বিদিত চ'রে হিন্দাব পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলে কুমার যত শোভাকে ফেলতে খেলে লজ্জা লজ্জা হরচর যত পড়ে ছিটনাখের কল্লা অথবা লেজাখের বাগুন্দা বণ্ কল্লা । বুকুলে, হাতার হিলেবের নিরমের লজ্জা মনের হিন্দাব নিরমের প্রভেদ আছে ।

চিহ্ননাথ চিহ্ননাথ টেনে পাড়ি পৌছে গিয়েছিল । পরদিন বেলা সাড়ে মণটার গাড়িতে দেওঘর পরিভাগের লক্ষ্মী লাক । ক'রে গাড়ি থেকে প্রাট্টফোর্সে নেবেই বিনয় দেখলে সন্ধ্যা লাড়িতে খেলেছন ছিটনাথ । সমস্ত মনটা বিহবিত্তে খুলিয়ে উঠল—একটা নিতশায় হতাশায় দে মনে মনে অস্তির চ'রে পড়ল,—এব দেখচি আমাকে কিল্লিতেই নিস্তার বেবে না । অস্তির যত বণ্লে, “অপনি কট ক'রে এবেছন কেন ?”

ছিটনাথের মুখে ভুট ভুট দেখা গিল :—বিনয়ের কাখে একটা ভাত বেখে বিড় কটে বণ্লে,—“কেন কট ক'রে

এসছি তা বুঝতে আমার মতো বরদ চ'লে, আর কমলায় মতো একটি মেরে থাকলে । এখন চল ।”

“কোথায় ?”

“আগন্ত আমায় বাড়িতে ।”

যেটা একটু কঠিন ক'রে

“কিন—”

ছিটনাথ চিহ্ননাথ বণ্লে,—“কিন বণ্লে আমি মজা চতায় হুতায় অনেক কথাই বণ্লে, অতএব চল ।” তাবশর মনে মনে কি ভেবে ঐক্য দুইকটে বণ্লে,—  
“কমলা লক্ষ্মী মিন উল্লাস ক'রে রয়েছে ।”

বাগুন্দা বিনয় বণ্লে, “কেন ?”

“তোমারই অবিরচনার ভজ্জ । এখন চল ।”

আর কোনো কথা না ব'লে নিরতিগতাব চিহ্নিত ম'ল বিনয় ছিটনাথের লজ্জা ওভার-রিতের দিকে অগ্রসর হ'ল ।



## মরণ

### কুমারী গীতা দেবী

মরণ, তোমার বরণ করি গানে,

চরণ দুটি নীতল তব অতি ;

চরণ কর বেদন-ভরা প্রাণে,

স্বাধার মত মৃতল তব পতি ।

আনিলে কোন্ মাঝার বগে তুমি

বাণ গো নিরে অচেতন কোন বেগে ;

আগেই তারা বিয়েছিল পাতি

সবাই দেখা তাদের সাথে মেনে !

ওগো আমার চিরদিনের সখা,

আজকে মঙ্গল চন্দের অবধান ;

ভাট গ্রন্থের চিত্র-বরণ আমি

তোমার পাশে লুটিয়ে দিলেম প্রাণ ।

তোমার আপমনের লাগে লাগে

মনের বঁধায় তরী বেঁকে গুণে ;

আমার বঁট গোপন বাধাগুলি

হুলের গাজে পুঞ্জ করে দেগটে ।

অল আমার দুক্তাগারি কণে

তোমার গুল্মগুলির দিলেম মালা,

মনের মত লাগিয়ে দিহু স্নিগ্ধ,

অনন্তলগ্নে তোমার বরণ ভালো ।

কণ্ঠ শুধু তোমার গানে গানে

উঠছে ভরি আজকে বিহারতি,

বিদায় নিলেম তোমার লাগে অতি

ওগো আমার অচিন্ত্য লোকের লগ্নো ;

## নানাকথা

### রবীন্দ্রনাথ

বৈশাখ মাস শুক্ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঙ্গলবারে জন্মলাভ ।

সুতরাং বাংলা সাহিত্যের শকে এ মাস - শুভ-মাস ।

১২৬৮ শালের ২৪-এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন । তাঁহার জন্মদিন আগন্তপ্রায়, আমরা

তৎপলক্ষে কবির বীৰ্য্যমু, বাহা এবং গৌড়াঙ্গা একান্তমনে

প্রার্থনা করিতেছি । এ সংখ্যার প্রকাশিত কবির আলোখাটি

শিলা, সাধারণভাবে কবির যে চিত্রাদি দেখিরাছেন তদুল্ল

ধারণা হইতে অঙ্কিত করিয়াছেন, কথিকে এ পর্য্যন্ত তিনি

চাকুর দেখেন নাই । এ চিত্রটির ইচ্ছা বৈলক্ষণ্য ।

\* \* \*

### জানন্দ-মেলা

আমাদের এই আন্তরিক জীবনের দাবতীয় ক্রমে ও মৌন

বন্ধনের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত জীবনের সনিগ্ধ আশ্রয়

ও পরম মীনতা লবেও যদি একবারও এমন একটি সন্মিলনে

আয়োজন হয়, যেখানে পারিশ্রমিক বিরুদ্ধতা ভুলিয়া

পৰম্পরের সহিত মিলিত হওয়া এবং সেই মিলনের মধ্যে

আনন্দ উপভোগ করা উচিত মন্ত কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য

না থাকে,—সেইরূপ সন্মিলনের অমুষ্ঠানত্ব বর্থাই আন্তরিক

প্রাণসার যোগ্য ।

কিছু সন্মতি আমরা এতৎ একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয়

পাইয়াছি, বাহার ক্রিয়া-কলাপ টকা অপেক্ষা অধিকতর

বিস্তৃত । ইহার নাম আনন্দ-মেলা । এই স্থানে দেশমাতার

কৃতী ও কর্মী লক্ষসংখ্যের সহিত লাক্ষ্য-সম্মতি পরিচি

হইবার এবং তাঁহাদের জীবনের বাকী তাঁহাদের মূলে

জনিত জীবন প্রাণের সংস্পর্শে নিত্যের জীবন পতি



# ১৩ ১৩১৮ বিচিত্রা

ষষ্ঠীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

চতুর্থ সংখ্যা

## স্বা-শিক্ষা

### জীবনানুশাসন চাকুর

জ্ঞানোৎসর্গ ও পুরুষের শিক্ষার এক মংগে মিল আছে, আর এক মংগে নাই। সাধারণ বিজ্ঞানিক উদ্বেগের সঙ্গে সমান আবৃত্তক—বাবদারিক শিক্ষা উভয়ের সঙ্গে বৃত্তয়। সংসারে যেমন পুরুষের স্ত্রীমনি মেয়েদেরও একটা বাবদারিক দিক আছে, সেখানে ভাড়াবের ওস্ত বিবেচ শিক্ষা ওস্ত। বিশ্বভাবভাতে সাধারণ শিক্ষার ভাড়াভাবীর মধ্যে কোনও প্রভেদ করা হয় নাই, এই বৃত্ত স্ত্রী-পুরুষ-ভায়ে এক সঙ্গেই শিক্ষা লাভ করে। বিবেচ শিক্ষার ওস্ত বিবেচ আরোজন করিবার ওস্ত আছে—প্রধান বাবা উপস্কৃত শিক্ষকের অভাব। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গাইব্রাতর স্বাভাবিক রোপিতপ্রদা-ওস্ত সন্তকে স্বার্থ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাড়াতে শুধু যে কামাকুলপ্রভা দেখা হয় তাই নহে, মেয়েদের মন ভায়ে ও অস্ত সংসারে হঠতে বৃত্ত হয়। এইরূপ সংসারের আবৃত্তনায় আমাদের স্বা-পুরুষের মন ভাড়াভায়ে হঠরা আছে—ইগরত ভায়ে আমরা অস্তের বাতির মাবতেছি। আমাদের পুরুষের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াও মনের ভিতর বৃত্তিলাভ করিতে পারেন নাই, প্রভাভ ভায়ে সন্ত প্রমাণ লাভ। ওস্ত ওস্তে বৃত্তা বায় যে, বোকা অস্তান্ত ভাবি, অস্ত ভোয়াই নহে না। অস্তান্ত্রেরও শিক্ষার প্রবেশ না হঠিলে আমাদের মরণ ভব। নিস্তর ভানিবেন সাধামত স্ত্রী-শিক্ষা সন্তকে লক্ষ্যপথে চলিতে ওস্তা করি। কিছু আমাদের লামর্বা অস্ত,—আমার দেশের লোক আমার কাছে আশুকুলা প্রকাশ করিলে বাবে বাবে পতিরা চলিতে পারিব। ওস্ত পতি, বাবা মনে আছে ভাড়া বাহিরে প্রকাশ করিবার মত লক্ষ্য আমার নাই।

এখানে মেয়েরা কেবল ভায়া ও সাকিতা পিণিতেছে ভাড়া পতি নহে—ভাড়াবা গানবাহন্য চিত্রকল: পতীরতন্ত পিণিতেছে, ভায়েতর কাম পিণীইবার উপস্কৃত বাবভাভ আছে। বালাকে Domestic Science বলে ভাড়াভ এখানে দেখানো হয়। ১৭ ফাল্গুন ১৩৩৮।

## আকাঙ্ক্ষা

### শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে চাতেরা এখানে আমাকে আছান করেছে, এটা আমার আনন্দের কথা। ছাত্রদের মধ্যে আমার আসন আমি সন্তোষ গ্রহণ করতে পারি। সে কিন্তু শুকরূপে নয়, তালেব কাঁড়ে এসে, তাদের মধ্যে ব'লে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, চট্টাৎ আমাকে বাইরে থেকে শুক ব'লে ভ্রম হয়, তাই বাসের বয়স আর ততো বয়স আমাকে ডাক, কাছে ডাকে না, আমার ভুলে তফাতে উঠ ক'রে মক ব'লে। এই বিশ্বাস থেকে রক্ষা পাবার ভুলেই মোকালেবের বাইরে আমি একটা ভাষণ করেছি সেখানে চেলেবের আন্টি কাঁড়ে ছেকেছি। সে কেবল চেলেবের উপকারের ভুলে নয়, আমার নিজের উপকারের ভুলে। উপকারটা কি একটু বুঝিয়ে বলি।

মাগুরের মনে অন্ধকার পদার্থ প্রবল। সেটাকে বয়স তার বয়স বাড়ে তখন সে মনে করে সেট বয়স বাড়ার মতোই নৃত্য তার বিশেষ অন্ধকার করার কারণ আছে। বিশেষত এখন যদি সে বুড়োজেরই লব ব'রে থাকে তাহ'লে তার সেট অন্ধকারটা আরো বেড়ে ওঠে। তখন সে একটা মস্ত কথা বলে যায় যে, যেটাকে সে বাক্য বলে সেটাই তার স্থান হ'লে বাওয়া। তার ভবিষ্যৎ ক'বে এসে, অতীতের বাড়তির বড়ই ক'রে তার ফল কি? শুকই যদি সংসারে পৌরবের জিনিষ হ'ত তাহ'লে শুককে বরখাস্ত করবার ভুলে ভগবান এত ভাড়া করতেন না।

স্টেট দেখতে পাকি, বুড়োদের উপর বাবা তুম্ব রঙে জায়া ছেড়ে দেবার ভুলে। নকীব হাফতে, স'রে বাগ, স'রে বাগ। কেন রে বাগু, বাটপল্লিট বহুরের পাকা আসন ছাড়ব কেন? ঐ যে আসনে মহারাজা, ঐ যে কুমার, ঐ যে কিশোর। তববান কেবলি কিয়ে কিয়ে শুককে মস্তোত সিংসানে পাট্টিয়ে জিঙেন। তার কি কোন মানে নেই? তার মানে এই যে, তিনি তাঁর সন্তীকে শিকনে বাবা

শ'কে থাকতে দেখেন না। নূতন মন নূতন শক্তি বা'রে বা'রে নূতন ক'রে তাঁর কাক মারন্ত বহি না ক'বে, তাহ'লে অগোবের প্রকাশ বাক্য পাবে। অগোবের ত ভরা নেই। এই ভুলে বৃহৎ মস্ত ভরা কেবলি কেটে মিলিয়ে যায়, আদ পৃথিবীর কোণ ছুড়ে তরল হু'লের মধ্যে তরল প্রভাতের আলোর বেগা দেয় তরলবয়স মল। ভগবান কেবলি নূতনকে বাশি বাজিয়ে ডাকলে, আর তার মলে মলে আসচে, আর সমস্ত জগৎ আদর ক'রে তাদের ভুলে যায় খুলে দিচ্ছে।

ভগবানের দেউ আছান শোনবার ভুলেই শিক্তবের মধ্যে বাগকরের মধ্যে আমি বসি। তাতে আমার একটা মস্ত উপকার হয়, মস্তান্ত বৃহৎ মস্ত আমি নবীনকে অগ্রসর করিনে; চাবীকালের আশার উপর আমার মস্তোতকালের আশার বোকা চাপিয়ে দিইনে। আমি বলি, "ভর নেই! পরীক্ষা কর, গ্রন্থ কর, খিচার কর, লতাকে হেড়ে দেখতে চাও; আছা, মাখাত কর, কিন্তু লামনের দিকে এখোও।" ভগবানের বাশির ডাক, চণোহদিক অভিনয়ে নূতনকে আছান, আমায়ো বুকের মধ্যে যেতে গ'ত। তখন আমি বুকেতে পারি যে, বুকের লতর্ক বিজ্ঞতা বড় লতা নয়, নবীরের চণোহদিক অনভিজ্ঞতা তার চেয়ে বড় লতা। কেননা এই অনভিজ্ঞতার শুৎব্রুকের কাছের লতা বা'রে বা'রে আপন নূতন শক্তিতে নূতন নৃতীতে গকাপ পান; এই অনভিজ্ঞতা অসুখ ব'লেই পূজাতনের পল্লতগ্রমল বাবা ভালে এক অলম্বা লামন হ'তে থাকে।

বৃহৎ সেয়ে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে। আমি কেবলমাত্র তোমাদের এই কথা মস্তপ করিয়ে দিতে চাই যে, তোমরা নবীন। তোমরা যে বার্তা বহন ক'রে এনেচ সেই বার্তা/কামরা সুলেলে চলে না। এই পৃথিবী থেকে মূল্য প্রকার লীর্ণতাকে তোমরা পরিচৈ দিতে এসেচ; কেননা লীর্ণতাই আতর্জনা, লীর্ণতা যাক্সপের বাবা। এই লীর্ণতাকে

যা বা আপন হ'লে সমস্ত করে তাইই লভ্যকার বস্তু।  
পৃথিবীতে তাদের কাজ কুরিয়েছে, গ্রামিণ তাদের ভাব  
বিয়েছেন, তারা দ'রে পড়বে। কিন্তু তোমরা নবীন,  
তোমাদের হাতে পৃথিবীর তার নতুন ক'রে পড়েছে, তোমাদের  
ভবিষ্যৎকে আজ্ঞার হ'তে দিও না, পথ পরিষ্কার কর।

কেন পালের নিয়ে তোমরা এসেছ? মত আত্মজ্ঞান।  
তোমরা বিভাগের বিশ্ব হ'লে ভিত্তি হয়েছ। কি বিশ্বের  
ধৰে ডেবে দেখো। পানী তার মা বাপের কাছে কি  
পেবে? পানী মেলতে পেবে, উকতে পেবে। মানুষকেও  
তার অস্তরের পানী মেলতে বিশ্বের হ'বে; তাকে বিশ্বের  
হ'বে কি ক'রে বড় ক'রে আত্মজ্ঞান করতে হয়। সেট  
ভগ্নতে হ'বে, এ পেশবার জন্তে বেশি গাধনার দরকার নেই।  
কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হ'তে হ'বে এই পিশার জন্তে যে  
অপরিসীম আত্মজ্ঞান দরকার, তাকেই শেষ পর্যন্ত আশির  
রাখবার জন্তে মানুষের পিকা।

এই বৃণে সমস্ত পৃথিবীতে যুরোপ শিকড়তার ভাব  
পেয়েছে। কেন পেয়েছে? গায়ের কোরে আর সব হ'তে  
পারে কিন্তু গায়ের কোরে শুক হওয়া যায় না। যে মানুষ  
গৌরব পায় সেট শুক হয়। তার আত্মজ্ঞান বড় সেই ত  
গৌরব পায়। যুরোপ বিভাগ কুগোল ইতিহাস প্রকৃতি  
লব্ধে বেশি বধর রেখেছে এ'লেই আত্মজ্ঞানের নিনে মানুষের  
শুক হয়েছে একথা সত্য নয়। তার আত্মজ্ঞান ব্রহ্ম, তার  
আত্মজ্ঞান ঐশ্বর্য; তার আত্মজ্ঞান কোনো বাধ্যকে  
মান্যত চাহ না, বৃত্তাক্ষেপ না। মানুষের যে বাসনা ক্ষুদ্র  
স্বার্থনিষ্ঠিত জন্তে, সেটাকে বড় ক'রে তুলে মানুষ বড়  
হ'ব না, ছোটই হ'বে তার; যে নৈন বাচ্যের জিতরে পানীর  
তড়া, তাতে পানীর মার্গকতা হয় না। কিন্তু জানের  
জন্তে আত্মজ্ঞান, প্রান্তিক নষ্টিকভাবে আবিষ্কার ক'রে  
একে মানুষের অধিকারে আনবার জন্তে আত্মজ্ঞান, যাতে  
মানুষ মরকে হয় ক'রে ফল পায়, যোগকে হয় করে  
সারা পায়, দুঃখকে হয় ক'রে নিজে পতিপথ অব্যাহত  
করে,—তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, তাতেই  
জন্মান হয় যে, মানুষের আগত আত্মা পশুভকক বিশ্বাস  
করে না; কোনো অত্যন্ত গুণে চরিত্রকেই সে অশুভ্রের

হাতের চরম মার মনে ক'রে মাগা পেতে নিতে অসম্মান যোগ  
করে; সে জানে যে তার গুণযোজন তার নিজেরই হাতে,  
তার অধিকার প্রভুত্বের অধিকার। যুরোপ এমন ক'রে আপন  
আত্মজ্ঞান পানী বড় ক'রে মেলতে পেয়েছে ব'লেই আজ  
পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শিকা দেবার অধিকার সে পেয়েছে।  
সেই শিকাকে আমরা যদি পৃথিবী বুলি শিকা, কতকগুলি  
বিষ শিকা ব'লে ক্ষুদ্র ক'রে বেশি তা'লে নিজেই বঞ্চিত  
করব। মনুষ্যত্বের শিকাটাট চরম শিকা, আর সমস্তই  
তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব চক্ষে আত্মজ্ঞান উদাণা;  
আত্মজ্ঞান গুণো অধাবার, মত মনুষ্যের চরিত্রতা।

যুরোপের লোকালয়ে যুরোপের মানুষ বিশৃঙ্খল আত্মজ্ঞানকে  
নিষতই নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে এবং চেষ্টা করছে, সেট  
দেখবার্থী মত উচ্চতর স্তরে গলে তাগের শিকা। তাদের  
বিভাগের শিকা এবং তাদের ভাবনের শিকা একেবারে পাশা-  
পাশি সংলগ্ন। এমন কি যে বিভাগ তা'বা শিকড়দের চার  
বেকে গ্রহণ করেছে সে বিভাগ তাদের আপন দেশেরই সাধনাব  
ধন, তার মধ্যে মনুষ্য জগতির অক্ষর নেই; তাগের আপন  
দেশের লোকের কঠিন তপস্যা আছে। এই কাননে  
শেখানকার ছাত্র শুধু যে কেবল শিকার বিষয়কে বড়ত্বের  
পাতার দেখতে আর গ্রহণ করছে তা নয়,—সীমাবদ্ধ  
কর্তৃত্ব, তার দাতৃত্ব, মনুষ্য চারিদিকেই দেখতে। এতট  
মানুষ আপনাকে চেনে এবং মানুষ হ'তে পেয়ে।

যে দেশে বিভাগের কেবল দেখতে পাট, ছাত্র মোটরকের  
পত্রপুট মেল হ'রে বিস্তার মুষ্টি তিকা করতে, কিবা পতাকার  
পালের দিকে তাকিয়ে টেকস্কট বইয়ের পাতার পাতার  
বিস্তার উচ্চতরিত নিযুক্ত; যে দেশে মানুষের বড়  
প্রয়োজনের সামগ্রী মাসেট শরের কাছে তিকা ক'রে সংগ্রহ  
করা হচ্ছে, নিজের হাতে দেশের লোকের দেশকে কিছুট  
বিভে না—না বাহা, না অন্ন, না জ্ঞান, না শক্তি; যে দেশে  
কর্ণের ক্ষেত্র সর্বাঙ্গ, কর্ণের চোটা গুলন, যে দেশে শিল্পকলায়  
মানুষ আপন গ্রাম মন আত্মব আনন্দকে নব নব রূপে  
সৃষ্টি করেছে না; যে দেশে মতাদের বস্ত্রের লক্ষ্যের  
জালে মানুষের মন এবং মনুষ্যত্ব বহুবিভক্ত; যে দেশে  
গ্রন্থ করা, বিচার করা, নতুন ক'রে চিন্তা করা, ও সেট চিন্তা





বাঁধাচোরে প্রয়োগ করা কেবল যে নেই তা নয় সেটা নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ, সেই ক্ষেত্রে মানুষ আপন সমাজে আত্মকে দেখতে পায় না, কেবল হাতের গাটকড়া, পায়ের বেঁধি এবং মুতঙ্গের আবক্ষমা-রাশিকেই চারদিকে দেখতে পায়, — শুধু বিদিকেই দেখে, কাগজ বিধাতাকে দেখে না ।

যদি মূলের দিকে তাকিয়ে দেখি তা হ'লে দেখব আমাদের যে দারিদ্র্য সে আত্মারই দারিদ্র্য । মানবাত্মারই অসমান চারিদিকে নানা মতাব নানা চরমরূপ ছড়িয়ে রয়েছে । নবী যখন ম'রে যায় তখন দেখতে পাই সন্ত এবং বাণি ; সেই পুণ্ডরীর সেই শুভতার অস্তিত্ব নিয়ে বিলাপ করবার কথা নেই, আসল বিলাপের কারণ নবীর মরণ দ্বারাঃ অজ্ঞান নিয়ে । আত্মার মরণ প্রথমে যখন শুধু তখনই আচারের নীচল নিষ্কলতা ।

স্বত্বিক যে সত্য বহন করতে সে সত্য মচল । সে নিরন্তর সত্যবাক্তির ভিতর দিতে বিকাশের নব নব পক্ষে ইঙ্গার মচল । তার কারণ, সত্য সত্যমকে প্রকাশের চরম । যেখানেই তাকে কোনো একটা দোমার বাধ বেঁধে চিরকালের মত বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয় সেইখানেই তাকে ব্যর্থ করা হয় । "মানবাত্মার দ্বারা নিরন্তর এই অগ্নীমের দিকে দাবিত চরম হ'লই কেবলই নব নব রূপে সৃষ্টি-বিকাশ করতে সে অগ্নির মচল । আত্মার পক্ষে "সত্যাবিকী জ্ঞানমল ক্রিয়া ১" ; জ্ঞানের পক্ষে মল্লের পক্ষে মিতা নৃতিরতাই তার সম্ভাব । বৎ মল্লারের বেঁধি হাতেপায়ে পরিহে দিয়ে তার এই ক্রিয়া বৎ ক'রে বেঁধেই তাকে তার সম্ভাব থেকে বিচূড় করা । এই নিষ্কলতাকে সৃষ্টি বলে না, এইটাই তার বহন ।

আত্মাকে দেখে কেবলি এই বাই তন্তে পাই, যা চলবে না সেইটাই প্রের, জ্ঞানের চেয়ে দুটাই বড় । এর আর-কোনো মানে নেই—এর মানে অত্যন্ত আচারের প্রতি, শুধু বাহ্যিক প্রতি আদ্য । সেই আত্মার প্রতি শুধু একমাত্রই চ'লে গিয়েছে, যে আত্মার পক্ষে "সত্যাবিকী জ্ঞানমল ক্রিয়া ১" । কিন্তু সত্য শিখা মানুষকে কি বগড়ে ? আত্মানঃ বিদ্বি । আত্মাকে জান । "নাগে হুমকি, কুটমব বিজ্ঞানাদিতবাঃ ।" অগ্নে হুম নেই, কুমাংকেই জান । এই আত্মাকে জানতে হ'লে, কুমাংকে জানতে হ'লে শৈতক

সকলটিকে বাজে বন্ধ ক'রে দিবাশিখা দিলে চলবে না । কেবলি চলতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে । উপহাস নিরন্তর সৃষ্টি ক'রেই আপনাকে জানেন, মানবাত্মাও কেবল তেমনি ক'রেই আপনাকে জানতে পারে—মৃত পিতামহের কাছে কিংবা স্মৃতি প্রতিবেদীর কাছে যার ক'রে নয়, তিকা ক'রে নয় ।

অতএব, প্রকৃত শিখা জ্ঞানমল্লের যে কলমে নিয়ে যাচ্ছে সে কলম কোথায় ? যেখানে এ উপদেশের সার্থকতা আছে—আত্মানঃ বিদ্বি, কুটমব বিজ্ঞানাদিতবাঃ । মানুষ যেখানে আত্মাকে জানে, মানুষ যেখানে হুমক্যকে পায় । অর্থাৎ মানুষ যেখানে সেই ত্যাগের শক্তি পায় যে ত্যাগের দ্বারা সে সৃষ্টি করে, যে শক্তির দ্বারা সে দুত্বকে অতিক্রম করে । কিন্তু আত্মকের মিলে তারতম্য বিজ্ঞানমল্লের এই যে মত-ভিদ্ধ-করা পোষার পাড়ি দিচ্ছে, মানুষের কোন কলম সে বেধতে পাচ্ছে কল ত ? দায়োদ্যাসিরি, কোশাগিরি, ভেপুজিরি । এইটুকু-মাত্র আত্মাকে নিয়ে এক বড় মল্লারের দায়নে এসে থাকিয়েছে, এর লক্ষ্যটা এস বড় মল্ল থেকে একবারে চ'লে গেছে । \*  
এরা বড় ক'রে চাইতেও শিখলো না ? অত দারিদ্র্যের লক্ষ্য নেই, কিন্তু আত্মাকার দারিদ্র্যের মত লক্ষ্যের কথা মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই । কেননা, অত দারিদ্র্য ব্যক্তির, এই আত্মাকার দারিদ্র্য আত্মার ।

এই ক্ষেত্রে আত্মা আত্মি তোমাদের এই কণাটুকু মলতে থাকিয়েছে—আত্মাকে বড় কর । শক্তি কারো বড়, কারো ছোট—কিন্তু আত্মাকে আত্মা ছোট করব না । আত্মাকে বড় করার মানেই আগ্রামকে অবজ্ঞা করা, হুমকে খেজাপূর্ণক গ্রহণ করা । এই হুমকে গোরবে বহন করবার অধিকারই মানুষের । আমাদের দ্বারা একটা কথা মল, বাসুদেবী তাবনা বৎ সিদ্ধিওরতি তাসুদে । এই সিদ্ধিটা কিসের ? অসু-বীরের নয়—এই সিদ্ধি হচ্ছে আপনাকে উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধি যা কলম আপনাকে প্রকাশ করে ।

আমাদের আত্মাকে শিশুকাল থেকেই কোমর বেঁধে আমরা বন্দী করি । অর্থাৎ সেটাকে কলম বাটাবার আসেই তাকে বাটা ক'রে বিট । অনেক সময়ে বড় বয়সে সঙ্গারের বড়তাপটের মধ্যে প'ড়ে আমাদের আত্মাকার পাখা ধীরে ধীরে যায়, তখন আমাদের বিবরবিদ্বি, অর্থাৎ ছোট বুদ্ধিটাই

বড় ক'রে ওঠে। কিন্তু আমাদের চুড়ামা এই যে, শিশুকালে থেকেই আমরা বড় রাগার চলবার পানের তার চালকা ক'রে দিই। নিজের বিভ্রাটেরে ছোট ছোট বাগবাদের মতোই সেটা আমি অগ্রহণ করি। প্রথমে তা বয়সের একতরফ বোধ হলে, কিন্তু ছেলেরা যেই বাড়ীগুলো দিয়ে পৌছায় আমরাই বিভ্রাটের সম্মুখে তাদের বিবরণিত্তি জেগে ওঠে। আমরা তারা চিন্তা ক'রে শিশুত্ব বসে। তখন থেকে তারা বলতে আরম্ভ করে, আমরা শিশু না, আমরা পাল করব। অর্থাৎ যে পথে বলাগন্তব কম জেনে বড়দূর সম্ভব বেশি মার্কী পাওয়া যায় আমরা সেই পথে চলব।

এই ত বৈশিষ্ট্য শিশুকালে থেকেই কান্না দেবার নৃতি অবলম্বন। যে জান আমাদের সমস্তের দিকে নিয়ে যায় মোক্ষা থেকেই সেই জানের সঙ্গে অপত্তা ব্যবহার। এর কি অভিপ্ৰাণ আমাদের মনের উপর লাগতে না? এই কতটুকু কি জানের বজ্র আমরা ভিকার তুলি গাতে বুঝে বাইরে বাসে নাই? আশিষের বড়বাবু ক'রেই কি আমাদের এই অগম্যমান পূর্ববৎ? আরেকের মনে যেমতের লোকেরা বুঝকেরা পূর্ণাঙ্গ যে বলতে যে, কবিতা যা ক'রে পেছনে তার উপরে আমাদের আর কিছুই ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই, এর মানে বুঝতে পেরেচ? এইটাই ঘটতে আমাদের কতক প্রবলিত্তি বিষয়েবীর অভিপ্ৰাণে। যে সমাজে কিছুই ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই, সমস্তই স্বাধীনতা। সে সমাজে কি নৃতিমান নৃতিমান মানুষের বাসেত বোগা? সে ত মোহাচ্ছিন্ন চাক বাধবার জায়গা। মন পনেরো বছর হ'রে শিকা লাভ ক'রে আপন চিত্তপন্থির পক্ষে এমন অদ্বুত অপমানকর কথা অগ্র কোনো যেনে এতগুলো লোক এত বড় নির্লজ্জ অজ্ঞানের সঙ্গে বলতে পারে নি। সুকল বড় যেনে যে বড় আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আপন নৃতিতে আপন ভাবনার আশর হাতে সৃষ্টি করবারই সৌন্দর্য দান করে, আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে কেবল যে বিসর্জন করছি তা নয়, বল যেনে লোক জেগে বিসর্জনের চাক পিঠিয়ে সেই তালে তান্ডব নৃত্য করছি।

কিন্তু আপন হৃদয় নিয়ে পূর্ব জোরে অজ্ঞান করলেই যে সেই হৃদয়টির বিবরণে এই আশা যেন না করি।

আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করব, সাধনাকে সত্য করব, কেবল অজ্ঞানত্বকেই বড় ক'রে তুলব এর সাধনাকে তেমনি কান্না থেকেই যেমন কান্না, শিকা এক্ষেত্রে শত্রীকার মার্কী পেরে নিজেই বিধান মনে করা। যেখানে বল দেয়া যায় সেখানে চেয়ে বেশি, ভিত্তি পেদুয়, চাকরী করলুম, টাকা চ'ল,—কিন্তু জানের দ্বন্দ্ব জানের ক্ষেত্রে শোণ করতে পারলুম না, সেখানে সমস্ত বিশ্বের কাছে মাথা টেট ক'রে রইলুম।

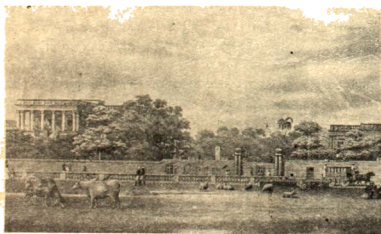
তোমাদের আমি দূর থেকে উপদেশ দিতে আসি নি। বয়সের এতদিনকার যে সৃষ্টিভূত লক্ষ্য, যে লক্ষ্যকে আমরা অজ্ঞানের শিশু ক'রে গোঁব ব'লে চালানতে চেষ্টা করছি সেইটের স্বপ্নপরিচয় বুঝিয়ে তোমাদের কাছে উদ্ঘাটিত ক'রে দেখাতে চাই। তোমাদের বয়স কাঁচা, তোমাদের বয়স তাজা, তোমাদের উপর এই লক্ষ্য দূর করবার তার। তোমরা কান্না দিয়ে না এবং কান্নাতে তুলবে না, তোমরা আকাঙ্ক্ষাকে বড় করবে, সাধনাকে সত্য করবে। তোমরা যদি উপরের দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে প্রবৃত্ত হও তা হ'লে সকল বড় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বড় হয়েচে আমরাও সেই ব্রত নেব। কোন ব্রত? মানব্রত।

যখন না দিতে পারি তখন কেবল হয় ত ভিত্তা পাঠ, যখন দিতে পারি তখন আপনাকে পাঠ। যখন দিতে পারব তখন সমস্ত পৃথিবী আপন বাড়ির এসে বলবে, “এম, এম, বোস!” তখন জোড়াসাঁক ক'রে এক কথা কাউকে বলতে হবে না, “আমাকে মেয়ে না, আমাকে বাড়ির রাখ।” তখন সমস্ত মানুষ আপন পরজাতি মাথা হ'তে আমাদের বাচাবে। তখন নিজের দাবীর জোনে সকল অধিকার গ্রহণ করব, পরের ক্রপার জোরে নয়। এখন আমরা ভয়ে ভয়ে কান্না, মানবদায়কে আমরা বড় আসন চাইনে, কোনমতে নিজের মাথা গুঁজে রাখবার একটুকু কোণ চাই মাত্র। না, এমন ছোট ভিত্তি মনেও স্থান দিতে নেই, এমন ছোট গ্রাণনা যুগেও উচ্চারণ করতে নেই। কুটুম্ব হৃদয় নাহে হৃদয়মতি। সেই কুটুম্বকে যদি অজ্ঞান তুলি এবং বাড়ির লক্ষ্য না করি তা হ'লে অগ্র যে কোন হৃদয় সুবিধা আমরা চেয়ে ছিলাম বোঝা করিনে কেন, তাতে আমাদের বেপারের দর্শনাঙ্গ হবে।

# বিচিত্রা-



চৌহদ্দি হোড়  
~~কোমল~~

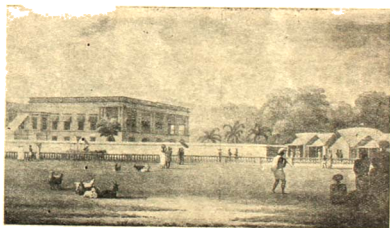
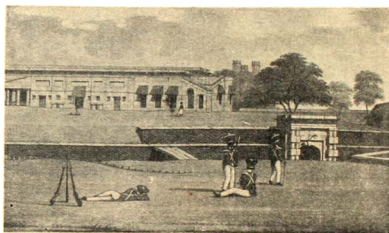


ঐক্য হাটের পো  
হাটের পো

চৌহদ্দি হোড়

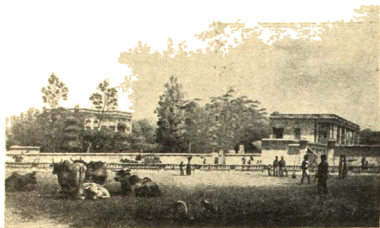
# চিত্রশালা

পুরাতন কলিকাতা

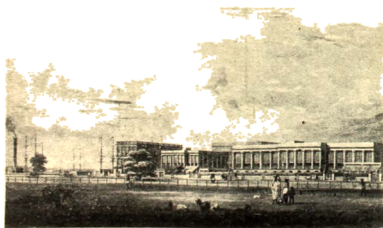


চৌরঙ্গি রোড

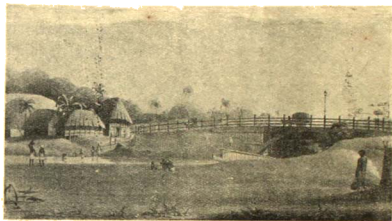
৮২১



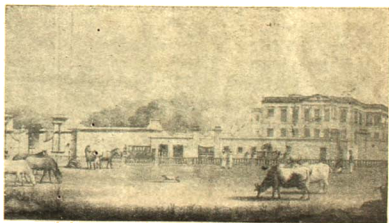
বিক্র. ফিল্ড



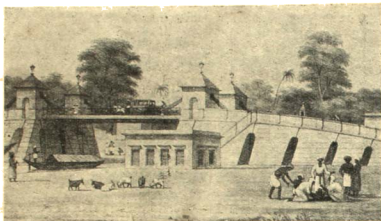
চামশাল বাড়ি



আলিপুর ব্রিজ



সদরদেওয়ানি আদালতের প্রবেশ পথ—চৌধুরি রোড্



ସିବିତପୁର ଗ୍ରାମ,



ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିର ଗୃହ—ପାର୍କ ଟାଉନ୍

ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଓ ଏହାରେ ଅନେକ ଗୃହ ଓ ଗୋଷ୍ଠି ଥାଏ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠି ଥାଏ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠି ଥାଏ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠି ଥାଏ ।



—শ্রী অমরনাথের দ্বায়

১৭

আবহতাভিনয়ের মুখে ছাটী দিয়ে আজ আমার সোনার  
হৃদয় উঠছে, দর্শনিক সোনা হ'য়ে গেছে।

কিছুদিন থেকে এমন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিদিন  
আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছে, এমন একটা পাতাতিক  
miracle। আকাশ উজ্জল নৌা, পৃথিবী উজ্জল প্রায়, পাছেবা  
এখনো পাতা কিয়ে পার নি, কিন্তু ফুলের ভাগে ভেঙে  
পড়ছে, মেত্রে ফুলের রঙের বাহাব দেখে মনে হয় যেন  
ফুলের আয়নাও হৃদয়ের আলোর সব কাঁটি রঙ, বিস্তারিত  
হয়েছে। শাখীরাও বলন্তের লগে দক্ষিণ মেশ থেকে ভিন্নল,  
তাদের নভব আর বামেই না।

এমনি miracle-এর উপর আদ্য রেখে আমরা মাকে  
মাকে লগুন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে চোখ যায়  
সেইদিকে চরণ যায়, আহার নিদ্রার তাবনাটা একাধম  
দটিকার আগে হাজার হর না, এবং তাবনা যদি বা চাঞ্জির  
হর আহার নিদ্রাকে হাকির করানো দেও এক প্রাতাতিক  
miracle। "যোটেই উপর একটা কিছু হ'য়ে ওঠেই ওঠে।"

অথচ ঐটুকু অস্বাভাব্যের তলে ভাল কাটতেও পারি নে।  
এত বড় উৎসবসভার পান শামনি ব'লে খুঁৎ খুঁৎ করলে  
কোন বৈশিষ্ট্য? একমলে এতগুলো মানুষ মিলে অক্রমণ  
করেছে—রঙ, রূপ, পান। সৌন্দর্যের বাণ সজ্জা গিঁথে  
পরশবা চটনা করল। মুখ দুটে ধস্তাবাদ জানাবার তাবা

নেই, এত অগাধ। স্বপ্নের মতো দেখমন লুটিয়ে পড়ে।  
পরম্পরকে অকারণে ভালবাসি, অপ্রতিভকে চাহোনা  
বন্ধুর মতো বুকে টানি। কুরাণের মতো স্পষ্ট উদাহরণ  
গেছে, কেবল! আকাশবাণী আলোর মতো চন্দ্রবাণী  
প্রভার বিপলে হৃদয়ের মতো নির্দোষ চক্রে মতো ভাগরক।  
অগন্তের পূর্ণতা ভীষনের অপূর্ণতাকে সত্ত্বের কোণে স্পষ্টের  
(spongy) মতো ওতপ্রোত করেছে। দল আমরা—  
সৌন্দর্যস্বপ্নের কোটি তরঙ্গাভাস সটতে গীতে আমরা  
আছি, আমাদের প্রবেশলি আনন্দলাভের বাঁজিভঙ্গ।  
অভাব? এমন দিনে অভাবের নাম কে মুখে আনবে?  
আমাদের একমাত্র অভাব—বাণীর অভাব, কৃতি জানাবার  
বাণীর। আসিদ্ধ মানবেরই মতো অসিদ্ধ মানবও বাণীর  
কাতিল থেকে বাবে, কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণীর। সেট  
কতই তো মানুষের মধ্যে কবি লকলের বড়—কবিও চেষ্টেও,  
বীরও চেষ্টেও, বাবস্থাপকের চেষ্টেও, কৃষা-নিবাহকের চেষ্টেও,  
লক্ষ্য-নিবাহকের চেষ্টেও। কবিকে বাদ দিলে মানুষের  
শরীর মানুষ বোবা, কবিকে কাড়ে গায়ে তার কথা  
যার নিয়ে মানুষের মান থাকে। নইলে কবি থেকে কৃষা-  
নিবাহক পর্যন্ত কেউ একটা পাখীর সম্মানও পেতেন না।

পরংকালে লোকলের রাজারা দিবিজরে যেতেন,  
বলন্তকালে একালের আহারও দিবিজরে বাট। আমরা  
যাই কোন দিকে কোন আপনার লোক অভ্যন্তর মতো





শুনে কি এদেশ কোনে বিন উঠবে! সার্বিকতার দিকনেত্র  
কি কখনো এর লগাটে জলবে? এ যে সব পর্যবেক্ষণ করে,  
কিছুই দেখে না, সব জ্ঞাত হয়, কিছুই জানে না, সব  
যেতে, কিছুই উপলব্ধি করে না। এর জীবন যেন জীবন  
বাণী ছেলেসাহাবি। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কুচি  
বছর বয়স পর্যন্ত লাটুর সঙ্গে লাটুর মতোই ঘুরছে!

প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী হচ্ছে, মানুষ তখন তার নাম  
সেখবার মত কাজ কর্তৃ ফেল রাখে; এই ক্ষেত্রে আমাদের  
বায়োসোপে তেরো পার্কণ। ইংলণ্ডেও নাকি এককালে  
মাগে মাসে বোল চূর্ণোৎসব ছিল, কিন্তু তে তি দিল্লী:  
পতা:। এখন প্রতিরাত্র পার্কণ চলে নাচকের ও সিনে-  
মার, প্রতিদিন খেলায় মাঠে। কত দিন বা ষ্টেটার এখন  
নামরক্ষার পর্যায়সিত। তারতম্যের লোকের কাছে এট  
সিমেবে ইংলণ্ড অত্যন্ত নিরানন্দ দেশ। এ দেশে প্রকৃতির  
সঙ্গে মানুষের লম্বা পুজোর সঙ্গে পূজারীর লম্বা থেকে কখন  
নেমে এসে পিকারের সঙ্গে পিকারীর লম্বাও ঠিকিয়েছে।  
এখনকার আমোদ প্রমোদগুলো যেন মুড়ে দিতে শরীর সূত  
মেহের উপভোগ্যবাণী করা। এমন আয়োদের পিরায়  
পিরায় ভয়, সূক্ষ্মতার দারিদ্র্যভর ব্যাবিভর। প্রকৃতির  
প্রতিশোধগুলোর নামে মানুষ বিপর্যয় হয়ে যায়। প্রকৃতি যে  
কত রকমে প্রতিশোধ নিতে লাগছে কয়েকটি হিসাব হয় না।  
একটা মন প্রতিশোধ হচ্ছে বৃদ্ধ। আধুনিক কালে আমরা  
সবিকাগেই কটন যেবে ইয়ুলে পড়ি, আগিলে কাজ  
করি, খেলতে বাই ও তামাশা দেখি। প্রত্যেক দেশেই  
এখন হাজার হাজার ইয়ুল কলেজ, লাগে লাগে আগিল  
কারখানা সংখ্যাজীত সিনেমা নাচের। প্রত্যেকটি মানুষ  
এর পরকাতী নয় কেরকাতী বুয়োক্রাফ্ট—সুতকাতা ডাক-  
কের সেহে কোচাণী থেকে Lyonsএর চায়ের দোকান-  
গুলোর কর্ণগারিণী পর্যন্ত কেউ যাব ব্যর্থনি। এই কোটি  
কোটি যৌযাছির চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে একই অভিনেতা  
অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয়  
ক'রে বনি। তিনশোবার বাগালে একখানা প্রামাণ্যকোনে  
সেকাডেও ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু বস্ত্র প্রথের দল।

এর পরিণাম বীকন বিরক্তি। দুটির দিন সত্তা টিকিট

কিনে হেঁনে বোকাট ক'রে একটি ঘানের পাশাপাশি  
হোটলে যখন হাজার হাজার জন অত্যাগত টমাস কুকের  
ডাক্তারী সূত্রে পরিচালিত হুণ্ড ও charabancএর গিঠে  
চ'ড়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কর্তৃ যান তখন অতঃপ্রকৃতি ও  
বহিঃপ্রকৃতি হুঁজনেই “প্রাচি” “প্রাচি” ক'রে ওঠেন। গাধা  
ফলন, “কটনের চাত থেকে আমাদের রক্ষা করো,  
মানচিত্রের চাত থেকে, এট্রিয়েটের চাত থেকে।” তখন  
এখন কোথাও যাবার ক্ষেত্রে মানুষ চটুফটু করে যেখানে  
টমাস কুক নেই, শাকা শক্ত নেই, শোবার ঘরগুলো  
মোটর কোচ নেই—এক কথার আমাদের শিত্তবিক্রিত  
পত্ন-অলঙ্কৃত লসবাজ্জবাসুত ক্রাণ্টের আগম নেই। সমস্ত  
পৃথিবীটা যেমন বটন: বটন: একই রকম হ'রে উঠছে, বেখে  
মনে হয় টমাস কুক গ্রামে গ্রামে যোঝান পুলবে, কাউকে  
আগ ভাতে ক'রে বেতিসাবীভাবে অজানি পথে বিবাহী হ'তে  
দেবে না। তখন মানুষের একমাত্র মাথা ভরবার হল  
কবে সূক্ষ্মক, সত্যিকারের দুটি শাওরা যাবে ঠিক নেই-  
যানাই, সেখানকার কিছুই আগে থেকে কোন রাখা যাবে  
না, প্রতি পলকেই অকস্মাতেও সঙ্গে দেখা।

সত মহাবুদ্ধি যে ক্ষতি হচ্ছে তাইই পূর্বের কতে  
প্রকৃতি অপেক্ষা করছে, তাই এখনো আমরা বুকের নামে  
মিড, কাউচি, মেয়ের আগামো পার্লামেন্টটাকে Parlia-  
ment of Peacemakers ক'রবার ক্ষেত্রে চেষ্টা করছে।  
কিন্তু যে শিত্তরা গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হ'রে বাড়ছে,  
যাদের কল্পনাকে খোঁজাক যোবার ক্ষেত্রে ভালোকে তুলোকে  
একটিও অপরিচিত প্রায় একটাও অপরিচিত স্থান নেই,  
সেই সব বাস্তববাদী যখন বড় হ'রে বলে বলে পরকাতী বে-  
পরকাতী বুয়োক্রেশীর অস্তিত্ব হ'রে কটিন্দা নামনে রেখে  
কাজ করবে তখন তাদের প্রত্যেকের চোখের সূত্রেই না হয়  
কুলিয়ে রাখা গেল “There is no fun like work” এবং  
শোভাগ্রন্থের দ্বারা তাদের কর্মকাল না হয় ক'রে বেগা  
ফেল বিবে পাচ বকী, তবু তাতা সেই সোনার খাঁচা থেকে  
উড়ে গিয়ে মস্ত চাইবে না কি? অন্তর্য কৌ সন্মত  
হওয়ার পরিণাম চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে, প্রকৃতি  
কোনো সন্মতকেই টিকতে দেয়নি,—না বোধ সন্মত, না

ঊর্ধ্বান সম্বন্ধে। এবং অস্ত্রবস্ত্রের অন্ত্রে যে নতুন লজ্জাটা প্রতি  
দেখেরই নানা নাম নিয়ে শশীকণার মতো বাড়ছে সেও প্রাণিক  
হয়। এবং অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু তার পরেও উপলব্ধি  
আছে। এবং সে উপলব্ধির ভেতর দৃষ্টিভঙ্গি নয়।

প্রকৃতির প্রতি ইংরেজের দৃষ্টি এখনো গোপন।  
গভীর দৃষ্টিভঙ্গির নাতি ন্যূনতম এখনো দেখতে পাওয়া  
যায়। স্বাভাবিকভাবে গাছ কটবার ক্ষেত্রে সমিতি হয়েছে,  
উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপাঙ্গ (Garden Suburb)  
যদিও হচ্ছে, শহরী সৌন্দর্য অল্প রাখবার আশঙ্কায় তো  
কবে থেকে চলে আসছে, কিন্তু রেলপাড়ার ওয়াশিংটন  
টেনিস-মেডা পরীক্ষার মতো বাকি। \* চ'পাচরন  
অসমাপ্তিক বস্তুহীন শহরী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে দেশের  
নব সভ্যতাকে আবারও করতে পারে, কিন্তু চাটের কোলা-  
চলে তাঁদের কষ্টের বড়ই ফল। পলিটিসিয়ানদের কাছে  
তাঁরা জামাল পান না, কেননা পলিটিসিয়ানরা চর বড়  
বড় কল কারখানা ওয়াশিংটনের ভাবেই নয়, কল কারখানার  
প্রতিকৃতির সন্ধানে। চই দেশের দাবী আরো অধিক-  
সাংখ্যিক কলকারখানা পাকা লড়ক নতুন বাড়ী ইত্যাদির  
মতে জড়িত। বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য এরা  
বা চাটের কাছে পাচ্ছে তাই কৃতে উদ্ভাবন, দশ বছর  
পরে তার কল দেশের চোরাচাটী কেননা হবে তা ভাবতে  
পেলে ভোট পাওয়া যায় না, সুবিধের ফুলাও বাড়তে  
যাবে। এমনই তো দেশটাতে যদি বসে আছে রাজ্য  
তার বৈশি, রাজ্য বসে আছে বাড়ী তার বহুতল; আরো  
দশ বছর পরে দেখা যাবে যে দারী ইংলণ্ডটা একটা। বিরাট  
শহর, এবং এই শহরের লোক নিজেদের বাড়ি নিজেরা  
একেবারেই উপাধীন করে না। বলা বাহুল্য সোভিয়েট  
শহুরে শ্রমিকদের ভোটের উপর নির্ভর করে; গ্রাম কৃষকদের  
জন্য তাদের মাথাবালা নেই। কৃষকদের ভোট পাবার

ক্ষেত্রে অজান্তেই এক-একটা কৃষি-পলিমা আছে বটে,  
কিন্তু পলিটিসিয়ান জাতীয় গ্রামিকের কাছে বৃহৎসিদ্ধা  
প্রতিষ্ঠা করা দূর, তারা তৃষ্ণিত মতো হঠাৎ অ'লে হঠাৎ  
নেবে, তাদের ভাবনা বড় ছোট বড় পাঠকে। সমগ্র  
দেশের নব সভ্যতার আবারও তারা তাদের কাল ও নর  
তাদের সাজেও না। তাদের একদল আরেকদলের ক্ষেত্রে  
বদলার আধায়া রেখে যেতেই জানে, সমগ্র জাতিটার চলা  
চালনা তাদের অতি দৃষ্ট মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না।

এখনকার ইংলণ্ডকে দেখে চমকিত হবার কারণ আছে।  
সে কারণ এমন নয় যে ইংলণ্ডের নৌবহরকে আমেরিকার  
নৌবহর ছাড়িয়ে উঠছে, ইংলণ্ডের উপনিবেশের পর হ'য়ে  
যাচ্ছে, ইংলণ্ডের অধীন দেশগুলি স্বাধীন হ'য়ে উঠছে,  
ইংলণ্ডের অস্তিত্ববাদে তার বন্যুষ্টি বাধা পাচ্ছে। আসলে  
সাম্রাজ্যের ক্ষয় ইংলণ্ড কোনদিন করার করেনি, যেমন  
ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে চিত্তবিন্দন দাঁপ কোনো দিন করার করেননি।  
ইংলণ্ড একবারেই অর্জন করেছে অজান্তে উড়িয়ে দিয়েছে,  
একদিন যাদের জৌতবাস করেছে অর্জন তাদের মুক্ত  
ক'রে দিয়েছে, যেদিন আমেরিকা হারিয়েছে সেইদিন  
তারতমর্ষ পেয়েছে। পুঙ্খবত ভাগ্য। আবিষ্কারিক  
শাস্ত্রের কথা ইংলণ্ড এতদিন তাইনি, এইবার তাইতে  
মুক্ত করেছে যেখানে মনে হয় এবার আর তার সেই পুরাতন  
অস্ত্রমন্ত্রতা নেই, এবার সে অক্ষয়ের মতো নিজের  
অক্ষমতার কথাই ভাবছে। বাণ্যার এই যে ইতিমধ্যে  
কবে একদিন—উদাহরণ নতুনক'তেই যাবে হয়—ইংলণ্ডের  
আস্থা অক্ষিত হয়েছে কিংবা দাবিদূত হয়েছে। দেকস্-  
শীয়ার থেকে ডাউনি: পর্যন্ত এসে সে ভাঙ হ'য়ে পড়ল।  
যে ইংরেজের গ্রাম ছিল adventure বিপদব্রত, সে এখন  
মহ নিয়মে, "Safety first"। বা-কিন্তু এক কালে অর্জন  
করেছে তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ করতে চায়। কিন্তু  
সংসারের নিয়ম এই যে, বীজছাড়া অস্ত্র কেউ বহুতলকে  
ভোগ করতে পারবে না, অর্থাৎ অর্জন করা ও ভোগ করা  
একসঙ্গে চলা চাই। বস্তুত অর্জন করাটাই ভোগ করা।  
অজিত বনকে হ'য়ে ব'লে ভোগ করা হচ্ছে সংসারের আইনে  
চুরি করা। এ আগন্তকে সংসার কিছুতেই প্রায় দেবে

\* একটি সমিতির সেক্রেটারী লিখেছেন, "আমনি কি জানেন যে  
জার্মানের বন্যুষ্টি এক একে গোপন পেতে থাকে? তাদের  
বাঁচিয়ে গ্রামের ক্ষেত্রে এই সমিতির এলাকা ও উপায় উদ্যোগ আমনি  
বোধ দেবেন?"

না। আর might নাই তার right তাহা যদি হ'বে যেতে,  
যার ইচ্ছা করবার ক্ষমতা নাই সে যেতে পাবে না।

কিছুকাল থেকে আধিতৌতিক ঐক্যের উপরে মন  
দেওয়া ছাড়া ইংলণ্ডের গতানুগতিক থাকেনি, কেননা মন দেবার  
মতো আধ্যাত্মিক ঐক্যের তার কণ্ঠ নগ্নে পড়ে। এখন  
আধিতৌতিক ঐক্যের বাহু-দ্বার দেখে তার মেজাজ বিগুড়ে  
থাকে। ধনকে যে মানুষ পরম কামা মনে ক'রে কোটিপতি  
হলো, সে এখন দেখে যে আরেকজন কেমন করে দ্বি-কোটি-  
পতি হয়েছে তখন সে চোখে আঁধার দেখে, তার পা টপ্পে  
থাকে। ভক্তলোকের ছেলে এখন ইতার লোকের ছেলের  
সঙ্গে কথা কটাকটি করতে আর ও একটা অস্বাভাবিকতা বলতে  
সিধে মশটি ভুলে আসে, তখন তার যে অবস্থা হয় ইংলণ্ডের  
অনেকটা সেই অবস্থা। বনকলকে সে সকলের থেকে  
শ্রেয় মনে করেছিল, আজ বনকলে সে এখন  
থাকতে পারছে না, আর্মোরকা তার চেয়ে বড় "power"  
হ'বে "অগ্নি প্রসিদ্ধি করেছে আপন"। ইংলণ্ডের এই  
অপমান এখনো তার মণ্ডে বেঁধে নি, কিন্তু চাক্ষুস বিগুড়ে।

যে একটু "inferiority complex" ও তার মধ্যে লক্ষ্য  
করছি। ভাবতর্কের মতো দেও বলতে আরম্ভ করেছে,  
"আমি বড় সতীষ, আমি গোবেচারা", কিন্তু সংসারের  
আইনে পরীষ হওয়া হচ্ছে কাদির আসামী হওয়া। তার  
আধ্যাত্মিক ঐক্যের ঘনি হ'বে হবে, নয় আধিতৌতিক ঐক্যের  
ঘনি হ'বে হবে, অস্তিত্বের সূচী দেবার গুণ ঘনি না হ'লে  
হলে না। ইংলণ্ডের যদি আবার আধ্যাত্মিক ঐক্যের  
তবেই তার এই "inferiority complex" দূরী হ'বে না।  
ইংলণ্ডের আত্মা তার একটা "Renaissance"—নবকল-ব-  
ধারণ। বনশাস্তির গুণে তার বলা ফাঁদ বনকল  
করছে। না সারিতো না রাসনোচিত না বাণিজ্যে না  
রসনোচিত কোনো দিকেই একটা মহামানবের সাক্ষ্য পাওয়া  
থাকে না। এত বড় একটা মহাপ্রভু গেল, কিন্তু তার থেকে  
পাওয়া আত্মিক অস্তিত্বতা নিয়ে না দেখা দিল মহাকাব্য,  
না মহা-উপজ্ঞান। সেইজন্য ইংলণ্ডের এই দারিদ্র্যপীড়িত  
আবস্থাওয়ার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

## পাহাড় পথে

### ঐক্যবাদজিৎ মুখোপাধ্যায়

পথ চলছে অঁকা বাঁকা  
কোনখানে সে কোনখানে,  
কোন সে গুলুর কেউ-না-জানা  
মোশন পুরীর সন্ধানে!  
বিরামহারা-কি-মান-পাওয়া  
পাইন বনের বুক খেয়ে,  
বাস্ ফুলের হুক-হুক  
ভাসির ঘোলাঘ ঘোলা ঘেয়ে,  
দেউতি ফুলের গছ ঘেঁষে,  
বনের বনের মাঝখানে  
অগস্ত্যের মাথার চ'ড়ে  
পথ চলছে কোন বানে!

ওই লুকাল বাংকের পথে,  
শের বৃষ্টি তার ওই বানে!  
এই রয়েছে, ভবনিত শের,  
চলেছে দিক এক টানে!  
ওই উপরে ওই দেখা যায়  
উঁচু পাহাড় বেঁধে দিয়ে,  
আবার কোথায় আড়াল হ'ল  
দেখতে হবে বেঁধে নিয়ে।  
অভিমানে ভারিবে যাওয়া,  
কিরিয়ে পাওয়ার সম্ভ্রান্ত  
নিভা খেল লুকোচুরী—  
পাহাড় পথের এই নীতি।



ওই পোন, ওই বক্টা বাজে,  
 একটু গাড়াও পান দিয়ে,  
 পাচড়ীয়া কাসেছে নেমে  
 ঘোড়ার পিঠে বোত্‌ নিয়ে ।  
 তিক্ত সরেছে—এগিরে চল,  
 পাচড়ী গাও ওই পুর !  
 পান দিয়ে পথ খাড়া চড়াই  
 বাউড়ী-করা জল ফুরে ।  
 ওই ক'খানা কাতের বাড়ী  
 স্নেহ পাথরে ছাপ খাটা,  
 চাপু পাচড়ি গায় সাভান  
 মতি-স্নেহে ওই গাঢ়কটা,  
 পাচড়ি বুকে  
 ঘুম-ভাঙান কোন বাণী  
 নামনে ঠান্ডা ওই বেণা বার  
 পাচড়ীঘের গ্রামখানি !  
 ওর'ত চোখা জাশির বনে  
 জালিম-ফুলি কা'র হাসি  
 লাগবে চখে, পর ছাড়া মন  
 উঠবে হুখে উঠাশি ।  
 আড়ু ব'তলে কোন বিলসী  
 গাশীর গুরে ভাক দিয়ে  
 ওর'ত সেখা পান পানিয়ে  
 হারা প্রিয়ার পোত নিয়ে !  
 বিষম চড়াই ! সাফল্য চল  
 খাড়া পাচড়ি ভাল খেলে  
 জান দিকে ওই বন্দ নেমেছে  
 গভীর অন্তঃ কোন বেগে !  
 ওর'ত হবে হাজার ফিট ও  
 কিবা হবে বেড় হাজার,

বাংলা বেনের পাটাপাটর  
 শুকনপাই নিন পে তার ।  
 বিস্ত্র বেণো সেই অতলে  
 জল চলেছে খড়্‌ খেয়ে,  
 লব্ধ বনের বুকের উপর  
 রূপার মাগার রূপ ছেয়ে !  
 এগিরে গড় ! ওই পোন ভাক !  
 একটু গাড়াও চূপ ক'রে ;  
 জকের বারা কয়েছে কোণাঠ !  
 উঠতে হ'ল পথ ধরে ।  
 গ্রাম্য বড় নর প্রবিধা,  
 একটু চল দাবখানে—  
 প্রেমের পথে অনেক বাধা  
 তাই ব'লে কি কেউ মানে !  
 ওই ছুটেছে পাহাড়-করা  
 মত্ত হারার বোড়-পোহার,  
 মুক্ত-চুড়া মহাধেবের  
 জটার ঘেন গজাধার !  
 বিদ্যুৎবিদ্যেকর নাইক বেধাল,  
 গতির বেগে সব বাধা  
 পথ ছেড়ে দেয়, মরু-ভারা  
 হুজিবাণী তা'র সাধা !  
 ত্রিকূটে পড়ে রোদের আলো  
 ইজবহর রূপ হারি,  
 কাপড়ে গিরি, ঘলের ঘোঁষা  
 উঠছে হাওয়ার বুক তারি ।  
 পান দিয়ে তা'র পাহাড়ী পথ  
 চলেছে ওই কোনখানে,  
 চিরকালের কেউ-না-জান  
 কোন স্রুয়ের লঙ্ঘনে !

# কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন

## শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

আমরা প্রায় দশবৎসর চটল কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন পবলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি যে 'দত্তা বিশ্বজ্ঞানের পবিত্র দর্শন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা আমরা মূল্যায়ন করিতে বসিয়াছি। তাঁর আত্ম জীবন কাব্যগোচরায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।



কবি দেবেন্দ্রনাথ

ব্রহ্মসমাজের যুগে তাঁহার সমসাময়িক যে কয়েক প্রতিনিধিত্ব কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার প্রভাব একাইয়া বঙ্গসাহিত্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। বিবেকানন্দ, অক্ষয়কুমার, কীরোরপ্রসাদ ও অদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মসমাজের

অগ্রদূতের পটিকা আশ্রয়দেয় স্বাক্ষর রাখেন নাই। ফলে আমাদের কাব্য ও নাট্যসাহিত্য ইত্যাদির অল্পাংশেই অপরূপ শোভা, সম্পদ ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। উপভাস ও পরলোভিতাদেশও এই কথা লতা। নামোন্মেষের বোধকরি প্রয়োজন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছাযুক্তই আসরে গান গাতিয়াছেন। সে গানের সুর ভাব ও চিন্তার যুব টু পক্ষের ন্যায় পৌড়িলেও তাহা যেমন মিষ্ট তেমনই পবিত্র।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসমাজ অলংকা চাই কি তিনি বঙ্গবোধ বড় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ স্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল। ব্রহ্মসমাজ তাঁহার 'দোদার তরী' দেবেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার 'গোলাপ-গুচ্ছ' ব্রহ্মসমাজকে ও তাঁহার 'অশোকগুচ্ছ' ব্রহ্মসমাজের নামে উৎসর্গ করেন। এই 'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই আমরা তাঁহার কাব্যগোচরায় অধিষ্ঠা করিব।

কবির যৌবনে রচিত প্রথম কবিতাগুণি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রক্রেম এটখানারই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, দেবেন্দ্রনাথের প্রথম নিদর্শন। এই পুস্তকখানিই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। কবি দ্বিতীয়মোহিনী স্বপন এই বইখানির নাম 'অশোকগুচ্ছ' রাখিলেন তখন কবি একটি মনোমত নাম পাইয়া পুলকিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই দশে ভরও হইল বৃত্তি বা ইচ্ছা সার্থক হইবে না। এই 'ভাবটি অশোকগুচ্ছের প্রথম কবিতাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

অশোকগুচ্ছ ? কই না, ইচ্ছাও কোথা

নব যশেরে কটি চিত্রন পথ।

বহির সীমার-পোতা শিশুরের মত

আকাঙ্ক্ষায়-কই গভীরগভীর।



## ঐতিহ্যবাহী গুণ

কোথায় দিল্লীর পাহা — সপহার বন ।  
 আনিব, কুমুম কোথা, গোপিনী-বাগিচা ।  
 কোথায় সুবীৰ কষ্ট আরক্ত বন ।  
 কোথায় সন্ধ্যার বেগ লোহিতে বজিত ।  
 কোথায় বা তাকে হাসা কস্তুর মোচন ।  
 কোথা পরিচয় পথ অলক্ষ্যমিত ।  
 মল্লন বদর কোথা অংগের কোণ  
 ত্রীড়ার বিক্ষেপে ঘরি মৃত্যুত লোহিত ।  
 সবসেধি কিছু কিছু চারুতা আরণি  
 ঘরি হৃদয় অশ্রুত পাত ও তরঙ্গ,  
 তক্ষে তক্ষে তরঙ্গের কবিতা উৎসল  
 হাজিতে অশোক ফুল, ঘরি কি বাঘুরি ।

প্রাণের পলাক কিংবা মোহন্যে মধুর  
 উত্তরিয়ে অংগেরে পড়ে হাসি তলি ।  
 সে কাহিনী তুমি আমি যেতি এবে তলি ।  
 এ কি হাসি । এ যে পশু আকুলি শব্দলি ।

আবার উক্ত দালি কবির প্রাণে কিতাপ ভাবের গভীর  
 কুণিয়াছে তাহারে একটু পরিচয় দেওয়া পরকার :

দুর্গিনী তাহিলের ভূতাবলম্ব  
 হাজি যেন উত্তরায় কখন তিহিলি,  
 লবের বৃত্ত বৃত্ত হাসি উদার  
 হাজি যেন উত্তরায় মূৰে শিখিলি ।

উপরে যে কবিতা ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা চাইহেই  
 মেমেন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দের গাঢ়তা এবং চিত্রাঙ্কনী  
 প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার ভাব  
 তরঙ্গ-ও ছন্দ সঙ্গত সুমধুর ও স্বচ্ছন্দগতি ; একটীমাত্র  
 ভাবের বাহ্যন্যায় চিত্রের পর চিত্র, উপহার পর উপহার  
 দিতে তিনি যোষ্যক অধিষ্ঠার। ভাবের মধ্যে কোথাও  
 ঘোঁরাটে বা আবছাতা ভাব নাই, এবং এই ভাবের  
 মাধুর্য ও ছন্দের সঙ্গীত প্রত্যেক সুরত অপ্রতিহত। কবি  
 যেন সৌন্দর্যের পদাধি পুণিয়া করেন। সেবার 'কল্পিত'ে  
 কোহিলুয়ে আলো যে উদিল পড়ে, ছড়াছড়ি ঠিকনীলে হারার  
 সূত্রায়।' আরও ইএকটি উদাহরণ দিবার মোত সংবরণ  
 করিতে পারিলাম না। একটি সনেটে কবি 'সুহতার হাজি'  
 এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন :

যে ভপলা, নিশিগমে কোন নরনারে,  
 কোন পদমর পুরে, কোন আশাধাঘ,  
 চরণে নুপুর যেন, অংগে মাংসার,  
 বহিরা সে কপলুবি আটকে ছোয়ার ?  
 নিকমর উপাত্তসে কোন মলকায়  
 ধাক্কাটকা দিলে তব, মনসেবাহিনী ?  
 এক হাজি হাজি খুব মলিকা কামিনী  
 বাঁচাইয়া কোলে তব পলিগ হিয়ার ।  
 পান নাহি বোঝা যায়, কালে পশু কুর ;  
 মূল নাহি দেখা যায়, মোতত তেজলি ।

'ভারমণ্ড কাটা মল', 'আলতা মোছা', 'ঘোমটা খোলা'  
 'খোঁপা খোলা' প্রভৃতি অনেক কবিতায় কবি তাঁহার  
 এই চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মগ্ধেব  
 রেওয়াজ অনেক দিন হইল উদ্ভিন্না গিয়াছে ; আলতাও  
 অদৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিংবা চরিত পাণ্ডকা-  
 শোভিত চরণকমলে এখন আর তাহার স্থান নাই ঘোমটা  
 বা খোঁপা পুণিয়া এখন আর নবযুগ লোক তাহারেই চর না,  
 ঘোমটা এখন সীমান্তের শেষ প্রান্তে অগ্রসর গ্রহণ করিয়া  
 কোনরূপে টিকিয়া আছে, তাহাও বৃত্তি আর নবীন্য  
 থাকে না। আর বাঙ্গালীর মেয়ের বড় আকর্ষণের খোঁপাও  
 এখন অনাহৃত, বৃত্তি তাহাও দিন দূরীভূত আদিয়াছে।  
 বাধীনতা-প্রায়াসিনী বহনাতী যদি আত লম্বিয়া বলেন, 'আমার  
 আকুল কবতী আবার কেননে যাইব প'ণেরি হাজে' এবং  
 কালই যদি bobbel hair-এর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া  
 তাঁহার খোঁপার হাটা ভাগ করেন তাহা হইলে কবরীদুহ  
 পুরুষ-কবি কি তাহা প্রতিজ্ঞাপ করিতে পারিবেন ? কিয়  
 সেওই আক্ষেপ করাও যুগ। কালের প্রবাহে অনেক  
 বস্তুই ভাসিয়া যায়। সে সব বস্তু যদি কাবের উপাধানে  
 রূপে কোন কবি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও  
 আমাদের কাব্যরস উপভোগের পক্ষে কোনই হানি হয় না,  
 যদি সেই কবির সৌন্দর্য্যদৃষ্টি পুণ উজ্জ্বল হয়। বাঙ্গালীর  
 গার্হীয়া গীতনের চেতনাতী যদিও কালক্রমে বদলাইয়া যায়  
 তাহা হইলেও মেমেন্দ্রনাথের কাব্যসৌন্দর্য্য রান চাইবে না।





আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁতার কবিতাগুলি চিরসম্পদ-রূপে বিরাজ করিবে।

কল্প রস দুটাইতেও বেবেস্তনাথ লিঙ্কহট। বাঙ্গালীর গুণে গুণে বিম্বা নারীতলে যে বিধাম-প্রতিমা ও মুক্তিমতী সন্নিহিতা আমাদের চোখকে বেগমাতুর করিয়া রাখিয়াছে কবি তাহাদের কথা বিস্তৃত হইল নাই। পুণ্ডে ইহার একবার উল্লেখও করিয়াছি। এখানে যেমন একদিকে দাম্পত্যানীলার উজ্জল হাসিমাণ আছে, অপর দিকে তেমনিই আবার দুবতী বিধবার তপ্ত অশ্রুও তাহারই অঙ্গুণে নিঃসৃত করিতেছে। ইহার জন্ত কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে এবং তিনি তাঁহার মোহিনী তুলিকার স্পর্শে কয়েকটি কবিতায় বঙ্গবিধবার যে অশ্রুপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন কল্প তেমনিই স্মরণীয়। স্বামীবিয়োগ-বিপুল নারী; যখন বিলাপ করিতেছে—

সকাল ত হইল যখন।  
 ওয়ার সাইত যখন। উঃ জনমের আর  
 তৈর্য করিল আমার।  
 দ্যাক্ষিণ্য কল নাও সিন্ধুর কোটা নাও  
 নাও নাও বসন রূপণ;  
 সন্ধ্যার রং বাণে নিবিড় রং বেশপাণ  
 করিত যা তখন হৃদয়।

তখন এই কাতরোক্তি শুনিয়া আমাদের নয়ন বাশাখুল হইয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মতো যে অগৌরব প্রেম, বৈরাগ্য ও আত্মসমর্পণের ভাব ঘোষিত হইল তাহা কি ভয়ঙ্কর!—

নাও নাও দুবতী তোমার,  
 ওই গতি মুখে করে মায়াবিন মায়াবন  
 করিল ইচ্ছিত অঙ্গ।  
 যে নাথ। কিন্তু না লাই, এই কিবাঃ হব তাঁই  
 নাও নাও অজস্রী তোমার মৌন।

এই বৈরাগ্য বিধবার উপর কিছু সমালোচকের নিষ্ঠুরতা তিনি 'রাধারাণী' শীর্ষক কবিতায় দেখাইয়াছেন।



কিন্তু কবির এই কল্পনাখরা শুধু যে বিধবারই উপর বর্ষিত হইয়া নিঃসেধ হইয়াছে তাহা নয়। হিন্দু সমাজ নারী-জাতির উপর যে অভ্যাচার করিয়া আসিয়াছে বা এখনও করিতেছে তাহা ভগবান্ কবির ভ্রমর বিগলিত না করিয়া থাকিতে পারে না। কোনোভাবেই শব্দপ্রধার বুলকাতে হিন্দু সমাজে যে নারী বন্দি হইয়া থাকে সেবেস্তনাথ তাঁহার বর্ণনার চিত্র দিগছেন। কুলীন দুবতী জুবীর্ষকাল স্বামীসমর্পনাকাক্সার অতিবাহিত করিয়া শেষে যখন একদিন তাঁহার সেই চির-অতীর্ণিত বস্ত্রটিকে পাইল তখন তাহার তত্তরকৎ দুঃখের বাবহারে কিভাবে সে

এবং পরে সে কিভাবে ধীরে ধীরে বিশেষ পদার্পণ করিল তাহা 'কলহিনীর আত্মকাহিনী'তে উজ্জল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কোলীজের দুঃখ অতীত হইয়া গিয়াছে। একদম ত্রিঃ বোধ হয় আর কোন কবিতা অঙ্কিত করিতে হইবে না। কিন্তু শব্দপ্রধার পাণিত বঙ্গা এখনও বঙ্গবালার মন্তকোপরি উজ্জত রাখিয়াছে। সেবেস্তনাথ যখনও স্নেহবর্ণন দ্বারা, কখনও বা কল্প রসের উৎস দুটাইয়া এই প্রথার ভয়ঙ্করতা প্রকটিত করিয়াছেন। কবি বিংশ শতাব্দীর বহুকে দশকজ্ঞার টাকার ভিণ্ডি পাশেলে বিবাহলভার পাঠাইয়াছেন। আবার অস্ত্রও বেশ কতক পিতা প্রতিশ্রুত রস লগ্ন হইয়া দিতে না পারায় 'বাকি শচিন্দ্র রূপেশ্বর'র জন্ত শতরূপে বন্দিী কল্পা মনের হৃদয়ে তিলে তিলে পুড়িয়া আগুণত্যাগ করিল। হায়!

অকাল যের আদি লয়ে পাঠ হৈম রাণি  
 তুমার দুঃখের দিল সে অক্ষয়-লিখা।

নারীর প্রতি এই যোর ক্রোধেরে হিন্দু সমাজ উৎসন্ন রাখিতে ব্যস্ত আছে। কবি তাই তাঁহার 'পুণ্ডিতমঙ্গলমথ' বামাইয়া বলিতেছেন—

ঐক্যকবিগণী গুণ

নাহি চুপা, নাহি লজ্জা। বিকঃ বিকঃ স্বপ্নে বাগানী  
প্রাণবশে বিজ্ঞানবুদ্ধি করে দূত। কি অন্ধ নর।  
দূত হ'লে নাথ বাহুর, কভা হ'লে নাথায় তবন।  
নাথীর অবলা করি মাখিলাত মুখে চুপকালি।

~ ~ ~ ~ ~  
বাংলা নারী, বাতী নারী, অমহাৎ দেবতাকলি,  
নারীই পৃথগা বিদে, নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্য বাহার।  
নারীর মায়ায় হৃৎ, হৃৎকলে না, তাই হারোকার  
আঁখি বসে পূরে পূরে।

তিনি যে হাতরদের অবতারণা করিতেও বিলম্ব পাই  
ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁহার 'দয়াকরু' নামে সরল  
গদ্য গ্রন্থখানি। স্বতন্ত্রাণে প্রালিঙ্গ্য মিলাই কবিকে  
দণ্ড করু বাগদাইয়া কিরণ লাহিত করিয়াছিল এবং  
অতঃপর তিনি নিজে তাহার কিরণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন,  
তাঁহাই এই গ্রন্থের বর্ণনার বিষয়। ইহার ভয়ে ভয়ে চটুল  
হাসির কোঁচারা ছুটিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যেও  
হাতরদের অবতারণা নাই। 'কোন নির্বাসিন্দুক সমাশোক্তের  
প্রতি' শীর্ষক বাঙ্গা কবিতা হইতে কয়েক ছত্র এখানে তুলিয়া  
দিতেছি :

দুলভের ভিলে চুমি গোপিত-আশঙ্ক  
কোঁচিয়ার কোঁচ দুলি, সে সমালোচক ?  
পাখন পাখনে বহু, অতঃ ও টক।—  
মাসুরের এক বিকু মরি কি কোঁচক ?  
আঁকা বাঁকা, বতি তব বসন্তলি বহু ;  
এক হাঁহে বিধ নাট, দুয়োপানো চক।  
এদখা-বসুকে গ্রীক ফলনর তাঁর ;  
লল নাহি, পাঁচো নাহি, তবু মহাবীর !  
তুঝি ছুঁ'ড়িয়া তাব সাধিগতক গোপ ;  
বজ্রধর ! শব্দ পায় :—যোকা খেতে কোপ !  
পাতলে যে হৃৎকর, গাফিয়াতে টাক ;  
হুটো চুমি, ফুটো পাখা—তারি এত জ্বালাম ?

এ পর্বত আশ্রয় 'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই প্রধানতঃ  
আলোচনা করিয়াছি। এইবার দেবেন্দ্রনাথের অজ্ঞাত  
কাব্যগ্রন্থগুলি সংক্ষেপে কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে

যায়। ১৩১২ সালে শ্যামবীরা পুজার পূর্বে তিনি একসঙ্গে  
'গোলাপগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'অপূর্ণ  
নৈবেদ্য', 'অপূর্ণ শিশুমঙ্গল' ও 'অপূর্ণ বীরভবনা' এই  
ছয়খানি নূতন কবিতা পুস্তক ও অশোকগুচ্ছের দ্বিতীয়  
সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার স্থাপিত ঐক্যগণাঠলো  
হইতে এই সময়ে যথেষ্ট অর্থায়ন হইতে পারে। সেই অর্থে  
তাঁহার এই সমস্ত গ্রন্থপ্রকাশ লক্ষ্যেই প্রদান করা হইল।  
বিভিন্ন মানিকপথে বহুকাল পরিত্যক্ত সকল অসংগত কবিতা  
ছড়াইয়া রাখিয়াছিল, সেইগুলি সংগ্ৰহ করিয়া তিনি এই  
করণনি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই কবিতাগুলির  
সংগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি লক্ষ্যমান ; কিন্তু  
তথ্যগণ আশ্রয়ের মনে হয়, 'অশোকগুচ্ছ'র প্রচুর কবিতা-  
গুলির দ্বারা সন্ধ্যা-সংসার কবিতা এই গ্রন্থগুলির  
মধ্যে বড় বেঁকে নাই। সেই বাস্তবতাগোচর চিত্র,  
সেই কৃত্রিমপীড়িতা জিন্দগীতির গুণকালিনী, সেই নিছক  
দোষদোষসূত্রের অপ্রাণ প্রাণস এ সমস্তই আছে ; কিন্তু  
তথ্যগণ যেন পাঠকের মন রূপির রূপে ভরিয়া উঠে না।  
কোন কোন কবিতা তাহে, ভাষার ও ভঙ্গীতে অসুন্দর ও  
ও হেমচন্দ্রকে হরণ করাইয়া দেয়। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন  
যে, এই ছই জনকেই তিনি তাঁহার কাব্যগত বলিয়া স্বীকার  
করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার 'অপূর্ণ বীরভবনা কাব্যের'  
প্রারম্ভে তিনি মাইকেলের উদ্দেশে বলিতেছেন—

হে ভর, কখনও তোমার নখনি বসনে,  
কিছু বসে :—তোমার নখনি বসনে  
মানসে পড়িয়া তব দৃষ্টি অকণম  
নিখিলাই বর্ণবিভা তোমারি সবার।

কিন্তু এই গুরুপিতা সম্প্রদায় মানিয়া লওয়া করিন।  
কারণ হেমচন্দ্রের শৌর্য ও বীরত্ব কিংবা মাইকেলের  
অলবনির্ভর্য্য দেবেন্দ্রনাথে কৃত্রিম নাই। তাঁহার রচনায়  
রচনোগুলি প্রায়ই বাধা হইয়াছে। সন্ধ্যার দেবেন্দ্রনাথের  
বাগ্য বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মাধুর্য্য, গানিত্য ও চিত্রপ্রাচুর্য্য—  
হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র মধ্যে খুব বেঁধে পাওয়া যায় বলিয়া  
মনে করি না। অতঃ মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'  
বাগ্যলার গীতিকাব্য মাখিতো অতুলনীয়। সুতরাং আধুনিক



দুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ সত্ত্ব বা কালিদাস এর 'বেবেল'ে  
রবি-ভক্ত চাইলেও যেমন রবীন্দ্রনাথের অত্যাচার বা তাঁহার  
কাব্য শিখা নেন, তেমনই বেবেলনাথও নিজেকে মধুসূদনের  
সাক্ষ্যেদ বলিয়া প্রচার করিলেও তাঁহার কাব্যে তাঁহার  
বিশেষ প্রমাণ নাই। একতুলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও  
যাঁকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমার এ রবিতপ্ত কলনা-  
কুম্বী হুঁইবে কি পুনর্কার ?' তাঁহার এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের  
প্রতি প্রভাবলি বা তাঁত আর কিছুই নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথ  
তাঁহার কাব্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন  
বলিয়া ত আমরা মনে করি না।

সে যাহা হউক, আমার এখন তাঁহার শেষ কথাখানি  
পুস্তকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়া সযত্নে  
করি। 'অশোক শুদ্ধের' পরই 'গোলাপ শুদ্ধের' স্থান।  
তাঁহার প্রথম কবিতা—

এই গোলাপে গোলাপে হাটবে কেসেছে

এ মধু কানন দেশ—

পূর্বেই প্রভাত বাবুর বর্ণনার উল্লিখিত চট্টাচ্ছে। কবি  
যে ইচ্ছার পরেই অত একটি কবিতার বিস্তারিত—

চিহ্নিত উৎসর্গের পথে 'আমি

কলম পুড়ায়

তাঁহার পক্ষেই প্রমাণ কবি এই গ্রন্থেও দিয়াছেন। তাঁর  
'প্রাণ-বাতাসে' ভাবগুলি সব গোলাপি বৈশাখ চুর।'  
নারীকে দেখে, মল্লভীর প্রেমসীতার ও শিশুর চন্দ্র-সাজে  
একই সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিকাশ দেখিয়া কবি আশ্চর্য।  
তাই কখনও তিনি 'মধুর মোহন্য'-জগদী ভ্রাম্যন্তী  
প্রমথীকে 'মাধ আলো' আত চায় বনজাতি গাছ' বলিয়া  
বর্ণনা করিতেছেন। আবার কখনও বা বালাকিতক-  
সজ্জা গৌরালীর 'রূপহৌত্তে চ'নরনে ধাঁধা' লেগে যায়।'  
যখন 'আগ্রসে মল্লভী' করে 'এখন চূষন' তখন সেই বৃদ্ধ  
বিশ্বদ নব-মল্লভীর ভাষা কবির চন্দ্রসেও—

ওরফা ইচ্ছা শিক, শিখিয়া ইচ্ছা দিক

করে যার ফল কুলে ভাসন যৌবন।

আবার সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের 'চূষন' কামনা—

সাত সাত বিশাৎ-চূষন।

চূষনের প্রাণে একবারে কবি গালি

অত্যাচারে ক'লিক বিতে মগে বিতে চাণি।

সংকট হীসার হুঁচি ঢাকের মলিন হুঁচি

সহিত করিবে সপি, জীবন বাপন।

'অশোক শুদ্ধের' বিধবার বিলাপবৃত্তি 'আনিয়া দেব।  
এই কালবাহারী 'বিরাগীর আকেশ', 'উদ্বোধনের কাহিনী'  
প্রভৃতি কবিতারও ছন্দে ছন্দে প্রদাহিত হইয়াছে। 'বাকি  
পাঠে' রূপের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। এই গ্রন্থের  
অন্তর্ভুক্ত 'কদম্বচূষন' নামক চূষন কবিতাটি নির্দোষ না  
হইলেও নানা রূপের সমাবেশে বেশ উপভোগ্য।

'অপূর্ণ নৈবেদ্য' ও 'অপূর্ণ শিশুমল্ল' ব্যক্তিগত  
কবিতার সমষ্টি; প্রথম খানি কবির বন্ধু-বান্ধব এবং তাঁহার  
পরিচিত কবি ও সাহিত্যিকদের স্তুতিবাদে পূর্ণ, এবং স্তম্ভের  
খানিতে কবি শিশুদের সন্ধে লিখিত নানা কবিতার মালা  
প্রদত্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি 'অপূর্ণ' কেন, তাঁহার  
উত্তরে কবি বলিখিত ভূমিকার বলিয়াছেন, 'এই কাব্যগুলির  
অধিকাংশ কবিতাই ঈশ্বরবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে।'  
এ সন্ধে বেবেলনাথ একদিন আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন  
তাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক মনে করি। তিনি  
বলিয়াছিলেন, 'আমি যে সতল মল্লিকা কি বালিকার স্তুতিবাদ  
করিয়াছি তাঁহাটাই আমার কবিতার সুখা বিষয় নহেন।  
আমি তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা  
ideal womanhood—নারীদের পূর্ণ আদর্শ অন্বেষণ করিতে  
চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য এই সতল কবিতাও তাঁহারই  
'আধ্যাত্মিকতা' আদির পড়িয়াছে; কারণ নারীভাষ্যকে  
আমি মনস্বাতার স্মরণপন্থী, ভগবানের সৌন্দর্য্য বিকাশ  
বা তাঁত আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমার শিশু-  
সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও এই অর্থে ব্যক্তিগত হইয়াও সার্ব-  
জনীন। এখানেও আমি শিশু-চরিত্রে বৃদ্ধ হইয়া বিভিন্নভাবে

আর তিনি তাহা আকুল—

ঐতিহাসিক গল্প

দেউতী অনন্ত দৌলপোষ মাভান দিতে প্রাণ সাইয়াছি।  
একটা আশা পিতৃভবন বাহার প্রকাশ তির চাইলেও মূলতঃ  
এক, ইহাট আমার শিক্ত-কবিতাগুলির বিষয়।' সুতরাং  
এই 'অপূর্ণ' কবিতাগুলি কোন্ অর্থে 'ঐতিহাসিক' উল্লেখ  
করা? ঐতিহাসিক কবির এই উক্তি চাইতে বোঝা যায়। 'অপূর্ণ  
ভাষা' নামক কবিতার শেষ ভাগে তিনি গ্রিক এই  
কথাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ অর্থাৎ অপরূপ একটি তিন  
বছরের পিতৃ। এই শিক্তে তিনি অপরূপকেই সুপ্রিয়  
রূপে দেখিতেছেন :

অপরূপ বহুশিক্ত অপূর্ণ হিহোলে  
আমার এ কবিতার হৃদয়ে বসে।  
তাহি যেনোহুই মানি কহেই প্রথম  
সৌন্দর্যের অপরূপতায় নবোদয়।  
শব্দে দেউল বহি কহেই দুনিয়া  
যে অপরূপ। হোর ঐতিহাসিক মোহন :  
এ অপরূপ অপরূপ হই এ অপরূপ  
এ অপরূপ অপরূপ, এ অপরূপ  
শিক্ত অপরূপে যে বহুশিক্ত।

এই আধাস্থিকতা শেষ বয়সে তাঁহাকে সাইয়া  
বসিয়াছিল, এবং অনেক স্থলে ইহা যে তাঁহার সৌন্দর্য-  
স্বপ্নের অন্তরায় হইয়াছিল তাহা আশাশ্রিত্যেই প্রমাণিত  
হইবার করিতে হইবে। তাই দেখি যখন তিনি সুপ্রিয়াদিনী  
আধাস্থিকতার হাত এড়াইয়াছেন তখন তাঁহার কবিতাও  
খুব অপরূপ হইয়াছে। হ' একটি উদাহরণ নিই। তাঁহার  
শিক্তকতা প্রকাশের পূর্বে যে কি ছিল এবং কোথায় ছিল  
কবি সে লক্ষ্যে তাহাকে এইরূপে গ্রহণ করিতেছেন :

এতদিন কোথা ছিল শাসনিনী ঘরে ?  
হৃদয়ে বসেই তুই ছিল কি আনন্দময়,  
স্বপ্নেরেই উভে বসে হৃদয়ের ঘরে ?  
কোথায় ছিল-আমি তুইও তামের মাঝে  
সেখানে কখন ছিলি গান গেয়ে গেয়ে ?  
বসেই বসে বসে আনন্দ অপরূপ  
শাসনিনী শিক্তকতা উভে বসে,

তুইও ইহা-বাংলা  
ছিলি লজ, মরহুমী হোর অপরূপে।  
এতদিন কোথা ছিল শাসনিনী ঘরে ?  
ইহার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের 'বোকা'র মত। তুলনা করা বাইতে  
পারে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা নিছক সৌন্দর্যের প্রকাশ,  
যার রবীন্দ্রনাথে সৌন্দর্যের স্মৃতি স্মৃতির অপূর্ণ সমন্বয়।  
আর একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখিয়া কবির মনভূমি  
প্রতিমা মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা শুধু তাহার  
বর্ণের মত।

যেহা-বসে, চেয়ে  
অপরূপ-আলো-  
আলো বহি পুজা, হেলেই বসেই—  
বাল্যের পশি গ্রাণ আলোকে মূল।  
এই অপরূপ  
পড়িছে বার বার। হৃদয়ে বসে।  
আত্মনা পড়ে বসি, হেলেই অপরূপ।  
আলোকে বহি বসে আনন্দ-মূল।  
কোথা সে মানি মানি  
কিঞ্চিৎ বসে বসে, বসে বসে,  
পলেতে বসে বসে,  
হৃদয়ে বসে বসে বসে বসে,  
হেলেই বসে বসে  
বোকা মনে বসে বসে বসে।

প্রকৃত আধাস্থিকতা প্রকাশের স্মৃতি এই সব কবিতা  
বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। 'শিক্তকতা'  
এক প্রকার কবিতার মতই নাই।

আজ এইখানেই শেষ করি। বাল্যের শিক্ত-কবিতার  
মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান যে খুব উচ্চ তাহাই আমি এ  
গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাল্যের তাৎপর্য ও  
সৌন্দর্য-পিশাচ আর চিরকাল শিক্ত-কবিতার কোমলকায়  
সকীতে আপনাকে পতন্যে উদ্ধৃতিত করিয়া আমাদের  
জাতীয় স্মৃতিতাকে এক অসামান্য বিশেষ স্থান করিয়াছে।  
এই স্মৃতির স্মরণ কখনও বা মরনাতীর প্রাণলীলায় পাশে



রক্ত ও অনন্ত মানুষ ব্যক্তি করিয়াছে। কখনও বা স্বাধীনতার  
নিজস্ব দাম্পত্য জীবনের অন্তর্নিহিত প্রথ-চেষ্টার দ্বিত  
মিলিত চরিত্র প্রত্যেক আরও বেশি হ্রস্ব। আরও বেশি উচ্ছল  
ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্ৰত্যেক দুইট আমরা  
দেবেশ্বরনাথের কাব্যে স্থানিত চাইতে দেখি। 'প্রাণতে রবীন্দ্র-  
নাথের মনস্বিতা' বা 'চন্দ্রসুন্দর' উল্লিখিত। না থাকিতে  
পারে। 'প্রাণতে' চরিত্র দেবচরিত্রের উদ্ভাৱনা নাই  
বা বিশ্বরক্তের নিগূঢ় সমীচণ্ড গুণিতে পাই না। কিন্তু  
প্রাণ চরিত্রে এই সুর স্বাধীনতা মনেই প্রাণস্পর্শ করে,  
কালে তাহাও পানের ত্যারে নিঃস্রব বাস। কহিত চাইতেছে

তাহারই এক লক্ষ্যময় প্রতিফলি সে তাহাতে গুণিতে পায়,  
তাহারই গার্হস্থ্যজীবনের দৌর্ভাগ্যের চিত্র তাহার চক্রে  
সমুদ্রে সে দেখিতে পায়। সে পানে ও চিত্রে অব্যাহত  
বৈদেশিক প্রভাবের লেপন নাই, অসংখ্যের কলুষ  
কোথাও তাহার পবিত্রতা নষ্ট করে নাই। তাহা স্বচ্ছ,  
নিম্মল ও পুত স্রোতবিনীর স্রাব তরতর বেগে বহিয়া  
চলিয়াছে। বন্দবাসী তাহা আকর্ষ পান করিয়া ধর  
উড়ক। \*

\* কয়েক বৎসর পূর্বে 'উদ্ভাৱনা'র প্রকাশিত 'অভিধিও' মেনে-  
নাথ দ্বন্দ্ব সংগ্রহে খস-খসে এই প্রভাব পুহীত হইয়াছে। লেখক।

## যাযাবর

### ঐজ্ঞানাত্মন চট্টোপাধ্যায়

সব্ব জগৎ ফেরে সংসার,  
নাটক ঘরের ভাবনা ;  
আপন বলিতে নাহি কোন তাঁই,  
সব তাঁই যেন আপন।

পলে পথে করে জীবন যাপন,  
পথেই জীবন করে সমাপন,  
চাপিয়ে চলে হৃৎপদে বলিমা  
পথের গুণে যাতনা।

কত গিরি মরু প্রান্তর'পরে,  
গ্রামে গ্রামে কত নগরে নগরে  
ছাউনি নিবৃত উঠিছে লড়িছে  
কে করে তাহার যারনা ?

চলার নেপথ্য চল-চকল

চলে উচ্ছল যাত্রিক বণ।

নাহি মানে বিধি না মানে বিধান,

স্বাধীনতা শুধু সাধনা !

# মুখে মুখে শ্রীমতীশচন্দ্র ঘটক

## নাটকীয় চরিত্র

|          |                  |
|----------|------------------|
| কেদার    | দালাল            |
| মহিম     | মুলমাটির         |
| বলিক     | রত্নশ্রীর প্রৌঢ় |
| নিম্বথ   | কবি              |
| বিনোদ    | জাকার            |
| কামাখ্যা | দাখা-খেলোয়াড়   |
| দায়দা   | কেশাব            |
| পঞ্চানন  | বেনে             |
| নেপাল    | কেদারের ভাই      |
| দলবধ     | উড়ে             |
| অপূর্ণ   | উকাল             |
| হকড়ি    | অগ্রদানী         |
| বিসল     | কেদারের চলে      |
| জগদীশ    | পুরোহিত          |

## প্রথম দৃশ্য

কলকাতার বাস। বাগবি উপর একটি বেনের মোকানের  
মাঝার পাটবোর্ড—“বেনের মোকান শ্রীপঞ্চানন পান”।  
মোকানের কাঁপড়াকা বন্ধ। দুটপাখে বহিম পাটচারি করছেন। তার  
দায়ে কোঁচার কাপড় দুটিয়ে বেত্তা।

মহিম

আঃ, এই ঝিঝিরে ভোয়ের হাপুয়াটুকু কলকাতার  
আছে। সাবাত্তান্ত পরমে ছুটকট ক’রে এই এখন  
বা একটু—আঃ।

(কেদারের প্রবেশ—তার দায়ে কোঁচ, দালাল কতটাব জড়ানো।)

মহিম

কেদার বাবু বে, নমস্কার! এই পরমে কক্ষটাব  
জড়িয়েছেন?

কেদার

(চিবোনো কবে) জড়িয়েছি আর সাধে? উঃ, কথটি কই-

বাবু বে নেই—হী কমেই—উঃ—

মহিম

হী কি করেছে—কারবতল নাকি?



মুখে মুখে  
ঐগতীশচন্দ্র খটক

মহিম

আরে, না, না! তুমি দেখছি কিছু খবর রাখ না, তিনি  
এখানে একলা পড়েছেন। তাঁর কামিলি ত সব  
বেশে।

রসিক

তাই নাকি? তা হ'লে বুঝি তুলের তরু কিছু চাঁদা—

মহিম

হ্যাঁ, কি বল তার ঠিক নেই। তাঁর এখন নিজেকে  
নিরে আমাবস্তে—

রসিক

বল কি—আমাবস্তে! তাই তোমার সুখে পূর্বিমার  
আলো চিক্ চিক্ কচ্ছে!

মহিম

এত ব্যেস হোলো তোমার ছিপলেমি ভাবটা পেল না।  
না ছুঁ বাপ কিছু রেখে গেছেন—ছত্রির প্রাণ গড়ের মাঠ  
ক'রে বেড়াচ্ছে—তা ব'লে কি সব সময়েই ঐ? শুভদে।  
তাঁর একটা সুস্থ, আর সে নেহাৎ হাসি ঠাট্টার নর,—  
যেমন বহুলা, তেমনি ফুলো।

রসিক

এঁা ফুলো! কোথায় ফুলেছে?

মহিম

কোথায় আবার—পালে।

রসিক

মহিম

তা নিচাৎ মন্দ নয়—একটা গাল গালিশের মতট।

রসিক

এঁা! এমন ব্যাপার?

মহিম

নৈলে আর ভরলোক ওপাড়া থেকে ওপাড়া আসেন  
আমাকে গুণ্ডা জিজ্ঞাস কর্তে?

রসিক

কেন, ডাক্তার কি সব ম'বে গেছে?

মহিম

ওই ত—এই তোমাদের—কথার কথার কেনাল ডাক্তার  
আর ডাক্তার! ডাক্তার দেখাতে কি আর ব্যাকী রেখেছেন?  
সব ফেল মেতে গেছে। এট ব'লে দিচ্ছি শোন—বা টোটকা-  
টোটকা জানি—ডাক্তারের বাবাও—

রসিক

আর কেন বেচারাদের বাপাস কর?

মহিম

তোমার যে দেখছি কিছু গায়ে লব না? লাব ক'রে  
বাপাস করি—কি জানে ওরা? কেবল লহলা বাবার মম।  
ঐ পরলা আমার বিশে—বাক আর নয়—শেষে পরনিমে  
যেতরে পড়বে। মধ্যাৎ বা টোটকা ব'লে দিগেচি  
লাগান ত ওতেই চুপসে যাবে—আর ওতে যদি না  
যায়—

রসিক

মহিম

তা হ'লে আর যাবে না।

রসিক

তার মানে?

মানে—ঐতট পেথ।

রসিক

তুমি ত বড় সাংঘাতিক লোক দালা!

মহিম

কেন দাম্ভা পালাগালি দেও? বিগ্গমেন করো, আর  
মিথ্যা কথা বলো?

রসিক

ও, তাই ত বটে! তা তুমি বড় বড়সভাস্ট্রিও তোমার  
গুণ্ডা কিছু সাংঘাতিক—হায় হায় এমন গুণ্ডা কেউই—  
যে হয় এম্পার নয় ওম্পার—

মহিম

হাঃ, হাঃ, হাঃ—ওকেই বলে গুণ্ডা, রসিক—ওকেই  
বলে গুণ্ডা। বাক্য তাকে কি আর দিই? তবে নাকি





একে কেন্দ্রীয় বাবু—তার নিশি ডাল মাপব—তার গাঠি  
ধ'রে আসছেন তাও উল্লেখ টুন্ডে—

রসিক

আ, হা, হা—

মহিম

কি আ, হা হা কর—যেবেছ? সে কই দেখতে ত  
বুঝতে—বাবারে মারে কচ্ছেন—আমার চোখ দিয়ে জল  
বেরিয়ে গেল—সুখের শরীর ত—

রসিক

আর তোমার দয়ার শরীর—

মহিম

কি করো বল—একটা কথাই আছে নির্দিষ্ট লোক  
শব্দর সমান। থাক, একবার সেক্রেটারির বাড়ী গাই—তাত  
ফুটে গেল বেটারা মর্ষি ফুল কচ্ছে না—

( মহিমের প্রস্থান )

রসিক

বাবারে মারে করছেন! আলতা—বঠ রোগ ঐ কালের  
লোকদেরই ধরে। আর আমি বেটা বেকার—গোকুলের  
বাড়ির মত চ'রে বেড়াই—মাথা বজাটা পলি কছে  
আসে না! আর, বেশ মজা তো! কট চরেচে আর অমনি  
লাসি পাণিয়েচে। ও বাবা হাসি, কোথায় পালালি?  
আর, আর—কট থাকবে বুকে, তুই থাকবি বুকে, এতেও  
তোমের কল না! ও কে! তরল কবি নিশিখত্রে। দিবা  
ভোক্তা—বিষে ওয়নি—মেখেতেও হুজী, পচসাও আছে—  
ওকে যে কোন ইয়ে এখনো—কেন ইয়ে করচে—ওকে  
আজ আমার বাড়ীতে—থাক।

( বাতা হাতে নিশিখের প্রবেশ। তার চুল এলোমেলো, বুট উলস )

নিশিখ

বাচ্চা কিবের

কাজলা মেহে

বোনটা কিলে চার,

কোয়ার বাড়ের

বোয়ল বোমা

হুগিরে গিরে বার।

লাব, হা মারে

অ'চলা বস

হাতযানি বের জাল,

বাড়িরে ওয়

ভা

অপ'রাধিতার খাল।

হার কি রবি

হুলসো কবি

কলসো হ'লে দিল,

উপ'বহির

দুগলু কোটে

সহ'তে হাসছিল।

রসিক

বাঃ বাঃ, এটি কৃষ্ণি বাবুর চালকিল রচনা?

নিশিখ

হ্যা, এই বড় কোর মাস খানেক—তুলেন নাকি?

রসিক

ওহু তনমুম—প্রাণে পান্ডিত্য তুলি বুলিয়ে দিলেন।

বাঃ বাঃ যেমন হুশর, তেমনই পবিত্র—

নিশিখ

কিন্তু লোকে ত জা বলচে না। সম্পাদকতা চুকোব  
আর অজাল ব'লে ফেড়ত পাঠাচ্ছে।

রসিক

অজাল! তরল প্রাণের অসম টপ'গে উজ্জ্বল কখনো  
অজাল হ'তে পারে? ধর-স্রোতা নদীর মতো যে তাৎ-  
হার্য সর্বদা প্রকার গতিতে ব'রে চলেছে, তার মতো  
অজালতার স্থান নেই। অজাল যদি শুধু তাকেই বার  
গতি দেই, পুঙ্খের মতো যা নিষ্ফল। চলুন, আমার  
বাড়ীতে গিয়ে এক কাপ চা—

নিশিখ

না, আমি এখন কেন্দ্রীয় বাবুর বাড়ী থাকছি।

রসিক

কেন, কেন সেখানে কেন?

নিশিখ

মনে করছি তাঁকে গিয়ে একখানা কাপড় বের  
করবো—দেখি আমার কবিতা জাপা হয় কি

রসিক

কিন্তু কেন্দ্রীয় বাবু ত—

নিম্নে

নিম্নরাজী করেছেন—কেবল নাম নিয়ে গোল বাধাও। আমি  
বলছি ‘বিশ্রান্তী কাল’, তিনি বলছেন ‘পরিহারের ক’টা।’

হাসিক

কিন্তু কেনার বাবুর যে বড় অসুখ।

নিম্নে

এঁগা? বড় অসুখ! আহা! বড় মনে প’ড়ে গেল।  
আমায়ই কথিত।। গিরিডি ব’সে লিখেছিলুম।

আমি বলবী, বড় বলবী!

উজ্জীর ধারে বসি ত কেউ

বুঝ না আমার সব্বী:

বড় বলবী, আমি বলবী।

কেনার বাবু কি এর মধ্যে

গিয়েছিলেন?

হাসিক

না, তাঁর অসুখ একটু অল্প ধরনের—গুচ্ছ বহুসের অসুখ  
কিনা।—

নিম্নে

জ, বুঝেছি—

যৌবন কুতি

দুর্ভাগ্য অতি

দুর্ভাগ্য লম্বা হলে

হাও-গাটানিচা

বুড়ো ককেশ

বুড়া ভাল বহা: সে।

হাসিক

আপনি স্বভাবকবি, যেমন ভাব, তেমনি ছন্দ, তেমনি  
শিল। কিন্তু কেনার বাবুর অসুখ ঠিক ও ভাবেরও নয়।

নিম্নে

তবে, তবে? নিঃসং সত্তমর অসুখ নাকি?

হাসিক

সত্তমর জীবনে আর কত হবে?

নিম্নে

তা হ’লে শুকতর বটে!

হাসিক

শুকতর কেন, শুকতম। গাল গলা কুলে ঐ আপনায়  
থাকে বলেন—চোল।

হাসিক

চোলই! আর এত বহুনা যে চোটেতে চোটেতে অজান  
ক’রে থাকেন।

নিম্নে

এঃ আমার কাগজটা দেখ’ছি—

হাসিক

বেতোর কি না দেখে।

শক্তিরহিত, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে

নিম্নে

জবাব দিয়ে গেছে! আচ্ছা

ডাক্তার, ডাক্তার!

ডাক্তার আর

সেখ বেতন আমি

কত বড় নাম-ডাক তার।

হাসিক

(বসত) এই সেহেতে। একজন ডাক্তার এঁই বিকে  
আসে—শকটে টেক্সিকোপ—বেশী কিছু না বলে।

নিম্নে

যদিও জ্বর পাবে কি নাহি

যদিও নবন পাবে কি নাহি?

কোট কোট খোশ খটাই নাই:

দাবিতে পাবে ল’লাল তার।

পাবে না যখন আবু হুদি বিবে

কেটে কোথায় আমি নাক তার।

ডাক্তার, ডাক্তার!

(বিলোমের প্রবেশ)

হাসিক

কেনার বাবালে দেখ’ছি—স’রে পড়া বাবু

বিলোম

(বিলোমের গির চাপ’ড়ে) কি হে কবি, আমাদের উপর এত  
খায়া কেন?

নিম্নে

কে—বিলোম? একটা ভাব এসেছিল।



বিনোদ

ভাবের উৎপত্তি হ'ল কিসে ?

নিমীষ

কেদার বাবুর অগ্রথ থেকে।

বিনোদ

কেন কেদার বাবুর ?

নিমীষ

ঐ যে বিনি—ঐ যে ধীর—ঐ যে—

বিনোদ

থাক থাক বুদ্ধি—ধীর বাড়ীতে তুমি যাও। কি  
হয়েছে তাঁর ?

নিমীষ

কি হয়েছে ? তুমি ? তুমিও গানের মধ্যে পিচ্চরপ দেবে।

বিনোদ

তোমার পিচ্চরপ ত কথার কথার চাই।

নিমীষ

হটে ? আচ্ছা, দেখো পিচ্চরপ দেয় কি না—

গান গলা ফুলে উড়ে-এই

• নাক ডাক অলপ,

হাতমারে খোরে আঁচেন নদী

জ্বলেন পড়িয়া গল্প।

গানে গবে ফিলে বটে ফুলে গায়,

ফোপ হুট অলপ,

গান কিনিবার নাহিক পরতি

কেবল বাকেন তুল।

বিনোদ

কি কি ? কেন ত বড় সুবিধার ঠিক্‌চেনা।

নিমীষ

অগবধ বুদ্ধি হাফাঙ্গনে

ফেড়রে ভিড়ি-মোত

আঁজন দেবে গানে গড়ে গাড়

শিরিষ্টবিনয় প্রৌঢ়।

বিনোদ

হাঃ হাঃ—বালা উপমা। কিন্তু ফেলটা আমার মনে  
হচ্ছে—বাক্—তুমি আর দেখিকে বেজো না।

নিমীষ

আর গিয়ে কি হবে ? কানকটা আর বেরগো না। চপ্পন  
হালিক বাবু, আপনার বাড়ীতেই—কই কোথায় গেলেন ?

বিনোদ

ত্রিনি ত অনেকক্ষণ—শোফের ত কাজকর

নিমীষ

তাঁর মানে! আমরা কি বেকার ? আমরা যা  
করি তাঁর মর্ম বোকা তোমাদের আজ নয়।

( কুতূহলে প্রবেশ )

বিনোদ

হাঃ হাঃ হাঃ, গানগানের এক বাপ নীচে। কিন্তু কেদার  
বাবু—এ রোগ কোথেকে—কলকাতার ত বড় কাল  
ছিল না।

( কামাখ্যার প্রবেশ। হাব বগলে একটি কাগজের বাঁক—তার  
মধ্যে লগার সরফান )

কামাখ্যা

কিছু।

কামাখ্যা

বিশুদ ব'ড়ের সুখে গজ। মেয়েচেন কি নৌকোর  
ওঠে-গায়—আর না মারেন তো খোঁড়ার কিছু—বাগ্‌ মাং।

বিনোদ

( বসত ) এ আর এক বাপও নীচে নয়—( প্রকাশ্যে ) কি  
মাং বগ্‌চেন ?

কামাখ্যা

কে, ভাকার বাবু! ঠিক বগ্‌চি। আপনি ত একটু  
আবটু খেঁকেন—এই দেখুন না—এর সামাল-আছে ?

( বাগ্‌ গুলে কুঁচাপের উপরেই বস গেছে বগ্‌ লগার  
লাফলেন )

ঠিক এই অথবা—কেদার বাবুর সাদা, আমার কালো—

বিনোদ

কেদার বাবুর সঙ্গে খেলে থাকেন ?

কামাখ্যা

আগর কার লগে খেলবে ? আর খেলতে জানে  
কে ? তিনি তবু খানিককণ দূরতে পারেন ।

বিনোদ

কামাখ্যা

কার লসনাশ ? আমার ? দেখলে তাই মনে হয়  
পড়ে । তিনিও তাই ভেবে যাচ্ছেন । কিন্তু আমি দেখিয়ে  
দেখো যে লসনাশটা ঠিকই । তিনিই চালে—এই দেখুন ।

বিনোদ

কবে তাঁর লগে খেলোচেন ?

কামাখ্যা

কবে ? বাড়ান্—পরদিন রাতে । বাছা তোলাই  
আছে । কাল আর বারিনি । কাল বাড়ীতে বসে  
ভেবেছি । সাতটা দিন খেল, চাপ আর বেয়েই না ।  
রাত্রে খাল কোলে ক'রে তখনো ভাবছি । ভাবতে ভাবতে  
বেই আলুর গারে পটপেচ কিস্তী দেওয়া—বাস্, চড়াই ক'রে  
মাথা-এসে গেল । এক বলে গ্যাংকিট—এই দেখুন বল  
কাটিয়ে—

বিনোদ

এই বল নিয়ে খেলছিলেন ?

কামাখ্যা

এই বল নিয়ে । এই ছক, এই বল, এই সব ।

পায়েন না যে, কিছু বললে ।

বিনোদ

এ বল আমি পুড়িয়ে দোব ।

কামাখ্যা

এঁা ? পোড়াবেন কি ? ( বল কুড়িয়ে বাছা বসে পুবে )  
এ কেন্দ্র বল নয়—কানী থেকে আনা—

বিনোদ

তা চলে পারকোরাইড অব মার্কেটিং দিয়ে ডিস্ট্রিক্টকট  
করতে হবে ।

বিনোদ

সেগের কণ্ট্রি খোঁজা যে ।

কামাখ্যা

সেগের কণ্ট্রি ! কেমনে বাবুর সেগ করেচে !

বিনোদ

কামাখ্যা

সেগ চলে যে জেনেছি যাঁতে না ।

বিনোদ

কামাখ্যা

( বাবুলখনে ) তবে কি হবে ?

বিনোদ

সবই ভরবানোর ইচ্ছে ।

কামাখ্যা

তিনি সেগে কার লগে খেলবে ?

বিনোদ

হাঃ হাঃ এটি কত ? তা খেলোয়ারের ভাবনা কি ?

কামাখ্যা

ভাবনা নয় ? যখনই ভাবনা । এ তালু পালা  
দুর্গাচাঁপ নয়, যা ঘেরেরাও খেলে । এতে মাগার দরকার ।  
এক কাগ ককন্, —আগনি ভাল ক'রে শিখে নিন্ ।

বিনোদ

তা পেছা যাবে । আগাত্ত বাজটা নিন্—আগনাকে  
কাল কেবল দোব । নিন্ ।

কামাখ্যা

দোব ? আজ্ঞা । যেমন কিছ্র করে ।

( বিনোদের হাতে বাজ দিলেন )

বিনোদ

হান্, ফিনাইল দিয়ে কাত খুয়ে ফেল্ণ গে ।

কামাখ্যা

হাত খুয়ে—তাই ত ! এখন খেলাটা দেখাতে পারলুম  
না । শেষকালে স্রেম ! ঐ কত পুরত দিন গাল চেপে  
ব'রে খেলছিলেন ।



হনন ক'বে সাবলার প্রবেশ । তাঁর বশে চাতা, খায়ে তাল  
খা খরসা মাটি, হাটেব খোতাষ নেই—মাগ হুতা । খিয়ে খোতাসের  
পর ধীনা মুখে একটা আখপোতা বিড়ি । নিরাসিত কথোপকথনের  
সময় পকানির তাঁর মোকামের কাঁপ তুলবে, খেজবরীকে এগনি ক'বে  
গুনা খিয়ে চার দিকে লতা জালের ছিটে বেবে ।

সারদা

( খিড়টাকে হাতে নিয়ে ) বেশলাই আছে কামাখ্যা—  
বেশলাই আছে ?

সারদা

অন্ত কথা বলবার সময় নেই ।

( বিড়ি ধূমে ক্রমে হন হন করে এগিয়ে চলে )

কামাখ্যা

( গহন হ'তে সাবলার মাথা টেনে ক'বে ) আচ্ছা সারদা, তুমি  
না এক সময় বাবা খেলতে ?

সারদা

( বিড়ি লাতে নিজে ) সে সব তুলে পেছি—ছেড়ে দাও ।

কামাখ্যা

কিছু মনে নেই ? আছে বৈকি । আমার সঙ্গে  
ও'চার দিন বসেই—

সারদা

ছেড়ে দাও—গেট ক'বে খাবে ।

কামাখ্যা

কমরং ক'রে কালিয়ে নেওয়া বৈ ত নয় । আ  
ক'বার ব্যাং বল ত ?

সারদা

আঃ কামাখ্যা—বেশুচো আপিল বাচ্চি—এর পর  
দৌড়তে হবে ।

কামাখ্যা

তা বৌড়ো—তলনা ক'বার ব্যাং ।

সারদা

আঃ, কেদার বাবু কছে বাও না ।

কামাখ্যা

আর কেদার বাবু—গাঁর বা হঠেচে—এখন বাবু কি  
তখন বনি ।

সেই যে—

কামাখ্যা

পরন্তু খেতেই একরকম—

সারদা

তা হ'লে আর এতক্ষণ নেই—ছাড়ো ।

কামাখ্যা

আচ্ছা বাও—কিন্তু বাবা তোমাকে খরাবেই ।

( কামাখ্যার প্রস্থান : সাবলা বিড়ি ধূমে খিয়ে হন হন ক'বে  
পকানির হোকনি পথের বেলায় )

সারদা

( খবক ধাক্কির খিড়টা হাতে নিয়ে ) একবার বেশলাইটা বাও  
ত পকানির ।

পকানির

আচ্ছা এখনো বৌনি বহনি ।

সারদা

একটা কাঠি জালাগে বৈ ত নয় ।

পকানির

আজ্ঞে মাপ করবেন—কাঠিও যা বাসও তাই—

সারদা

তুমি বেশুচি আগল বেয়ে—বাও একটা কিনেই নিচ্ছি ।

( একটা আখলা বেব ক'রে পকানির হাতে দিলেন )

পকানির

আমি পরদা ! "আমি পরদার বেশলাই আমার—নেই ।

সারদা

( পকেট হাততে ) কিছু আমারও ত আর কিছু নেই ।

পকানন

বিশি খেপলাই আছে কেবন ? আশপাশায় দিতে পারি ।

সারদা

দাও, দাও—বিশি ঢেয়ে আর কিনিব আছে ?

( পকানন খেপলাই বের ক'রে লাথোর হাতে ধিলে—সারদা ছাতিটা বোকায়েব পারে ঠান দিবে রেখে, বিচি বখাবার চোঁড়া করতে লাগলেন । )  
ছাতিটে কাটি টুকতে টুকতে বই হয়ে গেল )

সারদা

আরে কি ছাতি ধিলে—বিশি কাবার আভন—বাকু  
দিলেছে ।

( বিচি টানতে টানতে জরতবে জরান ।

হাতে একটি চোট রাঙাওঁদু বান )

পকানন

অনেকদিন পরে দেবতার দেখা—

নেপাল

জাঁ, এই কলকাতার এলুং ডেমিয়ারট আছে ।

পকানন

আতুন আতুন—এ নৈলে আর খপ্প-গুফ—দোকান  
কেমন চলচে ?

নেপাল

তা চলচে মন্দ নয় । এবার কিছু বেশীই কিন্বে ভাবতি ।

পকানন

কিন্বেন বৈ কি । দোকান বন্ধন দিচ্ছেন—বেই  
না কিন্বে চলে ? আর এ বেনের মগলা—এর চাঙা নেই,  
তুকে নেই, পচা নেই, মজা নেই । তা মিথো কেন কই  
ক'রে এলেন ? আমাকে চিঠি লিখলেই মতো—সব প্যাক  
ক'রে পাঠিয়ে দিতুম ।

নেপাল

জা জা তা টুটে, তবে ভাবলুম দাবার সঙ্গে একবার দেখা  
ক'রে ঘাই, অনেক দিন দেখা হয়নি ।

পকানন

ও, কেনার বাবুর সঙ্গে ? তা শু ভরবেনই । তা  
দেখুন এবার তাঁর কাছ থেকে মৎসঙ্গ কিছু নিয়ে দোকানটা  
একটু জাঁকিয়ে বসান্—হীসমার্কি, হি, হিবিমার্কি, কেমাদিন

বাক্সমার্কি, লাবান—( নিঃশব্দে ) কেন না দোকানের ভাগিয়ার  
ত আশনার ভাগিগোত্র হবে ।

নেপাল

সে আর তুমি বলবে শকু ? দেই জুয়েই ত আলো ।  
ন' গুই নিজে এনেছি—আর ন' চারেক তাঁর কাছ থেকে  
নিয়ে—বুকলে কিনা—

পকানন

আজো বুকবোনা কেন ? এই ক'রেই ত চুল পাকালুম—  
আবারো ত দাবা ছিল । বাকু বহুন্—একটু তামাক টেকে  
কল্প ।

তামাক ? আচ্ছা মাতো ।

( নেপাল দোকানের চোঁকিত হাও বগলেন—পকানন একটা চাষা  
ওঁকোর জল কিবিরে, গামাক সাফতে লাগলো, জরতবে লম্বোদর  
জবেন )

সারদা

ছাতি—পকানন—ছাতি ? এটি যে, ওঁর্দা এ

পকানন

কেলে পেছলেন বৃতি ?

সারদা

আর কেন বলো ? তাড়া ভাঙিতেই মাথুর ককিব তথ ।  
ও, তাগি যে কেউ চকু দান করেনি ।

পকানন

করতো, ঘনি না পকাননের দোকান চতো ।

সারদা

ছাতিমুলে ) তবে বেশী লাভ করতে পারতো না । জা  
জা—যে কাঁজতা আর তাগি । কিব বজ্র দেও হ'রে গেল—  
সে থেকে এলুন্ডু ম নহ—এখন বালেই যেতে হবে । ছ'টা  
পহাদা মিথো ত শকু, ও বেলো কিবিরে দোব ।

পকানন

ছটা পহাদা ! কি ক'রে বিই ? তামাক লাগছি যে ।

সারদা

বাগ, চট্ট ক'রে হাতটা ধুয়ে দাও ।



(বন্দরের প্রবেশ।)

দপদপ

এ বৈদ্যা ভাট, শখাটা কর শাখিমাটি কি অ'ত—

পকানন

শাখিমাটি—আর কি ?

দপদপ

আউ অধ্বেষাটাকার শুভী—

পকানন

আচ্ছা, আর কি ?

দপদপ

আউ ? হুগুয়া কাঠিবি, পান শাইবি—আউ কঁড় ?

সারদা

নাও পকানন, বাস্ আলুচে ।

পকানন

কত বলেন ? হিন পয়লা বুরি ?

সারদা

পকানন

হ'পয়লা ! ( হ'কো মসকে বন্দালের হাতে নিয়ে ) একটু  
হুঁ বিয়েনিম্ দেবতা—( হাত মুখে শয়লা বেব ক'রে দম্ভার প্রতি )  
ধকন্ ( সাবশ্য হাতে গরদা নিয়ে ) ও বেলা কিস্ত খেন পাই ।

সারদা

তা পাবে, যদি না এর মরো সেঁটে বাই—

পকানন

ও কি কথা বাবু ? আপনাতা হচ্ছেন আমাদেব তরলা ।

সারদা

তা বটে, কিন্তু মানুষের শরীর তো—কিছু বলা যায় না ।  
এই যে কাল কেবার বায়টিক হ'য়ে পেল ।

পকানন

হ'য়ে পেল ! ( বন্দালের দিকে ত্রস্তে নিয়ে গুব নৌক ক'রে )  
কেন্ কেবার বাবু ?

সারদা

( নিম্নে ) ওই যে নৌগরুর বাকী—

দপদপ

নৌক কুইটির বাবু ! ( কপালে চাপেচ নিয়ে ) এ মসরাণি,  
কপরাণ, এ মসরাণি । ( কপার মসরকী করে বলে পড়লো )

পকানন

আঃ—হুগু, হুগু, ( নিম্নে ) কি মরুভিৎ ?

সারদা

সেগ—সেগ—এই বাঁধো, বাঁধো—

হাত কুপে অহান )

দপদপ

কু-কু-কু—বাগ্পটরে ।

পকানন

আবার চৌধা ! ( চৌধা টোল্পা নিয়ে ) এই দহু তোর  
শাখিমাটি আর শুভী ।

দপদপ

( উচ্চ সম্ভবে ববে ) কাকি দিলা, চারি উচ্চা—বু'লব—  
বাকি বলা—এ মসরাণি !

নেপাল

ও কীয়ে কেন পকু ?

পকানন

আজ্ঞে ও কিচু নয় । ( বসত ) তালা উড়েচ আপদ—  
( প্রকাবে সাধব প্রতি ) আপনার মঙ্গলার কর্ছটা দিন,  
( বন্দরের প্রতি ) নে পালা—(চৌপালা ছুটো বন্দরের কোন্ হুঁকে  
দিয়ে ) ও'বেলা বাম দিয়ে বাস্ ।

দপদপ

কেবার বাবু—নৌককুইটির বাবু—আপ্পনি বি মরি গলা,  
মতে বি মরি গলা—

নেপাল

এঁা পাচু—কি বলে ? মাঝা কি আসার—চুপ ক'রে  
ঠাইলে বে ? মাঝা কি তা হ'লে নেই ?

( হ'কো মাথিবে বাবসেব ) •

পকানন

( মাঝা চুপে ) এঁা মাঝা ? হ্যাঁ—তাই ত শুন্টি ।

নেপাল

নেই ! মাঝা নেই ! ওকোচো, মাঝা, মাঝা !

( কোথ সাগদ মিলেন )

পকানন

( মধ্য ) ও'ল মন্ডা বেটা—ইচ্ছে করে বেটাকে—  
( মধ্যমের অতি ) যে পরমা দে—

মদরথ

আন্তে তু দেউহু—( পকাননের হাতে পরমা দিত ) আউ সে  
গুটে পরমা হুচে, গুটে টকা হুচে—খিটা হুচে, তিনটা হুচে,  
চারি চারি টকা—আঃ মতে সারি দেই মগাচে. সারি দেই  
গলা ।

( অসুস্থের প্রবেশ )

অপূর্ণ

মিও ত পকানন, এক টাকার গোটার মন্ডা বেধে ।

পকানন

গোটার মন্ডা ? বিজি । ( তাড়াতাড়ি পেটল্য বেঁধে গোটার  
মধ্যে পুথত লাগলো ) এই ধনে, এই লক্ষা, এই জিরে মরিচ ।

মদরথ

( কপাল চাপড়ে ) মোর কপাল, মোর কপাল ।

অপূর্ণ

কি রে মদরথ—কি হুচেচে ?

মদরথ

( বুক চাপড়ে ) কাটুটি গলা, কাটুটি গলা ।

অপূর্ণ

বল না বেটা গুনি—

পকানন

কি শুধুন উকীল বাবু ?—শাকি বেটা, অমায়  
মকাটি ধরে—'কাটুটি গলা'—বেঁজো, বেঁজো দোকান  
থেকে ।

মদরথ

হৌচ—আন্তর মদরথ তাংক বরাংরে কাম ককডরে ।  
মো-তলব তাক হাতরে দেই গিবে পরা—বাউ ।

( প্রবোধান্ত )

পকানন

হা, মেগের বাড়ী গিরে মন্ ।

মদরথ

আউ বাঁচবি কঁড় ? মরিচ ত টকা মরিচকি মরিচবি—

( অগম )

পকানন

( টোপলা ধাক্কা ধাক্কাতে )—এই লবন—এই কাঁচকল—এই  
কর্পূর ।

অপূর্ণ

উনি কে ?

পকানন

কেবার বাবু তাই—

অপূর্ণ

কেবার বাবু কি তা হ'লে—

পকানন

আজ্ঞে হ্যা । ভাবলুম এখন শোঁাব না, ম'বে দেশ  
থেকে আসছেন—তা বেটা উড়ে—

নেপাল

ওঃ পকানন—মতি তো ?

পকানন

তম্ পবর কখনো মিথো ছি ছোটবাবু ?

নেপাল

ওঃ—নাই দেখি তাঁর গতির বাবুতা—

পকানন

সে এতকল হ'বে গেছে—সরকারী গাড়ীতে ফুলে—

নেপাল

সরকারী গাড়ীতে ! ওহোহো—আপনার ভন থাকতে—  
আমার ঠিক ঘন টেনেছিল—ওহোহো পকানন, সব ভেঙ্গে—  
বাই দেখিগে ।

পকানন

কেবার যাচ্ছেন ? সে বাড়ীর দিকে আর যাবেন না ।

নেপাল

যাবো না ! বন কি ? তাঁর যে অনেক জিনিষপত্র—

পকানন

সে সব এতকল পুড়িয়ে দিচ্ছে—মেগের কই তো ।

নেপাল

ও বরাং—ওবে আর—ওঃ দাদা,

রোগেই গেলে !





অপূর্ণ

( ২৩১ ) হ'—দাখার চেয়ে দাখার জিনিষের উপর

নেপাল

ওগোহো—এমন দাখা করো তর না—বখন যা

চেয়েছি—কোখার কি রেখে গেছেন—

অপূর্ণ

( নেপালের কাছে এসির খিচে ) কোখার কি রেখে গেছেন,

জানেন না ?

নেপাল

কিছু কিছু জানি । দাখার পাঁচেক আছে নর্থব্রিটিশে

আর দাখার দশের চাটীর থাকে—

অপূর্ণ

তার ত এখন ওয়ারেন আপনিই ?

নেপাল

না আমি আর কই ? দাখার ভাইপো আছে—

অপূর্ণ

ও ভাইপো ! নাবালক বৃত্তি ?

নেপাল

হ্যা—বড়র খানেক পার্জেন গাঁকুতে পারবে ।

অপূর্ণ

তাতে আর কি হবে ? আচ্ছা ( হাসি করে ) আপনায়

দাখা যদি আপনাকে সব উইল ক'রে দিয়ে থাকেন ?

নেপাল

এঁা—বিচ্ছেদে নাকি ?

অপূর্ণ

( বেশ ) বিচ্ছেদে বৈকি কোয়েলী উইল—বুঝেন না ?

নেপাল

ও বাবা—সে উ'ক'বে ?

অপূর্ণ

হাঃ হাঃ—আপনায় ভাইপো ত বেশে আপনায় কাছেই

থাকে ?

অপূর্ণ

নিশ্চয় আপনায় বাবা ?

নেপাল

এখনো ত অবাধা তর নি ।

অপূর্ণ

আপনি প্রোবোট নিচে গেল সে আপত্তি যাবে ?

নেপাল

অপূর্ণ

তবে আর উ'ক'বেনা কেন ? তার নাম নই কত.—

একখানা চিঠি পেলেই হয়—

নেপাল

চিঠি তো এই একখানা আছে ।

( পকেট থেকে একখানা পোর্টকাট বের করে )

অপূর্ণের হাতে দিলেন )

অপূর্ণ

বাস্ এই তো—আর সব আমি আছি ।

নেপাল

দাকী ?

অপূর্ণ

বল্ছি আমি আছি । আর চাত্রে আমার লুকে দেখা

করেন । উকীল অপূর্ণকৃত—ঐ মোড়ের মাথায় বাড়ী ।

নেপাল

বে আজে ।

অপূর্ণ

কিন্তু অজ্ঞ ফিলে হবে না—বুঝেন তো ?

নেপাল

সে আপনি ক'রে বিয়ে বা চাইবেন !

অপূর্ণ

না না—আগেও কিছু—বাক্ আর দেখা করেন ।

নেপাল

বে আজে ।

অপূর্ণ

( পকনেরেও প্রতি ) টেক পকানন, চলো ?

মুখে মুখে  
ঐদীপচন্দ্র বটক

পকানন

পকানন

আজ্ঞে এটী হুগেচে—আমুন্। ( অমূল্যের হাতে তোলা মিলে।  
হুগড়ির কবেল— তার বালি পা, হাতে পাচলা চাকর )

আর সেটা চুপ্লেই—দোকানটা হাতে—সেটাও বড়  
কম নয়—

হুগড়ি

নেপাল

পাঁচু পাঁচু, একশরনার তিল আর এক শরনার কুণো—

ঐটা সেটাও—কিন্তু এখন আর—

নেপাল

পকানন

ওঃ দাদা—দাদা !—দব আমার হাড়ে বিয়ে গেলে !

বেশী না কিহুন—কিছু অস্বস্ত—হাতে হাতে এখন

( গোপে কাপড় দিলেন )

আপনারকেই ত জালাতে হবে—( হুগড়ির মতি ) এটী নাও

অমূল্য

দাদা—তোমার তিল আর কুণো।

আর আমার হাড়েও কিছু—

( হুগড়ির হাতে হুগে সেটা বিয়ে দিলেন )

হুগড়ি

হুগড়ি

কি হুগেচে উকীল বাবু ?

( হাতে হাতে নেপালের কান বিয়ে ) বড় ভাটী না

অমূল্য

শিত্তুলা : এ একটা শিত্তুলা বুলেট হুগে।

হুগি হুগড়ি, কিসের অগ্রদূত ? মাগুব মরলে টের

নেপাল

পাও না ?

হুগড়ি

হুগড়ি

এঁটা—ওর বুকি দাদা মরেনে ন—কবে শ্রাভ ?

এখন আপনার হাতেই উকীল বর্ণ—অমূল্য বর্ণ কেন, অকস-

অমূল্য

বর্ণ :—যদি বুঝেওলপটাও করেন। আর কবেবনত বা না

সে হুগি শোনো—( পকাননের প্রতি ) আসি পকু,

কেন ? এ হুগুন আপনার একটা শেষ কৃষ্ণ—একটা

পাতায় লিখে রেখো—

কোম মেনোনা : যে, ঐটা বেটে থাকতে কিছু করতে

( প্রয়াস )

পারিনি, কিন্তু এখন বা কবলুন চুড়ান। আর পায়েও

পকানন

হলেচে—“আজ্ঞাভায়ে বুঝেওলপে চিরা কাল সুখোহভবৎ।”

আবার বাতায় ?—আজ কাব মুখ দেখেই—

নেপাল

হুগড়ি

বেশি কি করতে পারি।

বাবুটি কোথায় থাকেন পাঁচু ?

হুগড়ি

পকানন

পাকেন বৈকি—যখন মন হুগেচে, নিশ্চয় পাকেন।

( হুগড়ির প্রতি গোপে ইঙ্গিত করে অন্যথাকে ) হুগে

আর এমন কিছু বসন্তও নয়। আমি যেখা ওনা করলে

হাড়াও না। ( অকস্মে ) আর কেঁবে কি হবে ছোট বাবু ?

কোনো বেটা উটুঝিয়ার দাদি নেই যে এক শরদা ভড়িয়ে

তিনি বা গেছেন—ভালই গেছেন। পুনরায় পুনরায়।

নেই। তা বাবু কি কলকাতাতেই শ্রাভ করবেন ?

এখন তাঁর ছেয়েকোটা হাতে ভালো ক'রে হুগে—আপনারদের

নেপাল

ত মোটে—এক দিন ত বেরিয়েট দেল—আর ন'টা দিন

না, দেখে।

মাজুয়।

হুগড়ি

নেপাল

তা বেশ, তাতেও কতি নেই। বাতায়িত মিলে যাবে

ঃ শ্রাভ ! ঐটা, এখন শ্রাভই—

বৈকি ) এটা একটা পরোপকার, আমারদের কাজই হুগে

এই—তা বাবু বেশে যাজেন কবে ?



নেপাল

চক্ৰি

গা হ'লে ত জিনিষ পতন আভট কিমতে হয়।

নেপাল

ঠা, তটুচাপিগৈ কিং একটা কৰ্ছ কৰিয়ে—

চক্ৰি

কিচ্ছ, লাগবেনা—কৰ্ছ আমাৰ সুখে। তটুচাপিগৈ  
যতকণ পুৰি হাটুকায়ে ততকণ আমি—চপু, এখনো  
গোম চাপেগৈ—সকাল সকাল ছটিতে বেজিয়ে পড়ি বড়বাজাৰ  
নতুন হাজাৰ, বউবাজাৰ, সব দেৱে হুপুৰ না খুৰতেই—  
আহুন—ব'লে গ'লেগেট গোক চেপে ধৰে—কাঙট  
ওচ চপু—আহুন, বাগটা না হয় আমিহি নিয়ে  
বাছি।

( বাগ কিং উই হাডালেন )

পকানন

চক্ৰিলা, একটু শুনে যোতা ?

( চক্ৰি সকলকৰ কাঁচো লেন )

চক্ৰি

পকানন

( চক্ৰিলা ) না, এট মোকানে মোকানে ত বড়ৰী  
পাৰেট—মোখা আমাৰ ককোট পেলে এটা বেন মনে  
বাচে।

চক্ৰি

( চক্ৰি বিক্ৰিৰ কৰ ) আহা, আহা জাৰি। ( ই এক  
শা এলিগ খৰ ) বড় ছোট নকৰ—বেনে তো। ( বেগালে  
অতি ) আহুন বাবু, জুতো পায়ে দিবে আসুচেন ? ওটা কেড়ে  
কেলুন—

( নেপাল অস্তিত্ব হ'ব জুতা বুকে কেলুনে )

চক্ৰি

জটা আমিহি পায়ে দিবে নিয়ে বাছি—

( জুতা পায়ে দিলে )

পকানন

( খৰ ) জুতা ছোকাও নিলে—বড় ছোট নকৰ—  
ওটা বাবুন কি না ( একায়ে বেগালে অতি ) বেকাৰ ভাষাকটা  
বাগা হ'ল না।

নেপাল

আগ তামাক—আমাৰ বা কণো—

চক্ৰি

কিছু হ'বে না, সব টিক ক'ৰে যোব—আহুন।

( আবে বাবে চক্ৰি ত তার শিঠনে শিঠনে বেগাল চক্ৰন )

পকানন

কিংৰ আখাৰ মোকানে আসুচেন—আপনাৰ কন্ডটা হ'বে  
কিছু সৰে দিবে যোব—

নেপাল

এখন কি আৰ টাকায় কুলোবে ?

পকানন

আজ্ঞে গাম না চৰ এখন বাঁকাই থাকুবে—আপনি ত  
আৰ পর ন'ন—আজ্ঞে পর বখন বুঢ়ী পাঠিয়ে বেধেন—  
( চক্ৰি ত বেগালে গয়াল )

একেই কলে সুখেৰে গাম ছুটে বাগা। আর আপবও  
চৰ—এক উড়ে—এক উকীল, এক অস্ত্রবানী—আমাৰ  
হাতে ছোকা—ওতা মাৰচে ছো। বত চিলেৰ মৰণ।\*

বিত্তীয় দৃষ্টি

পাড়া গায়েৰ বাঁকাই আছিল। আছিল এক কোণে গু কা  
পোতা—চায়ে গুটা বাহুৰ থকা। আছিল বাহুৰে বিমল বেড়া  
বাধাৰ ভাটা বলাৰ দিবে গাঙ কৰচে বসে। লালনে কলক  
ভাটাৰ পুৰি বুলে উহু হ'বে বসে। চাৰ পায়ে কলাৰ বোলা  
নেবেদে হাঙালো—কলাপাতাৰ কুল হাঙালি জিলা আলোচাল—একটা  
হালদাৰ শিঠীৰ ভাট। অকুৰে চক্ৰি একটা কটাৰি দিবে জোকা  
ভেটী কৰচে। বিমল বাবে বাবে উঠাই দিবে জোব হুণ্ডে।

( বেগালেৰ জেল )

নেপাল

কাঁহিমনি বিমল, কাঁহিমনি—হামা গিৰেচেন, আমি  
ত আহি।\* আমি তোকে ডান চাপা দিবে কাকো।

কলক

হাৰনেই তো। শিঠীৰ আৰ শিঠা কি অলোকা ?

পক— 'ও বেদভাটা: এবিভাচ'—আহাৰা চোখেৰ কল  
কেলো না—ওতে সঁচৈৰ অমলগ হ।

চক্ৰি

সঁচৈৰ অমলগ! অলোকা বলুন।

# মুখে মুখে ঐতিহ্যের ঘটক

জগদীশ

মাঃ তুমি কেন—তুমি এ সন্দের কি বোঝ ? এসেছে  
চাঁদা বাধতে—

ভক্তিকি

হ্যাঁ হ্যাঁ চুল ককন্—আপনার মস্ত অনেক শুটুচাঁকাকে  
চাঁকে—

নেপাল

কি করেছ আপনাতা—কাজ ককন্ !

জগদীশ

কাকে আমার চুল হবে না। আমার আজ্ঞাপ্রাচীর  
পড়ুন নই। পড়—

‘ও দেবতাতঃ ঋষিত্যক্ত মহাপুণ্ডিতা এবচ

নমঃ সুখাটৌ বহাটৌ নিত্যমেব তবদ্ব পি’

কৈ—পড়লে না ?

বিমল

( চোখ মুছে ) পড়েছি।

জগদীশ

মনে মনে পড়লে কি চর বাবা ? এব নাম মনসঃ।  
এব উজ্জয়ন্তে কল।

ভক্তিকি

মথায় যে উজ্জয়ন্ত করলেন—মুগ্ধতা ! বৈগিতা আর  
বেঙ্গলো না।

জগদীশ

আরে কেতে বাপু, তুমি টিক টিক করছো—সংস্কৃতির  
ল গানো না।

নেপাল

কেন গোপ করছেন ? ওতে যে আরো গুণিয়ে  
কেনবে। পড়, বিমল, পড়—কাঁদিলনি—কোর কিছু তাবনা  
নেই—দাখা, কি আর না বুকে আমার নাখে লব লিশে  
বিয়ে গেছেন ?

বিমল

জগদীশ

লব আপনায় নামে !

নেপাল

কেন না আমাকে দেওয়াও যা ওকে দেওয়াও তাই।  
তবে ও ছেলে মানুষ, কাঁচা পখা চাতে পড়া ভালো নয়—  
সেই কয়েকটি—

বিমল চোখে চক্কর মিলে )

জগদীশ

তা তুমি কাঁচটো কেন বাবা ? তোমার কাকা  
চেমন লোক ন’। তোমার কুটোচুৎগ ঘাবে না।

ভক্তিকি

আর ঠিক যখন ছেলে পূলে নেই—

জগদীশ

মা, কেন বকুচো ? তবিয়ে কবলে এমন কাকা মে

ভক্তিকি

কেন মণার বামে কথা কইছেন ? উনি দাখাং দেবতা।

নেপাল

ওকে মাত্র ক’বে তেবে—মরণের সময় ওকেই লব দিয়ে  
যাবো।

জগদীশ

আহা, পোনো বাবা পোনো—এমন কথা আর কেউ  
বলবে না।

ভক্তিকি

সে ত কানো কথাই। নতুন কি বলছেন ? তুমি মনে  
কর বাবা, তুমি পলকেই আঁচলে রয়েছ।

জগদীশ

আহা নতুন কথা বললে ! তুমি ঠিক ক’দিন গানো  
বাপু ? উনি আমার তিন পুরুষের বহুমান। ( বিমলের প্রতি )  
ছিঃ বাবা, তবু কাঁচটো ? আমি যে-সে ব্রাহ্মণ নই—  
আমার মূখ দিয়ে যা বেড়িয়ে গেছে তার নড়চড় হবে না—  
আমি যখন বলেছি তোমার কিছু বাবে না—

বিমল

বাবা যে এত ঈশ্বর—

জগদীশ

ও সেই জন্তে ! তা দেখো বাবা এর প্রমাণ মস্তিষ্ক  
পড়াগেই আছে—‘নাকালে দিবতে যবঃ’ অর্থাৎ নাকাল



চলেই শুধু মরে। তোমার বাবা কখন না চলেও টাকা টাকা  
ক'রে অনেক নাকাল হয়েছিলেন কিনা।

ভকড়ি

আর ত্রি বে কিলে আছে—

জগদীশ

হ্যাঁ কিলে আবার? বরাহমহিতার—‘মাতঙ্গি কি  
:’ অর্থাৎ কব বলছেন—‘মাতঙ্গি তো ভালো মানুষের  
কাজেই চাপ করবার কিছুই নেই।

বিমল

বাবাকে একবার দেখতে পেলুম না।

জগদীশ

দেখতে পেলো না? আচ্ছা!

তিনি তোমার দেখছেন।

বিমল

জগদীশ

দেখছেন বৈকি। নৈলে পুরক শিত্তি দিয়েছি কি  
করে? ছিলেন ‘মাকান্দো নিরাপথ: বাবুজো নিরাপথ:’  
অর্থাৎ আকাশে যা চ'রে, নিরাপথ: কিনা জলে লগা হ'বে,  
বাবুজো: কিনা বাতাসে ভুত হ'বে, নিরাপথ: কিনা নিরন্তর  
পরিপ্রসন্ন করছিলেন—আর এখন—

ভকড়ি

এখন হৃদয় শরীর পেরিয়ে।

জগদীশ

চুপ্ করো। ছেলে মানুষ কখনো হৃদয় শরীর থেকে  
এখন প্রত্যক্ষ বুঝলে বাবা, প্রত্যক্ষ দেখছেন। এই  
এখন যা মন পড়াবে তাতে তিনি সরাসরি নেবে এসে ঐ  
কাপড় পরবেন, ঐ শিত্তি থাকেন।

বিমল

তবু আমি তাঁকে দেখতে পাব না?

জগদীশ

কি ক'রে পাবে বাবা! সত্যকাল হ'লে গেতে। সে  
তক্তি কি আর আছে? না, তেমন বাবুল হ'লে কেউ  
জাকতে পারে?

বিমল

জগদীশ

হা: হা:, এত দরল মৈলে আর বাগল। বাবু অনেক  
কথা হয়েছে—বল 'ও বিজু', বলেছ? আচ্ছা এইবার ঠাও  
জোড় ক'রে তাঁকে আমান কর।

'ও এটি প্রেত শোমাণো গভীরে: পথিভি:'—কৈ  
পড়—ভাড়াভাডি চ'রে আছে? আচ্ছা: আচ্ছা: মাঝে মাঝেই  
বলচি—'ও এটি প্রেত'—অর্থাৎ কিনা তে প্রেত তুমি  
এসো—'ও এটি প্রেত,—

বিমল

( নমসকরে ) ও এটি প্রেত—

ঐ আসছেন।

জগদীশ

কে—কে? ওতে ক'বাবা!

( উঠে দাঁড়িয়ে ঠাকুর ক'রে কপতে লাগলেন—হাব কাটা গুলে  
পেল )

ভকড়ি

( ৪ দিনটে চোলা মাখা দিয়ে ) রাম রাম ভূর্গা ভূর্গা ভূর্গা ভূর্গা  
রাম রাম—

জগদীশ

আর ডেকো না বাবা—গে ডাক ডেকেছ—

ভকড়ি

এ লব কি আছে?

( ভকড়ি জগদীশ পরস্পরকে এড়িয়ে খ'বে নাচাবলী মুড়ি দিলেন )

( বন্দ্য ) ওই জন্তে পলু বগলছিল যে ঐগগিগু বাড়ী ধান্—

একটা কি বসে পোলমাল হয়েছে।

• নেপাল

( হাত কোড় ক'রে ) দাদা, আর কেন—আর কেন?  
যাও কাটিয়েছ ত আর কেন—অগর্জন চণ্ড—আমি  
কলিই গম্বা দিহে—

কেদার

(কিৎসোৎসবকত) এতদূর পড়িয়েচে! (বিশেষ প্রতি)  
বাবা বিমল, ওঠো আর প্রাচু করতে হবে না। (কৌতুকবশে  
নেপালের প্রতি) আর নেপাল, তোরা লস্ক আমায় খোঁজাগড়া  
মাছে।

নেপাল

এঁরা এঁরা—বোকাগড়া! না বাবা—আমায়  
চয়েচে—আমায় কমা করে।

কেদার

(বেশ) কমা! কখনো না। এত বড় গুরুতর কাজ  
কেউ কখনো করে?

নেপাল

আমি নিজের বুদ্ধিতে করিনি।

কেদার

তা ত বুঝতেই পেরেছি। কল্‌কাতার গিরে উড়ে  
গোকেকরু উড়ে কখা কখন—

নেপাল

মস্ত উড়ে—লোক—জালিয়াং উকীল—অপূর্ণ ঘোষ;  
তুমি ত এখন অজ্ঞানী, সবই বুঝতে পারচো। আমার  
মোটাই ইচ্ছে ছিল না—আমার এক রকম ধরে গেছে— সে  
উইল আমি এখনই গিরে ছিঁড়ে ফেলছি।

কেদার

কোন উইল?

বিমল

ঐ যাতে আপনি কাকার নামে সব লিখে দিয়ে দেন।

কেদার

হঁ—আচ্ছা আমি কল্‌কাতার গিরে অপূর্ণ ঘোষের বাড়  
ভাঙেবো। এখন যাওতো ভাই, বাড়ীর ভিতর গিরে ছোট কোল  
ভাতের ব্যবস্থা করোগে—কেননা ও পিত্তী ত আমার গলা  
দিয়ে নাহবেনা। বা—বা—অত আড়ট হ'লে থাকিল কেন?

নেপাল

না থাকি।

(নেপালের প্রস্থান)

জননী

নেপাল বাবু থাকেন নাকি? আমায়ের নিচে বাবু!

কেদার

কেন, আপনাদের কি পা নেই?

জকড়ি

পা পেটের মধ্যে ঢুক গিয়েচে। আপনি অস্ত্র না  
হ'লে আর বেহায়ে না।

কেদার

হাঃ হাঃ—আচ্ছা, আপনাদের কিছু বলবে না—  
আপনারা যতদূর পা বেব করুন। মোকা ঠা নৈবিশি,  
মকিগে, কাপড় গান্ধা, কিছু খেন না প'ড়ে থাকে—পুঁটের  
নিরে খাবেন। আর তা যদি না নেন—

জকড়ি

নিজি—নিজি—

জননী

তুমি কেন, আমিই নিজি।

(রকমে কাঁড়াকড়ি করে লাঞ্চে বিভিন্ন ভাষায় বাবু'র মাথায়)

জকড়ি

জননী

বেশী কথা বোল না। দখাল ছেড়ে  
কতকল লাবে?

(হঠাৎ পোঁটের বেশী জড়ুত করে বেরিয়ে গেছে)

কেদার

(বিশেষ করে গিরে তার মাথা হাত বুগিয়ে) এবার  
যেন কালো চুল উঠবে।

বিমল

(কেদারের হাত নীচ থেকে উপর খাচা উঠে) বাবা, তুমি  
মরোনি—না?

কেদার

মরতে পারি কখনো? তুমি এখনো বড় চরমি।

বিমল

তবে যে কাকা বলেছিলেন তুমি মরেছ?

কেদার

তোমার কাকার ঘিষো বলেননি। মাহুদ ভ্রষ্টকমে  
মরে—এক সত্তা সত্তা, কার এক মুখে মুখে। আমি  
মুখে মুখে মরেছিলাম।

সবনিকা

## কোলনের প্রেস

### শ্রীমণীজলাল বসু

বিমান-পোত কাউন্ট জেনেলিনের আটলান্টিক পাবাশ্যের মত কোলনের গেসা কেবলমাত্র গুপ্ত বসবসে (১২২৮) ভার্সানীর নথি, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। গেসা সম্বন্ধে ওরকম আত্মকীর্তিক প্রদর্শনা যথেষ্ট হয় এই প্রথম। প্রেসা প্রধানত প্রেস অর্থাৎ পত্রের কাগজের প্রদর্শনী হ'লেও, ওখানে 'প্রেস' অতি ব্যাপক অর্থে ধরা হইতেছে। — প্রেসার আর্থান-বিভাগে ছাপানান্য বস্তু-কথা তার পরিপন্থির ইতিহাস দেখান হইতে, তা ছাড়া তার অনেক আত্মকীর্তিক বিষয় দেখান হইতেছে।

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে মুদ্রাব্যয় চক্রে ভার্সানীর পনি। অবশ্য চীনেতে বস্তুপুস্তি মুদ্রাব্যয় ছিল, সুদীর্ঘ সাত শতাব্দীতে টাই-ব্রুকিংয়ের সময় পাকমুদ্রার ব্যবহার কাগজ ব্যয় হ'ত; কিন্তু চীনেদের মুদ্রাব্যয়ের বিশেষ উন্নতি হয় নি, তা পৃথিবীর অপরূপে ছড়িয়ে পড়েনি। গুটেন-বের্গারের (Gutenberg) মুদ্রাব্যয়ের উদ্ভাবনের পর মানবসভ্যতার এক নতুন পর্বের আরম্ভ হ'ল। এই গুটেনবের্গারের বাড়ী ছিল মাইনসে (Mainz) কোলনের পূর্ব কাণ্ডে। মাইনসে সহরে ১৪৫৪ খৃঃ অব্দে গুটেনবের্গার তার নব্য-উদ্ভাবিত মুদ্রাব্যয়ে প্রথম বই চালেন, তার পরের বৎসর প্রথম বাইবেল ছাপা হয়। বিস্তৃত অস্ত্রের মত এই মুদ্রাব্যয়ের জন্য মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক মহান বিশেষ ঘটনা; এই মুদ্রাব্যয়ের সাহায্যে মানবসভ্যতা যেমন শক্তি ও ব্যাপকতা লাভ করেছে, তেহি তার পতি ক্রম ক্ষুদ্র হয়েছে। হাইন-নখীর গোলের উপর গাড়িয়ে এখনিবে কোলনের চাক-চাকালি ও অপরবিধে প্রেসার পদচক্রী বৃককগুলির যিকে চেরে মনে হ'ল, গুটেনবের্গার কি মস্তও তাবৎত পেরেছিলেন যে, তার এই উদ্ভাবিত বস্তু আরও পরিপূর্ণ হ'য়ে পাঁচ শতাব্দী পরে মানব ইতিহাসে দখল চেরে

বড় শক্তি চেরে; তাবৎ যে দখল শক্তির ব্যয়ক পনিচালক চেরে, তাছাড়াই শোব দৃষ্টি বিপর ঘটবে, বাজা-গুটপালট হ'য়ে যাবে।

গুটেনবের্গারের মৃত্যুর ৫০০ত চারিদিক চড়িয়ে পড়ল। ১৪৯৫তে এল ইতালীতে, ১৪৯৬তে এল ফ্রান্সদেশে,



টেনবের্গারের বাইবেলের একটি-পাতা  
লন্ডনচক্রে ছাপা প্রথম বই

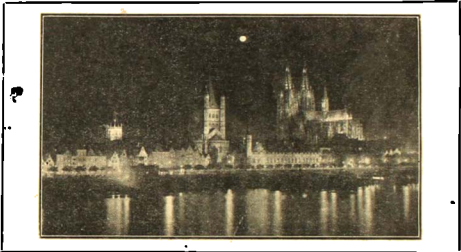
১৪৭০তে এল ব্রুসি, ১৪৭৭তে এল ইলভে; উইলিয়াম কাম্পটেনি বেলজিয়াম থেকে মুদ্রাব্যয়ে চালন বিশেষ লগ্নে ওয়েমিন্টারে তার ছাপাখানা খোলেন ১৪৭৭তে। আর

বাংলাদেশে মুসলিমরা আসে আঠারো শতাব্দীর মধ্যভাগে; ১৭৭৮-তে ইই টিগ্রা কোম্পানীর একটি দাওব লগুনীতে একটি বাজার স্থাপন করেন, তারপর জিহাদপুরে তেঁবি দাওব আর একটি বাজার মুসলিমরা চালান, এইভাবে বাংলাতে মুসলিমদের সূচক হয়। ইংরেজদের মত তারাও মুসলিমরা যদি শব্দের শতাব্দীতে স্থাপিত হ'ত, তা হ'লে ভারতের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ নব রূপ নিত। বসত, মুসলিমরা ছিল

ব'লেই লুগার জার্মানিতে রিফর্মশন-মোশন (Reformation) চালিয়ে পেরেছিলেন, মুসলিমরা ছিল ব'লেই করালী

কাঁচের গৃহস্থ ছবি দিয়ে বহুখানি গড়া, চাক্ষুণ্যে দেখে মধু সাধুদের সৃষ্টি, এট বহুখানিরে ছেঁয় সংবাদ প্রচারলকারক-দের সৃষ্টি,—জার্মানীর প্রাচীন চারণ কবি (Minnesinger) ওয়া-টার অফ ডোপেল ভাইডের ছবি প্রথমে, ইনি গান বেঁধে প্রাচীনতম মত প্রচার করতেন; তারপর গুটেন-বের্গের ছবি, সংবাদপত্রের প্রাচীনতার মধ্যযুগে মিন্টেনের ছবি ইত্যাদি নানা ছবি।

তারপরও পরর্ত্তে নেওরালে গৃহস্থ গৃহস্থ অক্ষর ছুঁতে ইংরেজীরা তাৎপার্য বর্ণমালায় উৎসাহিত, পরিণতি



ঐতিহাসিক আলোকমালা দীপ্ত কোলন

বিসংখ্যে আশ্রয় করেছিল; আর বর্তমান শতাব্দীতে খবরের কাগজই লোক রাষ্ট্রনৈতিক অ্যামোশনের বাহক ও চালক, খবরের কাগজই লোকমত সঞ্চে, ডাক্তারি, নব রূপ দিচ্ছে; জাতির সহিত জাতির, দেশের সহিত দেশের সম্বন্ধ বা শত্রুতা খবরের কাগজের প্রণয়নাত্মক ওপর নির্ভর করছে।

ঐতিহাসিক বিভাগ থেকে স্রেফ দেখা হইত করা গেল। সপ্তম বর্ষটির নাম হচ্ছে “দর্শন-গৃহ” ‘খবর-ব-কাগজ’ হচ্ছে কালের দর্শন—এই বর্ষটির পোড়ার লেখা, আর এই কথাই হচ্ছে ঐতিহাসিক বিভাগের মন্তব্য। পঞ্চাশতকের রাজত্ব কাঁচের গৃহস্থ জালাপার মত রক্তান

দেখান হয়েছে,—গাণ্ডিক লাটিন, ইত্যাদি বর্ণমালা। তারপর সপ্তম বর্ষে পুরাতন দিনের ছাপা কতকগুলি বই সাজান; কোন বই ১৪৭৩-তে আন্টওয়ার্পে ছাপা, কোন বই ১৪৭১-তে তেনিসে ছাপা ইত্যাদি।

তারপর কয়েকটি গৃহস্থ বই ছুঁতে মডেল ক'রে দেখান হয়েছে, বর্তমান খবরের কাগজ ছাপার আগে কি ক'রে গৃহস্থে গ্রামে সংবাদ ছড়াত। বর্তম, খবর জানবার উৎসুকতা মানুষের একটি স্বাভাবিক আদিম প্রবৃত্তি। শালের বাঙালীতে কি হয়েছে, গানের গ্রামে গৃহস্থে কি ঘটছে, শালের মধ্যে কোন দুঃ বিপদ হয়েছে কিনা এম সব খবর





তানবার তরে লক্ষ্য পতাকীর লোকই উদ্ভাবী ছিল।  
গান ছিল গবর ছড়াবার এক উপায়, তাতে বাজারে চাষেবা  
গান গেয়ে শবর দিত, তার সঙ্গে রাজনৈতিক মতও প্রচার  
করত; ছবি ছিল আর এক বাহক, চোটে কোন কারখানা  
ছবি এঁকে দেখান হত, কি খটেছে; তারপর চিত্রি ছিল  
শবরের কাগজ। বস্ত্র, ইলঙ প্রভৃতি নামাঙ্কে  
বর্তমান ছাপা শবরের কাগজের আগে চোটে-লেখা শবরের  
চিত্রি সংবাদপত্রের কাজ করত। মতি প্রাচীন কাল থেকে  
"royal letter" বা রাজার চিত্রি রাজার প্রধান দরকারী  
তানবার তর পতন থেকে চোটে লেখা হয়ে চিত্রির

বহেছে; পনেরো পতাকীর দাখার লোকের লাক প'রে  
কয়েকটি লোক স্টেটমেন্টের সময়ের জাখান পথিক  
হরকে বইয়ের পাতা ছাপছে প্রদর্শনীর পরিদর্শকদের  
দেখাবার ক্ষেত্রে—আর ছাপা পাতা অভাগতদের বিতরণ  
করছে। এ খরটি দেখে স্টেটমেন্টের আদমি ছাপাশানার  
সুন্দর চিত্র পাওয়া গেল।

এ খরটির পাশে একটি অঙ্ককার বৃহৎ ঘর, ঘরের মাঝখান  
ছুড়ে আঠারো পতাকিতে কাগজ তৈরী করবার একটি পুরনো  
জলপ্রবাহচালিত ঘর, চ'শত বছর আগে কি ক'রে কাগজ  
তৈরী হ'ত তা কয়েকজন লোক ছেঁড়া স্রাকড়া থেকে  
কাগজ তৈরী ক'রে দেখাচ্ছে। অবশ্য  
বর্তমান ঘরের মুদ্রা বহুগুলির কাগজের কুশ।  
এই ছোট জলবহুগুলি খাড়া মেটান  
অদৃষ্টব। প্রদর্শনীর গাইড থেকে লেখা  
আছে, ১৮০০ খৃ: অব্দে জাখানিতে গ্রাহ  
১৫,০০০ টন কাগজ তৈরী হ'ত। তখন  
একটা বৃহৎ কাগজ তৈরী করবার বহু,  
পূর্ব কোর ৩০,০০০ ড্রিণ্ডার কিলোগ্রাম  
কাগজ তৈরী করত; আর এখন ১৯২৭তে  
জাখানিতে ২০,০০০০ ড্রিণ্ড লাক টন  
কাগজ তৈরী হয়েছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক  
পক্ষিচালিত কাগজ তৈরীকরবার বহু বছরে  
তিন খ' লক কিলোগ্রাম কাগজ তৈরী



জল-প্রবাহ চালিত কাগজ তৈরির কল

মত নানী লকর গ্রামে পাঠান হ'ত; দেখানো চোটে বজারে  
রাজার লোক দাবীকে সেই চিত্রি ভূমিরে বহর প্রচার করত।  
যখন মুদ্রাবর প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন পতর্শেষ্টের এত কড়া  
নকর ও পাসন এই মনশক্তির উপর পড়ল যে, সংবাদপত্র  
ছাপান লক্ষ ও প্রাখার রটল না। তখন news-letter  
ও news-book বা সংবাদের চিত্রির পূর্ব প্রচলন হ'ল;  
এই হাতে লেখা চিত্রিতে সব সংবাদ কড় ক'রে লেখে সপ্তাহে  
একবার বা দুবার গ্রাহকদের ডাকে পাঠান হ'ত। তখন  
সংবাদপত্র লক্ষই সংবাদপত্র ছিল।

চোটে লেখা সংবাদপত্রের ঘর দেখে পয়ের ক্ষেত্রে দেখলুম  
স্টেটমেন্টের সেই আদমি মুদ্রাবহর একটি বৃহৎ মডেল

করেছে, অর্থাৎ পুরাতন আঠারো পতাকীও কাগজ তৈরী  
করবার বহর একশত গুণ বেশী! অবশ্য জাখানিতে বহু  
বই, শবরের কাগজ, পত্রিকা ছাপা হ'র ইয়োরোপের কোন  
বেশে তত হ'ল না। এক শবরের কাগজই জাখানিতে তিন  
হাজারের ওপর আছে, সাপ্তাহিক সাঙ্গিক উত্থাবি পত্রিকা  
গ্রাহ হ'র হাজার হবে। ১৯২১তে জাখানিতে ৩০ হাজারের  
তশত বই ছাপা হয়েছিল, এখন আরও বেশী, কাগজ ১৯২১  
জাখানীর চলেমর থেকে।

কাগজ তৈরী করবার ঘরের ঘর পাতা হ'রে পুরাতন  
সংবাদপত্রগুলির ঘরে আলা গেল; বস্ত্রের পর ঘরে কি তাই  
শবরের কাগজের পরিপতি উত্তি রয়েছে তাই দেখান হয়েছে।

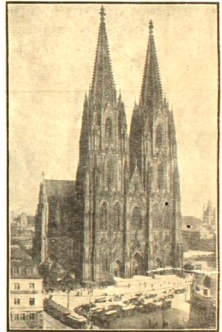
একটি ঘরে যোগ পতাকার ছায়া বই, তার পরের ঘরে সন্তোষ পতাকার ছায়া, তার পরের ঘরে আন্তোয় পতাকার ও ক্রাস্টোয় পতাকার ছায়া—এই সব পুরাতন দিনের পথের কামড়, ছবি, স্মৃতি, এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদপত্রে বিবরণ, বই ইত্যাদি প্রাপ্ত-কেন্দ্রে প্রাপ্ত—সুখের বইবেল, ফ্রেডরিক দি গ্রেটের যুদ্ধের বিবরণ, নেপোলিয়নের যুদ্ধের কথা ইত্যাদি।

বর্তমান কালের সংবাদপত্রের মত জার্মানীর প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয় ১৩-২০-তে 'মুনসেন-আউসবুর্গার মাস-সংবাদ পত্র' (Munche-Ausburger Abendzeitung), মুনসেন থেকে বাহির হয়। সন্তোষ পতাকার মধ্যে জার্মানীর সব প্রধান শহর অঙ্কিত একখানা করে সংবাদ পত্র বাহির হয়।

বর্তমান কালের সংবাদপত্রের মত ইংলণ্ডের প্রথম ছাপা সংবাদ পত্র হচ্ছে "অন্সফোর্ড পোস্ট" (১৩৬৪ খৃঃ অব্দ); তার আগে হাতে লেখা সংবাদপত্রের পূর্ব চলন ছিল, যেমন Paston Letters, Sidney Papers। এই হাতে লেখা সংবাদপত্রের চলন পরেও বহুদিন টিকে ছিল, তার কারণ মুদ্রাঘরের ওপর রাজশক্তির কঠিন নিয়ন্ত্রণ।

প্রেশার ঐতিহাসিক বিভাগের মধ্যে Press and Opinion ঘরটি বিশেষভাবে লক্ষ্যের। রাজশক্তি ও চার্চের সহিত লেখকগণ কি ভাবে পতাকার পর পতাকী যুদ্ধ করে মুদ্রাঘরের স্বাধীনতা লাভ করেছিল, এ ইতিহাস মানবজাতির এক মহা সংগ্রামের ইতিহাস। মহা যুদ্ধের ইয়োয়োগে চার্চই সব বই লেখার বই কপি করার কেন্দ্র ছিল; চার্চের বিরুদ্ধে কিছু লিখলে কেবল সে বই নয়, বইয়ের লেখককেও পুড়িয়ে মারা হ'ত। মুদ্রাঘরের স্বাধীনতা এক নব শক্তির জন্ম হ'ল। এই শক্তিকে আপনার কাছে লাগাবার জন্যে, বিরুদ্ধমত প্রচারের সব পথ বন্ধ করবার জন্যে রাজশক্তি ও চার্চ উঠে পড়ে লাগল। মুদ্রাঘর পৃথকিত হ'ল। আইনের পর আইন করে মুদ্রাঘরের ওপর সমস্ত বাধা হ'ল। Censorship, অর্থাৎ কোন সংবাদপত্র বা পুস্তক বা পুস্তিকা ছাপবার আগে, রাষ্ট্র বা চার্চের নিযুক্ত কলচারীকে তা দেখাতে হবে, তিনি সেই মিনিব ছাপতে অস্বস্তি দিলে

বা আপত্তি না করলে পরে ছাপা হবে, এই আইন দিয়ে মুদ্রাঘরের স্বাধীনতা করক পতাকী যুদ্ধ হয়। জার্মানীতে প্রথম সংবাদপত্র বাহির হবার কিছু পরেই ১৪২২-তে সেন্সর আইন পাশ হ'ল; তারপরও মান্যকার আইন দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করা হয়, কিন্তু স্বাধীন-মতাবলম্বী লেখকগণ এই সব আইনের বিরুদ্ধে কঠোর পদ ক'রে এসেছেন প্রেশার তাই দেখান চলেছে।



বিপ্লবের পর কেবলমাত্র জার্মানীতে নয়, অষ্ট্রিয়াতেও সেন্সরশিপ আইন রদ হয়। এর পর হ'তে মুদ্রাঘর নবজন্ম লাভ করে, পথের কামড় ও পত্রিকার সংখ্যা অগণিত ভাবে বৃদ্ধি পায়। সেন্সরশিপ দেল বেটে, কিন্তু অস্ত্র নানা আইন দ্বারা মুদ্রাঘরকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা চলল। সন্ত বিপ্লবের পর হ'তে জার্মান মুদ্রাঘর সম্পূর্ণ স্বাধীন



হয়েছে বলা যেতে পারে ; এখন লম্বাই আপনার প্রাকটিক্যাল স্বাধীনমত বাক্য করতে পারে ।

মুদ্রাবয় ইংলণ্ড এসে তার নকল নিমিত্ত করবার চেষ্টা হ'ল ; তাৎক্ষণিক থাকে অসুস্থতি বা অধিকার যেনে কেবল সেই বই ছাপতে পারবে । অবশ্য আবেদন করলেই এ অসুস্থতি শাণ্ডা যেত না ; হাতা উত্তর বিখ্যাত ব্যক্তি বা কোম্পানীকেই এই অসুস্থতি দিতেন । ইলিজাবেথের সময় হার চোয়ার কেবলমাত্র লন্ডন, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে কয়েকটি ছাপাখানাকে ছাপার অধিকার দিয়ে মুদ্রাবয়কে সীমাবদ্ধ করে রাখে । মিল্টন এই বন্ধ মুদ্রাবয়ের স্বাধীনতার তার *Areopagitica* লিখেছিলেন, "Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely

মুদ্রাবয় আইনের পর আইনের নিদড়ে বাধা । প্রেসার এই বয়স্টে দেশেতে যেখানে মনে হল, মুদ্রাবয়ের স্বাধীনতার ভঙ্গ ভারতে যে সব স্বাধীনচেতাদের কাষাপার হয়েছে, যে সব মতাবলম্বী সংবাদপত্র বাহ্যেয় প্রবেশ করেছে, স্বাধীনতার সংগ্রামের সেই জটিলতালি ভেঙে ক'রে মানবাত্মার বীরবীর পত্রিকার প্রদর্শনী আমাদের দেশেও একদিন হবে ।

কল্যাণ দিখিত "সোশিয়াল কন্ট্রাক্টের" (Social Contract) প্রথম সংস্করণের বই, এডিনবের শেক্টেটোর, কনিংগের (König) তৈরী কৃত মুদ্রাবয়ের মডেল ইত্যাদি নানা ভিনদেশে প্রেসার ঐতিহাসিক বিভাগ থেকে বর্তমান জার্মান প্রেসের বিভাগে আশা সেল । একান্ত বৃহৎ বাড়ী, —থরের পর থরে সংবাদপত্রের পর সংবাদপত্র পত্রিকার পর পত্রিকা ।

জার্মানীতে কত বিখ্যের কত যে কাগজ বাহির হয়, তা দেখে মতাই অবাক হ'তে হ'ল । পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই যার সবচেয়ে জার্মান ভাষায় কোন না কোন পত্রিকা নেই । তলার বৃহৎ কলে মাঝখানে একটি বৃহৎ গোটারি মুদ্রাবয়, তার পাশে লিনোটাইপ বয় ইত্যাদি নানা মুদ্রাবয় । বয়স্টালি মাতে মাতে চালিয়ে প্রদর্শকদের দেখান হচ্ছে কিভাবে এক রাত্রে হাজার হাজার বইয়ের কাগজ ছাপান হয় । তলার দর ছুড়ে কেবলমাত্র নানা সংবাদপত্র-কোম্পানীর প্রদর্শনীই নয়, সংবাদপত্রের বাইক রেল ও পোষ্ট অফিসের প্রদর্শনীও



প্রেসার জার্মান বিভাগ

according to conscience above all liberties," ১৬৯৫তে হাউস অফ কমন্স প্রেসের বিরুদ্ধে লাইসেন্সিং আইন (Licensing Act) শাপ করতে রাজী হলেন না ; সেই সময় থেকে ইংলণ্ডের মুদ্রাবয় স্বাধীনতা লাভ করল বলা যেতে পারে ; আর সেই সময় থেকে সত্যিকার সরকার কাগজের পরিণতি ও উন্নতি আরম্ভ হ'ল । থবরের কাগজ যদি দর্পণমন্ডকে লম্বাশোচনা করতে না পারে, স্বাধীন মত ব্যক্ত না করতে পারে, যা সত্য ঐ প্রচার করতে না পারে, তবে তার মূল্য কি ? আমাদের দেশে

আছে । জার্মানীর প্রতি প্রদেশে কত সংবাদপত্র আছে, সংবাদপত্রের অফিস কিত্তপভাবে চালিত হয়, টেলিগ্রাম টেলিফোন চিঠি বোঝা ইত্যাদির ব্যয় কিত্তপে সন্ধ্যা সংগ্রহ ক'রে প্রতি প্রান্তে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ইত্যাদি সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় নানা কৌতুকপূর্ণ কথা, ছবি এঁকে বা মডেল ক'রে বা রঙীন নক্সা দিয়ে নানাভাবে জনসাধারণকে বোঝান হয়েছে । একটি লক্ষ্য মডেলে দেখলুম—জার্মানীর একটি প্রদেশের বৃহৎ মানচিত্র অঙ্গণিত বৈজ্ঞানিক আলোকচিত্র । সে প্রদেশের যে যে লম্বা

ঈশ্বরীন্দ্রদাস বসু

বা গ্রাম হ'তে খবরের কাগজ বাতির হয় সেই আদমের একটি ক'রে কোনো নাগান। আগেগুলি একবার মস্কো, একবার নিউজি, তাই দেখে বেশ আইডিয়া হয় এই প্রদেশের কতগুলি স্থানে প্রতিদিন সংবাদপত্রের দীপ্তি অর্থাৎ প্রকাশিত হয়।

জার্মানিতে ৩০৪৬ খানি সংবাদপত্র আছে, তার মধ্যে ২০৪ খানি সপ্তাহে একবার বাতির হয়, ২০৪ খানি সপ্তাহে দু'বার, ৪২২ খানি সপ্তাহে তিনবার, ১১ খানি সপ্তাহে চারবার বা পাঁচবার, ২১৩২ খানি সপ্তাহে ছ'বার, ১৮১ সপ্তাহে ছ'বারের অধিক বাতির হয়; শুধু বার্লিন ও ড্রাজেনবুর্গে ২৭২ খানি সংবাদপত্র বাতির হয়।

জার্মানিতে নানা রাজনৈতিক দলের কতগুলি সংবাদপত্র আছে তারও একটি তালিকা দিচ্ছি। সোশ্যাল ডেমোক্রেট দলের ১৭২ খানি সংবাদপত্র আছে; লিবারেল দলের ৪২ খানি; জার্মান জনপদের দলের (Deutsche Volkspartei) ৪৭ খানি; গার্লসফেল্ডের ১৪৩ খানি; জার্মান নাগাদল দলের ৩৭৪ খানি, এ হল বনী অভিজাতের দল, এদের অর্ধ শতাব্দী তাই কাগজের সংখ্যাও বেশী; সেন্টার বা কাথলিক দলের ২৭৭ খানি; ডেমোক্রেট দলের ৮৮ খানি; কমিউনিষ্ট দলের ৩৫ খানি; বাতেরিগা রজনপদের দলের ১০৬ খানি; ১৮০৪ খানি কাগজ কোন দলের নয়। তা ছাড়া আর কয়েকটি ছোট রাজনৈতিক দলের কয়েকখানি ক'রে কাগজ আছে।

এই সংবাদপত্রগুলির অফিস ও মুদ্রণ বিভাগে প্রায় ৮৭ হাজার লোক কাজ করে; এদের মধ্যে ৬৪ হাজারের ওপর পুস্তক ও ২১ হাজারের ওপর ব্রীলোক। তারপর সংবাদপত্রপ্রকাশকের অফিসে ও বিতরণ-বিভাগে প্রায় ১১ হাজার লোক কাজ করে; তার মধ্যে পাঁচ হাজার পুস্তক ও প্রায় ছ' হাজার ব্রীলোক। সুতরাং সংবাদপত্র থেকে প্রায় ৯৮ হাজার শ্রমিকদের আর হয়; তা ছাড়া কত সংবাদযাত্রী, লেখক, ইত্যাদি আছে।

সংবাদপত্রের সংখ্যা এত অধিক হ'লেও প্রধান প্রধান খবরের কাগজগুলির বিক্রি বড় কম নয়। বার্লিনের প্রধান প্রধান খবরের কাগজের বিক্রি ২৫০ হাজারের ওপর। বার্লিনের

বাতিরের কাগজের বিক্রিও বেশ, যেমন Leipziger Neueste Nachrichtenর বিক্রি ১৭৫ হাজার; Munchner Neueste Nachrichtenর বিক্রি ১৪৫ হাজার। জার্মান প্রমোবী সপ্তাহের ৪২টি সংবাদপত্র ১২২৭ পৃঃ মধ্যে বড় সংখ্যা ছাপা হয়েছিল তা যোগ করলে ২২১ মিলিয়ন হয়। কমিউনিষ্টদের মূলপত্র খবরের কাগজ "বক্তৃতাফাহ্নে" (Der Rote Fahne) বিক্রি ৩৫ হাজারের ওপর। যে দেশে প্রতি নয়নারী লেখাপড়া জানে এবং পৃথিবীর খবর জানতে চায়, নিজের দেশের শাসন সম্বন্ধে প্রত্যেকেই চিন্তা করে, সে দেশে যে এত খবরের কাগজ বিক্রি হবে তা আশ্চর্য্য কি! তবে জার্মানিতে এত খবরের কাগজ বিক্রি বেশে কিছু অর্থাত্ হ'তে হয়, কারণ জার্মানীর খবরের কাগজগুলি বড় পত্রাব বকমের, কিছু শিক্ষাগ্রস্ত তাতে কোন বিবাহবিচ্ছেদ মোকদ্দমার রিপোর্ট, পুলিশকোডের কোন মোকদ্দমার প্রকাশিত কোতুক সম বা গোমর্গণ ঘটনার বিবরণ, চণ্ডাচি sensational news পড়ে না; তাতে বস্তুমান রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা লক্ষ্য আগোচর্য করা হয়, লোকশিক্ষা দেবার জন্য চিন্তা প্রদ আরও থাকে। এ বিষয়ে জার্মান খবরের কাগজগুলি পৃথিবীর অন্য সব দেশের খবরের কাগজের আদর্শ হ'তে পারে।

জার্মানিতে সাপ্তাহিক পত্রিক মাসিকপত্র ও অন্য সাময়িক পত্রিকাও অগণিত তবে প্রকাশিত হয়। ১২২৫তে জার্মানিতে ১৬,২৮৮ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। অল্প এতগুলি পত্রিকা বরাবর বাতির চরান, অনেকগুলি চড়ে হু'লংখ্যা বা তিন সংখ্যা বাতির হবার পরই বন্ধ হ'তে গেছিল। তবে নির্মিত গায়ে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, তার মধ্যে আড়াই হাজার মাসিক, বোল প' সাপ্তাহিক। পত্র অর্ধ শতাধীতে জার্মানজাতির কত শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি হয়েছে তা পত্রিকাসংখ্যার বৃদ্ধি দেখে বোকা যায়। ১৮৭৪তে প্রাণিয়ার নৃশত্রি যাত্রা জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় সমস্ত জার্মানিতে ১৭৫০ খানি সাময়িক পত্রিকা ছিল, আর এখন একমাত্র বার্লিন হ'তেই তার চেয়ে বেশী সাময়িক পত্রিকা বাতির হয়।



বাস্তব প্রদর্শনীই বাকীতে সংবাদপত্র ও পত্রিকার বিভাগ ছাড়া আরও অনেক বিভাগ ছিল। প্রেসের কাজ, ছবি চোখা, রক করা ইত্যাদি বিষয় শিখবার জন্য আর্থানীতে অনেক স্থান আছে; সেটী স্থানগুলির ছাত্রদের কাজের পরদর্শনী-বিভাগ খুব ভাল লাগে। রঙের সব ছবি কি স্থলর চোখা! বটচোখা দেখে চোখ ছুঁড়ায়, যেন এক মারটির স্থলর স্পষ্ট। এটী সব স্থানগুলির মধ্যে Language-এর



নব কলিমার প্রদর্শনী গৃহ

Technikum für Hochdrucker, München-এর Graphische Berufsschule, Stuttgart-এর Württembergische Staatliche Kunstgewerbeschule নামে বিদ্যমান। আমাদের দেশের অনেক বৃহৎ ওখন প্রেসের কাজ রক তৈরী ইত্যাদি বিখ্যে চান, আর্থানীতে এ সব স্থানে এসে তাঁরা অনুশীলন জান লাভ করতে পারেন।

আর্থান প্রেস-প্রদর্শনীর বৃহৎ বাড়ী থেকে বাহির হ'লে একটি সুন্দর বাগান ও কোয়ার্টার গায় হ'লে অর্ধচন্দ্রাকৃতির সুন্দর বাড়ীর সারিত নামনে আশা পেল। এ হচ্ছে সর্বস্বাতন্ত্র্য সংবাদপত্রের প্রদর্শনী-বিভাগ (Internationale Staatenhaus)। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সর্বস্বদেশের সব জাতির স্বতন্ত্রের কার্যকর প্রদর্শনী ঘরের পর ঘর ছুঁড়ে; অবশ্য তারতর্ক্যের কোন ঘর নেই। ইলেক্ট্রের একটি ঘর আছে বটে, তবে তার উপনিবেশগুলির, যেমন অস্ট্রেলিয়া বা দাউথ

আফ্রিকা, কোন ঘর দেখানুম না। তবে প্রেসেতে "গোলা ও বিশ্ববিজ্ঞান" বিভাগে ভারতীয় কয়েকটি বিশ্ববিজ্ঞান ও কলেজে প্রকাশিত পুরাতন সংখ্যা দেখেছিলাম, যথা-Dacca University Journal, Patna College, শরদল, বাঙ্গালিকা ইত্যাদি।

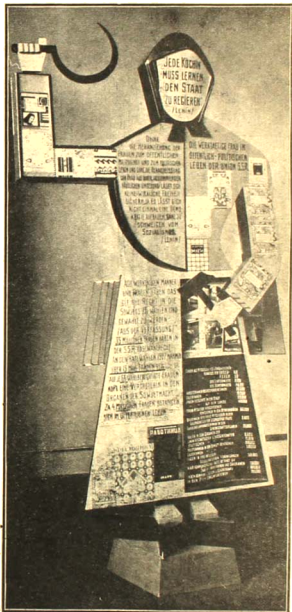
প্রথম ঘরটি হচ্ছে সোভিয়েট-সোভিয়েট-রিপাবলিক-সম্মিলন বা নব কলিমার ঘর। বিপ্লবের পর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অধীনে শিকারে জান-বিতরণে কলিমার কত উন্নতি হয়েছে তাই নানা বিচিত্র মডেলে নমুনা ছবিতে দেখার দেখান হয়েছে। প্রেসার "গোলা ও নারী" বিভাগে কলিমার শাখার কাজের বৃহৎ এক নারীমুর্তি দেখেছিলাম; তার এক হাতে কাস্ত আর এক হাতে হাতুড়ি, তার মুখে ও বুকে রক্ত-নারীর রক্ত লেনিনের রঙ। বচন, ও তপাতে নারীদের কাজ সবচেয়ে নানা তথ্য দেখা। মুখেতে দেখা। "প্রত্যেক রাত্রীকে জানতে হবে শিখতে হবে রাজ্য কি ক'রে চালাতে

হবে, শাসন করতে হবে। লেনিন।" তথ্য দেখা, "সোভিয়েট-রুশিয়াতে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ও সমান কর্তব্য, সোভিয়েট-সোভিয়েট-রুশিয়াতে ৩৬ মিলিয়ন নারীর তোটে বেচার অধিকার আছে"; "সোভিয়েট-সোভিয়েট-রিপাবলিক-ইউনিয়নের শাসন-কমিটিতে ৯৯ জন নারী আছেন, রুশ-সোভিয়েট ফেডারেল-সোভিয়েট-রিপাবলিকের শাসন-কমিটিতে ৪১ জন নারী আছেন।" বর্তমান রুশিয়া হচ্ছে Union of Socialist Soviet Republic; এই Union-তে ছ'টি স্বাধীন রিপাবলিক আছে, Russian Socialist Federal Soviet Republic, The White Russian S. S. Republic, The Transcaucasian Soviet Federal Socialist Republic, The Turkoman Soviet Socialist Republic, The Uzbek Soviet Socialist Republic.)

১৯১০-তে কলিকাতা ( বর্তমান পোস্তমেন্ট  
কলিকাতা ) ৫০১ খানি পত্রের কাগজ  
ছিল, সব পত্রের কাগজের মূল্য ২৫ লাখ  
কপি ছাপা ৪'৪; আর ১৯২৮-তে পোস্তমেন্ট  
কলিকাতা ৫৫৯ খানি পত্রের কাগজ ছিল,  
এক মাসের পত্র কাগজগুলির ৮২,৫০,০০০  
কপি ছাপা ৪'৪। কলিকাতা কল-ভাড়া ছাড়া  
অন্তান্ত ভাড়া লোক অনেক আছে; ১৯১০-তে  
কল-ভাড়া ছাড়া ১৭টি বিভিন্ন ভাড়া ১৩টি  
পত্রের কাগজ বাহির ৪'৪, আর এখন ৪৮টি  
বিভিন্ন ভাড়া ২১০ খানি পত্রের কাগজ  
বাহির ৪'৪।

১৯১০-তে কলিকাতা ১০৮২ খানি পত্রিকা  
ছিল, ১৯১১-তে ১০৯১ খানি পত্রিকা বাহির  
৫৫, তাই পত্রিকা লিখিত পত্রের সবচেয়ে ছাপা  
মাথায় আছে ৮৮ লাখ। বসন্ত, লোক-  
দিকার করে পত্রের কাগজ ও পত্রিকার  
বিশেষ প্রয়োজন; এ বিষয়ে পোস্তমেন্ট  
গভর্নমেন্ট প্রাপ্ত পত্র চেষ্টা করছেন। লোক-  
দিকার করে পত্রের কাগজের হিসাবে ১৯২৭-১৮-র  
বাজেটে ৮৫৭ মিলিয়ন কল পত্র ৫৫  
হয়েছিল। ১৯১০-তে কলিকাতা ৩৪ হাজার  
এই ১১৮ মিলিয়ন কপি ছাপা হয়েছিল,  
আর ১৯২৭-তে ২৯ হাজারের ওপর এই মূল্য ৮৫  
২১২ মিলিয়ন কপি ছাপা হয়েছিল। একটি  
পোস্তার ( Poster ) দেখান, তাতে দেখান  
হয়েছে ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত কলিকাতা  
বস এই ছাপা হয়েছে, সে সব পত্রের পর  
পাশাপাশি মাঝে ৩০০ হাজার কলিকাতার  
কল, অর্থাৎ পত্রের এই-বই-এর পাতার পথ  
ঠিক করাতে পাথরে পৃথিবী থেকে চাঁদে  
প্রদর্শন করে আসা যায়।

কল পত্রের কাগজগুলির অনেক বিশেষ  
আছে। একটি বিশেষ আছে, মাসিক পত্রের





সংবাদপত্রের লক্ষণসমূহ অতিক্রম করিয়া যা চাষা, এট মজুত ও চাষা সংবাদপত্রের তাদের কাউন্সিলের সহযোগিতায় বিশেষ সংবাদ বিক্রেতা, বিশেষ সমাজ আলোচনা করতে পারে। কৃষিকার সব খবরের কাগজে তিনলক্ষের ওপর নিম্নতম মজুত-চাষা-সংবাদপত্র আছে। কল কাগজগুলির আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সংবাদপত্রের পাতক পাঠিকাদের জন্য মাঝে মাঝে সভাপতিত্বের উদ্যোগ করা। সেখানে লোকশিক্ষার বিষয়ের আলোচনা করা। কৃষিকার একটি প্রধান সংবাদপত্র এক বছরের পাতক পাঠিকাদের জন্য তিন ন' কনফারেন্সের আয়োজন করেছিলেন।



কল প্রদর্শনীতে কালের নারী মূর্তি

কল-প্রদর্শনীখরের এক কোণে গেনিনের মূর্তি, তার সামনে রাস-কলে গেনিনের বই, পৃথিবীর পঞ্চাশটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত গেনিনের বই পাঠান রয়েছে। বরের আর এক কোণে একটি ছোট ছাপাখানার মডেল রয়েছে, ১৯০৫

মধ্যেতে বর্ণনাত্মক সেন্ট্রাল কমিটির একটি গুরু ছাপাখানা এক মাটির তলার ঘরে ছিল। ছাপাখানার এই মডেলটি। এই গুরু ছাপাখানা থেকে কত বিশেষ-মুদ্রক পত্রিক পুস্তিকা ছাপা হয়েছে।

কল-প্রদর্শনী-বইটি দেখে বেশ বোঝা গেল বর্তমান রাশিয়াতে সোভিয়েট তত্ত্বের অধীনে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জ্ঞানের উন্নতিই হচ্ছে।

নবজাগরণ প্রদর্শনী-গৃহের পাশে স্ট্রুভেনের প্রদর্শনী গৃহ, তারপর ডেনমার্কের, তারপর নরওয়ে, তারপর অষ্ট্রিয়ার, এরকম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবরের কাগজের প্রদর্শনীর ঘরের পারি। এটি ঘরে, সেট দেশের-অর্থিত প্রাচীন হ'তে আধুনিক সব খবরের কাগজ সামান্য খবরের কাগজের আদর্শ, বিবর্তন, উন্নতির ইতিহাস দেখান হয়েছে, মানা ছবিতে মানা পোষ্টারে বা তালিকা দিয়ে সে দেশের খবরের কাগজের সংখ্যা, জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস ইত্যাদি জানান হয়েছে।

স্ট্রুভেনের প্রদর্শনীতে স্ট্রুভেনের ঘরে বা বেগলুম তা কেবল খবরের কাগজের প্রদর্শনী নয়; অন্যর স্ট্রুভেনের প্রাকৃতিক শোভার বৃহৎ চিত্রশিল্পিত ঘরটিতে সমস্ত দেশের ভ্রমণকারীদের লক্ষ্য করবার বিশেষ প্রয়োগ আছে। নরওয়ে ও স্ট্রুভেনের ঘরের সে সব দেশের একল প্রাকৃতিক শোভার চিত্র দিয়ে পথিকদেরমন আকর্ষণের চেষ্টা দেখেছি। স্ট্রুভেন প্রথম বই ছাপা হয় ১৪৮৩ খৃঃ অব্দে; খবরের কাগজের অগ্রদূত "গ্লাসপাভা" (Pligblaad) ছাপা হয় ১৫৭৫তে; আর প্রথম সংবাদ-পত্র ছাপা হয় ১৬৪৫তে। বর্তমান সময়ে স্ট্রুভেনে ১০৭ বিভিন্ন লক্ষ ও গ্রাম থেকে সংবাদপত্র ও পত্রিকা বাহির হয়। সংবাদপত্রের সংখ্যা ৩১৩, তার মধ্যে একশতটির উপর সংবাদপত্র সমগ্রাণে ছ'বার বাহির হয়; সাপ্তাহিক পত্রিকা ও মানা-বিষয়ে মাসিক ইত্যাদি পত্রিকার সংখ্যা ১২০০। একথা মনে রাখতে হবে যে স্ট্রুভেনের লোকসংখ্যা ৯০ লাখ।

নরওয়ের বইটি ইংলেন্ড, নান্দেন, বুনট-প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নরওয়ে-বাসীর মূর্তি খাড়া দৃষ্টিতে, নরওয়ের কৃষকমণ্ডিত পাঠক, কৃষিকার চিত্রমালা-লোভিত। নরওয়ের প্রথম

সংবাদপত্র ব্যতিরিক্ত ৪৫ ১৭১০০০। ১৮১৪তে নরওয়ে দেশ নব শাসনভাৱে নতুন নীতি (constitution) অনুসারে দুস্তাৱের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল, সংবাদপত্রের নব পূর্ণ আৱন্ত হল। "রাষ্ট্রাঙ্গকোষ সকল বাণ্যর ও অজ্ঞাত সব বিষয় দৃষ্টিতে প্রত্যেক স্বাধীন ও মুক্তভাবে আপন মনোভাৱ ব্যক্ত করতে পারবে"—এই মহান স্বাধিকার পাওয়াতে সংবাদপত্র-লেখকগণ পূৰ্ব শক্তি লাভ করলেন। তাবধার ও লেখবার একজন স্বাধীনতা স্বাক্ষর কর্তৃকই নরওয়েৰ লাভিতোৱ একজন উজ্জ্বল ঐক্যি হয়েচে। বৰ্তমান সময়ে নরওয়েৰ দাপ্তরিক ও পত্রিকার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ১৯২৭তে পোষ্ট অফিস জনসাধারণকে ১১১ মিলিয়ন কপি সংবাদপত্র ও পত্রিকা সরবরাহ করেছে। নরওয়েতে কোন প্রেস আইন নেই সেজন্য এত চোট দেশেও এত সংবাদপত্র-প্রচলন সম্ভব হয়েছে। ২৫০ খানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের স্কাটল্ড ১ মিলিয়ন কপি, আর নরওয়েৰ জনসংখ্যা হচ্ছে পোনে তিন মিলিয়ন। প্রতি-সাপ্তাহের প্রতি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে পুস্তক ও নাস্তা খবরের কাগজ পড়ে। এক ওসলোতে (Oslo) ১৫ খানি দৈনিক সংবাদপত্র আছে।

ডেনমার্কের লোক সংখ্য লাভে তিন মিলিয়নও নয়, কিন্তু সে দেশে বহু সংবাদপত্র আছে তাহেৰ দৈনিক প্রকাশিত সংখ্যার মোট হচ্ছে ১১,৫৫,০০০, অর্থাৎ প্রতি তিনজন মানুষের ভিত্তি এক কপি খবরের কাগজ! অনেক ডেনমার্ককে তাই খবরের কাগজের দেশ বলে।

কিন্তু জনসাধারণ তুলনায় সুইজারল্যান্ডের মত এত বেশি খবরের কাগজ ও পত্রিকা কোন দেশেই নাই। সুইজারল্যান্ডের ঘরে ঢুকই দেখবু, সামনের দেওয়ালে সুইজারল্যান্ডের বৃহৎ মাগ, বেবে দূরত্ব ও গ্রাম হ'তে সংবাদপত্র ব্যতিরিক্ত ৪৫ সেগুলি নাক্ষত্রের ভিত্তি দিয়ে দেখান হয়েছে। যাপের এক পাশে দেখা সুইজারল্যান্ড হচ্ছে সংবাদপত্র-প্রচুরতম দেশ; আর একদিকে দেখা সুইজারল্যান্ডের জনসংখ্যা হচ্ছে ৩২,৫২,০০০,

আর তার সংবাদপত্র ও পত্রিকাসংখ্য হচ্ছে ৩২৩৭। বস্তুত, সুইজারল্যান্ড ছোট দেশেও, তার বাইশটি বিভিন্ন কান্টন (canton) ছাড়া তিনটি বিভিন্ন ভাষা। প্রতি কান্টন আত্মস্বাধীন শাসন স্বাধীন, সাধারণতঃের আইডিয়া এখানে এত লম্বা গুঁড়ীতে বলে খবরের কাগজের সংখ্যাও প্রচুর। দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রদেশের সংখ্যা হচ্ছে ৪০৬, তার মধ্যে ২৮২খানি জার্মানভাষার প্রকাশিত হয়, ১০৫খানি ফ্রান্সীজভাষার আর ১৯খানি ইতালীয় ভাষার প্রকাশিত। সংবাদপত্রসংখ্যা বেশি বটে কিন্তু সব সংবাদপত্র পূৰ্ব বেশি কপি ছাপা হয় না। লক্ষ্য হাজার কপি ওপর দৈনিক ছাপা হয় এরকম সংবাদপত্র তিনখানি আছে, বিপ হাজার থেকে লক্ষ্য হাজার কপি



সেগার খবরের কাগজের প্রাঙ্গণ

ছাপা হয় এমন কাগজ ম'খানি আছে, মগ হাজার থেকে বিপ হাজার কপি ছাপা হয় এরকম খবরের কাগজ পনেত্রোখানি আছে।

সুইস্ কাগজগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রতি কাগজেও প্রায় মালামা মালামা মালিক। এ হচ্ছে decentralised press, এক বৃহৎ কোম্পানীর হাতে অনেকগুলি কাগজের স্বত্ব ও পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হয়নি। তাতে প্রতি কাগজের যেমন মতের স্বাধীনতা আছে, তেঁয় প্রতি কাগজের স্বাধিকারগোচর কাগজ ব্যাধিবে স্বাভাৱে কিছু সংযোগ করতে হয়।

একটি বহু ভাষাভাষি ক'রে চীন ও জাপানের সংবাদপত্রের প্রদর্শনী। চীনের খবরের কাগজ বিশেষ কিছু নেই।





চীনেতেই পৃথিবীর প্রথম মুদ্রাপ্রণেত্র উদ্ভাবনা হয় ; পৃথিবীর সব চেয়ে পুরাতন ছাপা খবরের কাগজ চীনেতে ব্যক্তি হয় । পৃষ্ঠ চম্পাবার চূর্ণিত বহুরূপ ছাপা ছাপা রাজা পাও ( King-Pao ) সেই পৃথিবীর প্রাচীনতম খবরের কাগজের এক কপি স্থানীয়ভাবে লোকের মধ্যে বিবেচ্য । তাপানের লোকেরা এ প্রকারের বা আখ্যায়ের মধ্যে কিছু কম সংবাদপত্র পড়ে না তা তাপানী খবরের কাগজের দৈনিক প্রকাশ-সংখ্যা দেখে বেশ বোকা বোকা । তাপানের একটি প্রধান সংবাদপত্র Osaka-Mainichi প্রতিদিন ১৩৭৭ হাজার কপি প্রকাশিত হয় ; আর একটি কাগজ Takyo-Nichinichi প্রতিদিন সাত্বে ছাট লাখের বেশী ছাপা হয় ।

মঙ্গলদেবের পরে পৃষ্ঠ ইথিওপোলের নতুন রাজতন্ত্রের সংবাদপত্র সংখ্যা নবজাতীয়তার প্রেক্ষাপটে খুব বেড়েই গিয়েছে । শোমালের সংবাদপত্রের সংখ্যা ২৮৪ । জেকোম্বো-টাংকার সংবাদপত্র ৭ সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা প্রায় চার হাজার । দৈনিক সংবাদপত্র সংখ্যা ১০১ খানি, তাদের ৩৭ খানি আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত ।

ফ্রান্সের সংবাদপত্রসংখ্যা আশ্চর্যের মত মত বেশী নয় । ১৯৩৩তে পাব্লিক ট্রাফিক প্রকাশিত রাজনৈতিক দৈনিক সংবাদ-সংখ্যা ছিল ৪৮খানি । পারিষ বাহিরে প্রকাশিত সকল প্রকার সংবাদপত্র সংখ্যা তিন হাজারের কিছু ওপর । তবে সংবাদপত্রের কটতি খুব । Le Petit Parisien কটতি বারো লাখ, La Petit Journal কটতি দশ লাখ ; আট লাখ কপি ছাপা হয় এরূপ কাগজ অনেকগুলি আছে ।

গ্রেট-ব্রিটেনের ছাপা প্রদর্শনী ঘরে, ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কাল-টোনের ছাপা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জিনিস ছিল ; তা ছাড়া British Institute of Industrial Art এর ছবি ছাপা, এই যাবত, ইত্যাদি প্রদর্শনী বেশ স্থলর । গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের সংবাদ পত্রের সংখ্যা দু' হাজারের কিছু অধিক ; লন্ডন শহরেই ৪০৮ খানি খবরের কাগজ আছে, তার মধ্যে ২০খানি প্রতি সপ্তাহে ব্যক্তি হয় । আয়ারল্যান্ডের সংবাদপত্র সংখ্যা ১৩৮ খানি, স্কটল্যান্ডের ২০৫খানি । ১৯১০ খৃঃ অব্দে গ্রেট ব্রিটেনে বহু খবরের কাগজ ছিল, বর্তমান সময়ে তত নেই, এখন সংখ্যা কিছু কমছে, তার কারণ হচ্ছে গ্রেট-

ব্রিটেনের অনেক সংবাদপত্রের ঘর এক বড় কোম্পানী বা ট্রাস্টের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ; কয়েকটি বৃহৎ সংবাদপত্র-সমূহ ইংল্যান্ডের আর অধিকাংশ কাগজের মালিক, তারাই লোকমত গড়ছে, তড়িচ্ছে । Rothermer Group হচ্ছে সব চেয়ে বড় সংবাদপত্র-সমূহ । ডেলি মেল, ডেলি মিরর, প্রভৃতি বাকি খানি কাগজের মালিক এরা । ১৯২৪তে এই সমূহের সকল দৈনিক সংবাদপত্রের মোট বিক্রি হয়েছিল ৩৫ লক্ষ, আর সকল সাপ্তাহিকের মোট বিক্রি হয়েছিল ৩৫ লক্ষ ।



গ্রেটার ব্রুক

ব্রিগ লক্ষ । বর্তমান যুগের জনসাধারণের সংবাদপত্রের খুন্সি যে কি জীবন তা এখন সংখ্যা দেখেই বোকা যায় ; তবে নিছক রাজনৈতিক সংবাদপত্র নয়, চমকপ্রদ উত্তেজনাকর ঘটনাপূর্ণ sensational news তরা সংবাদপত্রেরই সব চেয়ে বেশী বিক্রি । তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ The News of the World নাম কত বোকা বোকা পারে । এই সাপ্তাহিকের বিক্রি সমস্ত পৃথিবীতে আর চলিখ লাখ । বর্তমান "গ্রেটার ব্রুক" বায়ারি পৃথিবীর লোকেরের দ্যত কেন্দ্রীয় ঘর গোমাকর

খবর বিশ্ব জ্ঞানবাহী জ্ঞান যোগে সত্য হতে। The News of the World ছাপাখানার তত্ত্বাবধিত মুদ্রণ-কলিতে মিনিটে সাত হাজার কপি কাগজ ছাপা হয়, এই একটি সাপ্তাহিকের কাগজের মূল্য বছরে ১২০ হাজার পাঁচ কটিতে হয়।

দলজাতীয় প্রদর্শনী বিভাগের বেধ বরতি হচ্ছে আমেরিকা-  
কার নৃত্য-রাজ্যের। নৃত্য-রাজ্যের প্রথম সংবাদপত্র ব্যক্তি  
১৭০৪তে, ইংলণ্ড থেকে প্রথম ঐগনিবেলিকপত্রের  
প্রাধি একশত বৎসর পরে। নৃত্য-রাজ্যের দৈনিক সংবাদ-  
পত্রের সংখ্যা হচ্ছে ২৩৮৮, তাদের মধ্যে সকল বেলায়  
প্রকাশিত ৪২৭ খানি সংবাদপত্রের দৈনিক কাটাতি হচ্ছে  
১২৪ লক্ষের ওপর, আর ১৮৮১খানি সাপ্তাহিকপত্রের দৈনিক  
প্রচার হচ্ছে ২১২ লক্ষের ওপর। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের  
সংখ্যা ১২৪২০, তার মধ্যে রবিবারে প্রকাশিত ৪৪৮খানি  
সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রি ২৩০ লক্ষের ওপর। সকল  
প্রস্তুত মাগাজিনের সংখ্যা লাভ হাজারের ওপর। The  
New York 'Times' হচ্ছে নৃত্য-রাজ্যের একটি প্রধান সংবাদ  
পত্র, তার দৈনিক প্রচার (circulation) হচ্ছে চার লক্ষের  
ওপর, আর রবিবারে দ্বাত লক্ষের ওপর। এই এক কাগজে  
ছাপিলে ছাপাখানায় তিন হাজারের ওপর লোক খাটে।  
আমেরিকার ছাপাখানা ও প্রকাশকের বাধা খুব বড় বাধা,  
ও দেশের সকল বাবদার মধ্যে শকম স্থান অধিকার করে;  
এপ্রম স্থান নিজে মোটরের বাধা। বিভিন্ন বিংয়ের পাচ  
লত সামগ্রিক শক্তিকার নমুনা-সংখ্যানগুলি দ্বারা সাধান নৃত্য-  
রাজ্যের প্রদর্শনী বরতি থেকে ব্যক্তি হ'য়ে এক মুন্ডর ফোরা-  
রার পাশ থেকে বলা সেল, সামনে রূপে মকে কনগ্রেট  
হজিল, গারিদিগে নানাধেপের পুন্ড ও নারীর ভিত।

কোনবের প্রোদা বেধে মনে হ'ল মানব সভ্যতার কি  
মহান উন্নতির রূপ দেখলাম, বিরাট অগ্রগতির পরিচয় পেলাম।  
প্রতিদিন সকালে যখন খবরের কাগজ পাই, তা পেরে কি  
আমি কত সভ্যবীর কত বৈজ্ঞানিকের গুণভার, কত আশি-  
কের সাধনার, কত স্নেহের প্রচোড় কল এই খবরের

কাগজখানি। স্টেনবোর্টার্ণের সেই আদম মৃত্যবধ, তারপর কোনিগের মৃত্যবধ, তারপর হোটিং-মৃত্যবধ, এইরূপ পত্রাবলীর পর পত্রাবলীর মৃত্যবধের ক্রমোক্তির দ্বারা—তার সঙ্গে স্কিম-ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক মোটর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, তার সঙ্গে স্কিমার, হেলগান্ডী, বাইস্কিট, আর কতিপয় কালে ক্ষুদ্রভাবে কাকের ডেবী কলবার উপায়—এর কল বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার পর বর্তমান যবের কাগজ পত্রবধ হচ্ছে। বস্তুত সকালে যে যবের কাগজখানি পাঠ হতে সমস্ত মানবজাতির প্রাণের রূপ দেখতে পাঠ।

প্রশ্ন দেখে আর একটি কথা মনে হ'ল—বস্তুমান  
সময়ের সংবাদপত্রগুলির প্রতি ও দায়িত্ব। সংবাদপত্র  
কেবলমাত্র দৈনিক সংবাদ সরবরাহের জন্য নয়, তার প্রাধান্য  
কাজ হচ্ছে লোকশিক্ষা দেওয়া। বস্তু এই ডেসমোক্রেসির  
মুখে সংবাদপত্রের দায়িত্ব ভরতর। সুতরাং সংবাদ দেওয়া,  
জাতিকে ম'ড়ে তোলা, পৃথিবীর দেশের সচিত্র দেশের সম্বন্ধ  
গঠিত করা, শান্তি স্থাপন করা, অস্ত্রের সচিত্র মুক্ত করা,  
মানব পৃথল ছিন্ন করা—এই কত কতবা সংবাদপত্রের।  
বস্তুমানকালের সংবাদপত্রগুলি বৌদ্ধ ভাষ্যত বাস্তবনৈতিক, কল্প  
বাক্যীভূত হচ্ছে জাতীয় জীবনের একটা অঙ্গমাত্র, স্বাভাবিক  
উন্নতি, সামাজিক উন্নতির বিবেক দৈনিক সংবাদপত্রগুলির  
ভেত্রে কথা দরকার; সংবাদপত্র ও সত্যিকা হচ্ছে জন-  
সাধারণের নিকট জীবনের চিত্রের বাহক। যেদিন সংবাদ-  
পত্রগুলি সত্যিকার জীবনের প্রকাশ হয়ে উঠবে, কেবল  
বেহায়েতি, দলদলি নয়, কেবল গোমর্ষক কোঁচুগ্রন্থ  
ঘটনা বা সংবাদের বাহক নয়, যখন-তারা জাতির সর্ববিধ  
কল্যাণের সাধক হবে, জাতির সচিত্র জাতির প্রাণ, শান্তি  
স্থাপনের মহাপ্রচেষ্টা হবে, যখন পৃথিবীতে কোন চূড়ামা  
দেশ বা চকল জাতির উপর অপ্রাপ্য বলিভ্যত কোন জাতির  
মজাচার-অবীর্ণতা পৃথলবহনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের  
সংবাদপত্রে প্রতিবাদ ও সূচসোষণ হবে, তখনই সংবাদপত্রগুলি  
সর্বমানবকল্যাণের কাজে লাগবে, পৃথিবীর পর পৃথিবীর  
এই বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির সাধনার সার্থকতা হবে।

## বনভোজন

ঐক্যকুমার সরকার

১২

অন্তর্যায় মাসের প্রথমেই একটা বিবাহের গল্প ছিল।  
রামেশ্বর চক্রবর্তী এবং সতীশ ব্রহ্মো নিম্নটি খাণ্ড করিয়া-  
ছিলেন। কিন্তু বিবাহ সে দিন হইল না। বাড়ির লোক  
জানিল ঘর গায়ে বিবাহ দিতে বাবুন-মা কিছুতেই রাজী  
হইলেন না। কিন্তু চিত্তের কথা অকুণের মা'র অজান্তে  
ছিল না। বাবুন-মা তাহাকে বেশ দীর্ঘ ভাবেই বলিয়া  
ছিলেন যে, বাবুনের মেয়ের বিবাহ চইবার চইতে  
পারে না।

সতীশ ব্রহ্মোও মাঝে বাধ পড়িল। কিন্তু কপাটা ক্রমে  
কানাবুঝাৎ একটা বিজ্ঞি তার বাধ পড়িয়া প্রায় হইতে  
প্রায়মসের চক্রবর্তী পড়িত লাগিল। যেমন্ত সেই দিন  
সন্ধ্যার পর হইতে নিরুদ্ধ হইয়াছিল; এবং রামেশ্বর  
চক্রবর্তীর নিঃস্বার্থসমাজবিভবণর তাহার নাম বিতার নামের  
সুচিত চিত্ত হইয়া, মেয়েকে স্বক করিয়া তাহার পরিণাম  
সকল ঘোড়িত হইতে লাগিল। বাবুন-মা টলিতে আভায়ে  
এক সময়ে সময়ে প্যট বাকো বিতাকে এই কথাই বুঝাইতে  
চাছিলেন যে, মিথ্যা ভর্ণাম কাগজেও কলঙ্কিত করিতে  
পারে না। অতঃপর মা কিছু বাবুন-মারচেষ্টার বিকলতা  
দেখিয়া হাসনা করিয়া গেল যে, ভর্ণামটা মিথ্যা  
না বলিয়াই বিভা তাহার যিস্মর কথাই মাঝন  
পাইতেছে না, এবং কলঙ্কের ভক্ত বত না হইক  
হেমন্তকুমারের আকস্মিক অত্যাচারই মেয়েটা চক্রবর্তী  
হইতেছে। তাহার এই মনের কথাটা ইচ্ছিতে উপায়  
সে প্রায়ই বাবুন-মা'র কাছে ব্যক্ত করিত; কিন্তু  
সে ভাবিত কপাটা গোপন রাখিয়াছি। হেমন্ত যে এই  
সরলা মেয়েটার সন্ধান করিয়া কেন, কোথায়,  
পলাইল, তাহা অতঃপর মা জানে না। কিন্তু সেই  
হস্তভাগার গল্পই যে তাহার সোনার বিভা' কারী

হইয়া গাউতেছে, এবং তাহাকে কিরিয়া পাওয়া  
বাড়ীতে যে বিতার আন্তোগের উপায় নাই, তাহা বিত  
বলিয়া মনে করিল। তাই সে নানা বেষ দেবীর  
নিকট কেবলই মাথা কুটুতেছিল কেন তাঁহারা বরা করিয়া  
তাহাকে কিরাইয়া আনিয়া যেন। বখালাহা তাহার অগ্রসন্ধানও  
চলিতেছিল, কিন্তু তাহা একেবারেই বিকল হইয়াছিল।

মাস তিরেক পূজা একদিন সন্ধ্যার পর লক্ষ্যাতীর প্রায়মাণ  
গ্রহের মত যে এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল, এই গ্রাম  
কম্বার ভাগ্যগণনের প্রকল্পী তাহার অত্যাচারও সেইরূপ  
আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক। তাহা বাড়ীতে মায় কিছুই নির্ভা-  
রণের সম্ভাবনা ছিল না। কেবল একমাত্র বিতা  
ইহার কাম্পন তিক বুঝিয়াছিল। তাহা হইত বাবুনের  
তাহারই কথা যে সে চিরকালের ভক্ত যে স্থান  
ভাগ্য করিয়াছে, এই কথা আত্মীয় দরদীদের  
নিকট বলিবার ভক্ত ব্যস্ত হইলেও সে বলিতে পারে  
নাই। এই যে সাধারণ কাল সে বিস্ত্রি ভাবি বাপন  
করিতেছে, এই যে পত চেষ্টা পূর্বের তাহার কথা, তাহার  
সুখি, তাহার লাগিত বা কিছু সমস্ত মনের উপর অগ্রকণ  
আলাপোনা করিয়া তাহার ভ্রাত ভিক্তক হৃদয়মাংসের বিশ্রাম  
না দিয়া অতি পীড়িত করিয়া তুলিতেছে, ইহার ত কোনও  
উপায়ই নাই। বিভা তাহাকে সুখী করিবার ভক্ত ভগ্নপে  
পাঠান নাই বলিয়াই বোধ হয় শিশুকাল হইতে ভগ্নপে  
বত রক্তম ভূষণের বোকা থাকিতে পারে, তাহার মাঝ  
চাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মাতা তাহার কণ্ঠের  
পরেই স্তম্ভিতা-গুণে অভিহিত ছিলেন, শিশুর আগের সে স্বপ্ন  
মাত্র করিতে পারে, তাহার বিদিস্মাকেও তাহার নামাত্র ব্যাট  
মনে পড়ে; তার পূর্বেই মনে পড়ে তাহার আলাপের  
অবস্থা, এবং সেই অবস্থার হেমন্তী বুঝার সমস্ত কণ্ঠের  
মত অগাধ বেহের যথো তাহার আদিয়া পড়া। সেখানে

## ঐশ্বর্যকৃত্যের পরকায়

কি শান্তি, কি আনন্দ, কি শিক্তা! কিন্তু এট শান্তি, এট  
 সুখ কখনোইর জন্মই বা। বহল ভাঙার যেমন বাড়িতে  
 লাগিল, তেমনি ভাঙার কানে অবাচিত ভাঙার  
 বহসের এবং বিবাহের প্রয়োজনীয়তার ও ঘরিত কল্লার  
 বিবাহের অন্তরায়ের কথা সময়ে অসময়ে আসিরা পড়িয়া  
 ভাঙার শান্তিকে ত্রিক্ত বিধাক্ত করিয়া দিতে লাগিল।  
 ভাঙার এট অবাচিত বাড়িতে বাড়িতে, পত অস্থি-পরীকার  
 উত্থানের ভিতর দিয়া, ভাঙার সোনার মত নিখল  
 এবং সমৃদ্ধ মনকে পলাটিকা অগ্নিময় করিয়া  
 তুলিল। মনের সেট রক্ত অবস্থার অনেকখান সে  
 ভাবিয়াছে, “মার পারি না। তে দেবতা, যেখানে চটক  
 এট অবস্থা চাইতে আমাকে পত্রিতান কর। সুখ আমি  
 চাই না; ভবিষ্যতের ভাবনাও করি না। কেবল বর্ত  
 মানের এট যে অসন্তোষ বাগুন ইহা চাইতে নিষ্ঠুর চাই!”  
 এট সময়ে এক সন্ধ্যায় সময় অপরিতিত হেমন্ত ভাঙার  
 তামস-গুণনে দেখা দিল। তারপর কি আনন্দ, কি শান্তি,  
 কিন্তু সে কখনোইর জন্মই বা। ত্রমণ ভাঙার অধুনিগির  
 কণ্ঠে তাব আনন্দের আকাশে জবতারটির উৎসর্গে লগে  
 পড়েই ভাঙার এক কোণে একটি ধূমকেতুর ছায়া-বুদ্ধি, দেখা  
 দিল। এখন কোথায় সে জবতার! ধূমকেতু সময়  
 আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছে। সবই ভাঙার ভাগ্যনিগির কল।  
 ভাঙা না হইলে কেন সেদিন সেই চুপটা বটল। ঐক  
 যে সময়ে ভাঙার ভাগ্য হুগ্লার হইয়া আসিতেছিল,  
 যে সময়ে সে কল্লার ভাঙার প্রথমতমকে আশ্রয় করিয়া  
 ভাঙার ভবিষ্যৎ পায়ের পাখিতে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই  
 সময়ে ভাঙার কিম্বার হাত ভাঙিয়া তাঁহাকে মরণের পথে  
 লইয়া গেল। উঃ, সে হাতের কথা সে কি কখন কুলিতে  
 পারিবে! বুঝায় কি সে বহুনা, ভাঙার অসংখ্যক সবিকৃত্যের  
 সীমা অতিক্রম করিয়া কি-ই সে আশির “অভিব্যক্তি।  
 কিন্তু ইন্দ্র ত সে সন্নিহিত ভাঙার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া-  
 ছিলেন। সে বহুগণ অবস্থানের জন্ম সে যে ভাঙার  
 সঙ্গাপেক্ষ। প্রিয় আত্মজ্ঞাটিকে ও ভাঙার নিষ্পেক্ষ বলি  
 বিবাহ মানস করিয়া তদবস্থানকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, “ঠাকুর,  
 এই মনোনা ত্রাণকৃত্যের একটি মাত্র প্রার্থনা তুমি পূরণ

কর। কিম্বা এট বহুগণ অবস্থান করিয়া বাও। অসি  
 কখনও কোন প্রার্থনা আমি করিব না। যদি করি ত  
 আমার লক্ষ্যপেক্ষ। যে প্রিয় ভাঙারট ভিতর দিয়া তুমি  
 আমাকে প্রতিকা ভক্তের শান্তি দিও।” ঠাকুর ত সত্যই  
 ভাঙার কথা শুনিয়াছেন। তাহা না হইলে সেট রূপোপে  
 কি সে সকল সম্ভব চাইত, না ভাঙার ভিমা’র বহুগণ অবস্থান  
 চাইত। কি যে সত্য, আর কি যে কুসংসার, তা কে  
 বলিবে? যদি এখন সে ভাঙার প্রতিকা লক্ষ্যন  
 করে তাহা হইলে দেবতার অমোঘ বহু চাইত তাহাও উপর  
 পড়িবে! কিন্তু অস্ত্রা সে আশ্রয় সে ভাঙার প্রথমতমের মন:  
 দিয়া আসিয়াই তাহাতে পৌঁছিত। সে কথার ভাবনতার  
 করনা মাঝেই সে পায়ল হইয়া যায়। হুতরা সে দাড়া  
 করিয়াছে, হেমন্তকে ভাঙারট রক্তের জন্ম কটু বাকে  
 পুর করিয়াছে,—তাহা বাতীর আর ত উপায়ান্তর ছিল না।  
 তাহাকে সেট নারীমাংসোপলুপ জন্মটার নিকট নিষ্পেক্ষ  
 বলি দিতেই হইবে! এ ভাঙার অন্তিমবহুগণের জন্মনিগির।

মনপ্রবৃত্তিবিবরা দিয়ার করিতে পারেন, মাএ পত্রে  
 আশ্রয় বহুগণের মেঘের মনো উপর দিয়া এতকণ দিয়ার  
 স্রোত বহিরা বাওয়া সম্ভব কি না। ভাঙার মনো পত্রা  
 হুতরাগির নিকট চাইতে দিয়ার এট পীড়ার সময়ের লিখিত  
 অনেকগুলি চিত্রি মনোবোধের সহিত অধ্যয়ন করিয়া এবং  
 বিহার পত ভাবন পক্ষে অনেক অত্মসন্ধান কারিয়া বিশেষ  
 কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিজেই ডাইবিত লিখিয়া  
 রাখিয়াছিল, “এই মেঘেরি বৃদ্ধ যেমন ভীত, ভাবপ্রবৃত্তা  
 তেমনি দলল। এইরূপ ভীতবুদ্ধি এবং ভাবপ্রবণ মাত্রবট  
 কি পায়ের বাক-প্রতিবাকিতে ভাবনায় উদ্ভাটাব্যাপন  
 হইয়া পড়ে?”

সেদিন রূপের বেলা বিভা খের মনো ভাঙার মনো  
 পড়িয়া পড়িয়া কত কি ভাবিতেছিল। মাত্রকাল সে  
 এইরূপই করিত। এমন সময়ে ভাঙার কানে একটা কথা  
 প্রবেশ করায় সে উঠিয়া বসিয়া মনোবোধ দিয়া শুনিতে  
 লাগিল। সেদিন জ্বরের পালের ছেলের বিবাহ। পুরাকাল  
 চাইতে এই গ্রামের নিম্ন মাঝে যে, গ্রামে কোন বিবাহ  
 হইলে বীড়, বোধের বাড়িতে ভেট শাটাইতে চয়। এই



শরীর দুইটই মুহূর্তের মধ্যে বিকল হইয়া বাইরের মত হইল। কিন্তু সেই মুহূর্তে এখন তাহার সমুখে আশিরা তাহার খোলাটে চোখের উপর উজ্জ্বল লব্ধাত্মিক তাবে দাঁপ দৃষ্টি স্থাপন করিল। তখন সে আশ্চর্য হইয়া যেখান যে মুহূর্তে তাহার একান্ত অপরিস্রবিত নগ্ন—বিভার প্রান্ত মুস্তির মত! তাহার পর সেই মুহূর্তে এখন একটা। তার তৎসদৃশ বয়ে তাহাকে সন্ধান করিয়া বলিয়া উঠিল, “তোমরা এত নীচ কেন? আমার বি-মার উপর এই নির্ভর্যতন কি তপস্বান সইতে পারবেন!” তখন অল্পক্ষণ স্থান্তির থাকিয়া রামেশ্বর উত্তর করিতে গেল, “আমি কি কব্ধ বল। মানেহার—” কিন্তু হস্ত বা রামেশ্বরের মনটা তখন অল্প একটা চিন্তার বিভার সেই কোমল নবীন সরল মুস্তির সহিত আভিকার এই কতালময়ীর তুলনায় এত ব্যস্ত ছিল যে, সে তাহার বক্তব্য ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না, অথবা হস্ত বিকৃতমস্তিষ্ক বিভার মাথায় তাহার কথা স্থানই পাইল না।

দ্রোহা স্বপ্রাণিতাব মত কোঁকর সহিত বলিয়া বাইতে লাগিল, “সত্যি মুখবোকে গিরে বলগে যদি সে আমার এই গড় কথানা পেলেই লম্বটে হয়, কলেই বিয়ের দিন আছে—”

এই সময়ে বাইরে একটা গোল উঠিল। তিন চারজন লোক বিভার উভয়বের কথার তাহার সন্ধান পাইয়া দেখানে ছুটিয়া আসিল। তাহার বি-মা তাহাকে অক্লান্তকৈ ধারণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পরদিন হুগাপুরের ইতিহাসে একটা দরদী বটনা পড়িয়া গেল। শুক ভোক্তার কলেই হউক বা অল্প কোন কারণেই হউক সত্যি মুখবোর অস্তর মধ্যে একটা গোলযোগ ঘটয়া বাপ যৌথ হইবার মত অবস্থা হইয়াছিল। প্রাচ্যের বিজ্ঞানের দৃষ্টিবোধ এবং সাম-কালী ভাষারের বিভার বলাগা হইয়া বাইবার পর কোণার দিচ্চল সর্ধিনকে আনা স্থির হইল। মধ্যাক্ষের পর তিনি আশিরা চিহ্নিতগা আরও করিয়াছিলেন, একপে রোনীকে কতকটা হুহ দেখিয়া ক্রিয়বার উচ্চারণ করিতে-

ছিলেন। পরীগ্রামে একজন যেমন-তেমন ভাষার আসিলেও জৌতুলী লোকের তিত্ত লাগিয়া যায়; হস্তবাহ মনোকাব মহাপথের পীড়া এবং সত্যের ভাষারের আগমন এই দুইটি মণিকাকনের সংযোগে সেদিন অপরূপে হুগাপুরের কাছারিতে যে একটা পণের জনতার সমাবেশ চরমোচ্চল, তাহাতে আশ্চর্য্যে কিছুই ছিল না। ভাষার সত্যে এত লোকগুলির দিকে চাওয়া চাওয়া যেন কাঠকে পুঁতেতে ছিলেন; কিন্তু সে লোকটি তাহার নজরে না পড়তে একজনকে ভাষিকা ছিঁড়িয়া করিলেন, “সেই যে আম ভাষা মানে এক বুড়া ভাষারের হাত কেটে বিয়ে দিয়েছিলাম, তাঁদের এখন খবর কি?”

“তাঁদের বড় বিপদ” বলিয়া হুগেন পাল বিভার পীড়ায় কথা উত্থাপন করিল।

ভাষার সাহেব বলিলেন, “সেই এখানে যেখানি না?”

কথার সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে একটা কানামুদা পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহাদের কোন মন্তব্য ভাষার খোখের কানে আসিয়া পৌঁছিবীর আগেই সুরেনশাল ধলিল, “সে মাস খানেক কোম্বার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে—”

“কেন? মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে—”

সকলেই এই কথার আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হুগেন পাল বলিল, “সে রকম কথা ত কখন শুনি নি। আপনি—”

ভাষার সাহেব কি ভাবিয়া কথাটা শেষ না করিয়া একবার বিভাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং হুগেন পালকে সঙ্গে লইয়া বাহুনমা'র বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। তখন বিভার ঘরের মেঝের গুইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া পতগ্রাতির সমস্ত বটনার কথা ভাবিয়া লজ্জার মরিয়া বাইতেছিল।

ভাষার সাহেব বাহুনমা'র নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া রোগীকৈ শরীকা করিয়া বৃক্লেন যে, সে দ্বারবিক বোকসোর একটা আত লম্বটের দীমার পৌঁছিয়াছে। তাহার মানসিক এবং পার্যায়িক যে ব্যাধা তিনি মনে হই পুঙ্কে দেখিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহার যে বয়স তাহাতে এই অল্পময়ের মধ্যে তাহার এইতপ অবস্থা



মধ্যে গানে গানে যে সমস্ত নিবাসের নীতি আচরিত হইয়া আছে, তাহাও মানবতাবোধে অজ্ঞাত নহে। কিন্তু বনভোজনের এক প্রান্তে এই যে মৃদক দৃবতীর বার্ষিক সমস্ত সম্মিলনের অগ্রদূত হইয়া থাকে, ইহা হঠাৎ অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর জ্ঞানের বাহিরে।

বনভোজনের বসন্তকালের একটি দিনে এই ক্ষুদ্র মহাদুনি গ্রামটি কয়েক মণ্ডল পালাকী মুন্সের মুন্সরীর আগমনে, তাহারদের কলহাজে, দীপাচকল সূতো এবং উদ্ভাঘনায় এবং প্রেমের ললিতগানে দ্বন্দ্ব হইয়া উঠে। সমস্ত বনভোজের মধ্যে বাঙালদের মাতাপিতার অতিক্রান্তে বামী প্রীর নির্দোষ হইয়া দিগাহে, বাহ্যিকের বীর মনোমগ্নে দীর্ঘন সচর সচরী স্থির হইয়া দিগাহে, এবং বাহ্যিক বয়স এবং চিত্তের পরিণতি-চেতু মনোমগ্ন সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্দোষের ক্ষত উন্মূষ হইয়া আছে, লকলেই দুই দ্বন্দ্ব হইতে সমস্ত বনভোজের উপার্জন এবং সমাজ হই একটা বহনের শৈবসানি লইয়া উৎসবের বেশে সম্মিত হইয়া এইখানে উপস্থিত হয়। তাহার পর কেহ বা নিজের প্রতিষ্ঠিত পরিণ এই গানে মগ্ন কর, কাহারও বা জনক জননীর নিসার্চিত পতি বা পত্নীলাভ হয়, আবার কাহারও বা তাহারে অজানা মনের রাগবৈচিত্র্য এই গানে সমবেত অসংখ্য নরনারীর মধ্যে বুদ্ধিগা বাহির করিয়া লইয়া হাঁকিতে আভায়ে গানে সূতো তাহার প্রাণের হইয়া নিবেদন করিতে হয়। যখন এই নিবেদন ক্রমে তাহার বাক্ত হয়, তখনকার সর্ধকতার উল্লাস একটা আনন্দের উচ্চালে বাক্ত হইয়া শুধু সেই মনোবীতার সখী-মহোত্তরগণেরই নহে, সেখানে উপস্থিত অত নরনারীগণেরও, দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কর্ণে একটা মধুর ধারা বর্ষণ করিয়া দেয়। পুরুষের সেবা করিয়া অনেক মোহিনী তাহাকে ভয় করিয়াছেন, এ তথা বাঙালীর নটিক উপভোগে প্রত্যাহ মোহিত, পাই; রমণীকে বীরবে মুক্ত করিয়া তাহার মনটি মগ্ন করিয়া লওয়া দীর্ঘকালে এবং মানবলগ্নে অতি পুণ্যজনক এবং; কিন্তু তাগশাতার, শাখার বাতাসের সেবা অপরিসীম স্বাভাবিক। তখনই মনোবলগ্ন করে, এ কেবলমাত্র এই, মহাদুনি মেলাতেই বোধ হয় দেখা যায়।

কিন্তু বনভোজের লক্ষ্য লক্ষ্যে। আনন্দের বাণীর তখনই আভ্যন্তরীণ যখন তাহার উৎসব এবং তখনবোধে দৃষ্টিতে পড়ে, কোন ত্রীর্থাবস্থা তখনই তাহার সূত্র নির্দোষিত সচরচরী সজিত সেই সর্গত এবং কনের কোন অজানা লুপন কোণের উচ্চত্রে বীরমগ্ন পদবিক্ষেপে ব্যোমস্ত করিয়াছে। অল্পমূল্য বিলাসী প্রসাধনের দ্রব্য, কুটা মুক্তার হার, গিন্টির ইয়ারিং, মাটির হুইটা হাঁড়ি, একখানি চোটেই, একখানি হাত পাখা, ইলান চট্টকরা কাপড় লইয়া মনের আনন্দে লোকচকুর অল্পমূল্যে পৃথিবীতে দেবতাব যে সর্গশ্রেষ্ঠ দান তাগবালা তাহার সমস্ত উপভোগের চক্রে তাহার। কবিবিরের ক্ষত তাহার সমস্ত হইতে অগস্ত ৪৪, তাহার পর কিরিয়া আদিয়া বামীপ্রীর রূপে লুপার পাতে।

দেখিলে সর্কার পর এই মেলায় অসংখ্য অনেক প্রমো-  
দের মধ্যে বেগুনের একটা সখের বসন্তাভাবের নাচ-  
গান হইতেছিল। নটকখানির কথা একজন দোতাঁরা—  
দেখানে শাস্ত্রিকর ক্ষত উপস্থিত লবতি; অক্ষিপারক ও  
তাঁহার মেলাবর্ণনকে অতিবিশদক বুঝিয়া বিবেচিত।  
এক রাক্ষসতা এক তাগালকে তাগাদিয়াছিল। দিনের  
পর দিন তাগালের মনো এই রূপে রাক্ষসাতীর পারিবা  
এবং মননের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অল্পমূল্যে  
উদ্ভানের এক প্রান্তে কোণপ্রান্তে নিঃশ্রুতা কুমারীর  
কর্ণে তাহার প্রেম নিবেদন কিরকম একটা হৃদয়গতকতার  
দ্বিত বাক্ত হইয়া গড়িল। কলে দে নিগাভন এবং নিসাসন  
লাভ করিল। কিন্তু প্রেমের অদৃষ্ট রহস্য! তাগালের  
নিসাসনের পরেই রাক্ষসাতীর তাঁহার সম্মানভান  
দুগিয়া গিয়া প্রিয়তমের সন্ধানে একজন বিধবা সচরচরী  
সজিত বাহির হইয়া গড়িলেন। কতদিন কতমাস ব্যুগ্ধা  
প্রাঙ্কা মলিনা রাক্ষসতা এক বিভ্রম কলে লগ্নাঙ্কা  
হইয়া গড়িলেন। সেই সময়ে তাঁহার কানে এক  
মধুর মৃদলীলনি প্রবেশ করিল। কুরক যেমন বাশীর প্রবে  
ধাবিত হয় তিনিও সেইরূপ সেইবরে আকৃষ্ট হইয়া অত-  
সজনি করিতে করিতে তাঁহার প্রিয়-পরিধানে উপস্থিত  
হইয়া মিলিত হইলেন।





এই অভিনয়ে যে বাণী বাজতেছিল, তাহার ক্রটিযে! সেখানকার লোকলেই বুঝ চইয়া গেল। লোকলেই বলিতে লাগিল এমন মধুর নিশুণ বাণী বাজনা তাহার কখন পোনে নাই। ক্রমে বাণী বাজান চইতে প্রশংসাও বাণী বাদকের উপর গিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিতে ঠিক বাঙ্গালীর মত, বন্দীত মত তাহার রং ও এবং মুখের পট্টন নয়, এবং তাহার নানিকাটি বন্দাবাদীর নাকের কাছ দিয়াও যাহা নাট, এমন কি তাহা অনেক বাঙ্গালীর পক্ষেও প্রকারে বুঝ্যের উপাদান হইতে পারে, এ কথা অনেকেরই স্বাক্ষর করিল।

এই যেনা উপলক্ষে একজন উজ্জ্বল বাঙ্গালী রাসকল্যাণী সপরিবারে সেখানে তীব্র পাতিয়াছিলেন। তাহার পরিবারের বয়সীপন চিত্রের আঁচনে বলিয়া এট বন্দী নাটকের অভিনয় দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধী অতি মনোযোগের সহিত সেই বন্দাবাদন শুনিতেছিল এবং বাৎসরিক অর্থ প্রত্যয়ের উপর গভীর অগ্রনিক্ষেপ করিতেছিল। মধ্য রাত্রিতে, অভিনয়ের অবসান হইলে যখন সব চিত্রদলান জলিয়ায় বাণীবাদককে ডাকাইয়া তাহাকে রোশা পুস্তক পুরকার দিতেছিলেন, তখন এই বৃদ্ধীটি বিস্ময়ে মনোযোগের সহিত তাহাকে দেখিয়া গেল। সে ভুলিল যে, এতবার সেই বাণীবাদক মহামুনির প্রতিমা ফেরিয়া যে পত পত বৃদ্ধ-বৃদ্ধী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অনন্ত-মুতা করিবে, তাহাদের সহিত মিলিয়া তাহাদের অনন্ত রুচি করিবার জন্য বাণীর মূর্তি তাহাদের ব্রতের উদ্ভাবনা কাগিয়ায়া চুলিবে।

রাত্রি তখন কুঠার প্রান্তর। মহামুনির মঙ্গল ক্রমেই জনবিরল হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহারই এককোণে শ্রান্ত বাণীবাদক তাহার বাণি চইতে অশ্রুত বোহমার বর মন্দিরের সমুদয় প্রাঙ্গণের আগ্রস্ত এবং নিয়োগ অলংকা নবনায়ক উপর ছুকাইয়া দিয়া তাহাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছিল। এই সময়ে সেই বাঙ্গালী মেয়েটি বন্দী বাণীবাদকের সঙ্গে অসঙ্কোচে দুহুতের জন্য হস্তার্শণ করিয়া

“একবার আমার সঙ্গে ঐ বড় বট পাড়টার তলায় দেখা করো” বলিয়াই কোথায় সরিয়া গেল।

পরদিন মধ্যাহ্নে মহামুনি চইতে কয় রোশা পুস্তক একটি পাছাড়ের নীচে একটি পাড়ার গাছের ছায়ায় চেমত বিতান হাতটি ধরিয়া বসিয়া ছিল। তাহাদের সাথ শোখাক সবই পাছাড়ের মত এবং তাহাদের সংসার পাতিবার উপকরণও সেই জাহিই অলুকরণে সংগৃহীত। চতুর্দিকে জন শ্রুতি নাই, যৌর এবং বায়ু আনন্দে মাতামাতি কোলাহুলি করিয়া তাহাদের এই মিলনকে আশীর্বাদ করিতেছিল; এবং তাহারই মধ্যে অনেক দিনের অনেক কাবার কথা তাহাদের মূহ হইতে অনর্গল বহির হইতেছিল। বিভার শীতের কথা সে গণিয়া রাখিতে চাইয়াছিল, কিন্তু তাহাও কয় পড়ার দিকে চাইয়া চাইয়া জাহা-পারে মাথার দেকের হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার লব কথা যেহেতু যৌর যৌর বাতির করিয়া গেল। জাহারের সেই হিসেব কাবার পর কি রূপে সে তাহার কিম্বদন্তি হস্তাপুর জাগ করিয়া সত্য মূখ্যের মাতিবা হইতে তাহাকে দূরে লইয়া বাইতে অগ্রসর করিয়াছিল, সে কথা বলিবার সময় বিভার অস্তর সজিত একটি লজ্জার হাসি মিলাইয়া গেল। তাহার পর কাণীঘাটে তাহার কিম্বদন্তি শিখের বাটি আলিয়া তাহায়া স্বয়ং অতিবাচিত করে, এবং সেই সময় কিম্বদন্তি বৃত্তা হয়। তাহার পর ক্রমে সে সেই শিখবাড়ীর বৃদ্ধবৃদ্ধ পরিবারের মধ্যে চট্রপ্রমে আসিয়া মহামুনির যেনার আসিয়া পৌছিয়াছিল, সে কথা বলিয়া যেহেতু চকুর দিকে গাহিতে গিয়া কি তাহায়া গাহিয়া বিভা মাথাটি শীচু করিল।

পাশে বাণীটা পড়িয়াছিল, যেহেতু সেই হাতে করিয়া কুলিয়া লইয়া কি তাহায়া বলিল, “তুমি বাণী বাজাতে শিখবে বিভা?”

বিভা হাসিয়া বলিল, “কেন?”

“পাছাড়ী মেয়েরা ত বাজায়”

“আমরা কি পাছাড়ী?”

## ঐক্যবন্ধনকার পরকায়

“এখন তা ছাড়া আর কি ! আমাদের দত্তা সমাধে ত আর স্থান নাই—”

কি তাহি। কণাটা হেমন্ত দেখ করিতে পারিল না। কিন্তু বিভা সে কণাটা টানিয়া লইয়া বলিলে ব্যাধিল, “দত্তা সমাধে আমাদের স্থান হবে কি না জানি না, জানতে চাই না। আমার লীলাধরী কিমা সরণকালে কি ব’লে গেছেলেন জান ?”

“কি বলে গেছেলেন ?”

“আমার হাত দুটো তাঁর বুকের উপর—সেই সেদিনের রাত্রির কথা তোমার মনে আছে ?—তুমি কি এই রকমে ব’লে গেছেলেন, মা সেদিনকার আমার সেই যে সন্তুদান সেটা মিথো নয়। আমি ত চ’লে থাকি, কিন্তু তুমি তার উপর তোমার যে দাবী এবং তার প্রতি তোমার যে কর্তব্য চাইই রকে কোরো। তাই ত আমি কাল অমন অদ্বোদে—” বিভা, বোধ হয় লজ্জার কণাটা দেখ করিতে পারিল না, কেমন্ত তাহার মাথাটা বুকেব উপর টানিয়া লইয়া চুলের উপর মুখটি একবার তৈকাইল। তাহার পদ একটু নিম্নত থাকিয়া বলিল, “কিন্তু আমার কর্তব্য যে, আমাদের সমাজের বা করণীর সেই মত কটা প’ড়ে আমাদের অবস্থাকে—”

“না, আর তাতে দরকার নেই, সেইদিনকার আমার কিম্বা সেই সন্তুদান, আর কাল রাত্রিতে এই মহাসুনির বেলায় আমার সেই অদ্বোদে—” লজ্জার হাঙ্গা হইয়া বিভা খামিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, “এই যে লক্ষ্য সমস্ত পাহাড়ীদের যথো কাল রাত্রিতে তাদেরই মতন আমাদের বীথন হ’লে পেল, তার চেয়ে দত্তার বীথন আর কি হ’তে পারে ?”

হেমন্ত নিজের মুখটি হুই ঠাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার চোখের উপর অন্ধকার সত্তার দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বির হইয়া

বসিল। মুত তাহিরা কক্ষ তটাই অর্ধ মুদ্রিত করিয়া বিভা বলিল, “অমন ক’রে কি দেখছ ?”

“দত্তা, বিভা ! তোমার মুখ থেকে কি যেন একটা দত্তার আলো আমার অন্ধকার চুল্লী মনের চিরকালের সংস্কার দূর ক’রে দিতে। দত্তাই কি আমাদের এই মিলনের উপর আর পাহাড়ী বা সামাজিক কোন করণীর নেই।”

“আমার ত তাই কারমনোবাধা। বিভা। তাতে যেন একটা দত্তাকে এবং তার সঙ্গে আমার স্বর্ণগতা কিম্বাকে অগমান করা হয়—”

“কিন্তু কি পরিচয় আমার লোকালয়ে দাব ?”

“যেটা দত্তা পরিচয় তাতেই, এবং এমন লীচল্লয়িত কেউ যদি থাকে যে আমাদের কথা ছাড়া অন্য গ্রাম্য চাবে, তাকে উপেক্ষা ক’রে।”

“কোণার থাকবে ?”

“সে যেখানে তোমার প্রবিশ্য হবে। তবে প্রজাপুত্র আমার আর আকর্ষণ নেই। একমাত্র অতুলন যাকে সময়ে সময়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।”

বিভা এবং হেমন্ত কলিকাতাতেই গাক। তাহার যেন যুগে এবং পাতিতে আছে তারা না-বলিলেও ভাল। কেননা বিভা, ব্যাতি, গ্রেম এবং বাচ্চাই যদি সাংসারিক যুগের পরাকাষ্ঠা হয়, উন্নত মন এবং নিশ্চাল আত্মা যদি ইচ্ছালোকে অমতর উপভোগের উপস্থান হয়, তাহা চাইলে তাহাদের যুগ এবং ভোগকে অনন্তসাধারণ বলিয়াই মানিতে হইবে। কেবল এখনও একটা মাএ গাণ তাহাদের অপূর্ণ আছে, অজ্ঞাপুত্রের রাগেরের ভিতরে এবং কিম্বার ভয় পবিত্র ধর্যানির মেঘের উপর এমন একটা। কিন্তু করা বাহাতে সেখানকার স্বতি বাজলার বুকে চিরকাল অন্ধর হইয়া থাকে।

সমাধ

# কব-কবি লার্মনটফ্

শ্রীমতোশ্রু দাস

১

কব-সাহিত্য ভগবতের রক্ত-ভাণ্ডারের একটি অমূল্য সম্পদ। দেশে দেশে সুপে সুপে মানবের অন্তরলোককে যত খেঁচনা, যত অজ্ঞ ভাষা হইয়া উঠিয়াছে—কবিতার সাহিত্য ভাণ্ডারকে চেতনা দিয়াছে, তপ দিয়াছে; যত প্রেম, যত ধর্ম, যত আনন্দ বোধ মানব-মনে জন্মলাভ করিয়াছে—কবিতার শিল্পী-মন তাহার

উদ্বোধন করিয়াছে।  
হাট আমরা দেখিতে  
পাট, বিব-সাহিত্যের  
একটা সুন্দর গ্রন্থ  
অঁড়িয়া গেছে,—আর  
সে-গ্রন্থিতে বিপ-  
পতঙ্গীর তরল বাঙালী  
মনট বেঁধে করিয়া  
জড়াইয়া পড়িয়াছে।

কব-সাহিত্যের মধ্যে  
আমাদের প্রথম পরি-  
চয় হয়, তাহার গভীর  
বিবাক-ভরা সুরের  
ভিতর দিয়া। যে-  
জীবনের চিত্র আমরা  
সেখানে অঙ্কিত  
দেখিতে পাই, সেখানে  
আনন্দের দীপ্তি নাই,  
সুখের রক্ত-বর্ণনা

বেদনার প্রলেপে অশ্লীল হইয়া গেছে—সমস্ত চিত্রব্যানি  
জুড়িয়া আছে একটি কৃত্রিয়ান বিবাদের স্রব। পুণ্যকিনের  
প্রথম বহুদৈব কবিতার ও গোপালের প্রথম বহুদৈব

উপস্থাপনে যৌবনের আনন্দ ও তরলতা স্থলের মতো দৃষ্টি  
উঠিয়াছিল দৃঢ়। কিন্তু জীবনের সেই প্রথম অধাঃস্বের  
অফসানের মধ্যে সজেই সে স্থল করিয়া গেল—জীবনের  
বৃক্ষে বৃক্ষে গুণের কাঁটাই বড় হইয়া জাগিয়া উঠিল।  
উলন্দট, তুর্গেনিয়েভ্, দস্তফ্-এল্‌ফ্, বেক্‌রাসক্, বলট্-  
দফ্, প্রভৃতি সকলেই সাহিত্যের কমলবনে গিয়া যে-সুখের

বক্তার তুলিয়াছেন—  
সে-বক্তার গিয়া মাহ-  
খের অন্তরের বেদনার  
স্থানটাই ল্পণ করি-  
য়াছে।

বেদনার এই ত্রিবিধ  
পরিচয়েই কব-সাহিত্য  
আমাদের কাছে তাহার  
অন্তরের কাছে উনিয়া  
ল ই যা ছে।...অদীম  
প্রবেশপথ মধুর করিয়া  
কব-সাহিত্যকগণ এক  
অমৃত-ভাণ্ডার দাত  
ক রিয়াছেন,—তা হা  
মানবতার জাতি  
সুপতীর দয়া ও  
সুবিপাল মহাপ্রভূতি।  
কবিতার বেদনা-বজ্রের  
প্রধান:—সুপ্রোহিত

দস্তফ্-এল্‌ফ্‌র সেই



কব-কবি লার্মনটফ্

মহাপ্রাণি মনে পড়ে—“I did not bow down to  
you individually but to suffering Humanity  
in your person.” কব-সাহিত্যের এই অন্তঃস্বের বাণী

ভিন্নদিন বিশ্ব-মানবের বুক অমর চটায় থাকিবে।—উভয় কব-শাস্ত্রের নত পরিচয়।

পুণ্ডিকনের জীবিত-কালে যে সকল তরুণ-কবি তাঁহার চারিশাশে থাকিলা আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ভর্য্য কব-শাস্ত্রের কলম-কলম প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লায়মন্টফের (Mikhail Yuryevich Lermontov) নামটী প্রথমে মনে পড়। কব-কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে পূর্য্য মনোভেদে ছিল; তাহা ভাঙা তিনি আদিয়াছিলেন অগাধা একটি নতুন স্বরের অগ্রদূত চইয়া। একণা মতা যে, কবিগণ কনসাধারণ তাঁহাকে চিনিলা অনেকটা বিলম্বে; কিন্তু যখন চিনিলা, এমন করিয়াই চিনিলা যে, লায়মন্টফের বেদনার ব্যাপ্তি তাহাদের মনুষ্যমাত্রা শিখার রক্তপোতে মিশাইয়া দেয়; তাহাদের মনের মতল কবির সিংহাসনখানি ভিন্নস্থায়ী ভাবে পাতা চটিল। তাহার বুকিল, লায়মন্টফ্‌ আর কাহারো কণা যেনে নাই, আর কাহারো বেদনা তাঁহার মর্য্যকে রক্তাক্ত করে নাই,—তুই তাহাদের বেদনা, তৎপ্রসিদ্ধিত রবিবার মাহুদের বেদনা তাঁহার লেখনীর মুখে লঙ্ঘনুত্বিত লজ্জবণ ছুটাইয়াছে। সেইদিনই তাহারা কবিয়ার এই লাজুক তরুণ কবিকে তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরের কোণ হইতে বিশাল বিশ্ব-ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া পৌরবের আলনে ব্যাটয়া দিয়া দমস্কে গাতিয়া উঠিল—‘জন-গণ-মন-অধিনায়ক হই হে!’

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কব-সৈন্তদল একটি ক্ষুদ্র স্প্যানিশ্‌ লুহর আক্রমণ করে, এবং দুর্গ অধিকার করিয়া কয়েকজন সৈন্তকে বন্দীভাবে কবিরগ লইয়া যায়। কব-সৈন্তের মধ্যে কল লায়মন্টফ (George Learmonth) নামে একজন চত্‌ ছিল।

লায়মন্টফ মতপের কবিগণেই কল্যাস করিতে থাকে, এবং এইরূপে সেখানে একটি নতুন কব-পরিবারের স্রষ্টা হয়। কবি-লায়মন্টফ্‌ এই বংশেই অগ্রগণ্য করেন।

লায়মন্টফের পুণ-পুরুষগণ সকলেই কব-সৈন্তদলে কল্য করিয়াছেন। তাঁহার পিতা একজন সম্রাট সৈন্যগণ্য ছিলেন। তিনি ধনী উচ্চ-কন্যা একটি প্রকৃতি কুমারীর প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং অনেক বাধা-বিঘ্ন পাক। সন্তেত তাঁহাদের বিবাহ হয়। মেয়েটি তাহার মস্তিষ্ক বার্মাকে প্রাণা-পেক্ষা ভাববাসিত এবং সে নিজে অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা চটয়াও স্বামীর সংসারের দারিদ্র্যে কল-মার্য্যে যাবে একটি প্রত্নস্বামী কল্যের মতোই বিভ্রাট করিত। তাহার সন্তের বয়স বয়সে লায়মন্টফের ক্ষুদ্র হয়। দরিদ্র সৈনিকের ঘরে সেদিন আনন্দেব জোয়ার বহিয়া গিয়াছিল।

তিনি বয়স পবটী মেয়েটি চত্‌ যাত্রা যায়। কিন্তু পিতৃ লায়মন্টফের মনে সেই বয়সেই মাছের অশ্রু-চিহ্ন মস্তিষ্ক চটয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সেও সেই ছবিটির চারিশাশে তাঁর বেদনা-ময় মন পাঠির আগার স্মৃতি মণিত। কোন্‌ এক নিরাশা লুহর সেট মধুর স্মৃতিটুকুে বিবিয়া অগ্রব তাঁহার কোথায় জলের চেউয়ের মতো ক্লিগা ক্লিগা উঠিত — চোখের কোণ তরুণ লবির বুক ভাঙ্গিয়া বাইত।

মাতার মৃত্যুর পর শিশু-কবি শিখার ভ্রাতা চটয়া পড়েন। শিখাও এই মা-মারা শিশুটিকে শাসনের সকল বকসের কঠোরতার ছোঁয়াত চইতে লয়াইখ রাখিতে সবিধে চটো কবিতেন। মাঝে মাঝে দারিত্র্য্য/স্বাকল যখন রক্ত-ভেদে অলিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রাণ করিবার উপক্রম করিত, তিনি দিলা-কার্য্য চইয়া শিশু-কবিকে তাঁহার বুকের আশ্রয়িত্তে আডাল করিয়া রাখিতেন। শিশু চইলেও বালক তাহা বুঝিতে পারিত এবং শিখার অত্যা-অভিযোগ তৎবেদনা তখন হইতেই তার শিশু-মনের কোমল মধু-হৃতির কাছে লয়া পড়িত।

কিন্তু লায়মন্টফের কপালে এই দুঃখবোধের মধুবতা-টুকুও বেশী দিন দর হইল না। তাঁহার মাতার(বা) তাঁহাদের গলাগের এই দুঃবস্থা দেখিয়া একদিন লায়মন্টফকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন।

দরিদ্র দারিদ্র্যে হাত এড়াইল বটে, কিন্তু সুখী হইতে পারিল না। তাহার দরিদ্র পিতা ভিন্নবিভিন্ন রহিয়া গেলেন— এই বেদনা বালক-কবির মনে কাঁটা চইয়া গিয়া রছিল।



যাব, এ বাড়িতে আসিয়া তাহার পিতার সঙ্গে সন্মিলন করিতে  
এক রকম ভিন্ন চেষ্টা পেল। পরিচিত সৈনিকের ঘনীর ঘের  
বিরে কবা মন্ত অশ্রুধারা—এই অশ্রুধারাই শারদমন্ডলের  
পিতার সঙ্গে এ বাড়ির লোকের কোনো সম্বন্ধ ছিল না।  
শারদমন্ডল জ্ঞানিত পরিচয়ানিমানী পিতা কোনোদিন  
এ বাড়ির উত্তর মাড়িইবেন না।

পিতার সঙ্গে আর সে-রকম দেখা করিতে পারিবে না,  
—এই দেখনা বালক-কবির মনের সন্মিলন পাণ্ডি কাড়িয়া  
লইল। কতদিন শুক ছিন্নতরে বর হইতে পলাইয়া বাতির  
চেষ্টা বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত,—পিতার সে  
'ভাড়া-ঢাকা পানী-ঢাকা' ছোট্ট কুঠিখানি কতদূরে আছে,  
কে জানে? কোন-লগ্নে গেলে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে  
—কে তাহাকে বলিয়া দিবে? পিতার স্মরণ-বস্ত্র, তাঁহার  
শ্রেষ্ঠ-ভগ্না মুখখানি শরণ কবিয়া কত রাত্রি তাহার বিনয়  
কাটিয়া যাইত,—চোখের জলে উপাধান তিথিয়া যাইত,—  
এই অল্প ইচ্ছা তাহার কাছে অসঙ্গ চেষ্টা উঠিত।

শারদমন্ডল চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ফরাসী, জার্মান ও  
ইংলিশ ভাষার মাতৃ-ভাষার মতোই অধ্যয়ন করিয়া লইয়া-  
ছিলেন। সেই বয়সেই তিনি স্কিলারের (Schiller) সমস্ত  
কাব্য-গ্রন্থ (original) পাঠ করেন এবং *Menchen und*  
*Lebensschaffen* নামক একখানা গীতি-নাট্য লিখিয়া  
ছিলেন। এই নাটক রচনার সময় লেখা হইলেও যখনকার  
নাম জর্রানে রাখা হয়। এই ক্ষুদ্র নাটকখানাতে তাঁহার  
পিতার স্মরণের জন্মদায়ক বর্ণনা আছে। শৈশবের যখনকার  
পুত্র কবির মনের উপর যে বিবাদের ছাপ আঁকিয়া  
দিয়াছিল—কিশোরের এই প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা তাহার  
রূপ পাইয়াছে।

এই নাটক-রচনার কিছুদিন পরেই কিশোর-কবি  
তাঁহার ছেলেসম পিতার লোকান্তর-সমন্বিত সংবাদ পান।  
এই ব্যাপক সংবাদ তাঁহার বুকে শেলের মতো আঁসিয়া  
বিধল। মাতামহীর নিম্নরতার অল্প তিনি শেখ দুই-ত্রেও

পিতার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না—যে পিতা যোগ  
দ্বারা কেবল তাঁহারি কথা শ্রবণ করিতে করিতে তিল তিল  
করিয়া মৃত্যুর গর্বে অগম্য হইয়া গেলেন। এ আঘাত সহ্য  
করিতে কিশোর-কবির বুক একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

কবির এই সময়কার সন্মিলন কবিতাতেই একটা নিবিড়  
বেদনার সুর ধ্বনিত হইত। এই pessimism-এই ভাবটা  
অনেকটা বাহ্যপের কবিতার মতোই ছিল বলিয়া অনেক  
জাহাৎ বাহ্যপের অস্বাভাবিক বলিয়া নিষা-প্রকাশ করিত।  
কিশোর-কবি এবং কথার কান দিতেন না, বিনের পর বিন  
বাহ্য জ্ঞান তাঁহার চক্ষে যেন বীণার স্বরার ভুলিতেন। একদিন  
এক বন্ধুকে শুধু বলিয়াছিলেন—“I am not Byron,  
but another exile, so far unknown to men.”

পিতার জ্ঞান সৈনিকের জীবন ব্যাপন করা শৈশব হইতেই  
তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন—  
“This may not bring me to my limit and fore-  
most aim (a literary career), but it will serve  
the final one it is certainly more pleasant to  
die with a bullet in one's chest than to fade  
away exhausted with old age.”

পনেরো বছর বয়সে তিনি সেণ্টপিটার্সবার্গের মিলিটারী  
কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু কবিতা-রচনার হৃদয় তাঁহার কণি  
হইতে কিছুতেই নাহিয়া যাইতে পারে নাই। অনেক সময়  
তাঁহাকে রূপ কাঁকি দিয়া পাণের পুত্রবার বসিয়া একা-  
কিত্তে কাব্য-রচনার নিমগ্ন দেখা যাইত। কবির *The Angel*  
প্রকৃতি অনেক উচ্চতরের কবিতা এই সময়কার রচনা।

কবির প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ *The Demon*-এর, বানিট্যাও  
এই সময়কার রচনা। তখনকার একজন বড় সমালোচক  
*The Demon*-এর স্তম্ভসমূহ পাকুনিপ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া,  
আর এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—“I was startled by  
the vividness of the tale and the monotonous music  
of the verse.”

১

উনিশ বছর বয়সে লার্মন্টকের military training শেষ হয় এবং কন-স্টান্টিনোলে এক সৈন্যপালের পদ গ্রাস্তি হয়।

ইতিমধ্যে নানা কারণে স্ত্রীতার কবিতা বাহির হইতে থাকে এবং দেশের প্রথামণ্ডলীর দৃষ্টি আঁকিবারে এই নবীন কবির উপর আসিয়া পড়ে। লকলেই বুঝিতে পারিলেন, কন-স্টান্টিনো এক নতুন চিন্তার দ্বারা শীঘ্রই প্রাধাণিত হইবে, এবং সে-প্রাধাণের উৎস এই তরুণ কবিরিতির মধ্যেই আছে।

এই সময় তিনি বাহরপের *The Dying Gladiator* এবং *Hebrew Melodies* অনুবাদ করেন। এতদ্বির হাইনে (Heine) এবং গোটের (Goethe) কয়েকটি কবিতাও ভাষান্তরিত করেন।

স্ত্রীতার এই সময়কার লেখা একশানি কিছুশাস্ত্রক গ্রন্থের censor দ্বারা বাতিলপ্রাপ্ত হয়।

এর পরেই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ইতিকাশ আসিয়া পড়িল। এই ঈশ্তিকালে কবির কবিত্তক পুঙ্খকিনের শেষকাল। সমগ্র কবিতা স্ত্রীতার শির কবির মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইল। লার্মন্টকের চিন্তেও কবির অভাবের বেধনা দেশের মতো আসিয়া ব্যাধিল। তিনি *On the Pushkin's Death* শীর্ষক এক কবিতায় কবি-গুরুর প্রতি স্ত্রীতার মনোভাব ব্যক্ত করেন। সেই কবিতার শেষের দিকে অসম্ভাব্য রাম-গুরুবদের অন্যায় ও উদাসীনতার প্রতি তীব্র কথামাত্তও আছে,—“those standing, a greedy crowd, round the throne, the hangmen of Freedom, Genius, and Fame, hiding themselves under the shelter of the law and forcing righteous judgment and truth into silence.”

এই কবিতাটি ছাপা হওয়ার আগেই জনসাধারণের মুখে মুখে এতদূর ছড়াইয়া পড়ে যে, ছাপানোর আর বিবেক কোনো আবশ্যকতা থাকে না। পুঙ্খকিনের পরাহরণসমনকারী বিরাট জনতার লকলেই এই কবিতা হাতে হাতে নকল করিয়া গইয়াছিল।

এই কবিতার দ্বন্দ্ব কথিকে তখনই স্বীকৃতি করা হয় এবং বিচারে স্ত্রীতাকে ককেশসের শাস্ততা-প্রবেশে নির্দোষিত করা

হয়। কিন্তু ককেশস পর্বতের নিবিড় ধূসর সৌন্দর্যের মাঝে নির্দোষনের দিনগুলিও স্ত্রীতার কাছে মধুর হইয়া উঠিল। তিনি এই পার্শ্বতা-বেশটিকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। প্রকৃতির এই সুক-প্রাণের মাঝে নিভা অধ্যায়ন করিয়া স্ত্রীতার কাব্য-প্রতিভা প্রসারিত হইতে ও স্রবণতার জাগিয়া উঠিল।

কিছুদিন পরেই রাগামার মাঝেবনে কন-স্টান্টিনো স্ত্রীতাকে নির্দোষন হইতে মুক্ত প্রদান করেন। রাগামার কণ্ঠ-কোলাহলের মাঝে স্ত্রীতার স্ত্রীতার জীবনের দিনগুলি অশান্তিতে কাটিতে থাকে।

লার্মন্টক্ “লাইক্ সাড” দৈনিকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। রাগামিয়া অপর্যবে তিনি ইহার কিছুদিন পরেই স্ত্রীতার অপর বলভুক্ত হইয়া ককেশসের শাস্ততা-প্রবেশে প্রেরিত হইলেন। দক্ষিণ কবিরায় নীল নির্দোষ জ’কাল তলে পরিত্রমণ করিয়া স্ত্রীতার সন্তপ্ত তদয় লাভ হইয়া আসিল। দিগন্ত-বিশুত ভূমার-গুহ গরিপুঙ্কের সারিগো স্ত্রীতার কলনা স্ত্রীতার তেজোময়া হইয়া উঠিল। তিনি অল্প কবিতা লিখিতে লাগিলেন। কবিতা লিখিতে হইবে বলিয়া তিনি কখনো কবিতা লেখেন নাই। কারণ, “Literary success did not impress Lermontov in the least; fame was nothing to him.” তিনি প্রাণের মাঝেগে মনের চিন্তা-বারাক তুখুজ দিতেন। তাই স্ত্রীতার প্রত্যেকটি কবিতা হইয়াছে স্ত্রীতার জীবনই প্রতিবে। তাতে আছে প্রচুর বল-সৌন্দর্য, তাতে আছে প্রাণের প্রাচুর্য। কেবল স্ত্রীতার কবিতা দিয়াই স্ত্রীতার স্ত্রীতাকে চিনিতে পারি।

এই সময়ে স্ত্রীতার “*Song the Tear from Familyevich, the Young Oprichnik, and the Brave Merchant, Kalushnik*” প্রকাশিত হয়। এটি কারো একটি নাটকের আকারে কবিরায় সামাজিক মনের স্রব্ধর একটি স্বচ্ছ চিত্র আঁকিত হইয়াছে। অনেক ইতাকে হোমারের (Homer) *Iliad*-কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। একজন নামজালা দলোপাচক এট



কাব্য পক্ষে লিখিয়াছিলেন—“It certainly places the author high above the personally lyric element; it is art itself, pure art, stripped of all the individual veiling with which suffering humanity is apt to enwrap its creations—a thing which the poets and artists, after all, have the indisputable right to do!”

কবি নিজে চিত্র-বিনোদনের জন্য হাইনের (Heine) সেই বিখ্যাত শীতি-কবিতাটির অনুবাদ করেন, যাতে উত্তর-দেশীয় ভূবার-ভার্যাক্তর মতীকর সূর্য্যালোক-প্রভাষিত দক্ষিণ দেশবাসী চকটির স্বপ্ন দেখে! এই কবিতাটির চিত্রের লায়মন্টক্, নিজের আঁচনের অনেকখানি স্ফুটন সন্ধান পাইয়াছিলেন। কারণ, তিনি বেশে থাকিতে নিজের মনের সমস্ত অশান্তি ও বিধাবের গুরু উত্তর-দেশের জল-বায়ুকেই বিশেষ করিয়া দাবী মনে করিতেন। দক্ষিণের কংকলস প্রদেশের ছোট তুচ্ছ নগরটি পূর্ণতা ভাঙা মনে অশ্রু রচনা করিত।

যাই হেউন নহ্নর বরস কবি তাঁহার সেই অদম্পূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ *The Demon* লেখ করেন। *The Demon* লায়মন্টকের, তথা কব দামিতোর, মহাকাব্য। কংকলসের নিজালা উপত্যাকাতে কবি একদিন তাঁহার কাব্য-মনকে একটি ফুলের মতো ফুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, সেই মনকেই নিরোজিত করিলেন ভিন আর তামারার (Tamara) স্ত্রীতে, আর তাঁহার স্ত্রীর ফুলজিক উৎসর্গ করিলেন সেই বিরাট কংকলসেই উদ্দেশে। কৃমিকার লিখিয়াছেন,—

“হে কংকলস! হে ভীমকান্তি মগধিবাহ! আমার এই আলক্ত-প্রসূত কাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করিলাম। তুমি ইহাকে সন্তান-বরূপে আশীর্বাদ কর; তোমার সুর্য্য-চন্দ্র বিহীন শিখর-ছায়া উগার উপর বিস্তৃত কর। আমার আশেপাশ চিত্রাঙ্গণি অসুটবলে তোমারই মেঘ-বস্ত্রের দখল। এমন কি যেখানে তোমার মহাশায়া দম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত—

সেই উত্তর-প্রদেশে থাকিগাও আমি তোমারি দয়াদাত্তরে বাস করিতাম। দক্ষিণা—দক্ষিণ আমি তোমারই ছিলাম।

“শৈশবে পণ্ডিত-পথে আমি তোমার গুরু শিরস্শাল-পোষিত সর্কোজ পিবি-পিথরে অধঃগোলন করিতাম। যেখানে পশন-মেঘ তাঁহার স্বাধীন লক্ষণট প্রদারিত করেন, ঈশলেয়া কোন্ দুরদেশ হইতে বিশ্রাম-শান্তের আশার ছুটিয়া আসে,—আমিও মনে মনে আপনাকে তথায় উত্তোলিত করিয়া কল্পনাধে তাহাদেরই একজন বিমানচাষী সজ্জর হইয়া পড়িতাম।

“তারপর বিধাবে, বেচনার কত বছর কাটিয়া গেল; আবার আলিয়া তোমার সন্তিত মিলিত হইলাম। “আজকের সেই স্তম্ভকে তুমি আবার সবারে, সোলাসে আলিঙ্গন করিলে। সেই আলিঙ্গন আমার বিধাবে বিশ্বাসি চালিয়া মিল,—বহুত তায় বহুত বিলাপ-শীতির প্রতিধ্বনি করিল।

“আজ আবার, হে পৃথিবী-পতি! এই নিশ্চেষ্ট উল্লভাক। তলে ধাঁড়াইয়া আমার সমস্ত চিন্তা ও সজ্জিত তোমারই, করে সমর্পণ করিতেছি।”

লায়মন্টকের Demon (জগৎবানের প্রতিধ্বনি পতি) একটি অম্পূর্ণ স্ত্রী। গোটের (Goethe) Mephisto বা বাহরবের Lucifer-এর মতো লায়মন্টকের Demon-এর মনে বিরাট প্রতিধ্বনিতার বাসনা ছিল না। কিংবা মিলটনের Satan-এর মতো “the study of revenge, immortal hate” তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।

লায়মন্টকের Demon স্বর্ণ চইতে নির্কাসিত হইয়া এই মাটির পৃথিবীর উপর দিয়া যুগের পর যুগ পরিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। আজকের দিকে চাহিয়া দেখিল—

“The caravan of wandering planets  
Thrown into vastness.....”

মাটির দিকে চাহিয়া দেখিল—

“A carpet woven of rich splendour,  
Luxurious vale of Græzia's land.

A blissful, brilliant nook of Earth !  
 'Mid stately ancient pillared ruins,  
 Relucant, gurgling rivulets run  
 And ripple over motley pebbles ;  
 Between them, rose-trees where the birds  
 Sing love-songs, while the ivy girds  
 The stems, and crowns the foliage-temple  
 Of green chinara (১) ; and the herds  
 Of timid red-deer seek the boon  
 Of mountain caves in salty noon ;  
 And sparkling life, and rustling leaves,  
 And hum of voices hundred-toned,  
 The sweetly breathing thousand plants,  
 Voluptuous heat of skies sun-laden,  
 'Caressive dew of gorgeous night,  
 All stars — as clear as eyes of maiden,  
 As glance of Grizian maiden bright !"

কোথাও দেখিতে পাইল—

"And golden clouds, due north, all day  
 Flew rapidly along its way  
 From far-off southern countries roaming.

এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। কোনও দৃষ্ট  
 বা বেশী তাহার কাছে ভালো লাগে না,—

"And everything that met his eyes  
 He did but hate, or else despise."

এমনি করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ককেশস  
 পর্বতের তলায় Grusia প্রদেশের বহু গ্রামের একটি  
 বিশ্রাট গ্রামসদৃশ তাহার নজরে পড়ে। এই গ্রামসদে  
 থাকে তামারা (Tamara) — এই বাড়ির পৃথিবীও সুন্দরী  
 কল্পিত। প্রতিদিন যখন—

"The sun, behind a far-off mountain,  
 Is half set in a urn of gold"—

সেই স্বপ্নসংশ্লিষ্ট-বেলায় তবুই তামারা—

"Her white veil fluttering down the path,  
 Descends the steps and fetches water  
 From clear Arárgva's (২) azure bath."

তামারার প্রথম পাকে দৃক-দেখে :.....সেই দূর  
 আজ কাছে আসিবে, পরে আজ আপন হইবে! তামারার  
 বিবাহের পর আসিয়াছে। দৃষ্ট আসিয়া যবন দিগন্তে—  
 তামারার প্রথম বিবাহের ভক্ত শোভাযাত্রা  
 করিয়া আসিতেছে।

তামারা তাহার স্বামীদের গহনা পাখড়ির এক নির্জন  
 উপত্যকা এক করণার গারে নুনা করিতেছে! কারণ সে  
 জানে,—

"It was the last time she would dance  
 To-morrow's morn would see her enter  
 A different world: wedlock would bring  
 The fate of servitude with it ;  
 Guld's sole heiress, Freedom's darling,  
 She was to leave her home and dwelling,  
 Meet stranger kinsmen—and submit."

তামারার সুখের উপর কত বিভিন্ন ভাবের ছায়াপাত  
 হইতেছে! একবার তাহার হৃদয় সুখবানি দ্বারা  
 মত-স্বাধার মতো লাল হইয়া উঠিতেছে, পরে লাল হস্ত  
 চৌকিট কী এক আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—  
 দৃক হঠাৎ; আবার কখনো বা একটা অজ্ঞাত  
 আগুনের তাহার হৃদয় সুখবানি কাণো হইয়া  
 আসিতেছে। কিন্তু—

"Yet were her movements so expressive,  
 So stately, simple and caressive,  
 That if the Demon were to fly  
 Her way, and chance to gaze upon her,

(২) গ্রীসিয়া (Gruzia) প্রদেশের একটি  
 শ্রোতবিনী।





He'd to mind his former kin,  
Would turn away and heave a sigh..."

ভিন্ন ভিন্ন হোঁচল। হোঁচল, পৃথিবীর মাটিতে  
ভাঙার ভক্ত স্বর্গের পারিজাত আলিয়া ফুটছে—ফুটছে,  
রক্তে ফাটছে পড়ছে! ভাঙার দিকে সে চাখিয়া  
উঠিল। চোখে আর পলক পড়ে না—নিঃশব্দ ঘন  
বামিরা গিয়াছে!.....এই ভক্ত মৃত্যুকেই ভাঙার চোখের  
দৃশ্যে পৃথিবীর রূপ ঘন বলাইয়া গেল।—

".....and at once  
The silent desert of his spirit  
Rang suddenly with joyful tones ;  
And once again the sacred grandeur  
Of Love and Good and Beauty shone  
Within his soul. All gloom was gone."

দিনের কমলটি বীরে বীরে সুদীর্ঘা আসিল—

".....The scarlet glow  
Has left the summits' ice and snow ,  
A fog has risen round the place."

ভাঙার প্রিয়তম আসিয়াছে। ঐ বরষাভীরের  
আগমন-কবিতা পঙ্কত-কবিতা বাজিয়া উঠিল!—

"The impatient bridegroom, in great haste,  
Has tired his steed : he cannot waste  
A moment of his marriage feasting."

স্বপ্নে পুরে অলঙ্কার কাতর-কবিতা উঠিল। কে ঘন  
বিশ্ব হইয়া দাড়াইবে রক্ত চাঁৎকার করিতেছে।

বর সেই মৃত্যুকে কাহারো নিষেধ-বাধা না শুনিয়া ঘোড়ার  
চড়িয়া পাহাড়ের উপর ছুটিয়া গেল।

আর সে কিরিয়া আসিল না।

ককেশাসের আকাশচুম্বী চূড়ার পশ্চাতে পূর্ণা নামিয়া  
গেল। অন্ধকার তার কালো তান। বেলিয়া সমস্ত  
উপত্যকা ঢাকিয়া ফেলিল।.....

বিবাহের উৎসব-বেলা ত্যাগিয়া গেল।

"The festival is all confusion ;  
The maidens weep. The castle yard  
Is crowded full....."

ভাঙার ভাঙার শব্দ কাল-শব্দরা এলাইয়া পড়িল।  
চুটি কালল চোখে অস্ত্র প্রাণ নামিয়া আসিল।.....  
ভগ্ন, ভাঙার প্রিয়তম তো অতিক্রান্ত পালন করিয়াছিল।  
মৃত্যুর মৃত আলিয়া এমন অলমের ভাঙাকে ছিনাইয়া লইয়া  
গেল—সে কি করিবে? বিবাহের উৎসব-কেন্দ্রে চায়ে  
তো সে আগিয়াছিল!.....আচ্ছা, চিরদিনের মতোই সে  
চলিয়া গেল সুখি! আর সে ঘোড়ার চড়িয়া পোতাঘর  
করিয়া ভাঙারকে লইতে আসিবে না!—

"Her prince had kept his word, though slain,  
And to his bridal feast had come.  
Alas ! his life is gone for ever,  
He mounts his steed never again !..

বেগনার আঘাতে ভাঙার তরল জ্বর -ভাঙিয়া  
আসিল। জীবনের বেঁচে-থাকার সমস্ত সাধ-আকাঙ্ক্ষা ঘন  
ভাঙার মৃত্যুই গেল।—

"Tarn, fallen on her bed,  
Sobs with a torn and piteous feeling.  
Tear follows tear in painful fleetness,  
Of grief she cannot have her fill..."

এমন সময় সে এক অপূর্ণ কণ্ঠের শুনিতে পাইল,  
কে ঘন হয়ে ভাঙাকে স্বর্গের এলোভন দেখাইয়া  
বলিতেছে,—

"Withhold thy tears : they burn the colour  
Of virgin cheeks, and dull thy view ;  
They cannot bring to life the dead—  
Thy are not drops of magic dew."

"In the boundless azure ocean,  
Without rudder, without sails,  
Gently float in stately motion  
Choirs of stars through misty ways,

"Cross the boundless fields of Heaven,  
Moving leisurely through space,  
Flocks of fleecy clouds evasive  
Idly pass, and leave no trace.  
Hour of meeting, hour of parting,  
Are no joy or grief to them ;  
Time to come begets no wishes,  
Past linds no regret, with them..."

তামারার সমস্ত পরীর হিম হইয়া আসিতেছে ! কেন  
মায়াদী এমন করিয়া যত্ন-পথে আসিয়া তাকাকে  
প্রলোভন দেখায় !—

একটু পরে আবার সে শুনিতে পাইল,—  
As soon as night throws silky veiling  
O'er Caucasus, and all the world  
Grows still and fairy-like, bewitched  
By Nature's magic wand and word ;  
As soon as Zephyrs flutter shyly  
Across the faded grass, and gaily  
Flies out of it the lurking bird ;  
As soon as under vine and maize  
The flowers of night find dew, and raise  
Unfolding petals with relief ;  
As soon as from behind the mountains  
The golden crescent glides, and steals  
A glance upon thee furtively—  
I shall fly down each night to thee,  
Shall guard till dawn thy virgin slumber,  
And on thy lashes dreams of amber  
I'll waft, to woo them prettily...."

জার কণ্ঠস্বর যেন নিশীথ-স্রোতির মতকারে বলিয়া  
গলিয়া গড়িতেছে । সে-সব তামারার মনে এক স্রবের  
সারাংশণ বিস্তার করিল, তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিল ।  
সে চমকিয়া চাটিয়া বেগিল, এক বিষম ছায়া-মুষ্টি—বর্ণবায়ী  
যেহা সে নয়, এই ঘটির পৃথিবীতে এক নিকাসিত

ভিখারী, কী বেদনা-ভরা পৃষ্ঠী তাহার !... "সে যেন জীঘ-  
শেবের রক্ত-গোধূলি । দিনও নয়, রাতও নয়...আলোও  
নয়, অন্ধকারও নয় !"

"He was like lucid summer twilight  
Not day, nor night ; not sun, nor gloom !"

এতি রাত্রিতে যত্নের পথে সেই ছায়া-মুষ্টি আসিয়া  
তামারাকে প্রেমের বাণী শুনার— "তাহার কুমারী-পুত্র  
দুধারে প্রহরা হইয়া আগির থাকে,"—মুক্তি ভিক্ষা করে ।

তামারা এক দিন ব্যাকুল হইয়া পিতাকে বলিল,—

"I'm haunted with the direpoisonous dreams  
A hellish spirit has the power  
Of torturing me with them, it seems.....  
I'm perishing ! Have pity ! Send me  
To humble nunnery's holy sway  
There I shall be in Saviour's keeping,  
He will behold my grief and weeping  
To Him I'll come in my dismay,  
Life's joyance all is doomed up quelling.....  
Beneath the holy church-towers boom  
Let dusky cell become my dwelling,  
My early grave and life-long tomb."

তামারা 'কৌম্বনে যোগিনী' সাজিল—তামারা দয়াদিনী  
হইল ।

কিন্তু সেই জীঘ যত্ন-পুত্রের চাত হইতে সে মুক্তি পাইল  
না । সেখানেও সেই বিধা-মুষ্টি, বেদনা-কাড়ঃ হুটি চোখের  
নীরব আকৃতি, সেই আর্ন্ত কণ্ঠস্বর, সেই মুক্তি-ভিক্ষা !  
তামারা উপাসনার বসিয়া সেই দুখ বেগিয়া চমকিয়া উঠে,  
তাহার উপাসনা ভাঙিয়া যায়—ভগবানের কাছে তাহার  
বাণিত অন্তরাত্মার নিবেদন পড়ানো হয় না ! স্রোতিতে  
নিজার যখন তামারার হুটি চোখের পাতা ভারি হইয়া  
পাশে, সেই মিনতি-কাতর কণ্ঠস্বরে তাহার তত্ত্বা হুটিয়া  
যায় । "দুখ দুনার মান-অন্ধকারে লহা লড়ার তাহার  
মতো সে-দুখ জালিয়া উঠে—



".....in the bluish haze of incense  
He gently glimmered like a star."

অকৃত্রিম অপরূপ পুস্তকাল ভাণ্ডার চোখের উপর বিছা  
ঢাটার মতো ভাসিয়া বাধ,—

"Both near the nunnery and far  
The glens and mountains spread in silence.  
Pale purple-hued the snowy range,  
Clear-cut against the sky and strange  
And beautiful its evening change  
Into a veil of gold and scarlet..."

কিন্তু তামার চোখে এসব সৌন্দর্যের মায়াজন বুলার

"In joys supreme no more takes part,  
The world she sees by shadows marred;  
In Nature all is cause for torment.  
First rays of dawn, or midnight moment,  
Both see her prostrate on the floor,  
And sobbing 'fore the holy ikon."

তামার প্রাণের সেই আকর্ষণের গুনিয়া হ্রাসের পথিক  
পথ চলিতে চলিতে চমকিয়া উঠে। মনে তাহে—

"Is it a mountain spirit, chained  
Within a cave, who thus is waiting?"

পথিক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি  
লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে।

নিম্নেই আছে দীর্ঘতরঙ্গের মূর্ছা ভিন্নের (Demon) কণ্ঠে  
আসিয়া বাহিল। সে চমকিয়া উঠিল। সে তো দীর্ঘতর  
ঙ্গ—যেন হস্তির অতল সারথী হইতে আসিয়া আসিল একটি  
হুয়ের পতন!—

"...gently sounds, which flowed  
In even streams, like tears of rare  
Angelic tenderness a song  
For earth in Heaven born and nourished..."  
ভিন্নের মনের ভিতরের একটা পর্দা ঘেঁষে এই হুয়ের

আঘাতে চিঁড়িয়া গেল। ভিন্ন এই প্রথম বুঝিল, সে  
ভালবাসিয়াছে.....

"Then first the Demon knew he loved;  
Knew how he yearned, and longed for love,  
In sudden fear, he thought to fly—  
But in that first, heart-rending anguish  
His wing was stayed—he had no power!  
And, marvel! from his veiled eye  
There dropped a tear..."

ভিন্ন ধীরে ধীরে তামার কক্ষ প্রবেশ করে।

তামারা বলে, তুমি কে? তামার কপাল বে ভয় ভয়!

"Oh, who art thou? Thy words bring terror,  
Who sent thee—Hell or Paradise?  
What wilt thou? Tell me!"

ভিন্ন শুধু বলে, তুমি হুয়ের!

তামারা ব্যাকুল হইয়া আবার বলে, কিন্তু তুমি কে?

বল—উত্তর দাও?

ভিন্ন বলে,—

"I am he whose voice has made thee listen  
Throughout the midnight's calm and rest;  
Whose thoughts have reached thee like a

whisper,

Whose vision through thy dreams would

glisten,

Whose sadness thou hast dimly guessed."

'হুয়ের স্বপ্ন হইতে নিষ্কাশিত আমি—আমি অতিপথ্য,  
আমি এই পৃথিবীর পরমালী।'

"I am he whose glance all hope doth wither  
As soon as hope begins to bloom..."

স্বপ্নে-মতো এমন কেউ নাই যে আমাকে ভগ্নেবাসে।

".....I am Nature's foe,  
The world's despair, and Heaven's woe."

তবুও আমি তোমার পাখের তপস্বী, পুন্ডরীক বৈবোধ  
দীর্ঘ আসিয়াছি—

## ঈশতোস্ত দাস

"Yet at thy feet I worship thee !  
I bring to thee my gentle prayer  
Of love, my awe and sacred fears ;  
I come to thee in earthly torture—  
My first humility of tears."

ওগো আমার 'অন্ধকারের অন্তরের ঘন,' আমার লম্বা  
প্রাণ-মন তুমিই লইয়াছ। আর আর 'মনস্ত' লইয়া আমি  
তাপ কটাইতে পারি না,—হৃদির পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র  
প্রাণের মধ্যে আমার অন্তর বাণী গমিতাছে, নীড়ের বদ্যের  
আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে! তোমাকে ছাড়া আমার  
'অনন্ত' কি লাভ? "What is eternity without  
thee?" তোমার এককথা দৃষ্টির প্রদান ছাড়া আমাকে বাও—  
এক টুকরা ভালোবাণী আমার হৃক্তির জন্ত বার কর।—

"Thou couldst restore me to the good

•By a single word ! I gladly would,

•Glad in thy holy love, appear

An angel new in radiance clear."

আজ আমি তোমার দাক্ষিণ্যের হ্রাসে বসুধা তিথ্যাবী।

আমি যে তোমার ভালোবাসি!.....

তামারাব লম্বা অন্তর কাশিয়া ওঠে। চাঁৎকার করিয়া  
বলে, ওগো আমাকে তুমি ছাড়িয়া বাও—

"Oh, leave me, Spirit of Temptation !

Be silent, I'll not believe !

Thou art my foe.....Alas ! I cannot

Pray any more. A fatal poison

Has pierced my weak and doubting mind...

Thou art my peril. Sounding kipl,

Thy words are fire and destruction.....

Oh, tell me—why thou lovest me ?"

ওগো—কেন তুমি আমারকে ভালোবাসো ?

ভিন্ন বল, কেন ? কেন তোমাকে ভালোবাসি—  
গ্রাম জিনি না। কিছ ভালোবাসি—

"Inflamed with spirit new, I proudly  
Down from my guilty head now throw

The wreath of thorns. I fling my woo,

My past—to dust. My paradise,

My hell, henceforth are in thine eyes !"

তুমি বুঝবে না মানবী, আমার বেদনা—আমার কুখ্যা !  
পৃথিবী-বৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আমি তোমাকে চাটিয়াছি—

"Since first the earthly world began,

In my mind's eye imprinted ever

Thine image seemed to fill the ether,

And through eternity it ran.

Thy name was sounding in my ears,

Confusing peace and contemplation.....

তামারা বলে, তুমি বর্ণের অভিলপ্ত, তোমার বেদনা-  
বোধে আমার অন্তর লাড়া দেহ না। তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে  
পাল.....

ভিন্ন বল, কিছ তোমার বিরুদ্ধে কোনো  
পাল করিয়াছি কি ?

আঃ, থাকো। ওরা তুমিতে পাবে—

না। আমার এখানে একলা।

তপবানও কি নেই ?

তিনি আমারের দিকে চাটিবেন না। তিনি তাঁর  
পদ লইয়াই যত্ন আছে, কারণ, বর্ণ মাঝে লুক্কায় !

তামারা চাঁৎকার করিয়া বলে, কিছ নরক ?—

"But Hell ? But punishment and

tortures ?"...

ভিন্ন বলে, আমি তোমাকে কঠিন করি না। তুমি তো  
আমার হইবে! .. আমি চাই হৃক্তি...এই অনন্ত বেদনা থেকে  
হৃক্তি, সে-হৃক্তি আছে তোমার অন্তর কাশন-চোখে।  
একলা আমি তপবানের কথা শাইব না, তুমি আমিলে  
আমার বর্ণের হ্রাস আমার হৃক্তি হইবে।

তামারা কিছুকল ভাবে। তারপর মোহাবিদ্রার মতো  
বলে, আমার চিত্তা সব মোহাক্ষর হইয়া গেছে। আমি  
কিছু বুঝি না. এতো ব্যস্ততার পর ?

ভিন্ন বল, বৃষ্টির প্রথম উবার নামে লম্বা  
করিতেছি—



কেশকে সুশাসিত করিব...তুমি দাও তুমি একটি মুহূর্ত একটি  
মখন চুনের পাতে...

'তোমার গুণ নড়িয়া উঠিল। ছায়া-মুতির অধর তোমার  
মদন স্পন্দ করিল।' একটি মুহূর্ত! জীবন ও মৃত্যুর সাংঘর্ষিক  
মতো রহস্যময় এক জাগ্রতা উঠিল।'

তোমার পৃথিবীর জীবন সেই একটি মুহূর্তেই নিঃশেষে  
ছুটাইয়া গেল।...

"But all was peace again, quiescence  
Betraying only rustling leaves  
And whisper of the brook that weaves  
Itself into the mountain cleft..."

১

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে কবির *Duma* (A thought) কাব্যে  
প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবির সমসাময়িকত্বের প্রতি  
জ্ঞান মনোভাব অনেক আত্মগোচরিত হইয়াছে। তা'ছাড়া  
—“as a piece of art it occupies a high place, in  
Russian literature and it is the severest verdicts  
on one's own generation one could possibly  
imagine.” (Wilfrid Blair)। জীবনের রোমান্টিক  
কাব্য *The Demon* এর সঙ্গে এই pessimistic কাব্য  
*Duma* একটা চমৎকার মিল আছে। এই চুই কাব্যেই  
মানবের চুঃখ-বোঝের গভীরতার ভিতর দিয়া জীবনের  
রহস্যকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস আছে।—আর  
আছে, জীবনের অদ্বয় শিশুতা—জীবনকে পদ আঘাত  
বেধনা-বৈরাগ্যের ভিতর দিয়াও একটি অনাবিল মাদুর্য্য ও  
অকৃত মহিমার সঞ্চার করিয়া তোলা।...*Duma* এর শেষের  
দিকে আমরা পাই,—

"There's no one with whom to shake

\* hands at the hour of heart's pain ;  
All's solitude, dulness, and sadness.

Desires ? What's the use of e'er wishing  
and longing in vain ?

the last years of youth  
with its gladness.

I swear by Hell, I swear by Heaven,  
I swear by sacredness, by thee,  
Thy latest look my soul enslaving,  
Thy first and guileless tear for me ;  
By breath from lips so pure and fireless,  
'Thy silky tresses' wave and shine,  
I swear by suffering, exaltation,  
And by my love for thee, divine."

আমি আমার বেদনা দিয়া শপথ করিতেছি...ও আমার  
অন্তর্য্যোক্তারিণী, তোমাকে আমার সমস্ত সমর্পণ করিলাম,  
আমি চাই তোমার জেম...তুমি দাও একটি মুহূর্ত—আমি  
দিব অনন্তকে তোমার কর্তৃত্ব করিয়া।

"A host of spirits in my service  
I'll bring, obedient, to thy feet ;  
Crowds of ethereal fairy-maidens  
Will wait, thy every wish to meet.  
The Crown which Evening Star is wearing  
I'll tear from her, and crown thy head ;  
I'll take the dew from evening flowers  
To shine on it in diamonds' stead ;  
I'll take a sunset ray of scarlet,  
And gird thee with its ribbon light ;  
I'll saturate the air around thee  
With purest fragrance of the night..."

'সন্ধ্যা-তারার মারা-মুহূর্ত ছিনাইয়া আনিয়া তোমার  
মাথার পরাইয়া দিব, আকাশ হইতে দেশিনীর পৃথিবীর  
কুলে করিয়া পড়ে—তারা ছুটাইয়া তোমার মুহূর্তের সীমার  
পাশে বসাইয়া দিব, সূর্য্যোদয়ের শেষ রক্ত-ধোঁয়াইকু লইয়া  
তোমার কর্ণদেশে বেড়িয়া পরাইব—রাত্রির সুবাসে তোমার

## ঈশ্বরভক্ত বাস

'To love ? But love whom ? To love just  
for a time is worth naught ;  
Eternity love cannot follow,  
Look inward all trace of the past with  
oblivion is fraught—  
Both torments and joys, all is worthless  
and hollow.  
What's passion ? 'tis sure, soon or late  
its sweet ailment will fly,  
When reason's assertion is heareth...  
And as one looks round with attentive and  
unflinching eye,  
A silly and meaningless joke life appeareth."

ইতার পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কবির গল্প উপন্যাস *The Hero of our Own Times* প্রকাশিত হয়। ইহাই "the first psychological novel that appeared in Russia." এই উপন্যাসের নায়ক Pechorin-এর চরিত্র কবির নিজের জীবনের সঙ্গে একবারে খাপ খাইয়া যায়। নিজের মনের খেদনাকে রূপ দিতে গিয়া তাঁহার স্বস্তির মধ্যে তিনি নিজেকেই গাঁড় করািয়া দিয়াছেন।... জীবনের নিকল ও সংকুচ প্রেমের গভীর ধূংসের কথা কবি ভুল না বিচিরা ভাবে ও ভাবার পাঠকের চোখের সম্মুখে বেলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি যেন গৃহ, সমাজ ও জগৎকে এক অস্বস্তি সৃষ্টিতে বোধিয়া, নিজের শু আম্রাদের অজস্রীড়ার নিগূঢ় ভাবের বাহির করিয়া দিয়াছেন! অবিচলিত সদাঙ্গাএত অব্যব ও চেতনার ভক্ত তিনি ত্রিকাল কব-মনের মধ্যে অমর হইয়া থাকিবেন।

এই সময় কবি অসুস্থতানিবন্ধন, চিকিৎসকের পরামর্শে ছুটি লইয়া প্যারিসরকের দৈনিক-আশ্রমে অবস্থান করিতে-  
ছিলেন। খাইওভস্ক নামো এক মন্দিয়ার প্রণয় লইয়া তাঁহার

লিখিত মেজগ ম্যাটিনস্ক নামক আর এক দৈনিকের কতকটা ইঙ্গার ভাব চলিতেছিল। কবি ম্যাটিনস্ককে দেখিতে পারিতেন না। তাহার লগ্নে নানা প্রকার বাস্তবিক কুংসা রটাইয়া তাহাকে বাইওভস্কের নিকট তাঁন ও অগ্নবস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। কলকটা রুমণ বিলম্বল পাকিয়া উঠিল, এবং শেষ পর্যন্ত একটা 'ফুয়েল' অপরোহায়া হইয়া পড়িল। বহুপনের মস্ত্র আশ্রয় ও সাবধানতা সত্ত্বেও উত্তরে একদিন মিলিত হইলেন।... এই 'ফুয়েল' কবি মাত্র মাত্রই বৎসর মধ্যে সূচ্যুখে পতিত হন।... সূচ্যুত পর তাঁহার পকেটে একটি জুব্বারি পড়িত। গুলি মাথায় চারটি ছিদ্র ও বক্রাকৃ হইয়া গেছে।... কবি তাঁহার প্রাণত্যাগের নিকট চেষ্টে পুগলিন উচ্চ জাতিয়া লইয়াছিলেন।

লারমন্টকের জীবনে চণ্ড-বেদনার আবির্ভাবের মধ্যে নোন্দগাই লতা—এই ভাবটো সোনার পঙ্কজের মধ্যে ফুটিয়াছিল। তাঁহার কাছে বর্জ্য-সৌন্দর্য বা অস্বস্তি-সৌন্দর্যের কোথাও একটুই ফাঁক পড়িবার জো নাই।... বাস্তবের সুপরিচিত সৌন্দর্যের স্বর্ণ সৃষ্টি করাই ম্যাটিনের কাজ—যাই তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি লাইন পদলাগিতো, উপমা-মাধুর্য ও ভাবের মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গুর্য করিয়া তুলিয়াছেন।

সামন্তিকের মনের উপর সুগের বা দেশের প্রভাব থাকে না—এমন নয়। লারমন্টকের মনের উপরেও সে প্রভাব ছিল। কারণ, আমরা লারমন্টকে দেখিতে পাই—  
কোনো দেশের কবির "কল্পনার কাগজ", সেই সুগের এবং সেই দেশের মরমাত্তার জীবনের সমস্তার গৌরবোভেই পূর্ণ—  
তাঁহার রস-স্বস্তির মাল-মণ্ডলা সেই সুগেরই কথা।

কিন্তু কোনো বিশেষ সুগের, বিশেষ দেশের কথা বসবস হইয়া ওঠে ভাবনি, যখন তাঁহার লিখিত অনন্ত সুগের, অনন্ত দেশের—অনন্ত মানব-মনের ঘোষ থাকে।

লারমন্টকের কাব্যে এই ঘোষ সূত্রীকৃত আছে বলিয়াই বিশ্বের সঙ্গে তৎকল-বাঙালীর মনও আজ তাঁহার কাব্যে পাড়া বিধা উঠিয়াছে।

## পতীক্ষা

—পদ্ম—

১

সন্ধ্যার প্রভূত অশ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার সংসারে কোন গুণ ছিল না। সংসারে সে আর তাহার অস্তিত্ব আদ্যেও ভাবনা মলিকা। তাহারেও পছন্দান্যি নাই। সন্ধ্যা বা মালিনী পাটন্ত হুবে স্বাক্ষর চলিয়া যাইত। চুইটি তরুণ তরুণী দিবা-নিশি পরস্পরের স্নেহে ভরপুর হইয়া থাকিত। এবার পূজার সময় কোথায় বেড়াতে যাইয়া চুইবে উঠা লটপাট দেখিল সন্ধ্যা সেখানে স্বামী স্ত্রীর ভিতর তরুণী চলিতেছিল।

মলিকা অস্তিত্বান্নী। সে যে আত্মপাথ নাম বলিতেছে তাহাই সন্ধ্যা 'না' বলিতেছে বলিয়া সেও সন্ধ্যা যে তাৎপা বলিতেছে তাহা মনঃপূত করিতেছে না। মলিকার পিতা শব্দে 'ম' চাকুরী করিতেন বলিয়া মলিকা অনেক বেশ বেশিছিল। সে তরুণ একটা সম্পূর্ণ নূতন জায়গা ব্যতির কবিতা সন্ধ্যাকে বেশ বেশ শাইতে চাইতেছিল। শেষে বিরক্ত হইয়া সন্ধ্যা বলিল, "দূর হোক সে, তা হ'লে তো বেশি বিলাসে নিয়ে যেতে হয় বেড়াতে।"

মলিকা বলি নিশি করিয়া গাফিয়া বলিল—“জগো মশাই, আমি কি সে বয়সে করেছি।”

সন্ধ্যা বলিল, “উঃ, বয়সে করলে তবে। বিলোতটা। যে বেশি জোয়ার কাছে মলিকার চ'রে দাঁড়াল।”

মলিকা জবাব দিল—“হবে না? জোয়ার মলিকার বেশ—তমসার তীরে মলিকার মলিকা। যাক্ ওলব কথা, এখন কোথায় বাবে ঠিক কর।”

আবার আবার হইল—“কশি হু”—“না।” “মলিকা হু” “পতি দেবার দরকার নেই।”

“এলাহাবাব হু” “দেবে চোখ প'ড়ে গেছে।”

সন্ধ্যা এবার নিরুপায়ের মত বলিল, “আমি শু আর জাপু পারি না। যা হক্, এবার গটো কর। চোখ বুজে

—শ্রীসমীরেন্দ্র মৃগোপাধ্যায়

এই আত্মপাথ লিখে যে আত্মপাথ নামের উপর আত্মপাথ দেখে সেই আত্মপাথ বাবে।”

স্বান-নিসাজনের নূতন রকম ব্যবস্থা দেখিয়া মলিকা দুই চোখ চোখ বন্ধ করিয়া আত্মপাথ রাখিল। স্বান নিরুপায়িত চটল পোতকপূর। উত্তরেই মলিকার নূতন জায়গা কেবল দেখে নাই। তাহার উপর বেশ দূর।

তাহার পর কিনিবদর গুচ্ছাইবার পালা। মলিকা নিশুপা গুচ্ছাই, সে সন্ধ্যা দিন দ্বিতীয় সংসারের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় জিনিষ গুচ্ছাইয়া লটতেছিল। নূতন জায়গা, একমাল থাকিতে চাইবে। সন্ধ্যা বুঝে চাইয়া এত কষ্টপটু গুচ্ছাই দিকে চাইয়া থাকে। তাহার সংসারের নৃতিমতী শাস্তি। যত্ন পাইয়াছে তাহা লইয়াই ভরপুর বুদী। বাহা পায় নাই তাহা পাইবার আশাও নাই। তাহার জন্মের সুখ লাভাধিনের পহিলমে রাষ্ট্রা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার এলাহিত কেবল্যনিশি চাপাটরা পড়িয়াছে, তবু তার আত্ম নৈরুপায়িত বুদীতে উচ্ছল, শাস্তিতে ভরপুর। সংসার-ভবের পরিপূর্ণ আনন্দে এই হৃদয়টি কেন নিজেই আত্মপাথ করিয়া কেঁদেছিল।

সমীর দিন তাহা বয়সে চাইল।

রাহি মলিকার সময় ব্যবস্থাপনোতে পাড়ী বদল করিবার সময় সন্ধ্যা দেখিল পুরুষের পাড়ীতে অত্যন্ত ভিত্তি,—বিশেষ অনিশ্চিত চিন্তাবানী লোকের। তাই মলিকাকে সে মেয়েদের পাড়ীতে দিল। পাড়ীতে অত স্ত্রীলোক ছিল না, তবু একটি মেয়াদী স্ত্রীলোক চূপ করিয়া গুচ্ছাইছিল। সে নাকি মলিকার পাড়ীতে গুচ্ছাইবে।

পাড়ী চলিল, রাহির চমকিত আত্মপাথ তেজ করিয়া নিরুপায়িত স্ত্রীলোকের নৈম নীরবতা আলোড়িত করিয়া চলিল, দূরে

## ঐসমীরেজ সুশাসনাধার

দ্বাৰা—কুৎসিত মৈত্রীর মত, বাণিত অঙ্গপরের মত  
পঙ্কন করিতে করিতে, বলি ছড়াতে ছড়াতে। ত্রাণি  
পতীর, স্থান নির্জন, এক একটি বৃহৎ ট্রেন পশানের মত  
দূর, অন্তরীণ। গাড়ী মাঝে মাঝে খামে আধার চলে, খাতীয়া  
নিষ্কার আচ্ছন্ন। গোড়াকপুর পৌছিয়ায় কিছু আগে কুসুমীর  
জল। গাড়ী অবিশ্রাম ছুটিয়াছে, তাহার উদ্দাম চলণে  
ভেদ করিয়া গলিলের খুমের মধ্যে কোন দূর হইতে যেন  
একটা চাপা কাগর আগরার হঠাৎ আদিয়েই তখন  
মিলাটয়া গেল। চাষিগিক ঘোর মছকার; দীর্ঘ শাপলাহ  
তলি বৈতালেনার মত সারি বাঁধিয়া গাড়ীয়া আছে,—দীর্ঘ  
বিপাশ। কুসুমীর জলগে প্রবেশ করিবার মুখে গাড়ী  
একটুখানি বাঁধিয়া আধার চলিল।

কুসুমী একটি ছোট ট্রেন। সেখানে মিনিট দুই গাড়ী  
যায়ে। গাড়ী খামিলেই গলিল ছুটিল মণিকার গাড়ীর  
দিকে। গাড়ীতে মণিকা নাই, সেই নেশানী স্রোতাকটিক  
মস্তকান। জিনিষত্র চতুর্দিকে ছড়ানো বিশপাত;  
দোখলেই মনে হয় এখানে একটি মলমল হইয়া  
গিয়াছে।

গলিল চাঁৎকার করিয়া উঠিল। বিশপ হঠাৎ মনে  
করিয়া গাড়ী হইতে কয়েকটি লোক নামিয়া পড়িল। ট্রেন-  
ঘাটার একটি দুমারিত লঠন কাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল।  
এগার কি? গলিল উত্তেজিত হইয়া সমস্ত বলিল। কে  
কেহ মণিকাকে একা রাখার জন্ত গলিলকে বিজ্ঞাত দিল।  
কহিল—এ অক্ষরের গাড়ীতে এগুণ বিশপ লাগিয়াই আছে।  
বিশপ পাখাড়ী স্রোতাকটা নানাক্রম কোণে করিয়া স্তম্ভী  
হেঁচকের খরিয়া বিক্রম করিয়া আঁধার নিকাহ করে।  
নিষ্ঠর কুসুমীর জলগে লুকুইয়া আছে, সফল হইলেই ধরা  
পড়বে। কিন্তু গলিল প্রত্যাহার অপেক্ষা করিতে পারিল  
না। শাপলের মত জলনের দিকে ছুটিল। হুঁ একজন  
বাধা দিয়া বলিল—“করেন কি, এই রাজ্যে, অত জলগে!”  
কিন্তু গলিল তাহারের তৈলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিল। ট্রেন-  
মিলাটিক বৃহৎ, গলিলের অবস্থা বোঝা তাহার বহা হইয়াছিল;  
সে শিঙনে শিঙনে গিয়া লঠনট গলিলের কাতে দিয়া বলিল,  
“বাবু, এই খাতিয়া নিয়ে যাও।”

গলিল আধার ছুটিল। ট্রেন ছাড়িয়া জলগে প্রবেশ  
করিল চাঁৎকার করিয়া ডাকিল, “মণিকা!” কেউ উত্তর  
দিল না। শুধু নিস্তব্ধ বনাতী চকিত করিয়া আঁঠু প্রতিধ্বনি  
ছুটিয়া চলিল বন হইতে বনান্তরে। আধার ডাকিল “মণিকা”,  
উত্তর নাই। শুধু সেই নিস্তব্ধ তাঁহা প্রতিধ্বনি তাহার  
বাণিত জলগে আসিয়া আঘাত বেশ, সমস্ত বনজমিকে একটা  
অদীম ক্রন্দনমূর্তে প্রবীকৃত করিয়া দিল। মেঘশোক  
পর্শাত বৃষ্টি সে আঁঠুর পৌছিয়া, বারং হঠাৎ ফিরিয়া আসে।  
কেউ তাহার উত্তর মাঝে ফিরাইয়া দিয়া বলে না, “ওগো  
এই যে আমি!” কুসুমীর হৃৎক জলগে ভেদনি নিস্তব্ধ  
নীলবতার, নৈশ-তিমিরে জলগের আঁঠুত করিয়া গাড়ীয়া  
হইল, শুধু গলিল স্রোতাকটা স্রোতাকটিক মত বারং অধ্বননে  
রজনী কাটায়া দিল।

তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। গলিল  
মণিকার অনেক চেষ্টা করিল। গলিলে বৎস বিল,  
কাপতে বিজ্ঞান দিল, কিন্তু কিছুই হইল না। মণিকার বা  
সেই নেশানী স্রোতাকটার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।  
তাহার পর আরও অনেক দিন কাটিল। সে পুরাতন কত  
লম্বের নিগুণ প্রলোভন ধরে ধরে পূর্ণ হইয়া গিয়া গেল।  
তাঁহা সংসার আধার নৃতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইল।  
সামান্য মানুষের জীবন-স্রোত যেমন একটানা হয় এও  
তেমনি হইল। কোথাও ব্যতিক্রম নাই, কোথাও বৈচিত্র্য  
নাই। নিবৃত্ত চত্বের তাতে মানবের জীবন-বীণা বাধা,  
স্বপ্নের রাগিণী তাহাতে লগে বাজে না, কিন্তু যখন বাক  
তখন ক’ছন মানুষ তাহাকে ছাড়িয়া, চত্বের পুকারী চটকা  
খাটতে চাহে? গলিলও চাহে নাই। তাই তাহার নৃতন  
সংসার, নৃতন সন্ধানী, নৃতন স্বপ্ন। আত গলিলকে দেখিলে  
মনে চমক না যে, এরই জীবনের উপর দিয়া এক অশ্রুত  
দুর্ভেদ বিদ্যার একটা প্রলম্ব-প্রলম্ব বহিয়া গিয়াছে। আত  
তাহার তল্লী খঁট পৈল, তাহার আঁঠুর তল্লা মছ।  
তাহার কোন কোণ নাই। কোন কোণ যেন তাহার  
কোনদিন ছিল না।





মত্ চার বন্দনের বালিকা। বড় সুন্দরী। সাগরবিন  
তাহার কনককণ্ঠে বাড়ীটি মুখরিত হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রী  
তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনের মধুর রচনা করিয়াছিল।

দেখিন বৈকাল বেলায় সলিল বেড়াইতে ব্যক্তি  
চলিয়াছিল। বৈল রাসাঘরে বসিয়া সূচি বেগিডেছে,  
এমন সময় মধু হাশাটতে হাশাটতে ছুটিয়া আসিয়া বসিল,  
“মা ডাখো মা, কি চুই।” মধু বিলম্ব ভর পাইয়াছিল।  
শৈল তড়া তড়া তাকে বুকে কানে টানিয়া লইয়া কহিল,  
“কি চরছে মধু, ভর পেছোছল কেন রে? কে চুই?”  
মধু চোখটুটি বড় বড় করিয়া বসিল, “ঠে ডিক্কেউগিটা মা।  
আমায় খ’বে চুই খেলে, যদি ছুটির ভেতর পুরে নিত তখন।”

শৈল বাস্তব হইয়া কহিল, “কে ডিখাই মেয়ে চুই ত  
দেখি। ও বাস্তব-বি, মধুর মুখটা ধুয়ে দে না ডাই। কি  
জানি কে চুই খেলে? চুই বা দিতি মেয়ে কি করছিলি  
বাটরে?”

শৈল ব্যস্তির আসিয়া দেখিল সত্যই একমন ডিখারিণী।  
পরশে পেকয়া কাপড়। মাথায় কাল চুলগুলি জটা পাকইয়া  
পিঠের উপর পড়িয়াছে। দম্বত মুখে পোড়া দাগ।  
দেখিলে মনে হয় যেন মুখের সমস্ত দৌলদারকে তিলে তিলে  
দহ করিয়া ফেলা হইয়াছে,—হস্ত বা তপনোলুপ হিংস্র  
মতালিখাচরের হাত চটতে দাম্বরকার গজ। হঠাৎ সে  
মুখ দেখিলে ভয় ভয়, আতঙ্ক হই, কিন্তু তপনসিকের কাছে  
তাহার অসুখম নহন চুটির মধুরিমা যেন আরও বড়া পড়িয়া  
যায়। তাহাদের তপ সে লুকাইতে পারে নাই।

এক বৈকালে গৃহস্থ বাড়ীতে ডিক্কা দিতে নাই, তাহার  
উপর কতক চুখন করার জন্য শৈল বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু  
কিছু বলিতে পারিল না। ডিখারিণীকে দেখিয়া যেন  
তাহার মনটা কেমন করিয়া উঠিল। মনে হইল ওর যেন  
কেই নাই, ও যেন বড় চোখিনী। কিন্তু ভরত ডিখারিন অমন  
চুখিনী ছিল না। সে ডিক্কা দিল। ডিখারিণী একবার  
কল্প বেয়ে তাহার দিকে চাছিল। দ্রুত এতদান করিল।

শৈল য মনে হইল মেয়েটা বেশ চর পাগল, দম্বত সন্তানের  
শোক অশ্রু করিয়া দুরিয়া বেড়ায়, পরের মেয়ে দেখিলে  
উভার ঘেঁহের উৎস বাধা মানে না, উল্লাসিয়া উঠে।

সন্ধ্যার পর যখন সলিল বাইতে বসিল তখন একথা  
সে কথার পর শৈল বলিল, “বেখো আর একটা বড় মজার  
পাগলী এসেছিল।”

সলিল বলিল, “মজার লাখুণী কি রকম?”  
শৈল কহিল, “কি জানি, কি রকম ওলা ওলা চাহনি,  
কোন কথা বলে না,—আর বেশ মজুটাকে ঘড়িয়ে খ’বে চুয়া  
খেয়ে গেছে।”

সলিল আশ্চর্য হইয়া বলিল, “মজুকে কেন ডিখাতোতে  
চুয়া খেলে? কি কথটা বলিয়াই তাহার দ্বিতর অর্পণটা  
যেন হঠাৎ উঠিয়া গেল। এ কোন ডিখারিণী যে তাহার  
কল্পাকে চুখন করিয়ায় লক্ষ্য রাখে! তাই আগ্রহে  
ডিখালা করিল, “আজ্ঞা শৈল, তার চোখ চুটো কি খুব  
টানা টানা?”

শৈল বলিল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। বড় লুপ, ডালা ডালা। তুমি  
দেখেছ বুঝি?”

কৌণবরে সলিল বলিল, “দেখিনি, তবে যদি দেখতে  
পেচুম শৈল।” তাহার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা  
করিতেছিল। তাহার আর পাওয়া হইল না, রাগে খুব  
হইল না। তাহার সমস্ত মন সেই অপরাহ্ন বেলায় আগমনের  
জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

ডিখারিণী আর আসিল না। কিন্তু সলিল আপা  
ছাড়িল না। প্রতিদিন অপরাহ্নে সে চুপ করিয়া পথের  
দিকে চাছিল বসিয়া থাকে। তাহার বেড়ান বড়, তাহার  
বহু বাস্তবের সহিত মেধাতন্য সব ভাগ করিল। শৈল  
কত বুঝিল, কাঁদিল, কিন্তু সত্যই যিনি বাইতে লাগিল,  
ততই যেন সলিল বেশী করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় রহিল।  
তাহার অপেক্ষার প্রতিদিনে সে থাকে নাই, কিন্তু এবার  
থাকিতেই হইবে। কেন না দম্বত বালিকা আবার আসিবে।

হাঙ্গেরিয়ানরা যে বৈশ্বাভিক পর্যায়ে (natural scale) অস্থায়ী স্বর কথা হইত, তাহা হইলেও উপরোক্ত বিভাজিত। অর্থাৎ "২" (note '1') প্রত্যেক "৪" বরা হইলে



"স" ইহার স্বাভাবিক "ব" হইত না। তার্থবে পৰ্বাগুলি চিলা ভাবে বাধা থাকে বলিয়া ইহাতে যদি "৪"কেই "স" পরিতে হয় তবে ইহার পৰ্বাগুলিকে এদিক এদিক নাড়িয়া স্বাভাবিক হ্র পাওয়া যায়, অথচ একই সময়ের বরফার হয়। কিন্তু হারমোনিয়মের চাবিগুলি fixed হওয়াতে সেগুলিকে নাড়িবার উপায়ই নাই। অথচ এই বরফ পরিবর্তনের স্থান্যব চক্ৰ, স্বর্গ্য প্রত্যেকেই যেন গুলার সঙ্গে কতক মিলিয়াই লইতে পারে এত চক্ৰ হারমোনিয়মেই সুবর্ণগুলি tempered gamut করা হইয়াছে। ইহাতে যদিও ইহার সাদা বা কাল চাবীর যে কোন একটিকে "স"-এই পরিমাণে অনায়াসে বাজাইতে পারা যায়, কিন্তু এক অক্টেবর (octave) এর চাইতি "স" আর ছাড়া অল্প সব কণ্ঠই সুবই অল্পবিস্তর তুল থাকে। প্রাচ্য সভ্যতাগোষ্ঠী ঐশ্বক উপজাতিতে মগলদের Amrita Bazar Patrikaতে প্রকাশিত "An Music Help Education" প্রবন্ধে লেখা আছে—"The musical notes of the instrument (keyed) is tuned according to the tempered scale, and not according to the harmonies of the note 'U'(Sa) which are the natural notes. This caused the fundamental difference between the two scales, for example if the vibration of 'U' be taken as 240 then the successive notes of diatonic or natural scale and that of tempered scale will be found as shown below.

#### Diatonic Scale VIBRATION:

Sa<sup>240</sup> R<sup>272.16</sup> Ga<sup>299.5</sup> Ma<sup>318.72</sup> Pa<sup>328.96</sup>  
 Dha<sup>410.1</sup> Ni<sup>430.26</sup> Sa<sup>480</sup>

#### Tempered Scale VIBRATION:—

C<sup>260</sup> D<sup>266.1</sup> E<sup>272.1</sup> F<sup>278.3</sup> G<sup>285.6</sup> A<sup>293.8</sup>  
 B<sup>303.1</sup> C<sup>311</sup>

It will thus be seen that the above two scales are quite different."

হারমোনিয়মের আওয়াজ তোর করিবার ক্ষমতা দুই সেট রীজ (double reed) প্রযুক্ত করা হয়; স্বর্গ্য এক একটা চাবিতে

দুইটি করিয়া বোজ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এক চাবিতে ত্রিক এক সুরেই দুইটি রীজ শাখারগত থাকে না। দুই সেট রীজের মধ্যে এক সেট রীজের সুরগুলি আর এক সেট রীজের সুর হইতে থাকে বা চড়াই থাকে। একই সুর টিপিয়া রাখিয়া তই part রীজ পৃথক পৃথক stop পুগিয়া বাজাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, একই চাবি হইতে দুই প্রকার সুর বাহির হয়। যন্ত্রের সোব চাকিবার ক্ষমতা হারমোনিয়ম নির্ধাতিগণ এইরূপ করিয়া থাকেন। কেবল রীজগুলি key-তে বসাইয়া লইলেই হয় না, রীজগুলির ভিন্নতাগুলি (tongue) বিবর্ত ঘনিষ্ঠা মাঝিরা সুর ত্রিক করিবারও বরফার হয়। কিন্তু আশ্চর্যের হারমোনিয়ম-নির্ধাতিগণ এই কথা মাজার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ নহ। তাহাতে এই বুঝাইয়াছে যে, আতকাল বাজায়ের হারমোনিয়ম-গুলির বাঁটি tempered gamut হয় না। Tempered gamut হইলেও বিলাতি হারমোনিয়মে কতক মিষ্টে পাও যায়; কারণ সেখানকার হারমোনিয়ম-নির্ধাতিগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। একে ত keyed instrument গুলির tempered scale থাকিতে ইহাদের সুর প্রকৃত নয়, তার উপর বাঁটি tempered gamut-এর সুরযুক্ত না হওয়াতে আশ্চর্যের দেশের হারমোনিয়মের সুরগুলি বিকৃত।

পিয়ানোতে tempered scale পাকা সবেও আওয়াজ মিষ্ট হয়, কারণ ইহাতে পিতলের রীজ নাই। ইহার চাবি টিপিলেই একটা চাতুর্ভাষা তারের উপর আঘাত করে এবং তার কাঁপিয়া ধ্বনি হয়। ইহাতেও দুই বা ততোধিক সেট তার থাকে। এই সব তারের narrow ব্যবহাি ব্যবক দুইটি তারের সুর এক করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু হারমোনিয়মে ইতরূপ করা যায় না। কিছুদিন পযের পিতলের রীজগুলিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া ইহার সুর বর্কণ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়, এবং tempered scale-এর সুরও থাকে না। "...the Brass Vibrators used in the harmonium are easily affected by climatic changes; the instrument, to be kept in the same tuning, would require adjustment at least once

a fortnight." (Six lectures on Indian music, delivered in the Bombay University by Mr. E. Clements, I. C. S.)

হারমোনিয়ম ক্রান্তি মেনে 'অবিচ্ছিন্ন' চাইলেও পান্ডিত্য মেনে ইহার প্রচলন বড় নাট, পিয়ারের প্রচলন আছে। পিয়ারো হারমোনিয়ম চাইতে উন্নত, কিন্তু ইচ্ছাতেও tempered scale থাকে। পিয়ারো লিখেছে The New Popular Encyclopedia, Vol IX, Music প্রবন্ধের এক প্রান্তে লেখা আছে :—“The disadvantage of equalling the tones and semitones is that the music obtained from these instruments is never agreeably in tune; its melodies and harmonies are different in richness of effect, and the piece performed, whatever it may be, possesses much insipidity. This ought never to occur in music formed on free-toned instruments.”

“যদি বলেন, হারমোনিয়মের সুরের যে মাতে মাঝে তুল আছে তাহা ঠিক উপলব্ধি হয় না, সামান্য তুল থাকিলেই বা কি আসে যায়,—ইচ্ছাতে প্রথমেই এই বলিতে হয় যে, তুল সব সময়েই তুল। যিহাযতঃ প্রকৃত স্বরগ্রাম (natural scale) আমাদেরকে বহু আনন্দ দেয় tempered scale ততটুকু আনন্দ দিতে পারে না। তারপর স্বয়ং স্বর-অন্তর কানে উপলব্ধি হয় না একথাও বলিতে পারি না। আমাদের দেশে এখনও বোম্বেতে যে “লটল ঠাট” বাবা হয় তাহা সঙ্গত স্বরগ্রাম। আমরা হারমোনিয়মের tempered gamut গুলিতে গুলিতে কান (musical ear) ব্যাঘাৎ করিয়া ফেলিয়াছি। কোন্টা প্রকৃত বা কোন্টা কৃত্রিম তাহা বুঝিতে পারি না। General Thompson লিখিয়াছেন, “It may be hoped the time is approaching when neither singer nor violinist will be tolerant of a tempered instrument. Singers sing to a piano-forte because they have bad ears; and they have bad ears because they sing to the piano-forte”

আমরা কান যে কানে যাহা শুনিতে পারি তাহা কণ্ঠে তাহাই অজ্ঞাতে অগ্রহণ করি। কাজেই একটা কৃত্রিম প্রব কানের নিকট থাকিতে থাকিলে কণ্ঠেও কৃত্রিম সুর গিয়া যায়, natural scale-এর সুর গলায় থাকে না এক তাগাতে গান কতিমদূর হয় না। ঐন্দ্রক ক্রিয়া-কল্যেবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “লীলাতে বাঙ্গালীর কণ্ঠ” ৩ নামক প্রবন্ধের এক স্থলে ঠিকই লিখিয়াছেন, “এখানে এই হারমোনিয়মের কৃত্রিম সুরেব ও গাভারের হারমোনিয়মের বিস্তৃত সুরের সম্বন্ধে ভেদাঙ্গ তিনিই যাহার : যেমন খাটি জিনিষের স্বাদ গ্রহণের কন্যতা কমিয়া যায়, তদ্রূপ সুরের কান ও তৎসংগত গায়ক সুর নষ্ট হইতেছে। বাংলাতে এ যাবৎ যতটা চাইয়াছে পশ্চিম অঞ্চলে এখনও ততটা হয় নাট। পশ্চিমা বাইজোরা এখনও সারেসৌর সম্বন্ধেই গান করে। এমন কি পশ্চিম অঞ্চলে গান করিয়া ঠিকাকরিতেছে এমন গায়ক গায়িকাও তাৎকালের সম্বন্ধেই এখনও পারিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একাংশে প্রমীল গলা ও প্রতি-স্বরকর গানের বাগতানুগ্ৰহ একপ্রকারকণা সুর এখনও পাওয়া যায়।”

আমাদের লীলাতের সুরে অনেকগুলি অন্তরার আছে। এইগুলি ছাড়া গীত করাই যায় না। ইচ্ছার নাম—মীড়, গমক, মুজ্জনা, আল ইত্যাদি। মীড়ের সোহায়ে ভাড়া রামগান্ধীর রূপ প্রকাশ করা আর অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু হারমোনিয়ম প্রকৃতি key-note instrument এ মীড়, গমক ইত্যাদি বাজাইতে পারে যায় না। ইচ্ছাতে কাটা কাটা সুর বাজিবে হয় এবং লীলাতের মাধুরী নষ্ট হবে। প্রবন্ধে ঐন্দ্রক উপভ্রমের ১২০ মামার লিখিয়াছেন, “We know that now-a-days harmonium is used, with our music, higher or lower, throughout India, though the essential parts

= প্রতি বাঙ্গালীরাই এই সঙ্গীতস্বয়ং প্রবর্তী গায়করা উচিত। “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা” নামক মাসিক পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গালীক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আরি বরদান প্রবন্ধ লিখিতে উক্ত প্রবন্ধটি হইতে যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছি। লেখক



of our music, such as murchláni, mirth, gamak etc, are impossible to produce in it." Rev. Popley ভারতীয় সঙ্গীত লব্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বলিয়াছেন যে, ইংরেজ চিত্রা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, "The custom has come in recently to the harmonium for drone. This is undoubtedly convenient, but the noise is not by means attractive, nor likely to add to the appreciation of Indian music by ears trained to quality well as to pitch." Mr. A. H. Fox Strangways ভারতীয় সঙ্গীত লব্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া কত ভারতের নানা গবেষণে ব্রহ্মণ করিয়াছেন। ইংরেজ পর তিনি The Music of Hindustan নামে এক বই লিখেন। তাহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"If the rulers of native States realised what a deathblow they were dealing at their own art by supporting or even allowing a brass band, if the clerk in a government office understood the indignity he was putting on a song by 'buying the gramophone which grinds it after his days of labour, if the Mohammedan 'Star' singer knew that the harmonium with which he accompanies himself was ruining his chief asset, his musical ear, and if the girl who learns the pianoforte could see that all the progress she made was as sure a step towards her own denationalization as if she crossed the black waters and never returned—they would pause before they laid such sacrilegious hands on Sarawati. Excuses may be made for such practices, but there is one objection fatal to them all; the instruments are borrowed..... to dismiss from India these foreign instruments

would not be to check the natural but to prune away an unnatural growth." তিনি ই পুস্তকের আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—".....It (harmonium) dominates the theatre, and desolates the hearth; and before long it will, if it has not already, desecrate the temple. Besides its deadening effect on a living art, it falsifies it by being out of tune with itself. This is a grave defect, though its gravity can be exaggerated. A worse fault is that it is a borrowed instrument constructed originally to minister to the less noble kind of music of other land."

সাধারণত দেখা যায় যে, যিনি হারমোনিয়মের লব্ধে দগ্ধ করিয়া গান শিক্ষা করিয়া থাকেন তিনি কখনও হারমোনিয়ম ছাড়া গান করিতে পারেন না। কেবল তাহাই নহে, যিনি যে ভারতীয় হারমোনিয়মের সঙ্গে সঙ্গত করেন তিক্ত ঐ ভারতীয় বস্তুটি না হইলে গান গাহিতেই পারেন না। আবার, বাহ্যিকের গণ্য করিয়া স্বরযুক্ত হারমোনিয়মের লব্ধে গান করিয়া কর্কশ হইয়া গিয়াছে তাহার হারমোনিয়ম এত ঘোরে বাজান করিয়া বাজাইয়া গান করেন যে, তাহাধের গলায় আগুন লাগিয়া মোটেই শুনিতে পাওয়া যায় না। হারমোনিয়ম দিয়া গান করিতে হইলে হারমোনিয়ম খুব আঁত্রে বাজাইয়া এবং হারমোনিয়মের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সুধের ও কঠোর আওয়াজের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া গান করিতে হয়। এলিড সঙ্গীতজ্ঞ যার সুত্রেসনাথ বঙ্কিমদার বালাজুর মহাপন লিখিয়াছেন—

"প্রায় জগৎ বঙ্গের বহিরা পলা গিয়াছিল, কিন্তু শেষের বিশবঙ্গের হারমোনিয়ম স্বরূপ বস্তু অবলম্বন করিয়া কঠোর অচেতন, অকর্ষক ও অন্ধ হইয়া গিয়াছে। 'এক একটা গমকের মধ্যে পূর্বে যে ভাব আদিত তাহা আর নাই। ভাবের সৃষ্টিরও পাকি কমিয়া গিয়াছে।

এখন ভারিা দেখুন হারমোনিয়ম আশাধের সঙ্গীতের পক্ষে কতদূর উপকারী।





পাড়া একপাশে নিকানো পুকুরে। ছোট্ট খড়ের ঘর  
ডালিন নামে। গোয়ালে চুইপুই চড়বড়া খাচী বাঁধা, মাচা  
চণা বিচালী, ঘোলা ভরা দান। ঘুরে চারিধারে ঘানের ক্ষেত  
নৌল অঁকানোর তলায় লম্বুত আলোর বাঁধ বাঁধিয়া রাখিয়াছে,  
মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের ডাঙা, লম্বুত গন্ধ খোলা। অগুণায়  
উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখী ডাকে—লীলকন্ত, বাবুই,  
গ্রাম।। অশু লকালে উঠিয়া বড় রাস্তার ভেঁড়ে খোঁজা এক  
পায় তাল। সন্দেশ কাল গাটীর তুলের লজ্জা গরম স্ক্রিয়ার  
ফলাব শহিয়া পড়িতে বসে। চণী মাশেলিয়ার তোসে  
না। লকলেই গানে, লকলেই খাতির করে, আদিত্য পাথের  
দশা লয়। গণাব বলিয়া কেহ তৃপ্ত তালনা করে না।

...তখুই স্বপ্ন দেখে, ঘিন নাই, ভাত নাই, লক্ষ্মীনা তখুই  
স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয় এককাল পরে সত্য সত্যই  
একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই  
ভেগে বেলাকাল দিনে জামতলায় লজিনাতার ঘুরিবার সময়  
ঠাইতে লেঁচ্ছুতির আদ্যপনা। আঁকার মস্তুর সঙ্গে এ সাধ বে  
তালার মনে তড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আলতা পড়া পাথের  
পাণ আঁকা। আদিত্যর স্বপ্নের বাড়ার ঘর সংসার পাতাইবে।  
এককম ভাঙা পুতানে কোঠা, বাণবন কে চাষিয়াছিল?

চণী কঁকটা ছোট্ট মানকছু কোথা ঠাইতে বোপাড় করিয়া  
আনিতা রাস্তাফর ঘণা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা  
বলে, তোমার কোল কি হুগা? ..আজ কি বলে তাত বাধি?  
কাল সন্ধ্যা বেলাও তো জর এসেছে? চণী বলে, তা হোক  
মা, সে জর বৃষ্টি—একটু তো মোটে শীত করণো?...কুনি  
এই মানকছুটা তাতের ঘিরে চুটো তাত—। তাহার মা  
বলে—মাঃ, অমূল্য গোরে তোমার খাই খাই বস্তু কেড়েছে।  
আজকাল তাল যদি থাকিস্তো তাল বর: দেখো—

অনেক কাকুতি মিনতির পর না পারিয়া দেখে চণী  
মানকছু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা হুপ করিয়া বসিয়া  
থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব তাল আঁচি, আজ আর  
জর আসবে না আমার—ওপাশা চুণানো কুটি আর আলুতাল  
খাওয়া। একটু পরে চাই ওঠে, সে খানে ইয়া জুর আসার  
পূর্ণা লক্ষণ। তবুও সে মনকে খোঁজা, চাই উঠুক, এমনি তো

কত চাই ওঠে, সব আর হবে না। ক্রমে শীত করে, বৌয়ে  
গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে বৌয়ে না গিয়া মনকে প্রবোধ  
দেয় সে, শীত বোধ করণে একটা স্বাভাবিক ষাণ্ময়িক ব্যাপার,  
স্বয়ং আসার লক্ষিত ইহার সন্দর্ভ কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ পাটে না। রৌত্র না পড়িতে  
পড়িতে স্বয়ং আসে, সে লুকটিয়া গিয়া রৌত্র বেগে, পাঁচে  
মা টের পায়। তাহার মন ছুট করে; তাবো—জর স্বয়ং  
ভেবে এরকম হচ্ছে, লজ্জা লজ্জা স্বয়ং হয় নি—

রাঙা হোদ পেগা ধরা তাল পাঁচিলের গারে গিয়া  
পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। চণীর মনে হয়  
অন্তরঙ্গ হইয়া থাকিলে স্বয়ং চলিয়া যাইবে। অশুকে বলে,  
বোল দিক একটু আমার কাছে, আর গল্প করি।

একদিন আর বছর ঘন বর্ষার রাত্রে সে ও অশু মতলপ  
খাঁটিয়া দেখতে পিছনে শেঠাকৃষ্ণনের বাগানে তাল  
কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ হুগার পায়ে পটু করিয়া এক কাঁটা  
সুঁতিয়া গেল। ঘরপাশ পিছু হঠিয়া গী পা খানা দেখানে  
রাখিল, সেখানে বা পায়েও পটু করিয়া আর একটা!...  
লকাল বেলা দেখা গেল, পাঁচে রয়েছে উহার কেহ  
তাল কুড়িয়া লয়, এমত লম্বু তালতলার পথে দোহা  
করিয়া মরি মরি বেশ-কাঁটা সুঁতিয়া রাখিয়াছে। আর  
এতদিন বা আসবে? ব্যাপার!...ওরকম কোন দিন হয়  
নাই।

কোথায় হইতে দেখিন এক বুড়া বাজাল মূল্যমান একটা  
বড় ব্রা হু কয়া কাচ-বানো টিনের বাস্ক লইয়া বেলা  
দেখাইতে আসে। ওপাড়ার জীবন চৌধুরীর উঠানে সে  
বেলা দেখাইতেছিল। চণী পানেই ঝাড়াইয়াছিল। তাহার  
দশা ছিল না। আর লকলে এক এক পরণা দিয়া বাস্কের  
পায়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া কি লব দেখিতেছিল।

বুড়া মূল্যমানটি বাস্ক বাজাইয়া হুহু করিয়া বসিতেছিল,  
তাক বিদিকা রোজা দেখো, হাতী বাস্ক! লজ্জাই দেখো!  
এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ: হইতে  
চোখ গড়াইয়া লইতেছিল, অমনি চণী তাহাকে সহ্য আশ্রয়ের  
লক্ষিত লজ্জা করিতেছিল, কি দেখনি যে ওর মধ্যে?  
লব লজ্জাকারের?

উঃ ! সে কি অশুভ বাণীও দেখিচ্ছে তোমার ভাষায়  
বলিতে পারে না !...কি সে সব !

সতনের লেখা একে একে হইয়া গেল । চূর্ণা চলিয়া  
যাইতেছিল বুড়ী মূল্যমানটি বলিল, দেখেও না বুড়ী ?...  
চূর্ণা বাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পরদা  
নেই ।

লোকটি বলিল—এসো এসো বুড়ী, দেখে যাও—পরদা  
লাগেও না—

চূর্ণার একটু লজ্জা হইয়াছিল ; মুখে বলিল, নাঃ—কিন্তু  
আগারে কোতুলে তাহার বুদ্ধের মধ্যে চিপ্ চিপ্ করিয়া  
উঠিল ।

লোকটি বলিল—এসো এসো, দেখা কি ?...এস, ভাষা—  
চূর্ণা উচ্ছলমুখে পারের পারে বাহুর কাছে আসিয়া  
দাঁড়াইল বটে, তবুও লজ্জা করিয়া মুখটা চোতের মধ্যে দিতে  
পারে নাই । লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্য দিবে তাকাও  
দিক খুঁকি ?...

চূর্ণা মাথার উত্তর চুলের গোছা কানের পাশে দরাইয়া  
দিয়া চাহিয়া দেখিল । পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো  
বর্ণনা করিতে পারে না । সত্যিকারের মাহুৎ ছবিত্তে কি  
করিয়া দেখা যায় ? কত সাহেব, মেম, ঘর বাড়ী, বৃদ্ধ,  
সে সব কথা সে বলিতে পারে না । কি ভিনিষই সে  
দেখিয়াছিল !

অশুভ দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, চূর্ণা কতবার  
খুঁজিয়াছে, ও দেখা আর কোনও দিন আসে নাই ।

সব ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে চূর্ণা অরের ধমকে  
খার বলিতে পারে না, উঠিয়া খয়ের মধ্যে কাঁধা মুড়ি বিজা  
পোহ ।

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অশুভ আর ভুঁজিয়া যেনা  
দায় । বই মল্লের খুঁ খরিবার যোগাড় হইয়াছে । লকাল  
বোলা সেই সেই এক পুঁটুপি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর  
বেকে একবারে প্রস্থ করিয়া পেল খরিবার লম্বা । তাহার  
মা বকে—ছেলেরা না নিকুচি করেছে—তোমার লেখাপড়া  
একবারে দিকের উঠলো ?...এবার বাড়ী এসে সব কথা  
বলে দেখো, দেখো এখন জুনি—

অশু ভরে ভরে দপ্তর লটকা বসে । বইগুলি পূব  
চাহিদিকে ছড়ায় । মাকে বলে, একটু খয়ের নাও মা, আমি  
দোহাতের কালিতে দেখো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া যৌত্রে  
যের । শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিমানো কালি, চক্ চক্  
করে—অশু মচাপুরি সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—  
তাবে—আর একটু খয়ের দেখো কাল থেকে—ও কী  
চক্চক্ করছে দেখো একবার !...বাটা হইতে মাকে  
লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোহাতে দেয় ।  
পরে লেখা লিখিয়া কুখাইতে দিয়া কতটা মাজ মূল্যমান করে  
দেখিবার ক্ষমতা কোতুলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে ।  
মনে হয়—আজ্ঞা বান করে একটু দি ?

একদিন মার কাছে বসে পড়িয়া যায় । মা বলে,  
ছেলের লেখার সঙ্গে ঘোঁক নেই, কেবল জালা ডালা খয়ের  
রোজ দস্তকার—রেখে দে খয়ের—

বসে পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে  
কালি হয় বৃষ্টি ?...আমি বৃষ্টি এখনি এখনি—

—না খয়ের নৈলে কালি হইবে কেন ? এট মব রাজিার  
ছেলে আর লেখাপড়া কছে না—তাদের পের দেয় পরের  
রোজ যোগান তেছে যে দোকানে । যাঃ—

অশু বসিয়া বসিয়া একখানা বাতার নাটকি লেখে ।  
বড় লিখিয়া খাটখানা সে প্রায় তরাইয়া ফেলিয়াছে—সম্রাট  
বিবাহোতকায় রাজা রাজা ছাড়িয়া বনে বান, রাজপুর  
নীনাথর ও রাজকুমারী অধা বনের মধ্যে দস্তার চাতে  
পড়েন, খোদ বৃদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃত্যু হয় নদীতীরে  
দেখা যায় । নাটকে সত্ৰ বলায় একটি জটিল চরিত্র পুঁট  
হইবার অঙ্গ পরেই বিশেষ কোনো মাগাছক দেখে  
বর্ণনা না থাকে লম্বাও প্রাণমত্তে দণ্ডিত হয়—নাটক  
পেশদিক রাজপুত্রী মবার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি  
বা বিদ্রুত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাহার বিবাহ  
প্রতিষ্ঠা ঘটনায় বাহারা বলেন যে, পর বৈশাখ মাসে দেখা  
যামার পালা হইতে এক নামকাল ছাড় ইচ্ছা মূলতঃ  
কোনো কালেই পূর্ণক্ নচে, বা সেই হইতেই ইচ্ছা কবর  
লগা, তাহার কুলিয়া বান যে, প্রতিজ্ঞাপালী যাক্দের





কল্পনার ও চিত্রার দ্বারা সাধারণ জীবের বুদ্ধির পক্ষে  
গ্রহণযোগ্য—সে লক্ষ্যে কোনো মত না দেওয়াই সুবিধা।

অতীতের কোনো এক নীরব জোড়ামহী রাত্রিতে  
নির্জন বালকজনের ক্রিয়াকলাপে শব্দার এক প্রাচীন কবির  
লীল্যমেঘের মত চন্দ্রময় মন্থ-নির্মালিনী বৃত্ত বনভূমির বস  
বসি কালিদাসকে মুগ্ধ মেঘের ভ্রমণ বর্ণনে অহুস্মিত  
করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি ? সে বিষয় শুভ  
বাহিনীর বন্দন সাহসে নিম্নের অজ্ঞাতসারে লিখার কল্পনা  
ধরিয়া করিয়া আসিতেছে, আশ্রয় দিয়াই আশ্রয় জ্ঞানো  
দায়, হইএর চিন্তিতে মনসি ভ্রমিয়া কে কোথায় মনসি  
জ্ঞানে ?...

অপূর বসন্তে একখানা বই আছে,—বইখানার নাম  
চরিতমালা, দেখা আছে উৎসবস্ত্রে বিভ্রাণের প্রসিদ্ধ।  
পুরানো বই, ভাণ্ডার বাহার নানা জায়গা হইতে ছেলের লজ  
বই সংগ্রহ করিবার ব্যতিক্রম আছে, কোথা হইতে এখানা  
আনিয়াছিল, অল্প মাঝে মাঝে মাঝে খানিকটা পুলিয়া  
পড়িয়া থাকে। বইখানাতে রাখাযের পর আছে সে ঐ  
রকম হইতে চায়। হাতে আসু বেচিতে পাঠাইলে কলকল  
এক বেড়াই ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত,  
কালজের অজ্ঞাবে চান্দ্র্যের পাতে ভেঁটতা আল দিয়া অস্ত  
কসিত, মেঘশালক ভূবাল ইত্যন্তঃ লক্ষণশীল মেঘললকে  
দৃষ্টিবিচরণের প্রবেশ দিয়া এক মনে পঙ্কতলায় বসিয়া  
ভুজিত পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়।...

‘বীজগণিত’ কি জিনিস ? সে বীজগণিত পড়িতে চায়  
ভূবালের মত। সে এই চাতের লেখা লিখিতে চায় না,  
ধারাপাত কি শুভক্ষমী এসব ভাণ্ডার ভাগ লসে না। ঐ  
রকম নির্জন পঙ্কতলায়, বনের ভাণ্ডার, কি বেড়াই ধারে  
বসিয়া বসিয়া সে “ভুজিত” ( জিনিসটা কি ? ) পাঠিয়া পড়িবে,  
বড় বড় বই পড়িবে, পড়িত হইবে ঐ রকম। কিন্তু  
কোথায় পাইবে সে সব জিনিস ? কোথায় বা ‘ভুজিত’,  
কোথায় বা ‘বীজগণিত’ কোথায়ই বা ‘লিটিন ব্যাকরণ ?’—  
এখানে শুধুই কড়ি কপার আধা, আর কুড়ীয়া নাস্তা।

না বসিলে কি হইবে, বাহা সে পড়িতে-চায়, তাহা  
এখানে কই ?

কল্পিত বস বর্ষা চলিতেছে। অগ্রহা রাগের চক্রাঘাতনে  
লক্ষ্যাবেগের মল্লিশু কল। সেদিন দেখানে নীলকণ্ঠীর  
ভূতের পর হইতে মুগ্ধ হইয়া পৃথিবী কোন্ দিকেরে মাথার  
পাঠে মন ভারী চুপক পাখের বগানো আছে, ভাণ্ডার আকর্ষণের  
বলে নিকটবর্তী মনুতগামী জাহাজ প্রায়ই লগ্ন হইয়া  
আগিয়া ভীতবর্তী মন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি  
জ্ঞানবো উপলব্ধির পরের মত নান্য আকর্ষণ কাহিনীর  
বর্ণনা চলিতেছিল। প্রোভাবের কাহারও উত্তিবার ইচ্ছা  
ছিল না, এ রকম আকর্ষণের পর ছাড়িয়া কাহারও বাকী  
হইতে মন লরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শূন্যই গল্পের  
ধারা আসিয়া ঘোড়াবে পৌছিল। বীজ জৌমুখী বসিবে  
ছিলেন—তুণ্ড লংকিতার মত অমন বড় তো আর নেই ?  
তুমি বাও, শুণ্ড লম্বা বাণিতা দিয়ে দিয়ে নাও, তোমার বাবার  
নাম, কোন্ কুলে জন্ম, তুঁত তবিল্য সব বলে বেবে—তুমি  
মিলিয়ে নাও—এক ও রাশি চক্রে বত রকম হইবে ঐ—  
তা সব দেওয়া আছে কি না ? হার তোমার পূর্ণ জন্ম  
পর্যন্ত—

সকলে সাগ্রহে কলিতেছিলেন, কিন্তু রামমহা হঠাৎ  
বাহিরের দিকে চাফা বসিলেন—না তুঁত বাক, এর সব  
আর বাওয়া বাবে না—মেঘতো না কাণ্ডগামি ? একটা বড়  
কটুকা টটুকা না হোলো বাঁচি, পাতিক বড় খাণ্ডাণ, চলো সব—  
বুজিক বিয়াম নাই। একটু থামে, আবার এমন কোরে  
আসে, বুজির ভাটে চাফিয়ার খোঁজা খোঁজা।

হরিহর মোটে পাঠো টাকা পাঠাইয়াছিল, ভাণ্ডার পর আর  
পড়ও নাই টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—  
তোল লক্ষ্যে উত্তিয়ার মল্লয়া ভাবে আকর্ষণিক খরচ আসিবে।  
হেলেকে বলে, ‘তুমি খেলো খেলো বেড়াই ব’লে দেখতে লাগলে,  
ডাক বাটুটার কাছে ব’লে থাকি—পিওন যেমন আসবে  
আর অবনি জিগোস করবি—

অপূ বলে—বা আমি বৃত্তি ব’লে থাকি নে ? কাণও তো  
এলো, পুঁটিলের চিঠি আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—  
জিগোস ক’রে এস দিকি পুঁটিকে ? কাণ শুনে আমাদের  
খবরের কাগজ কি ক’রে এল ? আমি থাকিবে বৈকি ?

বর্ষা স্রীতিমত নাহিরাছে, অশু মায়ের কথার ঠায়  
স্নেহের চৌমুকপুণ্ডে লিখনের প্রতাপার বলিয়া থাকে ।  
শাখু কর্ণকানের বরের ঢালা হইতে গোলা শায়রার দল  
ভিজিতে ভিজিতে কটাশটু করিয়া উড়িতে উড়িতে স্নেহের  
শক্তিমের বরের কার্ণসে আসিয়া বসিতেছে, চাখিয়া চাখিয়া  
আবে । আকাশের জাক সে বড় ভর করে । বিভাং  
চক্ষুটিলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কি রকম বল পাতে  
দেবেছে, এইবার গ্রিক জাক্বে—পরে সে চোখ বুজিয়া  
কানে আসুন্ দিয়া থাকে ।

বাড়ী করিয়া আছে না ও দিবি সারা বিকাশ ভিজিতে  
ভিজিতে রশ্মিকৃত কচুর শাক তুলিয়া রাত্রি স্নেহের দাওয়ার  
জড় করিয়াছে ।

অশু বলে—কোথেকে আসলে মা ?—উঃ কত !

চুর্ণা হাসিয়া বলে—কত ! উঃ—! জোয়ার তো ব'লে  
ব'লে বড় ছবিছে !... ওই গমের জোয়ার জাম তলা ফেঁকে—  
এই এতটা এক ছাঁটু জল ! যাও বিকি !...

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত যোজের সঙ্গে দেখা হয় ।  
সরস্বতী কাপড়ের ভিতর হইতে কীদার একখানা মেঝারী  
বাতির করিয়া বলে. এই ছাপে : বিনিস খানা পুৰ তালো—  
তরল না, কিছু না, ফুল কীদা । তুমি বলেছিলে, তাই  
বলি, ঘাই নিয়—

অনেক বর বস্ত্রের পর নাপিত যৌ নগ্ন একটী আধুলি  
আঁচল খেকে তুলিয়া দিয়া ত্রেকারীখানা কাপড়ের মধ্যে  
লুকাইয়া লয় । কাউকে খেন না প্রকাশ করে সরস্বতী এ  
অগ্রসর বার বার করে ।

হুই একদিনে বনোত্তর বধা নামিল । ছ ছ পুবে হাওয়া—  
খানাজোয়া লব খে খে করিতেছে—গথে ঘাটে একছাঁটু  
জল—দিন রাত দৌ দৌ বানবনে কড় বাধে—বাপের মাথা  
মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও কঁক  
নাই—মাকে মাকে একটু খেন লুটাই করিয়া বেধায়—আবার  
এখনি আশেবার চেরেও অন্ধকার করিয়া আসে কালো  
কালো মেঘের রূপ ছ ছ উঠিয়া পুৰ হইতে পশ্চিমে  
চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় খেন দেবদেবের মহা-  
সংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কোণী দেনানায়কর চালনার

জলজল আকাশ একাকারে চাটয়া ফেলিয়া বিরাট বৈতাঃ  
সৈন্ত বাহিনীর পর বাহিনী অকৌচিনীর পর অকৌচিনী  
অদূর রথী মহারথীরের নায়কে কড়ের বেগে অগ্রসর  
হইতেছে—কিশোরিততে ঠেলাঠেলি করিয়া আকাশে  
বাতাসে মহাতীড় পাঁকাইয়া তুলিয়া, আবার উৎসাহে,  
আগ্রে :—এখনি গিয়া পৌছোনো চাই—নরকে চাপিয়া  
মারিতে হইবে :—হস্তীবলের সর্বপ প্রাণিততে কানে তাল  
ধরিয়া যায়, অঙ্গলত্ব অস্ত্র দেবদেব দান উড়াইয়া চক্রে  
নিমিষে বিশাল রক্তক্ষয় এদিক্ এদিক্ পলায় ছিঁড়িয়া  
কাঁড়িয়া এই জ্বি জ্বি করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা  
হইতে রক্তবৌয়ের বংশ করাল ক্রম জাহায পুণিবী অমরীক  
অন্ধকার করিয়া গরিয়া আসিতেছে !

মহাকত !

খিন রাত দৌ দৌ. পক্ষ—মনোর জল বাড়ে—কত  
বরবোর কত স্নায়বীর যে পড়িয়া গেল !...নদী নাল্য তলে  
তালিয়া গিয়াছে—শুক বাহুর পাড়ের তল, শাখবনে, বাড়ীর  
ছাঁচুতার আকারে বাড়ীটয়া ভিজিতেছে. পাখী-শাখানির  
শব্দ নাই কোনোদিকে । চার পাঁচ দিন সমান ভাবে কাটিল—  
কেবল কড়ের লস আর অবিশ্রান্ত ঘাড়া বস !—অশু মাওয়ার  
উঠিয়া ডাড়াডাড়া ভিলামাথ: দ্বিভিত্তবৃত্তে বলিল—আমাদের  
বানতলার জল এগেছে দিবি, দেখবি ? ওয়া কীবা বৃদ্ধি বিধা  
ওটয়া ছিল—না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এগেছে রে ?...  
অশু বলে, তোর জর সাংলে কাগ বেখে আসিস ? তেঁতুল  
তলার গথে ছাঁটু জল !...পরে ভিজাল্য করে—মা  
কোথায় রে ?...

অর একটা দান। নেই—ওটোখানি বাসি চালভাড়া  
মাজ আছে । অশু কল্যাণটি কবে,—তা ছবে না মা,  
আমার বিবেশায় না বৃকি—আমি ওটো 'ভাত খাও'

তার মা বলিল, লক্ষী মানিক জামার—ওরকম কি  
করে !...অনেক ক'রে চালভাড়া মেখে দেখো এখন—  
রাঁধাযে কেমন ক'রে দেখিষ্টে নে কি রকম মেঘটা  
করেছে ?—উহনের মধ্যে এক উত্তর জল । পরে সে কাপড়ের  
ভিতর হইতে একটা কি বাতির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া  
বলে—এই ছাখ, একটা কই মাছ বানতলার কানে হইতে



দেখি বেড়ায়ে—বস্ত্রের ভল পেয়ে সব উঠে আসতে গাছ থেকে—বয়স্ক পোতার ভোবা ভেঙ্গে নদীর সঙ্গে এক হ'রে গিয়েচে কিনা?...

চুর্ণী কীথা ফেলিয়া গুঠে—অবাক্ হইয়া যায়। বলে—  
দেখি মা মাছটা?... হ্যাঁ মা, কই মাছ বুঝি কানে হাঁটে  
বেড়ায়? আর আছে?... অণু এখন স্তম্ভীমাথায় ছুটিয়া যায়  
আর কি? অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে বাহার।

চুর্ণী বলে—একটু আর সাংলো কাশ লকালে চন্দ্র অণু,  
তুই আর আমি বানবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো  
এখন। পরে সে অবাক্ হইয়া ভাবে—বাগবাগানে মাছ!  
কি ক'রে এল? বা: তো?—মা কি আর তাগ ক'রে  
পুড়েচে—পুড়লে আরও সেখানে আছে—দেখতে পেলাম  
না কি রকম কই মাছ কানে হাঁটে—কাশ লকালে  
দেখবো—লকালে আর দেহে থাকবে—

চাষাভেকর বন বাসান কিরিয়া লক্ষ্য নামে। লক্ষ্যার  
মেঘে ও আশোনির অন্ধকারে চারিবার একাকার! চুর্ণী যে  
বিছান। পাতিয়া গুইয়া আছে, তাহারই এক শপে তাহার  
মা ও অণু বসে। লক্ষ্যতা ভাবে—আজ যদি এতগুলি  
একখানা পতর আশে নীরেন বাবাভিত্ত?... কি জানি, তা  
চ'তে কি আর পারে না?... নীরেন তো পছন্দই ক'রে  
গিয়েচেন—কি জানি কি গেল অদেটে! না, সে সব কি  
আর আমার অদেটে হবে? তুমিও যেমন! তা হোলে  
আর ভাবনা ছিল কি?

ওষিকে ভাইবোনে তুলল তর্ক বাধিয়া যায়। অণু গুরিয়া  
মায়ের কাছে বসিয়া কসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজার নীত  
করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেই—গামলফা বাটনা  
বাটে মাটিতে লুটায় কেন?...

চুর্ণী বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন বেশ—  
অণু বলে—বুধ—হ্যাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার  
ছেড়ে গিয়েচেন বেশ?... কথা বলিয়াই সে দিবার অজ্ঞতার  
হালে।

লক্ষ্যতার বুক ছেলের অথেন উন্মাদের হাসি পেলের  
মত বেধে। মনে মনে ভাবে—লাটটা বহু, পাটটা নহু—এই  
তো একটা ছেলে—কি অদেটে যে ক'রে এগেছিলাম—

তার বুকের আবদার স্বাধুতে পারিনে—খি না, লুচি না,  
সন্দেশ না—কি মা শুধু ছোটো 'ভাত'—নিমকা?... মাঝের  
ভাবে—এই ভাঙা বর, টানটানির সংসার—অণু মাহুল  
হোলে আর এ চুখে থাকিবে না—জগদান তাকে মাহুল  
কোরে তোলেম যেন!...

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে  
নির্ভীকপুত্রের বর করিতে আসিয়াছিল তখন এক বৎসর এট  
রকম অনিশ্চয় বর্ষা নবীর জল এত বাড়িয়াছিল যে, ঘাটের  
পথের দুখানো বাগানের কাছে বড় বোকাই নৌকা পরাণ  
আসিয়াছিল।

অণু বলে—কত বড় নৌকা মা?  
—মস্ত—ওই যে ঘোড়াদের চুনের নৌকা, লাগি-  
মটির নৌকা মাঝে মাঝে আসে দেখিচি তো—অত  
বড়—

চুর্ণী কঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারভিত্তি বিহুনি  
কষ্টে জানো?

অনেক রাতে লক্ষ্যতার ঘুম ভাঙিয়া যায়—অণু তাঁকি-  
তেছে—মা, ওমা ওঠো—আমার গায়ে কল পড়'চে—

লক্ষ্যতা উঠিয়া আলো জালে—বারিহে ভাবনিক স্তম্ভী শব্দ  
হইতেছে—ছুটা ছাব দিগা ব্যতের লক্ষ্য জল পড়িতেছে।  
সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। চুর্ণী অঝোর অয়ে গুইয়া  
আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া জ্ঞাপে তাহার গায়ের  
কীথা ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে। তাঁকিয়া বলে—  
হুগ্গা—ও হুগ্গা শুনিছিস?... একটু ওঠ বিকি? বিছানাটা  
সরিয়ে নি—ও হুগ্গা—শীতগির ওঠ একেবারে ডিঙে গেল  
যে সব?...

ছেলে মেয়ে দুমাইয়া পড়িলেও লক্ষ্যতার ঘুম আসে না।  
অন্ধকার স্বাক্ত—এই ঘন বর্ষা... তাহার মন ছন্দ ছন্দ করে—  
ভর হর একটা বেন কিছু ঘটিবে... কিছু ঘটিবে। বৃকের মতো  
কেমন বেন করে। ভাবে—সে মাহুয়েরই বা কি হোল?...  
কেন পত্তরও আসে না—টাকা মক্ক পে থাক। এরকম তো  
কোনোবার হয় না?... তার পরীয়াটা ভাল আছে তো?...  
মা শিচ্ছেনবী, দ পাচ আমার জোপ দেখো, ভাল ববর এনে  
দাও মা—

তারপরদিন সকলের বিকেল সামান্য একটু রুটি মাখিল।  
সপ্তমবার বাটার বাটার চট্টা খেবিল বাপবনের মথের ছোট  
ডোবাটা জলে ভর্তি চট্টা গিয়াছে। বাটের পথে নিবাসনের  
মা ভিঙিতে ভিঙিতে কোথায় বাইতেনি, সপ্তমবার ভাঙিয়া  
বলিল—ও নিবাসনের মা পোন্—পরে সপ্তমবারে বলিল—  
সেই তুই একবার বলিছিনি না, বিল্লাসুনি চানদের কথা  
তোমার ছেলের ভাঙে—তা নিবি তু...

নিবাসনের মা বলিল—আছে তু—দেখা একটু থকুক,  
সেই ছেলেবেলা সপ্তম ক'রে এখন আম্মো এখন—নতুন  
আছে মা-ঠকুক, না পুরোনো তু...

সপ্তমবার বলিল, তুই আর না—ওগুনি দেখবি তু—একটু  
পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গারে দেয় নি—গোটা তোলা  
আছে—পরে একটু পানিমা বলিল—তোরা মাঝকাল চাপ  
ভান্দিম নে তু

নিবাসনের মা বলিল—এই বাপলার কি ধান শুকোর মা-  
ঠাকুরোণ...খাবার ব'লে ছুটাখানি রেখে বিটটি অমনি—

সপ্তমবার বলিল—এক কাজ কর না—ভাই গিছে আমার  
আবকাটা খানেক আম্মি দিয়ে থাকি তু—একটু গরুরা  
আদিয়া মিনতির গুরে বলিল—বস্তির ভাঙে বাবার পেকে  
চাপ আন্নার লোক পাচ্ছিনে—টাকা নিয়ে নিয়ে  
বেকাছি তা কেউ যদি রাগি চর—কড় মুঠিলে পড়িছি  
মা—

নিবাসনের মা খাঁকার হইয়া গেল, বলিল—আম্মো  
এখন নিয়ে, কিন্তু সে কেটল ঘানের চালির ভাত কি  
আপনারা খেতে পারবেন মা ঠাকুরোণ তু—বস্ত মোটা—

বৈকালবেলা হইতে আবার ভগ্নবাক্য রুটি মাখিল।  
রুটির সঙ্গে কড়ও ঘেন বেশী করিয়া আছে—বোর বর্ষদুখর  
নির্জন, জলে বৈ বৈ, হু হু পূবে হাওয়া বওয়া, মেঘে  
অন্ধকারে একাকার ভাসিয়া। আবার সেই বকম কালো  
কালো পূর্বা। তুলোর মত মেঘ উড়িয়া লিগিয়াছে—রুটির  
পক্ষে কান পাতা যায় না—বরষা জানালা বিয়া ঠাণ্ডা  
হাওয়ার কাপড়টার সঙ্গে রুটির ছাট্টা হু হু করিয়া ঢোকে—  
হেঁকা খলে, হেঁকা কাপড়-গোলা তাকান কবোটার আড়ালের  
সাধা কি যে বড়ের ভীম অন্ধমণের মুখে থাকায়।

বেশী রাতে সকলে ঘুমাউলে বেশী রুটি নাখিল।  
সপ্তমবার ঘুম আসেনা—সে বিভ্রান্ত উদ্ভিগ্ন বলে।  
বটের শুধু একটানা হু হু জগেব পশু; কড় বৈকাল  
মত সপ্তমবার একটানা গৌ গৌ রবে বড়ের বকম। বাড়ীতে  
দাখিভেছে—...জানি কোটাগানা এক একবারের বন্ধকার  
ঘেন খর খর করিয়া কাপে—...হয়ে তাহার গ্রাম উড়িয়া যায়...  
গানের একমুহুরে বাপবনের মধ্যে ছোট ছোট ভেলসেয়ে  
লইয়া নিঃশব্দ...মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি  
তাতে খেঁচি নেই—এখর কি করি তু এই বাস্তির ঘাই বা  
কোথায় তু—মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আজ্ঞা যদি  
কোটা পড়ে, তবে দালালের ছোলাটা বোধ হয় আগে  
পড়বে—যেমন পক্ষ ছবে অমনি পানচালার দোর নিশে  
এদের টেনে গার ক'রে নেবো—

সে ঘেন আর বসিয়া থাকিতে পারেনা—করদিন সে  
গোলাক কচুখাক শিখ করিয়া বাইয়া মিন কটাটতেছে—  
মিকে উপাসনের পর উপাসন বিয়া ছেপেমেয়েক বাবা কিছু  
সামান্য খাবা ছিল বাঙাইতেছে—পতীর ভাবনা অসত্যের  
চকল, মাথার মধ্যে কেমম করে।

বড়ের গৌ গৌ পক্ষ অনেক ভায়ে বড় বাড়িল।  
বাড়ির কি কটুকা আসিল! উপায়! একবার বড় একটা  
বন্ধকার তর পাইয়া সে বড়ের পক্ষ বৃত্তিবার মত সুরপে  
দালালের দোহার খুলিয়া বাড়িরের গোড়াকে হু হু বাড়াইল...  
রুটির ছাটে তাহার কাপড় চুল সব ভিঙিয়া গেল—হু হু  
একটানা হাওয়ার পক্ষে রুটিপতনের পক্ষে বড়ের পক্ষে ঢাকিয়া  
গিয়াছে—বাড়িরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে  
যাকালে বাতালে পাছপালার সব একাকার...কড়রুটির  
পক্ষে আর কিছু শোনা যায় না। এত চিত্তে অন্ধকার ও  
কুর অটিকাময়ী হকমীর আচ্ছা ঘেন প্রলম্ববের দৃষ্টান্তে  
ভীম ভৈরব বেগে রুটি গ্রাস করিতে ছুটয়া আসিতেছে—  
অন্ধকারে, রাতে, গাছপালার, আকাশের, মাটিতে তাহার  
পতিবৎ বাহিয়া পক্ষ হইতেছে—হু-ই-প...হু-উ-ই-প...  
হু-উ-উ-ই-প...এই পক্ষের প্রথম প্রথমবারের বিকে  
বিষগ্রাসী হুটী ঘেন শিখ চট্টা বলসকর করিতেছে—  
হু-উ-উ—এক শেখের অশেষটা পুখিবার উচ্চ নাচ তাক



বাস্তবের আলোড়ন, মনন করিয়া বাহুল্যমূহে বিশাল ভূকনি  
ভূনিয়া তাহার সমস্ত আত্মিকতাও বলে সজ্জলতারে ধীর  
কোটাটার পিছনে থাকা দিতেছে—ই-ই-ই...! কোটা  
ভূনিয়া ভূনিয়া উঠিতেছে...আর থাকে না! ইহার মধ্যে  
যেন কোনো অসীমতা, বিশ্বম্পত্তা, ভ্রমভাঙ্গি নাই—যেন

অত্যাশ্চর্য, অশালোভ্য তাবের কস্তাকর্ণা...! বিখটাকে  
নিশ্চিন্ত সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে  
লগিয়াছে...সুগে সুগে এরকম কত হাতমুখী সস্ত্রিক বিকল  
করিয়া অনন্ত আকাংক্ষা অকৃত্যে তাগাব্যিক মত ছুড়াইয়া  
দিয়া আশিচ্ছাদে যে মহাপ্রতিমান্ ধ্বংসদূত—এ তার অত্যাশ্চর্য  
কাণ্ড...এই তার অসীমতা উদ্ভটতা গাঢ় না...

অত্যাশ্চর্য মনস্তত্ত্ব দোর বন্ধ করিয়া দিল—আজ্ঞা যদি  
এখন একটা কিছু হবে চোকে? মাহুর কি অস্ত্র কোনো  
মানেগার? চারিদিক ঘন বায়বন, জঙ্গল, লোকজনদের  
বসতি নাই—মাগো...জলের ভাটে ঘর তাদিয়া বাইতেছে...  
গাভ দিয়া দেখিল সুন্দর অশুর পা কলে ভিকিয়া ভ্রাতা হইয়া  
যাটতেছে...সে কি করে? আর কতদূর আছে?...  
সে বিভ্রান ভাতড়াইয়া খেলগাই বুঁদিয়া কেবোদিসের  
ভিবাটা জানে। ডাকে—ও অশুর ওঠো!...এল  
পড়তে...অশুর বুঁদচোখে ভক্তিতপলায় কি বলে বোকা ধার  
না। আলার ডাকে—অশুর? ওন্টিস্ ও অশুর?...  
ও, দিক...চুবাকে বলে—পান কিরে গো তো হুগুগা।  
এই এল পড়তে—একটু ম'রে, পান কেন্দ্র দিক—

অশুর উঠিয়া বলিয়া বুঁদচোখে চারিদিক চাহ—পরে  
আবার ওঠিয়া পড়ে। হৃদয় করিয়া বিষম কি শব্দ হয়,  
মনস্তত্ত্ব তাড়াহাড়ি আবার ভয়ানক পুনিয়া বাহিরের দিকে  
ঠিক মারিয়া দেখিল—বায়বায়ানের দিকটা কঁাকা কঁাকা  
দেখাইতেছে—রাগায়নের দেওয়াল পড়িয়া পিয়াছে!...  
তাহার বুক তাঁপিয়া ওঠে—এইবার যদি পুরাণো  
কোটাটা—? কে আছে কাছকে সে এখন ডাকে?  
মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আতঙ্কিত ভাতটা কোনো রকমে  
কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের বুকের দিকে তাকাও—

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, বড় খানিয়া  
প্রিয়াছে কিং গুই তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার

নীলমণি সুখ্যোর গ্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে  
আসিতেছেন, এমন সময় বিড়কীবোরে বার বার থাড়া  
ভনিয়া আশিয়া লোপ পুনিয়া বিম্বয়ের জুবে বলিলেন—  
নতুন বৌ!...সমসজা বাথ ভাবে বলিল—ন বি, একবার  
বট্টাকুবে জাকো দিক? ...একবার ঈগণির আমানের  
বাড়িতে আসতে বলা—হুগুগা কেমন করছে? নীলমণি  
সুখ্যোর গ্রী আশিয়া হইয়া বলিলেন—হুগুগা? কেন কি  
হয়ছে হুগুগার?...সমসজা বলিল—কদিন থেকে তো আর  
হচ্ছিল—হুগুগার বাজে—মাগেগিয়ার অর, কাল দেখে  
থেকে আর বড় বেগী—ভূমি—তার ওপর কাল রায়ে কি  
রকম কাণ্ড তো জানে—একবার ঈগণির বট্টাকুবে—  
তারার বিজ্ঞত কেন ও বাত-আপা রাঙা রাঙা চোখের  
কেমন মিনাযারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি সুখ্যোর গ্রী  
বলিলেন—ওহ কি বৌ—বিড়কি আমি ওগুনি থেকে  
দিকি—চল আমিও যাকি—কাল আবার রাত্রে গোহালের  
চালাখানা পড়ে গেল—বাবা কাল রাত্রেই মত কাণ্ড ম'মি  
তো কখনো দেখিনি—শেষ রাতে সব উঠে পলটক পরি'রে  
ঝেবে আবার শুয়েছে কিনা?...বিড়কি আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি সুখ্যো, তারার বড় ছেলে করণ,  
গ্রী ও চই মেরে লকলে অশুরের বাড়ী আসিলেন। রাত্রির  
সেই দৈত্যটা যেন সাতা গ্রামখানা দলিত, পিটে, বসিত  
করিয়া দিয়া আকাশ পলে অস্ত্রহিত হইয়াছে—তাড়া পায়ে  
ভাল, পাতা, চালের বড়, কাঁচা বাপপাতা, বালের ককিতে  
পথ ঢাকিয়া যিরাছে—কাড়ের বাপ হুইয়া পথ আটকিয়া  
রাখিয়াছে। কনি বলিল—দেখলেন বাবা কাণ্ডখানা?...  
সেই সবাবগরের শাকারাজা থেকে বিনীতি পাছটার পাতা  
উড়িয়ে এনেছে!...নীলমণি সুখ্যোর ছোট ছেলে একটা  
মহা চকুই পাকী বাপ পাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির  
করিল।

চর্যার বিধানার পাশে অশুর বলিয়া আছে—নীলমণি সুখ্যো  
যদি চুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অশুর?...অশুর মুখে  
উজ্জ্বল চক্। বলিল—যদি কি সব বুকছিল ছেঁটা রপায়।  
নীলমণি বিধানার পাশে যদি বলিলেন—দেখি হাত-  
খানা?...অবটা একটু বেনী, আজ্ঞা কোনো ভয় নেই—

কই, তুমি একবার চুটু করে নবাবপুত্র চ'লে যাও দিকি  
পরং ডাকাতের কাছে—একবারে ভেঙে নিয়ে আসবে।  
পরে তিনি ভাবলেন—ওর্দা, ও ওর্দা ?—ওর্দার অর্থের  
আজ্ঞার ভাব, সাদা পত্ৰ নাই। নীলমণি বলিলেন—এ  
ঘরদোরের অবস্থা তো বড় খারাপ ? জল প'ড়ে কাল রাস্তা  
তেল গিয়েচে—তা বোমার লজ্জার কারণই বা কি—  
আমাদের ওখানে না ওই উল্টেই হোত ? চরিতারও কারণ  
জান আর কোন না এই জায়গা—এই অবস্থায় এই রকম  
ঘরদোর লাগানোর একটা ব্যবস্থা না করে কি যে করতে,  
তাও জানি নে—

ঠাকুর হী বলিলেন—যর দাস্যবে কি, ব্যবসার নেই হবে,  
নৈলে কি এরকম আশ্রয়ের কোনে কেউ বিবেচনা করে ?  
আমি বোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিবেচে—একটু জল  
পান করলে দাড়—ওই আনালাটা পূলে দাড় তো কই ?

একটু বেলায় নবাবপুত্র চাইতে পরং ডাকাত আসিলেন—  
দেখিও শুনিয়া ঐশ্বরের ব্যবস্থা করিলেন। বসিয়া গেলেন  
যে নির্ভয় ভয়ের কোনো কারণ নাই, অর বেদী চাইয়াছে,  
মাথায় জলপট্ট নির্মিত ভাবে দেওতার অশ্রাব্য করিলেন।  
দয়িত্ব কোথায় আছে জানি নাই—তবুও ডাকাত পূর্ণ  
টিকানায় ভাঙকে একখানি পত্ৰ দেওয়া হইল।

সেদিন এই চাৰেই কাটিল। পরদিন কড় বৃষ্টি ধামিয়া  
গেল—আকাশের মেঘ ছাটিতে বৃষ্টি করিল। নীলমণি  
মুখো হুবেলা নির্মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন।  
অপুদের খাওয়া দাওয়া বন্দোবস্ত নীলমণি মুখোবের  
বাড়ীতেই হইল—এ সবচে ডাকাত জী লক্ষ্যের কোনো  
আপত্তি চিনিলেন না। কড় বৃষ্টি ধামিয়ার পরদিন হইতেই  
ওর্দার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। পরং ডাকাত হুবিধা  
বুলিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্ৰ দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিবার মাথার কাছে বসিয়া জলপট্ট বিতে-  
ছিল। অর আবার বড় বাড়িয়াছে। জলপট্ট মিতে দিতে দিগিকে  
সে দু একবার ভাবিল—ও দিদি শুভুহিস্, কেমন আছিস,  
ও দিদি ? ওর্দার কেমন আছর ভাব। 'টোট' নিকটে—  
কি গেল আপন মনে বলিতেছে, খোর খোর। অপু কানের  
কাছে মুখ লইয়া গিরা দু একবার চোঁটা করিয়াও কিছু বুঝিতে

পারিল না। বৈকালের দিকে দর চাড়িয়া গেল। ওর্দা  
আবার চোপ মেগিয়া চাটিতে পারিল একজন পরে। সে  
তারী চুপল চুইয়া পড়িয়াছে, তথা এত কৌশলের বিনেতে  
যে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোকা বার না কি বলিতেছে।

মা গুরুকার্যে উদ্রিয়া গেলেন অপু দিবার কাছে বসিয়া  
রহিল। ওর্দা চোপ তুলিয়া ডাকাত দিকে চাটিয়া বলিল—  
বেলা কত রে ?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—হুদু  
উঠেচে আজ বেশিদি দিদি ? এখনও আমাদের নাংকল  
পাছের মাথার হুদু রখেচে—

খানিকক্ষণ গুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক  
দিন পরে রৌদ্র গুজতে অপু র তার আস্তান চাইয়াছে। সে  
জানালার বাহিরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাথার চাটিয়া রহিল।  
খানিকটা পরে ওর্দা বলিল—গোন্ অপু—একটা কথা  
শোন—

কি রে দিদি ? পরে সে দিদির মুখে আরও  
কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমার একদিন তুই রেলপাড়ী দেখাবি ?

—মেথাবো এখন—তুই গেরে উঠলে বাবাকে ব'লে  
আমরা সব একদিন গজা নাটতে বাবো রেলপাড়ী করে—

পরদিন সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখো অনেকদিন  
পরে নবীতে দান করিতে গাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে  
বসিয়াছেন, ডাকাত জী উত্তেজিত হুও তার কানে গেল—  
ওগো, ওগো তো একবার এদিকে নাগরীব—অপুদের বাড়ীর  
দিক্ থেকে ঘেন একটা কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—

বাণীর কি সেখিতে দফলে ছুটিয়া গেলেন।

দলকরা মেয়ের মুখের উপর স্তম্ভিতা পড়িয়া বলিতেছে—  
ও ওগো চা দিকি—ওমা ভাল করে চা দিকি—  
ও ওগো—

নীলমণি মুখো ঘরে চুকাইয়া বলিলেন—কি হয়েছে—সংসা  
সংসা সব দিকি—আমি কি সব বাতাসটা বড় করে গাড়ি ?

দলকরা তাহার সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেদীর অর্থের মধ্যে  
উপস্থিত তুলিয়া গিয়া জীবনের কাহিনী উঠিল—ওগো, কি  
হোল মেয়ে এমন করতে কেন ?



ওগা আর চাফি না।

লাফাশের নগ্ন আশ্রয়স্থল করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের  
যে চাতুর্মানি আছে—পৃথিবীর বুক থেকে ছোঁয়েমেয়েযা  
চকল হঠাৎ ছুটায়; দিয়া অনন্তনীলময় মগ্না জুহিমা নিভেদের  
জাবাতি ফেলে—অনন্তকোটা নতুন জগতের মধ্যে কোন  
পদটান পথে—ওগার অন্তর, চকল প্রাণের খেলায় জীবনের  
সেই সফলপঙ্কা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।  
তখন আবার রাহুলটো ডাকাতকে ডাকা হইল—বলিলেন—  
মাগেলিয়ার শেষ ট্রেজিটি আর কি—পূব দ্বারের পর যেমন  
বিদ্যায় হয়েচে আর অমনি হাটফেল ক'রে—টিক এ বকম  
একটা *game* ক'রে গেল সেদিন মলমলার—

আমকটার মধ্যে পাড়ার শোভে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

১০

হরিদর বাড়ীর চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ী হইতে বাড়ির হইয়া হরিদর বার প্রথমে  
গোবাতী ভুলসবার বার। কাহারও সঙ্গে তথায় ভাঙার  
পরিচয় ছিল না। সহর বাজার আংগা, একটা না একটা  
কিছু উপায় হইবে এই অজানার স্রোত পড়িয়াই সে  
সেখানে গিয়াছিল। গোবাতীতে কিছুদিন থাকিবার পর  
সে সন্ধান পাটন যে, সহরের উকিল কি জমিদার বাড়ীতে  
তৈনিক বা মাসিক চুক্তি ভিনাবে চতুষ্পাঠী করার কার্য  
সারাই হুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো  
কাটাওয়া বাড়ী হইতে পথঘরট বন্ধিয়া ফলসামান্য বাজা  
কিছু আনিয়াছিল ফুকাইয়া কেগিল, অগত কোথাও কিছু  
জাবা হইল না। সে পড়িল মগাবিপথে—অপরিচিত স্থান,  
কেও একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই—মোড়ে  
ঝাঝের বে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুকাইয়া গেল  
সেখানে হইতে বাড়ির হইতে হইল। একজনের নিকট  
তনিল স্থানীয় হরিদর। নবায়ত অস্তাবস্ত্রত ব্রাহ্মণ  
পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও বাইতে বেড়া কর।  
অস্তাব জানাইয়া হরিদরার একটা সুহৃদ্রির এক পাশে  
সে থাকিবার স্থান পাইল ঘটে, কিন্তু সেখানে বড়  
অগ্রবিদ্যা, কারণ অনেক ভুলি নিকটীয় গাঝাঘেবে লোক  
স্বাক্ষিতে সেখানে আত্মা করে, আর দস্তর রানি চৈ চৈ

করিয়া কাটায়া, এমনকি দস্তর স্বাক্ষিতে এক-একদিন  
এমন দরপের স্ক্রোলকের স্বাক্ষরাত দেখা বাইতে লাগিল  
ঝাঝের ঠিক হরিদরনিবদর্শনগাথিনী তদ্রূপকণা  
বলিয়া মনে হয় না। অতিকটে দিন কাটাওয়া সে  
সহরের বড় বড় উকিল ও দলী পৃথক্কার বাড়ীতে গুহিতে  
লাগিল। সাতদিন গুহিয়া অনেক স্বাক্ষিতে দিবিয়া  
এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিজ্ঞানাটি  
টানিয়া লইয়া তে একজন অজ্ঞাতকুলশৈল স্বাক্ষি নাক  
ডাকিয়াইয়া গুমাটিকে। হরিদর কতকদিন বাহিরের  
ঝাঝার গুহিয়া কাটাইল। প্রায়ই একপ ঠগস্বাক্ষিতে  
টকা লইয়া খাঝাখোর সম্ভাব্যের দ্বিতীয় তাহার একটু  
বন্দা হইল। পরদিন প্রাতে তাহার্য হরিদর  
সেক্রেটারীর কাছে দিগাফি লাগাইল তাহারই জানে—  
সেক্রেটারী বাহু নিক বাড়ীতে হরিদরকে ডাকিয়া  
পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাহারের হরিদরার তিনদিনের  
বেশী থাকিবার নিয়ম নাই, সে বেন অগ্রত বাইস্থান  
দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে তিনিশব্দ লইয়া হরিদরকে হরিদর  
বাড়ী হইতে বাড়ির হইতে হইল। মোড়ে নদীর পারে  
অম একটু নিশ্চিন স্থানে পুঁচুটিটা নোয়াইয়া রাখিয়া  
নদীর তলে চাতনু হইল। সাতদিন কিছু খাওয়া কর  
নাই—সেদিন একটা কাঠের গোলাতে বন্ধিয়া ভ্রামাবিষ  
গান করিয়াছিল—গোলায় অবিকারী একটি টাকা  
প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া  
বাজার হইতে মুক্তি ও নই কিনিয়া আনিল। বাবার পণা  
দিয়া বেন নামে না—সাত দিন ঘণেকের সফল রাখিয়া  
সে বাড়ী হইতে বাড়ির হইয়াছে। অগ্র প্রায় একমাসের  
উপর হইয়া গেল—এপর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে  
নাই—এতদিন কি করিয়া তাহারের চলিতেছে! অসু  
বাড়ী হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—  
তাহার অগ্র একখানা পত্রপুস্তক কিনিয়া লইয়া বাইবার  
লক্ষ্য। সে বই পড়িতে বড় ভাল বাসে—বাড়ীর সামান্য  
মহাতার সব পড়িয়া দেখ করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে  
মাঝে যেনে যে তাহার বাক্য দস্তর গুহিয়া সুকাইয়া বই

বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে—  
বাহ্যের ভিতর আনাদি হাতের কোলাপোড়া কথা থাকে  
—কোন্ বই বাপ বাহ্যের কোণার রাখে, ছেলে  
তাহা জানে না—উট্টাপালটা করিয়া পাঠাইয়া ছুরি  
ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাঁকী ফিরিয়া  
বাহু বুজিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কৌতুহি। তাহার বাঁকী  
হইতে আদিবার পূর্বে হরিহর নৃসিংহাড়া হইতে একখানা  
বটতলায় পত্র পত্রপূরণ পড়িবার ভক্ত লইয়া আসে—সে একটা  
পালা লিখিতেছিল, তাহাতে বইখানি একবার দেখিবার  
সম্বোধন ছিল। অণু বইখানা দেখণ করিয়া বলিল—তোম  
তোম পড়ে—কুচুনা পাড়ার শিবঠাকুরের মাক্ সরিতে বাগ্গার

\* কণাটা পড়িয়া তাহার তালী আমোদ—বইখানা সে ছাড়িতে  
চায় না। হরিহর বলে—বইখানা ছাও বাবা, যাদের  
বই তাহা চাড়ে যে? অকথ্যে একখানা পত্রপূরণ তাকাক  
কিনিয়া দিতে চাইবে—এই দরত বাবাকে রাজী করাইয়া  
ডবে, সে বই দেয়ৎ দেয়। আদিবার সময় বার বার  
বলিযাকে—সেই বই একখানা কেন। কিন্তু বাগ, এহার  
অবিকি অবিকি? চূর্ণার উচু নকর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে,  
একখানা মন্ত্ৰ হাওয়ার তাপক ও একপাতা ভাল বেখিয়া  
মালাতা লইয়া বাইবার ভক্ত। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা,  
কি করিয়া বাজীতে লংগার চলিছেতে সেই না এখন সমস্ত?

সন্ধ্যার পর পূর্ণপরিষ্কৃত কাঠের গোলটার গিয়া সে  
রাহের মত আশ্রয় লইল। ভাল ঘুম হইল না—বিছানার  
চট্টা বাজীতে কি করিয়া কিছু পাঠয়ে এই ভাবনার এশ  
ওশা করিতে লাগিল। লক্ষ্যে উঠিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে  
সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথের একখানে পড়িয়াছিল। রাস্তার  
ওশারে একটা লাল ইটের শোণার কটক-গুলা বাজী।  
খনকখন চাষিয়া তাহার কেনন মনে হইল এই বাজীতে  
পিয়া গুণে জুনাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের  
পুতুলের মত সে কটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। লক্ষ্যনো  
বৈঠকখানা, মার্কেল পাথরের ধাপের স্তরে স্তরে বসানো  
ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পানু, বরগার ঢুকিবার স্থানে  
পা-পোষ পাড়া। একজন প্রৌঢ় ভ্রমলোক বৈঠকখানার  
খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন—অপরিচিত লোক বেখিয়া

কাগজ পাশে রাখিয়া দোজা চট্টা বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,  
কে তুমি? কি দরকার? হরিহর বিনীতভাবে বলিল—  
আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠটাই  
করি—তা ছাড়া ভাগবত কি গীতা পাঠও—

প্রৌঢ় ভ্রমলোকটি ভাল করিয়া কথা না শুনিয়াই তাঁহার  
সময় অত্যন্ত বৃথাযান্, বাড়ে কথা শুনিবার সময় নিত্যন্ত  
সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন—না, এখানে ওদখ  
কিছু এখন সুবিধে হবে না, অস্ত্র ভাঙ্গগার দেখুন। হরিহর  
মরিয়া ভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন দরত এসেছি, একেবারে  
কিছু হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িছি, কদিন ধরে  
কেবলই—

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি আপন বিদ্যার করিবার  
ভঙ্গিতে টেস বেগুয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া  
লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই নিন্,  
বান্, অস্ত্র কিছু হবে টবে না, নিন্। সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই  
হটুক সেইটাই অস্ত্র হরে দিতে আসিলে হরিহর লইতে  
কিছুমাত্র আপত্তি করিত না—এক সে বস্ত্রতাম লইয়াছেও,  
কিন্তু চঠাৎ খেন ঘণ্টার বড় বেলাক-কলানো বড়িটার হুস্টে  
গম্ভীর টুক টুক শব্দ, ফরাসের বিঘ্ননাং চামড় মুড়িবার বিশেষ  
ভঙ্গিটি, ঘরের অনিচ্ছিত অপরিস্ফুট বহনের গদ্য সংস্কৃত  
মিলিয়া তাহার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর, অপ্রীতিকর  
প্রেক্ষণ। সে বিবীতভাবেই বলিল—আজ্ঞে ও আপনি  
গপুন, আমি এন্নি কাকর কাছে নিইন—আমি পাঠ  
পাঠ টাই করি—তা ছাড়া কাকর কাছে—আজ্ঞে পাক্—

একটু ভ্রমযোগ বোধ হয় ঘটিয়াছিল। বক্তিত মধ্যাহ্নের  
কাঠের গোলাতেই একদিন একটা লক্ষন ছুটিল। কল-  
নগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বন্ধিচ্ মহাজন গা-  
বেচাব পূজা পাঠ করিবার ভক্ত একজন ব্রাহ্মণ পুঁজিতেছে,  
যে বস্ত্রাবর টিকিটা থাকিবে। বক্তিত মধ্যাহ্নের যোগ্যযোগে  
অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাজীর কর্ত্তাও তাকাক  
পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর আগায়নের  
কোন ফটি হইল না।

কয়েকদিন কার্য্য করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল।  
বাজী বাইবার সময় বাজীর কর্ত্তা দণ্ডাটক প্রণাম। ও





হাতাঘাতের পাকীতারা দিনেই, গোরাডাঙাতে রক্তিত মধ্যাহ্নের নিমিত্ত বিবাহ লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা গ্রহণী পাওয়া গেল।

আকাশে বাতাসে পরম রোহিণী সন্ধ্যা, মীল নির্মল অকারণের দিকে চাহিলে মনে হইত উল্লাস আসে, বর্ষা-পেখের সময় সবুজ লতা পাতায়, পখিকের চরণ-তড়িতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেল পথের দুপাশে কণ কুলের কাড় পাকীর বেগে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই সে বাড়ীর কথা ভাবিতে লাগিল।

একদল শান্তিপুত্রের ব্যবসায়ী লোক পুষ্কার পূর্বে কাপড়ের পাট ক্রয় করিতে কলিকাতার গিয়াছিল, পাশ্চাত্য খেয়ার নৌকার উকিয়া কলরব করিতেছে—সর্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। বাগাঘাটের বাজারে সে ব্রী ও পুর-কলার জট কাপড় কিনিল। দুর্গা লাগশাড় কাপড় পরিতে ভালমুসে, তাহার কত বাড়িয়া একখানা ভাল কাপড়, ভাল দেহের আশ্রয় করে পাত। 'অপুর পশুপুষ্কার' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গুরুদ্বারীর টুকটাক ও একটা জিনিস, সর্বমুখ্য বলিয়া বিখ্যাত একটা কাটের চাকী বেগুনের কথা, তাহাও কিনিল।

ঘেষের ট্রেনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌছিল। পথে বড় একটা কাহারও সন্নিহিত দেখা হইল না, কেবা হইলেও সে চম্ চম্ করিয়া উত্তর-দিকের কাহারও দিকে দৃষ্টিতে লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—আ, জাখো কাণ্ডখানা! বাণ কাড়টা কুঁকে পড়তে একেবারে পাটীলের ওপর, তখন কাকা কাটাখেনও না—বুড়িল হয়েচে আচ্ছা—পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের স্বরে ডাকিল—ওমা! হুগুগা—ও অপুর—

তাহার সঙ্গার স্বর তিনিয়া সর্বমুখ্য বয় হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল,—বাড়ীর সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ী নেই বুঝি? সর্বমুখ্য শান্তভাবে

আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এগো—অরে এগো—ব্রী অষ্টপুংগ শান্তভাবে হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না—তাহার কলনার স্রোত তখন উচ্চায় বেগে অজমিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি তাকাতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও ক্রিনের রেলগাড়ীটা দেখাইয়া তাহাদের ডাক লাগাইয়া দিবে! সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠল কাটের চাকী বেগুন এনিচি এবার—পরে কিছু নিরাশামিস্রিত মৃত্যু নরমে চারিদিকে ডাফিয়া • বলিল, কৈ—অপুর হুগুগা এরা বুঝি সব বেগিরেচে—

সর্বমুখ্য আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল নী। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ছকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো হুগুগা কি আর আছে গো—হা যে আমাদের কার্যক দিলে চলি গিয়েচে গো—এতদিন কোথায় ছিলে!—

পাড়ুলী বাড়ীর পুষ্কার অনেক কালের। একদিন গ্রামের অতি দরিদ্রও অতুল থাকে না। সব কনেনি বকাবক, নির্দিষ্ট সময়ে কুমার আসিয়া প্রতিমা পড়ার, গোটো চালচিত্র করে, মাগাকর মাঝে খোপায়, বাহাগে-মধুখানির দ' হইতে বাউরিয়া রাশি রাশি পশুচুল তুলিয়া খানে।

অগম্যার গীত নামাইবার অন্ত অন্ত বংশের মত হুহু-তৌকী বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগম্যার আনন্দ হ্রস্ব বামিয়া ওঠে,—আগর হেমন্ত রত্নের ঘেহ অত্যর্থ্য,—নব হস্তগুহের, নব আগম্যক শ্বেতালি দলের, হিমালয়ের পার হইতে উকিয়া-মাগা পখিক-পাখী শ্রমায়, শিশির-মিত্ত সুগল-কোটা হেমন্তকায়ার।

নতুন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ বাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুল-খেচা • ছোট মুখের সর্নির্ভঙ্ক গোপন অমুরোহে দুহায়ের পাশের

বাড়াসে মিশাইয়া থাকে—হঠাৎ পথে না দিয়া কেমন অজ্ঞানত্ব হইয়া পড়ে—হেলেনকে বলে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, অনেক বেলা হ'বে গিয়েচে বাবা—

গাঙ্গুলী বাড়ীর গ্রাম্য উৎসববেশে সজ্জিত হাসিবুধ ছেলে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অণু চাটাই চাটাই খেলি লতু ও তাহার ভাই কেমন করলানেবুং এর জামা গায়ে দিরাছে—সবুজ লাড়ী পরিয়া ও দিবা চুল বাঁধিয়া রাহ-নিবিকের বা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ে সুনন্দনী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল ভাঁজিয়া আর পাচ ছোট ঘেঁরের

সঙ্গে পুজার দালানে গাড়াইয়া খুব গর করিতেছে ও হালিতেছে। সুনন্দনী বাবে বাকী মেয়েদের সে চেনে না, বোধ হয় অল্প জাহাঙ্গা হইতে উঠাদের বাড়ী পুজার সময় আসিয়া থাকিবে—সন্দেরের মেয়ে বোধ হয়, যেমন লাক গোড়, তেমনি বেখিতে! অণু একদুট তাহারের দিকে চাটাইয়া রছিল। ওমিকে কে চৈচাইয়া বলিতেছে—বড় দামিহানাটা! জাম্‌বার ব্যবস্থা এখনও হোল না? বাঃ—তোমাদের যা কাজকর্ম, দেখো এখন এর পর মকাতী!

## গরবিনী গেরো-বালা

ঐন্দ্রিলমা রায়

কে চলে পুজুর-বাটে কাঁখে কলসী,  
কল নিতে যার হুকি গেরো রূপসী!  
বাঝিছে কাঁকন করে, গায়ে বাজে মল,  
উড়িছে উদাল বায়ে শিখিল অঁচল!  
উরসে হুলিছে হাথ, কানে ঘোলে চল,  
গুণন-আবেগ-মাথা আঁধি ঢুলুঢুলু!  
ভ্রামল-নীরব-নীল বগন-মেলে—  
গেরো-বালা! কোথা হতে নামিয়া এলে!  
এলে কি লখন বন-পথ চলিয়া,  
শিত্তী-ব-বেতালি-বল গায়ে দলিয়া।  
হুটী তীর আঁধি তুলি কী তাবা কহ!  
নিখিলের মুখা-খানি লম্বয়ে বহ!  
লাগিল গায়ে কি বাখা পথ চলিতে?  
চলল নখনে চাঁহ করে ছলিতে?

ছায়া-কাণো বন-পথ আলো করিয়া,  
গরবিনী গেরো-বালা যায় চলিয়া!  
দাড়িমের হুঁড়ি করে মুক্ত-কেঁবে—  
হাতে তুলি' ফেলে দেহ মদুব মেলে!  
জোষ্টি-ভারে গতি তার শিখিল ভাঙ্গী,\*  
কল চলকিয়া ভেছে নীল পাজী!  
বন-পথ বাড়ি' চলে বনের রাগী!  
বেতাল-অঁকড় দরে অঁচল টানি!  
লেখা কোঁপে কোঁপে 'ওরা' বেতালের কল,  
দরমে লাঞ্ছ কেহে আঁধি ছলছল!  
কাছে এসে 'একজন' চাঁহি' মুখ 'পর,  
নীলবে ছাড়ারে বের বেতাল-অঁকড়!  
মুখখানি রাঙা করি' চলে সে বীরে,—  
অঁভমানী গেরো-বালা চাহে না দিরে!

## জলধর সেন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রশেখক জলধর বাবুর বয়স সত্তর পার হ'ল। শিচ্-ময়ুকের প্রাবল্যে যে জাতি জ্বালালের পথে এগিয়ে চলেচে, আর বাদেও পড়শরতা আত্মর পরিমাণ আটপাল বন্ধরে গাড়িগেচে, তাদের পক্ষে ভেবলমাত্র দীর্ঘকাল বেঁচে থাকটাই একটা আশ্চর্যের কারণ। আবার জলধর বাবু যে তপু বেঁচেই আছেন তাই নয়, জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি কিছু সম্পদও দিয়েছেন। স্মরণ্য তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা তাঁকে স্মরণ করি এবং তগবানের নিকট তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আমাদের সাহিত্যকে তিনি খেঁচু সমৃদ্ধ করেছেন তার কয়েক চুস্তা হওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি সাহিত্যের সেবা করেছেন, এ কথা বললে বোধ হয় অতুক্তি হবে না। এর থেকে এই প্রশ্নও হয় যে, সাহিত্যের প্রতি তাঁর দরজা আন্তরিক এবং আত্মরিক। এই অভাব অভিযোগের ঘূঁনি গোষা প্রতিপালনের গুরুভার নিয়ে তিনি সাহিত্যের ভারত্ব না চ'য়ে যদি কোন গুরুদায়িত্ব আগলেহে ভারত্ব চর্চেন তবে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থাটা প্রচণ্ড হ'তে পারত—উপহৃত বৃত্ত বারো কিছু প্রতিভেট কত আর gratuitly নিয়ে কামিলাস করতেও পারতেন। তা' না ক'রে তিনি বে-বেবীর লগ্ন নিয়েছেন লক্ষ্যর লুকে তাঁর চিরবিবাহ। দেবী বাণীর দীন সেবকের নিঃসর্গভিত্তার স্ত্রীরা দশটিটুকু বিতে আমরা যেন অপারক না হই।

জলধর বাবুর বইএর সমগ্র তালিকা আমি সংগ্রহ করতে পারি নি—আমাদের দোয়টো এই বীণা লাইব্রেরীতে তাঁর ৩০ খানি বই আছে। আমার বিবাল তাঁর বইএর লগ্না আয়ো বেশী। আমি বতবুহ সেখেনি তাতে জলধর বাবুর বই গুলিকে সিন শ্রেণীতে তাপ করা যেতে পারে—সম্প্রকাশিনী, উপজ্ঞান ও চরিতকথা।

জলধর বাবুর তিতর একজন স্থপ্ত ভবঘুরে বাস করে। সে মাথা নাড়া দিয়ে কেপে উঠলেই জলধর বাবুকে বিজ্ঞানাপত্র বেঁধে বেকতে হয়। ১৮৯০ সালে অর্ধাৎ আত্মকের থেকে ৩৯ বছর আগে তিনি একবার পুং লগ্না পাড়ি দিয়েছিলেন। ফিলাব মত তখন তাঁর বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে। লগ্নায়ের একটা প্রচণ্ড খাজা খেয়ে তিনি ফিলাবের বৃকের মধ্যে জড়ুতে এসেছিলেন। সেই ফিলাবের ভ্রমণের রোজনাম্ভা সংগ্রহ ক'রে স্থানচিহ্নিতক দীনেন্দ্র কুমার রায় "ভারতী" পত্রিকায় ছাপিয়ে যেন। পরে এর থেকে "ফিলাব" নাম দিয়ে জলধর বাবুর প্রসিদ্ধ বই ১৯০০ সালে ছাপা হয়। ফলের বালকবালিকাধের উপযোগী ক'রে 'ফিলাব' নাম দিয়ে 'ফিলাবের' একটা শিচ্-সংস্করণ ছাপা হয়েছে।..

'ফিলাব' বেকনোর পর জলধর বাবুর পুং স্থানচিহ্ন হয়। এতদিনকার অল্পকৃত একটা মতাব বৃত্ত হওয়াই তাঁর প্রশম এবং প্রশ্রাণ কারণ হ'লে আমার ধারণা। ভ্রমণ-কাহিনী আমাধের সাহিত্যে বেশী নেই—অভাব এবং বভাবের দোষে আমরা কতকটা ফুণে প্রকৃতির। স্মরণ্য ঝায়া কোনদিন বদরিকাজেয় লগ্নরীর উপস্থিত হ'তে পারবেন না। জলধর বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্ত শ'ড়ে তাঁয়ের ভ্রমণজ্ঞ আখা তৃপ্ত হয়। বিশেষতঃ হিন্দুত্ব তাঁরখানার বিবরণ কোন দিনই এ জাতির নিকট অন্যায়বী নয়। জলধরবাবু আবার সপ্রজ্ঞভাবে এই তাঁরখর্পন করতে বেরিয়েছিলেন এবং স্থানগুলির সূক্ষ্ম বর্ণনাই দিয়েছেন। কথায় কথায় ভ্রমণকাহিনী লিপ্তে পারার দক্ষতা তাঁর আছে এ কথাও বীকার্য। আর আত্মকের থেকে চম্পিৎ কলসর আগে তিনি বখুন তাঁরখাজা করেছিলেন তখন পথখাট এতটা স্থগম এবং নিরাপদ ছিল না।

জলধর বাবুর তিতরকার ভবঘুরে যে এখনো তেজবানে মরে নি তার প্রশ্রাণ তিনি এই বৃত্ত বহলে এবং অশটু শরীর

নিরে মৃত্যুর শীতের সময় সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিতে পদপ্রান্তে সেট মেয়েটিকে দেখে তিনি আশ্চর্য মীথলা-জীবনে মীথলাটি এগেছিলেন এবং মৃত্যুপতিষ করতে ইনোর গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে টাওয়ারাই দুব্ব চাহাং মাইলের কাছাকাছি।

উপভোগ, ছোট খর এবং বড় গল্প জগদ্বন্দ্বের অনেক লিখেছেন। এখন পণ্ডিত তাঁর কলম নামে নি। ছোট বড় সব মানিকের পুঁজিতেই তাঁর গল্প বা গল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে জগদ্বন্দ্বের বড়র বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁর লেখার gigantic intellect এর পরিচয় নাই থাকুক, gigantic heart এর পরিচয় আছে। বাংলা দেশের চণ্ডি নাট্যশ্রী, রোগ শোক, সমাজের পীড়ন তাঁর বুকের মধ্যে গিরে তাঁর মত বেধে। তাতে কাতর হ'লে তিনি কাঁপতে থাকেন, হুতরাং তাঁর পট্টকবর্ণকেও কাঁপতে পারেন। সমাজের একটা ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিশেষ ক'রে আঘাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটি এই যে, যদি কোন অল্পবয়সী বিধবা কোন অসতর্ক মুহুর্তে হঠাৎ বয়সে বেয়ে, আলো, অথচ প্রকৃত পাপ না করে, তবু সমাজ তাকে জাগ্রত করবে কেন? 'বিভবান' উপন্যাসের ভিতর দিয়ে তিনি এইট প্রমাণ

### আশ্চর্য

রায় জগদ্বন্দ্বের বাহ্যিক মতোদ্বয়ের সত্ত্বাভ্যন্তর জন্মোৎসব উপলক্ষে মীথলা-প্রবাসী বাঙ্গালীগণের আকর্ষণ।

"তবে বঙ্গভাগ্যজননী একনিষ্ঠ সাধক।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে মীথলা দেবী বাণীর উত্তরে পূর্ণাঙ্গলি দিতে ছিলেন তাঁহার অধিকাংশ সাধকগণই ইচ্ছাগত হইতে চিরদিনের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মীথলা অবশিষ্ট আছেন ভূমি তাঁহারিগণের অগ্রতম। যিনি তোমাকে এই হৃদয় কাল বীণা-পাণির সেবার নিরন্তর রাখিয়াছেন সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রার নিকট ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে আমরা তোমার হৃদয় জীবন কামনা করি।

"হে মাতৃভাবার সেবক! প্রকৃত সাধক যখন নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া অপরকে তাঁহার সাধন পথের পথিক করিয়া লয়েন এবং দেহে ও মনের কল্যাণ সাধন করেন, ভূমিও তেমনি নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া অপরকে সেই পথের পথিক করিয়া লইয়া এবং লইতেছি। তোমার চন্দ্র-বাসরের এই বাসন্তী সন্ধ্যায় আমরা আজ এই কথাটি বলি,

'তোমারে যে ভালবাসি সে তোমারি গুণে'

মীথলা হৃদয়ভাষী }  
০১/০২/২৩ } মীনচন্দ্রসেন রায় (মীথলা-বিনোদ) কর্তৃক পট্রিত

কথাসাহিত্য করেছেন। তাঁর বলবার কথাটা যোগ কর এই যে, সমাজ যদি সমস্ত পুঁজি নাটিকে তখন সমস্ত সমাজভাবে এট সমস্ত ব্যাপারের বিচার করেন, এবং কাকর পা বাহা-পা থেকে খনিজ করে কেবলমান এইটুকু তখনই যদি নাক না সেটকান তা হ'লে অনেক কিশোর-জীবন শুধু যে মকালেই হ'লে পড়া থেকে দক্ষা পায় তাই নয়, একটা ছাড়া থাকার ফলে তাহের পরবর্তী জীবন মৌল্যে হ'লে উঠতে পারে। 'বিশ্ববাস'র ভিতর দিয়ে কথাটা বলে তিনি তখন হতে পারেন নি—আখ্যায় 'মদ্যাসী'র ভূমিকা বলাচ্ছেন। "ইতিপূর্বে বিগ্ণাবা পুত্রকে একটা কথা বলিতে চাচ্ছিলেন; আমার মক্ষমতাবসত: কথাটা যেমন করিয়া বলিলে হইত, তাহা বলা হয় নাই, তাই পুনরাব চেষ্টা করিলাম; কিন্তু এখানেও কথাটা ঠিকমত বলা হইল কিনা, বুঝিতে পারিতেছি না। "কথাটা ই এবং হৃদয়ান পুত্রকেই সেটা ভাল ভাবে দেখান হইতে। আমাদের সমাজ এখনো এ বিষয়ে উদারতার পরিচয় দেন নি—যদি কোন দিন যেন তা' হলে জগদ্বন্দ্ব বাবুর অল্পশ্রুত

করেছেন—এমন কি একেবারে নিরর্থক হইবে না।



জলধর বাবুর দয়্য বা উপজ্ঞানের মধ্যে আর একটি বস্তু  
চোখে পড়ে—সমাজের পুরাণো রীতি নীতির প্রতি তাঁর  
প্রতি। প্রতিতে গোয়াল, বাকী ইত্যাদি হ'লেও বাড়ীর  
পুরাণো চাকর ছেলেদের "দাদা"—তাদের উপর সে-দাদার  
অংশ আধিপত্য। সন্নিব বাড়ীর ছেলে মেয়েই সে-দাদার  
ছেলে মেয়ে—তার আর পুত্র লংগার নেই বরষেই ৪২।  
এই বস্তুটি বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য  
বিশেষত্ব, অধুনা বিশেষ শতাব্দীর সমাজের চাপে লোপ পেরে  
বসেছে। সুতরাং কলা-সাহিত্যের চিত্রে এর সন্ধান পাওয়া-  
টাকে অনেকের চরিত্র residue of a barbaric trait বলে  
মনে করতেন, কিন্তু আমরা কাছে বড় refreshing বলে  
মনে করি।

তাপস চরিত্রতার জলধর বাবুর কথা। তিনি "কাল  
চরিত্র"েব জীবনচক্র সাধারণো প্রকাশ ক'রে একটি  
মস্ত কাম করেছেন। তিনি এই সাধুপুরুষের ছাত্র, শিষ্য  
এবং পাল বলে নিজেও প্রতিষ্ঠিত করেন। জলধর বাবু  
না জানালে আমরা তাঁর কথা কিছুটা জানতে পেরতাম না।  
কাল চরিত্র মানে ৪২৬ বীর বেলাবি বর্ণনায় অধিকার নেই।  
কাল চরিত্র সবচেয়ে জলধর বাবুর নিজের কথা এখানে  
উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—“উনিবিশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বেতে যে  
সকল কঠোর, মূল্যবোধের চেষ্টা, বর ও অসংলগ্নের ফলে  
বাক্য সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল কাল চরিত্রের উত্তীর্ণ-  
মিথের অন্ততম, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।  
যখন সাহিত্য-সম্রাট বহিঃলোকের প্রথম পুত্রক পূর্ণদর্শনবিনী  
প্রকাশিত হয় নাই, তখন কাল চরিত্রের 'বিজয়-বসন্ত'  
প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সে সময় শত শত নয়নারী সেই  
'বিজয়-বসন্ত' পাঠ করিয়া অজ্ঞানতা করিয়াছিল। কাল  
চরিত্রের 'বিজয়-বসন্ত' পুস্তকে যে ভাবের সৌন্দর্য্য, ভাবের  
মাধুর্য্য ছিল, তাহা এখনও অনেক সাহিত্যরসীর অক্ষরশীল।  
কিন্তু বড়ই প্রচণ্ডের বিষয়, সেই বাক্য সাহিত্যের উন্নতি-  
করে উৎসাহিত জীবন কাল চরিত্রের কথা,—ঐশ্বর্য

সাহিত্য-সাধনার কথা—ঐশ্বর্য একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবার  
কথা—ঐশ্বর্য পবিত্র প্রতিকল্প জীবনের কথা—ঐশ্বর্য  
আধ্যাত্মিকতার কথা—ঐশ্বর্য অতুলনীয় বাউল পানের  
কথা—ঐশ্বর্য অপরিসেব জ্ঞানভার 'প্রজ্ঞা-বোধের' কথা  
—ঐশ্বর্য সাংবাদিক সম্পাদকের কথা ;—সকল কথাই  
বাক্যশীল ছিল। বাক্য সাহিত্য সাহিত্য সেবকপন ভূমিকা  
নির্ভাঙ্কলেন। বাক্য সাহিত্যের ইতিহাসে, বাক্য  
সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচনা করুন কোনদিন কাল  
চরিত্রের নাম তখন করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। পর্মা-  
বাসী, জীব কুটীরবাসী, শতপ্রস্থিষ্ঠ মলিনবেশধারী কাল  
চরিত্রের জীবনযাপন সাধনার সংবাদ কেউ গ্রহণ করেন  
নাই। কাল চরিত্র কালের গর্বে অগ্রগত করিয়া-  
ছিলেন, কালভাবেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। কোন-  
দিন তিনি ঘন মান ঘনের পশ্চাতে গাথিত ঘন নাই; তাই  
এই অর্ধদশক ধনগলিত যুগে কেহ কালের বোঝ  
লইলেন না।” কাল চরিত্রের পানের একটি গাউল  
জলধর বাবু জীবনে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। “সে  
গাউলটি হচ্ছে এম, 'বোঝ সোঝা, লে সোঝা’। কালের  
এই রকম অজ্ঞান বাউল পান আছে তার 'মতো একটি  
আমি অনেককে গাইতে শুনেছি, কিন্তু তাঁরা লজ্জা মানেন  
না যে ঐ পানটির রচয়িতা কে। পানটি হচ্ছে এটি,  
“যদি ডাকার মত পরিচয় ডাকতে।

তবে কি মা! এমন ক'রে তুমি  
লুফিয়ে থাকতে পারতে।” ইত্যাদি  
জলধর বাবু একদিন এই কালের যে শিষ্য গ্রহণ  
করেছিলেন তা একবারে বুঝা হইল বলেই আমার  
বিষয়। আর তিনি প্রৌঢ়ের প্রান্তরীমার উত্তীর্ণ, তাঁর  
লক্ষী এবং সন্তানের আর বড় কেউ কেউ বৈধ নেই—  
এক তিনি আছেন, আর সবুধে আছেন কাল চরিত্র।  
এই কালই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছে যাবেন।  
ও ব্যক্তি:

সত্যতম জীবন উপলক্ষ বীরট  
বীর সাহিত্য পবিত্র লজ্জা পট্ট।

## প্রথম পর্ক

—নন্দা—

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

“মাতারি বে! কি মনে করে? আস্তে আস্তে  
চেনি, আস্তে আস্তে হোন, পাতেলেহাম। দেখ একটু  
পায়ের খেলা দিন দেবতা।” বলিয়াই মাধুরেন উবু হইয়া  
ঘমাই ঠাকুরের চরণগুলি লইয়া ভিলাহ লেহন করিয়া  
হাতখানা বলাক্রেম বন্ধ, কর্ত ও মস্তকের উপর দিয়া ঘুরাইয়া  
লটল।

দেবতা উত্তর করিলেন, “বাক্, বাক্, চোখে চোখে—  
কোষা, ভক্তময়।”

মাধুরেন সবুখ কুর টুলখানি বন্ধহিত গামভার ধরা  
কাড়িয়া পুঁজিয়া একটুখানি আগাইয়া দিয়া বলিল,—“বন্দন  
দেবতা, বন্দন।”

দেবতা বলিল মাধুরেন অগ্রবৃত্তক দৃষ্টিতে তাহার দিকে  
চাহিল। দেবতা বুকি বা বিম্বন হটল; কিংব তিক্ত  
কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল,—“আরে বলছি, বলছি, অত  
বাক্ত করিম কেন? বামুন ভোর দোকানে পায়েত খেলা  
দিলে—একটু খোঁয়া মুখ করা, তবে না অত কথা। কাজ  
তো একটা আছেই রে, নইলে ঘমাই ঠাকুর কি ভেমনি  
শমা যে শু শু পায়েত খেলা দিতে এসেছে।”

মাধুরেন ব্যস্ত হইয়া অতি তৎপরতার সহিত তামাক  
সাজিয়া দিল। ঘমাই ঠাকুর তখন নিব্বিঠ মনে চকু দুইয়া  
দৃশ্যপান করিতে লাগিল; সাধুও প্রসাদের নিমিত্ত ঠাকুরের  
বুনের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বহুকণ  
উদ্ভবী হইয়া থাকিয়া বন্দন বৃষ্টিতে যে, কণিকাময় প্রসাদের  
মালাও নিভাত হুয়াশা, তখন কুর হইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস  
চাপিয়া লইল। মাধুরেনের দেব জেমে তিক্ত অজ্ঞাত  
নিব্বিঠ ও গভীর হইলেও পুণ্যোক্ত প্রসাদের অতি তাহার  
আগতিক কিছুমাত্র কম ছিল না।

ঘমাই ঠাকুর নীরবে বহুকণ দৃশ্যপান করিবার পর তড়ি-  
বাবা ভঁকটির মস্তকোশরি চইতে কলিচাটি নামাইয়া  
বলিল,—“আর কি দেখাচ্ছে তোমের তিক্ত টিক্ত আছে  
যে দেহো! বলি বামুনের হুঁফো দিক করা কি ভাল  
বদলানো,—এটা বুকি আব আনিভক্ত মনে করিম নি,  
না? ভঁকো কোথায় ‘পুড়ো পুড়ো’ ভাক্ ভাক্বে, তা  
নরকো ‘লিলে’ ভাক্বেই দম বক!”

সময়মত প্রসাদের অভাবে সাধুর মনে কোমের সকার  
হইলেও সে আপনাকে সামলাইয়া লটয়া কহিল,—“নিভাই  
তো ওনাকে ভাল দেখা, দিক্বেড়ক করাই!”

“আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ করিম, এখন নে, নে, একটু  
‘শেলাব!’ পা।” বলিয়া ঘমাই ঠাকুর কলিচাটি আগাইয়া  
দিল।

সাধু কিঞ্চ চটিয়া উঠিল,—“রাখ ঠাকুর, তোমাব  
‘শেলাব!’ এতই যদি দেখিলেন তবে আরও বাদ ওতে  
কিছু থাকেন তবে তাও দেখোন। ওতে শু আপ কিছু  
আছেন ঠাকুর?”

ঠাকুর কিছু এ তিরবাবে রাগিল না। এতকণ  
ধরিয়া ঠাকুরটু দেবন করিয়া মেলাজটা হাওর প্রদর  
হইয়াছে। সে হাসিয়াই বলিল,—“না বহ আর এক  
‘ছিপুম’ জেলেই সাধ না দেখো! অত গরম তোম কেন  
বাপু? আমি বামুন মাগু, সারা সতাল বনো কাজে খুব  
ভুগে আচ্ছা হুঁফে ভোর দোকানে এসে বঁচে না ও  
এক ‘ছিপুম’ একাই শেলুম! তা’তে আপ এমন কি চোখে  
বাপু!”

সাধু আপনাকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বলিল,  
“না, তা’ আর কি চোখেছেন দেবতা! তা’ কিলির ওরে  
‘ভোর বিধান’তক এত খুশে, তা’ তো কই প্রেকাশ  
করলে নি।”



“আরে কাক কি আর একটা রে সেখো? মনে করছি কি জানি—একটা গাভীর দল খুঁজি। ভোক্তাবাদ ছুটিতে গাভী এসে, সেদিন কি এক কুটেই বিয়েটার না মিথ্যেচার করেছে, বামাকু দেখে না? গাভীর আর সীমে সংখ্যা নেই। সামটাকে যেন চ’য়ে ফেলছে আর কি? যেন কি না কিট একটা করেছে! আরে, যেহেতুই তোর বিয়েটার! ওতো যেলেই করতে পারবে রে। বাবেব ‘গান-শক্তি’ নেই বুঝি কিনা সেখো, তারাই করে বিয়েটার; গান আর গাঠিতে চর না, কেবল বক্তিতে ক’রেই বাস।”

সাধু কহিল,—“না, ওতাও তো ‘গায়ান’ করেন দেবতা!”

এদিক ঠাকুর, হোঃ হোঃ করিয়া উঠ হাত করিয়া উঠিল, “কুঃ! কি যে বলিস্ সেখো! অকল্যাণ আর হাস্য নি বাসু! ওকি আবার একটা গান? ওতো যেরে মাতৃবর নাকি কাগ। গান বলি হাতাত গানকে।”

সাধু ভূমি উত্তর হইয়া উঠিল,—“তা ঠিক ‘নিখান’ কথা কইছেন দেবতা! ‘ভক্তা’ গানির তুলি কি আর ‘গায়ান’ আছে? তা’ আপনি যদি একটা দল বাধুতি পার ‘ভর’ তো ভাট্টই হয়।”

“তাই তো ‘এত ‘মেহনত’ ক’রে তোর কাছে আসা রে। নটলে ‘বল্লভায়’ বিনা কাজে ‘শাসনকং ন গচ্ছামি’—তা তো জানিস।”

“তা’ আমার কাছে কানে দেবতা! আমি আর কি কতটি পারি?”

“পারিস্ রে, বাসু পারিস্। নটলে কি আর রমাই ঠাকুর তোর কাছে এসেছেন। তোর ‘বাকলা’ খানা আছে তো, আর আমার সুপ্তি-তলা! তা’ তো জানিসই। ও ওতেই চলে বা’বে একরকম! আর তোর ঘোঁকানে রজা আর বটে ব’লে যে ছেলে চটো কাজ করে না? মনে করছি ওদিকে কোরসো রাম, লক্ষণ? মম হ’বে কি?”

“আম, নকোণ মক হবেন কানে দেবতা, এতিবারে দিবা বাসা হবেন।”

দেবতা কিন্তু চট্টা উঠিল,—“ত, বাসা হবেন, না ছাই হবেন। কেন মেলা দ্যাচ দ্যাচ করিস্ বলতো?”

আর তা’ না ওর হ’লই, কিন্তু ‘মো’ত’ হবে কে তাই তনি? না ওবে চিত্রই অমনি অমনি বা’ তা’ বলিস্ ওই তোর এক দোষ! এ আমি চিত্রকালই দেখে আসছি।”

সাধু হাত ছোড় করিয়া কহিল,—“বৌদি! করেন কানে কতী, সে তখন একটা দেখে গুনে নিলেই হবি।” তারপর একটু ভাবিয়া সাধু পুনরায় বলিল,—“কানে ওই বাগাকর-দেয় ভক্তকে নিলিই হয়। দেখেছেন তো ‘চারণা’ খানা! আর কিবে গলা? পোনেন নি বুঝি তা’র ‘গায়ান’?”

রমাই এইবার অভিনয় পুণী হইয়া উঠিল। বলিল, “এতক্ষণ পরে একটা কথা মত কথা বলেছিস্ সেখো, মাকে মাকে তোর মগজটা বেশ একটু খেলে!—এ আমি চিত্রকালই দেখে আসছি কি না, তাই না তোকে মত ভালবাসি, নইলে রমাই ঠাকুর সে চিত্র নই যে আমি অমনি—তা’ বেশ বলেছিস্ সেখো, ও তুমাই ঠিক হ’বে।”

সাধু আশ-প্রশংসা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গল হইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—“আবণ আবা সাধু যেন ক’র গাউরি।”

“আরে আবণ সাক্ষা তোদের বা’ ঠাকুরই সামবেন, সেজন্তে তাবিস্ নি সেখো! আর বা’কিছু শেলব ‘লশা’ তিন ভূড়িতে ঠিক ক’রে নেবে। তোর সে ছোঁকরা গুটো সেল কোথায়? রজা আর বটে?”

“তার্য-পেছেন কতী, ওপাড়ায় একটু ‘আমোদ’ করি। রজা বললে,—‘আম কাল করতি আর ভাল লাগছে নি ওল্লদামশাই, আক একটু আমোদ ক’রে আসি, একটু রেহাই দিতি হ’বি।’ ভাবহু ছেলে মাতৃব, রাতদিন শোনা শিটুনি! হাক একটু—”

“তা’ বেশ করেছিস্, মাকে মাঝে একটু আশুই ছুটি ছাটা দিতে হবে বৈ কি! তা’ কাল সকালে ওলে দব কথা ব’লে ঠিক বাখবি, বকবি?”

“ও ঠিক হ’বে দাবি, সে বিষয়ে কি শাকিগি করি?”

“বেশ! বেশ! সব তো এখন ঠিক হ’বে সেল। আব তাবনা কি বল? এখন নিতিনি হ’বে একটু দোষা সুখ কথা তো সেখো।”

সাদু তাম্বুলট একা করিবার লোকটির দিকে চপ্ত প্রদান করিল।

রমাই ঠাকুর নুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—“মারে ও ভাষাক রাখ রে লেখো। বড় তাম্বুলট না চর একটু লাকলি এতক্ষণ চোঁচামিতির পর কি আর ওই ‘হুস-মহর’ ভাল লাগে? তোর বাপু, ওই এক কেমন ঘোষ! এঁদি বস্তুে তোর একটুও নেই, এ আমি চিরকালই দেখে আসছি কি না! নতুবা হাতুখ তো আর তুই মন্য নোস।”

সাদু অগ্রসর হুখে উঠিয়া গজিকা প্রস্তুত করিতে এসব হইল। অপরূপ লদাখটি ঠিকমত প্রস্তুত হইলে সাদু, ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া, নিজেই ‘সেবা’ করিতে “আরম্ভ করিল দেখিয়া রমাই অধিসূত্রি হইয়া উঠিল, “এ তোম কি রকম আকল রে হতভাগা? প্রাণ—নারায়ণ হুখে থাকতে তাঁকে নিবেদন না করে তুই যে বড় নিজেই—”

সুদূর বলিতে পারিলেন না, রাগে গাঁভর কর্তব্যর বহু হইয়া গেল।

সাদু অগ্রসরিত না হইয়া বলিল,—“চটো কানে দেবতা, মাতৃভাটা একটু জলকে দিচ্ছি ভাল করে। সেবা করি আরাম শাখ—তাই না।”

“আরাম পাবে না তোর মাথা পাবে! এ চোট ভাষাক কিনা যে লজ্জা দিবি! প্রাকামির আর ভায়াগা পেলি না, তাই মারের কাছে মাসির স্রা কতে এসেছল! বলে—সুদূরের কাছে লুপ্ত দিবি! প্রাণেশের ‘আগবোল’ উচ্ছিন্ন করলি রে বনগর! এখন যে দেখি কলকেটা একটু এগিয়ে।” বলিয়াই রমাই ঠাকুর সাদুর হস্ত হইতে কলিকাটি একরকম টান মারিয়াই কাড়িয়া লইল।

সাদু অত্যন্ত বেলাহ হইলেও কোম সামলাইয়া লইল। এমন তাহাদ্বয়কে তো কতই করিতে চর, এখানেও করিল; কিন্তু চোট কলিকাস সাক্ষিয়া যে বহুটির নেণা সমাধা করিতে চর, তাহা সাদুর অত্যন্ত ‘আদরের’ জিনিষ, তাই ওদিকে রমাই ঠাকুরের বদনাকর্ষণে উহাও যেমন জ্বলিতে লাগিল, এদিকে সাদুর হৃৎকর তিতরও তেমনি পুড়িতে লাগিল।

ঠান সাদু তাহার সমস্ত মততা তুলিয়া গিয়া চোঁচাইয়া উঠিল,—“এগ দেবতা, আর টান্ট ওঁদি নি! ছাও, ডেব হইছে।” সাদু ঠাকুরের অভিযুগে চপ্ত প্রদানিত করিল।

রমাই নাক নুখ দিয়া একরূপ নুখ ভাষা করিয়া নুখ করিয়া কালিয়া হাঁচিয়া ঘাচা বলিল, তাহার ভাবার্থ চটতেছে—এখনও তাহার একটা টান ‘পাওনা’ আছে।

“পাওনা আছেন না আর কিছু! বাউন, তুমি ‘প্রাণন’ হাঁত ‘টান চুরি’ কর্তিছ! আবার বলে ‘টান’ পাওনা আছেন।”

বাগাশাটা হইতেছে এহ যে, সাদুর দোকানের পত্রিকা-পেবিমিরের মধ্যে একটা নিম্ন ছিল যে, কেহ কলিক প্রাণ হইলে কয়েকটি নির্দিষ্ট ‘টান’ টানিয়া অস্ত্রে চরে কলিকাটি ফিরাইয়া দিবে। ‘মৌখিক আকর্ষণ’ একটুও কেহ অধিক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সাদু বলিতে চাহ যে, রমাই ঠাকুর তাহার ব্যতিক্রম করিয়া একটা টানের ভাণ করিয়া তাহার মধ্যেই কয়েকটি অধিক ‘টান’ টানিয়া লইয়াছে। এ অপরাধ অব্যাকর্ষণ!

সাদু বলিল,—“দেবতা আছে, পাথের কল। দেও তেলক সেবা কর, তাই বলে টান চুরি!”

তুচ্ছিতে অধি যোগ্য হইল। রমাই ঠাকুর তল-ছেঁড়া ধরকের মত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—“বেটা চোঁচালাক, না! হুখে আসে তাই বলবি? আমি নাকি টান-চোর? ওঁরে হতভাগা, তোর বদন জম্বোই হর নি, তখন থেকে ‘ওনার’ আমি সেবা করছি! এই তোর মত, কম করেও, মনটা লোকের মাথার বত কেন আছে তত তারি এ স্পাত্ত সেবা করেছি, তা’ জানিস? কেউ কোনদিন বললে না যে, রমাই ঠাকুর ‘টান-চোর’! আর তুই হারামজানা তাই বলবি? তারি তো গাঁভা তোর! বলে মাখ পছন্দার নেণা! আকিওরে লিছনে আমার কত টাকা পরচ হর তা’ জানিস রে ছুঁচো! বলিয়াই কলিকাটি মগোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

“বর্ণ তো ঠাউরি! গালাগালি দিচ্ছ—দাও, কিছ ‘কোম্বিটা’ ফেলি কোন মাফেলে?”



রমাই ঠাকুর বাঁ করিয়া মাথুর পত্তবেশে এক ভীষণ  
চোপাখাত করিয়া বলিল,—“বেটা, তুই বাম্বুকে অসিল  
আকেল দেখতে? এত বড় ওর নাম কি তোর আশঙ্কা!  
বেটা পাতি, নজর, ছুঁচো! তোর বড় ভামাকে, তোর  
গোফানে, তোর ‘বাগ্‌লাতে’, ‘আমি লাখি মারি! তুই বেটা  
বে ওর নাম কি অতি ‘টং’ তা’ আমি চিরকালই জানি!”  
বলিয়াই রমাই ঠাকুর ফোপে গরু গরু করিতে করিতে তথা  
হঠাৎ নিজস্ব চইল।

খ

গ্রামাঠাকুরাণী রান্নায়ে পুস্কর খাটের দহা ডক করিয়া  
বাঁটা আদিয়া কক্ষিত কলসীটি বাগানে উপর স্থাপন করিয়া  
খাট মাঝিনী হঠাৎ চল নিজস্বন করিতে করিতে কলার  
ভুলিলেন,—“বলি ও পৈরভি, উরুনে এখনও যে বড় আভন  
দিলু’নি, তারপর আমার পাত পুকেবর পিতি তোরের হ’বে  
কান বলায় তা’ তুমি? বেলা এখনও ব’লে আছে, নয়?”

সৌরভী বারখায় গালে চাত দিয়া লুকেও যেমন বলিয়া-  
ছিল এখনও তেমনিই রহিল, কোনরূপ চাকলা প্রকাশ  
করিল না।

বস্তুর আর এক পর্কা চড়িয়া উঠিল,—“তবু এখনও চুপ  
ক’রে ব’লে থাকিলি? কানের মাথা কি একবারেই  
খেরেছিল?” না ‘সেরাফি’ হচ্ছে না।”

তখন সৌরভীর কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল না।  
—এইবার তরুর ‘দুধারা’ ছাড়িয়া একবারে ‘তারার’ ঠিকিল,—  
“উপোসের কেউ নয় শরপার গোলাই।” বলি ও নবাবের  
পরিবার! তোমরা না চর বর্ণের বিভাবর বিভাবরী!  
তোমাদের শেটে কিছু না মিলেও যেন চল, তা’ ব’লে আমি  
তো আর তা’ নই। আমি যে এট নরুলোকেরই জীব, তাই  
ক্ষিবে তেঁরাও আছে।”

সৌরভী অশ্রুচক্ষে বলিল,—“কে বলছে নেই।”

গ্রামাঠাকুরাণী যেন একেবারে কাটিয়া পড়িলেন,—“কটে!  
আবার চোপা হচ্ছে! সাত চক্ষে ‘রা’ ছিল না এখন আবার  
সে স্তম্ভও দেখা দিলেছে। বলে—‘মদন্তের দাঁত হ’ল,  
কামড় পেয়ে পেয়ে প্রাণ গেল।’ তবুও যদি সোয়ামীর ভাত  
খাচ্‌তা তা আরও কত দেখতুম। তা’ আর হ’বে না!

বলে—‘যেমন কল্লার রেবটী, তেমনি পাতা জোলা তাঁতি।’  
তা’ না চ’লে মানাবে কেন? দিন রাত্তির পাঁচা, আশিঃ  
আর পাণ্ডুরীর অর-পাশে। এই তো দুতোপ! তেঁনার পরি-  
বারের আবার ‘চোপা’ দেখ না। যুখে আভন!”

সৌরভী উত্তর করিল,—“সে আভনের কত খেরি তার  
ভাংতে দিবেই তো উরুনে আভন পড়ে নি।”

গ্রামাঠাকুরাণী তটু হঠাৎ এক প্রকার বিচিত্র দ্বন্দ্বি  
নির্গত করিয়া বলিলেন,—“মরি মরি! তুনেও প্রাণটা  
খেলল হ’ল! ‘অমনি ‘প্রাণ-বিনতি’র গোলা হ’য়ে গেল।  
ব’লে ব’লে কত গিতি তিন বেলা দিলু’নে আর তুই পানী  
মুখ দুখে দিবে রাত্তির খেটে মর! একটা যদি তথা করে-  
ছিল—অমনি কুলোপানা হেঁজার। তোমের এত চোখ-  
রাঙানির কি ধার ধারি বলতো? কের যদি অমন মেজাজে  
দেখাবি তো খেয়ে দিবে কেড়ে দেব।”

কণ কণে ছোট্ট একটুখানি উত্তর পোনা গেল,—“তা  
মিলেই তো পায়। সেটাই বা বাকী থাকে কেন?”

সৌরভীর চক্ষু টং-পুকেই দিক হইয়া উঠিয়াছিল, এট  
বারে অস্ত টং-টং করিয়া করিয়া পড়িল। গ্রামাঠাকুরাণী  
এক পর্কা নামিয়া আদিলেন,—“বলে—‘আর অস্তে দুক  
কাটে, সে আমারে এক কাটে।’—আমারও চয়েছে তাই,  
আমি দিবে রাত্তির ওর ভাল চাই কিনা, তাই আমার  
ওপরই ওর বত আক্রোশ!”

কলার কলিত অকৃতজ্ঞতার কথা মনে উত্তর চওগার  
গ্রামাঠাকুরাণী পুনরায় একটু চোঁকা উঠিলেন। আরও  
একটু চড়া হুয়ে পর্কা বাধিলেন,—“দিবে রাত্তির দিলু’নে!  
আর ‘উবি’ এখানে ব’লে টিপে দুতো কাটু’নে আর ‘তিনি’  
সেখানে পঁচা আগিঃরের ‘ছেরাক’ করবেন। বলে—‘বর  
আমাদের শেড়ার মুখ, মরা পাঁচা সমান মুখ।’—তারপর  
পঁচাখোঁরটা এসে এখন বলবে,—‘বাঁকী পাই কি ছেরার  
পাই।’—তখন কি ছাই খেতে বেগুা দেবে, তাই তুমি?”

একটু অসম্মান-স্বত্ব তিত্ব হইবেই উত্তর আসিল,—“কেন  
বেছাই উরুনে থাকে তাই। তারও কি আফাল পড়েছে না কি?”

এমন সময় দুকেতুর মতই স্বকথায় পাঁচাখোঁর রমাই  
ঠাকুর চাঁৎকার করিতে করিতে অপর টুকিল,—“কিদের

এত টেচামিচি সাতদিন লেগেই আছে তন্তে পাই ? এত কি আর পেরেছ লক্ষী থাকে ?—তা থাকে না। এত শক্তগোল আমার বাড়ীতে পোষাবে না, তা' কিন্তু আগেই ব'লে রাখছি। এ দেখেই দোকান পার নি কেউ, এ তরলোকের বাড়ী।”

পানের দুধে স্নিগ্ধ মূল পড়িলে যেমন হয়, রমাই ঠাকুরের আগমনে প্রামাটাকুরাণীরও তদৈব হইল। তাঁহার সমস্ত তক্ষন পক্ষন এক নিমিষে অপ্রকৃতি হইল। রমাই ঠাকুর এ বাড়ীর ঘর-দামাই। রমাই ঠাকুরের সাতকুলে কেউ নাই, প্রামাটাকুরাণীরও এই সবে ঘরে নীলমণি এক দৌরভা। কহেক বাবা কহিকমা বা' আছে তাহাতেই প্রবেশ করে কোনরকমে চলিতেছে। সে বাধা হউক, এবাড়ীতে এরূপ টেচামিচি নূতন নহে, প্রায়ই ঈ এং রমাই ঠাকুরের এক ছদ্মবেশেই সব মিথিা বাবা। ঠাকুর ছাড়া বা কখন শুনিবার পোমনে না। আজ কিন্তু আর তাগা হইল না। একিকে পুণ্য হইতেই কোন কারণে ঠাকুরের প্রতি দৌরভার তক্ষয় অতিমান কোরের আকার ধারণ করিয়া তিততে তিততে পক্ষীহুতিল। তাহার উপর প্রামাটাকুরাণীর স্নেহের গাওয়া শরিয়া বাহিরে দাউ দাউ করিয়া প্রকাশ পাইবার ক্ষমতামাত্র একটু ছুতোয় অবকাশ বুঝিতেছিল; আর তখিক সাধুর সঙ্কিত টান-চুরি লইয়া কণকের ফলে রমাই ঠাকুরের মেজাজ বিসড়াইয়াই ছিল, তাহার পর বাড়ীতে আগিয়াই এই কোণালাল।

রমাই ঠাকুর দুখ বিকৃত করিয়া বলিল, “ভিলে বেহালের মত এখন যে দেখি সব চুপ্ চাপ্! বলি ব্যাপারখানা কি।”

প্রামাটাকুরাণী বলিলেন,—“ব্যাপার আর কি বাবা, এখন পর্য্যন্ত উঠেন অঁচ পড়লো নি, তাই দৌরভিকে বসুড়িলুম,—এতখানি বেলা হ'ল, তাগর ডালমাগুয়ের ফেলে ভেতে পুড়ে আলুনে, সমগ্রমত একমুঠো বিবি কি ক'রে বসুড়ো ?”

রমাই ঠাকুর ক'রিকট উঠিল,—“ও সেভেই তো রাব-নকিলীও তাবনা-চিক্তর গুল হচ্ছে না। নিকেদের শিগুটা সাত সাতো পর্য্যাপটিলগে হুগেই হ'ল। দকীল থেকে সত্কা পর্য্যন্ত মাখার ঘাম পায়েকেলে ঘুরে মগছি, আর নব্যবসুঠী অরে ব'লে নব্যবীচাল চাকুরেন। এর ওখু পিঠের ওপর সাত খাওয়া তাগা।”

দৌরভার মুখাভিত ক্রোধ এতকথের সম্পূর্ণরূপে দাউ দাউ করিয়া অলিয়া উঠিল, “তাগাতের পিঠে সাতখো খাওয়া না দেবে তাকে এনে বর্ষনি রাবুতলো বসানো চরবেই তখন এ 'ইনাম' তো পাওনাই" আছে—সেই তো শোধ ক'রে দাও।”

দৌরভার কথা থমাই ঠাকুর সম্মত উপলব্ধি করিতে না পারিলেও ঐটুকু বেশ বুঝিল যে, সাত অশেকা সাতখোব শুকব অশেক অশিক, অতএব ক্রোধের মাত্রা ভেতনিক না চড়াইলে পরাভব হয় তাবখা একটা ছদ্মবেশে ভাঙিয়া স্নানিত করে পাঠকা চক্রে লটকা দৌরভার অভিযুখে অসংগত হইল। দৌরভার কিয়দা দাঁড়াইল। মাগরার এক পাশে মাফিত বাসন-কোলনগুলি উগুড় করিয়া রাখা চটখাটিল, তখন চক্রে একখানি লোহার চাতা উঠাইয়া লটকা বলিল,—“এল না একবার, এগিয়ে এস, ও! বলে তাত কালুদের কেউ নং, কিনা মাগরার গোলাট।”

প্রামাটাকুরাণী এক মুহুর্তে ব্যাপারটির শুক বুঝিয়া লইলেন। এখনই যে একটা লডাকাত পটীয়া কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তাগা তাঁহার বুঝিতে বিশেষ বেশ শরীতে হইল না, কারণ পুণে সেক্ষত বস্তাব চরখা গিরায়ে। মাগরার দৌরভা রমাইয়ের সমস্ত অত্যাচার নাথবে সহ করে। কিন্তু আজ সে করিতেছে কি! প্রামাটাকুরাণী ঘনে আভের গোমা ছিল না। দৌরভার বনজালিনী নুর্দি দেখিয়া রমাইয়ের মনেও ভীতির স্ফার হইয়াছিল, কিন্তু পতিবেবতঃ হইয়া তো আর খাটো চক্রে পরা পায় না। তাই দৌরভারগুণের আজ্ঞানে সে আর একটা বিগট ছদ্মবেশে ভাঙিয়া প্রামাটাকুরাণী ছুটীয়া বাইয়া উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চাকর করিতে লাগিলেন,—“ও দৌরভি, শোভারমুখ, করিল কি ক'র আমার মাথা খাস্, স'বে বা, স'রে বা।”

দৌরভা চোখ দুখ রাঙা করিয়া ক'রিকতা উত্তর বলিল, “কেন পা, কিলের তরু? আমি কি ওর দাই, না পবি, যে দিন নেই রাতির নেই কপার কপার চোখ রাঙাবে আর পড়ম পেটা করবে।”

রমাই ঠাকুর আর সহ করিতে পারিল না। “আমার খুসী করব! শুধু কি খকম পেটা? দুখ তোর বামা



বলে চিড়ে কেনবা।" বলতে বলতে মঙ্গলক হঠাৎ  
কৃত্রিম হৃৎস্পন্দে খটখট শৌরভের মাধব ঝুঁকতে  
লাগিল। শৌরভের মাথা কাটাটা বর বর কবিতা বক্ত  
ভাবে লালিল।

ভ্রামহাভুতবীর কামিমা উল্লিখেন,—“মেরোটাকে একবারে  
পুন ক'রে কেন নি বাবা।”

একটু দীর্ঘাঃ গাভাটীয়া শৌরভ বলিল,—“গাভাঃ, মাত  
গোমারই একদিন, কি আমারই একদিন—দেখাচ্ছি।  
আমি এই বক্ত শুক ছাড়ি খানস, বেশি এর কোন প্রতিফল  
আছে, কি নেই।” বলিয়া লতা লতাট হাইবার নিমিত্ত  
স্বাধা ফিরা গাভাটিল।

দুইত মাত্র সময়। রমাই ঠাকুর দোকাইয়া গিয়া প্রাঙ্গণের  
প্রান্তস্থিত একটা শেখরাগাছের কাছে ক্রমাগত মাথা ঝুঁকতে  
লাগিল। আঘাতে আঘাতে রক্ত সমস্ত বুখানো বীভৎস  
করিয়া চাঁৎকার করিতে লাগিল,—“আমিও ছাড়ি। বেশি  
মা আর তার মেরেকে যদি আর না বাবাতে পারি তবে  
আমার এই কান চুটে কেটে কুহুরের পায়ে দেব। বলে  
‘সুপ দেবেছে ফাঁদ দেখ নি।’ ছাড়ি মনজন ভরলোকের  
কাছে। গিরে বদ্বি—‘আপন পরিবারকে বেশি নিয়ে  
বেতে চেয়েছিলাম, তাই মা মেরে ছুঁতেন এই শাস্তি করেছে।’  
বেশি, বেশি ভরলোক আছে কি নেই।”

ভ্রামহাভুতবীর উচ্চ চাঁৎকারের মাত্র—“ও বাবা,  
তোমার পায়ে পড়ি।” ভাড়া আর কিছুই বোকা গেল  
না।

গ

বেলা অনেক হইয়াছে। একটা অনেকজন বাজিয়া  
গিয়াছে। গ্রামের জনিয়ারবাবু তখন কেবল মাত্র  
দয়বীর ভল কবিয়া অকস্মাতে গাইবার নিমিত্ত উল্লিখা  
গাভাটীয়াছেন, এমন সময় গ্রামের বহুলোক পাঁচবেষ্ট  
রমাই ঠাকুর ‘ঠাউ মাউ’ করিয়া বাবুর কাছারিতে আসিয়া  
কামিমা পড়িল—“আপনি বেশি ছাড়ে আমার এই  
চন্দা কটা।”

অমিগর বাবুর আর অকস্মাতে গাওয়া উল্লিখ  
তিনি ফলানে বলিয়া পুনরায় চাঁৎকার এখন করিয়া

বলিলেন,—“মত চাঁৎকাচি না ক'রে, বাপারখানা কি  
তাই বলে বলুন না।”

রমাই ঠাকুরের উচ্চ চাঁৎকার হাল হওয়া বুঝে থাকুক  
আরও চতুর্ভূৎ বহির্ভূৎ হইয়া উঠিল। রমাই উচ্চকণ্ঠে এই  
কথাটাই বার বার আঁহির করিতে লাগিল, বেশি আর  
ভর নাট, শাক্তী ও তাহার কড়া, বক্ত-কামাতার এ মেন  
চুঁচনা করিতে যে বেশি সমর্থ সে বেশি কখন মাতুর বাস  
করে? দেব ছিড়ে নাম মাত্র তক্তিও আর শোকেত নাই,  
নতুবা শাস্তি কামার এই রমাই ঠাকুরকে টান-চোর বলিয়া  
পার পাটা বাহ! বোর কলি আর কাঠকে বলে!

যে সব ভরমন্তলী মতা দেখিতে সববেত হইতছিল  
কর্তাবাবু তাহাদিসকে গৃহে কিরা' বাইতে আনেন  
করিলেন। তখন বাবা হইয়াই তাহারা এই চক্ক-কণ-পরিভূত  
দায়ক স্থানটি পরিভাগ করিল।

বাবু বলিলেন,—“বেশুন ঠাকুর মশাই, ও সব বাক্য কখন  
রাখিয়া দিল। আপনাকেও আমি চিনি, শৌরভী পিলি  
গাছের মেয়ে উকেও আমি জানি। আপনাত প্রকার তো  
টার দিব্যভাষির অমের ভুল। আপনাত পুত্র বাড়াতে  
স্বীলোক ছাটী মো সঙ্গী আপনাত ভরে কাঠ হ'রেই বাস  
করেন। তবু আপনি বখন-তখনই কারণে অকারণে  
আপনাত পুত্রক কলিতে বাস্ত থাকেন, এর মানেকি মশাই!”

এইরূপ উল্টা অসুযোগ তুলিতে হইবে রমাই তাহা  
ভাবিতে পারে নাই, তাই অতিশয় গম্ভীর হইয়া সে বলিল,  
“এ আপন কি বলছেন কর্তা বাবু! পুত্রক মাতুর পুত্রক  
ফলবে না তো কি ফলবে মেয়েমাতুর? মেয়েমাতুর  
বত ভাশাই হোক তা'কে কি আর আশায়া দিতে  
আছে কর্তা! মেয়েমাতুর আর মরণ কাগড়, ও বত  
আছাকাবেন তই পরিবার হ'বে। তাই মাকে মাকে বেশ  
একটু ‘ককুকে’ দিতে হত, তবে তো বর দলার কথা চলে।”

অমিগর বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—  
“না, তা কি আর চলে—তার কল তো আপনাত সুখের  
ওপরেই দেখতে পাচ্ছি।”

রমাই ঠাকুরের পুত্রবৎ আঘাত লাগিল। মঙ্গলক মন্তক  
উন্নত করিয়া সে বলিল,—“হুঃ! আপনি কি চেয়েছেন,

এ কাণ্ড সৈরতি করেছে? তা'র মাথার উপর মাথা আছে যে, রমাই ঠাকুরের গায়ে ছাত দেয়। তেমনি পরিবার নিয়ে 'নন্দারাম' ঘর করে না এ নিশ্চয়! তবে ঘর করতে গেলে—চ'চারণানা বাসন-কোমরও যদি এক কাছগার থাকে তবে টুটো: ক'রে কি বাজে না? বাজে। এত তাই। নিজের পরিবার, তার অমন পরিবার! সাত চক্রে তা কাড়ে না, সেই কিনা চটাব জাম একটুকুতেই খালা হ'বে উঠলে:—বলি বাপার খানাই কিরে! মাঝা দিখাই একটু পিন্ধা বিয়ে, তাই পেয়ায়া আছে মাথা টুকে,—বুতলেন কিনা—”

বাবু গাভর সংবরণ করিয়া বলিলেন,—“লে আমি অনেক-কণ পুসেই বিশেষ ক'রে বুঝি ঠাকুর! তা বেগ করেছেন! কিন্তু এখন তা হ'লে জামার কাছে আগার কারগটা কি তা'র ওস্তে পাই?”

রমাই ঠাকুর গম্ভীর হইয়া বলিল, “আপনি দেশের মা-বাগ! মনের আবেগে যদি আপনার কাছে বাবুন মারগ্র এগেই থাকি, তা'তে আর এমনই কি ঘোষ হয়েছে বাবু?”

“না না, ঘোষ আর কি, পাচশো বার আস'বেন; অব বেলাটা কত হয়েছে, পেটা কি কিছু ঠিক রেখেছেন? দেশের মা-বাগেরও তো সুখা তুকা নামক বাগাইগুলি আছে—না নেই?”

রমাই ঠাকুর চট্টিয়া উঠিল,—“সুখা তুকা বড় লোক ব'লে কি শুধু আপনাদেরই একুচেটে? আপনি কি মনে করেছেন যে, আমি কালিয়া গোলাও খেয়ে উল্লার তুলছি।”

“সেবার দোকানে যে মধ্যপ্রসাদ সেবা করেছেন তাতে ক'রে উল্লার কালিয়া গোলাওয়ের ওড় ভিলমায় হান অবশিষ্ট থাকলে তো তা'র গ্রহণ করবেন।”

রমাই বুঝিল যে, বাবুর কানে টান-চুরির কথা ইতিমধ্যেই শ্রুতি পৌছিয়াছে। কোথায় ত্রাঙ্কণকে মগমান করবার ওড় সাধুকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার ওড় বিশেষ করিয়া শান্তির ব্যবস্থা করিবে, তাহা নহে, আবাব ত্রাঙ্কণকে পরোক্ষ-মগমান! রমাই ঠাকুর ভেঁলে-বেঙনে অগিয়া উঠিয়া বলিল,—“গুণে আপনাদের অত মা-বাগ থাকলে, এ ছাড়া আর কি হ'বে?”

বাবু বাগিলেন না, উইং হাসিলেন মাত্র, ব'লিলেন,—“সাধুর বাপার আমি লম্বই ভনেছি। আপনি কি করতে বলেন?—সাধুকে বাড়ি দিতে তো? আপনি ঠেক্কে কথলে নিজেই তো তাতে বেশ ক'রে লামা দেখাওতে পারেন। গান্ না খানার, মাথা দেখিয়ে বলবেন যে, টান-চুরির মিথ্যা ওড়ুহাতে লে আপনাত এই মশা করেছে।”

রমাই ঠাকুর তাড়াতাড়ি গুঠ কানে অকুলি প্রদান করিয়া বলিল, “সে কি তপা বাবুশাট, আপনি দেশের মা-বাগ, এত বড় মিথ্যা কথাটা শুক'ব গিরে 'কলক' করতে গেবে কিনা আপনি বললেন—এতবড় দেশভানিত সাধু ব্যক্তি হ'বে। রমাই শম্বার বাগও তা' শারবে নি। একটু আদটু গাঝা আকিই না হু খেয়ে থাকি, তাই ব'লে কি মিশো লাকা! ওরে বাবা বে! এখনও চক্কে লুগা উঠে, হাতবিন হচ্ছে।”

বাবু হাসিয়া বলিলেন,—“তা' হ'লে খানার না গিরে এখন বাড়ীই কিরে হান, বেলাও তো এদিকে দার মার। সৈরতি গিলি এক তো মারসোর খেয়ে আচেন, তারশন এতখানি বেলা আপনি কোথায় কি কচ্ছেন গার ঠিকানা নেই—তাদের মনের অবস্থা যে কেমন চ'তে পারে পেটা একটু বুতে চেটা করবেন, তা' হ'লে মারসোর না করলেও ঘর সংসার ভাল ভাবেই চ'লে যাবে।”

এতকণ পরে রমাই লজ্জিত হইল, মনে মনে ভাবিল,—“সৈরতির অবস্থাটা বাবু ভাবলেন কি ক'রে? কাছে দেখছি কিছুই চাপা থাকে না।”

রমাই ধীরে ধীরে উঠিয়া গুণাভিষে অগ্রসর হইল। গুণে আসিয়া দেখিল,—অমিত্যর পুসেই তাঁহাদের গা-দেবতার প্রসাদ ত্রাঙ্কণ দিহ; পঠাইয়া দিয়াছেন। এ প্রসাদ কণিকামাত্র নহে, রমাই ঠাকুরের লকে অগয়াপ।

রমাই ঠাকুর মনে মনে বলিল,—“ভমিধাব, ভমিধাব, একেই তো বলি ভমিধাব? একেই তো বলি দেশের মা-বাগ!”

দেশের ভরণোকেতা কিছু রমাই ঠাকুরের লম্বত বাসনে ভনিয়া একবাক্যে “তার” বলিল,—“রমাই ঠাকুরের রম্য: যশের লক্ষ্যাকাণ্ডেই প্রথম অলগা তাইই হইয়াছে।”

## আলোচনা

১

### বিবাহ-বিস্ফোর

বৈশাখের চিঠির প্রবেশা শ্রীকৃষ্ণ অপরূপা দেবীর “বিবাহ-বিস্ফোর” প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মনে যে সব প্রশ্ন জাগিতেছে এবং বহুদিন ধাবৎ এই বিষয়ে ভাবিয়া যাচা বুঝিয়াছি “বিচিত্রা”র মাঝখানেই তাঁহাকে জানাইয়া বিনীত পিতার সার উত্তর প্রার্থনা করিতেছি। আমার বিজ্ঞা অতি সামান্য, কাজেই পাত্রাদি পাঠ করিয়া নিজের জ্ঞানে দবজ্ঞান সমস্তার সমাধান কহিতে পারি না, অথচ সমাজের নানা স্তরের শ্রীলোকের মনোভাব ও সামাজিক অধিকাংশের হৃদয় পাঠ্য মনে যে-দমত আলোচনার উৎস হয় তাহা বলিয়া বুঝাইবার মত ভাষাজ্ঞানের অভাব হইলেও বলিতে ইচ্ছা করে।

ভাষার প্রবন্ধের উক্ত লই গোপালেশ্বর মহাবীর মধ্যে আছে—“সামাজিক ব্যবস্থা এবং কতকগুলির কল্যাণ সাধন করিয়া আগিতেছে—”। এখনও যদি সত্যই সামাজিক সমস্ত ব্যবস্থাই সমাজের কল্যাণ সাধন করিত তবে জীবনের প্রত্যেক আদর্শ এত পলবধূর্ণ হইয়া উঠিত না। তিনি লিখিয়াছেন সমাজের জোর হওয়া লাগা অস্বাভাবিক নহে এবং চিরদিনই ইহা চলিয়া না আসিলে বসন্তার অবস্থার সমাজকে আমরা কল্পিতে পারিতাম না। তাই যদি হয় তবে-সমাজের বেখানেই দৃষ্টি কত বোঝা যাবে সেখানেই সমাজের স্বপ্ন প্রয়োগ করিতে হইবে। কত বহু দুঃখিত হয় ঐহিক তত বিবাক হয়, এই জুড়ি বোঝা যায়। এখন পুরাণ কালের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা এবং হিন্দু নারীর অতি উচ্চ বিশিষ্টতা এই দুইটির প্রতি অস্বস্তি প্রকাশিত আমার যদি হিন্দু সমাজের সফল প্রেমীর নরনারীর দাম্পত্য-জীবন বিস্তারিত করিয়া যাহা দেখিতে পাই তাহা স্বীকার করিতে এবং প্রথম প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে সৰ্ব্ব পাই— তবে নন্দারায় যুব বহু হইয়া গেলে জমা আবক্ষ্মণ, পচিত্রা

বাড়ীর যে অবস্থা হয় সমাজেরও ক্রমশঃ সেই অবস্থা হইবে। হিন্দুনারীর শিক্ষা স্বীকা ও জীবনের আদর্শ এককালে দেশে নিয়মিত ছিল এখনও সেই ভ্রষ্টই আছে একথা স্বীকার করিতে পারিলে গৌরব বোধ করিতাম, আর কেন যে দেশে নাই তাহা এখানে না বলিলেও চলে, তবে ছোট করিলেও যে, দেশের একদল পরিবর্তিত অবস্থার সমাজের দেশে অপরিবর্তিত অবস্থা বলাও তাহা বাইবে না, তাহা বলিতেই হইবে। সমাজের অবস্থা এখন একদল ব্যাপাদায়ক যে আশঙ্কন গোড়াইয়া খাটি করিয়া গুণ্ডার অস্ত্রই অধি-সংস্কারের প্রয়োজন। কারণপ্রত্য ও দুঃখার্থকে অস্বীকার করিয়া কেহ জীই হইয়াছে কি? যুগান্তের দৃষ্টি সামন্তত রাধিবার এক পুরাতনকে ভাঙিয়া গড়িতে হয়। বড় জিনিষ মাঝেই অবিনশ্বর হইতে পারে না, আর যাহা ব্যক্তিক অবিনশ্বর সংস্কার তাহাকে কি করিতে পারে?

কোন দেশের সতী দাশ্য কোন নারীই নিজের অংকটটি কেবল চিন্তা করিয়া ভিত্তিগর্ভে বিশ্বের পক্ষপাতী হইবে না, কিন্তু প্রত্যেক দাম্পত্য জীবন পবিত্রতার আধার এবং প্রত্যেক স্ত্রী সতী দাম্পত্য একথাও তাঁহারা বলেন না। লোক সংস্কার অনুগতে হিন্দু-সমাজ যদি স্বনীতিতে সজ্ঞাত অনেক সমাজের উপর হইয়াও থাকে, তবু তার খেঁচু তুলনিতা সজ্ঞাত পতিতে চিন্তা আছে তাতে বাধা দিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সেই শিক্ষা দিতে যে সময় লাগিবে ততদিনে চরিত্রিত কতখানি বাড়িয়া যাইবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। পুঙ্খল প্রোত আছেই যদিও যদি বিবাহ করি তবে তাহা বলিয়া চলিয়া যাইবার স্বপ্ন পাচ্চা নন্দারায় করিতে বাধা দিই কেন? এককালে অধিবসীকার উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুনারী তার বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিত, স্ত্রী স্বামী-চিত্তার গড়িয়া সতীত্বের পুণ্ডিত রাধিয়া যাইত, এখন যে সব গ্রাম্য

ও পুণ্ড্র সতী সাধীরা কখন দেখা হইতে পারিবেন ? তা বলিয়া সতীর একান্ত অভাব হইয়াছে বলিয়া ত মনে করি না, আর সেট ভুলট তো ভিক্টোরিয়ার পক্ষে ভোট দিতে দিয়া করি না। আজকের দিনে এই ভিক্টোরিয়ার বিলট সতীদের অঙ্গ-পরীক্ষা। যে দেশে এখনও পতির অধীন-মানে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর পতন্যর গ্রহণকে লোকে প্রচার চোখে দেখে না, সে দেশে পতি বর্ধমানের পতন্যর গ্রহণ-কারিত্বকে কি চোখে দেখিবে তাহা সন্দেহই অস্বপ্নের। এ দেশে ইহা কিম্বলে ব্যবহৃত হয় তাহাও দেখিবার বিষয়।

প্রাচ্য-মহাদেশ বিভাগ্যের মহাপন ও তাহার জননী মায়া-পন্থার ও হিন্দুনারী হইয়াও বিদ্যাবিবাচের পক্ষপাতী হইয়া-উঠিলেন। আর এতদিন ধাবৎ এট আইন ত বিনিবন্ধ হইয়াছে, তবু দেশে-এত অধিক বালবিবাহ থাকে, এবং অনেকই অতিভাবক দ্বারা প্ররোচিত হইয়াও, কেন মরণে বিবাহ করি-তেছে না ? এট আইনের দ্বারা বিবাহের প্রত্যেকের যদি কতি না হইয়া থাকে তবে বিবাহবিবাহের ও পতন্যরগ্রহণ আইনের দ্বারা সতীদের কেন কতি হইবে ? দ্বাভা। তার প্রকৃতির তাগাদের পক্ষে, আইনসমূহ তাহে বাধিত মিলনে ভতকটা উপকারও হইতে পারে। দ্বাভা। অযোগ্যগোত্রে পড়িয়া জীবনে বার্থ ও অসুখী তাগাদের পক্ষে যোগ্যতার পটিলতাতে পার্থক্য আদিত পারে। দ্বিতীয়বার বিবাহকারী পুরুষের গ্রহণ স্ত্রী ও পুণ্ড্র পুণ্ড্র বিয়গ নয়। ইহকালটাকে প্রত্যেকের বাহ দিয়া কেবল পতন্যকালের আগার লক্ষ্যপ্রকার লাহনা দ্বিগা এবং লক্ষ্যপ্রকার অস্ত্রকে প্রস্তর দ্বিগা দ্বিগের জীবন কাটে তাগের পক্ষেও এই আইন একটু ধবত কটলাঘবকর হইতে পারে। কারণ এই প্রেমের দ্বাভা। মাঝে কিছুতেই সন্নিহিত না হইলেও পারিবারিক সম্বন্ধানির একটু ভয় করে। ইহা। এখন জানিবে বো, তাগাদের নিবাহিতা লক্ষ্যপ্রকার প্রেমের স্ত্রীর ভয় একটা পক্ষ হইয়াছে এবং সেই পক্ষ অবলম্বন করিলে তাহার পৌরবে আধাত পড়িবে, তখন রহত একটুখানি নিম্নে লক্ষ্যপ্রকার চলিবে।

সমাজের এবং পাত্তের বত কিছু বিধান, সে সমস্ত কতক কেবল পুরুষের ভয়, ভয় কেবল স্ত্রীভাতির ভয় নির্দিষ্ট, আর কতক সমস্ত মহিলাভাতির পক্ষে সমান তাহে বাটে ;

তখন প্রাকৃতিক বিধানও পুরুষনারী ভেদে নির্দিষ্ট আছে, আর মানবভাতির পক্ষে সমান তাহে প্ররোচক কতক-গুলি প্রাকৃতিক বিধানও আছে। হিন্দুভাতির অঙ্গ চটতে স্ত্রী পণ্ড্র যে সব সংস্কার হয় পুরুষ নারীভেদে তাহার কোন পার্থক্য নাই, এবং লক্ষ্যপ্রের যে সংস্কার বিবাহ তাগাতে স্ত্রীপুরুষ উভয় ভাতির সমান অংশ, এবং উভয়েই মিলিত তাহে মিলিবে ইহা সম্পন্ন হয় না ; অপর অঙ্গকালকার হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী একটী নিজের নিজের কল্পনার্থবৎ অবস্থান করে, তাহাকে কোন মন্ত বলিতে হয় না,—আর কল্পনা তাহা ও লক্ষ্যপ্ররোচিতেরা যে মন্ত দ্বাভা এট বিবাহ কার্য সমাধা করেন তাহার অর্থ একবর্ণও তাহারে একটী নারী স্ত্রীতে পারে কিনা সম্ভব। তবু মানিয়া লইলাম যে, গ্রহণ বিবাহ দ্বাভাও ইহকাল পরকাল জীবন মরণ এক হইয়া যায় ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রীর ইচ্ছা যদি বত উচ্চা ততবার বিবাহ করিতেছে সে ক্ষেত্রে, তাহা এখন সংস্কারই নয়, তখন সেই সব স্ত্রীরা কোন্ পতি লাভ করিবে ? আর সেই সব দ্বাভাভের কি “জীবনে মরণে জনমে জনমে” ততগুলি দ্বাভা ততী হইয়াই চলিতে হইবে ? প্রথমবার ভিন্ন অস্ত্রব্যবহে বিবাহ সংস্কার না হইলেও অস্বস্তান ত এক প্রকৃতিরই হয়, আর সেই স্ত্রীরাও কিছু আগে বিবাহ করিয়া থাকে না। পুরুষের বহুবিবাহ বহু হইলে পুরুষের কোন্ দ্বাভা দ্বাভা পুরুষের পার্শ্বের ? মহাত্মা কৃষ্ণের যুগোপাধার অংশের এ বিবাহ দ্বাভা নিষিদ্ধহেঁন তাহা নিম্নত প্রেমের কথা, সেই প্রেম তাহার ভদ্রের কল্পার তার যানির বাধাত ও পারিত্রতা নষ্ট হইতে সে দ্বিবে না ; কিন্তু অপর লক্ষ লক্ষ মন নারী দ্বাভা। আদর্শ লক্ষ্যও লক্ষ্যে নহ লক্ষ্য প্রেমের লক্ষ্যও পার নাই, তাগের ভয় একটা লক্ষ্যপ্রকার বাহাত পরকাল মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই পাত্তপ্রকার দ্বিতীয়বার বিবাহ সংস্কার নয় লক্ষ্যপ্রকার অসিদ্ধ বোধ হয় বলেন নাই, অথবা যদু অতাবে ক্ষেত্রের মত বাহা। দ্বিগাছিলেন। এই যে বাহা। ইহা যদি পুরুষপ্রকৃতির ভয় এতই আবস্তক হইয়াছিল তবে স্ত্রী-প্রকৃতি লক্ষ্যে তাগের পুরুষপ্রকৃতি হইতে এতই কি উচ্চতর যে, তার ভয় ঠিক উল্টা বাহা। হইল ? বাহা। ইহা প্রকৃতি উচ্চতর কিনা, তাগের পরীক্ষাই বা কি দ্বিগা।



৪৮নং ? আর উক্তরই যদি হইবে তবে অত তড়াক্তি কেন ?

পূৰ্ব্ব অধ্যায় কতিভেদে বলিয়া ক্রীড়াও অস্ত্রায় তরুণ, একতর ভাব হইতে কেহ ভিত্তোঁস বিল সমর্থন করে বলিয়া মনে করি না : তবে সত্যের সত্যরহতই মধ্যপন হউক না কেন তথালি বহন সমাজে মেয়েদেরও পদখলন হইতেছে, অতি বড় মুশিক্ষিতা ও অতি বড় অশিক্ষিতা এই দুই শ্রেণীতে ঐ বিধে বেগ সাধুশ্রুও দেখা বাইতেছে, তখন সমাজে এমন সব পথ পুলিয়া রাখা বোধ হয় সম্ভবতার বাহাতে কতি অল্পসময়ে চলিয়া থাকিতে পারে : যে বিধে পূৰ্ব্ব ও নারীকে সমান অধ বলিয়া মনে করি সে বিধে উত্তর জাতির ভক্ত সমান ব্যবস্থা থাকার সম্ভবতার মনে হয় নাকি ? পূৰ্ব্বদা বাহা পারে বীরাও তাহা পারিবে, আশ্বাষ ক্রীড়া বাহা পারে না পূৰ্ব্বদাও তাহা পারিবে না, এই দুই বকমের দাবী মোটের উপর একট ; কাজেই পূৰ্ব্বের বহু বিবাহ বন্ধ করিতে খেলো অদুর ভবিষ্যতে প্রস্তাব উদ্ভিত পারে যে, পতিত নারীদের মত পতিত পুরুষদিকও সমাজের বাহিরে থাকিয়া দেহ বিক্রয় দ্বারা ভাবিকা নিগাহ করিতে হইবে ; তাহা হইলে সমাজে থাকিবেন কতিপয় সন্ন্যাসীকল্প মহাপুরুষ জার বৃত্তিমের আশ্রয় বাসী । বিধবা মায়েদের নিপীড়নে তৎক্ষণাৎ অত্যাচারিতা ক্রীড় একান্ত উপায়হীনতা এবং বিপাত্তিকের, পতী কষ্টক পরিচাক পূৰ্ব্বের ও পতীত্যাগীর পুনরায় দারপরিগ্রহণের অধিকার যদি বিধিবদ্ধ হইয়া সমাজে চলে তবে এই নিম্নজাতি বা সমাজের বিশিষ্টতা মন্থনকে দেখাইবার ভক্ত আর বেশি দিন থাকিতে হইবে না,—তৎপকথার পায়ের মত এই বিপুল জাতির ইতি-চাল অগণ্যদাশী পুঁথি পড়ে পাঠ করিবে ।

“ভারত মহিলায়, হিন্দু স্ত্রীরা, আৰ্য্য নারীর নিজস্ব পূর্ণ গুণবস্তা তাঁর সমস্ত মহিমা পরিমা” তবে কি একই নুনকো জিনিস যে, নিয় অধিকারীর ভক্ত বাহা প্রয়োজন তাহা জানের কাছে পাইলে নিজেই আঘাত করিবেই এবং ভাবিয়া চুম্বার হইবে ? এই যে হিন্দু পায় এবং সমাজ এর বৈশিষ্ট্য কোনখানে ? দেখানে দেখি “বত মত তত

পম,” যে যেমন অধিকারী তার ভক্ত সেই তরম ব্যবস্থা, প্রত্যেকের কতি অল্পসময়ে একটা নিখিই দানে আলস লইবার পথ আছে, সেইখানে নয় কি ? দীতা সাধিনী চিত্তা অল্পসময় সত্যের-পাখা যে পূণের কাহিনী, সমাজের পুনঃ স্বাধারের উদ্ভাষণ, ক্রৌণদীর পক্ষ বাসী, অথবা অধালিকার বৈধবা অবস্থার পুরোধোপদান, ক্রীড়া সত্যবতীর ক্রুদ্রতা অবস্থার মা হওয়া—এ সবও সেই পূণের কথা, এবং এই পেরোজ নারীগণ সমাজে চাপিতা হিলেন না : পক্ষপাতের কন্যকথাও আমাদের কাছে জরুচিপকত নয় ; সেই পাতবদের, বিবেকত ক্রীড়কের লুপকে বসার সুপ বা তাঁতালিপকে আশ্রয় করে বলে কি ? হিন্দুর মতে সেই চিত্রশ্রবীর আশ্রয় মহাপুরুষ বা লক্ষ্মীপ্রভ অবতারের সময়ে বাহা হইত তাহারও সংভার পরবর্তী লজ্জারকণণ আশ্রয়ক বোধে করিয়া গিয়াছেন, নহিলে আজও আশাসমায়ে সেই সব গ্রাধা প্রচলিত থাকিত । দেবতার জার পূজাশ্রয় সামান্য মহাতারতের লক্ষণ আশ্রয় নিপীড়নের অল্পসময় করিতে হিন্দু বিদ্যাবিত হইত না । অতীত কালে বাহা ছিল তাহা “যদি বর্তমানে জনাবস্তক বোধে পরিভাষণ করিয়া থাকিত পারি, তবে বর্তমানে বাহাও প্রয়োজন বোধ করিতেছি তাহা ভবিষ্যতেও চরিত পরিচাক হইতে পারে । প্রাধা এবং আইন অদ্বারী জিনিস, পক্ষান্তরে নরনারীর প্রেম সাধক, চিরকালের জিনিস ; প্রাধার স্তিক্রমে প্রেম বিপুল হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না :

বর্তমানে পরাশ্রয় না দেশ অতটা উক্ত শিক্ষা পাইবে থাকতে সমস্ত পূৰ্ব্ব নারী একাধিক বার বিবাহে প্রেজ্জার বিরত হইবে, সমাজ হইতে জানত বাহিচার ও অজানত পদখলন একবারে লোপ পাইবে, অস্তত ততদিনের জন্ত বাহাতে অবস্থা ভেদে একবারে নিষ্কাশ হইতে না হয় সেভক্ত আইনত লক্ষণ তরম পথই পুলিয়া রাখা উচিত । সমাজে বাহিচারী নরনারীকে যদি সূচিতে পারি তবে পতা-ভক্ত প্রেধকর্তারিতিকে সূচিতে না পারিবার হেতু কি ? যখন পথের আশ্রয়ক হয় অথও পথ পাওয়া বাসনা, তখনই নরনারী বেপেরোজ হইয়া উঠে, প্রায় পরিচক কি আমতা, এখনই পাইতেছি না ? ইউরোপের কল্যাণের সূচিত

আমাদের দেশের কলাকল তুলনা করা চলিবে না, কারণ এদেশের সভ্য অগ্রগতির সত্যের চেয়ে উচ্চ আদর্শের, ইহা সকলেই বলেন। দেশভেদে ও জনবান্ধুত্বে একই কিনিবের চাহ তির তির ফল প্রদব করে। আশা বীরাগা বলেন যে, শত প্রকার আবেষ্টনে আবদ্ধ রাখিয়া এই যে সভ্য ইচ্ছার কি মূল্য আছে, তাঁহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন যে, ভারতমণিগণ এমন কিছু আছে যাতে প্রকৃত প্রস্তেন না বিলেগ সে নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারে। আর বীরাগা হিন্দুনারী পুরাতন আদর্শের প্রাতি প্রত্যাশান বলিয়া তাহাদের এই সমস্ত দাবী পাওয়ায় ক্রুর চন এবং নির-পায়ী হইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন, তাঁহারা দেখিয়া ভূমী হইবেন যে স্বাক্ষর হাতে পাঠিয়া তাহার যথেষ্ট ব্যবহার ঘটায় না হয় সেজন্য হিন্দুনারী ভাবিতে শিখিয়াছে; যে বিধে যে এতদিন সে মোচাবিট ছিল সে বিধে যখনই শ্রুতেন চইয়া ক্রিয় ছিল ক্রিয় হইয়াছে এবং ক্রিয় হইতে চইবে একথা তাহাতেই। যেদিন বুঝিবে যে, তাহার বৈশিষ্ট্য এবং রাখিয়া চলিতে পারিলে ভিত্তিগর্ভ বিলেগ কোন আবশ্যকতা নাই তখন ভিত্তিগর্ভ বিল আশনা হইতে অক-শনা হইয়া যাইবে। আর যদি সে এর দ্বারা উপকাণ পায় তবে ত এর প্রয়োজনই আছে। বিশেষীকরণ দারশনিকেরে বাধা না থাকিলেও এমন বহু বিশেষীক আছেন বীরাগা প্রেম প্রদ্বার বিভাষ আচাৰে বিধবাকে হার মানাইতে পারেন।

ভাষ্যমণ্ডলের উপরে প্রত্যেক টালির সংযোগ হলে অশাধা দ্বারের চাতা পকাইয়াছে, এগুলিকে বাঁধিয়া নিশ্চল করিতে পারে মানুষের সাধা নয়। কলক্রমে এই দ্বারেরই শিকড়ের অস্তাত্তারে তাহাতে কাটল ধরিবে, তখন তাঁর সংস্কার লক্ষ্য হইলেও লক্ষ্যের পথে উহার দীর্ঘাতি কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। লক্ষ্য বাহ্যিক অনিবার্য নূতন কোন শিল্পী নূতন পরিচয়নাও তাহাকে তাহিয়া গড়িলে যথ্য হইবে কেন? সুতরাং গড়িবার পূর্বে উহাকে তাহিয়াই দাব্যক হইবে। অযোজিতব্যবের শিদ্ধান্ত মানিয়া গইলে এতোক সংস্কার দ্বারা লাভবানই হইব বলিয়া মানিতে হয়। রাণী সৌরিয়া ও আশীয়া

আমায়ীয়া এই বহু আশাতে ও এত দ্রুত হস্তে সংস্কার করিতেছিলেন বলিয়াই আশ আশপানিগান এতদ বিলম্বের সভ্য, কিন্তু এই বিলম্বের পরে যখন পাণ্ডি অসিবে তখনকার আশপানিগান যে ভারতের দৃষ্টান্তল না হইবে তাগা কে বলিতে পারে? হাতে উঠে কাক করিলে যে পরিবর্তনে যুগ যুগান্তর বহিগা হাইত, সেই আকাঙ্ক্ষিত পরি-বর্তন রাণী সৌরিয়া আশনাই হস্ত দেখিয়া যাইবেন।

বীরাগা লক্ষ্যপ্রকার কাম্যবশ পাতে লক্ষ্যভীমন তাঁহারা প্রস্তুতিমার্গের দোষ জীর্জন করিতে পারেন, এবং বাধা হইয়া ঈশ্বর হইতে বিকৃতভীমন নিগুণিমার্গ মানিয়া ও লইতে পারে; কিন্তু সগতি ও নিগুণির প্রভেদ সমাক-রণে বুঝিতে পারিয়া আবশ্যক হইলে যেক্ষার নিগুণিমার্গ প্রচল করিতে পারে এতদ জ্ঞান ও শিকা বাহ্যবের নাই তাহাবিধকে শিখাইবার ভক্ত শিকক বা শিকহিতী আশার? দেহপ্র শিকাগরই বা কবটা আছে? বীরাগা মনে প্রাণে এদব অগ্রভব করেন তাঁহারা নিগুণির আশন ছড়াতা দিবার ভক্ত লক্ষ্য ভাণ্য করিয়া সকলের মাঝখানে রাখিয়া রাখেন না কেন? নিজে সমস্ত আশার ও দৃষ্টান্তের মধ্যে মত থাকিয়া নিগুণিতব প্রচার করিলে সাধারণে কতটুকু শিকা পাইবে? আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে একদা বলিতেছি না, সকল সমাজেই উপদেশদাতার চেহে আদর্শ-দর্শনিতার সংখ্য অত্যন্ত কম তাহ বলিতেছি।

ঈশ্বরদ্বারা দোষ

### বিবাহ-বিচ্ছেদ

বৈশ্যবের 'বিচ্ছিন্ন' ঈশ্বরী অগ্রগণ্য দেবী গিণ্ড 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' প্রবন্ধ পড়িলাম। প্রবন্ধ হুল চইয়াছে বাংলায় তুতপূর্ণ শাসক লর্ড রোমান্দনের উক্তি দিয়া। "যে সামাজিক ব্যবস্থা ভারতবাসীর কল্যাণদান করা যায়-তেছে...লক্ষ্যচিত্তে...তাহার পরিবর্তন" উচিত নয়, পাট-গায়েব তার বিরোধী। ভালো কথা।

তারপর লেখিকার নিজের কথা—"আমাদের দেশের পৃথিবীর বহুতর দেশের হইল সংস্কারের একটা দোষ





হাওয়া পাগলাছে, এটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। কৃপে কৃপে টিরাধিন এমন চটখাচে ও চটতেছে এবং পরেও আবার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর চটতেই মানবসমাজের গঠন ও সংস্কার চিরদিন ধরিয়াই চলিয়া না আসিলে আমরা বর্তমানকালে যে-সমাজকে দেখিতে পাইতেছি, তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম না। যেমন মানুষের জীবনের থাকিলে তাহাতে ভোগ ন্যেক ভোগ এবং উন্মাদ হইতে আত্মবিকার চোঁটা অনিবার্য, তেমনি সমাজ থাকিলেই তাহাতে ধোঁহা কটী থাকে এবং প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা চোঁটাও অনিবার্য। তা' সে সমাজ হইবে কেন না বিচ্ছেদভার সহিত গঠিত হইক, কারণেই লক্ষ লক্ষ ভবিষ্যৎ কিছু না কিছু অসম্ভব হয় এবং কথিত কালে হিঙ্গ হইতেও ব্যক্তি থাকে না; সেই মত মনীষীমণ্ডল ঘাড়া গঠিত সমাজেরও কথিত জীর্ণ ভাগে হিঙ্গ প্রবেশ করিয়া থাকে।"

লেখিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বুঝা যেন। কিন্তু "সেই সংস্কারটা সম্পূর্ণরূপে পুরাতনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়া করা আবশ্যিক" মনে করেন না। "সমাজ ভাঙার" আগ্রহের আভিনব লেখিকা পছন্দ করেন না, কারণ, তা "বুঝ লক্ষ্যগ্রস্থ নাও হইতে পারে। যেমন কাবুলের "রাজমহিলা রাণী দৌরিয়াত অত্যন্ত ক্রতবত্তের সমাজ সংস্কার তাঁর বামীর পুত্রের দেশের এবং সমাজের পক্ষে শুভকারী হয় নাই।"

সংস্কারটা ক্রত চক্রবর্তী বাহিনী—মানবদেহের মত সমাজ-দেহের কত আবিস্কৃত ইয়োমাত্র অস্ত্রোপচার আবশ্যিক, নতুবা অচিরে ঐ বিধ সমস্ত বেতে খালি হইয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে। কোনো সংস্কারই আপাতদৃষ্টিতে কীদ্রব্য চিন্তা-লেনদেন মানুষের চোখে প্রভবক মনে হয় না—ইতিহাসে তার কুঁড়ি কুঁড়ি দৃষ্টান্ত আছে—পুঁই হইতে রামসোহন বিজা-সাগর পর্যন্ত। কারণেই মানুষ সংস্কারের উপকারিতা বুঝিতে পারে, এবং বৈশ্বাত্মিক একতা দেখ বা সমাজের পক্ষ বলিয়া আখ্যাত হয়, তিনিই আবার দেশভুক্তভাবে জন-সাধারণের পূজা পাটয়া থাকেন। এগুলি ঘটন্য মানব-সমাজে ব্যাবহার ঘটিলে, আশঙ্ক্য তায় বিরোধ নাই।

"হিন্দুবিবাহ-বিচ্ছেদ-বিগ্ন" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বিচলিত হইয়া লেখিকার বিকল্পপক্ষের প্রতি নিঃশিখিত চটুকথা প্রয়োগ করা উচিত হয় নাই।

১। "এই সব অশ্রুপিতবস্তুর নব্যশিক্ষিতা অবিবাহিতা বা সমাজবিবাহিতা মেয়েদেরই বা সমস্ত হিন্দুসমাজের মেয়েদের ভালমত চিন্তার কিসের অধিকার আছে?"

২। "বিদ্যাভি বাহ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাস বহিষ্কৃত—শুভকর্তব্য বিধে হস্তক্ষেপ করিয়া বসিয়াছেন এবং ...কতকগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্তি আবেশে গঠিত, পাণিত নরনারী তাঁদের এই বেখাল (whim)-কে উল্লাহ মান করিয়া প্রবর্তিত করিতেছেন।"

৩। "হিন্দু মেয়েদের মঙ্গল চিন্তার অধিকার ও চোঁটার দাবী হিন্দু সমাজের হিতাকাজীনা বা হিতাকাজীনা সাত্রেই আছে, তিনি যে সাম্প্রদায়িক হিন্দুই হোন অথবা হিন্দু নাই হোন।"

বাই হোক লেখিকা দাবী করেন, "কোন সমাজেরই লক্ষ্য নয় বা নারী হুচলি বা সাক্ষী অথবা উন্নতিচরিত্র হইতে পারে না। যে সমাজের লোকসংখ্যা বহু বেশি হয় তাহাতে গদগদ থাকা হইত বেশি সম্ভব; সমস্ত হিন্দু বামীর হস্তে পতী-নির্বাচনের নিশ্চয়ই অস্তাব নাই..."

তত্বেই সমাজবাসীর কর্তব্য লেখিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এইরূপ—"এ সব ক্ষেত্রে সত্যনারী প্রতিবন্ধক। থাকিয়া জীবনব্যাপনে হস্ত বাধা হইতে পারেন, এর জন্য 'সেনেটরিয়াম' বা জুজিলিয়াম সেপারেটন ব্যাংকে আইনের হাতে লঙ্ঘন পান এবং ঐ অস্ত্রাচার পতি ব্যাংকে পুনঃ বিবাহ করিতে না পারেন, সে চোঁটা ইয়ো অসম্মত নয়।"

কিন্তু "বিবাহ-বিচ্ছেদ পূর্বক হিন্দুনারী সমাজের প্রবেশের অধিকারিতা হইবে" হিন্দু সমাজের এর চেয়ে বড়ো অধঃপতন লেখিকা করুণা করিতে পারেন না। বরং "পূর্বক ব্যাংকে কথার কথার স্ত্রী ত্যাগ করিতে না পারে, এবং স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে না পারে, সে 'চোঁটা' কহাই সম্মত।"

সেই চোঁটাই হইতেছে। হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিগ্নের উত্তর তবে কি জ্ঞান? বিধবী লেখিকার কী তাহা বুঝিতে

## ঐহনৌতি বহু চৌধুরাণি

পারেন নাই? যে সকল হিন্দু স্বামী তুচ্ছ অজ্ঞাতের দ্বোকে  
ত্যাগ করে, এক দ্বী বর্তমানে বিব্রাণ দ্বী গ্রহণ করে, তাহা-  
দ্বিপক্ষে সায়েস্তা করিতে হইলে হিন্দু গ্রীষ্ম ও এক পতি ত্যাগ  
করিয়া অল্প পতি-গ্রহণের অধিকার পাওয়া উচিত।  
কুত্বের উপযুক্ত মন্তব্যও যে এই!

এমন একটি আইন পান হইলেও পতিব্রতা মতী নারী-  
দের আশঙ্কায় কি হেতু আছে বুঝিতে পারি না। আইন  
নিশ্চয়ই কাম্যকেও পতাগ্রহ গ্রহণে বাধা করিবে না।  
ব্রাহ্মীর কৰ্ম ও পক্ষপাতের কুত্বের বিবাহিত পতি পাণ্ডুর  
উন্নতত্ব ছিলেন না, প্রোগণী একই কালে পক্ষপাতের  
অক্ষণারিনী হইয়াছিলেন, অতঃপর কথাও তুমিরাহি। দেও  
নব "কিন্তু মতীর মতীকগোরব" ত ব্রহ্ম হই নাই, দেও  
নব "ভারতমহিলা আর্থানারীর মহিমা পরিমা" ত ম্প  
এই নাই, তবে আজ এতকাল পরে কলিযুগে অবস্থাবিবেশে  
হিন্দুনরীকে পতাগ্রহ গ্রহণের অধিকার দেওয়ায় স্রষ্টাবে  
গৌরবিকার এই দ্বাধাকার কি পোতন না মন্ত?

ঐহনৌতি বহু চৌধুরাণি

## নারী-জাগরণ

আজকাল ভারতে বহুবিধ আন্দোলন চলিতেছে;  
নারীকে জাগরিত করা, স্বাধীনতা দেওয়াও তাহার ভিতরে  
একটি।

কেন কেন বলেন, নারীকে পান্ডাতা পিকার নিকিতা  
কর, বিবাহের তার নারীকেও ভোটের অধিকার দাও, রাষ্ট্র  
বাণীতে তাহাদের সমান অধিকার হ'ক্, মল বিধের নারী  
পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করুক, তাহা হইলেই স্ত্রী-  
স্বাধীনতা হইল, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা হইলেই দেশ স্বাধীন  
হইবে।

আর একদলের মত, নারীকে আমাদের স্রাচা আদর্শে  
নিকিতা কর, দীতা সমস্তরী আদর্শ গ্রহণ করুক, তাহাখন  
মহাত্মার সীতা অব্যয়ন করুক, তাহা হইলেই ভারতের  
নারী জাগরিত হইবে।

কিন্তু বাণীরাই হইলে—এই আন্দোলনের দুগে কতক  
সুখ চাচেন যে, নারীদের কত কিছু একটা করা নিত্য  
বহুকার; আর নারীরাও তাহাদের নিকটের দানী পরিহার  
কত অত্যন্ত বাস চাইয়া উঠিয়াছে। কিছু করা বহুকার,  
একটা কিছু হওয়া বহুকার ইহা আমরা সকলেই বুঝিতেছি—  
কিন্তু কিসে হওয়া বহুকার, কিসে তাহার বহুকার, কোথায়  
তাহার সমাপ্তি, তাহা কেহই চাহার করিয়া উঠিতে পারি-  
তেছিরা, আর পারিতেছি না বলিয়াই নানারকম যোগ  
যোগের সন্ধি চাইতেছে।

এই সমস্তার সীমায়া কোথায়? তবে একটা কথা  
বোধ্য আর কোনদলের মতবিশ্বাস নাই যে, নারীকে  
নিকিতা করা উচিত; কিন্তু তাহার পরেই যত্নগোপন, যত্ন  
উত্তীর্ণ করিয়া তাহা নিকিতা করা উচিত। এই "এক" ও  
"তাব" লটাইই মাত্রাযারি।

আমি নিজে নারী, তেমন শিক্ষার কিছু আমার নাই,  
সুতরাং আমার মত যে একটা অসম্ভব চাইবে তাহাও বিশ্বাস  
করি না; কিন্তু স্রাভোক্তাই যেমন নিজের কথা বলিবার  
বাঞ্ছনীয় অধিকার আছে আমি তত্ব সেই অধিকারটুকু দাবা  
করিয়া আজ আমার মনের কথা আশ্রমদের কাছে মল  
ভাবে বলিতেছি, বিচার করার তাব আশ্রমদের। যদি কিছু  
অপ্রাসঙ্গিক বলি বা কোনরকম তুল টুক হই, অসঙ্গত করিয়া  
মাফনা করিয়া লইবেন।

কথাটা বলিতেছিলাম স্রা পিকার "এক" ও "তাব" লটাই  
যত যত্নগোপন। অনেক মনে করেন যে, আমাদের দেশের  
লোকের হাতেই যদি পান্ডা পান্ডিত তাহা হইলে এত কথা  
তাববার বহুকার ছিল না; আইন করিয়া পচাপ্রভা  
উদাহরা দেওয়া হইত, বিশ্ববাব্যাক স্রাচলিত হইত, বিবাহের  
বয়স নির্ধারিত হইত,—তাহা হইলে মল বহুকারের কম  
সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নারী-জাগরণের পালা শেষ হইয়া যাইত,  
এক সেই স্বাধীনতা-প্রাপ্ত নারীদের বিধ-ভঙ্গিতে সমস্ত  
পান্ডাতা জগৎ চমকিত হইত।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইত কি না-হইত তাহার মন্ত  
দ্বীত্ব আমাদের মন্তবে, তাবিধা চিহ্নিধা বাচির করিতে  
হইবে না। এই তো লেখিন আজগানরাক আমাভ্রা মন্তাক



শাস্তাভ্যাসেণ জীৱতা আশিলেন এবং নিজেৰ বেলে আশিহাই আইনের চোৱে একেবাৰে পৰ্বাশ্ৰয়া উঠাইয়া দিলেন, শ্ৰী-  
লিকা বাহ্যাত্মক কৰিলেন, নাতোৱেৰ শোৰাক পৰিষ্কাৰ  
নশূৰ্ণৰূপে বদলাইয়া গেল, সমস্ত সমস্ত বস্তুবোৰ অককাৰ  
আবজ্ঞানপূৰ্ণ বৰ লগা যেন হ'বোৰ আলোকে উজালিত  
হইয়া উঠিল।

ফল তামাৰ কি হ'ল? ঘোড়িওপ্ৰত্যাপ আত্মগানবাৰে  
লক্ষিত ও আইনের সমস্ত ক্ষমতা বাৰ্য কৰিয়া উঠিল এক  
দাবণ মন্তবাদ বাহাৰ ফলে আত্মগানবাৰে লিংহালনচাত্ত এবং  
বিশবদ্যন্ত হইলেন।

তাৰা চটলেট দেখা বাইতেছে যে, লালনদত্ত আমাৰে  
চাতে থাকিলেও "নাট্যজ্ঞানৰণ" সমস্তাৰ মীমাংসা কৰা  
সম্ভবমানা নহে। এখানে বলিতে পাবেন যে, আত্মগানে  
এখনো নাট্যবোৰ বখেই লগাভুক্তি ছিল, কিন্তু এক লক্ষ্যক  
যোৱাৰ দল অক বিদ্যাস ও কৃষ্ণাভাৱেৰ বশবতী হইয়াই এই  
বিশব বাপাইয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা কৰি এই কথা, যদি সমস্ত নাট্য  
অন্ততঃ প্ৰকৃতি আত্মগানবাৰে আমাৰোৱাৰ প্ৰতি ও তাঁহাৰ  
মাতাৰেৰ প্ৰতি থাকিত তাৰা হইলে আশুন কি এইবশতাবে  
অগিয়া উঠিত? আমাৰ মনে হয় আত্মগানে সমস্ত নাট্য  
অন্ততঃ লগাভুক্তি আত্মগানবাৰে পান লাভ, যোৱাদেৰ  
কতক দোষ থাকিতে পাৰে হ'ল, কিন্তু নাট্যোৰ কতকাংশে  
তাঁহাৰ ভক্ত দাতা, কতকট আশুন লক্ষ্য আত্মগানে লগবণ  
হইল না।

কথাটা আৱণ একটু পৰিষ্কাৰ কৰিয়া বলি। এই  
নাট্য-মন্তাৰ সমস্তাৰ হইয়াছে তুৱে, কামাল পাণাৰ  
বাইতে, কামাল পাণাৰ পতাকাভালে সমস্ত তুৱে জাতি  
মৰমে মাথা নত কৰিয়াছে; এবং তাঁহাৰ ফলে গড়িয়া উঠি-  
য়াছে সেখানে এক ক্ষুদ্র সভা। কথাটা একটু বিবেচনা  
কৰিয়া দেখিলে প্ৰায় উঠে, যে মাতাৰ আত্মগানেৰ লক্ষ হইল

না তাৰা তুৱে লক্ষ হইল কেমন কৰিয়া?

আত্মগান বেণ এখনও বহু পৰ্যন্ত, দেখানে লোকেৰ  
ভাৱেৰ দাতা একটুও বদলাই নাই, কামে কাজেই আত্মগান-  
বাৰেৰ ভাৱশক্তি কেমন কাৰ্য্য হইল না; অন্তৰিকে

কামালপাণা প্ৰমুখ যে আত্মগান গড়িয়া তুলিল তাঁহাৰ ফলে  
তুৱেৰেৰ প্ৰাণশক্তিৰ নিৰালম ও গণতন্ত্ৰেৰ শাসন-প্ৰতিষ্ঠা  
হইয়া গেল। ইফালেই লাই যোকা বাৰ যে, কামালপাণা  
বাইত তাঁহাৰ বেলেৰ বাই, আৰ আত্মগান বাৰেৰ বাই  
তুৱেৰ তাঁহাৰই বাই, তাঁহাৰ বেলেৰ নহে।

এই ছবিটোৰো বৰ্তমান ইতিহাস আমাৰেৰ তুৱে এই  
লক্ষাই দেখে যে, কোন জাতিকে জাগৰিত কৰিতে চটলে,  
নাট্যই হোক বা পুৰুষই হোক, বেলে প্ৰথমত শিক্ষাৰ  
প্ৰয়োজন। তাঁতপুৰ্বে বলিতেছিলাম যে, নাট্যৰ শিক্ষাৰ  
'ভাব' ও 'ৰূপ' কিতল হইবে? আমি কোন ৰকম শিক্ষাৰ  
লক্ষ্য কৰি না, কাৰণ শিক্ষাৰ ভিতৰে জাতীয় বিৰোধা  
নাই, তবে শিক্ষাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'লো চাই মন্তাৰে কি নাট্য  
লাভ কৰা।

প্ৰতি পুৰুষ ও নাট্যৰ ভিতৰে বেলে শিক্ষা বিয়াকে,  
প্ৰকৃতিৰ নিমমে পুৰুষ ও নাট্যৰ কাম মীমাংসক আকে, তাৰা  
কেচ লক্ষন কৰিতে পাৰে না, ইফালে যদি লক্ষ্য হয় তাৰা  
হইলে প্ৰকৃতিকে বহু কৰিয়া শিক্ষাকে তাৰাৰ অহুঁল  
কৰিলে—আমাৰ মনে হয় সেই শিক্ষাই প্ৰকৃতিশিক্ষা হইবে।  
নাট্যকে শিক্ষা দেওৱা বৰকাৰ, কিন্তু একথাও লক্ষ লক্ষ  
মনে লক্ষ্য বৰকাৰ যে বেলে কাল ও পুৰুষেৰ সভাভাৱ  
'ভাব'বাৰা একেবাৰে বাদ দিলে চলে না।

বেলেৰ বাই বেলেৰ আত্মগানবাৰে উপলক্ষ মাটি ও  
আলো বাতাস পাইলে লক্ষ যেমন লক্ষ্যে বৰ্দ্ধিত হয়, যেমন  
তাঁহাৰ আত্মকিক মিত্তামল শোভা বেলে,—কিনেলেৰ  
আত্মভাৱেৰ মতো পড়িয়া কিলেৰে আলো ও বাতাসে বৰ্দ্ধিত  
হইয়া সেই শোভা, সেই ৰূপ, সেই গন্ধ, সেই ৰস,  
কিছুই সেই ৰকমটি হয় না। ইফালে প্ৰকৃতিৰ পক্ষে যেমন  
লক্ষ্য, মানবজাতিৰ পক্ষেও ইফালে যেমন আত্মকিক নিমম।  
এই নিমমে লক্ষন কৰা হইলেই প্ৰকৃতিকে লক্ষন কৰা  
হয়।

প্ৰত্যেক বেলেৰই এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে;  
প্ৰত্যেক বেলেৰই ভাববাৰা কীৰনমাশন গাণী হুতৰ;  
হুতৰাং সেই বাতাসা ও বৈশিষ্ট্যকে একেবাৰে বাধ  
দিয়া যে শিক্ষা লইতে চাই, সে শিক্ষা কোনকালে

## শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

শিক্ষাকালে লক্ষ্য হয় না, তাহাতে একটু পুঁত থাকিয়াই যায়।

এই ভাবে বহুপূর্বে কথিগণ যে সভ্যতা ও সাধনার বিদ্যা শিখাছিলেন এবং জীবনযাপন-প্রণালী ও বৈশ্বকল সামাজিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এই য়েপের নরনারীর মধ্যরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিহিত আছে। যে শিক্ষা এই ভাবধারা ও পূর্ণোক্ত নিয়ম-গুলির আত্মল পরিবর্তন করিয়া সংসারের নামে ভাগবতের বিধান বাস্তব, সেই শিক্ষা কখনই য়েপের চিত্তকর হইতে পারে না। একথা নিশ্চয়,—তবে একথাও ঠিক, যে নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা বলপূর্ব্বক বংশের পূর্বে এই য়েপের উপযোগী ছিল, তাহা এতকাল পরেও যে সবটুকু সেইরূপ ভাবে উপযোগী হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে; কারণের সংজ্ঞা-ধীনরতা অতুল্যারে ভাঙার সংস্কার ও পরিবর্তন আবশ্যক। এবং সেই পরিবর্তন ও সংস্কারের ফলে প্রত্যেক য়েপের নিজস্ব ভাবধারা অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতর

ভাবে লগতের সময়ে সভ্যমান হয়,—ইহাটুকু ভক্ত শিক্ষা আবশ্যক।

কারণ, শিক্ষাই মনকে প্রশস্ত করিয়া দেয়, ও কালেব উপযোগী পরিবর্তন ও সংস্কারকে প্রণয়ন কবিবার পক্ষে ব্যক্তিহইয়া তোলে।

এখন কথা হইতেছে, ভারতের নারীর শিক্ষা: কিস্তি কইবে? আমি বলি, সব শিক্ষাই আমরা গ্রহণ কবিতে প্রস্তুত আছি, যাহা য়েপের ভাবধারায় দৃঢ়ত সামঞ্জস্য বাধিয়া চলেবে; এবং সেইরূপ শিক্ষার শিক্ষিতা হইয়া ভাবধাতে যে “নারী-দম্প” গড়িয়া উঠিবে সেই “নারী-দম্প”ই ভারতের সকল নারীর শিক্ষা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়া দিবে।

শুধুহেবা এই অধিকারে চপ্তকণ করিতে গেলে ভাগ্য গোলাগোলেবই ফুটি হইবে, কাগাত কিছুই হইবে না, এবং ভারতের নারী থাকে যে ভিত্তিবে সেই শ্রীমৈত্রেয়ী থাকিয়া থাকিবে, ইহা স্থানিষ্ঠত কথা।

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

## বয়স

## শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

তখন সন্ধ্যাকালে

অন্ত রবি দূরের পেকে রত্নিন আলো ঢালে,

সূর্যের দ্যত পাপড়ি স্তম্ভি বিদায় বাধায় ভাবে—

পড়েছিল ক’রে!

বইল বাতাস বাবে,

দিনের আলো আসিল তখন সন্ধ্যাসাগর তীরে,

রবি তখন লেগেছিল সূর্যের গগন কোরে।

দূরেই মাঠে খেলতেছিল একটা ছোট মেয়ে,

মধুর তার হাসি,

নবীন কচি পাতায় পাতায় বাজাছিল বাদি।

তখন ওই সে বুড়ো, সব কাজে ব্যর্থ হেলা,

ব’লে ব’লে খেলতেছিল ছোট মেয়ের বেলা।

বাট পেরিয়ে এল বোব কয় তাল,

তালয় মন্ড, সকল দৃশ্য, পূণ্যের একাকার।



হঠাৎ ব'লে আপন ঘনে দেখছিল ওর খেলা,  
অন্ধকারে ঘীরে ঘীরে নাড়তেছিল বেলা ।

ছোট্ট মেয়ে তার

ওপের আলোর কুবিরে দিলো সকল অন্ধকার ।  
বা তার কাপন লাগিলে গেল কীকড়া তারার চুপে  
পুড়ো মনের গোপন পুড়োর সকল দিগে খুলে ।

বুড়ো তখন তাবুতেছিল আপন ঘনে ঘনে,

এমন হল কেন—

এমন কেন ওর,

উজার বয়স আট যদি বা হবে, আমারে বা বাড়ি কেন গো কর ?  
আমারও ত এমনি ছিল যিন, এমনি ছিল বেলা,  
আমারও ত বুকের উপর দিগে গেছে এমন যথুর লক্ষা বেলা,  
আমারও ত এমনি ছিল হাসি, কজিন মাঝার জাল,  
লোক বলে অনেক দিনের কথা, সে যে অনেক কাল ।

কে জানেই কাল কাটারে বলে, কে জানেই তার !

কে জানেই এমন ক'রে কেন বয়স শুধুই বেড়ে চলে যায় ;

এ যে শুধু ভোলায় কথার বলে,

কে জানেই বয়স করে বলে !

কে জানেই কোথায় বুকের বুকের ক'রে ক'রে

কোন এক স্রোতে মূহুর পথে কাল চলেছে ব'য়ে !

তারার মাতাল প্রাণের সাথে অড়িয়ে মোদের প্রাণ,

সে কেন রে, বাবার বেলায় দেখরে আমার টান !

দীর্ঘ করে দীর্ঘ করে পরাণ ছল ছল,

সে কেন রে মোদের, বলবে চল চল ?

সকল তার সকল সত্য মিথ্যা ক'রে যায়,—

তারেই কিসে বয়স বলে তার !

চাইনা আমি শুনে কখন কথা,

চাইনা আমি শুলে কথার বলে ।

আমার শুধু সত্যি ক'রে হল, বয়স করে বলে ।

## পরিত্য

—গল্প—

—ঐশ্বর্যবোধ বস্তু

মেয়েটির নাম নীলা । সে কোন ঘরে কলেজে পড়ে, কলেজের নাম অরুণ, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । তারা প্রতিবেশী, কিন্তু তাদের আলাপ নাই, সুখ চেনা মাত্র । অরুণ জানালা দিয়া নীচে চাষিয়া চর তো দেখিত মেয়েটি বাসে, দিয়া উঠিতেছে, না চর বাড়ির পাড়িতে হাওয়া বাইতে চলিয়াছে । তাহের বাড়ির সমস্ত দেখা বাইত না, শুধু ছোট বাগানটা কুছকুড়া পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা দেখা বাইত, আর কোণার ঘরটা পর্দা দিয়া বন্ধ দেখাইত । দক্ষিণদিকের জানালার দ্বারা দিয়া ইঁড়াইলে দেখা যাউত মেয়েটি একটি মোসল চোরায়ে বসিয়া গুলিতে-গুলিতে পড়া তৈরী করিতেছে । সে না থাকিলে সেটা খালি পড়িয়া থাকিত । সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিলে অরুণ স্তমিত মেয়েটি মিলিগলার গান পাঠিতেছে, তার ছোট ভাইটি কচি গলা দিকির গলত সাথে মিলিয়াছে । কোণের ঘর হইতে পর্দা, ঢাকা জানালা গলাইয়া দরের অধিবাসিনীর কথাবার্তাও কিছু কাণে আসিত । ওমা, কলেজের বেলা হ'লে সেল বে; খোকার দোরগাতি বেখে ঘা, খাতার উপর কালি ঢেলে দিলে, আর পারিলে বাগু; বাবা দাড়া আছ দিনমহাতে নিরে বাবে,—পাড়ি পাঠিয়ে দিও, কলেজের বাসে আসতে হ'লে সন্ধ্যা, না হর টামেই আসু ।

অরুণ পাড়িতে পড়িতে হঠাৎ চাষিয়া দেখিত চরতো ঘোলন্ চোরায়ে বসিয়া পড়িতে পড়িতে বই রাখিয়া চোখ তুলিয়া মেয়েটি তাহার দরের দিকে তাকাইয়া আছে । চোখচোখি হইলে ত'জনেরই বাড়ি ভাঙিয়া আবার পড়া লুক করিত । কলেজে থাকার সময় নীচে অরুণের মাগে মেয়েটির মাঝে মাঝে সুখোমুখিও হইয়া বাইত । ত'জনেই একটু পরত হইয়া উঠিত, তারপর অরুণ টামে বাইয়া উঠিত, মেয়েটি বাইয়া বাসে বসিত ।

এখনি অনেকদিন হইয়াছে ; ত'জনের কলেজে বাইবার

সময় জান ত'জনেরই হইয়া গেছে ; কে কখন শোখাক সাধারণত পরে তাকাত তাহের অজানা নাই । নীলা দেখিত অরুণ পরে চিলাহাতা পাল্লাধা, গায়ে তলরের ভিখা পরনের চামড়া, পরে দেহ মধ্যমের স্কাটাল । অরুণ দেখিত মেয়েটা স্নাতকদিনই পাড়ি বদলায়, তার পাচোড়ো ছুতো কোনটা বে কোনদিন পরে দিবে ঠিক নাই, কলাব-দেওয়া রাউল, মাল রঙটা ভারী শঙ্খ । তারই মত লাল রঙের পার্কারের ফাউন্টেন পেন্ । ত'জনে দুক্তনের সোনার ঘড়ি চেনে, একজনেরটা চোরাগেট রঙের মধ্যমের বাগু দিয়া বাধা মাতেকজনেরটা চুড়ির সঙ্গে জাঁটা । কোনদিন চরতো মেয়েটির বাসে হাওয়া চাইত না, বাসু আসিবার দেরী দেখিয়া টামে চলিয়া বাইত । অরুণ বা বাড়ির পাড়িতে বাইত । অনেকদিন তারা একটামেই পিরাচে এলুগানেডে টাম বদল করিয়া আবার একটামেই গিয়া উঠিয়াছে ।

কিন্তু তাহের আলাপ নাই । পরস্পর পরস্পরকে চেনে । এ জানে, ও বার নব্বরের বাড়িটার মোড়লার উঠিব দ্বারের লাকান ঘরতোতে বসিয়া টোবংল কুঁকিয়া বড় বড় বলাভা মলাটের বই পড়ে, আর ছাবলুসের টি-শার্টে রাখিয়া পেয়ালার পর পেয়ালো চা নিশেবে কবে,—টামে একলসে গিলিলে আভ্যন্তর-বিশিষ্টের কাছে রাখিয়া যায়, আর যোগ করি প্রতিদিনই বা দিনেমা দেখিতে যায়, না চলে দিনেমাতে গেলেই ওর সঙ্গে দেখা হয় কি করিয়া । ও জানে, মেয়েটি এগারো নব্বের থাকে, টামে চাপিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে গামেনা, শেখার “এজেন্সি” হাতে লেখা পুরিয়া খাট হইয়া কলেজে যায়, নিজেদের মোটরে কমই কলেজে যায়, কিন্তু প্রতি-সন্ধ্যায় হাওয়া বাইতে বাহির হয় ।

অরুণ নীলার নাম জানে না । বাড়িতে কি জানি কি বলিছ ডাকে—ঠিক থোকা যায় না । বহুল না থোকা,



দ্রিক করিতে না। পানিরা মনে-মনে নাম রাখিল বেলা।  
নীলা কিন্তু অকপের নাম কানে। অকপের বন্ধুরা আসিয়া  
ধন-তখন নীচ হইতে চাংকার করিয়া তাকে ডাকে,  
তাগতেই সে জানিয়াছে। রবিবার দিন নীলা দেখিত  
অকপ চুইটা না বাজতেই টেনিস্‌ ব্যাকেট হাতে বাহির হইয়া  
পড়ে, কিংবা কোন বন্ধু আসিয়া ঘোঁটার করিয়া তাহাকে  
বেড়াইতে গিয়া। বাঘ, না হয় ঘরে বসিয়া সে শাল-কঙ্কের  
আধান খাটার কি দেখে। অকপ বেধে পনিবার এসে  
চাং নীলা কোথায় ঘাট, গাড়িতে তাহার যে মেয়ে-বন্ধুরা  
চাংয়ের হাতেও অননি কিছু একটা-না-একটা হয়।

তার গুহায়েট চকনকে দূর হইতে দেখে, পরস্পরের  
আঁবেনবায়ী সধকে অনেক কিছুই বলিতে পারে। অকপ  
বলিতে পারে নীলা কোথায় কখন উঠে, আর বায়ান্বায়  
পায়চারি করিতে করিতে গুণ গুণ করিয়া কোন একটা  
প্রকাজী হুত স্তম্ভগণ করে। নীলা জানে কখন অকপ শেব  
পাতের আনন্ড অকপারে ডেভেলোপার টানে, কখন বা সুখ  
দুইয়া আসিয়া বন্ধু আঁবেনবায়ী লম্বে গাড়াইয়া মাথা ক্রস্  
করে।

অকপ ঘেরিত নীলা কবিতা লুৎ করিয়া পড়ে; এটা  
তার অভ্যাস। অকপ দেখিতে চাটিলেও সে মনে মনে  
পড়ে না। পড়িতে বসিলে তার হুই, তাইটা আসিয়া তাকে  
বার বার বাতিবাস্ত করিয়া তোলে। নীলা রূপ দেখাইয়া  
বলে, দেখে-খোকন, হার খেতে চান; আং তোরা আলার  
আর বাটিনে; চুই,মি কয়েনা লজাটি, আচ্ছা ছবি দেখাচ্চি,  
বসিয়া রকতো সাগরে তাইটিকে কোলের কাছে টানিয়া  
আনিয়া ছবি দেখাও।

এমনভাবে পাখা মেথিয়া দিন চলিয়া যায়।

অকপ তারার লাল-খাটাটে বেলার কথা কখনায়  
পাশে মিশাইয়া কবিতা লেখে। সে কবিতা কাগজও নামে  
নয়, কিন্তু নীলাই তাহা ছুটাইয়া তার আঁবেনবায়ী হইয়া  
উঠিয়াছিল। নীলা রকতো কাজ না থাকিলে রঙ আর  
তুলি লইয়া বায়ান্বায় ছোট টেনিলে খাটা রাখিয়া  
ছবি আঁকিতে বসিয়া বাটত। কুক্কুয়াট প্রস্তুত  
পাখার পানে তাকিয়া কোন চিত্রই তার

মনে দৃষ্টিত না, এবং কোন অসহক অপে পাণের বাড়ির  
পাঠ বত হেলেনটির ছবির মত আঁকিয়া পড়িত। তারপর  
লজ্জার সে ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিত।

অকপ ভাবিত ঐ মেয়েটি যদি তারার পাশে আলাপ  
করিত তবে সে সুখী হইত। নীলা ভাবিত অকপ যদি  
আসিয়া তারার সঙ্গে কথা বলে তবে সে সুখী হইয়াই আলাপ  
করিবে। কিন্তু অকপ ভাবিল, আসিয়া কথা কহিলে রকতো  
অশোভন দেখাইবে—অন্তএব বন্ধুকার নাই। নীলা ভাবিল,  
সে কি করিয়া নিজের আগাইয়া আলাপ করে। ইচ্ছাতে  
হয় তো তার চকলতা প্রকাশ পাইবে; অত পরজ সে  
দেখাইতে যার কেন। অকপের মাঝার সহিত নীলার বাবার  
আলাপ আছে, তবে বতটুকু না থাকিলে নয় মাত্র ততটুকু।  
কিন্তু পাশাপাশি এই ছুটি বাড়ির মধ্যে অপরিচয়ই বেশি।  
কেবল এ বাড়ির হেলেনটির সহিত ও-বাড়ির  
মেয়েটির চেনা, কিন্তু সে চেনা এক অদৃষ্ট  
রকমের। কাকর পাশে কাকর আলাপ নাই, কাকর পাশে  
কাকর সান্না-সান্নি জানা-পোনা নাই; কিন্তু  
তবু এক বিচিত্র ধরণের পরিচয় থাকে একেবারে উপেক্ষা  
করাও চলে না।

একদিন মেয়েটির জন্ম-উৎসব আসিল। অনেক  
নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আসিয়া মেয়েটির ছুটপাখের বার ভরিয়া  
বিল। অকপ দেখিতে গেল নীলার দাখা মোটরে করিয়া  
একগ্রাণ ফুলের তোড়া আর মালা কিনিয়া আসিল;  
মেয়েটির অনেক বন্ধুবান্ধব আসিল। এক লম্বা জানুলা  
মিয়া চাকিয়া অকপ দেখিল মেয়েটি পংখের পাড়ি  
পড়িয়া, পলাই ফুলের মালা বিজা চকন-চড়িত বুখে  
বায়ান্বায় রিলিঙ্ক করিয়া তারার ঘরের দিকে তাকিয়া  
রকিয়াছে। চোখো-চোখি হইতে নীলা সলজ্জ ভাবে  
জাড়াটাকি করে চলিয়া গেল। অকপ উৎসবের আর কিছুই  
দেখিতে গেল না, শুধু দৃষ্টির বাহিরে হল-ঘরটার ভিতর  
হইতে পানো বৃত্তলব কানে আসিয়া পৌছিল। সে  
তাকিল মেয়েটির সহিত আলাপ থাকিলে আজ সে তাকে  
বাধ দিতে পারিত না।

সে রাতে নিজের ঘরে শুইয়া-শুইয়া নীলা শুনিল অনেক  
গাভ পাঁজর অল্প গাধা বাজাইল। নীলা ভাবিল ছেলেটি  
কেন বাঁধিও বাজায়।

স্নান-মাস্তে এখন বন্ধুর আদিয়া অকপের ঘরটা  
জাঁকিয়া বসিত, নীলা তাদের উচ্চ গান আর কথা-বার্তা  
শুনিত শব্দিত। অকপের বন্ধুদের অনেককে সে খুব চিনিয়া  
কলিয়াছে; কে কখন আসে, কতকণ বা থাকিয়া চলিয়া  
যায়, দেখিতে-দেখিতে অনেকটাই নীলার অন্তর জটয়া  
গেল। অকপ লম্বা-অঙ্গের ‘চ্যনিকা’ পুণিয়া পড়িতে  
থাকে, কিবা রবীন্দ্রনাথের নতুন গানের একটা-দুইটা কপি  
গাওয়া উঠিয়া ইন্দি-চোরাটোতে দিয়া বই লইয়া চাইয়া পড়ে।  
নীলা তার ‘শ্রীভক্তিনি’খানি টেকিলের উপর পুণিয়া  
বসে।

এমনি করিয়া দিন যায়। গ্রীষ্মে দিন নটরাজের নৃত্যের  
ছন্দে মাতিয়া শেষে সন্ধ্যায়ের দূর ধরিল। একদিন  
ভোর ইঁহেই আকাশ মেঘে অন্ধকার, মাঝে-মাঝে ক্রি-  
বির করিয়া হঠাৎ একটু রুষ্টিও হইতেছে। গাছগুলি  
সমতা-হাওয়াতে কপে কপে গুলিয়া উঠিতেছে। দূরে  
গম্বুজ-গুলা বাড়িটার উপর দিগা একটা মেঘের ঐরাবত  
চলিয়া গেল। কোন্ অলকার কলপুসীতে কোন্ প্রাচ্যের  
উপর দিগা, কোন মসরে জনপদে দ্বারা লকারিত করিয়া  
কোন্ নদী-পঙ্কজ ডিঙাইয়া সে যে বাইবে তালা কে জানে।  
নীলা শুনিল ভোর হইতে অকপ হুঁহু করিয়া মেঘ-নৃত্যের  
পূর্ণ-মেঘের স্নোক্তগণি পড়িয়া বাইতেছে। এই বর্ষায়  
দিনে কখনো আর জন-সন্ধ্যায়ের মিলিত এই স্নোক্তগণি  
তার ভারী চন্দ্রকর লাগিল। তার মনে হইল এ  
খন বর্ষারই হুঁহু।

অকপ দেখিল নীলাবের বায়ান্ধা মনের কাপটার  
অনেকটা ভিজিয়া গেছে। মেঘটি আসিয়া মসাঁ-কাণো  
দিশন্তের পানে কপেক চাইয়া ঘরে চলিয়া গেল, আবার  
আসিল, আবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। অকপ শুনিল আজ  
অত্যন্ত মনসে পর্দা-মাফল ঐ ঘরটা হইতে এপ্রাচ্যের  
টানা হুঁহু বাজিতেছে। গানের পৈ ও হুঁহু হু-একটা  
কানে আসিল, কিন্তু অত্যন্ত বিরল। সেদিন অকপ কলমে

গেল না। নীলারও বাসু আদিয়া কিরিয়া গেল। তপু-  
বোশের অল্প ‘চ্যনিকা’ পড়িতে-পড়িতে পড়া কুণিয়া জান্না  
দিগা চাইয়া চাইবে দেখিল নীলার ছোট ভাইটি একটা কদম  
ফুলের তোড়া লগা ছুটিয়া বাতায়ের চলিয়া আসিয়াছে,  
নীলা শিখন-শিখনে আসিয়া সেটা কাড়িয়া লইল। ছেলেটি  
তাহাতে কাদিয়া উঠিল। নীলা তাগ হইতে একটা ফুল দিয়া  
আদর করিয়া ভাইটিকে ধরে উনিয়া লইল। একটু পরে  
চাইয়া দেখিল নীলা আবার বায়ান্ধা কিরিয়া আসিয়া  
রেণ্ডে ভর করিয়া উদাল-চোখে চাইয়া ‘মোছে—তার  
খোঁপাতে খোঁপা একটা কদমফুল। এই সব মাগনিকার  
মনিমির পঞ্চাঙ্গের দৃষ্টিতে সে হুঁহু-বিশ্বের দেখিয়া লইল।

তারপর অকপের তরবার করিয়া গুটি নামিল; কাছ  
দূরের সব-কিছু আবছা হইয়া গেল। গান সান্ধিত-গান্ধিতে  
নীলা শুনিল পানের বাড়ীর ছেলেটির বাঁধি রুষ্টি করতালি  
ডেব করিয়া যেন হুঁহু পার চাইয়া আদিয়া কীদ হইয়া  
বাঁজিতেছে। নীলা গান বন্ধ করিয়া তাহাই শুনিতে  
লাগিল।

সেই দিন নীলা ভাবিল সে নিজেই ঐ-ছেলেটির সহিত  
একদিন আলাপ করিয়া লইবে। পর্দা তো তানব ছিল না,  
তার বাবা-মা মেঘেরের স্বাধীনতা পছন্দ করিতেন।

নতুন একটা বাঙালি মাণিক-পত্রিকার পাতা উন্টাইতে  
উন্টাইতে পুস্তক-সমাগোচনার জাফিয়া চাইবে অকপের  
নামটা দেখিয়া নীলা আগ্রহে হুঁকিয়া পড়িল। অকপের  
লেখা একটা কাব্য-গ্রন্থকে সমালোচনা করা হইয়াছে।  
বইখানার নাম ‘বেলা’ সম্পাদক পূর্ব প্রদেশে করিয়া  
লিখিয়াছে—এরই মধ্যে কবি বাঙালী-সাহিত্যে বেশ নাম  
করিয়াছেন, এ কাব্য-গ্রন্থটি তাহার প্রতিভার পরিচয় দেয়।  
কয়েক টুকরা কবিতা সমালোচনার মধ্যে ছড়ান ছিল, নীলা  
পড়িয়া দেখিল ভারী মিষ্টি।

সেদিন বিকাল-বেলা গাওয়া বাইরে দিয়া নীলা দাদাকে  
লইয়া বড় একটা বইয়ের দোকানে দিগা উপস্থিত হইল।  
গোটা প্রায় অল্প বইয়ের সহিত অকপের কাব্য-গ্রন্থটিও  
কিনিয়া আসিল। সে রাতে বইটি শেষ করিয়া ঘুড় হইয়া  
সে জাবিল, কী চন্দ্রকর!





পরে মিনি নীলার বন্ধু মাধবী আসিয়া বুক-বেসের  
এই নাক্সা চোড়া করিয়া অকপের বটট টানিয়া বাহির করিল।  
নীলা অকপের লক্ষ্যের লাগ হইয়া উঠিল। বটট একটু  
উঠাইয়া পাঠাইয়া মাধবী করিল, "ভাগ্যী চন্দ্রকার হয়েছে,  
না?" নীলা কিছু বলিল না। মাধবী করিল, "কি চন্দ্রকার  
শ্রীকি বাজার।" নীলা করিল, "হবে। ভোর সন্ধ্যা চেনা  
আছে?" মাধবী করিল, "মুখ চেনা গোছেয়। মিসলদার  
এক কিনা।" ইহার পর অকপের কাব্য-লগ্নে আস্তে কণা  
ঠহিল। মাধবী চলিয়া গেলে নীলা ভাবিল সে কালই  
অকপের দূরিত আশ্রয় করিবে।

পর দিন নীলার বাসু আসিয়া দেবী আছে দেখিয়া  
চলিয়া গেল। মেটর পাড়ি নীলার বাবাকে লইয়া বাহির  
হইয়া গেছে। নীলা সানান্যার বেশ কুণা লাগিয়া কোন  
টামে ঘাইবে ব্যাকস্মার গাড়াইয়া তাই হঠাৎ ভাবিতেছিল।  
ব্যরোটার ক্রাস, তাকাতাড়ি ঘাইবার তেমন তাক্সা ছিল না, শুণ  
করিয়্য রেগিল খরিয়্য সে গান করিতেছিল। পাথরে পথে  
চাফিয়া দেখিল অকপ কলেজে বাইবার মজ্ঞ প্রস্তত হইয়া নীচে  
নামিতেছে। নীলা মনে করিল তাহারো সময় হইয়াছে,  
সে তাকাতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। লোক-তর্কি  
টামে নীলাকে একটু মাধবী দেওয়া হইল—অকপ পিছনে  
গিয়া গাড়াইয়া করিল। এসুয়ানেন্ডে নামিয়া টাম বন্দাইয়া  
নীলা দেখিল অকপ তাঁকার এক বন্ধুর দৃষ্টি একটা বাসে  
ঘাইয়া উঠিল।

কয়েকদিন এমন করিয়া টামে ঘাইবার পরে নীলা  
দেখিল সে বতই আগাইয়া যায়, অকপ ততই দূরে সরিয়া  
চলে। একই সময়ের বাহিরে আসিয়া নীলা হঠাৎ টামে  
উঠিল, অকপ গাড়াটা। পরে টামের মজ্ঞ অশেপা করিয়া  
করিল। ওয়াল-কোর্ডের দোতলা বাসে নীলা চড়িল, অকপ  
পরের একতলা বাসে উঠিয়া বসিল।

অকপ অন্ত্যস্ত সন্ধান হইয়া গেল, বাহাতে একই সময়ে  
প্রতিদিন তাদের কলেজে বাইবার সময় না হয়। সে অন্ত্যস্ত  
সতর্ক হইয়া বাহাতে এক টামে না ঘাইতে হয় তাহাৎ দেখে।  
আগে এখন তাদের এসুনি সোন-পরিচার নিকিৎ হুইয়া উঠে  
নাই, তখন তাহা অনেক দিনই এক টামে চড়িয়া পাশাপাশি

বসিয়া গেছে, তাহাতে তার একটুকুও বাধে নাই; কিন্তু আজ-  
কাল অকপের কেমন লগ্নে হয়। সে ভাবে এখন তাকে  
মাকে-মাকে এক টামে চড়িতে দেখিলে যেমন্টি হঠাৎ কিছু  
ভাবিতে পারে। তাই অকপ সানান্যত তাকে এড়াইয়া চলে।  
নীলার দেবী করার অন্ত্যাস দেখে শুধরাইল। সে এখন  
কলেজের বাসে চাপিয়াই কলেজে যায়। অকপের ক্রাস  
দেবীতে থাকিলে সে দেখে নীলা এক তাক্সা বই লইয়া  
বাসে উঠিতেছে।

একদিন লক্ষ্যাবল্য অনেককাল পরে ইন্ডেন-গার্ডেনে  
বেড়াইতে গিয়া অকপ দেখিল নীলারা বেড়াইতেছে। প্রথমে  
সে কিছু দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ একবারে বুঝেমাখি  
হওয়াতে একেবারে ধমকিয়া গেল। তারপর দূরে এক  
বলক রক্ত লইয়া তাকাতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া  
বাঁচিল। পরের দিন গার্ডেনে বাণ্ড ছিল, তাহাকে তার  
এক বন্ধুর দৃষ্টি অনেকটা বাধা হইয়া আসিতে হইল। বাত  
মন্দিরের চারপাশে ভীড় কমিয়া গেছে, তাহারা দিয়া 'একটা  
গাস-পোটারে ধাবে গাড়াইল। একটি পানী মেরে ক্রিপের  
পাড়ি পরিচা তারের লক্ষ্যে গাড়াইয়াছিল, মুখ দেখা  
ঘাইতেছিল না, শুধু বাতাসে চূর্ণ-অলক গুলিতেছে তাহাই  
দেখা ঘাইতেছিল। একটা টিউন শেষ হইলে মেমন্টি  
তাকাতাড়ের দিকে করিয়া তাকাইতে সে মজ্ঞ বিষয়ে দেখিল  
হে, সে তাহাই প্রতিবেদিনী। অকপ তাহার বন্ধুকে কোন  
রকমে টানিয়া সেখান হইতে পালাইল। সে-লক্ষ্যার  
বেড়াইতে-বেড়াইতে এই কথাটাই তার মনে হইতেছিল,  
হিঃ নীলা কি ভাবিবে! তার চোখে সে যদি ছোট হইয়া যায়  
তবে তার চোখের পরিমোদা থাকিবে না।

ইহার পর অকপ তবে ইন্ডেন-গার্ডেনে আর আসিত না।  
কিন্তু কাল পারিয়া নীলার সব গানই জনিত। নীলার  
এলাভের দ্রুত কানে আসিলে বই তাহিয়া বসিয়া থাকিত,  
আর নীলার বাসে উঠার সময় না তাহিয়া থাকিতে পারিত  
না। ছোট তাহিরের দোহাআর খবর নীলার কথাবার্তা  
মধ্য দিয়া সে জানিতে পারিত, ব্যাকস্মার পোশু সোফে  
তাকে গুলিতে গুলিতে পড়িতেও দেখিত। কিন্তু যৌন  
পরিচয়কে মনের পোশন কোটা হইতে বাহিত করিবার আর

চেষ্টা সে করিত না। এক ব্যয়গার যে না করিত ভাল  
নচে, সে তার কবিতায়, কিছু কের তাহা ব্রুত না।

সেদিন রোষ ও বর্ণবের ভিতর কোন কাঁকে একটু  
কোথো উঠিয়াছে, সুত অর্থাৎ মধুর। কুকুড়া গাছের পাড়া  
হইতে তখনও কোঁটা-কোঁটা গুটির বিদ্যুৎ করিয়া পড়িতেছে  
এবং কোথা হইতে নাম-না-জানা একটা ফুলের গন্ধ  
ভাসিয়া আসিতেছে। গুটির সময় কানের আন্দোলন বহু  
করা ছিল, অল্প দেটা গুলিয়া সেখানে পাড়াইয়া  
বাধিবার সিকে তাকাইয়াছিল। জলে-তিখা রাস্তার পিচ  
চকচক করিতেছে। একটু দূরে ট্রামের রাস্তার মোটরগুলি  
হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলে। মাঝে মাঝে দু-একটা রিক্সার  
টুটাই শব্দ কানে আসে। একটু পরে অল্প শুনিয়া নীলা  
এস্রাফ বাজাইতেছে। কি যে গুর সে নাম জানে না, কিন্তু  
\*এ সময়ের স্মৃতি তার সারী চমৎকার মিল ছিল। শুনিতে  
শুনিতে আনন্দ। হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ চক্ষিয়া চাইয়া  
যেখনি ঘেরেরি কখন এস্রাফ বাজাইয়া যেরে পর্দাটা সরাইয়া  
দিত্তেছে। অল্প লক্ষ্য কর একবারে মরিয়া পেল। ঘেরেরি  
তাকে অমনি জাবে পাড়াইয়া থাকিতে দেখিলে কি ভাবিলে!  
সাত্তা লক্ষ্যাবলো সে ইহাই ভাবিয়া কাটাইল যে, তার কাজটা  
অত্যন্ত অভ্যস্তের মত হইয়াছে, ইহাতে নীলা সত্যি সত্যিই  
রাগিতে পারে।

ইহার পরদিন নীলা যেখনি অল্পের ঘরের ভাদের  
দিকের আন্দোলন পর্দা পড়িয়াছে। নীলা ভাবিল হঠাৎ সে  
অমনি করিয়া তাকাইয়া থাকিত বলিয়া এ আক্রমণ  
আকর্ষণ। সে চমকিত হইল, একটু লক্ষ্যও পাইল।  
ইহার পর অল্প আর নীলাকে খোলন্ চোখে চুলিতে  
দেখে না। নীলার কাছেও অল্পের জীবনযাত্রা আর চোখে  
পড়ে না। পর্দার উপর দিয়া আয়নার কেটুকু চোখে পড়ে  
তাহাতে কখন কখন অল্পের ছায়া দেখা যায়। হঠাৎ  
পড়িতেছে, নবজো দেই লাল খাতাটাতে কি লিখিতেছে।

শব্দ জো আর পর্দাতে বহু হ্রস্ব, তাই দেটা চলে। অল্প  
শোনে, নীলা তেমন আশায়ে ভাবীর মাকে ছোট ভাইয়ের  
কৌতুকীয় কথা জানাইতেছে, নীলার দায়ের স্মৃতি দিনে-মা-  
খিরেটোরে দাবার চুক্তি করিতে ক্রিমি কপকা করিতেছে,

না এর গান করিতেছে, কিংবা এস্রাফে কি সব মিলি তর  
তুলিতেছে। নীলা শোনে অল্প 'চরনিকা' হইতে কবিতা  
আবৃত্তি করিতেছে, না এর কাছারও সাথে কথা করিতে  
কহিতে উচ্চস্রবে লালিয়া উঠিতেছে, না এর রাত গভীর  
হইলে গাশীতে বাসেই রাগিনীতে গুর পরিচায়ে।

হঠাৎ কখনো বড় রাস্তার ট্রাম-স্টেশনে ধারে তাড়াবে দেখা  
হইত। কিন্তু সে কণিকের গুহ। তারপরই অল্প নামের  
বাস্টাতে সমস্ত ভীত অবস্থা করিয়া উঠিয়া পড়িত। নীলা  
তখন অল্পমিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ট্রামের অপেক্ষার চাহিয়া  
থাকিত। দিনে-মাতে হঠাৎ কখনও দেখা হইত,  
কিন্তু অনেক দূরে দূরে। অল্প নীলার দিকে তাকাইত,  
নীলাও অল্পের দিকে তাকাইত; তারপর চোখোচোখি  
হইলে আর চাহিত না।

একদিন প্রামোফনের নতুন রেকর্ড কিনিতে গিয়া  
অল্প ও তার এক বড় বিলম্ব কিনিবার মতো কিছুই  
পুঁজিয়া পাইল না। দোকানের লোকটি বলিল, "নীলা  
দেবীর একটি রেকর্ড বেঁচেছে, যে-কোনোজের ছাড়া।"  
অল্পের বহুটি মোহমোহে গিলিল, "হে! কেমন চমকে,  
আমুন পিগুনির।" লোকটি হেঁচকটি আনিতে গেল। অল্প  
কহিল, "কেমন গার ঘেরেরি, ভাল।" "বহু তাহাকে নাড়;  
বিদ্যা কহিল, "চিনিম্লে গাখা, তোার ঞাণের বাঁচ  
দে থাকে। চমৎকার গার। কেন গান কখনো শুন্তে  
পান্ না?"

অল্প সে রেকর্ড কিনিয়া গেল। নীলা দেবীর আছো  
রেকর্ড থাকিলে আরো গুহিত। সে রাখে উত্তর-বর্তের  
মোক পড়িতে পড়িতে নীলা হঠাৎ আশ্চর্য হইল। কান  
পাড়িয়া শুনি অল্পের প্রামোফনের রাক্ষ গানের রেকর্ড  
বাজিতেছে। নীলার হাতী আনন্দ হইল। সে চানিয়া  
পর্দাটা সরাইয়া নিজের গান শুনিয়া বাইতে লাগিল।  
তারপর রাত্রি বহন গভীর হইয়াছে বিনতি লবায় কুটয়া  
নীলা শুনি তাহার গানটি আবার বাজান হইতেছে, তারপর  
আবার, আবার, আরবার—সে গানের যেন শেষ হইবে না।  
নীলার চোখের জল আর বাধা মানিল না। অল্পের কাহা-  
এবং 'বেলা'র অনেক কবিতা যেন সহজ হইয়া বাইতে চাহিল।



ভাষার সাহায্যে প্রতিদিনই রাত গভীর হইলে সে জনিত অরুণের ঘরে ভাষারই গানটি চলিতেছে।

একদিন সিনেমা ভাঙিয়া বাটবার পরে অরুণ ভীড় ঐলিয়া অগ্রসর হইয়া আশিতে সম্মত। একটি ঘরের উপর আসিয়া পড়িল। যেহেতু ক্রিয়াজ্ঞা তাহার দিকে চাহিতেই অরুণ দেখিল যেহেতু নীলা। অপ্রতিভ কণ্ঠে “মাশ কব্বেন” বলিয়া অরুণ কোন মতে ভীড়ের মধ্যে মিশাইয়া বাতির আসিয়া দাঁপ ছাড়িয়া বাটিল। যেহেতু যে তাকে কত বড় অসুখ ভাবিবে মনে করিয়া তাহার নিজের মাথা চুকিতে উজ্জ্বল হইতেছিল। নীলা তাহার দিকে যে ভাষার গুটি চোখ উঠাইয়া তাকাইয়াছিল, সে ভাবিল এ তাহার নীরব চন্দ্রনা।

সে-বারে নীলা দেখিল প্রায়শ্চক্রে তাহার রেকর্ড আর বাজিল না। অরুণের গায়ের শ্রবণ আর শোনা গেল না। নীলা অনেকক্ষণ কাগিয়া প্রতীক্ষা করিল, তার পর রাত সতীর হইলে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের রাতেও প্রায়শ্চক্রে বাজিল না। গায়ী অনেক রাতে বাজিল। নীলা শুনি গায়ীতে বাজিতেছে,—বেদনার আর্তি ভজন সুর। বাসিলে সুখ ভাঙিয়া সে শুইয়া পড়িল।

কয়েকদিন পরে অরুণ দেখিল তাহার বন্ধু বিমল আসিয়া ও বাড়িতে তার কথাইয়া তুলিয়াছে। তাহার যেন মাথারকৈ সে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসিত দেখিত, বিমলকে সে আগে কোনো দিন দেখে নাই। বিমল এখন মাঝে মাঝে নীলাদের সহিত তাদের মোটরে গাওয়া গাইতে বাতির ছয়, কখনও বা নিজেই মোটরে ইহাদের বেড়াইয়া আসে। সিনেমাসে বিমলকে সে ইহাদের সহিত মাঝে-মাঝে দেখে। অরুণের মনে একটা বেদনা ঐলিয়া উঠে।

একদিন অরুণ নিউ-মার্কেটে একটা ফুলের তোড়া কিনিয়া টল হইতে একটু দূরে আসিতেই দেখিল নীলা, তার দাদা, ছোট ভাই আর বিমল একটা ফুলের ঠেলের ধারে দিয়া দাঁড়াইল। বিমল নীলার দাবাকে

একটা খেত-পত্রে তোড়া আর ছোট ডাইটকে একটা লাগ-পত্র কিনিয়া দিল। তারপর নীলার ভক্ত মন্ত বড় একটা বসুয়া গোলাপের তোড়া আনিয়া বিলাতী কাগজের নত কটা একটু গাঙ্গিয়া তোড়াটি উপচার দিল। অরুণ লিপ্তনে ঠাঁট দিয়া তাকুতাকি হাঁটিয়া বাসে উঠিয়া বসিল।

নীলা রাজে অরুণের বাসি শোনে। তাহার সুর যে কল্প হইতে কল্পন্তর হইতেছে তাহা তাহার কাছে গোপন থাকে না। তাহার কান্না পাথ।

ইহার কিছুদিন পরে এক গুরুদক্ষ্যবেলা অরুণ তাকু-তাকি বাড়ি ফিরিল, কারণ পরের দিন তাকে এক মাসিক-পত্রের ভক্ত একটি গল্প লিখিয়া দিবার কথা ছিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ভোৎসাহ্য ঘর ভরিয়া গেছে, পুঁথিবিকের জাল্য দিয়া রাত্তার শাপের গাছে ছায়া টেবিলের উপর নৃত্য করিতেছে। তাহার আলোটা আশিতে উজ্জ্বল হইল। না। দাঁকনের বাতাস জানালার পর্দাটাকে ঢোল করিয়া তুলিয়াছিল। সে দিয়া অনেক দিন পরে পর্দাটা টানিয়া সরাইয়া দিল।

নীলাদের বাসায় গোখ পড়িতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ভোৎসাহ্য বারান্দাটা ভরিয়া গেছে। “তাইই মধ্যে একটি ঘরে ও একটি ঘরক বসিয়া দুঃ-ভায়ে কি কথা বলিতেছে। মেহেট তাহার দিকে শিখর ক্রিয়য়া বসিয়াছিল, তাহার শিঁ ও খোঁশা দেখা বাহিতেছিল। কিন্তু অরুণ বুঝিল, সে নীলা। হেলেনি অরুণের অপরচিত নহে, তাহারই বন্ধু বিমল। অরুণ দেখিল বিমলের চোখ গুটি আনন্দে উজ্জ্বল। সে তাকুতাকি পর্দাটা আবার টানিয়া দিয়া বাসিলে সুখ ভাঙিয়া পড়িল। সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, কষ্টকা, আশা আকাঙ্ক্ষা আবহা হইয়া গাছের ছায়ায় মতোই ঢোল হইয়া গুলিতে লাগিল। ঈর্ষা? কিন্তু কেন? যে মেহেটের সহিত তার আশাপ মাত্র নাই তার ভক্ত ঈর্ষা! সে কথাটা উঁকুইয়া দিতে চাহিল,—কিন্তু একটা বেদনার অজুহাত তাহার সমস্ত চেতনার মধ্যে কাগিয়া রহিল।

\*

একমাস পরে এক গুরু রক্তদীতে লাহানার তানে বিমলের সহিত নীলার বিবাহ হইয়া গেল। বিমল অরুণকে

নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন অল্প নিতান্ত দরকার বলিয়া বিমলের একান্ত অসুযোগে অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতার বাহিরে কোণার চলিয়া গিয়াছিল। ইহার পরের দিন কলোজে ঘাইতে অনুবিদ্যা হর বলিয়া অল্প মামার কাছ ছাড়িয়া গোটেলে চলিয়া আসিল। তাব বন্ধুবাছবেণা অথাক্ হইয়া দেখিল অল্প অল্পস্থল বকম বাচাল চইয়া উঠিয়াছে এবং কোন না-কোন একটা টেবিলে মইয়া মাতিয়া আছে। মামা তনিয়া কহিলেন, অত টেবিলে কতো না। প'ড়ে-তুনে কাঠ-কাল পাওয়া চাই। অল্প কিছু বলিল না।

নীনা বিবাহের পরে বস্ত্রবাড়ি হইতে প্রথম বেদিন সজ্জাবেনা করিয়া আসিল যেদিন নিম্নের বস্ত্রের পর্দা সরাইয়া দেখিল অল্পের বরটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে,

পর্দা চলিয়া গেছে, মাগো নাট, যে একটা চকল জীবনের সাজা দেখান হইতে পাওয়া বাইত তামা সস্তিয়া গেছে। তখু পরিত্যক্ত বস্ত্রটার মধ্যে যেন অন্ধকার যেন বৈতান্ত মত নীরবে শিয়া রহিয়াছে। তার চোখতটী ছলছলিয়া উঠিল। রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ভাবিয়া ছিল। যে বাসিটি স্ত্রী-রাজেই ব্যক্তি তামা আর বাছিল না, কি একটা নিশাচর পাখী কর্তৃক-পরে ডাকিয়া গেল। একদিন রাতে তার গানের রেকডটী ত্রিশ বার বাজিয়াছিল, সে রাহের কথাটা মনে পড়িয়া তার মন বাবার তরীয়া উঠিল। সে উঠিয়া শিয়া পর্দা সরাইয়া অন্ধকার শূন্য বস্ত্রটার পানে উদাস-চোখে চাহিয়া রহিল। বস্ত্রের ভিতর আত্মকা বাতাস ঢুকিয়া সৌখ্যবাদ ভাগাইতেছে। অল্প আশিয়া পড়িতে-চল। সে বাধা দিল না।

## বিলাস-পরিচয়

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

তোমার সোনার অঙ্গে এত লজ্জা দরম ভর,  
সকল অঙ্গ দেহ যে তবু বিলাস-পরিচয়;  
তোমার লিখির সিঁদুর রেখা  
নিবিড় অসুযোগের লেখা,  
তোমার পাড়ীর আঁচল-সোলায় কাগুন লাগিয়া বহ,  
সকল অঙ্গ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয়।

অলুপা চুড়ির রিনিম্ব-কিনি দেহ কত সংবাদ,  
গৃহকণ্ঠের কঁকে কঁকে হঠাৎ পরমাদ।  
তোমার সলাক ভাগর অঁধি,  
হাতছানি দেহ থাকি থাকি,  
আমার বেবে বাহ যে বেবে তোমার চরণর;  
সকল অঙ্গ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয়।

তোমার তরুণ তরুণতার কতই বাসি মাগে,  
তোমার রক্তা পাড়ীখানি লাল যে অসুযোগে;  
পান-বাগা-পান পুতুল টোটে  
বাগর রাতেও ছন্দ কোটে,  
জোড়া কুলুহ মাগণানে টিপু আঁগুন ছেদেই রহ;  
সকল অঙ্গ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয়।

তোমার ঘাড়ের শিখর-কিরে গুঁচার উড়া চুল,  
নরতো খোঁল। নরতো বৈশি, তবুও ঢুলঢুল।  
বসই চানো আঁচলখানি,  
ততই যেন তোমার আনি,  
\* চাকুতে গিরে জ্বলিবে মিলে এই লাগে বিষয়।  
সকল কর্দ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয়।



মাথার কঁটা দুলাচিকম্বী ছোটের অনলকণা,  
তোমার গলাব সান্তনরী হার কোলমে ঘোবনা ।  
মীচলে ঐ চাবির গোছায,  
চরণ চলে আলতা-মোছায,  
তোমার শাড়ীর ডাঁতে ডাঁতে আনন্দ-চক্ষণ !  
সকল অঙ্গ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয় !

চুলটি বাধো বৈকালে সই, আরসি পানি পাতি,  
তখন মনে কাগে নাকি মধুর কত বাতি ?  
যখন তুমি লজ্জাক্ষণে,  
বিছিন্না পাঠো আপন মনে,  
তখন তোমার মনের কোণে কিসের আঁচনর ?  
সকল কণ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয় !

যতই তুমি সাবধানেতে চলাফেরা করো,  
তোমার মনের অজানাতেই নিজেই ঘরা পড়ো,  
তোমার নীরব বেচলভা  
জানায় তোমার মনের কথা,  
চুপ ক'রে ভই, ব'লে থাকো, চুপ করা সে নর,  
তোমার মনের সাক্ষ-মহলের ঘাও যে পরিচয় !

যত-পত্র তোমার ঘরে রথ যে অপোস্তাব,  
আরনা পমান কবির মনে পাতা তোমার কাঁধ ;  
যতই তুমি এড়িয়ে চলো  
তোমার তুমি বাড়িয়ে তোলা,  
আবুক খেঁচি চাক্তে দিখে আবক তোমার কর ।  
সকল কণ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয় !

আলুগা নোপা এখন তোমার হঠাৎ খুলে পড়ে,  
ও'হাত দিখে বাড়িয়ে তা মাও বাতে আঁচল ধ'রে,  
শামাজ এট কাপটি নিয়ে,  
মন যে আমার দাও তাকিয়ে  
এট টুকুতেই টালিয়ে দে' বাও, মন যে কেমন হয় !  
সকল কণ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয় !

খোঁবন তোমার সিঁদ-তটি লক্ষাইকু নিয়ে,  
কি রঙ কানাও তুমি তারই আড়াল দিখে ;  
সপায়ে দাও আঁচল টানি,  
দেখতে যা পাই একটু পানি,  
সেই টুকুতেই তোমার দেহের পাই যে পরিচয় ;  
তোমার দেহের সকল শবর সেই টুকুতেই কণ !

ওগো রাণী, নিজেই তুমি জানো নাক হার,  
তোমার দেহের আলয়ে তুমি কতই অঙ্গার ।  
তোমার চলে কলা গাঁড়া,  
ঘোবনেরি দেহ যে সাদা,  
ছলা কলার পাচ পেথনি, নিঃশব্দ নির্ভর !  
সকল অঙ্গ দেহ যে তোমার বিলাস-পরিচয় !



# শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব

## ঐশ্বরীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্রনাথের ৬৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে বিগত ২৪শে বৈশাখ একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিভাগব্দের ঐশ্বর্যবকাশ অনেকদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। বৈশাখের শেষ—আকাশে এক ফোঁটা মেঘের স্ফোর নাহি, তাতে ভুবনভাঙার ঘোমনবাণী ভাঙা খোঁগাই; আকাশে গোড়া গালটকটকে গোহার গুটির মত ভূপুংবলার রক্তা কীকরগুলি পথে ঘাটে চোখ লাকাইয়া লগ্নিকের লবঙ্গকরণে ভীতি জন্মাইতেছে। গালবোঁধকার শান্তিনিকেতন কেন এই মকতূমিতে মগজান বিবেশ। কিছু কালের অভাবে এখানকার অবস্থাও পোচনীর, নিম্নাধের নিম্নাধ তুচ্ছতা হইয়া কোমলকম প্রামল ঐক্য ধূম্রমলন করিয়া ভুলিয়াছে। বিভাগব্দের ছাত-ছাতী কসী-অশাপক সকলেই বাহিরে ছুটি উপভোগে চলিয়া গিয়াছেন, আশ্রম একতরপ শূন্য বলিলেই হয়। এই নির্জন নীরলতার মধ্যে তবু যে-কয়জন শূন্যতাকেই আশ্রয় করিয়া মাছেন, তাঁহারা শব্দের মিলনমাধুর্য্য দিয়া প্রাণকে পূর্ণ করিবার ক্ষম উৎসাহ-সঙ্করে শুকদেবের অংগেদগের আয়োজন করিলেন।

২৪শে ভাদের উট্টিয়া বাহিরে চোখ মেপিতেই আকাশের এক অতিনব রং ছদ্মবেশে আকর্ষণ করিল। মেঘমেঘে আকাশ ভাইয়া গিয়াছে, তাহার স্তম্ভক প্রামল ছায়া পড়িয়া বরষার বাহনিনীর্ণ মূখখানিতে এতদিন পরে একটু উল্লাসের সিন্ধু আতা ছুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল, বিসম্বৎ কেন বৈতালিক গান বহিয়াছে—“এলু, এলু এস মল্ল খন, বাঘল বরিষণে—”

বিকাশের দিকে,—আমাদের মধ্যে তখন উৎসবের পালের দাড়া কাগিয়াছে, হঠাৎ একি তনি—“ওক ওক গগন মাকে”—বাঘল মেঘে যে বাঘল বাজিতে শুরু হইয়াছে। তানিগাম তাইতো—প্রকৃতির প্রাণের মাধু

রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রাণের মানসী প্রকৃতি। আজ কবির শুভ অধিভি।—মান-ভগ জায়বদ্য কহালদার দেহে মূহুর্ৎ থাকিয়া, আজ কেন খেলে বাহিরে ভিতরে আকর্ষক এত রঙ্গের প্রাণের প্রকৃতির, এরকম বৃত্তিতে আর বাকী রহিল না। চাঞ্চিয়া দেখি—সুন্দরের অর্জুনায় প্রকৃতির আমাদেয় হার মানাইয়া অক চইতেই তাহার অপকরণ রসগোবর্ধণের অধিনিবেশনে উদ্ভূত হইয়া উৎসবকে প্রজ্বলিাইয়া বসিয়াছে।

তার উৎসবই আরম্ভ হইল আগে। সে কি মেঘ! সে কি তার লক্ষ্যমান, সে কি বায়ুবেশ তার বাহিরবশ। পথখাট ভাদিয়া গেল। ছলছল কলকল রবে কুল ছাপাইয়া কলহার্য্য ছুটিতে লাগিল। বায়ুর কঁঠও নারব রকিল না। দান থাকিতেই লক্ষ্য হইল। আঁখির গগনের কালো গারে নিকষে কনকরেখার মতো ফণে ফণে বাঁকাবিচ্যুত চম্কাইতে লাগিল। ভিত্তে আঁটির গুচ্ছ লমক: বাতাসে উড়িয়া আনিয়া মনকে ভিলাইয়া দিল। আমরা জনকয়েক দৃক ও বালক রথন উৎসবকেই বাইরাগ লখে বাহিরের প্রতিফলতার একটা ঘরের বারান্দার মাটিক) পড়িয়াছি। বাহিরের উদ্ভাবনায় ভিতরেও একটা ধোলাভূম উঠিয়াছে। সঙ্গে ছিল একখত পুরবা ও ‘বিতোর’র নটরাজ-দংখা। ঝা করিয়া তারি শতা: হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিভিন্ন সুরতালে কবিতা-খানের কোষায়া ছুটাইতে লাগিলাম। ছেলেদের ধরিয়া রাখা কে। তাদের নাচ, তাদের ছুটাছুটি, সে কি সুখি! কেন সে কড়োবাগারই মত আব্বা। এইরূপে বাহিরকে সেদিন ঘরে ডাকিয়া আনিয়া উৎসবের অধিবাস লক একযোগে দায়া হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে বাহিরের বর্ষণ ক্ষান্ত হইল,—অমনি ঘরের উৎসবের মধুর আচ্ছাদন তানিগাম খটীকরে। “চং চং



তাঁর—“দল বাঁহা লকলে দুটিলায়। উত্তরাধনে  
 বলাবাহুল উদয়-পথে ছিল উৎসবের আবেশন।” সেখানে  
 মাঝের উপকরণ বেদী কিছু নয়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি  
 গম্বুজ কংক যেতের উপর করাল পাতা, তার এক ধারে  
 একটি বেদী, বেদীর আশেপাশে গুটিকয়েক মৃণাল-গোষ্ঠিত  
 রত্ন পতঙ্গ কৃত্তিক অদ্বায় বেলতলা আনত করিয়া যেন  
 প্রগতির ভঙ্গিতে চলিয়া পড়িয়াছে। সেখানে উপস্থিত চট্টা  
 দেখি এই ঘনতীর মধ্যেও জনসমাগম হইয়াছে মূল নয়। বীর-  
 কৃষকের প্রসিদ্ধ কবিদার ও সুসাহিত্যিক রাধা বাগাচর ঐশ্বর্য  
 নিখশিবে বংশোদ্ভাষ্য ও রাধা বাগাচর ঐশ্বর্য বিচার  
 বিচারী সুকোণাধার আশ্রয় উপস্থিত হইয়াছেন, তা ছাড়া  
 ঐনিকেন্দ্র ও শান্তিনিকেতনের ছাত্র-কর্মী ও মহিলাগণ,  
 এবং অধ্যাপকদের মধ্যে ঐশ্বর্য ভগদানন্দ বার, কাশীমোহন  
 বোম্ব, ও অধ্যাপক বহু, বৈদেশিকদের মধ্যে মিঃ বেনোয়া  
 ও মিঃ প্র্যাট এবং বীরভূমবাসী সম্প্রদায় সাহিত্যিক  
 ঐশ্বর্য সুধাকান্ত বার ‘চৌদুরী মঙ্গল’ও সেখানে মিলিত  
 হইয়াছেন। ইত্যাদের সম্মুখে বড় আনন্দ হইল। নিঃসঙ্গ তার  
 বৈচিত্র্যময় গুচ্ছ জীবনে অকস্মাৎ এই রস-উৎসবের পরিমিত  
 জনসমষ্টি যে কতখানি পূর্ণতাপ্রদ তাহা মাত্র এতদবস্থাতেই  
 উপলব্ধির বিষয়।

একটি স্নান বিধা প্রথমে উপাসনা আরম্ভ হইল। ঐশ্বর্য  
 কাশীমোহন বার আচায্যের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রার-  
 ম্ভের সময় তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—“যিনি আজ এ উৎসবের  
 উপলক্ষ্য, তাঁর কবিতার, তাঁর আশ্রয়ে জনতার কত না  
 লোক অহুস্মিত! তারা তাঁকে নানাভাবেই পূজিত  
 করে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতাই একই বিভিন্ন  
 রকমের। এ যাত্রায় তাঁরই সাক্ষাৎ পড়া। আমরা তাঁর  
 কাছ থেকে উপদেশ ও আশ্রয় নিজে গুরু ভাবুকতার ক্ষেত্রে  
 পশ্চাৎভাবে নই, অথবা জীবনের পথে অগ্রগত হ’লে চলছি।  
 আমরা যদি অথবা জীবন বিরোধী তাঁর আদর্শকে সার্বিক  
 করবার কাম্য লাগতে পারি তবে সেই হবে আমাদের স্বার্থ  
 প্রভা-প্রকাশ। তিনি এমনি আত্ম বর্জিত আমাদের মধ্যে  
 থেকে আমাদের জীবন ও বিশ্বাসের জীবনকে জীবন্ত  
 আদর্শ ও কাব্যলোক উদ্ভাসিত করে তুলুন, কত সম্ভাব্য।

উপলক্ষ্য করে, ভগবানের কাছে আমরা এই কামনা  
 নিবেদন করছি।”

উপাসনা শেষ হইলে রবীন্দ্রপ্রদত্ত বসে। সকলের  
 আগ্রহে ঐশ্বর্য নিখশিবে বার উপরত আলোচনার পরি-  
 চালনা আরম্ভ হয়। ঐশ্বর্য অধ্যাপক বহু “পুরবী”  
 হইতে “২০০ বৈশাখ” কবিতাটি পাঠ করেন, তারপর  
 রবীন্দ্রনাথের নাট্যের উপর একটি গবেষণামূলক লেখা পাঠ  
 করেন ঐশ্বর্য সুধাকান্ত বার। একটু দাঁড়াইলেও তাঁর  
 রচনার প্রতিপাদ্য রচয়িতা আমরা বিশ্বের দাবিদারবাচ্যে  
 এখানে সত্যিও করিয়া দিতেছি :—

—“ফলস্বরূপ, অতঃপরও ও ফলস্বরূপ, এটি তিনটি  
 নাটকের কাব্যগিরিকল্পনা ও ঘটনাবলীর প্রত্যেকক্ষেত্রে  
 একটি নিপুণ ভাবে ঐশ্বর্য আছে বলিয়া মনে হয়। এই  
 ঐশ্বর্য যেমন কাব্যের দিক দিয়া চরম পদ্ধতির সীমাবদ্ধ  
 বিবেচনা, তেমনি জীবনেরও পরিণতির দিক নির্দেশ কর-  
 তেছে। কাব্যের বিচারে ভাষা দিয়া জীবনের পরিণতির  
 যে দিকটি কবি ইচ্ছার মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা  
 এখানে আমাদের আলোচ্য।

তিনটি নাটকের মধ্যে একমূল লোক দেখা যায়, যাদের  
 নিষ্কট চোখে চাওজ, কানে শোনা, হাতে শাওয়া, পায়ে  
 চলাই একমাত্র সত্য। ফলস্বরূপ নব বৌদ্ধের দল, অতঃপ-  
 রতনের সুদর্শক বলা যায় এই মনের। আবার বিশ্রীত  
 বিবে একমূল লোকের নিষ্কট কর্তব্য ও তাগিদ একমাত্র  
 লক্ষ্য। ফলস্বরূপ দাবা, অতঃপরতনের অধিবাসীগণ এই  
 দলে। ক্রমে দেখা যায় এই মনের লোকেই অবদান  
 ঘনাইয়া আসে। আত্মপ্রতিষ্ঠার অস্তব বৈশাখ, সেখানেই  
 উভয় ও নিষ্ঠা মঙ্গল স্থাপিত হয়। আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত  
 দাবা, তাহা শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যে লক্ষ্য। ফলস্বরূপ  
 চরম, অতঃপরতনের বিরুদ্ধ, অতঃপরতনের শৈশবগোপন  
 এবং স্থিতিস্থাপন দলে মহাপ্রকট এই শ্রেণীর। পর্ব ঠিক কান  
 না থাকিলেও বিশ্বাধিগত চরম চিত্রের অপেক্ষা এই সুচ-  
 চিত্র নিষ্ঠাবানরাই আগে পথের লক্ষ্যন পায়। বিশ্বাধিপতি  
 চিত্রকে পথ দেখাইয়া গিয়া। চলে সংস্কারমূলক বহুপ্রাণ  
 প্রাণক ;—যে জ্বরের পথের পথিক। ফলস্বরূপ অল্প বাউল,

অল্পপত্রতমের প্রসঙ্গ ও অচলোচ্চয়ের পক্ষ—ইচ্ছা  
 বিশ্বের হৃদয়ে পড়িত মূর বিদ্যাইচ্ছা সকল বিরোধের উর্ধ্বে  
 উঠিয়াছে। ইচ্ছা কৃত্তিম মূর পারিয়া বিশ্বের অম্লনিহিত  
 সেই সূর্য্য আশ্রিত সহিত ক্ষুদ্র আশ্রিত বোম্বাসন করিয়া  
 দেয়। এই নিগমক্ষেত্রে চুই বিপরীত মূল আশ্রিত বেগে  
 তাবের ছই পক্ষেই আশ্রিত সূর্য্য রহিয়াছে। বিখ্যাত মূল  
 পরিচয়্য কথিতে পারিলেই দেখা যায় যে পরিপূর্ণ একই  
 সকল বস্তুকে নিরস্তিত করিতেছে; ব্যক্তিগত পক্ষি অথবা  
 আত্মপক্ষি সেই সূর্য্য একেই পক্ষি অংশে। সূর্য্য  
 আত্মপক্ষির উপলব্ধি পথ দিয়া ঘাইতই বিশ্বের অম্লনিহিত  
 সূর্য্য আত্মকে উপলব্ধি করা যায় এবং এই উপলব্ধিতেই

\* অমর্য্য গাভ হু।—

ইচ্ছা পরে এখানকার কলাভবনের ভূমিক হাজ কর্তৃক  
 তাঁহার স্বরচিত একটি কবিতা পঠিত হইলে, একটি গান হয়;  
 তখন, যৌগিকভাবে আলোচনার স্থাপত্য করেনঐত্ব  
 বিজ্ঞানবিদ্যার সুবোধাধার মহাপর। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলা  
 সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহন, নিগমমাধ স্বদেশের সৌরভপ্রতিভা  
 ও তাঁর কালের নির্ভূত কল্প, পদলালিতা এবং রূপূর্ণ  
 ভাবমণ্ডলে বিশ্বের স্রেষ্ঠ নিবন্ধন করিয়া তিনি কবির প্রতি  
 আত্মরিক প্রভা জ্ঞাপন করেন: পরে নিম্নলিখ্য আত্মানে  
 স্থাপত্য বাবু বলেন,—“আমার কাছে রবীন্দ্রকবো  
 একটা তিনি যুব প্রাণান্ত পেয়েছে বনে চর—সে হচ্ছে  
 “প্রকৃতি প্রেম”। প্রকৃতির কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি  
 পত্র মতোই স্থাপত্যে প্রকাশ পায়, আর কতকগুলি  
 আছে মাগুয়ের মতোই বার বিশেষ দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ  
 প্রকৃতিকে বেছেছেন প্রাণময় পানবিক সৃষ্টিতে নয়—  
 অহুত্বের রসগুণিতে বেছেছেন তিনি মানবীর প্রেমময়  
 কীমত প্রতিধারণে। তাই এখন তাঁর কাঁবা পড়ি,—  
 বেশ, সে তো শুধু কতকই মাত্র নয়, সে খেঁদ আমায়ই  
 মলোরে নিত্যকার পরমাখীর। তার মধ্যেই মানবেরই  
 আশা, মানবেরই ত্যাগ দেহ প্রেম, হুহু হুহু—সবই মানবের  
 মত ক’রে বসে-উৎসাহিত হচ্ছে। “নির্ব্বোধের বসন্তক”  
 কবিতাটিতে নির্ব্বোধের সুখে তনতে পাচ্ছি, আমায়েরই  
 বার্ষিক হতে সকলতার নবালোকে নব আশা-প্রবু জ্ঞানের

বিবক্ষিতী অভিমানে তুর্গাপনি; ঐত্বালির সেই—  
 “শব্দ তোমার অঙ্গ আলোর অঙ্গি।” গানটিতে শুধু  
 হুহু যে ছবিটি মানসপটে ভেসে উঠে, সে কি আমায়েরই  
 গুণবিচারিত তন-পতি তবী কুমারীর লাবণ্যময়ী গম্ভী  
 সৃষ্টি নয়? হুহু চেয়ে ভাল লাগে আমার—“লোনার  
 বাংলা” গানটি। বসন্তাধিক কবিতার এটি প্রকৃতির  
 চরম আদর্শ। সত্যে চোখে ভাল মটি আলো বাতাস প্রকৃতি  
 পক্ষত্বের সংমিশ্রণে যে বসন্ত গগন, তাই তাঁর অহুত্বের পবন-  
 মণির ছোঁয়া লেগে প্রকৃতির “লোনার বাংলা” গণ বয়েছে।  
 এখ মতো বেশি, প্রকৃতির মিলে হুহু হুহু হুহু হুহু হুহু হুহু  
 প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময়ী উপলব্ধিতে তার মাঝে তাঁর  
 আত্মবোধ খুঁটিছে। প্রথমে পাকান বাতাস বাতীর হুহু  
 তাঁর মন চরণ করল, তারপর আত্মের মনের ছাপ করল  
 পাগল, শেষে অস্ত্রের ভরা ক্ষেত মধুর ঘাসি বেশিবে তাঁকে  
 তনমৌলিকের পুষ্কার আত্মবিজ্ঞান ক’রে তেলল। যেখানে  
 গণ নাই সেখানে গজ, যেখানে গজ নাই সেখানে গজের  
 গোপন পথ হুহু কবি প্রকৃতির অহুত্বের মিলে  
 পৌঁছেছেন। বস বাতাস; বসই নীরল হোক না কেন,  
 তার জঘন্যতার সঙ্গততার আবেদনে স্রিতবের অহুত্ব  
 রসমিত্রকে বাইরে না বইয়ে এনে তিনি ছাড়েন নি।  
 প্রকৃতির মাঝে এই প্রেমলীলাটি তাঁর যেমন মধুর, তেমনি  
 পবিত্র, তেমনি হুহু ও হুহু।”

স্থাপত্য বাবু প্রচলিত আলোচনাটি তাঁর সঙ্গ  
 বাকপট্টার গুণে সকলেরই বড় জঘন্যগীতি হইয়াছিল।  
 মতঃপর ঐত্বক জনমানব বার মহাপর শান্তিনিকেতনে  
 রবীন্দ্রসাহিত্যের দাব্যকার প্রণার কামনাঃ এই প্রকৃতিপিকে  
 দরদর করিয়া রাখিবার জন্য বিবর্তনীয় কণেক বিভাগ  
 ও বিভাগের ছাউ ছাউয়ের নগো রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর  
 সঙ্গপ্রস্তর প্রবল রচনাকারকে চুইটি পুরস্কার ও তাঁর মণ  
 সত্যঃ এবং বাবুজীর বাবুজীর জন্য মহাপ্রাণক ঐত্বক ক্ষিতি-  
 মোচন দেন পাকী মহোদয়কে সভাপতি করিয়া একটি  
 ঘনভাটার ছাপনের প্রস্তাব উপাধন করেন; দরদর  
 কমে তাহা গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গেই ঐত্বক পৌন্দ্রনাথ  
 ঠাকুর বিবর্তনীয়তে রবীন্দ্রসাহিত্যের দাব্যবৃত্তিক উচ্চ





গবেষণার কাজ ১০০০০ টাকার একটি প্রতিষ্ঠাপনের  
অভিলাষ প্রকাশ করেন।

নিখলশিব বাবু উপসংহারে তাঁহার রচনায় লেখনীর  
প্রাচীনতা অক্ষর রাখিয়া নাতিবৃত্ত নিবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যে  
তাঁহার অকৃত্রিম অঙ্গুরণ ও ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-সম্প্রদায়ের  
কৌতুককর বর্ণনা প্রদান করেন। সবার পক্ষে রবীন্দ্র-

নাথেরই একটি কীর্তন গীত কইলে গুরুদ্বারীয় সুবাসনার  
জলযোগের অবসরে বিভিন্ন রসবস্তুর ব্যস্তত্ব রসাবাসনে  
যেহ মনোব সঙ্গীতীয় পরিকল্পনা দাখন করিয়া সকলে আমরা  
এবারের মত উৎসব সমাধা করিলাম। বলা বাহুল্য ঐদৃশ্য  
রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যস্থতাই ছিলেন এ উৎসবের অন্তিম  
উজ্জ্বলতা।

## পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

মানবের কাছে তেনে পুঁজা পাও পচিলে বৈশাখ,  
তাকি চান ? আক তব আগমনে দেশে বৈশাখের  
উৎসব-সভার পথ কখনে কখনে হুলস্থাপন করে  
কি জানায় ?—তুই নানী ছুটে আসে পুনি সেই ডাক।

সভাস্থলে খাঁড় করে চুড়, মৃগ, বালিকা, বালক,  
তোমারি চরণে সবে অর্বা দিল বাঁধা আঁচে দার ;  
কবি সে পাকিল দান, বৌদভার তুলিল স্বভাব,  
সভা মাকে জিনি' উঠে কোন নব জন্মের আলোক।

সে আলোক জ'লে ছিল কবে হ'তে—জান কি কোথায়,  
—কোন প্রাণে, কোন বাণে সে আলোক বাণিয়াছে বাণ,  
কবে হ'তে এই বিধে হুক হোল সে আলোর ভাষা,  
সে আলোর ছবিখানি স্রবণের উজ্জল প্রভা

প্রভাত সন্ধ্যাত ঘরে মিল'রের সঙ্গ ভক সনে  
ভাঙলে স্বপ্নের ঘোর কোন বেগে, কোথায়—কেমনে ?

তুমি আজি ভাবিও না, তে উজ্জল পচিলে বৈশাখ,  
তোমার সম্মান-টীকা অঁকা হোল বৈশাখী-আকাশে  
রবির কিরণ সনে, তাই এত আলোকে মাপে সে ;  
প্রভাত-প্রাকলভলে তাই আজি উৎসবের ডাক

নগল পথের রবে ঘরঘর বেগে বৈশাখের  
বরষার করিবারে তোমার গগন ; যুক্তিও না তুল,  
কবি বটে, মৈত্রে তবু পদস্রোত আলোর নুতন ;  
ছুনের খুঁবি সে যে দীপ্ত ছন্দে তৃণাখানি করে ;

কবি বটে—তবু সে যে মানবের জীবনের কবি।  
তোমার বন্ধের পথে গন্ত তার হয়েছিল এ'লে  
নর-নারী সবে আজি সভাস্থলে আসে বলে বলে,  
মনে করে, এমিনের সেই কোন মনোজ্ঞান ছবি।

—সে কবির, সে রবির নাই সন্ধ্যা, নাই ক্ষয় কতি,  
কালের গগনে সে যে অনিবার্য, বাণিময় জ্যোতি।

# সমস্যা-সাহিত্য

## আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

শ্রীশশীলচন্দ্র মিত্র

রূপক কাব্য ও অতীতব্রিত্তা

রোমান্টিক-বিপ্লবী সমালোচকের রোমান্টিজমের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ যোগ্য এই যে, রোমান্টিক সাহিত্য আমাদের এমন অনেক ভ্রম দিয়াছে যাহা নিছক কল্পনা-প্রসূত,—একবারেই অলৌকিক, মিথ্যা, মারামর। এতাবস্থার বহির্ভূত তাহাদের কোনো প্রতিষ্ঠা নাই-ই,—মনোজগত ও তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো দাবী নহে না। সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ এমনি করিয়াই বর্ণ করা হইয়াছে; এমন দাবীও নাকি করা হইয়াছে যে, সত্যকে প্রকাশ করা ও রূপদান করাটাই সাহিত্যের একমাত্র দৰ্শ বা উদ্দেশ্য নহে। ছেলে-বেলাও নাকি সাহিত্যের অন্ততম দৰ্শ,—অন্ততঃ পক্ষে এমন অনেক দরূণের সাহিত্য থাকিতে পারে যাহার কাজ সত্যকে প্রকাশ করা নহে, কেবলমাত্র রূপকল্পের সাহায্যে চিত্র-বিনোদন করা। ছেলে-বেলা হইলেও এই সব সাহিত্য নাকি উচ্চ-মস্তরের সাহিত্যের মধ্যেই স্থান পাইবার যোগ্য,—তথুই যদি তাহার মধ্যে কিছু স্বকৃতির পরিচয় থাকে, কিছু সৌন্দর্যের বিকাশ থাকে,—কিছু সত্যের প্রকাশ থাকিলে তাহা হইতে পারে।

স্বকৃতি ও সৌন্দর্য যেখানে আছে,—যেখানে সত্যের অভাব ঘটিতে পারে কি-না,—এ বিষয়ে তর্ক-প্রদ্বন্দ্ব হওয়া এ-প্রকার উদ্ভ্রান্ত নহে। তবে এ কথা ঠিক যে,—রোমান্টিজমের এমন একটা রূপ অনেক সাহিত্যেই পাওয়া যায়,—এবং ফরাসী সাহিত্যেও পণ্ডিত্য দিয়াছে যাহার

প্রতি, জাগরণের পুরুষে, বাস্তব অস্তিত্বের আমাদের প্রাণ লাড়ায় দেয় না,—অপ্রেরণা মধ্যে হৃৎ-ত বিতে পাতে। ফরাসী সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণ অস্বস্তির বর্ণনে নির্ভরতাবে এই সব সাহিত্যের উপর বর্ষিত হইয়াছে, তথাপি বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিকতার বিপুল স্রাবনের মধ্যেও এই দরূণের সাহিত্য আশ্রয় ফরাসীদেশে টিকিয়া আছে। তাহার অনেক কারণ থাকিতে পারে,—একটি কারণ যোগ্য এই যে,—যাহা কিছু কখনা যাহ না বা শাশ্বত যাহ না, তাহাই এমন একটা কৃত্রিমতার প্রচলিতকার মত তাহাদের অংশে হেঁচনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে,—মাত্রার মন একটা মূঢ় আকর্ষণী শক্তির তাড়নার তাহার বিকে প্রধাবিত হয়। রোমান্টিজমের এই বিশিষ্ট রূপটি হৃৎ-ত বা এই প্রকার আকর্ষণী শক্তিরই একটা অংশে প্রকাশ। কষ্টকার মূল্য তাহাই হউক না কেন,—অংশে প্রত্যক্ষযোগের পরিচয় হওয়া করিলে, বাস্তবিক দৃষ্টি-বৃত্তির নিকট টকা বরত ছেলে-মাত্রের বর্ণনা মনে হউক না কেন,—একটা কথা অব্যাকার করা যায় না যে, এই সাহিত্যে বাস্তব প্রাণের লাড়ায় দিয়াছে, তাহাকে এমনই অস্তিত্ব আবেগের দাও লাড়ায় দিয়াছে যে, প্রতিদিনকার প্রত্যক্ষ রূপে সেখানে রূপান্তরিত হইয়া নবীন বর্ণে উদ্ভাসিত, আমাদের মতিহার মস্তুর, অনিস্কটনীর মাপুরিতে মধুরতম চটকা উঠিয়াছে।

এই দিক দিয়া এই দরূণের রোমান্টিক সাহিত্যের মূল্যই বেওয়া হউক না কেন,—সমগ্রভাবে রোমান্টিক আন্দোলনের বিচার করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রোমান্টিজমের আদি অনুপ্রেরণা যে আদর্শ,



সে আদর্শ অনেক উচ্চতর,—সামাজিক চিন্তা-বিশোধনের জন্য একটা নতুনক মাধ্যমতা সৃষ্টি করা নয়। বস্তুতঃ সে আদর্শ ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শ হইতে বিভিন্ন নয়,—একই;—সত্যের অঙ্গুল্যকান ও নির্ধারণ। রোমান্টিকের নূতন অঙ্গুল্যেরণা আমাদের কতকগুলি এই আদর্শের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে,—সে কিরূপে সঠিক বিচারের সময় এখনো আসে নাই; তবে হারিদিগকেই,—সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এখন দেখিতে পাওয়া যায়,—নূতন করিয়া একটা কিছু সজ্জা তুলিবার বিরাট প্রয়াস।

কবীন্দ্র-কবিতার ক্ষয় ত রোমান্টিক অঙ্গুল্যেরণা হইতেই,—একথা বলিলে অতুক্তি হয় না। এমন-কি, উপজ্ঞানে ও নাটকে এখন রোমান্টিকের বিজয়-চমুতি ঘাঘিয়া দিয়াছিল,—এখন বিজ্ঞানের নিকট নূতন উৎসাহ পাইয়া উপজ্ঞান-চরিত্রাত্মক উপজ্ঞানের ভিতর দিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ভাবাসমূহ প্রতিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তখন হইতেই কবীন্দ্র-কাব্যে যেবা দিয়াছিল এক নূতন কবি-মন্ত্রদার,—সাহিত্যের মতামত ও মানব-জীবনের অধ্যয়ন বিজ্ঞান-বাহ্যিকের মতামতের দিক উন্মোচন। ইহাদের কাব্যের নাম রূপক-কবিতা Symbolisme। ইহাদের যে কল্পনা,—তাহা একবারে নিছক কল্পনা,—অর্থাৎ অস্ত্র কৈশোরে মনোবৃত্তির সঠিক প্রকাশিত নহে,—বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারাও ইহা অক্ষমুচিত। বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা আসন্ন বাস্তব পুষ্টি বা বিশ্লেষণ করি বা বাধ্যতা করি,—সেই বোঝা বা বিশ্লেষণ বা বাধ্যতার মধ্যেই প্রত্যক্ষ পার্থক্যতা;—কিন্তু এই রূপক-কবিতার কল্পনার যে রূপ বা ছবি দৃষ্টিয়া উঠে,—প্রত্যক্ষ পার্থক্যতা আশ্রয়তর মধ্যেই,—প্রত্যক্ষ কোনো অস্বপ্নমিত অর্থের মধ্যে নয়। অর্থ হইতে সে ছবি একটা কিছু থাকিতে পারে;—স্বপ্ন বা সে ছবি আশ্রয়ই কোনো অস্বপ্ন-ছবি-বোধের একটা সৃষ্টিমান প্রকাশ,—কিন্তু কবি সেটি অস্ত্রের মধ্যে উপলব্ধি করিতেই পারেন,—যেন প্রাণে অস্ত্রত্ব করিতে পারেন,—প্রত্যক্ষ ভিতর দিয়া বুদ্ধি-বৃত্তির নিকট আবেশন করিয়া প্রত্যক্ষ একটা বুদ্ধিসঙ্গত বাস্তব। করিতে পারেন না।

এই রূপক-কবিতার অগ্রণী ছিলেন পল্ ভেরালেন

(Paul Verlaine) ও আর্থার রিম্বো (Arthur Rimbaud)। রিম্বোর নিকট আমাদের এই পরিপূর্ণতাময় অঙ্গুল্যে ছিল একটা প্রতীকমানতা মাত্র, সত্য নয়। তিনি বলিতেন,—‘প্রাণি যদি বল, প্রাণিই ত আমি চাই।’ সেই ত সত্য। আমাদের যে ইন্দ্রিয়-বোধ,—তাহা ত একটি নিমিত্ত মাত্র, সৈবের বোধযোগ। তখন সত্য ত আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ নয়, তখন সত্য আমাদের অন্তরের অস্বপ্নমিত; ঐক্য তখনে নিখিল প্রস্তরবৎ রত। আমল জিনিষ ঘেঁহু, ঐ তরুর কন্দল,—নিখিল প্রস্তরবৎ নয়। আমাদের এই প্রাণী পৃথিবীটা কল্পি,—ইহার বায়ু মিথ্যা। এই পৃথিবীর বায়বা ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া সত্যের স্বপ্নপ্রাণ ও বাস্তবতা সত্য। কাব্যের ভিতর দিয়া সত্যের স্বপ্নপ্রাণ করিতে হইলে,—এই প্রতীকমান অঙ্গুল্য হইতে একবারে নিষ্কাশ হইতে হইবে,—কীপ দিতে হইবে, আমাদের অন্তরের সেই নূতন অঙ্গের মধ্যে, যেখানে আমাদের সমস্ত স্বপ্ন জীবন্ত হইয়া উঠে, যেখানে প্রাণ কিছু সত্য সকলই সূচের মত বিকশিত হইয়া উঠে।

এই রূপক-কবিতার অস্বপ্নমিত ছিল সর্বস্ব। ইহাদের মতে কাব্য কবির অস্বপ্নমিতই একটি সৃষ্টিমান বিশ্রু। ইহার আবেশন পাঠকেরও অস্বপ্নমিতই নিকট। প্রাণেরও বুদ্ধি-বৃত্তির সঠিক ইহার কোন সংশয় নাই,—না কবির,—না পাঠকের। এতদিন কবীন্দ্র সাহিত্যে যে কাব্যের প্রকাশ ছিল, তাহা প্রস্তরবৎ কঠোর ছিল না,—কেননা কবির প্রাণের আবেশটুকু বোধগম্য ভাষার অস্বপ্নমিত হইয়া পাঠকের বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে স্বপ্ন-প্রাণ-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে পথেই বিনষ্ট হইয়া বাইত, পাঠকের প্রাণে আসিয়া আর পৌঁছিতে পারিত না। তাই সত্যাকারের কবিতা দ্বারা, প্রাণের সঠিক বুদ্ধি-বৃত্তির কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। সে কবিতা পাঠকের প্রাণের নিকট কবির প্রাণের,—পাঠকের অস্বপ্নমিত নিকট কবির অস্বপ্নমিত একটি সোচ্চারিত নিবেশন;—এ নিবেশনে আর কিছুই সম্ভবতা নাই; কিছুই বাধ্য নাই, বিশ্লেষণ নাই;—আমের শুধু একটি ইচ্ছা। একটি অস্বপ্নমিত ভাষার কবির ও-পাঠকের অন্তরে অন্তরে একটি শব্দে পরিণত।

ঐশ্বর্যশীলচরিত্র

কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে এই আনন্ধানি, এই শাক্যৎ পরিণত সম্বন্ধ? এই পরিচয়ের প্রধান বাহ্য হইতেছে, স্থাপতি পরিচয় বোধের প্রতি আমাদের একটি বোধ। এই বোধ আমাদের পরিচয় করিতে হইবে, কারণ কাব্যের উপযোগী যে প্রাণের আবেগ,—তাঁহা আর বাস্তব উচ্চ, স্থাপতি ও পরিচয় নহ; তাহা নতির মাধ্যমে তাঁহাকে পরিচয় করিয়া উপলব্ধি করিতে গেলে, আমরা আর বাস্তব পাই না কেন, সেই আবেগটুকু পাইব না। কবি বটেই এই আবেগ-বিজ্ঞিত রক্তের মধ্যে ভূমিমা ঘাইলেন,— বসন্ত তিনি সেই বসন্তের মধ্যে; মানিকস্নায়ক প্রকাশ করবার চেষ্টা করিলেন, বসন্ত তিনি তাঁহার প্রাণের গোপন আবেগগুলি অস্বস্তির মধ্যে ফুটাইয়া ফুলিতে চাহিলেন, ততই তাঁহার কবিতার মর্মটুকু অংশেই হইতে অংশেই হইয়া খিলিঃ ঘাইবে একটি ইচ্ছার মধ্যে, তাঁহার প্রাণের রক্তটুকু রূপ ধরিয়া উঠিবে তাঁহার কাব্যের মধ্যে। কাব্যের এই যে সৃষ্টি,—ইহা বাক্য-অর্থের সাধারণ সম্বন্ধেই ঘটিত নহে;—এই সৃষ্টিরূপের যে উপকরণ,—তাঁহা ভাষার অলঙ্কার নহে,—তাঁহা কবির প্রাণের মধ্যে ভেদ-উচ্চা কতকগুলি ছবি। সে ছবি কবির ভাবের বা আবেগের একটা ভাষার অস্বাভাবিক মাত্র নহ, সে ছবি সেই ভাবাবেগেরই মাধ্যম; পরক যদি তাঁহার প্রতি আপনায় অস্বাভাবিক মেলিয়া দেন, তবে তাঁহা পাঠকের অস্বস্তিতে আঘাত করিয়া তাঁহার অন্তরে আপন-আপনিই তাগিয়া উঠে,—এমন কি পাঠক কবির ভাষার অর্থ না বুঝিলেও।

এলা বাস্তবা, এই ইচ্ছিত-অপ্রাণ রক্তের কাব্য সঙ্গীতের মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া ফেলেন। বসন্তঃ ফরাসী কাব্যের উপর সঙ্গীতের প্রভাব অপরিসর। বিশেষতঃ এই সময়ে Wagner-এর সীতি সঙ্গ-সম্মে সঙ্গমাণ কথিমা বিরাটিল— সঙ্গীতের রক্তের আবেগ-প্রকাশের কক্ষত কতখানি পত্তর, কেমন করিয়া একজনের প্রাণের অনির্লচনার প্রকাশ্য আবেগগুলি প্রাণের মধ্যে সৃষ্টিপ্রদ করিয়া আর একজনের প্রাণে ভ্রমজিমা বাধিয়া উঠে। এমনি করিয়া কবির প্রাণেও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল—তাঁহারই হৃদয়ের রক্তের মধ্যে সাধুদের গোপন প্রাণের সত্যটুকু ফুটাইয়া ফুলিলেন।

সে কাব্যের সাধারণ মর্মপ্রকাশেই কোন প্রাণের নাট, এমন কি, মর্ম প্রাণের চৌকিটিও কাঁচকনক, কেননা প্রাণের গোপন সত্যটুকু ফুটাই উঠে হৃদয়ের রক্তের মধ্যে, বাক্যের কবির মধ্যে, বাক্যের অর্থের মধ্যে নহ। এমন বাক্যের অর্থ অস্বস্তিকার কারণে অর্থ হৃদয় মিলিবে, রক্ত-মিলিবে না, কিন্তু সত্যটুকু মিলিবে না তাঁহা নিশ্চয়। তাহা কারণ বাক্যের অর্থপ্রকাশ করিতে তাহা বুদ্ধি-বুদ্ধির মাধ্যমে, শুধু নিজ সৃষ্টির বিশেষণ ও সংযোগ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া,—কিছু আমাদের গোপন প্রাণের সত্যটুকুর স্পষ্ট হইতেছে এই যে, সে আত্মপ্রকাশ করে ঠিক সেটাবলেন, যেখানে আমাদের সৃষ্টির ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

এমনি করিয়া এক নূতন ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে চলিল,—যাহা বুদ্ধি-বুদ্ধির নিজ সৃষ্টির নিয়ম আঃ মানিতে চাহিল না। সাধুদের অংশে চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল একটা নূতন রূপে যাহা বুদ্ধি-বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করা যায় না, যাহা ধারণা কবির কল্প চাই অল্প অল্প, আমাদের মননশক্তি (intuition)। এই সত্যপ্রিয় রূপের কবি ছিলেন স্তেফান্ মালার্মে (Stéphane Mallarmé)। আমরা সাধারণতঃ যে ভাগে বাস করি, কলর করি, বুদ্ধি করি, তক করি,—এই সত্যপ্রিয় রূপে সে যাহা হইতে অনেক দূরে,—একবারেই পৃথক। কবি বাস করেন এই সত্যপ্রিয় রূপে,—এই রূপের উদ্বোধন কাব্যের বিষয়। এখানে তিনি যাহা অস্বস্তক করেন, সাধা-রূপ বাস্তবিক রূপের তাহার তাকাকে যদি বলা যায়, তবে সেই সত্যই হইতেছে প্রকৃত সত্য, আমাদের ব্যক্তি-ভাবিক রূপের সত্যের চেয়ে অনেক বৈধি সত্য। শুধু তাই নহ, আমাদের বাস্তবিক রূপের সত্যটা হইতেছে সেই সত্যই একটা দ্বারা মাত্র, ঠিক বলিতে গেলে,—একটা সত্যি কল্প বিকার। কবি যখন বাস্তবিক রূপের এই দীন ভূমি প্রতীক্ষনাসক্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া গইয়া আপনায় অস্বস্তের মধ্যে থাকেন তখন হইয়া থাকেন, তখনই এই সত্যপ্রিয় উচ্চতর সত্য তাঁহার চৈতন্য প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে চিনিয়া গইয়া যায় অনেক উচ্চ,—সেই সত্যপ্রিয় রূপে। কবির কাব্যে এই অস্বস্তক



একটা পরিষ্কার বাখা বা বর্ণনা থাকিতে পারেনা,—  
থাকিলে শুধু ইতার প্রতি একটা ইঙ্গিত,—স্বরের ভিতর বিয়া,  
বা কবির স্রষ্টার বিয়া, ছবির বক্তারের ভিতর বিয়া ।

এইখানে মালামের সহিত রূপক কবিত্বের একটা মিল  
দেখা যায় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মালামের ঠিক রূপক কবি-  
ত্বের সলভূক্ত ছিলেন না । রূপক-কবিত্বের যে রূপ,  
সেখানে অল্পকৃতিত ছিল সন্দেহ,—গ্রানের মাঝেই সেখানে  
অল্পকৃতির মধ্যে রূপ খরসা ছুটিয়া উঠিত,—কিন্তু মালামের  
অন্তরে নয়, সেখানে মালামের চকলতা লুপ্ত হইয়াছিল  
পঙ্কজ হানের মধ্যে, সে রূপে ধরা যিয়াছিল মালামের  
মনন-শক্তি নিকট । তাই মালামের কাব্য ছিল অনেকটা  
লগ্ননিকতা-মিশ্রিত—উচ্চাৎক অতীন্দ্রিয়তার কবি বলিলে  
বোধ হয় ভুল হইবে না । কিন্তু এই অতীন্দ্রিয়তার কাব্যে  
মালামের চেয়েও অল্পসর হইয়াছিলেন পল ভালেরি  
( Paul Valéry ) । উভয়ের মতে কবিতার বিষয় মাহু-  
ত্বের আবেগ নয়, মাহুত্বের তাৎপর্য । কবির যে রূপ,  
তাহা মাহুত্বের দীপ-কিত্তি দ্বারাষ্ট পরিচালিত,—তবে এই  
দীপ-কিত্তি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত ঠিক  
একজাতীয় জিনিস নয় । সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তি বলিতে  
আমরা বুঝি,—তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের সৃষ্টি  
মিশ্রিত । ব্যবহারিক জীবনে এই বুদ্ধি-বৃত্তি সৃষ্টির পরি-  
চ্ছন্নতা ও তাহার পরিপূর্ততা অনুসন্ধান করে,—কিন্তু  
আমাদের যে দীপ-কিত্তি কবির অতীন্দ্রিয় রূপকে পরিচালনা  
করে তাহার সৃষ্টি এই ব্যবহারিক জীবনের কোনো  
সম্প্রদেই নাই । ব্যবহারিক রূপে হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন  
করিয়া লইতে পারিলেই আমরা কবির এই অতীন্দ্রিয়  
রূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি । এই রূপে  
আমাদের মনন-শক্তি আশ্রয়ে গ্রানের গভীরতম উৎস  
হইতে অক্ষয়ধারায় কাব্য-স্রোত বহিতে থাকে । এই  
কাব্য বাহির হইতে সৃষ্টিধারা বাখা করিবার নয়, ভিতর  
হইতে খরসা করিয়া অস্তরের মধ্যে পুনঃসৃষ্টি করিয়া  
লইবার । তাই এই অতীন্দ্রিয় কবিত্বের মতে কাব্য বুদ্ধিতে  
হইলে পাঠকেরও কবি হওয়া প্রয়োজন, অন্ততঃ এক  
দৃষ্টিভঙ্গি প্রদ ।

ব্যবহারিক বা প্রতীয়মান রূপ ও অতীন্দ্রিয় রূপের  
মধ্যে এই যে একটা পার্থক্য, বার্মার কল্যাণে, শুধু  
কাব্যে নয়, সাহিত্যের অন্তর বিতাগেও ছড়াইয়া পড়িয়া-  
ছিল । ইহা মানবজীবনের দ্বারার অশুভতার পক্ষে বিশেষ  
কল্যাণকর হইতে পারে না । বিজ্ঞানের একদিকে রহ-  
দৌরব, অন্তরিকে দার্ঘ্যতা বোধ হয় এমন কতিয়া মাহুত্বের  
জীবনের অশুভ দ্বারাকে বিদ্যা বিবর্তিত করিয়া বিদ্যাছিল ;  
রোমান্টিক আন্দোলন হইত বা এই বিচ্ছেদকে হানে হানে  
কোন কোন দিক দিয়া আরও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে ।  
কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই বিচ্ছেদের পুনঃসংযোগ  
স্বাভাবিক পাওয়া যাইবে,—রোমান্টিক মেয়েই মধ্যে, রোমান্টিক  
আমিষ-বোধের ভিতর মাহুত্বের সেই সচেতন আশ্রয়ভিত্তি  
এই আশ্রয়-ভিত্তির ফলে আমাদের অনুসন্ধানের কেন্দ্রটি  
সিঁড়িয়া সিঁড়িয়া বাহির হইতে অস্তরে, রূপে হইতে আত্মার  
মধ্যে । আমাদের বিশ্বাস এই আমিষ-বোধেরই মধ্যে  
প্রতীয়মান রূপ ও অতীন্দ্রিয় রূপের মধ্যে একাত্মতার  
সন্ধান মিলিবে । কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা । এখনই  
সে সবকিছু নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না । তবে সে বাহ্যি  
ইউক না কেন,—রোমান্টিক আন্দোলনের ফলে আধুনিক  
সাহিত্যে বর্তী অটলতার সৃষ্টি হইল না কেন,—আমরা  
মাহুত্বের সমস্ত চিত্তাভাঙ্গা, ছুঁড়িয়া উঠিয়াছে যে একটা  
মানবতার দ্বার, তাহাষ্ট রোমান্টিকের লক্ষ্যপ্রদ লান ।

আধুনিক কল্পনা সাহিত্যের সর্বত্রই সফল সন্দেহের  
লেখকের মধ্যেই পাওয়া যায়,—এই মানবতার আভাস ।  
বিভিন্ন সন্দেহের সমস্ত লেখকের লেখার মধ্যেই সমস্ত  
বিস্তার এই মানবতার দ্বার আছে । এই প্রবন্ধে আমরা  
কেবলমাত্র রোমান্টিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনা  
সাহিত্যের কয়েকটি দ্বার কল্পনা করিয়াছি । কোনো লেখক  
বিশেষেরই রচনার কোনো আলোচনা করি নাই, এমন কি  
স্বল্পক লেখকেরও নাম করি নাই । ভবিষ্যতে কোনো  
কোনো লেখকের রচনা এই বিস্তৃততার আলোচনা করিবার  
ইচ্ছা রহিল ।

## রূপক

### শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী

অন্ধর সৌর, ভিপুভিগে নরীষ, সে ছিল শাঁখারি ; শাঁখার  
কাঁপি নিয়ে ওয়ায়ে ওয়ায়ে কিরি ক'রে ফেড়া—অন্ধরে  
অন্ধরে কিরে কিরে । সে ছিল তরল ; অত্যাশ্রিত তরল  
আধোগ্রসিত সঙ্কেৎ বহই সে সলজ্জ হ'য়ে উঠ'ত, পুত্র অন্ধরী  
কর-প্রকোপে শাঁখা পরাতে তার হাত কাঁপ'ত !

প্রভাতে বেরিয়ে তরল শাঁখারি চপুরের দিকে সে দিন  
দুইছিল । তার হাতের কাঁপিতে ছিল অন্ধর-তরলীর কর-  
কম্পন-কড়া কয়েক জোড়া শাঁখার মোড়ক, আর তার বুকের  
কাঁপিতে ছিল কি একটা আশ্রয় তরল অ-পুল্ল অস্ত্রধা ।

\* বাড়ী গিয়ে সে তার বন্ধ-করা কাঁপির মধোকাষ  
মোড়কের থেকে বেছে এক জোড়া তরল শাঁখা বের ক'রে  
নিয়ে মাথা ঠেকাবার ভক্তে তুলে নামিয়ে বুক ঠেকালে ;  
অশ্রুটপরে বললে—ওগো গুণ্ডিতা, ওগো বস্ত্রমহি, আমার  
হাতে তোমার প্রভাতের সল-স্পন্দ-ভরা এই কর-কম্পন । আমি  
এর প্রত্যেক স্পন্দে তোমার সলাজ কোমল করকম্পন  
শাক্তি, এর দীপ্ত স্তম্ভতার তোমার স্তম্ভ ভবরের আভাস  
আলুচে, এর আনন্দ আমি বুক রাখলাম—তোমার ভবরের  
ছোঁয়া আমার ভবরে লাগল ! কিয়, ওগো কোড়ুমরী,  
কোনু রঙে আমি রঙিয়ে তুলব এই শাঁখা চটির গয়ে তোমার  
শেই লুম্মাইলি কাকল—‘তোয়ের ফুল’ ?

সাতদিন হ'রে সে ভাবলে । শাঁখা ছুটি দিয়েছিল  
নগর-শ্রেষ্ঠীর কড়া বিজয়ী ‘মহাভাটী’—শাঁখাটিকে এর উপর  
তুলির রঙে ছুটিয়ে দিতে হবে ‘প্রভাত সুস্থ-কাকল’ ।  
কোনু ফুল কেমন ক'রে আঁকতে হবে, সে কিছু ব'লে  
দেখনি ; শুধু বলচে—‘তোয়ের ফুল’ ।

সাতদিন হ'রে সে ভাবলে ; সাতরাতে হ'রে তুলির পর  
তুলি নিয়ে বাঁধাচাড়া করলে ; তারপর প্রকৃষে যখন  
পদদীপ্তির জলের উপর প্রথম অরুণ-আলোক এসে পড়ল,  
তখন দীপ্তি বিক্রেতে যেতে যেতে তরল শাঁখার গায়ে বীয়ে বীয়ে

দে ছুটিয়ে তুললে—কটকিত স্রশাল-পুটে একটি তরল কমল,  
সুন্দরী স্তম্ভনাবকাশের কশেণ-অরুণমার মতই শূটনোম্বু !  
তারপর নীলের তুলির টান দিয়ে তার তলে ছুটালে দীপ্তি  
জলেব নীল আকাশেরছায়া,—আর, স্নহু তুলির আঁচে  
আঁকলে একটি ললল পদ্ম-পাতা ।

চিত্রিত শাঁখাটটি মোড়কে ভড়িয়ে আবার মোড়ক তুলে  
শাঁখা ছুটি চাতে ক'রে কিছুক্ষণ দেখে তাইলে ; একটা  
নবা তুলি চাতে নিয়ে কিরে সেটি তুলি-দানে দেখে দিলে ;  
শেষে সেটি আবার তুলে নিয়ে শাঁখার গায়ের কটকিত  
তুলাল-পুটে-ছোঁয়া পদ্মপাতার উপর তুলি বুলিয়ে আঁকলে  
একটি শাখা-তাজা ছোট লম্বা—তুলালের কাঁটার সঙ্গে তার  
তাজা শাখার একটি টুকরা লেগে যাঁচে ।

শাঁখারি বুঝে একটু করল হাসি ছুটে উঠল ।

শাঁখার কাঁপ নিয়ে পরিচারিকার সঙ্গে শাঁখার যখন  
শ্রেষ্ঠীর মধ্যপুরে প্রবেশ করলে, তখন বেলা বেই চর নি ;  
মানান্তে প্রসাধন শেষ ক'রে শ্রেষ্ঠী-ককা' সুবে মারে তার  
বলবার ঘরে এসে বসেচে । একটা মিষ্ট সৌরভে ঘরের  
বাতাস ভরপুর । তরলকে দেখে তরলী তার মাথার উঁচুনা  
আর একটু টেনে দিলে ; কিয় তাই কোড়ু-শ্রিত  
অশ্রুজের দৃষ্টি তরলের চোখে এড়ান না ।

শাঁখারি একবার পুর্নদৃষ্টিতে মনঃস্ফীত দিকে তাকিয়ে  
দুখখানি নত ক'রে ঠাকুরে হাতের মোড়ক তুলে সেট  
রঙীন শাঁখা জোড়াটি বের করে সন্মুখের একটি চাতীর  
দাঁতের কাণ কড়া জিপদীর উপর বেবে আন একবার  
চোখ তুলে শ্রেষ্ঠী-কক্তার দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে  
দিলে ।

মহাভাটী জিপদীর উপর থেকে শাঁখা জোড়া হাতে তুলে  
নিয়ে একবার ভাল ক'রে দেখলে ; তারপর তরলের দিকে  
একবার চেয়ে, পরিচারিকাকে ইঙ্গিতে ডেকে কি বললে বুঝা



গেল না ; কিন্তু যেন গেল—তখনোনির্ণ দিয়ে শ্রেষ্ঠ-কুমারী  
চিত্রের 'ভ্রমর' নির্দেশ কর্বে।

পরিচায়িকা বল্লে—তুণে শুষ্ক কাকক, তোমার চিত্র  
পেয়ে আমারে দেখে পথের স্ত্রীত চলেন ; তিনি বল্লে,  
হৃদয় পতনল দীপ্ত প্রভাত-সুন্দর ! কিন্তু পদপাতায়  
শাখা-ভাঙা ভ্রমরের অর্থ কি ?

শাঁখারি এক মুহূর্ত্ত কি তাব্লে। তারপর মুহূর্ত্তে  
বল্লে—চিত্র-লেখা দেখার ভালো লেগেচে ব'লে নীন কক-  
কাকক দেখীকে মস্তকের প্রহা বিবেচন কর্বে। কিন্তু  
দেবী যদি এর মধ্যে বিশেষ অর্থ খোঁজেন ত' নিরর্থক হবে।  
এ আমি অর্থ ভেবে আঁকি নি। পদদীপ্তিপদপাতায় ভ্রমর  
দেখে ভ্রমর একেচি। আর, ভ্রমরের ভাঙা শাখার টুকরা  
নাও গটা, ও আমার এক মুহূর্ত্তের অন্তরনভতার তুলির তুল  
—জিহ্বা-দুগা-কাঁটার তুলি-চোয়ানো রক্ত।

শাঁখারির মন একটু কুঁচ হ'ল। মদরত্নী কথাটা লতা  
ব'লে বিবাস কর্লে কি না, সে বুঝতে পার্লে না। কিন্তু  
মিথ্যা না ব'লে যে তার উপায় নেই ; সে গোপন কথা যে  
নে কর্তে পারে না !

তার মনে পড়ল পতকলাকার কথা। কাল সকাল বেলা  
যখন সে তার আঁপিল খুলে বের করেছিল আর এক ছোঁকা  
কুল-খাঁকা শাঁখা মদরত্নীকে পরাবার হস্তে, তখন মদরত্নী  
সেই শাঁখার-খাঁকা কুল 'সন্ধ্যামালতী'র দিকে অনেকক্ষণ  
চোরে খেঁকে কি ভেবেছিল ; তারপর তার নিজের হাতের  
লাগা শাঁখা খুলে ঘিরেছিল—'তোরের কুল' আঁকবার হস্তে।

শাঁখারির শাঁখার ছবি সেই 'সন্ধ্যামালতী' ছিল—একটি  
চিত্র-কবিতা। তার অর্থ—'আমার নীনতার লক্ষ্যের দিগের  
বেলা আমি হুঁতিনি ; এখন লাডা মছকারের তলে বিরল-  
পবিত্র পথের নিরালার আমার গোপন ব্যথিত হৃদয়ের বল  
কেটে থাকে। আর, শাঁখার পবিত্র কেটে যদিও এপথ ঘিরে  
যায়, আমার মৃত পথে বহত সে আমাকে চিত্বে পাব্বে না।"

তার সেই কবিতার 'সন্ধ্যামালতী'র সম্বন্ধ মদরত্নী  
পেতেছিল কি না মদরত্নীই জানে। 'সন্ধ্যামালতী'—তারই  
নীন হৃদয়ের সন্ধ্যামালতী ; ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র পথ !

তারপর আত্মকায় এই 'তোরের কুল'—এও আর একটি  
এপথ কাকক। তবে, এটি একটু অন্য রকমের। এর তাৎ—  
"ওখো 'তোরের কুল', ওখো অর্ধ-প্রতিভা তলসী কিশোরি,  
তোমার সবখানি দুখছবি না দেখেই আমার চিত্র ভ্রমর  
তোমার মস্তে মুঁচ হ'ল, বাঁকুল হ'ল। জানি আমি, তুমি  
পূজার পথ ; তোমাকে পাওরা আমার হুরাণা ! তবু আমি  
তোমাকে পানবা ভেনেও ভালোবেগেচি। এ ভালবাসার  
বেধনার হয় ত' আমার চিত্র ভেঙে যাবে—ঐ শাখা-ভাঙা  
ভ্রমরেরই মত, কিন্তু সে বেধনা আমি লম্ব করব।"

এই গোপন রূপক গোপনে রাখবার হস্তেই শাঁখারি  
অমন অনুভবের আশ্রয় নিলে।

মদরত্নী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কি তাব্লে। অনেকক্ষণ  
পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে—বোধ হ'ল। তারপর  
পরিচায়িকাকে ইঙ্গারায় কি ব'লে 'তোরের কুল' শাঁখা  
ছোঁকা তার হাতে দিয়ে শাঁখারির দিকে একটু স'রে বল্লে।

পরিচায়িকা সেই শাঁখা শাঁখারিকে দিয়ে বল্লে—  
আমাদের ঠাকুরদায়কে শাঁখা পরিবে দাও, শাঁখারি !

মদরত্নী শাঁখারির দিকে তার গুহ প্রকোষ্ঠ বাড়িয়ে  
দিলে ; শাঁখারি সেই প্রকোষ্ঠে রাখা শাঁখা পরাতে লাগল।  
শাঁখারির হাত কাঁপছিল, এবং তার বোধ হ'ল—  
মদরত্নীরও হাত কাঁপে।

শাঁখা পরানো লগা ক'রে শাঁখারি উঠে দাঁড়িয়ে  
শ্রেষ্ঠ-কুমারীকে প্রথম বিবাহ সস্তাষণ জানাতেই 'তোরের  
কুল' পূর্ণ প্রস্তুত হ'ল।...শ্রেষ্ঠ-কুমারী কুমারী-কুলত  
লক্ষ্য পবিত্রাঙ্গ ক'রে তার বুকের গুহনা সবখানি সরিয়ে  
ফেলে শাঁখারির সমুখে দাঁড়াল।

শাঁখারি পতনত পথে কুমারীর বুখে ব্যথিত চেয়েই  
হুরারের দিকে পা বাড়ালে।

মদরত্নী, শাঁখারির একখানি হাত হঠাৎ চেপে ধ'রে  
কল্পনাতরে বল্লে—তল, তোমার শাঁখার আমি ব্যথিত !

তারপর শাঁখারি তার শাঁখা-চিত্রের কুল না নিয়েই  
চলে গেল।

মদরত্নী কি রূপকের অর্থ বুঝেছিল ?







বিভিন্ন ক'রে দেখলে আমরা খোঁজার দিবে দেখতে পাই, দেখানে  
করে বুলত; দুটি ভিবিৎ—একটি বস, আর একটি তাঁর বস; তা  
খড়া শব্দের বাধুদী ব'লে আরও একটি ভিবিৎ আছে দেখানে—বুট  
অখোঁজ। এই শব্দের বাধুদী হচ্ছে—ইংলিজে থাকে বলা হয়  
mode of expression।

\* \*

মনের এই বাধুদী-লাভ সাধনামালায়ক। মানবজাতির  
পট্টর এমন থেকে কলকলিগাট নয় একম অনুভূতির ন্যূন  
তারে লম্বা ক'রে ব'লা থাকে; এ-এ কথাও লিখা যে, প্রতি কল্পই  
অথবা এক একটি বিশিষ্ট সভ্য বা বস আছে—কখনো বা মিলে তার  
অগ্রিম। মনুষ্যের সেই আশের তারের বস্তু যে ভুল ( বা ভুল ) কখন  
বতাবি কোরে আঘাত করে, তখন তার চেতনা তত বেশী জ্বলন্ত ও  
খাটাই হয়ে পড়ে। এই আঘাতের অব্যাহত চুটি তারের উদ্ভব হয়—  
একটি বস আর একটি তাৎপার্যের বা emotion।

এস ত তাৎপার্যের দুইটি একেবারে বতর বস। একটা উদাহরণ  
লিখে আনা করি, সে খাটখাটা বেশ পাট হয়ে উঠে একটি  
অলম্ব্যস্ত বস্তুই যোড়নীকে সাধারণভাবে দেখলে সাধারণ মানুষ মনে  
একটা বিবিষ্ট আকর্ষণ অনুভব করে। সেটা বিবিষ্ট তাৎপার্যের বা  
মোহ—কারণ তোসেই তার পরিণতি। কিন্তু শিল্পীর চোখে যদি  
দেখতে পাই, তখনই যৌবন-বিকশিত তরুণ স্ত্রীমা, রূপ-লাভের সে  
বেব একটি লম্বা-প্রকৃতিত পূর্ণ বতালের নতই আমায় মানবশক্তি  
প্রতিষ্ঠা হয়ে এ-এ তখন তার রূপের বর্ণমালাটি আমায় চিত্রে নিবাহিল  
মানব-রূপের উজ্জ্বল ক'রে আমাকে বস্তুয়ের সহিষ্ণুর দ্বায়ে বতীর  
ভাবে লম্বাহিত ক'রে বেবে। শিল্পীও চোখ করে, কিন্তু খাটাই  
আমায়।

লম্বত রূপ তাৎপার্যেরই রূপের প্রাচী হ'তর। এস ত তাৎপার্যের  
আমায় ঠিক একই পরিমাণে দেখতে পাইল। এস চিত্রকন—সে  
কিন্তু বস্তু নয়, তাৎপার্যের বিস্তারিত আকর্ষণের বিন্দুই হ'ত

যায়। বস বস্তুই গ্রাণ, রূপ তার রূপ; যে পাটের মধ্যে গ্রাণ এবং  
চেতন পুর্নোপ কট, সেইখানেই সৌন্দর্য আশার প্রকট-অবস্থান  
অন্যতর ক'রে প্রকাশ পায়।

তবেই কেবলো পার্থি।—সৌন্দর্য বিবিষ্ট রূপ নয় আশার রূপও  
নয়—অথচ এ দু'য়েরই যৌবিক পরিণতিতেই তার পতন। আপনি  
যাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি বলা হবে। আমি জানেই ব'লে এসেছি, তা  
হলে রূপেরই বাস্তবত।

\* \*

এখনও সাধারণতর আশার সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ হ'তে একটি  
থাকি রয়েছে। প্রকর বা তা পাতর, আর একটা তার বিবেক লক্ষন  
এই যে, সহজ পর্যাবসিকতার চলে সে সকলের চিত্রেই কোমল-  
কোমলতার কিছু-না-কিছু আশারের শরৎ মিলে থাকেই,—কারণ সেই  
চিত্রশিল্পীর চাংকলি থাকি একেবারেই বিকল হ'বে না বিবেক থাকে  
তবেই বস্তু দেখেই এ কথা প্রমাণ হবে। বস্তুতো অনুভূতির  
অভাবে অনুভূতি দার লম্বল বিলম্বপ্রাপ্ত হ'বে, তার কাজে কোমল-  
বিনয় বস্তুয়ের আবির্ভাব সে দাঁতে না বলাই পারেন।

\* \*

সৌন্দর্য তার পুর্নিতার উপনীত হবার পথে প্রকাশ-পতনের কিছু  
অপেক্ষা রাখে।

\* \*

এই চিত্রশিল্পীর চোখে শিল্পের শিল্পচিন্তা। এই ভিবিষ্ট  
সৌন্দর্যকে সাধারণতর ক'রে বুলবার পরম সাধ্যক। বস্তুর মধ্যে যেমন  
ক'রে কোমল আশি সৌন্দর্যের লক্ষন দেখে, তার পরিণতি কুটে  
উঠে আমায় বিবিষ্টতায়। মনো-রূপ যেমন বস্তুতিকে দ্বায়েদ্ধি  
করে, হুঁতে মিলে একটা সৌন্দর্য পড়ে চলে, তেমনি অনুভূতির জলের  
উপর হা কলিয়ে সময়ে বস্তুয়ের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু আবির্ভাবকে  
আমরা পূর্ণ বলতে পারিবে—কারণ, তখনো তাইশিল্পীর চিত্রে বস্তুর  
উপস্থাপনা হ'বে থাকে হ'বে। কিন্তু এ-বার যদি সে বস্তুকে সৌন্দর্যকে  
মনের বাধুদী মিলে খাটাই মনের বর্ণন—বর্ণন ও আশারের উপস্থাপনা  
ক'রে বস্তুকে পারি, তখনই বস্তু—এবার বস্তুই সৌন্দর্য পজিত  
হ'বে।

# বিবিধ সংগ্রহ

## প্রশান্ত সাগরের কয়েকটি মরুদ্বীপ

চৌধুরীজি কাকা আলোচনা করিতে গিয়া জীবন্তবিলুপ্ত পশুভগ্ন এই নিক্তির সন্নাহে দুই ক্রিয়া কলাপ অবলোকন করিয়াছেন, ও তাঁহাদের অঙ্গদ্বন্দ্ব প্রভিন্দ তাঁহাদিগকে নব নব প্রস্তর সঙ্গীত করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ নৌ-যাত্রার সময় চট্টোই মালদ্বীপের মধ্য দ্বীপ সকল এই দৈবশক্তি প্রকটিত পর্শিকা করিবার ক্ষেত্র চট্টো উদ্ভিগাছে, ইহার বিশেষ কারণ এই যে, একই প্রবীর প্রাণ ও উদ্ভিদ বিভিন্ন আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে পড়িয়া য় য় আকর্ষিত ও অঙ্গাদ ক্রিয়া বলাইয়া ফেলিয়াছে—তাঁহা নৃত্যে চট্টো মধ্যদেশের উপকূল চট্টো দ্বীপবর্তী লম্বাঙ্গর দ্বীপগুলির প্রাণ ও উদ্ভিদের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবর্তী বহু দ্বীপে এক প্রাণীর পরিপূর্ণ, বাহ্যেত পূর্ণপূর্ণাঙ্গ বহুকাণ পুর্বে ভাগমান কাচ, সামুদ্রিক পৈবাণ, ভয় ভাঙারের টুকরা, প্রকৃতি অবলম্বনে ঐ সকল জনপুত্র দ্বীপে গিয়া আস্তর লইয়াছিল। ঐ সকল দ্বীপগুলির আর লম্বাঙ্গরই মতবা বসতিপুত্র অঙ্গর ও কক। অনেক দিন চট্টো জীব-তত্ত্ব পশুভগ্নের দৃষ্টি এই সকল দ্বীপে পড়িয়াছে, এক

নানাদিক্ চট্টো দ্বীপের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের উৎপত্তি, বিচার ও তাহার কারণনির্ণয়ের চেষ্টার কালে দৈবশক্তির নৃত্য নৃত্য ক্রিয়া গোচরীকৃত হইতেছে।

কালিফোর্নিয়ার পশ্চিমোপকূলের ক্ষুদ্রে এক বহু দ্বীপ আছে। এই সকল দ্বীপে প্রাণী বৃষ্টি চট্টো না, চট্টো এত



লোমশ শিশু—অঙ্গর এবং নির্বোধ

কম তা যে ক্ষুদ্র অঙ্গরও থাকে না। শুধাভঙ্গ, দ্বীপ এই দ্বীপগুলির অঙ্গরও এবং কোনো দিক চট্টোই কালিফোর্নিয়ার উপকূলবর্তী ভূতাবের সহিত কোনো সংযোগ না থাকতে ইহা প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক দ্বীপ। অঙ্গর এই দ্বীপের তাক প্রাণী ও উদ্ভিদ কালিফোর্নিয়া চট্টোই

আসিয়াছে। সারা দীপটি কোনো প্রকৃৎ অতীতে আরোও পক্ষির ভাঙনে নীল মহাদেশেরই হইতে লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়— প্রকৃৎপক্ষে ঘোঁষের উত্তর ভাগ একটি অধুনা-নির্কাপিত আরোহণের অংশ মাত্র, লক্ষ্য অংশ হইতে প্রায় ৪৫০০ ফুট বাড়ি, গলিতভাঙ প্রকৃৎের দেওয়াই একপাঠ্যে বহুপ্রমাণ যে দৈনিক হইতে ঘোঁষ উদ্ভিয়ার কোনো উপায় নাই। যে সব প্রাণী একবার

কাঁচের শিল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার লোমশ চন্দ্র-অভ্যন্তরীণ, সেজন্য উনিবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তিমি-শিকারী বনের ভাঙা এ অঞ্চলে দাঁড়াইতে শুরু করে এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্ধলোকাল তিমি-শিকারীর দল কাঁচের পর্বতের পাঠাওয়া এই নিষ্ঠার দ্বারা দৈনিক লোমশ ভগ্ন অংশ হত্যা করিয়া প্রায় তই কোটি টাকার দ্রব্যের চন্দ্র এখন হইতে



শিকারীর দল দেখিয়াও শিলগুলি লগাইতেছে না

এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, কালিকোথিয়ার উপকূলে ভিত্তিয়ার ভাঙাঘের আর স্থাপন খটে নাই, বহুকাল ধরিয়া নতুন স্থানের নতুন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। তাহার বহু পারিবর্তন সংশোধিত হইয়াছে—যেগুলি দীর্ঘতরুর দিক হইতে স্থানের অগ্রসর হইতে হইয়াছে—তৎকালীন বিবরণ।

পূর্বে গুয়াডেলুপের সঙ্কটস্থে এককাঁচের লোমশ শিল বাস করিত; প্রাক্ত মহাপ্রাণের অল্প কোন স্থানে সে

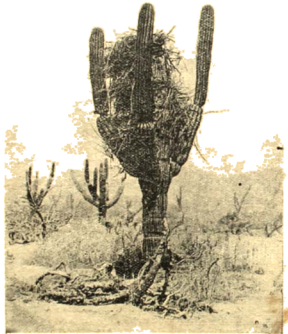
সংগ্রহ করে। ফলে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের পর উক্ত ভাঙা শিলের বাণে বাতি নিতে কেহ অধিগত ছিল না। বর্তমানে গুয়াডেলুপ ও নিকটস্থ কয়েকটি দ্বীপে অল্প এক কাঁচের শিকারী দল বাস করে, বহুতো সেগুলিকেও ইউনাইটেড স্টেটস গবর্নমেন্ট আইন করিয়া উদ্ধারের হত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা না করিলে এতদিন সে কাঁচের শিলও টিকিত কি না সম্ভব।



কয়েক বর্ষের পূর্বে উপকূলবর্তী বীশসমূহের প্রাণি ও উদ্ভিদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবার দল আমেরিকার কয়েকটি বিশিষ্ট সমিতি একতল বৈজ্ঞানিকের স্তম্ভভেদে গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা গিয়াই প্রথমে অল্পদূরত্ব করিতে আরম্ভ করেন যে গোমণ শিলের বংশে বর্তমানে কেই কোথাও অবশিষ্ট আছে কি না। কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া নানা সম্ভব অসম্ভব স্থান খোঁজাখুঁজি করিবার পর তাঁহারা বুঝিলেন গোমণ শিলের শেষ বংশধরকে কল্যাণবিশেষের দ্বার চেষ্টাতে উদ্ধার করিতে তাঁহাদের যে সময়ে মাসা উচিত ছিল তখনেই চম্পি বঙ্গের পরে তাঁহারা আসিয়াছেন। বীশের কয়েকটি স্থানের বিশেষ চিত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন যেই সেই স্থানে গোমণ শিলের স্তম্ভের বন সমুদ্রতীরে এখন করিয়া থাকিত : স্থানগুলি পরিমাপ করিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে, সমগ্র বীশতীরে প্রথম অবস্থায় প্রায় দশলক্ষ গোমণ শিলের আবালকুমি ছিল। তাহাদের যে দিকটা পশ্চিম, ইচ্ছাযে বন সেই দিকেই বাস করিত, বহুতাল করিয়া সংখ্যক কল সেমিকের লাভা পাত্তরের বড় বড় শক্ত মাফেল পাথর সম্মুখ ও চতুর্দিকে হইয়া পড়িয়াছে—তাদের ধারের, গুহামুখের এই সব সম্মুখ প্রস্তরবন্ধ লুপ্তবংশ হতভাগ্য গোমণ শিল জাতির মুক্ত প্রতিচ্ছন্ন-বর্তমান থাকিয়া তাহাদের দুরয়ত্তমতা ও অর্থ লোপুতার লজ্জাকর কাহিনী নীরবে প্রচার করিতেছে।

বর্তমানে স্তম্ভভেদে গঠিত বীশে এক জাতীয় অতিকার শিল বাস করে। তাহাদিগকে দেখিতে অতি অসুখ। শব্দ বড় বড়, গায়ের বন্ধ বন্ধ ও শব্দ, একটা করিয়া বড় তক্ত-ওয়ালা, অতি কদাকার জীব। এক সময়ে এই জাতীয় শিল দক্ষিণ মহাদেশের দক্ষিণ অর্ধদ্বীপে প্রভুত বীশে বাস করিত, কিন্তু যেদিন চেষ্টাে তিনি শিকারীর দল জানিতে পারিল যে

ইচ্ছাযে চম্পি চেষ্টাে প্রচুর পরিমাণে স্থানান্তরিত হইয়া যায়, সেই দিন চেষ্টােই মেক্সিকোর বীশসমূহে ইচ্ছাযে হতভাগ্য আরম্ভ হইল এবং এখন দেখা গেল যে ইচ্ছাযে সংখ্যা এত কম হইয়া গিয়াছে যে শিকারের দলটা গোয়ার তখনই হা-ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্তম্ভভেদে গঠিত বীশের



অতিকার কদম্বজাতীয় গাছে পাবীর বাস।

শিকারীরা লান্বেনিটো, সেলোস প্রভৃতি বীশেও পূর্বে ছিল কিন্তু মহাবীশ অত্যাচারে তাহাদের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। স্তম্ভভেদে গঠিত বীশের শিলের বন যে বলা পাটচায়ে ভাল একটি বৈবর্তনীয় আছে।

উপগ্রন্থক বৈজ্ঞানিকবল বীশের উত্তর ভাগের উপকূল একতল অতিকার শিলকে বাদুসকতে শারিত্যবহার দেখিতে

পান, ইত্যাদি এত অল্প এবং নিম্নোপ যে মানুষ দেখিলেও নড়ে না, পিটপিট করিয়া কোচুলের দৃষ্টিতে চাওয়া চাওয়া দেখে। যেখান লোমশ পিলগুলিও এইরূপই ছিল এবং বিশেষ করিয়া সেইগুলি এত পায় তাহাবিরুদ্ধে ধরাধামে চেষ্টা বিবাহ লইতে চাইত।—এই আশ্রয় এই নিম্নোপ, অসুখ প্রাণীদের উপর এতটুকু রূপা প্রকাশ করে না। প্রাণীদের নিরীহ রক্তে শুধু লৈকত্বমি রঞ্জিত করিয়াছে, শুধু দন-লানদার ও আশ্রয়ের পুষ্টি রক্ত। তাই এতদ-

সে দাড়া ইউক, জাঃ এতদমান ও তাঁহার বল কিরিয়। গিয়াই বাহাতে অতিক্রম পিলগুলির অবস্থা হওয়া বহু হয় লৈকিক মেসিকো। পর্বমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং সম্প্রতি মেসিকো। পর্বমেন্ট আইন জারি করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিনামূলিতে এই লকল বীণে অতিক্রম পিল কোই পিকার করিতে পারিবে না।

অতিক্রম পিল বাতীর আশ্রয় নানা প্রকারের পাই ইত্যাদি জাতের লুপ ও নিকটবর্তী লোহাল বীণে দেখিতে



পাহাড়ের পানে পানীয় বাগ

যাঃ উপরোক্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন, তাঁহারা একটি বড় পিঠের দলার অত্যন্ত নিকটে গিয়া দলটির কটোপ্রাক গ্রন্থ করতেন। বর্তমানে প্রাকের সেই ছবিটি দেখিলেই বোকা বাইবে যে এই জীবগুলি এতই নিম্নোপ যে এত অজ্ঞানের সবেও মানুষ দেখিলে পলাতনের চিন্তা তাহাদের মোটা বুদ্ধিতে আসে। আসে না? এমন কি তাঁহাদের দলের কেহ কেহ পায় পায় ইহাদের অত্যন্ত নিকটে গিয়া ইহাদের পিট চাপকাইতে থাকেন, কেহ কেহ বা খোঁড়ার দ্বারা ইহাদের পিটে ঠকিয়া বসেন, ইত্যাদি শুধু পিটপিট করিয়া চাওয়া থাকে মাত্র, নড়েও না চড়েও না। এতদনিরীহ প্রাণীকেও হত্যা করিতে হাত উঠে।

পান। সেলোন্ বীণ একেবারে মকমর, ইত্যাদি অধিকাংশই কঠিন লাভ। প্রস্তরের উচ্চতর ভূমি ও লকলতাপ্ত কটোপ্রাক এবং বাস্তুস্থ। এই বীণের পশ্চিমোপে লাভ। কেহ দেখেনে চাপু চাইয়া সমুদ্রে নামিয়া আসিয়াছে, সেট লমতল নিরুত্মিতে এক লনর উচ্চতাল জাতীয় এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী (Sea Otter) বলি কহিত। ইহারা পাখের দ্বারা কটো প্রাক সামুদ্রিক কাঁড়। পুঁজিয়া বাইরা যেহাউ ও লৈকত্বমিতে দলে দলে যৌর শোহাইত। মুক্তি ইহাদের চর্চ ও বাজারে উচ্চলো

বিরূপ রূপ—কলে ইহারাও প্রায় লোমশ শিলের প্লাক অল্পপল করিয়াছে; বর্তমানে দাড়া অবশিষ্ট আছে, তাহা অতি সামান্য। সান ভিরোগে প্রচুতি দাঁপ হইতে বিভিন্ন সময়ে প্রায় তিন কোটি লাফা দুলের উচ্চতাল চর্চ ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে প্রেরিত হইয়াছে।

সেলোন্ বীণের লাভ্যময় ভূমিতে এক জাতীয় কদমদল। গাছ ছাড়া অন্য গাছ বড় একটা জন্মে না, তবে এক প্রকারের অল্পত বৃক্ষ হানে কানে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে তাঃ এতদমানের নাম দিয়াছেন Elephant tree। এই বৃক্ষ দেখিতে অতি কদাকার, শুঁকিটা বসকাক, অত্যন্ত স্থল এবং



দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেম  
পাক্‌টোর সন্ধ্যাবেলায় হইয়াছে।  
ইহার ভিত্তির বেড় চিত্রন হইতে  
পাচ ফুট, উচ্চতা। প্রায়ই ঘাট  
দুটের পেশী চর না, জালের হা  
শীতল মালা। অল্প বয়স ছিন্ন  
করিলে পাছের গা হইতে বন  
জালের মত এক প্রকার মালা রপ  
নশিতে থাকে। সেজোদ্‌ হোপে  
কৃষ্ণবর্ণী অগভীর জলে মানা  
পকারের মংজ, চিংড়ি ও  
কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়—  
তন্মধ্যে কয়েকটির রং অতি  
সুন্দর, বিশেষ করিয়া ইজ্রব্দ  
বংএর এক জাতীয় মাছ এত  
যে, ইউরোপ ও আমেরিকার  
মিউজিয়ামেব অল্প নমুনা সংগ্রহ  
করিতে এখনে মাত্র মাঝে  
বিকারীর দল আসে। শীতকালে



এখান হইতে এক প্রকার  
বৃংকায় চিংড়ি মাছ রাশি  
রাশি বৃত্ত হইয়া দান্  
জান্দিসকো রঙাঈবইয়া  
থাকে।

সেজোদ্‌ হোপে র  
পনেরো মাইল পশ্চিমে  
বেনিটো বীপপুঞ্জের মধ্যেই  
Sea-lion দেখিতে পাওয়া  
যায়। ইচ্ছাও শিলজাতীয়  
অন্ত, তবে ইহাদের চকি  
বা চর্ম এখনও শগাভবা  
মধ্যে স্থান না পাওয়াতে

বেনিটো বীপপুঞ্জের ভীকৃতাবSea-lionএর দল

ওমিশিকারীকেও অত্যাচার এখনও টাটকের উপর হুক হয় নাই। তাহা ছাড়া ইহার। এত কঠিনতার ও ভীষণতার তবু যে, কোনোক্রমে সম্বোধনক লক কানে ঘাইবারে শুদ্ধকৃত করিয়া মলত্ব গিহা লম্বের কলে লড়ে ও তৎকালে চূর্ণ বিধা অদৃষ্ট হইয়া যায়।

আছে বলিলেও বৈধি বলা হয় না। তাঃ এতাবস্থায় নিখিয়াছেন, "জুলাই মাসের শেষ ভাগে যখন আমরা এই বীপে ঘাই, তখন এই অতিক্রম করিমেন। গাছের কণ্টকময় শিখরগুলি অশ্লক কলে ভবিয়া দিয়াছে এবং কাট্টোকা ও নানা বস্ত্রকোষের মল মলকলয়ে মলমলকনে মস্ত! আমরাও



\* সেভোলাবীপে পূর্বোদয়

এই লম্বের বীপের কঙ্কর বাগুকা ও লাভাশ্রবণের ভূমিতে এক প্রকার অতিক্রম করিমেন। কাট্টো (calius) উদ্ভিদ আছে। সাকী মার্গারিটা, নেটিভিভাত প্রভৃতি বীপের অনেক স্থানে এই গাছের উচ্চতা ৩০ ফুটেরও বৈধি। (অল্পত হবি প্রভৃতি)। দেখোক বীপে উত্তরাংশে এই বৃক্ষের অল্পত

ও একটি মল মুখে বিধা দেখিলাম অশ্লক কলগুলির আবাস অতি সুমিষ্ট, ফ্রাণ ও ভিতরের লাল অনেকটা মাল্লোবার ফলের জায়। ঘাইলে তৃক্ষা নিবারিত হয়—কলগুলি ৪৩ গাছের মত দেখিতে এবং অত বড়।”

ঐতিহাসিক ভূমণ বক্ষোপাধায়





## ঐক্যদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাংলা ভাষাতত্ত্বের মধ্যে কান্দীর প্রভাব এমন অনেক স্থান আছে যেগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চুলন। পৃথিবীতে আর কোথাও পুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তবাবি ব্রহ্মদেশের সৌন্দর্যের এমন একটা বিশেষ আছে যাহা অন্তর্ভুক্ত বিহীন, উঃ! বর্ষারই নিত্য নিত্য সম্পত্তি। এমন উত্তর ভারতের ঐতিহাসিক হানসপুরের অথবা নৈনিতাল, মতরি, শিমলায় পুত্র একত্রে হইয়া যায়, চিলি কথা বলিতে বলিতে এবং ছিপুখানীঘের এক রকমের

চোরা ঘেঁষিতে দেখিতে আমাদের বিরক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন বর্ষার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ও লোকপরিচয়ের নবনবীকৃত কমনীর চোরা মধুর ব্যবহার ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে নৃতনের আনন্দ আনিয়া দেয়। উড়াপা-বনঃ আমাদের দেশের পুণ্য কন্য লোকই কেবল-স্বাভাবিক উদ্বেগ

দ্বারা গিয়া থাকেন। কোন কাজকর্মের উপলক্ষ্যে তির কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা সে দেশে থাকে না। সমাজতন্ত্র ও হানসপুরের বিচ্ছিন্নতা ও তথ্য বিবরণ অনেক ভিন্ন আছে। ভারতবর্ষের একটি অংশ হইয়াও এই দেশের অধিবাসীরা চোরাঘের আচারে ব্যবহারে যে কত পুণ্য তারা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বর্ষার মেলে প্রথমেই এই দেশের সহরগুলির নাম আমাদের নিকট-নূতন ও রক্তাক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহার পরই এই দেশের নবনবীকৃত। আমাদের ভিতরগঠিত কানপুর, মির্জাপুর, বিলাসপুর, নগপুর ইত্যাদির পরই, পেশ্বর, মির্জাপুর, কানো, মোশমিন, মোবিন ইত্যাদি নাম শুনিতে

যেন কেমন একটা বেখানার ঠেক এবং স্বভাবতঃই মনে করাইয়া দেয় যে ইহারা আমাদের নিকট আত্মীয় নহে।

নিম্নবর্ষার প্রথম লগ্নে হেজুন ও মোশমিন অনেকটাই নিকট স্থগিত, আধুনিক যুগের আদর্শবাহী নির্মিত। হেজুনের পিউ ভাগেই পাগোজা বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দির। পাগোজা নিকটবর্তী হুইটন পুত্র অতি মনোহর।

মাগালে হইতেই প্রকৃতপক্ষে উত্তর বর্ষার সীমা খসে পড়িয়াছে। হেজুন হইতে মাগালে টেনে যাওয়া যায়, কিন্তু



মোটর বাইকার প্রবৃত্তি পথ

ইয়াবতী নদীর ছাঁই পার্শ্বের বৃক্ষ দেখিতে হইলে প্রায় অবশিষ্ট টেনে গিয়া তাহার পর সীমারে মাগালে যাউতে হয়। মাগালে বর্ষার পুরাতন রাস্তাদানী। রাজা ঘিষোর নিকট হইতে এই নগর ইংরাজরা ১৮৮৪ সালে অধিকার করেন। রাজপ্রাসাদ ও কোটা ১৮৪৭ সালে বর্ষার সর্বপ্রধান নগরিত হুন্-হুন্-মিন্ টৈয়ার করা হইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের মধ্যস্থিত গির্জাসন-পুত্র ও দেবদেব কাঠের নির্মিত কাককাঁধাঘটিত গুলি ঘেঁষিতে অতি সুন্দর ও চমকপ্রদ। মাগালে পর্বতের উপর হইতে চতুর্দিকের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আয়তন পাগোজা এই স্থানের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মন্দির।

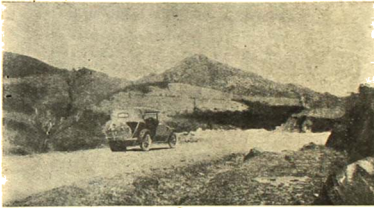
মাগালেকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন কঠিন লোক বিভিন্ন দিকে যাত্রা হইয়া পড়েন। গাহারা আমোদ প্রমোদ

নাচ পান ভাল বাসেন তাঁহাদের পক্ষে মিথামোই উপযুক্ত স্থান। ঝাঁকরা ইতিহাস চর্চা করিতে বা গ্রন্থভর্যের খোঁজ লইতে চান অথবা ছবি আঁকার মাল মণসা সংগ্রহ করিতে চান তাঁহারা একাদশ শতাব্দীর পুরাতন রাজধানী পেপানে যান। তৎপার ঐতিহাসিক দৃশ্যের বহু পুরাতন ভিনিও দেখিতে পাওয়া যায়। সহস্রটিকে প্যাপোডার দরহ বহিরাও অভিহিত করা হইতে পারে। এতগুলি ছোট, বড় ও মাঝারি প্যাপোডার সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। মাণ্ড্রালের নিকটবর্তী আভা নগরও এককালে সমৃদ্ধিশালী ছিল। জনবিলে প্রচুর প্রকৃতির দোহা দোমণোর ভিতর

এব কাঠ কাটিয়া নদীতে ভাসাটরা দেওয়া হয়; তাহাতে তাহা সিতে কাঠগুলি নিয়ন্ত্রণে আসিয়া পৌঁছিলে মালিকেরা ঐগুলিকে ভাঙ্গার টানিয়া তুলে। অনেক কাঠ একত্র ভেলার মত করিয়া বাগিয়াও ছাড়িয়া দেয়। নদীগুলি না থাকিয়া স্থানে স্থানে এমন শরলগাছের বহিরা পিয়াছে যে কোথায় রাখিতে মনে হয় যেন কেহ নদ-পাৰ্শ্বস্থিত পাৰ্বত্যের দা বেঁধিয়া লামা দেখা আসাযোড় টানিয়া বিছাড়ে।

ইয়াবতী নদী বিধা উত্তর-পূর্ণ সীমাতে তাহা দূরে পৌঁছান যায়। এই সহস্রটি চীন সীমান্তের নিকট অবস্থিত থাকার, চীনের দখিত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত

হইয়াছে; সহস্রের অধি-  
বাসীদের মধ্যে অধিকাংশই  
কাচীন, পান্ বা চীন।  
মাণ্ড্রালের নিকটবর্তী  
গল্টেকের সেতুও একটি  
বেঁধবার ভিনিও। এট  
বিশালবান্ধের প্রদীপ সেতুটি  
পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান  
অধিকার করিয়াছে।  
সেতুটি, পল্লভগল্লের  
উপর নিৰ্মিত; ইহার উপর  
বিধা রেল লাইন, বর্ষায়  
পূর্ণ সীমান্তের নিকটবর্তী  
বাণিত নগর পৰ্য্যন্ত  
গিয়াছে।



মোলক বনিতে বাইবার পথ

বিধা মুক্তনৈবে ঝাঁকরা ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে জীমার ভ্রমণের তার অস্বাভাবিক আর কিছুই নাই। ইয়াবতীর শাখা চানউইন নদীতে উত্তর পশ্চিম দিকে হোমালিন্ পৰ্ব্বত কাওয়া যায়। উত্তর পূর্ণ দিকে ইয়াবতী বিধা তামো পৰ্য্যন্ত কাওয়া যায়।

নদীর দুই পাৰ্শ্বের দূর অতি মনোহর। ছোট ছোট পালাক নদীর মধ্য হইতে ১০০ ফিট ও তদুচ্চ পৰ্ব্বত খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাত ও বৃন্দীর আধিকা দেখিয়া মনে মৃদুপণ তীতি ও বিশ্বের সত্যের হয়। বর্ষায় জলপে নামা প্রকাণ্ড মূল্যবান কাঠ প্রচুর পরিমাণে আছে। এই

ভ্রমণেদের উপস্থিতিস অগা গোড়াই পক্ষ, জল ও  
মুত মুত নদীতে সমাজ্য। ঐহারা লাক্সী ও কইদিক্স  
তাঁহারা পূর্ণ সীমাতে পান্ ও কাচীনদের দেশে, উত্তর-পূর্ণ  
সীমাতে পার্শ্বতা অধিবাসীদের দেশে ও পশ্চিম সীমাতে  
ওমা, চিন্, লামা প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের দেশে ভ্রমণ  
করিয়া অনেক বিধা বেঁধিয়া তানিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে  
পারেন। এই সব সীমান্ত প্রদেশের দৃশ্য অতি মনোহর।  
নাম-না-জান নামা প্রকারের পাক্সাফুল ও ফল এই সকল  
স্থানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দূর ভূখণ্ডস্থিত গিরিশৃঙ্গ



দেখিতে অতিপচিতাক্ষক। বস্ত্রাবশুপকমিত্তে পান রাতোত্র  
অনেক স্থান মোটরে ভ্রমণ করা যায়, রাজ্যগুলিও  
ভাণ। দেখিত্তে চুস্তি যায়, দেউ দিত্তেই বাসের সবুজ  
আবরণ বস্ত্রের পথান্ত পল্লভরিত্তি কোল বেঁধিয়া বিবৃত  
বহিষ্ঠাও। কখনও বা উপর উঠিয়া এবং তৎপরেই নীচে  
নামিয়া অধিত্তাক্ষা ও উপত্যাকার উপর দিয়া অধিত্তাক্ষা  
ধাক্ষিয়া আস্তা তুরে শীমন্তে মিশিয়া গিয়াছে। ১৯২০  
মাইল পরে কদাচিত্তে কোলাও চান্না, পালা মৈনুগণা প্রভৃতি

প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে আপনাকে  
চুলিয়া ঘাইবার এমন সুযোগ খুব অল্পই পাইয়া  
থাকে।

দক্ষিণ পান রাতোত্র মধ্যে কলউ (Kalaui) অতি  
মনোরম পার্শ্বতঃ স্থান-নিবাস। স্থানটি সমুদ্র হইতে ৪০০০  
ফুট উচ্চে অবস্থিত, আবহাওয়া কংসারের মতল সময়েই ঠাণ্ডা  
ও স্বাভাৱ্য। বহু স্থান-নিবাস ও হোটেল পার্শ্বতঃ অনেক  
দোক এখানে আসিয়া থাকে। এই নগর হইতে ৮০ মাইল



নামদুয়ের বাসার

৩

কাঁচের আদিত্ত অধিবাসীদের গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। কনকরণ  
মতরে অনেকদিন বাস ভরবার পর এই সব এখানে ভ্রমণে  
বাঁধির হইলে মুক্তির নিখাল কোলিয়া বাঁচা যায়। অবশ্যক-  
স্বাভাব্যে পাহাড়সমূহের সন্ধান পাই, চিত্তা-অধিত্তিত্ত মন  
উৎসাহ হইয়া উঠে। পল্লভরিত্ত মাহুকের সন্নিহিত মাহুকের  
ক্রোড়াক্ষিত্ত তর নাই, কাজকর্মের ত্যাগত্যাগ নাই, উষ্মের  
কোন কারণ নাই, একাকী আপনায় মনে পাহাড় পর্বতের  
উপর পুথিয়া, ক্রান্তল তুরাঙ্গির উপর পল্লভ করিয়া চতুর্দিকের

দুরে ইন্দ্রে ভ্রম, তথাকার তালমাল ঘোঁড়ালি দেখিবার মত  
জিনিষ।

ম্যাক্সালের উত্তরে ইয়াবতী নদীর পারে খাটিকিন্  
নামক স্থান হইতে ৩০ মাইল দূরত্বের করিয়া পূর্ব দিকে  
দেলে কর্তব্য প্রসিদ্ধ হীরকখনি সোণোকে পৌছান যায়।  
এই হীরক-খনির মালিক হওয়াই এ পর্যন্ত কর্তব্য রাজ্যের  
সর্বোৎকর্ষ পল্লভের কথা ছিল। এই স্থানে বিভিন্ন জাতীয়  
লোকের বিভিন্ন সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্মেলন সম্বন্ধে পক্ষে ঐতকালেই সম্মেলনকে অগ্রসর, বর্ষাকালের মতক উদ্ভিদাদি ও সম্রাট পর্বতমালায়  
খনিও বর্ষাকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও উপেক্ষীয় নহে। সৌন্দর্য্য বিশেষ করিয়া মনোহরন করে।



নগর দল

ঐতিহাসিককর্মার বহু

### তিব্বতীয় লামাদের আনুষ্ঠানিক-নাচ

কাম্বোজের উত্তর-পূর্ব দিকে তিব্বতের মধ্যে 'গাটাক' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। গাটাকে চারিটি পুরাতন বৌদ্ধ-মঠ আছে ও তন্মধ্যে মঙ্গলপ্রধানটির নাম 'হিমিস্ পোম্প'। এই মঠে প্রায় আটশত তিব্বু ও তিব্বু বসবাস করে। এই স্থানে প্রত্যেক বৎসর জুন মাসে এক প্রকারের নিবর্ণনাময়িক নাচ হইয়া থাকে। তিব্বতের মজার বৌদ্ধ মঠেও ইহারই অনুকরণ নাচ বৎসরে একবার হয়। বহুব্রহ্ম হইতে বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া অসংখ্য নরনারী নাচের সুখের মঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। নাচটি তিন দিন ধরিয়া চল—ইহার বিশেষ এই যে প্রধান

বর্ষব্যয়ক হইতে মঠের তিব্বু পর্বত ইচ্ছাতে যোগদান করেন। যদিও এতাব্যকাল সাধারণ লোকে টাকাকে প্রধানতঃ চূত স্রোত তাড়াইবার নাচ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাচের যে একটি বিশেষ অর্থ আছে তাহার ধারণা অনেকেরই নাই। বিভিন্ন প্রকারের ভগ্নাবহ ও বিকটাকার মূখ্যে পরিয়া এট নাচে লামারা যোগদান করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ-বর্ষব্যয়কেরা পুনর্জন্মে বিখ্যাত করেন এবং মৃত্যুর পর পরলোকে ঘাইবার পক্ষে সমগ্রজন্মের লোকোপদেশেরা আশ্বাসকে তাহার পথ হইতে বিচূত করিবার জন্য নানা-সংকার বীজবৎ সৃষ্টি করিয়া তর দেখান, এই ধারণা তাহাদের



অথো বহুদল। যদি তর পাটরা একবার কেব শরতানের কবলে পড়ে তাহা হইলে তাহাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পথ বুজিয়া থাতিয়া দুরিয়া মরিতে হইবে। সাধারণ লোকের বাগাতে এই লব বিকটাকার কৃত শ্রেত দেখিয়া সুতীর পর তাহা না পার এবং নিজের গরুবাংলু অবিচলিত চিত্তে চলিয়া বাহিরে পাবে, তাহারই জন্য এই নাজের অস্ত্রটান ও এই লব কিশুট-কিমাকার স্ত্রীর আদ্যাদি। সকলেই যদি এই লকায়ের কৃত শ্রেতের বিষয় অবগত থাকে ও

অন্যোক্তিক শক্তির ক্ষমতা-প্রদর্শন এই অস্ত্রটানের প্রধান লক্ষ্য। জন, বুল, আকাশ, বাতাস কোন কোনই শিখাচপ্ত নর এবং তাহার সকলেই যেন বিকট চোখের লইয়া দর্শকদের অভিযুগে ছুটিয়া বাহিরেই এইরূপ অভিযুগ করা হয়। একবার দর্শনিত পুরোহিতেরাই যে এই শিখাচপ্তির ওই লজ্জা হইতে সকলকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা তাঁহাদের আগমনেই, এই লব কৃত শ্রেতের পলায়ন হইতে মুক্তা যায়।



কাপড়-নির্দিষ্ট লুপন লব সুযোগপরিহিত নর্তকদল

সাধারণ ও তাহা হইলে সুতীর পর লগা ইহানগকে পথে দেখিতে পাটরা কেব আর বিলম্বিত হইবে না।

শক্তির প্রাক্শে বিকটাকার সুযোগ ও নানা প্রকারের অকৃত গোলাক পরিহিত লোকেরা নাচ, গান, টাটা, মন্ডরা ইত্যাদি সমস্ত দিন ঘরিয়াই করিয়া থাকে। কখনও ভায়াব সুতের লবতারপা, কখনও উজ্জ্বলেরে চীৎকার, কখনও নানা প্রকারের অকৃত বায়াক্তের ঐক্যতান একত্র মিথিয়া এক বীজল-ব্যাশারের স্রষ্ট ও দর্শকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। চতুর্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ, ব্যরথর এবং মলের পর মলের আগমন, ভৌতিক ও বাস্তবিক্যের

দর্শনপ্রথমে একদল লোক অকৃত অকৃত ও ভরতর ভীত মন্ডর আভতির সুযোগ পরিহিত কটাক্ষনি, তাটির বাগা ঠকু ঠকু লব ও চীৎকার করিতে করিতে প্রাক্শে আসিয়া অবতীর্ণ হয়। বায়নমায়েরাও ঐ লবে লব লোরে বাকনা বায়াইতে থাকে। কিয়ৎকাল এইরূপ উদ্যম ও উজ্জ্বল নাচ চলিবার পর লগা সকলে একবারে নামিয়া যায় এবং চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করে, কারণ এইবার পুরোহিতের দল অভিযুগের গোলাক পরিহিত ও পবিত্র বস্ত্র উল্লেখ করিতে করিতে দলিদের মধ্য হইতে ঘুরে ঘুরে প্রাক্শে নামিয়া আসেন। সাত জন লগা বুদ্ধদের সাতটি

পূর্ণাঙ্গের মুক্তির অঙ্গরূপ যুগোপ পরিচা পত্নীর ও দীর্ঘ প্রতিমধুর সঙ্গীত বাদ্যবহন সহকারে গীত হয় ।  
পৰ্বক্ষেপে আদিয়া প্রেরিতব্যভাবে মণ্ডায়মান হইলে পর এতরূপে গ্রন্থন অঙ্ক অভিনীত হইবার পর সহসা বাত  
উপস্থিত দর্শকগণ, অভিনেতারা ও মণ্ডার পর মল ও সঙ্গীত পরিচা দ্বারা এবং এককল লোক ভিন্নবস্ত্র পরিচা



বিজটাকার  
যুগোপের নটনা

যুগোপ পরিচিষ্ট  
লামাদের নৃত্য



ভিক্রুরা একে একে আদিয়া তাঁহাদের পায়ে লগ্ন্যমে প্রদ্বাঙ্গলি  
প্রদান করিতে থাকে । এই সময় লক্ষ্যগণই মধুর ও গভীর  
মন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাকে ও ঘোরে ঘোরে প্রবহ

আসবে উপস্থিত হয় । লক্ষ্যগণই যুগে উষ্মণ ও কংগ  
ভিল পথিগুট ; কেহ বা ঈতে কাশে, কেহ বা অঙ্কের মত  
ঘুরিতে ঘুরিতে এখিকে ওখিকে লক্ষ্যে বাহা পাত তাগাই



আঁকড়াইয়া পরে ও মুখে কড়ের কাগ পাই পাই লক  
কথিতে থাকে। এই লুপ্ত ও শেষের সমাবেশ লক্ষের মনে  
নিরানন্দ আনিয়া দেয়। টকাই পথপ্রান্ত আশ্বাস ভূমিতিস  
দৃষ্ট। ইতার মধ্যেই আবার তানয় ভীষণ ভীষ জম্বর বৃথোদ  
লগ্নিত্ত কৃত প্রেতের আবির্ভূত হয় ও ভর দেখাইয়া ও  
পিছনে পিছনে তাক বিহা তাকাবে উল্লস কতিয়া সারে।  
এক এক সময় মনে হয় যেন আশ্বস্তির পরিচালিত আর  
কোনট উপায় নাট, সকলেই কলমের জীংকার করিতে

এই অভিনয় ও নৃত্য হইতে সকলকে ইহাই বুঝাইয়া  
দেওয়া হয় যে, যাঁহারা ধার্মিক ধর্মবাহকেরা তাহাদের লাক্ষণ্য  
মুক্তার পরও করিয়া থাকেন ও প্রকৃত শল দেখাইয়া যেন।  
সকলেই যে এই বাখ্যা সমাক জগৎলক্ষ্যকরিতে পারে তাহা  
মনে হয় না, কারণ লক্ষ্যমণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া  
অনেক লাক্ষ্য পর্ণাক সমযোজিত পাণ্ডুর্য বহুয় রাখেন না,  
অথবা হাঙ্গি, টাট্টা, ময়রা, তামাশার যোগদান করেন ও  
শেবেলো এই অপ্রত্যান্টিক প্রায় বাৎসরিক আনন্দোৎসবেই



চারপবেশি লামা

করিতে এ উঠাকে দলিয়া, কোনও মতে এরিকে গ্রবিকে  
লগাইয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে। এমন সময় পুনরায়  
পুরোহিতের মল আসিয়া উপস্থিত হন ও কলমল্লর মল  
মন্ত্রপুত করিয়া সকলের দিকে ছিটাইয়া দিলে পর আবার  
কিছুক্ষণের ভক্ত উঠারা লাগু হয়। এই অভিনয় বহুবার  
অপেক্ষিত হয় এবং পরিশেষে অজ্ঞানের সঞ্চিত পুরোহিত  
বলেই বুঝের পর অভিনয় শেষ হয়। বলা বাহুল্য লক্ষ্যপতি-  
মান ধর্মবাহকেরাট পের পর্ণাক কঠো চম।

পরিপত করিয়াছেন। মিনা ঘণ্টের মতই এই স্থানেও  
খোঁজ ধর্ম-নিহিত প্রকৃত বাখ্যার অর্থ না বুঝিয়া তাকার  
খেলনের উপরই সকলে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। এখন  
কেবলমাত্র, এই বাৎসরিক অপ্রত্যান্টিকেই লক্ষ্য করিবার  
দিকে সকলের মন ও এত উন্মোহিত আয়োজন।

• টবিগান ওই বেলুত বাখ্যাবিবের সৌন্দর্য

উচ্চিহাংকুমার বসু

# বাউল গান

মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

বাউল পঞ্চটা বাউর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিমা কেহ কোহ বলেন। উত্তর ভারতের বাউরের সঙ্গে আমাদের দেশের বাউলের যথেষ্ট সৌম্যাদৃত্য ঘটে হয়। উত্তর ত্রৈলোক্যপালীল মহোদয় বলেন, বাউল পঞ্চটি আউল পঞ্চক, কোন না আসরা সাধারণতঃ আউল আউল বলি। আউল পঞ্চটি আরবী আউলিলা লম্বুত, আউলিলা কুবি।

বাউলের গুরু ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে তি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বাউল গুরু গ্রন্থ কবিরাছে দিচ্ ও মূলদমান কবির হইতে। ১৮শ, ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে বাউল যথেষ্ট প্রবল ছিল। বাউল যলের সঙ্গে বৈরাগিবলের কোন সম্পর্ক নাই। বাউল বল তাহাদের নিজেদের পাল বাউতী মন্ত কোন পান পানিত সা; কিন্তু মন্ত গোেকতা বাউল পান পানিত।

বাউলজ্ঞানপন হইতেছে, সে মনের মানুষ খুঁজিতেছে, তাহার বর্ষ হইতেছে লহন ভাব, দেককে কিংবদন্ত লুপ্ত লুপ্তরপ মনে করে, এই বেদের মধ্যে চক্র পূর্বা আছে, তাহার ভাটা চলিতেছে। তাহার ভাব চর্যা ভাব; কীকনের বাবদার হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। বাউলের মধ্যে মোটেই বৈরাগীর ভাব নাই। যদিও বা থাকে তাহা আছে শুধু মজা গ্রহণ করিবার মত মজা।

বাউল লম্বুচে বেশী কথা আমাদের জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই। বিভিন্ন ধরনের বাউল পানের উদাহরণ প্রদান করিয়া বিদ্যার লইতেছি।

(১) (ক) মনের মানুষ—

আমার মনের মানুষ যে যে

আমি কোথায় পাব তানে,

হুজিরে সেই মানুষে যেন দিগোনে

কেটাই বুঝে।

আমি মন পাউলান মনের মানুষ পাউলান না।

আমি তার মধ্যে আছি মানুষ তাহা ভিন্নল না।

মানুষ হাওয়ার চলে হাওয়ার কিংব, মানুষ হাওয়ার মনে বদ,  
কেহর থাকে আঁকের সোনার মানুষ, মানুষ ঢাকলে কথা কদ।

গোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো—

তুমি মন বিলাক সেই মনের সাথে।

কেহর থাকে আঁকের মানুষ ঢাকলে কথা কদ।

মনের মানুষ কেমন

আমি কোন লম্বায়ে খাট সেখানে।

মনের মানুষ না হলে গুলুর তার জিনা যাব কিসেতে

আমি কোন্ এলেন কথের মানুষ হোর

কোপনি এক বোট লরা—

সে মানুষ কলে হলে কলে কলে কোন্ যে

মুঁদর মনেচোরা।

যে মানুষ বরি বরি

আলাব করি

সে মানুষ বংগে কোন্ না সে বংগ।

ভরিতে আছে আট-মনি কোটা কলরে

বাঁঠি বঃ মহলে

সেখানে মনের মানুষ বিলাক করে

মন পলাই উরা চলে

এই মানুষে আঁকের মন

বারে বলে মানুষ বচন

লালন বলে কোরে সে বন, পাংগায়ে না।

ক কথা কথের কোন্ বের বঃ

নড়ে ওড়ে হাতের কয়ে

পুঁকলে ললন তব দিলে না।





মাছে বায় মনের মাহু মনে সে কি অপে মাগে  
অতি নির্জনে ব'সে ব'সে দেখেছে খেলা ।  
কাছে র'তে জাকে ভাবে, উঠবেরে কোন পাবনা ।  
প্রবেশ বা বোঝে ডাঙে সে বুঝে থাকবে তোলা,  
যে দায় বাধা নেহাৎ, সেইখানেতে চাত্ত ফল মল  
ওরে ত্রৈলোক্যে মনে মনের মাহু মনে ভোগা— ।  
যে জন দেখে দেখে করিবে চুপ রহ নিরালা  
ও সে লালন ভেঁড়ের গোক জানানো

চরি বেলা—

মুখে চরি, চরি খেলা ।

• • •  
অলস মাহু বইলো আরে, তার নাটকে তার চুপে চুপ ।  
• • •

( ৪ ) মনের মাহুয়ের পর আমরা অচিন পাখীর খবর  
পাই । ইহাও বাউলের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ।

বাটার চিত্র অচিন পাখী

কমলে আসে ঘর

•  
মনের মাহু পাখী পদীনে চড়ে

নবীত ফল ওষায়ে খেলেরে

পাখী পুতে উড়ান চাড়ে

মাহির বেশ লরে ।

• • •  
আমার নব পাখী বিক্ষোভ হয়ে,

দূরে সরে যা ।

( ২ ) সমস্ত ভাবে সকল মিনিষ করিবার আকাঙ্ক্ষা  
বাউলের একান্ত আপনার ভিনিষ । অস্ত্রের লগ্নে তাকার  
হানে বিশেষ পার্থক্য ।

দুখ পালে হত দুখ তোলা,

দুখ পালে হত দুখ উতলা,

লালন কর মাহুরের খেলা

নব জোর কিলে কুং ধরে ।

বৌদ্ধ শিক্ষণের চর্যা যে ধরনের রচনা, বাউল  
গানের তদ্রূপ রচনা । জীবনের নানা বাবদার ( Occupa-  
tion ) অবলম্বন করিয়া গান রচনা করা । এক্ষেপে এই  
জীবিত করেকটি গান তুলিয়া বিদায় লইচ্ছছি ।

✓  
বাড়ের কোন দূতাবে এমন তরী ফল ফেটে ডাঙাতে চলে  
বক তার কারীপকী দুহতে মাহি এ কোল সে কোথায় গেলে ।  
মেঘি না কেবা মাহি কোথায় বসে, হাওরায় আসে হাওরায় চলে ।  
তরীটি পবিদ্যাটা মাহুলটি মাহবাবনে তার মাহুরে কোলে,  
লাগেনা হাওরায় কল শুধনি সে ফল মিলিল বিকে লম্বায় চলে ।  
তরীতে আরে আটা-মহি কোঁটা কলার বাতি হাঃ বহলে  
কেবনে মনের মাহু বিদায় করে মন-মমবে তরী চলে ।  
মহিন কর চলে সড়ি তুলবে জারী উৎসবে এই মন-মহিলে,  
যে দিন ভাঙাবেরে কল হুবে অলস  
জলে নঃ আর ফল ফলে ।

পদ্মা নদীর পুল বেঁধেছে ভালো—

কত ইট পাটকেল পাশুড়া, কুটী পমার বুলে মিল,

কত কাচপার মাহু ই ডাকুতে মিল ।

পুলের বাবা বোল কোঁড়া,

উপরে তার মিলটি কত,

করকড়া কলে মাটি তুলে বাধা বসাইল

মেঘ মাহুরের দুধি খালা,

পুল বেঁধেছে কত খালা ।

‘মোল কোঁড়া বামবদাতে তিনের মাহুর মল ।

কোঁমল কলীর মদো মাল কলী মল ।

পুলের বরত বেটোদুট

চাকার ঘর লাও কোটী

আমার কাপা চামের কি কারবানা বুঝতে জনম খেল ।

এই প্রবন্ধ লিখিতে আচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ  
শীল মহোদয়ের নিকট অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি ।  
দূর দূরীতে তাঁহাকে ব্রত জানাইতেছি ।

• মাহুরে নবীত পদীনে মাহিরা-মহিলনীতে পঠিত ।



৩১

পাড়ি ক'রে যেতে যেতে ছিন্ননাথ বিনয়ের বহুর বিষয়ে অহুসঙ্কন করলেন। বহু যথুপরে তখন গর্ভাশ্র পৌঁছোয় নি জনে বললেন, "তুমি তা হ'লে এতক্ষণ সময় কাটাতে কোথায়?"

— বিনয় বললে, "টেশনে; ওরা আসে নি যেসে বাড়িওয়ালাব কাছে কোনো চিঠিপত্র এসেছে কি না। খবর নিয়ে টেশনে ফিরে এসে অপেক্ষা ক'রে ছিন্ননাথ।" অন্তঃপন্থা বাতাবিক অহুসঙ্কনে ছিন্ননাথের যে প্রসন্ন করবার সম্ভাবনা তা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশ্রয়ে বিনয় কথাটাকে ভিন্ন ধারায় চালিত করবার চেষ্টা করলে; বললে, "বাড়িওয়ালাব কাছে চিঠিপত্রও কিছু আসে নি; কি যে হ'ল, কিছু বুঝতে পারছি নে—মনে বড় ভাবনা হচ্ছে।"

ছিন্ননাথ কিছু বিনয়ের এ উৎকণ্ঠায় কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হ'য়ে বললেন, "তা হ'লে খেলে কোথায় বিনয়? টেশনের রিক্রেশনিস্টে ভবে?"

ঠিক এই কথাটাই বিনয় মনে মনে ভাব করছিল; এক পক্ষে কখনো অনাহারে রয়েছে সে সংবাদ খবর ক'রে এনে অপর পক্ষের সংবাদও যদি ঠিক একই রকম পাওয়া যায়, তা হ'লে উভয় পক্ষেরই আচরণের গুরুত্ব পৃথক ভাবে বুঝি পায়। কি বলবে লক্ষ্য স্থির করতে না পেয়ে একটু ইতস্তত ক'রে বিনয় বললে, "পাওয়ার বিশেষ দরকার ছিল না—সকালে তাল ক'রে জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

ছিন্ননাথ বললেন, "অর্থাৎ, সমস্ত দিন উপোস ক'রে রয়েছ সে কথা স্বীকার করতে সন্মত হচ্ছে। কি যে তোমাদের কাণ্ড কিছুই বুঝি নে!"

এ কিছুই বুঝি নে'র অর্থ যে কতক বুঝি, এবং 'কাণ্ড'র অর্থ কেবল ঘাত্ত অনাহারই নয়—তা বুঝতে বিনয়ের দুল হ'ল না। সে অপ্রতিবাদের দ্বারা 'ছিন্ননাথের' সমস্ত অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিয়ে নীরবে ব'সে গেল। দেওঘর যাবার পাক্য রাস্তা ছেড়ে ছিন্ননাথের বাড়ি থাকল কাঁচা রাস্তার পড়বার আগে বিনয়ের একবার মনে হ'ল ছিন্ননাথের বাড়ি না গিয়ে একেবারে সোকাহাটী তাকে শুকুমারদেব বাড়ি পৌঁছে দেবার ওর ছিন্ননাথকে অহুসঙ্কন করলে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রবল উত্তেজনা তীব্র মনের মধ্যে প্রতিফলিত হ'লে একটা অসমস্ত বিস্তার করেছিল যে, তার দুখ দিয়ে একটি বাক্য নির্গত হ'ল না; শুধু চোখের সামনে দুটে উঠল একটি অনাহারাত্মক তরুণীর বিষন্ন-মেঘের মাথুরী, এবং প্রাণের তাগে ধর্মিত হ'তে লাগল একটি ভ্রাতৃ-সুহৃদর নাম—কমলা, কমলা, কমলা! বিনয়কে আশ্রয় করতে পারে নি বলে কমলা বয়ঃ সমস্ত দিন উপবাসিনী রয়েছে!—যে আত্যা সে বিনয়ের বুকে দিতে পারে নি সে আত্যা সে নিজেরও প্রাণ করতে পারে নি! বিবাহ বিতর্ক কলহ বৈরতের মধ্যে কোথায় দৃকিবে ছিল এই অমৃতের ঐকান্তিক সহস্রোপিতা,



যা প্রস্তুতিত পড়লেও মত চিত্রের স্বার্থ বহুগুণী বর্জনিত করে দিয়েছে। অতীত লক্ষ্যেবের মধ্যে বিনয়ের মনোবাসি মচিহ্নিত দোষাগার উচ্চল মাননে কাপুতে লাগল।

পথের ওপারে উটকারিগণের গাছ থেকে একটা ছিট পড়তে লাগল। ডান দিকে একটা দাঁড়া চুলকাই করা বাড়ির খেঁটে বিন্যাসিত পাত্রের দের অলংকার কমলালেবু হুয়েন ফুলে ভরে গিয়েছে। বিনয়ের মনে হ'ল আজ যেন আকাশে নৃতন আলো, বাতাসে নৃতন স্পর্শ, ভক্তির নৃতন দলীলতা; আজ যেন পরম অপরূহ তার সমস্ত কমলীলতা এবং রমণীয়তার সমস্ত চ'রে তার বহুভাবলয় মহিয়ার গুণ-পথটি বকে দারণ করে রয়েছে। কমলা এবং সে উজ্জ্বল অতীত; -- মনে হ'ল এ যেন মিলনের পূর্ণাঙ্গ সংসার বিধি পালন।

গেট অতিক্রম করে গাড়ি গুল-গাছের প্রবেশ করতই বিনয়ের উৎসুক দৃষ্টি চতুর্দিকে যে বস্তুর অবস্থান ক'রে এল কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। গাড়ির পথ শেষে একজন ভুতা ছুটি এল; তাকে বিজ্ঞান ভিজ্ঞান করলেন, "সন্তোষ বাবু এসেছেন?"

"আজ্ঞে না সন্তোষ।"

"আজ্ঞা, নির্দিষ্টকাল পিগনির বৈঠকখানা ঘরে ডেকে দে।" ব'লে বিজ্ঞান ভিজ্ঞান করে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করলেন।

কমলা তখন নিজেই ঘরে ব'লে একটা বই নিয়ে পাতা ওঠাচ্ছিল। ভুতা ঘরের কাছে এসে ডাকল, "নির্দিষ্ট!"

কমলা এসে পর্দা দড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি?"

"বৈঠকখানার সচিব আপনাকে পিগনির ডাক দেন।"

হ'লে পক্ষ কমলার কানে গিয়েছিল; জিজ্ঞাসা করলে, "সচিব আর কেউ আছেন?"

"সেই ছবি-ওজালা বাবু।"

কমলার মুখ স্বেচ্ছা আরক্ত হ'য়ে উঠল।

"আর কেউ?"

"আর ত' কেউ না।"

"আজ্ঞা, ব'লে বাজি।"

মিনিট দুই পরে বৈঠকখানার ঘরের পাশে কানির চ'লে পড়ল। কমলা বলল, "বাবা, আমাকে ডাকি?"

বিজ্ঞান ঘরের ভিতর থেকে বললেন, "হ্যাঁ, ডাকি বর কি। ভিতরে এস।"

বিজ্ঞান পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করে কমলা দেখলে একটা বড় মোড়ার বিজ্ঞান এবং বিনয় ব'লে। বিজ্ঞান ইঙ্গিতে কমলাকে নিকটে ডেকে নিম্নের পাশে বসিয়ে বললেন, "তুমি মনে কোরো না কমল, একা তুমি উপবাস করে রয়েছে। আমার ডানদিকে গে বাড়ি ব'লে মাছের তোমার আচরণের সঙ্গে তার আচরণের যে কোনো প্রভেদ নেই তা তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। আজ সকালে বাড়ি থেকে লাখ্য বৈঠক খাবার করে বেরিয়েছিলেন তারপর সমস্ত দিনে মুখে অন্নভণ পড়েন।"

তবে কমলার বিস্তৃত মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; একগুণ অচেতন আত্মকে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে দৃষ্টি নত করে সে নীচবে ব'লে রইল। শব্দে আতঙ্কিত হয়ে বিলম্ব হ'য়ে গিয়ে কই বয়, এই আশঙ্কায় সে সকালে বিনয়কে আচরণ করে বাবার চক্ষু কত শীতলীভূত করেছিল, কিন্তু এখন বিনয় সমস্ত দিন অতীত রয়েছে শুনেও তার মুখ দিয়ে একটি বাক্য নির্গত হ'ল না। মনের মধ্যে একটা চক্রে অপ্রভব করলে বটে, কিন্তু সে প্রাণের মধ্যেও একটা ছিট পড়ল আনন্দ টিক তেমনি তাই পরিবর্তন হ'য়ে রইল—বাস্তব অন্ধকারের মধ্যে মোহমা যেমন তাই থাকে।

আজব না ক'রে কমলাকে না জানিয়ে চ'লে বাওগর মধ্যেই কমলা অতীত রয়েছে, অতীত সে অপরূহের চক্রে কমা প্রার্থনা করা উচিত মনে হ'লেও, পরিবর্তিত অবস্থায় সে কখনো এনি নিজের গৌণ হ'য়ে পড়েছে ব'লে বিনয়ের মনে হচ্ছিল। বস্তুর দাঁড়নের সময়ে গৃহের কণা ছোট হ'য়ে গেছে। তবুও বলাগড়ব সত্যের কাছেরে কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে কল, "আমায় আজ্ঞা আচরণের চক্রে আপনি সমস্ত দিন না খেয়ে রয়েছে মিস মিস, সে হুয়ে মাঝি।"

বিনয়কে কথা শেষ করার অবকাশ না। দিয়ে বিজ্ঞান বললেন, "সে হুয়ে তুমি যা, তা বলবার পরে হুয়েই..."

পায়ে—তার মাগে আমার কাতটি আমি গারি বিনয়।”  
বলে অকস্মৎ একটি কাত করলেন। এক চক্রে কমলার  
হাত এবং মণ্ডল হস্তে বিনয়ের হাত ধরে কমলার হাত বিন-  
য়ের হস্তে স্থাপিত করে বললেন, “কমলের চেয়ে আমারে  
জিনিষ আমার আর কিছু বেই বিনয়, কমলাকে আমি  
তোমাকে দিলাম। তুমি কমলাকে গ্রহণ কর।”

তড়িৎ-পৃষ্ঠের মত সূচনা গাড়িরে উদ্ভাসিত বলল,  
“এ আপনি কি করলেন?—আমাকে না জেনে না বুকে,  
আমি যোগ্য কি অযোগ্য বিচার না করে, এ আপনি কেন  
করলেন?”

বিজ্ঞানের সুখ উপরে পাণ্ডুর্য্য বারন করল; অলিত  
কণ্ঠে তিনি বললেন, “দে কি বিনয়। তবে কি আমি মূল  
করলাম? তবে কি তুমি কমলা—“বিজ্ঞানের কণ্ঠ রক্ত  
হ’য়ে গেল।

বিনয় বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কমলার অযোগ্য।  
আমি গুরুতর, দরিদ্র—আপনি আমার ইতিগত জানেন  
না। কমলা আমার কামনার বস্তু হ’লেও আমি কমলাকে  
পাবার অধিকারী নই।”

বিজ্ঞানের সুখ থেকে চিন্তিতার ঘন ঘন অশ্রুত হ’ল।  
বিনয়কে হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, “যে বস  
তুমি কর করছে সে বস্তু তুমি অধিকারী;—অধিকারী  
বলে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস না হ’লে আমি  
তোমার হাতে কমলাকে বান করতাম না। তুমি  
গুরুতর তা আমি জানি—তুমি বনবান নও তাও  
আমি জানি—কিন্তু তোমাকে আমি উইলু করে অথবা  
ধান-শস্য করে আমার সম্পত্তি বিক্রিতে বিনয়। যে  
তিনি তুমি নিয়ে সব করে অধিকার করছে তাই আমি  
তোমাকে বিক্রি,—এ অশ্রু-প্রবাহ বান মূঢ়। আমার কথা  
বিশ্বাস না হয়, আমি গাইবে গাজি, তুমি কমলাকে বিজ্ঞান  
ক’রে দেখ।”

সমস্ত ঘটনাবলি একটা অপরিস্রব ক্রিমির উৎকর্ষায়  
তত্ত্ব করত লাগল। এক মুহূর্তে নীরবে অবস্থান করে বিনয়  
পুনরায় উদ্ভাসিত বলল, তবে “আমাকে এই আশীর্বাদ  
করুন, আমি যেন কমলার সোপান হ’তে পারি।”

বিজ্ঞান সত্যসুখে বললেন, “গড়েছ ত’ বিনয়,  
but the brave deserves the fair।”

আরকম্পে কমলার বিকে পৃষ্ঠপাত করে বিনয়  
“তা’লে এল কমলা, আমারে ওখানে থাকে এক  
গলায় করে তার আশীর্বাদ ত্রিকা করি।”

প্রগাণ করবার সময় কমলা ওই বাক্য নিয়ে বিজ্ঞান  
পদয বেষ্টিত করে ধরে উদ্ভাসিত করে ঠাণ্ডে  
বিজ্ঞান তাকে তুলে ধরে পাঠ করে বললেন,  
তোমাদের প্রকৃতক আত্ম এই আশীর্বাদ করি  
নিরত তোমরা একবার হাতকে অবলম্বন করে  
কোনো বিকল্প পক্ষি কোনো যেন তোমাদের সত্য  
বিস্মৃত করতে না পারে। বর্ণাশ্রম মিলন তোমাদের  
হ’য়ে গেল, সামাজিক অসুস্থতা তোমাদের হাট  
থেকে ফিরে এলে হবে। এখন আমি নিশ্চিত  
আমি পরিতুষ্ট।”

পশ্চিম গগন অকস্মাৎ বর্ণাশ্রমের মরুত  
উদ্ভাসিত—তার কিরণে উদ্ভাসিত মেটের পাশে এক  
হলপরের পাছ তার অসংখ্য অশ্রু-নিধি এই সত্য  
মিলন-অভিনয়ের সাক্ষ্য করে ইল।

বিনয়কে মান্যতার ক’রে বাহে খাবার চক্রে  
অগ্রসর করলেন—কিন্তু বিনয় স্বাক্ষর হ’ল না।  
তার উল্লেখের উত্তরকার সে এমন একটা অবস্থায়  
করছিল যে, একটু বিগ্রাসের এবং নিম্নস্তর  
চিত্র অধীর হ’য়ে উদ্ভাসিত। এক পেচালা তা এক  
কিছু বাবার খেবে সে বাবুর জগে সন্তুষ্ট হ’ল।

মনের অপরিস্রব মানকে বিজ্ঞান অতিথির  
বোধ করছিলেন; বললেন, “চল বিনয়, তোমাকে  
পৌছে দিয়ে আমি।”

বিনয় এত বিজ্ঞান প্রগাণ করবার বস্তুভাবিত  
রিকিৎসা থেকে সন্তোষ ফিরে এল। সংগে গেরে পৃষ্ঠ  
তাকে ভিতরে ডাকিয়ে পাঠালেন।

অবশেষে উপস্থিত হ’য়ে সত্যের পদযুগের  
গ্রহণ করলে তার সামনে একজন কৃতা টা এক  
ভেবে গেল।



স্বস্ত্যাব বললে, “আলবার আগেই অনেক খাবার টাবার এসেছি ঠাকুমা,—আর কিছু খাব না।”

পদ্মবা সত্য প্রসঙ্গকে বললেন, “তা না খাও না খাবে, আমারে কি খাওয়াবে বল?—খোদা-বর আছে।”

স্বস্ত্যাব মিতমুখে বললে, “আপাতত বিনিমায়ের পেঁড়া। বর রূপ কানির চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণ-রূপ পর্যন্ত পথ সমস্ত। কিন্তু কি খোদা-বর হলেন? কমলার বিয়ে বিনয়ের সঙ্গে?”

স্বস্ত্যাব জান্ত এ কথাটা। উপহিত মনসে একবারেই দা, এবং এ পরিস্থিতি পদ্মবী উত্তেজিত হইল।

পদ্মবী ক্রুদ্ধিত করে বললেন, “বোনো না আমি হবে কথা! তা হলে কি কি-খাওয়াবে বিজ্ঞান। ম?—একবারে চতুর আকিমের ক্রমাগত দিলাম।” পর প্রসঙ্গকে বললেন, “কমলার বিয়ে হটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে।”

এ বিবাহ অনেকদিন আগে খাওয়াতে সমস্ত সন্তোষের অনেকখানি আগুণে হানাদিকার করেছিল।

স্বস্ত্যাব বললেন, “আরো বলে বলুন ঠাকুমা।”

তখন বানিকটা রং আর বানিকটা পাণি, বিয়ে পদ্মবা বিগ্রহের বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন

হইয়া বিবৃত করলেন; বললেন, “চতুর্থে বিবাহ করে

স্বস্ত্যাব মোটাটাকে নিয়ে বিবাহ বিনিমায় পেঁড়ে দিতে

স্বস্ত্যাব—কিহে এসেই তোমাকে সব কথা বলবে; কালই যাতে

তোমাকে বিবাহ আশীর্বাদ করে তার ব্যবস্থা আমি করব।

স্বস্ত্যাব তুমি যদি আমাকে তার যাও ত তোমার পক্ষ

হ’লে আমি কমলাকে আশীর্বাদ করে রাখব। কি বল?”

স্বস্ত্যাব হাসিমুখে বলল, “আপনার আশীর্বাদেই যখন

কমলাকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে, তখন কমলাকে আপনি

আশীর্বাদ করবেন, সে তার কি আমাকে দিতে হবে

ঠাকুমা? আপনি কমলাকে আশীর্বাদ করবেন আপনার

নিজের মর্মান্বয়।”

স্বস্ত্যাব হ’লে পদ্মবী বললেন, “আচ্ছা, তাহ’লে তাই

কি বল।”

আরো কিছুকণ কথোপকথন এবং পরামর্শের পর

স্বস্ত্যাব বাটরে এসে বাতান্বিত বলল;—মনে হ’ল বাগানের একপ্রান্তে একটা শিলাবস্তুর উপর কমলা ব’লে রয়েছে;—পাছপাশের অবকাশ দিয়ে তার লালপ’ড় পাড়ীর অংশ দেখা যাচ্ছে। প্রথম মনে হ’ল আজ যখন ঠাকুমা’র পর সমস্ত কথা পাকা হবার কথা রয়েছে তখন তার পূর্ণ কমলার সহিত কোনো কথা না হওয়াই ভাল; কিন্তু পাশের তার উজ্জত চন্দ্রের আবেগকে রোধ করতে পারেন না। ঘরে ঘরে কমলার সমীপে উপস্থিত হ’লে যত্নসহে ডাকলে, “কমলা!”

কমলা পাশের আগমন জান্ত গেরেছিল; বলল, “আজ্ঞে?”

“তোমাকে একটা গ্রন্থ বিজ্ঞান করতে এলাম কমলা!”

চকিত হ’লে কমলা বলল, “কি গ্রন্থ?”

সত্যসুখে প্রসঙ্গের সন্তোষ বলল, “আজ আমাদের চন্দ্রের মধ্যে কে বেশি সুখী—তুমি, না আমি,—তাই বিজ্ঞান করতে এসেছি।”

স্বস্ত্যাবের কথা শুনে চন্দ্রে, তবু, সজ্ঞার কমলার চন্দ্র মনিত হ’লে উঠল। এই নিরতিশয় লক্ষণের অবস্থায় সে ক্রি বলবে, কি করবে কিছুই বুঝতে না পেরে অবগত হ’লে পড়ল।

অন্যকাল অগেফা করে স্বস্ত্যাব বলল, “আমিই বেশি সুখী, কারণ আজ আমি তোমাকে পাবে। আজ রাতে তোমার দাবা আমাকে আমার দলভেট দৌড়াগের কথা জানাবেন। তুমি আমার জীবনের আলো কমলা, আর আমার জীবন আলোকিত হবে, ঠিক যেমন এই সূর্যের বাগান আলোকিত হ’লে উঠল মোটাটির আগের।”

বিজ্ঞানের মোটা কম্পাউণ্ড প্রবেশ করেছিল।

লক্ষট হ’তে মস্ত্রাণিত ভাবে উদার লাভ করে কমলা তাড়াগাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “বাবা এলেন, চন্দ্র।” ব’লে আর উত্তরেই অল্প অগেফা না করে দ্রুতগে অগের হ’ল।

কমলা দেখেনে সেসিহিল দেখেনে ব’লে প’ড়ে স্বস্ত্যাব মনে মনে বলল, “এ শিলাময়ী বড়ি। তুমি আমাদের উজ্জত রূপ মিলন-কেন্দ্র হ’ল।”

## পুস্তক সমালোচনা

অন্য—ডাঃ নরেন্দ্র সেন রূপ প্রদীপ। ১৮৩

পৃষ্ঠা—মুদ্রা ১০৮ টা। প্রকাশক—শ্রীমন্তরায়  
ইসমি ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিভিন্ন প্রথম বর্ষে এই উপজ্ঞানখানি ব্যাপ্যবৃত্তিক  
ভাবে মনে মনে বিচার্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং  
বিচার্য অনেক পাঠক-পাঠিকা এই উপজ্ঞানখানির  
স্বীকৃত পরিচিতি।

নরেন্দ্র বাবু বাঙালী সার্বভৌম ব্যাচনামা উপজ্ঞানিক ;  
ঐশ্বর্যপোষার পঠিত পঠিত নন বাঙালী সার্বভৌম এমন  
পাঠক-পাঠিকা নহে। পশ্চিমান লেখকের এ উপজ্ঞানখানি  
পাঠ করিয়া পাঠক কৃষ্ণপাত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ  
নাই।

লুইসার প্রবন্ধের বলিয়াছেন, "সত্য" একটি সত্যের  
চরিত্রস্বতী নারীর জীবন-কাহিনী। বাঙালীর নারী সমাজে  
এ চরিত্রের যদি সমাধর না হইয়া থাকে তবে সেটা বাঙালী  
নারীর এত কম কলঙ্কের কথা যে আমি তাহা কোনও  
মতেই মানিরা গইতে পারি না। অথচ কোনও সাময়িক  
পক্ষে কোনও নারীর স্বাক্ষর দিয়া এই কথাই বলা হইয়াছে।

গ্রীষ্ম উপজ্ঞান-লেখক হইয়া নরেন্দ্র বাবুর এতদ  
আক্ষেপ করা উচিত হয় নাই। প্রচলিত সংস্কার এবং সন্ত-  
বাদের দ্বারা নিরুদ্ধিত বর্তমান সমাজের সুযোগের হইয়া  
কোন বিশিষ্ট উপজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক নূতন সত্য প্রচার  
করেন? যে সত্যের প্রত্যেক বর্তমান সমাজের সমাজের  
চক্ষু যদি সত্য না করিতে পারে ত সে বোধ উপজ্ঞানিক  
অথবা দার্শনিকের নয়। তবে সত্য যেন সত্যই সত্য হয় ;  
—বিধায় উপর কণ্ঠ স্থির সিদ্ধি না হয়। কিন্তু,  
সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের একটা অচল পরীক্ষাই বা কোথায়  
আছে? সত্য-মিথ্যা নির্ণয়িত হয় জন-সাধারণের অধিকাংশের  
উপলব্ধি দ্বারা, বিচারের দ্বারা সব সময়ে নয়। সুতরাং  
যিনি সত্যের নূতন নৃষ্টি প্রকাশ করেন, তাহাকে অনেক  
সময়ে জনসাধারণের অধিকাংশের কাছেই লাঞ্ছনা ভোগ  
করিতে হয়। অতএব কোনও সাময়িক পক্ষে কোনও

একটি নারী কি বলিয়াছেন তাহারা বিচলিত হইয়া  
কিছু নাই।

চুখক—রায় সাহেব জগদানন্দ রায় প্রদীপ  
১৮৩ পৃষ্ঠা, মুদ্রা ১০৮ টা। প্রকাশক—শ্রীকালী  
কিশোর মিত্র, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, কোলকাতা।

চুখক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ ছেলেনেব  
একটি চমৎকার পুস্তক। বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ সম্বন্ধ  
জগদানন্দ বাবু সিদ্ধান্ত। সহজ সরল প্রণালী  
বিজ্ঞানের কঠিন সমস্যাগুলিকে সাধারণের বোধগম্য  
করিতে তাঁহার মত কমতাপালী লেখক বাংলায়  
অতি দ্রুত আছেন। পুস্তক খানি আভ্যোপাধি পঠিত  
আমরা যেমতাই চুখক সম্বন্ধে সমস্ত কথাই  
চিত্তাকর্ষক ভাবে বলা হইয়াছে।

পুস্তকখানিতে দুইটি ক্রটি আমরা লক্ষ্য করিলাম।  
প্রথমত—পুস্তকে ব্যবহৃত চিত্রগুলির বিভিন্ন অংশ নিজে  
করিবার মত ইংরাজী বর্ণমালায় অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া  
হইয়াছে, ইহার কারণ মনে হয় চিত্রগুলি ইংরাজী পুস্তক হইতে  
অনুবর্তিত ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙালী লক্ষ্য  
ব্যবহার করিলে, যাহারা ইংরাজী বর্ণমালায় পঠিত  
পঠিত নন তাহাদের এই পুস্তক পাঠ করিতে অপ্রসিদ্ধ  
হইত না। দ্বিতীয়ত, পুস্তকে সামুদ্রিক ব্যবহার করা  
করিয়া চলিত ভাষা ব্যবহার করিলে বাংলা-বালিকা-লেখ  
পক্ষে দ্রুত গ্রহণ হইত।

বই খানির ভাষা, কাগজ, বাঁধা এবং প্রচ্ছদপট  
দেখিলে মনে হয় না যে ভারতবর্ষে বইখানি প্রস্তুত  
হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, কোলকাতা  
অপ্রতিপদ দৌরব এ পুস্তকে অল্প রক্ষিত।

ভাষা—রায় সাহেব জগদানন্দ রায় প্রদীপ  
১৮৩ পৃষ্ঠা, মুদ্রা ১০৮ টা। প্রকাশক—শ্রীমন্তরায়  
বর, আকতোব লাইব্রেরী, ৪ নং কলেজ রোড, কলিকাতা।  
জগদানন্দ বাবুর চুখক বইখানির রচনা বিচার উপরে  
আমরা যে অতিমত প্রকাশ করিয়াছি এ পুস্তকটি সম্বন্ধে



অতিমত প্রযোজ্য। একশ পৃষ্ঠক বাগদা জাহার প্রকাশিত হয় দেশের চতুর্থ মঙ্গল। এই ক্ষমতার শাক্যতগণকেও আমবা আমায়েন বহুবার জাপন করিতেছি। মাশ কবি তাঁহার ক্রমশ এই শ্রেণীর আরও পুস্তকাংশী প্রকাশিত করিবেন।

**দীপান্বিতা—**ঐ.চমস্ত্র বাগদা প্রণীত। মূল্য: ৩ টাকা। প্রকাশক—ঐন্দিরীশকুমার বাগদা। গাউ, মনন মিড লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—বদনা জেল্লী, কলকাতা টুট মার্কেট, কলিকাতা।

বর্তমান কালে ক্ষমতাশালী যে তরুণ কবিশ্রমের গুণে আমরা পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে যেমনবাহুর কৃষ্ণ মেধ উল্লেখ্য। কোনো মানিকের পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চোখে পড়িলে তাতা উপেক্ষা করিয়া পাতা মিলিত। "না যাহ না, ঠাঃ কুবিজ্ঞা-প্রাপ্ত মানিকের দৃশ্যে প্রকাশের কথা নহে।

দীপান্বিতার কবিতাগুলি সুস্বাক্ষিত, সুকল্পিত। কব ও লেখ, কবিতা একান্ত মিষ্ট। কবিতাগুলি রচিত করিবার বয়সে কবির বহুশক্তিভাব পরিচয় দেয়—কিন্তু তরুণ কবিতার সাবলীল গতি কোথাও বাধা পায় নাই।

চেমস্ত্র অলঙ্কারের লক্ষণাঙ্গী :—অধুনা-নির্মিত ক্ষমপ্রসারের প্রতিগ ইচ্ছার লোভ কম নয়,—বহা 'ভুলে গেলি মহাভারত' ভুলি আশ্রয়ে তাই নবোদয়-উদয় 'উদাস'। কিন্তু অলঙ্কার ব্যবহার করিবার সুকল্পিত ভাবে ইনি অলঙ্কার ব্যবহার করিবার বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাতিয়াছেন।

দীপান্বিতার কাগজ, ভাষা, বোধাই এবং সুপ্রণীত প্রণীত।

**কল্যাণ-প্রদীপ—**ঐমত মোক্ষা দেবা প্রণীত। ১০ পৃঃ ভঃ ক্রঃ—৪২০ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক—ঐন্দিরীশ ৩২ মূখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ১ নং ৩৫, পোষ্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তকখানি মাতামহা কর্তৃক লিখিত 'কল্যাণ-প্রদীপ' পুস্তকখানি

কুমার মূখোপাধ্যায় খাট, এম. এন-এর জীবন-কালিকা, ১০ পৃঃ ভঃ ক্রঃ—৪২০ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক—ঐন্দিরীশ ৩২ মূখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ১ নং ৩৫, পোষ্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

মিঃ উত্তর টাংকে জুবর পেনা কর্তৃক অবতরু চন এবং অবতরুচলনে মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে টাইফাইডে প্রাণ হারা যান। পুস্তকেই কল্যাণকুমার শাসনিকতা এবং কল্যাণকুমারের দেবদেবী যে 'ব্যক্তি জী শ্রমণ শাসনিকতা' এবং কল্যাণকুমারের মাইলশব জীবন-কাহিনী এই পুস্তকে স্থান পাতিয়াছে।

বাঙালীর সাধারণ বৈচিত্র্যময় জীবন যাপনের মূখ্য বাঙালী শাসনিকতা এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার প্রযোজ্য নয়; সে ভিন্নবে এ পুস্তকখানি আকর্ষণীয়। তাতা ছাড়া, তাহার প্রাচীনতা এবং বৈচিত্র্যের মতক ভক্তি পুস্তকটি সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। পুস্তকের দেখাশ পুস্তকের 'কথার কোঁহলোশীলক'।

পুস্তকটিতে পনেরোখানি চিত্র ও চিত্রখানি মানচিত্র শির-বেশিত হইয়াছে।

**জমা-অক্ষর—**ঐমতম মূখোপাধ্যায় প্রণীত। ১০ পৃষ্ঠা—মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—ঐন্দিরীশ রবি, ১০২ বঙ্গোয়ল, কল্যাণাট, কলিকাতা।

পাঠখানি গল্প লইয়া এবং একটা গল্পের বই। 'জমা-অক্ষর' গল্পের পরিচয় বিচিত্রা নিরমিত পাঠকবর্ণকে দিতে হইবে না, তাতা এই পুস্তকের প্রকাশকের নিষেধন পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এই গ্রন্থের পাঠক গল্পের মধ্যে চারটি গল্প বিচিত্রা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লেখকের দেখা পাইয়াই আমরা তাঁহার শক্তি উপলব্ধি করি, এবং বিচিত্রা উপলব্ধি তাঁহার গল্প প্রকাশিত হইবার বাঙালী পাঠক শ্রেণীর মতি তাঁহার বর্ধার পরিচয় স্পষ্টিত হয়, তাতা প্রকাশিত হইবে প্রকাশকের নিষেধনের নিষেধকৃত অংশ হইতে :—"০০০ লেখকের 'বাগুদী' নামক 'সরটি-বিচিত্রা' প্রকাশিত হইয়া শাসনিকমতে ক্ষেপে সমাপ্ত হইয়াছে। 'বাগুদী' হইতেই লেখকের 'রতন-মহাবীরা' নিরূপিত হইয়া যায়। তাহারপর 'জমা-অক্ষর' প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'তে। 'জমা-অক্ষর' প্রকাশিত হইলে লেখকের দ্বা-উল্লিখিত 'ব্যাগুদী' প্রকাশিত হইবে।

পুস্তকখানি মাতামহা কর্তৃক লিখিত 'কল্যাণ-প্রদীপ' পুস্তকখানি কুমার মূখোপাধ্যায় খাট, এম. এন-এর জীবন-কালিকা, ১০ পৃঃ ভঃ ক্রঃ—৪২০ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক—ঐন্দিরীশ ৩২ মূখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ১ নং ৩৫, পোষ্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সৌন্দর্য্য—ঐশ্বর্য্যমূল্য বাক্য এবং, ৫. প্রবৃত্তি। ৮৭  
পৃষ্ঠা—মূল্য আছে জানা। প্রকাশক—ঐ.সামান্য বাক্য  
মহম্মদ, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,  
কলিকাতা।

বাক্য পুস্তক। চতুর্থ বর্ষ পঠে—এ বইখানি সমাপ্ত—  
চতুর্থ পঠে আমায়ের ভাল লাগিয়াছে। ভাষা প্রাচীন,  
ভাষা সমাধিকৃত, বাক্য পঠিত,—নাতিভা-বাক্য-পাঠ  
এ বইখানি পাঠ করিয়া মনো হইবে।

এইখানির ভাষা পাঠ্য এবং কালকের পক্ষে মূল্য  
হইত।

মেক্সিকোদেশের কথা—ঐ.সামান্য (মো) প্রবৃত্তি।

১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আছে জানা। প্রকাশক—ঐ.সামান্য প্রকাশ  
দিত; মেক্সিকোদেশের মত নারী-মহল-সমিতি, ৪৬ নং  
কেন্সিংটন রোড, কলিকাতা।

‘কলকাতা’ সম্পাদিকা প্রকাশিকা ঐ.সামান্য প্রকাশিকা  
মো, প্রবৃত্তি এই মাসের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া  
আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। মনস্ত পুখুরী ব্যাপি  
এখন নারী-মহল-সমিতির বিবরণ অতিশয় হইয়াছে। একমুখ  
নারী-পুস্তকের মধ্যে নারী-মহল-সমিতির মত  
পঠিত পক্ষে বাহ্যিক কিছু বাহ্যিক বিবরণ তপে উপস্থিত  
হইবে—তাহাকে পঠিত এবং লিখিত করিয়া নারী-মহল-  
সমিতির ক্ষেত্রে প্রকাশ করিবার কত দুঃস্বপ্ন হইয়াছেন।  
আমায়ের বেগের নারী-মহল-সমিতির এ চাকলাত লক্ষণ  
প্রকাশ পাইয়াছে। বর্তমান সময়ের কেবল নারী-মহল-  
সমিতির নত, পুস্তকের পক্ষেও এইখানি পড়িয়া দেখা  
একটি অবিকৃত বলিয়া আমরা মনে করি। এই  
পুস্তকখানির অতি প্রয়োজনীয় নিবন্ধগুলির মধ্যে দুষ্টি  
এবং ভাষার এমন একটি অগ্রগত প্রভাব—বর্তমান যে,  
গাঢ়তা অপ্রতিমিত নারী-প্রগতির সমর্থক এবং গাঢ়তা  
নত, উত্তর প্রবৃত্তি এই পুস্তকে তাহা দেখিবার মত  
অনেক তিনিদ পাঠ্য।

ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত আমরা সকলকে এই পুস্তকখানি  
পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সৌন্দর্য্য-শিক্ষা—ঐ.সামান্য বাক্য প্রবৃত্তি ৮০ পৃষ্ঠা  
মূল্য আছে জানা। প্রকাশক—ঐ.সামান্য বাক্য প্রবৃত্তি  
এ, বেঙ্গল পাবলিশিং কোং, ২ নং কলেজ রোড,  
কলিকাতা।

এখানি একটি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি পড়িলে  
মনে হয় প্রবৃত্তি-এ পুস্তকে তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্যের লক্ষ্য  
হইতে পরিবর্তন করে দেখা যায় মনস্ত দেখাই অত্যন্ত  
করিয়াছেন। বিভিন্ন কবিতার মধ্যে বাক্য-কোণের  
অনুসরণ পঠিত হয়। বাহ্যিক, কয়েকটি কবিতা পাঠ  
করিয়া দেখিলে কবিতাগুলির পরিচয় পাঠ্য আমরা মনো  
হইয়াছি। নিজের কবিতার পক্ষে অত্যন্ত পঠিত  
দেখক সকলতা পাঠ করিলে বলিয়া আমরা মনে  
করিয়া।

ভাষান্তর শিক্ষা—ঐ.সামান্য প্রকাশিকা ৮০ পৃষ্ঠা  
মূল্য আছে জানা। প্রকাশক—ঐ.সামান্য প্রকাশিকা ৮০ পৃষ্ঠা  
নাতিভা-ভবন, বড়-বড়, মো: বড়-বড়, ২৪ পল্লী।

উপনিষৎ এবং বক্তৃতা-প্রবৃত্তি হইতে নিষ্কাশিত  
উপনিষৎবাকী এক ভাষার মূল্য বাক্য প্রকাশ।

চার জানা বাহ্যিক এ পুস্তিকার প্রভাব বাক্য প্রকাশ  
২৪ পাঠ করিলে।

বিশ্ববিদ্যালয়-ঐ.সামান্য প্রকাশিকা ৮০ পৃষ্ঠা  
মূল্য ৮০ জানা। প্রকাশক—ঐ.সামান্য প্রকাশিকা ৮০ পৃষ্ঠা  
৮০ পৃষ্ঠা নাতিভা-ভবন বড়-বড়, মো: বড়-বড় ২৪  
পল্লী।

বিবাহের মত পঠিত হইতে মনস্ত প্রকাশ এবং  
মূল্য বাক্য প্রকাশ। বক্তৃতা কালোজী, দুষ্টি  
কভার মনস্ত। এ বইখানি বিবাহকালে  
উপকার দিবার উপদ্রুত।

ম্যাক্সিমেলিন পুস্তিকা—সময় ১০০০  
প্রকাশক—বি কালকাতা টেজি কোম্পানি, ১২-২,  
গোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পরিচয় ভাবে দুষ্টি এই মিন-পুস্তিকাটির মধ্যে  
নতনতের মূল্য আছে।



## নানাকথা

### রবীন্দ্রনাথ

আগামী ১লা জুন, পনিবার ঐদুক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যাহ্ন ভাষণে হঠাৎ কলকাতা পৌছিবেন এইরূপ কথা আছে। কলিকাতায় তবে পৌছিবেন তাঁহার এখনও স্থিরতা নাই।

ক্যানাডার অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ তখন বাঙ্গালীগণের নিকট প্রচুর সম্মাননা এবং সমর্থনা পাইয়াছিলেন। ভ্যানকুভারের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সম্মেলনে গ্রেট-ব্রিটেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী এবং কোকো-সোথিকিয়া হঠাৎ সমগ্রগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইচ্ছাধর মেঘা রবীন্দ্রনাথই সকলক গান গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিবেশনের প্রথম করেক দিগ্বে তিনিই প্রধান বক্তা ছিলেন—এবং স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইত।

যে সম্মাননা রবীন্দ্রনাথকে প্রদর্শিত হইত, তাহা যে শুধু বাস্তবতাবৎ তাঁহার সম্বন্ধে অসংখ্য নথি, পরন্তু ভারতবর্ষের প্রতি ক্যানাডার দোষাভ্যাসও নিদর্শন, তাহা ক্রমশই সুশ্রুতি হইয়া উঠিয়াছিল। ক্যানাডাবাসীগণের সুখে রবীন্দ্রনাথের কথা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার ভারতবর্ষকে ক্যানাডার জাতিভ্রাতা জানে ভারতবর্ষের সচিব ক্যানাডার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় বাছনীর বলিয়া মনে করিয়াছেন।

পূজ্য ক্যানাডার এবং প্রধানতঃ ভ্যানকুভার ও ব্রিটেন-কলিকাতার জনসাধারণ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের আগমন হেতু ভারতবর্ষের প্রতি এবং ক্যানাডার ভারতবর্ষীয় বাসিন্দাদের প্রতি উৎসাহের মনোভাব বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে; ইহার দ্বারা বিশিষ্ট সামাজিক এবং রাজনৈতিক লাভ অর্জিত হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

শিক্ষা পরিষদের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ মনোবিজ্ঞান লকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এবং বাণী, চিন্তা-বিশ্রুতি এবং অতিবাক্তিক বৈচিত্র্য হেতু সাধারণের নৈকট্যেই কলিকাতা, উপমহা এবং উদ্বাহরণের দ্বারা লকলকেই হইয়া লকলের নিকট বিশেষভাবে উপভোগ্য হইয়াছিল। কবির স্মরণে মৃতি এবং স্মরণ্য বাণী জনসাধারণকে যে অপরিমিত আনন্দ দিয়াছিল, তেমন আনন্দ পশ্চিম ক্যানাডার অধিবাসীগণের অগ্রে কদাচিত ঘটিয়াছে।

সম্মেলনের শেষভাগে একদিনের একটি ঘটনা হইতে কবির প্রতি ভ্যানকুভারবাসীগণের অস্থায়ী প্রভাবমান হইবে। একটি সিনেমা-রোলারে জার্মান যুব-সম্মেলন ভারত পরিষদের চিত্র দেখান হইতেছিল। পাঁচ-নিকটনের চিত্রাভিনয়কালে হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হইয়া প্রায় হাত্রে জার্মান অতিবিশিষ্টকে সম্বোধিত করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত মৃতি মৃতি-গোচর হইবামাত্র বর্ষকমণ্ডলী বিপুল উল্লাসে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠেন। প্রায় তিন মিনিট কাল—রবীন্দ্রনাথকে দেখা গিয়াছিল,—এই সময়ে বর্ষকগণ বাহ্যিক হর্ষধ্বনির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহাদের অসংখ্য বাক্ত করিয়াছিলেন।

ক্যানাডা হইতে বিদায়কালে ভ্যানকুভার থিয়েটারে বিপুল প্রোডুস্টলীর সম্মুখে বর্ধাইয়া রবীন্দ্রনাথ ক্যানাডার প্রতি তাঁহার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, “প্রাচীন সভ্যতার অসমুদ্র—যে প্রাচীন সভ্যতাসমূহ পরিভ্রান্তির মোহনতঃ বিদ্যে-পীড়িত এবং অসামান্য-বর্ধিত হইয়া পড়িয়াছে—ক্যানাডা এখন তৎপরতার অবস্থান করিতেছে;—তাঁহার বর্ধিত নবীনতা নূনতাবে বর্ধিতক নিশ্চয় করিবার উপযোগী।”

রবীন্দ্রনাথের বিদায়বাণী সমাপ্ত হইলে বিপুল উল্লাস—

অনির দ্বারা বর্ণক-বস্ত্রী ঔষধের আনন্দ লাভ  
করেন।

পৰ্বতমাৰ্গৰ কানাডা বৰ্ণন কানাডা এ ভাৰতবৰ্ষকে  
ব্ৰিটিশ-কাঠীৰ-সাম্ৰাজ্যৰ অৰ্দ্ধেক হুইট মৈত্ৰ ৰাজ্য কৰিবলৈ  
কাল্পনিক হৈছে বলিয়া কানাডাবাসীপণ্ডেৰ বিশ্বাস ।

আমরা জানি যে এক পক্ষের স্বাধীনতাকে অধিনায়িত  
করিতেছি।

উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

সং ১৯৫ বৈশাখ আশ্বিনের মধ্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধুগণিত।  
বাণেশ্বর একটি সাধারণ দলার অধিবেনন হইয়াছিল।  
শ্রীকৃষ্ণবিশ্বনাথ শাল মহাবীর দত্তগণিত আসন গ্রহণ  
করেন। বহুসংখ্যকগণের চর্চাচরিত সাংখ্যার্থ মহাবীরের  
প্রত্যাবে, এক মিঃ পি' চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ হরিদাস হালদার, ভাঃ  
নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্তের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুগণিত সাংখ্যার্থ-  
হুতাশ্রয়ণ বর্গীসংস্থিত। সম্মুখের আগামী অধিবেনন সাংখ্যার্থ  
ও সম্মুখের আসন করিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ দত্তগণিত বঙ্গ-  
পরিচালন সমিতির সম্পাদক এই নিমন্ত্রণ সাংখ্যার্থ গ্রহণ  
করিয়াছেন। উক্ত দলার একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত  
হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ রমাশ্রয়ণ শ্রীকৃষ্ণ কোষাধ্যক্ষ  
ও শ্রীকৃষ্ণকোষাধ্যক্ষ যোগ আসনকারী মনোনীত হইয়াছেন।  
অভ্যর্থনা সমিতির চালা অনুমি ১ টাক। দাওয়া হইয়াছে।  
আবশ্যক দাওয়া ১০০ পদপত্রের বোজ দিকানোর  
আসনকারীর নিকট সাংখ্যার্থ দাওয়া।

### ইণ্ডিয়া হাউস অলঙ্করণ

বিশাতে ইতিবাৎ হাউস অফগবনবর জন চার জন মনক  
 ভিকর বিশাতে বাইবেন হির হইগাছে । \* একত বি-  
 শিষিত হর জন শিয়ার নাম নিরীচিত হইগা চারত  
 গবনটে কর্তক বিশাতে পাঠানে হইগাছে :—ঐহুক  
 গনিউমাবন সেন, ঐহুক বোহমুক বোবদগ, ঐহুক  
 হুবাং চৌবৌ, ঐহুক বগবা উকৌ, মি: কৈকৌ রহমান  
 ঐহুক মি: মার, মি: সি, মি: গিগৌ।। এই হর জন শিয়ার  
 সব হইতে চার জন নিরীচিত হইবেন । বিশাতির বদাম

কলেজ অফ্‌ আর্টস্‌ প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক রুথেনস্টাইনের  
( Prof. W. Rothenstein ) মতে চৈতন্যদেব বেশ  
নিকাচিহ্ন করিয়াই তার পর্জিমাতে ।

[illegible]

ଅନ୍ୟାୟପ୍ରମତ ବଦ୍ଧେନାପାଧ୍ୟାୟ

বিদগ ১৬ই বৈশাখ বর্ষ: ভাটপা: কামপ্রদ বংশোদ্ভাব্য  
মহাপ্রভের স্ত্রী: ইয়াং। ঠান সর্গীত-বিদগ ১৭ই বর্ষ-  
নাথ বংশোদ্ভাব্যের ভোগ পুত্র এবং সর্গীত-বিদগ: সোণবর  
বংশোদ্ভাব্যের মহাপ্রভের অগ্রজ। সমগ্র ভাটবংশের মধ্যে  
ঠান একজন ব্যক্তিনামা সর্গীত-বিদগ ছিলেন। বিষ্ণু এবং  
নাকুড়ার অধিবাসীগণ ইহার বিরোধে নিয়মান ৪৪৪৪৪৪।  
ইহার স্ত্রীতে বাংলা দেশের সর্গীত-বিদগ অধিবাস  
৪৪৪৪৪৪ স্মরণ নাই।

निखिल-भारत चारुशिल्प प्रदर्शनी .

আগামী দুই মাসে কাজাখিস্তান যাবে।  
২০১৭-এর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় চাকরি  
প্রদর্শন প্রদর্শন হবে। কলিকাতার ইন্ডিয়ান  
মোবাইল অফিসের ডায়ালগ এটস এই প্রদর্শন  
ক্রিয়ায় প্রথম কথকতা।

રાહે જાય મન્યુજન

রাষ্ট্র ভাষা সম্মেলনের সাধারণ কাগাজাংক উদ্ভূত হইল মর্মে  
স্বকলমে আশা করেন, অনতিবিলম্বে সমগ্র বঙ্গদেশ  
হিন্দিভাষা শিক্ষার বিভাগে পরিণত হইয়া যাইবে। এ 'বয়েসে'  
উদ্দেশ্যের চার আসনের মধ্যে কালিকাতার চারটি (অষ্টজন  
হাস্ত) এবং দিনাজপুর ও কুমিল্লার একটি করিয়া হিন্দি  
বিভাগের স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের, মুন্সীগঞ্জ  
-ব্রিশাল, চাঁদপুর, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানেও সাধারণ চৌদ্দ



চলিতেছে।" আশায়েন কুমারীকর্তৃকণের মধ্যে কেতকৈ  
হিন্দীভাষাকে প্রাচ্যের দেবতার ভাষা করিয়েন বলিয়া  
ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ১লা এবং ২য় জুন  
আগামে শিবসাগরে রাই ভাষা লেখকের অভিধেয়ন  
বসিবে।

বঙ্গদেশে এই হিন্দীভাষা প্রচার করতঃ প্রচারিত  
করা হইবে, এবং পরিশেষে ইহা বাংলা ভাষার বৈধী হইয়া  
উঠিবে কি না, তাহা প্রসার অগ্নিকণের দ্বারা ভবিষ্যৎ  
দেখা উচিত। আমরা এ বিষয়ে সুবিধাবর্ত্ত প্রত্যয়  
আমন্ত্রণ করিতেছি।

### শিল্পে নয়াতা

গিরে দ্বিত্য: নিকটীয় নতুন বলিয়া লক্ষণের শিল্পদগ  
বহুদিন হইতে একটা আঁখতার ভোগ করিয়া আসিতেছেন।  
সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশেও ইহার বিকল্পে অভিমান দেখা  
দিয়াছে। ফটোগ্রাফের উদ্ভব হইলে আন্তর্জাতিক  
ছায়াচিত্র প্রদর্শনী হইতে একটি ফটোগ্রাফ এবং মনট্রোফের  
চার পির প্রদর্শনী হইতে চুইটি উৎকর্ষশ্রুতি অর্জনতা  
হেতু অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে শিল্পদগের মধ্যে একটা  
সম্মতির অঙ্গোব দেখা দিয়াছে। ফটোগ্রাফটি ছোটো  
মোটাকিয়ার সুবিখ্যাত ফটোগ্রাফার ফ্রেড্রিক্স ব্রিটিকোব  
বুজিত একটি নয় নারীমূর্ত্তি, এবং মূর্ত্তি চুইটি ফটোগ্রাফের  
স্মারকসমূহ। ইহার উল্লিখ্য লক্ষণ হইত একটি নয়  
বালকের পরিচয়ন। শিল্প-প্রদর্শনী-সমিতির একজন সদস্য  
বলিয়াছিলেন, মূর্ত্তি চুইটিকে আঁখিয়া না পরাইয়া কিছুতেই  
প্রদর্শনীতে রাখা হইতে পারে না।

মিঃ ল্যাংগের শিল্প-মূর্ত্তি লক্ষণ হইল একাডেমী এবং  
দ্বিত্যের দ্বারা একাডেমীতে প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রত্যয়  
তিনি এক্ষণে উক্তদ্বয়ের শিল্পী; তথাপি তাঁহার শিল্প-

লক্ষণ যাহা বালকের নকশায় কম-সামান্য লক্ষ্য করিতে  
পারিল না।

### শিক্ষকভাষার নারীর অধিকার

ইংলণ্ডে মিষ্ট্র মস্টার ক্রুসান্দ ল্যান্ডোনিগেন্দ্র মস্ট্র  
কুলমাত্রার্নের অভিধেয়নে প্রা-শিক্ষকিত্তো কর্তৃক বালকদিগকে  
মস্ট্র-ক্রীড়ার শিক্ষালয়ের সমীচীনতা বিষয়ে কথা উঠিয়াছিল।  
মিঃ মস্ট্রের মতঃ এ, টি, এন, মিষ্ট্র প্রত্যয় কথেন দে, বালক-  
দের চিত্র-করে শিক্ষাপরিষদের নিয়ম করা উচিতঃ যে  
বালকদের মস্ট্র-ক্রীড়া-শিক্ষা একমাত্র পুরুষ শিক্ষক কর্তৃক  
প্রদত্ত এবং পরিচালিত হইবে। ক্রীড়া শিক্ষকগণের নিয়ম  
কর্ত্তী, ক্রীড়ামনী এবং পরিশ্রম হইয়া আবশ্যিকঃ পুরুষ-  
দের মধ্যে সম্ভবতঃ এই লক্ষণীয় নারীদলের অপেক্ষা  
বেশি পরিমাণে আছে।

কুমারীকর্তৃকিত্তো নতুন, সাধারণ শিক্ষা লক্ষণেও বিনা  
বিদ্যাবাদে কয়েকটি প্রকার গৃহীত হয়, উক্তরা একটির  
মতঃ—লক্ষণ নতুন বালকদের পুরুষ প্রচার-শিক্ষিতঃ এবং  
অন্তর পুরুষ শিক্ষকদের মণীনে পুরুষ-প্রচারের মধ্যে থাক।  
আবশ্যিকঃ। অতঃ একটি প্রচারের মতে, যে শিক্ষাকৃত্তাদের  
মধ্যে বালক ও বালিকাদ্বয়ের বিচার এক বিভিন্ন বিভা-  
লয়ের ব্যবস্থা নাই সে শিক্ষাকৃত্তার নারীদলারক হইতে  
পারে না।

### ক্রম-সংশোধন

এই সংখ্যার ১৪১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ২৮ লাইনে  
“নীতি” বলে “নীতি নাট্য” হইবে।

১৪২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ২ম লাইনে “অন্তর”  
এক “মহ” কথায় বসে। এট কথাক্রম বসিবে :—

“প্রাতিষ্ঠানিক হইয়া উঠিয়াছিল যে কলম,—লক্ষণে  
অবস্থিত দর্শন”।